দেশ পত্রিকা

সম্পাদক : শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন | সহকারী সম্পাদক : শ্রীসাগরময় ঘোষ

৩ বর্ষ] ৬ পৌষ, শনিবার, ১৩৫২ সাল। Saturday, 22nd December, 1945. [৭ম সংখ্যা

কাঁথির নির্যাতনের কাহিনী

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি ইহার পূর্বে মেদিনীপুরের তমলুক মহকুমার আগস্ট আন্দোলন সম্পর্কে যে অত্যাচার এবং অনাচার চলে, তার রিপোর্ট প্রকাশ করেন, সম্প্রতি তাঁহারা কাঁথি মহকুমার অনুষ্ঠিত অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন। এই রিপোর্টের সংক্ষিপ্ত সার নিম্নরূপে দেওয়া যাইতে পারে:—

(১) গুলীতে নিহত — ৩৯ জন
(২) গুলীতে আহত — ১৭৫ জন
(৩) নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার, অত্যাচারের চেষ্টা, নারীর সম্ভ্রমহানি — ২২৮ জন
(৪) অগ্নিপ্রয়োগে গৃহ — ১৬৫
(৫) গৃহদাহ জনিত ক্ষতির পরিমাণ — ৫,৪৯,৪৩৪ টাকা।
(৬) গ্রেপ্তারের সংখ্যা (যাহাদিগকে বেআইনীভাবে আটক করা হইয়াছিল এবং উৎপীড়নের পর মুক্তিদান করা হয় তাহাদিগকে লইয়া) — ১২,৬৮১
(৭) দণ্ডিত — ৬৭২
(৮) গৃহ লুণ্ঠন — ২০৫৯
(৯) লুণ্ঠন জনিত ক্ষতি — ৩,৫৫,২৪৬ টাকা
(১০) লাঠির আঘাতে আহত — ১,৬৮৫ জন
(১১) পাইকারী জরিমানা — ৩০,০৫০ টাকা
(১২) স্পেশাল কনস্টেবল নিয়োগ — ৪৩৮
(১৩) যে সব হিন্দুদিগকে মুসলমানদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল — ১০ জন

কাঁথির বুকের উপর দিয়া এদেশের বিদেশী শাসকেরা উন্মত্ত পশুর মত ... কতটা তাণ্ডব চালাইয়াছে এবং বীভৎস কাণ্ড ... ... কংগ্রেস কমিটির প্রকাশিত এই রিপোর্টেই আমরা ... [illegible]

সাময়িক প্রসঙ্গ

... পরিচয় পাওয়া যাইবে। প্রকৃতপক্ষে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমলাতন্ত্রের নির্মম অত্যাচার মেদিনীপুর যেভাবে অপরিসীম বীরত্ব ও শৌর্য সহকারে সহ্য করিয়াছে, ভারতের কোথায়ও তাহার তুলনা মিলে না। সর্দার বল্লভভাইয়ের দ্বারা সুখ্যাত বারদোলী তালুকের কথা আমরা শুনিয়া থাকি; কিন্তু মেদিনীপুরের অকুণ্ঠ আত্মত্যাগের কাছে বারদোলীর মহিমাও ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে। পরাধীন জাতির জনগণের অন্তরে স্বাধীনতার জন্য অনবোচিত উদ্যম যেখানে আন্তরিকতা এবং আত্মোৎসর্গের উগ্র আকার ধারণ করে, সেখানে বিজেতা শক্তি কতটা অমানুষ হইয়া উঠে, মেদিনীপুরে আমরা সে পরিচয় পাই। নারী ধর্ষণের কথা উল্লেখ করিয়া এই রিপোর্টে বলা হইয়াছে—

কখনও কখনও একটা গোটা গ্রাম অথবা কোন কোন গ্রামের ঘরবাড়ি সেনাদল অথবা পুলিশ দ্বারা বেষ্টিত এবং পুরুষদিগকে গ্রেপ্তার করা হইত অথবা বলপূর্বক অনাত্র অপসারিত করা হইত। ইহার পর নারীদের উপর পীড়ন এবং পাশবিক অত্যাচার করা হইত। দুইশত আটশজন স্ত্রীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচার এবং উৎপীড়ন করা হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া যায়। এইসব পাশবিক কার্যের বিবরণ অত্যন্ত লোমহর্ষণকর। কখনো কখনো একটি স্ত্রীলোকের উপর তিন বা ততোধিক সৈনিক পর পর পাশবিক অত্যাচার করিয়াছে। তিনদিনের সদ্যপ্রসূতা নারীকে পর্যন্ত রেহাই দেওয়া হয় নাই। নানারকমে স্ত্রীলোকদের শ্লীলতা নষ্ট করা হইয়াছে এবং হতভাগিনী নারী তাহাতে সামান্য বাধা দিতে গেলে বন্দুকের কুঁদা দিয়া তাহাকে প্রহার করা হইয়াছে এবং পদাঘাত করা হইয়াছে। এই অবস্থার মধ্যে ছুরিকাঘাত করারও একটা ঘটনা জানা যায়।"

সাম্রাজ্যবাদী শাসকের দল জার্মান অত্যাচার এবং জাপানীদের অত্যাচারের কথা আমাদিগকে শুনাইয়া তাহাদের নিজেদের সভ্য জীবনের মধুর মহিমা উপলব্ধি করাইতে চাহেন; কিন্তু এই সব অত্যাচারের অপেক্ষা জঘন্যতা আর কোথায়ও ঘটিতে পারে বলিয়া আমরা জানি না। বেলসেন ও ডাকাউতে অনুষ্ঠিত অত্যাচারও ইহার কাছে তুচ্ছ হইয়া পড়ে। সাম্রাজ্যবাদীদের শত প্রকার প্রচারকার্যের দ্বারাও আমাদের এ বিশ্বাস বিন্দুমাত্রও শিথিল হইবে না। ভারতবাসীরা যদি স্বাধীন থাকিত, তবে এই সব অত্যাচারী পশুদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে ইহাদের এক একজনকে প্রকাশ্যভাবে বেত মারিয়া তবে তাহারা ন্যায়ের মর্যাদা বজায় রাখিত এবং মানবতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিত; কিন্তু পরাধীন এদেশ, তাই এখানে এমন অত্যাচার এবং নির্যাতন সম্বন্ধে নিরপেক্ষ তদন্ত পর্যন্ত হইল না; কিন্তু উৎপীড়িতা নারীর নেত্রনীর এদেশের মাটিকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে এবং তাহা হইতে একদিন অগ্নিময় কৃত্যা সমুত্থিত হইবে। অত্যাচারীরা আজ দেশের পরাধীনতার আড়ালে লুক্কায়িত থাকিতে পারে; কিন্তু আর অধিক দিন তাহা সম্ভব হইবে না। ভারতসচিব লর্ড পেথিক লরেন্স পাইকারীভাবে রাজ-কর্মচারীদিগকে রক্ষার জঘন্য হুমকি দেখাইয়াছেন, কিন্তু বেশী দিন সেই ধরণের ফাঁকা হুমকিতে কাজ চলিবে না। দেশের লোক শাসনের ক্ষমতা যেদিন লাভ করিবে, সেদিন এই সব দুষ্কৃতকারীরা কর্তব্য পালনের নামে কর্তব্য লঙ্ঘনের জন্য আদর্শ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।

ব্রিটিশ প্রতিনিধি দল

ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের প্রতিনিধি দল ভারতে আসিতেছেন। সংবাদে দেখা যাইতেছে, তাঁহারা বড়দিনের পর ইংলণ্ড হইতে রওয়ানা হইবেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, ব্রিটিশ প্রতিনিধি দলের এই-ভাবে ভারত পরিদর্শনে আগমনের ব্যাপারকে আমরা কোনরূপ গুরুত্বই প্রদান করি না। কারণ ভারতের রাজনীতিক সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহাদের নূতন কিছুই জানিবার নাই এবং ভারতবাসী ও ব্রিটিশ শ্রমিকদলের মধ্যে প্রীতির বন্ধনকে দৃঢ় করাই যদি তাঁহাদের আগমনের উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তবে ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের মতিগতি পরিবর্তিত না হইলে তাহাও সম্ভব নহে। সেদিন ব্রিটিশ শ্রমিক দলের পক্ষ হইতে মিঃ উইলিয়ম ডোবী, মিঃ এম জে কোভ, মিঃ এস ও ডেভিস এবং উইং-কম্যাণ্ডার মিলিংটন এ সম্বন্ধে একটি বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, ভারতবাসীদের সঙ্গে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করাই যদি এই প্রতিনিধি দল প্রেরণের উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তবে আজাদ হিন্দ ফৌজের অধিনায়কদের বিরুদ্ধে সামরিক আদালতে যে মামলা চালানো হইতেছে, অগ্রে তাহা প্রত্যাহার করা উচিত। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট কিংবা তাঁহাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ভারত গভর্নমেণ্ট যাহাই মনে করুন, সমগ্র ভারত আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বদেশপ্রেমে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে এবং সামরিক আদালতে ইঁহাদের অধিনায়কগণের বিরুদ্ধে মামলা আনাতে ভারতবাসীদের মনে বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট স্পষ্টভাবে জনমতকে যেক্ষেত্রে উপেক্ষা করিতেছেন, সেক্ষেত্রে ভারতের জনসাধারণ তাঁহাদের প্রেরিত প্রতিনিধিদলকে হৃদ্যতার সঙ্গে গ্রহণ করিতে পারে না এবং তাঁহাদের প্রেরিত প্রতিনিধিদলের সঙ্গে ভারতবাসীদের আন্তরিকতার সূত্রে আলাপ-আলোচনাও সম্ভব নহে। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের এই কয়েকজন শ্রমিক প্রতিনিধি সাহস করিয়া একটি অপ্রিয় সত্য কথা এক্ষেত্রে উচ্চারণ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। তাঁহারা বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের বর্তমান গভর্নমেণ্ট গণতান্ত্রিক নহে এবং সে গভর্নমেণ্ট জনমতের দ্বারাও পরিচালিত হয় না; কাজেই যথোচিত মর্যাদা এবং কর্তৃত্ব পরিচালনের সর্বময় ক্ষমতার দাবীও সে গভর্নমেণ্ট করিতে পারে না। যাঁহারা সমগ্র ভারতের প্রবল জনমতকে পদদলিত করিয়া আজাদ হিন্দ বাহিনীর স্বদেশপ্রেমিক বীরসন্তানদিগকে দণ্ডিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাঁহারা এই পরামর্শ গ্রহণ করিবেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। দেখিতেছি, ভারতের জনমতকে অগ্রাহ্য করিয়া এবং ভারতবাসীদের স্বাধীনতাপ্রবৃত্তিকে পশুবলে পিষ্ট করিয়া সেই সঙ্গে ভারতবাসীদের প্রতি মৌখিক সদিচ্ছা প্রকাশের কূটকৌশলই তাঁহারা অবলম্বন করিতেছেন; কিন্তু এতদ্দ্বারা ভারতবাসীরা প্রতারিত হইবে না। ব্রিটিশ শ্রমিকদল এ সত্য সুনিশ্চিতভাবে জানিয়া রাখুন এবং তাঁহাদের ধাপ্পাবাজী হইতে নিবৃত্ত থাকুন। ভারতবাসীদের আত্মমর্যাদায় আঘাত শেষ মাত্রায় পৌঁছিয়াছে এবং এসব চাল তাহারা কিছুতেই ভাল দৃষ্টিতে দেখিবে না।

পরলোকে রজনীকান্ত গুহ

অধ্যক্ষ রজনীকান্ত গুহ লোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙলাদেশে একজন প্রবীণ শিক্ষাব্রতীর অভাব ঘটিল। গ্রীক ও লাটিন ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে এবং সিটি কলেজের অধ্যক্ষ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি যে যোগ্যতা এবং কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, এদেশের ছাত্র ও শিক্ষকসমাজে তাহা আদর্শ হইয়া থাকিবে। গুহ মহাশয় বিদেশী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু বাঙলা ভাষার প্রতিও তাঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তাঁহার লিখিত সক্রেটিসের জীবনী বাঙলা সাহিত্য-ভাণ্ডারে মৌলিক অবদান হইয়া থাকিবে। তিনি ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন; ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতারূপে আমরা তাঁহার সাধক জীবনের পরিচয় পাইয়াছি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অমায়িক, তেজস্বী এবং সাধু-পুরুষ ছিলেন। আমরা তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

মাতৃভাষার মর্যাদাবোধ

একান্ত প্রয়োজন না হইলে মাতৃভাষা ব্যতীত বিদেশী ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করাকে আমরা ব্যক্তি এবং জাতি উভয়ের পক্ষেই আত্মমর্যাদাবোধের অভাব বলিয়া মনে করিয়া থাকি এবং এই বস্তুর অভাব ঘটিলে কোন জাতিই বড় হইতে পারে না। সম্প্রতি সোদপুর আশ্রমে দৈনন্দিন প্রার্থনার পর মহাত্মাজী এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া-ছিলেন। তিনি বলেন, ইংরেজি বা অন্য কোন বিদেশী ভাষা শিক্ষা করা যে দোষের এমন কিছু নয়, কিন্তু ইংরেজি ভাষাকে ভদ্রস্থতা বা সামাজিক মর্যাদার স্থান দান করাতে জাতির যে কতখানি অনিষ্ট সাধিত হয়, সাধারণত আমরা অনেকে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখি না। তিনি আরও বলেন যে, বিজেতা ইংরেজ জাতির ভাষার প্রতি অকারণ শ্রদ্ধাবুদ্ধি পোষণ করিবার দৈন্য যেদিন আমরা পরিত্যাগ করিতে পারিব, সেদিন ভারতের ক্রীতদাস-জীবনের একটি বড় বাঁধন ছিন্ন হইয়া যাইবে। প্রকৃত-পক্ষে জাতির সাহিত্যের মধ্যে তাহার প্রাণশক্তি নিহিত থাকে; এরূপ অবস্থায় জাতীয় সাহিত্য এবং মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ ব্যতীত কেহই প্রকৃত দেশপ্রেমিকের পর্যায়ভুক্ত হইতে পারেন না। তথাকথিত সেই দেশপ্রেম ভিতর অন্তরের সঙ্গে গ্রথিত হয় না এবং বিদেশীর ঘৃণ্য অনুকরণের মোহের মধ্যেই তাহা পাক খাইতে থাকে। জাতীয় সাহিত্যের প্রতি মর্যাদাবুদ্ধির উজ্জ্বল আলোকে আমাদের স্বাধীনতার সাধনা প্রদীপ্ত হইয়া উঠুক, আমরা ইহাই কামনা করি; দেশের শিক্ষিত সমাজের দৈনন্দিন জীবনে শ্রদ্ধাবুদ্ধির অভাবের বেদনা এখনও আমাদের অন্তরে বাজে বলিয়াই এই কথা লিখিতে হইল।

ব্রিটিশ শ্রমিকদলের নীতি

কলিকাতায় বাঙলার লাট এবং বড়লাটের সঙ্গে যথাক্রমে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এবং মহাত্মা গান্ধীর আলোচনা হয়, তাহা লইয়া ইতিমধ্যে অনেক জল্পনা-কল্পনা হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি এই মর্মে একটি সংবাদ প্রচারিত যে, কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ এবং গভর্নমেণ্টের মধ্যে এই আলোচনা সূত্রে একটা আপোষ রফা হইয়া গিয়াছে এবং নেতারা গভর্নমেণ্টের কাছে এই প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন অদূর ভবিষ্যতে তাঁহারা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কোন কর্মপন্থা অবলম্বন করিবেন না। কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট মৌলানা আজাদ সংবাদের প্রতিবাদ করিয়াছেন। আমরা নিজেরা এই ধরণের সংবাদকে কোনরূপ গুরুত্বই প্রদান করি না; কারণ গভর্নমেণ্ট ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া না লইলে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কাহারও পক্ষে তেমন প্রতিশ্রুতি দান করা সম্ভব নয়, এবং ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের মতিগতিরও তেমন কোন পরিবর্তন দেখা যাইতেছে না; পক্ষান্তরে, পশুশক্তির স্পর্ধায় তাঁহারা যেন প্রমত্ত হইয়া উঠিতেছেন। বিলাতের "নিউ স্টেটসম্যান ও নেশন" পত্রে সম্প্রতি কলিকাতায় ছাত্রদের শোভাযাত্রার উপর গুলী চালনা সম্বন্ধে একজন ইংরেজ সৈনিকের লিখিত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক ইহার উপর এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র শ্রমিক সরকার নামে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ফ্যাসিস্ট পন্থা প্রয়োগ করিতে-ছেন। জাতীয় স্বার্থেই ব্রিটিশ শ্রমিক দলের গভর্নমেণ্টের কাছে বড় ছটাকা

উঠিয়াছে। বিদেশী পরাধীনদিগকে শোষণ করিয়া স্বজাতিকে পোষণই ইহাদের মুখ্য নীতি। সেদিন স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের মুখেও আমরা সেই কথাই শুনিতে পাইয়াছি। অথচ অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীদের মত শ্রমিক দলের নেতা রাজপুরুষেরা এ কথাটা কূটকৌশল প্রয়োগে চাপিয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছেন। সেদিন লর্ড লিস্টোয়েল ইন্দোনেশিয়ায় অবলম্বিত ব্রিটিশ নীতিকে সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, দ্বীপে সৈন্য প্রেরণের দায়িত্ব শুধু ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টেরই নয়, আমেরিকার সঙ্গে পরামর্শ করিয়াই ব্রিটিশ ঐ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। লর্ড মহোদয় এতদ্বারা কি ইহাই বুঝাইতে চাহেন যে, আমেরিকার সঙ্গে যোগ দিয়া অপরের স্বাধীনতা অপহরণ করিবার চেষ্টা করিলে তাহা ইংরেজের পক্ষে দোষ হইয়া গুণ হইয়া দাঁড়ায়? প্রশান্ত মহাসাগরের রাজনীতি সম্বন্ধে যাঁহাদের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারাই জানেন, ঐ অঞ্চল শোষণ করিবার জন্য ইংরেজ, মার্কিন এবং ওলন্দাজ এই তিন শক্তি হাতে হাত মিলাইয়া কাজ করিতেছে। লর্ড মহোদয় এক্ষেত্রে তাঁহাদের পক্ষে মামুলি যুক্তি উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ইন্দোনেশিয়ায় অবস্থিত জাপ সেনাদিগকে নিরস্ত্র করিবার উদ্দেশ্যেই ইংরেজ সৈন্য সেখানে গিয়াছে; কিন্তু সেজন্য তথাকার স্বদেশ-প্রেমিক বীর সন্তানদের রক্তে ভূমি ধৌত করিবার কি প্রয়োজন ছিল? ইন্দোনেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ডক্টর সারিয়ার অতি স্পষ্ট ভাবেই বলিয়াছেন, ব্রিটিশ ও মার্কিন ওলন্দাজ শাসকদের উপর চাপ দিয়া যদি ইন্দোনেশিয়াকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য করায়, তবে তাঁহারাই জাপানীদিগকে নিরস্ত্র করিবার ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু ইংরেজের পক্ষে তেমন সুবুদ্ধি দেখা দিবার কোন সম্ভাবনাই নাই; কারণ সাম্রাজ্যবাদী-দের পরস্পরের স্বার্থ অঙ্গাঙ্গিভাবে গ্রথিত। তাহাদের মধ্যে একজনের স্বার্থ বিপন্ন হইলে অপর সাম্রাজ্যবাদীর সহানু-ভূতি উথলিয়া উঠে। এজন্য ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি যেমন ব্রিটিশের প্রীতি দেখা যাইতেছে, ইন্দোচীনে ফরাসীদের সঙ্গে তাহাদের প্রীতির ভাবও তেমনই উত্তরোত্তর পরিপুষ্ট হইতেছে। ইংরেজ সৈন্য স্বদেশপ্রেমিক আনামীদের ধ্বংসের শুভকার্যে প্রবল উৎসাহে মাতিয়া উঠিয়াছে। এরূপ অবস্থায় সাম্রাজ্য-বাদীদের বিরুদ্ধে এশিয়ার স্বাধীনতাকামী দেশসমূহের মৈত্রীর বন্ধন দৃঢ় হইবে ইহা স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক প্রেরণাই ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় দলের সঙ্গে ভারতের কংগ্রেসের প্রীতিসূত্র গড়িয়া তুলিতেছে এবং তথাকার নেতৃবৃন্দ সেই প্রবৃত্তিবশেই পণ্ডিত জওহরলালকে তথায় আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাম্রাজ্য-বাদীদের পক্ষে ইহা আশঙ্কার বিষয় রহিয়াছে; তাই পণ্ডিতজীকে তাঁহারা ইন্দো-নেশিয়ায় যাইতে সুবিধা প্রদান করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। সম্প্রতি ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতাকামী সম্প্রদায়ও পণ্ডিতজীকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মদেশে নিজেদের সাম্রাজ্য দৃঢ় করিবার জনাই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট পরাইয়াছেন; সুতরাং সে সুবিধা তাঁহারা পণ্ডিতজীকে দিবেন, এরূপ আশাও দুরে পরাহত; কিন্তু ব্যক্তির প্রভাবকে তাঁহারা রুদ্ধ করিতে পারেন, স্বাধীনতার প্রেরণায় এশিয়ার জাগ্রত জাতিনিচয়ের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টাকে রোধ করিবার শক্তি তাঁহাদের নাই এবং এই সঙ্ঘ-প্রেরণা সাম্রাজ্যবাদীদের শক্তির মূলে আঘাত করিবে, এশিয়ায় এমন দিন উত্তরোত্তর আসন্ন হইতেছে।

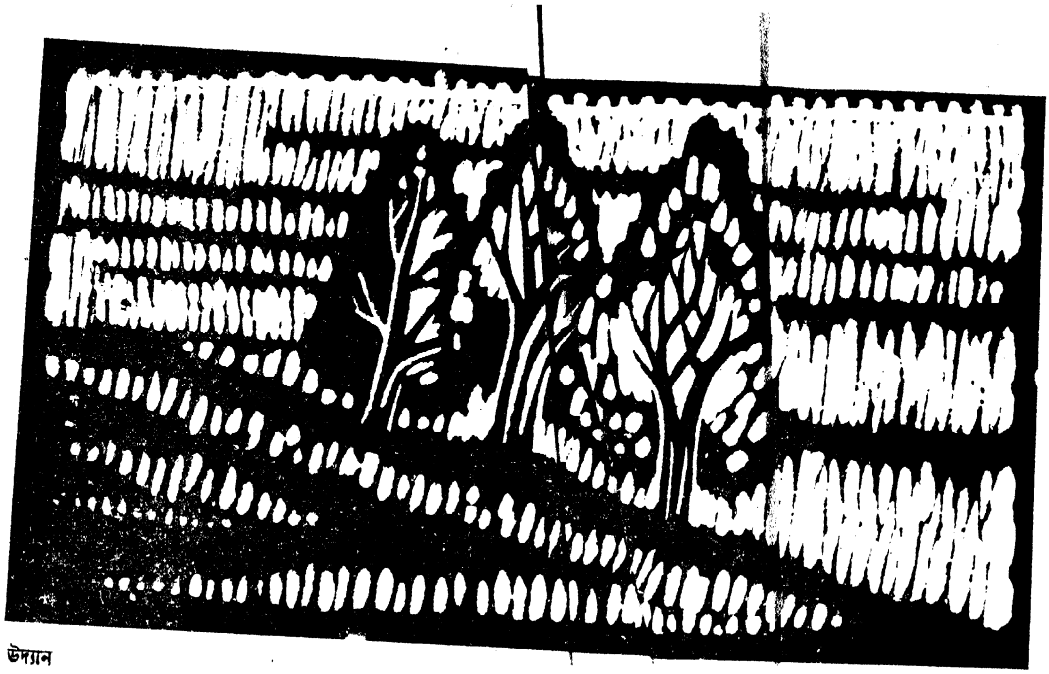
স্যার নাজিমুদ্দীনের সওয়াল

মুসলিম লীগের চেলার দল বর্তমান নির্বাচন সম্পর্কে বাঙলা দেশের সর্বত্র যে গুণ্ডামী চালাইতেছে, এতদিন পরে স্যার নাজিমুদ্দীন তাহার সাফাই গাহিবার জন্য লাগিয়া আসিয়াছেন। লীগওয়ালাদের মামুলী ধাপ্পাবাজী চালাইয়া তিনি কংগ্রেসের উপর যত দোষ আরোপ করিয়া ছেন; কিন্তু তাঁহার উক্তির মূলে কোন যুক্তিই নাই। কংগ্রেসকে এইভাবে গালি-গালাজ করিয়া সাম্প্রদায়িকতায় অন্ধদিগকে সহজেই উত্তেজিত করিয়া তোলা যায়; সেক্ষেত্রে যুক্তির কোন প্রশ্নই উঠে না, অথচ লীগওয়ালাদের কার্য সিদ্ধির সুবিধা হয়। স্যার নাজিমুদ্দীনের ন্যায় শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিও যে এইরূপ পন্থা অবলম্বন করিতে লজ্জাবোধ করেন না, ইহা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। লীগের নেতা মিঃ জিন্না কিন্তু এ পন্থা গ্রহণ করেন নাই; তিনি লীগওয়ালাদের গুণ্ডামীর কথা একেবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু স্যার নাজিম অভিযোগ একেবারে অস্বীকার করেন নাই; পক্ষান্তরে তাঁহার বক্তব্যের উপসংহার ভাগে গুণ্ডামিকে সমর্থন করিয়াছেন এবং এই যুক্তি দেখাইয়াছেন, ইংলণ্ডে ও অস্ট্রেলিয়াতেও এমন ব্যাপার ঘটিয়া থাকে; সুতরাং গবর্ণমেণ্ট যেন এসব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করেন। বাঙলা দেশের অতীত স্বৈরাচারের অন্যতম স্তম্ভ স্যার নাজিমুদ্দীনের মুখে গণতান্ত্রিকতার এমন দোহাই শুনিয়া আমরা পুলক বোধ করিতেছি; কিন্তু প্রতিপক্ষের মাথা ভাঙ্গা বুলি লীগওয়ালাদের গণতান্ত্রিকতারই রীতি; কার্যত গুরু মিঃ জিন্না এবং শিষ্য স্যার নাজিমুদ্দীন উভয়ের মধ্যে মুখ্য উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে মতের কোন প্রভেদ নাই; অজ্ঞ জনসমাজকে সস্তা সাম্প্রদায়িকতায় বিভ্রান্ত করিয়া নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থ সিদ্ধ করাই ইঁহাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু লীগ-ওয়ালাদের এই নীতির পরিণতি বাঙলা দেশ বিগত দুর্ভিক্ষে দেখিয়া লইয়াছে। সে দুর্ভিক্ষে বাঙলার মুসলমান সমাজের সহস্র সহস্র নরনারী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, অথচ লীগওয়ালারা পদ মান আঁকড়াইয়া ধরিয়া সর্বতোভাবে নিজেদের তুষ্টি পুষ্টির দিকেই দৃষ্টি রাখিয়াছেন এবং দুই হাতে গরীবের টাকা নানারূপ কৌশলে লুঠিয়াছেন। স্যার নাজিমুদ্দীন লীগের সাফাই গাহিতে পারেন; কিন্তু তদ্দ্বারা সত্য যাহা তাহা মিথ্যাতে পরিণত হয় না। লীগনেতাদের সঙ্কীর্ণচিত্ততা এবং স্বার্থপরতা বাঙলা দেশের যে সর্বনাশ সাধন করিয়াছে সহৃদয় মুসলমান সমাজ তাহা বিস্মৃত হইতে পারিবে না।

পরলোকে হীরালাল লোহিয়া

প্রসিদ্ধ কংগ্রেসকর্মী হীরালাল লোহিয়ার আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছি। লোহিয়া মহাশয় দৃঢ়চেতা এবং একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক ছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কংগ্রেসের সেবাই তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান ছিল। পরাধীন দেশে দেশ-সেবকের যাহা পুরস্কার সেই কারাদণ্ড এবং নির্যাতন ও লাঞ্ছনা তিনি যথেষ্টভাবেই লাভ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করেন এবং মুক্তিলাভ করিয়াই তিনি কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে এবং ভগ্নস্বাস্থ্য হওয়া সত্ত্বেও দেশের কাজে কোনদিন তাঁহার শ্রান্তি বা ক্লান্তি ছিল না। লোহিয়া মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র ডক্টর রামমনোহর লোহিয়া এখনও আগরা জেলে বিনা বিচারে অবরুদ্ধ রহিয়াছেন। ভারতের স্বদেশ প্রেমিক বীর সন্তানদের উপর এইরূপ নির্যাতন আরও কতকাল চলিবে, আমরা জানি না। দেখিতেছি, বিলাতে শ্রমিক গভর্নমেণ্টের প্রতিষ্ঠা হওয়া সত্ত্বেও ভারতের আমলাতন্ত্রের এই নিষ্ঠুর পীড়ন নীতির পরিসমাপ্তি ঘটিল না। ডক্টর লোহিয়া বলিষ্ঠ-প্রাণ ব্যক্তি। তিনি বহু নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন। পিতৃ-বিয়োগের পর মানবতার দিক হইতে বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে মুক্তিদান করা গভর্নমেণ্টের পক্ষে কর্তব্য। আমরা তাঁহাকে এবং তাঁহার অন্যান্য পরিজনবর্গের এই শোকে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

শান্তিনিকেতন কলাভবনের সৌজন্যে



উদ্যান

শিল্পী—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বিশী



পথ

শিল্পী—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বিশী

দেশের কথা

(২৫শে অগ্রহায়ণ—২রা পৌষ)

বড়লাটের বক্তৃতা—কাঁথিতে অনাচার—ভারতীয় জাতীয় সেনাদল—পার্লামেন্টের সদস্যদিগের ভারত পরিভ্রমণ নির্বাচন।

বড়লাটের বক্তৃতা—বড়লাট লর্ড ওয়াভেল বণিকসভা সংঘের বার্ষিক অধিবেশনে বক্তৃতা করিতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। গত ১০ই ডিসেম্বর তিনি বক্তৃতা দেন। তাহাতে বাঙলার গভর্ণরের প্রশংসা হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতীয় 'জাতীয় সেনা দলের' লোকের বিচার পর্যন্ত অনেক বিষয়েরও উল্লেখ ছিল। তিনি 'জাতীয় সেনাদলের' বিচারের সমর্থনে—সে সম্বন্ধে কিছু বলা অসংগত বলিয়া মুখ বন্ধ করিয়াও কথা বলিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারেন নাই। কংগ্রেস যে বৃটিশকে এ দেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে বলিয়াছেন, তাহাতে অবশ্য তাঁহার বিরক্তি স্বাভাবিক বলা যায়—কেননা, তাহা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্যের বিরোধী। তিনি বলিয়াছেন—ঐ কথা উচ্চারণ করিলেও উহা মন্ত্রবৎ কাজ করিবে না। তাঁহার এই বক্তৃতায় প্রথম বলা হইয়াছে, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে ভারতবাসীদিগের সরকার বা সরকারসমূহ প্রবর্তিত হইতেও পারে। মুসলিম লীগ যে পাকিস্থান পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, তাহা সম্ভব হইতেও পারে এমন কোন কথা এতদিন বৃটিশ সরকারের কোন দায়িত্বসম্পন্ন কর্মচারীর উক্তিতে শুনা যায় নাই। এইবার প্রথম বড়লাট যে কথা বলিলেন, তাহাতে উহার সম্বন্ধে সরকারের সম্মতির-সম্ভাবনার আভাস পাওয়া গেল। এদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ দীর্ঘকাল স্থায়ী করিবার জন্য যে ভেদনীতি নানা প্রকারে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে, পাকিস্থান পরিকল্পনা যে তাহারই ফল তাহা সর্বজনবিদিত। সে নীতির সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াই লর্ড ওয়াভেল ভারত-শোষণ নীতির পরিচালক বণিকদিগের সভায় ঐ কথা বলিয়াছেন, ইহাই অনেকের বিশ্বাস।

কাঁথিতে অনাচার—১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আন্দোলন সম্পর্কে মেদিনীপুর জিলার কাঁথি মহকুমায় যে অনাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ মেদিনীপুরের কাঁথি মহকুমা কংগ্রেস কমিটির পক্ষ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাস হইতে অক্টোবর মাস ইহারই মধ্যে সংঘটিত অনাচারের বিবরণে দেখা যায়—

(১) গুলীতে মৃতের সংখ্যা	৩৯
(২) গুলীতে আহত	১৭৫
(৩) স্ত্রীলোক ধর্ষণ, ধর্ষণের চেষ্টা ও লাঞ্ছনা	২২৮
(৪) গৃহদাহ	৯৬৫
(৫) গৃহদাহে নষ্ট সম্পত্তি মূল্য	৫,৪১,৪৩৪, টাকা
(৬) আটকের পরে লাঞ্ছনা দিয়া যাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়	১২,৬৮১ জন
(৭) দণ্ডিত	৬৭২ জন
(৮) লুণ্ঠিত গৃহের সংখ্যা	২,০৫৯
(৯) লুণ্ঠনকরা ক্ষতির পরিমাণ	৩,৫৫,২৪৬, টাকা
(১০) লাঠির আঘাতে আহত	৬,৬৮৫ জন
(১১) পাইকারী জরিমানা	৩০০০০ টাকা
(১২) স্পেশ্যাল কনস্টেবল নিযুক্ত	৪৩৪ জন
(১৩) হিন্দু স্ত্রীলোক নিখোঁজ	১০ জন

নিম্নে কাঁথি থানার চন্দনপুরের বিবরণ প্রদত্ত হইল—

২৭শে সেপ্টেম্বর প্রায় ৩৫ জন সশস্ত্র পুলিশ চন্দনপুরে স্বেচ্ছাসেবক শিবির আক্রমণ করে। স্বেচ্ছাসেবকদিগকে নির্মমভাবে প্রহার করে ও তাহাদিগের হাত বাঁধিয়া পুষ্করিণীতে ফেলিয়া দেয়। তাহার পরে তাহারা রামনগর থানার কেশবনীতে যাইয়া তথায় বালিয়াড়ীর উপর স্বেচ্ছাসেবক শিবির আক্রমণ করে। যখন আক্রমণ আরম্ভ হয়, তখন স্বেচ্ছাসেবকগণ নিদ্রিত ছিল। শিবির দগ্ধ করিয়া পুলিশ যখন গ্রামে প্রবেশ করিতে থাকে, তখন জনতা তাহাদিগের সম্মুখীন হয়। পুলিশ গুলী বর্ষণ আরম্ভ করে। তখনই ৩ জনের মৃত্যু হয় এবং অনুমান ১৪ জন আহত হয়। গ্রাম হইতে ফিরিবার সময় পুলিশ আবার স্বেচ্ছাসেবক শিবিরের সন্নিকটে সমবেত জনতার উপর গুলী বর্ষণ করে। ফলে ২ জনের মৃত্যু হয়, প্রায় ৬০ জন আহত হয়। পুলিশ প্রথম মৃত ৩ জনের শব ও ৩ জন আহতকে লইয়া চলিয়া যায়। মোট মৃতের সংখ্যা ১০ দাঁড়ায়। আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডে সম্পূর্ণ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

নেতৃগণের সহিত আলোচনা—কয়দিন পূর্বে 'এসোসিয়েটেড প্রেসের' সংবাদদাতা প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছেন, সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদিগের সহিত কংগ্রেসের কয়জন নেতার আলোচনায় উভয় পক্ষে বিরোধ বিরতি ঘটিয়াছে। কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বলিয়াছেন, কংগ্রেসের এখন কোন ব্যাপক আন্দোলন প্রবর্তনের কল্পনা নাই। কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগের সহিত কেবল প্রাদেশিক গভর্নরের আলোচনা হইয়াছে। তাঁহাকে ঐ কথা জানাইবার কোন কারণ বা সার্থকতা থাকিতে পারে ন[া]। গত ১৬ই ডিসেম্বর কংগ্রেসের রাষ্ট্রপ[তি] মৌলানা আবুল কালাম আজাদ জানাইয়াছে[ন], কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগের সহি[ত] সরকার পক্ষের যে আলোচনা হইয়াছে, তাহা কোনরূপেই মীমাংসা বা মিটমাট ব[লা] যায় না। লোক যেন কোন সাংবাদিকে[র] বা সংবাদপত্রের অনুমানপ্রসূত সংবা[দে] বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ভ্রান্ত না হন। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে প্রকাশিত কোন বিবৃ[তি] ব্যতীত আর কোন সংবাদে নির্ভর ক[রা] সংগত হইবে না। কংগ্রেস যে সরকারে[র] সহিত কোনরূপ দর কষাকষি করিবেন, ইহ[া] বিশ্বাস্য নহে। সেরূপ মনোভাব থাকি[লে] কংগ্রেস কখনই অবিচলিতভাবে নানারূ[প] ত্যাগ স্বীকার করিয়া আপনার পথে অগ্রস[র] হইতেন না।

পার্লামেন্টের সদস্যদিগের ভারত পরিদর্শন—পার্লামেন্টের জনকয়েক সদস্য ১০ দিনের জন্য সরকারের ব্যবস্থায় ভারতবর্ষ পরিদর্শনে আসিবেন। ঐ দলে পার্লামেন্টের লর্ড সভার যেমন কমন্স সভারও তেমনই প্রতিনিধি থাকিবেন। লর্ড চ্যান্সেলার হাউস অব লর্ডসের ও সভাপতি হাউস অব কমন্সের প্রতিনিধি মনোনীত করিবেন। তাঁহাদিগের ব্যয় ভারতবর্ষকে বহন করিতে হইবে না—বিলাতী সরকারই বহন করিবেন। তাঁহারা কোন বিষয় অনুসন্ধানও করিবেন না—তাঁহাদিগকে রিপোর্ট দিতেও হইবে না। এদেশে তাঁহাদিগের পরিভ্রমণের সব ব্যবস্থা ভারত সরকারই করিবেন। তবে তাঁহারা যাঁহার সহিত ইচ্ছা সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন। সে সম্বন্ধে কোনরূপ বিধিনিষেধ থাকিবে না। তাঁহাদিগের ভারতে আগমনের উদ্দেশ্য—তাঁহারা প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বুঝাইবেন, বিলাতের লোক—বিশেষ বিলাতের সরকার ভারতবর্ষের উন্নতি সম্বন্ধে অনবহিত নহেন। এই পর্যন্ত।

মহাত্মাজীর সফর—মহাত্মাগান্ধী এবার আর পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে যাইতে পারিবেন না। তিনি ১৮ই ডিসেম্বর রেল কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থায় স্পেশ্যাল ট্রেণে 'শান্তিনিকেতনে' যাইবেন। তথায় ২০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত থাকিয়া ঐদিন তিনি রামপুরহাটে যাইয়া স্পেশ্যাল ট্রেণে কলিকাতায় ফিরিবেন এবং ২৩শে ডিসেম্বর মেদিনীপুর যাত্রা করিবেন। বাঙলা সরকার তাঁহার মেদিনীপুরে যাত্রার জন্য একখানি বড় ও একখানি ছোট ষ্টীম লঞ্চ তাঁহাকে ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। ২৩শে যাত্রা করিয়া তিনি, পরদিন ডায়মণ্ড-হারবারে পৌঁছিয়া তথা হইতে তমলুকে যাইবেন এবং ৪ দিন থাকিবেন। তিনি ৩রা জানুয়ারী কলিকাতায় ফিরিবেন।

নির্বাচন—বাঙলা হইতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে সদস্য নির্বাচন শেষ হইয়াছে। মুসলমানাতিরিক্ত প্রার্থীদিগের মধ্যে সফলকাম সকলেই যে কংগ্রেসের মনোনীত, তাহা বুঝা যাইতেছে। কলিকাতা হইতে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু যে বিপুল ভোটাধিক্যে নির্বাচিত হইয়াছেন, তাহাতেই তাহা অনুমান করা যায়। মুসলমান কেন্দ্রসমূহে নির্বাচন প্রসঙ্গে মুসলিম লীগের দল যেরূপ অনাচারের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারা যায়। গত লোক গণনার সময় তৎকালীন মুসলমান প্রধান-সচিবের উক্তির প্রতিবাদ করা স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকারের মত লোকও কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। লোক গণনার উদ্দেশ্য যে এক সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য প্রতিপন্ন করাই নহে, তাহাও মুসলিম লীগের দল বিস্মৃত হইয়া কাজ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এবার মিঃ জিন্না যে বলিয়াছেন, মুসলিম লীগই এদেশে মুসলমানদিগের একমাত্র প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য নির্বাচনে লাঠি, রামদা প্রভৃতিও ব্যবহৃত হইতেছে। কলিকাতার ভূতপূর্ব মেয়র মিঃ জাকেরিয়া তাঁহার গৃহে প্রবিষ্ট কয়েকজন লোকের দ্বারা প্রহৃত হইয়াছেন। মিষ্টার ফজলুল হক ও স্যার আবদুল হালিম গজনভী অনাচারের ও অত্যাচারের বিষয় গভর্নরকে ও বড়লাটকে জানাইয়াছেন। বাঙলার গভর্ণর বলিয়াছেন, সরকার নির্বাচনে গুণ্ডামি সহ্য করিবেন না। কিন্তু তাঁহার কর্মচারীরা গুণ্ডামি নিবারণ করেন নাই। স্থানে স্থানে অভিযোগ—সরকারী কর্মচারীদিগের উপস্থিতিতেই গুণ্ডামি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণও নাই। কারণ, যেদিন ভোট দান হয়, সেই দিন পাবনার মুসলমান জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটও মুসলিম লীগের মনোনীত নির্বাচন প্রার্থীর বিজ্ঞাপন মোটরে ঝুলাইয়া ভোট গ্রহণ স্থানে গিয়াছিলেন—এ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। খান বাহাদুর হাসেমালী গত ১৬ই ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন,—বাঙলায় মুসলমানদিগের প্রতিনিধি নির্বাচন প্রহসন ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। তিনি সংবাদ পাইয়াছেন, গভর্ণরের নির্দেশ পালিত হয় নাই—কোন কোন মুসলমান সরকারী কর্মচারী প্রকাশ্যভাবে মুসলিম লীগের মনোনীত প্রার্থীদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়া সাহায্য করিয়াছেন—কেহ কেহ মুসলিম লীগের গুণ্ডাদিগের কাজ দমন করিতে ইচ্ছাপূর্বক বিরত ছিলেন।

যেদিন খান বাহাদুর হাসেমালীর বিবৃতি প্রদত্ত হয়, সেইদিনই খাজা স্যার নাজিমুদ্দীন—বহুদিন পরে—এক বিবৃতি দিয়া নির্বাচনে গুণ্ডামির সমর্থন করিয়াছেন এবং উত্তেজনার বশে বলিয়াছেন—বাঙলার গভর্ণরকে ভয় দেখাইয়া বলান হইয়াছে, তাঁহার সরকার নির্বাচন সভায় উক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা করিবেন। তিনি বিলাতী নজীরের আশ্রয় লইয়াছেন; কিন্তু নজীর যে বর্তমান ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে, তাহা বিবেচনা করিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, যখন বিলাতের প্রধান সচিব মিস্টার চার্চিলকেও তাঁহার বন্ধুর নির্বাচন-সভায় বক্তৃতা করিতে বাধা পাইতে হইয়াছিল, তখন এদেশেই বা কেন নির্বাচন-সভায় হাঙ্গামা নিন্দিত হইবে? তিনি গভর্নরের বক্তৃতার বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং বলেন নাই যে, বিলাতে বা অন্য কোথাও এক দলের লোকরা অন্য দলের প্রার্থীর নির্বাচনরোধের জন্য লাঠি ও রামদা পর্যন্ত ব্যবহার করে না। স্যার নাজিমুদ্দীনের উক্তিতেই মুসলিম লীগের মনোভাব সপ্রকাশ—সন্দেহ নাই। গভর্নর তাঁহার নির্দেশ লঙ্ঘনকারী সরকারী কর্মচারীদিগের ব্যবহার সম্বন্ধে কি করিয়াছেন বা করিতেছেন, জানা যায় নাই।

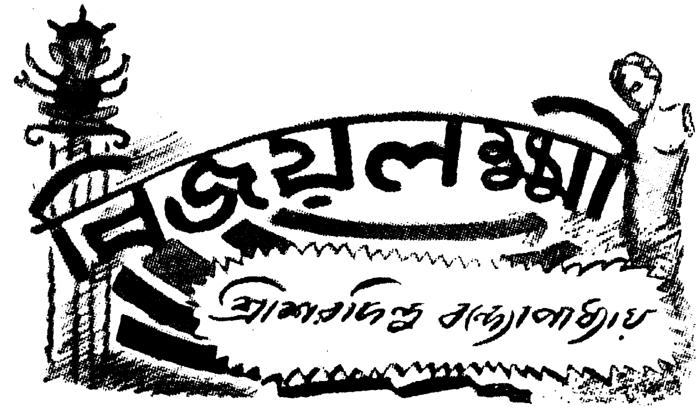
"ভারতীয় জাতীয় সেনাদল"—দেশের লোকের সমবেত ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারত সরকার "ভারতীয় জাতীয় সেনাদলের" নায়কদিগের বিচার করিতেছেন। বিচার প্রসঙ্গে যে সকল কথা প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে, "ভারতীয় জাতীয় সেনাদল" ব্রহ্মাদি বৃটিশের অধিকারচ্যুত দেশে বিপন্ন ভারতীয়দিগের ধনপ্রাণ মান রক্ষায় অবহিত হইয়াছিল; তাহাদিগের নেতার চেষ্টায় জাপান ভারতবর্ষে যথেচ্ছা বোমাবর্ষণে নিবৃত্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিল, বাঙলার দুর্ভিক্ষের সময় তিনি যে চাউল দিয়া সাহায্য করিতে চাহিয়াছিলেন সেই সাহায্য—লক্ষ টন চাউল—গ্রহণের ব্যবস্থা যদি ভারত সরকার করিতেন, তবে বহু লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণ হারাইত না। অবশ্য সে চাউল আসিলে বাঙলার মুসলিম লীগ সরকার তাহা বিকৃত করিয়া নষ্ট করিতেন কি না, তাহা কেহ বলিতে পারে না। ব্রহ্মে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত বৃটিশ সরকার তথায় সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতিকৃতি রক্ষা নিষিদ্ধ করিয়াছেন। সেজন্য তথায় ভারতীয়গণ প্রতিবাদ করিয়াছেন।

কোন সংবাদপত্রের ব্যাঙ্ককস্থ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন, তথায় "ভারতীয় জাতীয় সেনাদলের" ১৯,০৬৩ জন লোক বন্দী ছিলেন। তাঁহাদিগকে কোন অজ্ঞাত স্থানে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

নির্বাচন বোর্ড—বাঙলার ব্যবস্থা পরিষদে সদস্য নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রার্থী মনোনয়ন জন্য শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে সভাপতি ও ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে সম্পাদক করিয়া এক বোর্ড গঠিত হইয়াছে। বোর্ডের সদস্য—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার বসু, শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সৈয়দ নৌশের আলী, মৌলবী হবিবর রহমন চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সীতারাম শকসেরিয়া, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী ও ডক্টর সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইঁহারা কেহ নির্বাচনপ্রার্থী হইবেন কি না, জানা যায় নাই।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু—পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আসাম পরিভ্রমণ করিতেছেন। তিনি তথায় দেশবাসীকে মুক্তি-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে উপদেশ দিতেছেন। আসাম সরকার তাঁহার আসামে গমনের অব্যবহিত পূর্বে তথায় সরকারী কর্মচারীদিগকে ব্যবস্থা পরিষদে নির্বাচন সম্পর্কিত কোন সভায় যোগ দিতে নিষেধ করিয়াছেন। পণ্ডিতজী বাঙলায় দুর্ভিক্ষে ৩৫ লক্ষ লোকের অনশনে মৃত্যুর জন্য সরকারই দায়ী—একথা অকুণ্ঠভাবে প্রচার করিয়াছেন।

শান্তিপুরে তন্তুবায়—শান্তিপুরের কাপড় বাঙলার ও ভারতের সর্বত্র বিক্রীত হয়। সম্প্রতি সরকারী আদেশে সে কাপড় নদীয়া জিলার বাহিরে পাঠান নিষিদ্ধ হওয়ায় তন্তুবায়গণ বিপন্ন হইয়াছেন। মহকুমা হাকিম তন্তুবায়দিগের দুর্দশার বিষয় জানাইলে জিলা ম্যাজিস্ট্রেট তথায় আগমন করেন। তিনি সমবেত জনতার প্রতি অশিষ্ট ব্যবহার করিয়া বলেন—যখন দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তখন অন্নাভাবে কয় হাজার তন্তুবায় মরিলে তাহাতে ক্ষতি কি? তন্তুবায়দিগের অভিযোগের প্রতিকার করা পরের কথা তিনি ভয় দেখাইয়া গিয়াছেন—কাপড় জিলার বাহিরে পাঠাইবার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা ত হইবেই না; পরন্তু তিনি প্রতিবাদকারী তন্তুবায়দিগকে সূতা দেওয়াও বন্ধ করিয়া দিবেন। উপসংহারে তিনি তন্তুবায়দিগকে কাপড় বয়ন করা ছাড়িয়া মাটি কাটিতে সদুপদেশ দিয়া গিয়াছেন! তন্তুবায়গণ এই বিপদে কংগ্রেস-কর্মীদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। দেশের লোককেই দেশের লোককে বিপদে—ধ্বংস হইতে—রক্ষা করিবার কর্তব্য পালন করিতে হইবে।



ফেড্ ইন।

সকালবেলার কলিকাতা। বেলা আন্দাজ ন'টা। চায়ের দোকানের ভিড় কমিয়া গিয়াছে; মনিহারীর দোকানপাট খুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। মেস্-হোস্টেলের ঠাকুর-চাকর ব্যস্তসমস্তভাবে বাজার করিয়া ফিরিতেছে। শ্রাবণ মাস; কিছুক্ষণ আগে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া আবার রোদ উঠিয়াছে। ভিজা ফুটপাথ পথচারীর পায়ে পায়ে শুকাইয়া উঠিতেছে।

কলেজ স্ট্রীটের মত বড় রাস্তার উপর প্রকাণ্ড একটি দোকান। বাড়িটি দ্বিতল, দুইতলার মাঝখানে কার্নিসের উপর তিন ফুট উঁচু সোনালী অক্ষরে লেখা আছে—মনোহর ভাণ্ডার। উপরে সারি সারি জানালা; নীচে দরজার দুই পাশে দুইটি জানালা। সদর দরজাটি খুব চওড়া; ঘষা কাচের কবাট,দরজা হইতে দুই ধাপ নামিয়া ফুটপাথ।

ঠিক দরজার সামনে ফুটপাথের উপর একটি ক্ষুদ্র গর্ত আছে। এই গর্তটিকে গাবু করিয়া নিম্নশ্রেণীর কয়েকটি ছেলে মারবেল খেলিতেছে। তাহাদের সকলেরই বয়স পনেরো বছরের নীচে; গায়ে ময়লা ছেঁড়া জামা কাপড়, কেউ বা স্রেফ একটি হাফ-প্যাণ্ট পরিয়া আছে। কাহারও মুখে হাসি নাই; সকলে গভীরভাবে খেলায় মগ্ন।

যে ছেলেটি এই দলের সর্দার তাহার নাম কার্তিক। কালো শীর্ণ ছেলেটি, দেখিলে মনে হয় দুবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না; কিন্তু মুখেচোখে চোখা বুদ্ধি জ্বলজ্বল করিতেছে। সে গভীর মনঃসংযোগে মারবেল খেলিতেছে, দলের ছেলেদের প্রয়োজনমত শাসন করিতেছে, আর তাহার মুখ দিয়া চাপা আওয়াজ বাহির হইতেছে—চিকা চিকা বুম! কবে কোন্ গ্রামোফোনের দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে বিলাতী রেকর্ড শুনিয়াছিল, সেই গানের একটি পদ তাহার মস্তিষ্কে ছাপ মারিয়া দিয়াছে—চিকা চিকা বুম্!

ইতিমধ্যে মনোহর ভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়াছে; কাউণ্টারে যেসব কর্মচারী কাজ করে তাহারা একে একে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। একজন উর্দিপরা চাকর, কাঁধে ঝাড়ন ও হাতে পিজ্‌বোর্ডের কয়েকটি ফলক লইয়া বাহির হইয়া আসিল; অত্যন্ত অবহেলাভরে দরজার কাঁচের উপর ঝাড়ন চালাইয়া ফলকগুলি টাঙাইয়া দিয়া অদৃশ্য হইল। ফলকগুলিতে কোনটিতে লেখা আছে—'বিলাতী প্রসাধন দ্রব্য', কোনটিতে—'ফাউণ্টেন পেনের কালি অমাবস্যা' কোনটিতে—'বিলাতী কাচের বাসন' ইত্যাদি।

কার্তিকের দল খেলিয়া চলিয়াছে; পথিকদের যাতায়াতের ভিতর দিয়া তাহাদের পাথরের গুলী ছুটিতেছে; গুলী খেলার বিচিত্র পরিভাষা মাঝে মাঝে তাহাদের মুখ দিয়া বাহির হইতেছে—'গাবু!' 'পিল!' 'নট্ কিচ্ছু!' কার্তিকের গলায় অন্তর্গূঢ় আওয়াজ হইতেছে—চিকা চিকা বুম!!

মনোহর ভাণ্ডারের ম্যানেজার নীলাম্বরবাবু বাহির হইয়া আসিলেন, তাঁহার হাতে একটি পিজ্‌ বোর্ডের ফলক। নীলাম্বরের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, ঘিয়ে ভাজা চেহারা—অত্যন্ত ঝাণ্ডু লোক। তাঁহার একটি স্নায়বিক দুর্বলতা আছে, থাকিয়া থাকিয়া বাম চক্ষুটি নাচিয়া উঠিয়া বন্ধ হইয়া যায়, মনে হয়, তিনি চোখ টিপিতেছেন।

ফলকটি তিনি দরজার গায়ে টাঙাইয়া দিলেন। দেখা গেল তাহাতে লেখা আছে—

নূতন কর্মচারী চাই।

ভিতরে অনুসন্ধান করহ।

ফলক ঝুলাইয়া দিয়া নীলাম্বর ক্রীড়ারত বালকদের দিকে ফিরিলেন, ঘোর বিদ্বেষ-পূর্ণ চক্ষে তাহাদের নিরীক্ষণ করিয়া খিঁচাইয়া উঠিলেন—

নীলাম্বর ঃ আরে গেল যা! ঠিক দরজার সামনে তোদের খেলবার যায়গা! বেরো বেরো, দুনিয়ার জঞ্জাল সব। ধাপার গাড়ী তোদের এখনও নিয়ে যায়নি কেন—অ্যাঁ! (নীলাম্বর চক্ষু স্পন্দিত করিলেন) বেরো দূর হ' ছোট লোকের ছোঁড়া সব—

কার্তিক ও তাহার দল নিজ নিজ গুলী হাতে লইয়া এমন সতর্কভাবে দাঁড়াইয়া রহিল যে নীলাম্বর যদি কেবলমাত্র বাক্য-বল প্রয়োগে সন্তুষ্ট না হইয়া বাহুবল প্রয়োগে অবতীর্ণ হন তাহা হইলে তাহারা অচিরাৎ সরিয়া পড়িবে, কিন্তু তাহা না করা পর্যন্ত এমন সুন্দর গাবু ছাড়িয়া তাহারা কিছুতেই অন্যত্র যাইবে না। যা হোক, নীলাম্বর আর অধিক হাঙ্গামা না করিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। ছেলেরা



'চিকা চিকা বুম'—

তখন কার্তিকের পানে তাকাইল। উত্তরে কার্তিক দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়িল।

আবার খেলা আরম্ভ হইল।

ক্যামেরা তখন দরজা দিয়া দোকানের ভিতর প্রবেশ করিল।

ডিজল্‌ভ্‌।

দোকান ঘরটি খুব বড়, এমপোরীয়ম জাতীয় বিলাতী দোকানের মত সাজানো। তিনটি দেয়াল ঘিরিয়া কাঠের কাউন্টার চলিয়া গিয়াছে; পিছনে প্রায় ছাদ পর্যন্ত উঁচু আলমারী—পণ্যদ্রব্যে ঠাসা। ঘরের মাঝখানেও ইতস্তত কাঁচের শো-কেসে সৌখীন পণ্যদ্রব্য সাজানো রহিয়াছে। সদর দরজার বাম পাশে স্বত্বাধিকারীর অফিস-ঘর; ডান পাশ দিয়া প্রশস্ত সিঁড়ি উপরে উঠিয়া গিয়াছে। সিঁড়ির রেলিংয়ের নিম্নতম স্তম্ভে ইংরেজিতে লেখা—Proprietor. স্তম্ভের নীচে মেঝের উপর কয়েকটি চায়ের প্যাকেট উপরাউপরি সাজানো, তাহার উপর দিয়া কেবল ঐ Proprietor কথাটি জাগিয়া আছে।

দোকানে এখনও খরিদ্দার আসিতে আরম্ভ করে নাই; কাউণ্টারের পিছনে গুটি-চারেক কর্মচারী একত্র হইয়া নিজেদের মধ্যে গুজগুজ্‌ করিতেছে।

প্রথম কর্মচারী ঃ আর কি, এবার পাত-তাড়ি গুটোও। আমাদের অন্ন উঠল।

দ্বিতীয় কর্মচারী ঃ কী—নতুন কিছু হয়েছে নাকি?

প্রথম কর্মচারী ঃ দেখোনি? বাইরে ইস্তাহার টাঙানো হয়েছে—নতুন কর্মচারী চাই। বুড়ো কর্তার আমলের সাবেক যারা ছিল তারা তো সব বিদেয় হয়েছে, এবার আমাদের পালা—

তৃতীয় কর্মচারী ঃ নতুন মালিক, চাকরও রোজ নতুন চাই! তা আমার তো মোটে এক মাসের চাকরি। যায় যাবে।

এই সময় সদর দরজা দিয়া একটি বৃদ্ধ খরিদ্দার প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধের বেশ-ভূষা একটু অদ্ভুত—গায়ে একটি প্রাচীন ওয়াটার প্রুফ, মাথায় মাঙ্কিক্যাপ, চোখে কালো চশমা মুখের উর্ধভাগ প্রায় ঢাকিয়া রাখিয়াছে। কর্মচারীরা তাঁহাকে লক্ষ্য করিল, কিন্তু গ্রাহ্য না করিয়া পূর্ববৎ ফুসফুস্‌ করিয়া চলিল। একজন বয়স্থ কর্মচারী মাথা নাড়িয়া বলিল—

চতুর্থ কর্মচারী ঃ বিল্বিপত্তর দেখছি আমাকেই শোঁকাবে। আমিই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে পুরোনো, তিন মাস চাকরী করছি।

দ্বিতীয় কর্মচারী ঃ কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম!

প্রথম কর্মচারী ঃ কর্তা না হাতী—ও গোবর গণেশের মাথায় কি কিছু আছে। আসলে ঐ মিটমিটে শয়তান, ঐ ভিজে বেরালটি, যিনি কথায় কথায় চোখ মারেন (চোখ টিপিয়া দেখাইল) সব তাঁরই প্যাঁচ। এই বলে দিলুম দেখো তোমরা, ম্যানেজার হয়ে ঢুকেছে—ফাল হয়ে বেরুবে।

সকলেই গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িল।

চতুর্থ কর্মচারী ঃ আশ্চর্য নয়। এই যে ঘন ঘন লোক বদল করছে এর কোনও মাচ্‌-কোফের আছে। পুরোনো লোক থাকলেই তো জানতে পারবে, কোথায় কি কারচুপি হচ্ছে ধরা পড়ে যাবে—তাই কাউকে আর পুরোনো হ'তে দিচ্ছে না।

এই সময় কাউণ্টারের উপর ঠক্‌ ঠক্‌ শব্দ হইল। কিছু দূরে দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ খরিদ্দারটি অধীরভাবে কাউণ্টারের উপর একটি পয়সা দিয়া টোকা দিতেছেন।

প্রথম কর্মচারী মুখ ব্যাজার করিয়া তাঁহার দিকে গেল; বৃদ্ধ পয়সাটি তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া কড়া সুরে বলিলেন—

বৃদ্ধ ঃ এক পয়সার নস্যি।

ক্যারমের ঘুঁটির মত আঙুল দিয়া পয়সাটি বৃদ্ধের দিকে ফিরাইয়া দিয়া কর্মচারী তাচ্ছিল্য ভরে মুখ বিকৃত করিল।

প্রথম কর্মচারী ঃ এক পয়সার জিনিস এখানে পাওয়া যায় না।

বৃদ্ধের মাথায় বোধ করি ছিট্‌ আছে; তিনি চশমা কপালে তুলিয়া ক্ষণেক কর্ম-চারীর পানে কট্‌মট্‌ করিয়া তাকাইলেন, তারপর আবার চশমা যথাস্থানে নামাইলেন।

বৃদ্ধ ঃ কী! পাওয়া যায় না! আমি চল্লিশ বছর ধ'রে এই মনোহর ভাণ্ডার থেকে নস্যি নিচ্ছি আর বললে কি না পাওয়া যায় না?

বিরক্তি দমন করিয়া ধৈর্য সহকারে কর্মচারী বলিল—

প্রথম কর্মচারী ঃ আরে মশায়, সেদিন আর নেই। আগে শুনেছি বুড়ো মালিকের আমলে এক পয়সার নস্যি, দু'পয়সার পেন্‌সিল্‌, তিন পয়সার জুতোর ফিতে পাওয়া যেত; এখন নতুন কর্তার আমলে সে সব বদলে গেছে। দু'চার পয়সা দামের মাল দোকানে আর রাখা হয় না।

বৃদ্ধ আবার চশমা তুলিয়া কর্মচারীকে তীব্র দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিলেন, তারপর চশমা নামাইয়া ক্রুদ্ধভঙ্গীতে পয়সা তুলিয়া লইলেন।

কাট্‌।

মনোহর ভাণ্ডারের বাহিরে রাস্তার অপর পারে একটি লাল রঙের ফায়ার-অ্যালার্ম স্তম্ভ আছে; সেই স্তম্ভের পাশে দাঁড়াইয়া একটি যুবক একদৃষ্টে মনোহর ভাণ্ডারের দিকে তাকাইয়া আছে। তাহার পিছনে এক সারি ছোট ছোট দোকান ঘর বন্ধ রহিয়াছে; তাহাদের মাথার উপর লম্বা বোর্ড টাঙানো—'দোকান ভাড়া দেওয়া যাইবে'।

যুবকের নাম বিজয়। সুদর্শন চেহারা কিন্তু বেশ বাস অত্যন্ত মামুলি, এমন কি দারিদ্র্যের পরিচায়ক বলিলেও চলে। সে দ্রুতপদে রাস্তা পার হইয়া মনোহর ভাণ্ডারের সম্মুখে উপস্থিত হইল। কার্তিকের দল তখনও অনন্য মনে মারবেল খেলিয়া চলিয়াছে।

কর্মখালির ফলকটি আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়া বিজয় সচকিতভাবে চারিদিকে তাকাইল, তারপর চট করিয়া ফলকটি উল্টাইয়া দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিল। দেখা গেল, ফলকের উল্টা পিঠে লেখা আছে—

বাদশাহী সাবু

স্বয়ং বাদশা আলমগীর ব্যবহার করিবেন।

বিজয় যে সময় দ্বার দিয়া প্রবেশ করিল, ঠিক সেই সময় বৃদ্ধ খরিদ্দারটি সবেগে বাহির হইয়া আসিতেছিলেন; দুজনের ঠোকাঠুকি হইয়া গেল। বিজয় মাপ চাহিল, কিন্তু বৃদ্ধ কোনও দিকে দৃকপাত না করিয়া চলিয়া গেলেন।

ভিতরে গিয়া বিজয় দরজার সম্মুখেই দাঁড়াইয়া পড়িল। প্রকাণ্ড ঘর; দূরে খরিদ্দার সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন কর্ম-চারীরা নিজেদের মধ্যে ফিস্‌ফাস্‌ করিতেছে। কাহার কাছে অনুসন্ধান করিতে হইবে বুঝিতে না পারিয়া বিজয় চারিদিকে তাকাইল। সিঁড়ির স্তম্ভে Proprietor কথাটি তাহার চোখে পড়িল।

বিজয় একটু দ্বিধা করিয়া সিঁড়ি দিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল, ভাবিল একেবারে মালিকের সঙ্গে দেখা করাই ভাল। কয়েক ধাপ উঠিবার পর সে দেখিল, সিঁড়ি দিয়া একটি তরুণী নামিয়া আসিতেছেন। তরুণীটি দেখিতে সুন্দরী; হাতে দু'খানি বই; পরিধানের কাপড় চোপড় দেখিতে সাদাসিধা হইলেও মূল্যবান। তরুণী বিজয়কে সোপান আরোহণ করিতে দেখিয়া বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিলেন।

বিজয় ভাল ছেলে; সে তরুণীকে এক নজর দেখিয়া লইয়া সম্ভ্রমের সহিত পাশ কাটাইয়া উপরে উঠিতে লাগিল। তরুণী কিন্তু বড় বড় চক্ষু মেলিয়া তাহাকে দেখিতেই লাগিলেন; বিজয় যখন তাঁহাকে ছাড়াইয়া উপরে উঠিল তখন তিনিও ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন।

বিজয় সিঁড়ির মোড় ঘুরিয়া দু' ধাপ উঠিয়াছে এমন সময় তরুণীর কণ্ঠস্বর আসিল—

তরুণী ঃ শুনুন—

বিজয় থামিয়া নীচের দিকে তাকাইল। তরুণীর দৃষ্টি যে অস্বস্তিকরভাবে তাহাকে অনুসরণ করিয়াছে তাহা সে সর্বাঙ্গ দিয়া অনুভব করিতেছিল। ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া সে বলিল—

বিজয় ঃ আমাকে বলছেন?

তরুণী ঃ হ্যাঁ। আপনি কোথায় চলেছেন?

বিজয় ঃ (বিরসকণ্ঠে) দেখতেই পাচ্ছেন ওপরে যাচ্ছি।

তরুণীর দৃষ্টি খর হইয়া উঠিল।

তরুণী ঃ তা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ওপরে আপনার কী দরকার?

বিজয়ের একটু রাগ হইল; সে ভাবিল তরুণীটি দোকানের একজন বড় মানুষ ক্রেতা, তাহার দীনবেশ দেখিয়া অনধিকার স্পর্ধা প্রকাশ করিতেছে; তাহার কণ্ঠস্বর তিক্ত হইয়া উঠিল।

বিজয় ঃ দরকার কিছু আছে বৈকি। কিন্তু সে খবরে আপনার কি দরকার জানতে পারি কি?

তরুণী ঃ আমার দরকার এই যে, ওপর তলায় আমি থাকি।

বিজয় কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হইয়া গেল, তারপর কয়েক ধাপ নামিয়া আসিয়া তরুণীর কাছে দাঁড়াইল।

বিজয় ঃ মাপ করবেন, আমার ধারণা ছিল দোকানের মালিক ওপরে থাকেন।

তরুণী ঃ আমি দোকানের মালিকের মেয়ে।

বিজয় ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল; দোকানের মালিকের যে কন্যা থাকিতে পারে ইহা তাহার কল্পনায় আসে নাই। কিন্তু একেবারে অসম্ভব নয়। বিজয় বুদ্ধিমান ছেলে, সে বুঝিল কথাটা মিথ্যা না হইতে পারে। সে কখনও দেখে নাই বলিয়া দোকানদারের মেয়ে থাকিবে না এমন কোন কথা নাই। তরুণী ইতিমধ্যে বলিয়া চলিয়াছেন—

তরুণী ঃ আমার বাবা রায় বাহাদুর ধনেশ রায় এই দোকানের মালিক। ওপর তলাটা দোকান কিম্বা অফিস নয়, ওখানে আমরা থাকি—private—

বিজয় ঃ (কুণ্ঠিত কণ্ঠে) কিন্তু সিঁড়ির থামে লেখা রয়েছে—

তরুণী ঃ কি লেখা রয়েছে চলুন তো দেখি।

দুজনে পাশাপাশি নামিয়া আসিল; বিজয় ঈষৎ বিজয় গর্বের সহিত অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া Proprietor লেখা দেখাইল।

বিজয় ঃ এই দেখুন।

তরুণী একটু হাসিয়া অধর কুঞ্চিত করিলেন, তারপর উপরের চায়ের প্যাকেটটি তুলিয়া লইলেন; তখন দেখা গেল, proprietorএর নীচে লেখা আছে private.

বিজয় কিছুক্ষণ অভিনিবেশ সহকারে নিরীক্ষণ করিয়া তরুণীর দিকে ফিরিল, সবিনয়ে হাত যোড় করিয়া বলিল—

বিজয় ঃ আমারই ভুল—চায়ের প্যাকেট তুলে অনুসন্ধান করার কথা আমার মনে হয়নি। ক্ষমা করবেন।

চায়ের প্যাকেট যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া তরুণী হাসিলেন। এই দীনবেশী যুবকটি যে সহজে পরাভব স্বীকার করিবার লোক নয় তাহা তিনি বুঝিলেন, সহজ শিষ্টতার কণ্ঠে বলিলেন—

তরুণী ঃ আপনি বাবার সঙ্গে দেখা করতে চান?

বিজয় ঃ (শুষ্কস্বরে) ইচ্ছে ছিল, কিন্তু —আজ বোধ হয় আমার যাত্রাটা বড় খারাপ হয়েছিল। দোকানে ঢুকতে গিয়ে এক বুড়ো ভদ্রলোকের সঙ্গে ধাক্কা লেগে



"দেখতেই পাচ্ছেন ওপরে যাচ্ছি"—

গেল, তারপর আপনার সঙ্গে এই ঠোকাঠুকি!—কাজ নেই, ফিরেই যাই।

তরুণী ঃ না না, দেখা না ক'রে ফিরে যাবেন কেন? যদি কোনও জরুরী দরকার থাকে—

বিজয় ঃ আমার পক্ষে জরুরী দরকারই বটে। আপনার বাবা নতুন কর্মচারী চান—তাই—

কথাটা বিজয় অসমাপ্ত রাখিয়া দিল। তরুণী হঠাৎ একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন; বিজয়কে দেখিয়া বা তাহার কথা শুনিয়া তাহাকে চাকরি-ভিক্ষার্থী বলিয়া মনে হয় না, স্বাধীনচেতা শিক্ষিত লোক বলিয়া মনে হয়। তরুণী একটু ঢোক গিলিয়া বলিলেন—

তরুণী ঃ তা যান না—ঐ যে বাবার অফিস—

তিনি অফিস ঘরের দ্বার অঙ্গুলি নির্দেশে দেখাইয়া দিলেন। বিজয় একটু ইতস্তত করিল।

বিজয় ঃ আপনি বলছেন যখন দেখা করেই যাই। মরার বাড়া তো গাল নেই। —ধন্যবাদ।

তরুণীকে নমস্কার করিয়া বিজয় অফিস ঘরের দিকে চলিল। তরুণী কিছুক্ষণ সেইদিকে তাকাইয়া রহিলেন, তারপর সদর দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

কাট্।

সদর দরজার সম্মুখে ইতিমধ্যে একটি দামী বড় মোটর আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কার্তিকের দল ফুটপাথে পূর্ববৎ খেলিয়া চলিয়াছে।

তরুণী আবির্ভূতা হইতেই মোটরের চালক ঝুঁকিয়া গাড়ির দরজা খুলিয়া দিল। গাড়ি শূন্যই ছিল, তরুণী প্রবেশ করিয়া বসিলেন। চালক গাড়িতে স্টার্ট দিল, কিন্তু গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিবার পূর্বেই তরুণী বলিয়া উঠিলেন—

তরুণী ঃ ইয়ে—মহেশ, একটু অপেক্ষা কর, এখনও কলেজের দেরী আছে—

মহেশ ঃ আজ্ঞে।

মহেশ ইঞ্জিন বন্ধ করিয়া দিল। তরুণী তখন একখানি বই খুলিয়া তাহাতে মনোনিবেশ করিলেন। মাঝে মাঝে তাঁহার চক্ষু দুটি বই ছাড়িয়া দোকানের দরজার দিকে ফিরিতে লাগিল। সদ্য দেখা যুবকটির ভাগ্য সম্বন্ধে তাঁহার মন কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছে, তাহার ভাগ্যে চাকরী জুটিল কিনা তাহা না দেখিয়া তিনি কলেজে যাইতে পারিতেছেন না।

কাট্।

ওদিকে বিজয় অফিস ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইতেই এক তকমা-আঁটা চাপরাশি দেখা দিল; বিজয়ের বেশভূষা দেখিয়া, শিষ্টতার কোনও চেষ্টা না করিয়া বলিল—

চাপরাশি ঃ ক্যা মাংতা?

বিজয় ঃ মালিকসে মুলাকাৎ মাংতা।

চাপরাশি ঃ ক্যা কাম?

বিজয় ঃ নোকরি।

চাপরাশির চোখের অবজ্ঞা আরও বাড়িয়া গেল।

চাপরাশি ঃ ঠাহরো—রায় বাহাদুরকো এত্তালা দেনা হোগা।—বৈঠো বিরিঞ্চ পর।

চাপরাশি মালিকের সম্মুখে আবির্ভূত হইবার পূর্বে দেয়াল সংলগ্ন একটা আরসির সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজের পাগড়িটা ঠিক করিয়া লইতে লাগিল। বিজয় দাঁড়াইয়া রহিল। চাপরাশির কথা তাহার অঙ্গে সুধাবৃষ্টি করে নাই; কিন্তু সে প্রার্থী—করিবার কিছু নাই।

কাট্।

অফিস ঘরের প্রকাণ্ড টেবিলের সম্মুখে বিপুলকায় রায় বাহাদুর ধনেশ রায় বসিয়া আছেন। অহ্লাদী পুতুলকে পাম্প্ করিয়া বড় করিলে যেরূপ দেখিতে হয় তাঁহার চেহারাটি সেইরূপ। সর্বাঙ্গে থাকে থাকে চর্বির থর নামিয়াছে; মুখে

বুদ্ধির চিহ্ন যদি বা কখনও ছিল এখন তাহা চর্বির অন্তরালে গা-ঢাকা দিয়াছে। রায় বাহাদুর ধনেশ বসিয়া বসিয়া পরম তৃপ্তির সহিত একটি আপেল ভক্ষণ করিতেছেন। ডাক্তার তাঁহাকে দিনে তিনটি করিয়া আপেল ভক্ষণ করিবার বিধান দিয়াছে, তিনি ডাক্তারের আদেশ চতুর্গুণ পালন করিয়া চলেন—এক ডজন আপেল খান। টেবিলের উপর থরে থরে আপেল সাজানো রহিয়াছে।

অফিস ঘরটি মাঝারি আয়তনের; খুব ফিট্‌ফাট্ সাজানো। টেলিফোন আছে। রাস্তার দিকে একটা বড় জানালা; সেই জানালার গরাদ ধরিয়া নীলাম্বর বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছেন। রাস্তার অপর পারে যে দোকানঘরগুলো ভাড়া দেওয়া যাইবে বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে, সেগুলো এই জানালা দিয়া স্পষ্ট দেখা যায়।

ধনেশ আপেলের জাবর কাটিতে কাটিতে তৃপ্তি-মন্থর কণ্ঠে বলিলেন—

ধনেশঃ চার মাসে মনোহর ভাণ্ডারের চেহারা বদলে' দেওয়া গেছে, কি বল নীলাম্বর—অ্যাঁ?

নীলাম্বর ধনেশের দিকে ফিরিয়া একটি তৈলাক্ত হাসি মুখে ফুটাইয়া তুলিলেন।

নীলাম্বরঃ সে কথা আর বলতে! তুমি যা করেছ তাকে তো ফ্রেঞ্চ রেভল্যুশন বলা চলে—নলচে খোল সব বদলে দিয়েছ।

নীলাম্বরের দুষ্ট চক্ষুটি স্পন্দিত হইয়া উঠিল; ইহা সম্পূর্ণ নিরর্থক স্নায়বিক ক্রিয়াও হইতে পারে, আবার অর্থপূর্ণও হইতে পারে। ধনেশ তাহা দেখিতে পাইলেন না, গদগদ মুখে হাসিলেন।

ধনেশ ঃ বাবা যদি এখন এসে দেখেন, দোকান চিনতেই পারবেন না।—কিন্তু একথাও বলতে হবে, তুমি সাহায্য না করলে আমি একলা কিছুই করতে পারতুম না।

নীলাম্বরঃ আরে না না, আমি আর কী করেছি—কাঠবেড়ালীর সাগর বন্ধন। তবে যেটুকু করেছি প্রাণের টানে করেছি। ইস্কুলের বন্ধু আমি তোমার, আমি যদি না করি কে করবে বল? বরং তুমি যে ভাল-বেসে আমাকে ম্যানেজার করেছ এইটেই তোমার মহত্ত্ব।

পরস্পরের পিঠ চুলকানি হয়তো আরও কিছুক্ষণ চলিত; কিন্তু এই সময় দ্বারে টোকা পড়িল এবং চাপরাশি সসম্ভ্রমে প্রবেশ করিল।

চাপরাশিঃ হুজুর, এক আদমি নৌকরিকে লিয়ে মুলাকাৎ মাংতা হ্যয়।

ধনেশঃ ও—আসতে সুরু করেছে! আচ্ছা—তাহলে নীলাম্বর—?

ধনেশ সপ্রশ্নভাবে নীলাম্বরের পানে চাহিলেন। সকল কার্যের আরম্ভে তিনি এইভাবে নীলাম্বরের পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন; নীলাম্বর এমন মোলায়েমভাবে তাঁহার পথনির্দেশ করিয়া দেন যে, ধনেশ ভাবেন, তিনি নিজেই পথ চিনিয়া লইয়াছেন।

নীলাম্বরঃ হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়, তাড়াতাড়ি কিসের? (চাপরাশিকে) এই, তুম্ আদমিকে বসতে বল। সাহেব যখন ঘণ্টি বাজাঙেগ তখন পাঠিয়ে দিও।

চাপরাশিঃ হুজুর।

চাপরাশি বাহির হইয়া গেল। নীলাম্বর যেন ধনেশের ইচ্ছাটাই প্রকাশ করিয়াছেন এমনিভাবে বলিলেন—

নীলাম্বরঃ সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে। তোমার মুখ দেখেই বুঝেছি তুমি কী চাও। ঠিকই তো! চাকরির উমেদারী করতে



গদগদ মুখে হাসিলেন।

এসেছে, খানিক বসুক, মাটি ভাপাক। নৈলে চট্ করে ডাকলে ভাববে, আমাদেরই বুঝি গরজ—

ধনেশ বুঝিতে পারিলেন, তিনি অজ্ঞাত-সারে একটি বুদ্ধির কাজ করিয়াছেন, তাঁহার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল।

ধনেশঃ হুম্—

নীলাম্বরঃ যাই বল ধনেশ, পাকা ব্যবসাদার বটে তুমি! কার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হয় এইটেই তো ব্যবসার গোড়ার কথা। আমি বলতে পারি, কলকাতা শহরে যত ব্যবসাদার আছে সব্বায়ের তুমি কান কেটে নিতে পার।

ধনেশ আর আত্মশ্লাঘা চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না।

ধনেশঃ সে কি আমি জানি না! কিন্তু বাবার ধারণা আমি ব্যবসার কিছুই বুঝি না। গবরমেণ্ট্‌কে চাঁদা দিয়ে রায় বাহাদুর হলুম, আর আমি ব্যবসা বুঝি না—বল তো নীলাম্বর!

নীলাম্বরঃ তোমার বাবা সেকেলে মানুষ, আধুনিক ব্যবসার ধরণ-ধারণ তো কিছু বোঝেন না। যা হোক, শেষ পর্যন্ত দোকানের ভার তোমাকে দিয়ে যে কাশীবাসী হয়েছেন, শেষ বয়সে এই একটিমাত্র বুদ্ধির কাজ করেছেন।

ধনেশ ঃ আমিও দেখিয়ে দেব এবার modern styleয়ে ব্যবসা কি করে চালাতে হয়।

বলিয়া ধনেশ টেবিলের উপর একটি কিল মারিলেন। দৈবক্রমে টেপা-ঘণ্টিটা ঐখানেই ছিল, আচমকা কিল খাইয়া বাজিয়া উঠিল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিজয় ঘরে প্রবেশ করিল। ধনেশের কাছে কার্যকারণ সম্বন্ধটা ধরা পড়ে নাই, তিনি চমকিয়া উঠিলেন—

ধনেশ ঃ অ্যাঁ,একি! কে তুমি? বলা নেই কওয়া নেই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লে!—নীলাম্বর!

নীলাম্বর ব্যাপার বুঝিয়াছিলেন, তিনি টেবিলের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, নিম্ন-স্বরে কহিলেন—

নীলাম্বরঃ ঘণ্টি শুনে এসেছে। যাক—কী চাও তুমি?

বিজয়ের মাথার ভিতরটা গরম হইয়া ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল। প্রথমে দরোয়ানের অবহেলা, তারপর দীর্ঘ প্রতীক্ষা, শেষে এই অশিষ্ট সম্ভাষণ তাহার স্বাভাবিক নম্র প্রকৃতিকে রূঢ় করিয়া তুলিল। সে একবার ধনেশের দিকে একবার নীলাম্বরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া শ্লেষ-তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল—

বিজয়ঃ আপনাদের মধ্যে মালিক কোনটি তাঁকেই জবাব দেব।

ধনেশ এই উক্তি ঘোর অপমানকর বলিয়া মনে করিলেন; এ কেমন ছোকরা, তাঁহাকে দেখিয়াও মালিক বলিয়া চিনিতে পারে না? তিনি উগ্র একটা কিছু বলিবার ভূমিকা স্বরূপ টেবিলের উপর একটা চাপড় মারিলেন, কিন্তু তিনি বাক্য নিঃসরণ করিবার পূর্বেই নীলাম্বর তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলেন—

নীলাম্বরঃ ইনি মালিক—রায় বাহাদুর ধনেশ রায়। কী দরকার তোমার চট্‌পট্ ব'লে বিদেয় হও, নষ্ট করবার মত সময় নেই আমাদের।

বিজয়ঃ আমারও নেই। কাজ ক'রে যারা খেতে চায় তাদের সময় আপনাদের চেয়েও কম।—(ধনেশকে) আপনি বিজ্ঞাপন দিয়েছেন কর্মচারী চাই, তাই এসেছি। ভিক্ষাথী মনে করবেন না, কারণ আপনি যেমন আমায় পয়সা দেবেন আমিও তেমনি আমার পরিশ্রম আপনাকে দেব।

ধনেশ থ হইয়া বসিয়া রহিলেন, কারণ এ ধরণের কথাবার্তায় তিনি অভ্যস্ত নন।

নীলাম্বরের বক্র চক্ষু কিন্তু বিদ্রূপে নাচিয়া উঠিল।

নীলাম্বর: খুব যে কমরেডি বুলি ঝাড়ছ ছোকরা। শূন্য কলসিই বেশী ঢন্ ঢন্ করে। চাকরি করবার যোগ্যতা কিছু আছে? কী qualification তোমার?

বিজয়: বি এ পাস করেছি।

নীলাম্বর নাকি সুরে হাসিয়া উঠিলেন।

নীলাম্বর: বি এ পাস? তবে তো তুমি অপদার্থ।

ধনেশ এতক্ষণে বলিবার মত একটা বিষয় পাইলেন।

ধনেশ: worthless worthless তোমার মত লোক আমি চাই না। কলেজে যারা ঢুকেছে, তারা তো—অ্যাঁ নীলাম্বর?

নীলাম্বর: ষাঁড়ের গোবর। তুমি যেতে পার।

বিজয়ের মুখে একটা খরশান হাসি খেলিয়া গেল।

বিজয়: বুঝতে পারছি আপনারা কেউই কলেজে ঢোকেন নি। সেটা তেমন দুঃখের বিষয় নয়; কারণ বিদ্যা-বুদ্ধি সকলের সমান হয় না। কিন্তু আপনারা ভদ্রতা-শিক্ষার স্কুলেও ঢোকেন নি এইটেই লজ্জার কথা।—নমস্কার।

বিজয় বাহির হইয়া গেল। ধনেশ ও নীলাম্বর হতবাক হইয়া দ্বারের পানে চাহিয়া রহিলেন।

(ক্রমশঃ)

অনুবাদ সাহিত্য

উৎকর্ষ

জন গলস্‌ওয়ার্দি

[জন গলস্‌ ওয়ার্দি (১৮৬৭-১৯৩২)—ইঁনি এইচ জি ওয়েলস মহাশয়ের সম-সাময়িক। কি ছোট গল্পে, কি উপন্যাসে সর্ববিষয়েই তাঁহার অপূর্ব দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। এই ছোট গল্পটি তাঁহার 'quality' নামক গল্পটির অনুবাদ। যান্ত্রিক শিল্পের উন্নতির সহিত কুটীরশিল্পের কি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে বর্তমান গল্পটিতে লেখক তাহারই একটি জীবন্ত দৃশ্য উপস্থাপিত করিয়াছেন।]

(১)

ছেলেবেলা থেকেই তাকে আমি জানতুম, কারণ সেই আমার বাবার বুট জুতো তৈরী করত। দুটো ছোট্ট দোকান এক করে তারা দুইভাই ওয়েস্ট এণ্ডের ছোট রাস্তার ধারে বাস করত। আজ সে রাস্তাও নেই—সে দোকানেরও কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না।

যে ফ্ল্যাটটিতে তারা বাস করত তার একটা অদ্ভুত বিশেষত্ব ছিল। তার ওপর যে, কোন রাজপরিবারের ছাপ মারা ছিল তা নয়—কেবলমাত্র তাতে তাদের জার্মান ভাষায় "জেস্‌লার ব্রাদার্স" এই নাম লেখা ছিল; আর একটা ঘরের জানলায় কয়েক জোড়া বুট জুতো ঝুলতো আমার এখনো মনে পড়ে সেই জানলার বুটজোড়াগুলো তখন আমায় কি ভাবনাতেই না ফেলেছিল। সে কখনও বাড়তি জুতো তৈরী করত না তবে তার তৈরী জুতো যে কারও পায়ে বেমানান হয়েছে একথাও কখন শুনিনি। তবে সে কি সেগুলো কিনে এনে সেখানে রেখেছিল? একথাও আমার কাছে অবিশ্বাস্য। সে কখনও তার বাড়িতে নিজের কাজ করা চামড়া ছাড়া অন্য কিছুর প্রবেশাধিকার দিত না। তা ছাড়া জুতোগুলো এতই সুন্দর ছিল—এত নরম ছিল তার চামড়া—আমার ভারী লোভ হতো। সে রকম জুতো সেই তৈরী করতে পারে যে সেই কাজকে প্রাণের মত ভালবাসে। এ চিন্তাগুলো অবশ্য আমার মনে পরে এসেছিল। তখন আমার মনে হোত—আর এখনও হয় যে, সে রকম জুতো তৈরী করা বাস্তবিকই দুর্বোধ্য ও আশ্চর্যজনক।

আমার খুব মনে পড়ে ছেলেবেলায় একদিন আমি তাকে আমার ছোট্ট পা খানি এগিয়ে দিয়ে সলজ্জ ভাবে জিজ্ঞাসা করেছিলুম: 'মিস্টার জেস্‌লার, এটা তৈরী করা কি খুব শক্ত নয়?' তার লাল দাড়ির ফাঁক থেকে একটু হাসির সঙ্গে উত্তর পেয়েছিলুম: 'এটাও একটা শিল্প।'

সে আর তার বড় ভাই দেখতে প্রায় একই রকম; যদিও তার বড় ভাই তার থেকে সব বিষয়েই ছিল একটু দুর্বল। আমি প্রথম প্রথম প্রায়ই তাদের দুজনকে চিনে উঠতে পারতুম না।

(২)

তার দোকানে দু জোড়ার বেশী জুতো কেউ তৈরী করতে দিত না; কারণ তার জুতো সাধারণ জুতোর চেয়ে অনেক বেশী টেকসই ছিল।

অধিকাংশ জুতোর দোকানে সাধারণে যে মনোভাব নিয়ে ঢোকে (অর্থাৎ—আমায় তাড়াতাড়ি দিন, আমি চলি)—এ ভাব নিয়ে তার দোকানে যাওয়া চলতে না। তার দোকানে ধীর স্থির ভাবে ঢুকতে হোত; আর একটা কাঠের চেয়ারের ওপর বসে অপেক্ষা করতে হত; কারণ দোকানে কাউকে বসে থাকতে দেখা যেত না। তারপর তার বড়ভাই কাঠের খড়ম পায়ে সিঁড়ি দিয়ে ঠক্ ঠক্ করতে করতে নামতো। তাকে দেখে মনে হত সে যেন এইমাত্র বুটের স্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছে; অথবা প্যাঁচা যেন দিনের আলো দেখে বিস্মিত হয়ে ক্রুদ্ধভাবে তাকিয়ে আছে।

আর আমি তাকে বলতুম: 'কেমন আছো, মিস্টার জেস্‌লার? 'রাশিয়ান লেদার' দিয়ে আমার একজোড়া বুট তৈরী করে দিতে পারো?'

চুপ করে সে তার নিজের যায়গায় ফিরে যেত আর আমি সেই চেয়ারে বসে তার নতুন চামড়ার গন্ধ শুঁকতুম। সে রোগা শিরে বের করা হাতে একটুকরা সোনালী রঙের চামড়া নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতো। চামড়ার ওপর চোখ রেখেই বলতঃ 'কি সুন্দর টুকরো!' আমিও তার সুখ্যাতি করলে পরে সে আবার জিজ্ঞেস করত: 'কবে আপনার চাই?' আমি উত্তর দিতুম: 'যখন সুবিধা মত তৈরী করতে পারবে তখনি করে দিও।'

তারপর মৃদুস্বরে বলতুম: 'সুপ্রভাত।' সে তার চামড়ার দিকে তাকিয়েই উত্তর দিত: 'সু-প্রভাত।' আমি দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে শুনতে পেতুম সে তার বুটের স্বপ্ন নিয়ে ঠক্ ঠক্ শব্দ করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে। যদি তার কোন নতুন রকমের জুতো আমার জন্য তৈরী করতে হত তবে সে আমার পুরোনো জুতোটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ পরীক্ষা করত। তারপর একটা কাগজে আমার পায়ের ছাপটা পেন্সিল দিয়ে তুলে নিত। দেখতুম্ হাতটা তার কাঁপছে।

সেদিনের কথা আমি ভুলতে পারব না। খুব মনে পড়ে সেদিন আমি তাকে বলেছিলুম: 'শুনছো, ও মিস্টার জেস্‌লার, তোমার আগেকার তৈরী বুটটায় মস্‌মস্‌ শব্দ হচ্ছিল।

কিছুক্ষণ সে কোন উত্তর না দিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল যেন আশা করছিল আমি আমার কথা ফিরিয়ে নিই বা কিছু বদল করি। তারপর উত্তর এল: 'আপনি বুটটা বোধ হয় আগেই ভিজিয়ে ফেলেছিলেন' 'সে রকমও ত মনে হচ্ছে না।'

'একথায় সে তার চোখ নামিয়ে যেন বুট জোড়াটির বিষয় চিন্তা করতে লাগলো। আমিও একথা তাকে বলায় নিজেকে অপরাধী মনে করে দুঃখিত হলুম।

'বুট জোড়া পাঠিয়ে দেবেন', সে বল্লেঃ 'আমি তাদের দেখবো।'

সেই বুটজোড়া তৈরী করার সময় তাতে তার প্রাণের কতই না দরদ মাখানো ছিল একথা চিন্তা করে মনে তখন আমার বিষাদের ঢেউ উঠ্ছিল।

সে ধীরে ধীরে বলে চল্লো, 'কোন কোন বুট তৈরীতেই খারাপ হয়ে যায়। সেগুলো যদি ঠিক না করতে পারি তবে বিলের থেকে তার দাম কেটে দেব।'

একবার (একবারই মাত্র) আমি তার দোকানে অন্যমনস্কভাবে অপর এক বড় ফার্মের তৈরী জুতো পরে গিয়েছিলুম। সে এবার কোন চামড়া না দেখিয়ে নীরবে আমার আদেশ নিল। আমি যেন স্পষ্ট অনুভব করলুম যে তার চোখের তীক্ষ্ম-দৃষ্টি আমার পায়ের সে হীন আবরণকে ভেদ করছে। অবশেষে সে বলে ফেল্লে, 'এগুলো তো আমার জুতো নয়।'

সে স্বরে ছিল না রাগ, ছিল না দুঃখ; এমন কি তাতে ঘৃণা পর্যন্ত ছিল না; কিন্তু সে স্বরে ছিল এমনই একটি স্নিগ্ধতা যা আমার রক্তকে পর্যন্ত জমিয়ে দিয়েছিল। বুটটির সামনের দিকে আঙুল দিয়ে টিপে সে বল্লে—'এইখানে আপনার লাগে, না? এইসব বড় বড় ফার্মের কোন আত্মমর্যাদা নেই'

তারপর সে তার দুঃখের কথা শোনালো। জীবনে এই আমি তার প্রথম কাতরোক্তি শুনলুম। সে ভাঙা ভাঙা কথায় বলে চল্লো—'জানেন,—এইভাবে—এইভাবে তারা আমায় সম্পূর্ণ নিঃস্ব করছে। ধীরে ধীরে তারা আমার অর্ধেক কাজ নিয়ে নিয়েছে। আর প্রতি বছরই আমার কাজ কমতে যাচ্ছে। ক্রমে ক্রমে আমি পথে বসছি।' এই প্রথম আমি তার মুখে দারিদ্রের চিহ্ন দেখতে পেলুম—হঠাৎ তার লাল দাড়ি যেন সাদা হয়ে পেকে উঠেছে।

আমি তাকে যথাসাধ্য যুক্তি দিয়ে বোঝা-বার চেষ্টা করলুম যে তাড়াতাড়ির জন্য বাধ্য হয়ে ও জোড়া আমায় কিনতে হয়েছে। কিন্তু এতেও তার মুখের কিছু পরিবর্তন না দেখতে পেয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে অনেকগুলো জুতো তৈরীর আদেশ দিয়ে বাড়ি ফিরলুম। এবারকার জুতোগুলো এত টেকসই হয়েছিল যে দু বছরের মধ্যে আর তার দোকানে আমায় যেতে হয়নি।

(৩)

তারপর একদিন তার দোকান দেখে খুব আশ্চর্য হলুম। দুটো ছোট দোকান আর এক করা নেই। অন্য এক ভদ্রলোকের নাম একটা দোকানে দেখতে পেলুম; আর সেই বুট জুতোগুলোকেও সে পুরোনো অবস্থায় দেখলুম না। এবার অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর সে নেমে এল; তার মরচে পড়া লোহার চশমার মধ্য দিয়ে তাকিয়ে বল্লো —'আপনি মিস্টার—নন?'

আমি বললুম—'হ্যাঁ মিস্টার জেস্লার, আমিই। এবার দেখুন আপনার জুতোগুলো এখনও কি সুন্দর রয়েছে!' এই বলে আমি আমার পা বাড়িয়ে দিলুম। সেও এটা দেখ্লো। তারপর করুণ সুরে বল্লো, 'কিন্তু লোকেরা তো ভাল জুতো চায় না?'

কয়েক জোড়া জুতো তৈরী করার আদেশ দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লুম। আমার মনে হল সমগ্র সমাজ যেন তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে।

তারপর অনেক দিন বাদে আবার একবার তার দোকানে যাই। জিজ্ঞেস করিঃ 'কেমন আছো মিস্টার জেস্লার?' ধীরে উত্তর আসেঃ 'খুব ভাল আছি; কিন্তু আমার বড় ভাইটি মারা গেছে।'

অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে তাকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করি। তার চেহারাতেও বার্ধক্যের স্পষ্ট ছাপ দেখতে পাই। এক টুকরা চামড়া হাতে নিয়ে সে বলেঃ 'কি সুন্দর চামড়া! আপনার কি জুতো চাই?'

জোড়া কয়েক জুতোর মাপ দিয়ে ফিরে চলি। এবারকার জুতোগুলো আরও সুন্দর হয়। তারপর কার্যগতিকে কয়েক বছরের জন্য লণ্ডন শহর আমায় ছেড়ে যেতে হয়। আমার পুরোনো বন্ধুকে ৬০ বছর বয়সে ছেড়ে যাই আর তার ৭৫ বছর বয়সের সময় ফিরে আসি। এবার সে আমায় চিনতেই পারে না। বহুক্ষণ কথাবার্তার পর তাকে কয়েক জোড়া জুতো তৈরী করতে দিয়ে ফিরে আসি। তার সেই ক্ষীণ অবস্থা মনকে আমার খুব ব্যথিত করে তোলে।

তারপর এক সন্ধ্যায় আমি আমার বুট-গুলো পাই। চার জোড়া জুতো পাশাপাশি সাজিয়ে আমি প্রত্যেকটি পায়ে দিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করি। প্রত্যেকটি তার সম্পূর্ণ নিখুঁত আর সুন্দর হয়েছিল। সেই পার্শেলের সঙ্গে আমি বিলটাও পেয়ে-ছিলুম। এর আগে সে কখনও বিল পার্শেলের সঙ্গে পাঠায় নি। তাড়াতাড়ি নীচে নেমে আমি একটা চেক সহি করে নিজেই ডাকে পাঠিয়ে দিলুম।

এক সপ্তাহ পরে ঐ রাস্তা দিয়ে যাবার সময় আমার ইচ্ছে হয় তাকে বুট জোড়া কেমন মানিয়েছে দেখিয়ে আসি। কিন্তু তার দোকানে পৌঁছে দেখি তার—দোকান ঠিকই রয়েছে কিন্তু তার নাম নেই। একটু ইতস্তত করেই তার দোকানের ভিতর ঢুকি। একজন ইংরেজ ভদ্রলোক দোকানে বসে-ছিলেন; অগত্যা তাকেই জিজ্ঞেস করিঃ 'মিস্টার জেস্লার আছেন কি?'

তিনি আমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে উত্তর দেন—'না মশায়, তিনি নেই। কিন্তু আমরা আপনাকে পছন্দসই বুট দিতে পারি। তাঁর দোকান আমরাই কিনে নিয়েছি। আপনি কি আমাদের নাম দেখেন নি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়ছে—কিন্তু মিস্টার জেস্লার—?' সে একটু বিমর্ষ ভাবেই উত্তর দিল—'মারা গেছেন।'

মারা গেছেন! কিন্তু এক সপ্তাহ আগেই যে আমি তার কাছ থেকে বুট নিয়ে গেছি।'

তিনি বলে চল্লেন—'উঃ কি করুণ তার মৃত্যু! বৃদ্ধ ভদ্রলোক অনাহারে মারা গেছেন মশায়, অ-না-হা-রে! 'ডাক্তারেরা এ মৃত্যুকে ধীরে ধীরে অনাহারে মৃত্যুই বলেছেন! নিজে ছাড়া তিনি অপর লোককে দিয়ে জুতো তৈরী করাতেন না। তাই এক এক জোড়া বুটের পেছনে তাঁকে যথেষ্ট সময় দিতে হতো। গ্রাহকেরা এতদিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারতেন না। ফলে ধীরে ধীরে তিনি তাঁর সব গ্রাহক হারান। আমি জোর গলায় বলতে পারি মশায় এ তল্লাটে তাঁর মত কেউ বুট তৈরী করতে পারত না। কিন্তু প্রতিযোগি-তায় পারবেন কি করে। কখন তিনি তাঁর দোকানের নাম সাধারণের কাছে বিজ্ঞাপনের মারফৎ প্রচার করেন নি। যে দাম তিনি বুট বেচে পেতেন, তা দিয়ে কেবল তাঁর ঘর ভাড়া আর ভাল চামড়া কিনতেই খরচ হয়ে যেত। কখনো তিনি নিজের খাওয়া-পরার কথা চিন্তা করেন নি। তাঁর মত লোকের এ পরিণাম ছাড়া আপনি আর কি আশা করেন!'

'কিন্তু অনাহারে মৃত্যু—'

'এটা আপনাদের কাছে হয়ত কিছু অস্বাভাবিক মনে হবে; কিন্তু মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত আমি তাঁকে চামড়া নিয়ে বসে কাজ করতে দেখেছি। খাবার জন্য পর্যন্ত তিনি সময় নষ্ট করেন নি। কি করে যে তিনি এতদিন বেঁচে ছিলেন এই ভেবেই আমি আশ্চর্য হচ্ছি। বাস্তবিকই তিনি একজন অতিমানুষ ছিলেন। কি চমৎকার বুটই তৈরী করতেন!'

'চমৎকার বুটই তৈরী করতেন' বলেই তাড়াতাড়ি আমি ঘরে দাঁড়ালুম কারণ সে যুবককে আমি জানতে দিতে চাইছিলুম না যে তখন আর আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

অনুবাদক—শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য।

বিজ্ঞানের কথা

অ্যাটম বোমা

শ্রীঅমরজ্যোতি সেন

৫ই আগষ্ট ১৯৪৫ সাল **মানুষের ইতিহাসে এক অতি** দুর্ভাগা দিন। এই দিন সে নিজেকে ধ্বংস করার অস্ত্র নিজেরই উপর প্রয়োগ করেছে। এই দিন সে 'এনোলা গে' নামে বি-২৯ সুপার ফরট্রেস বিমান থেকে হিরোশিমা সহরের উপর মাত্র একটি অ্যাটম বোমা নিক্ষেপ করে যার ফলে সহরটি নিশ্চিহ্ন হয়ে' যায়। বোমাটি নাকি সহরের একটি পার্কের দেড়শ ফিট উপরে ফেটে ছিল ফলে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার লোক মারা যায়। যারা সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল তারা ত গেলই কিন্তু যারা দূরে থেকে সামান্য আঘাত পেয়েছিল কিংবা কেটে অথবা কিছু পুড়ে গিয়েছিল; কিছুদিন পর থেকেই তাদের ক্ষিদে কমতে লাগল, মাথার চুল উঠতে লাগল, দাঁতের মাড়ী দিয়ে রক্তপাত ও সেইসঙ্গে ১০৪° ডিগ্রি পর্যন্ত জ্বর এবং রক্তবমন ও মৃত্যু। রক্তের শ্বেত কণিকার শতকরা ছিয়াশি ভাগই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

প্রথম বোমা পড়ার বারো ঘণ্টা পরে নাগাসাকি শহরে দ্বিতীয় বোমা পড়ে ও ফলাফল লক্ষ্য করে বৈজ্ঞানিকেরা অভিমত জ্ঞাপন করলেন যে দ্বিতীয় বোমা প্রথম বোমাটি অপেক্ষা আরও উন্নত ধরণের; প্রথম ও আধুনিক যুগের মোটর গাড়ির তুলনা করলে যা হয় তাই। নাগাসাকি সহরের ধ্বংস কার্যটা আরও বেশী হয়েছিল বলেই বোধহয় এই মত প্রচার করা হয়েছিল।

প্রথম যখন ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, পলোনিয়াম অথবা রেডিয়াম ধাতুর স্বতঃ-দীপ্ত শক্তি জানতে পারা গেল ও তখনকার বৈজ্ঞানিক মহলে নানাপ্রকার জল্পনা কল্পনা সুরু হ'ল তখন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক স্যার অলিভার লজ লিখেছিলেনঃ "যদি কখনও মানবজাতি তাদের নিজেদের গ্রহের পরমাণুতে যে শক্তি নিহিত আছে তার সামান্য এক ভগ্নাংশও নিয়োজিত করতে পারে তখন তার ফল হ'বে হয় ধ্বংসমূলক কিংবা গঠনমূলক এবং তা নির্ভর করবে তখনকার মানুষের সভ্যতার ধারা ও মাপ-কাঠির উপর।" তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে, পরমাণুর শক্তি নিয়ে নাড়াচাড়া করবার ও তা' প্রয়োগ করবার মতো মানুষ যথেষ্ট সভ্য হবে কিনা। একদিন যা তাঁর কাছে স্বপ্ন ছিল আজ তা বাস্তব। যেদিক থেকেই বিচার করা যাক না কেন এই গুরুত্বপূর্ণ ও সাংঘাতিক আবিষ্কার মানুষের মনকে এমন করে' আর কখনও নাড়া দেয়নি। আমরা হয়তো কোনদিন পৃথিবীর উপর থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো কিংবা আমাদের সামাজিক জীবনের আমূল পরিবর্তন হ'বে।

এতদিন জানা ছিল যুদ্ধ ইতিহাস ও ভূগোলের শিক্ষক, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে, সে বিজ্ঞানেরও শিক্ষক। তাই আমরা জানতে আগ্রহশীল ম্যাগ্নেটিক মাইনের কৌশলটা কি, রাডার জিনিসটা কি, ফ্লাইং বম্ব ঠিক লক্ষ্যস্থলে পড়ে কিনা? আমাদের 'সাম্প্রতিক' কৌতূহল হ'ল অণু পরমাণুর তথ্য।

আমরা ছোটবেলা থেকে বিজ্ঞানপাঠে পড়ে আসছি যে পদার্থ তিন প্রকার: কঠিন, তরল ও বায়বীয় অথবা গ্যাসীয়। পদার্থ কাকে বলে তাও আমাদের জানা আছে যেমন ইঁট, কাঠ, লোহা, কালি, কলম, বাতাস। পদার্থের দু'টি শ্রেণী আছে, মৌলিক পদার্থ ও যৌগিক পদার্থ। যে পদার্থকে ভাগ করে' আর অন্য পদার্থে রূপান্তরিত করা যায় না তাই হ'ল মৌলিক পদার্থ যেমন লোহা; কিন্তু যে পদার্থকে ভাগ করা যায় তা হ'ল যৌগিক, যেমন জল। জলকে ভাগ করলে আমরা পাবো অক্সিজেন আর হাই-ড্রোজেন নামক দুই রকমের গ্যাস। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন মৌলিক পদার্থ, তাদের আর ভাগ করা যায় না। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, সমস্ত পদার্থই মৌলিক কিংবা দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থ দ্বরা গঠিত। পৃথিবীর সমস্ত পদার্থ তা কঠিন, তরল অথবা বায়বীয় যাই হোক না কেন মোট বিরানব্বইটি মৌলিক পদার্থ দ্বারা গঠিত, যেমন অক্সিজেন, লোহা, ক্যালসিয়াম, পারা, রূপা অথবা অন্য কিছু দিয়ে। যে কোনো পদার্থকে বিশ্লেষণ করলে বিরানব্বইটি মৌলিক পদার্থের মধ্যে কোনো না কোনো একটি অথবা ততোধিক মৌলিক পদার্থের সন্ধান নিশ্চয়ই মিলবে।

সমস্ত মৌলিক পদার্থের মধ্যে পারা ও ব্রোমিন তরল অবস্থায় পাওয়া যায় আর সবই কঠিন অথবা গ্যাসীয় অবস্থায় পাওয়া যায়। দুই বা ততোধিক গ্যাসের মিলনে তরল পদার্থ পাওয়া যায়, যেমন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিলনে জল, আবার সেই

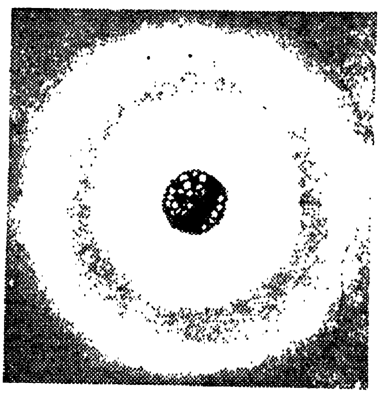


হিরোশিমা শহরে অ্যাটম বোমা ফাটল। কালো ধোঁয়া ভেদ করে সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলী লক্ষণীয়।

জলকে ঠাণ্ডা করতে থাকলে কঠিন বরফ হয়ে' যায়। এই বরফকে ক্রমশ গরম করতে থাকলে জল হয়ে' পরে বাষ্প হয়ে উড়ে যায়, সেই বাষ্পকে আবার ঠাণ্ডা করলে পুনরায় সেই জল ফিরে পাওয়া যায়। আবার দুটি মৌলিক গ্যাস যেমন অ্যামোনিয়া ও ক্লোরিন, উভয়ে মিশে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড নামক কঠিন পদার্থের সৃষ্টি করে।

পৃথিবীর সমস্ত পদার্থ বিরানব্বইটি মৌলিক পদার্থ দ্বারা গঠিত বললেই এখানে শেষ হ'ল না। পদার্থের শেষ পরিণতি আছে যাদের বলা হয় অণু ও পরমাণু। যৌগিক পদার্থের শেষ পরিণতি অণু (Molecule) আর মৌলিক পদার্থের শেষ পরিণতি হ'ল পরমাণু (Atom)।

আমাদের পুরনো বন্ধু জলের কথাই ধরা যাক্। আমরা যদি জলকে ক্রমশ ভাগ



ইউরেনিয়ামের পরমাণু। কেন্দ্রে নিউট্রন ও প্রোটন। অস্পষ্ট বৃত্তগুলি দ্রুত চলমান ইলেকট্রনের গতিপথ।

করতে থাকি তাহ'লে তা ক্রমশ এমন একটি সূক্ষ্ম পর্যায়ে এসে পড়বে যাকে আর ভাগ করা চলবে না, যদি ভাগ করা যায় তাতে জলের আর কোনো ধর্মই নিহিত থাকবে না অর্থাৎ তা আর জল থাকবে না। এই সূক্ষ্ম অবস্থাকে বলা হয় জলের অণু। এইবার এই অণুকে ভাগ করলে পাওয়া যাবে দু'টি হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণু আর একটি অক্সিজেন গ্যাসের পরমাণু। এই মোট তিনটি পরমাণু মিলে সৃষ্টি করেছে জলের অণু।

এই সমস্ত অণু ও পরমাণু এতই ছোট যে, তাদের আকারের ধারণা করতে পারা যায় না। আলপিনের ডগে যতটুকু জল তুলতে পারা যায় তার মধ্যে লক্ষ লক্ষ অণু আছে। মাত্র এক বিন্দু জলকে যদি পৃথিবীর মতো বড়ো করা যায়, তার ভিতরের অণুগুলি হবে এক একটি ছোট কমলা লেবুর মতো। এইবার যদি ঐ একটি জলের অণুকে পৃথিবীর মতো বড়ো করা যায় তাহলে তার পরমাণুগুলির আকারও ঐ কমলা লেবুর চেয়ে বড়ো হবে না। এই সমস্ত পরমাণুর নির্দিষ্ট মাপ ও ওজন আছে। বিশেষ মৌলিক পদার্থের পরমাণুর বিশেষ ধর্ম আছে। লোহার পরমাণুর সঙ্গে অক্সিজেনের পরমাণুর কোনো মিল নেই। হাইড্রোজেনের পরমাণুর ওজন ধরা হয়েছে ১, ও তার সঙ্গে তুলনা করে' অন্য মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ওজন স্থির করা হয়েছে; যেমন অ্যালুমিনিয়াম পরমাণুর ওজন ২৭, সোনার পরমাণুর ওজন ১৯৭, সীসের ২০৭। ইউরেনিয়াম পরমাণু সব চেয়ে ভারী, তার ওজন ২৩৮।

অণু ও পরমাণুগুলির আরও নানারকম গুণ আছে, যেমন ধরুন, সেগুলি সব এক সঙ্গে মিশে যেয়ে একটি পিণ্ডের সৃষ্টি করে না, নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলে। আমরা মনে করতে পারি, অনেকগুলি সন্দেশ এক সঙ্গে চটকালে এক তাল বেশ বড়ো সন্দেশ পাওয়া যায়, কিন্তু এখানে লক্ষ্য করতে হবে যে, সন্দেশের সব অণু একজাতীয়, অতএব সমধর্মের অণু এক সঙ্গে মিশবে, বিভিন্ন ধর্মের অণু এক সঙ্গে মিশে যায় না। পরমাণুগুলি যেন আমাদের ভাষার এক একটি অক্ষর আর অণুগুলি নানারকম কথা। আরও একটি প্রশ্ন উঠতে পারে। মনে করুন, আমরা যখন সরবত খাই তখন জলে চিনি মেশাই আর সেই চিনি জলে গলে' বেশ এক গ্লাস সরবত তৈয়ারী হয়। এখানে ত' দেখা যাচ্ছে, দুটি বিভিন্ন জিনিস বেশ মিশে এক হয়ে যাচ্ছে। এর উত্তর হ'ল এই যে, অণুগুলির মাঝে মাঝে ফাঁক আছে। কঠিন পদার্থের ফাঁক খুব কম, তরল পদার্থের ফাঁক আরও বেশী; গ্যাসের আবার ফাঁক আরও বেশী, তার অণু অথবা পরমাণুগুলি যেন ছুটে পালাতে চায়। সেই জন্য গ্যাস অত তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। এখন সরবতের বেলায় হয় কি, চিনির অণুগুলি জলের অণুর ফাঁকে ফাঁকে প্রবেশ করে। আমরা যদি একটি পাত্রে মার্বেলের গুলি রাখি তাহলে তার মাঝে মাঝে অনেক ফাঁক থাকে। খানিকটা বালি অথবা জল ঢেলে দিলে ফাঁকে ফাঁকে ঠিক চলে' যায় অথচ পাত্র উপ্‌চে পড়ে যায় না। সরবতের বেলায়ও তাই হয়। এই সরবতকে তাপ দিলে জলীয় অংশ ক্রমশ বাষ্প হয়ে যায়, এই বাষ্পকে একটি পাত্রে ধরে' রেখে ঠাণ্ডা করলে আবার জল ফিরে পাওয়া যাবে, আর চিনি সরবতের পাত্রের তলায় পড়ে থাকবে।

এতক্ষণ যা বলা হ'ল তারই ওপর ভিত্তি করে' গড়ে উঠেছিল মনীষী জন ডালটনের বিখ্যাত পরমাণবিক সূত্রগুলি (Atomic theory)। তাঁর মতেঃ

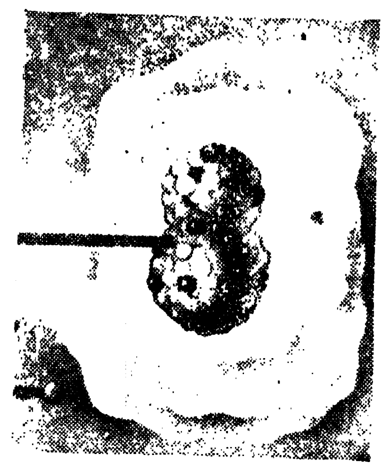
সমস্ত মৌলিক পদার্থ পরমাণু নামক অতি সূক্ষ্ম কণা দ্বারা গঠিত যেগুলিকে কোনো প্রকার রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া দ্বারা ভাগ করা যায় না অথবা তাদের ভাঙতে অথবা নতুন করে' গড়তেও পারা যায় না।

একই মৌলিক পদার্থের পরমাণুগুলি সর্বতোভাবে সমান। তাদের ওজনও এক।

বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ওজন ভিন্ন ও তাদের রাসায়নিক গুণাগুণও আলাদা।

এইগুলিই ছিল ডালটনের প্রধান সূত্র। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে পর পর এমন কতকগুলি আবিষ্কার হ'ল যার ফলে পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের পরিবর্তন করতে হ'ল।

সার উইলিয়ম ক্রুকস (১৮৩২-১৯১৯) প্রায় বায়ুশূন্য একটি কাঁচের আধারের



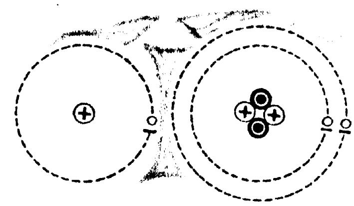
একটি নিউট্রন প্লুটোনিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রকে ভাঙতে আরম্ভ করেছে।

ভিতর দিয়ে বিদ্যুত তরঙ্গ চালিয়ে দিয়ে লক্ষ্য করলেন যে, সেই আধারটির এক অংশ থেকে অপর অংশে কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম কণার একটি স্রোত বয়ে যায় যাদের বলা হ'ল ক্যাথোড রশ্মি। এই কণাগুলি হাইড্রোজেন পরমাণু অপেক্ষা ছোট। সার জে জে টমসন এদের নাম দিলেন ইলেকট্রণ। টমসন আরও প্রমাণ করেন যে, এই ইলেকট্রনগুলি ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত (negatively charged)। হাইড্রোজেনের পরমাণু সর্বাপেক্ষা হাল্‌কা কিন্তু একটি ইলেকট্রনের ওজন হাইড্রোজেন পরমাণুর ১।১৮৪৫ ভাগ মাত্র। এর সোজা অর্থ এই যে, দাঁড়ি পাল্লার একদিকে যদি মাত্র একটি হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে তাহলে অপর দিকে ১৮৪৫টি ইলেকট্রন চাপাতে হবে তবে ওজন সমান হবে।

এর কিছুকাল পরে ১৮৯৫ সালে বিখ্যাত জার্মাণ বৈজ্ঞানিক উইলিয়াম

কনরেড রঞ্জেন এক্স-রে অথবা রঞ্জন রশ্মি আবিষ্কার করেন। তিনি ক্রুকস-এর ঐ বৈদ্যুতিক আধারটি নিয়েই পরীক্ষা করতে করতে একদা লক্ষ্য করেন যে যদিও ঐ বৈদ্যুতিক আধারটি পুরু কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে তার ভিতর বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালানো হয় তথাপি কিছু দূরে একটি বেরিয়াম-প্ল্যাটিনো-সায়ানাইডের পাতের উপর আলোক প্রতিফলিত হয়। তখন এই রশ্মির নাম দেওয়া হয় এক্স-রে। এখন ত' সবাই জানেন যে, এই রশ্মির সাহায্যে নীরেট মাংসর ভিতর দিয়ে আমরা শরীরের হাড় অথবা অন্য অংশ দেখতে পাই এবং অন্ধকারে অন্য আলোর সাহায্য ব্যতিরেকে ফটোগ্রাফ তোলা যায়।

এক্স-রে আবিষ্কার তখনকার বৈজ্ঞানিকদের এই দিকে নানা প্রকার গবেষণাকার্যে অনুপ্রাণিত করে। এক্স-রে আবিষ্কৃত হওয়ার এক বৎসর পরে প্যারিস নগরীতে হাঁরি বেকেরেল নামক বৈজ্ঞানিক এমন একটি আবিষ্কার করলেন যাকে বর্তমান আটম বোমার ভিত্তি বলা যেতে পারে। তিনি আবিষ্কার করেন যে, ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম নামক ধাতু আপনা আপনিই এক অদৃশ্য রশ্মি বিচ্ছুরিত করতে পারে এবং এই রশ্মিও অন্য আলো ব্যতীত ফটোগ্রাফ প্লেটে আলোর ছাপ ফেলতে পারে। এর অল্পকাল পরেই মেরি কুরি ও তাঁর স্বামী পিয়ের কুরি রেডিয়াম আবিষ্কার করেন। ইউরেনিয়াম ও থোরিয়ামের মতো রেডিয়াম থেকেও একপ্রকার স্বাভাবিক আলো বিচ্ছুরিত হয়। বৈজ্ঞানিক মতে একপ্রকার বলা ভুল হ'ল কারণ রেডিয়াম থেকে তিনপ্রকার রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়, যাদের নাম দেওয়া হয়েছে অ্যালফা, বিটা ও গামা। এই সমস্ত ধাতু যাদের স্বভাব এইরূপ রশ্মি বিকীরণ করা, তাদের নতুন নাম দেওয়া হ'ল রেডিও-অ্যাকটিভ অথবা স্বতঃদীপ্ত। দেখা গেল যে, ধাতুগুলি রশ্মি বিকীরণ হবার সময় তাদের পরমাণুর ভাঙন ধরে যার ফলে এই ধাতুগুলি কম পরমাণবিক ওজনের ধাতুতে পরিণত হয়, যেমন ইউরেনিয়াম যার পরমাণুর ওজন ২৩৮ সে রেডিয়ামে পরিণত হয় যার পরমাণুর ওজন ২২৬. রেডিয়াম আবার সীসেতে পরিণত হয় যার পরমাণুর



বামে হাইড্রোজেন ও দক্ষিণে হিলিয়াম পরমাণু।

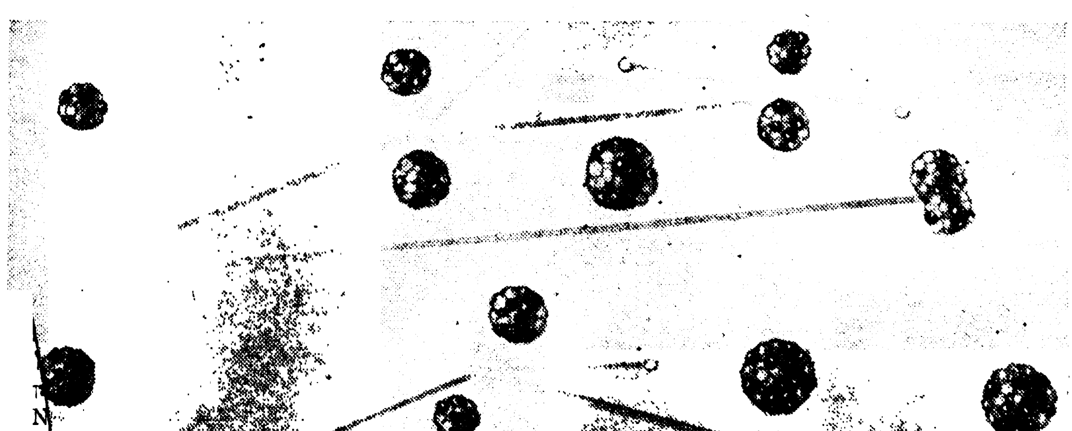
ওজন ২০৭। হোমিওপ্যাথিক ওষুধের গুলির মতো ছোট্ট একটি রেডিয়ামের গুলি থেকে প্রতি মুহূর্তে বহু লক্ষ পরমাণু ভেঙে ভেঙে চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। অবশ্য ঐটুকু রেডিয়াম নিঃশেষ হতে কয়েক শতাব্দী লেগে যাবে কারণ তার মধ্যে যে কত কোটি পরমাণু আছে তার কল্পনা করা যায় না। ইতস্তত দ্রুত বিচ্ছুরিত এই সমস্ত ভঙ্গুর পরমাণুর জন্য রেডিয়াম নিয়ে নাড়াচাড়া করা বেশ একটু শক্ত ব্যাপার বিপদও আছে, এই জন্য রেডিয়াম নিয়ে সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হয়। রেডিয়াম সাহায্যে ক্যান্সার নামক দুরারোগ্য রোগ সারানো যায়, কিন্তু রেডিয়াম দুষ্প্রাপ্য, দুর্মূল্য এবং ব্যবহার বিপজ্জনক বলে' কোনো সহজপ্রাপ্য ধাতুকে রেডিও-অ্যাকটিভ করে' ক্যান্সার চিকিৎসায় কাজে লাগাতে পারা যায় কিনা এই চেষ্টা হতে লাগল। এই কাজের সূত্রপাত করলেন সার আর্নস্ট রাদারফোর্ড (পরে লর্ড রাদারফোর্ড) ও প্রথম ধাপ হিসাবে তিনি নাইট্রোজেন পরমাণুকে ভাঙতে সক্ষম হলেন।

আমরা আগে বলেছি যে রেডিয়াম থেকে তিন প্রকার রশ্মি বিচ্ছুরিত হয় যথা আলফা, বিটা ও গামা। আলফা রশ্মিতে থাকে কতকগুলি কণা যাদের নাম হ'ল আলফা—পার্টিকল্, যেগুলি হ'ল ধনাত্মক তড়িৎ যুক্ত (Positively charged)। রাদারফোর্ড এইরূপ রেডিয়াম থেকে নির্গত আলফা পার্টিকল্ দ্বারা নাইট্রোজেন পরমাণুকে আঘাত করলেন ফলে নাইট্রোজেন পরমাণু ভেঙে একটি হাইড্রোজেন এবং একটি অক্সিজেন পরমাণুতে পরিণত হ'ল। এরপর ১৯২২ সালে রাদারফোর্ড সার জেমস চাডউইক নামক একজন বৈজ্ঞানিকের সহযোগে বোরন, ফ্লোরিন, সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম ও ফসফরসের পরমাণু ভাঙতে সক্ষম হয়েছিলেন।

প্যারিস নগরীতে ১৯৩৪ সালে বিখ্যাত মাদাম কুরির কন্যা ও জামাতা আইরিন কুরি-জলিয়ট এবং এফ্ জলিয়ট বোরন অ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাগনেশিয়ামকে আলফা-পার্টিকল্ দ্বারা আঘাত করে' প্রথম কৃত্রিম রেডিও অ্যাকটিভ ধাতু উৎপন্ন করতে সক্ষম হ'ন। তাঁদের আবিষ্কৃত এই কৃত্রিম রেডিও-অ্যাকটিভ ধাতু চিকিৎসা জগতের অনেক অভাব পূরণ করেছে।

এই সমস্ত পরীক্ষার ফলে ডালটনের সিদ্ধান্ত "পরমাণু অবিভাজ্য" এ তথ্য আর টিকল না। পরমাণুর গঠনের রূপ গেল বদলে যার শেষ আকার দিলেন রাদারফোর্ড ও ডেনমার্কবাসী বৈজ্ঞানিক নাইলস বোর।

পরমাণুর নতুন রূপ কি রকম হ'ল দেখা যাক্। সর্বাপেক্ষা সরল হ'ল হাইড্রোজেন পরমাণু। বিশ্লেষণ করে দেখা গেল যে হাইড্রোজেন পরমাণুর আছে একটি কেন্দ্র



নিউট্রন প্লুটোনিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রের পর কেন্দ্র ক্রমশ ভেঙেই চলেছে।





বামে পীচব্লেণ্ড যা থেকে ইউরেনিয়াম পাওয়া যায় ও দক্ষিণে অন্ধকারে তোলা তার ছবি।

(nucleus), এই কেন্দ্রটি ধনাত্মক তড়িৎ-যুক্ত যার নাম প্রোটন। এই প্রোটনের চারিদিকে বৃত্তাকারে ঘুরছে ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত একটি কণা যার নাম ইলেকট্রন। এরা দুজন পরস্পরকে আকর্ষণ করে যার ফলে এরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। ব্যাপারটা ঠিক যেন সূর্যের চারিদিকে পৃথিবী ঘুরছে। হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রে আছে দু'টি প্রোটন আর দু'টি নিউট্রন আর এদের প্রদক্ষিণ করে' ঘুরে বেড়াচ্ছে দু'টি ইলেকট্রন। নিউট্রনের মধ্যে দুই বিভিন্ন





বামে—নাইলস্ বোর (জন্ম ১৮৮৫) ১৯২২ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।
দক্ষিণে—জন্ ডালটন (১৭৭৬-১৮৪৪) অণু-পরমাণুর গঠনের ধারণা ইনিই প্রথম জানিয়েছিলেন।

প্রকার তড়িৎশক্তি সমান অংশে বিদ্যমান যার ফলে নিউট্রনের ক্ষমতা নিরপেক্ষ। এই রকম এক এক রকম মৌলিক পদার্থের পরমাণুর গঠন এক এক রকম। ভারী মৌলিক পদার্থের পরমাণুর যেমন সীসে, ইউরেনিয়াম অথবা রেডিয়ামের গঠন কিছু জটিল ও এদের ইলেকট্রন প্রোটন ও নিউট্রনের সংখ্যাও বেশী।

সমস্ত পরমাণুর গঠনের মধ্যে ইউরেনিয়াম পরমাণুর গঠন সর্বাপেক্ষা জটিল। এর আছে বিরানব্বইটি ইলেকট্রন, আর এর কেন্দ্রে আছে বিরানব্বইটি প্রোটন, কিন্তু নিউট্রন আছে ১৪৬টি। ১৪৬ ও ৯২ যোগ করলে ফল হয় ২৩৮। এই ২৩৮ হ'ল ইউরেনিয়ামের পরমাণবিক ওজন। এখন যদি ইউরেনিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রে ১৪৩টি নিউট্রন থাকে তাহলে তার পরমাণবিক ওজন হ'বে ২৩৫। আজকাল ইউরেনিয়ামকে ইউ—২৩৮, ইউ—২৩৫ অথবা ইউ—২৩৪ এই প্রকার নামে অভিহিত করা হয়। একই মৌলিক পদার্থ ইউরেনিয়াম তিন প্রকার পরমাণবিক ওজনের পাওয়া গেলেও এদের গুণাগুণ অথবা ধর্ম এক। এই প্রকার মৌলিক পদার্থের নাম দেওয়া হয়েছে আইসোটোপ, যেমন ইউ—২৩৮ এর আইসোটোপ হ'ল ইউ—২৩৫।

ভ্যান ডি গ্র্যাফ আবিষ্কৃত যন্ত্র এবং ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর আর্নেস্ট লরেন্স কর্তৃক আবিষ্কৃত সাইক্লোট্রন নামক যন্ত্র পরমাণু ভাঙবার কায সহজ করে আনল কিন্তু কৌতূহলের বিষয় এই যে আটম বোমা নির্মাণে এই দু'টি যন্ত্রের কোনো সাহায্যই লাগে না।

বর্তমান যুদ্ধের অল্পদিন পূর্বে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক এনরিকো ফার্মি (ইনি ফ্যাসিস্ট ইটালী থেকে বহিষ্কৃত হয়ে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করছেন) লক্ষ্য করেন যে রেডিয়াম রশ্মি থেকে নির্গত অথবা সাইক্লোট্রন যন্ত্র থেকে প্রাপ্ত একটি নিউট্রন দ্বারা যদি ইউ—২৩৫ এর পরমাণুকে আঘাত করা যায় তাহলে ইউ—২৩৫ পরমাণু ভেঙে যায় ও সেই সঙ্গে ভীষণ তাপ ও শক্তি নির্গত হয়। ফার্মি



বেকেরল (১৮৫২—১৯০৮) ইউরেনিয়াম ও থোরিয়ামের স্বতঃ দীপ্তি লক্ষ্য করেন। ১৯০৩ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন কুরি দম্পতি সহযোগে।

আরও লক্ষ্য করেন যে এই কাজে অল্প গতি যুক্ত নিউট্রন অধিক কার্যকরী। যদি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি পাওয়া যায় তাহলে পরমাণু ভাঙার কাজটা খুব কঠিন নয়। একটা পাত্রে এক কণা রেডিয়ামকে বেরিলিয়াম নামক ধাতুর চূর্ণ দিয়ে ঢেকে রেখে দেওয়া হ'ল ও এক কণা ইউ—২৩৫কে বেশ করে' প্যারাফিন মাখিয়ে রাখা হ'ল। প্যারাফিন মাখাবার উদ্দেশ্য এই যে রেডিয়াম থেকে নির্গত নিউট্রনের গতি যাতে মন্দীভূত করা যায়। রেডিয়াম থেকে নির্গত নিউট্রন ইউ—২৩৫ এর পরমাণুকে আঘাত করে এক ভীষণ তাপ ও শক্তির উৎপাদন করে। এই পরীক্ষার ফলে যে বিপুল শক্তি নির্গত হয় তাতে বিস্মিত হ'তে হয়। মাত্র পনেরো গ্রেন (১ গ্রাম) ইউরেনিয়াম থেকে ২ টন ওজনের কয়লার সমান তাপ পাওয়া যায় আর তার শক্তি এক টন TNT (Tri-Nitro-Toluene) নামক অতি বিস্ফোরক বোমার সমান। আইনস্টাইন যে প্রচার করেছেন যে পদার্থকে সম্পূর্ণ-





বামে—এনরিকো ফার্মে (জন্ম ১৯০১) ইউরেনিয়াম পরমাণুকে নিউট্রন আঘাতে ভেঙে ফেলেন। নোবেল পুরস্কার—১৯৩৮।
দক্ষিণে—অটো হ্যান (জন্ম ১৮৭৯) জার্মাণ, ১৯৪৪ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

রূপে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় এইখানে তার প্রমাণ হ'ল।

জার্মান বৈজ্ঞানিক অটো হ্যান ও তাঁর সহকর্মী লিজি মাইটনার (ইনি মহিলা), ফ্রিস্ক ও স্ট্রাসম্যান; ফার্মির পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করেন কিন্তু লক্ষ্য করেন যে ইউ—২৩৫ এর পরমাণু ভেঙে ত' যায়ই কিন্তু তাই থেকে পাওয়া যায় বেরিয়াম নামক ধাতুর পরমাণু ও ক্রিপ্টন নামক এক-প্রকার দুষ্প্রাপ্য গ্যাস। কিন্তু পরমাণু ভাঙার সঙ্গে অতি ভীষণ শক্তি উৎপাদিত হয়। একটি নিউট্রন যেই ইউরেনিয়ামের পরমাণুকে আঘাত করে সেই পর[illegible]টি দু'টুকরো হয়ে' ভেঙে যায় [illegible] আরও দু'টি নিউট্রন পাওয়া যা[illegible] আবার এই দু'টি নিউট্রন [illegible] ইউরেনিয়ামের পরমাণুকে [illegible] ভেঙে ফেলে ও চারটি নিউট্[illegible]

এখন আবার এই চারটি নিউট্রন চারটি পরমাণুকে আঘাত করে আটটি নিউট্রন মুক্ত করে, তারপর আটটি হয় ষোলটি, ষোলো হয় বত্রিশ. এইরকমে সংখ্যা দ্বিগুণ (G.P.) হ'তে থাকে। নিউট্রনগুলির গতি এক সেকেণ্ডে বিশ হাজার মাইল তাহলে বুঝুন কত কম সময়ে কত নিউট্রন মুক্ত করে' কত পরমাণু ভেঙে কি ভীষণ তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে এবং তার ফল ও কি ভীষণ।

আসল অ্যাটম বোমার কৌশলটা হয়ত কোনো যান্ত্রিক কৌশলের সাহায্যে একসঙ্গে কয়েকটি ইউ—২৩৫ এর কণা একত্রে এনে হঠাৎ সংঘাত ঘটানো যার ফলে একটা অ্যাটম বোমা ফেটে পলকে মহাপ্রলয় ঘটায়।

অ্যাটম বোমার আসল উপাদান ইউরেনিয়াম সংগ্রহ করাই হ'ল সর্বাপেক্ষা দুরূহ ব্যাপার আবার তার মধ্য থেকে ২৩৫ পরমাণবিক ওজনের ইউরেনিয়াম সংগ্রহ করা আরও কঠিন ব্যাপার। ক্যানাডা, অ্যামেরিকার যুক্তরাজ্য ও চেকোশ্লোভ্যাকিয়ায় ইউরেনিয়াম পাওয়া যায়। খাঁটি অবস্থায় প্রকৃতিতে যেমন কোনো ধাতু পাওয়া যায় না ইউরেনিয়ামও তাই। বহু পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করে' হাজার হাজার মণ পীচব্লেণ্ড থেকে হয়ত এক কণা ইউরেনিয়াম পাওয়া গেল। যখন দেখা গেল যে তিন রকম পরমাণবিক ওজনের মধ্যে ইউ—২৩৫ ই আবশ্যক তখন এইটিকেই সংগ্রহ করা হ'ল সর্বাপেক্ষা দুরূহ ব্যাপার। সবচেয়ে দ্রুত উপায়ে—যা মাত্র ১৯৪০ সালে জানা গেছে—এক. পাউণ্ড ইউ—২৩৫ সংগ্রহ করতে সময় লাগবে অন্তত এক হাজার বৎসর। এখন একটি অপেক্ষাকৃত সহজ উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। ইউ—২৩৮, ইউ—২৩৫ অপেক্ষা সহজে পাওয়া যায়, এখন দেখা গেল যে ইউ—২৩৫ থেকে নির্গত একটি নিউট্রন দ্বারা যদি ইউ—২৩৮কে আঘাত করা যায় তাহলে ইউ—২৩৮ এর পরমাণবিক ওজন কমে' এমন একটি নতুন ধাতু পাওয়া গেল যা সর্বতোভাবে ইউ—২৩৫ এর অনুরূপ কাজ দেয়। এর নাম দেওয়া হ'ল প্লুটোনিয়াম। অ্যাটম বোমায় প্লুটোনিয়ামই ব্যবহার করা হয়েছে। এই হ'ল কলিকালের অগ্নিবাণ অ্যাটম বোমার তথ্য।

অ্যাটম বোমার শক্তির একটা হিসেব নেওয়া যাক। TNT যে অতি বিস্ফোরক একটি বোমা তা আমরা জানি কিন্তু অ্যাটম বোমার মাত্র এক পাউণ্ড বিস্ফোরকের মধ্যে নিহিত আছে পনেরো হাজার টন TNT বোমার শক্তি। এই পনেরো হাজার টন TNT বোমা বহন করতে চারটি পুরো ট্রেন লাগবে যার প্রত্যেকটিতে অন্তত ৭৫ খানি করে' গাড়ি থাকবে। অ্যাটম বোমা ফাটলে তার ধোঁয়ার কুণ্ডলী, ধুলো ও টুকরো পদার্থসমূহ চকিতের মধ্যে চল্লিশ হাজার ফিট উঁচুতে উঠে যায়, অতএব যে উড়োজাহাজ থেকে বোমা ফেলা হবে সেখানি নিরাপদ উচ্চতায় ওঠবার আগেই ধ্বংস হতে পারে এই আশংকায় প্যারাশুট সাহায্যে বোমাটি নামিয়ে দেওয়া হয় যাতে বোমা আস্তে আস্তে নামতে নামতে উড়োজাহাজ নিরাপদ দূরত্বে পালাতে পারে। তাছাড়া চল্লিশ হাজার ফিট উঁচু থেকে লক্ষ্য ঠিক করা যায় না সেইজন্য এই ব্যবস্থা।

পরমাণুর শক্তি খালি ধ্বংসই করে না, একে সৎকাজেও লাগানো যায় এবং তার চেষ্টাও চলছে। মাত্র পনেরো গ্রেন প্লুটোনিয়ামের সাহায্যে একটি বড়ো উড়োজাহাজ না থেমে সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে পারবে; তার চেয়েও কম পরমাণবিক শক্তির সাহায্যে একটি মোটরগাড়ি তার সমস্ত জীবন চলতে পারবে। তখন কি পেট্রলের ও কয়লার যুগ শেষ হবে?

বিভিন্ন দেশের অন্তত দুইশত জন বৈজ্ঞানিক নানাভাবে অ্যাটম বোমা আবিষ্কারের জন্য দায়ী। বিশেষ করে' কারও নাম করলে আর একজনের প্রতি অবিচার করা হ'বে। সম্প্রতি সংবাদপত্রে যে প্রচারিত হয়েছে, অ্যাটম বোমার আবিষ্কারককে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে সে সংবাদ ঠিক নয়। অবশ্য এই দুইশত জন বৈজ্ঞানিকের মধ্যে অনেকেই নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন যাঁদের মধ্যে অধুনাতম হ'লেন অটো হ্যান।

অ্যাটম বোমার বাঙলা করা হয়েছে আণবিক বোমা, কিন্তু অ্যাটমের বাঙলা হ'ল পরমাণু এবং মলিকিউলের বাঙলা অণু। অতএব অ্যাটম বোমার কোন বাঙলা সঠিক? আণবিক অথবা পরমাণবিক?



মোহর

শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

কতগুলো দুর্লভ মূল্যবান মোহর!

সংসারের চাকা যখন প্রাত্যহিক অভাব-আবর্জনায় মন্থর হয়ে কেঁপে ওঠে রামকৃষ্ণবাবু তখন আলমারি খোলেন—মেহগিন কাঠের অতি বিরাট প্রাচীন আলমারি! তারপর আস্তে আস্তে সুন্দর একটি কাচের কৌটো হাতে তুলে নেন আর বৈদ্যুতিক আলোয় যেন কথা বলে ওঠে মোহরগুলো—ছোট বড় মাঝারি চৌকো আরও অনেক। আনন্দে গর্বে রামকৃষ্ণবাবু স্ফীত হয়ে ওঠেন। এ মোহরগুলো তাঁর বর্তমান নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবনের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ!

কিন্তু এগুলোর বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ আছে। জীবন্ত প্রতিবাদের মতো নিরুপমা মাঝে মাঝে রামকৃষ্ণবাবুর কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে।

আমার কথা না হয় ছেড়েই দাও, কিন্তু মেয়েটা? তারও কি সাধ-আহ্লাদ নেই, এ বয়সে গয়না-কাপড় না পরলে আর কবে পরবে?

হবে, ধীর গম্ভীরস্বরে রামকৃষ্ণবাবু বল্লেন, অবস্থা ভালো হলেই সব হবে!

সে আশায় তো বিয়ের পর থেকেই বসে আছি। কিন্তু না, নিজের কথা বলতে আসিনি তোমার কাছে, ভয় নেই। মেয়েটাকেও কি অবস্থা ভালো হবার আশায় বসিয়ে রাখবে? সে সময়ের জন্যে তো আমিই আছি।

একটু বিরক্ত হয়ে রামকৃষ্ণবাবু বল্লেন, আমি কি করতে পারি বল?

ইচ্ছে করলেই তুমি গৌরীর গয়না গড়িয়ে দিতে পারো।

না, আমি এখন তা পারি না, পারলে তোমার বলার অপেক্ষায় থাকতাম না।

হঠাৎ নিরুপমা বলে উঠলো, ওই মোহরগুলো রেখেছ কি করতে? পণ্টু মামা সেদিন বলছিল সোনার চেয়ে একপয়সা বেশী দাম ওগুলোর হবে না। বড়োবাজারে

নাকি অমন মোহর অজস্র পাওয়া যায়—

তাই নাকি? একটু হেসে রামকৃষ্ণবাবু বল্লেন, তোমার পণ্টু মামাকে বলে দিও আমার কাছে যে-জিনিস আছে সে-জিনিস সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে খুব কম লোকের কাছেই পাওয়া যায়। আর সোনার দামে এর দাম নয়—এর মূল্য বোঝা তোমার পণ্টু মামার সাধ্য নয়।

হয়তো কারুরই সাধ্য নয়। কিন্তু যে-জিনিসের মূল্য কেউই বুঝতে পারে না সেগুলো রেখেই বা লাভ কি? তার চেয়ে এমন করে নিলেই তো হয় যেন সকলে মূল্য বুঝতে পারে? মানে আমি গৌরীর গয়নার কথা বলছিলাম—

রামকৃষ্ণবাবুর আর ধৈর্য রইলো না। আলমারি বন্ধ করে চাবি পকেটে নিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন। তবে তাঁর চোখ দুটো যেন জ্বলে উঠলো।

সেই পুরোনো একঘেয়ে ইতিহাস!

তবু নিঃশব্দে রামকৃষ্ণবাবু সমস্ত কিছু মেনে নিয়েছেন। তিনি জানেন চিরদিন তাঁর স্বাতন্ত্র্য খোদাই করা থাকবে মোহরগুলোর গায়ে। সেগুলোই তাঁর বংশের উজ্জ্বল ইতিহাসের জ্বলন্ত প্রমাণ। মোহরগুলো রামকৃষ্ণবাবুর কানে গেয়ে ওঠে সেই ইতিহাস! তাই সেগুলোকে তিনি আঁকড়ে ধরতে চান।

মাঝে মাঝে মোহরগুলো হাতে নিয়ে প্রায় অবশ হ'য়ে যান। একটা তীব্র তীক্ষ্ণ অনুভূতিতে তাঁর শরীর কেঁপে ওঠে!

পর্দা সরে যায়—

বিরাট বাড়ি, প্রচুর অর্থ আর নিশ্চিন্ত আরাম। রায়চৌধুরী পরিবারের আভিজাত্যের কথা কে না জানতো তখন। সেই আব-হাওয়ায় রামকৃষ্ণবাবু বেড়ে উঠেছেন।

পিতামহের অনেক গভীর কথা আজও তাঁর কানে ভিড় করে,—নিজে না খেতে পেয়ে মরলেও আভিজাত্যকে কখনও মারবি না। এ সহজে পাওয়া যায় না আর এর চেয়ে বড়ো জিনিস আর নেই।

রামকৃষ্ণবাবুর বাবাও একথা অক্ষরে-অক্ষরে পালন করেছিলেন। উত্তরাধিকার-সূত্রে ছেলেকে তিনি দিয়ে গেলেন শুধু আভিজাত্য। একে একে সমস্ত দেনা মিটিয়ে রামকৃষ্ণবাবু দেখলেন তাঁর কাছে অবশিষ্ট আছে শুধু মোহর—তাঁর আভিজাত্যের জ্বলন্ত অঙ্গীকার।

বাবার মৃত্যুর পর কিভাবে এ মোহর-গুলোকে তিনি রক্ষা করে এসেছেন সেকথা ভেবে তাঁর নিজেকে এ বংশের সম্পূর্ণ উপযুক্ত সন্তান বলে মনে হয় বৈকি!

খুব অল্প বয়সেই যথারীতি তাঁর বিয়ে হয়েছিল। এ বংশে চাকরি করবার কল্পনা কেউ কখনো করেনি। কিন্তু নিরুপমার সাংসারিক অভিযোগে রামকৃষ্ণবাবু চাকরী গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। প্রথম প্রথম এজন্যে তাঁর লজ্জার সীমা ছিল না। এখনও কঠিন গাম্ভীর্য নিয়ে মাথা নীচু করে তিনি অফিসে ঢোকেন আর ঠিক তেমনি করেই যথাসময়ে বেরিয়ে আসেন। কথাবার্তা কারুর সঙ্গে বলেনই না। চাকরিটা নাকি তার মতো লোকের যোগ্য নয়।

তবু দেখতে দেখতে সেই চাকরির ওপরেই রামকৃষ্ণবাবুকে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হলো। অবস্থার এই ঘোরতর পরি-বর্তন তাঁর বুকে মুহূর্তে মুহূর্তে বাজে!

তিনি জানেন এ বাড়িতে তাঁকে একে-বারেই মানায় না। বর্তমান অবস্থার সঙ্গে তাঁর চরিত্রের তফাৎ অনেক। তবু রামকৃষ্ণ-বাবুর দৃঢ় বিশ্বাস যে তিনি সেখানে যেভাবেই থাকুক না কেন, মোহরগুলো তাঁর সত্যিকার পরিচয়-পতাকা তুলে ধরবে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাঁকে যেখানেই নামিয়ে আনুক, মনে মনে রামকৃষ্ণবাবু সেই উত্তুঙ্গ শিখরে বসে আছেন—সেখান থেকে কার সাধ্য তাঁকে নামিয়ে আনে!

কারোর কাছে কোন অভিযোগ তিনি করেন না। শুধু সুযোগ পেলেই কথায় কথায় সাধারণকে প্রচ্ছন্ন গর্বের সঙ্গে তাঁর মহামূল্য মোহরের কথা জানিয়ে দেন!

রামকৃষ্ণবাবুর মেয়ে গৌরী!

ছেলেবেলায় তিনি তাকে শোনাতেন, শোন্ গৌরী, এ মোহরগুলো দেখ—আসল আকবরী মোহর। খুব বড়লোকের বাড়ি ছাড়া এগুলো কোথাও থাকে না।

গৌরী সেগুলো নেড়ে চেড়ে দেখে বলতো, এগুলো কিসের বাবা—সোনার?

হ্যাঁ, চাপা হাসি হেসে রামকৃষ্ণবাবু বলতেন, খাঁটি সোনার, তোর দাদু আমাকে দিয়ে গেছেন।

বাঃ, কী সুন্দর!

তারপর গৌরী অবাক হয়ে শুনতো রূপকথার মতো সে ইতিহাস। আর মুগ্ধ বিস্ময়ে মোহরগুলোর দিকে চেয়ে থাকতো।

মাঝে মাঝে রামকৃষ্ণবাবুকেও সাংসারিক প্রয়োজন ঘিরে ফেলে। তাই নিরুপমার সঙ্গে তাঁর কলহ হয়।

একদিন সকালবেলা নিরুপমা বললো, শুনছো, আজ সকাল থেকে চাকর পালিয়েছে, কাজেই তোমাকেই তো বাজার যেতে হবে।

কি বললে? রামকৃষ্ণবাবুর স্বরে বিস্ময় ঝরে পড়লো।

চাকর নেই, তুমিই বাজারে যাও।

কাকে কি বলছো তুমি!

তবে আমিই যাই বাজারে? না খেয়ে তো আর থাকতে পারি না—

থেকে থেকে রামকৃষ্ণবাবু বলে উঠলেন, যে কদিন চাকর না পাওয়া যায়, প্রয়োজন হলে সে কদিন না খেয়ে থাকতে হবে।

বাঃ, চমৎকার বিধান, একটু পরে হঠাৎ সুর বদলে নিরুপমা বললো, অত মাইনে দিয়ে চাকর রাখারই বা দরকার কি বাপু? তার চেয়ে—

অনেক দরকার। চাকর ছাড়া কোন ভদ্রলোকের চলে না।

কিন্তু আজ যে ভদ্রতাকে বাঁচাতে চাচ্ছ, এমনভাবে চললে সংসারে একটা বিরাট ছিদ্র করে দশজনের সামনে সে একদিন ফেটে বেরিয়ে পড়বে সেকথা বুঝতে পারো না?

এতে বোঝবার কিছু নেই!

অবুঝ স্বামীর ওপর নিরুপমার মায়া হয়। তার স্বামী এত অবুঝ যে স্পষ্ট করে বোঝালেও কিছু বোঝে না। যে জিনিস ধরে রাখা যাবে না, যা কিছুতেই ধরে রাখার সামর্থ্য তার নেই সেটাকেই আঁকড়ে রাখার প্রাণপণ ব্যর্থ চেষ্টা তাকে পঙ্গু করে রেখেছে। নিরুপমা স্পষ্ট বুঝতে পারে তার স্বামী সহজভাবে কিছুই বুঝতে পারে না। বোধ হয় নিশ্বাস নিতেও তার কষ্ট হয়।

আস্তে আস্তে নিরুপমা বললো, শোন, ওগো তুমি সহজ হ'তে চেষ্টা কর—

আমি খুবই সহজ আছি।

না, তুমি মোটেই সহজ নেই তাই যদি হবে তাহ'লে পদে পদে তোমার এত সংকোচ কেন? কেন তুমি সাধারণের মতো চলাফেরা করতে পারো না? তোমার সব কিছুতেই কেমন যেন একটা আড়ষ্ট ভাব।

সাধারণের মতো চলাফেরা আমাকে করতে বল কেন, আমি কি সাধারণ?

তবে তুমি কি? কি তোমার অসাধারণত্ব?

আমি কোন্ বংশের ছেলে সেকথা জানো?

হেসে নিরুপমা বললো, কি মূল্য তার!

কেমন করে তুমি বলো যে মূল্য নেই? জানো নিরুপমা, লোকে কুকুর কিনলেও তার বংশ-তালিকা দেখে কেনে।

কুকুরের বেলায় যা খাটে, মানুষের বেলায় তা তো খাটে না। কুকুরের বেলায় বংশ-গৌরব বড় কেননা তার মনুষ্যত্ব নেই। এটা বুঝতে পারো না কেন যে মানুষের সবচেয়ে বড় গৌরব মনুষ্যত্ব।

গৌরী এসে বললো, বাবা, আজ তাহ'লে আমি একাই কলেজে যাই?

যতদিন চাকর না পাওয়া যায়, ততদিন তোমাকে কলেজে যেতে হবে না।

না গেলে চলবে না বাবা, সামনেই টেস্ট্ পরীক্ষা।

আমি তোমায় পৌঁছে দিতে পারি না।

কি দরকার তার? এই তো কাছেই আমি একাই যাই না?

না, গম্ভীরস্বরে রামকৃষ্ণবাবু বল্লেন, নিজেকে সুলভ করো না।

গৌরী চুপ করে রইলো। কিন্তু রামকৃষ্ণ-বাবু অফিসে বেরিয়ে যাবার পর যথাসময়ে সে পালিয়ে কলেজে গেল।

আর রামকৃষ্ণবাবু গৌরীকে মোহর দেখান না।

সে একদিন বলেছিল, এগুলো রেখে কি হবে বাবা? তার চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে দিয়ে দিলে অনেকের উপকারে আসে।

রামকৃষ্ণবাবু গুম্ হয়ে গিয়েছিলেন।

তিনি বুঝতে পারেন যে জিনিসকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরতে চান, সে জিনিসের মূল্য এদের কাছে কিছু নয় কারণ সে-আবহাওয়ায় এরা নিশ্বাস নেয়নি।

তাঁর অদৃষ্টকে দোষ দেন তিনি। আজকাল মাঝে মাঝে অসহ্য জ্বালায় রামকৃষ্ণবাবু গুমরে গুমরে জ্বলেন। তাঁর যা আয় তাতে তিনি যেভাবে থাকতে চান সেভাবে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়। চারপাশ থেকে একটা বিকট শৈথিল্য তাঁকে ঘিরে ধরে। তবু তিনি বিচলিত হন না। তাঁর উজ্জ্বল অতীতের সাক্ষী মোহর। সেগুলো হাতে নিয়ে তিনি তাকিয়ে দেখেন। আর তাঁর সমস্ত শৈথিল্য যেন কেটে যায়।

কিন্তু অকস্মাৎ একদিন রামকৃষ্ণবাবুর আসন টলে উঠলো।

এতদিন তিনি আঘাত পেয়েছেন—বুঝতে পেরেছেন স্ত্রী মেয়ে তাঁকে সমর্থন করে না, প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা ঝড়ের মতো তাঁকে নাড়া দিয়ে গেছে বারবার কিন্তু কোন ক্ষতি তাঁর হয়নি। মাঝে মাঝে বিচলিত হলেও আসন টলে ওঠেনি।

নিরুপমাই কথা পাড়লো, শোন, অধৈর্য হয়োনা, আর আমার মনে হয় বাধা দিতে গেলে কোন ফল হবে না—

কি বলছ, স্পষ্ট করে বল?

নিরুপমা স্পষ্ট করেই বললো, গৌরী একটি ছেলেকে বিয়ে করতে চায়।

হঠাৎ ঘরে যেন একটা ভীষণ শব্দ হলো। রামকৃষ্ণবাবুর মনে হলো কি যেন ভেঙে পড়ছে। নিজের কানকে তিনি যেন ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারলেন না।

কি—কি বললে? তাঁর স্বর কাঁপছে।

গৌরী একটি ছেলেকে পছন্দ করেছে, তাকেই ও বিয়ে করবে। ছেলেটি ভালোই, শ' দেড়েক টাকা মাইনের চাকরী করে। বাপের অবস্থা খুব ভালো না হলেও ছেলে তো নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে—

গৌরী কোন্ বংশের মেয়ে সে-খবর রাখো? রামকৃষ্ণবাবু প্রায় চীৎকার করে উঠলেন, এসব কথা আমার কাছে তোমরা উচ্চারণ করো কোন্ সাহসে?

নিরুপমা অপমান বোধ করলো, সাহস যখন বেড়েই গেছে দেখছো তখন তো আর সেকথা বলে লাভ নেই। তবে হ্যাঁ, একথা বলতে পারি যে গৌরী বিয়ে করবেই, একটু থেমে নিরুপমা আবার বললো, আর বংশের কথা বলছো, তার স্বাধীন মন কি বংশের চেয়ে বড়ো নয়?

না, বংশ-মর্যাদার দিকে চেয়ে নিজেদের অনেক কিছুই উৎসর্গ করতে হয়।

তুমি তা পারো, কিন্তু নিজের স্বাধীনতাকে পিষে মারতে ওরা পারে না।

ও, তাহলে তোমারও সায় আছে দেখছি, বেশ ওকালতি করতে শিখেছো তো—

হ্যাঁ, কারণ না করে উপায় নেই। ওরা বিয়ে করবেই যখন তখন বাধা দিয়ে ফল নেই. নিজেদেরই হাস্যাস্পদ হতে হবে।

বাজে কথা বলো না। আমার মেয়ে একটা গরীবের ছেলেকে বিয়ে করবার আগে যেন বিষ খেয়ে মরে—আমি বিষ এনে দেবো।

তুমি বিষ এনে দিতে পারো কিন্তু কোন দুঃখে সে মরতে যাবে?

দেখা যাক্!

বেশ, গৌরীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তুমি তার সঙ্গে বোঝাপড়া কর—

বোঝাপড়া! এসব বাজে কথা নিয়ে মাথা ঘামাতেও আমার মাথা কাটা যায়, তাকে বলে দিও সে যেন আমার সামনে না আসে!

গৌরী অবশ্য সামনে এসেছিল কিন্তু সেকথা পরে।

রামকৃষ্ণবাবু রাগের ঝোঁকে যা-ই বলুন না কেন, মনে মনে কোথায় যেন তিনি তৃপ্তি পেলেন—সন্তুষ্ট হলেন। কে যেন তাঁর একটা রাত্রিদিন খচ্‌খচ্ করা কাঁটা তুলে নিলো।

গৌরীর বিয়ের কথা রামকৃষ্ণবাবু অনেকদিন থেকেই ভাবছিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাবনাও বেড়ে যাচ্ছিল। তিনি জানতেন বর্তমানে বিয়ের ব্যাপারে খরচ অনেক—সে-ব্যয়ভার বহন করার সাধ্য তাঁর নেই। অথচ সাধারণের মতো সামান্য আয়োজন করে বিয়ে দিতেও তাঁর সম্ভ্রমে বাধে। সমস্ত দিক ভেবে এ বিষয়ে তিনি নীরব ছিলেন—তাঁর কিছু করবার উপায় ছিলো না। এ ভাবনা কাঁটার মতো নিরন্তর তাঁর বুকে খচ্‌খচ্ করতো।

কিছুদিন আগে একবার নিরুপমা বলেছিল, পশুমামা একটা খুব ভালো ছেলের খবর এনেছে, নগদ কিছুই চায় না তারা, শুধু গয়না দিতে হবে।

বুঝতে পারছি নিরু কিন্তু এখন—

কেন? গয়না দেয়াতো আমাদের পক্ষে অসম্ভব নয়।

কেমন করে সম্ভব?

মোহরগুলো ভেঙে ফেললেই তো হয়!

রামকৃষ্ণবাবু জ্বলে উঠেছিলেন, ওগুলো যে আমার কাছে আছে সেকথা ভুলে যাও নিরুপমা, মোহরগুলো গেলে আমার পরিচয় দেবার আর কি থাকবে বলতে পারো?

তবে যা ইচ্ছে কর!

তারপর গৌরীর আর কোন সম্বন্ধ আসেনি।

সেই গৌরীর বিয়েতে রামকৃষ্ণবাবুর কোন দায় থাকবে না ভেবে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। আর অর্থের দিক থেকেও এক্ষেত্রে তাঁকে লজ্জিত হতে হবে না। যা ইচ্ছে করুক তারা!

তবু তাঁর মনে আবার আগুন জ্বলে উঠলো। নিজের ইচ্ছেয় একটা গরীবের ছেলেকে গৌরী বিয়ে করছে—কী সাহস! তাঁর শরীরের সমস্ত শিরা যেন ফুলে উঠলো। না না, কিছুতেই এতে প্রশ্রয় দেয়া যায় না।

কান্না-মেশানো কোলাহল শুনে রামকৃষ্ণবাবু বাইরের ঘরে এলেন। সে-ঘরে গৌরী, সুদর্শন একটি যুবক আর নিরুপমা। গৌরীর মাথায় সিঁদুর দেখে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে নিতে তাঁর বিশেষ দেরী হ'ল না। তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

খুব আস্তে আস্তে নিরুপমা বললো, তোমার মেয়ে জামাই, এদের আশীর্বাদ করো!

ওরা প্রণাম করলো।

কয়েক মুহূর্ত রামকৃষ্ণবাবু চুপ করে রইলেন তারপর নিস্তেজ গলায় থেমে থেমে বললেন, ও হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা, দাঁড়াও, দাঁড়াও—তিনি প্রায় টলতে টলতে পাশের ঘরে চলে গেলেন। একটু পরেই আবার ফিরে এসে বললেন, গৌরী, তুমি যা করেছ সেটা আমার কাছে খুবই সাংঘাতিক—এতো সাংঘাতিক যে তোমাকে তার কিছুই আমি বোঝাতে পারবো না। তবু আমার বংশের ধারা তোমার রক্তে বইছে—সেটাকে আমি অস্বীকার করতে পারি না। তাই তোমাকে আমি এটা দিলাম—আমার আশীর্বাদের চিহ্ন, এই নাও—একটা আকবরী মোহর তিনি গৌরীর হাতে দিয়ে বললেন, কিন্তু তোমরা আর এ বাড়িতে এসো না—আমি মনে করবো আমার মেয়ে মরে গেছে!

কি বলছো যা-তা? নিরুপমা গৌরীর হাত ধরে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে বললো, ভারী জিনিস দিলেন উনি, লজ্জাও করে না! যাক্, তুই কিন্তু কিছু ভাবিস না, সব ঠিক হয়ে যাবে দুদিন পরে। হ্যাঁ, তোকে তো কিছুই দিতে পারলাম না, আর এ বিয়ের জন্যে কোন পক্ষ থেকেই তো কিছু পেলি না। তোর কানের—হ্যাঁ, তুই এক কাজ কর, মোহরটা দিয়ে যা আমার কাছে, ওটা ভাঙিয়ে তোকে একটা কানের গয়না—

না মা, ব্যস্ত হয়ে গৌরী বললো, বাবার অত সখের জিনিস—

আরে, তুইও কি পাগল হলি তোর বাবার মত? ওটা বাক্সে তুলে রেখে কি করবি? তার চেয়ে কানের গয়না গড়ানো সব দিক দিয়ে ভালো। দে, আমার কাছে ওটা দিয়ে যা, আমি স্যাকরাকে দিয়ে দেবো—গৌরীর হাত থেকে এক রকম জোর করেই নিরুপমা মোহরটা নিয়ে নিলো।

রামকৃষ্ণবাবু বাইরের ঘরে বসেছিলেন—তাঁর মুখ গম্ভীর বিষণ্ণতায় ভরে গেছে। মাসের প্রথম দিকে এমনি দুর্ভাবনা নিরন্তর তাঁকে যেন প্রহার করে। বাড়ী ভাড়া আর সংসার খরচের চিন্তা এ সময়টা প্রবলভাবে নাড়া দেয়। এই ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তির স্পর্শ এড়াইবার জন্যে রামকৃষ্ণবাবু উন্মাদের মতো হয়ে ওঠেন।

আজ প্রথম তাঁর মনে ঝলসে উঠলো মোহরগুলোর কথা। সম্পদ যখন তাঁর রয়েইছে তখন অর্থের এই স্বল্পতা বারবার সহ্য করা কেন! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি শঙ্কিত হয়ে উঠলেন—তাঁর মনে হলো এইমাত্র যেন কোন অশুচি নোংরা জিনিস স্পর্শ করেছেন। রামকৃষ্ণবাবুর নিজের ওপর ঘৃণা হলো।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই প্রবেশ করলো নিরুপমা, শোন, গৌরীর কানের গয়না গড়াবার জন্যে স্যাকরাকে তোমার মোহরটা দিয়েছিলাম—ওগুলো সোনা নয়, রূপোর ওপর সোনার প্লেটিং করা, এই দেখ না স্যাকরা আজ ফেরৎ দিয়ে গেল—

বিস্ফারিত চোখে রামকৃষ্ণবাবু দেখলেন, নিরুপমার হাতে তাঁর গৌরীকে দেয়া আকবরী মোহর দু'টুকরো করা!

প্র·না·বি·র পাতা

শকুন্তলার অঙ্গুরী

সাঁওতাল পরগণার একটি ছোট শহর। মাঠের মধ্যে বাড়িগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হওয়া অসম্ভব নয় যে বাড়িগুলি নির্মাণের মধ্যে কোন পরিকল্পনা নাই। কিন্তু বস্তুত তাহা নয়। মাঠ অসমতল। ঢেউ খেলানো মাঠ দিগন্ত-বিসর্পী, যেন মাটির তরঙ্গ। একটি করিয়া তরঙ্গের চূড়া, তার পরেই খাদ; এমনি করিয়া খাদে নিখাদে এখানকার জমির বিন্যাস। তরঙ্গের চূড়ায় কতকগুলি বাড়ি, মানুষের যত্নে রোপিত বৃক্ষের বাগান। আর খাদের অংশে ধানের ক্ষেত, পাথর-চোয়ানো জলের ছোট একটি ঝরণা, বৃহত্তর ঝরণার অভিমুখে ধাবিত—সবগুলি ঝরণা দিয়া বালু শয্যাশায়িনী জয়ন্তী নদীতে করদান করিতেছে। প্রকৃতির অনায়াস অকৃত্রিম প্রয়াস আর মানুষের কৃত্রিম চেষ্টা পাশাপাশি গলাগলি সংস্থিত।

মাঠের একটি তরঙ্গের চূড়া যেমন বাড়ি ঘরে ভরিয়া যায়, অমনি পরবর্তী তরঙ্গের চূড়ায় আবার বাড়িঘর উঠিতে থাকে—মাঝ-খানকার নিখাদ অংশের একান্তে সরু কাঁকর ঢালা একটি লাল পথের সৃষ্টি হয়—দুইটি অদূরবর্তী পাড়ায় যাতায়াতের একমাত্র সূত্র।

ছোট বড় মাঝারি নানা আকারের বাড়ি—কিন্তু প্রত্যেক বাড়িতেই একটি করিয়া বাগান আছে। কতকগুলি গাছের এখানকার মৃত্তিকায় জন্মিবার একটি সহজ প্রবণতা আছে—পেয়ারা, আতা, পেঁপে, ইউ-ক্যালিপটাস। কিন্তু যত্ন করিলে সব গাছই এখানে জন্মিতে পারে। আম, লিচু, কাঁঠাল, শাকসব্জী সবই। কেবল ফলের বাগান নয়—এখানকার মতো এমন ফুলের বাগান বড় একটা দেখা যায় না। কলিকাতায় হয় তো আছে—কিন্তু তা এমন প্রত্যক্ষ নয়। মানুষের হাতের চিহ্নে আর উঁচু প্রাচীরের আড়ালে সে সব আচ্ছাদিত। বিলাতি মরসুমী ফুল হইতে আরম্ভ করিয়া জবা, টগর, কৃষ্ণচূড়া, বেল, কুন্দ, চাঁপা, বকুল আর গোলাপ। এখানকার বালু-জমি গোলাপের পক্ষে প্রশস্ত। কলিকাতার বাজারের সৌখীন গোলাপ নাকি এখান হইতেই চালান হইয়া যায়।

একটি পাড়ায় হয় তো কুড়িখানি বাড়ি। সারা বছর অধিকাংশ বাড়ি শূন্য। বাড়ির দরজা জানলা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পূজার ছুটির জনতার জন্য ধ্যান করিতে থাকে। শরৎ কালের প্রথম উত্তরে বাতাস উঠিতেই দরজা জানলা খুলিয়া যায়—ক্রমে বাড়িগুলি কলিকাতার আর্ত অধিবাসীদের ভিড়ে ভরিয়া উঠিতে শুরু করে। বস্তুত শরৎ ও শীতই এখানকার ঋতু, জনসমাগমের ঋতু। বাকি সব কয়েক মাস—অনবচ্ছিন্ন প্রকৃতির রাজত্ব। তখন বাড়ির মালি আর পাড়ার রাখাল ছাড়া আর কেহ থাকে না। শরৎ ও শীত এখানকার মথুরার পালা, বছরের অবশিষ্ট এখানে চলিতে থাকে বৃন্দাবনের লীলা—রাখালের লীলাই তখনকার প্রধান সৌন্দর্য ও সম্পদ।

শরৎকালের অভ্যস্ত বর্ষণ শেষ হইয়া গেলে আকাশের শেষ মেঘ বিন্দু নিঃশেষে মুছিয়া গেলে অসীম শূন্য যখন অনন্ত নীলে ভরিয়া যায়, সোনার রৌদ্র যখন শূন্যতার উচ্চতম প্রান্ত হইতে গড়াইয়া দিকবলয় অবধি আনমিত হয়, তখনকার প্রত্যেকটি দিন এক একটি অলৌকিক সোনার পিঞ্জর। পিঞ্জরের সোনালী শিক-গুলির ঠিক বাহিরই উচ্চাবচ সুনীল পাহাড়ের সারি, মরুভূমির মধ্যে মরুভূমির উষ্ট্র যূথের মতোই আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া দণ্ডায়মান। সকাল বেলার সূর্য রশ্মি ইহাদের মুখে সোনার বলগা কষিয়া দেয়—আবার বিকাল বেলা পড়ন্ত রোদ সাড়ম্বরে সেই রশ্মি প্রত্যাহার করে। আর সারাদিন এই মরুভূমির চির পথিকের দল, মরীচিকাপায়ী তৃষার্তের দল—চঞ্চল মরীচিকা স্রোতের দিকে উন্মুখ হইয়া তাকাইয়া থাকে। উচ্চতম পাহাড়টির শৃঙ্গে কখনো কখনো মেঘ সংলগ্ন হয়, তখন সে মেঘের পতাকা উড়াইয়া দিয়া কাহার উদ্দেশে কি সংকেত বার্তা জ্ঞাপন করে।

নীচু জমিতে ধানের চাষ। কচি ধানের সবুজ শীষ—শ্যামল, গাঢ় শ্যামল, সোনালী শ্যামলের ধাপ অতিক্রম করিয়া শেষে খাঁটি সোনায় পরিণত হইয়া আনমিত হইয়া পড়ে। প্রতিদিন সকালে সূর্যের কিরণ উত্তরী লুটাইয়া পড়িয়া তাহার শীষ হইতে শিশির বিন্দুটি মুছিয়া লয়। সারা দীর্ঘদিন সোনার ধানে আর সোনার রোদে যে সংলাপ চলিতে থাকে, কবিরা হয় তো তাহার সংবাদ দিতে পারেন।

এইখানে মাঠের মধ্যে আসিয়া আমি দাঁড়াই—বেলা তখন দশটার কাছে। প্রভাত উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বাতাসে তখনো আছে প্রভাতের স্নিগ্ধতা। উন্নত সরল ইউক্যালিপ্‌টাসের তরুশাখা হইতে একটি কষায় মধুর সৌগন্ধ্য মগজের শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হইয়া যায়। আকাশ পরিব্যাপ্ত করিয়া এই সৌগন্ধ্যটি সারারাত্রি বিস্তারিত হইয়া থাকে—ভোরের হাওয়া একটু প্রবল হইবার সঙ্গে সঙ্গেই রাত্রের এই শয্যা সুবাস গুটাইয়া যায়। আবার সন্ধ্যা বেলার স্তিমিত বাতাসে এই গন্ধের বিছানা প্রসারিত হইতে থাকে, প্রান্তর লক্ষ্মীর অদৃশ্য মলমলের আশ্চর্য বিছানা। এখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে আবহাওয়ার সঙ্গে অস্তিত্বের কেমন করিয়া একটি সমন্বয় ঘটে। কাছেই এক পাল গোরু চরিতেছে—তাহাদের ঘাস ছিঁড়িবার সম্মিলিত ঐক্য তান, অদূরে কোথায় ঘুঘু ডাকিতেছে,তাহার সকরুণ শাশ্বত সঙ্গীত, দূরের সাঁওতাল পল্লী তরুচ্ছায়া কোমল খোলার চালের রক্তিম আভাস, সবশুদ্ধ মিলিয়া কেমন একটা অপার্থিব ভাব। ধীরে ধীরে বহু সংস্কারের গ্রন্থিল অঙ্গুলী হইতে হঠাৎ মনটা শকুন্তলার অঙ্গুরীয়ের মতো স্খলিত হইয়া এই স্বচ্ছ অতল শান্তি নীরের মধ্যে পড়িয়া যায়। মন উদাস হইয়া ওঠে। যে মুহূর্তে শকুন্তলার অঙ্গুরী খুলিয়া পড়িয়া গিয়াছিল—সে কি অকারণে উদাসীনতা অনুভব করে নাই? শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের বিরহ নাটিকা আজও অভিনীত হইয়া চলিয়াছে—মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে। মানুষ প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। সে বিচ্ছেদ এতই সুগভীর যে কেহ কাহাকেও চিনিতে পারিতেছে না। অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়ক যে অতলে নিমজ্জিত! তাই ক্ষণে ক্ষণে দু'জনেরই মন উদাস হইয়া যায়। এইখানে এই মাঠের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলে আমি সেই আদিম বিরহ যেন অনুভব করিতে পারি!

প্রাচীন কালের কবিরা নিত্য প্রকৃতির সহবাস করিতেন—তাই তাঁহারা স্বতন্ত্রভাবে প্রকৃতির চিত্র অঙ্কিত করেন নাই। খুব সম্ভবত তাঁহারা প্রকৃতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতনই ছিলেন না। তাঁহাদের কাব্যে আধুনিক কবিদের মতো প্রকৃতি চিত্রন যে নাই—ইহাই তাহার একমাত্র কারণ। যে স্বামী-স্ত্রী চিরকাল একত্র থাকিল—তাহা-দের চিঠিপত্র তলব করিয়া প্রণয় বিচারের পরীক্ষা কি বৃথা নয়! দান্তে কাব্যের প্রকৃত উপজীব্য বলিয়া "ভগবান, যুদ্ধ ও প্রেমের" উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি প্রকৃতির উল্লেখ করেন নাই। তাহার স্বতন্ত্র উল্লেখের কথা তাঁহার চিন্তারও অগোচর ছিল।

নাগরিক সভ্যতার উদ্ভব মানুষকে প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে—তাই কবিরা এখন প্রকৃতির সম্বন্ধে সচেতন। এই চৈতন্য হইতে প্রাকৃতিক কবিতার সৃষ্টি। জানকী বিচ্ছেদের সেতু রচনা করিয়াছিলেন অঙ্গচ্যুত রত্নালঙ্কারে; রামচন্দ্র বিচ্ছেদের সেতু রচনা করিয়াছিলেন শোকের

লবণাম্বুধিকে সংবন্ধ করিয়া; এখনকার কবিরা প্রকৃতির বিচ্ছেদের সেতু রচনা করে, প্রকৃতির উপরে কবিতা লিখিয়া। এই সব কবিতায় মিলনের আভাস আছে, কিন্তু মিলন নাই।

শকুন্তলা ও দুষ্মন্তে অবশেষে মিলন ঘটিয়াছিল; প্রকৃতি ও মানুষে আর কি মিলন ঘটিবে না? প্রকৃতি আজও তাহার জন্যে অপেক্ষা করিয়া আছে—এক বেণী-ধারিণী, তপশ্চারিণী, বিরহ-প্রবর্ধিত সৌন্দর্যা! কিন্তু মানুষ-দুষ্মন্ত কি তাহার তপস্যায় বসিয়াছে? কিম্বা সে কি এই বিরহ সম্বন্ধে আদৌ সচেতন? ক্ষণে ক্ষণে তাহার মন উদাস হইয়া যায় সত্য, কিন্তু তাহার কারণ কি সে বুঝিতে পারিয়াছে? প্রকৃতির শকুন্তলার সঙ্গে মিলন না ঘটা অবধি তাহার শান্তি নাই। শান্তির আশায় সে হংসপদিকাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া মরিতেছে, ঐশ্বর্য, প্রতাপ, ব্যবসা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান এবং পাণ্ডিত্য! সুখ হয় তো সে পায়, কিন্তু শান্তি পাইয়াছে কি? শান্তির অভাব আর কিছুতেই পূর্ণ করিতে পারে কি? এই মিলন না ঘটা অবধি মানুষ অসম্পূর্ণ। শান্তি যে পূর্ণতার নামান্তর! প্রকৃতি আজও তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে, মানুষ কি তাহার জন্য তপস্যায় বসিবে না? সময় কি উত্তীর্ণ হইয়া যায় নাই? প্রয়োজনের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়—প্রেমের সময় কখনো অতিক্রান্ত হয় না।

ব্যবসা বাণিজ্য

ভারতে উৎপাদিত লৌহ

শ্রীকালীচরণ ঘোষ

প্রায় শতাব্দীকাল চেষ্টা করিবার পর ভারতের লৌহ শিল্প কোনও রকমে আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখিবার উপযোগী হইয়াছে। অন্যান্য কোনও দেশই এত পুরাতন জ্ঞান ও শিল্প সৌষ্ঠব লইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠিত হইতে অনুরূপ পরিমাণ আয়াস, সময় ও অর্থ নষ্ট করিতে বাধ্য হয় নাই। ইহার কারণ সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করিয়াছি, বর্তমানে আর তাহার প্রয়োজন নাই।

ভারতীয় কারখানার প্রকৃত মূর্তি আমরা বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দেখিতে পাই। পরে অতি ধীরে ধীরে এই সকল কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে, মাঝে মাঝে সমস্ত চেষ্টা ধূলিসাৎ হইবার উপক্রম হইলেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব হইতে কতকটা নির্ভরতার সহিত বলা যায় যে, ভারতের শিল্পের ভিত্তি দৃঢ় হইয়াছে।

১৯০৪ সাল হইতে উৎখাত লৌহ প্রস্তরের পরিমাণের নিয়মিত হিসাব পাওয়া যায়, পূর্ব প্রবন্ধে তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ঐ সাল হইতেই ভারতে উৎপাদিত লৌহের নিয়মিত হিসাব রাখা হইয়াছে। তখন কাঁচা লোহা (Pig iron) ও ঢালাই (Castings) এই দুইটি নামে উৎপাদিত লৌহের হিসাব প্রকাশিত হইতে থাকে। নিজেদের কারখানায় উৎপাদিত কাঁচা লোহা হইতে ঢালাই করিয়া যে সকল দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইত, তাহারই হিসাব স্বতন্ত্র-ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

১৯০৪ সালে ভারতবর্ষে মাত্র একটি কারখানা চালু ছিল, তাহা পূর্বের বিবরণ যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারেন। বরাকরের "বেঙ্গল আয়রণ ও স্টিল কোম্পানী" লৌহ প্রস্তর হইতে কাঁচা লোহা উৎপাদন করিত এবং তাহাই ঢালাই করিয়া নানা আকার দান করিয়া বিক্রয় করিত। ঐ কারখানা ১৯০৪ সালে ৪০,৯৩৭ টন কাঁচা লোহা ও ১৪,৮৮২ টন ঢালাই মাল প্রস্তুত করে। ১৯৩০ সালে ১,০৩,৯২৯ টন কাঁচা লোহা ও ৪৩,৭০৩ টন ঢালাই মাল তৈয়ারী করিবার পর তাহাদের ব্লাস্ট ফার্ণেসের কাজ বন্ধ হইয়া যায়। ইতোপূর্বেই ১৯২৯ সালে চারটি ফার্ণেসের মধ্যে দুইটি বন্ধ হয়; ১৯৩০ সালে আরও একটি নির্বাপিত হইয়া বৎসরের শেষে সকলগুলিই অচল হইয়া পড়ে।

নিম্নের সংখ্যা তালিকায় কয়েকটি বিশিষ্ট সালে উৎপাদিত কাঁচা লোহা ও লৌহজাত প্রস্তুত দ্রব্যাদির হিসাব দেওয়া হইল:—

[বেঙ্গল আয়রণ ও স্টিল কোম্পানী কর্তৃক উৎপাদিত লৌহ]

	কাঁচা লোহা (Pig iron) টন	ঢালাই (Castings) টন
১৯০৪	৪০,৯৩৭	১৪,৮৮২
১৯০৫	৪৪,৭৬৪	১৮,৮০২
১৯১০	৩৫,৯৩৩	৭,৯৩০
১৯১৫	৮৭,২৮৫	২৫,৬৩৪
১৯২০	৯৫,৮৫৮	৩১,০৪২
১৯২৩	১,১৯,৩৭৯	৩৩,৬২৭
১৯২৪	১,৪৭,৭৩৩	২৭,০৪৫
১৯২৫	৫২,৬৭৪	৩৫,২৩৮
১৯৩০	১,০৩,৯২৯	৪৩,৭০৩

এখন হইতে ব্লাস্ট ফার্ণেস বন্ধ থাকিলেও মজুত কাঁচা লোহা হইতে ১৯৩৪ পর্যন্ত ঢালাইয়ের কাজ চলিয়াছে এবং গড়ে প্রতি বৎসর ৪৫,০০০ টন মাল উৎপাদিত হইয়াছে।

১৯১১ সালের ফেব্রুয়ারী হইতে টাটা কোম্পানী ফার্ণেসের কাজ সুরু করে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দ্রব্যাদি তৈয়ারী আরম্ভ হয়। ১৯১১ হইতে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত যে পরিমাণ কাঁচা লোহা ও লৌহজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার মোট হিসাব প্রকাশিত হয়। তাহার পর হইতে প্রত্যেক জিনিসের স্বতন্ত্র হিসাব প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৯১১ হইতে ১৯১৩ পর্যন্ত তিন বৎসরে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়াছিল:—

বিবরণ	টন
(১) কাঁচা লোহা	২,৩১,৯২৫
(২) ইস্পাতের চাই	৬৩,১৭৫
(৩) লৌহ (পেটা) খণ্ড	৫৩,০১৫
(৪) গঠনের উপযোগী কড়ি বরগা প্রভৃতি	৩৪,৩১২
(৫) ছড় প্রভৃতি	৬,৪৯১

ইহার পর ১৯১৪ হইতে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত পাঁচ বৎসরে উৎপাদিত কাঁচা লোহা ও তাহা হইতে উৎপাদিত ইস্পাত (রেল লাইন সমেত)-এর স্বতন্ত্র হিসাব পাওয়া যায়। ১৯১৪ সালে স্টিল আয়রণ ১,৬২,২৮২ টন ছিল; ১৯১৮ সালে তাহা ১,৯৮,০৬৪ টন হয়, রেল লাইন ৬৬,৬০৩ হইতে ১,৩০,০৪৩ টন হয়। একদিন যে কারখানা স্থাপিত হইবার সময় ভারত সরকার মহা সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিল, সেই কারখানার কাজ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে তাহার উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। যাঁহারা ভারতের প্রকৃত মঙ্গলকামী তাঁহারা

(1) Pig iron, (2) Steel ingots, (3) Blooms, (4) Structural materials and (5) Bars, angles, etc.

ইহাতে যে আনন্দ লাভ করিবেন তাহা নিঃসন্দেহ।

১৯১৯ সাল হইতে যত প্রকার দ্রব্যাদি টাটার কারখানায় প্রস্তুত হইয়াছে তাহার স্বতন্ত্র হিসাব প্রকাশ করা হয়। উপরে যে পাঁচ প্রকার দ্রব্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ছাড়া ফেরো-ম্যানগানিজও (ferro-manganese) প্রচুর পরিমাণে তৈয়ারী হইয়াছে। ইহা তৎপূর্বে ভারতে আর কোথাও হইত না বলিয়া লৌহ হইতে ইস্পাত করিতে বিশেষ অসুবিধা ছিল।

পিগ আয়রণ বা কাঁচা লোহা অপরাপর লোহজাত দ্রব্যের মূল এমন কি বেসেমার কনভার্টার (Bessemer Converter)-এর সাহায্যে ইস্পাত প্রস্তুত করিতেও কাঁচা লোহাই মূল বস্তু। সেই কারণে অপরাপর দ্রব্যাদির হিসাব দিয়া প্রবন্ধ ভারাক্রান্ত না করিয়া টাটার কারখানায় উৎপাদিত কাঁচা লোহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইলঃ—

[টাটা কোম্পানীর কারখানায় উৎপাদিত কাঁচা লোহার হিসাব]

সাল	টন
১৯১৯	২,০২,৩৬৮
১৯২০	২,২১,৬০৬
১৯২৫	৫,৬৩,১৬০
১৯৩০	৬,৯৫,৯২৩
১৯৩৫	৮,৯৭,৯৭৬
১৯৩৯-৪০	১১,৪০,০০০

উপরোক্ত তালিকা হইতে কারখানার কার্য পটুতা ও বিস্তারের আয়তন সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কুড়ি বৎসর পূর্বে যাহা ২,২১, ৬০৬ টন ছিল তাহা এই কয় বৎসরে পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং সুযোগ সুবিধা পাইলে আমাদের দেশীয় কারখানায় কতদূর কাজ হইতে পারে তাহার একটি ধারণা করা যাইতে পারে।

কিন্তু লৌহ শিল্পের এইখানেই শেষ নয়। ১৯২৩ সাল হইতে ভারতে আরও দুইটি নূতন কারখানায় উৎপাদিত লৌহ ভারতের বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; ইহা যে কত বড় আনন্দের কথা, তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া বলার প্রয়োজন নাই। এই কারখানা দুইটির নামঃ (১) ইণ্ডিয়ান আয়রণ এ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানী লিমিটেড ও (২) মাইশোর (বা ভদ্রাবতী) আয়রণ ওয়ার্কস।

এই দুইটি কারখানার মধ্যে প্রথমটি গোড়ার দিকে ধীরে ধীরে বেশ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়া ১৯২৯ সাল পর্যন্ত বেশ চলিতে থাকে। তাহার পর হইতে ১৯৩২ পর্যন্ত উৎপাদন অত্যধিক পরিমাণে হ্রাস পায়; ১৯৩৩ সালে উৎপাদন পুনরায় বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৩৪ সালে প্রায় ১৯২৯ সাল (৪,৫১,০৫৯ টন কাঁচা লোহা)-এর মত হয়, অর্থাৎ উৎপাদিত কাঁচা লোহার পরিমাণ ৪,২০,২৭১ টন দাঁড়ায়। নিম্নে কয়েক বৎসরের হিসাব হইতে সমস্ত অবস্থা পরিস্ফুট হইবেঃ—

[ইণ্ডিয়ান আয়রণ এ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানী কর্তৃক উৎপাদিত কাঁচা লোহা]

সাল	টন
১৯২৩	৭৭,৯৮০
১৯২৫	২,৪৭,৫০০
১৯২৯	৪,৫১,০৫৯
১৯৩১	২,৪০,২১৪
১৯৩২	১,৯৮,৭০০
১৯৩৩	২,৪৯,০৭৯
১৯৩৪	৪,২০,২৭১

১৯৩৪ সালের পর আর স্বতন্ত্র হিসাব প্রকাশিত হয় নাই, কারণ ঐ বৎসর হইতে বেঙ্গল আয়রণ এণ্ড স্টীল কোম্পানী লিমিটেড ও ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড স্টীল কোম্পানী লিমিটেড মিলিত হইয়া যায় এবং এক যোগে কাজ করিতে থাকে। ১৯৩৫ সালে উহাদের সম্মিলিত পরিমাণ ৫,৩৪,৭৩৪ টন কাঁচা লোহা ছিল; ১৯৩৭ সালে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৭,১৩,০০০ টন হইলেও ১৯৩৮ সালে মাত্র ৫,৪০,২৭৭ টন হয়।

মাইশোর আয়রণ ওয়ার্কস-এর কয়েকটি বিশেষত্ব আছে। দক্ষিণ ভারতের ইহাই একমাত্র আধুনিক লৌহ কারখানা, ইহারা লোহ প্রস্তর গলাইতে ভারতের চিরাচরিত তাপ উৎপাদক বস্তু কাঠ কয়লা ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া বাঙলা বা বিহারের কারখানার তুলনায় ইহার উৎপাদিত লোহের পরিমাণ অত্যন্ত কম।

১৯২৩ সালে ৯,৭০২ টন কাঁচা লোহা ইহার উৎপাদনের পরিমাণ ছিল; ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯২৯ সালে ২১,৪৫২ টন হয়; কিন্তু ইহার পর পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ১৯৩২ সালে ১৪,৬৮৩ টনে নামে। ১৯৩৩ সালে প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকিয়া পুনরায় বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৩৭ সালে সর্বোচ্চ পরিমাণ ২২,৮৩৭ টন হয়। কিন্তু এ সৌভাগ্য ক্ষণস্থায়ী; পর বৎসর (১৯৩৮) উহা পড়িয়া গিয়া একেবারে ১১,২৬৭ টন হইয়া যায়।

এই সকল স্বতন্ত্র হিসাব হইতে ভারতের প্রকৃত রূপ এক স্থানে জানিবার ইচ্ছা হওয়াই স্বাভাবিক। সেই কারণে যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত তিন বৎসরের হিসাব দেওয়া হইতেছে। সাধারণত ভারতের লোহের পরিমাণের হিসাব নানা অংশে বিভক্ত করা থাকে; যথা,—কাঁচা লোহা (Pig iron). ঢালাই (Castings), ইস্পাতের চাঁই (steel ingots), ইস্পাত (finished steel) আর 'মাঝামাঝি' (semis)। আমি মাত্র কাঁচা লোহা ও ইস্পাতের চাঁই (ingots) এই দুইটির হিসাব দিলাম; তাহা হইতেই পাঠক ভারতের লোহ শিল্পের প্রসারের একটি ধারণা করিয়া লইতে পারিবেন।

[ভারতে প্রস্তুত কাঁচা লোহা ও ইস্পাতের চাঁই (ingots)]

•	কাঁচা লোহা টন	ইস্পাতের চাঁই টন
১৯৩৭-৩৮	১৬,৪৪,১৫১	৯,২৯,৮০২
১৯৩৮-৩৯	১৫,৭৫,৫৬২	৯,৭৭,৩৫৮
১৯৩৯-৪০	১৮,৩৭,৬৩৬	১০,৭০,৫৩৫

সাধারণত ইহা হইতেই মনে হইতে পারে আমরা লোহ শিল্পে বহু অগ্রণী হইয়াছি, এখন আমরা আমাদের চেষ্টা কতকটা শ্লথ করিতে পারি। কিন্তু অন্যান্য দেশের সহিত তুলনা করিলে এবং নিজেদের অভাবের এমন কি প্রতি বৎসরে ব্যবহারের প্রয়োজনে আমদানীর পরিমাণের হিসাব লইলে দেখা যাইবে. আমাদের চেষ্টার গুরুত্ব যে কেবল বৃদ্ধি করিতে হইবে, তাহা নহে, তাহাকে আরও বহুমুখী করা প্রয়োজন।

যুদ্ধের পূর্বে অপরাপর কয়েকটি দেশের লোহ ইস্পাতের হিসাব, তুলনামূলকভাবে দিয়াছিলাম, তাহা হইতে প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারা যাইবে।

[বিভিন্ন দেশে উৎপাদিত কাঁচা লোহা (Pig iron)-এর পরিমাণ]

দেশ	লক্ষ টন ১৯৪০	লক্ষ টন ১৯৪৩
আমেরিকা	৪,৩০	৫,৬৯
জার্মানী	২,০০	—
সোভিয়েট ইউনিয়ন	১,৫০	—
ইউনাইটেড কিংডম	৭০	৭৩
ফ্রান্স	৬৫	—
বেলজিয়ম	৩১	—

এই সকল দেশের সহিত তুলনা করিলে ভারতবর্ষের গোরব করিবার কিছুই থাকে না; উপরন্তু যুদ্ধের পূর্বে লুক্সেম্বুর্গ, চেকোশ্লোভাকিয়া, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে যে পরিমাণ পিগ আয়রণ উৎপাদিত হইত তাহার সহিত ভারতবর্ষের তুলনা করা চলে। যুদ্ধের সুযোগে অস্ট্রেলিয়া যে স্থান অধিকার করিতেছে, ভারতবর্ষ তাহা হইতে এখন অনেক পিছাইয়া পড়িয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন। যে সকল দেশের উৎপাদিত কাঁচা লোহের পরিমাণ উল্লেখ করা হইয়াছে, ভারতের তুলনায় উহাদের লোক সংখ্যা নিতান্ত কম। সুতরাং ঐ সকল দেশ আপনাদের প্রয়োজনে যৎকিঞ্চিৎ রাখিয়া সমস্ত বিদেশে রপ্তানী করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে। আর আমাদের মত অভাগা দেশ সেই অর্থ সরবরাহ করিয়া থাকে।

দেশের মধ্যে অবস্থিত লৌহ শিল্পের যে পরিচয় দেওয়া হইল, তাহা প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নহে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। বিদেশ হইতে যখন নানা আকারে মাল আসিতে লাগিল, তাহাতে "ভারত" গভর্নমেণ্টের আনন্দই হইয়াছে, কারণ ইহার অধিকাংশই ইংরেজ সরবরাহ করিয়াছে। কিন্তু ভারতের স্বার্থে তাহার এ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া একান্ত প্রয়োজন ছিল। তাহা সে করে নাই; হয়ত তাহার অজুহাত ছিল যে এ সকল বে-সরকারী বাণিজ্যে তাহার পক্ষে হস্তক্ষেপ করা যুক্তিযুক্ত নয়। কিন্তু একটা বিষয়ে ভারত সরকার একমাত্র ক্রেতা এবং তাহাতে কয়েক কোটি টাকার মাল ইংলণ্ডের কারখানায় তৈয়ারী করাইয়া ভারত সরকার ক্রয় করিয়াছে। বে-সরকারী ইংরেজ দল যখন রেল পাতিবার নামে প্রকারান্তরে ভারতের অর্থের অকথ্য অপচয় করিল, তখন ভারত সরকারের মত নির্লজ্জ গভর্নমেণ্টও নিজেদের হাতে রেল বিস্তারের ভার গ্রহণ না করিয়া পারে নাই; সেই সময় অবশ্য সকল কোম্পানী গভর্নমেণ্ট ক্রয় করে নাই, কিন্তু যতটা ভার হাতে আসিয়া পড়িল তাহাও নিতান্ত মন্দ নহে।

এতদবস্থায় গভর্নমেণ্টের উচিৎ ছিল নিজেদের কারখানা স্থাপন করিয়া লৌহ উৎপাদন করা এবং তাহা হইতে রেলের প্রয়োজনীয় মাল নির্মাণ করিয়া লওয়া। তখনকার দিনে গভর্নমেণ্টের পক্ষে এই সাম্যবাদের ভিত্তিতে কারখানা স্থাপন করার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ ছিল, কারণ তাহাতে অপরের অর্থাৎ লৌহ শিল্প সম্পর্কিত ব্যক্তি বা কোম্পানী বিশেষের ক্ষতি হইত এবং গভর্নমেণ্টের পক্ষে এই জাতীয় শিল্পপ্রসারের পক্ষে অহেতুক বাধা দান করার আপত্তি উঠিতে পারিত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট লবণ বা বনবিভাগের ন্যায় কোনও বিভাগ সৃষ্টি করিয়া এ কার্যের ভার গ্রহণ করিলে দেশে লৌহশিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইত এবং বহু অর্থের অপচয় হইতে দেশ রক্ষা পাইত এবং দেশের বহু লোক অন্নের সংস্থান করিবার সুযোগ পাইয়া বাঁচিয়া যাইত। কিন্তু এ সকল কথায় মনোযোগ দিবার লোক ছিল না; তখন একমাত্র চেষ্টা কিভাবে ভারতবর্ষকে শোষণ করিয়া ইংলণ্ডকে ধনী করা যায় তাহাতে ভারতবর্ষের ক্ষতি বৃদ্ধিতে "ভারত সরকারের" কিছুই করিবার ছিল না। ভ্যালেণ্টাইন বল ভারতীয় ভূতত্ত্ব বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন; এই দারুণ অবিচার তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। তিনি এ বিষয়ে লিখিয়াছেনঃ—

"It seems to be not improbable that had the Government started the manufacture of iron on an extended scale at the time of the opening up of the railways, great benefit would have accrued to the States that it would have been possible, politically speaking, for any government to have done so continuously may be doubted, owing to the opposite interests involved; but had there been a department of the State, similar in its organisation to the Forest or Salt departments, it is almost certain that the effect of establishing factories for iron manufacture throughout India would have been to keep vast sums of money in circulation in the country, and to have given employment to large number of peoples who now crowd the land."

V. Ball: Economic Geology of India, Pt. III p. 345.

ইন্দোনেশিয়ার মুক্তি সংগ্রাম

শ্রীবিমল ঘোষ

ইন্দোনেশিয়ার মুক্তি-সংগ্রাম ও বিপ্লবের খবর কাগজে আপনারা পড়ছেন; কিন্তু সেখানকার অবস্থা ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক খবরই আপনারা জানেন না—তারই কিছুটা খবর আপনাদের জন্য সংগ্রহ করে পরিবেশন করছি। ইন্দোনেশিয়ানদের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা বর্তমান ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীন গণতান্ত্রিক গভর্নমেণ্টের স্রষ্টা যিনি,—তাঁর পুরো নাম হচ্ছে ডক্টর আই আর সোয়েকার্নো। আসলে ইনি একজন ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন এবং জাভা জাপানীদের অধিকারে যাওয়ার পর থেকে ইনি বরাবরই ব্যাটাভিয়ায় বাস করছেন। ইনি যে প্রাসাদে থাকেন, সেটির মালিক ছিল ডাচেরা। তবে জাপানীরা ইন্দোনেশিয়ানদের 'স্বাধীনতা' স্বীকার করে নেওয়ার ফলে এটি ইন্দোনেশিয়ানরা অধিকার করে নিয়ে সোয়েকার্নোকে সেটি থাকবার জন্য দিয়েছে। তাঁর এই আবাসটি একটি প্রাসাদ বললেই চলে। চারধারে জাপানী সাজসজ্জা ও ছবি দিয়ে সুন্দর করে সাজানো। সোয়েকার্নো ৪৪ বছর বয়সের বিজ্ঞ লোক, সুন্দর চেহারা—সুগঠিত দেহটি তাঁর অধিকাংশ সময় সাদা সুতী পোষাকে ঢাকা থাকে—মাথায় থাকে তাঁর মুসলমানী কালো টুপী। চমৎকার ইংরাজি ভাষায় ইউরোপীয়ানদের মতই গড় গড় করে কথা বলেন—যদিও তিনি কখনও এশিয়া ছেড়ে ইউরোপে যাননি। দু'বার বিবাহ করেছিলেন—এখন দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীই তাঁর সঙ্গে থাকেন। স্ত্রী নাকি জাভার একজন সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী। এঁদের একটিমাত্র শিশুসন্তান—তার বয়স মাত্র দশ মাস।

ডক্টর সোয়েকার্নো পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা ও বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে সব সময়ে ওয়াকিবহাল থাকেন। আটলাণ্টিক সনদের প্রতিটি লাইন তাঁর কণ্ঠস্থ এবং তিনি সেই সনদকে ভিত্তি করেই ইন্দোনেশিয়ার বর্তমান স্বাধীনতা আন্দোলনের স্লোগ্যানগুলি তৈরী করেছেন—জাভার দেওয়ালে, প্রাচীরে চারিধারে পোস্টার মারা হয়েছে। এইসব স্লোগ্যান বড় বড় অক্ষরে লেখা হয়েছে।

(1) "That any nation has an absolute right to maintain their national independence."

(যে কোনও জাতিরই অবাধ অধিকার আছে—তাদের জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার।)

(2) "Our government is a government from the people, for the people and by the people"

(আমাদের গভর্নমেণ্ট—জনগণের গঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থা জনগণের জন্যই—জনগণের দ্বারা পরিচালিত।)

(3) "What is good for the British Labour party is good for us, too."

("বৃটিশ শ্রমিকদলের জন্য যা ভালো—আমাদেরও জন্য সেই ব্যবস্থাই ভালো।")

(4) "Hands off Indonesia, Respect our constitution, Down with Imperialism."

(ইন্দোনেশিয়া থেকে হাত গুটাও—আমাদের শাসনতন্ত্রকে মেনে নাও, রাজতন্ত্র ধ্বংস হউক।)

(5) "Indonesia for Indonesians' Hospitality to any body who respects our constitution."

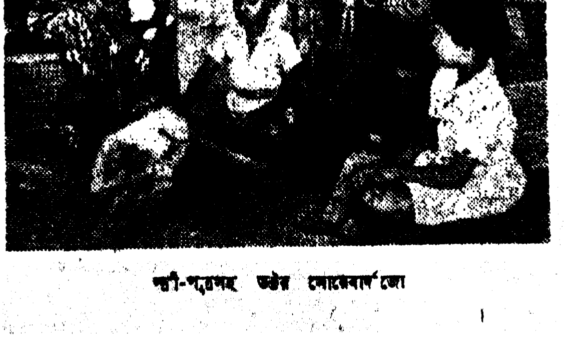
(ইন্দোনেশিয়া ইন্দোনেশিয়াবাসীর। আমাদের স্বাধীন শাসনতন্ত্রকে যে কেউ মেনে নেবে—সেই আমাদের আতিথেয়তা পাবে।)

প্রেসিডেণ্ট সোয়েকার্নোর তৈরী সবচেয়ে জোরালো স্লোগ্যান হলো—
"Better to the Hell than to be colonized again."
—(আবার ঔপনিবেশিক প্রজা হওয়ার চেয়ে নরকে যাওয়া ঢের ভালো।)

ডক্টর সোয়েকার্নো যখন জনসাধারণের সামনে আসেন, তখনই তিনি ফ্যাসিস্ট পদ্ধতিতে অভিবাদন করেন—তবে তাঁর আদর্শ এমন এক 'গণতন্ত্র'—যার ভিত্তি হবে জাতীয়তা, ঈশ্বরে বিশ্বাস ও সামাজিক নিরাপত্তা।

সোয়েকার্নোর সহযোগী নায়ক হিসাবে আরও কয়েকজন ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীন গভর্নমেণ্টকে পরিচালিত করছেন—তার মধ্যে বৈদেশিক সচিব ডক্টর সোয়েবার্দজো, ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ডক্টর হাট্টা ও রাষ্ট্র-মন্ত্রী ডক্টর প্রিংগোদিদগো স্বাধীনতাকামী সমস্ত ইন্দোনেশিয়াবাসীর কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়।

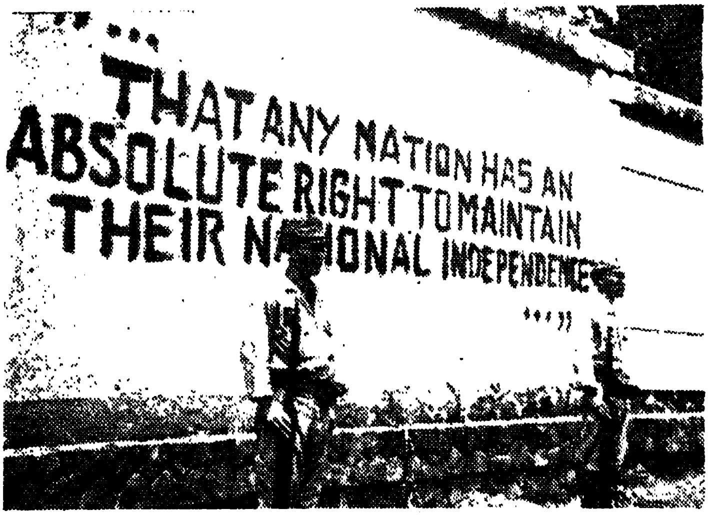
ডক্টর সোয়েবার্দজোর প্রভাব জাভার আদিবাসীদের ওপরই বেশী, তিনিই তাঁদের নেতৃত্ব করেন। আদিবাসীদের এই নেতার কিন্তু চালচলন একেবারে তাঁর দেশের আদিবাসীদের চালচলনের উল্টো। তিনি বহু



স্ত্রী-পুত্রসহ ডক্টর সোয়েবার্দজো



ডক্টর সোয়েকার্নো, তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ও শিশুপুত্র



ইন্দোনেশিয়ার এক দেওয়ালে স্বাধীনতাকামীরা বড় বড় অক্ষরে শ্লোগান লিখেছে।

বছর ইউরোপে কাটিয়ে এসেছেন—পরিষ্কার ইংরাজি কথা বলেন। ডক্টর সোয়েবার্দজো দোহারা চেহারার বেঁটে মানুষ—স্বভাবটি ভারী নরম—মুখে হাসি লেগেই আছে; তবে তাঁর দেশের স্বাধীনতার দাবীকে তিনি দৃঢ়মনে ঘোষণা করেন সব সময়েই। কিছুদিন আগে এক ইংরাজ সংবাদপত্র প্রতিনিধি তাঁর সঙ্গে দেখা করেন—তখন তিনি তাঁর কাছে পরিষ্কারভাবে বলেন যে, কোন অবস্থাতেই তাঁর গভর্নমেণ্ট আর ডাচ শাসনের অধীনতা সহ্য করবে না, কিন্তু তাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, মিত্রপক্ষের শত্রু অধিকারের কাজেও ততদিন কোন বাধার সৃষ্টি করবে না, যতদিন পর্যন্ত না ডাচরা আবার তাদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চায়। ভারতের আদর্শে তাঁরা সত্যাগ্রহ করবেন; কিন্তু সে কথাকে ইংরাজ প্রতিনিধি সত্য বলে স্বীকার করেন নি, কারণ ডক্টর সোয়েবার্দজো ইংরাজ সংবাদপত্র প্রতিনিধিটিকে একথাও জানিয়েছেন যে, জাপানীরা ৩ লক্ষ ইন্দোনেশিয়ান সৈন্যকে যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত, যুদ্ধসাজে সুসজ্জিত করে দিয়েছিল। স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ান বাহিনীর একাংশকে যদিও নিরস্ত্র করা হয়েছিল, তবুও ৪০ হাজার সৈন্য এখনও অস্ত্রত্যাগ করেনি। ইংরাজ প্রতিনিধি ডক্টর সোয়েবার্দজোকে সন্দেহের চক্ষে দেখেছেন—কিন্তু আপনারা জেনে রাখুন, ডক্টর সোয়েবার্দজো গান্ধীজীর মতবাদকে মন দিয়ে মানেন। সোয়েবার্দজোর দুটি ছেলে একটি মেয়ে।

ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীন গভর্নমেণ্টের যে সৈন্যবাহিনী আজ সংগ্রাম করছে, তারা সবাই সুদক্ষ যোদ্ধা হয়ে উঠেছে এবং প্রত্যেকেই দেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। এই স্বাধীন ইন্দোনেশিয়া সৈন্যবাহিনীর লাল-সাদা পতাকা সমস্ত জাভা দ্বীপে উড়ছে। পতাকাটি ভারতের জাতীয় পতাকার মতই—তবে তিনটি রঙের পরিবর্তে লাল ও সাদা কাপড় জুড়ে তৈরী। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীন গণতান্ত্রিক গভর্নমেণ্টের প্রতীক হিসাবে এই পতাকা প্রতিটি প্রত্যূষে ও সন্ধ্যায় সাড়ম্বর অনুষ্ঠান করে উঠানো ও নামানো হয় এবং রাষ্ট্রের কেন্দ্রে এই পতাকা উঠানো ও নামানোর অনুষ্ঠানে প্রায় প্রতিদিনই ডক্টর সোয়েকার্নো উপস্থিত থেকে পতাকা অভিবাদন করেন।

মুক্তিকামী এশিয়াবাসীমাত্রেই কামনা করে, ইন্দোনেশিয়ার এই সংগ্রামের জয় হোক্ এবং সেই সঙ্গে এশিয়ার সকল পরাধীন জাতির বন্ধন মুক্ত হউক।



ডক্টর সোয়েকার্নো স্বাধীন ইন্দোনেশিয়ার লাল-সাদা পতাকা অভিবাদন করছেন।



হবি ও সমিধ

শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়

ভারতবিখ্যাত দেশকর্মী মহীতোষ ঘটকের নাম আপনারা সকলেই জানেন। আমিই শ্রীমহীতোষ ঘটক। বলিতে সংকোচ বোধ করিতেছি যে, এক সময়ে দেশের কোন খবরই আমি রাখিতাম না। আমাদের পরিবারে খাওয়া, শোওয়া, টাকা-রোজগার আর রোজগারের জন্য পরীক্ষা পাশের পড়া—এ ছাড়া অন্য কোন পাঠই ছিল না।

যে ঘটনা আমাকে দেশ চিনাইল, তাহাই বলিতেছি। ১৯৩০ খৃস্টাব্দে আমি তখন বি এস-সি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছি। মহাত্মাজীর আইন অমান্য আন্দোলনে তখন 'সারাভারত উথল' যাইতেছে। খবর রাখিবার আগ্রহ না থাকিলেও খবর তখন আপনি কানে আসিতেছে। শহরের উপকণ্ঠে আমাদের গ্রামটি পুলিশের গুপ্তচর বিভাগের লোকে ভরিয়া উঠিল।

মজা এই যে, সেই গুপ্তচররা নিজেদের ক্রিয়াকলাপে সব সময়েই নিজেদের প্রকাশ করিয়া রাখিতেই ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহাদের চালে বোলে সকল সময়েই তাঁহারা প্রচার করিতে চাহিতেন যে, সরকারী চণ্ড ক্ষমতার ভীম বিভীষণতার অধিকারী হইয়া তাঁহারা আমাদের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন, ইচ্ছামাত্রই আমাদের যে কাহাকেও তাঁহারা জেলে পুরিতে তো পারেনই, ফাঁসিকাঠে ঝুলাইতে পারাও শক্ত কিছু নহে, সুতরাং আমরা যেন তাঁহাদের ভয় করিয়া চলি।

বলা বাহুল্য, সকলে তাঁহাদের ভয় করিয়াই চলিত। গ্রামে বিপ্লবী দলের দুইটি যুবক আসিয়া আশ্রয় নিয়াছিল, গুপ্তচর মহাশয়দের আবির্ভাবে তাহারা পলাইয়া গেল; গুপ্তচররা গুপ্ত থাকিবার প্রয়াস করিলে তাহারা ধরা পড়িত। যুবক দুইটি প্রতি কথাতেই পুলিশের লোককে 'বন্ধু' বলিয়া ইঙ্গিত করিত বুঝি এইজন্যই। চা দোকানগুলিতে গুপ্তচররা যখন তখন দুইয়ে তিনে মিলিয়া আড্ডা মারিতেন এবং ধারে চা ও নানাবিধ খাদ্য ভক্ষণ করিতেন, কিন্তু সেই ধার আর কখনও শোধ করিতেন না। দোকানীরা ধারে জিনিস দিতে কখনও 'না' বলিতে পারিত না—যদি জেলে পুরিয়া দেয়।

শনিগ্রহের এই চেলাদের লোলুপ দৃষ্টি গ্রামের কয়টি অবিবাহিতা তরুণীর উপরও পড়িয়াছিল। একটির কথাই বলি।—পাড়ার নিধু ছেলেটি গরীব বাপের একমাত্র পুত্র, প্রাণপণে সে লেখাপড়া করিতেছিল, ম্যাট্রিকটা পাশ করিতে পারিলেই একটা চাকরি নিয়া বাপের দুঃখ ঘুচাইবে। তাহার বোন রেণু বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিয়াছে। সুন্দরী সেই মেয়েটির উপর শীতল নামক এক গুপ্তচর যুবকের দৃষ্টি পড়িল। নিধুর স্বভাবভীরু পিতার সহিত এবং ক্রমে মাতার সহিত সে আলাপ জমাইয়া তুলিল এবং তাঁহাদের জানাইল যে, নিধুর উপর পুলিশের দৃষ্টিটা একটু অপ্রসন্ন। নিধুর পিতামাতা ভয়ে কাতর হইয়া শীতলের শরণ লইলেন, সেই সুযোগে রেণুর সহিত শীতল সম্বন্ধ ঘনাইয়া তুলিল।

কয়েক মাস পরে শীতলদের সকল খবরের মতো এ সত্যও অপ্রকাশ রহিল না যে, রেণুর দেহে আসন্ন জননীত্ব সূচিত হইয়াছে। গতিক দেখিয়া শীতল অন্য কেন্দ্রে বদলি হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইহাতে সারা গ্রাম উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তরুণী কন্যার উপলক্ষ্যে যে যে পরিবারে গুপ্তচর প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাঁহারা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। দিবালোকে গ্রামের পথে শীতল দুর্লভ হইয়া উঠিল, কিন্তু একদা রাতের অন্ধকারে একা শীতল একাকী আমার সামনে পড়িয়া গেল। উত্তেজনাবশে যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিয়া তাহাকে গালি দিলাম এবং শাসাইয়া দিলাম যে, রেণুকে সে যদি বিবাহ না করে, তবে আমরা সরকারের স্বারস্থ হইতে বাধ্য হইব।

অবিলম্বে সরকারের স্বারস্থ হইলে ফল কী হইত জানি না, কিন্তু রেণুর তথা একটি ভদ্র পরিবারের মুখ চাহিয়া ব্যাপারটা গোপন রাখিবার চেষ্টা হইতেছিল বলিয়া সরকারী সাহায্য প্রার্থনা করা হয় নাই।

শীতল কিন্তু তাহার ক্ষমতা প্রদর্শনে বিলম্ব করিল না। কয়েকদিন পরে একদিন রাত তখন নয়টা হইবে, আমি বাড়ির ভিতর খাইতে বসিয়াছি, এমন সময় পুলিশ আসিয়া বাড়িতে হানা দিল। সারাটি বাড়ি ত্রাসে একেবারে দমবন্ধ হইয়া রহিল। আহার অসমাপ্ত রাখিয়াই সকলে উঠিয়া পড়িলাম।

কয়েকজন কনেস্টবল ও একজন হাবিলদার সঙ্গে করিয়া থানার ছোট দারোগা আসিয়াছেন। খানাতল্লাসীর নামে সানুচর তিনি আমাদের বাড়ির সকল ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র তন্তনন্ত করিলেন। আমার শয়নের এবং পাঠের ব্যবস্থা ছিল বাহিরের ঘরে। সে ঘর তল্লাসী করিয়া কোণের দিকের সর্বোচ্চ তাক হইতে নিষিদ্ধ ইস্তাহারের একটি পুলিন্দা বাহির করিয়া আমাদের সকলকে তাঁহারা তাক লাগাইয়া দিলেন। অসতর্কতাবশে বাহিরের ঘর অনেক সময়ই খোলা থাকিত, প্রতিশোধ গ্রহণে শীতল যে তাহারই সুযোগ লইবে কে জানিত।

আমি বন্দী হইয়া হাজতে চলিলাম। যাইবার সময় দেখিলাম, আমাদের বাড়ির বিপরীত দিকে আলোক স্তম্ভের নিচে দাঁড়াইয়া শীতল ও তাহার দুইজন সমবয়সী সহকর্মী মুখ টিপিয়া হাসিতেছে।

কয়েকদিন হাজতবাসের পরে আমি মহকুমার বিচারালয়ে নীত হইলাম। সেখানে আমার বন্দী হওয়ার আসল কারণ—শীতলের কীর্তিকাহিনীও বলিলাম, বিচারপতি তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। যে ইস্তাহারে কী মুদ্রিত ছিল আজ পর্যন্ত আমি তাহার বিন্দুবিসর্গও জানি না, তাহাই ঘরে রাখিবার এবং বিলি করিবার এবং দেওয়ালে থামে আঁটিবার অপরাধে ছাত্র বিধায় এবং প্রথম অপরাধ বলিয়া কম করিয়া আমার প্রতি ছয় মাসের কারাবাসের আদেশ হইল।

কারাগারে অনেক সত্যকার দেশকর্মীর সংস্রব পাইলাম। সেখানেই আমি দেশ চিনিলাম। আমার রাজনীতি জ্ঞানের সেই শিক্ষা মন্দিরকে চিরজীবন আমি শ্রদ্ধান্বিত অন্তরে স্মরণ করিব, সে আমার শিক্ষাতীর্থ—নবজন্মতীর্থ।

ছয় মাস পরে কারাগার হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম, গ্রামের তরুণ সম্প্রদায় আমাকে বরণ করিয়া লইতে আসিয়াছে। অযোগ্যের প্রতি তাহাদের সেই সম্মান বর্ষণে সংকোচবোধ করিলাম, কিন্তু সংকোচ কাটাইয়া তাহাদের সম্মানের মাল্য আমি শির পাতিয়া কণ্ঠ ভরিয়া গ্রহণ করিলাম, সে সম্মানের মানরক্ষার জন্য আমার বাকি জীবন উৎসর্গ করিলাম।

লেখাপড়ার সেখানেই ইতি হইল। পিতা-মাতা তাহাতে অসন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহাদের বলিলাম, আমার ছোট ভাইরা তোমাদের সেবার জন্য রহিল, আমি মাটিজননীর—জনজননীর—দেশজননীর সেবায় চলিলাম।

শীতল সম্বন্ধে খবর পাওয়া গেল, ছোট দারোগার প্রচেষ্টায় রেণুকে সে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছে। ছোট দারোগার প্রতি আমি শ্রদ্ধান্বিত হইলাম। শীতলের উদ্দেশে আমি চিরকাল নমস্কার জানাইব—শীতল আমাকে দেশজননীর পূজাদেউলের পথে টানিয়া আনিয়াছে।

এমনি করিয়া এই শীতল এবং তাহার পুলিশ বিভাগ সারা দেশ জুড়িয়া কত যে দেশকর্মীর সৃষ্টি করিয়াছে তাহার সংখ্যা নিরূপণ অসম্ভব। সুতরাং আমার মত দাঁড়াইয়াছে এই যে, এদেশের পুলিশ এদেশের স্বরাজ্যসাধনার পরমসহায়ক।

সেই উনিশশো তিরিশের পর হইতে আজ পর্যন্ত কালের মধ্যে আট বৎসর আমার কারাগারে কাটিয়াছে—সে পুলিশেরই কৃপায়। প্রতিবার জেলে গিয়া নূতন উদ্দীপনায়

সজীব হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছি। সেই প্রেরণায় কাজ করিয়া চলিয়াছি, দেশময় আজ আমার যশ, একদিন হয়তো দেশ আমাকে নেতৃরূপে বরণ করিবে। সেদিনও আমি পুলিশকে নমস্কার জানাইব।

ঊনিশশো বিয়াল্লিশে অগস্ট্ বিপ্লবের কালে যে জেলে গেলাম, সেখানেই এককালের বিখ্যাত দেশসেবী নরেনদার সঙ্গে আমার পরিচয়। এ তিন বছর জেলে থাকাকালে বাড়িতে তাঁহার রোগশয্যাশায়িনী বৃদ্ধা মাতা বিনা চিকিৎসায় মারা গিয়াছেন, পঞ্চাশের মন্বন্তরে ছেলেটি আর মেয়ে দুইটি অনাহারে মরিয়াছে; স্ত্রী ক্ষয়রোগের গ্রাসে পড়িয়া পিত্রালয়ে আশ্রয় নিয়াছিলেন।

সেদিন শহরে নির্বাচনী সভায় দেখিলাম নরেনদা বক্তৃতার আগুন ছড়াইতেছেন। সভার শেষে তাঁহাকে নমস্কার জানাইয়া তাঁহার স্ত্রীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম। জানাইলেন, সতীলক্ষ্মী মাসখানেক আগে পতির চরণে মাথা রাখিয়া বাঞ্ছিত ধামে চলিয়া গিয়াছেন।

উজ্জ্বল মুখে গভীর কণ্ঠে নরেনদা বলিলেন, ভাই, দেশজননীর সেবক সন্তান হইয়া বিবাহ করিয়া সন্তানধর্ম জলাঞ্জলি দিয়াছিলাম। পরিবার পোষণে জীবন নিয়োজিত হইয়া গিয়াছিল, দেশের কথা বুঝি ভুলিয়াছিলাম। আজ সকল বন্ধন কাটিয়াছে, মুক্তপুরুষ হইয়া মায়ের ছেলে আজ আবার মায়ের কোলে ফিরিয়া আসিয়াছি। আবার আজ বুক ফুলাইয়া গাহিতে পারিতেছি 'ভয় কি মরণে!'

মাতৃপূজা-বিস্মরী মায়ের বিস্মৃত সন্তানকে কে আবার মায়ের কোলে ফিরাইয়া দিল? দিল পুলিশ। অগস্ট বিপ্লবের বহু পূর্বেই নরেনদা নিভিয়া গিয়াছিলেন এবং পরিবার পোষণ চিন্তায় ভারগ্রস্ত সেই ভদ্রলোক অগস্ট বিপ্লবের খবরই রাখিতেছিলেন কিনা কে বলিবে? কিন্তু পুলিশ তাঁহাকে ভুলে নাই; সঞ্জীবনী-গারদে পুরিয়া পুলিশ তাঁহাকে আবার বাঁচাইয়া তুলিয়াছে; রক্তহৃদয়ের কুসুমে অঞ্জলি ভরিয়া নরেনদা আবার বন্দী জননীর বেদীতলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আজ পুলিসের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাইবার তাঁহার ভাষা নাই।

দেশের নেতৃগণকে ধরিয়া পুলিস বারবার জেলে পাঠাইতেছে। কারাজীবনের আগুনে পানমরা খাদ পুড়িয়া পুড়িয়া তাঁহাদের মধ্যেকার খাঁটি সোনাটুকু অবশেষ থাকিতেছে। কারাবন্ধনের বাহিরে আসিয়া যখন তাঁহারা দাঁড়াইতেছেন, খাঁটি সোনার ভাস্বরতায় লজ্জা পাইয়া দেশজননীর বন্ধন-শৃঙ্খলের মেকি ধাতু গলিয়া গলিয়া শিথিল হইতেছে।

অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, অগস্ট বিপ্লবের আগে ভারতীয় জাতীয় মহাসভায় যেন নিষ্প্রাণতার সুর বাজিতেছিল, অগস্ট বিপ্লবে যেন তাহারই বিশৃঙ্খলার আভাস পাওয়া গিয়াছে। তিন বৎসর পুলিসের স্বর্ণায়নশালার আগুনে পুড়িয়া এমন খাঁটি সোনা হইয়া কংগ্রেস বাহির হইয়া আসিল যে, তাহার প্রদীপ্তিতে আজ দেশের আকাশে বাতাসে আগুন ধরিয়া গেল।

একুশে নবেম্বর নিরপরাধ নিরস্ত্র ছাত্র শোভাযাত্রার উপর গুলী চালাইয়া পুলিস এদেশের মুক্তিসাধনায় যে মিত্রতা করিল তাহার বুঝি তুলনা হয় না। দেশের অন্তরে অন্তরে এমন একটা আশঙ্কা ছিল যে, সাম্প্রদায়িক আর দলগত বিভেদচেষ্টা বুঝি বা মুক্তি সাধনাকে ব্যাহত করিবে, কিন্তু একুশে নবেম্বরের পুলিসি কৃতিত্বে দেশ দেখিতে পাইল, যুবশক্তির মর্মস্থলে ভেদ-নীতির কোন স্থান নাই। সাম্রাজ্যবাদী শাসক দেখিয়া কাঁপিয়া উঠিল যে, ভেদ-নীতির প্রশ্রয়দান বিফল হইতেছে। জগৎ দেখিয়া শিক্ষা পাইল যে, বন্দীদেশের প্রাণে যখন মুক্তিবাঞ্ছার মাতন জাগে, ক্ষুদ্র স্বার্থের হানাহানি রত সকল দলের সকল সম্প্রদায়ের সমস্ত পতাকা তখন পাশাপাশি এক ঠাঁই আকাশে মাথা তুলিয়া সম্মিলিত পত্ পত্ শব্দে ডাকিয়া উঠে, ভেদ নাই ভেদ নাই—মুক্তি চাই মুক্তি চাই।

সুতরাং, অধীন ভারতের পক্ষ হইতে আমি জানাইতেছি, হে পুলিস, বন্দী ভারত তার মুক্তিসাধনায় সহায়তার জন্য তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছে। দেশের মুক্তি-যজ্ঞের আকাশচুম্বী অগ্নিমণ্ডলের এপাশে দাঁড়াইয়া আমি আগুনের মধ্যে ঢালিতেছি রক্ত, তুমি মারিতেছ লাঠি। আগুনের জ্বলিবার পক্ষে উভয়েরই প্রয়োজন সমান। আমার রক্ত সেখানে হবি হইয়া দগ্ধ হইতেছে আর তোমার লাঠি সমিধ হইয়া জ্বলিতেছে। আগুন জ্বালাইতে হবির চেয়ে সমিধের প্রয়োজন অল্প নয়। ভারতের মুক্তি লাভের দিন পর্যন্ত তোমার সহায়দানে মুক্তি-যজ্ঞের অনল অনির্বাণ রাখিও, বন্ধু!

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞান অর্জনের জন্য একদল পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধি নাকি অচিরেই ভারতে আসিতেছেন। এতদিনেও যাঁরা ভারত সম্বন্ধে কোন জ্ঞান অর্জন করিতে পারেন নাই, তাঁরা যে এদেশে আসিলেই রাতারাতি এ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করিবেন সে সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ



আছে। তবে একান্তই যদি আসিতে চান, তাহা হইলে তাঁরা যেন শীতের মরসুমটাতেই আসেন। এই সময় খাওয়া-দাওয়াটা একটু ভাল হয়, তাছাড়া King's Cup, viceroy's Cup এবং নানারকম সার্কাস পার্টির খেলা এই সময়েই জমিয়া উঠে।

* * * *

প্রসংগত পণ্ডিত জওহরলালের বিবৃতিটি মনে পড়িয়া গেল। তিনি বলিয়াছেন যে, বৃটিশ সরকার শীঘ্রই ভারত ত্যাগ করিয়া যাইবেন, তবে ঠিক কোন্ তারিখে



কখন যাত্রা করিবেন, আপাতত বলা শক্ত। জওহরলাল "পণ্ডিত" ব্যক্তি বলিয়াই হয়ত পাঁজী-পুঁথি ঘাঁটিয়া যাত্রার দিনক্ষণ দেখিতেছেন। বিশু খুড়ো বলেন—আপাতত



ভাল দিন না পাওয়া গেলে—মঙ্গলে ঊষা, বুধে পা দেওয়ার ব্যবস্থাও চলিতে পারে!

* * * * *

স্টক এক্সচেঞ্জের বক্তৃতায় জওহরলাল বলিয়াছেন যে, এখানে জুয়া খেলা হয় তা তিনি জানেন। তিনি নিজেও জুয়া খেলেন, তবে এখানে নয় অন্যত্র। আমরা নির্বাক হইয়া পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিলে বিশু খুড়ো বলিলেন—বিগত আটতারিখ শনিবার কলিকাতার ঘোড়দৌড়ের মাঠে এতদিনের অপরাজেয় ঘোড়া "Illussion" মার খাইয়াছে, ঠিক সেই দিনেই দেশপ্রিয় পার্কের মাঠে সাম্রাজ্যবাদের অপরাজেয় শক্তি সম্বন্ধে Illussion অনেকের মন হইতেই ঘুচিয়া গিয়াছে। জওহরলাল সেই মাঠেই জুয়া খেলিয়াছেন। খুড়োর কথাটা খুব স্পষ্ট হইল না, তবু সমস্বরে বলিয়া উঠিলাম 'জয় হিন্দ'।

* * * *

বড়লাট বাহাদুর তাঁর বণিক সভার বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, "ভারত ছাড়ো" বুলি আলিবাবার "চিচিং-ফাঁকের" মত দরজা খোলার কাজে লাগিবে না। উপমাটা শুনিয়া প্রথমটায় মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল—আলিবাবার গল্পে বর্ণিত গহবরে যারা ধনরত্ন জড় করিয়া রাখিয়া দরজা বন্ধ করিয়া রাখিতেন, তাদের সংগে কি তবে বৃটিশ সরকারের··কিন্তু নিশ্চয়ই নয়, নিশ্চয়ই লাট সাহেব উপমাটা দেওয়ার সময় সবটা গল্প মনে করিতে পারেন নাই।

* * * * *

বাঙলার ভাবী গভর্নর মিঃ বারোজকে যখন বলা হইল যে বাঙলায় গেলে তাঁহাকে প্রতিদিন সকালে মাথা মাটিতে ঠেকাইয়া এবং পা উপরে তুলিয়া "যোগ" সাধন করিতে হইবে তখন তিনি নাকি সেই কথার উত্তরে বলিয়াছেন যে, বাঙলায় আসিয়া নিশ্চয়ই তিনি যোগাভ্যাস করিবেন। যোগ মার্গে তিনি কতটা অগ্রসর হইতে পারিবেন বুঝিতেছি না, তবে এই কথাটা বেশ ভাল করিয়াই বুঝিলাম যে পার্থিব সুখ দুঃখের কাহিনীতে বিচলিত না হইবার মত সাধনায় সিদ্ধি লাভ তাঁর হইবে।

* * * *

বিলাতের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল বলিয়াছেন—"I only remain in politics because I think it is my duty to try and prevent the great position which we have won in the war being cast away by folly and worse than folly on the morrow of our victory.

কিন্তু মিঃ চার্চিল নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, শ্রমিক সরকার তত বড় গর্দভ নহেন।



আর কিছু করিতে না পারিলেও মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলার বুদ্ধি তাঁরা রাখেন।

* * * * *

ফজলুল হক সাহেব একটি বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, লীগপন্থীরা শুধু যে কালো পতাকা লইয়া নির্বাচন কর্মীদের বাধা দিয়াছে তা নয়, তারা লাঠি এবং 'রামদাও' লইয়াও তাড়া করিয়াছে। আমরা বলি লাঠি পর্যন্ত উঠিলেই ভাল হইত, "রাম নাম" সংযুক্ত 'দা' ব্যবহার করিয়া কি তাঁরা পাকিস্থান আদর্শ খর্ব করেন নাই? আশা করি জিন্না সাহেব অচিরেই একটি ফতোয়া জারী করিয়া এই মারাত্মক ভুল সংশোধন করিয়া দিবেন।

* * * * *

রোটারী মেশিন খারাপ হইয়া যাওয়ায় "আজাদের" সম্পাদকীয় প্রবন্ধ "গুণ্ডামীর দায়িত্ব" পর পর দুই দিন ছাপিতে হইয়াছে। বিশু খুড়ো বলিলেন, দুই দুইদিন গুণ্ডামী প্রকাশের জন্য একমাত্র "আজাদের" প্রেসই দায়ী।

* * * *

পাকিস্থানের দাবী মানিয়া নিলে দশ মিনিটের মধ্যে ভারতীয় সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে বলিয়া কায়েদে আজম একটি বিবৃতি দিয়াছেন। পাকিস্থানের দাবী উঠাইয়া নিয়া কায়মনোবাক্যে কংগ্রেসের নীতি মানিয়া নিলে সমস্যা সমাধানের জন্য কত মিনিট সময় লাগিতে পারে সেই অংকটা জিন্না সাহেব একবার কষিয়া দেখিলে পারেন।

সুমিত্রার সমস্যা

শ্রীনলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়

সুমিত্রা আজ চলেছে হাওয়া বদলাতে, সঙ্গে রয়েছে কবি সুবোধ। সুমিত্রার নিজের সামর্থ্যে যেটা হয়ে ওঠেনি সেটাকে সম্ভব করেছে কবি সুবোধ। কবি সুবোধের আর্থিক সংস্থান কবিতা লিখে নয় অবশ্য। সমস্ত জীবন ধরে নিশ্চিন্ত মনে কাব্যচর্চা এবং তদুপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করবার মত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তার ছিলো। মাত্র তিনদিন আগে সে সুমিত্রাকে বিয়ে করেছে অনেক দিনের, অনেক রাতের বিফল স্বপ্নের ওপর যবনিকা টেনে। বাঙালী ছেলেমেয়ের জীবনের দুষ্প্রাপ্য প্রেম অত্যন্ত সহজে তার জীবনে এসেছিলো। বহু লজ্জা, বহু নিন্দার, বহু সন্দেহ অবিশ্বাসের ভেতর দিয়ে তার আর সুমিত্রার মধ্যে চিত্ত-বিনিময়ের অভিনয় চলেছিলো। সহসা একদিন সে প্রস্তাব করলো বিবাহের এবং সুমিত্রা অবশেষে, যতদিন দেরী না করলে বেমানান হয়, ততদিন দেরী করে সম্মতি দিয়েছিলো।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বিবাহে সম্মতি দেবার পরদিন থেকেই সুমিত্রা যেন শুকিয়ে যেতে লাগলো। কুড়িটা বসন্তের মেয়ে সুমিত্রা যেন একবিংশ শীতের শুরুতেই নিস্পত্র, নিরাবরণ হয়ে দাঁড়ালো। সুমিত্রা তো সরমভীরু মেয়ে নয় যে শীতের বনে কোন্ সে কঠিন আসবে বলে' ভয়ে মলিন হয়ে যাবে! তবে কেন সে বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে!

প্রত্যহ বাজার না হওয়া যে পরিবারের স্বাভাবিক অবস্থা, অথচ দেনা করে দান সামগ্রী কিনে, বাড়ি বাঁধা রেখে পণ এবং অলঙ্কারের খরচ জুগিয়ে যারা মেয়ের বিয়ে দেয়—এমন কি বিবাহের রাত্রে ভূরিভোজনের অঙ্গহানির ভয়ে যারা তটস্থ হয়ে থাকে, সুমিত্রা সেই পরিবারের মেয়ে। বিনামূল্যে স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থা মহানগরীতে আছে, নাগরিক প্রতিবন্ধকতার জন্যে নাগরিকদের সে শিক্ষা গ্রহণ করতে অনেক সময় সম্মান-বোধ ক্ষুন্ন হয়। কিন্তু সুমিত্রার বড় বোনের বিবাহ দিয়ে পূর্বোক্ত নিয়মে নিঃস্ব হয়ে তার বাবা মধ্যবিত্তের পর্যায় থেকে নেমে গেলেন এবং রক্ষা করবার মত মর্যাদা রইলো না বলে রক্ষণশীলতা কমে গেলো। ফলে সুমিত্রা হঠাৎ একদিন স্কুলের গণ্ডী পেরিয়ে গেলো। নির্মম সমাজ বিবর্তনের প্রতিকূলতায় মরিয়া হয়ে উঠেছেন সুমিত্রার বাবা। তিনি প্রতিবেশীদের সচকিত অবস্থাকে উপহাস করে মেয়েকে কলেজে পাঠালেন, অবশ্য খরচের দিকটা সুমিত্রা নিজেই বন্দোবস্ত করে নিয়েছিলো। সুমিত্রা যেখান থেকে কলেজে পড়তে যেতো, সে জায়গাটা তার মত মেয়ের পক্ষে অত্যন্ত বেমানান। টিনের চাল ও খোলার ঘরের বস্তি হলে কি হয়, এখানকার বাসিন্দারা এখনও তাদের পাকা দোতলা বসতবাড়ির কথা স্মরণ করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। আজ এদের করবার আর কিছু নেই, শুধু বেমানান, বেচাল, কিছু দেখলে বিগত আভিজাত্যের দোহাই দেওয়া ছাড়া। সুমিত্রার বাবা এবং নিমরাজি মা তাকে বাধ্য হয়ে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। বাবার সম্মতিটা খানিকটা প্রতিহিংসামূলক আর মা উপায়ান্তর না পেয়ে; কারণ সুমিত্রাকে তিনটে ট্যুইসানি করতে হতো নিজের খরচ চালাবার জন্যে।

সুমিত্রা দিনের পর দিন একই রাস্তায় যাওয়া-আসা করছে। অবাধ স্বাধীনতার মাঝখানে, বন্ধু-বান্ধবীদের সমারোহের স্বাচ্ছন্দ্যে সে তিনটে বছর কাটিয়ে দিলো। এমনই একদিনে সে একেবারে স্বাধীন হলো। বাবা-মা'র বয়স হয়েছিলো, তাঁরা স্বর্গে গেছেন, প্রতিবেশীরা হাজার বিমুখ হলেও বিপদের সময় এই বলে সান্ত্বনা দিলো।

সুমিত্রার বি-এ পাশ করতে আরও এক বছর বাকি। সে উঠে গেল এক বোর্ডিংএ।

একদিন সে গিয়েছিলো এক বড়লোক বান্ধবীর বিয়ের নিমন্ত্রণে। মধ্য রাত্রি পর্যন্ত হীরে জহরতে চোখ ধাঁধিয়ে সে ফিরবার উদ্যোগ করলো। তার বান্ধবী নববধূ আরও খানিকক্ষণ অন্তরঙ্গতার সুযোগ নিয়ে, তারপর তাকে যেতে দিলো। রাত অনেক হয়েছে। আলোগুলি তেমনই ঝলমল করছে লাল ঝালরের ধারে ধারে, কেবল উৎসব সহচরেরা অনুপস্থিত। ছেঁড়া ফুলের মালা আর পাঁপড়ির ওপোর দিয়ে চলতে সুমিত্রার মায়া করতে লাগলো। গেটে গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে, চোখে ঘুম ভেঙে আসছে, চলতে চলতে সমস্ত শরীর যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে এমন সময় শুনতে পেলো কে যেন কাকে বলছে—বাঃ চমৎকার! কে যায় দেখো তো? তার পরেও বক্তা তার সৌন্দর্য সম্বন্ধে কতকগুলো মন্তব্য করলো। সুমিত্রা চকিতে ফিরে চেয়ে দেখলো অত্যন্ত পরিশ্রান্ত দুটি স্বাস্থ্যবান যুবক অত্যন্ত সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করে বিশ্রাম করছে।

সুমিত্রা শোবার ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে জামা-কাপড় ছাড়তে লাগলো। ভদ্রলোকটি অভদ্র ঠিক নয়, তবে অতো চেঁচিয়ে তার সমালোচনা করা ঠিক হয়নি! কিন্তু উপমাটি বেশ দিয়েছেন! সন্ধ্যে থেকে হীরে জহরতের ঔজ্জ্বল্যে তাঁর চোখ নাকি জ্বালা করছিলো। সুমিত্রার আবির্ভাব নাকি তাঁর চোখে গোলাপজল দেবার মত স্নিগ্ধকর! সত্যিই কি তাই! সুমিত্রা আয়নার সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। স্বাধীনতা সে জীবনে অনেক পেয়েছে, কোনোদিন সে তার অপব্যবহার করেনি। নিজের পরিশ্রমে তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে যে মধু সঞ্চয় করেছে, তার সম্বন্ধে সঠিক ধারণা কখনো তার ছিলো না। কিন্তু মানুষে তো এ খবর রাখে! তবে আজও পর্যন্ত কেউ তো তার কাছে কোনো কিছু প্রার্থনা করলো না! প্রণয়ের আঁকাবাঁকা রীতির কথা তার বান্ধবীদের কাছে শোনেনি তা নয়, কিন্তু আজও তো তার কাছে কেউ নতজানু হয়ে কিছু প্রার্থনা করলো না! তবে কি তার নিজের কোন অপরাধ আছে!

মানুষকে সে প্রশ্রয় দেয় না, কিন্তু সাহসী মানুষের সাক্ষাৎ তো সে আজও পেলো না!

বান্ধবীদের কাছে গল্প শুনেছে এমন সব মানুষের কথা যারা দস্যুর মত দুর্বার। অসহায়, প্রতীকারহীন কৌমার্যের দ্বারে তারা হানা দেয়। কোনো শাসন মানে না, বারণ মানে না, অথচ শিশুকে যেমন প্রলোভন দেখিয়ে শান্ত করতে হয়, তেমনি ভাবে অত্যন্ত সহজে নিরুপদ্রব সমাজের দোলনায় শিশুশয্যা পেতে তাদের ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া যায়, হাজার হাজার বছরের পুনরাবৃত্ত গাথা গান গেয়ে সাবধানে দোল দিতে থাকলে তাদের ঘুম নাকি আগামী আরও হাজার বছরের মধ্যে ভাঙে না।

সুমিত্রা আরও শুনেছে যে, আর এক রকমের মানুষ আছে তাদের স্বভাব ঠিক চোরের মত। তারা নাকি অতীতে এক চৌরাগ্রগণ্য পুরুষ ছিলো তারই ধারাবাহক। অতীতে এই চোরটি নাকি বিশেষ স্থানের সমগ্র নাগরিকাদের দুকূল চুরি করেছিলেন অথচ চোর কোন সাজা পায়নি উপরন্তু তাঁদেরই হয়েছিলো শ্যামকলঙ্ক। এরা আসে অত্যন্ত নিঃশব্দে, কথা কয় লাজুকের মত, অথচ একদিন দেখা যায় সংশ্লিষ্ট প্রেমিকারা তাদের প্রতিরোধের সামর্থ্য খুইয়ে বসে আছে। এই একটি রাত সুমিত্রার জীবনে

পরিবর্তনের রাত। সে কি ভাবছে সে কথা সেই-ই জানে। সে সাধারণ মেয়ে নয়। তার মনের কথা বলতে গেলে কবিরা লজ্জা পাবে, কথা-শিল্পীরা নিজেদের সম্ভ্রম বাঁচিয়ে চলে যেতে পারলে ভাগ্যবান বলে মনে করবে। কিন্তু তবুও বুঝতে পারা যাবে তার আজকের এই প্রতিক্রিয়ার ফল আগামীকাল লক্ষ্য করলে। একটু আগে তার চোখ ঘুমে ভরে আসছিলো, এখন সে আলো নিভিয়ে জানলার বাইরের মধ্যরাতের পাণ্ডুর চাঁদের দিকে চেয়ে রইলো। সে রাত্রে তার চোখে আর তন্দ্রা এলো না। রাত যখন শেষ হ'লো তখন মনে মনে কিসের যেন সমাধান করে অত্যন্ত অসময়ে ঘুমিয়ে পড়ে এক নিভীক স্বপ্ন দেখলো।

তার পরদিন কলেজে যেতে বান্ধবীরা তার সঙ্গে কথা বলতে এলো এবং সুমিত্রার পরিবর্তনটা স্পষ্টই লক্ষ্য করলো। যে সমস্ত ফাজলামির উত্তরে সে ধমক দিতো, সুমিত্রা যেন আগে থাকতে তার জবাব মুখস্থ করে এনেছে।

এর আগে সুমিত্রা পথ চলতো কোনো দিকে না চেয়ে। আশেপাশে কেউ তাকে লক্ষ্য করছে কিনা, অথবা কেউ কিছু মন্তব্য করলো কিনা, তার দিকে সে মোটেই মন দিতো না। তার ধারণা ছিলো, তার আশে পাশের সমস্ত জীবই পুরুষ এবং তাদের কাছে মেয়েদের অপযশ ছাড়া আর কিছু পাওনা নেই। নূতন চেতনায় সুমিত্রা সাহসী হোলো। অনেক বারের চেষ্টার ফলে, পথ চলতে যেই-ই তার দিকে ফিরে তাকায়, সেও জবাবে তার দিকে সোজা অকুণ্ঠ দৃষ্টিতে চাইবার অভ্যাস করলো। কিন্তু প্রতিবারেই সুমিত্রা আশাহত হ'লো। তার চোখের সামনে অধিকাংশ লোকই চোখ নামিয়ে নিলো। অবশ্য কেউ কেউ নিতো না, কিন্তু তাদের মুখের দিকেই সুমিত্রার চাইতে ইচ্ছা করতো না। সুমিত্রার রক্তাভ সুপুষ্ট ঠোঁট চিন্তার চাপে বিবর্ণ হয়ে উঠতো, অথচ এর কোনো সদুত্তর সে মনে মনে হাজার সন্ধান করেও খুঁজে পেতো না।

কিন্তু সুমিত্রার এই পর্যায়ের কোনো বান্ধবী ছিলো না। তার অসম্বৃত চিন্তার রাজ্যে কোনো দোসর মেলে নি। কিন্তু উত্তর একদিন আপনা আপনি এসে গেলো।

সুমিত্রার এক ছাত্রীর বড় ভাই তার নিজস্ব রূপগুণের জোরে দুঃসাহসী হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু সুমিত্রার সামনাসামনি হয়ে তার সাহস নিভে গিয়েছিলো। পরে সুমিত্রা তার ছাত্রীর কাছ থেকে জানতে পেরেছিলো ভদ্রলোকের পরাজয়ের ইতিহাস। সে বলেছিলো সুমিত্রা যখন চোখ তুলে তাকায় তখন মানুষের বুকের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তার দৃষ্টিতে নাকি এমন একটা মর্যাদাবান পদার্থ আছে যার মধ্যে সমমেরু-ধর্মী চুম্বকের বিকর্ষণের গুণটাই বেশী পরিমাণে বর্তমান।

অন্য মেয়ে হ'লে খুশী হ'তো হয়তো এই ধরণের সমালোচনা শুনে। সুমিত্রা অবশ্য সমস্ত মুখে বিজয়ীর অনুকম্পা-মিশ্রিত হাসি ফুটিয়ে তুলেছিলো, ছাত্রীর মারফৎ তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিশ্লেষণের ফলাফল শুনে, মনে মনে সে দুঃখিত হ'ল নিশ্চয়ই।

সুমিত্রা আরও খানিকটা বদলে গেলো। আপ্রাণ চেষ্টার ফলে তার দৃষ্টিতে আরও একটু পরিবর্তন হ'লো। সামান্য একটু প্রশ্রয়, খানিকটা আমন্ত্রণ তার হঠাৎ চাওয়া চোখের মধ্যে পেয়ে পথ চলতে কেউ কেউ সচকিত হতে লাগলো।

এই মহানগরের দিকে দিকে কত মানুষ নির্বিরোধে পথ চলতে গিয়েছিলো, পড়ন্ত সূর্যের আলোয় কত মানুষ অপ্রচুর অবসরের ওপরে রঙ ধরাতে গিয়েছিলো, কত অক্ষত হৃদয় যুবক প্রভাত সূর্যের প্রলোভনে পথে বেরিয়েছিলো, তাদের মধ্যে কয়েকজনের কয়েকটা রাত বিনিদ্র কাটবে।

গোধূলি বেলায় সুমিত্রার আশেপাশে যে মন হারালো, সে বিনিদ্র রাতের প্রহর গুণতে গুণতে অনেক আশা-নিরাশার শেষ করে, বুকের কাঁপন সামলাতে সামলাতে নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে রইলো সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে অস্তরাগের সাতরঙা মোহ উজ্জ্বল আলোয় অদৃশ্য হয়ে গেলো। আবার প্রভাত আলোয় স্নিগ্ধ স্বাস্থ্যবতী সুমিত্রাকে কেন্দ্র করে যে মানুষ সন্ধ্যা পর্যন্ত দিবাস্বপ্ন দেখলো, তার চোখে সন্ধ্যার সুমিত্রা, রঙিন আলোর সমারোহে উছলে পড়া সুমিত্রাকে, তার চোখে রুচি এবং ক্ষুধা উদ্রেককারী বিজ্ঞাপনের মত লাগলো।

হয়তো এই মহানগরীর, মিলনপন্থী কোন নাগরিক কোনো-না-কোনো দিন এই প্রভাত ও সন্ধ্যার বৈষম্যের সমন্বয় করতে পারতেন, কিন্তু সুমিত্রার পক্ষে তাদের সে অবসর দেওয়ার সুযোগ ঘটে উঠলো না।

চাকরী করবার মত যোগ্যতা হতেই সে মফঃস্বলের কোন স্কুলে চাকরী পেয়ে এক-প্রকার প্রলোভিত হয়ে সেখানে চলে গেল।

সুমিত্রার কি দুর্ভাগ্য! সামাজিক নিরাপত্তার মাঝখানে নিজের জীবন ও যৌবনকে উপভোগ করবার স্বপ্ন দেখতে দেখতে প্রত্যেক কিশোরীই যুবতী হয়। সে স্বাধীনতা বাঙালীর মেয়েকে পেতে হলে, আলো জ্বালাতে হয়, সানাইয়ের এবং নিমন্ত্রণ পত্রের মারফৎ বিজ্ঞাপন দিতে হয়, বিনামূল্যে সে স্বাধীনতা সুমিত্রা পেয়েছে। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সুমিত্রা সে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ পড়তে পেলো না, সে নিষিদ্ধ পুস্তকের পাতা ওলটাতে পারলো না।

মহানগরীর অনুকরণে যে সমস্ত শহর গড়ে উঠেছে সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের সুবন্দোবস্তের জন্যে, সুমিত্রার কর্মস্থল তারই একটা উন্নততর নমুনা। আশেপাশে অনেক ছেলেদের স্কুল গড়ে উঠেছে। হাজারে হাজারে কেরানী, উকিল, ডাক্তার, স্কুল মাস্টার দেশ বিদেশে চালান হয়ে যাচ্ছে। পুরুষের রুচি বদলে যাচ্ছে তাই মেয়েদেরও পরিবর্তনের প্রয়োজন। শিক্ষিতরা নববধূর কাছ থেকে শুধু আঁকাবাঁকা কালির আঁচড়ের পত্র পেয়ে সন্তুষ্ট থাকছে না। সত্যকারের অবিমিশ্র প্রেমপত্র না হলে তাদের মন উঠছে না. তাই মেয়ে স্কুলের প্রয়োজন এবং সুমিত্রার আগমন সেই কারণে সম্ভব হতে পারলো।

কিন্তু নতুন যায়গায় এসে সুমিত্রা আবার নতুন সমস্যার সামনাসামনি হোলো। এখানকার মানুষেরা সুমিত্রার দিকে চোখ তুলে তাকায় না, অথচ দূর থেকে আড় চোখে চায়। এতদিন যার ওপরে ভিত্তি করে গবেষণা চালিয়ে ছিলো, তার আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন হ'লো। একটা থেকে আর একটায় পরিবর্তিত হতে গেলে মাঝ-খানে কিছুদিন নিস্তরঙ্গ হওয়ার প্রয়োজন। এই পর্যায়টা সুমিত্রা যখন পার হ'চ্ছে, তখন তার দিকে তাকালে মানুষের চোখ শ্রদ্ধায় নত হ'য়ে আসবে।

আবার বসন্ত এলো, কিন্তু সুমিত্রার জীবনে প্রণয়ী এলো না। অতিবাহিত গ্রীষ্মের পরে ঘন বর্ষণের রাতে' সুমিত্রা বিনিদ্র নয়নে রূপকথায় শোনা দুঃসাহসী-দের পদধ্বনির প্রতীক্ষায় প্রহরের পর প্রহর বৃথাই কাটালো।

অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পল্লীতে চমৎকার ছোট একখানা বাড়ি তাকে থাকতে দেওয়া হয়েছে। চারিদিক থেকে বহুদূর পর্যন্ত বাড়িখানা দেখা যায়।

অলস অপরাহ্নে সুমিত্রা বারান্দায় বসে যখন বিশ্রাম করতো অদূরে পলাশশ্রেণীর ধার ঘেঁসে এই শহরের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসাস্থল কত ছেলে সন্ধ্যার আকাশ অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত সুমিত্রাকে উপলক্ষ করে আলোচনা করতে করতে নিজেদের ভবিষ্যৎকে সংশয়াচ্ছন্ন করতো।

সুমিত্রা তাদের লক্ষ্য কখনও করেনি কিন্তু হিতৈষীরা করলেন। প্রৌঢ় বয়সী হিতৈষীরা তাঁদের অবচেতন মনের কোণে কি যে দুরাশা গোপন করে রাখতেন, তা কেউ জানে না, কিন্তু সুমিত্রার বাড়ির চারদিকে পাঁচিল তুলে দিয়ে তাকে সুলভ হবার হাত থেকে বাঁচাবার সংকল্প করলেন। তাঁদের বোধ হয় মনে হ'লো, প্রাচীরের বন্ধনীতে সুমিত্রাকে বাঁধতে পারলে, মনের অস্পষ্ট কামনা, যার একমাত্র বিকল্প অন্তরালবাসিনীর বাহুবন্ধন, সেটা তৃপ্ত হবে।

একদিন সকাল বেলায় সুমিত্রা দেখলো তার বাড়ির উঠানে ইঁট, সুরকি জমা হচ্ছে। মজুরদের প্রশ্ন করে যা জানতে পেলো তাতে খুশী হওয়া উচিত কিনা বুঝতে পারলো না। বাড়ির একধার দিয়ে অর্ধ-চন্দ্রাকারে ভিত খোঁড়া হচ্ছে। তখনো পাঁচিলের কোন চিহ্ন নেই। সুমিত্রা ভাবছে যে তার প্রতিবাদ করা উচিত কিনা হঠাৎ দেখতে পেলো বছর তিরিশ বয়েসের একজন ভদ্রলোক অত্যন্ত ব্যস্তভাবে প্রাঙ্গণের মধ্যে ঢুকে পড়ে কুলীদের সর্দারকে উদ্দেশ করে নানা কথা বলতে লাগলো। ভদ্রলোক অত্যন্ত ব্যস্তভাবে কাউকে ধমক কাউকে উপদেশ দিয়ে মিনিট পনেরো পরে চলে গেলেন, ঘণ্টা দুয়েক বাদে আবার আসবার ভয় দেখিয়ে। এই এতক্ষণ সুমিত্রা স্তম্ভিত হয়ে বসেছিলো। মানুষটি চলে যাবার পর তার খেয়াল হ'লো যে একজন অত্যন্ত বলিষ্ঠ গঠনের তামাটে রঙের, বিশ্রী পোষাক-পরা প্রায় ছ'ফুট লম্বা একজন লোক তার সামনে দাঁড়িয়ে তার অধীন শ্রমিকদের সঙ্গে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কথা বলে হয়ত আরও একটা জরুরী কাজ পরিদর্শন করতে চলে গেল, কিন্তু তার দিকে একবারও ফিরে চাইলো না, এমন কি সে যে পাঁচ গজের ব্যবধানে বসেছিলো তা সে জানতে পেরেছে বলেও মনে হল না।

লোকটার ধৃষ্টতার সম্বন্ধে যতই চিন্তা করছে সুমিত্রার মনের রাগ ততই বাড়ছে। কী বিশ্রী পোষাক লোকটার! সুমিত্রা অনুসন্ধানে জানলো ভদ্রলোক একজন স্থানীয় ঠিকাদার। পরণে ভাঁজবিহীন হাফ্ প্যাণ্ট। গায়ের শার্টটার রঙের মৌলিকতা নষ্ট হয়ে গেছে। পায়ে অত্যন্ত ভারী বুট জুতো, মোজা না পরায় অত্যন্ত বিশ্রী দেখায়। শরীরের গঠনটা আসুরিক। কদর্য লোমশ পা দু'খানার দিকে চাইলে ঘেন্না করে। অতো সকালেও পান খেয়েছে এবং দাড়ি কামায়নি। "যেমন স্বভাব, তেমনি চেহারা। লোকটার কি সব বিচ্ছিরি!" সুমিত্রার ভাবনার ভেতরেই এই রকম একটা স্বগতোক্তি হ'লো।

দিনটা ছিলো ছুটির। দুপুরের দিকে ভদ্রলোক আবার এসে হাজির হলেন। অদূরে বসে সুমিত্রা সক্রোধে লক্ষ্য করলো এই শিষ্টাচারহীন লোকটিকে। রোদে ঘুরে যেন আরও ভয়ানক চেহারা করে এসেছে। ভিত খোড়ার কাজ প্রায় অর্ধেক হয়েছে। লোকটি নিজেই খানিকটা হাত লাগিয়ে দিলো কাজে, অবশ্য সর্দার কুলী অত্যন্ত সম্ভ্রমসহকারে তার হাত থেকে কাজ ছিনিয়ে নিলো। একটু পরে কুলীদেরই একজনকে আদেশ করলো তাদেরই লোটা বেশ করে ধুয়ে বড় রাস্তার টিউবওয়েল থেকে খাবার জল নিয়ে আসতে।

লোকটা সামান্য ভদ্রতাও জানে না! অন্তত খাবার জলটাও তো আমার কাছে চাইলে পারতো! উঃ! উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নোংরা ঘটিটা উঁচু করে ঢক্ ঢক্ করে জল খাচ্ছে! গাল দিয়ে তো আদ্ধেকই গড়িয়ে পড়লো গলার ওপর। জামার হাতায় মুখ মুছে লোকটি আবার কাজের কথা বলতে লাগলো। সুমিত্রা মনের আক্রোশ চাপতে গিয়ে অকারণে ঝি চাকরদের ওপর চটতে লাগলো। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে অসাবধানতার জন্য ধমক দিতে লাগলো।

ঠিক দুপুর বেলায় এক গাড়ি সুরকি এসে হাজির হোলো। গাড়োয়ান গাড়িটা নামিয়ে গরু দুটোকে খুলে দিয়ে চালান সই করাবার জন্য ভদ্রলোকের কাছে সেলাম করে এসে দাঁড়ালো। যে বারান্দায় সুমিত্রা বসেছিলো তারই সামনের তিনটে সিঁড়ির একটার ওপর পা রেখে ঊরুর ওপর কাগজখানা পেতে সই করতে গিয়ে পেন্সিলের সীস ভেঙে গেলো। মুখে একটা আক্ষেপোক্তি করে ভদ্রলোক মুখ তুলতেই সুমিত্রার সঙ্গে তার চোখোচোখি হল। সুমিত্রা এতক্ষণ লোকটার কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিলো হঠাৎ তার সঙ্গে চোখের দিকে চাইতেই তার বুক দুরদুর করে উঠলো।

"একটা পেন্সিল দিন তো?" সুমিত্রার বিরূপ মন ইচ্ছে করলেই অনেক ভুল ত্রুটি ধরতে পারতো ভদ্রলোকের চাইবার ধরণে, কিন্তু কি জানি সে তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ঘর থেকে একটা পেন্সিল এনে দিলো। ভদ্রলোক বিনা ওজরে পেন্সিলটা নিলেন, সই করলেন এবং তখুনি কাজের দিকে মুখ ফিরিয়ে এগিয়ে চলে গেলেন। সুমিত্রা মনে মনে ফুঁসতে লাগলো, যে ব্যবহার তার করা উচিৎ ছিলো সময়মত তা করতে পারলো না বলে।

অপরাহ্ণ পর্যন্ত সমানে কাজ চালালো ভদ্রলোক। ভিত খুঁড়ে, দুরমুস পিটিয়ে পাঁচিলের প্রথম ইঁটের সারি বসানো আরম্ভ হয়ে গেলো।

সুমিত্রা ভাবছে তার সামনেকার এই উদার উন্মুক্ত মাঠকে পাঁচিল তুলে মুছে দেবার অধিকার কারো আছে কি না। মনে মনে সে স্থির করছে যে, কালই সে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে এবং প্রয়োজন হলে সে চাকরী ছেড়ে দিতেও সংকল্প করলো।

সুমিত্রা ভাবলো এক আর হোলো এক। সূর্য প্রায় লালাভ হয়ে এসেছে এমন সময় তার ঝি তার সামনে এক পেয়ালা ধূমায়িত চা রেখে গেল। চায়ের পেয়ালা মুখের সামনে তুলে ধরতে যাবে এমন সময় দেখতে পেলো ভদ্রলোক তার দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিলেন। সুমিত্রা আন্দাজ করলো, ভদ্রলোক বোধ হয় অভ্যাস বশে চায়ের পেয়ালার দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

সুমিত্রা, শোনা যায় এমন স্বরে, ঝিকে ডেকে বললো ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করতে যে তিনি চা খান কি না অথবা খাবেন

কি না। ভদ্রলোক কিন্তু ঝি আসবার আগেই বলে উঠলেন—"যদি বেশী থাতে তো পাঠিয়ে দিন।" ঝি চা আনতে ভেতরে গেলো। হঠাৎ সুমিত্রার খেয়াল হ'ল যে ভদ্রলোককে বোধ হয় শুধু চা দেওয়া উচিৎ হবে না; কিছু খাবারও দেওয়া উচিৎ এবং খাবার খেতে গেলে উঠানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাওয়াটা কেমন যেন দেখায়, অতএব বারান্দায় এক-খানা চেয়ারে এসে বসতে আমন্ত্রণ করতেই হ'লো সুমিত্রাকে। ভদ্রলোক সুমিত্রার ধারণায় যত বড় অভদ্রই হোক, চায়ের জন্য ধন্যবাদ দেওয়ার ছলে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার সারাদিন কাটে কি করে, কোথাও বেড়াতে যান না?

উদাসসুরে সুমিত্রা জবাব দিলো—কোথায় আর যাবো বলুন! আলাপ তো কারো সঙ্গেই করিনি।

হঠাৎ ভদ্রলোক ভয়ানক জোরে কাকে ধমক দিলেন—সুমিত্রা চমকে উঠে দেখলো একজন মজুর তাড়াতাড়ি আলস্য ছেড়ে কাজে মন দিলো। কি বিশ্রী গলার আওয়াজ ভদ্রলোকের! কিন্তু খুব পুরুষালি, সুমিত্রার দ্বিতীয় চিন্তায় মত বদলালো।

"আশেপাশে কোন পাড়াপড়শিও নেই যে আলাপ করবো। আপনার বাড়ি কতদূর!"

ভদ্রলোক একটু থেমে থেকে বললেন—আমার বাড়ি বেশী দূর নয় বটে, কিন্তু আমার বাড়িতে আলাপ করবার মত কেউ নেই।

"কেন, আপনার স্ত্রী"—ভদ্রলোকের বয়স নিশ্চয়ই তিরিশ বছরের ওপর, সুমিত্রা নির্ভয়ে জিজ্ঞাসা করলো।

"আমার স্ত্রী নেই আজ বছর চারেক! একটি মাত্র ছেলে আছে তার বয়েস প্রায় বছর আটেক।"

সুমিত্রা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলো—তাকে দেখা শোনা করে কে! একেবারে ছেলে মানুষ তো!

ভদ্রলোক একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন—ছেলে মানুষ মোটেই নয়, একটি আস্ত ডাকাত। মানুষ করেছে একটা চাকর, সে ব্যাটাও একটা আস্ত ডাকাত! সমস্ত দিন খেটেখুটে বাড়ি যাবো আর বসেবসে পাড়াপড়শির নালিশ শুনবো।" ভদ্রলোকের গলার আওয়াজে আন্তরিকতা ফুটে বেরুলো।

কাল নিয়ে আসবেন না, এখানে—সুমিত্রা প্রস্তাব করলো। ভদ্রলোক প্রথমে খুব প্রতিবাদ করলেন এবং সুমিত্রা বার বার অনুরোধ করতে প্রতিবাদ সাপেক্ষ রাজী হ'লেন।

"দেখবেন, আপনাকে একেবারে বিরক্ত করে মারবে। নাম তার শ্যামল, লোকে কিন্তু সামাল সামাল বলে ডাকে।" কৌতুকের মৃদু রেশ নিয়ে, দুজনে দুজনের কাছ থেকে বিদায় নিলো।

তারপর দিন স্কুলে গিয়ে সুমিত্রা যা ভেবে রেখেছিলো, অর্থাৎ পাচিল তোলা নিয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবাদ জানানো, তা আর করলো না। বিকেলে স্কুলের ছুটির পর বাড়ি গিয়ে দেখতে পেলো ভদ্রলোক পাঁচিল তোলার কাজে অনেকটা এগিয়েছেন। প্রায় আধ হাত ইঁটের গাঁথনি অর্ধ চন্দ্রাকারে সমতল জমির ওপর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

"আপনার শ্যামল, কিন্তু আসছে একটু পরে", ভদ্রলোক মৃদু হেসে প্রথম সম্ভাষণ জানালেন। তাঁর কথা শেষ না হতেই অদূরে চাকরের সঙ্গে শ্যামলকে আসতে দেখা গেল।

সুমিত্রার বুক কাঁপছে অপেক্ষায়, অবশেষে শ্যামল এলো। বোধ হয় কথবার্তা আগে থেকেই বলা ছিলো। শ্যামল বিনা উপক্রমণিকায় একেবারে সুমিত্রার খুব কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। চমৎকার স্বাস্থ্যবান ছেলে, সুপুষ্ট শরীর। বাপের শরীরের অবিকল ছাঁদ থাকলেও মুখে চোখে কোথাও কাঠিন্যের লেশ মাত্র নেই। যত্ন করে তাকে পরিষ্কার জামা হাফ প্যান্ট পরিয়ে দেওয়া হয়েছে, চুল আঁচড়ে দেওয়া হয়েছে।

সুমিত্রা তাকে বুকে চেপে ধরলো। তার সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়েও সুমিত্রার যেন আশ মিটছে না।

"খুব দুষ্টু বলছিলেন যে! এ তো খুব লক্ষ্মী ছেলে!" সুমিত্রা কথা বলতে বলতে বেশ হাঁপিয়ে উঠছে।

"দাঁড়ান, কিছুক্ষণ যাক! নিজ মূর্তি ধরেনি এখনো!" ভদ্রলোক অন্যদিকে চেয়ে জবাব দিলেন।

শ্যামলকে আদর করে সুমিত্রা বিকেল কাটিয়ে প্রায় অপরাহ্ণে এলো। শ্যামলের দুষ্টুমির পরিচয় সে এখনও পায়নি। বলতে গেলে কোন কথাই শ্যামল বলেনি। বোধ হয় আলোচনা করবার মত বিষয়ই সে পায়নি।

"তোমার গায়ে নাকি খুব জোর শ্যামল! তোমার সঙ্গে কেউ নাকি মারামারি করে পারে না!" সুমিত্রার এই কথাটা শোনবার পর শ্যামলের বড় বড় নিরীহ চোখ যেন উৎসাহে চক্ চক করে উঠলো।

এদিক ওদিক তাকিয়ে সে হঠাৎ বলে উঠলো—"দেখবেন আপনাকে উঁচু করবো মাসিমা!" মাসিমা বলতে তাকে আগেই শেখানো ছিলো।

সবিস্ময়ে সুমিত্রা বললো—"আমায় উঁচু করবে কি শ্যামল, ছিঃ! কিন্তু সে কোন কিছু সক্রিয় প্রতিবাদ করবার আগেই আট বছরের শ্যামল তার কোমরের কাছে সজোরে জড়িয়ে ধরে মাটি থেকে প্রায় আধ হাত উঁচু করে ফেললো। সুমিত্রা পড়তে পড়তে সামলিয়ে নিলো।

উঠানের মাঝখান থেকে ভদ্রলোক জোরে হেসে উঠলেন, এমন কি কর্মরত মজুররা পর্যন্ত মুচকে মুচকে হাসতে লাগলো।

"ওর জোরের পরীক্ষা দেবার ধরণই ঐ রকম। আমাকেও চেষ্টা করে মাঝে মাঝে, তবে পেরে ওঠে না।" ভদ্রলোক যেন নিজের ছেলের বদনামকে সপ্রমাণ করতে পেরে উল্লসিত হলেন।

মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠে সুমিত্রার বুকের কাঁপন তখনো থামেনি। প্রথম লজ্জার বাঁধ ছুটে যেতে শ্যামলের নানা প্রকার কসরৎ আরম্ভ হোলো, যথা উঁচু বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়া, খালি মেঝের ওপোর ডিগবাজী খাওয়া ইত্যাদি। অঙ্গনস্থ পিতা বারণ করলেও সে শুনলো না। খানিকক্ষণ এইভাবে চলবার পর অনিচ্ছুক পুত্র পিতার সঙ্গে বাড়ি চলে গেল।

সেইদিন শেষ রাত্রে সুমিত্রা স্বপ্ন দেখলো সে মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠেছে, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও আর সে পায়ের তলায় মাটি ঠেকাতে পারছে না।

ঘরের ভেতরে পুত্রের দৌরাত্ম্য সামলাতে সামলাতে সুমিত্রার দিন স্বপ্নের মত কেটে গেল। সময় সময় নিরুপায় হ'য়ে সুমিত্রা পুত্রের উৎপীড়নের হাত থেকে সাময়িক পরিত্রাণ পাবার জন্যে পুত্রের পিতার সাহায্য চায়, কিন্তু সে দিক থেকে সাহায্যের বদলে আসে উপহাস। ভদ্রলোক আস্তে আস্তে পাঁচিলের উচ্চতা বাড়িয়েই চললেন।

এমনি করে সুমিত্রা আপনা আপনি নিজেরই গড়া বেষ্টনীর মধ্যে আটকা পড়লো। প্রতিদিন অল্প অল্প করে বাড়তে বাড়তে একদিন পাঁচিল তোলার কাজ শেষ হয়ে গেল। সুমিত্রার চোখের দৃষ্টি ঘুরে ফিরে সেই একই দেওয়ালে আঘাত লেগে ফিরে আসে।

এমনি করে অনেকদিন কেটে গেল। ছুটির দিনে শ্যামল সমস্ত দিন সুমিত্রার কাছে থাকে এবং সন্ধ্যার সময় চলে যায় চাকরের সঙ্গে। অন্যান্য দিন বিকেলে আসে এবং বেশ একটু রাত হলে চাকর এসে নিয়ে যায়। ডিসেম্বর মাস এসে পড়লো। মেয়েদের পরীক্ষা সমাগত হ'লো এবং একদা শেষ হয়ে গেলো। শ্যামলের বাবা আর সুমিত্রার বাড়িতে আসে না, তবে সুমিত্রার সঙ্গে তার পথে ঘাটে দেখা হয়। সুমিত্রা খালি কুশল সংবাদ ছাড়া আর কিছুই জিজ্ঞাসা করতে পারে না। বড় জোর কোনদিন শ্যামলের সংবাদ আদান-প্রদান হয়।

সুমিত্রার মনে অভিমান জমা হয়। ভদ্রলোক একবার তার বাড়িতে গেলেও তো পারেন! তারপর আবার সে নিজে থেকেই ভাবে বিনা কারণে ভদ্রলোক তার

বাড়িতে যাবেনই বা কি করে! এই সমস্ত ভাবনা সুমিত্রা ভাবছে, কারণ এই সমস্ত কথা ভাবা তার পক্ষে স্বাভাবিক।

স্কুলের পরীক্ষায় স্বাভাবিক যা পাশ হয় তার চেয়ে বেশী ছাত্রী এবারে পাশ হোলো। আশাতিরিক্ত সাফল্যের জন্য কর্তৃপক্ষ সুমিত্রাকে অভিনন্দন দেবার যোগাড় করছে সে খবর সুমিত্রা একদিন বিকেলে নিমন্ত্রণ পত্রের মারফৎ পেলো। উৎসবের দিনটা বড়দিনের ছুটির শেষের দিকে, অথচ সে ভাবছিলো ছুটিতে কলকাতায় ঘুরে আসবে কি না। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে শ্যামলকে নিয়ে। সে কোথা থেকে শুনেছে যে সুমিত্রা কলকাতায় যাবে, সেই থেকে সে রাত্রে চাকরের সঙ্গে বাড়ি ফিরতে ভয়ানক হাঙ্গামা করে একদিন তো সে গেলই না। চাকরটা খুব জবরদস্তি করলো, বললো যে শ্যামলকে ছেড়ে রাত্রে কিছুতেই থাকতে পারবেন না তার মনিব। সুমিত্রা তখন বললো যে, শ্যামল থাক। তার বাবুকে জবাবদিহি সেই-ই করবে।

সুমিত্রা মনে মনে ভাবছিলো যে, বাজারে কয়েকদিন উপরি উপরি যাত্রা হচ্ছে, একলা থাকার ভয়ে সুমিত্রা ঝির সনির্বন্ধ অনুরোধে কান দেয়নি, কিন্তু আজ যদি সে যেতে চায় তাহলে তাকে স্বচ্ছন্দে অনুমতি দেবে। সুমিত্রা নিশ্চয়ই ভেবে বসেছে যে, শ্যামলকে ছেড়ে যে থাকতে পারে না, সে তাকে নিতে আসবে নিশ্চয়ই। সুমিত্রা তার শিক্ষা, আভিজাত্য-জ্ঞান সব বাজি রাখলো আজ।

"যেতে পারো, কিন্তু রাত্রে তোমার জন্যে দরজা খুলতে পারবো না কিন্তু! তুমি না হয় তোমার বাড়ি গিয়েই শোবার বন্দোবস্ত কোরো। আজকের রাতটা শ্যামলই আমাকে আগলাবে। কিরে শ্যামল, পারবি না, চোর ডাকাত এলে সামলাতে!" সুমিত্রার জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্যামল তার সংগৃহীত একটা মস্ত বড় লাঠি মুঠো করে ধরে বিছানার ওপর বসলো।

তার মুখের ভাব দেখে অনাগত চোর ডাকাতদের ওপোর সুমিত্রার মায়া হোলো।

শীতের রাত। প্রায় দশটা বাজলো। শ্যামলের খাওয়া হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। তার চোখে ঘুম নেমে আসছে, কিন্তু হাতের লাঠি সে তখনো ছাড়েনি। রাত ক্রমে আরও গভীর হ'লো। শ্যামলের শিথিল হাত থেকে লাঠিখানা খুলে পড়ে গেলো। সুমিত্রা তাকে ভালো করে বিছানায় ঢাকা দিয়ে শুইয়ে দিলো। কিন্তু সুমিত্রার চোখে ঘুম এলো না। রাত বেড়ে চলেছে। সুমিত্রা কান পেতে রয়েছে পথের দিকে। প্রতীক্ষায় তার চোখে প্রায় জল এসে গেছে এমন সময় শুনতে পেলো কে যেন দরজায় আঘাত করছে। প্রথমটা সে কথা বলতে পারলো না, একটু পরে সাড়া দিলো।

ঘরে ঢুকেই আগন্তুক দরজাটা বন্ধ করে দিলো। ভয়ানক ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে।

"আপনাকে শ্যামল খুব বিরক্ত করছে, না! রাত্রে ফিরে আসতে আমার অনেক দেরী হয়ে গেলো। এসে শুনলাম যে শ্যামল ফিরে আসেনি। এই রাতে আবার টানাটানি!"

কথাগুলো সুমিত্রাকে উদ্দেশ করে বলা হয়েছিলো নিশ্চয়ই, কিন্তু ভদ্রলোক ভাবলেন যে, সুমিত্রা বোধ হয় কিছু শুনেছে না।

"ডাকবেন নাকি শ্যামলকে? না থাক, এমনিই তুলে নিয়ে যাই। জেগে উঠলে আবার হাঙ্গামা করবে।"

সুমিত্রার এখন কোন জবাব দেওয়া উচিত। সে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

"তাহলে নিয়ে যাই শ্যামলকে, কি বলুন!" তখনও জবাব না পেয়ে ভদ্রলোক সুমিত্রার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালেন।

সুমিত্রার সমস্ত শরীরের রক্ত যেন মুখে এসে জমা হ'চ্ছে। ভদ্রলোকের পাশে সুমিত্রাকে দেখাচ্ছে অত্যন্ত ছোট। ইচ্ছে করলে এই অসুরের মত চেহারার লোকটা সুমিত্রাকে এক হাতে উঁচু করে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে।

ভদ্রলোক আরও কাছাকাছি সরে গেলেন। সুমিত্রা শিউরে উঠছে। খাটের ওপর ঘুমন্ত শ্যামলের মুখের ওপর ল্যাম্পের ক্ষীণ আলো এসে পড়েছে। চোর-ডাকাতদের নির্ভয় নিশ্চিন্ত করে তার হাতের লাঠিটা মেঝের ওপর লুটোচ্ছে। সুমিত্রার শিক্ষা সভ্যতার গোড়ায় আঘাত লাগছে, সমস্ত শরীর তার কাঁপছে। নিশীথ রাত্রের দস্যু তার কাঁধের ওপরে হাত রাখলো। শ্যামল নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে রইলো তার প্রতিজ্ঞা ভুলে।

পৌষের দীর্ঘ রাত্রির প্রহরগুলো একে একে শেষ হতে লাগলো। উদয়াচলের আলো এসে পড়লো। নিদ্রিত শ্যামলের খুব কাছে বসে ওরা দুজনে অত্যন্ত আস্তে আস্তে কথা বলতে বলতে সারা জীবনের অব্যক্ত অভিমান শিথিল করে ফেললো।

নিরাশ্রয় সুমিত্রার জীবনের মধ্যে এই একটি রাতই সম্পূর্ণ। ঝড়ে বিপর্যস্ত পাখীর নিশ্চিন্ত আশ্রয় লাভের তৃপ্তির মত এক রকমের প্রশান্তি তার অন্তরে ভরে উঠেছে। কিন্তু অসাবধানে সুমিত্রা তা হারিয়ে বসলো।

কখন যে রাতের জমা কুয়াসা কেটে গিয়ে ঘরের মধ্যে আলো হয়ে উঠেছে তা তারা বুঝতে পারেনি। বিশাল আশ্রয়ের ওপর আপনার সম্পূর্ণ ভার রেখে সুমিত্রা উদীয়মান আলোর পথের দিকে পরম আলস্যে বসেছিলো। শ্যামলকে কেউই লক্ষ্য করেনি।

হঠাৎ শ্যামল চীৎকার করে ডেকে উঠলো—"বাবা?" দুজনেই তাড়াতাড়ি আলাদাভাবে জবাব দিলো। "ঘুম ভেঙে গেলো শ্যামল!" সুমিত্রা তাড়াতাড়ি জবাব দিলো। কিন্তু তার লজ্জা ঢাকতে পারছে না। "তুমি কাল কোথায় শুয়েছিলে দেখতে পাচ্ছো শ্যামল!"

শ্যামল সুমিত্রার দিকে ফিরেও চাইলো না। "বাড়ি চলো বাবা!" শ্যামলের বাবা বললেন—এতো তাড়াতাড়ি কেন শ্যামল, ভালো করে সকাল হোক!"

"না, তুমি এখুনি চলো।" শ্যামল কোনো দিকে না তাকিয়ে তার বাবার কাছে নেমে এসে টানাটানি করতে লাগলো।

অনিচ্ছুক পিতা দরজার দিকে এগোতে লাগলেন।

"এখনি চলে যেওনা শ্যামল, খাবার দাবার খেয়ে তারপরে যেও! শ্যামল, শোনো, মাথায় ভালো করে ঢাকা দাও নইলে ঠাণ্ডা লাগবে। যেও না বলছি, শ্যামল শোনো?" যেখানে সুমিত্রার দৃষ্টি আঘাত পেয়ে ফিরে আসে, শ্যামল তারও বাইরে চলে গেল।

সুমিত্রা তখনো ভাল করে বুঝতে পারেনি যে, ব্যাপারটা কি ঘটল। সমস্ত রাতটা যেন স্বপ্নের মত কেটে গেছে। সকালের আলো চোখে অসহ্য মনে হচ্ছে। কোন এক অদৃশ্য হিংসাপ্রবণ নাট্যকারের ইঙ্গিতে উৎসব-মুখর জীবননাট্য বিয়োগান্ত হয়ে গেল।

দারিদ্র্যে, অপমানে, অবহেলায় সুমিত্রা কখনো কাঁদেনি। অসাফল্যেও তার চোখে কখনও জল আসেনি। দুঃখের আগুনে পোড়া সুমিত্রার কঠিন মন আজ কামনার কাছে হার মেনে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো।

বেশ একটু বেলা হলে ঝি এসে ডাকাডাকি করতে তার ঘুম ভাঙলো। ছুটির দিন। ইচ্ছে করলে সে কলকাতায় চলে যেতে পারতো, কিন্তু সম্বর্ধনার আয়োজনে সম্মতি দিয়ে সে, সে পথও নষ্ট করেছে।

সমস্ত দিন কেটে গেল। বিকেল বেলায় সুমিত্রা প্রতীক্ষায় রইলো শ্যামলের আসবার। কতবার দরজা খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো, তবুও শ্যামলের দেখা পেলো না। সেদিনও না, তারপর দিনও না এমন কি তারপরের পরদিন পর্যন্ত সে এলো না।

আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে সুমিত্রা ঝিকে পাঠালো শ্যামলের খোঁজ করতে। ফিরে এসে ঝি বললে—"শ্যামল খেলা করছিলো, তাকে সে কত ডাকলো, কত লোভ দেখালো, সে কিছুতেই এলো না।"

সুমিত্রার মন আবার হাহাকার করে উঠলো।

ব্যর্থ রাত তার জীবনে নতুন নয়, কিন্তু সাফল্যের সম্ভাবনা একবার মাত্র উঁকি দিয়ে আবার মিলিয়ে যেতে তার বর্তমান জীবন একেবারে অসহ্য হয়ে উঠলো। কয়েকদিন পরে সম্বর্ধনার রাত এলো। অনেকদিন পরে সুমিত্রা আবার সাজসজ্জা করলো সভায় যাবার। বেশ পরিবর্তনে মনেরও খানিকটা পরিবর্তন হোলো। মিটিং হবে স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী উকিল এবং স্কুল কমিটির সভাপতির বাড়িতে। সম্বর্ধনার সমারোহ দেখে সুমিত্রা মুগ্ধ হয়ে গেল। সামান্য একটু নাচ গানের বন্দোবস্ত হয়েছে, একটা ছোট নাটিকা অভিনয়েরও বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সবাইকার দৃষ্টি তার দিকে, সবাইয়ের মুখে তার নাম উচ্চারিত হচ্ছে। কিন্তু সুমিত্রা লক্ষ্য করলো সভায় তার নামের পরেই আর একটা নাম লোকের মুখে মুখে ফিরছে, সে নামটি সুবোধবাবু নামধেয় কোন ব্যক্তির।

একজন প্রবীণ উকিল সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন। সুমিত্রাকেও তাঁর পাশে গিয়ে বসতে হলো। মাল্যদান করবার সময় স্কুলের মেয়েরা গান গাইলো। সভা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে সভাপতি ঘোষণা করলেন—এবারে কবি সুবোধকুমার শহরবাসীর পক্ষ থেকে সুমিত্রা দেবীকে মানপত্র প্রদান করবেন। সুমিত্রা উৎসুক চক্ষে সভার দিকে চেয়ে রইলো, কবি সুবোধকে আহ্বান করলে কে উঠে আসে দেখবার জন্যে। নিরাশ হলো না সুমিত্রা। চমৎকার পরিচ্ছন্ন একখানা মুখ। সর্বাঙ্গীন কৌমার্যকে সাদা পোষাকে ঢেকে দামী শাল গায় দিয়ে কবি সুবোধ আর্ট পেপারের একটা বাণ্ডিল হাতে করে তার পাশে দাঁড়ালো।

চমৎকার সুগন্ধে জায়গাটা ভরে গেল। সুমিত্রা ভাবতে লাগলো মনে মনে, আর কবে সে পুরুষ-দেহের উপস্থিতির ঘ্রাণ সম্বন্ধে এতো সচেতন হয়েছিলো। মনে পড়লো তার একজন বিশালকায় পরিশ্রমী পুরুষকে। ঘর্মাক্ত, পরিশ্রান্ত ছাড়া আর কোন রূপে সে তার কখনও দেখেনি।

এই বিশেষ দিকটা সুমিত্রার মনে আসতেই সে সমাগত অতিথিদের ভেতরে কাকে যেন খুঁজতে লাগলো। একপাশে দর্শকদের ভেতরে একটা শিশুর মুখ খুঁজে খুঁজে নিরাশ হলো।

সামান্য গৌরচন্দ্রিকার পর সুবোধবাবু অভিনন্দন-পত্র পড়তে লাগলেন। চমৎকার মিষ্টি গলা, গানের মত। তারপর সুমিত্রা বসে বসে তার নিজের গুণবর্ণনা শুনতে লাগলো। এমন কথাও শুনলো যে, তার দর্শনে নাকি পুণ্য সঞ্চার হয়, তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হলে স্কুলের ছাত্রীরা নাকি তাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে মহিমান্বিত করতে পারবে। তার পরে এলো নাটিকা অভিনয়ের পালা। কবি সুবোধের পাশাপাশি বসে অভিনয় দেখতে দেখতে তার সঙ্গে সুমিত্রার পরিচয় হল। অবশেষে সুমিত্রা এই মার্জিত-রুচি, সৌজন্যসম্পন্ন ভদ্রলোকের ছোঁয়াচ মনের মধ্যে এনে বিগত দিনের মানসিক অশান্তি কিছুটা পরিমাণে দমন করতে পারলো।

কবি সুবোধের সঙ্গে পরিচয়ের পরদিন থেকে সুমিত্রার জীবনে নৈতিক দুর্দিনের সূত্রপাত হলো। কবি সুবোধের চরিত্রের সুনাম এতই বেশী যে, প্রকাশ্য রাস্তায় কথা বলতে সুমিত্রার সংকোচ বোধ হয় না। কবির জনপ্রিয়তা এবং বদান্যতার আদর্শকে আজ পর্যন্ত কেউ অস্বীকার করেনি। সভ্য-জগতের আবহাওয়ায় দিনের আলোয় সুমিত্রা থাকে একরকম; কিন্তু রাত্রের নিঃসঙ্গতার মধ্যে সে যেন হাঁপিয়ে ওঠে। তাই অনেকদিন পরে মধ্যরাত্রে তার জানলায় কে একজন আস্তে আস্তে আঘাত করছে শুনতে পেয়ে সে বিনা জিজ্ঞাসায় দরজা খুলে দিলো।

প্রথম প্রথম কয়েকদিন তারা শ্যামলের কুশল প্রশ্নের আদানপ্রদান করতো। ক্রমে তাও বন্ধ হয়ে গেল। দিনের বেলায় সুমিত্রার জীবনে কবি সুবোধ সূর্যের মত অন্যান্য গ্রহকে অবলুপ্ত করে দেয়, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসতেই সুমিত্রার মনের আকাশও ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসে। এমনি করে শীত গেলো, বসন্ত এলো। কবি সুবোধ ফুল ফোটার কাব্য শোনালো। সারারাত কাটে সুমিত্রার দিনের বেলায় শোনা মহাকাব্যের সুরে গাওয়া জীবনের গান শুনে। কবি বর্ষার গান শেষ করলো। ঘূর্ণমুখর রাত্রে প্রশস্ত বক্ষের ওপর মাথা রেখে নিশ্ছিদ্র ঘরে, নিরাপদে শ্রাবণ রাগিণীর মধ্যে কবির কণ্ঠস্বর শুনতে শুনতে হেমন্তের দিনে এসে পেঁছুলো।

অত্যন্ত সুসভ্য নাগরিকের ভঙ্গীতে একদিন কবি সুবোধ সুমিত্রার কাছে বললো—এমন করে তো আর দিন কাটে না সুমিত্রা!

আর একদিন রাত্রে আর একজন তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করলো। যুক্তি দেখালো যে, এরকম লুকোচুরির মধ্যে সামাজিক এবং অন্যান্য অনেকরকম অসুবিধা আছে।

আজ সুমিত্রা তার জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার অধ্যবসায় সম্পূর্ণ তার দিকে চলেছে; কিন্তু সে মন স্থির করতে পারছে না। রাত্রি এবং দিনের মাঝখানকার দ্বন্দ্বের সমাধান করতে পারছে না।

সুমিত্রার কাছে সব এলো; কিন্তু শ্যামল তো ফিরে এলো না! দিনের আলোয় পরিচিত সত্যিকারের মানুষকে সে রাতেও দেখেছে, সেদিক থেকে তার আন্তরিকতা থাকলেও কৌতূহল খুব বেশী নেই, কিন্তু যে মানুষকে দিনের পর দিন পরখ করেছে, তার তরফের অহোরাত্রের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য সে করবে কোন্ যুক্তিতে!

"জানো, শ্যামল তো আর এলো না? একদিন তাকে আনতে পারো না? কি যে তার হলো!" সুমিত্রা যার কাছে অভিযোগ করে, সে তার কোন জবাব দিতে পারে না।

সুমিত্রা তো নিশ্চিন্ত হতে পারে কবি সুবোধের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়ে। ভবিষ্যতের কবিকুঞ্জে কবি-প্রিয়া হয়ে বসবে সুমিত্রা। নিঃশঙ্ক পবিত্র জীবন। তার নিজেরই দুটি একটি সন্তান ছুটোছুটি করে বেড়াবে কুঞ্জের সামনেকার অঙ্গণে, তাদের দিকে স্নেহপূর্ণ নয়নে চেয়ে থাকবে সুমিত্রা, সর্বসময়ে সর্বপ্রকার আনন্দের প্রতিজ্ঞা নিয়ে কবি উপস্থিত থাকবে; কিন্তু শ্যামল! কবির ছেলেরা কবির মতই অমনি সভ্য ভদ্র, পৃথিবীতে শান্তিপ্রতিষ্ঠার অগ্রগামী দলের ভবিষ্যৎ নিয়ে জন্মাবে। কখনো হয়তো জোরে কাঁদবে না, কখনো হয়তো কারো ওপরে দাবী জানাতে শিখবে না। চোখে স্বপ্নের ঘোর নিয়ে তারা জন্মাবে, মানুষকে মাটি থেকে উঁচু করতে পারবে না, শুধু মানুষের মনকে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

শ্যামলের জন্যে সে অনেক দাম দিয়েছে, কিন্তু চিরদিন কি সে তা পারবে! সুমিত্রার দিনের চৌরভীতি রাত্রের ডাকাতদের অভিযানের হাত থেকে বাঁচাবে বলে শ্যামল হাতে অস্ত্র নিয়ে সজাগ হয়ে বসে থাকবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলো, অজ্ঞাতে তার শক্ত মুষ্টিশিথিল সে অস্ত্র মাটিতে পড়ে গেছে। সুমিত্রা কি করবে, কোথায় যাবে!

হঠাৎ একদিন রাত্রে সুমিত্রা স্বপ্ন দেখলো, শ্যামল আসছে। স্বপ্নের ঘোরে অন্তরাত্মার মাঝখানে তার উপস্থিতি সে অনুভব করলো।

তার পরদিন সুমিত্রা কবি সুবোধের প্রস্তাবে সম্মতি দিলো।

কিন্তু সম্মতি দেবার পরদিন থেকেই সুমিত্রা যেন শুকিয়ে যেতে থাকলো। কবি সুবোধ উদার, তার প্রতি স্নেহশীল। কিন্তু সে যদি তাকে বুঝতে না পারে!

রাত্রে সুমিত্রা দুঃস্বপ্ন দেখে তার কবি কুঞ্জবনে কবির পাশে সে বসে আছে। তার শ্যামল, তার দুর্দান্ত শ্যামল তাদের সামনে খেলা করে বেড়াচ্ছে। সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকে দেখতে দেখতে কি যেন বলতে গেল কবিকে, কিন্তু পাশের দিকে চেয়ে দেখলো কবি সেখানে নেই।

অকারণে সুমিত্রা শুকিয়ে যেতে লাগলো। কবি তাকে এই আবহাওয়া থেকে অন্যত্র নিয়ে চলেছে।

সুমিত্রা কি ভালো হবে! কে তাকে নিশ্চিন্ত করবে।

পুস্তক পরিচয়

বাহির বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ:—শ্রীশিশির সেনগুপ্ত ও শ্রীজয়ন্তকুমার ভাদুড়ী প্রণীত; প্রকাশক—দেশবন্ধু বুক ডিপো; ৫৪-এ, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা; মূল্যে ২৷৷০; ১২৮ পৃষ্ঠা।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ভারতে যে সার্বভৌম শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত, তাহা পাঠক সাধারণকে বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। কিন্তু বাহির-বিশ্বে অর্থাৎ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তিনি যে সমাদর লাভ করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে এ দেশের পাঠক সাধারণের কথঞ্চিৎ ধারণা থাকিলেও সে সমাদর যে কতখানি, পাশ্চাত্য সমালোচকগণের নানা দৃষ্টিকোণ হইতে তাঁহাকে যে কিভাবে দেখা হইয়াছিল এবং তাঁহার শ্রদ্ধা-নিবেদনের ব্যাপার লইয়া পৃথিবীর জার্মাণ, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের মধ্যে যে কিরূপ রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, ইত্যাদি ধরণের নানা কৌতূহলপ্রদ ও জ্ঞাতব্য বিষয় গ্রন্থকারদ্বয় পুস্তকখানিতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। পাশ্চাত্যের বহু সাময়িক পত্রিকা হইতে তাঁহারা তাঁহাদের গ্রন্থের তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। ১৯৩১ সালে রবীন্দ্রনাথের নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে ইউরোপ ও আমেরিকায় যে সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল অভিমত প্রকাশিত হইয়াছিল, তদুৎ দেশের সংবাদপত্রগুলির অংশবিশেষ হইতে তাহাও এই গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষভাগে বিদেশে রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও তৎকর্তৃক রচিত বাঙলা গ্রন্থাবলী এবং তৎকর্তৃক সম্পাদিত নানা গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রের বর্ষানুক্রমিক ধারাবাহিক সূচী সন্নিবেশিত হওয়ায় রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠকগণের যথেষ্ট সাহায্য হইয়াছে। এই গ্রন্থ প্রণয়নে দুষ্প্রাপ্য বিষয়সমূহ সংগ্রহে লেখকদ্বয় যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকখানি সমালোচনা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিও ঐ সমস্ত সমালোচনা গ্রন্থের সহিত পাঠ করিলে সমগ্রভাবে রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠে যথেষ্ট সহায়তা হইবে এবং পাঠকগণের শ্রম স্বীকার ও জ্ঞানার্জন পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিবে। গ্রন্থখানির যথেষ্ট সমাদর হইবে, আমরা এই আশাই করি।

নষ্টচাঁদ (কবিতা-সংগ্রহ)—শ্রীঅজিত দত্ত প্রণীত; ২০২, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত; মূল্য ১৷৷০; ৩২ পৃষ্ঠা।

সাম্প্রতিক মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থখানির অধিকাংশ কবিতা রচিত। মহাযুদ্ধের মারণ-যজ্ঞের ভয়াবহ রূপ এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফলাফল লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবির মনে যে ছায়াপাত করিয়াছে, তাহাই তাঁহার বলিষ্ঠ ও ব্যঞ্জনাময় ভাষায় সুন্দর ছন্দোবদ্ধ হইয়া কাব্যরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। রসভূয়িষ্ঠ কবিতার ক্ষেত্রে আধুনিক দুর্ভিক্ষের যুগে তাঁহার কবিতাগুলি পাঠে আনন্দলাভ করিলাম। পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ, প্রচ্ছদ উৎকৃষ্ট।

তমসাবৃতা (ছোট গল্প):—প্রশান্তি দেবী প্রণীত; প্রকাশক—বাসন্তী পাবলিশার্স; ২৪।এ, আমহার্স্ট রো, কলিকাতা; মূল্য—২, টাকা; ২৫৫ পৃষ্ঠা।

আলোচ্য পুস্তকখানিতে তমসাবৃতা, অপমৃত্যু, হাইফেন, এক যাত্রায়, এমন কেন হয় ও সাহসিকা—এই ছয়টি গল্প স্থান পাইয়াছে। এখানি লেখিকার প্রথম গ্রন্থ হইলেও, ইহা হইতে তাঁহার ছোট গল্প রচনার যে পরিচয় পাওয়া গেল, তাহা তাঁহার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথাই মনে জাগ্রত করে। কোন কোন গল্পের প্লটে বিশেষ নূতনত্ব না থাকিলেও সাবলীল ভাষা, ঘটনার সমাবেশ ও ছোট গল্পের আঙ্গিকের দিক দিয়া গল্পগুলি সুখপাঠ্য হইয়াছে।

ভাঙা তলোয়ার (কবিতা সংগ্রহ):—জুলফিকার হায়দার প্রণীত; প্রকাশক—মৃত্তিকা গ্রন্থনী বিভাগ, ১৭-বি, তারক দত্ত রোড, বালিগঞ্জ, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত; মূল্য সাধারণ সংস্করণ—১৷৷০, রাজসংস্করণ—২, টাকা; ৩২ পৃষ্ঠা।

লম্বা-চওড়া অভিনব আকারের, লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্রশিল্পী জয়নুল আবেদীন কর্তৃক সুদৃশ্য প্রচ্ছদে আবৃত এই গ্রন্থের সুলিখিত কবিতাগুলি পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিলাম। স্থানে স্থানে ছন্দের সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য হইলেও এই গ্রন্থের কবিতাগুলি নির্ভীক স্পষ্টবাদিতায়, সুতীক্ষ্ণ তেজস্বিতায়, যুগোচিত বলিষ্ঠ ভাবধারায় ও সুন্দর ভাষায় প্রাণবন্ত। যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর যুগের সমস্যাগুলি তাঁহার মনে যে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার অভিব্যক্তি কতকগুলি কবিতায় পাওয়া যায়। নিপীড়িত মানবতার জন্য তাঁহার ক্ষুব্ধ মর্মবেদনা অত্যন্ত করুণ অথচ অনুপ্রাণনাময় ও তেজোগর্ভ। কোন কোন কবিতায় তাঁহার উদার জাতীয় মনোভাব চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন,—

"পিছনের রোষদীপ্ত, কষায়িত চক্ষের লালিমা,
প্রচণ্ড বহ্নিসম তেজোদৃপ্ত শাসনের ভয়,
জরাজীর্ণ শতছিন্ন কংকালের পায়
এই তুচ্ছ সমাজের রক্তচক্ষু নারিবে রোধিতে মোরে।

*　　*　　*　　*

বুভুক্ষার অন্তহীন অসহ্য বিলাপে নাহি কর্ণপাত
দীর্ণ করে শুধু এই ধরণীর বুক......
ধরা পৃষ্ঠ হতে এই কলংক-কালিমা
মুছিয়া ফেলিতে হবে;
বিলুপ্ত করিতে হবে এই জঘন্য কালিমা,
উৎপীড়ন, অবিচার, অত্যাচার যতো।"

তাঁহার তলোয়ার ভাঙা হইলেও ক্ষতি নাই, হৃদয়-বলই হইল প্রধান কথা:—

"তলোয়ার ভেঙে গেছে ক্ষতি নাই,
তবু, বুকের বল যেন নাহি ভাঙে,
অনুক্ষণ সচেতন থেকো ভাই।
বাঁচার প্রয়োজন যদি করতেই হয় মরণ বরণ,—
মৃত্যু যদি অলক্ষিতে সহসাই আসে
বীরের লাশ রণভূমিতে রক্ত-স্রোতেই ভাসে,
সে হবে মহামৃত্যু, সে মৃত্যুর তুলনা নাই।
ভীরুর বাঁচার চেয়ে বীরের মরণ লক্ষ গুণে শ্রেয়
জানিস নাকি ভাই?—
ওরে আমার দিল-পিয়ারা, দুর্জয়, ভয়-হারা
বিপ্লবী বোন-ভাই।"
"কে আছ সাচ্চা, বীরের বাচ্চা,
যোগ্য অলোক-দূত,
এগিয়ে চল বুকে নিয়ে মজবুত—
ঈমানের বিদ্যুৎ।"
"মুছিতে কলংক-চিহ্ন,—
ঘুচাইতে পরাধীন দেশের দৈন্য,
দেখিতে আবার মাতৃভূমির নয়ালী মানচিত্র
আজাদীর গৌরবে মহীয়ান—
খারিজী নিশান বিচিত্র।"

কবি কাব্য-ক্ষেত্রে নবাগত হইলেও আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইতেছি। "ভাঙা তলোয়ার" তাঁহাকে কবি-খ্যাতির পথ প্রদর্শন করিবে।

তাঁহার স্বপ্ন সফল হোক। জাগরণের আহ্বানেও যাহারা ঘুমাইয়া আছে, তাহাদিগকে জাগ্রত করিতে তাঁহার লেখনী সার্থক হোক।

চীন রাষ্ট্র ও স্বাধীনতা সংগ্রামের পাঁচ বৎসর—প্রকাশক—চীন পাবলিশিং কোম্পানী; চুংকিং, চীন; ১৬৫ পৃষ্ঠা।

চীন সম্বন্ধে নানা জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ এই পুস্তকে চীনের সামরিক আয়োজন, রাজনীতি, অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, সমাজ; যানবাহন, পথঘাট, সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা ইত্যাদি নানা বিষয়ে চীনা লেখকগণ কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধের বাঙলা অনুবাদ সন্নিবেশিত হইয়াছে। সংক্ষেপে চীনের ইতিহাস ও বিস্তৃতভাবে যুদ্ধকালীন চীনের অবস্থা এই গ্রন্থ হইতে জানা যায়। এই দিক দিয়া প্রচার-পুস্তক হইলেও পুস্তকখানির ঐতিহাসিক মূল্য আছে। উৎকৃষ্ট কাগজে মনোজ্ঞরূপে মুদ্রিত এবং চীনের জাতীয় নেতৃবর্গের চিত্রে শোভিত।

যুগান্তরের গান (কবিতা-সংগ্রহ)—শ্রীসন্তোষকুমার পাল প্রণীত; প্রাপ্তিস্থান—মডার্ন বুক এজেন্সী; ১০নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা; মূল্য—১্; ৫৩ পৃষ্ঠা।

পুস্তকখানিতে ২৭টি সনেট ও দুইটি "কথা ও কাহিনী" পর্যায়ের কবিতা স্থান পাইয়াছে। কবিতাগুলির আলম্বনে নূতনত্ব ও রচনাভঙ্গীতে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় নাই। কাব্য-গ্রন্থখানির নাম "যুগান্তরের গান" হইলেও ইহাতে যুগান্তরের সন্ধান করিতে গেলে নিরাশ হইতে হইবে।

অবনীন্দ্রনাথ—শ্রীমনোজিৎ বসু প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যেমন বাঙলা সাহিত্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়া বিশ্বের দরবারে বাঙলার তথা ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন, শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথও তেমনি ভারতীয় শিল্পের নূতন প্রাণ সঞ্চার করিয়া সারা বিশ্বে শিল্পকলায় ভারতের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বস্তুত এই দুই মহামনীষীর প্রতিভার অবদানে ভারত শিল্প ও সাহিত্য গৌরবে সর্বত্র উচ্চাসনের অধিকারী হইয়াছে। শুধু শিল্পে নহে, সাহিত্যেও অবনীন্দ্রনাথের দান অপ্রচুর নহে। বিশেষ করিয়া শিশু সাহিত্য রচনায় তিনি যে নূতন ভঙ্গীর প্রবর্তন করিয়াছেন, ভারতীয় সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আলোচ্য গ্রন্থে মনোজিৎবাবু সংক্ষেপে অবনীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক কথাই আলোচনা করিয়াছেন। অবনীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার বিবরণ, তাঁহার শিল্পীজীবন শুরু হওয়ার কাহিনী, অভিনয় শিল্পী হিসাবে, আলাপচারী হিসাবে, সর্বোপরি মানুষ হিসাবে অবনীন্দ্রনাথের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও প্রতিভার পরিচয় লেখক রূপকথার মতই চিত্তাকর্ষক ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। লেখকের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি, ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই সর্বদিক দিয়াই বইখানা অনিন্দনীয় ও আকর্ষণযোগ্য হইয়াছে। (১৭২।৪৫)

জাপানী-যুদ্ধের ডায়েরী—শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক—এ মুখার্জি এণ্ড কোম্পানী, ২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য পাঁচ টাকা।

বিবেকানন্দবাবুর জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী বাঙলা সাহিত্যে ইতিপূর্বেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছে। লড়াইয়ের খবর গরম গরম যতই চমকপ্রদ লাগুক না কেন, এই উপন্যাস প্লাবিত বাঙলার পাঠকগণের নিকট যুদ্ধের বাসি খবরের উপর লিখিত আলোচনা খুব রুচিপ্রদ হওয়ার কথা নয় বলিয়াই সাধারণত লোকের ধারণা ছিল। জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী সে ধারণা ভুল প্রতিপন্ন করিয়াছে। যুদ্ধের সুনিপুণ ও চক্ষুষ্মান পর্যবেক্ষক হিসাবে তিনি যাবতীয় খুটিনাটি সঞ্চয়ের প্রতিই লক্ষ্য রাখিয়া এই বইয়ের প্রবন্ধগুলি রচনা করিয়া চলিয়াছিলেন। তাঁহার লেখার গুণে যুদ্ধও রীতিমত সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয় সংস্করণে বইটিতে প্রচুর নূতন তথ্য সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। এই যুদ্ধের পশ্চাদ্বর্তী রাজনৈতিক ইতিহাস, জাপানের নৌবল, বিমানবল ও স্থলসৈন্যের শিক্ষা এবং ব্রহ্ম, মালয়, ফিলিপাইন ও ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের যুদ্ধের নূতন তথ্য এই সংস্করণে গ্রন্থসন্নিবদ্ধ করা হইয়াছে। এ সকল কারণে প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা এই সংস্করণের উপযোগিতা সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। (১৫৭।৪৫)

বাংলার কথা

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসের নেতৃগণের বাঙলার বাহির হইতে বাঙলায় আগমনে বাঙলার পক্ষে নবোদ্যমে কার্যক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ ঘটিয়াছে। মহাত্মাজী কলিকাতা হইতে পূর্ব ও উত্তর বঙ্গেও যাইবেন স্থির ছিল। কিন্তু কার্যগতিকে তাহা সম্ভব হয় নাই। এবার তিনি 'শান্তিনিকেতন' হইতে আসিয়া মেদিনীপুর পরিদর্শনে যাইতেছেন। তাঁহার মেদিনীপুর পরিদর্শনে যাইবার কারণ সহজেই অনুমেয়। মেদিনীপুরে গত ১৯৪২ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসের আন্দোলন ফলে যত অনাচার ও অত্যাচার হইয়াছে, তত বোধ হয় বাঙলায় আর কোথাও হয় নাই। তমলুকে ও কাঁথিতে যেসব ঘটনা ঘটিয়াছিল সে সকলের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে।

সে সকল বিবরণ পাঠ করিলে "ব্ল্যাক অ্যান্ড ট্যানের" সময়ে আয়ার্লণ্ডে যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহাই মনে হয়।

যেভাবে লোকের মুক্তিকামনা দলিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় সন্দেহ নাই।

অবশ্য যাহারা অনাচারের নায়ক ছিল, তাহারা অনেকে ভারতীয়। কিন্তু তাহাতে কিছুই আইসে যায় না। বরং তাহাতে প্রতিপন্ন হয় দীর্ঘকালের পরাধীনতা মানুষকে অমানুষ করে।

আয়ার্লণ্ডে তাহাই দেখা গিয়াছে।

(১) যে আইরিশ পুলিশ আয়ার্লণ্ডের মুক্তিকামীদিগের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করিয়াছিল, তাহারা অনেকেই আইরিশ এবং চাকরীতে বহাল হইবার পূর্বে জাতীয়তার পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু ডাবলিনে পুলিশ ডিপোয় তাঁহারা পরিবর্তিত হয়। ফলে তাহারা জাতীয়তাবাদী স্বদেশীদিগের সহিত শত্রুতা করে এবং বেতন ও পদ বৃদ্ধিই জীবনের কাম্য বলিয়া মনে করিতে থাকে।

(২) ইয়ং বলিয়াছেন, বহু (ইংরেজ) জমিদার তাঁহাকে বলিয়াছেন, আইরিশ কৃষকরা দীর্ঘকালের অত্যাচারে যেরূপ ভাবাপন্ন হইয়াছিল, তাহাতে তাহারা জমিদারের ভোগার্থ পত্নী বা কন্যাকে পাঠাইতে আদিষ্ট হইলে তাহা আদরণীয় বলিয়া বিবেচনা করিত।

এদেশে যে লোকের অবস্থা সেরূপ হীন স্তরে অবনত হয় নাই, তাহাই আশার কথা এবং তাহাতেই বলা যায় এদেশের মুক্তিলাভ চেষ্টা সহজে সাফল্য লাভ করিতে পারিবে।

কংগ্রেস দেশের মুক্তিসংগ্রামে রত। যে আগস্ট আন্দোলন প্রবর্তিত হইবার সম্ভাবনা দেখিয়াই এদেশের ইংরেজ শাসকরা নেতাদিগকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন কংগ্রেস এখনও সেই আন্দোলন সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার পক্ষপাতী। সেকথা কংগ্রেসের ব্যবস্থা পরিষদে নির্বাচন বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে। তথাপি যে বড়লাট ওয়াভেল কলিকাতায় আসিয়া—যাঁহাকে দীর্ঘকাল বন্দী রাখিয়াছিলেন, সেই মহাত্মাজীর সহিত আলোচনা করিয়া গিয়াছেন এবং বাঙলার গভর্নর মিস্টার কেসী যে ৪ দিন তাঁহার সহিত ও আর একদিন কলিকাতায় সমাগত কংগ্রেস নেতৃগণের সহিত আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়—তাঁহারা পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন; তাঁহাদিগের দ্বারা দেশবাসীর মুক্তিকামনা দলিত করা সম্ভব নহে।

কেবল তাহাই নহে—"বিদ্রোহী" ও "বিপ্লবী" মহাত্মাজীর জন্য সরকারের রেল কর্তৃপক্ষ স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যবস্থা করিয়াছেন—বাঙলা সরকার তাঁহার মেদিনীপুর পরিভ্রমণের জন্য স্টীমলঞ্চ দিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। লঞ্চে তিনি যাইলে লাউড স্পীকার খাটান থাকিবে এবং সরকারী লঞ্চ হইতে কংগ্রেসী প্রচারকার্যও চলিতে পারিবে!

মেদিনীপুরের ২টি মহকুমার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও কলিকাতার ঘটনার বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই। তাহা প্রকাশিত হইলে মহাত্মাজী ও সভ্য জগৎ স্তম্ভিত হইবেন।

বাঙলার সমস্যার বৈশিষ্ট্য যে নাই তাহা নহে। বাঙলায় কেবল সরকারের নীতিই লক্ষ্য করিলে হইবে না। সরকারের ভেদনীতি বাঙলায় কিরূপ প্রবল হইয়াছে, তাহার পরিচয় আমরা কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদে সদস্য নির্বাচনে পাইয়াছি। মুসলমান নির্বাচন কেন্দ্রে যেরূপ গুণ্ডামী হইয়াছে, তাহাতে বলা যায়—নির্বাচনে নির্বাচকদিগের স্বাধীনতা রক্ষিত হয় নাই। আর মুসলিম লীগের অনুরক্ত ভক্ত খাজা স্যার নাজিমুদ্দীন সেই সব হাঙ্গামার সমর্থন করিয়া বিবৃতি প্রচারে লজ্জানুভবও করেন নাই।

কিন্তু বাঙলা যে কংগ্রেসের নীতির অনুসরণ করে—অমুসলমান কেন্দ্র মাত্রেই কংগ্রেস প্রার্থীর জয়ে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

এই কারণে বাঙলা সম্বন্ধে কংগ্রেসের দায়িত্ব যে বর্ধিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সেইজন্য বাঙলার লোক মনে করে—কংগ্রেসের নেতৃগণ বাঙলা সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত হইবেন। বাঙলায় যে কংগ্রেসী দলাদলিও নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। তাহা যত পরিতাপের ও লজ্জার বিষয়ই কেন হউক না তাহা স্বীকার করিতে হয়। সেই দলাদলির অবসান ঘটাইবার পূর্বে অধিকার যদি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুকে প্রদান করা না হয়, তবে বাঙলার ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল হইতে বিলম্ব ঘটিবে এবং তাহাতে যে ক্ষতি হইবে, তাহা কেবল বাঙলার নহে—কংগ্রেসের, সুতরাং সমগ্র ভারতবর্ষের।

মহাত্মাজী এবার অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল বাঙলায় থাকিয়া নিশ্চয়ই বাঙলার অবস্থার ও সমস্যাসমূহের বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়া যাইতেছেন। তিনি এখনও যে বাঙলার সমস্যা সম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই, তাহাতেই বুঝা যায়—তিনি সে বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছেন।

বাঙলায় আগমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—তিনি নির্বাচন সম্পর্কে বা রাজনীতিক কারণে বাঙলায় আসেন নাই। দুর্ভিক্ষে যাহারা বিপন্ন হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে থাকিয়া যথাসম্ভব সান্ত্বনা ও সাহায্য প্রদানই তাঁহার বাঙলায় আগমনের উদ্দেশ্য।

ইহা তাঁহারই উপযুক্ত কথা।

তিনি মেদিনীপুরে লক্ষ্য করিবেন—দুর্ভিক্ষে ও তাহার সঙ্গে রাজপুরুষদিগের ব্যবহারে বাঙলার সামাজিক ও অর্থনীতিক ভিত্তি শিথিল হইয়াছে। কিন্তু তাহার রাজনীতিক বিশ্বাসের ভিত্তি শিথিল হয় নাই। বাঙলার রাজনীতিক ভিত্তিতে থাকিয়া তাহার অন্যান্য ভিত্তি পুনর্গঠিত করিয়া তুলিতে হইবে।

মহাত্মাজী যে গ্রাম উদ্যোগের জন্য বহুদিন হইতে দেশবাসীকে প্রণোদিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন—তাহার সুযোগ বাঙলার বিপদের মধ্য দিয়া বাঙলায় আসিয়াছে।

সেই সুযোগের সম্যক সদ্ব্যবহারে তাঁহাকেই বাঙালীকে প্ররোচিত করিতে হইবে—তাঁহাকেই তাহার পথপ্রদর্শক হইয়া কংগ্রেসের দ্বারা কাজ করাইতে হইবে।

বাঙলার লোকের দেশসেবার আগ্রহ তাঁহার অজ্ঞাত নাই। বাঙলার যে সুভাষচন্দ্র তাঁহার পথের পথিক না হইয়া আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠনে অসাধ্যসাধন করিয়াছেন, তিনিও মহাত্মাজীর প্রতি তাঁহার অবিচল শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সুভাষচন্দ্র তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এতদিনে আমরা জানিতে পারিয়াছি। বাঙলায় উপযুক্ত উপকরণের অভাব নাই। যদি মহাত্মাজী সেই উপকরণের সদ্ব্যবহার করেন, তবে তিনি যে বাঙলায়ই তাঁহার প্রচেষ্টার প্রধান কেন্দ্র পাইতে পারিবেন, তাহা বলাবাহুল্য।

বাঙালী আজ তাঁহার নেতৃত্ব—তাঁহার উপদেশ—তাঁহার নির্দেশ চাহিতেছে।

কাহিনী নয় খবর

ভবঘুরে

চাষী-কুলী-সৈনিক-লাট

কয়েকদিন পরেই বাঙলার লাট সাহেব মিঃ আর জি কেসী বিদায় নেবেন এবং তাঁর যায়গায় নতুন লাট হয়ে আসবেন—সগুম্ফ বৃষস্কন্ধ স্যার ফ্রেডরিক জন বারোজ, তিনি তাঁর জীবনের গোড়ার দিকে সর্বপ্রথম চাষী ও রেলের কুলী ছিলেন। তারপর প্রথম মহাযুদ্ধে তিনি সৈনিক হিসাবে যোগ



বাঙলার ভাবী লাট ও তাঁর গৃহিণী—তাঁদের হিয়ার ফোর্ডশায়ারের কটেজের সামনে।

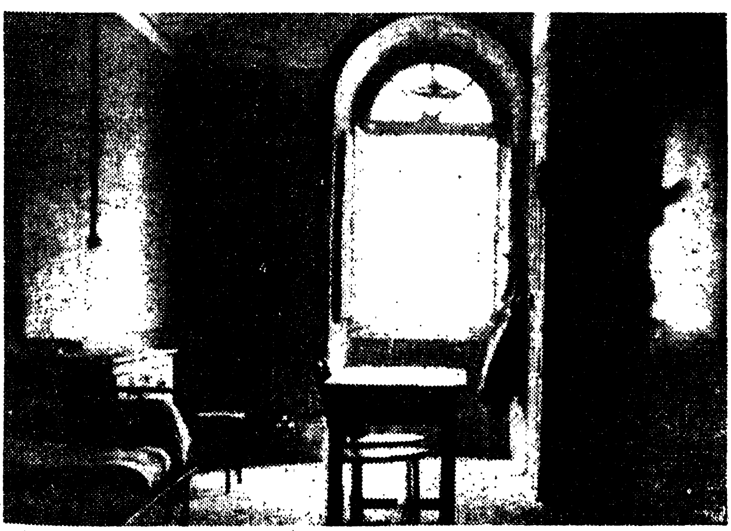
দেন এবং সার্জেণ্ট মেজরের পদে উন্নত হন। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত তিনি বৃটেনের রেল কর্মীসভার সভাপতিত্ব করেন। আর তারপরেই একেবারে এক লাফে বাঙলার লাটের গদীতে সমাসীন। সমাজতন্ত্রবাদ বৃটিশ সাম্রাজ্যে বিস্তার লাভ করেনি এর পরেও বলবে কে? ভাবী লাট বারোজ জীবনের গোড়ার দিকে রেলের টিকিট চেকারের চাকরী যখন করতেন তখন মাইনে পেতেন মাসে দুশো টাকার মতো। তিনিই এখন লাট সাহেব হয়ে এসে থাকবেন বাঙলার লাট প্রাসাদে। এর আগে তিনি কোথায় কিভাবে থাকতেন সে খবরটা জানতে পারেন নি তো? থাকতেন তিনি ইংলণ্ডের হিয়ার ফোর্ডশায়ারের একটি ছ'কামরাওলা সাধারণ কটেজে। ভাবী লাট গৃহিণীর নাম শ্রীমতী ডোরা বিয়েট্রিস বারোজ —মানুষটি কেমন তা জানি না, তবে তাঁর স্বামী বাঙলার লাটের পদ পাওয়ায়—তিনি উত্তেজিত না হয়ে বলেছেন—"আমরা নিশ্চয়ই বদলে যাব না—আমরা শ্রমিক মানুষ চিরদিনই তাই থাকবো। আমি নিজে হাতে সব কাজ করতে চেষ্টা করবো—বরাবর যেমন করে এসেছি। এখন আমাদের দরকার পোষাক পরিচ্ছদ করাবার জন্য কাপড়ের রেশনের কতকগুলি বাড়তি কুপন।" শ্রীমতী ডোরা বিয়েট্রিস বারোজের কথাগুলি মধুর তাতে সন্দেহ নেই—কিন্তু আমরা জানি বাঙলার মাটিতে পা দিলেই তাঁর মেজাজ বদলে যাবে। কারণ "যে আসে লঙ্কায় সেই হয় রাবণ।"

মার্শাল পেত্যাঁ কোথায়? কেমন আছেন?

একদা ফ্রান্সের যিনি অধিনায়ক ছিলেন—সেই মার্শাল পেঁতার বিচারে প্রাণদণ্ড হয়েছে—তারপর প্রাণদণ্ডের থেকেও তাঁকে রেহাই দেওয়া হয়েছে এসব খবর আপনারা পেয়েছেন—কিন্তু এখন তিনি কোথায় কিভাবে আছেন—সে খবর নিশ্চয়ই কেউ রাখেন না?



পিরেনিজ পর্বতে ঘেরা পোর্তাল দুর্গ



পোর্তাল দুর্গের এই কারাকক্ষে বর্তমানে পেত্যাঁ থাকেন।

পিরেনিজ পর্বতমালার উপত্যকাভূমি 'পোর্তালে'র নির্জন কারাদুর্গের ৬ নম্বর সেলে তিনি তাঁর জীবনের শেষের দিন ক'টি কাটাচ্ছেন। এই কারাদুর্গটির চারিদিকে কেবল পাহাড় আর জঙ্গল এবং এর চারধারের ২৫ মাইল এলাকা জুড়ে দিন রাত সশস্ত্র প্রহরীরা দাঁড়িয়ে আছে যে যার ঘাঁটি আগলে চারিদিকে কড়া নজর রেখে। বৃদ্ধ মার্শাল পেত্যাঁর সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর যোগাযোগ বলতে যা আছে তা হচ্ছে মাত্র কয়েকখানি বাছাই করা চিঠি। তিনি বাইরের কাউকেই চিঠি লিখতে পান না—মাত্র সপ্তাহে তিনখানি চিঠি লেখেন তাঁর স্ত্রীকে। এছাড়া মানুষ বলতে তিনি দেখতে পান—দু'জন ডাক্তার একজন পাদরীকে। এই পাদরীটি দুর্গের কাছাকছি 'উর্দোস' বলে ছোট্ট শহরটি থেকে রোজ সকালে আসেন—পেতাঁকে ধর্মকথা শোনাতে। মার্শাল পেত্যাঁ এঁদের সঙ্গেও খুব কম কথাবার্তা বলেন। বেশীর ভাগ সময়ই

তাঁর কাটে বই পড়ে। অস্কার ওয়াইল্ডের লেখা "Ballad of Reading Gaol" বইটাই তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বই, এছাড়া "Life of St. Aquinas" ও নেপোলিয়নের শেষ বন্দী-জীবনের বর্ণনাবহুল "Memorial of St. Helena" বলে বই দুটিও প্রায়ই তাঁকে পড়তে দেখা যায়। ৯৩ বছরের এই বৃদ্ধ বন্দীর জীবন এখনও যেভাবে প্রতিটি দিন কঠোর নিয়ম মেনে চলে—তা শুনলে অবাক হতে হয়! প্রতিদিন সকালে ঠিক আটটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঘুম থেকে ওঠেন—নিজেই নিজের বিছানা ঝাড়েন—মুখধুয়ে পোষাক বদলান—তারপর একবাটি স্যুপ খান—তারপর দাড়ি কামান। মধ্যাহ্ন ভোজনের ঘণ্টা বাজলে তিনি আর তাঁর প্রহরী একই রকম সাধারণ খাবার খান। সন্ধ্যা সাতটায় তিনি রাত্রিবেলার খাবার—দুপ্লেট ঝোল আর কিছু সব্জী সিদ্ধ খান। তাঁকে তাঁর ঘর থেকে বড় একটা বাইরে আসতে দেওয়া হয় না। তবে যদি দিনটা বেশ পরিষ্কার থাকে—তাহলে সকাল সন্ধ্যে তাঁকে দুর্গের প্রাঙ্গণে বেড়াতে আনা হয়। তাঁর ঘর থেকে ৩০টি সিঁড়ি বেয়ে এই প্রাঙ্গণে নেমে এসে তিনি বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েন—তাই সেখানে একটা পাথরের বেঞ্চে তিনি বসে পড়েন—বসে বসে চেয়ে থাকেন দূরে পিরেনিজ পর্বতমালার দিকে। হয়তো ভাবেন—এই নির্জনে থেকেই পিরেনিজের মতই তাঁর মাথা আজও উঁচু আছে।

সাহিত্য প্রসঙ্গ

বইপড়া

আদিত্য ওহদেদার

সেদিন World Digest (Sept. 1944) পত্রিকাখানার পাতা উল্টোতে উল্টোতে একটা লেখার ওপর চোখ আটকে গেল। লেখাটা C. E. M. Joadএর। New Statesman পত্রিকা থেকে digest অর্থাৎ চর্বণ করা হয়েছে। সাধারণ শিক্ষিত লোকের বইপড়ার অভ্যাস সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লেখক মন্তব্য করেছেন—

"Something, it is clear, is radically wrong with our educational system if we are to judge by results, of which one is the bringing up and sending into the world of a generation of young people who taking them by and large are without desire to read or the habit of reading."

অর্থাৎ আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে মূলত এমন কোন দোষ আছে, যার ফলে আমরা দেখতে পাই যে, শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বইপড়ার ইচ্ছে বা অভ্যাস নেই। এই মন্তব্যের মূলে সত্যি কতখানি, তা যাচাই করবার আগ্রহ লেখককে পেয়ে বসল। তাঁর মন বল্লে, রেলে বেড়াবার সময় শতকরা একজনকেও বই হাতে দেখা যাবে না। কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে শাসন করলেন এই বুঝিয়ে যে, নিশ্চয়ই এটা অতিশয়োক্তি। তবু পরীক্ষা করাই যাক্ না। তাই লেখক শুরু করলেন যাত্রা। এডিনবরা থেকে লণ্ডন রেলে ন-ঘণ্টার রাস্তা, এবার ট্রেন আরও ঘণ্টাখানেক সময় বেশী নিলে। গাড়িটা সৈন্যদলে ভর্তি ছিল। (এখানে বলে রাখা ভাল যে, এ সৈন্যদল আমাদের 'রংরুট' নয়। এরা সকলেই শিক্ষিত যুবক—বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ প্রায় বেশীর ভাগের ওপরেই মারা। লেখক লক্ষ্য করতে লাগলেন: আপোষে কথাবার্তা বলা বাইরের দৃশ্য দেখা—সবই ক্রমে ঢিমে হয়ে এল। তারপর সব চুপচাপ—ঘণ্টার পর ঘণ্টা একঘেয়ে ভাবে বসে থাকা শুধু। প্রত্যেকের মুখ দেখে বোঝা যায় যে, এই একঘেয়েমি ভাল লাগছে না; কিন্তু কি বা করা যায়, উপায় কি? অথচ বই পড়ে এই চুপচাপ একঘেয়েমি কাটানোর কথা কারুরই মনে এল না! লেখক একটি একটি করে গুণে দেখলেন তাঁর সঙ্গী যাত্রীদের—সংখ্যায় তারা একশ-চার। তবে কেউ কি সত্যি একেবারেই বই হাতে নেয় নি? তা অবশ্য নয়। কেননা, লেখক শেষ পর্যন্ত একটি পাঠক আবিষ্কার করলেন—তিনি পড়ছিলেন, New orchards for Miss Blandish অর্থাৎ আমাদের 'নীল-বসনা সুন্দরী' গোছের পুস্তক আর কি!

আমাদের রাজার দেশে যদি এই অবস্থা, তবে অভাগা এই প্রজার দেশের হালটা সহজেই অনুমেয়। সম্প্রতি কিছুদিন মেসে ছিলাম। জনকুড়ির প্রায় সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ সিঁড়ি পার-হওয়া। যুদ্ধ-চাকরির কল্যাণে মাসিক আয় বেশ মোটাই বলা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সিগারেটের প্যাকেটের সঙ্গে পাঁচ-দশ টাকার বই অনায়াসেই কেনা চলে, অথবা স্থানীয় লাইব্রেরীতে সভ্য হওয়াও যায়। কিন্তু কাউকেই বই-বস্তু হাতে নিতে দেখিনি। অথচ ছুটির দিনে তাঁদের সময় নাকি কাট্‌তে চায় না!

—কোন একটা ভাল সিনেমা নেই, মশাই!

—দূর, দূর—এ শহরে আবার লোকে থাকে। মাসখানেকের মধ্যে ভাল ছবি আসবার নাম নেই!

—চলুন মশাই, তাসই পেটা যাক্। সময় কাটুক।

—তাই বা সব ছুটির দিনে ভাল লাগে কৈ।

—যাকগে, ঘুমই দেওয়া থাক।

এই রকম কতদিন, কত রাত দেখেছি তাঁদের বিব্রত হতে—কিন্তু তবু বই পড়ে খানিক সময় যে কাটতে পারে, এমন কল্পনা তাঁদের মনে উদয় হতে দেখি নি।

বইপড়ার যেটুকু অভ্যাস থাকে, সেটুকু শুধু সস্তা উপন্যাস, গল্প ও যৌন-আবেদন-মূলক মাসিকপত্র ঘিরেই। একটু সিরিয়স্ কিছু পাঠ—সেটা আর থাকে না। অনেক রাত অবধি জেগে, অনেক নোট মুখস্থ করে, অনেক অথরিটি ঘেঁটে আমরা বি-এ, এম-এ পাশ করি; কিন্তু পাশ করবার পরেই বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করি। সুতরাং বুঝতে হবে, আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে সত্যই মূলত কোন দোষ আছে। দোষের নানা কারণ হয়ত আছে; তবে আমার মনে হয়, সে দোষের একটা বিশেষ কারণ এই যে, আমাদের শিক্ষা বইয়ের সঙ্গে আমাদের আনন্দের যোগ ঘটাতে পারে না। এই আনন্দের যোগটা থাকে না বলেই বোধ হয় বইয়ের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা স্বাভাবিকভাবে অবিচ্ছেদ্য হয়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌তে পারে না। বইপড়ার অভ্যাসটা সাধারণের কাছে বিড়ম্বনা; যাদের অভ্যাস দাঁড়ায়, তাঁরা ব্যতিক্রম বলে গণ্য হন। শিক্ষিত গণমন বলবেন, বি-এ, এম-এ পাশ করবার সময় রাত জেগে বই পড়েছি, সেই তো হ'ল; আবার বইপড়া কি? পাস করার জন্যই তো বই। পাস যখন করেছি, তখন আর মাথাব্যথা করে লাভ কি? গল্প-উপন্যাস দু'চারখানা না হয় চলতে পারে, তার উপর আবার কি? মিছিমিছি বই পড়ে হবেই বা কি! ছাই বি-এ, এম-এ পাশ করে হ'লই বা কি? চাকরীর বাজারে এ-দোরে ও-দোরে ঘা খেয়ে খেয়ে তো ষাট্‌টি টাকার কেরানী আজকাল না হয় যুদ্ধের বাজারে দুটো পয়সার মুখ দেখতে পাচ্ছি। মশাই, টাকাই হল সব, বই-টইয়ের ধার ধেরে লাভ কি?

সুতরাং সাধারণ শিক্ষিত অবিবাহিত যুবকের ঘরে যদি যাই তো দেখা যাবে—বই বলে কোন বস্তু নেই, আর যদিও থাকে তে সেই ছাত্রাবস্থার বইগুলি, নয়ত-বা সিনেমা-সাপ্তাহিক অথবা যৌন-মাসিক।

আর বিবাহিত যাঁরা—তাঁদের কথা শিরসি মা লিখ। বিয়ে-থা' করে বইপড়া কোন পাগলের খেয়াল এ?

অথচ এঁরাই একদা মোটা মোটা সিরিয়স বই লাল-নীল পেন্‌সিলে দাগ কেটে কেটে পড়েছিলেন! সেইটুকুই মূল্যবান স্মৃতি।

বৈদেশিকা

কিছুদিন আগে মেজর জেনারেল হার্লি চীনে মার্কিন রাজদূতের পদ ত্যাগ করিয়াছেন। কাজে ইস্তফা দিবার তিনি যে যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন যে, মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগের নীতির অনিশ্চয়তাই তাঁর পদত্যাগের মূল কারণ। কিন্তু তাঁর মতে এই মতিস্থিরতার অভাবের জন্য ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধতা প্রধানত দায়ী। ইংরেজ, ডাচ প্রভৃতি চীনের ঐক্য চায়না। ইহারা জানে যে, চীন ঐক্যবদ্ধ ও ক্ষমতাশালী হইলে সুদূর প্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদের অবসান হইবে। এই পরিণতি ইহাদের কাহারও কাম্য নয় বলা বাহুল্য এবং মার্কিন উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে কেহ কেহ এই বিষয়ে ইউরোপীয়দের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। জেনারেল হার্লি মনে করেন যে, মার্কিনদের এই মতদ্বৈধের দরুণ চুংকিং ও ইয়ানানের বিরোধ ক্রমেই বাড়িয়াছে এবং বর্তমান গৃহযুদ্ধে পরিণত হইয়াছে। জেনারেল হার্লি সম্প্রতি বলিয়াছেনঃ—

"I think there was no question that the policy of helping China had the support of Britain and Russia. **But it definitely did not have the support of the imperialist civil servants of Britain in Asia and it did not have the support of the Netherlands imperialists.**"

(আমি মনে করি যে, চীনকে সাহায্য করা সম্বন্ধে বৃটেন ও রাশিয়ার উৎসাহের অভাব ছিল না। কিন্তু ইহা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সিভিল সার্ভেণ্ট ও ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদীদের এ বিষয়ে কোন সহানুভূতি ছিল না।)

তৎপূর্বে পদত্যাগ করিবার সময় তিনি লিখিয়াছিলেনঃ—

"In diplomacy today we are permitting ourselves to be sucked into the **power bloc on the side of Colonial Imperialism against Communist Imperialism.**"

(কূটনীতিতে আমরা আজ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের শক্তিচক্রের আবর্তে পতিত হইতেছি এবং ইহাকে কম্যুনিস্ট সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাহায্য করিতেছি)

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে,

"Professional American foreign service men sided with Chinese Communist Party and the Imperialist block of nations whose policy was to keep China divided against itself."

(বিদেশস্থ মার্কিন সরকারী কর্মচারীগণ চৈনিক কম্যুনিষ্টদের এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়াছেন যদিচ শেষোক্ত দেশগুলির নীতি চীনকে বিভক্ত রাখা।

"কুকুরের সহিত শীকার করা ও খরগোসের দৌড়ান" বলিয়া ইংরেজীতে যে প্রবাদ আছে এও খানিকটা সেইরকম। আসল কথা হইল যে, চীনের কম্যুনিস্টদের সহিত এই মার্কিন কর্মচারীদের সহানুভূতি মৌখিক মাত্র। চুংকিং ও ইয়ানানের মধ্যে ইহাদের সদ্ভাব হয় ইঁহারা চান না। জেনারেল হার্লির পরিবর্তে জেনারেল মার্শেল চীনের মার্কিন রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন ও সম্প্রতি প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান চীনের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বিশ্বের শান্তির জন্য চৈনিক ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। চিয়াং কাইশেকের গভর্নমেণ্টকে তিনি পূর্ববৎ মানিবেন বলিয়াছেন, কিন্তু সঙ্গে সর্বদল মিলিয়া একটা সম্মিলিত গভর্নমেণ্ট তৈয়ার করার আবশ্যকতাও স্বীকার করিয়াছেন। আমেরিকায় জনমত ক্রমশ চীন সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতেছে। ট্রুম্যানের বর্তমান বিবৃতি ইহার প্রমাণ। শুনা যায় যে, মস্কৌ কনফারেন্স চীন সম্বন্ধে পররাষ্ট্র সচিবদের আলোচ্য বিষয় হইবে। চীনের বিবাদে আমেরিকা যদি ভবিষ্যতে কোন হাত দিবে না স্বীকার করে তাহা হইলে এখনও সেখানে ঐক্য ও শান্তি স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সবটা নির্ভর করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীনের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে কিনা। যদি এখনও ইহার বিশ্বাস যে, ভবিষ্যতে এশিয়া প্রধানত ইঙ্গ-মার্কিনদের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের রঙ্গভূমি হইবে তাহা হইলে চীনের ঐক্য ও শান্তি স্থাপন অসম্ভব।

ইঙ্গ-মার্কিন আর্থিক চুক্তি সম্প্রতি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। "ডলার কূটনীতি" (dollar diplomacy) দিয়া আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া এইভাবে আমেরিকা ইংলণ্ডকে বহুকালের জন্য নিজের দলে টানিল। ইংরেজ আর্থিক দুর্গতির হাত হইতে আপাতত রক্ষা পাইল বটে কিন্তু এই চুক্তিতে বৃটেনের ভবিষ্যৎ আর্থিক স্বাধীনতা নানাভাবে খর্ব হইবে সন্দেহ নাই। সেইজন্য Anglo-American financial Agreement সম্বন্ধে বিলাতের পার্লামেণ্টে যে আলোচনা হইয়া গেল তাহাতে রক্ষণশীল দল, দল হিসাবে কোন ভোট দেয় নাই। কিন্তু আমেরিকার কাছ হইতে ঋণ না নিয়া উপায় ছিল না। এই যুদ্ধের ফলে বৃটেন দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে। মার্কিনের সাহায্য ছাড়া ইহার আর্থিক পরিস্থিতির কোন উন্নতি সম্ভব নয়। ভয়ের কথা কেবল এই যে, এই চুক্তিতে ভারতবর্ষের আর্থিক ভবিষ্যতের নানা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িল। ভারতবর্ষের নিকট বৃটেনের যে অগাধ ঋণ জমিয়াছে তাহার কি হইবে এবং আমেরিকার সহিত ব্যবসায়ে ভারতবর্ষ কতখানি স্বাধীনতা লাভ করিবে তাহা এখনও অনিশ্চিত। বর্তমান অবস্থার খানিকটা পরিবর্তন হইবে সন্দেহ নাই তবে ইহাতে ভারতবর্ষের আর্থিক পুনর্গঠন কি পরিমাণ লাভবান হইবে তাহা বিবেচনার বিষয়। ইঙ্গ-মার্কিনরা তাহাদের আর্থিক আধিপত্য জগতের উপর চিরস্থায়ী করিতে চায়। এই চুক্তি দ্বারা পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ধারিত হইল। গৃহবিবাদ এইভাবে যতটা কমান যায় এই তার চেষ্টা।

রক্ষণশীল দল কিছুদিন আগে শ্রমিক গভর্নমেণ্টের উপর অনাস্থা দেখাইবার জন্য পার্লামেণ্টে একটা আলোচনার উদ্রেক করে। ইহার উদ্দেশ্য ছিল ঘরবাড়ী তৈয়ারী, সৈন্য দলের মুক্তি প্রভৃতি নানা বিষয়ে শ্রমিকদের অকৃতকার্যতা দেখাইয়া কয়লার খনি, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি ন্যাশনেলাইজেশন বা রাষ্ট্রীকরণ ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক নীতিকে দেশের চক্ষে হীন করা। কিন্তু চার্চিল প্রভৃতি রক্ষণশীল নেতাদের জনগণের প্রতি দরদ যে কেবল বাহিক তাহা কারও অজানা নাই। ব্যক্তিগত আর্থিক স্বাধীনতা ও অন্যান্য বুলিতে এখন লোক সহজে ভোলে না। এই যুদ্ধে প্রমাণিত হইয়াছে যে, আর্থিক জগতে অনেক জিনিস সমষ্টিগতভাবে করিলে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। আর পৃথিবীর আর্থিক প্রগতি দ্রুত এমন বৃহদাকার ধারণ করিতেছে যে, তাহাতে ব্যক্তির স্বাধীনতার কোন স্থান নাই। "রাষ্ট্রীকরণ" বর্তমান জগতের যুগ ধর্ম। শ্রমিকদের উপর রক্ষণশীলদের অনাস্থা ভোট গ্রহণকালে টিকিল না।

ব্রহ্মদেশের সমস্যা

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চন্দ

ব্রহ্মদেশে উপনিবিষ্ট ১০ লক্ষ ভারতীয়ের জীবিকা ও ধনসম্পদাদির প্রশ্ন ব্যতীত প্রতিবেশীর বিপদাপদের সহিত নিজের বিপদাপদ অবিচ্ছেদ্য ভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়াও ব্রহ্মদেশের সমস্যা ভারতের নিকট অনুপেক্ষনীয়।

প্রতিবেশী হিসাবে অতি প্রাচীনকালেই ভারতীয়েরা ব্রহ্মদেশে বা 'সুবর্ণ ভূমিতে' উপনিবেশ স্থাপন করে। বস্তুত চীন হইতে আসিয়া ৯ম শতাব্দীতে যখন বর্মীরা উত্তর ব্রহ্মে উপনিবেশ স্থাপন করে তাহার পূর্বেই ভারতীয়গণ দক্ষিণ ব্রহ্মে (থেটন ও পেগু বা কেদারম এবং প্রোম বা শ্রীক্ষেত্র অঞ্চলে) উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। পাগান বা হস্তিনাপুরে ৪০৬ খৃষ্টাব্দে গোপাল কর্তৃক হিন্দু রাজ্য স্থাপিত হওয়ার প্রমাণ আছে। সেই সব ভারতীয় তত্রত্য মোঙ্গলীয় জাতিদের সহিত মিলিয়া গেলেও তাহারাই ব্রহ্মদেশকে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সমন্বিত করে। তৎপর ভারতীয় অর্থবলে ও লোকবলে ১৮২৪ সনে টেনাসেরিম ও আরাকান ১৮৫৬ সনে পেগু অঞ্চল এবং ১৮৮৫ সনে উত্তর ব্রহ্ম বৃটিশ অধিকারে আসে। বৃটিশ প্রয়োজনে আনুপাতিকভাবে ভারতীয়ের সংখ্যাও তথায় ক্রমে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বর্মী বিদ্বেষের ফলে শেষ পর্যন্ত তথায় ভারতীয়দের অবস্থান প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠে।

ব্রহ্ম-ব্যবচ্ছেদের স্বার্থেই বর্মা-ভারতীয় বিদ্বেষ সৃষ্টি করা হইয়াছিল (ব্রহ্ম-চীন ব্যবচ্ছেদের প্রশ্ন নাই বলিয়া বর্মার লক্ষ লক্ষ চীনাদের বিরুদ্ধে ঐরূপ বিরোধ সৃষ্ট হয় নাই) এবং তাহারই ফলে ভারতীয় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার মতই (বাস্তবিক পাকিস্থান ও ব্রহ্ম-বিচ্ছেদ একই প্রণালীতে প্রোৎসাহিত) কয়েকটি বর্মী-ভারতীয় দাঙ্গাও তথায় হইয়াছে। কিন্তু বর্মাতে ভারতীয় বিদ্বেষ দ্বারা বৃটিশ-বিদ্বেষ শেষ পর্যন্ত কাটাইয়া উঠিতে পারা যায় নাই; সাধের পাকিস্থানেরও হয়ত তাহাই হইবে। মূলত এই বর্মী-বিদ্বেষের ফলেই ১৯৪২ সনে ইংরাজের পলায়নের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ ভারতবাসী ভারতে প্রত্যাবৃত্ত হয়, কিন্তু সরকারী অব্যবস্থার ফলে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী আসিতেই পারে নাই। বাস্তবিক বাহিরে ভারতবাসীর সংখ্যা ব্রহ্মদেশেই ছিল সর্বাপেক্ষা অধিক।

১৯৩৭ সনে ব্রহ্ম বিচ্ছেদ হয়, কিন্তু বর্মা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীনেই থাকে এবং বিলাতে ভারত সচিবই ব্রহ্ম-সচিবরূপে কার্য করিতে থাকেন। ভারতীয় অর্থে ও সামর্থ্যে ব্রহ্মদেশ বিজিত (এই জন্য ব্রহ্ম-বিচ্ছেদের সময় ব্রহ্মের ভারতকে ৪৫ বৎসরে ৫০½ কোটি টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়) ও শিল্প বাণিজ্যে উন্নীত হইলেও (ভারতীয়রা ব্রহ্মে প্রায় ১০০০ কোটি টাকা ন্যস্ত করিয়াছে) ১৯৪১ সনে ইমিগ্রেশন আইন দ্বারা নূতন ভারতীয়দের ব্রহ্ম প্রবেশ কার্যত নিরুদ্ধ হয়। তৎপূর্বে ১৯৩৯ সনের ল্যান্ড এলায়েনেশন এ্যাক্টেও ভারতীয় স্বার্থ অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয়। ইহার ফলে ভারতীয়দের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইতেছিল যে, ব্রহ্ম তাহাদের পক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকায় পরিণত হইতে চলিল।

এই যুদ্ধে উত্তর আফ্রিকার ন্যায় ব্রহ্মদেশও প্রধানত ভারতীয়দের সাহায্যেই পুনর্বিজিত হইয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি আবার সুর তোলা হইয়াছে যে, বর্মীরা নাকি নূতন ভারতীয়দের ব্রহ্মপ্রবেশে আপত্তি করিতেছে। কিন্তু বর্মীরা ইংরাজের ব্রহ্মপ্রবেশেও আপত্তি করে নাই কি? ইংরাজের বেলায় ঐ আপত্তি উপেক্ষিত হইলে ভারতীয়ের বেলায় হইবে না কেন? ব্রহ্মস্থ ভারতীয়দের প্রত্যাবর্তনও (উহা রোধ করা বে-আইনীই হইত) অযথা বিলম্বিত হইতেছে। আগামী মার্চ মাস হইতে পূর্ণ এক বৎসরে ৪ লক্ষ ভারতীয়ের প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা হইয়াছে। যুদ্ধান্তে রুশ, পোল ইত্যাদির প্রত্যাবর্তন গতির সঙ্গে ইহার তুলনা হইতে পারে কি? ব্রহ্ম বিজয়ের কালে তথায় ভারতবাসীর উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় হইলে (ব্রহ্মবিজয়ে নিযুক্ত মিত্রপক্ষের মোট ১০ লক্ষ সৈন্যের মধ্যে ভারতীয় সৈন্যই ছিল ৭ লক্ষ) এখন তথায় বসবাসের কালেও হইবে। ঠেকার বেলায় ঠাকুর, ঠেকা ফুরালে কুকুর—এই নীতি চলিবে না। কেবল বসবাস ও বাণিজ্যাদি অসামরিক বিষয়ে নয়, সামরিক ব্যাপারেও ব্রহ্মদেশের প্রয়োজনীয় সহযোগিতার ব্যবস্থা ভারতবর্ষকে করিতে হইবে। এই যুদ্ধেই সাব্যস্ত হইয়াছে যে, ভারতের বহিঃসীমা সিঙ্গাপুর ও কাইরো পর্যন্ত। কাজেই ব্রহ্ম সম্পর্কে ভারতবর্ষ উদাসীন থাকিতে পারে না।

ভারতের সহিত বাস্তবিক সিংহলের মত ব্রহ্মদেশও সামরিক ও অসামরিক ব্যাপারে এত অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত যে, তাহাদের মধ্যে বৈদেশিকের মত আচরণ অসম্ভব। উপরোক্ত ভারতীয় বিদ্বেষ সত্ত্বেও নিজ স্বার্থেই ব্রহ্ম ১৯৪১ সনে ইন্দো-বার্মা বাণিজ্য চুক্তি দ্বারা এই ব্যবস্থা করিয়াছিল যে ব্রহ্মদেশে ভারতীয় মাল বৃটিশ সাম্রাজ্যের অপরাংশ হইতে শতকরা ১০ ভাগ এবং সাম্রাজ্য বহির্ভূত মাল হইতে শতকরা ১৫ ভাগ বেশী সুবিধা পাইবে। ইহার স্বাভাবিক কারণ এই যে, ব্রহ্মদেশের সমস্ত বৈদেশিক আমদানীর (সর্বমোট প্রায় ২৩ কোটি টাকার বস্ত্র, লৌহ, কয়লা ইত্যাদি) প্রায় ৫৫ ভাগ ছিল ভারতীয় এবং সমস্ত বৈদেশিক রপ্তানির (সর্বমোট প্রায় ৫০ কোটি টাকার চাউল, তৈল, কাঠ প্রভৃতি) শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ ছিল ভারতে। এখন আমেরিকার লীজ-লেন্ড-এর চাপে বৃটিশ সাম্রাজ্য হইতে যদি ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স উঠিয়াও যায়, তবুও ভারত-ব্রহ্মের পূর্ব ইতিহাস ও স্বাভাবিক আর্থিক সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া উপরোক্ত ভারত-ব্রহ্ম প্রেফারেন্স রাখিতেই হইবে।

বার্মা নিতান্ত ক্ষুদ্র দেশ নহে (২৬০০০০ বর্গমাইল) কিন্তু লোকসংখ্যা দেশানুপাতে সামান্য (১৬৮ লক্ষ মাত্র) এবং তাহাও অনুন্নত। কিন্তু ব্রহ্মে স্বাভাবিক সম্পদ অসামান্য। ১৯৩৭ সনে তথায় বর্মা অয়েল কোম্পানী তিন কোটি গ্যালন তৈল বাহির করে, নামটুর সিলভার মাইনিং কর্পোরেশন নামক অপর ইংরাজ কোম্পানী কোটি কোটি টাকার রূপা উত্তোলন করিয়াছে। ১৯৩৮ সনে ২১২৮২৭ ক্যারেট রুবি ও সেপায়াল উত্তোলিত হইয়াছিল। বাহাদুরী কাষ্ঠে ব্রহ্ম সরকারেই খরচান্তে বাৎসরিক আয় প্রায় তিন কোটি টাকা। বার্মায় বাৎসরিক প্রায় ৩০ লক্ষ টন উদ্বৃত্ত চাউল হয়। কিন্তু শিল্পসম্পদে ব্রহ্ম ভারতের মতও অগ্রসর হয় নাই। কাচ, চিনি, চামড়া, কাপড়, কাগজ, লৌহ ইত্যাদির কারখানা তথায় বিশেষ প্রয়োজন। ইংরাজ শাসনাধীনে সোয়াশত বৎসরেও প্রয়োজনীয় ভারত-ব্রহ্ম রেলপথটি না হইলেও মাত্র তিন বৎসরের জাপ শাসনে ব্রহ্ম-শ্যাম রেলপথ তৈয়ার হইয়াছে (জাভাতেও ৩ বৎসরের জাপ শাসনে যে উন্নতি হইয়াছে ইংরাজের মাসতুত ভাই ডাচদের ৩০০ বৎসরের শাসনেও তাহা হয় নাই)। এখন ভারত-ব্রহ্ম ও চীন-ব্রহ্ম রেলপথ স্থাপিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, ব্রহ্মদেশের নানা কৃষিজ ও খনিজ সম্পদ বৃদ্ধি ও নব নব শিল্পসম্পদ পরিবর্ধনের জন্য যে

শ্রম, মূলধন ও প্রচেষ্টা প্রয়োজন বর্মীদের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণ নাই। কাজেই মূলে বর্মীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ না করিয়াও এই সব কার্যে বহু ভারতীয় তথায় নিযুক্ত হইতে পারে। বিধ্বস্ত ব্রহ্ম পুনঃ সংস্থাপনের কার্যে অধিক দুঃস্থ হিসাবে অবশ্য ভারতীয় ইভাকুইদিগকেই প্রাথমিক সুযোগ দিতে হইবে। ব্রহ্ম স্বাধীন হইলেও ব্রহ্মের উপরোক্ত স্বাভাবিক স্বার্থেই ব্রহ্ম ভারতের সহিত উৎকৃষ্টতর ব্যবহার করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

কিন্তু ব্রহ্মের স্বরাজ পরিস্থিতিটা কিরূপ? বার্মা হস্তচ্যুত হওয়ার প্রাক্কালে ১৯৪১ সনের নবেম্বর মাসে ব্রহ্মসচিব আমেরি সাহেব ঘোষণা করেন যে যুদ্ধ শেষ হওয়ার অব্যবহিত পরেই যথাসম্ভব শীঘ্র ব্রহ্মকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনে সাহায্য করাই বৃটিশ সরকারের উদ্দেশ্য। রেঙ্গুন পুনর্বিজয়ের পর হোয়াইট পেপারে বিঘোষিত হইয়াছে যে, অসামরিক শাসন আরম্ভ হওয়ার পর তিন বৎসর পর্যন্ত ব্রহ্ম গভর্নরের শাসনাধীনেই থাকিবে, তৎপর ব্রহ্মের ঔপনিবেশিক স্বরাজের চেষ্টা করা হইবে। এই শ্বেতপত্র একেবারেই শ্বেত নয়, উহাতে প্রতিজ্ঞার মসীচিহ্নও আছে। তৎপর জাপ আত্মসমর্পণের অব্যবহিত পরেই ব্রহ্মদেশের গভর্নর স্যার ডরমেন স্মিথ রেঙ্গুনে গিয়া আশ্বাস দেন যে প্রথম এক বৎসর তিনি (জাতীয় দলসমূহ হইতে গৃহীত) একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সাহায্যে শাসন চালাইবেন, তৎপর পূর্বের শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হইবে* এবং বর্মীরা প্রয়োজনীয় সন্ধি-সর্তে স্বীকৃত হইলে দুই বৎসর পরে শাসনতন্ত্র সংগঠক সভার সাহায্যে ঔপনিবেশিক স্বরাজ প্রদানের চেষ্টা করা হইবে। কিন্তু প্রথম পদক্ষেপেই গণ্ডগোল বাধিয়াছে। গভর্নরের পরিকল্পিত একজিকিউটিভ কাউন্সিলে তৎমনোনীত সভ্য গৃহীত না হওয়ায় ভূতপূর্ব স্বাধীন ব্রহ্ম বাহিনীর অধিনায়ক ও বর্তমানে সর্বদলীয় নেতা অং ছেন অসহযোগপূর্বক পূর্ব এশিয়ার জাতিসমূহের স্বাধীনতার জন্য "এশিয়াটিক

* উপরোক্ত দ্বৈত শাসনাধীনে রাজস্ব, দেশরক্ষা, বৈদেশিক বিভাগ ও সাধারণ শাসন বহির্ভূত স্থান (বর্মী রাজাদের পূর্ব সামন্ত-রাজ্য রূপ শান স্টেটস্‌সমূহ) স্বনিযুক্ত উপদেষ্টার সাহায্যে গভর্নর নিজেই শাসন করিতেন; বাকি বিষয় আইন সভার আস্থাভাজন মন্ত্রীদের হস্তে প্রত্যর্পিত হইয়াছিল, কিন্তু ভারতের মতই পুলিশ শাসনে আবার গভর্নরের বিশেষ কর্তৃত্ব ছিল। এই আইনসভায় ৩৬ জন সভ্যসমন্বিত সিনেট নামে ঊর্ধ্বপরিষদ (ইহার অর্ধেক গভর্নর ও অর্ধেক নিম্নপরিষদ্‌ কর্তৃক মনোনীত) এবং ১৩২ জন সভ্যসমন্বিত হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভ নামধেয় নিম্নপরিষদ ছিল। ইহাতে নির্দিষ্ট ভারতীয় নির্বাচন পরিধি হইতে নির্বাচিত কতিপয় ভারতীয়ও ছিলেন, কিন্তু কোন ভারতীয় কখনও মন্ত্রী হইতে পারেন নাই। যদিও ৩ জন ভারতীয় রেঙ্গুন হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলেন। এই সংস্কারের স্থলে ঔপনিবেশিক স্বরাজ লাভের চেষ্টায়ই ১৯৪১ সনে ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী উ চ বিলাত ও আমেরিকা গমন করেন এবং প্রত্যাবর্তন পথে বন্দী হন।

পটসডাম" আহবান করিতে চাহিয়াছেন। ভারতে স্বাধীন ভারত বাহিনীর বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা করিলেও ব্রহ্মদেশকে সহজে করায়ত্ত করিবার জন্য ইংরাজ (যে খেলার অভাবে ডাচরা জাভায় বিপদে পড়িয়াছে) স্বাধীন ব্রহ্ম বাহিনী ও তাহাদের এই নেতাকে ইংরাজপরিপুষ্ট বর্মী বাহিনীতে গ্রহণ করিয়াছিল (যেমন শত এটম বমেও হারিকিরীধর্মীরা আত্মসমর্পণ করিবে না এই ভয়ে জাপানী গভর্নমেণ্ট রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়া জাপ সম্রাটের সাহায্যে জাপসৈন্যের আত্মসমর্পণ সাধিত হইয়াছিল)। উপরোক্ত এশিয়াটিক পট্‌সডাম ভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি কর্তৃকও সমর্থিত হইয়াছে এবং চীন, জাপানকে উহাতে নেওয়ার কথা হইতেছে, কেননা মনে করা হইতেছে যে, প্রথম প্রতিশ্রুতি যেরূপেই হউক না কেন জাপান এখন কার্যত পরাধীন এবং চিয়াং কাইশেকের স্বাধীনতাও জালধর্মী ক্লাইভের অধীনে মীরজাফরীয় স্বাধীনতার মত। তাই মনে হয় অনতিবিলম্বে ঔপনিবেশিক স্বরাজ না পাইলে (রাজাহীন আইরিশ রিপাবলিকও বৃটিশ কমনওয়েলথের সভ্য আছে) বর্মীদের এই স্বরাজতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত হইবে না।

১৯৪৩ সনে জাপানীরা ব্রহ্মের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বা মর সহিত (১৯৪২ সনেও ইনি ইংরাজের বন্দী ছিলেন) স্বাক্ষরিত সন্ধিক্রমে মাত্র যুদ্ধকালে সামরিক কর্তৃত্ব রাখিয়া ব্রহ্মকে নাকি পূর্ণ স্বরাজই দিয়া দিয়াছিল। বর্মীরা এই ক্ষমতা ও পার্শ্ববর্তী ফিলিপাইনের স্বাধীনতার সহিত তুলনা করিয়াই তাহাদের নব ক্ষমতার মূল্য নির্ধারণ করিবে। ব্রহ্মদেশের অগোণে স্বাধীনতা লাভে ভারতবাসীর কোন আপত্তি নাই, ভারত ব্রহ্মদেশে কেবল তাহার ন্যায্য স্বার্থ রক্ষিত দেখিতে চায়। ব্রহ্মকে ঔপনিবেশিক স্বরাজ দানকালে যেইসব সন্ধিসর্তের কথা হইয়াছে তাহাতে দেখিতে হইবে যে, ভারতীয় দেশরক্ষা ও বাণিজ্যাদির ন্যায্য স্বার্থ রক্ষিত হইয়াছে কি না; ইহার ন্যায্যতা বিচারে ব্রহ্মবিজয়ে ভারতীয় ক্ষয়ক্ষতির কথাও বিবেচনা করিতে হইবে।

স্বাধীনতা লাভ সম্পর্কে কতিপয় বিষয়ে ভারতের চেয়েও ব্রহ্ম অধিক সুবিধা সম্পন্ন। সেই কারণে অং ছেনকে ব্রহ্মে সর্বদলীয় নেতৃত্ব দেওয়া হইয়াছে, তাহার অধিক কারণ সত্ত্বেও নেতাজীকে ভারতে নেতৃত্ব দেওয়া হইত কি?

ব্রহ্মে শান, চীন, কাচিন প্রভৃতির মধ্যে একটু উপজাতীয় ধারা আছে সত্য, কিন্তু অন্য কোন বৈদেশিক হইতে তাহারা যে ভিন্ন একগোষ্ঠীয় জাতি এই ধারণা তাহাদের মধ্যে প্রবল যা ভারতের পাকিস্থানীদের মধ্যে বিরল। আবার ধর্মেও তাহারা মূলত এক, অবৌদ্ধ বৈদেশিকদিগকে ধরিয়াও শতকরা ৮৫ ভাগই বৌদ্ধ। খৃষ্টান কেরেনদের সাহায্যে পাকিস্থানী প্রচেষ্টা তথায় সম্ভব নহে। আবার পূর্বে বর্মীদের আসাম ও শ্যাম জয় করিবার গর্ববোধও রহিয়াছে; থিবুর রাজদরবারে ইংরাজকে করজোড়ে আসিতে দেখিয়াছে এমন বর্মী এখনও জীবিত। সর্বোপরি সুদূর প্রাচ্যের রাজ্যসমূহের পুনর্ব্যবস্থার যে আন্তর্জাতিক প্রশ্ন উঠিয়াছে তাহাতেও ব্রহ্মের স্বরাজের পথ সুগম হইতে পারে। এমতাবস্থায় মনে হয় (যদিও বিলাতের শ্রমিক প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন যে তিনিও বৃটিশ সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতেই বদ্ধপরিকর এবং যদিও সানফ্রান্সিস্কো চার্টারে উহার সম্পদের এইসব আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অন্যের হস্তক্ষেপ নিবারিত হইয়াছে) ব্রহ্মের স্বরাজ লাভ সহজেই হইয়া যাইবে, উহার জন্য আর কোন বিদ্রোহ-বিঘটনের (থারওয়ার্ডি বা ইন্দোনেশীয় ধরণের) প্রয়োজন হইবে না।

বিগত

রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী

মাঠের দিগন্ত ছোঁয়া স্বাদ
ধূ ধূ অদৃশ্যের ছলনায়
মনের কবাটে হানে হাত।
অনেক নিঃশব্দ রাত
দিগন্তের সিঁড়ি বেয়ে ধরা দিয়েছিল চোখে এসেঃ
প্রেতের নিঃশ্বাস
উত্তপ্ত করেছে হাওয়া, তারার আলোয়
ছড়ায়েছে রূঢ় অট্টহাসি।
একটানা সে বিদ্রূপে দিগন্তের দুরান্ত সীমানা
মৃত-পাংশু আর্তনাদে
কেঁপেছিল থরহরিঃ অদৃশ্য মিছিলে
গুঁড়ায়েছে আকাশের জ্যোতি।
মাঠের দিগন্ত ছোঁয়া স্বাদ
মনের কবাটে তবু বারবার হানে করাঘাত।
সে মাঠের পটে আঁকা ফসলের সোনার তুলির
জীবনের অপরূপ ছবি
দেখেছিনু রাত্রিশেষে জ্যোতির প্রলেপে।
সবুজ মুখরতায়
মোহাবিষ্ট মন।

আজ বার বার শুধু সে জীবন ঝড়ে
মাটিতে নামাই প্রাণ মোরঃ
স্পর্শের বিদ্যুৎ খেলে সমগ্র সত্তায়,
সোনার কাঠির স্পর্শে দৃষ্টি জ্বলে ওঠে;
মাঠের হাওয়ায় আজ ফসলের কল-কোলাহল,
দুরান্তের সোনালি আলোয়
তার ঢেউ তোলে আলোড়ন।

বন্ধ দ্বার খুলে দাও তীব্র করাঘাতে,
মজুত শস্যের স্তূপে যুগান্তের অভিশাপ জমে'
আগুন লেগেছেঃ
শেষ হোক লুঠ-করা শস্যের কণিকা।
আলোয় নামাও চোখ, মাঠে মাঠে প্রাণ জেগে ওঠে।

রঙ্গজগৎ

অভ্যুদয়

গত ১১ই তারিখে রকসীতে 'অভ্যুদয়'-এর অভিনয় শহরের প্রমোদজগতের ইতিহাসে একটি অনন্যসাধারণ ঘটনা হিসেবে স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। শ্রীসুকৃতি সেন এর সংগীত পরিচালনা করেছিলেন এবং নৃত্য পরিচালনা করেছিলেন শ্রীপ্রহ্লাদ দাস। উক্ত অনুষ্ঠানে ভারতের জাতীয়তাবাদী প্রায় সমস্ত নেতাই উপস্থিত ছিলেন এবং শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু স্বয়ং অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। ভারতীয় ইতিহাসে ইতিপূর্বে আর কোন মঞ্চাভিনয়ের এ সৌভাগ্য হ'য়েছে ব'লে আমাদের জানা নাই, সেই হিসেবে উদ্যোক্তা কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘ ইতিহাস রচনা ক'রলেন সন্দেহ নেই। সেদিনের অনুষ্ঠানটি নেতাদের আগমনে জমকালো হ'য়েছিল এবং নেতারা প্রমোদের মধ্যে দিয়ে জনগণের মধ্যে জাতীয়তা জাগিয়ে তোলার এই অভিনব নৃত্যনাট্যের ভূয়সী প্রশংসাও করেন, কিন্তু ইতিপূর্বে যারা 'অভ্যুদয়' দেখার সৌভাগ্যলাভ ক'রেছিলেন তাদের মধ্যে তেমন খুশী হওয়ার ভাব পরিলক্ষিত হ'ল না। অভিনয় সত্যিই সেদিন যে তেমন সুবিধের হয়নি, আগের তুলনায়, সে বিষয়ে আমরাও একমত। গানগুলি, বিশেষ ক'রে মেয়েদের গলা, অত্যন্ত কর্কশ লাগলো, মনে হলো আগেকার শিল্পীরা সেদিন ছিলেন না। নাচগুলিও যেন তেমন মহলা দেওয়া হয়নি। আর সবচেয়ে আমাদের হতাশ ক'রেছেন সূত্রধার প্রবোধকুমার সান্যাল—জাতীয় জাগরণে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলার জন্যেই এই সূত্রধারের সৃষ্টি; প্রবোধবাবু সেদিন মোটেই তার মর্যাদা রাখতে পারেননি। এই অপ্রিয় সত্যগুলির অবতারণা সত্ত্বেও 'অভ্যুদয়' একটি অনবদ্য অবদান হ'য়েই থাকবে; এ ধরণের জিনিস ইতিপূর্বে আর দেখা যায়নি এবং সেইজন্যেই এ জিনিসটার মর্যাদা রক্ষা বিষয়ে প্রত্যেক শিল্পীর অত্যন্ত সজাগ থাকা কর্তব্য। এটা সাধারণ প্রমোদ-অবদান নয়, জাতীয় সেবায় আগামী দিনের ইসারা এর মধ্যে রয়েছে, তাকে লোকের মনে স্পষ্ট ক'রে তুলতে হবে। আশা করি শীঘ্রই গান্ধীজী সকাশে 'অভ্যুদয়' দেখাবার যে কথা চলেছে সে সময়ে সব দোষ-ত্রুটিগুলি সংশোধিত হবে। অভ্যুদয়কে ভারতের সর্বত্র পরিবেশন করবার জন্যও আমরা কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

নূতন ও আগামী আকর্ষণ

গত সপ্তাহে যে দুখানি বাঙলা ও একখানি হিন্দী ছবি মুক্তিলাভ ক'রেছে তা হ'চ্ছে রূপবাণীতে শ্রীভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের 'গৃহলক্ষ্মী'—পরিচালনা গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরযোজনায় হিমাংশু দত্ত সুরসাগর, ভূমিকায় অহীন্দ্র, জহর, মিহির, রবীন, চন্দ্রাবতী, পদ্মা, পূর্ণিমা প্রভৃতি; মিনার-ছবিঘর-বিজলীতে কে বি পিকচার্সের 'ভাবীকাল'—পরিচালনা নীরেন লাহিড়ী, সুরযোজনায় কমল দাশগুপ্ত (যদিও একখানিও গান নেই), ভূমিকায় অমর মল্লিক, দেবী মুখার্জি, জহর, রবীন, মিহির, ফণী রায়, শ্যাম লাহা, চন্দ্রাবতী, শিপ্রা প্রভৃতি; আর হিন্দী জ্যোতি সিনেমায় ভারত প্রডাকসন্সের 'মীনা',—পরিচালনা ফণী মজুমদার, ভূমিকায় হংসা ওয়াড়কর, বাসন্তী, আনন্দ, দীক্ষিত প্রভৃতি— এ ছবিখানি বাঙলা 'রাজকুমারের নির্বাসন' চিত্রের হিন্দী সংস্করণ।



রূপশ্রীর 'মৌচাকে ঢিল' চিত্রে নবাগতা সুমিতা দেবী

* * * *

বছরের শ্রেষ্ঠ চিত্রগুলির মধ্যে ঠাঁই পাবার মত একেবারে খানকয়েক হিন্দী ছবি এ সপ্তাহে একসঙ্গে মুক্তিলাভ ক'রেছে — শ্রী-ছায়া-আলেয়া-সেণ্ট্রাল-পার্কশো-হাউসে মিনার্ভা মুভীটোনের 'একদিন কা সুলতান', ভূমিকায় মেহতাব ও ওয়াস্তি এবং পরিচালনায় সোরাব মোদী; সিটি ও বীণাতে এ্যাসোসিয়েটেড প্রডাকসন্সের 'আমীরী', পরিচালনা বড়ুয়া এবং ভূমিকায় যমুনা ও বড়ুয়া; প্যারাডাইসে ফিল্মিস্তানের 'মজদুর', পরিচালনা নীতিন বসু, ভূমিকায় ইন্দুমতী, বীরা ও নসীরখান; গণেশ টকীতে নিউ মহারাষ্ট্র পিকচার্সের 'দেবদাসী', পরিচালনা চন্দ্রনাথ বসু, নামভূমিকায় মণিকা দেশাই।

* * *

মঞ্চেও নতুন আকর্ষণ রয়েছে এ সপ্তাহে —স্টারে 'শতবর্ষ আগে'; সিপাহী বিদ্রোহকে কেন্দ্র ক'রে মহেন্দ্র গুপ্তের লেখা; আর কালিকায় 'মেজদিদি' শরৎচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে রচিত নাটক।

বিবিধ

গত ১৫ই থেকে কাঁচা ফিল্মের ওপর থেকে সরকারী নিয়ন্ত্রণ অপসারিত হ'য়েছে।

* * * * *

শোনা গেল সাধনা বসু প্রডাকসন্সের 'অজন্তা'র চিত্রগ্রহণ স্থগিত রাখা হ'য়েছে এবং প্রযোজকদের মতিগতি দেখে মনে হয় যে ছবিখানি তোলা বোধ হয় একেবারেই বন্ধ হ'লো।

* * *

এ সপ্তাহে কয়েকটি বিবাহের খবর রয়েছে, মহসীন আবদুল্লার সঙ্গে ফিল্মিস্তানের নতুন নায়িকা বীরার, বম্বের অভিনেতা সুশীলকুমারের এবং এখানকার পরিচালক অপূর্ব মিত্রের আর ফণী মজুমদার ও মণিকা দেশাইয়ের বিয়ের খবর 'দেশ'-এর পাঠকরা অনেকদিন আগেই পেয়েছেন।

বম্বেতে 'ফালতু' অভিনয় শিল্পীদের একটি সঙ্ঘ স্থাপিত হ'য়েছে। সঙ্ঘ স্থাপনা ক'রেই প্রযোজকদের কাছে এরা একটা আবেদন পেশ করে সঙ্ঘ-অনুমোদিত শিল্পীদেরই কেবল গ্রহণ করার জন্য এবং পারিশ্রমিকের হার বাড়ানোর জন্যে। সুখের বিষয় প্রযোজকরা এদের কথামত কাজ ক'রতে স্বীকার ক'রেছেন।

* * * * *

ছবিপিছু লাখ টাকার শিল্পী সায়গল এবারে নিজেই প্রযোজকের অংশ গ্রহণ ক'রবেন। সায়গলের নিজস্ব প্রথম ছবি হবে বিখ্যাত উর্দু কবি গালিবের জীবনী, নাম-ভূমিকায় অবশ্য নিজেই থাকবেন। ছবিখানি সম্ভবত তোলা হবে পুণাতে।

* * * *

সম্প্রতি আজাদ হিন্দ ফৌজ সাহায্য ভাণ্ডারে চাঁদা তোলার জন্যে বম্বের চিত্র-কর্ণধাররা এক সভায় সম্মিলিত হন এবং মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ৭৮,০০০ টাকা চাঁদা তুলে ফেলেন। জয় হিন্দ।

* * * *

নীতিন বসু বম্বে টকীতে হিন্দীর সঙ্গে 'নৌকাডুবি'-র একটি বাঙলা সংস্করণও তুলবেন।

শৈলজানন্দ তাঁর পরবর্তী ছবি 'রায়-চৌধুরী'-র চিত্রগ্রহণ আরম্ভ করেছেন। এটা হচ্ছে নিউ সেঞ্চুরীর হয়ে, এ ছাড়া তাঁর নিজস্ব শৈলজানন্দ প্রডাকসন্সের ছবি 'মানে-না মানা'র হিন্দী সংস্করণ তোলাতেও মনোনিবেশ করেছেন।

সিনে প্রোডিউসার্সের 'মাতৃহারা' যার চিত্রগ্রহণ শ্রীভারতলক্ষ্মীতে চলতে চলতে হঠাৎ বন্ধ হ'য়ে যায় সেখানি কালী ফিল্মস স্টুডিওতে গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় দ্রুত সমাপ্তির পথে। এর ভূমিকায় রয়েছেন জহর, মলিনা, সন্তোষ সিংহ, বেচু সিংহ, কমল মিত্র প্রভৃতি।

* * *

সাংবাদিক পরিচালক খগেন রায় তাঁর ছবি 'অনিবার্য'-এর চিত্রগ্রহণ রাধা ফিল্মসে পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ করেছেন। ভূমিকায় রয়েছেন নবাগত শিল্পী অজিত ব্যানার্জী, পূর্ণেন্দু মুখার্জী, অজন্তা কর মায়া এবং সিপ্রা।

* * *

উত্তর কলিকাতা কংগ্রেস কমিটি, রাজবন্দীদের সাহায্য ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগঠন উদ্দেশ্যে গত ১৬ই ডিসেম্বর রবিবার দীপক চিত্রগৃহে এক বিচিত্র নৃত্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিলেন। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এবং স্বেচ্ছাসেবকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দেন।

সুরশিল্পী কমল দাশগুপ্ত, নৃত্যশিল্পী সাধনা বসু, গায়ক জগন্ময় মিত্র এবং অন্যান্য অনেক শিল্পীবৃন্দ অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন, তাঁহাদের সকলের সমবেত চেষ্টায় এই দাতব্য অনুষ্ঠানটি বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল।

* * * *

ভারত গভর্নমেণ্টের ইনফরমেশন ও ব্রডকাস্টিং বিভাগের সেক্রেটারী পি এন খাপর কানাডায় গিয়ে প্রকাশ করেছেন যে, ভারতীয় চাষীদের শিক্ষিত করার জন্য এক হাজার ভ্রাম্যমান সিনেমার ব্যবস্থা করা হবে।

* * * *

অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে এবারে নিজেই চিত্রপ্রযোজনা কাজে আত্মনিয়োগ করছেন। সব দিকের ব্যবস্থাই পাকা করে ফেলেছেন তিনি এবং ছবিখানির চিত্রগ্রহণ কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হবে।

ইতস্তত

আচ্ছা পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে উত্তর দিন ত?

এমন তিনটি সংখ্যার নাম করুন যাদের পাশাপাশি যোগ অথবা গুণ করলে ফল একই হবে।

—উঃ ১, ২, ৩।

যদি সাতজন লোক প্রতিদিন সাত ঘণ্টা পরিশ্রম করে' সাত দিনে একটি পুরো গর্ত খুঁড়তে পারে, তাহলে কতজন লোক প্রতিদিন কত ঘণ্টা পরিশ্রম করে কতদিনে অর্ধেক গর্ত খুঁড়তে পারবে।

—উঃ গর্ত কি কখনও অর্ধেক হয়? গর্ত গর্তই।

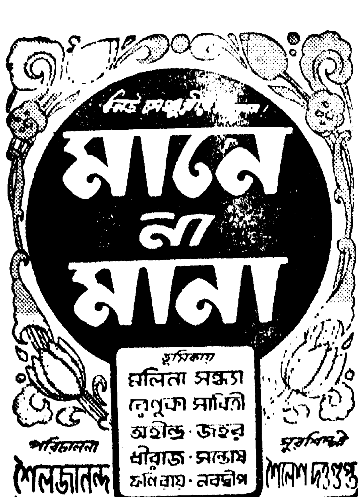
একটি বড়ো সাঁওতাল ও আর একটি ছোট সাঁওতাল রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। ছোট সাঁওতালটি বড়ো সাঁওতালের ছেলে কিন্তু বড়ো সাঁওতাল তার বাবা নয়। তবে কে?

—উঃ তার মা।

একটি শিশুর তার পিতার সঙ্গে কি সম্বন্ধ যখন সে তার ছেলে নয়?

—উঃ মেয়ে।

অমরেন্দ্রকুমার সেন সংকলিত



খেলাধূলা

অস্ট্রেলিয়া দলের সাফল্য

অস্ট্রেলিয়ান সার্ভিসেস ক্রিকেট দল সিংহলে নিখিল সিংহল দলকে এক ইনিংস ও ৪৪ রানে পরাজিত করিয়াছে। ভারত ত্যাগ করিবার পূর্বে মাদ্রাজে শেষ খেলায় তাঁহারা সম্মান বিসর্জন দিয়া বিশেষ মর্মাহত হইয়াছিলেন। আশা করি, সিংহলের জয়লাভ তাহা কতকাংশে লাঘব করিবে।

নিখিল ভারত দল সিংহল ভ্রমণ করিয়া বিশেষ সুনাম অর্জন করিতে পারে নাই। সেইজন্য আমাদের ধারণা ছিল অস্ট্রেলিয়ান দল যাহারা ভারতে খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিল না তাহারা নিশ্চয়ই সিংহলে জয়লাভে সমর্থ হইবে না। কিন্তু সিংহল দলকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইতে দেখিয়া সত্যই আশ্চর্যান্বিত হইতে হইয়াছে। "খেলার ফলাফল সকল সময়েই অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে" এই কথা যে কতখানি সত্য তাহা সিংহলের খেলার ফলাফল দেখিবার পর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে আমাদের যতদূর ধারণা সিংহলের খেলোয়াড়গণ অনুশীলনের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেন নাই।

খেলার বিবরণ

অস্ট্রেলিয়া দল টসে জয়ী হইয়া প্রথম ব্যাটিং গ্রহণ করে। প্রথম তিনটি উইকেট ১২৬ রানে পড়িয়া যায়। ইহার পর কিথ মিলার অধিনায়ক হ্যাসেটের সহিত খেলিয়া দ্রুত রান তুলিতে আরম্ভ করেন। ইহারা একত্রে খেলিয়া ১২১ রান সংগ্রহ করেন। মিলার শতাধিক রান করিবার কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। অস্ট্রেলিয়া দলের ইনিংস কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৩০৬ রানে শেষ হয়। সিংহল দল খেলা আরম্ভ করিয়া প্রথম দিনের শেষে ৬ উইকেটে ২৪ রান করে। এই নৈরাশ্যজনক সূচনা দলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়। দ্বিতীয় দিনের সূচনায় অল্পক্ষণ খেলিয়া সিংহল সকলে ১০৩ রানে আউট হইয়া যান। ইহাতে অস্ট্রেলিয়ান দল সিংহল দলকে ফলো অন করিতে বাধ্য করে। সিংহল দল প্রাণপণে নিজেদের সম্মান রক্ষার চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় ইনিংসও ১৫৯ রানে শেষ হয়। একমাত্র হেইন ৫০ রান করিতে সক্ষম হন। অস্ট্রেলিয়ান দলের এলিস উভয় ইনিংসে মারাত্মক বোলিং করেন। তিনদিনব্যাপী খেলা দুই দিনে শেষ হয়। অস্ট্রেলিয়ান দল এক ইনিংস ও ৪৪ রানে বিজয়ী হয়।

খেলার ফলাফলঃ—

অস্ট্রেলিয়া দলের প্রথম ইনিংসঃ—৩০৬ রান (কে মিলার ১৩২, হ্যাসেট ৫৭)।

সিংহল দলের প্রথম ইনিংসঃ—১০৩ রান (জয়বিক্রম ৩১, এলিস ২৫ রানে ৫টি, রোপার ৯ রানে ২টি উইকেট পান)।

সিংহল দলের দ্বিতীয় ইনিংসঃ—১৫৯ রান (ডিসারাম ২৩, জয়বিক্রম ২৩, হেইন ৫০, সালভা ডোরাই ২৩, এলিস ২৩ রানে ৩টি ও পেপার ৪৬ রানে ৪টি উইকেট পান)।

রণজি ক্রিকেট

আন্তপ্রাদেশিক রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার বিভিন্ন অঞ্চলের প্রথম রাউণ্ডের খেলা আরম্ভ হইয়াছে। বিহার দল হোলকার দলের বিরুদ্ধে খেলিয়া গত বৎসরের ন্যায় শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়াছে। প্রতিযোগিতার সূচনা হইতে এই পর্যন্ত বিহার দলের পক্ষে প্রথম খেলায় জয়লাভ করা সম্ভব হইল না, ইহা প্রকৃতই দুঃখের বিষয়। দীর্ঘ-



হ্যাসেট

কালের মধ্যে একটি প্রদেশের ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ ক্রমোন্নতির পথ রচনা করিতে পারিলেন না, ইহা প্রদেশের পরিচালকগণের মনে কি এখনও উদিত হয় নাই?

অপর খেলায় মহীশূর দল ১১২ রানে মাদ্রাজ দলকে ও পশ্চিম ভারত দল মাত্র তিন রানে গুজরাট দলকে পরাজিত করিয়াছে। এই দুইটি খেলার মধ্যে কোন খেলায় খুব উচ্চাঙ্গের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শিত হয় নাই।

বিহার বনাম হোলকার

বিহার বনাম হোলকারের খেলায় হোলকার দল এক ইনিংসে ও ১৮৭ রানে বিজয়ী হইয়াছে। হোলকার দল প্রথম ব্যাটিং করিবার সৌভাগ্য লাভ করে ও ৪৩৩ রানে ইনিংস শেষ করে। বি বি নিম্বলকার শতাধিক রান করিয়া ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ইহা ছাড়া মুস্তাক আলী ৫০ রান, জে এন ভায়া ৮৯ রান ও সি এস নাইডু ৬০ রান করেন। বিহার দলের অধিনায়ক এস ব্যানার্জির বোলিং বিশেষ কার্যকরী হয়। দ্বিতীয় দিনের সূচনায় হোলকার দলের ইনিংস শেষ হয়। বিহার দল পরে খেলা আরম্ভ করে ও প্রথম ইনিংস ১৪২ রানে শেষ করে। হোলকার অধিনায়ক বিহার দলকে "ফলো অন" করিতে বাধ্য করে। বিহার দল দ্বিতীয় ইনিংসেও শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়া ১০৪ রানে ইনিংস শেষ করে। **খেলার ফলাফলঃ**—হোলকার প্রথম ইনিংস—৪৩৩ রান (নিম্বলকার ১০৬, মুস্তাক আলী ৫০, সি এস নাইডু ৬০ রান, জে এন ভায়া ৮৯ রান)।

বিহার প্রথম ইনিংসঃ—১৪২ রাণ ও দ্বিতীয় ইনিংস ১০৪ রান।

পশ্চিম ভারত রাজ্য দল বনাম গুজরাট

পশ্চিম ভারত দল প্রথম খেলা আরম্ভ করিয়া ১৯৯ রানে ইনিংস শেষ করে। কে পি কেশরী একাই ৫৫ রাণে ৭টি উইকেট পান। গুজরাট দল পরে খেলিয়া ১৬৪ রাণে ইনিংস শেষ করে। পরে দ্বিতীয় ইনিংসে পশ্চিম ভারত রাজ্য দল ১৫৮ রান ও গুজরাট দল ১৯০ রান করে। **খেলার ফলাফলঃ**—পশ্চিম ভারত রাজ্য দল—১ম ইনিংস ১৯৯ রান ও ২য় ইনিংস ১৫৮ রান। গুজরাট দল—১ম ইনিংস ১৬৪ রান ও ২য় ইনিংস ১৯০ রাণ।

মাদ্রাজ বনাম মহীশূর দল

মহীশূর বনাম মাদ্রাজ দলের খেলায় মহীশূর দল ১১২ রানে বিজয়ী হয়। মহীশূর দলের রমা রাওর বোলিং বিশেষ কার্যকরী হয়। নিম্নে খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

মহীশূর দলঃ—১ম ইনিংস ১৫৮ ও ২য় ইনিংস ১৯২ রান।

মাদ্রাজ দলঃ—১ম ইনিংস ১৭২ রান ও ২য় ইনিংস ১৬৬ রান।

পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট

বোম্বাই পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতা আগামী জানুয়ারী মাসের প্রথম হইতে আরম্ভ হইবে। হিন্দু দল ইতিমধ্যেই নির্বাচিত করা হইয়াছে। এই দলে এইরূপ অনেক খেলোয়াড়কে গ্রহণ করা হইয়াছে যাঁহারা এই বৎসর কোন খেলায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। সেই জন্য নির্বাচিত হিন্দু দলকে শক্তিশালী দল বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে না। নিম্নে খেলোয়াড়গণের নাম প্রদত্ত হইলঃ—বিজয় মার্চেণ্ট (অধিনায়ক), হিন্দেলকার, এস সোহনী, এস ব্যানার্জি, মিশ্র, মানকড়, ইউ মার্চেণ্ট, রঙ্গনেকার, এইচ অধিকারী, কিষেণচাঁদ, ফাদকার ও সিন্ধে।

সুভাষচন্দ্রের বাসভবনে মহাত্মা গান্ধী



মহাত্মা গান্ধী গত ১৮ই ডিসেম্বর শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর এলগিন রোডস্থিত বাসভবন পরিদর্শন করেন। ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসে শ্রীযুত সুভাষ বসু যে ঘর হইতে নিখোঁজ হন, উক্ত চিত্রে মহাত্মাজীকে তাহা পরিদর্শন করিতে দেখা যাইতেছে।



শ্রীযুত সুভাষ বসু যে ঘরে কাজ করিতেন, সেই ঘরে মহাত্মা গান্ধী।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

১১ই ডিসেম্বর—কলিকাতায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনের পরিসমাপ্তি হয়। কমিটি এই অধিবেশনে সাতটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে কংগ্রেসের অহিংসনীতি সম্পর্কিত প্রস্তাব অন্যতম। মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং ইহার খসড়া রচনা করেন। ওয়ার্কিং কমিটি এই প্রস্তাবে কংগ্রেস কর্মিগণকে ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামে সম্পূর্ণরূপে অহিংস নীতিতে অগ্রসর হইতে অনুরোধ জানান।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যগণের স্বদেশ-প্রীতি এবং সাহসিকতার প্রশংসা করিয়া, কলিকাতায় গুলী বর্ষণ সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবী করিয়া, ইন্দোনেশিয়ায় ভারতীয় সৈন্য প্রেরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়া, মালয় ও ব্রহ্মদেশে একটি মেডিকেল মিশন প্রেরণের সিদ্ধান্ত করিয়া এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের কোন নির্বাচনমূলক পদে যাহাতে কোন কম্যুনিষ্ট থাকিতে না পারে তজ্জন্য বিভিন্ন প্রাদেশিক কমিটিকে নির্দেশ দিয়া ওয়ার্কিং কমিটি অপর কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

আসাম ব্যবস্থা পরিষদের সাধারণ নির্বাচন-কেন্দ্রে কংগ্রেস বিনা বাধাতেই ১৫টি আসন দখল করিয়াছে।

সীমান্ত প্রদেশ নির্বাচন কেন্দ্রের কংগ্রেস-প্রার্থী খান আবদুল গণি খাঁ কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। খান আবদুল গণি খাঁ সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফুর খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গের পল্লীগীতি সংগ্রাহক শ্রীযুত চন্দ্রকুমার দে গত ৭ই ডিসেম্বর ৬৪ বৎসর বয়সে তাহার ময়মনসিংহস্থিত বাটীতে পরলোকগমন করিয়াছেন।

শুভ-বিবাহ—গত ৯ই ডিসেম্বর বরিশাল জলাবাড়ী নিবাসী শ্রীযুত রাইচরণ বিশ্বাসের মধ্যম পুত্র শ্রীযুত অমলেন্দ্র বিশ্বাসের সহিত শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী গীতার শুভ-বিবাহ শ্রীযুত বসুর ১নং উডবার্ণ পার্কস্থিত ভবনে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

১১ই ডিসেম্বর—কম্যুনিণ্টদের সম্বন্ধে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, তদনুযায়ী নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির ৮ জন কম্যুনিণ্ট সদস্যের নাম কাটিয়া দেওয়া হইতেছে। ওয়ার্কিং কমিটির এই প্রস্তাব অদ্য প্রকাশিত হইয়াছে।

কলিকাতা বড়বাজারে এক মহতী সভায় খাঁ আবদুল গফুর খাঁ বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতের মুক্তি সংগ্রামে ত্যাগ ও দুঃখ বরণের প্রয়োজনীয়তা বিবৃত করেন।

পাঞ্জাব গভর্নমেণ্ট সমগ্র প্রদেশে আজাদ হিন্দ ফৌজ ক্যালেন্ডার বাজেয়াপ্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের এক সভায় আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্যদের মুক্তির দাবী সমর্থন করিয়া এবং কলিকাতায় নিরস্ত্র ও শান্ত শোভাযাত্রীদের উপর পুলিশের গুলী চালনার নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

রাষ্ট্রপতি আজাদ কলিকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করেন যে, আগামী এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে দিল্লীতে কংগ্রেসের আগামী পূর্ণ অধিবেশন হইবে।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু অদ্য আসাম মেলযোগে কলিকাতা হইতে আসাম অভিমুখে যাত্রা করেন।

রেলওয়ের লোক ছাঁটাই ও তাহাদের পুনর্নিয়োগ সম্পর্কে এক সরকারী ইস্তাহার প্রচারিত হইয়াছে। উহাতে নিখিল ভারত রেল কর্মচারী সম্মেলনের দাবীর উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, স্থায়ী বা অস্থায়ী কোন কর্মচারী ছাঁটাই করা চলিবে না এই দাবী কোনক্রমেই গৃহীত হইতে পারে না—গভর্নমেণ্টের কোন বিভাগই এই দাবী মানিয়া লইতে পারে না। কর্মচ্যুত লোকদের একটা বোনাস দিবার কথা ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে।

১৩ই ডিসেম্বর—বাঙলার প্রাদেশিক নির্বাচন পরিচালনার জন্য নয়জন সদস্যকে লইয়া একটি কংগ্রেস নির্বাচন বোর্ড গঠিত হইয়াছে। শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু উহার চেয়ারম্যান এবং ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ উহার সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন।

ব্রহ্মদেশ এবং মালয়স্থিত ভারতীয়দের দুরবস্থা সম্পর্কে শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু এক বিবৃতি দিয়াছেন।

কলিকাতায় অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে যতদিন পর্যন্ত সভাপতি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আরোগ্য লাভ না করেন ততদিনের জন্য শ্রীযুত এল বি ভোপৎকার কার্যকরী সভাপতি নিযুক্ত করা হইয়াছে।

অদ্য দিল্লীতে সামরিক আদালতে আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন শা নওয়াজ, ক্যাপ্টেন সায়গল ও লেঃ ধীলনের বিরুদ্ধে আনীত মামলায় আসামীপক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হয়।

বেঙ্গল আসাম রেল কর্তৃপক্ষ ঢাকা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডকে জানাইয়াছেন যে, বাঙলা গভর্নমেণ্ট ঢাকা আরিচা রেলপথ নির্মাণের বিরোধী। ঢাকাডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড গত বৈঠকে ঢাকা আরিচা রেলপথ খোলার ব্যবস্থাবলম্বনের জন্য বাঙলা গভর্নমেণ্টকে অনুরোধ জানাইয়া প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। আলোচ্য রেলপথটি খোলা হইলে ঢাকা কলিকাতা যাতায়াত সহজ হইবে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা হইবে।

১৪ই ডিসেম্বর—আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রায় ৮০ জন মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দী মাদ্রাজে ইউনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়ার প্রতিনিধির নিকট গত সেপ্টেম্বর মাসে বাঙলার নীলগঞ্জ ছাউনীতে আটক আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দী সৈনিকদের উপর গুলী বর্ষণের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। এই গুলী বর্ষণের ফলে দুইজন বন্দীর সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয় এবং ১২ জন আহত হয়। আহতদের তিনজন পরদিন মারা যায়।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু গৌহাটিতে পেঁাছিলে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন। সেখানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, বৃটিশ গভর্নমেণ্ট কংগ্রেসের দাবী মানিয়া না লইলে সংগ্রাম অনিবার্য।

পুণার সংবাদে প্রকাশ, সামরিক আদালতে বিচারার্থ যাহাদের নামের তালিকা রহিয়াছে, তন্মধ্যে আজাদ হিন্দ ফৌজের চীফ অব ষ্টাফ কর্ণেল জগন্নাথ রাও ভোঁসলের নাম নাই।

মাদ্রাজের সংবাদে প্রকাশ, ভেলোর জেলে আজাদ হিন্দ ফৌজের যে ৮ জন লোক আটক রহিয়াছেন, তন্মধ্যে দুইজন বাঙালী আছেন। ১৯৪২ সালের শেষভাগে মালয় হইতে প্রবর্তনের পর আজাদ হিন্দ ফৌজের ২০ জন সৈন্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। তন্মধ্যে ছয়জনকে বিচারের পর মাদ্রাজ কারাগারে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে।

১৫ই ডিসেম্বর—কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের কলিকাতা অমুসলমান নির্বাচন কেন্দ্রের ভোটের ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে। কংগ্রেস-প্রার্থী শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু ৭২৯০ ভোট পাইয়া সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দু মহাসভার প্রার্থী শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায় চৌধুরী ৮৮ ভোট এবং অপর-প্রার্থী শ্রীযুত রাসবিহারী সরকার ২০ ভোট পাইয়াছেন। উভয়েরই জামানত জব্দ হইয়াছে।

মেদিনীপুরের কাঁথি মহকুমায় ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন সম্পর্কে কাঁথি মহকুমা কংগ্রেস কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্টে কাঁথি মহকুমায় প্রায় তিনমাসব্যাপী আগস্ট আন্দোলন এবং তাহা দমনকল্পে গুলী বর্ষণ, নারী ধর্ষণ, গৃহদাহ, লুঠতরাজ, ধরপাকড়, পাইকারী জরিমানা প্রভৃতির বিবরণ সংকলিত হইয়াছে। এই বিবরণে জানা যায় যে, গুলী বর্ষণের ফলে ৩৯ জনের মৃত্যু এবং ১৭৫ জন আহত হয়।

দিল্লীতে লালকেল্লায় তৃতীয় সামরিক আদালতে সুবেদার সিঙ্গারা সিংহ এবং ৫।১৪ তম পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের জমাদার ফতেখাঁর বিচার আরম্ভ হইয়াছে।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু শিবসাগরে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, স্বাধীনতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত "ভারত ত্যাগ কর" ধ্বনি ত্যাগ করা অসম্ভব।

১৬ই ডিসেম্বর—নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, মালয়ে যে সমস্ত ভারতীয় আছে, তাহাদের পক্ষ সমর্থন এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবার জন্য ভারত সরকার পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরুকে মালয়ে প্রেরণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

হাওড়ায় এক বিপুল জনসভায় শ্রীযুত হরিবিষ্ণু কামাথ, শ্রীযুত বিশ্বম্ভরদয়াল ত্রিপাঠী, লালা শঙ্করলাল, শ্রীযুত শীলভদ্র যাজী ও শ্রীযুত রামগতি গাঙ্গুলী প্রমুখ বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ফরোয়ার্ড ব্লকের আদর্শ ও কর্মপন্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

১৭ই ডিসেম্বর—মহাত্মা গান্ধী অদ্য রাত্রে কলিকাতায় শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর এলগিন রোডস্থিত বাসভবন পরিদর্শন করেন।

দিল্লীতে প্রথম সামরিক আদালতে আসামী পক্ষের কৌঁসুলী শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই সওয়াল করিবার সময় বলেন যে, ক্যাপ্টেন শা নওয়াজ, ক্যাপ্টেন সায়গল এবং লেঃ ধীলনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার যে অভিযোগ আনা হইয়াছ, তাহা দ্বারাই স্বাধীন ভারতের বিদ্রোহী গভর্নমেণ্টকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

১১ই ডিসেম্বর—বাটাভিয়ার সংবাদে প্রকাশ, চরমপন্থী ইন্দোনেশীয়গণ বাটাভিয়া ও বান্দোয়েংএর মধ্যে একটি মোটর কনভয়ের উপর আক্রমণ করিয়া বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যগণকে নিহত করে।

১২ই ডিসেম্বর—মার্কিণ সেনেটের পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কমিটি ৭৫—১ ভোটে ইহুদীদের বাসভূমি প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের অবাধ প্রবেশাধিকারের সমর্থন করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে।

১৩ই ডিসেম্বর—কমন্স সভায় মিঃ হার্বার্ট মরিসন ঘোষণা করেন যে,যে পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধিমণ্ডলী ভারতে প্রেরিত হইবে, পার্লামেণ্টের প্রতিনিধিগণ লইয়াই উহা গঠিত হইবে এবং উভয় আইনসভার সদস্যগণই উহাতে স্থান পাইবেন। প্রতিনিধিমণ্ডলীর উপর কোন সরকারী তদন্ত ভারও অর্পিত হয় নাই।

ইঙ্গ-মার্কিণ ঋণ প্রস্তাব ও ব্রেটন উডস অর্থনৈতিক চুক্তি কমন্সসভায় ৩৪৫—৯৮ ভোটে গৃহীত হইয়াছে।

রেঙ্গুণের সংবাদে প্রকাশ, ব্রহ্মের গভর্নর সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতিকৃতি এবং সুভাষচন্দ্রের প্রতিকৃতি সম্বলিত পুস্তিকাদি বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন।

১৪ই ডিসেম্বর—মার্কিণ বৈজ্ঞানিক প্রফেসার জর্জ ক্লার্ক ঘোষণা করিয়াছেন যে, এক নূতন ধরণের এক্সরে টিউব আবিষ্কার করা হইয়াছে। উহা হইতে যে রশ্মি নির্গত হইবে, উহার তীব্রতা পূর্ববর্তী এক্স-রশ্মি অপেক্ষা শতগুণ বেশী হইবে।

১৫ই ডিসেম্বর—জাপানে রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে শিণ্টোবাদের বিলোপ সাধন করিয়া জেনারেল ম্যাকআর্থার এক আদেশ জারী করিয়াছেন।

জাপানের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী প্রিন্স কনোয়ে বিষপান করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন।

১৬ই ডিসেম্বর—আরব রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যগণ প্যালেস্টাইনের ইহুদীদের বিরুদ্ধে পূর্ণমাত্রায় অর্থনৈতিক অবরোধ ব্যবস্থা অবলম্বনের একটা পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই বয়কট ও অর্থনৈতিক অবরোধ ১লা জানুয়ারী হইতে কার্যকরী হইবে।

মস্কোতে ত্রি-শক্তির (বৃটেন, আমেরিকা ও রাশিয়া) পররাস্ট্র সচিবদের বৈঠক শুরু হইয়াছে।

শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক:—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মণ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

দেশ পত্রিকা

৬

সম্পাদকঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন — সহকারী সম্পাদকঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

১৩ বর্ষ] ১৪ই পৌষ, শনিবার, ১৩৫২ সাল। Saturday, 29th December, 1945. [৮ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

পণ্ডিত জওহরলালের বাণী

চলমান ঘূর্ণিবাত্যার মত বাঙলা এবং আসামের নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু গত ২২শে ডিসেম্বর বাঙলা দেশ পরিত্যাগ করিয়াছেন। পণ্ডিতজীর এই পরিভ্রমণ শুধু বাঙলার নহে, সমগ্র ভারতের জাতীয় জীবনে নূতন শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। পণ্ডিত জওহরলাল তাঁহার সমগ্র অন্তর দিয়া দুর্ভিক্ষে বিধ্বস্ত, শাসকশক্তির নির্যাতনে নিপীড়িত বাঙলাকে স্পর্শ করিয়াছেন এবং সেই স্পর্শে তাঁহার হৃদয় হইতে অগ্নিপ্রবাহ উত্থিত হইয়া সমগ্র ভারতকে মানবতার জ্বালায় উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। পণ্ডিতজী বাঙলা দেশ পরিত্যাগের পূর্বে তরুণ সমাজকে সম্বোধন করিয়া স্বাধীনতার বাণী শুনাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, স্বাধীনতাই আমাদের সর্বপ্রথমে প্রয়োজন, অন্য সবই পরোক্ষ। ভারতের বুকে বৃটিশের প্রভুত্ব জগদ্দল পাথরের মত চাপিয়া রহিয়াছে। বৈদেশিক প্রভুত্বের এই গুরুভারকে সর্বাগ্রে অপসারিত করা প্রয়োজন এবং ইহার মধ্যে জটিলতার কিছুই নাই। পণ্ডিতজীর এই উক্তি আমরা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। দীর্ঘদিনের পরাধীনতা জাতির মনকে নানাদিক হইতে স্বার্থগত সংস্কারে দুর্বল করিয়া ফেলে এবং এই অবস্থায় জাতির অন্তরের ধর্মের বলিষ্ঠ বিকাশের পথ আইনগত বিচারের জালে আচ্ছন্ন হইয়া যায়; প্রাণের বল সরল ও সহজভাবে বিকাশ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। এই অবস্থায় জাতির মন স্বাধীনতার পথে যেসব অন্তরায় তাহার হিসাবের অঙ্কের পাকে পড়িয়া নির্জীবের মত কেবল ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডীর মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে এবং বিজেতার দল এই দুর্বলতার সুযোগ লইয়া দয়াময় উপদেষ্টার ভূমিকায় জাতির কাছে সেই হিসাবই নানা কৌশলে উপস্থিত করিতে থাকে। ভারতের রাজনীতিক সমস্যার মর্মকথা হইল ইহাই। আমাদের মধ্যে অতি-বুদ্ধিমানের দল শুধু স্বাধীনতার পথে অন্তরায়ের হিসাব কষিয়াই নিজেদের স্বার্থের গণ্ডীর মধ্যে ঘেঁষিয়া থাকিতেছেন, আর বৃটিশ প্রভুরা নিজেদের উপভোগ্যরূপে সেই অন্তরায়ের হিসাব উপস্থিত করিয়া তাঁহাদের ভারত শোষণের পথ প্রশস্ত করিতেছেন। স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে পরাধীনতাজনিত মানসিক এই দুর্বলতার পাক কাটাইয়া আমাদের উপরে উঠিতে হইবে এবং জাতির দুঃখ-দৈন্যের সুগভীর বেদনায় সাড়া দিতে হইবে। পণ্ডিতজী আমাদের এই মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "সময় সময় আমি ভারতীয় সমস্যার জটিলতার কথা কাহার কাহারও মুখে শুনিতে পাই। তাঁহারা বলেন, আরও কয়েক বৎসর অপেক্ষা করা যাউক, তখন আমাদের ভিতরে পরস্পরের প্রতি দ্বেষ-বিদ্বেষ ভাব হয়ত হ্রাস পাইবে এবং এমনকি মিঃ জিন্নাও অনেকটা নামিয়া যুক্তি-বুদ্ধির পথে আসিতে পারেন। এই আশায় বসিয়া থাকা কাহারো কাহারো পক্ষে সম্ভব হইতে পারে। যাঁহারা সমাজে সুখে স্বচ্ছন্দে আছেন, তাঁহারা ইংরেজই হউন কিংবা ভারতবাসীই হউন, এই ধরণের যুক্তি লইয়া চলেন। এ দেশের দরিদ্রের ব্যথা তাঁহারা গভীরভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন না; ক্ষুধার তাড়না যে কি বস্তু তাঁহারা বুঝেন না। সত্যই পরাধীন জাতির অন্তর অনেকক্ষেত্রে এমন অমানুষ স্বার্থপরতায় অভিভূত হইয়া পড়ে। পণ্ডিতজী এদেশের দরিদ্র জনগণের মর্ম ব্যথায় আমাদের মানবতাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছেন, তিনি মনুষ্যত্বের অগ্নিময় বাণী শুনাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ইংরেজ যদি কংগ্রেসের "ভারত ত্যাগ কর" নীতি স্বীকার করিয়া লয় এবং তদনুযায়ী ভারতে বৃটিশ প্রভুত্বের অবসান ঘটে, তবে ভারতের বর্তমান সমস্যাসমূহের অচিরেই সমাধান হইয়া যাইবে। বৃটিশ গভর্নমেন্ট আমাদিগকে বলে যে, আমরা তো তোমাদিগকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুতই রহিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে আমরা তাঁহাদের নিকট স্বাধীনতা ভিক্ষা করিতে যাইতেছি না। আমরা তাঁহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলিতেছি। পণ্ডিতজী সত্যই বলিয়াছেন, ইংরেজ আমাদের কথা অনুসারে যাইবে না, কোন বিজেতা জাতিই যায় না। আমাদিগকে নিজেদের শক্তির বলে স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে; এবং এক্ষেত্রে যুক্তির মার-প্যাঁচের মধ্যে ঘুরিয়া আমরা যেন পশুর জড় জীবনের পরিচয় আর না দেই।

ভারতে পার্লামেন্টের প্রতিনিধি দল

পার্লামেন্টের শ্রমিক প্রতিনিধি দল দুই এক দিনের মধ্যেই ভারতে পদার্পণ করিবেন। বলা বাহুল্য, ইঁহাদের এদেশে আগমন সম্বন্ধে আমাদের মনে কোন আগ্রহই উদ্দীপ্ত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে সত্য কথা বলিতে হইলে এই প্রতিনিধি দল প্রেরণের মূলে বিলাতের শ্রমিক গভর্নমেন্টের কোন শুভ উদ্দেশ্য আছে বলিয়া আমরা মনে করি না; পক্ষান্তরে ভারতের স্বাধীনতা বিলম্বিত করিবার কূট-কৌশলই নিহিত আছে, আমাদের ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস। এই প্রতিনিধি দলের যাঁহারা সদস্য হইয়া

আসিতেছেন, আমরা দেখিলাম, দুইজন ব্যতীত ভারতের ব্যাপারের সঙ্গে তাঁহাদের অন্য কাহারও কোন সম্পর্কই নাই। মিঃ সোরেনসেনের নাম আমরা অনেকে জানি। পার্লামেণ্টে ভারতের সম্বন্ধে তিনি মাঝে মাঝে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া থাকেন এবং সেই সব ক্ষেত্রে ভারতের জাতীয়তাবাদী দলের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি আছে বলিয়া মনে হয়; কিন্তু মৌখিক এই ধরণের সহানুভূতির বস্তুত বিশেষ কোন মূল্য আছে বলিয়া আমরা মনে করি না এবং ব্রিটিশ শ্রমিক দলের বিশেষত্ব হইল এই যে, আজ যাঁহারা বাহিরে থাকিয়া ভারতের প্রতি এই ধরণের সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন, ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডলে স্থান পাইলে তাঁহাদের সুরই সম্পূর্ণরূপে সাম্রাজ্যবাদীদের সমর্থনের দিকে ঘুরিয়া যায়। মিঃ সোরেনসেনের সম্বন্ধেও এই কথাই বলা যাইতে পারে। মিঃরিচার্ডস্ ম্যাকডোনাল্ডী শ্রমিক-মণ্ডলীর আমলে সহকারী ভারত সচিব ছিলেন এবং সেই হিসাবে তিনি আমাদের পরিচিত; কিন্তু সে পরিচয় এমন কিছু হৃদ্যতাজনক নহে; কারণ ম্যাকডোনাল্ডী শ্রমিক মন্ত্রিমণ্ডল ভারতের কোন হিতসাধন করেন নাই। তাঁহারা ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্বকেই পশুশক্তির প্রতাপে দৃঢ় করিয়া গিয়াছেন। শ্রমিক দলের মধ্যে যাঁহারা সমধিক প্রগতিবাদী, অর্থাৎ আমরা যাঁহাদিগকে সেইরূপ বলিয়া মনে করি, তাঁহাদের কাহারও আমরা এই প্রতিনিধি দলের সদস্য-স্বরূপে দেখিতে পাইতেছি না। মিঃ ফেনার ব্রকওয়ে, মিঃ হুইটলী স্টোকস্ কিংবা এনুরিন বিভান,—ইঁহাদের কেহই প্রতিনিধি দলের সদস্য হইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন নাই। তারপর ইঁহারা ভারতে আসিয়া কি করিবেন, তাহাও সুস্পষ্ট নহে। সহকারী ভারত-সচিবের মুখে সেদিন আমরা এই কথা শুনিয়াছি যে, সরকারীভাবে কোন তদন্ত করিবার অধিকার এই প্রতিনিধি দলের নাই এবং কোন রিপোর্ট দাখিল করিবার অধিকারও ইঁহাদিগকে দেওয়া হয় নাই। তবে ইঁহাদের ভারতে আসিবার কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে? ভারতের রাজনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করাই যদি ইঁহাদের আগমনের উদ্দেশ্য হয়, সবজান্তা ইণ্ডিয়া-অফিস বিদ্যমান থাকিতে তাঁহাদের এতদূরে ক্লেশ স্বীকার করিয়া আসিবার কি প্রয়োজন ছিল? ভারতবর্ষ সম্বন্ধে রাতারাতি পণ্ডিত হইবার পথ তো ইণ্ডিয়া অফিসেই খোলা আছে, লাট-বড়লাট হইতে ভারত সচিব সেইখানেই পাঠ গ্রহণ করিয়া পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়া থাকেন! কিন্তু প্রতিনিধি দল প্রেরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য ইহার একটিও নহে। ভারতের রাজনীতিক দলাদলি, মতভেদ নির্বাচনের এই তোড়ের মুখে এই সব খুঁটিনাটি সংগ্রহ করিয়া সেগুলির প্রচারকার্যের পথ প্রশস্ত করাই ইহার উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা না দিয়া শুধু স্বাধীনতা দানের মৌখিক ধাপ্পাবাজীকে ঝালাই করিয়া আরও কিছুদিন যাহাতে চালানো যায়, সেই জন্য এই কূট-নীতির অবতারণা। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতবাসীরা স্বাধীনতা লাভের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে কিনা, এই বিচার করিবার ক্ষমতা ব্রিটিশ জাতির নাই এবং স্বাধীনতা লাভের পথ-নির্দেশে ভারতবাসীদিগকে পরামর্শ দিবেন, এমন ধৃষ্টতাও যদি ইঁহারা দেখাইতে চাহেন, তাহাও আমরা বরদাস্ত করিতে প্রস্তুত নহি। ভারতবাসীরা স্বাধীনতা-অর্জনে ব্রিটিশের কৃপার ভিখারী নহে; সুচতুর সাম্রাজ্যবাদীদের কূট যুক্তি-জাল অগ্নিময় প্রেরণার বলে ছিন্ন করিয়াই তাহারা নিজেদের দেশের স্বাধীনতা অর্জন করিবে। শ্রমিক দল এদেশে আসিয়া আমাদের পরামর্শদাতার অভিনয় করিতে উদ্যত হইবেন না, আমরা ইহাই আশা করি।

বন্দি-মুক্তির দাবী

যে অজুহাতে রাজনীতিক ও নিরাপত্তা বন্দিগণকে এখনও বাঙলার ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কারাগারসমূহে আটক রাখা হইয়াছে, সুদূর প্রাচ্যে যুদ্ধ-বিরতির পর সেই সরকারী অজুহাতও আর টিকে না। আমরা পুনঃপুনঃ এরূপে মন্তব্য করিয়াছি এবং এতৎসম্পর্কে বিক্ষুব্ধ জনমতও সংবাদপত্রসমূহের মারফৎ বহুবার প্রতিধ্বনিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বিভিন্ন কারাগারে শত শত রাজনীতিক ও নিরাপত্তা বন্দীকে আটক রাখা হইয়াছে। এই বন্দিগণের সকলকেই মুক্তি দেওয়ার পরিবর্তে গবর্ণমেণ্ট ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা শোচনীয়রূপে পীড়িত ও ভগ্নস্বাস্থ্য, তাঁহাদিগকেও আটক রাখিয়া যে চূড়ান্ত হৃদয়হীনতার পরিচয় প্রদান করিতেছেন, তাহা যেমন বেদনাকর, তেমনই তাহার নিন্দা করিবার ভাষা নাই। নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি সম্প্রতি যে কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অধুনালুপ্ত 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক শ্রীযুত সত্যরঞ্জন বক্সী ও 'জয়শ্রী' মাসিক পত্রের ভূতপূর্ব সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা লীলা রায়ের মুক্তির দাবী অন্যতম। সম্প্রতি শ্রীযুত বক্সীর মাতা প্রেসিডেন্সী জেলে পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। শ্রীযুত বক্সীকে তাঁহার মাতা অত্যন্ত দুর্বল ও ভগ্নস্বাস্থ্য দেখেন, কথা বলিতেও তাঁহার কষ্ট বোধ হইতেছিল। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুত অনিল রায়ের কথাও উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘ কারা-জীবনে ক্রমাগত তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইতেছে। ভগ্নস্বাস্থ্য বন্দিগণের সম্পর্কে সরকারী চৈতন্য উদয়ের জন্য আমরা পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিয়াছি। সম্প্রতি এইরূপ হৃতস্বাস্থ্য আরও তিনজন বন্দীর সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ইঁহারা হইতেছেন শ্রীযুত সরোজকুমার সেন, শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত ও শ্রীযুত বিমল ঘোষ। শ্রীযুত সেন সিটি কলেজের কমার্স বিভাগের পূর্বতন অধ্যাপক। ইঁহার স্বাস্থ্য শোচনীয়রূপে ভগ্ন হইয়াছে। সম্প্রতি ইঁহার পরিবারবর্গকে দেয় সরকারী ভাতা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। দ্বিতীয় বন্দী শ্রীযুত সেনগুপ্ত মাদারীপুরে আইন ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য অত্যন্ত উদ্বেগ-জনক বলিয়া প্রকাশ। শ্রীযুত বিমল ঘোষ অর্শরোগে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন এবং স্বাস্থ্যও শোচনীয়রূপে ভাঙিয়া পড়িয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এরূপ ভগ্নস্বাস্থ্য ব্যক্তিগণকে বিনাবিচারে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্দী করিয়া রাখা এবং ইঁহাদের জীবনের প্রতি এইরূপ নিদারুণ অবহেলা যে কোন সভ্য দেশের গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অপরিসীম কলঙ্কের কথা। দেশবাসী ইঁহাদিগকে নির্দোষ বলিয়াই জানে। কোন প্রকাশ্য আদালতে ইঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত এবং প্রমাণিত হয় নাই। সেই দিক দিয়া এবং মানবতার দিক দিয়াও এই সমস্ত ভগ্নস্বাস্থ্য বন্দিগণকে অবিলম্বে মুক্তিদান করা সরকারের পক্ষে আশু এবং অপরিহার্য কর্তব্য।

কারাগারের কাহিনী

নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের রাজনীতিক বন্দীদের হিসাব সংগ্রহ করিতেছেন। আমরা দেখিলাম পাঞ্জাব, তামিলনাদ এবং গুজরাটের সম্বন্ধে এতৎসম্পর্কিত রিপোর্ট তাঁহাদের নিকট পৌঁছিয়াছে। সমগ্র ভারতের মধ্যে বাঙলাদেশেই রাজনীতিক বন্দীর সংখ্যা অধিক। বিলাতে শ্রমিক গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও বাঙলার এই সব স্বদেশপ্রেমিক বীর সন্তানগণের বন্দী-জীবনের অবসান ঘটিল না। পক্ষান্তরে ভারতের কারাগারসমূহে নির্মম এবং নিষ্ঠুর নির্যাতনের কাহিনী উত্তরোত্তর আমাদের কর্ণে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। এ সম্পর্কে আমাদের মনে এই বিশ্বাসই দৃঢ় হইতেছে

যে, ভারতের এই সব স্বদেশপ্রেমিক কর্মীদের মুক্তির জন্য গভর্নমেণ্টের নিকট আবেদন-নিবেদন করিয়া কোন লাভ নাই; কারণ ভারতের স্বাধীনতার গতিপথ রুদ্ধ করিতেই গভর্নমেণ্ট দৃঢ়সংকল্প; সুতরাং স্বদেশপ্রেমিক ভারত সন্তানদিগকে ইঁহারা শত্রুর দৃষ্টিতেই দেখিবেন। এ ক্ষেত্রেও মানবতার প্রশ্নও ইঁহাদের কাছে অবান্তর। মিত্রপক্ষ যুদ্ধ-বন্দীদিগকে সাজা দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু ভারতের কারাগার-সমূহে অসহায় রাজনীতিক বন্দীদের উপর যাহারা নিষ্ঠুর নির্যাতন চালাইতেছে, তাহাদের সম্পর্কে তাঁহারা উদাসীন। সম্প্রতি যেসব খবর পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে দেখা যায়, আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দীদের উপরই নির্যাতনের প্রকোপ বিশেষ ভাবে আপতিত হইতেছে। লাহোরের একটি সংবাদে প্রকাশ, মণ্টোগোমারী জেলে অবরুদ্ধ আজাদ হিন্দ ফৌজের তিনজন সৈনিক কিছুদিন পূর্বে লাঠির প্রহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে; কলিকাতার নিকটবর্তী নীলগঞ্জ বন্দি-শিবির হইতেও কিছুদিন পূর্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের মৃত্যুর মর্মান্তিক সংবাদ পাওয়া যায়। ঝিকরগাছার আজাদ হিন্দ ফৌজদের বন্দি-নিবাস হইতেও গুলীর খবর আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কয়েকজন অত্যাচার এবং নির্যাতনের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়াও সংবাদ পাওয়া যায়। এই সব বিবরণ যদি সত্য না হয়, তবে কর্তৃপক্ষের অবিলম্বে এগুলির প্রতিবাদ করা উচিত; কারণ আজাদ হিন্দ ফৌজের এই সব বীর সন্তানের প্রাণের মূল্য বিদ্রোহী হিসাবে তাঁহাদের কাছে তুচ্ছ হইতে পারে; কিন্তু দেশের লোকের নিকট তুচ্ছ নহে। এ সব সংবাদে দেশব্যাপী বিক্ষোভের সৃষ্টি হইবে, ইহা স্বাভাবিক।

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন

গত ২৫শে হইতে ২৭শে ডিসেম্বর মীরাটে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন বিশেষ সফলতার সহিত নিষ্পন্ন হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুত ক্ষিতিমোহন সেন মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্য, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত—বৃহত্তর বঙ্গ, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সেন—দর্শন, ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী—ইতিহাস এবং শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—শিল্প ও বাণিজ্য শাখার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। মূল সভাপতি শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের অভিভাষণ নানাদিক হইতেই উল্লেখযোগ্য হইয়াছে। তিনি বাঙালীর বর্তমান জীবনের বিশদভাবে আলোচনা করিয়া সহজ ও সরলভাবে সমাজের উন্নতির পথ নির্দেশ করিয়াছেন। অন্যান্য সভাপতিদের আলোচনাও আমাদের জাতীয় অভ্যুন্নতির দিকে উজ্জ্বলভাবে আলোকসম্পাত করিয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুবোধনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য সেবার ভিতর দিয়া বাঙালীর সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধানের উপর জোর দিয়াছেন। তাঁহার এই অভিভাষণ সর্বতোভাবেই কালোপযোগী হইয়াছে। মোটের উপর প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বিগত অধিবেশন নানাদিক হইতেই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হইয়াছে; এজন্য মীরাটের প্রবাসী বাঙালী সমাজ এবং তাহাদের মুখপাত্র-স্বরূপে অধিবেশনের কর্মকর্তৃগণ বিশেষভাবেই ধন্যবাদার্হ। সাহিত্যই বাঙালীর সব চেয়ে বড় সম্পদ; প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সাহিত্য এবং সংস্কৃতির সম্পর্ক থাকিলেও আমরা বরাবরই এই কথা বলিয়া আসিতেছি যে, রাজনীতির দিক হইতেও ইহার খুব একটা বড় মূল্য রহিয়াছে; কারণ, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির সাধনা রাজনীতির সম্পর্ক শূন্য হইতে পারে না; এই দিক হইতে সাহিত্য সেবা স্বদেশের সর্বোত্তম সেবা বলা যাইতে পারে। আমরা মীরাটের দেশপ্রেমিক কর্মিবৃন্দকে পুনরায় আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

আমাদের বস্ত্র-সংকট

যুদ্ধ অতীত হইল; কিন্তু আমাদের বস্ত্র সংকট কাটিল না। সত্বর যে এই সমস্যার সমাধান হইবে, ইহাও মনে হয় না; কারণ, সাম্রাজ্য স্বার্থের সঙ্গে ভারতের এই বস্ত্র-সমস্যার সম্পর্ক নিবিড়ভাবে জড়িত রহিয়াছে। ভারতীয় কটন টেক্সটাইল কণ্ট্রোল বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীযুত কৃষ্ণরাজ থ্যাকারসে সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরও কিছুকাল বলবৎ রাখিতে হইবে এবং বস্ত্র মূল্য আর কমাইবার সম্ভাবনা নাই। বস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রচলিত রাখিবার পক্ষে যুক্তি উপস্থিত করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, সমগ্র পৃথিবীতে বস্ত্রের ঘাটতি দেখা দিয়াছে; যতদিন পর্যন্ত এই অবস্থার প্রতিকার না হইতেছে, ততদিন পর্যন্ত ভারতে বস্ত্র নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা বহাল না রাখিয়া উপায় নাই। সমগ্র জগতের বস্ত্র সমস্যার বিরাট আন্তর্জাতিক প্রশ্নটি শ্রীযুক্ত থ্যাকারসে মহাশয়ের মস্তিষ্ক কেন আলোড়িত করিল, এ সম্বন্ধে সাধারণের মনে প্রশ্ন উঠা অস্বাভাবিক নয়; কারণ কিছুদিন পূর্বে বোম্বাইয়ের কলওয়ালারা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া বলিয়াছিলেন যে, ভারতের কলসমূহে যে পরিমাণ বস্ত্র উৎপন্ন হইতেছে, তাহাতে অনায়াসেই ভারতের বস্ত্রাভাব মোচন হইতে পারে। সুতরাং সহজেই বোঝা যায়, নিয়ন্ত্রণ-নীতির বলে ভারতবাসীদিগকে অর্ধনগ্ন রাখিয়া বিশ্বের বস্ত্র-কষ্টের এখান হইতে সমাধান করিবার শুভ সংকল্প লইয়া কর্তারা অগ্রসর হইয়েছেন। কাজেই ভারতের আবশ্যক বস্ত্র ভারতে উৎপন্ন হইলেও ভারতবাসীরা তাহা পাইবে না। তারপর বস্ত্রের মূল্য আপাতত কেন কমান সম্ভব হইবে না, খোদ বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্য স্যার আকবর হায়দরী সেদিন বোম্বাইতে আমাদিগকে সেকথা শুনাইয়া দিয়াছেন। তিনি প্রথমত ক্রেতা সাধারণের উপর কটূক্তি বর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন, কাপড়ের চোরা বাজার বস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও এখনও সর্বত্র চলিতেছে, ইহা ঠিক, কিন্তু ক্রেতাসাধারণই এজন্য অনেকাংশে দায়ী। তাহারা অভিযোগ করে, কিন্তু আমাদিগকে সাহায্য করে না। স্যার আকবরকে আমাদের এক্ষেত্রে বক্তব্য এই যে, নিয়ন্ত্রিত দ্রব্যের বণ্টনের ভার গভর্নমেণ্টেরই হাতে; এরূপ অবস্থায় এই সোজা সত্য উপলব্ধি করিতে কোন বেগ পাইতে হয় না যে, সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি প্রবেশ না করিলে চোরাবাজার চালু থাকিতে পারে না। দুর্নীতিপরায়ণ এই সব সরকারী কর্মচারী আইনের কূটচক্রের ভিতর নিজে-দিগকে নিরাপদ রাখিয়া কাজ চালায়। সে চক্রব্যূহ ভেদ করা গরীব জনসাধারণের পক্ষে সম্ভব নহে, অথচ অত্যাবশ্যক দ্রব্য তাহাদিগকে সংগ্রহ করিতেই হয়; সুতরাং সরকারী বড় বড় বিবৃতির ফাঁকে ফাঁকে চোরাবাজারী কারবার স্বচ্ছন্দে চলিতে থাকে। স্যার আকবর নিজেও পরোক্ষভাবে এই অবস্থার কথা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। বস্ত্রমূল্য হ্রাসের প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া তিনি বলেন, কেন্দ্রে এবং প্রদেশসমূহে উপযুক্ত পরিমাণ যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মচারীর অভাব রহিয়াছে, এই অবস্থায় ধীরে মূল্য হ্রাসের পন্থা অবলম্বন না করিয়া যদি হঠাৎ অতিমাত্রায় মূল্য হ্রাস করিয়া ফেলা হয়, তবে চোরাবাজারী কারবার বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং স্যার আকবরের উক্তিতেই দেখা যাইতেছে, বস্ত্রের মূল্য হ্রাস না করা যায়, এমন নহে; কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণ শিক্ষিত এবং সুযোগ্য কর্মচারীর অভাব, আর সেজন্য চোরাবাজারী কারবারের ভয় সুতরাং ক্রেতাসাধারণের পক্ষে কম মূল্যে বস্ত্র পাইবার কারণ থাকা সত্ত্বেও বেশী দাম দিয়া কাপড় ক্রয় করিতে হইবে। এ কারবারের মোটালাভের অংকটা কাহাদের ভাগে পড়িবে, এই প্রশ্ন থাকিয়া যাইতেছে।

শান্তিনিকেতনে মহাত্মা গান্ধী



গান্ধীজী শ্রীনিকেতনে দীনবন্ধু এণ্ডরুজ স্মৃতি হাসপাতালের ভিত্তি স্থাপন করিতেছেন।



'উদয়নে' মহাত্মাজীকে শ্রীযুত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছেন।



শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর স্টুডিওতে মহাত্মা গান্ধী।



দীনবন্ধু ভবনের ভিত্তি স্থাপনান্তর মহাত্মাজী সমবেত জনগণকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা করিতেছেন। গান্ধীজীর পার্শ্বে শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখা যাইতেছে।



দক্ষিণ পার্শ্বে—একটি হরিজন বালিকা গান্ধীজীকে মাল্যভূষিত করিতেছে।

নীচে, বামে—কলাভবন হইতে বাহির হইয়া আসিবার কালে মহাত্মাজী নিখিল ভারত রবীন্দ্রনাথ স্মৃতিরক্ষা কমিটির জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদারের সহিত আলোচনা করিতেছেন।

নীচে, দক্ষিণে—শান্তিনিকেতনে মহাত্মাজী ও শ্রীযুত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে আলোচনা।





বৈদেশিকী

ক্ষুদ্র শ্যাম রাজ্যের সহিত ইংলণ্ডের শান্তি স্থাপিত হইতে চলিল। কিন্তু শ্যামের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ইংরেজ ও আমেরিকানদের মধ্যে বোঝাপড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ সম্বন্ধে কোন্ স্থায়ী ব্যবস্থা হইবে বলিয়া মনে হয় না। সে যাহা হউক, শ্যামবাসীদের প্রতি ইংলণ্ডের মতিগতি ভাল নয়। এই সুযোগে শ্যামকে গ্রাস করার দিকেই সব জিনিসটা গড়াইতেছে এবং অন্য কোন শক্তি হইতে বাধা না পাইলে শ্যাম শীঘ্রই বর্মার অবস্থায় পরিণত হইবে বলিয়া ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে।

শ্যাম এতদিন কি করিয়া তার স্বাধীনতা বজায় রাখিল বিবেচনা করার বিষয়। ইহার প্রধান কারণ ইংরেজ ও ফরাসীদের রেষারেষি। প্রায় সত্তর বছর আগে বর্মীরা যখন তাহাদের স্বাধীনতা হারাইল ও ফরাসীরা ইন্দোচীন গ্রাস করিতে বসিল, তখন শ্যাম দুই দলের কাছে নিজের কিছু কিছু অংশ হারাইয়াও দাসত্বের শৃঙ্খল এড়াইতে সমর্থ হইল। জগৎব্যাপী ইঙ্গ-ফরাসী বিরোধের ফলে অন্তত বাহ্যত শ্যামের স্বাধীন সত্তা বিনষ্ট হইল না। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আফগানী-স্থানের মত শ্যাম রাজ্যও একটি buffer stateএ পরিণত হইল। দুই শক্তিশালী রাজ্যকে পৃথক রাখায় এই সব ছোট দেশের প্রয়োজনীয়তা।

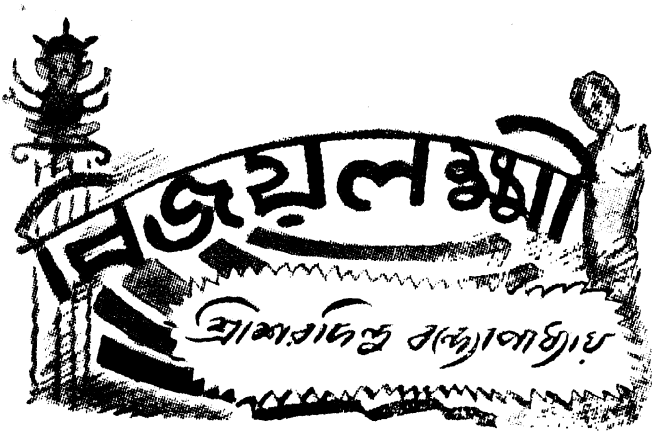
ঐ সময়ে এশিয়ায় ইংরেজদের একচেটিয়া আধিপত্য থাকাতে আর্থিক ও রাজনৈতিক সূত্রে শ্যামের বহুলভাবে ইংরেজদের উপর নির্ভরশীল হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে এই অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হইয়াছে। জাপানের শক্তিবর্ধনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব এশিয়ায় রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলাইতে লাগিল এবং শ্যামের নেতারাও এই শক্তিদ্বন্দ্বের সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে ছাড়িলেন না। শ্যামের স্বাধীনতা এতদিন পর বাস্তব আকার ধারণ করিতে লাগিল। ক্রমেই ইউরোপীয় শক্তিগুলি শ্যামবাসীদের প্রতি তাহাদের পূর্ব নীতি পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইল। মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে, ১৯৩৭ সালের মধ্যে আন্তর্জাতিক অসাম্যের যে সব চিহ্ন শ্যামের লজ্জার কারণ ছিল, তাহা দূর হইল। রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্যামের নেতৃবৃন্দ দেশের আর্থিক উন্নতি ও স্বাধীনতার দিকে মন দিবার সুযোগ পাইলেন। এই প্রসঙ্গে বক্তব্য এই যে, শ্যামের আর্থিক জীবনে চীনবাসী ও ইংরেজের প্রতিপত্তি এত অধিক ছিল যে, শ্যামের অর্থনৈতিক প্রগতি নানাভাবে বাধা পাইতেছিল। ১৯৩২ সালের পর হইতে সরকারী আওতায় শ্যামে নানা শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠিত হইল এবং ব্যবসা বাণিজ্যেও শ্যামের অধিবাসীরা নানা সুযোগ পাইল।

কিন্তু এইসব আভ্যন্তর পরিবর্তন সত্ত্বেও শ্যামের নেতারা বহির্জগতের সহিত দেশের সম্বন্ধ এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে লাগিলেন যাহাতে শ্যামকে কোন বিশেষ শক্তির উপর নির্ভর না করিতে হয়। এই নীতি অনুসরণ করার ফলে শ্যামের আন্তর্জাতিক গৌরব বর্ধিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের ভিতরে নানা উন্নতিরও সুযোগ বাড়িল।

জাপানের সহিত ইঙ্গ-মার্কিণদের সংগ্রাম যখন আরম্ভ হইল তখনও শ্যামবাসীরা ভাবিয়াছিল যে, তাহারা ইহার হাত হইতে রক্ষা পাইতে সমর্থ হইবে। সেইজন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শ্যামের কর্তৃপক্ষরা উভয় দলের সহিত বন্ধুত্ব রক্ষা করিতে সচেষ্ট ছিলেন। ফ্রান্সের পরাজয়ের পর ইঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, জাপান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ফ্রান্সের স্থান অধিকার করিবে এবং শ্যাম তাহার স্বাধীনতা পূর্বের মত বলবৎ রাখিতে পারিবে। কিন্তু জাপানীরা যখন ইন্দোচীন দখল করিল এবং শ্যামের ভিতর দিয়া মালয় ও ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করিবার সংকল্প করিল তখনও বিপুল-সংগ্রাম প্রভৃতি শ্যামের নেতারা জাপানের সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধে যোগদান করিতে রাজী হন নাই। কিন্তু জাপানীরা যখন শ্যামের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল তখন তাহাদের ক্ষমতা না মানা ছাড়া উপায় ছিল না। পরে যখন দেখা গেল, ইংরেজ মালয় ও ব্রহ্মদেশকে শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিল না তখন শ্যাম জাপানের মিত্র হইতে বাধ্য হইল। বর্তমান জগতে ক্ষুদ্র দেশের এই দুর্ভাগ্য। ইহাদের স্বাধীনতা সব সময়েই পর মুখাপেক্ষী।

এই যুদ্ধে শ্যামের ভৌগোলিক পরি-স্থিতি হইতে আর একটা জিনিস প্রমাণিত হইয়াছে। দেখা গিয়াছে যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সামরিক নিরাপত্তার চাবী শ্যাম। অর্থাৎ শ্যাম যে কোন বৃহৎ শক্তির অধীনে থাকিবে, সেই শক্তি বর্মা, মালয় ও নিকট-বর্তী অন্যান্য দেশকে আক্রমণ ও রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। শ্যামকে দখল করার ফলে জাপান অতি সহজে মালয় ও ব্রহ্মদেশ অধিকার করিতে সমর্থ হয়। এই কারণে ভবিষ্যতে ইংলণ্ডেরও চেষ্টা হইবে যাহাতে শ্যাম সব সময় তাহার আধিপত্যে থাকে। বস্তুত শ্যামের উপর ইংলণ্ড যে সমস্ত দাবী চাপাইয়াছে শুনা যাইতেছে, তাহা হইতে ইংলণ্ডের মতিগতি বেশ বুঝা যাইতেছে। আর একটা কথা এই যে, ফ্রান্সের আন্তর্জাতিক ক্ষমতা হ্রাস হওয়ার ফলে শ্যামকে আর buffer state হিসাবে রাখারও কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমেরিকা কি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকিবে? প্রথমত শ্যাম চীনের পার্শ্ববর্তী দেশ এবং দ্বিতীয়ত শ্যাম বৃটেনের দাস হইলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৃটিশদের ক্ষমতা এমনভাবে বাড়িবে যে, সুদূর প্রাচ্যে আমেরিকার একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা ব্যাহত হইবে। শ্যামের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ইঙ্গ-মার্কিনদের মতদ্বৈধের ইহাই প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ড আমেরিকাকে চটাইয়া এ ব্যাপারে বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিবে না, কিন্তু স্থানে স্থানে যে ইহাদের মনান্তর হইতেছে তাহা এশিয়ার পক্ষে সুখবর। আজ এশিয়াবাসীদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা ভয়ের কথা ঔপনিবেশিক বাদ সম্বন্ধে ইঙ্গ-মার্কিনদের মতের ঐক্য। এই ঐক্য যতকাল বর্তমান থাকিবে ততদিন পরাধীন দেশগুলির ভবিষ্যৎ অনুজ্জ্বল থাকিবে।

লণ্ডনের পররাষ্ট্র সচিবদের কনফারেন্স ভাঙ্গার পর মনে হইয়াছিল যে, আবার শীঘ্র কোন আন্তর্জাতিক সভা ডাকা হইবে না। কিন্তু এত অল্প দিনের মধ্যেই কেন মস্কৌতে আর একটা কনফারেন্সের উদ্যোগ করা হইল? সকলেই জানেন যে, আমেরিকার মিঃ বার্ণস (Byrnes), বৃটেনের মিঃ বেভিন ও রাশিয়ার মিঃ মলটভ সম্প্রতি সোভিয়েট ইউনিয়নের রাজধানীতে মিলিত হইয়াছেন। এই সভায় পূর্বের মত ফরাসী ও চৈনিক প্রতিনিধি আসেন নাই। তার প্রধান কারণ বোধ হয় যে, সকলেই এখন বুঝিতে পারিয়াছেন যে, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ শান্তি আপাতত আমেরিকা, বৃটেন ও রাশিয়া অর্থাৎ জগতের তিনটি বড় শক্তির উপর নির্ভর করিবে। অন্যদিকে উপরোক্ত তিনটি শক্তি ইতিমধ্যে নিজেদের জাতীয় স্বার্থ নিয়া এমনভাবে জড়াইয়া পড়িয়াছে যে, অতি সত্বর ইহাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া না হইলে আবার একটা মহাযুদ্ধ থামান কঠিন হইবে। সংবাদপত্রে মধ্যপ্রাচ্য, তুরস্ক, ইরাণ, চীন ও জাপান নিয়া নানা আলোচনা চলিতেছে এবং বাহ্যত মনে হয় যে, আসল বিবাদটা বুঝি এই সব দেশের একটাকে নিয়া কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, এই তিন শক্তির মধ্যে আসল বিরোধ এখনও ইউরোপে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে ইউরোপের ভবিষ্যৎ অবহেলার বিষয় নয়। সেইজন্য জার্মানির উপর কে আধিপত্য করিবে, তাই নিয়া ইহাদের মধ্যে এত মন কষাকষি। মস্কো কনফারেন্সে জার্মানির ভবিষ্যৎ যে আলোচনার একটা বিশেষ বিষয় হইবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।



(২)

কাট্।

দোকানের সদরে মোটর এখনও দাঁড়াইয়া আছে। তরুণী মাঝে মাঝে পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া দ্বারের পানে তাকাই-তেছেন। ফুটপাথে ছেলেরা খেলিয়া চলি-য়াছে। মহেশ ড্রাইভার গাড়ির পিছন দিকে দাঁড়াইয়া সতর্ক ভাবে একটা বিড়ি টানিয়া লইতেছে।

বিজয় বাহির হইয়া আসিল; মুখে চোখে অবরুদ্ধ ক্রোধের উষ্মা। মনের এরূপ অবস্থা বিপজ্জনক, কারণ এ সময় বহির্জগতের দিকে দৃষ্টি থাকে না। বিজয় ফুটপাথে নামিয়াই কার্তিকের গুলীর উপর পা দিল। সঙ্গে সঙ্গে—সড়াৎ! পা পিছলাইয়া বিজয় সশব্দে ফুটপাথে আছাড় খাইল।

মোটরের ভিতর হইতে একটি তরুণ কণ্ঠের কলহাস্য সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। ছেলের দল কোলাহল করিয়া উঠিয়া নিজ নিজ মারবেল্ কুড়াইয়া মুহূর্ত মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বিজয় বেদনা-বিকৃত মুখে উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না, অর্ধেক উঠিয়া আবার পায়ের গোছ ধরিয়া বসিয়া পড়িল। কার্তিক পলায়ন করে নাই; সে বিজয়কে উৎসাহ দিয়া বলিল—

কার্ত্তিক—উঠে পড়ুন স্যার—কিছু লাগেনি—

মোটরে বসিয়া তরুণী প্রথমটা হাসিয়া উঠিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বিজয়ের ব্যথা-বিদ্ধ মুখ দেখিয়া তাঁহার হাসি থামিয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি গাড়ি হইতে নামিবার উপক্রম করিলেন।

ওদিকে কার্তিক দু'হাতে বিজয়ের বাহু ধরিয়া টানিয়া তুলিবার উপক্রম করিতেছে।

কার্তিক—উঠুন স্যার—এ'ইয়ো! চিকা চিকা বুম!

বিজয় উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার স্কন্ধে ভর দিল, হাসিবার ক্লিষ্ট চেষ্টা করিয়া বলিল—

বিজয়—দুম্।

কার্তিক—আজ্ঞে?

বিজয়—চিকা চিকা বুম নয়—চিকা চিকা দুম্।

যে ব্যক্তি এমন গুরুতর পতনের পরও রসিকতা করিতে পারে, তাহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকা যায় না। কার্তিক শ্রদ্ধাভরে আকর্ণবিশ্রান্ত হাসিল। এই সময় তরুণী বিজয়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।



সতর্কভাবে একটা বিড়ি টানিয়া লইতেছে।

তরুণী—বেশী লাগেনি তো?

তরুণীকে দেখিয়া বিজয় মুখ গম্ভীর করিল।

বিজয়—বিশেষ কিছু নয়, পা মচ্‌কে গেছে।

কার্তিকের স্কন্ধে ভর দিয়া সে সন্তর্পণে পা বাড়াইল।

কার্তিক—কিছু ভাববেন না স্যার, আমি আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দেব। কোন দিকে আপনার বাড়ি স্যার?

বিজয়—নেবুতলার দিকে।

বিজয় আর এক-পা অগ্রসর হইল; তরুণী তখন তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—

তরুণী—দেখুন, আমার একটা কথা শুনবেন? আমার গাড়িতে আসুন, আমি আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।

বিজয় ঊর্ধ্বদিকে চক্ষু তুলিয়া উদাসকণ্ঠে বলিল—

বিজয়—ধন্যবাদ, আমি হেঁটেই বাড়ি পৌঁছুতে পারব, আপনাকে কষ্ট করতে হবে না।

তরুণী—আমার কোনও কষ্ট করতে হবে না। আপনার বাড়ি নেবুতলায় তো? আমি ঐদিক দিয়েই কলেজ যাই, আপনাকে শুধু নামিয়ে দিয়ে যাব।

বিজয় তরুণীর প্রতি একটি শুষ্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

বিজয়—আপনার অসীম দয়া। কিন্তু একজন অপরিচিতকে এত অনুগ্রহ কেন করছেন, বুঝতে পারছি না।

তরুণী—(ঈষৎ হাসিয়া) হয়তো একটু স্বার্থ আছে। জানেন তো মেয়েদের কৌতূহল বেশী হয়। আপনার চাকরীর কি হল জানবার জন্যে মন ছট্‌ফট করছে।

বিজয়—ও—তা সে তো এককথায় বলা যায়—

তরুণী—না না এখানে নয়—গাড়িতে—

বিজয় আর প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না—কার্তিক ও তরুণীর সাহায্যে গাড়িতে উঠিয়া বসিল। গাড়ি চলিয়া গেল। কার্তিক কোমরে হাত দিয়া কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিল, তারপর দীর্ঘ শিস্ দিয়া বলিল—

কার্তিক—চিকা চিকা বুম্।

কাট্।

চলন্ত মোটরে দুজনে পাশাপাশি বসিয়া আছে। বিজয়ের পশ্চাদ্ভাগে একটা কিছু ফুটিতেছিল, সে সেটা বাহির করিয়া দেখিল একখানা ইংরেজি বই। বিরসমুখে সে বইয়ের পাতা উল্টাইতে লাগিল। তরুণী স্মিতনয়নে তাহাকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া তরলকণ্ঠে বলিলেন—

তরুণী—একটা কথা বলবেন? আপনি বিদ্বান লোক না? অন্তত বি-এ পাস করেছেন।

বিজয়—বি-এ পাস করলে যদি বিদ্বান হয়, তবে আমিও বিদ্বান। কিন্তু বুঝলেন কি করে?

তরুণী—(মুখ টিপিয়া হাসিয়া) বই দেখলে আপনার মুখের ভাব বদলে যায়।—কিন্তু যাক, আপনার চাকরির কি হল বলুন।

বিজয়—কি আর হবে—যা আশা করেছিলুম তাই। আপনার বাবা এবং আর একজন ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে ঝগড়া হল, তারপর চলে এলুম।

তরুণী কিছুক্ষণ কথা বলিলেন না, তারপর সুদীর্ঘ একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—

তরুণী—আমি খুশী হয়েছি।

বিজয় ভ্রূকুটি করিয়া তরুণীর দিকে চাহিল, তাহার মুখে ক্রমে একটা কঠিন হাসি ফুটিয়া উঠিল।

বিজয়—খুশী হয়েছেন। তা তো হবেনই। চাকরী পেলে গরীবের অন্নসংস্থান হত, কিন্তু তাতে আপনার কি আসে যায়! (তরুণী হাসিলেন)—হাসছেন। অর্থাৎ এত আনন্দ হয়েছে যে, চেপে রাখতে পারছেন না। এই ড্রাইভার, গাড়ি থামাও আমি এখানেই নামব।

তরুণী—কেন, আপনার বাড়ি এসে পড়ল?

বিজয়—না, কিন্তু আমি হেঁটেই যেতে চাই। আমার পা এখন ঠিক হয়ে গেছে।

মহেশ গাড়ির গতিবেগ হ্রাস করিয়াছিল। তরুণী মুচ্‌কি হাসিয়া বলিলেন—

তরুণী থামাবার দরকার নেই মহেশ।—আপনি তো ভারী রাগী লোক; আমি খুশী হয়েছি বলে আমার গাড়িতেই আর থাকবেন না! রাগ না করে খুশীর কারণটা জিগ্যেস করলেও তো পারতেন।

বিজয় উত্তর না দিয়া গোঁজ হইয়া বইয়ের



শিস্ দিয়া বলিল, "চিকা চিকা বুম্"।

পাতায় চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া রাখিল। তরুণী মিটি মিটি হাসিলেন।

তরুণী—কি পড়ছেন এত? ওটা গল্প-উপন্যাসের বই নয়। খোঁচা দিবার সুযোগ পাইয়া বিজয় মুখ তুলিল।

বিজয়—না, ইকনমিক্‌সের বই। কিন্তু আপনার এ বই পড়বার কি দরকার? আপনার পড়া উচিত কবিতার বই, রূপকথার বই—

তরুণী—তাও পড়ি। এটা কলেজের পাঠ্য কিনা, তাই পড়তে হয়। কিন্তু ওকথা যাক আপনি একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক, সামান্য চাকরীর জন্যে এমন ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন কেন বলুন তো?

বিজয়—কি করতে বলেন? চুরি-ডাকাতি?

তরুণী—চুরি-ডাকাতি আর গোলামী ছাড়া জীবিকা উপার্জনের আর কি পথ নেই?

বিজয়—আর কি আছে আপনিই বলুন।

তরুণী—ব্যবসা আছে—স্বাধীন ব্যবসা?

বিজয় ক্ষণেক কৃপাপূর্ণনেত্রে তরুণীকে পরিদর্শন করিল।

বিজয়—অর্থনীতির ছাত্রীর পক্ষে আপনার কথাটা একটু—ইয়ে হয়ে গেল। ব্যবসা—স্বাধীন ব্যবসা করতে গেলে মূলধন চাই, বুঝেছেন? মূলধন।

তরুণী—বুঝেছি।

সহসা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বিজয় নিজ পকেটে হাত দিল।

বিজয়—আমার কত মূলধন আছে জানেন?—পকেট হইতে হাত বাহির করিয়া সে তরুণীর সম্মুখে মেলিয়া ধরিল।

বিজয়—এই দেখুন, এক টাকা সাড়ে তিন আনা আমার মূলধন। আমার পারিবারিক অবস্থাটাও তাহলে খুলে বলি—বাড়িতে মা আছেন, আর আমি। দাদা মফঃস্বলে সেরেস্তাদারের কাজ করেন, মাসে মাসে টাকা পাঠান; তাতেই খরচ চলে। আজ মাসের সাতাশে, অর্থাৎ আরও চারদিন এই এক টাকা সাড়ে তিন আনায় আমাকে সংসার চালাতে হবে (টাকা পকেটে রাখিয়া) এখন কি বলেন? স্বাধীন ব্যবসা আরম্ভ করার পক্ষে এই-ই যথেষ্ট—কেমন?

তরুণী কিন্তু মোটেই দমিয়া গেলেন না, বরং কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। বিজয়ের মুখ লাল হইয়া উঠিল।

বিজয়—ও—আপনার হাসি পাচ্ছে। আমার দারিদ্র্যের ইতিহাস আপনার হাসির খোরাক জুগিয়েছে—ভাল। আচ্ছা, নমস্কার। এই ড্রাইভার—

তরুণী হাসি থামাইয়া বিজয়ের বাহু স্পর্শ করিলেন।

তরুণী—আপনি বড় উল্টো বোঝেন। হাসলুম কেন জানেন? স্বাধীন ব্যবসা আরম্ভ করার জন্যে এক টাকা সাড়ে তিন আনা শুধু যথেষ্টই নয়—অপর্যাপ্ত।

বিজয়—ও—তাই নাকি?

তরুণী—হ্যাঁ। এখন আপনাকে একটা গল্প বলি—শুনুন।

বিজয় : এর পরেও গল্প বলবেন? (হৃদয় ভারাক্রান্ত নিশ্বাস ফেলিয়া) বেশ, বলুন।

বিজয় পিছনে ঠেস দিয়া বসিল। তরুণীর মুখে গাম্ভীর্য; তিনি ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

তরুণী ঃ আমাদের দোকানটা আজ দেখলেন তো—বেশ বড় দোকানই বলতে হবে, প্রায় দশ লাখ টাকার কারবার। প'য়তাল্লিশ বছর আগে আমার ঠাকুর্দা এই মনোহর ভাণ্ডারের পত্তন করেছিলেন। তখন তাঁর মূলধন ছিল—আট আনা।

বিজয়—অ্যাঁ—আট আনা!

তরুণী ঃ হ্যাঁ। অনেকবার দাদুর মুখে গল্প শুনেছি। ভারী গরীব ছিলেন, কলকাতা শহরে মাথা গোঁজবার যায়গা ছিল না। প্রথমে এক উড়িয়ার দোকানে তেলে-ভাজা বিক্রি করতেন আর তার দোকানের বারান্দায় পড়ে থাকতেন। ক্রমে আট আনা পয়সা জমল, তখন তিনি স্বাধীন ব্যবসা আরম্ভ করলেন ঃ চুলের কাঁটা, কাপড় কাচা সাবান, ছেলেদের কাঠের খেলনা —এই সব সস্তা জিনিস বাড়ি বাড়ি ফিরি ক'রে বেড়াতেন।

বিজয় বিস্ফারিত নেত্রে তরুণীর পানে চাহিয়া রহিল। তরুণী একটু হাসিলেন, কিন্তু তাঁহার চক্ষু দুটি অবরুদ্ধ আবেগে বাষ্পোৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

তরুণী—আপনি হয়তো বিশ্বাস করছেন না যে, ভদ্র ব্রাহ্মণ সন্তানের পক্ষে এতটা কৃচ্ছ্রসাধন কি করে সম্ভব হ'ল। কিন্তু আমার দাদু জীবনে কখনও মিছে কথা বলেন নি; সত্যিই এসব কাজ তিনি করেছিলেন। দুর্জয় সাহস ছিল তাঁর, আর ছিল স্বাধীনতার দুর্দম পিপাসা। পরের গোলামী করে জীবন কাটাবার মত মনের দীনতা তাঁর ছিল না—

বিজয়—আপনার বৃদ্ধ দাদু তো ভারী তেজী লোক ছিলেন।

তরুণী—যে সময়ের কথা বলছি, সে সময় দাদু বৃদ্ধ ছিলেন না, আপনারই মত নব-যুবক ছিলেন।

বিজয়—আর লজ্জা দেবেন না, তারপর বলুন—

তরুণী—তখন দাদুর দৈনিক আহারের খরচ ছিল চার পয়সা—যেদিন লাভ না হ'ত, সেদিন একবেলা খেতেন। এমনি করে দীর্ঘ দু-বছর ধরে একটি একটি করে টাকা জমতে লাগল। শেষে দুশো টাকা জমল। তখন দাদু ছোট্ট একটি সিঁদুর-কোটোর মত দোকান খুললেন—নাম দিলেন মনোহর ভাণ্ডার। তারপর পঁয়তাল্লিশ বছরে সেই মনোহর ভাণ্ডার আজ এই হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিজয় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল; তরুণী গোপনে চোখ মুছিল। শেষে বিজয় তরুণীর দিকে ফিরিয়া সম্ভ্রমপূর্ণ স্বরে বলিল—

বিজয়—ধন্যবাদ। আপনার দাদু বেঁচে থাকলে তাঁর পায়ের ধুলো নিতুম।

তরুণী—কিন্তু—দাদু বেঁচে আছেন। (কুণ্ঠিতস্বরে) অনেক বয়স হয়েছে, তাই বাবার হাতে দোকানের ভার দিয়ে কাশীবাস করেছেন—

বিজয় তরুণীর পানে চকিত দৃষ্টিপাত করিল; তাহার মনে হইল তরুণীর মনে যেন একটু ক্ষোভ আছে, যেন তাঁহার দাদু দোকানের ভার তাঁহার পিতার হস্তে অর্পণ করায় তিনি সুখী নন।

বিজয়—ও!—আচ্ছা, এবার আমাকে সত্যিই নামতে হবে। ঐ যে সামনে গলিটা, ওটা আমার গলি—

তরুণী—মহেশ, বাঁ-দিকের গলি।

বিজয়—না না, মোড়ের ওপর নামিয়ে দিলেই হবে।. ও গলিতে আপনার গাড়ি ঢুকবে না—

তরুণী—খুব ঢুকবে।

মোটর গলিতে ঢুকিল।

বিজয়—ঐ যে পাঁচরঙা বেড়ালের মত বাড়িটা, ওর দোতলায় আমি থাকি—

গাড়ি দাঁড়াইল। বিজয় রাস্তায় দাঁড়াইয়া দুই হাত যোড় করিল। তাহার পায়ের বেদনা প্রায় দূর হইয়াছে।

বিজয়—ধন্যবাদ—অনেক অনেক ধন্যবাদ।

তরুণীও সহাস্যে দুই করতল যুক্ত করিলেন।

তরুণী—গল্প মনে থাকবে তো?

বিজয়—থাকবে।

কাট্

দুইটি ঘর লইয়া বিজয়ের বাসা। সদর ঘরটির একমাত্র আসবাব একটি তক্তপোষ; দিনের বেলায় ইহা বসিবার ঘর, রাত্রে বিজয়ের শয়নকক্ষে পরিণত হয়। দেয়াল-চিত্রাদি বাহুল্যবর্জিত, কেবল একটি এস্রাজ তক্তপোষের পিছনের দেয়ালে ঝুলিতেছে; মনে হয় ঘরের নিরাভরণ দীনতা দেখিয়া অভিমানী সৌখীন যন্ত্র গলায় দড়ি দিয়াছে।

তক্তপোষের উপর বিজয়ের দাদা প্রতাপ-বাবু কাৎ হইয়া কনুইয়ে ভর দিয়া অবস্থান করিতেছেন; তাঁহার সম্মুখে একটি রূপার পান-কৌটা। প্রতাপবাবুর বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ; নাদুস-নুদুস্ চেহারা ; দিনে প্রায় একশ খিলি পান খান; চিবাইয়া চিবাইয়া কথা বলেন। তিনি যে সদ্য বিজয়ের বাসায় উপস্থিত হইয়াছেন, তাহার প্রমাণ, একটি গ্ল্যাড্‌স্টোন ব্যাগ মেঝেয় রাখা রহিয়াছে; দ্বিতীয় প্রমাণ তাঁহার জননী শিয়রে দাঁড়াইয়া তাঁহার মাথায় বাতাস করিতেছেন।

জননীটি বাঙলাদেশের বহুলক্ষ বর্ষীয়সী বিধবা জননীর মতই, শান্ত ভীরু পুত্র-মুখাপেক্ষী। জ্যেষ্ঠপুত্রের অপ্রত্যাশিত আগমনে তাঁহার মুখে অজ্ঞাত আশঙ্কার ছায়া পড়িয়াছে। উপার্জনক্ষম স্বাধীন বিবাহিত পুত্রকে ভয় করিয়া চলেন না, এমন জননী বাঙলাদেশে কয়টি আছেন?

প্রতাপ পান-কৌটা হইতে কয়েকটি খিলি মুখে দিয়া খানিকটা চূর্ণ আঙুলের ডগায় তুলিয়া লইলেন।

প্রতাপ—একদিনের ছুটি; তা একটু



“বি-এ পাশ করিয়ে কি লাভটা আমার হলো?”

যে জিরোবো, তার কি যো আছে। সারারাত ট্রেনে হট্‌রাতে হট্‌রাতে আসতে হল। গরজ আমারই কিনা মা, তোমাদের আর কি বল না। মাস গেলে মাসোহারার টাকা আসে—ব্যস্‌—নিশ্চিন্দি। সেই টাকা যে আমাকে গায়ের রক্ত জল করে রোজগার করতে হয়, তা তো আর তোমরা ভাব না—

মা—বাবা প্রতাপ—

প্রতাপ—থাক মা, তুমি যা বলবে, আমি জানি। কিন্তু আমার দিকটাও একটু ভেবে দেখো। লাখপতি নই, ছাঁ-পোষা মানুষ; তবু এই চার বছর খরচ দিয়ে তোমাদের কলকাতায় রেখেছি। কিসের জন্যে? আখেরের কথা ভেবেই না? (চূণ মুখে দিলেন) যা হোক, বিজয় বি-এ পাস করল, ভাবলুম খরচ সার্থক হল, এবার বুঝি সে পয়সা রোজগারে মন দেবে। হায় হরি, কোথায় কি। তিন মাস হয়ে গেল বিজয়ের কোন গুজরই নেই। বৌ তো সেই কথাই বলে—'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।' কিন্তু মা, আমিই বা দুটো সংসার কদ্দিন ঘাড়ে করে থাকি? নিজের সংসারটি কম নয়—দিন দিন মা-ষষ্ঠীর কৃপায় বেড়েই যাচ্ছে। ওদিকে মেয়েটা বড় হয়ে উঠ্‌ল, আজ নয় কাল তার বিয়ে দিতে হবে। আমি একা কোন্‌ দিক সামলাই? তুমিই বল তো, বিজয়ের কি উচিত নয় চাকরি-বাকরি করে আমাকে দু'পয়সা সাহায্য করা? তা সাহায্য চুলোয় যাক, নিজের আর তোমার ভারটাও সে নিতে পারল না। তাকে বি-এ পাস করিয়ে কি লাভটা আমার হ'ল তাহলে?

মা—ঠিক কথাই বলেছ বাবা প্রতাপ—কিন্তু সে চুপ করে বসে নেই। পাস করার পর থেকে রোজ সকাল বিকেল চাকরির খোঁজে বেরোয়—

প্রতাপ—মা, তোমার কোলের ছেলেটি যা বলে, তাই তুমি বিশ্বাস কর। কিন্তু আমি তো আর ঘাস খাই না। তিন মাস ধরে চাকরি খুঁজলে কলকাতা শহরে চাকরি পাওয়া যায় না? তা নয়, দাদার ভাতে আছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে আড্ডা মেরে বেড়াচ্ছে—কি দরকার ওর জোয়াল ঘাড়ে নেবার? যতদিন এইভাবে গায়ে ফুঁ দিয়ে চলে, ততদিনই ভাল—এই আর কি।

মা—না বাবা প্রতাপ, বিজয় তেমন ছেলে নয়—সে সত্যিই কাজের চেষ্টা করছে—

প্রতাপ—যাকগে মা, তুমি বুঝবে না যখন ব'লে লাভ কি? মোট কথা, এবার আমি একটা হেস্তনেস্ত করে যাব। বৌ বলে, 'যা করেছ ঢের করেছ—আর কেন? নিজের অপোগণ্ডদের দিকেও তো তাকাতে হবে। ভাই তো আর স্বর্গে বাতি দেবে না।'

মা কিছু না বলিয়া কেবল চক্ষু মুছিলেন।

দ্বারের কাছে শব্দ হইল; ভেজানো দ্বার ঠেলিয়া বিজয় প্রবেশ করিল। প্রতাপকে দেখিয়া স্মিত-বিস্ময়ে তাড়াতাড়ি আসিয়া সে তাঁহাকে প্রণাম করিল।

বিজয়—দাদা—তুমি কখন এলে?

প্রতাপ চৌকির উপর আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিলেন। দুই ভাইয়ের অনেকদিন পরে দেখা—প্রতাপের মুখে কিন্তু বিজয়ের আনন্দের প্রতিবিম্ব পড়িল না। গম্ভীর মুখে দু'খিলি পান তুলিয়া লইয়া তিনি মুখে দিলেন।

প্রতাপ—আমি তো অনেকক্ষণ এসেছি, কিন্তু তুমি এতক্ষণ ছিলে কোথায়? কার বাড়ীতে আড্ডা জমেছিল?

বিজয় অবাক হইয়া দাদার মুখের পানে তাকাইল, তাঁহার প্রশ্নটা ঠিক ধরিতে পারিল না।

বিজয়—আড্ডা—?

প্রতাপ—হ্যাঁ হ্যাঁ—কিসের আড্ডা বসেছিল? তাসের না গানের?

বিজয়ের মনের ভিতরটা শক্ত হইয়া উঠিল। দাদার স্বভাব সে জানিত কিন্তু অনেকদিন পরে দেখা হওয়ার আনন্দে তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল। সে ক্ষণেক নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল—

বিজয়—তাস-পাশা গান-বাজনার কি সময় আছে দাদা, চাকরীর খোঁজে বেরিয়েছিলুম।

প্রতাপ যে বিশ্বাস করিলেন না তাহা তাঁহার কণ্ঠস্বরেই প্রকাশ পাইল।

প্রতাপ—অ—! তা যোগাড় হল কিছু?

বিজয়—কিছু অপমান, কিছু উপদেশ, আর কিছু ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ—এছাড়া কিছুই যোগাড় হল না। একদল আছে তারা লেখা পড়া জানা লোক চায় না; আর এক দল চায় ত্রিশ টাকা মাইনেতে এম এ পি আর এস।—কাজেই আমার চাকরী জুটবে কোত্থেকে?

প্রতাপ বিরক্তভাবে পানকৌটা তুলিয়া পকেটে পুরিলেন।

প্রতাপ—হুঁ। কিন্তু আমি তো মুখ্যুও নই, এম্‌ এ পি আর এস-ও নই—আমার চাকরী জুটেছিল কি করে?

মা এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, এবার দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে কথা কহিলেন—

মা—বাবা প্রতাপ, আমি একটা কথা বলি। তুমি তো বাবা ভাল চাকরী করছ, সরকারী চাকরী করছ,—তা তুমি বাবা ওকে নিজের অপিসে ঢুকিয়ে নাও না—

প্রতাপ স্তম্ভিত বিস্ময়ের অভিনয় করিয়া এমনভাবে মায়ের পানে তাকাইলেন যে, ভয়ে মায়ের বুক শুকাইয়া গেল।

প্রতাপ—মা! তুমি মা হয়ে এই কথা বললে! আমার চাকরিটাও যাবে? হুজুরে যদি জানতে পারেন—আর জানতে পারবেনই—যে আমি নিজের ভাইকে আপিসে ঢুকিয়েছি তাহলে কি আর রক্ষে থাকবে! সেই দিনই আমার চাকরি যাবে।

মা—(সভয়ে) না না, তাহলে কাজ নেই বাবা—আমি বুঝতে পারিনি।

প্রতাপ কিন্তু একটা সূত্র পাইয়াছেন, সহজে ছাড়িবার পাত্র নয়; তাঁহার কথার ভঙ্গী আরও নাটকীয় হইয়া উঠিল।

প্রতাপ—কি সর্বনেশে কথা! আমি নিজের অফিসে ওকে ঢোকাব! ছেলেপুলের হাত ধরে আমাকে পথে দাঁড় করাতে চাও তোমরা!

মায়ের নিগ্রহ দেখিয়া বিজয় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—

বিজয়—যাকগে দাদা, আমি ঠিক করেছি চাকরি করব না।

প্রতাপ তাঁহার বিস্ময়-স্তম্ভিত দৃষ্টি বিজয়ের দিকে ফিরাইলেন; বিজয় তাড়াতাড়ি বলিয়া চলিল—

বিজয়—আমি ব্যবসা করব—স্বাধীন ব্যবসা। দাদা, চাকরি পেলেও আমি রাখতে পারব না—পদে পদে লাঞ্ছনা আর অপমান, ও আমার সহ্য হবে না। তার চেয়ে স্বাধীন ব্যবসা ভাল; যত সামান্যই হোক, তবু তো কারুর গোলামী করতে হবে না—

প্রতাপের তাম্বুলপূর্ণ মুখ এতক্ষণ বন্ধ ছিল, এবার হাঁ হইয়া গেল।

প্রতাপ—ব্যবসা—তুমি স্বাধীন ব্যবসা করবে!

বিজয়—হ্যাঁ দাদা, তুমি অনুমতি দাও, আমার মন বলছে আমি পারব।

প্রতাপ—পাগল তুমি—মাথা খারাপ! একটা চাকরি যোগাড় করতে পার না, তুমি ব্যবসা করবে! রামছাগলে চড়বার ক্ষমতা নেই, তুমি ঘোড়ায় চড়বে! কে এসব কুবুদ্ধি দিয়েছে তোমাকে?

বিজয়—কুবুদ্ধি নয়, এতদিনে আমার সুবুদ্ধি হয়েছে। মিছে একমাস চাকরি চাকরি করে দোরে দোরে ঘুরে বেড়িয়েছি—ও কাজ আমার নয়। দাদা, তুমি অমত কোরো না, আমি ব্যবসা করব। দেখো, যদি লক্ষ্মী কোনও দিন আমাদের ঘরে আসেন, ব্যবসার পথ দিয়েই আসবেন।

প্রতাপ—পাগল, উন্মাদ—মতিচ্ছন্ন হয়েছে তোমার। ব্যবসা করতে হলে মূলধন চাই তার খবর রাখো?

বিজয়—জানি মূলধন চাই। কিন্তু আমার বেশী মূলধন দরকার নেই দাদা। তুমি আমাকে পাঁচশো টাকা দাও, তাতেই আমি কাজ আরম্ভ করতে পারব—

অতর্কিত পদাঘাতে ফুটবল যেমন লাফাইয়া ওঠে, প্রতাপ তেমনি ছিটকাইয়া চৌকি হইতে মেঝেয় নামিলেন।

প্রতাপ—কী বললে তুমি! পাঁচশ' টাকা! আমি তোমাকে পাঁচশ টাকা দেব আর তুমি ব্যবসা করবে! উঃ, খুনে সব—খুনে! মা,

শুনলে তোমার আদুরে ছেলের কথা? আমাকে জবাই করতে চায়—

বিজয়—দাদা, এমনি না দাও, ধার বলে দাও—আমি তোমার টাকা ফেরৎ দেব—

প্রতাপ—মাথায় পা দিয়ে আমায় ডোবাতে চায়। না—আর এখানে নয়। (ব্যাগ তুলিয়া লইয়া) ইষ্টিশানে বসে থাকব, তবু এখানে নয়। আমাকে ফতুর করতে চায়! পাঁচশ' টাকায় একটা মেয়ের বিয়ে হয়, সেই টাকা আমি লুটিয়ে দেব! মা, আমি চললুম—

মা ছেলের ব্যাপার দেখিয়া একেবারে কাঠ হইয়া গিয়াছিলেন; বিজয় আসিয়া প্রতাপের হাত ধরিয়া ফেলিল।

বিজয়—দাদা! তোমার পায়ে ধরছি বোসো এসে, এমন করে চলে যেও না। পাঁচশ' টাকা না দিতে পার, যা পার দিও। দুশো টাকা—

প্রতাপ—দুশো টাকা! দু'পয়সা দেব না আর তোমাকে। অনেক দোহন করেছ, আর নয়। এখন আমাকে কাট্‌লে রক্ত নেই, কুটলে মাংস নেই। আমি গেরস্ত মানুষ, খেটে খাই, তুমি ব্যবসা কর, বাণিজ্য কর, ঘোড়দৌড় খেল—আমি কিছুতে নেই তোমার; আজ থেকে তুমি আলাদা আমি আলাদা। মা, এই পেন্নাম করছি তোমাকে; তোমার আদুরে গোপালকে নিয়ে থাকো, আমার কাছে আর পিত্যেশ কোরো না।—চললুম।

বিজয়—দাদা—

বিজয় আবার তাঁহার হাত ধরিল, তিনি ঝটকা মারিয়া হাত ছাড়াইয়া ব্যাগ হস্তে বাহির হইয়া গেলেন।

মা—প্রতাপ! ওরে অমন করে চলে যাসনি বাবা—

মা দ্বার পর্যন্ত ছুটিয়া গেলেন, কিন্তু প্রতাপ আর ফিরিলেন না। বিজয় ক্লান্ত ভাবে চৌকির উপর বসিয়া পড়িল।

মা—বিজয়, কী সর্বনাশ করলি রে! প্রতাপ যে সত্যিই চলে গেল। যা—ওকে ধরে নিয়ে আয়।

বিজয়ের ক্লিষ্ট মুখে একটা কঠিন হাসি খেলিয়া গেল।

বিজয়—কি হবে মা, দাদা আর আসবে না। একটা ছুতো খুঁজছিল, সেই ছুতো পেয়ে চলে গেল।

মাও বোধ হয় তাহা বুঝিয়াছিলেন; তিনি একান্ত অসহায় ভাবে চৌকিতে গিয়া বসিলেন।

মা—কিন্তু কি হবে বিজয়?

বিজয়ের শিরদাঁড়া এবার সোজা হইয়া উঠিল।

বিজয়—কী আর হবে? তুমি ভয় পেয়ো না মা, এ ভালই হল দাদা আমাদের ছেড়ে চলে গেল—দাদার উপর নির্ভর করে এতদিন যেন মনে কোনও জোরই পাচ্ছিলুম না। আজ আমি স্বাধীন, আজ আমাকে নিজের অন্ন নিজে সংগ্রহ করতে হবে। ভগবান শরীরটা দিয়েছেন, আর কিছু না পারি, মুটে-মজুরের কাজ তো পারব।

মায়ের চোখ দিয়া নিঃশব্দে জল পড়িতে লাগিল।

মা—তুই চাকরি করবি না? ব্যবসাই করবি?

বিজয়—হ্যাঁ মা, ব্যবসাই করব। আজ একটা বড় সুন্দর উদাহরণ পেয়েছি। খাটব

মা—বিজয়, আমার মুখের দিকে তাকা। ঠিক বলছিস পারবি এ কাজ করতে? ভুল করছিস না?

বিজয়—না মা, আমার অন্তর্যামী বলছেন আমি পারব। তুমি পায়ের ধুলো দাও, তোমার পায়ের ধুলো কখনও নিষ্ফল হবে না।

বিজয় মায়ের পদধূলি লইল; মা তাহার চিবুকে করাঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন।

মা—তবে আয় আমার সঙ্গে—

মা উঠিয়া পাশের ঘরে গেলেন, বিজয় সঙ্গে সঙ্গে গেল। মা তোরঙ্গ খুলিয়া



"ঘরের লক্ষ্মীর জন্যে তোলা গয়না যেন মা লক্ষ্মীকে ঘরে আনতে পারে।"

—মুটোগিরি করব—বেগুনি ফুলুরি বিক্রি করব। তোমার ছেলে আর ভদ্রলোক থাকবে না মা, ভদ্রতার মুখোস তার খসে গেছে। এমনি করে একটি একটি করে টাকা জমাব; তারপর যখন দুশো টাকা জমবে তখন ছোট্ট একটি দোকান খুলব...সেই দোকান ক্রমে বড় করে তুলব—

মা—দুশো টাকা পেলেই তুই দোকান খুলতে পারবি?

বিজয়—পারব, একটু টানাটানি হবে কিন্তু পারব। একটি ছোট্ট দোকান ঘর দেখেছি—

মা বিজয়ের বাহুর উপর কম্পিত হাত রাখিলেন।

একটি ছেঁড়া কাপড়ে বাঁধা পুঁটলি বাহির করিলেন; পুঁটলির মধ্যে একটি সিন্দুর কৌটা ও সেকেলে গড়নের ভারী সোনার হার ছিল। হারটি তুলিয়া লইয়া মা বিজয়ের হাতে দিলেন।

মা—আমার শেষ গয়না। তোর বৌকে দেব বলে রেখেছিলুম। তা তুই-ই নে, বিক্রি করলে দুশো টাকার বেশীই হবে। আমার ঘরের লক্ষ্মীর জন্যে তোলা গয়না যেন মা লক্ষ্মীকে ঘরে আনতে পারে।

বিজয়—মা!

দুর্দম আবেগে বিজয় মাকে জড়াইয়া ধরিল।

ফেড্ আউট্। (ক্রমশ)



(২)

ভাস্কর্য

সিংহলের মূর্তির তারিখ, একেবারে স্থির করিয়া বলা যায় না, ভারতীয় মূর্তিতে অনেক সময় দাতার নাম শিলা-লিপি হইতে জানা যায়, তাহা হইতে ভারতীয় মূর্তির তারিখ ঠিক হয়।

প্রস্তর ফলক (স্টেলে)

দাগোবার প্রবেশপথে প্রচুর কারুকার্য খচিত প্রস্তর ফলক দেখা যায়। জন্তু, ফুল, লতা, পাতা শোভিত (Floriated design) অলংকরণ আছে। একটি ঘট হইতে লতা পাতা উঠিয়াছে; ইহাকে বলে পুন্নেঘট (পূর্ণ ঘট)। সিংহলে উৎসবাদিতে পূর্ণঘট দেওয়ার রীতি আছে।

দোরুটু পাল

আর এক রকম ফলক আছে, তাহাতে নরনারীর মূর্তি—যক্ষ, যক্ষিনী, নাগ নাগিনী ও কুৎসিত বামনমূর্তি খোদিত। সিঁড়ির মুখে দুই দিকে দুটি মূর্তি থাকে, সিংহলী ভাষায়, এই মূর্তিকে বলা হয় দোরুটুপাল (দ্বারপাল)। বিহারের চিত্রেও দরজার দুই দিকে দোরুটুপালের চিত্র থাকে। দোরুটুপালের ভাস্কর্যে অনেক সময় শিল্পনৈপুণ্য দেখা যায়।

অভয়গিরির প্রস্তর ফলকের মূর্তি সাঞ্চির ভাস্কর্যকে স্মরণ করাইবে, কিন্তু তাহা হইতেও উন্নততর। ইহা কুশন শিল্পের পরিচায়ক।

চন্দ্রশিলা

ইংরাজীতে ইহাকে Moon Stone বলে। সিংহলী শিল্পের ইহা একটি বৈশিষ্ট্য। মন্দিরের সিঁড়ির নীচে, অর্ধ-চন্দ্রাকারের একটি পাথর থাকে, তাহাকে চন্দ্রশিলা বলে। নীচু রিলিফে ইহাতে ফুল, লতা, পাতা, ঘোড়া সিংহ, ষাঁড়, হাতী ও হংসের অলংকরণ খোদিত আছে। ইহাতে সূক্ষ্ম কারুকার্যের পরিচয় পাওয়া যায়।



পরাক্রমবাহু, দি গ্রেট, দ্বাদশ শতাব্দী। পোলানারুয়া, ১১½ ফুট উচ্চ।

প্রতিকৃতি

সিংহলে রাজাদের প্রতিকৃতি দেখা যায়। মিহিনতাল আম্বাস্থল দাগোবার নিকট দেবনাম পিয় তিস্‌সে-এর প্রতিকৃতি পাওয়া গিয়াছে। ইহাই প্রাচীনতম। রুয়ানবেলি দাগোবার নিকট রাজা ভাট্টিকা অভয় (খৃঃ ৪২—৭০) এবং দুটুঠগামিনির (খৃঃ পূঃ ১৬১—১৩৭) মূর্তি আছে। দাঁড়ান মূর্তি প্রমাণ আকার হইতে একটু বড়; দ্বাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত প্রতিকৃতি পরাক্রমবাহু দি গ্রেটের মূর্তি। পোলানারুয়াতে পাহাড়ের গা কাটিয়া তৈরী ১১½ ফুট উচ্চ। দুই হাতে তালপাতার পুঁথি (ওলা) ধরিয়া আছে। পরণে ধুতি। মুখে দাঁড়ি গোঁফ আছে। খুব গাম্ভীর্য-ব্যঞ্জক জ্ঞানী চেহারা। সাধারণ লোকদের বিশ্বাস ইহা পরাক্রমবাহু দি গ্রেটের মূর্তি। কিন্তু পোষাক দৃষ্টে কেহ কেহ মনে করেন, ইহা কোনো তামিল সাধুর মূর্তি।

বুদ্ধ মূর্তি

তিন রকমের বুদ্ধ মূর্তি দেখা যায়, বসা, দাঁড়ান এবং শোওয়া। শ্রেষ্ঠ মূর্তি হইল অনুরাধাপুরের উপবিষ্ট ধ্যানী বুদ্ধ-মূর্তি। অবনীন্দ্রনাথ মনে করেন, ইহা সিংহল এবং ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধ মূর্তি। নির্বাত নিষ্কম্প-দীপশিখার ন্যায়, দীর্ঘ ঋজুদেহ। ৪র্থ শতাব্দীতে নির্মিত। বসা অবস্থায় উচ্চতা ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি।

অওকন বিহারের দাঁড়ান বুদ্ধ সিংহলে



কপিলমুনি, দ্বাদশ শতাব্দী। ইসুরুমুনিয়া বিহার, অনুরাধাপুর।

সর্বাপেক্ষা উচ্চ মূর্তি, পাদপীঠ সমেত ৪৬ ফুট উচ্চ। পৃষ্ঠদেশ পাহাড়ের সঙ্গে যুক্ত। মূর্তির বিরাটত্ব দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পোলোনারুয়াতে পাহাড়ের গায়ে কাটা কয়েকটি মূর্তির বিরাটত্ব এবং ভাবের গভীরতা মনকে অভিভূত করে। এগুলি গাল বিহারের মূর্তি বলিয়া পরিচিত। নির্মাতা পরাক্রমবাহু। তিনটি মূর্তি আছে। বুদ্ধের বসা মূর্তি, ১৫ ফুট উচ্চ। বুদ্ধের শায়িত মূর্তি ৪৬ ফুট লম্বা, পাশে দাঁড়াইয়া প্রিয় শিষ্য আনন্দ, প্রভুর তিরোধানে বিষাদ বিনম্রভাব। আনন্দ ২৩ ফুট উচ্চ। বুদ্ধের মহানির্বাণের চিত্র মনকে স্তম্ভিত করে।

ইটের বুদ্ধমূর্তি

পোলোনারুয়ার অনেক বিহারে এবং অন্যত্র ইটের তৈরী বিরাটাকার বুদ্ধমূর্তি দেখা যায়। সিমেন্ট দিয়া ইটজোড়া, উপরে চুণের আস্তর ও রং করা। আধুনিক কালেও বিহারে এই রীতিতে মূর্তি নির্মাণ করিতে দেখা যায়। পাথরের মূর্তিতেও চুণের আস্তর দিয়া রং করার প্রথা ছিল। পোলোনারুয়ার জেতবনারাম মঠের লঙ্কাতিলক মন্দিরে বিশালাকার দাঁড়ান ইটের বুদ্ধমূর্তি আছে। লঙ্কাতিলক মন্দির সিংহলে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মন্দির। থুসারাম মন্দির ও মহাসেয়া মন্দিরেও বিরাটাকার দাঁড়ান বুদ্ধমূর্তি আছে।

কপিলমুনি (দ্বাদশ শতাব্দী)

ইসুরুমুনিয়া বিহারে, পাহাড়ের গায়ে উচ্চ রিলিফে খোদিত কপিলমুনির মূর্তি শিল্প-সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তাঁহারা ইহাকে ভাস্কর্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মনে করেন। রাজজনোচিত আরামের ভঙ্গিতে (মহারাজলীলা) বসিয়া আছে; পশ্চাতে একটি ঘোড়ার মুখ দেখা যাইতেছে। কপিলের মুখে বিরাট গাম্ভীর্য ও শক্তিমত্তার চিহ্ন। ইহা আকারে ছোট, কিন্তু পরিমাপ এমন মনে হয়, যেন বিরাট মূর্তি (মনুমেণ্টাল)। মিশরের ভাস্কর্যের সঙ্গে ইহার তুলনা চলে। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় এই মূর্তিকে খুব উচ্চে স্থান দেন।

ইসুরুমুনিয়া বিহারের প্রস্তরফলকে খোদিত রিলিফ মূর্তি, দম্পতির চিত্র উল্লেখযোগ্য।

জন্তুর চিত্র

সিংহলী শিল্পী হাতীর মূর্তিতে অপূর্ব দক্ষতা দেখাইয়াছে। ইসুরুমুনিয়া বিহারে পাহাড়ের গায়ে নীচু রিলিফে খোদিত হাতীর মূর্তি আশ্চর্য-জনক। পাহাড়ের নীচে একটি ছোট "পোকুন" (জলাশয়) আছে। হাতীর নিম্ন অংশ জলে ডোবা, হাতীর কাছে কতগুলি পদ্মফুল খোদা আছে। অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়াছে। হাতী শুঁড় দিয়া জল ছুঁড়িতেছে, জলে নামিয়া পদ্মবনে যেন জলকেলি করিতেছে। মাদ্রাজের মহাবলিপুরম-এর পাহাড়ের গায়ে খোদিত হাতীর চিত্র স্মরণ করাইয়া দিবে।

সিংহ

মিহিনতালের সিংহ উল্লেখযোগ্য। একটি চৌবাচ্চার গায়ে খোদিত উচ্চ রিলিফ ৭ ফুট ৪ ইঞ্চি উচ্চ। সিংহ সামনের দুই পা তুলিয়া গর্জন করিতেছে, যেন কারো গায়ে লাফাইয়া পড়িবে। এই সিংহের জন্য চৌবাচ্চার নাম "সিংহ পোকুন"। চৌবাচ্চা হইতে একটা লোহার নল সিংহের মুখের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, অনবরত তীর্থ-যাত্রীদের জন্য সিংহের মুখ হইতে জল পড়িত। শিল্পী এবং ইঞ্জিনিয়ারের মৌলিকতা নিশ্চয়ই প্রশংসাযোগ্য। সিংহ হাতীর ন্যায় জীবিতবৎ নহে, কনভেনশনাল।

নাগ

সিংহলী শিল্পী নাগের মূর্তিতে খুব যত্ন নিয়াছে। মানুষের মাথার পিছনে, সাপের ফণাওয়ালা নাগ দেবতার মূর্তি আছে। স্থাপত্যের অলঙ্করণে শুধু সাপের মূর্তিও আছে। মিহিনতালের "নাগ পোকুনের" নাগ সর্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাহাড়ের গহ্বরে ক্ষুদ্র জলাশয় (পোকুন), পিছনে পাহাড়ের গায়ে পাঁচ ফণাওয়ালা নাগ খোদিত, লেজ জলের ভিতর ডুবিয়া আছে; সাপ যেন জলের উপরে মাথা তুলিয়া বিষ উদ্গীরণ করিতেছে। এই সাপের মূর্তির জন্য এই জলাশয়ের নাম "নাগ পোকুন"। পাহাড়ের নির্জন স্থান সাপের মূর্তি রহস্যময় করিয়া তুলিয়াছে।



শৈবসাধু সুন্দর মূর্তিস্বামী, তামা। পোলোনারুয়া ১০ম শতাব্দী হইতে ১৩শ শতাব্দীর মধ্যে।



দম্পতি, ৮ম শতাব্দী। ইসুরুমুনিয়া বিহার, অনুরাধাপুর।

বুদ্ধ এক সময় ৭ রাত্রি তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে রৌদ্র বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য নাগরাজ তাঁহার মাথার উপর ফণা বিস্তার করিয়াছিলেন। এজন্যে সিংহলী ভাস্কর্যে নাগের স্থান।

ব্রোঞ্জ মূর্তি

সিংহলে ব্রোঞ্জের উচ্চশ্রেণীর বৌদ্ধ ও হিন্দু মূর্তি পাওয়া যায়। ইহার অধিকাংশই তামার। ৫ম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ধাতু মূর্তির কাল। পোলানারুয়াতেই অধিকাংশ মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কেহ কেহ মত পোষণ করেন, এ সব পোলানারুয়াতে তৈরী নহে, দক্ষিণ ভারত হইতে আনান হইয়াছে। অন্য মতে, দ্রাবিড় স্থপতি পোলানারুয়াতে ঢালাই করিয়াছে।

সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত নটরাজের মূর্তি (৩ ফুট)। ভারতীয় শিল্প পূর্বে আলোচনা করিয়াছেন শুষ্ক প্রত্নতাত্ত্বিকেরা, তাঁহারা ভারতীয় শিল্পে সৌন্দর্য খুঁজিয়া পান নাই। তাঁহাদের কাছে একমাত্র গ্রীক-শিল্পই আদর্শ ছিল। কিন্তু বর্তমানে ইউরোপের ভাস্কর ও চিত্রকরেরা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন, গ্রীক আদর্শ পৃথিবীর চরম নহে। ফরাসীর বিখ্যাত ভাস্কর রোঁদা নটরাজের মূর্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। নটরাজের মূর্তি আমাদের কাছে খুবই পরিচিত, ইহার পরিচয় অনাবশ্যক।

শিব দেবলে প্রাপ্ত অন্যান্য তামার হিন্দু মূর্তি—পার্বতী, কার্তিকেয়, গণেশ, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, বালকৃষ্ণ, হনুমান, সূর্য। শৈব সাধুদের মূর্তি পোলানারুয়ার একটা বৈশিষ্ট্য। শ্রেষ্ঠ হইল সুন্দরমূর্তিস্বামী (১ ফুট ৮ ইঞ্চি)। ৭০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি তিনি ছিলেন, মাদ্রাজের তিরুভরুর অধিবাসী। বিবাহের দিনেই তাঁর ডাক আসিল, বিবাহ সজ্জাতেই তিনি সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া গেলেন। সেই অবস্থার মূর্তি। চোখে, মুখে ভগবৎ-প্রেরণার ভাব। অবনীন্দ্রনাথ এই মূর্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন। রোঁদার লোহ-যুগের (আয়রন এজ) ছবি দেখাইয়া তুলনা করিয়াছেন। মানুষ প্রথম লোহার সন্ধান পাইয়া আত্মহারা হইয়াছে। সেই আত্মহারার ভাবই রহিয়াছে সুন্দরমূর্তিস্বামীর মুখে, কোন অজানার সন্ধান যেন পাইয়াছেন। পোলানারুয়ায় এ সকল মূর্তি নির্মিত হইয়াছে ১৩০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি।

ব্রিটিশ মুজিয়মে রক্ষিত প্রমাণ আকারের মূর্তি, "পাট্টিনি" দেবী বিশেষ বিখ্যাত। ভারতবর্ষ হইতে আসিয়া পাট্টিনি সমগ্র সিংহলে পূজা পাইতেছেন।

সম্রাট গজবাহু (২য় শতাব্দী) ভারতবর্ষ হইতে পাট্টিনি দেবীকে আনয়ন করেন। কান্ডিতে পাট্টিনি দেবল আছে। কান্ডির পেরহেরা উৎসবে পাট্টিনি দেবী বিশেষ সম্মান পাইয়া থাকেন।

পাট্টিনি দেবী সতীত্বের দেবী। বস্ত্রের ভিতর দিয়া গুপ্তভাস্কর্যের ন্যায়, শরীরের গঠন দেখান হইয়াছে। দেহের উপরিভাগ নগ্ন, কোনো অলঙ্কার নাই; মাথায় মুকুট, আছে। পিত্তলের মূর্তি। তারিখ ঠিক বলা যায় না

ব্রোঞ্জের কয়েকটি মহাযান বৌদ্ধ মূর্তি —অবলোকিতেশ্বর, জাম্বল (কুবের), বজ্রপাণি উল্লেখযোগ্য। অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি এখন বোস্টন মুজিয়মে আছে (৩½ ইঞ্চি উচ্চ)। ডাক্তার কুমারস্বামী মনে করেন ইহা সিংহলের সকল মূর্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অবলোকিতেশ্বরে পাওয়া যায়, গুপ্ত যুগের আদর্শ আর বজ্রপাণিতে পাওয়া যায় পালযুগের আমেজ। কয়েকটি ব্রোঞ্জবুদ্ধ মূর্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে গুপ্ত যুগের আদর্শ রহিয়াছে।

চতুর্দশ শতাব্দীর পরে সিংহলে ভাল মূর্তির উদাহরণ দেখা যায় না। তখন ভঙ্গুর পদার্থে মূর্তি নির্মিত হইয়াছে, বহু সহস্র সে সকল মূর্তি ধ্বংস হইয়াছে। একজন পর্টুগিজের লেখা হইতে জানা যায়, ১৬শ খৃষ্টাব্দে, পর্টুগিজেরা দেবুন্দারাতে বিষ্ণু দেবলের এক হাজার মূর্তি ভাঙিয়াছে। মূর্তিগুলি মাটি ও কাঠের, তামার গিল্টি করা ছিল। পাথরের উল্লেখ নাই।

স্টুকো মূর্তি

স্থাপত্যের অলঙ্করণে প্রচুর পরিমাণে স্টুকো মূর্তির ব্যবহার হইয়াছে।

গ্রহশত্রু

শ্রীকালীপদ ঘটক

লেংড়া রতন বাগ্দীর সঙ্গে তার ছোট ভাই ঝড়ু বাগ্দীর ঝগড়া-বিবাদ বেশীদিনের নয়। ছেলেবেলা থেকে এক-সঙ্গে তারা এক সংসারেই মানুষ হয়েছে। রতনের মা বেঁচে থাকতে ভাইয়ে ভাইয়ে এদের সদ্ভাব ছিলো যথেষ্ট। মা-বুড়ী মারা যাওয়ার পরও বহুদিন যাবৎ হাঁড়ি হেঁসেল পৃথক হয়নি. দু'ভাইয়ে একসঙ্গে জমি চষেছে, একসঙ্গে মাটি কেটেছে, খেটে-খুটে একসঙ্গে তারা সুখে-স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্বাহ করেছে। জ্যেষ্ঠ রতন বাগ্দীর কর্তৃত্ব ঝড়ু বাগ্দী বরাবরই মেনে চলতো; কিন্তু রতনের বৌ দামিনীর সঙ্গে তার বনিবনা হতো না মোটেই। রতনের বৌটা ভয়ানক মুখরা. খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে ঝড়ুর সঙ্গে সে মাঝে মাঝে কোমর বেঁধে ঝগড়ায় লেগে যেতো। ঝড়ু বাগ্দী জোয়ান বেটাছেলে—রীতিমত কাজের লোক মস্তবড় জমিদারের সে কোটাল. গাঁয়ের কাছারী বাড়ি গোমস্তার অধীন চাকরী করে ঝড়ু। মেয়ে-মানুষের বাড়াবাড়ি সহ্য করবার ছেলে ঝড়ু বাগ্দী নয়, তবে কিনা দামিনী নেহাৎ বড় ভাইয়ের বৌ বলেই ঝড়ু অনেকটা সহ্য করে যেতো; দামিনীর কোন কথাই সে গ্রাহ্য করতো না মোটে। কিন্তু ধৈর্যের একটা সীমা আছে. দামিনীর বাড়াবাড়ি যেদিন একান্তই অসহ্য হয়ে উঠতো—সেদিন কিন্তু বড় ভাজ বলে দামিনীর সে খাতির রাখতো না, বকেঝকে চোখ রাঙিয়ে তুমুল কাণ্ড করে বসতো। অবশেষে লেংড়া রতনকে নেংচাতে নেংচাতে ছুটে গিয়ে দুটো ধমক ধামক দিয়ে বহু কষ্টে উভয় পক্ষকে শান্ত করতে হতো। দামিনী অবশ্য রতন বাগদীকে কেয়ার করতো থোড়াই, কিন্তু ঝড়ু বাগদীর ঠিক ঐ জায়গাটায় বিশেষ একটু দুর্বলতা ছিলো, রতনের মনে সহজে সে আঘাত দিতে চাইতো না, ছোটখাট তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে। বেচারী রতন পঙ্গুনাচার হাজার হোক সে ঝড়ু বাগদীর বড় ভাই ত। ঝড়ু বাগদী আর যাই হোক রতনের উপর টান ছিলো তার যথেষ্ট।

ঝড়ু বাগদী জমিদারের কোটাল। জমিদারবাবু বরাবর সদরে থাকেন. গোমস্তা ভৈরব চক্রবর্তী এ গ্রামের কাছারি বাড়ির ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, ঝড়ু বাগ্দী তারই অধীন চাকরী করে। ঝড়ুর মনিব গোমস্তা ভৈরব চক্রবর্তী পাকা লোক। দীর্ঘদিন জমিদারের মহাল মুনাফা নাড়া-চাড়া ক'রে সাংসারিক অবস্থা বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের জন্য যত রকম পন্থা ও কূটকৌশল থাকতে পারে, ভৈরব চক্রবর্তীর তার কোনটাই অজানা নাই। জমিদারের ন্যায্য প্রাপ্য ষোল আনার উপর গোমস্তা ভৈরব চক্রবর্তীর উপরি পাওনার খাঁই মেটাতে দুস্থ গ্রামবাসী প্রজাদের সময় সময় ঘটী বাটী পর্যন্ত বাঁধা দিতে হয়। কিন্তু উপায় কি. একে সে প্রবল প্রতাপশালী জমিদারের ভারপ্রাপ্ত গোমস্তা, তার ওপর পুলিশের স্থানীয় দফাদার নাকি গোমস্তা বাবুর কোন্ এক ভায়রা ভাইয়ের সাক্ষাৎ ভাগনের সম্বন্ধী. প্রজাদের টুঁ শব্দ করবার উপায় আছে কি! ভৈরব চক্রবর্তীর ছোটখাট অন্যায় ও অনাচারের প্রতিবাদ করতে বড় বেশী কেউ সাহস করে না। প্রজারা তার সামনে বলে—গোমস্তা বাবু, হুজুর, অন্তরালে কিন্তু গোমস্তা বাবুকে শালা না বলে কেউ জলগ্রহণ করে না।

গ্রামের দু' একটা দুর্দান্ত লোকের কাছে ভৈরব চক্রবর্তী কতকটা জব্দ থাকে, মনে মনে এদের ভয় করে সে যথেষ্ট। সেবার কি একটা স্ত্রীলোক ঘটিত ব্যাপার নিয়ে হঠাৎ একদিন রাত্রিবেলা গয়লা পাড়ার মোড়ে এদেরি হাতে ভৈরব চক্রবর্তীর মাথা ফেটেছিলো এই প্রৌঢ় বয়সেও। ভৈরব চক্রবর্তী কিন্তু ঘুঘু লোক, ব্যাপারটা সে বেশী দূর আর গড়াতে দেয়নি এদেরি আবার হাতে পায়ে ধরে গোপনে কিছু অর্থ-দণ্ড দিয়ে রাতারাতি ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলে। পরে অবশ্য ভৈরব চক্রবর্তী এদের ছেড়ে কথা কয়নি, নিকট আত্মীয় দফাদার বাবুর সহযোগিতায় তিন তিন বার এদের বি-এল কেসে চালান দিবার ব্যবস্থা করেছিলো। সেই থেকে লোকগুলো একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কিন্তু সাবধানের বিনাশ নাই. ভৈরব চক্রবর্তী একটু সতর্ক থাকে. বিশেষত গোমস্তাগিরি চাকরি নিয়ে প্রজাদের সঙ্গে লেঠা হরদম লেগেই আছে, কে কখন কি বখেড়া বাধায় বলা যায় না। সেই জন্যই ভৈরব চক্রবর্তী বিশেষ ভেবে চিন্তে বৃদ্ধ জগন বাউরীকে বরখাস্ত ক'রে ঝড়ু বাগদীকে কোটালগিরিতে বাহাল করেছে বছর দুই তিন আগে।

ঝড়ু বাগদী ষণ্ডাগুণ্ডা চেহারা দুর্দান্ত সাহস, বাঘের মত শক্তি তার গায়ে। গোমস্তা ভৈরব চক্রবর্তীর প্রিয় পাত্র সে। প্রজাদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে খাজনা আদায়ের জন্য তাদের ডেকে হেঁকে কাছারী বাড়িতে এনে হাজির ক'রে দেওয়াই ঝড়ু বাগদীর প্রধান কাজ। গোমস্তাবাবুর হুকুম তামিল করতে তৎপরতার অন্ত নাই ঝড়ুর। প্রজাদের সে ডেকে হেঁকে উপর্যুপরি তাগিদ দিয়ে, এমন কি দরকার হলে টেনে হিঁচড়ে পর্যন্ত গোমস্তা বাবুর সামনে এনে হাজির করে দেবেই। এত বড় একটা জমিদারীর কোটালী করা কি সহজ কথা, দায়িত্ব এর একটা আছে বৈকি!

গোমস্তা ভৈরব চক্রবর্তী মাঝে মাঝে বকশিশ করে ঝড়ুকে, প্রজাদের কাছ থেকে কিছু কিছু আদায় করেও দেয়। ঝড়ু বলে,—গোমস্তা বাবু, আপনার দয়াতেই বেঁচে আছি।

ভৈরব চক্রবর্তী খুশী হয়ে বলে,—কিন্তু দেখিস বেটা, বিদেশ বিভূঁয়ে একলাটি এসে পড়ে আছি, এখানে চারিদিকে শত্রুর বাস, এদিকে যেন একটু হুঁসিয়ার থাকিস।

ঝড়ু বলে,—সে জন্য আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন কর্তা, খাতির জমা। ঝড়ু বাগদীর লাঠির সামনে এগোয় কুন শালা, যেমন তেমন দশটাকে আমি ইকলাই দেখে লিতে পারি।

ঝড়ু নেহাত মিথ্যে বলেনি, তার বলিষ্ঠ দেহ, স্ফীত মাংসপেশী ও অটুট স্বাস্থ্যই তার যথেষ্ট প্রমাণ।

ভৈরব চক্রবর্তী খাতা সারতে সারতে কলমটা হঠাৎ কানে গুঁজে ঝড়ুর দিকে চেয়ে খুশী হয়ে বলে উঠে,—বলিহারি বেটা হুলিহারি, এইত চাই।

ঝড়ু বাগদী গোমস্তাবাবুর পায়ে একটা গড় করে লাঠি হাতে আবার কাজে বেরোয়। ভৈরব চক্রবর্তী দাখিলা বইয়ের পাতা উল্টে তহশীলের একুন কষতে থাকে।

ঝড়ু বাগদীর ভাই রতন বাগদী লোকটা কিছু নিরীহ। রোগা লিকলিকে লম্বা-পানা চেহারা, মাথায় এক মাথা বাবরী চুল, মুখে তার সব সময়ই একটা অর্থহীন হাসির আমেজ লেগেই থাকে। রতনের পা একটি খোঁড়া. ছেলেবেলায় বাতব্যাধিতে ভুগে ডান পা-টা তার একেবারে সরু হয়ে গেছে। কিন্তু সেজন্য রতনের কাজকর্ম আটকায় না কিছুই, ছোট্ট একটা লাঠির উপর ভর দিয়ে লেংড়া রতন দেড় পায়েই ষোল ক্রোশ মেরে আসতে পারে। রতন বাগদীর পৈত্রিক পেশা খড় আর বেকারী দিয়ে ঘর ছাদন করা। ছোটবেলা থেকে ঘর ছেয়ে ছেয়ে রতনের হাত একদম পেকে উঠেছে, এমন নিখুঁতভাবে পরিপাটি চাল বাঁধতে

বাড়ই মহলে রতনের জ্বড়িদার খুব কম। পাড়ার ঘরে ঘরে রতন বাড়ই বলে রীতিমত নাম ডাক আছে রতনের। কেউ কেউ আবার খাতির করে বলে রতন মিস্ত্রী। রতন যে খুব কাজের লোক এ কথা সকলেই স্বীকার করে, স্বীকার করে না শুধু রতনের বৌ দামিনী। দামিনী বলে,—মিস্তিরি না ঢেঁকি। হো হো ক'রে হেসে ওঠে রতন. দামিনীর কথায় প্রতিবাদ করে না সে কোনদিনই।

বর্ষার ঢের আগে থেকে কাজে লাগে রতন, গাঁয়ের লোকের ঘর ছাওয়া ছাওয়া শেষ হয় প্রায় দুর্গা পুজার আগে। এ কয়েক মাস রতনের কাজকর্ম বেশ ভালই চলে, কিন্তু হাতে তার এক পয়সাও জমা থাকে না, উপার্জনের অধিকাংশ মদে ভাঙেই খরচা হয়ে যায়। পয়সা কড়ি কিছু হাতে এলে রতনকে আর পায় কে, পাড়া ঘুরে ঘুরে সংগী জোটায় রতন. দল পাকিয়ে পচুই খেতে বসে. রাত দুপুর তক ঢোল বাজায় আর পাল্লা দিয়ে ঝুমুর গায়। খরচ খরচার দিক দিয়ে রতন একেবারে দিল দরিয়া. ভবিষ্যতের ভাবনা নিয়ে রতন বাগদী মাথা ঘামায় না। এই সমস্ত কারণের জন্যই রতনকে এক আধটু মুখ ঝামটা সহ্য করতে হয় রতনের বৌ দামিনীর কাছ থেকে। রতন কিন্তু হেসে উড়িয়ে দেয়. দামিনীর গালিগালাজ সে গায়ে মাখে না।

ঝড়ু বাগদী কাছারি বাড়ির চাকরি নেওয়ার পর থেকে রতনেরও খাতির কিছু বেড়ে গেছে. কোটালের ভাই বলে' পাড়ায় ঘরে কতলোক তার মান্য করে, ভ্রাতৃগর্বে রতনের বুক ফুলে উঠে।

রতনের বৌ দামিনী কিন্তু ঝড়ুর উপর সদয় নয়। ঝড়ু বাগদীর তাঁবেদারী সহ্য করতে একান্তই সে নারাজ; মাঝে মাঝে ঝড়ুর সংগে তার ঠকামকি লেগেই আছে। বেচারা রতন, ওদের দেওর ভাজের ঝগড়া মেটাতে রতন এক এক দিন হাঁপিয়ে উঠে। ঝড়ুকে দুটো ধমক ধামক দিয়ে তবু কোন রকম শান্ত করা যায়, কিন্তু দামিনীকে বাগ মানায় কার বাপের সাধ্য। কোটালের ভাই বলে বাইরে রতনের যত খাতিরই থাক, দামিনী তাকে কড়ে অংগুলে ছুঁয়ে যায় না। সেজন্য অবশ্য রতনের কোন আপসোস নাই। সংসারের শান্তি শৃংখলা বজায় রাখবার জন্য সব কিছুই সে সহ্য করে চলে।

দিন এইভাবেই কেটে যাচ্ছিলো, আরো কিছুকাল যেতোও হয়ত কেটে কিন্ত ঝড়ু বাগদীর বৌটি ডাগর হয়ে স্থায়ীভাবে সোয়ামীর ঘর করতে আসার পর থেকে দামিনীর কলহপ্রীতি দ্বিগুণ বেড়ে গেল। ঝড়ুকে ছেড়ে এবার থেকে সে লেগে পড়লো ঝড়ু বাগদীর বৌয়ের সংগে। নতুন বৌ, প্রথম প্রথম সয়ে যেতো, কিন্তু বড় জায়ের ভাবগতিক দেখে শুনে তারও একদিন মুখ খুললো। কিন্তু দামিনীর সংগে পাল্লা দেওয়া—সে কি ঝড়ুর বৌয়ের কাজ, পাড়ার দজ্জাল মেয়েরা পর্যন্ত সময় সময় হিমসিম খেয়ে যায় দামিনীর সংগে টেক্কা দিতে গিয়ে, ঝড়ুর বৌ ত ছেলে-মানুষ। ঝড়ের মুখে খড় কুটোর মত উড়ে যায় সে দামিনীর দাপটে।

ঝড়ুর বৌ শেষে উত্যক্ত হয়ে ঝড়ুর কাছে নালিশ জানায়। ঝড়ু সেদিন তেড়ে মেড়ে দামিনীকে বেশ খানিকটা শাসিয়ে দিলে, স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলে ঝড়ু—ছোট বৌয়ের সংগে এমন ধারা ঝগড়া ঝাটি করলে ফল তার ভাল হবে না।

এই বলে ঝড়ু লাঠিহাতে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল কাছারী বাড়ির কাজে। দামিনী তখন ঝড়ু বাগদীর সাত পুরুষের পিণ্ডি চটকাতে সুরু করেছে. মুখে তার হাত দেয় কে। কিন্তু সামনে তার প্রতিপক্ষের অভাববশত এক তরফা বাক যুদ্ধ বেশ জমছিলো না, অগত্যা সে নিজের মনেই গজরাতে গজরাতে রতন বাগদীর সামনে গিয়ে হাজির হলো।

রতন বাগদী রান্নাঘরের পাশে কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে শাক বুনবার জন্য খানিকটা জমি তৈরী করছিলো। দামিনীকে দেখেই হাতের কাজ তার বন্ধ হয়ে গেল। দামিনী ঝংকার দিয়ে বলে উঠলো,—বলি ড্রোর এত আস্পর্ধাটা কিসের, তেড়ে যে আমাকে মারতে এলো তার কারণটা কি শুনি।

রতন বাগদী ঝগড়ার আদ্যন্ত সবই শুনেছে. ঝড়ুর চেয়ে দামিনীর উপরেই মনটা তার বিগড়ে ছিলো বেশী। রতন একটু দাঁত খিঁচিয়ে বললে,—লাগতে যাস কেনে—বলি ওদের সংগে অস্ট ঘড়ি লাগতে যাস কেনে। তোর জন্যে কি আমরা ভেয়ে ভেয়ে লাঠালাঠি করবো!

দামিনী চোখ দুটো কপালে তুলে বললে,—ঘাট হয়েছে—আমারই ঘাট হয়েছে, ভেয়ের দোষ ত কোনদিনই চোখে পড়বে না. যত কিছু দোষ ঘাট সব আমার। ঝাঁটা মারি—ঝাঁটা মারি এমন সোয়ামীর মুখে।

দামিনীর মুখ দিয়ে যেন তুবড়ি ছুটতে লাগলো, মুখে তার হাত দেয় কে। মেজাজটা বেশ ভাল ছিলো না রতনের, একটু তিরিক্ষিভাবে বলে উঠলো রতন—গুটেক আর বাড়াবাড়ি করিস না বলছি, হাঁ—মানে মানে সরে পড় ইথান থেকে।

ঝড়ু. বাগদীর পক্ষ . নিয়ে দামিনীকে চোখ রাঙিয়ে শাসন করবে রতন—দামিনীর পক্ষে এ অসহ্য। রাগে যেন ফেটে পড়লো দামিনী, সংগে সংগে সে তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে দিলে। রতনের আস্কারা পেয়েই যে ঝড়ু আর ঝড়ুর বৌ দামিনীকে কড়ে আংগুলে ছুঁয়ে যায় না, রতনের সামনে বার কয়েক ঢাই ঢাই ক'রে মাথা খুঁড়ে দিয়ে দামিনী সেকথা প্রমাণ করে দিলো।

রতনের হয়েছে সব দিক দিয়েই মুশকিল। দামিনীকে শান্ত করতে গিয়ে নিজেই সে রীতিমত শ্রান্ত হয়ে পড়লো। দামিনী চোখ তেড়ে বলে উঠলো,—থাক তবে তুই গুণের ভাই আর ভাই-বৌকে নিয়ে, চললোম আমি যে দিকে দু' চোখ যায়।

এই বলে দামিনী কোলের ছেলেটাকে ধপ্ করে রতনের সামনে নামিয়ে দিয়ে নিজের মনেই বকতে বকতে হন হন করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। দামিনীর ছেলেটা মাটির উপর পড়ে চীৎকার করে কান্না জুড়ে দিয়েছে। ঝড়ুর বৌ নিঃশব্দ রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে ছেলেটাকে কোলের উপর তুলে নিয়ে চুপচাপ আবার ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়লো। দামিনী বাড়ি থেকে বেরোবার সময় জোর গলায় বলতে বলতে গেল,—যার সোয়ামী করে হেলা তারে ভূতে মারে ঢেলা। শ্বশুরের বাড় কি আর সাধ বেড়েছে।

রতন লাঠি ভর দিয়ে নেংচাতে নেংচাতে সদর দোর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে পিছন থেকে দামিনীকে ডাক দিলে.—হেদেক শুনছিস, বলি গজ গজ করে চললি কুথা?

দামিনী আর পিছন ফিরে তাকালো না. দূর থেকেই সে জবাব দিলে,—জলে ডুবে মরতে।

রতন বাগদী ফিরে গিয়ে বড় ঘরের দাওয়ার উপর একটা খুঁটি ঠেস দিয়ে ধপ করে বসে পড়লো। মনটা তার আজ ভাল নাই মোটেই। অবশ্য দামিনীর জলে ডুবে মরতে যাওয়া মানে পাড়াপড়শীর বাড়ি গিয়ে খানিকক্ষণ আড্ডা দেওয়া মাত্র রতনের তা ভাল রকমই জানা আছে; এর আগে দামিনী সে কথা কয়েকবারই হাতে হাতে প্রমাণ ক'রে দিয়েছে। এমন কি ঝগড়া ক'রে সে রাগের মাথায় বার দুই তিন কলসী দড়ি সংগে নিয়ে কাজল দীঘির ঘাট পর্যন্ত পেঁছে গিয়েছিলো, কিন্তু কদাচ সে জলে ডোবেনি, কলসী ভরা দীঘির জল আর আঁচল ভর্তি কলমির শাক নিয়ে সচ্ছন্দে সে বাড়ি ফিরেছিলো। সে জন্য অবশ্য চিন্তার কোন কারণ নাই, কিন্তু ঝড়ো যে রকম দামিনীর সংগে লেগে পড়েছে—

থেকে থেকে দামিনীর এ কথাগুলোই রতনের মনে ভেসে উঠতে লাগলো,—যার সোয়ামী করে হেলা, তারে ভূতে মারে ঢেলা।

সত্যিই ত, দামিনীর উপর এমন ধারা অত্যাচার করবার ঝড়ুর ত কোন অধিকার নাই।

ঝড়ু বাগদীর উদ্দেশে নিজের মনেই হঠাৎ বলে উঠে রতন—ভাই—ভাই না আমার চাঁদি।

বেলা প্রায় পড়ে এসেছে। এক ভাঁড় পচুই মদ নিয়ে ঝড়ু এসে বাড়ি ঢুকলো। ঢেঁকিশালে চাটাই পেতে ঝড়ু বসলো মদ খেতে, রান্নাঘরের দিকে চেয়ে বৌকে একটা হাঁক দিয়ে বললে ঝড়ু,—দিস ত খানিক চাট।

ঝড়ুর বৌ একটা বাটি করে হে'সেল থেকে কতকগুলো মাছভাজা বের করে দিলে। ঢক ঢক করে খানিকটা মদ গিলে গলাটা একটু ভিজিয়ে নিয়ে ঝড়ু বাগদী একটা ডাক দিলে,—খোঁড়া!

রতনকে ঝড়ু বরাবর খোঁড়া বলেই ডাকে, কেউ কোনদিন তাকে দাদা বলতে শোনেনি। সেজন্য অবশ্য কনিষ্ঠের উপর জ্যেষ্ঠের কোন অনুযোগ বা অভিমান নাই, ছেলেবেলা থেকে রতন বাগদী ঝড়ুর কাছে খোঁড়া ডাকেই অভ্যস্ত।

রতন একটু বেশি রকম মদের ভক্ত। মদ খাবার জন্য কোনদিনই তাকে ডাকাডাকি করতে হয় না, নিজে থেকেই উঠে গিয়ে তাড়াতাড়ি সে চাটাই পেতে বসে পড়ে ঝড়ু বাগদীর পাশে। আজ কিন্তু রতনের সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না, খুঁটি ঠেস দিয়ে নিঝঝুম সে বসে আছে ত আছেই।

ঝড়ু বাগদী চোঁ চোঁ করে খানিকটা টেনে নিয়ে মদের ভাঁড়টা রতনের সামনে নামিয়ে দিয়ে বললে,—বসে বসে ভাবছিস কি, খাবি ত খানিক খেয়ে লে এই বেলা।

এই বলে সে তক্ষুণি আবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। সন্ধ্যে হয়ে আসছে, গোমস্তা বাবুর গাই দুইতে যেতে হবে।

রতন আজ ঝড়ু বাগদীর উপর ভয়ানক চটে আছে। মদের ভাঁড়টা সে একধারে সরিয়ে দিয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো, তারপর সে সদরদোরের দিকে একটু উঁকি মেরে তাকিয়ে জোর গলায় একটা হাঁক দিলে,—ঝড়ো!

ঝড়ুর আর সাড়া পাওয়া গেল না। লেংড়া রতন বিড় বিড় করে বকতে বকতে এক কলকে তামাক সেজে গম্ভীর ভাবে হুঁকো টানতে লাগলো।

রাত্রি প্রায় প্রহর খানেক, দামিনী তখনো বাড়ি ফেরেনি। বিছানায় পড়ে পড়ে রতনের মনটা ভয়ানক উসখুস করতে লাগলো। এর আগে আরও কয়েকবার ঝগড়া ঝাঁটি ক'রে ঠিক এমনি করেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে দামিনী, কিন্তু কোনদিন তার ফিরতে এত দেরি হয়নি। রতন একটু চিন্তিত হয়ে পড়লো। ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে রতন, যখন তার ঘুম ভাঙলো রাত তখন অনেকখানি। তাড়াতাড়ি লম্পটা জেলে ফেলতেই রতনের চোখে পড়লো মেঝের উপর তালাই পেতে দামিনী তার নির্দিষ্ট জায়গাটিতে চুপচাপ এসে কখন শুয়ে পড়েছে। যাক—সেও ভাল এতক্ষণে রতন যেন একটু আশ্বস্ত হলো। দামিনীর গায়ে একটু নাড়া দিয়ে চুপি চুপি ডাক দিলে রতন—বড়কী—ও বড়কী, বলি শুনছিস?

দামিনীর সাড়া পাওয়া গেল না, গায়ের কাপড়খানা সে ভাল করে টেনে দিয়ে মুড়ি সুড়ি দিয়ে আবার পাশ ফিরে শুলো। রতন একটু আমতা আমতা করে বললে,—খানিকটা মদ আছে, খাবি? বলি শুনছিস?

দামিনী হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে গর্জে উঠলো,—গুটেক বকিস না ত—যাঃ।

এর উপর কথা কইতে গেলে পাড়ার লোকের শান্তিভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী। রতন তাই চুপ মেরে গেল। তারপর সে মদের ভাঁড়টা টেনে নিয়ে চোঁ চোঁ শব্দে এক নিঃশ্বাসে সমস্তটা শেষ করে দিয়ে চুপচাপ আবার চোখ বুজে শুয়ে পড়লো। রতনের চোখে ঘুম নাই, দামিনীর কথা ভাবতে ভাবতে মন যেন তার বিষিয়ে উঠে.—[illegible] নয় যেন বিয়েলকুঁড়ি গাই, সামনে [illegible] শিং নেড়ে তেড়ে আসে।

পরদিন দুপুর বেলা রান্না চড়াতে গিয়ে ঝড়ুর বৌয়ের সঙ্গে দামিনীর আর এক দফা কুরুক্ষেত্র বেধে গেল। গণ্ডা কয়েক পুঁটি মাছ ভেজে আলাদা করে রাখা হয়েছিলো তেঁতুল দিয়ে টক রাঁধবার জন্যে, রাতারাতি তার কতকগুলো লোপাট হয়ে গেছে। সন্ধ্যার সময় কিছুক্ষণের জন্য বাড়ি ছিলো না দামিনী, তারি মধ্যে হে'সেলে ঢুকে জলজীয়ন্ত চুরি। দামিনী ঝড়ুর বৌয়ের উপর খাপ্পা হয়ে উঠলো, সে ছাড়া এই দুঃসাহসিক কাজ অপর কারো দ্বারা হতে পারে না। একে একে দামিনী তার সাত পুরুষের পিণ্ডি চটকাতে শুরু করে দিলে। বাড়ির বৌ-ঝিরা যদি হে'সেলে ঢুকে এমন ধারা চুরি করে খায়, সে সংসারে লক্ষ্মী ছাড়তে ক'দিন।

ঝড়ুর বৌ কিছুক্ষণ ধরে দামিনীর গালাগালিগুলো চোখ বুজে সহ্য করে গেল। কিন্তু এ অবস্থায় বেশিক্ষণ চুপ করে থাকা কোনমতেই সম্ভব নয়। দামিনীর সামনে এগিয়ে এসে ঝড়ুর বৌ প্রতিবাদ জানিয়ে বললে—সন্ধ্যার আগে কতকগুলো ভাজা মাছ ঝড়ুকে সে মদ খাবার চাট করবার জন্য হে'সেল থেকে বেড়ে দিয়েছিলো, বাকিগুলো যেমনকার ঠিক তেমনিটি ঢাকা দেওয়া আছে। দামিনী সে কথা কানে তুললে না, মদ খাবার চাট করতে অতগুলো মাছ ভাজা কখনো খরচা হয়। ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলো দামিনী,—তুই হারামজাদি চুরি করে খেয়েছিস, অমন জিবে আগুনে ঠেকাই লে গা।

ঝড়ুর বৌয়ের আর বরদাস্ত হলো না, সেও হঠাৎ সমান তালে গর্জে উঠলো, বললে,—খবরদার বড়কী, মুখ সামলে কথা বলিস, মিছেমিছি বদনাম দিলে দুটি চোখের মাথা খাবি। জোড়া বেটা আধ বেলাতে মড়ঘাটিকে যাবেক যে।

তপ্ত তেলে বেগুন পড়লো, দামিনীর কণ্ঠ গেলো দ্বিগুণতর চড়ে! দামিনীর যুগ্যিমন্তর সাত বছরের বেটা শ্রীমান ভেঁদা বাগদী দূরে দাঁড়িয়ে একটা ছাগল ছানাকে আম পাতা খাওয়াচ্ছিলো। মা এবং কাকীর বাক-বিতণ্ডা শুনে বাঁশের একটা লাঠি হাতে মাতৃভক্ত ভেঁদারাম ছুটতে ছুটতে এসে দামিনীর পাশে দাঁড়ালো। জায়ে জায়ে তখন কুরুক্ষেত্র বেধে গেছে। শ্রীমান ভেঁদা হঠাৎ লাঠিগাছটা কাকীর সামনে উঁচিয়ে ধরে তারস্বরে বলে উঠলো,—মেরে এখুনি বোম-ফুটো করে দিব শালীকে, জানিস।

আর একটু হলে প্রকাণ্ড ঐ বাঁশের লাঠি ঝড়ুর বৌয়ের মাথায় পড়েছিলো আর কি। ঝড়ুর বৌ তাড়াতাড়ি ভেঁদার হাত থেকে লাঠিগাছটা টান মেরে কেড়ে নিলে। ভেঁদা হঠাৎ টাল সামলাতে না পেরে পিছন দিকে ছিটকে পড়লো।

এই আর যায় কোথায়! দামিনী হঠাৎ ঝড়ুর বৌয়ের চুলের মুঠি ধরে এলোপাথাড়ি শুরু করে দিলে কিল আর চাপড়। ঝড়ু সেই সময় কাছারি বাড়ির কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিলো, ব্যাপারটা হঠাৎ চোখে পড়তেই সর্বাঙ্গ তার গুরুগুরু করে উঠলো। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে দামিনীর ঘাড়টা হঠাৎ চেপে ধরে রাগের মাথায় দিলে ঝড়ু আচ্ছা করে দু'চার থাপ্পড় কষে।

মাতৃভক্ত ভেঁদারাম তখন সরে পড়েছে।

মার খেয়ে দামিনী কাপড়ের আঁচলটা শক্ত করে কোমরে জড়িয়ে নিয়ে চীৎকার করে উঠলো,—তবে-রে গুখোর বেটা, এত বড় আস্পর্দা তোর যে আমার গায়ে হাত তুলিস। তুই মনে করেছিস কিরে গুখোর বেটা!

এই বলে দামিনী বাঘিনীর মত ঝড়ুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কোমরটা তার শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রীতিমত ধস্তাধস্তি আরম্ভ করে দিলে।

ঝড়ু বাগদী গর্জে উঠলো রাগে বললে—খবরদার—মার খেয়ে এখুনি গুঁড়ো হয়ে যাবি, ভালোয় ভালোয় এখনো সরে পড় বলছি।

দামিনী দাঁত খিঁচিয়ে বললে,—তাই মার নারে গুখোর বেটা, তোর হাতে আজ মার খেয়েই মরবো। দ্বীপচালানে যাবি যেরে আঁটকুঁড়ো, পেয়দা এসে কুমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাবেক যে।

দামিনীর মাথায় যেন খুন চেপে গেছে, ঝড়ুকে সে ছাড়তে চায় না কোনমতেই। ঝড়ুর বৌ গিয়ে ওদের দু'জনকেই টেনে হিঁচড়ে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলো। দামিনী ততক্ষণ ঝড়ুকে ধরে ঠেলতে ঠেলতে বড়ঘরের দাওয়ার কাছে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে। দাওয়ার একটা খুঁটিতে ধাক্কা লেগে ঝড়ুর মাথাটা হঠাৎ ঢাই করে উঠলো।

ঝড়ু একটা ঝাঁকানি দিয়ে দামিনীর হাত দুটো ছাড়িয়ে আঁচল দিয়ে গলাটা তার চেপে ধরলে। দামিনী সেই ফাঁকে ঝড়ুর গালে ঠাই করে বসিয়ে দিলে এক চড়।

রাগে ঝড়ু ফুলে উঠলো। হঠাৎ সে দামিনীর চুলের মুঠি ধরে দিগ্বিদিক জ্ঞান-শূন্য হয়ে আরম্ভ করে দিলে বেদম প্রহার। দামিনী তখন ঝড়ুর বুকে কামড়ে ধরেছে।

দামিনীর চীৎকারের চোটে চারিদিকে লোক জমে গেছে বিস্তর। খোঁড়া রতন সেই সময় নেংচাতে নেংচাতে বামুনপাড়া থেকে বাড়ি ফিরছে। দূর থেকে এদের কাণ্ড দেখে সদরদোরে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে চীৎকার জুড়ে দিলে রতন,—তোমরা সব দেখ হে, গুণ্ডোশালা আমার পরিবারকে খুন করে ফেললেক। পুলিশ জিম্মে কর—পুলিশ জিম্মে কর শালাকে, কাঁকালে শালার দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাক।

রতনের সাড়া পেয়ে দামিনী আবার দ্বিগুণ উৎসাহে ঝড়ু বাগ্দীকে আঁকড়ে ধরেছে। রতন গিয়ে রাগের মাথায় ঘরের ভিতর থেকে পাঠাকাটা একটা রাম-দা বের করে এনে দেড় পায়ে লাফাতে লাফাতে হুঙ্কার করে উঠলো—শালাকে আজ কেটেই ফেলবো, ফাঁসি যেতে হয় সেওভি আচ্ছা।

এই বলে রতন ঝড়ুর দিকে এগিয়ে গিয়ে পাড়ার বারোয়ারী মনসা ঘরটার দিকে তাকিয়ে দু'হাত দিয়ে খাঁড়াটাকে শক্ত করে উপর দিকে তুলে ধরে হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো,—জয় মা—!

চারদিক থেকে লোকজন সব হাঁ হাঁ করে উঠলো। ঝড়ু হঠাৎ দামিনীকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে রতনের হাত থেকে রাম-দা খানা তাড়াতাড়ি ছিনিয়ে নিলে। রতন তার হাতলাঠিটা তুলে নিয়ে ঝড়ুর গায়ে ধপাধপ বসিয়ে দিলে গোটাকয়েক লাঠি। ঝড়ু বাগদী লাঠিখানা চেপে ধরে বললে,—হেদেক খোঁড়া, মিছেমিছি লোক হাসাহাসি করিস না, হারামজাদা ভেড়ুয়া কোথাকার!

ঝড়ুর বৌ ঝড়ুকে ধরে টানতে টানতে রতনের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। লেংড়া রতন গুড়গুড় করে কাঁপতে কাঁপতে দামিনীর কাঁধে ভর দিয়ে বড়ঘরের দাওয়ায় গিয়ে বসে পড়লো।

পরদিন সকালেই পাড়ার পাঁচজন লোক ডেকে ভাইয়ে ভাইয়ে ওরা পৃথক হয়ে গেল। ঘর বাড়ী, তৈজস পত্র, হাঁড়ি হেঁসেল, মায় গরু ছাগল পর্যন্ত সমান দু'ভাগে ভাগ ক'রে নিলে রতন আর ঝড়ু। বড় ঘরটা পড়লো রতনের ভাগে, ঝড়ু পেলে ছোট ঘরখানা। দু' একদিনের মধ্যেই উভয় পক্ষের সমবেত চেষ্টায় উঠানের মাঝখানে দুর্ভেদ্য এক বাবলা কাঁটার বেড়া উঠে গেল।

ভাইয়ে ভাইয়ে গৃহ বিবাদের এই হলো গোড়ার কথা। আজ এক বৎসর কাল এমনি ভাবেই চলে আসছে। কেউ কারো ছায়া মাড়ায় না, ভাইয়ে ভাইয়ে মুখ দেখাদেখি বন্ধ।

দু' ভাইয়ে পৃথক হওয়ার পর ঝড়ু বাগদীর সংসার বেশ সচ্ছলভাবেই চলতে থাকে, কিন্তু নেংড়া রতন বাগ্দীর অবস্থা ক্রমশই শোচনীয় হয়ে উঠতে লাগলো। ঝড়ু বাগদীর কিছু জমি জায়গা আছে; 'চাকরাণ' স্বত্ব প্রায় একখানা লাঙলের আয় সম্পূর্ণ তার নিজস্ব। রতন বাগদীর সম্বল মাত্র পৈত্রিক তার বসতবাটীখানা। সংসারের চাপে রতন একেবারে কাবু হয়ে পড়লো। খেটে খাবার ইচ্ছা থাকলেও শরীরে তার কুলোয় না। এক-মাত্র বাড়ই-গিরি ছাড়া অপর কোন কাজকর্মে রতন বিশেষ অভ্যস্তও নয়।

ফাল্গুন মাস। গ্রামের লোকের ঘর ছাওয়া ছাওয়ি আরম্ভ হতে এখনও ঢের দেরী আছে। ভেবে চিন্তে দামিনীর মাছ ধরা ফুটো জালিটাকে জোড়াতালি মেরে কোন রকমে সেরে নিলে রতন। বুত্তাকার বাঁশের বেকারিটা আর নড় বড়ে কাঠের হাতলগুলো নতুন ক'রে নিলে পাল্টে। যেমন করে হোক সংসার যে তাকে চালাতেই হবে।

সকাল বেলা জালি ঘাড়ে ক'রে দামিনী বেরোয় মাছ ধরতে। নেংড়া রতন লাঠি ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে তার পিছু পিছু গিয়ে জলে নামে। সারাটা দিন দু'জনে মিলে নদীনালা খাল বিল পুকুর গড়ে ঘুরে ঘুরে জালি টেনে মাছ ধরতে থাকে,—দাঁড়কে পুঁটি গচি গড়ই চিংড়ী খলসে আরও কত কি।

রতন ভারী শিকারী লোক। এক কোমর জলে নেমে দু'হাত দিয়ে জল হিঁচে হিঁচে এমনভাবে সে জালির দিকে মাছ তাড়া করে যে, সে সময় তাকে নেংড়া বলে' ধরে কে। ডাঙ্গার চেয়ে জলেই যেন তার খোঁড়া পায়ের তাগদ কিছু বেশী।

বিকেল বেলা দামিনী গিয়ে গ্রামের লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে মাছ বিক্রী করে। ফিরবার মুখে দোকান থেকে জিনিসপত্র খরিদ ক'রে এনে সন্ধ্যাবেলা রান্না চড়ায়। ওর মধ্যেই রতন এক একদিন দামিনীকে ধরে' পাকড়ে মদের দামটা আদায় ক'রে নেয়। দামিনী দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠে,—দিন গেলে যার হাঁড়ি চাপে না, তার এত মদ খাবার বাতিক কিসের।

রতন সে কথার জবাব দেয় না, মদের ভাঁড়টা হাতে ঝুলিয়ে চুপচাপ সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে।

ধরম পুজো উপলক্ষে বুড়ো রায়ের তলায় তিনদিনের জন্যে মেলা বসেছে। অন্যান্য বৎসরের চেয়ে ধুমধামটা এবার কিছু বেশী। বড় বড় দু'টি কবির দল বায়না হয়ে গেছে, তিনদিন ধরে পাল্লা চলবে। এর উপর খইরু মিঞার সত্য-পীরের গান আর জব্বর চাচার লেটোনাচ ত আছেই। এ গ্রামের ধরম পুজো এ অঞ্চলের মস্ত একটা পরব।

আজ ক'দিন থেকে রতন বাগ্দীর মেজাজটা বেশ ভাল নাই। দামিনী তাকে ক্রমাগত তাগিদ দিচ্ছে ছেলেপিলেদের পরব দেখতে জামা কাপড় চাই। রতনের ছেলে ভেঁদা ভয়ানক বায়না ধরেছে নতুন কাপড় আর রাঙা জামা পরে' কবি শুনতে তাকে যেতেই হবে। কিন্তু রতন সে কথা কানেই তোলে না, বাধ্য হয়ে ভেঁদা শেষ পর্যন্ত মনের খেদে ছাগল চরানো বন্ধ ক'রে দিয়েছে।

পাড়ায় ঘরে সকলেই এ সময়টা কিছু না কিছু খরচা ক'রে থাকে। বছরের সাধ পরব বলে কথা। অন্যান্য বছর রতন নিজেও ধরম পুজোর পরবে খরচা করে প্রচুর, এবার কিন্তু একেবারে নিরুপায়, তেলা একটি আধলারও ভরসা নাই এবার কোন দিক থেকে।

সকাল বেলা রতনের কাছে ধমক খেয়ে বাড়ি থেকে সটকে পড়েছিলো ভেঁদা। বিকেল বেলা সে নতুন একখানা কাপড় পরে' লাল রঙের একটা জামা গায়ে দিয়ে লাফাতে লাফাতে এসে বাড়ি ঢুকলো। দামিনী ওর সাজপোষাক দেখে অবাক।

ভেঁদা আনন্দে অধীর হয়ে বলে' উঠলো, —চললোম আমি পরব দেখতে, ঝড়ু-কাকা জামা কাপড় কিনে দিয়েছে।

দামিনীর মুখখানা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠলো। এতখানা সত্যিকারের দরদ ঝড়ুর কাছ থেকে আশা করা যায় না, এর মধ্যে তার নিশ্চয় কোন মতলব আছে। দামিনীর পিত্ত শুদ্ধ জ্বলে উঠলো, ভেঁদার হাত ধরে' হিড় হিড় ক'রে টানতে টানতে একেবারে তাকে রতনের সামনে নিয়ে গিয়ে হাজির করলে দামিনী। দামিনী চোখ মুখ তেড়ে বলে উঠলো,—বলি অপমানের চরম এবার হলো ত?

দামিনীর ভাবগতিক দেখে ভেঁদা একে-বারে অবাক মেরে গেছে। রতনও কিছু বিস্মিত হলো, দামিনীর দিকে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে একটু আশ্চর্যভাবে বলে উঠলো রতন,—ব্যাপারটা কি খুলে বল দেখি।

দামিনী একটু ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলো, তোর বড়লোক ভাই ভাই-পোকে ইলেম দিয়েছে। বলি এগুলো শুধু আমাদিকগে অপমান করতে, না আর কিছু!

রতন বাগদী আর এক নজর ভেঁদার দিকে চেয়ে বলে' উঠলো,—ঝড়ো এই সব কিনে দিলেক বুঝি, তা জিনিস ত নেহাত খারাপ দেয়নি বড়কী, তুই এত চটছিস কেনে বল দেখি?

দামিনী কপালে গোটা তিনেক চাপড় মেরে বলে উঠলো,—হায় রে আমার কপাল ওটুকু বুঝবার ক্ষেমতা যদি থাকতো! বলি পাড়ায় পাড়ায় এবার গেয়ে বেড়াবেক ত যে ফলনা বাগদীর কানাকড়ির মুরোদ নাই, আমি ওর ছেলেপিলেদের টেনা কিনে দিলোম, রাষ্ট ক'রে বেড়াবেক কি না বল?

এই বলে দামিনী ভেঁদার গা থেকে চড় চড় করে টানতে টানতে জামাখানা খুলে ফেললে। সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার জুড়ে দিলে ভেঁদা। দামিনী ঠাস্ ঠাস্ ক'রে ভেঁদার গালে কষে দিলে গোটা কয়েক চড়। তারপর সে ঝড়ুর দেওয়া জামা কাপড়গুলো তাল পাকিয়ে বেড়ার ধার থেকে ঝড়ুর পাশ দিকে ছুঁড়ে দিলে। ঝড়ুর বৌ বেড়ার ওপাশ থেকে বলে উঠলো—পরব দিনে ছেলেটাকে মিছেমিছি কাঁদাচ্ছিস কেনে বল্ দেখি?

দামিনী তেড়ে তুড়ে গর্জে উঠলো। ঝড়ু বাগদী যে টাকার দেমাকে ধরাকে নেহাত সড়া জ্ঞান করছে এবং তারই ফলে ঝড়ুর বৌয়ের সিঁথির সিন্দুর মুছতে যে আর বড় বেশী বিলম্ব নাই, দামিনী একথাটা ঝড়ুর বৌয়ের মুখোমুখি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলে তাকে। ঝড়ুর বৌ বাক্য ব্যয় নিষ্প্রয়োজন বোধে জামা কাপড়টা তুলে নিয়ে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়লো। ভেঁদা তখন উঠোনের মাঝখানে গড়াগড়ি দিয়ে চীৎকার করতে আরম্ভ করেছে। দামিনী গিয়ে ভেঁদার পিঠে দুমাদুম আরও কয়েক ঘা বসিয়ে দিলে। রতন আর চুপ ক'রে থাকতে না পেরে দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠলো,—বলি ছেলেটাকে অমন ধারা গরু-পেটা করছিস কেনে?

দামিনী ভোঁদাকে ছেড়ে রতনের উপর লেগে পড়লো। এমন কতকগুলো লাগসই কড়া কথা রতনকে সে শুনিয়ে দিলে যা একমাত্র লেংড়া রতন বলেই কোন রকমে চোখ বুজে সে সহ্য ক'রে গেল। সহ্য না করে উপায় কি. এ সমস্ত অশান্তির মূলে রতনেরই নিজের অক্ষমতা। দামিনী তাকে হামেশাই খোঁটা দিয়ে বলে,—স্ত্রীপুত্রের ভরণ পোষণ ও শখ আহ্লাদ মেটাবার শক্তি যার নাই, তার আবার বিয়ে করা কেন!

সত্যি কথা, অভাবী লোকের বিয়ে করা মানেই জীবনকে তার শতেক প্রকারে বিড়ম্বিত করে তোলা। ওইখানেই একটু ভুল হয়ে গেছে রতনের, কিন্তু সে আজ ঢের দিন আগের কথা. এখন আর ও ব্যাপার নিয়ে আপসোস করে লাভ নাই কোন।

সন্ধ্যা লাগবার আগেই চুপচাপ বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো রতন। বিশেষ কোন কাজ নাই হাতে, তবু সে একবার বেরুলো। বুড়ো রায়ের তলায় কবি গানের জুড়ন আরম্ভ হয়েছে, ঢোলের আওয়াজ পেয়ে রতনের মনটা আরও খিঁচড়ে উঠলো। ভাবতে ভাবতে পথে গিয়ে নামলো রতন।

সন্ধ্যার পর ছেলেপিলেদের ঘুম পাড়িয়ে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়েছে দামিনী। প্রহর খানেক রাত্রে রতনের গলার আওয়াজ পেয়ে দামিনীর হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। বেতালা সুরে গান গাইতে গাইতে টলতে টলতে বাড়ি ফিরছে রতন। মনের আনন্দে টানা সুরে সে গেয়ে চলেছেঃ—

কে তোর নাম রেখেছে দয়াময়ী কালী।
নদী যদি মদ হতো আর মেয়েতা হতো বালি।
কে তোর নাম রেখেছে—

বাড়ি ঢুকে রতন জোর গলায় একটা হাঁক দিলে,—বড়কী. বলি ঘুমুলি নাকি? জ্বাল —জ্বাল—লম্ফটা একবার জ্বাল্ দেখি।

এই বলে সে নিজের মনেই আবার সুর ভাঁজতে আরম্ভ করে দিলে—

ও নদী যদি মদ হতো আর মেয়েতা হলো
বালি—
কে তোর নাম রেখেছে দয়াময়ী কালী।
কে তোর নাম রেখেছে—

রতন যেদিন অতিরিক্ত নেশা করে সেদিন তার গানের বাতিকটা কিছু বেশী রকম চড়ে' যায়, থেকে থেকে নিজের মনে কেবলই সে সুর ভাঁজতে থাকে। দামিনীর বুঝতে বাকি থাকলো না যে, রতন আজ রীতিমত নেশা করে এসেছে। কিন্তু পয়সা—মদ খেতে সে পয়সা পেলে কোথায়?

দামিনী উঠে লম্ফটা তাড়াতাড়ি জেবলে ফেললে। রতন দামিনীর সামনে কাপড়ের একটা পোঁটলা ফেলে দিয়ে সোৎসাহে বলে উঠলো,—নিয়ে এলোম চাঁদা কেওটের কাছ থেকে গোটা কয়েক টাকা ধার করে, বর্ষার আগে ওর মনসা ঘরটা ছেয়ে দিতে হবে। তোরা সব এবার যা দেখি, জামা কাপড়গুলো পরে' খানিক পরব দেখে আয়,—বুড়ো রায়ের তলায় মেলা খুব জে'কে উঠেছে।

দামিনী পোঁটলা খুলে দেখে ছেলেদের জন্যে কেনা হয়েছে রঙিন জামা, নতুন কাপড় সেই সঙ্গে দামিনীর জন্যেও একখানা কস্তা পেড়ে ডুরে শাড়ী কিনে আনা হয়েছে। শাড়ীখানা দেখে দামিনীর চোখ দুটো খুশির আমেজে ভরে উঠলো. মুখে একটু হাসি টেনে ঈষৎ অনুযোগের সুরে বলে উঠলো দামিনী,—আ মর, ডুরে শাড়ী কিস্‌কে আনলি, ই সকলের এখন কি আর বয়েস আছে!

রতন জড়িত কণ্ঠে বলে উঠলো,—আহা একবার পরেই দেখ না। দেখ আবার খাটো ফাটো হবেক নাকি, ঠিকেই হবেক—লিজের হাতে আমি মেপে নিয়েছে।

রতনের অনুরোধে শাড়ীখানা দামিনীকে পরতেই হলো। রতন দামিনীর দিকে চেয়ে একটু মুচকি হেসে বললে,—মাইরি বলছি বড়কী, ডুরে শাড়ী পরলে এখনো যা মানায়—ঠিক যেন ডবকা ছুঁড়ি।

এই বলে রতন দামিনীর মুখখানা তুলে ধরে শুকনো তার গাল দুটো দু'হাত দিয়ে একবার জোরভর্তি রগড়ে দিলে। দামিনী একটু মুখ বেঁকিয়ে মুচকি হেসে বলে উঠলো,—উহু হু—ছাড়—ছাড়, বুড়ো বয়েসে ঢং দেখে কি হয়।

হো হো করে হেসে উঠলো রতন। ভেঁদা হঠাৎ ধড়মড়িয়ে জেগে উঠলো। দামিনী জামা-কাপড়গুলো ভেঁদার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে,—চটপট এগুলো পরে ফেল দেখি, পরব দেখতে যাবি।

বুড়ো রায়ের তলায় সন্ধ্যা থেকেই ঢোল বাজছে, সারা রাত আজ কবির মজলিস। আহ্লাদে আটখানা হয়ে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলো ভেঁদা, সঙ্গে সঙ্গে সে জামা-কাপড় পরতে আরম্ভ করে দিলে। রতন দামিনীকে একটু তাড়া দিয়ে বললে, —চাঁওড় করে যা, ঈশান মাল কেমন কবি গাইছে খানিক শুনে আয়গা। লকড়ে পাকমারাকে ধরেছে ইসা এক চাপান—

এই বলে রতন ঈশান মালের অনুকরণে কবির সুরে গেয়ে উঠলোঃ—

ও কুন্ বাপ তুর জন্ম হলো
জমডণ্ডীর তেজে।
মোর বাপ তুর কুন্ বাপকে
বেঁধেছিলো নেঞ্জে।
ধন্য নারী মন্দোদরী
ধন্য রে তুর মাকে।
এক যুবতী শতেক পতি
ভাব কেমনে রাখে।
মরি হায় রে—
তাক্ ডুমাডুম—তাক্ ডুমাডুম—

কবির গানে নিজের মনেই আবার মশগুল হয়ে উঠলো রতন।

দামিনী বেরোবার আগে কাঠের মোটা চিরুণী দিয়ে বেশ করে মাথাটা একবার আঁচড়ে নিলে। রতন একটা চকচকে সিকি দিলে দামিনীর হাতে গুঁজে, বললে,—পানটান কিনে খাস, আর ছেলে দুটোকে মেলা থেকে দিবি দু'চার পয়সার লাড়ু-টাড়ু কিনে।

দামিনী আঁচলের খুঁটে সিকিটা বেশ শক্ত করে বেঁধে নিয়ে ছেলেদের সঙ্গে পরব

দেখতে রওনা হয়ে গেল। রতন লম্ফ নিবিয়ে শুয়ে পড়লো চালায় একটা মাদুর পেতে। রতনের মন আজ স্ফূর্তির আমেজে ভরে উঠেছে। কে বলে রতনের কানাকড়ি মুরোদ নেই, কোন্‌ শালা বলে? ঝড়ো হয়ত পাড়ায় ঘরে সেই রকমই গেয়ে বেড়ায়, রতন তাকে বাগে পেলে আর ছেড়ে কথা কইবে না। দামিনী কি সাধে ওর উপর হাড়ে হাড়ে চটা! ভাই—ভাই না আমার ইয়ে!

ইয়ের কথা ভাবতে ভাবতে রতনের হঠাৎ নাক ডাকতে শুরু করে।

ধরম পুজোর মেলা দেখতে এসে দামিনীর বোন টগরী আর শ্বশুর বাড়ি ফিরে গেল না। বিধবা হওয়ার পর দামিনীর সঙ্গে তার দেখা-সাক্ষাৎ এই প্রথম।

বছর তিনেক আগের কথা। টগরীর স্বামী তখন অজয় পারের কোন একটা কয়লা খাদে মালকাটার কাজ করতো। বাড়িতে তার আপনার জন বলতে বিধবা এক পিসি, আর তের বছরের পরিবার এই টগরী। মাঝে মাঝে সে বাড়ি আসতো গেঞ্জে ভরতি টাকা-পয়সা আর টগরীর জন্যে শাড়ী, সেমিজ, তেল, সাবান আরো কত কি জিনিসপত্র নিয়ে। টগরী যেন আহ্লাদে ভেঙ্গে পড়তো, লাজ-লজ্জার বালাই ওর কোন কালেই ছিলো না। ওইটুকু বয়েস থেকেই বরের সঙ্গে সে পাল্লা দিয়ে ছড়া কাটতো, সুর করে গান গাইতো, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নেচে কুঁদে সারা বাড়ি মাত করে তুলতো। ছোটবেলা থেকেই টগরীর ধাত ছিলো একটু চঞ্চল, বিয়ের পরেও অভ্যাসটা সে পাল্টাতে পারেনি। টগরীর সারা অঙ্গ বেয়ে যৌবনের ঢল তখন ধীরে ধীরে নামতে শুরু করেছে। চেহারাখানা তার সত্যিই ছিলো চমৎকার, টগরীকে দেখে কে বলবে যে বাগদীর ঘরের মেয়ে। টগরীর মত সুন্দরী বৌ পেয়ে স্বামীটা ওর বর্তে গিয়েছিলো। টগরীকে সে ভালবাসতো যথেষ্ট। টগরীর মনটা ছিলো বেজায় রকমের সৌখিন। মাঝে মাঝে সে বরের কাছে বায়না ধরে কত জিনিস যে চাইতো কাপড় চাই, জামা চাই, ফাঁদি চাই; নাকছাবি চাই, বাজুবালা, পৈছেবিছে ইত্যাদি করে এক নিঃশ্বাসে চেয়ে বসতো সে অনেক কিছুই। কিন্তু আব্দারের দৌড় তার ওই পর্যন্তই; আর্জিটুকু পেশ করে দিয়েই টগরীর কাজ খতম; ওর মধ্যে কি পাওয়া গেল—আর কোন্‌টাই বা মনের ভুলে বাদ পড়ে গেছে, এ নিয়ে টগরী মাথা ঘামায়নি কোনদিনই। টগরীর বর টগরীর দিকে চেয়ে শুধু মুখ টিপে টিপে হাসতো। পারতপক্ষে টগরীকে তার অদেয় ছিলো না কিছুই। টগরীর ঢলঢলে সুন্দর মুখখানার দিকে চেয়ে মন যেন তার নেচে উঠতো।

টগরী সেবার স্বামীকে ওর ধরে বসলো, অজয়পারের কুঠিতে গিয়ে সেও তার সঙ্গে খাদে নেমে কাজ করবে। ঝুড়ি করে টব গাড়িতে কয়লা বোঝাই দেওয়া সে আর এমন কঠিন কথা কি। দিনকয়েক একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিলেই বিলকুল সে শিখে নিতে পারবে। টগরীর স্বামীরও তাতে আপত্তির কোন কারণ ছিল না, বরং সে বিষয়ে তার আগ্রহ ছিল টগরীর চেয়েও বেশি। সুবিধা-মত ধাওড়া পাওয়া যায়নি বলেই টগরীকে সে নিজের কাছে নিয়ে যেতে পারে নি, ইচ্ছা ছিলো কোম্পানীকে বলে কয়ে শিগ্‌গীর মধ্যে একটা কিছু ব্যবস্থা করে ফেলবার, টগরীর জন্যে মাঝে মাঝে সত্যিই তার মন কেমন করতো। টগরীও মনে মনে দিন গুণছিলো কোন রকমে ধাওড়া একটা পাওয়া গেলেই হয়। কিন্তু কোম্পানী থেকে ধাওড়া পাবার জন্যে বেশিদিন আর অপেক্ষা করে থাকতে হলো না টগরীকে; কিছুদিন পরে হঠাৎ একদিন খবর পাওয়া গেল সুঁদের ভিতর চাল ধস্‌কে কয়লা চাপা পড়ে টগরীর স্বামীটা গেছে মারা। টগরীর পিসু-শাশুড়ী খবর পেয়ে বুক চাপড়ে কান্না জুড়ে দিলে। টগরীও ক'দিন ধরে মুখ গুঁজে একধারে পড়ে রইলো মনমরা হয়ে। পিসি বুড়ীর কান্না দেখে সত্যিই এক এক সময় কান্না পেয়ে যায় টগরীর। কিন্তু লোকটা যখন শেষ পর্যন্ত মারাই গেল, তখন আর মিছেমিছি তার জন্যে কান্নাকাটি করে লাভটা কি? কাঁদলে কি সে ফিরে আসবে! কয়েকদিনের মধ্যেই টগরী আবার কোমর বেঁধে উঠে বসলো একটু একটু করে স্বামীর দুঃখু সে ভুলতে আরম্ভ করে দিলে, মাসখানেক যেতে না যেতেই টগরী আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলো ঠিক আগেকার মতই; স্বামীর শোক সে একদম গেল ভুলে।

টগরীর পিসশাশুড়ী টগরীকে ভাল-বাসতো নিজের মেয়ের মতই। অল্পবয়সে বিধবা হওয়ার যে কি দুঃখু, বুড়ীর তা ভালরকমই জানা ছিলো। টগরী বিধবা হওয়ার বছরখানেক পরে নিজেরই এক দূরসম্পর্কীয় বোনপোর ছেলের সঙ্গে টগরীর আবার বিয়ে দিয়ে দিলে বুড়ী। নতুন করে টগরী আবার ঘরসংসার পেতে বসলো। কিন্তু ওর দ্বিতীয়পক্ষের স্বামীটা ছিলো ভয়ানক বেয়াড়া ধরণের। টগরীর সঙ্গে তার বনিবনা হতো না মোটেই। যেমন ছিল সে একরোখা আর পাঁড় মাতাল, তেমনি ছিলো দুশ্চরিত্র। বিয়ে হওয়ার মাস-খানেকের মধ্যেই টগরীর নতুন স্বামীটা পাড়ার একটি বৌকে নিয়ে হঠাৎ একদিন রাতারাতি নিখোঁজ হয়ে গেল। বহুদিন যাবৎ কোন সন্ধানই আর পাওয়া গেল না তাদের। কেউ বলে ওরা বর্ধমানে ইঁটের ভাটায় বেওরা খাটে, কেউ কেউ বলে চা-বাগানের আড়কাটিদের সঙ্গে দেশ ছেড়ে ওরা কাছাড় চলে গেছে।

টগরীর আর একা ঘরে থাকা চলে না, বিশেষত এই সোমত্তবয়সে। বাপের বাড়িটা বজায় থাকলে এ অবস্থায় টগরী হয়ত সেখানে গিয়ে কিছুদিনের জন্যে আশ্রয় পেতে পারতো, কিন্তু বাপ-মা তার মারা গেছে অনেকদিন আগেই। টগরী অনেক ভেবে চিন্তে ফিরে এলো তার পিস-শাশুড়ীর ভিটেয়। বুড়ী প্রথমটা টগরীকে দেখে হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলো। টগরীর দ্বিতীয় পক্ষের স্বামীটা যে টগরীর মত যুগ্যিমন্ত লক্ষ্মী বৌকে ফেলে কালপেঁচা একটা শ্যাওড়া গাছের পেত্নীকে নিয়ে ঘর-দোর ফেলে সরে পড়বে, একথা বুড়ী ভাবতে পারেনি। হতভাগা ছোড়াটার দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে কপাল চাপড়ে হায় হায় করতে লাগলো বুড়ী। টগরীর কিন্তু কিছুমাত্র আপসোস নাই তাতে, বুড়ীকে সে নানান ভাবে সান্ত্বনা দিতে লাগলো, বললে,—ওর জন্যে আর কাঁদিস না পিসি, খালভরা গেছে, না, আপদ গেছে, মুখপোড়াকে নিয়ে আমি জ্বলে পুড়ে মরছিলুম।

টগরীর কথাবার্তা শুনে বুড়ী একেবারে অবাক। ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ ক'রে কিছুক্ষণ সে চেয়ে থাকলো টগরীর দিকে। টগরী মুখ-খানা যথাসম্ভব গম্ভীর ক'রে কি যেন তার দুঃখের কথা আরও খানিকটা বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু বুড়ীর গোমড়া মুখের ভাবগতিকটা দেখে টগরীর পক্ষে ধৈর্য রাখা কঠিন হয়ে উঠলো, হো হো ক'রে হঠাৎ হেসে উঠলো টগরী, হাসতে হাসতে বুড়ীর সামনে সে কুটি কুটি হয়ে ভেঙে পড়লো। বুড়ী একটা ধমক দিয়ে বললে—হলো কি তোর পোড়ারমুখী, হি হি ক'রে হাস-ছিস যে!

টগরী একটু হাসি চেপে বললে,—আমার লেগে তুই ভাবিস না পিসি, ঘর সংসার পেতে বসা আমার দ্বারা আর হবেক নাই, তোকে ছেড়ে আমি আর কোথাও যেতে চাই না।

বুড়ী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে টগরীকে বুকের কাছে টেনে নিলে। বুড়ীর কোলে আশ্রয় পেয়ে টগরীও যেন হাঁপ ছেড়ে, বাঁচলো। কিন্তু বুড়ীর হিল্লেয় খুব বেশি দিন টগরীকে থাকতে হলো না, কয়েক মাস পর দিন চার পাঁচ ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগে বুড়ীও হঠাৎ মারা গেল। টগরীর মায়া কাটিয়ে বুড়ী যে এত তাড়াতাড়ি এমন ভাবে সরে পড়বে, টগরী সে কথা ভাবতে পারেনি।

(আগামীবারে সমাপ্য)

বিজ্ঞানের কথা

ফলিত নৃতত্ত্ব

শ্রীশশাঙ্কশেখর সরকার

অধিকাংশ লোকের ধারণা যে নৃতত্ত্ব কতকগুলি বিদেশীয় মনুষ্য-সমাজের অদ্ভুত রীতিনীতি ও বিশ্বাস লইয়া গঠিত এবং আধুনিক সভ্য সমাজের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, নৃতত্ত্বের মূল সূত্রগুলি বুঝিতে পারিলে আমাদের নিজ নিজ সমাজের সামাজিক প্রথা প্রভৃতির মধ্যে কোনটি গ্রহণযোগ্য এবং কোনটি পরিহার্য তাহা বুঝা যায়।

আমরা সংক্ষেপে এই বিজ্ঞানটির পরিধির কথা বলিয়া ইহার ফলিত দিকটির আলোচনা করিব। নৃতত্ত্বের প্রধানত দুইটি বিভাগ আছে—একটি দৈহিক, অপরটি সামাজিক। দৈহিক বিভাগে নৃতত্ত্ববিৎ মানুষের দেহের গঠন লইয়া গবেষণা করেন এবং এই বিভাগে কার্য করিতে হইলে মানব দেহের কঙ্কালের ও ব্যবচ্ছেদ বিদ্যার সহিত সুপরিচিত হইতে হয়। ব্যবচ্ছেদবিৎ ও নৃতত্ত্ববিৎ এই দুয়ের কার্যের মধ্যে অল্প পার্থক্য আছে—প্রথমোক্ত পণ্ডিতেরা কোন একটি বিশিষ্ট শব লইয়া কার্য করেন। তাঁহাদের পরিধি হইল মাত্র ঐ একটি দেহ, কিন্তু নৃতত্ত্ববিৎ সেই একই গবেষণার ফল একটি জাতি বা সমষ্টির উপর প্রয়োগ করেন। নৃতত্ত্ববিৎ এই ভাবের একটি জাতির বা সমষ্টির সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়াই না সমাজের সহিত তাহার সম্বন্ধ।

মানব দেহের বিভিন্ন অংশের মাপজোখ প্রচলনের জন্য নৃতত্ত্ববিদেরাই মুখ্যত দায়ী এবং এইটি দৈহিক বিভাগের প্রধান অস্ত্র। মাপজোখের সঙ্গে সঙ্গেই অঙ্ক শাস্ত্রের আগমন অবশ্যম্ভাবী এবং স্থল বিশেষে আধুনিক পণ্ডিতেরা এমনই দুরূহ অঙ্কশাস্ত্রের প্রয়োগ করিতে সুরু করিয়াছেন যে, সাধারণের পক্ষে তাহা সহজে বোধগম্য নহে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মনুষ্য প্রজনন (human genetics) বিজ্ঞানের মধ্যে পশ্বাদির মত ইচ্ছামত প্রজনন সম্ভব নহে বলিয়া অঙ্কশাস্ত্রের প্রবর্তন ও তজ্জন্য ইহার জটিলতা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। ক্রমবিকাশের পর্য্যায়ে যে সব গণিতশাস্ত্র পড়ে তাহা পৃথিবীর অতি অল্প লোকেরই বোধগম্য বলিয়া মনে হয়।

সামাজিক নৃতত্ত্বের পরিধির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই—একটু ভাবিয়া দেখিলেই আমাদের স্ব স্ব সমাজের বিভিন্ন জটিল সমস্যার কথা মনে পড়ে। এইগুলির সমাধান করিতে হইলে প্রত্যেকটির সমগ্র পরিধি লইয়া তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক গবেষণার মূলে তথ্য সংগ্রহ প্রয়োজন। সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্তন শুধু আইন করিলেই হয় না—এই জন্য মাদ্রাজের নায়ার নাম্বুদ্রী বিবাহ হইতে আরম্ভ করিয়া বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন পর্যন্ত কোনটিই বিশেষ কার্যকরী হয় নাই। সামাজিক নৃতত্ত্বমূলক গবেষণার ফলেই একমাত্র বুঝা যায় যে, কেন আচার, বিচার, রীতিনীতি পরিবর্তন হয়। আমরা বুঝিতে চেষ্টা করি না, কেন অমুক ব্যবস্থা হইল? এই "কেনর" উত্তর না পাইলে পরিবর্তন আনা চলে না।

এইবার ফলিত ক্ষেত্রের কথায় আসা যাউক। দৈহিক বিভাগের মধ্যে স্বতই বংশানুক্রমের কথা আসিয়া পড়ে। মানুষের মধ্যে ইন্দুর বা খরগোসের ন্যায় ইচ্ছামত প্রজনন চলে না সেজন্য বিবিধ উপায়ে কার্য করিতে হয়। বংশ তালিকা সংগ্রহ এবং আন্তর্জাতিক বিবাহের ফলে উদ্ভূত সন্তান-সন্ততির গবেষণা ব্যতীত আর বিশেষ কোন উপায় নাই। ইহা ব্যতীত যমজ গবেষণা আসিয়া মনুষ্য বংশানুক্রমের একটি প্রধান সহায়ক হইয়াছে। এই সবগুলিরই মূলত একই উদ্দেশ্য—কিভাবে একটি সন্তানকে তাহার জন্মদাতা পিতার সহিত পরিচিত করিতে পারা যায়। ইংলণ্ড ব্যতীত ইউরোপের প্রায় সর্বত্রই এইরূপ গবেষণা কেন্দ্র আছে। মনে হয় জারজ সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যই এই প্রকার গবেষণাগারের প্রবর্তন হইয়াছে। জার্মানীর এইরূপ একটি গবেষণা কেন্দ্রে প্রথম দিন ও তাহার পরবর্তী দিনগুলির অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। প্রথম দিনের আপাতদৃষ্টিতে ইহাকে অত্যন্ত স্থূলভাবে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু পরে বিশেষ করিয়া ভিয়েনায় আসিয়া বুঝিয়াছিলাম যে, ইহার মধ্যে শুধু বংশানুক্রমের শুষ্ক তথ্যই নাই, পরন্তু সামাজিক নৃতত্ত্বেরও ব্যাপার আছে। আমাদের দেশে এইরূপ গবেষণার যে প্রয়োজন নাই তাহা নহে, মধ্যে মধ্যে বিচারালয়ে দুই একটি ঘটনার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। পথিপার্শ্বে পরিত্যক্ত শিশুদের পিতার সন্ধানও অনেক ক্ষেত্রে মিলিতে পারে। কলিকাতার বিচারালয়ে এমন মামলা হইয়া গিয়াছে, যেখানে পিতৃত্ব অনুসন্ধান করিলে হয়ত মামলাটির সুবিচার হইত অথচ তাহা না করিয়া পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করিয়া মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ আমাদের অজ্ঞতা—যেখানে সন্তানের বিবাহিত পিতা ও অনুমিত জন্মদাতা পিতা বর্তমান সে স্থলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাক্ষ্য প্রভৃতির উপর নির্ভর না করিয়া বংশানুক্রম বিজ্ঞানের সহায় লওয়াই সঙ্গত।

ফলিত নৃতত্ত্বের আর একটি বিশাল কর্মক্ষেত্র হইল সুপ্রজনন বিদ্যায়। সকল সমাজই চাহে যে তাহার মধ্যে কোন পঙ্গু, বধির, খঞ্জ অন্ধ বা উন্মাদ সন্তানসন্ততি না জন্মায়। সুপ্রজনন বিদ্যার উদ্দেশ্য হইল একটি স্বাস্থ্যবান জাতি গড়িয়া তোলা যাহাতে সে জাতি জীবন সংগ্রামের মধ্যে পড়িয়াও না লুপ্ত হয়। ইহার জন্য সমাজের মধ্য হইতে ক্ষতিগ্রস্ত দোষগুলি সরাইতে হইবে। আধুনিক সভ্য সমাজের মধ্যে বিশেষ করিয়া শহরের মারাত্মক ব্যাধি তিনটি হইল যক্ষ্মা, বহুমূত্র ও ক্যান্সার। তিনটিই প্রত্যেক সভ্যদেশে বাড়িয়াই চলিতেছে এবং তিনটিরই বংশানুক্রমিক প্রভাব প্রবল। আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রে পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুসন্ধানই প্রবল। এই জন্য এই ব্যাধিগুলি যে বংশানুক্রমিক তাহার ধারণা ক্রমশই সমাজ হইতে যেন লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। অথচ এইগুলিকে না এড়াইয়া চলিলে কোন জাতিরই মঙ্গল হইতে পারে না। এইগুলির জন্য কোন হাসপাতাল চালানর দায়িত্ব কোন সমাজের সহজ কথা নহে এবং ব্যাধিগ্রস্তদের জন্য তাহা না করিয়া উপায় নাই। এই সকল ব্যাধি যাহাতে প্রসার না লাভ করে তাহার জন্য শুধু ছোঁয়াচ নিবারণ করিলেই চলিবে না। ইউরোপে ও আমেরিকায় এই প্রকার কতকগুলি ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের একেবারে প্রজনন বন্ধ করিয়া দেওয়ার রীতি আছে। আমাদের দেশে এ ব্যবস্থা হওয়া সুদূরপরাহত; তবে লোক-শিক্ষায় যতটুকু সম্ভব ততটুকুরও ব্যবস্থা হয় নাই। ইংলণ্ড আজিও এই বিষয়ে বহু পশ্চাতে; সুতরাং আমরা কি করিয়া অগ্রসর হইব?

সামাজিক নৃতত্ত্বের কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে বাঙলা দেশের

কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তার কথা আলোচনা করিব। সামাজিক ফলিত নৃতত্ত্বের পরিধির মধ্যে সমাজের বিবাহ সম্পর্কীয় ব্যাপার, স্ত্রীলোকের উৎপাদিকা শক্তি, স্ত্রীপুরুষের হার, সাংসারিক সমতা প্রভৃতি আসিয়া পড়ে।

প্রায় প্রত্যেক বাঙালী সংসারে অবিবাহিত স্ত্রীপুরুষ কিছু না কিছু আছেই। সাধারণের বিশ্বাস যে, নারীর সংখ্যা পুরুষের অপেক্ষা অধিক; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। গত ১৯৩১ সালের আদমসুমারীতে দেখা যায় যে, ১৭-৪৬ বয়সের অবিবাহিত পুরুষের সংখ্যা হইল ১০,৯৬,১১২ এবং ঐ বয়সের অবিবাহিতা নারীর সংখ্যা হইল ৬৯,০১০। ইহাতে বুঝা যাইবে যে অবিবাহিতা নারীদের সকলেরই বিবাহ হইয়া গেলেও ১০,২৭,১০২ জন পুরুষ অবিবাহিত থাকিয়া যায়। এই ব্যাপার কিন্তু একেবারে অন্যরূপ ধারণ করে যদি ঐ বয়সের বিধবাদের সংখ্যা ধরা যায়। ১৯৩১ সালের গণনায় ১৭-৪৬ বৎসর বয়সের মৃতদারের সংখ্যা হইল ২,৪১,৫৮৮ এবং বিধবাদের সংখ্যা হইল ১৩,৪১,৭২৪। বিধবা বিবাহ আর সমাজে অচল নহে এবং অবিবাহিত পুরুষদের জন্য ইহার প্রচলন আরও প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

উপরিউক্ত সংখ্যাগুলি সারা বাঙলাদেশের হিন্দুর সংখ্যা এবং প্রত্যেক বিভিন্ন বর্ণের জন্য এইরূপ সংখ্যার প্রয়োজন, নতুবা কোন বিশিষ্ট প্রকার ফলিত কার্যপদ্ধতি নিয়োগ করা চলে না। অতিরিক্ত পুরুষের সংখ্যা কোন জাতির পক্ষে মঙ্গলকর চিহ্ন নহে। আমাদের এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। প্রত্যেক জাতির মধ্যে জন্মকালে পুংশিশুর-হার স্ত্রীং শিশু অপেক্ষা অধিক হইতে দেখা যায়, কিন্তু পরবর্তীকালে পুংশিশুর মৃত্যুহার স্ত্রীং শিশু অপেক্ষা অধিক হওয়ার ফলে নারী ও পুরুষের সমতা বজায় থাকিয়া যায়।

বাংলাদেশের বিবাহ বাপারে আর একটি অপ্রীতিকর ব্যাপার স্বতঃই আসিয়া পড়িয়াছে। সভ্যতার প্রসারের ফলে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই বিবাহকালীন বয়স বাড়িয়া যাইতেছে। পুরুষের বেলায় ইহা সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে। ৪০ বৎসরের ঊর্ধ্ব বা অনূর্ধ্ব পুরুষদের প্রায়ই ১৮।২০ বৎসরের যুবতীদের বিবাহ করিতে দেখা যাইতেছে। স্বামী-স্ত্রীর বয়সের প্রভেদের সহিত সন্তান-সন্ততির স্বাস্থ্য যে কিরূপ হয়, তাহার সম্যক জ্ঞান না থাকিলেও কিছু প্রভাব যে নাই তাহা অস্বীকার করা চলে না। যৌন জীবনের অসমতার ফলে স্বাস্থ্যহানি, মানসিক বিকার প্রভৃতিও আসিয়া থাকে। ১৯৩১ সালের আদমসুমারীতে দেখা গিয়াছে যে, ১৬ বৎসরের অনধিক বয়সে বিবাহিত স্ত্রীর সন্তান-সন্ততিরা তদূর্ধ্ব বয়সে বিবাহিতদের সন্তান-সন্ততি অপেক্ষা অধিক দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে। মূল রিপোর্টের অংশটি এইরূপ—

"the figures for the number of survivors per 1000 born alive definitely seem to suggest a higher survival rate for children to marriage in which the wife was less than 16 at marriage than to those in which her age was higher."

এই ত সুপ্রজননের আসল উদ্দেশ্য। যে শিশু জন্মায় সে যদি সুস্থ সবল হইয়া আসে, তাহা হইলে মাতাপিতার কষ্টের লাঘব ত হয়ই তাহা ব্যতীত তাহারা সমাজের, তথা দেশের গলগ্রহ হইয়া আসে না।

অনুবাদ সাহিত্য

বুমেরাং

অস্কার কুক

[অস্কার কুকের সব চাইতে বড়ো পরিচয় নাট্যকার এবং ঔপন্যাসিক ...বলে। সরকারী চাকরীতে বহুদিন কাটিয়েছেন বৃটিশ নর্থ বোর্নিওতে। এঁর গল্পে তাই বোর্নিও পটভূমি হোয়ে বহুবার দেখা দিয়েছে। ইংরাজ লেখকদের মধ্যে ইনি অন্যতম সাহিত্যিক, যিনি গ্রন্থকার, সম্পাদক, প্রকাশক, অভিনেতা, নাট্য-বিদ্যালয়ের পরিচালক এবং যিনি ব্যবসার কোন ক্ষেত্র হোতে পশ্চাদপসরণ করেননি। বুমেরাং গল্পটি এঁর বহুপ্রচারিত সৃষ্টি।]

ওয়ারউইক আমার পাশের চেয়ারে বসে পাতলা প্যান্টের ঝুলটা হাঁটুর ওপর সামান্য টেনে তুলে নিলো। তারপর সামনে ঝুকে আমার হাঁটুতে একটা টোকা মেরে বললো, আমাকে সেই যে মেনডিংহ্যামের গল্পটা বলেছিল, সে কথা তোমার মনে আছে?

মাথা নেড়ে সায় দিলেম, হ্যাঁ আছে।

বেশ, মেনডিংহ্যামের মতোই আমি তোমাকে আজ একটা গল্প শোনাবো। নায়িকার মুখ হোতে এইমাত্র শুনে আসছি —একেবারে তাজা সবুজীর মতো সবুজ হোচ্ছে আমার গল্প।

চেয়ারে হেলান দিয়ে ওয়ারউইকের মুখের দিকে আমি ভালো করে তাকালাম। বুঝলাম ওর মুখে একটা ভয়াকুলতার ছায়া যেন সমস্ত আলো আবৃত করেছে। আর ও যেভাবে বলছে একজন মেয়ের কাছ হোতে গল্পটা শুনে আসছে, তখন নিশ্চয় কিছু সত্য ওর গল্পে বিজড়িত আছে।

ওয়ারউইক হোচ্ছে অদ্ভুত লোক। কোনো কোমল অনুভূতি কিংবা শালীনতাবোধ ওর থাকে না মদের তৃষ্ণা প্রখর হোলে। গলা তখন ওর আগে সরস হওয়া চাই, তারপর অন্য কথা। কথাটা আমার জানা আছে। তা ছাড়া এই সূচনার পর নীরবতার কারণ বুঝতে আমার বিলম্ব হোল না। তাই বৃথা কালক্ষেপ না করে হুকুম দিলাম, দু গ্লাস মদ আনবার। মদ এলো। ওয়ারউইকের গলা সরস হোল, আমি বললেম, বন্ধু, এই তোমার কাহিনী বিবৃত করো।

—তা হোলে শোনো। গল্পটি হোচ্ছে জংগলী গল্প।—ওয়ারউইক আরম্ভ করলো, মানে দুজন চাষী বোর্নিওর গভীর অভ্যন্তরে বাগান বানাতে গিয়েছিল আর বুঝতেই পারছো তাদের সংগে এক সময়ে একটি মেয়েও জুটেছিল।

সে-ই-তো এ গল্পের নায়িকা—কেমন?

হ্যাঁ।—ওয়ারউইক আমার জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়ে এগিয়ে চললো, শোনো তার রূপটা। মাথায় সুন্দর সোনালী রংয়ের একরাশ চুল। অবশ্য আজকাল আশেপাশে দুটো একটা ধূসর রংয়ের রেখা দেখা যাচ্ছে। গলার ডান পাশে বেশ লম্বা একটা লাল রংয়ের কাটা দাগ। পরিচয় হোচ্ছে তার লিওপোল্ড থিংএর স্ত্রী। তৃতীয়জন হোচ্ছে ক্লিফোর্ড মেসি—তিনি এই ত্রিভুজের অন্যতম কোণ সৃষ্টিকারী বাহু।

—বেশ, তুমি এদের মধ্যে কেন স্থান পেলে?

একটা চোখ টিপে ওয়ারউইক একবার আমার মুখের দিকে তাকালো। তারপর জিভ দিয়ে ঠোঁট দুটো ভিজিয়ে নিয়ে বললো, হায়, হায়! এটা বুঝলে না? আমি যে গল্পকার, কাহিনী শোনানোর ভার আমার ওপর।—ওয়ারউইক আর থামলো না, তার গল্পের জের টেনে চললো, আমার গল্পের নায়িকা জীবনের প্রতি বর্তমানে বীতরাগ। তবে ধর্মের মধ্যে শান্তি খুঁজে পাবার চেষ্টায় এখনো কোনো প্রকারে বেঁচে আছে। আমি তার কাছ হোতে সবকথা শুনে, ঘটনা তথ্য ইত্যাদি মিলিয়ে নিয়ে তবে তোমার কাছে এসেছি। যদি শোনার ইচ্ছে থাকে তো, আমি বলে যাই চুপ করে শোনো।

কৌতূহল ইতিমধ্যে যথেষ্ট বেড়ে গেছে। সেই চিরন্তনী ত্রিভুজ এবং ত্রয়ী নিয়ে ওয়ারউইক তার গল্প শুরু করেছে, পটভূমি হিসাবে স্থাপন করেছে বোর্নিওর অরণ্যানী। সেই অরণ্যের বুনো গন্ধে যেন ইতিমধ্যেই তেজালো হোয়েছে ওর গল্প আর তাকে রংদার করেছে নায়িকার গলার ওই লাল রংয়ের ক্ষতরেখা। মাথা নেড়ে বললাম, বলো, শুনছি।

আমার অবস্থা ওয়ারউইক বুঝতে পেরেছে। সে হাসলো।

—ওরা দুজনে অংশীদার হোয়ে গভীর অরণ্যে গিয়ে প্রথমে পত্তনী লাগায়। উদ্দেশ্য ছিল কি রকম চাষবাসের অবস্থা দাঁড়ায় তাই দেখা। ছ বছর পর দেখা গেল বেশ মোটা টাকা লাভ হোচ্ছে। ইতিমধ্যে মেসির মোটে বাড়ি যাওয়া হয়নি। থিং কিন্তু আঠারো মাস পূর্বে বাড়ি গিয়েছিল। ফিরে যখন এলো রোনা তার সংগে এসেছে রীতিমত বিয়ের কনে হোয়ে। বুঝতেই পারছো গোলযোগের সূত্রপাত তখনই হোল। তাদের জোড় ভাংগলো। অর্থাৎ তৈয়ার হোল একটা নতুন বাংলো।

আমি জিগ্যেস করলেম, মেসির জন্যে?

হ্যাঁ। ব্যাপারটা তার বেশ ভালো লাগলো না নতুন বাংলো কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকলো। তার ওপর তার রাতের পর রাত নিঃসংগ শয্যায় কাটতে লাগলো আর অন্য বাংলোয় অপর পক্ষ—বুঝতেই পারছো।

মাথা হেলিয়ে সায় দিলাম ঃ পরিস্থিতিটা আমার কাছে পরিষ্কার।

ওয়ারউইক বলে চললো, যা হওয়ার তাই হোল। মেসি প্রথমে ফ্লার্ট করলো, তারপর সহানুভূতি দেখালো, অবশেষে ভীষণভাবে ভালোবাসায় পড়ে গেল। প্রকৃতি হোচ্ছে তার সেই দলীয়, যারা কোনো কিছু আংশিকভাবে উপভোগ করতে রাজী নয়। যদি মদ খায়, তবে বেদম মাতাল হোয়ে তবে থামবে, ভালো যদি বাসলো, তবে আত্মহারা হোয়ে যথাসর্বস্ব সমর্পণ করে ভালোবাসা জানাবে—আর যাকে ঘৃণা করবে, তার মাথায় নরকের সমস্ত গ্লানি এনে চাপিয়ে তবে নিরস্ত হবে।

—আর শ্রীমতী থিং?—আমার মনে হোল নিশ্চয় তারও কিছু নিজস্ব মত আছে।

—এক জাতের মেয়ে আছে, যারা দু নৌকায় পা দিয়ে চলে। সে এই একক, নিরীহ লোকটির নির্জনতা এবং সংগীহীনতা বিনষ্ট করবার উদ্দেশ্য নিয়ে তার সংগদান আরম্ভ করেছিল। তারপর সংগদানের গণ্ডী পেরিয়ে একদিন সে শুরু করলো নারীর পুরুষের ওপর আধিপত্য বিস্তারের চিরকালীন লীলা। এরপর একদা সে যে কি বহ্নি প্রজ্বলিত করেছে, তার আভাস পেয়ে সংকিতচিত্ত, দিশাহারা হোয়ে পড়লো। কিন্তু তখন অনেক দেরী হোয়ে গেছে। সে বুঝলো মেসি শুধু ভালোবাসায় পড়ে নি, সে নিজে মেসির ভালোবাসা-সমুদ্রের নিতলে নিমজ্জিত হোয়ে গেছে। তবে ধর্মের প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা রক্ষা করে চললো পদস্খলন।

—থিং ছিলো সহজ সরল মানুষ। জটিলতার মধ্যে সে নেই। উদারতা তার হৃদয়ে প্রচুর। ধরো জামা, জুতো কেউ চাইলো। সে খালি গা অথবা পা করে জামা জুতো দিতে দ্বিধাবোধ করবে না। কিন্তু একবার যদি সে বোঝে তার অধিকারে কেউ

হস্তক্ষেপ করেছে, ব্যস্ তা হোলেই সে একেবারে অন্য মানুষ। সব সরলতা, শালীনতা তার বাষ্পের মতো অদৃশ্য হোয়ে যাবে, সে জায়গায় জাগবে আদিম বন্য-মানুষের হিংস্রতা শ্বাপদের মতো স্বার্থ-পরতায় উগ্র হোয়ে।

—কিছুদিনের মধ্যেই রোনা বুঝলো, সে যে খেলায় মেতেছে তা চালিয়ে নিয়ে যাওয়া তার পক্ষে সাধ্যাতীত। হৃদয়ের যে ছবি মানুষের মুখে পড়ে, সেই অলেখ্য লুকানো তার পক্ষে সম্ভবপর নয়, সে শক্তিহীনা। থ্রিং তাই শীঘ্র বুঝতে পারলো ঃ একটা গোলযোগ ঘটেছে। মানিয়ে চলবার ক্ষমতা রোনার নেই, মেসির প্রকৃতিতে লুকিয়ে কিছু করা অস্বাভাবিক। বোঝো একবার রোনার অবস্থাটা। একধারে তার সন্দিগ্ধ স্বামী আর অপর প্রান্তে বেপরোয়া দুর্দান্ত প্রণয়ী। সে আমাকে বলেছে, সেদিন তার সকল সময় মনে হোত সে যেন নরকের অসহ্য উত্তাপে ঝলসিত হোয়ে যাবেই—বসে আছে জাগরণোন্মুখ আগ্নেয়গিরির চূড়ায়।

হ্যাঁ, যে কোনো সময়ে বিস্ফোরণ ঘটবে।—ওয়ারউইকের ইংগীত আমি হৃদয়ঙ্গম করলাম।

—ঠিক তাই।—ওয়ারউইক স্বীয় কাহিনীর জের টেনে চললো, সর্বকিছু তখন নির্ভর করছিল থ্রিংএর ওপর। হাতে তার রয়েছে পলিতা—একবার শুধু দেশলায়ের আগুন ছোঁয়ালেই হোল। তাছাড়া বুঝে দেখো অরণ্যের বুকে আমার গল্পের নায়িকা এবং নায়করা করছে বিচরণ। অসম্ভব কিছু যদি সম্ভবপর হয়, তবে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে?

ওয়ারউইকের জিজ্ঞাসার উত্তরে আমি একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিলাম। তারপর আমি নিজে একটা নিয়ে আগুন জেলে দুটো সিগারেটই জ্বালালাম।

একগাল ধোঁয়া ছেড়ে ওয়ারউইক হাসলো, বললো, কেমন জমিয়েছি?

বাজে কথা রাখো। যা বলছিলে বলো।—গম্ভীরভাবে বললাম আমি।

—শোনো তবে। অবস্থা ক্রমশ জটিল হোয়ে উঠলো। থ্রিং রোনাকে দেশে পাঠিয়ে দিতে চাইলো। রোনা গেল না। স্বামীর প্রতি কর্তব্য তাকে অহরহ উদগ্রীব করে রেখেছে; আর প্রেমাস্পদের থেকে বিচ্ছিন্ন হোয়ে দূরে সরে যাওয়া তার কাছে অসম্ভব। আর সবচাইতে কঠিন সমস্যা ঃ এই উদ্যত ফণা দুজন পুরুষকে রেখে সে নারী হোয়ে কেমন করে পলাতকা হবে। আশঙ্কা তার সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রীকে অসাড় করে দিলো, ভাবনা মূর্চ্ছাতুর করে গেল হৃদয়ের অনুভূতি। এপাশে মেসির সংযমের বলগা দিন দিন শিথিল হোয়ে আসতে লাগলো। সে অধিকতর কামাতুর হোয়ে উঠলো। থ্রিং সুচতুরভাবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিল। একদিন কোনো বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে সে হঠাৎ রোনাকে সটান জিগ্যেস করে বসলো, সে কি মেসির প্রণয়িনী নয়?

—বর্ষার জল সেদিন সমস্ত আবহাওয়াকে স্যাঁতসেঁতে করে রেখেছিল। একটা অতি সামান্য বিষয় নিয়ে সমস্ত সকাল কলহ চলছিল। তার শেষ পরিণতি হোল থ্রিংএর ওই মর্মান্তিক প্রশ্ন।—ওয়ারউইক চুপ করলো।

—রোনা কি উত্তর দিলো?

—রোনা কি উত্তর দিলো?—নাক বেঁকালো ওয়ারউইক, সে আবার কি বলবে, বোকা মেয়ে, নির্বোধের মতো স্বীকার করলো, হ্যাঁ সে মেসিকে ভালোবাসে।

বিস্ময়ে হতবাক হোয়ে গেলাম আমি। জানতেম এমন একটা উত্তর সে দেবে। তা বলে' থ্রিংএর কাছে তার এই স্বীকৃতি... ওয়ারউইককে জিগ্যেস করলুম, থ্রিং কি করলো?

শূন্য মদের গ্লাসে মিছামিছি একটা চুমুক দিয়ে ওয়ারউইক বললো, সেইটাই তো হোচ্ছে সবচাইতে মজার বিষয়। রোনার উত্তর শুনে সে কোনোরূপ উত্তেজনা প্রকাশ করলো না। দেখা গেল বিন্দুমাত্র বিচলিত সে হয়নি।

—একেবারে ঠাণ্ডা মেরে গেছে।—ব্যাঙ্গোক্তি আমার জিভের ডগায় এসে গেল।

—হ্যাঁ রোনা যখন মেসিকে এই ঘটনা বলেছিল, মেসি আর রোনা আলোচনার পর এই একই কথা স্থির করেছিল। আসলে তা হয়নি। থ্রিং নীরব হোয়ে সুযোগের অপেক্ষায় শান্ত হোয়েছিল। কারণ তার পরিষ্কারঃ মেসি হোচ্ছে প্রকাণ্ড জোয়ান। হাতাহাতি বাঁধলে এক ঘুসিতে সে থ্রিংএর প্রাণান্ত করে ছেড়ে দেবে। সুতরাং অবস্থাটা ছিল ঠিক যেন ঝড়ের পূর্বে আকাশের স্তব্ধতায় নিস্পন্দ প্রকৃতির অবস্থা।

—পরিবর্তন এলো। নিয়তি যেন এগিয়ে এসে সকল স্তব্ধতা চুরমার করে দিল। মেসিকে ধরলো ভয়ংকর ম্যালেরিয়া। জ্বরের অবস্থা দেখে থ্রিং পর্যন্ত বিচলিত হোয়ে রোনাকে বললো মেসির সেবাযত্ন করতে। দিনরাত্রি চললো সেবা। শেষ পর্যন্ত জ্বর বন্ধ হোল, কিন্তু অসম্ভব দুর্বল হোয়ে গেল রোগী।

—এপাশে রোনা অসুখে পড়লো। এতো পরিশ্রম তার সহ্য হোল না। থ্রিং যে সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল, সেই সুযোগ এসে গেল ঃ ওরা এখন বিচ্ছিন্ন—থ্রিংএর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর। যা ইচ্ছা প্রতিহিংসা গ্রহণ করা এখন থ্রিংএর হাতে।

—বর্ষা তখন শেষ হোয়ে এসেছে। অরণ্যের বিস্তৃতি হোয়েছে প্রতিহত, বাতাস বইছে বসন্তের। ঘাসের সবুজ রং আর অরণ্যের শ্যামলতায় নবজীবন যেন স্পন্দমান। বনের কীটপতংগ আর প্রাণীর সংগমের পূর্বে শক্তি সঞ্চয়ে উদ্দীপ্ত। মনে হয় যৌবন যেন প্রাণ বিস্তারের লক্ষ্য নিয়ে যোদ্ধৃসাজে অবতীর্ণ। প্রকৃতির এই অভিনব লীলা অকস্মাৎ থ্রিংএর মাথায় একটা বুদ্ধির জোগান দিলো। শয়তানীর চূড়ান্ত সেই বুদ্ধি বললোঃ থ্রিং তোমার প্রতিহিংসা সাধন এবার সহজে হবে।

বোর্নিওতে একজাতের কানকোটারী পোকা আছে যাদের গায়ের রং সাদাটে ধূসর এবং দেহ হচ্ছে মাকড়সার জালের মতো সূক্ষ্ম। লম্বায় এরা গুটিপোকার মতো। এরা হাড়ের অথবা ফুলের নরম সত্তা খেয়ে বেঁচে থাকে। এই কোমল সত্তা ফুলের অথবা বৃক্ষের গভীর অভ্যন্তরে নিহিত থাকে। বোর্ণিও অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে এই পোকা মূর্তিমান বিভীষিকা। কেন না এতো ধীর এবং লঘু পায়ে এরা চলে যে মানুষ কখনো এদের উপস্থিতি সম্বন্ধে সহজে সচেতন হোতে পারে না। এদের আর একটা বৈশিষ্ট্য হোচ্ছে মানুষের কানে আশ্রয় নিতে এরা বড়ো পছন্দ করে, কারণ কানে যে নরম হাড় থাকে তাতে মোমজাতীয় পদার্থ আছে প্রচুর আর তার স্বাদ নাকি এদের জিভে বড়ো ভালো লাগে!

কানকোটারী পোকার বর্ণনা দিতে দিতে দেখলাম ওয়ারউইক চেয়ারে বুকটান করে সোজা হোয়ে বসেছে। ধীর, সংযত গলায় কথা বলছে আর নিজের বক্তব্য বোঝানোর জন্য প্রতি কথার শেষে বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের তালুতে মুষ্টিবদ্ধ আঘাত হানছে। তার এই ভঙ্গী এবং এই অভিব্যক্তির প্রাণবন্ত রূপ দিয়ে সে যেন উন্মোচিত করে গেল আগামী ঘটনা স্রোতের গুরুত্ব কতো গভীর হোতে পারে সেই কথা।

সচকিত হোয়ে বললাম আমি, তুমি বলতে চাও—তুমি বুঝতে পেরেছো।—অসমাপ্ত কথার ওপর বাধা দিলো ওয়ার-উইক। হাতের অর্ধদগ্ধ সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে একগাল ধোঁয়া কথার সঙ্গে বের করে দিলো। তার দিকে চেয়ে বুঝলাম সে নিজের বর্ণনাতে নিজেই চঞ্চল হোয়ে উঠেছে। বলছে, কি শয়তানী বুদ্ধি বলো দেখি। রোনা সকল সময় দুর্বল মেসির কাছে থাকে না। একটা কানকোটারী পোকা মেসির কানের পাশে চুলের ওপর রাখতে পারলেই হোল...

তারপর?—সচকিত আমার মুখ হোতে প্রশ্নটা এক সময় বেরিয়ে গেল।

—তারপর আর কি। পোকাটা কানে ঢুকলে সোজাসুজি কি আর বেরিয়ে আসবে? এ-কান হোতে ও-কানের দিকে সে

চলবে দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি আর সে চলবার সময় খাবে নরম হাড় কুরে কুরে আর—

—দোহাই তোমার! ওয়ারউইক তুমি থামো!—চীৎকার করে উঠলাম আমি। যে ছবি আমার সামনে বর্ণিত হোচ্ছিল তা কি সহ্য করা যায়? তার হাত চেপে ধরে ভাঙা গলায় বললাম, আর শুনতে চাই না। ও ভগবান! থ্রিং কি মানুষ—ও যে নর পিশাচ!

ওয়ারউইক আমার মুখের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলো—ওর মুখ পাণ্ডুর হোয়ে গেছে।

এক সময় সে কথা বললো, পিশাচ! নর পিশাচ!—তোমার কথা সত্য বলে মানি বন্ধু, কিন্তু বলতে পারো যদি মেসির মতো বন্ধু তোমার স্ত্রীকে প্রণয়িনী, শয্যাসঙ্গিনী করতো, তাহোলে তুমি কি করতে?

—কি করতাম জানি না। কিন্তু এই-ভাবের গুপ্ত নির্যাতন—ধীরে ধীরে উন্মাদে পরিণত করা। না, না, ওয়ারউইক, বন্ধু আমার এতে সমর্থন নেই—তুমি সমর্থন দিও না!

ম্লানহাসি হাসলো ওয়ারউইক। দুহাতের মুঠি বন্ধ করলো, তারপর সম্মুখে বাহু-প্রসারিত করে সেই মুঠি ধীরে ধীরে খুললো, যেন আলস্য দূর করছে।

—তোমার কথা হয়তো ঠিক। হয়তো ঠিক না। যা হোক আমার গল্প তুমি শোনো। রোনা অসুখ থেকে সেরে ওঠার পর সকল সময় মেসির কাছে না থাকলেও মাঝে মাঝে সে দেখতে আসতো তাকে। না এলে থ্রিং জোর করে পাঠিয়ে দিতো। অনেক সময় থ্রিং নিজে এসে দেখে যেতো রোনা সত্যি এসেছে কি না। একদিন বিকালে রোনা এসে দেখলো মেসি ঘুমোচ্ছে। বাইরে বারান্দায় এসে সে বসলো। হাতে তার আধবোনা একটা সোয়েটার। বসে বসে কিছুক্ষণ গেল। দিনের আলো মরে গিয়ে রাতের অন্ধকার চাপ বাধলো। বাইরে বাদুড় উড়তে লাগলো ঃ খেঁকশিয়ালেরা ফল খেয়ে রাত্রির বিশ্রাম নিতে গর্তে এসে ঢুকলো। বারান্দায় গোটা কয়েক ইঁদুর কিচমিচ করে বাইরে আসতে গিয়ে হঠাৎ মানুষ দেখে আবার পালালো। আলো জ্বালবার সময় তখনো হয়নি, অন্ধকার ঘনায়মান হোয়ে উঠছে। বিষাদাচ্ছন্ন করুণ একটা মুহূর্তের অনুভূতি এই সময়ে এসে দোলা দিলো রোনাকে। সে হাতের সোয়েটার ফেলে দিয়ে এক সময় নিজের অজান্তে চোখের কোণে টলটলায়মান অশ্রু মোচনের জন্যে দুহাত দিয়ে মুখ ঢাকলো। ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের ভিতর হোতে আর্তনাদ উঠলো, উঃ মাথা গেল, কান গেল, মাগো, আমার কান গেল, কি ভয়ানক যন্ত্রণা.....!

—সূত্রপাত হোল এইভাবে। পোকাটা তখন কানের ভিতরে বেশ গুছিয়ে আস্তানা পেতেছে। রোনা জলভরা চোখ নিয়ে ছুটে গেল ঘরের মধ্যে। কিন্তু গিয়েই বা করবে কি? তার সমস্ত যত্ন, উদ্‌গ্রীব সেবা, আকুলতা সবি মিথ্যা। পোকাটা যখন ঘুমাতো অথবা বিশ্রাম নিতো, তখন কোনো যন্ত্রণা মেসি অনুভব করতো না। যন্ত্রণা শুরু হোতো পোকাটা নড়লে অথবা কুরে কুরে কান খেতে আরম্ভ করলে।

—দিনের পর দিন, রাতের পর রাত এই এক ঘটনার পুনরাবৃত্তি হোল। মেসির এই প্রতিকারহীন আর্তনাদে রোনা অসহায় হোয়ে বসে থাকতো। কখনো তার মাথায় হাত বুলাতো, কখনো মাথা টিপে দিতো। আর সে অমানুষিক চেষ্টায় চোখের জল, বুকের গভীর কান্না গোপন করতো। সকল সময় সে ভীতা, ত্রস্তা হোয়ে থাকতো কখন এই মর্মন্তুদ আর্তনাদ থামবে। যখন থামতো, তখন সেই উন্মুখ হোয়ে মুহূর্তের পর মুহূর্ত গুণতো কখন আবার শুরু হোল যন্ত্রণা। কাঁদিবার কোনো উপায় নেই—থ্রিং প্রায় সকল সময় উপস্থিত।

ওয়ারউইক থামতে আমি আর নীরব থাকতে পারলাম না, বললাম, শুধু উপস্থিত থাকতো?

—না, নানান রকমের ওষুধের ব্যবস্থা করতো। সে সব ওষুধে অবশ্য কখনো কাজ হয়নি। এ ছাড়া নানারকমের ফন্দি থ্রিং অনবরত করতো মেসিকে শহরে নিয়ে গিয়ে ভালো ডাক্তার দেখানোর। সে সমস্ত ফন্দিও কাজে পরিণত করা হয়নি।

শরীরের সমস্ত প্রাণশক্তি নিঃশেষ প্রায় করে, চক্ষুর জ্যোতি ম্লানিমায় ভরে দিয়ে হঠাৎ একদিন অন্য কান দিয়ে পোকাটা বেরিয়ে এলো। এই অবিস্মরণীয় মুহূর্তে রোনা আর থ্রিং উভয়ে উপস্থিত ছিল মেসির কাছে। তখন ভয়ানক, অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় মেসি কাতরাচ্ছিল। পোকাটা বেরিয়ে আসবার পরই, সেই যন্ত্রণার অকস্মাৎ নিরসন হোয়ে গেল। মেসি একটা অপূর্ব আরাম পেলো। সঙ্গে সঙ্গে তার বোধ হোল কানের ওপর কি যেন লাগলো, তারপর গালের ওপর সেইটা সরে এলো। গালে আঙুল দিতে আঙুলে নরম একটা কি জড়িয়ে গেল। মেসি চোখের সামনে আঙুল আনলো। সে যা দেখলো, তাতে করে নিমেষেই বুঝলো তার এই নিদারুণ যন্ত্রণার মূল কোথায় নিহিত ছিল। এমন কি রোনা, যে এইসব জীবতত্ত্বে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ সে পর্যন্ত সংশয়ের কোনো কারণ খুঁজে পেলো না। কেমন করেই বা পাবে? পোকাটার গায়ে তখনও পর্যন্ত রক্ত আর হাড়ের মজ্জা জড়িয়ে আছে আর আছে মোমের মসৃণ কোমলতা। একটি নীরবতায় নিটোল মুহূর্ত কাটলো। তারপর মেসি ক্ষীণস্বরে বললো, ভগবান! আমার এযে পুনর্জন্ম হলো!—রোণার চোখ হোতে জল ঝর ঝর করে গড়িয়ে পড়লো মেসির কথা শুনে। থ্রিং কিন্তু নির্বাক। এইখানে সে ভুল করলো। তার এই বাকহীনতা মেসিকে বিচলিত করলো। সে থ্রিংএর মুখের দিকে চাইলো। থ্রিং মুখ ফিরিয়ে নিলো। সেই মুহূর্তে সত্য প্রকাশিত হোল। অস্ফুট কণ্ঠে একটা দিব্যি করে মেসি রুগ্ন হাতের আঙুলের চাপে নিহত পোকাটা সটান থ্রিংএর মুখে ছুঁড়ে মেরে দুহাতে নিজের মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠলো।

ওয়ারউইক চুপ করলো। বহুক্ষণ অতি-বাহিত হোল নিঃশব্দে। হঠাৎ আমার মনে হোল আর বোধহয় কিছু বলবার নেই। তা ছাড়া যথেষ্ট শুনেছি, আর কেন? তবু বললাম, গল্প তা হোলে এখানেই শেষ?

আমার কথায় সচেতন হোয়ে উঠলো ওয়ারউইক। মাথা হেলিয়ে বললো, না, আর একটু আছে, শোনো! রোনার চোখের জল তখন শুকিয়ে গেছে। মেসির ওই অসহায় কান্না আর অভিমানের অভিব্যক্তি তার বুকের পাঁজরা চুরমার করে গেলেও সে থ্রিংএর মুখের দিকে তাকিয়ে মেসির কাছে কোনোরূপ সান্ত্বনা দিতে পর্যন্ত যাবার সাহস করলো না। সে দেখলোঃ সেই মৃত পোকাটা বাঁ হাতের তালুতে তুলে নিয়ে গাছগাছড়ায় পোকা লেগেছে কিনা দেখবার জন্য থ্রিংএর কাছে সকল সময় যে অণু-বীক্ষণ কাঁচটা থাকে, তাই দিয়ে সে গভীর মনোনিবেশ সহকারে পোকাটাকে পর্যবেক্ষণ করছে। রোনা দেখতে পেলোঃ ধীরে ধীরে থ্রিংএর মুখের পাণ্ডুর ভাব পরিবর্তিত হোয়ে গেল—হতাশা আর আশঙ্কা সেই মুখ হোতে অদৃশ্য হোয়ে প্রস্ফুট হোয়ে উঠলো প্রতিহিংসা চরিতার্থ হওয়ার জন্যে একটা শয়তানী কুৎসিত আনন্দ। থ্রিং পোকাটা হোতে মুখ তুলে চীৎকার করে উঠলো, মেসি!

মেসি ওর মুখের দিকে তাকালো। আঙুল দিয়ে উঁচু করে পোকাটা তুলে ধরলো থ্রিং, মরে গেছে এটা, না? মরে গেছে—হ্যাঁ মৃত, আমার বন্ধুত্ব যেমন তোমার প্রতি আজ মৃত। আর আরো আমার প্রেম যেমন স্বেচ্ছাচারিণী স্ত্রীর প্রতি আজ মৃত। এটা মরে গেছে, শুধু তোমরা নও, আমিও স্বীকার করি, এটা মরেছে। কিন্তু সবচাইতে মর্মান্তিক মজা হোচ্ছে যে এই পোকাটা হোচ্ছে স্ত্রী পোকা। আমার বক্তব্য অনুধাবন করার চেষ্টা করো। এটা হোচ্ছে স্ত্রী পোকা। স্ত্রী পোকাতেই ডিম পাড়ে। সেই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়। আমি পরীক্ষা করে দেখলাম কাণ থেকে বেরিয়ে আসার আগে অর্থাৎ তোমার হাতে মরবার পূর্বে—

থ্রিংএর বক্তব্য অসমাপ্ত রইলো। তার এই

নিষ্ঠুর কথনভঙ্গি মেসিকে উন্মাদপ্রায় করে তুললো। সে তার রুগ্নশরীর, দৌর্বল্য, সমস্ত কিছু বিস্মৃত হোয়ে লাফিয়ে গিয়ে থ্রিংএর গলার টুঁটি চেপে ধরলো। তারপর শুরু হোল এক প্রাণান্তকর নির্মম যুদ্ধ। কখনো মেসি ওপরে, থ্রিং নীচে, কখনো বা থ্রিং ওপরে মেসি তার দেহের নীচে। দুজনের লক্ষ্য হোচ্ছে থ্রিংএর কোমর-বন্ধনীতে আটকানো শিকারের ছোরাটা।

—রোনা স্তম্ভিত হোয়ে দাঁড়িয়ে এই আত্মঘাতী দ্বন্দ্ব দেখতে লাগলো। দেখতে দেখতে এক সময় থ্রিং মেসির বুকের ওপর প্রায় উঠে বসে কোমরের দিকে ডান হাত বাড়িয়ে দিলো। সেই মুহূর্তে রোনার সকল কিছু কেমন গোলমাল হোয়ে গেল। সে ভুলে গেল থ্রিংএর ধর্মপত্নী সে, ভুলে গেল তার ধর্মের প্রতি অনুরাগ, তার শুধু মনে হোলঃ মেসিকে সে ভালোবাসে—এ জগতে মেসি ছাড়া তার আর স্বজন কেউ নেই। চিন্তা করতে তার একটিক্ষণও লাগেনি। সে তীব্রবেগে সেই ভয়ংকর মুহূর্তে ছুটে গেল মেসিকে সাহায্য করতে। থ্রিং বুঝতে পারলো রোনার অভিসন্ধি কি। সে লক্ষ্য স্থির করে রোনার নতপ্রায় মস্তকে সবেগে পদাঘাত করলো—রোনা প্রচণ্ড আঘাতে জ্ঞানহারা হোয়ে মেঝের ওপর পড়ে গেল। সে পতন কিন্তু নিস্ফল হোল না। যে মুক্ত হাত দিয়ে থ্রিং কোমরের ছোরা বের করে আনছিল, সেই হাতের ওপর পড়লো রোনার জ্ঞানহীন দেহ। ছোরার শাণিতফলা লেগে রোনার গলার খানিকটা কেটে গেল। আর সেই ক্ষত হোতে ফিন্‌কি দিয়ে রক্তধারা সজোরে ছুটে এসে থ্রিংএর ডান চোখে লাগলো। থ্রিং সহসা চোখ বন্ধ করলো। সেই চক্ষু নিমীলনের মুহূর্তে যেন মেসিকে বাঁচাবার জন্যই এসেছিল। মেসি তা বুঝতে পেরেছিল, কোনরূপ শৈথিল্য প্রকাশ না করে, সে সেই মুহূর্তকে কাজে লাগালো এবং রক্ষা করলো তার জীবন।

—রোনার যখন জ্ঞান ফিরে এলো, থ্রিং তখন বিগতপ্রাণ। সেই প্রাণহীন দেহের পাশে দাঁড়িয়ে আছে মেসি। আর মৃতদেহের গলার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হোয়েছে উ'ই-মারা যন্ত্রের নল। মৃতদেহটা ধীরে ধীরে ফুলছে।

ওয়ারউইক থামলো। শেষের কথাগুলো সে বহুক্ষণ ধরে বলে গিয়েছে। সুতরাং গলা ভিজাবার জন্যে সে শূন্য গ্লাসটা তুলে নিয়েই একটা চুমুক মারলো। তারপর গ্লাসটা শূন্য বুঝতে পেরে টেবিলের ওপর ঠকাস্ করে সজোরে বসিয়ে দিলো। গ্লাস বসানোর শব্দে আমার চেতনা ফিরে এলো। আমি হাত বাড়িয়ে মাথার ওপরের ঘণ্টিতে চাপ দিলাম ওয়েটারকে ডাকতে। হাত নামিয়ে জড়িত গলায় বললাম, হ্যাঁ, একখানা গল্প শুনিয়েছো বটে—চিরকাল মনে থাকবে। মাথা আমার ঝিমঝিম করছে। কিন্তু একটা কথা এখনো বাকি আছে—মেসির কি হোল? সে কি বেঁচে গেছলো?

ডান দিক হোতে বা দিকে মাথা হেলিয়ে ওয়ারউইক উত্তর দিলো, সে আর এক ইতিহাস। মেসি মরেনি, আজো বেঁচে আছে। থ্রিংকে হত্যা করার অপরাধে তার বিচার হয়। কিন্তু প্রমাণাভাবে খালাস পায়। খালাস সে পেলো বটে, তবে থ্রিং কি করে মারা পড়লো, সেই ঘটনা বিবৃত করতে সে যে কাহিনীর অবতারণা করে, তা বিশ্বাস করা বড় কঠিন। সুতরাং বুঝতে পারছো?

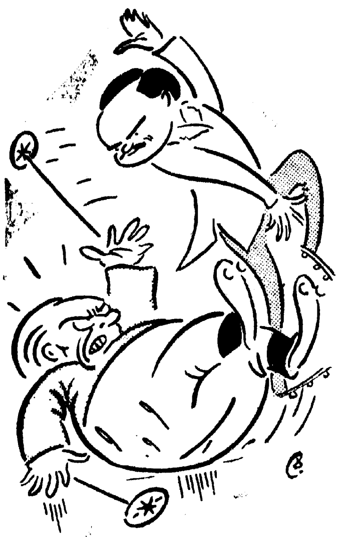
—তার মানে? মেসির কাহিনী পাগলের প্রলাপ বলে ধরে নেওয়া হোল? সে কি এখন পাগলা গারদে?

আবার মাথা হেলিয়ে ওয়ারউইক আমার কথায় সায় দিলো। তার চোখের সঙ্গে আমার দৃষ্টি মিললো। সেই দৃষ্টির অনুসরণ করে দেখি, একজন ওয়েটার এসে আমার চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে হুকুমের অপেক্ষারত। পরিষ্কার কণ্ঠে তাকে হুকুম দিলেম, দুটো ডবল হুইস্কি আর সোডা। তারপর সিগারেট ধরাবার জন্যে দেশলাই জ্বাললাম। আমার হাত কিন্তু থর্ থর্ করে কাঁপছে।

অনুবাদক—**সমীর ঘোষ।**



পররাষ্ট্র সচিব মিঃ বেভিন মস্কো পৌঁছিয়াছেন। কিন্তু সংবাদে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মস্কো-সম্মেলন সম্বন্ধে কোন খবর সর্বসাধারণের মধ্যে প্রকাশ করা হইবে না। মস্কোর বরফে "স্কি" খেলিতে গিয়া বিপুলকায় সচিব মহাশয়ের যদি



পতন ও মূর্চ্ছা হয় তবে সেই বিপত্তির সংবাদে সর্বসাধারণ মর্মাহত হইবেন বিবেচনা করিয়াই হয়ত পূর্ব হইতে এতটা সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে।

* * * *

মার্শাল স্ট্যালিন অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন এই একটি সংবাদ বহুদিন আগেই রটিয়াছিল। বন্ধুদের মনে আশঙ্কার কথাটাই আগে জাগে বলিয়া স্ট্যালিনের উত্তরাধিকারী কে হইবেন সেই জল্পনা-কল্পনাও ইতিমধ্যে হইয়া গিয়াছে। এখন রয়টার সংবাদ দিতেছেন, স্ট্যালিন মস্কো ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খোঁজ নিতে গিয়া মিঃ বেভিন যখন জানিলেন স্ট্যালিন সুস্থ এবং বাহাল তবিয়তে আছেন তখন মিঃ বেভিন নিশ্বাস ফেলিলেন,—দুঃখের নয়, স্বস্তির নিশ্বাস!

* * * *

নির্বাচনী সভায় লীগপন্থীদের গুণ্ডামী প্রসঙ্গে স্যার নাজিমউদ্দীন যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহার মর্ম এই যে, বিরুদ্ধবাদীদের সভা ভাঙিয়া দেওয়ার অধিকার ন্যায়ত দোষনীয় নহে। সভাভাঙা আর মাথাভাঙা যে এক নয় এই কথাটা প্রাক্তন মন্ত্রী মহাশয়ের মাথায় ঢোকে নাই।

* * * *

নির্বাচন প্রসঙ্গে বিশুখুড়ো যে সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা সত্যই অপূর্ব। কোন এক কেন্দ্রের লীগদলের ভোটদাতারা নাকি কংগ্রেসকর্মীদের বলিয়াছেন—"আপনারা সব সময় বলেন গান্ধী, জিন্নাবাদ; জওহরলাল, জিন্নাবাদ। সব সময় জিন্নাকে বাদ দাও বলিয়া চেঁচান কিন্তু কই, আমরা ত কখনও জিন্না, গান্ধীবাদ বা জওহরলাল বাদ বলি না!"—সংবাদটি সত্য হইলে গ্রামবাসীদের কাছে "জিন্দাবাদের" অর্থ যেভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাতে লীগের প্রচার কৌশলের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

* * *

রাজকর্মচারীরা যাহাতে কোন রাজনৈতিক সভায় যোগদান না করেন এই মর্মে আসাম সরকার একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়াছেন। আমরা আশা করি, অতঃপর অনুরূপ সভা-



সমিতিতে উপস্থিত থাকিয়া পুলিশ এবং সি, আই, ডি বিভাগ না-হক ঝামেলার সৃষ্টি করিবেন না।

* * * * *

বাঙলার গভর্নর মিঃ কেসি নাকি গান্ধীজীর গায় দিবার একটি শালের জন্য অস্ট্রেলিয়া হইতে ভাল পশমের সুতা আনিয়া দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। মিঃ কেসির স্যুটের জন্য কিছু ভাল খদ্দরের সুতা দিয়া গান্ধীজী নিশ্চয়ই এই প্রীতির ঋণ শোধ করিবেন বলিয়া দেশবাসী আশা করিতেছেন।

মেয়েদের জন্য পৃথকভাবে সভা আহ্বান করার প্রচেষ্টাকে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু সমর্থন করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, মেয়েরা যদি সব ব্যাপারে পুরুষদের চাইতে উন্নত হইয়া থাকেন তবে মেয়েদের সভাতে পুরুষদের জন্য একটু স্থান করিয়া



দেওয়ার সৌজন্যবোধ মেয়েদের থাকা উচিত ছিল। আমরা অবশ্য সভায় স্থান না পাওয়ায় খুব দুঃখিত হই নাই। ট্রামে-বাসের মহিলাদের সীটের পাশে একটু স্থান পাইলেই তাঁদের সৌজন্যবোধকে অভিনন্দন জানাইব।

* * * *

টরোণ্টোর মেয়রের সমাধিক্ষেত্রে নাকি একটি "তাজমহল" নির্মাণের ব্যবস্থা হইতেছে। খবরটি শুনিয়া বিশুখুড়ো বলিলেন, রবীন্দ্রনাথের অভাবে এই "তাজমহল" সম্বন্ধে আমিই একটি কবিতা লিখিয়া দিতে পারি। এই কথা বলিয়াই খুড়ো আবৃত্তি করিতে লাগিলেনঃ—

"এ কথা জানিতে তুমি মেয়র-প্রবর
'তাজ' আর হয় নাকো,
শিব গড়তে হয় সে বাঁদর।
তবু তব অন্তরের জ্বালা
পাগল করিয়া তোমা' খেলাইল
তাজ তাজ খেলা।"

খুড়ো আরও কত ছাইভস্ম বলিতে যাইতেছিলেন। বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে থামাইতে হইল।

* * * * *

ইংরেজী নূতন বৎসর আসিয়া পড়িল। নব বৎসরের পণ আমাদের কিছুই নাই, আছে শুধু প্রার্থনা। আর এই প্রার্থনাও ধনমানের জন্য নয়, ট্রামে-বাসে একটু বসবার জায়গা আর অবাধে একটুখানি রেশানের সংস্থানের জন্য মাত্র। আমাদের প্রার্থনায় যোগ দিয়া নিরীহ শ্যামলাল বলিল,—"যদি ঐ সঙ্গে ময়দানে একটা স্টেডিয়াম হইয়া যায় তাহা হইলে আর আমাদের প্রার্থনার কিছুই থাকে না।"

নাইরে পরিত্রাণ

শ্রীনিশাপতি মাঝি

জগতের মানুষ ধাপে ধাপে উঁচুতে উঠছে, কিন্তু বাঙলার হরিজনরা ধীরে ধীরে নীচে নামছে। তারা সেকালের আচার-ব্যবহারকেই আঁকড়ে ধরে রাখছে। যেন তারা আদিম মানুষেরই মতো বনে বিচরণ করতে চাইছে। তাই হরিজনদের অবনতির উদাহরণ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এতে হয়ত একদিন হরিজনদের কল্যাণ হবে, কিন্তু আজকের দিনে অবনতির কথা শুনে শুনে ঘোরতর অকল্যাণই হচ্ছে। হরিজনরা যে মানুষ এবং মানুষের মত জীবনধারণের অধিকার যে তাদের আছে, তা অনেকে জেনেও জানতে চান না। যদি হরিজনদের দারিদ্র্যের কথা দেশকর্মিগণ নিখুঁত ভাবে জানতেন, তা হলে নূতন কিছু গড়ার সঙ্গে সঙ্গে হরিজনদের পারিপার্শ্বিক জীবন নূতন ভাবে গড়ে উঠত।

সাধারণত অপরের খাদ্য, বস্ত্র, অলঙ্কার, ঘর-বাড়ি, ধন-দৌলত দেখে হরিজনদের চোখ টাটায়, নিজদিগকে অসভ্য বলে সভ্য সমাজে মাথা নত করে। তথাপি ধীরে ধীরে উন্নততর জীবনযাপন করতে চায় না। এমন কি দুঃখের ভারও লাঘব করতে অক্ষমতা জানায়। এই কারণে আত্মরক্ষার ও জীবনকে উপভোগ করবার আশা-আকাঙ্ক্ষা হরিজনদের মন থেকে মুছে গেছে। সব কাজেই হরিজনরা পিছনে থাকছে, এগিয়ে চলতে পারছে না। কল-কারখানা, যান-বাহন, কৃষি-শিল্পাদি কাজে হরিজনরা সাধারণত শক্তি অর্পণ করে, কিন্তু স্বাস্থ্য নষ্টকারী কীট-পতঙ্গ, মশা-মাছি ও জীবজন্তুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে তারা চায় না।

অভিভাবকের মৃত্যুর পর স্ত্রী-কন্যারা পথে পথে ভিক্ষা করে। মাতার মৃত্যুর সময় কন্যা অন্নের চিন্তায় চোখের জল ফেলবার অবসর পায় না। এরূপ মানসিক অবনতির কারণ কি? প্রধান কারণ—হরিজনরা গতরের খাটুনিকেই বড় করেছে। জন্মদিনের সময় মা ও বাবা দুটো শক্ত হাত কামনা করেন। হাত ধরে তাই মা-বাবা নবকুমারকে বুকে চেপে ধরেন। তাঁরা ছেলেমেয়ে পালন করেন তাঁদের কুকুরের মত অনুগত ভক্ত করবার জন্য। প্রত্যেকে নিজের নিজের ভাত-কাপড়ের উপায় অবলম্বন করে থাকেন। ছেলে গরু চড়ায়। মা ধান ভাঙে। বাবা চাষে মজুর খাটে। এক হাঁড়িতে ভাত রান্না হয়। বাপ-বেটায় একসঙ্গে আহার করেন। মা উচ্ছিষ্ট খেয়ে জীবনধারণ করেন। এখানে কারো মগজে সমাজ বলে, রাষ্ট্র বলে কোন ভাবনা নাই বললেই চলে। সবচেয়ে বড় ভাবনা ভাত আর কাপড়। রোগের সময় একটু ওষুধ পেলে ত ভাল, নতুবা জড়িবড়ি খেয়েই রোগ তাড়াবার কামনা করে।

বিবাহে, শ্রাদ্ধে, উৎসবে এবং অন্যান্য সামাজিকতায় হয়ত কিছু সময় ও শ্রমের মূল্য ব্যয় করতে হয়, কিন্তু সবাই জানে এ সবের মধ্যে কোন পবিত্রভাব নেই। যিনি পাড়ার মধ্যে সমাজপতি সেজে সমাজ সমাজ করে বেড়ান, তাঁকে অনেকে ভয় ভক্তি করে। কিন্তু তাঁর গোদা পায়ের লাথির মুরদ সবাই ধরে ফেলেছে। হুকা রক্ষা, হাঁড়ি রক্ষা ও জাতি রক্ষার জন্য তাই হরিজনপ্রধান আজ বিশেষ কিছু করতে পারছেন না। অন্ন ও বস্ত্র সমস্যায় কাতর প্রধানই যে-কোন লোকের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করছেন। বস্ত্রের জন্য পদতলে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। তাই গ্রামের হরিজনদের ডাক দিয়ে সমাজ উন্নতির উপদেশ দান করবার মত অবসর প্রধানের নাই বললেই চলে। হরিজন পল্লীর প্রাণ-কেন্দ্র এজন্য মৃতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট রয়েছে। দুপুরে, বিকেলে ও সন্ধ্যায় প্রধানের ঘরে হয়ত কেউ কেউ হাজির হন। কিন্তু কোন সৎ আলোচনা হয় না। অথচ একদিন হরিজনদের গড়ে তোলবার প্রধান কেন্দ্র ছিল প্রধানের গৃহ। জ্ঞান দানের জন্য পুরাতন পুস্তক পাঠ হত। গল্প আলাপ-আলোচনা চলত। কে চাষ করছে না, কে কাজ করছে না, কে মাটি কাটছে না, কে ছেলেমেয়েদের সময়মত খেতে দিচ্ছে না এসব কথা পরস্পরে অবসর সময়ে বলাবলি করত। যারা গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে চাইত তাদের ডাক পড়ত। রোগীর সেবা-যত্নের ব্যবস্থা প্রধান করতেন। দায়-বিপদে অভিভাবক হয়ে প্রধান অভয় দিতেন। জমিনদার হয়ে কৃষি-কাজের সময় টাকা-পয়সা, ধান-চাল সংগ্রহ করতেন। স্ত্রী-কন্যার উপর কেহ কু-নজর দিলে প্রধান হুঙ্কার দিয়ে পল্লী শত্রুদের দমন করতেন। শিশুকাল হতে ছেলেরা ধূর্ত এবং বদমাইস হতে পারত না। বাপ-দাদার কুলগত বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়ে প্রধান হরিজন পল্লীর সুখ ও শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখতেন।



"হাতটা সরিয়ে নে, ছোঁয়া যাবে!"

বর্তমানে চাকা বিপরীত দিকে ঘুরছে। হরিজন প্রধান ধনীদের তাঁবেদার হয়েছেন। যে কোন সূত্রে প্রধান মালিকের মনস্তুষ্টি করছেন। হরিজন নরনারীও প্রধানের খোসামোদী করে ভাত-কাপড়ের এবং সামান্য সুখের কামনা করে থাকেন। এ অবস্থায় পল্লীর গোঁয়ার-গোবিন্দ মাতাল কাণ্ডজ্ঞানহীন হরিজন প্রধানদের পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করে লাভ নাই। দেশকর্মীদেরই দেশকে পুনর্গঠনের জন্য হরিজন পল্লীতে পল্লীতে অবস্থান করতে হবে। তবেই

আবার হরিজন পল্লীতে নূতন ভাবে শিক্ষা কেন্দ্র গড়তে পারবে। তাতে সংবাদপত্র পাঠের দ্বারা দুনিয়ায় যাবতীয় বিষয়ে সহজ সরল ভাবে বোঝাপড়া চলতে পারে। অযথা বহু কেতাব ও বিষয়বস্তু উত্থাপন করে বয়স্কদের বিরক্ত করবার প্রয়োজন নাই। শরীর পালনের যদি ডাক্তার এবং কৃষিশিক্ষার জন্য কৃষিবিদ এবং গৃহ-শিল্পের উন্নতির জন্য যদি কোন শিল্পী মাঝে মাঝে পল্লীতে যান, তাহলে ত কথাই নাই। অবশ্য এসব ব্যক্তি পল্লীতে গিয়ে যদি বড় বড় কথা বলেন ভুল করবেন। ঘরে ঘরে উপস্থিত হয়ে দু'চারটি কথা বলে এক একটি বিষয়ে এক এক সময়ে শিক্ষাদান করলে এ বিষয়ে হরিজনদের সহযোগী হতে পারবেন। চাষের সময় ধান চাষের, ভাল বীজের কথা কৃষিবিদ উপদেশ দিবেন। ম্যালেরিয়ার পূর্বে ডাক্তার প্রতিবিধানের কথা সরলভাবে বোঝাবেন। শিল্পী অবসর সময়ে কৃষিজীবীদের হাতের অনেক কাজ শিখাবেন। সেইরূপ সমাজ-পতি ও রাষ্ট্রপতির উপদেশ সকল প্রতিদিন সংবাদপত্র পাঠ করে গ্রামের কর্মী গ্রামের সকলকে বুঝিয়ে দিবেন। তবেই হরিজনদের মধ্যে কর্মীদল গঠিত হবে। তাঁরা নিজের কাজ নিজেরাই করতে পারবেন। শ্রীনিকেতন হরিজন সেবাসমিতি ১৯৩০ সালে স্থাপিত হয়। আচার্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ কাজের ভার গ্রহণ করেন। তিনি অবশ্য বহু পূর্বেই এ কাজের গোড়াপত্তন শ্রীনিকেতনে করেছিলেন। কর্মিগণ গ্রামে গ্রামে অবস্থান করে অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে নানা তথ্যও সংগ্রহ করেন। যেমন—(১) স্পৃশ্যেরা অস্পৃশ্যদের স্পর্শ করেন না। কোন রকমে ঠেকাঠেকি হলে স্নান করে বা গঙ্গাজল নিয়ে পবিত্র হন। (২) রান্নাঘরে কিংবা আহারের স্থানে অস্পৃশ্যেরা যেতে পায় না। যদি কোন কারণে রান্নাঘরে যেয়ে পড়ে, তাহলে গোময় দিয়ে স্থানটি পবিত্র করা হয়। (৩) স্পৃশ্যদের খাদ্যপাত্রে অস্পৃশ্যদের খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হয় না। যদি কোন কারণে অস্পৃশ্যেরা পাত্রটি ব্যবহার করে, উত্তমরূপে মেজেঘসে ধৌত করে রৌদ্রে শুকাতে দিবার ব্যবস্থা অস্পৃশ্যদের করতে হয়। (৪) শুষ্ক কাপড় অস্পৃশ্যেরা স্পর্শ করলে জলে ডুবিয়ে দিতে হয়। ধোবার পরিষ্কার করা কাপড় গঙ্গাজল দ্বারা পবিত্র হয়ে থাকে। (৫) জলাশয়ের এক ঘাটে স্পৃশ্যেরা ছিটা জল লাগার ভয়ে স্নান করেন না। দৈবাৎ অস্পৃশ্যের জল লাগলে পুনরায় স্নান করে স্পৃশ্যেরা পবিত্র হয়ে থাকেন। (৬) নল-কূপে জল অস্পৃশ্যেরা অবাধে নিতে পায় না। সকলের শেষে জল নেয়। স্পৃশ্যেরা অন্য স্থান হতে জল এনে নলকূপের নলটি ধৌত করে জল নেন। (৭) নাপিতে অস্পৃশ্যদের চুল কাটে না। ধোবায় কাপড় পরিষ্কার করে দেয় না। অথচ নাপিত ও ধোবা মুসলমান ও খৃষ্টানদের চুল কাটে ও কাপড় পরিষ্কার করে থাকে। (৮) হরিজনরা মন্দিরে প্রবেশ করতে পায় না। এমন কি, পূজার ভোগ অস্পৃশ্যদের দৃষ্টিতে অপবিত্র হবার আশঙ্কা আছে। এজন্য পূজার উপকরণাদি সুকৌশলে আড়ালে রক্ষা করা হয়। কোন কোন সর্বজনীন ও বারোয়ারী পূজাতেও অস্পৃশ্যেরা পুষ্পাঞ্জলি দিতে পায় না। (৯) অস্পৃশ্যেরা মিষ্টান্নের দোকানে আসন ও জলপাত্র পায় না। উপর হতে মুখে জল ময়রা ঢেলে দেন। (১০) হোটেলে সমান মূল্য দিয়েও হরিজনরা সমান ব্যবহার পায় না। (১১) অস্পৃশ্যদের দেবালয়ে বা



"আমি নাপিত হয়ে ডোমের চুল কাটবো!"



"ছুঁবি লো! ছুঁবি!"

ঠাকুরতলায় স্পৃশ্যেরা সহজে মাথা নত করেন না। নিতান্ত দায়ে পড়েই রোগ মুক্তির কামনায় কেউ কেউ হাজির হন। (১২) অস্পৃশ্যেরা ধর্মপুস্তক পাঠ করলে স্পৃশ্যদের গাত্র জ্বালা উপস্থিত হয়। কেহ কেহ অস্পৃশ্যদের নিকট গীতা বা ধর্মগ্রন্থ শ্রবণ করতে হলে অবিলম্বে স্থান ত্যাগ করেন। (১৩) স্পৃশ্য ব্যক্তি যেহেতু তিনি স্পৃশ্য, সেইহেতু প্রপিতামহের বয়সের অস্পৃশ্যদেরও নাম ধরে ডাক দেন। পদবী ব্যবহারেও বিরক্তভাব পোষণ করেন। (১৪) জুতো পায়ে দিলে এবং ভাল কাপড়াদি পরলে অনেকের গাত্র দাহ হয়ে থাকে। (১৫) বাড়িতে গেলে আসন দিয়ে অভ্যর্থনা করতে শঙ্কা বোধ করেন এবং শিক্ষিত হরিজনদের উপরেও অনেকে একইরূপ ব্যবহার করেন।

হিন্দু জাতির এই কলঙ্ক ও অভিশাপ দূরীকরণের জন্য আর বেশী কিছু উল্লেখ করবার আবশ্যকতা নেই। দেশকর্মিগণ আজ পর্যন্ত অনেক কিছু করেছেন। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় শুধু রাজনীতিক উদ্দেশ্য নিয়ে যাঁরা হরিজনদের সেবায় লিপ্ত হয়েছিলেন, তাঁরা আজ দূরে অবস্থান করছেন। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য হরিজনদের সেবার কাজ যেমন করণীয়, সেইরূপ দেশকে প্রকৃতভাবে স্বাধীন করবার জন্যও যে হরিজনদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির প্রয়োজন, তাহা কি তাঁরা বুঝেন না? খুব বোঝেন। দেশবাসী তো চোখের সামনেই হরিজনদের নিঃসঙ্গভাবে অবমানিত জীবন-যাপন করতে দেখছেন। কবিগুরু রবীন্দ্র-নাথ এজন্যই বহু পূর্বে দেশবাসীকে আহ্বান করে লিখেছিলেন—"অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।" এতদিন দেশে বাড়তি ফসল ছিল অন্নকে ভাগ করে খাবার কোন বাধা ছিল না। আজ অন্ন সংকট উপস্থিত এবং বস্ত্রের অবস্থা আরো শোচনীয়। আজ পরস্পরের মধ্যে অন্নবস্ত্র সমানভাবে বণ্টন না করলে ভারতের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং সভ্যতার কোন মূল্য থাকে না। এই কারণে রবীন্দ্রনাথের অমর বাণী হরিজনরা বার বার স্মরণ করতে বাধ্য হচ্ছে—"ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্ন পান।" নানা অজুহাতে হরিজনদের প্রতি শিক্ষালয়ে এবং সরকারী বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে ঘোরতর অবিচার করা হয়ে থাকে। সমান চাকুরী করে, উচ্চ বেতন লাভ করেও যদি আভি-জাত্যের অজুহাতে বাসগৃহাদি হরিজনরা না পায়, তা হ'লে সামাজিক নিমন্ত্রণ ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না। উকীল ও মোক্তার হয়েও হরিজনরা বার লাইব্রেরীতে ভাল ব্যবহার পান না। সংরক্ষণশীলদের নিকট হতে নানাভাবে আত্মসম্মানে আঘাত পেয়ে থাকেন। বিচারক যদি চণ্ডাল হন, তাহলে বর্ণ হিন্দু উকীল মোক্তারের মাথায় বাজ পড়ে। অতএব "অশিক্ষার জন্যই অস্পৃশ্যতা জীবিত" একথা ঠিক নয়। শিক্ষার ধারা যদি না বদলায়, তাহলে বর্তমান শিক্ষা বিস্তারের দ্বারাও অস্পৃশ্যতা দূর হবার নয়।

বর্ণ হিন্দুরা হরিজনদের ছোঁবে না, ধোবা নাপিতেরা তাদের কোন কাজ করবে না। পাটুনী তাদের নায়ে তুলবে না—এমন সর্বপ্রকারে অস্পৃশ্য হয়ে তারা মানব সমাজে কতদিন চলবে? এ-সবের বিরুদ্ধে কি তাদের সুপ্ত মানবতা একদিন জেগে উঠবে না? মৃতপ্রায় হিন্দু সমাজ তখন তাদের এ জাগরণ ঠেকাবেন কি দিয়ে? তাঁরা যদি এখনো সমাজের অস্পৃশ্যতারূপ আবর্জনা পরিষ্কারে উদ্যোগী না হন, তা হলে পরিত্রাণের কোন উপায়ই একদিন থাকবে না। সে দিনের কথা মনে করেই কবিগুরু বলে রাখছেন,—"নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ।"

দেশের কথা

(৩রা পৌষ—৯ই পৌষ)

বাঙলায় মহাত্মাজী—পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সফর—রামেশ্বরের মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত—নির্বাচন—খাদ্যের অবস্থা।

বাঙলায় মহাত্মাজী—মহাত্মা গান্ধী রবীন্দ্রনাথের কবি-কল্পনার মূর্ত বিকাশ শান্তিনিকেতনে গিয়াছিলেন। তথায় গমনের পূর্বে গত ১৭ই ডিসেম্বর তিনি সুভাষচন্দ্র বসুর ভবনে গমন করিয়াছিলেন। সরকার সুভাষচন্দ্র তাঁহাদিগের আদালতে বিচার জন্য উপস্থিত না হওয়ায় তাঁহার বাসভবন নিলামে বিক্রয়ের চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু সফলমনোরথ হইতে পারেন নাই। নেতাজী যে কক্ষে অধ্যয়ন করিতেন, তিনি তথায় গমন করেন; সে কক্ষ সুভাষচন্দ্র যেভাবে রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেই ভাবেই রাখা হইয়াছে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কন্যা শ্রীমতী অপর্ণা দেবীর ভবনে মহাত্মাজী দেশবন্ধুর বিধবা পত্নী শ্রীমতী বাসন্তীদেবীর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

১৮ই ডিসেম্বর সোদপুর হইতে যাত্রা করিয়া মহাত্মাজী সেই দিন বোলপুরে উপনীত হন। তিনি তথায় বলেন, "শান্তিনিকেতন" তাঁহার পক্ষে শান্তিলাভের স্থান —দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে আসিয়া তিনি যখন "শান্তিনিকেতনে" আশ্রয়লাভ করেন—তখন তিনি শান্তিলাভের জন্য তথায় আসিয়াছিলেন। তদবধি উহা তাঁহার পক্ষে তীর্থস্থান হইয়া আছে।

১৯শে মহাত্মাজী "শান্তিনিকেতনে" দীনবন্ধু এণ্ডরুজের স্মৃতিরক্ষার্থ পরিকল্পিত আরোগ্যশালার ভিত্তি স্থাপন করিবার সময় বলেন, জীবন ও মৃত্যু একই মুদ্রার দুই দিক। সেইজন্য তিনি রবীন্দ্রনাথের ও এণ্ডরুজের মৃত্যুতে শোকানুভব করেন না।

১৮ই ডিসেম্বর "শান্তিনিকেতনে" সমবেত প্রার্থনাকালে তিনি বলেন—

আজ বাঙলা অনলে দগ্ধ হইতেছে। ভারতবর্ষের প্রদেশসমূহের মধ্যে বাঙলা যত কষ্ট সহ্য করিয়াছে, তত আর কোন প্রদেশ করে নাই। বাঙলার করুণ আর্তনাদ তিনি কারাগারে শুনিতে পাইয়াছিলেন এবং তদবধি—কিরূপে যথাসম্ভব শীঘ্র বাঙলায় আসিতে পারিবেন, ভগবানের নিকট সেই প্রার্থনা করিয়া আসিয়াছেন। তিনি বাঙলার লক্ষ লক্ষ লোকের সেবার জন্য—তাহাদিগের বেদনার লাঘব করিতে বাঙলায় আসিয়াছেন। সেইজন্য তিনি "শান্তিনিকেতনে" অধিক সময় যাপন করিতে পারিবেন না।

২০শে ডিসেম্বর রাত্রিকালে তিনি সোদপুরে ফিরিয়া আসেন।

"শান্তিনিকেতনে" রবীন্দ্র স্মৃতি-ভাণ্ডার সম্বন্ধে মহাত্মাজী ভাণ্ডারের সম্পাদক শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদারের সহিত আলোচনা করেন এবং অবগত হন—অধিকাংশ অর্থই সামান্য দানে সংগৃহীত হইয়াছে।

কলিকাতায় ২ দিন শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসু মহাত্মাজীর সহিত বর্তমান রাজনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং বাঙলার গভর্নর মিঃ কেসি আবার আলোচনা করেন।

বিলাতের 'টাইমস' পত্রের মেলবোর্নস্থিত সংবাদদাতা জানাইয়াছেন,—বাঙলায় সমবায় সমিতিগুলিতে ও উটজশিল্পে সূতা প্রস্তুত করিয়া বস্ত্র বয়ন জন্য অস্ট্রেলিয়া হইতে কিছু পশম পাঠাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। মহাত্মাজীর মোটা পশমী চাদর লক্ষ্য করিয়া মিঃ কেসি তাঁহার সম্বন্ধে মন্তব্য করিলে মহাত্মাজী মোটা চাদরের সমর্থন করিলে মিঃ কেসি বলেন, তিনি অস্ট্রেলিয়ার ভাল ভেড়ার লোম পাইলে ভাল হয়। তিনি বলেন, তিনি তাহা আনাইয়া দিবেন এবং মহাত্মাজীর শিষ্যরা তাহা হইতে ভাল চাদর করিয়া দিতে চাহিবেন। মিঃ কেসি সেইজন্য অস্ট্রেলিয়া হইতে ভেড়ার লোম পাঠাইতে নির্দেশ দেন। মিঃ কেসির আশা—মহাত্মাজী বাঙলা ত্যাগ করিবার পূর্বেই ঐ লোম আসিয়া উপনীত হইবে এবং তিনি মহাত্মাজীকে তাহা উপহার দিতে পারিবেন।

পণ্ডিত জওহরলালের সফর—কলিকাতা হইয়া পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আসামে গমন করিয়াছিলেন। তিনি যেরূপ ক্ষিপ্রতা সহকারে আসামের নানাকেন্দ্রে যাইয়া বক্তৃতা করিয়া আসিয়াছেন, তাহা অধিক লোকের পক্ষে সম্ভব নহে। তিনি যে স্থানেই গমন করিয়াছেন, সেই স্থানেই অসাধারণ উৎসাহ লক্ষিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, তিনি দেখিয়াছেন, আসাম উৎসাহে উৎসাহিত—জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত। প্রত্যাবর্তন পথে নানা স্থানে তাঁহাকে লোক যেভাবে সম্বর্ধিত করিয়াছিল, তাহাতে ট্রেন কলিকাতায় পৌঁছিতে ২ ঘণ্টা বিলম্ব ঘটে। রেল ষ্টেশন হইতেই তিনি দেশবন্ধু পার্কে যাইয়া বিরাট জনতার নিকট বক্তৃতা করেন এবং পরদিন শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সভায় বক্তৃতা করেন। পরদিন নানা স্থানে নানা অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া শান্তিনিকেতনে যাত্রা করেন।

তথায় তিনি ছাত্রদিগকে ২৩শে ডিসেম্বর বলেন—

অস্বাভাবিক জীবনযাপনই তাঁহার অদৃষ্টের লিখন। তিনি ইতস্তত বিচলিত হইয়াছেন, কিন্তু শান্তিনিকেতন তাঁহার পক্ষে শান্তির স্থান—রাজনীতিক মরুভূমিতে মরূদ্যান।

তিনি বলেন, নানাস্থানে বিরাট বিরাট গৃহে—প্রতীচ্য পদ্ধতির অনুকরণে যে সকল সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ হয়, সে সকল অপেক্ষা শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে তাহাদিগকে উপদেশ দানই অধিক বাঞ্ছনীয়।

ঐ দিনই বাঙলা হইতে বিদায়কালে তিনি বর্ধমানে বলেন, এবার ব্যবস্থা পরিষদে নির্বাচন বৃটিশ সরকারের সহিত কংগ্রেসের সংগ্রাম। যদি এই নির্বাচনের পরেও বৃটিশ সরকার কংগ্রেসের সহিত সন্তোষজনক মীমাংসা না করেন, তবে কংগ্রেসকে গ্রামে গ্রামে আন্দোলন প্রবর্তিত করিতে হইবে। বাঙলার লোককে তিনি সেই সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকিতে উপদেশ দিয়াছেন। বাঙলার লোক যেন উৎসাহ ও উদ্যমের অপব্যয় না করে, পরন্তু সেই সংগ্রামের জন্য শক্তি সঞ্চিত ও সঙ্ঘবদ্ধ করে। তাহারাই কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধি করিবে। যেন প্রতি গৃহে কংগ্রেসের বাণী প্রচারিত হয়। গত ৩ বৎসরে ২ লক্ষ লোককে কারাগারে প্রেরণ করা হইয়াছে। বড়লাট, প্রাদেশিক গভর্নরগণ ও ভারতসচিব কংগ্রেসকে ধ্বংস করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। কংগ্রেস যে বৃটিশকে ভারত ত্যাগ করিয়া যাইতে বলিয়াছেন, সেজন্য কংগ্রেসকে দুঃখ প্রকাশে বাধ্য করাই তাঁহাদিগের কার্যের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহাদিগের সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই—কংগ্রেস নত হয় নাই—দেশের লোকের শক্তি শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

উপসংহারে তিনি বলেন—

দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধজনিত কারণে ৪৫ লক্ষ লোক বাঙলায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে বটে, কিন্তু গত ১৪ দিনে তিনি বাঙলায় যে উৎসাহের পরিচয় পাইয়াছেন, তাহাতে তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন। বাঙলায় যে দুঃসহ দুর্দশা ঘটিয়াছে, তাহা সমগ্র ভারতের দুর্দশা।

পণ্ডিতজী বলিয়াছেন—বাঙলার লক্ষ লক্ষ নরনারীর মৃত্যুর জন্য সরকারই দায়ী।

নির্বাচন—কেন্দ্রী ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচনে কংগ্রেসেরই জয় হইয়াছে। বাঙলায় যেমন অ-মুসলমান কেন্দ্রসমূহে কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী ব্যতীত আর কেহই নির্বাচিত হইতে পারেন নাই, অন্য অনেক স্থানেও তেমনই হইয়াছে।

বাঙলায় নির্বাচন যদি স্বাধীনভাবে হইতে পারিত, তবে যে মুসলমান কেন্দ্রেও অন্তত ২।৩জন কংগ্রেসপ্রার্থী নির্বাচিত হইতেন, তাহা মনে করিবার কারণ আছে। কিন্তু বাঙলায় ঐ সকল কেন্দ্রে নির্বাচনে মুসলিম লীগের গুণ্ডামীর পরিচয় সকলেই পাইয়াছেন। বড়লাটকেও তাহা জানান হইয়াছে। বাঙলার গভর্নর বলিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার অধীনস্থ কর্মচারীদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন, তাঁহারা যেন গুণ্ডামী প্রভৃতি অনাচারের প্রতীকার করেন। সে নির্দেশ যে পালিত হয় নাই, তাহা পরিলক্ষিত হইয়াছে।

মৌলবী ফজলুল হক আবার মিস্টার কেসীকে সে বিষয় জানাইয়াছেন এবং তিনি আবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন—তিনি ব্যবস্থা করিবেন। সে প্রতিশ্রুতি কতদূর নির্ভর-যোগ্য তাহা কে বলিবে? তবে প্রাদেশিক নির্বাচনের পূর্বেই তিনি বাঙলা ত্যাগ করিয়া যাইবেন। সুতরাং তখন আর তাঁহার কিছু করিবার থাকিবে না।

বাঙলার লোককে আগামী নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। বাঙলা যেন তাহার কংগ্রেস প্রীতিতে অন্য কোন প্রদেশের কাছে পরাভব স্বীকার না করে—ইহাই পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু প্রমুখ নেতৃগণের উপদেশ।

রামেশ্বরের মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত—

গত ২১শে নবেম্বর পুলিশের গুলীতে নিহত রামেশ্বরের মৃত্যু সম্বন্ধে করোনারের তদন্তে জানা গিয়াছে—পুলিশ জনতা ছত্রভঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে গুলী করিলে যাহা করিত, তাহা করে নাই, কারণ গুলী রামেশ্বরের কপালে লাগিয়া তাহার মৃত্যু ঘটায়।

সরকারের পক্ষে যে উকীল ছিলেন, তিনি করোনারকে আগ্নেয়াস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট দিতে অস্বীকার করিয়াছেন। তাহা নাকি অপ্রকাশ্য। অথচ করোনার দেখাইয়াছেন, আইনে তাঁহার যে অধিকার আছে, তাহাতে, মৃত্যু কাহারও অন্যায় ও বে-আইনী কার্যের ফল কিনা, তাহা বিবেচনা করিবার অধিকার তাঁহার আছে। উকীল সে অধিকার প্রত্যক্ষভাবে অস্বীকার করিতে না পারিলেও পরোক্ষভাবে তাহাই করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

তদন্ত মুলতুবী আছে।

যদি আবশ্যক রিপোর্ট প্রভৃতি সরকার দাখিল না করেন, তবে যে তদন্ত প্রহসন মাত্র হইবে তাহা বলা বাহুল্য। এই কথা করোনারও বলিয়াছেন।

মহাত্মাজীর পরিকল্পনা—গত ২৩শে ডিসেম্বর এলাহাবাদ হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, কংগ্রেসকে কিরূপে অধিক সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান করা যায়, মহাত্মাজী সে সম্বন্ধে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিকে তাঁহার পরিকল্পনা প্রেরণ করিয়াছেন। প্রকাশ, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কোন কোন সদস্যও অনুরূপ প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছেন।

মহাত্মাজীর পরিকল্পনা অবগত হইবার জন্য সমগ্র দেশ উদ্গ্রীব হইয়া থাকিবে।

খাদ্যের অবস্থা—বিলাতে পার্লামেণ্টে সহকারী ভারত সচিব মিস্টার আর্থার হেণ্ডারসন এদেশে খাদ্যের অবস্থা সম্বন্ধে এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন—

ভারতে খাদ্যদ্রব্যের অবস্থায় নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই। বিদেশ হইতে শস্য আমদানী করিতে হইবে। যদি তাহা হয়, তবে—সরকার যে সকল ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিয়াছেন, সে সকল বহাল রাখিলে বাঙলায় বা অন্য কোন প্রদেশে এবার আর দুর্ভিক্ষ হইতে পারিবে না।

তবে কি সরকারের অধিক খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন করিবার জন্য আবেদন ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে?

সহকারী ভারত সচিব বলিয়াছেন—চাউলের দাম অল্পে অল্পে হইলেও স্থির-ভাবে চলিতেছে। তবুও বাঙলায় লোকের আবশ্যক খাদ্যদ্রব্যের অভাব তাহার কারণ, বাঙলার সাড়ে ৬ কোটি লোকের অহার্য বাঙলায় উৎপন্ন হয় না—বাহির হইতে চাউল আনিতেও হয়। কিন্তু গত কয় বৎসরের "অধিক খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন করার" আন্দোলনে যে অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে, তাহা অপব্যয়ই হইয়াছে কিনা, তাহা তিনি বলেন নাই।

ধর্মঘটের জন্য ১৪ দিনের নোটিশ

ধর্মঘট করিতে হইলে যে ১৪ দিন পূর্বে তাহা জানাইতে হয়, ভারতরক্ষা নিয়মের সেই বিধানের আয়ুষ্কাল শেষ হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সেই ব্যবস্থা পুনরায় বহাল করা হইল। কারণ কেন্দ্রী সরকারের বিধান, যুদ্ধ শেষ হইলেও যুদ্ধজনিত অস্বাভাবিক অবস্থা হইতে স্বাভাবিক অবস্থার আগমন পর্যন্ত সেই নিয়ম রাখা প্রয়োজন। সেইজন্য গত ১৯শে ডিসেম্বর সেই নিয়মের পুনঃ প্রবর্তন করা হইয়াছে।

"ভারতীয় জাতীয় সেনা দলে"

মুসলমান নারী—

মুসলিম লীগের মুখপত্র 'ডন' বলিয়াছেন—কোন মুসলমান নারী "ভারতীয় জাতীয় সেনা দলের" রাণী ঝান্সী দলে যোগ দেন নাই। কিন্তু সে কথা মিথ্যা। কারণ দেখা গিয়াছে—দিল্লী দুর্গে আবদ্ধ একজন মুসলমান সেনানায়কের পত্নী সেই দলে ছিলেন এবং আর একজন মুসলমান নায়কের দুই কন্যাও ঐ দলে ছিলেন।

এইরূপ মিথ্যা প্রচারের উদ্দেশ্য কি তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

কলিকাতা কর্পোরেশন ও বাঙলা সরকার—

বাঙলা সরকার কয় মাস পূর্বে কলিকাতা কর্পোরেশনকে কতকগুলি কাজ করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। এখন তাঁহারা বলিতেছেন, কর্পোরেশন যথাসম্ভব তৎপরতা সহকারে সে সকল নির্দেশ পালন করেন নাই—ত্রুটি করিয়াছেন। কর্পোরেশনের সভায় অধিকাংশ কাউন্সিলারের মতে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহার স্থূল কথা—কর্পোরেশনের যে প্রাপ্য বাঙলা সরকার অন্যায়রূপে দিতেছেন না, তাহা না পাইলে কর্পোরেশনের পক্ষেও সকল কাজ করা সম্ভব নহে।

কলিকাতা কর্পোরেশন ও ট্রাম—

কলিকাতা কর্পোরেশন যে মূল্য দিয়া কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানীর স্বত্ব ও স্বামিত্ব কিনিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কোম্পানী তাহা উপযুক্ত নহে বলায় এখন বিষয়টি বিচারাধীন হইবে। সুতরাং এখন আর কর্পোরেশনের পক্ষে ট্রাম কোম্পানীর স্বত্ব স্বামিত্ব ক্রয় করা হইল না।

প্র-না-বি-র সংগে ইণ্টারভিউ

প্র-না বি থাকেন সাঁওতাল পরগণার ছোট একটি শহরে। সেখানে তাঁর ছোট একটি বাড়ি আছে। বিচিত্র গঠনের এই বাড়িটি। বাড়ির কম্পাউণ্ড প্রকাণ্ড, চারদিকে আম, শাল, মহুয়ার গাছ; শিউলি, স্থলপদ্ম; রক্তকরবী; জবার গাছও অনেক। মাঝখানে অনেকটা পরিষ্কার জায়গা। সেখানে বাড়িটি। আগাগোড়াই কাঠের তৈয়ারী। এই কাঠের বাড়িখানা এমনভাবে তৈরি, যাতে যখন যেদিকে সূর্য থাকে সেদিকে ঘোরানো যায়। এইজন্যই বাড়িটির নাম সূর্যমুখী। দুদিকে ছোট ছোট দুটি ঘর; একটাতে প্র-না-বি'র পড়বার জায়গা, আর একটাতে বসবার এবং বিশ্রামের স্থান। মাঝখানের বড় হলটার কাঠের দেয়ালে কতকগুলি বন্দুক টাঙানো। দেয়াল এবং মেঝের প্রায় সবটাই পশুচর্মে আবৃত। প্র-না-বি'কে সবাই লেখক এবং বিদূষক বলিয়াই জানে। কেহই জানে না যে, তিনি একজন বড় শিকারী। আমিও জানিতাম না।

সেদিন আমি একজন আমেরিকান বন্ধুর সংগে প্র-না-বি'কে দেখিবার জন্য গিয়া উপস্থিত হইলাম। এই আমেরিকান বন্ধুটি যুদ্ধের আগে ছিলেন আমেরিকার কোন এক কলেজের অধ্যাপক। যুদ্ধ বাধিলে কয়েক বছর তাঁর দেশে-বিদেশে বনে-পাহাড়ে ঘুরিয়া কাটে। শেষের দিকে কিছুকাল হইতে কলিকাতাতেই আছেন। এখন তাঁর দেশে ফিরিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এদেশ হইতে বিদায় লইবার আগে তিনি এখানকার বিখ্যাত ব্যক্তিদের সংগে একবার দেখাসাক্ষাৎ করিয়া যাইতে চান। দেশে গিয়া তিনি "My India" নামে একখানি বই লিখিবেন, তারই উপকরণ সংগ্রহ করিতেছেন। আমার সংগে প্র-না-বি'র পরিচয় আছে জানিয়া তিনি আমাকে ধরিয়াছেন। তাঁহাকে লইয়া আমি আজ প্র-না-বি'র কাছে উপস্থিত হইলাম।

প্র-না-বি'র সংগে আমার এক সময়ে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল বটে; কিন্তু তারপরে বহুকাল দেখাসাক্ষাৎ নাই। তখন তিনি থাকিতেন কলিকাতায়। সেদিনকার প্র-না-বি-কে লেখক বলিয়াই জানিতাম—এখন তাঁহার শিকারের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইলাম। কিন্তু প্র-না-বি'র সম্বন্ধে বিস্ময়টা বাহুল্য। তিনি কি এবং কি নহেন, কি করিয়াছেন এবং কি করিতে পারেন—তাহার সম্বন্ধে শেষ কথা জোর করিয়া বলা যায় না।

আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া মাঝখানের হলঘরটাতে বসিলেন। একটা

প্র-...লার কথা

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

'স্পিপ্রং' -

বাড়িটা•া যে অনির্বাপিত অগ্নিতে আজও আরামপ্রত্তছে, তাহা একাধিক; তবে সবই গেল। যারা প্রযুক্ত।,

আমি বাঙলা যত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, বলিলাম—ভবর্ষের আর কোন প্রদেশই জানতাম না। স্বাদ হিন্দ ফৌজের বিচারে

প্র-না-বি হদ্—বাঙালী সুভাষচন্দ্র বসু আমি বরাবর্বলে—বিমান হইতে আক্রমণে শিকার করি, অব্রত হইত, আর তিনি শিকার। তদ্ক্ষের সংবাদ পাইয়া ব্রহ্ম পরিচয় জানে না-উল পাঠাইবার প্রস্তাবও আমি মানুষ-শিকার; সরকার সে প্রস্তাব কেবল পশুকেই মার্কিন।

তারপরে একটু নাস্থানে অনেককে প্রত্যেক লেখকের পক্ষেকরা হইয়াছে—বহু রাখা দরকার। তাতে অ এই সকল কারণে থাকে। অবশ্য প্রত্যেক ড চেষ্টায় আসামে হয়ে উঠবে—এমন আশা কক রেল স্টেশনে,

তারপরে আমেরিকান ব বৃক্ষতলে—পথে করিয়া বলিলেন—পশ্চিমেছল। যাহারা শিকারটা খুব বোঝে। পা পাইয়াছিল; জানোয়ার যতই কমে আসছে—অধিক কষ্ট-করে তারা সেই অভাব পূষিয়ে দুঃখের যে

আমেরিকান বন্ধুটি বলিলেইয়াছিল, আমাদের দেশের কোন বড় লেখককে হয়—বলে জানি না। এবারে দেশে ফিধর্মের তারা শিকার অভ্যাস করে, তার করাও করবো। দ্বারা

প্র-না-বি বলিলেন—শিকার করাটা কছে, নয়। ওর 'ফিলজফিটা' ধরাই কঠিনর ফিলজফির সংগে সংযুক্ত না হ'লে শিকারটা বর্বরতা ছাড়া আর কিছু নয়।

ক্রমে সাহিত্যের প্রসংগ উঠিয়া পড়িল। আমেরিকান অধ্যাপকটি প্রশ্ন তুলিলেন—বর্তমানে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচিত না হওয়ার কারণ কি? দান্তে-সেক্সপীয়র-গোটের ভাব-বংশ কি একবারেই লুপ্ত হইল? এমন কেন হয়?

প্র-না-বি বলিলেন—কথাটা সর্বাংশে সত্য নয়। আমাদের রবীন্দ্রনাথ ও'দেরই সমকক্ষ। তবে একথাও সত্য যে, তিনিই বোধ করি পৃথিবীর শেষ মহাকবি।

ইহা শুনিয়া বন্ধুটি বলিলেন—তবে তো আপনি আমার কথাই সমর্থন করছেন।

—করছি বইকি।

—এর কারণ কি?

প্র-না-বি সুরু করিলেন—মানুষের

করার অভিযোগ উপস্থাপিত করিতেছে, তাহা এই প্রসংগে উল্লেখযোগ্য।

এই অনাচার যে দুর্ভিক্ষের সময় মানুষকে অধিক বিপন্ন করিয়াছিল এবং বহুলোকের পক্ষে নিবার্য মৃত্যু অনিবার্য করিয়াছিল, তাহাও জানা গিয়াছে। বাঙলার দুর্ভিক্ষ মানুষের সৃষ্ট—পণ্যের বিমুখতাজনিত নহে। সেই দুর্ভিক্ষের কোন রাজনীতিক কারণ ছিল কিনা, তাহা বলা সম্ভব নহে—অন্তত এখনও সম্ভব নহে। কিন্তু দেখা গিয়াছে, যখন দুর্ভিক্ষে কলিকাতার রাজপথেও অনাহারে লোক মরিয়া পড়িয়া থাকিতেছে তখনও তাঁহার শাসন পরিষদের একাধিক ভূতপূর্ব সদস্যের পরামর্শও তৎকালীন বড়লাটকে একবার বাঙলায় আনিতে পারে নাই; দেখা গিয়াছে, বাঙলায় সচিবগণ যখন হীন মিথ্যার আশ্রয় লইয়া সত্য গোপন করিতে ব্যগ্র ছিলেন—বলিতেছিলেন, অভাব নাই, তখন ভারত সরকারও সেই কার্যে সাহায্য করিতে-ছিলেন—বাঙলা সরকার কলিকাতার হাসপাতালসমূহে দুর্গত মৃতের যে হিসাব প্রকাশ করিতেন, তাহাও বিদেশে পাঠান নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন; দেখা গিয়াছে, বাঙলার সচিবগণ পাঞ্জাব হইতে বাঙলার নিরন্নদিগের জন্য ক্রীত গম বাঙলায় অধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়া সরকারকে লাভবান করিয়াছেন—আর কেহ লাভবান হইয়াছেন কিনা, তাহা বলা নিরাপদ নহে—হয়ত সম্ভবও নহে; দেখা গিয়াছে, জলপথে পাঞ্জাব হইতে বাঙলায় গম ও আটা আনিবার জন্য যে ২খানি জাহাজে মাল বোঝাই করা হইয়াছিল, সে ২খানির কল অচল হয়; দেখা গিয়াছে, রাখিবার ত্রুটিতে লক্ষ লক্ষ টাকার চাউল ও আটা বিকৃত হইয়া মানুষের আহারের অযোগ্য হইয়াছে—আর লক্ষ লক্ষ লোক না খাইয়া মরিয়াছে। ইহাতে লোকের মনে সন্দেহের উদ্ভব অসম্ভব বলা যায় না। সরকার যে দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই কমিশনের সিদ্ধান্ত—দুর্ভিক্ষ নিবারণ করা যাইত। যদি তাহাই হয় (এবং সরকার সে কথার প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই) তবে যাহারা নিবার্য সর্বনাশকে দুর্নিবার্য করিয়াছিল, তাহাদিগকে কি জন্য এবংত করা হয় নাই?

কাব্য যাহাই হউক, দুর্ভিক্ষে অন্তত ৩৫ আগেই ক প্রাণ হারাইয়াছে এবং তাহার পরে কবি কাব্য রোগে ও দৌর্বল্যে, আর দাঁড়িয়ে। ন্য আবশ্যক হ্রাস না হওয়ায় দেওয়া অন্যায়অজও যে লোক মৃত্যুমুখে আত্মান্তর থেকে তাহা গান্ধীজী কলিকাতার পড়েছে। এখন ত মৃতের দৈনিক হিসাবে সংগে অধোগতি আছেন। যাহারা দুর্ভিক্ষের দাঁড়িয়ে। সেইজন্যঅল্পাহারে কাতর হইয়া-কবিদের কাব্য কাব্যই

ছিল তাহারা এখনও মরিতেছে। মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষে চিকিৎসকগণ দেখিয়াছেন—যাহারা দীর্ঘকাল অনাহারে বা অপূর্ণাহারে থাকে তাহাদিগের পরিপাকযন্ত্র যে অবসাদগ্রস্ত হয়, তাহাতে তাহাদিগের পক্ষে পরে উপযুক্ত চিকিৎসা ও পথ্যেও পূর্ব স্বাস্থ্য পাওয়া অসম্ভব হয়। বাঙলার লোক ঔষধ ও পথ্যও পাইতেছে না। বাঙলা সরকার ঔষধের ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই—চাউলের মূল্যও কমান নাই। রোগীর পথ্য কোথায়?

ইহার পর রাজনীতিক দুর্দশা। ১৯৪২ খৃস্টাব্দের যে আন্দোলন প্রবর্তিত হইবার পূর্বেই সরকার নেতৃগণকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং যে আন্দোলনে জাতির মুক্তি-কামনার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ তাহাতে সরকার পক্ষ কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার পরিচয় গান্ধীজী পাইয়াছেন। তিনি মেদিনীপুরে যাইতেছেন—এতদিনে ক্ষত কতকাংশে শুকাইলেও ক্ষত চিহ্ন তিনি দেখিতে পাইবেন। মেদিনীপুরে সরকারের দমন নীতি যখন প্রবলভাবে প্রযুক্ত হয়, তখন মেদিনীপুর প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতবিক্ষত—সরকারী নীতি সেই ক্ষতে ক্ষারক্ষেপ মাত্র করে নাই—সঙ্গে সঙ্গে নূতন ক্ষতের সৃষ্টিও করিয়াছিল। প্রকৃতির দুর্যোগের সংবাদ পক্ষকাল গোপন রাখা হইয়াছিল। তাহার পরে বিমানে পরিভ্রমণে যাইয়া বাঙলার বহুবিধ দুর্দশার জন্য দায়ী গভর্নর স্যার জন হার্বার্ট তাহার যে বর্ণনা দিয়াছিলেন, তাহাই অবস্থা বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট।

বাঙলা এই সকল অবস্থায় পীড়িত।

আজ আমাদিগের মনে পড়িতেছে, বঙ্গ বিভাগ উপলক্ষ করিয়া যে আন্দোলন হইয়াছিল, তখন বাঙলার গোমুখীমুখ হইতে জাতীয়তার পাবনীধারা প্রবাহিত হয়, আর তখন দুই প্রদেশের দুইজন স্বরাজসাধক বাঙালীর সম্বন্ধে তাঁহাদিগের মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পাঞ্জাবের নেতা লালা লাজপত রায় বলিয়াছিলেন, বাঙালীরা যে অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন তাহার জন্য তিনি বাঙালীদিগকে অভিনন্দন করিতেছেন। কারণ, ভগবানের বিধানে, বাঙালীই ভারতবর্ষে নবযুগের প্রবর্তন করিল।

বোম্বাই প্রদেশের গোপালকৃষ্ণ গোখলে বলিয়াছিলেন, অনাচারের দ্বারা বাঙালী জাতিকে দমিত করা সম্ভব নহে। আর যতদিন বাঙলা অসন্তুষ্ট থাকিবে ততদিন ভারতবর্ষের কোন প্রদেশেই শান্তি থাকিবে না।

তিনি বলিয়াছিলেন—কলিকাতায় পুলিশ বিডন স্কোয়ারে সভায় জনতার উপর লাঠিচালনা করিলে বাঙলা সরকার তদন্ত জন্য ওয়াটসন নামক চাকরীয়াকে নিযুক্ত করিলে আহত ব্যক্তিরা যে তাঁহার কাছে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করে, তাহা নূতন ভাবের পরিচায়ক। বাঙালীদিগকে বাহুবল পরিচালনে অনিচ্ছুক বলা হয়—ভীরু বলিয়া ব্যঙ্গ করা হয়। কিন্তু ইংরেজ পরিচালিত সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণসমূহ যদি বিশ্বাসযোগ্য হয়, তবে বুঝিতে হইবে, বাঙলার তরুণেরা আজ আর সেরূপ নাই—পরন্তু তাহারা দৈহিক সংঘর্ষের জন্য আগ্রহান্বিত।

গান্ধীজী নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন, বাঙলার তরুণেরা সেদিন প্রতিহিংসাপরবশ হইয়া হিংসাশ্রয়ী হইয়াছিল বটে, কিন্তু যে হিংসা এদেশের ধাতুগত নহে—যাহা তাহাদিগের চিরাগত সংস্কৃতির ও শিক্ষার বিরোধী তাহারা অতি সহজেই সেই হিংসার রক্তসিক্ত পথ ত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রবর্তিত অহিংসার পথ গ্রহণ করিয়াছে। তিনি যখন লবণ সত্যাগ্রহ প্রবর্তিত করেন, তখনই তিনি তাহা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ ব্যক্তিরা মেদিনীপুর সম্বন্ধে সে সময় যে রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাহার প্রভূত প্রমাণ ছিল। এবারও মেদিনীপুরে ও কলিকাতায়, আগষ্ট আন্দোলনের সময় তাহার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। গান্ধীজী নিশ্চয়ই সে বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন।

গান্ধীজী সত্যই বলিয়াছেন—বাঙলায় অগ্নি জ্বলিতেছে। তাঁহার মতে—ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশকে বাঙলার মত দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে হয় নাই।

এই বাঙলার লোককে সান্ত্বনা ও সাহায্য প্রদান করিবার উদ্দেশ্য লইয়া—যে বাঙলার আর্তনাদ কারাগারে তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছিল সেই বাঙলার ক্ষতে প্রলেপ প্রদানের জন্য—তিনি বাঙলায় আসিয়াছেন। কারামুক্ত হইয়াই তিনি বাঙলায় আসিবেন, এ আশা বাঙালীরা করিয়াছিলেন। কিন্তু কয়টি কারণের সমন্বয়ে তাঁহার আগমনে বিলম্ব ঘটিয়াছে। সে কথা তিনি বলিয়াছেন। আজ তিনি "শান্তি-নিকেতনের" শান্তি-স্নিগ্ধ পরিবেষ্টন মধ্যেও অধিক দিন থাকিতে পারেন নাই। যে উদ্দেশ্য লইয়া বাঙলায় আসিয়াছেন, সেই উদ্দেশ্য সাধন জন্য চলিয়া আসিয়াছেন।

আজ যে সরকার তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইয়া তাঁহার সফরের সুবিধা করিয়া দিতে ব্যাকুল সেই সরকারের পরিবর্তিত ব্যবহারে মনে করা অসঙ্গত নহে—তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন, আত্মিক বলের নিকট বন্দুক বেয়নেট বোমার বল পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য। অবশ্য জড়বাদ জর্জরিত কালে—ইহকালসর্বস্ব জাতির মনে ভারতের আত্মিক শিক্ষার প্রভাব কতদিন স্থায়ী থাকিবে, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে তাঁহারা আজ গান্ধীজীর সম্বন্ধে যে ভাব দেখাইতেছেন, তাহা যেমন লক্ষ্য করিবার বিষয়, তেমনই তিনি যে সেই ভাবের সুযোগ লইয়া তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের নীতি কর্তব্য ও সুযোগ সম্বন্ধে সদুপদেশ দিবেন তাহাও সহজে অনুমান করিতে পারা যায়।

গান্ধীজী বাঙলার শক্তির পরিচয় পাইয়াছেন। সেই শক্তি প্রযুক্ত করিয়া বাঙলার পুনর্গঠনের—কল্যাণ সাধনের কি উপায় তিনি নির্দেশ করেন, তাহা জানিবার জন্য বাঙলার আগ্রহ একান্তই স্বাভাবিক। সেই উপদেশে সে উপকৃত হইবে—এই বিশ্বাস লইয়া সে তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে।

মেদিনীপুর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া গান্ধীজী বাঙলা সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশ প্রদান করিবেন, ইহা মনে করা অসঙ্গত নহে। সে উপদেশ তাঁহার পর্যবেক্ষণের, অভিজ্ঞতার ও প্রেরণার ফল হইবে—সন্দেহ নাই।

বাঙলার রাজনীতিক্ষেত্রে যে বিবাদ-বিরোধ তাহাকে দুর্বল করিতেছে—যে স্বার্থ সংঘাত আমরা লক্ষ্য করিতেছি, তাহার অবসান প্রয়োজন। বিশেষ বাঙলায় সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব কিরূপ অনিষ্ট সাধন করিতেছে, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। গান্ধীজী বাঙলায় অবস্থানকালে নির্বাচন-কালে এক সম্প্রদায়ের ব্যবহারের সংবাদ পাইয়াছেন। আর তিনি কলিকাতায় উপনীত হইবার কয়দিন মাত্র পূর্বে নিরস্ত্র জনতার উপর পুলিশের গুলীবর্ষণের সংবাদও তিনি পাইয়াছেন—হয়ত মিস্টার কেসীও তাঁহাকে সে কথা বলিয়া তাঁহার সরকারের কার্যের সমর্থনে কিছু বলিয়াছেন। গান্ধীজী যে বলিয়াছেন—বাঙলায় এখনও অগ্নি নির্বাপিত হয় নাই, তাহাতে ঐ ঘটনার প্রচ্ছন্ন উল্লেখ ছিল।

সে যাহাই হউক, গান্ধীজী বাঙলার অবস্থা লক্ষ্য করিয়াছেন—বাঙলার সমস্যা বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করিয়াছেন। বাঙালীর শক্তির পরিচয় পাইয়াছেন। তিনি যে উদ্দেশ্যে বাঙলায় আসিয়াছেন, সে উদ্দেশ্য সাধন জন্য বাঙলার বিপন্ন জনগণকে সান্ত্বনা ও সাহায্য প্রদানের জন্য তিনি কি করেন, বাঙলার অন্ন-বস্ত্রের অভাব বিবেচনা করিয়া কি উপদেশ দেন, বাঙালী তাহার প্রতীক্ষা করিতেছে।

তিনি যে উদ্দেশ্য লইয়া বাঙলায় আসিয়াছেন, তাঁহার সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক,ইহাই আজ বাঙালীর—বাঙলার লক্ষ লক্ষ বিপন্ন নরনারীর একান্ত কামনা।

বাংলার সংস্কৃতি ও আধুনিক সমস্যা

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

যে মহা সম্মানের আসনে আজ আপনারা আমাকে ধরে বসিয়ে দিলেন তার উপযুক্ত যোগ্যতা কি আমার আছে? আপনাদের স্নেহের এই দানকে যেন আমি আমার প্রাপ্য মনে না করি। উচ্চ স্থানে বসলেও বিনা যোগ্যতায় কেউ উচ্চ হতে পারে না। চোরের শূলও উচ্চ, ফাঁসীর মঞ্চও উচ্চ। তাতে কি কেউ উচ্চ হয়ে উঠে? কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যেই রথে ছিলেন কৃষ্ণার্জুন সেই রথেরই চূড়ায় বসেছিলেন কপি। তাতে তাঁদের মর্যাদার কিছুমাত্র ইতর বিশেষ ঘটেনি। অযোগ্যকে বড় স্থান দেবার দুঃখ আপনাদেরই সইতে হবে। রথের সামনে কাঠের ঘোড়া দিয়ে সাজালে নিজেদেরই রথ টানতে হয়। আমি তো আপনাদের রথের কাঠের ঘোড়া,—উপলক্ষ্য মাত্র হয়ে বসে থাকবো। এই সম্মিলনের রথ আপনাদেরই চালাতে হবে।

মীরাট একটি প্রখ্যাত স্থান, কিন্তু তার মাহাত্ম্য আমার জানা নেই, আর যাঁরা এখানে আজ সমবেত তাঁদের মহত্ত্বের কথা বলবার যোগ্যতাও আমার নেই। যদিও আমি কাশীরই লোক তবু বহু দিন পড়ে আছি শান্তিনিকেতনের মাঠে, প্রবাসী বাঙ্গালীদের সুখ-দুঃখের সব কথা জানবার সুযোগ আমার নেই। তাই ভাবছি কোন্ যোগ্যতা দেখে আপনারা আমাকে এখানে বসিয়ে দিলেন। এই সম্মেলনে নানা শাখায় যোগ্য যোগ্য সব মানুষ এনে আপনারা এবার বসিয়েছেন। বাংলার সংস্কৃতি নিয়ে দু চার কথা যা আমি বলতে পারতাম, তা তাঁরাই তারও ভাল করে বলতে পারবেন। তাই বসে বসে ভাবছি আমার আজ কি বলা সঙ্গত হবে।

আজ সবচেয়ে বড় কথা এখানে বহু **জ্ঞানী ও গুণীর সমাগম** ঘটেছে। তার চেয়েও আনন্দের কথা এখানে বহু বন্ধুজনের মিলন ঘটেছে। এমন একটা মহোৎসবে যে উপস্থিত হতে পেরেছি সেটাও আমার সামান্য সৌভাগ্য নয়।

এই সব দেশে মেয়েদের মধ্যে বহুদিনের পর দেখা হলে প্রথমেই একটা কান্নার পালা চলে। না- জানা লোক মনে করে যে, কেউ বুঝি মারাই গেছে। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে মিলনের মুহূর্তে সেটাই হল তাঁদের অন্তরের বহু দিনকার সঞ্চিত ব্যথার ভার হালকা করে দেবার উপায়। তারপরে তাঁদের আসে আনন্দ-আলাপের পালা। আজ এই মিলনের দিনে আমরাও দুঃখের কথাগুলিই আগে বলে নিই। এখানকার সব দুঃখ ও তার প্রতিকারের উপায় আমার জানা নেই। তবে বাঙ্গলাদেশ আমাদের সবারই মূল স্থান। এই কয় বছর বাঙ্গলার উপর দিয়ে যে দুঃখের বন্যা চলেছে তা আর বলে শেষ করা যায় না। মূলের সেই দুঃখ প্রত্যেক শাখাপ্রশাখায় এসে পৌঁছেছে।

পৃথিবীব্যাপী এই **মহাযুদ্ধের** যত অকারণ আঘাত গেছে **ভারতের** উপর দিয়ে। আবার সেই আঘাতেরও সবচেয়ে নিদারুণ চোটটা গেছে বাঙ্গলা **দেশেরই** উপরে। অথচ এই যুদ্ধের আর্থিক কোনো লাভই হতভাগা **বাঙ্গলা দেশ** পায়নি। **অন্যান্য প্রদেশ** এই যুদ্ধে আর কিছু লাভ না করুক, কিছু পয়সা কামিয়ে নিয়েছে।

যুদ্ধের অজুহাতে বাঙ্গলা দেশের উপর দিয়ে এই ক' বছর একটা **পৈশাচী-লীলাই** গেল। এই উপলক্ষে মানুষের তৈরী দুর্ভিক্ষে নাকি মরেছে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ। আর এই দরুণেই রোগে, দুর্গতিতে, অনাহারে মরবার দাখিল হয়ে আছে এর চতুর্গুণ লোক। এর মধ্যে হিন্দু-মুসলমান দুইই আছে। যাঁরা ভদ্র ও মানী তাঁদের দুঃখ আরও বেশি, তাঁরা মর্মে মর্মে মরেছে অথচ মুখ ফুটে জানাতেও পারেননি। এখনো তাঁদের বহু লোক নিঃশব্দে মরণের দিকে এগিয়ে চলেছেন। প্রতিকারের কোনো উপায় নেই। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, ঔষধ নেই।

এই বিরাট হত্যাকাণ্ডের মহাপাপের জন্য সবাই **দায়ী** করছেন বিদেশীয় সরকারকে। কিন্তু এই পাপের কি কতকটা ভাগ আমাদের মাথায়ও নেই? আমরা সহায়তা না করলে কি এতবড়



একটা পৈশাচিক ব্যাপার ঘটতে পারতো? অর্থের লোভে যে এইসব নিরুপায় **নিঃসহায় স্বদেশ-বাসীদের** ধরে ধরে নিংড়ে নিংড়ে মারা হোলো তার কিছু লাভের ভাগ কি আমরাও পাইনি?
আমাদের সঙ্গে ঠগী-ঠেঙ্গাড়ে দস্যুদের তফাৎ কোথায়? সেই সব দস্যুদের পাপ তবু ছিল সরল সহজ, আর আমাদের এই পাপকে চাপা দেবার জন্য কত যুক্তি কত আইনের চাতুরী কত লিপি-কৌশল! এই পাপার্জিত অর্থের একটু আধটু ধর্মার্থে দানও আমরা করি! সমাজে এর জন্য আমাদের বিন্দুমাত্র লজ্জা নেই। কিসের লজ্জা? সবাই যে সমান পতিত, সমান মলিন।

যুদ্ধের অজুহাতে এই কয় বছর ধরে দেশের উপর যে দুঃসহ **সরকারী জুলুম** গেছে তাও কি আমাদের সহায়তা বিনা ঘটতে পারতো? সরকারের কাজের জবাবদিহি সরকারের। যিনি সর্ব মানবের বিচারকর্তা তিনি তার বিচার করবেন। কিন্তু আমাদের এই **পাপের বোঝা** আমরা রাখি কোথায়?

পাশ্চাত্ত্য সব দেশের উন্নতির মূলে এতকাল ছিল তাদের চরিত্র। এই চরিত্র বহুকালের সাধনায় অর্জিত। আজ যদি তাদের সেই চরিত্রের নৌকায় ফুটোও হয়ে থাকে তবে হয়তো আরও কিছুকাল লাগবে সেই নৌকা ডুবতে। কিন্তু আমরা যে ডুবেই আছি। আমাদের ডুবো নৌকায় দুর্নীতির ফুটো হলে কখনও কি আর মাথা তুলতে পারবো?

মানুষের হাতে তৈরী এই মন্বন্তরের দুর্গতিতে যারা কোনো প্রকারে প্রাণে প্রাণে রক্ষা পেলো তারাই কি সত্যি বেঁচে গেল? পুরুষেরা হারিয়েছে তাদের সাধুতা, মেয়েরা হারাল **সাধ্বীত্ব**। প্রাণে মরার চেয়েও যে এই মরণ হোলো সাংঘাতিক। কারণ তাদের নিজেদের মৃত্যুর খবর এখনো তারা নিজেরাই পায়নি। অথচ শত সাজসজ্জা, প্রসাধন সত্ত্বেও তাদের শবদেহের পূতিগন্ধ চতুর্দিককে নরককুণ্ডের চেয়েও জঘন্য করে তুলেছে।

এই বিষয়ে সব সম্প্রদায়ের পাপীরাই সমান বেহায়া ও বেপরোয়া। কতকালের সাধনার ফলে নর-নারী যেসব মহৎ **আদর্শ** জীবনে পেয়েছিল আজ এই দুর্গতির বন্যায় সেই সব কোথায় **ভেসে গেছে**।

রাঁচীর কাছে কোল-মুণ্ডা-ওঁরাওঁ প্রভৃতি প্রাচীন সব জাত আছে। তারা অতি গরীব। বর্ণজ্ঞানহীন হলেও তারা সহজ সরল ও সুসভ্য। কোনো প্রকার অসাধুতা তাদের জানা নেই। লক্ষ্ণৌ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধীরেন মজুমদার কিছুকাল ধরে তাদের সমাজ ও রীতিনীতি নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছিলেন। এবার যুদ্ধের সময় তিনি সেখানে যেতেই বুড়োরা একেবারে কেঁদে পড়লো। বল্লে, 'বাবু, আমাদের ব্রত-নিয়ম-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতির আর খোঁজ করতে হবে না। সবই গেছে আমাদের। পামরদের হাতে যে সস্তা সম্পদ এসে পড়েছে সেই পাপের পয়সার বন্যায় আমাদের মেয়েদের সামাজিক বাঁধন ও শুচিতা একেবারে ভেসে গেছে।' নৃতত্ত্ববিদ্‌কে হতাশ হয়ে ফিরতে হোলো। তাদের এতকালের সংস্কৃতি আজ দেউলে হয়ে গেল।

(২)

যুদ্ধকালীন এই বিপর্যয় ছাড়াও **বাংলাদেশ** দিন দিন পিছিয়ে যাচ্ছিল। তার কারণ একাধিক। এক রথীর বাণে অভিমন্যুর মৃত্যু হয়নি।

বুদ্ধির অভাব বাঙ্গালীর নেই, **চরিত্রের অভাবই** তার সর্বনাশের মূল। এই দোষেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি গ্রীকেরা মরেছেন রোমানদের দাস হয়ে। চরিত্র নেই বলেই বিধাতার কৃপায় অমারাও বঞ্চিত। চরিত্রের অভাবে জীবনটা যেন ঝাঁজরি হয়ে গেছে। বিধাতা তাঁর কৃপা দেবেন কিসের মধ্যে, আমরাই বা তা রাখবো কোথায়? কিছু রাখতে হলে চাই পাত্র। চরিত্রবানকে বলে সৎপাত্র। সৎপাত্রেই কিছু বস্তু রাখা চলে। ঝুড়ির মধ্যে দোহালে কাম ধেনুরও দুধ এক ফোঁটা রাখা যায় না।

এই চরিত্রের অভাবেই আমরা একজন অন্যের সঙ্গে মিলতে পারিনে। মিশতে পারি, কিন্তু মিলতে **পারিনে**, কাজেই আমাদের মণ্ডলীগুলিও ঝাঁজরি। সবাই মিলে এক হতে পারিনে। কি করে একজন অন্যকে খাটো করবো ক্রমাগত সেই চেষ্টা। একে অন্যকে খাটো করতে করতে সবাই যাই নগণ্য হয়ে। নগণ্যদের তো জগতে স্থান নেই। আমাদেরই সব বনস্পতিকে আমরাই করে আনি বামন। বামনরা কারও চোখেই পড়ে না। এমন করেই বিশ্বের দরবারে আমাদের স্থান আমরা হারিয়েছি। মাঝ দরিয়ায় যারা আপন জাহাজের তলায় ফুটো করতে পারে তাদের আত্মঘাতী সূক্ষ্মবুদ্ধির তারিফ করতে হয় বটে!

ঠিক এই কারণেই **বিজ্ঞানে** আমাদের সূক্ষ্ম **বুদ্ধি** থাকা **সত্ত্বেও জীবনে ও আচারে** আমিরা **বিজ্ঞানোচিত** ব্যবহার করতে পারিনে। বিজ্ঞানের **ও জ্ঞানের** সঙ্গে আমাদের ব্যবহারগত উদারতা বুদ্ধি

পায় না। 'বিজ্ঞান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সব ছাত্রেরা ব্যবহারের সময় মূঢ়ের মতই আচরণ করেন' এই দুঃখই আচার্য পি সি রায় মহাশয় করে গেছেন। তাঁদের একদিকে বিদ্যা ও অন্যদিকে গোঁড়ামি পাশাপাশি চলে, দুধ নষ্ট হলে যেমন তার একদিকে ছানা ও অন্যদিকে জল কেটে যায়। এই দুঃখ রাখবার স্থান কোথায়? আচরণের দৈন্য চাপা দেবার জন্য পরের কাছে আমরা গীতা-উপনিষদ্ ও ষড়দর্শনের সব সূক্ষ্মতত্ত্বের ঝড় তুলে দিই। আবার আপন মনকে প্রবোধ দেবার জন্য অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন গুরুর খোঁজও করি। সামান্য লোককেও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলে মেনে নিই। অলৌকিক সব ব্যাপারেই বেশি ভরসা রাখি। অথচ চরিত্র ও ব্যবহারকে সহজ সরল পথে উন্নত ও অগ্রসর করিনে, সব জাতিরই মরবার মুখে এইসব চাতুরী এসে দেখা দেয়।

বিচারের বিজ্ঞানকে আচারে গ্রহণ করতে পারিনে বলেই আজ আমরা শক্তিহীন। প্রকৃতিই সব শক্তির মূলাধার। মাটির-জলের বায়ুর-অগ্নির-আলোকের-বিদ্যুতের-প্রাণের নানাবিধ শক্তি নিয়েই মানুষ আজ শক্তিমান। আমরা সে সব মুখস্থ করি কিন্তু জীবনে গ্রহণ করিনে।

শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন এর বিপরীত। ভাগবতে দেখি তিনি জ্ঞানে ও আচরণে ছিলেন একেবারে এক। নন্দ প্রভৃতি বৃদ্ধেরা ইন্দ্র পূজার আয়োজনে রত (১০ ২৪ অধ্যায়)। শ্রীকৃষ্ণ জানতে চাইলেন কিসের জন্য এত আয়োজন। বৃদ্ধেরা বললেন, "ইন্দ্র পূজার জন্য এই আয়োজন। ইন্দ্র পূজায় বৃষ্টি হবে, আর বৃষ্টিতে শস্য হবে। নৈলে লোক বাঁচবে কিসে?" শ্রীকৃষ্ণ বললেন, "প্রকৃতির ধর্মেই তো বৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে আর ইন্দ্রপূজা কেন? ঈশ্বর বলে যদি কিউ থাকেন তবে তিনিও প্রকৃতির ধর্ম মানুষের কর্ম অনুসারেই ফল দেবেন। প্রকৃতির স্বভাবেই মেঘ ও বৃষ্টি হয়, ইন্দ্র আবার করবেন কি (১০, ২৪, ২৩)? অতএব ইন্দ্রপূজা ছাড়, প্রকৃতি-সংগত কর্মেই মন দাও।"

হাজার হাজার বছর আগেকার শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশ আজ পালন করচেন আর লক্ষ্মী লাভ করচেন পাশ্চাত্ত্য সব দেশবাসীরা। সাগরের গর্ভ হতে পৃথিবী উদ্ধার করে শস্য ফলাচ্চেন হল্যান্ড, তুষার প্রদেশে সোনার শস্য ফলাচ্চেন রাশিয়া, পানামা হতে ম্যালেরিয়া তাড়াচ্চেন আমেরিকা। এইসব কথা আমরা শুধু মুখস্থ করেই মরলাম।

যদি বল আমরা পরাধীন বলেই এই দুর্দশা তবে বলবো তারও তো কারণ ঐ সংহতিরই অর্থাৎ চরিত্রেরই অভাব। এই দুরবস্থার মধ্যেও যে সমবেত চেষ্টায় বিজ্ঞানের সহায়তা নেবো তারও উপায় নেই। একত্র হওয়াই যে আমাদের পক্ষে অসম্ভব। সুইডেন, নরওয়ে প্রভৃতি দেশ পররাজ্য আক্রমণ না করেই শুধু নিজেদের সমবেত চেষ্টায় অপূর্ব সমৃদ্ধি লাভ করেছে। আর আমরা? আমরাও সমবেত হতে পারি, সে শুধু দলাদলি করতে বা কাউকে একঘরে করতে।

জগন্মাতার পূজা অর্থই হোলো তাঁর সন্তানদের সমবেত হওয়া। আর তাই নিয়েই আমাদের কত দলাদলি। সেই উপলক্ষে আমাদের ব্যক্তিগত দ্বেষ-বিদ্বেষ চরিতার্থ করার মানেই হোলো মাকে অপমান করা। দলাদলি করতে গিয়ে মাকেই আমরা খণ্ড খণ্ড করি। বিগতপ্রাণা সতীর দেহ একবার খণ্ড খণ্ড করা হয়েছিল। আমাদের পূজনীয়া এই মাও কি তবে বিগতপ্রাণা? মৃত মায়ের থেকে কি করে জীবন্ত সন্তান হবে? এই পাপেই কি আমরা দিনে দিনে মরতে বসেছি?

মৃতের আবার মূল্য কিসের? প্রাণের প্রসাদেই আমাদের যা কিছু মূল্য। বৈজ্ঞানিকেরা হিসেব করে দেখিয়েছেন একটা মৃত মানবদেহের সব উপাদান বিশ্লেষণ করে নিলে তার মূল্য হয় মাত্র সাড়ে পাঁচ টাকার মত। মানবের মূল্য তার প্রাণ-শক্তি ও মহত্ত্বের জন্য। তাই যদি যায় তবে আর কিসের মূল্য?

চরিত্রের অভাবেই বাঙ্গালী অধ্যবসায়হীন। দীর্ঘকাল ধরে সে কোনো সাধনাই চালাতে পারে না। স্বর্গীয় শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় একবার বলেছিলেন, "তিন দিনের উৎসাহে বাঙ্গালীর কাছে কেউ দাঁড়াতে পারে না। যদি বল, রোজ বিশ ঘণ্টা ব্যায়াম করলে মাসখানেকের মধ্যে ভীম হওয়া যায় তবে বাঙ্গালীর সঙ্গে কেউ পারবে না। যদি বল, রোজ বিশ মিনিট করে ব্যায়াম করলে কয়েক বছরে ভীম হবে তবে আর বাঙ্গালীকে কোথাও খুঁজে পাবে না।" সারা বছর কিছু না করে পরীক্ষার পূর্বে দিন কয়েক আঠারো ঘণ্টা করে খাটতে পারে শুধু বাঙ্গালী। অথচ প্রতিদিন নিয়মিত কাজ করে যেতে আমরা অক্ষম। এই নিয়মের দু' চারজন ব্যতিক্রম থাকলেও এটাই আমাদের স্বভাব। ব্যবসা-বাণিজ্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই দুর্বলতাই আমাদের প্রধান অন্তরায়।

প্রকৃতির মধ্যেই সব শক্তি ও সম্পদ। আজ সেগুলি সংযত করে যাঁরা ব্যবহার করতে জানেন তাঁরাই লক্ষ্মীমন্ত। এই সব শক্তিগুলি নিয়মিত ব্যবহারে না আনতে পারলে আমাদের দুঃখ দৈন্য ঘুচবে আর কিসে? বাংলার উপর দিয়ে কত জল বৃথাই বয়ে চলেছে। এই ক্ষতি যে দেখে সেই বলে কি দারুণ অপচয়। তারচেয়েও সাংঘাতিক অপচয় আমাদের বিপুল মানবশক্তির ও মানসিক বেগের। যে কোনো আন্দোলনে আমরা চেঁচামেচি করে দেশ মাথায় করে তুলি, কিন্তু বার বার দেখেছি তাতে দেশকে পরপদদলন হতে রক্ষা করা যায় না। এই মানসিক উত্তেজনায় বৃথা হৈ চৈ করে ফল কি? তুবড়ী বাজির উন্মাদ অন্যুচ্ছ্বাসকে সংযত করে আঁধার ঘরের মঙ্গলদীপ জ্বালিয়ে তুলতে হবে। তবেই আমাদের কল্যাণ, জগতের কল্যাণ।

দেশে নতুন যুগ আসচে। সর্ব জগতের কল্যাণে ভারতকে তার আপন স্থান গ্রহণ করতে হবে। তাতে ভারতের যে কতবিধ দায়িত্ব তা আজ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখতে হবে। আর সেই মহাব্রতে কে কোন ভার নেবো তা স্থির করে আমাদের প্রত্যেককে অভ্রান্ত সাধনায় তারজন্য প্রস্তুত হতে হবে। ওকাকুরা বলেছিলেন, "তোমাদের দেশে ঘরে বাইরে যে বৃথা চিৎকার চলেচে তাকে সংযত করে কাজে লাগালেই তোমাদের সর্ব বন্ধনপাশ মুক্ত হতে পারে।" কিন্তু এই সংযত সাধনার জন্য চাই দৃঢ় নিষ্ঠা সুদৃঢ় চরিত্র। সেই সাধনাবিজ্ঞানকে আমাদের গুরু বলে স্বীকার করতেই হবে।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় হতে দামোদরের বন্যার মত কী উত্তেজনার ঝড়টাই বয়ে চলেচে বাংলাদেশ, কত ছেলেমেয়ে তাতে জেলে গেল, প্রাণ দিল। আর সেই বাতাসে পাল তুলে লক্ষ্মীর রাজ্যে এগিয়ে গেল অন্য প্রদেশের লোক। পাটপচা জল খেয়ে ও জলে ডুবিয়ে ম্যালেরিয়ায় মরে বাঙ্গালী, আর পরে তার লাভ তুলে নেয়। বাংলার কয়লা, বাংলার চা, বাংলার কাগজের উপাদান; তার লাভ কিন্তু বাংলার নয়। বাংলারই সব মাঝিমাল্লা অথচ বাংলা দেশের খেয়া নৌকার ব্যবসাটাও বাঙ্গালীর হাতে নেই, তার মালিক বাইরের ধনী। তারা যেভাবে জেলা-বোর্ডের থেকে খেয়া নৌকার ডাক আদায় করে বাঙ্গালীর হয়ত তা করার সাধ্য নেই। কিন্তু জেলা বোর্ডের সভ্যরাও তো বাঙ্গালী। তবে এমন হয় কেন? সেই একই কথা। চরিত্র নেই। চরিত্র নেই। রাজনীতির ক্ষেত্রে বাঙ্গালী ছেলেমেয়েরা দুঃখ কম স্বীকার করেনি, কিন্তু সেখানেও তার কোনো যোগ্য স্থান নেই। যে চরিত্রের মধ্যে চালুনীর মত ছ্যাঁদা তাতে কিছু রাখা যায় না, সব বেরিয়ে যায়।

বৈজ্ঞানিক দিক দিয়েই কি অপচয় আমাদের কম? কাঁচা কয়লাগুলি বৃথাই পুড়চে। জীব-জন্তুর হাড়ের মধ্যে ফল-শস্য-ফলানো ফসফেট নামে এমন একটা সার থাকে যা বাইরে চলে যেতে দিলে আর কোনো রকমে তা পূরণ করা যায় না। ১৯২৪ সালে জাপানে দেখলাম ভারতের নানা প্রদেশের ব্যবসায়ী আছেন। একজন মাত্র আছেন বাঙ্গালী, তাঁর কাজ হচ্চে বাংলা দেশের হাড়ের গুঁড়ো সেখানে বিক্রী করা। অবশ্য সেই ব্যবসায়টির মালিক ইংরেজ। জাপানীদের কেউ কেউ আমাকে বললেন, "এই জিনিষ কি কেউ বাইরে বেচে? তোমাদের এমন নেতা কি কেউ নেই যে এই রপ্তানি বন্ধ করে?" বলবো কাকে? দেশের কাগজে কত রকমের আলোচনাই থাকে। কিন্তু এইসব আলোচনা নেই। দুঃখের কথা বলি কাকে, আর বলিই বা কেমন করে?

চিনি ও সরষের তেল খায় বাংলাদেশ, জোগায় অন্যে। আমাদের দেশভরা জঙ্গল, অথচ উড্ প্রডাক্টের কোম্পানী বেরিলিতে। চারিদিকে সাগর অথচ লবণ ও মাছের ব্যবসা আমাদের নেই। কড্লিভার অয়েল এখন হয় হাঙ্গরের যকৃতের তেলে। বাংলার সমুদ্রে তা যথেষ্ট, অথচ আমরা তা কিনে খাই। জলপথগুলো ক্রমেই নষ্ট হয়ে আসছে, যাও আছে তাও হয়তো অবাঙ্গালীর জাহাজেই একদিন চলবে। ভাগ্যকুলের জাহাজ আর কখানা? মাথার উপরে হিমালয়ে কুইনাইন গাছ হয় তবু জাভার কুইনাইনের অভাবে যে আমরা এই যুদ্ধকালীন ম্যালেরিয়ায় মরেচি তার কারণ অবশ্য সরকারী নিষেধ। আজ বাংলা বস্ত্র-হীন। কল হতে বস্ত্র পাবার উপায় নেই। এক সময় বাঙ্গলাদেশ আপন হাতে সুতো কেটে ও কাপড় বুনে য়ুরোপকেও জুগিয়েচে। আর আজ আমরা যে একেবারে নিরুপায় হয়ে পড়েচি তার কারণ আমরা সেই চরিত্র হারিয়েচি। নিজের হাতে সুতো কেটে তাঁত না বুনলে আমাদের যে বস্ত্রের অভাব এখন ঘুচবে এমন তো মনে হয় না।

খাদ্যের অভাবে ও খাদ্যের দোষেও আমরা দিন দিন স্বাস্থ্য ও শক্তি হারাচ্চি। মুটে-মজুর মিস্ত্রী সবাই অবাঙ্গালী। গ্রামে গ্রামে বাঙ্গালী মুচি অন্নাভাবে মরেচে, আর বাইরের সব সেলাই বুরুষ-ওয়ালা সামান্য শ্রমেই দিন তিন চার টাকা কামায়। চীনা বাজারে ও বড় বড় কারখানায় ভিন-দেশী সব মুচি। ধোপা নাপিত সবই এখন বাইরের। ফেরি-ওয়ালা পর্যন্ত এখন বাঙ্গালী আর বড় নেই। বোলপুর অঞ্চলে দেখেচি পুকুর জমা রেখে মাছ ধরা মাছ বিক্রী করা এই সবই বাঙ্গালীরা অন্যের হাতে তুলে দিয়ে আরামে উপোস করে মরচে। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান বাঙ্গালী বড় একটা আর এখন দেখা যায় না। বাইরের থেকে এই সব শ্রমি-কেরা এসে বাংলাদেশে যে করে খাচ্চে তাতে আমি কোনো দুঃখই করতে পারিনে। বরং তাদের দৃষ্টান্ত আমাদের দেখা দরকার। আমার দুঃখ হচ্ছে বাঙ্গালীর অকর্মণ্যতায়। বাইরের শ্রমিক ও বাংলার শ্রমিক উভয়ে মিলে একই ক্ষেত্রে সমান উদ্যমে কাজ করুক তাই তো প্রার্থনীয়। রেলে ষ্টীমারে কুলী সব বাইরের। পাশের গ্রামেই দেখবে বাঙ্গালী রয়েছে বসে, তাদের ভাত নেই। আসল কথা, সব দিকে উদ্যম হারিয়েচি।

খাদ্যের অভাব তো আছেই, তার উপরে অপচয়ই কি কম? বিয়েতে পূজোতে শ্রাদ্ধে খাদ্যের অপচয় দেখলে চোখে জল আসবার কথা। তা ছাড়া চালের কুঁড়ো ফেলবো, ভাতের ফেন ফেলবো, ছানার জল ফেলবো, তরকারীর খোসা ফেলবো। মানা করলে মেয়েরা শুধু

বেজার। প্রতিদিন খেতে বসেও আমাদের পাতে কত অন্নই ফেলে দি। অথচ দেশভরা ক্ষুধার্ত। ডাস্টবিন হতে তারা খাদ্য সংগ্রহ করবে কেন? আমরাই শুদ্ধভাবে এই অন্ন দিতে পারতাম না? জাপানে কোয়াসানে দেখেছি সবাই পাত্র ধুয়ে পর্যন্ত সেই জল খাচ্ছে, পাছে একটি খাদ্যকণা নষ্ট হয়। এই শিক্ষা নাকি ভারতের কাছেই একদিন তারা পেয়েছিল। আর আমরা?

দেশে মাছ মাংস দুর্লভ। দুধ নেই, তবু গো-পালন করবো না। ফল খেলে স্বাস্থ্য ভাল হয়। কিন্তু গাছ লাগাবে কে? একটি আমলকী দুইটি কমলা লেবুর সমান গুণ ধরে, কিন্তু খাই কৈ? দেহে রৌদ্র লাগালে অনেক ভিটামিনের অভাব পূর্ণ হয়, কিন্তু তার জন্য যতটুকু উদ্যম চাই তাই বা পাবো কোথায়? সব দিক দিয়ে মরে আছি।

তারপর, খাদ্যের গুণাগুণ দেখে আমরা খাদ্য পছন্দ করিনে। আমাদের খাদ্যগুরু হলেন আমাদের রসনা। পরীক্ষায় দেখা গেছে ভারতে পাঞ্জাবীদের খাদ্যই সবচেয়ে সারবান; বাংলার খাদ্যে সার নেই। আমরা ফর্সা খাদ্য চাই, তাই গুড় ছেড়ে চাই চিনি, লাল চাল ছেড়ে খুঁজি ফরসা চাল, আটা ছেড়ে খুঁজি ময়দা। মুড়ি মুড়কি, অঙ্কুরিত মুগ ছোলা, এগুলি এখন বাতিল হয়ে গেছে। ভেজাল ঘীতে তৈরি খাবার না হলে দিন চলে না। দেহ থাকবে কিসে?

রান্নার এত ঠাট যে মেয়েরা সারা দিন ধরে করেন পাক, আর আমরা করি পরিপাক। সময়মত ছেলেরা একসঙ্গে বসে খাবেন না। যিনি যখন আসবেন তিনি তখন খাবেন। মেয়েদের আর হেঁসেল থেকে ছুটি নেই। মেয়েদের সময় ও শক্তির কি সামান্য অপব্যয়? সময় নষ্ট, খাদ্য নষ্ট, স্বাস্থ্য নষ্ট, এত অপচয় করে কি আমরা কখনো মাথা তুলতে পারবো?

(৩)

শিক্ষার দিক দিয়ে এক সময় ভারতে ছিল সব তপোবন ও তক্ষশিলা নালন্দা প্রভৃতি বিশ্ব-বিদ্যালয়। সেগুলি যখন গেল তখনও বাঙলা দেশ টোল চতুষ্পাঠী খুলে জ্ঞানের প্রদীপটি বজায় রেখেছিল। তাছাড়া সর্বসাধারণের জন্য ছিল পুরাণ-পাঠ, কথকতা, যাত্রা, রামায়ণ গান, কীর্তন, বাউল গান প্রভৃতির আয়োজন। উত্তর বঙ্গে গম্ভীরা ও বিহু, পূর্ব বঙ্গে রয়ানী নীল পূজা, পশ্চিম বঙ্গে গাজন প্রভৃতির উৎসব লোকের আনন্দের ক্ষুধা মেটাতো। লোকের মধ্যে তখন নৃত্য ছিল, গীত ছিল, অভিনয়, যোগীর কাচ প্রভৃতি ছিল, ঢাকার জন্মাষ্টমী প্রভৃতির মিছিল ছিল। সেই যুগে মজলিশে ও বৈঠকে যে আনন্দ ছিল আজ সভা-সমিতিতে তা নেই। আলিপনায় সিঁড়ি চিত্রে, কাঁথা-শিকা প্রভৃতি কাজে ছিল লোকশিল্প।

নাতিনাতনীদের জন্য তখন দিদিমারা গল্প বলতে জানতেন। এখন পাশ করা সব মেয়েরা তাঁদের শিক্ষাহীনা মা ঠাকুরমাদের মত সামাজিক-ভাবে গৃহাগত সকলের সঙ্গে মিলতে মিশতেও পারেন না। এই দুঃখ রবীন্দ্রনাথ করতেন, আর ছেলেমেয়েদের কাছে গল্প করতে বললেই তাঁদের চক্ষু স্থির। মুখস্থ করে এখন তাঁরা শেখেন মণ্টেসরী ও ডালটনের মেথড, তাই শিশু-চিত্ত দিনে দিনে শুকিয়ে মরছে। মায়ের বুকে দুধ না থাকলে যেমন বোতলের দুধের ঘটা তেমনি দিদি-মাদের গল্পের বদলে দেখা যায় রাশি রাশি ছেলেদের গল্পের বই বাজার ছেয়ে ফেলেছে। এই অশ্বত্থামার দুধে ছেলেরা দিন দিন অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছে।

হাতের কাজ যারা করতো তাদের তখন উৎসব ছিল বিশ্বকর্মা পূজায়, হলকর্ষণ উৎসবে, নবান্নে, গোপাষ্টমীতে, পোষলায়, নৌকাবাচে, বৃক্ষ রোপনে, জলদানে, ইন্দ্রোৎসবে। আজকালকার সভাসমিতিতে সেই অভাব পূর্ণ হবে না। এই সব কারণে শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদ্যালয়ে ও বিশ্বভারতীতে এই সব উৎসবকে অঙ্গীভূত করে শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। শুধু আনন্দ উৎসব নয়, ভারতের ও এশিয়ার সব সংস্কৃতিতে সমন্বয়-সৃষ্টির জন্য রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীতে হিন্দী-বিভাগ, ইসলামিক বিভাগ, আবেস্তিক বিভাগ, জৈন বৌদ্ধ বিভাগ, সঙ্গীত ও কলা বিভাগ রাখতে চেয়েছিলেন। কলা ও সঙ্গীতের জন্য তিনি গাল কি খেয়েছেন কম? এই সব নৃত্য-গীতে আনন্দ-উৎসবে নাকি দেশ নির্বীর্য হয়ে যাচ্ছে।

এই কয়েকদিন আগে স্বর্গগত রবীন্দ্রনাথকে বিশ্রীভাবে গালি দিয়ে সংস্কৃতে অনুষ্টুপ্ ছন্দে রচিত একখানা পত্র পেলাম। পত্রখানা হাতে লেখা। নম্বরে দেখা গেল এইরূপ শতাধিক পত্র নানা স্থানে লেখা হয়েছে। লেখক বাঙালী, তিনি নাকি বীরত্ব চান, তবে আপন নামটা প্রকাশ করবার মত সাহসও তাঁর হয়নি। তিনি বিনামা। বেগর ঠিকানায় অব্যক্তনামে আপন চরিত্রের ও বীর্যের নমুনা তিনি দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের গানেই নাকি দেশের বীর্যহানি ঘটেছে, অথচ দেখা গেছে মহাত্মা গান্ধী, নেহরু প্রভৃতি সবাই রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভক্ত, আর দেশের যেসব বীর সন্তান তাঁদের সাধনার জন্য প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের কণ্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীতই শোনা গেছে। ফাঁসিকাঠে উঠবার সময় পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের গান তাঁরা করে গেছেন। এই সব বীর সন্তানেরা স্বর্গে বসে আজ এই বিনামা গালিপটু বীরের কুৎসিত শ্লোকগুলি শুনে কি ভাবছেন কি জানি।

একটি শ্লোকে তিনি জানিয়েছেন নৃত্যগীতে লোক বীরত্বহীন হয়ে পড়ে। অথচ বৈদিক আর্যদের বীরত্বের যুগে ঋষিদের প্রশ্ন ছিল নৃত্য-গীতের মতো এই মহাসম্পদ মানুষকে কে দিল? **"কো বাণং কো নৃতোদধৌ** (অথর্ব ১০, ২, ১৭)।" রাজপুতে বীরদের মধ্যে নৃত্যগীতের প্রভূত সমাদর ছিল। তারপর রাজপুতদের বীরত্ব অবসানের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যগীতও লুপ্ত হয়ে যায়। এখন তার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা চলেছে। জার্মাণ ও রাশিয়ানদের নৃত্যগীত সারা য়ুরোপের সম্পদ বলে গণ্য। জাপানের বীর সামুরাইয়া নৃত্যগীত শিক্ষা করতে বাধ্য হতেন। তাঁরা তো নৃত্যগীত কলাকে সুকুমার বলে ত্যাজ্য মনে করেন নি। শক্তিশালী কাঠময় বনস্পতির মূলে সুকুমার ফুলমুকুল। ফুল বাদ দিলে কাঠেরও সঙ্গে সঙ্গে অবসান। বেশি কথা কি মহাভারতের যিনি শ্রেষ্ঠ বীর, গীতার যিনি একমাত্র আদি পাত্র সেই অর্জুনই ছিলেন নৃত্যগীতে নিষ্ণাত আচার্য। বরং শিখণ্ডীকেই কোনো দিন নাচতে বা গাইতে দেখা যায়নি। হয়তো সেই যুগে তিনিই অনুষ্টুপ ছন্দে সব অশ্লীল কুচ্ছো রচনা করে অব্যক্ত নামে বেগর ঠিকানায় অর্জুনকে গালাগালি দিতেন।

বাঙলা দেশের এইসব লোকশিল্প ও সাহিত্য সম্পদাদি উদ্ধার করতে ও শিক্ষার কাজে লাগাতে হলে সমবেত সাধনার দরকার। তার জন্য চাই চরিত্রবল। তা না হলে শিক্ষার ক্ষেত্রেও আমাদের ক্ষতি কম হবে না।

বাঙলাতে প্রয়োজনানুরূপ ভাল একদল পাবলিশর আজও গড়ে ওঠেনি। এখানে লেখকরা তাঁদের ন্যায্য পাওনা পান না বলেই উৎসাহহীন। তাই বাঙলা সাহিত্য প্রচারে সম্প্রতি গুজরাটী পাবলিশরও দেখা যাচ্ছে। সেদিন জয়পুরে P. E. N. সভায় একটি গুজরাটী যুবক অভিযোগ করলেন যে, বাঙালীরা নাকি বড়ই স্বার্থপরভাবে প্রাদেশিক। তার প্রমাণ দিলেন বাংলা সাহিত্যে সুশিক্ষিত এক গুজরাটী ভদ্রলোক গুজরাটী হতে কিছু ভালো জিনিষ বাঙলাভাষায় অনুবাদ করে বাঙালী প্রকাশকদের দোরে দোরে ধন্না দিয়েও নাকি তাঁর লেখা ছাপাতে পারেন নি। বাঙলাতে গুজরাটী পবিলিশর থাকতে তিনি যে কেন বাঙালী প্রকাশকদের দোরেই ধন্না দিলেন, তা তো বোঝা গেল না।

প্রাদেশিক স্বার্থপরতা তো দূরের কথা, প্রাদেশিক কল্যাণ চেষ্টা পর্যন্ত বাঙালীদের নেই। জ্ঞানবিজ্ঞান যদি মাতৃভাষাতে শেখা না যায় তবে সময় ও শক্তির কত বড় অপব্যয় তা আর বলে বুঝাবার দরকার নেই। এই অপচয় নিবারণ করে জাপান প্রভৃতি দেশ অনেক এগিয়ে গেছে। মানব-শক্তির সম্ভাবনাকে যথাযোগ্যভাবে কাজে লাগানো হয়নি বলে দুঃখ করেছিলেন ভক্ত রামপ্রসাদ—"মনরে কৃষিকাজ জান না। এমন মানব জমীন রইলো পতিত আবাদ করলে ফলতো সোনা।"

এই বিষয়ে বহুদিন হতে সাবধান করেছেন রবীন্দ্রনাথ। অল্প কিছুদিন হোলো বাঙলার বিশ্ববিদ্যালয় সেইদিকে দৃষ্টি মাত্র ফিরিয়েছেন। কাজের মত কাজ এখনো বিশেষ কিছু হয় নি। রবীন্দ্রনাথের পিতার আমল থেকেই তাঁদের বাড়ীতে ইংরাজীতে পত্র লেখা চলতো না। তাতে করে তাঁরা ইংরাজিতে খর্ব হয়েছেন বলে তেমন তো মনে হয় না। সভাসমিতিতেও রবীন্দ্রনাথ ইংরাজী ব্যবহারের বিরুদ্ধে ছিলেন। এজন্য তাঁকে অনেক পরিহাস সইতে হয়েছে। তবু তিনি পাবনা প্রাদেশিক কংগ্রেস সভায় বাঙলা অভিভাষণ দিয়েছিলেন। তখন তাতে সবাই অবাক হলেও এখন প্রাদেশিক সভায় বাঙলাই চলে গেছে।

পাশ্চাত্য সব ভাষাতে তো কথাই নেই, হিন্দী মহারাষ্ট্রী গুজরাটী প্রভৃতি সব ভাষাতেও যে সব নানা বিষয়িণী সুলভ সহজ গ্রন্থমালা আছে বাঙলাতে তার অভাব ছিল। সেই গ্রন্থমালাতে সর্বদেশের নানা কালের নানা বিষয়ের সম্পদ সরল সহজ বাঙলাতে থাকলে খুবই উপকার হয়। এই দুঃখ আমি করেছিলাম। এখন বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগ বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের নামে সেই কাজে হাত দিয়েছেন।

অভিধান ও বিশ্বকোষের কাজে বহু লোকের সমবেত সাধনা চাই। বাঙলা অভিধানের কাজে একা শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রায় চল্লিশ বছরের সাধনায় একটা বড় অভাব মোচন করে এনেছেন। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পরিভাষার কাজে মহারাষ্ট্রী ও হিন্দী সাধকেরা এবং ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু পণ্ডিতেরা অনেকটা কাজ করেছেন। বাঙলা দেশও এই সময় এই কাজে হাত দিয়েছিল কিন্তু সেই কাজ বেশিদূর এগোয়নি।

মহাভারতের নানা পাঠ ভারতের নানা দেশে, সব পাঠ মিলিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ মহাভারত করতে পুণার ভাণ্ডারকার ইনস্টিটিউট চেষ্টা করলেন। ভারতে তিনটি স্থানে প্রায় ২৩ বছর ধরে তাঁদের কাজ হচ্ছে। তাঞ্জোর, পুণা ও শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীতে সেই একই কাজ চলেছে। তাতে ভাণ্ডারকার প্রতিষ্ঠানের নির্দেশে বাঙলা দেশের নানা স্থানের বহু পুঁথি নিয়ে আমরাও কাজ করেছি। এই রকম ক্ষেত্রে শুধু বাঙলা দেশের নয়, সর্বভারতের সমবেত চেষ্টা চাই।

বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, দর্শনশাস্ত্র, তন্ত্র,

[illegible], জ্যোতিষ ও নানা মতের ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ কতক হয়েছে কতক হয়নি। যা হয়েছে তাও এখন দুর্লভ। কালীবর বেদান্তবাগীশ, সত্যব্রত সামশ্রমী প্রভৃতির লেখাও এখন দুষ্প্রাপ্য। সেই সব গ্রন্থ এখন সুপ্রাপ্য হওয়া দরকার। যেগুলির এখনও বাঙলা অনুবাদ হয়নি তার অনুবাদ হওয়া চাই। বিদেশী সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস ভ্রমণ চরিত কথা ও কলাবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের যথাযোগ্য পরিচয়ও বাঙলা ভাষায় গ্রন্থাকারে না পেলে চলবে কেন?

ভারতের নানা প্রদেশের সাধক সন্তদের বাণী ও চরিতকথা বাঙলাতে পাওয়া দরকার। তামিল শৈব ও বৈষ্ণবদের কথা, গ্রন্থসাহেব, কবীর, রবিদাস, মীরাবাঈ প্রভৃতি ভক্তদের পরিপূর্ণ পরিচয় বাঙলা ভাষাতে না থাকলে আমাদের শিক্ষা অপূর্ণ থাকবে। বাংলা দেশেও বৈষ্ণব শৈব শাক্ত ও বাউল প্রভৃতি নানা মতের গান ও লোকসাহিত্য লোকের কণ্ঠেই রয়েছে। দিন দিন তার ক্ষয় হচ্ছে। এই সব অমূল্যধন যাতে নষ্ট না হয় তাকি দেখতে হবে না?

এসব কাজ একার নয়। ছোট কোনো সংঘ বা মণ্ডলীরও সাধ্য নয়। যে সংঘ এতে হাত দেবেন তার যোগ থাকা চাই দেশের সবার সংগে। জন-কয়েকের মধ্যে ও তাঁদের স্বার্থেই বদ্ধ থাকলে কাজ হবে না। এই সব বিষয়ে পূর্বেও অনেকে আবেদন জানিয়েছেন। তবু আজও জানাতে হবে কারণ অভাব তো পূর্ণ হয়নি। যাবৎ সুবৃষ্টি না হয় তাবৎ চাতকের দল তাদের জল-প্রার্থনা থামাবে কেমন করে?

(৪)

সামাজিক দিক দিয়েও বাংলা দেশের অনেক ভাববার কথা আছে। **বাঙালী হিন্দুরা ক্ষয়িষ্ণু।** যে অপরাধে এমন ঘটেছে তা দূর করতে হবে।

পূর্বে যখন আমরা গ্রামে থাকতাম তখন সেখানে সেইরকমের সমাজ-শাসন ছিল। সেই গ্রাম-সমাজও আজ ব্যাধিগ্রস্ত—আমরাও গ্রাম ছাড়া। সহরে এসেছি, সেখানে কোনো **শাসনই নেই।** বিদেশী-ভদ্রতা বা এটিকেটেরও ধার ধারিনে। এই অবস্থা কি কখনো ভাল হতে পারে?

আগে আমাদের বৃত্তি ছিল কৃষিগত, পারিবারিক ব্যবস্থা ছিল একান্নবর্তী। একজন মারা গেলে তার পরিবারের ভার অন্যেরা বহন করতেন। এ তো এক রকম ইনসিওরেন্স। এখন আমরা চাকরী করি, আর এই চাকুরীর দৌরাত্ম্যেই আমরা বঙ্কিম-শরৎচন্দ্রের 'চিন্ময়' সম্পদ সবটা পাইনি। এরই জন্য রাখালদাস মহেঞ্জোদারোর ও রসিক সিকদার এভারেস্ট আবিষ্কারের গৌরবে বঞ্চিত। আমাদের বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিক দার্শনিক সবাই নানাভাবে চাকুরীর জন্য বদ্ধ, আর আমরা তাই বঞ্চিত। চাকরীতে বদলী আছে, তাই ভাই ভাই নানা ঠাঁই। ঠিক বিলাতের মতই এখন পরিবারের উপার্জন কর্তা মারা গেলে গোটা পরিবারই অনাথ। বন্ধুবান্ধব আর কদিন সাহায্য করতে পারেন? অথচ আজও বিলাতের মত আমাদের মধ্যে অনাথাশ্রম, বৃদ্ধাশ্রম, বিধবাশ্রম প্রভৃতি কিছুই গড়ে ওঠেনি। অর্থাৎ আমাদের অবস্থা **"ন ঘরকা ন ঘাটকা"।** "Divorced from the old and not reclaimed by the new." এমন অবস্থায় ছেলেমেয়েরা যদি উপায়ক্ষম হয় তবু ভরসা। কিন্তু চাকুরীও দিন দিন দুর্লভ হয়ে আসচে। কলকব্জা ও হাতের শিল্পে সবাই যে প্রতিষ্ঠিত হবো বা ব্যবসা-বাণিজ্য করবো এমন ব্যবস্থাও হয়নি। আয় নেই বলে ছেলেরা বিবাহ বিমুখ, মেয়ে বিয়ে দিতে টাকার লোভ দেখাতে হয়, তাতেও নানা দুর্গতি।

একান্নবর্তী পরিবার প্রথা গেছে, চাকরীরও স্থিরতা নেই। কাজেই লোক দায়ে পড়ে ভয়ে ভয়ে সঞ্চয় করে। তাতে সমাজে সম্ভার হতে পায় না। অকারণে ভয়ে লোক সঞ্চয় করে, তাতে ক্রমে Capitalism-এর দিকে সমাজ ঝোঁকে। যদি সমাজে সকলেই খেতে-পরতে পাবে, এই ভরসা থাকতো তবে এইরূপ দুর্গতি হোতো না। অর্থের উদ্দেশ্যই চলাচল করার জন্য। তা বন্ধ হোলে নানা দুর্গতি আসতে বাধ্য। প্রবাসী বাঙালীদের হয়তো এই সবই বড় বিপদ। সকলে সমবেত হয়ে এই সব বিপদের প্রতিকার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হতে হবে। প্রাচীন-পন্থী বহু পরিবারে মেয়েরা শিক্ষা পান না, সেখানে উপার্জক মারা গেলে সঞ্চিত অর্থ বা উপায়ান্তর না থাকলে যে কী দুর্গতি হয় তা আর এই সভায় বলতে চাইনে। আপনারা কেউ কেউ নিশ্চয় তা জানেন।

তারপর **মেয়েদের শিক্ষাই** বা কি দিচ্ছি? য়ুরোপের বাতিল করা উচ্ছিষ্ট এবং এদেশের বর্তমান কালের জীবনযাত্রার অনুপযোগী একটা কিম্ভুত-কিমাকার শিক্ষাপ্রণালী দায়ে পড়ে আমাদের ছেলে-দের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আজকের জীবন-যাত্রার দুর্গতির দিনে ছেলেদের পক্ষেই তা একটা দুর্বহ ভার। সেই অদ্ভুত বস্তুটা যদি আজ আবার মেয়েদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়, তবে তার চেয়ে অসঙ্গত আর কি হতে পারে। মেয়েদের যথার্থ শিক্ষা কি হতে পারে তা আজ দেশ-বিদেশ ও আমাদের সর্বদিক দেখে, মেয়েদের বিশেষত্বগুলি প্রণিধান করে, মেয়ে পুরুষে মিলে, গড়ে তুলতে হবে। কিন্তু যাবৎ তা না হয়, ততক্ষণ মেয়েদের যাতে হঠাৎ নিরুপায় না হতে হয়, সেইজন্য যে শিক্ষাপ্রণালী আছে, তাতে যতই ত্রুটি থাক তবু তাইতো দিতে হবে!

(৫)

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য কোনো সংস্কৃতিরই সবটা ভাল নয় আর সবটা মন্দও নয়। পাশ্চাত্ত্যদের যা ভাল তাকে অস্বীকার করলেই বা চলবে কেন? খৃষ্ট বলেছেন, যার কিছু আছে সেই পায়। আমাদেরও যা ভাল তা যদি না রাখি, তবে অন্যের যা ভাল তাই বা নেব কেমন করে? তাদের যা ভাল বা আমাদের যা ভাল তা ছাড়লে কিছুতেই মঙ্গল নেই। আমাদের আপন সংস্কৃতির সঙ্গে আর এক সংস্কৃতির মিলনের যুগে যোগ্য সব যোগগুরু চাই। তাঁরা পুরোহিত হয়ে উভয় পক্ষের বৈশিষ্ট্য ও মহত্ত্ব রক্ষা করে কাজ করবেন। যুগে যুগে মহাগুরুরা সেই কাজই করে এসেছেন। একটা কুলীন গাছ যখন প্রাচীন হয়ে শক্তিহীন হয়, তখন যদি জোরালো নতুন গাছের সঙ্গে তার জোড় কলম বাঁধা যায়, তবে তাদের উভয়ের কৌলীন্য ও প্রাণশক্তি দুটোরই সঙ্গতি ঘটে। লুথর বরব্যাঙ্ক (Luther Burbank) এই রহস্য দেখিয়ে গেছেন। ভারতের প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে আজ যদি বিদেশী প্রাণবন্ত **সভ্যতার জোড় কলম** বাঁধা যায় তবে কী মঙ্গলই না হয়। তবে তাতে প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য দুই সংস্কৃতিরই ভাল দিকটা বজায় রেখে উভয়েরই মন্দটা বাদ দেওয়া চাই। এই বিষয়ে ঢাকা সহরের গুলীর আড্ডার একটি চমৎকার গল্প মনে আসচে। সে যুগে ঢাকাতে অস্ত্র চিকিৎসক সিমসন (Simpson) সাহেবের খ্যাতি ছিল বিক্রমাদিত্যের খ্যাতির মত। এক গুলীখোর বললে "জানিস, সেদিন চৈতা (চৈতন্য) নদীতে নাইতে নাবলো, আর কামটে (হাঙরে) তার কোমর পর্যন্ত নিয়ে গেল কেটে। **রক্তারক্তি। জল** ছেড়ে উঠলেই চৈতার মরণ। উপায়? নদীর ধার দিয়ে যাচ্ছিলেন ডাক্তার সিমসন। সবাই তাঁকে ধরলে। তিনি বললেন, 'পারি তো জুড়ে দিতে, কিন্তু দেহের তলার আধখানা পাই কৈ?' নদীর ধারে চরছিল এক বকরী, সবাই দিলে দেখিয়ে। সায়েব বললেন, 'তাই সই।' বকরীর তলার দিকটা জুড়ে দিলেন চৈতার উপরের দিকটার সঙ্গে। ওভাই, ভারি মজা। চৈতা যেমন চাকরী কত্তো তেমনি কচ্চে, মাসে মাসে মাইনেটাও পায়, আর দুবেলা আধ সের আধ সের করে দুধও দেয়। দিব্বি হয়েছে।"

এই রকমই তো চাই। চৈতার ভাল দিকটা বকরীর ভাল দিকের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে! চৈতার তলার দিকটা যদি বকরীর উপরের দিকের সঙ্গে জুড়ে দিতো তবে না হোতো চাকরী না হোতো দুধ। শিঙের গুঁতোই হোতো লাভ। তাই আমরাও চাই প্রাচ্যের ভালর সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যের ভালর যোগ। তা না হয়ে দুয়েরই খারাপ দিকটার যোগ হলেই সর্বনাশ। প্রাচ্যের ছিল স্নেহময় সরল সহজ জীবন, কিন্তু অভাব ছিল জ্ঞান বিজ্ঞানের। আর পাশ্চাত্ত্যের রয়েছে জ্ঞান-বিজ্ঞান, কিন্তু জীবন তার বড়ই বিলাস জটিল ও আড়ম্বর-বহুল। প্রাচ্যের সহজ জীবনের সঙ্গে চাই পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের যোগ। তবেই হয় চৈতার মত সৌভাগ্য। আর আমাদের ভাগ্যে ঘটেছে কিনা পাশ্চাত্ত্য আড়ম্বরবহুল জীবনের সঙ্গে আমাদের জ্ঞানহীন সংকীর্ণতা ও কুসংস্কারের যোগ। একেই বলে দুর্ভাগ্য। তার ফলে ভোগবিলাসবাহুল্য ও ছেলেদের বিবাহ-বিমুখতা। তাতে করে বহু সমস্যা ও পাপ সমাজে ঢুকচে।

(৬)

এখন কথা এই যে, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সঙ্গে **জোড় কলম** বাঁধবার মত সম্পদ আমাদের কি আছে? আমাদের সংস্কৃতি ও সাধনার ইতিহাস দেখলে বুঝবেন যে বঙ্গ মগধ মিথিলায় এমন একটি সভ্যতা ছিল যা বেদের সভ্যতার চেয়ে কম প্রাচীন বা কম গৌরবের নয়। বেদপন্থী আর্যেরা সেই সভ্যতার প্রভাবকে পছন্দ করতেন না। তাই তীর্থ-যাত্রা ছাড়া কেউ মগধ মিথিলা বঙ্গে গেলে তাঁরা প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে ছাড়তেন। মগধ বঙ্গ ছিল তখন একঘরে হয়ে। বেদে দেবতাদেরই জয়গান, বঙ্গ মগধের সভ্যতায় **মানুষই প্রধান।** অথর্বের মহীসূক্তে (১২,১) ও নু সূক্তে (১০,২;১১,৮) তার কিছু ইশারা মেলে। মানব ধর্মপ্রবর্তক মহাবীর ও বুদ্ধদেব এই দেশেরই লোক। জনক প্রভৃতি উপনিষদের মহর্ষিরাও এখানকার। সাংখ্যমত-প্রবর্তক কপিলও গঙ্গাসাগর সঙ্গমেই সাধনা করেন। এঁরা সবাই বেদাচার ও যাগযজ্ঞ বিরোধী, নিষ্কাম অহিংসার সাধক। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা ও কামনা জয়ের দ্বারা এঁরা মুক্তি ও নির্বাণ চান।

তবু বাংলাদেশে **বেদের আলোচনা কম** হয়নি। প্রাচীন তাম্র ও শিলা শাসনে দেখি, ভারতের নানা প্রদেশের রজারা বাংলায় সব বেদাচার্যকে নিয়ে আপন আপন রাজ্যে বেদ বিদ্যার উন্নতির জন্য ভূমিদান করে প্রতিষ্ঠিত করছেন। বহু উৎকৃষ্ট দার্শনিক গ্রন্থ বাংলাদেশে রচিত হয়েছে। **বৈশেষিক ও ন্যায়** দর্শনের জন্য বাংলাদেশের খ্যাতি সর্বত্র। বাংলার **শৈবগুরুরা** দক্ষিণ দেশে গিয়ে সেখানকার রাজগুরু হয়ে সে সব দেশে শৈবমত প্রচার করেছেন। বাংলার **বৈষ্ণবধর্মও** বহু প্রাচীন, তার প্রমাণ পাই পাহাড়পুরের মধ্যে। মহাপ্রভুর তিন চার শ' বছর পূর্বেকার সব বৈষ্ণব কবির কবিতা দেখতে পাই শ্রীধর দাসের সদুক্তি-কর্ণামৃতে (১২০৫ খৃঃ)।

মহাপ্রভুর মতকে গৌড়ীয় বা মহাপ্রভুর মত বলাই সঙ্গত। বৃন্দাবনের মধ্য দিয়ে তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বত্র। রাজপুতানায়, গুজরাটে এমনকি ডেরা ইসমাইল খাঁ পর্যন্ত তার প্রভাব দেখতে পাই। সেন-রাজবংশীয়দের সঙ্গে বাংলার শাক্তমত হিমালয় প্রদেশেও গেছে। নেপালে ও হিমালয়ের অন্যত্র বাংলার শক্তি সাধকেরা বাংলার শক্তিসাধনা নিয়ে গেছেন। বেলুচিস্থান হিংলাজেও বাঙালী সাধকদের প্রভাব দেখেছি।

বাংলার সব ধর্মেই ভারমুক্ত একটা স্বাধীন ভাব দেখা যায়। তার পরিচয় দিতে গিয়ে সুফীদের মধ্যে প্রচলিত একটি গল্প বলা যাক। এক রাজপুত্র ও কৃষক পুত্র পড়তেন এক পাঠশালে। শিক্ষা সমাপ্ত হোলে বহুকাল পরে এক তীর্থে উভয়ের দেখা। উভয়েরই পিতা তখন পরলোকে। কে কার বাপের সমাধি কেমন ভাবে দিয়েছেন সেই কথাই উঠলো। কৃষক পুত্র বললেন, "বাবার কবর মাটির, তার উপরে লাগিয়েছি এক গোলাপ গাছ।" রাজপুত্র সগর্বে বললেন, "এইমাত্র? আর আমার বাবার কবরের উপর ত্রিশ হাজার শিলা-শিল্পী বিশ বছর ধরে বিরাট এক সৌধ করেছেন রচনা।" কৃষকপুত্র বললেন, "মজাটা টের পাবেন তোমার বাবা কেয়ামতের (শেষ বিচারের) দিনে।" রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন?" কৃষকপুত্র বললেন, 'ভগবান ডাক দিতেই আমার বাবা মাটি ঝাড়া দিয়ে উঠবেন আর তোমার বাপকে একা শুধু হাতে এই পাষাণ-বাধা ভাঙতে পাঁচ শ বছর গলদঘর্ম হতে হবে। তারপর এত বিলম্বের জন্য শাস্তি তো আছেই।"

গল্পটার মর্ম এই যে, আমরা পাথরচাপা থাকি বলে অনেক সময় ভগবানের ডাক শুনতে পাইনে। কত রকম পাষাণভারেই আমরা চাপা পড়ে আছি! রাজ্য সম্পদ, বংশ-আভিজাত্য, বিদ্যাবুদ্ধি, ধন-মান এমন কি কুল-সম্প্রদায়েরও পাথরে আমরা সব ভারগ্রস্ত। বুদ্ধদেবের ছিল রাজ্য-আভিজাত্যের বাধা। তা তিনি সরিয়ে দিলেন। বিদ্যা ও জাতির বাধা সরালেন মহাপ্রভু।

বাংলাদেশের সৌভাগ্য সে চিরদিন ভারমুক্ত। আচার্য ব্রজেন্দ্র শীল একবার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"বাংলা দেশের বিশেষত্ব কোথায়?" কবিগুরু বলেছিলেন, "বাংলা দেশটি তৈরি পলিমাটিতে। পুরানো আমলের ভারি ভারি মন্দির প্রাসাদ এখানে যায় তলিয়ে। অথচ এখানকার সরস ভূমিতে বীজমাত্রেই প্রাণ পায়। এখানে প্রাচীনতার দায় নেই অথচ প্রাণের দাবি আছে।" এইজন্যই বাংলা দেশের ভাব ও ভক্তি ভারমুক্ত। তাই মহাপ্রভু বলেছেন,

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।।

(পদ্যাবলী, ৭২ অঙ্ক, রূপ গোস্বামী)

"আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয় নই, বৈশ্য নই, শূদ্র নই। আমি ব্রহ্মচারী-গৃহস্থ-বানপ্রস্থ বা যতিও নই।" আমি শুধু একজন প্রেমপথের পথিক।

বাংলা দেশের এই বিশেষত্বের জন্যই এখানে দক্ষিণ ভারতের মত অস্পৃশ্যতা নেই। সাম্যবাদের দেশ বলেই মহাপ্রভু

সন্ন্যাসী-পণ্ডিতদের করিতে গর্বনাশ।
নীচ শূদ্র দ্বারা করে ধর্মের প্রকাশ

(চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত, ৫ম)।

তাই শ্রীমদদ্বৈতাচার্য যবন হরিদাসকে ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধপাত্র খাওয়ালেন। হরিদাস তাই সঙ্কোচের সঙ্গে বলেছেন,

বিপ্রের শ্রাদ্ধপাত্র খাইলু ম্লেচ্ছ হইয়া

(চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত, ১১শ)।

এই দেশ মেনেছে প্রেমকে। প্রেম কখনো শাস্ত্রের বা নিয়মের অধীন নয়। সে স্বাধীন। তাই মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র কবিকর্ণপুর বললেন—

শাস্ত্রীয়ঃ খলু মার্গঃ পৃথগনুরাগস্য মার্গোদন্যাঃ।
প্রথমোহপি সনিয়মতাম্ অনিয়মতাম্ অন্তিমো ভজতে॥

(চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ২য় অঙ্ক)।

প্রেমের জোরে বাংলার ভক্তরা ভগবানকেও মানবের সমান করে নিয়েছেন। এখানে ভগবান বলেন,

আমারে ঈশ্বর মানে আপনারে হীন।
তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন॥

(চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, ৪র্থ)

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ চিরদিন সাম্যবাদী—অন্য সব দেশে রাজারাই ভূস্বামী। ভূমি দান করবার সময় তাই তাঁরা শাসনে লেখেন, "বিদিতমস্তু ভবতাম্" অর্থাৎ "তোমাদের জানাচ্ছি।" আর এখানে প্রজাই ভূস্বামী। তাই ভূমি দানকালে বাংলা দেশে রাজারা লিখতেন, "মতমস্তু ভবতাম্"—"এই ভূদানে তোমাদের সম্মতি চাই।" এই দুইএ বিস্তর প্রভেদ। এখানে প্রজারাই ভূমির মালিক। প্রয়োজন হলে মূল্য দিয়ে রাজাকে ও রাজপুরুষকে প্রজার কাছে ভূমি কিনতে হোতো। ১৯৩৭ সালে মেদিনীপুরে সম্রাট শশাঙ্কের দুইটি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। তার দ্বিতীয়টিতে দেখা যায়, সম্রাটের মহাপ্রতিহার শুভকীর্তিকে দানার্থ চল্লিশ দ্রোণ ভূমি প্রজাদের কাছে যথা নিয়মে কিনতে হয়। তাম্রশাসনে প্রজাদের সম্মতি জানানো হয়েছে "ক্রীত্বা ক্ষত্তো যথান্যায়ম্"—"এই জমি আমাদের কাছে থেকে যথানিয়মে কেনা হয়েছে।" এই বাংলা দেশে অরাজকতা হয়েছিল বলে প্রজারা দিব্বোককে রাজা নির্বাচন করেন।

ধর্মজগতেও এখানে সেই সাম্যবাদ। বুদ্ধদেব বলতেন, "আত্মদীপোভব।" আপনার মধ্যে আপনার যে দীপ তাই জ্বালাও। মৃত্যুকালে তিনি আনন্দকে বল্লেন, "আত্মদীপা বিহরথ।" বারবার তিনি বলেছেন, "অত্তা হি অত্তনো নাথো কো হি নাথো পরো সিয়া"। অর্থাৎ আপনিই আপনার নাথ, অপরে নাথ হবে কেন?

বাংলা দেশের মাথায় হিমালয়, তাই তার আদর্শ মহান্। তার হৃদয় সমতল তাই শাস্ত্রভারে সে আক্রান্ত নয়। নিয়মের পথ তার পথ নয়। তার পথ প্রেমের পথ। এখানকার বৈষ্ণবে বাউলে সর্বত্র এই স্বাধীনতা। শাক্তরাও এখানে দেবীকে মাতৃরূপে, কন্যারূপে এমন কি প্রণয়িনীরূপেও পেয়েছেন।

সংস্কৃত রচনায় গৌড়ীয় রীতি সংস্কৃতের সেবাদাসী মাত্র। তাই গৌড়ীয় রীতি ভারাক্রান্ত। বাংলার নিজস্ব সাহিত্য ভারমুক্ত। দক্ষিণ ভারতের শার্ঙ্গদেব লিখলেন, সঙ্গীত রত্নাকর, নিয়ম ব্যাকরণ নিয়েই তার কারবার। আর সঙ্গীতের প্রেমিক গীত-রচয়িতা জয়দেব জন্মালেন বাংলা দেশে। তিনি গানের শিল্পী। আজও সারা ভারতের গান-জগতে তিনি অদ্বিতীয় সম্রাট। রবীন্দ্রনাথ যদিও ক্লাসিকাল সুরে বিস্তর গুরুগম্ভীর গান রচনা করেছেন তবু যেখানে তাঁর আপন রচনা সেখানে তিনি ভারমুক্ত। বাংলার ছনমুখ ভাস্কর শিল্প যেমনি গভীর তেমনি ভারহীন। বাংলার সেই স্বাধীন ধারাটি চিনেছিলেন মহামতি হ্যাভেল। সেই পথেই গেছেন অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রভৃতি শিল্পীর দল। বাংলার এই "অনিয়মতা" দেখে "সনিয়মতা"র উপাসক রাজপুত্রের দল আজও উৎকণ্ঠিত। তাঁরা জানেন না বাংলা কোনোদিন বিধাতার ডাকের পথে এত মর্মর পাষাণের বাধা সইতে পারবে না।

(৭)

বাংলাদেশ শুধু ভারমুক্ত সাম্যবাদেরই ক্ষেত্র নয়, সমন্বয়েরও মহাতীর্থ বাংলাদেশ। এখানে আর্য-আর্যেতর নানা সংস্কৃতির সমন্বয়ও ঘটেছে। সেই সংস্কৃতিতে উচ্চ নীচ নানারকমের সাধনাই আছে। যখন শান্তিনিকেতনে বসে রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি লিখেছিলেন তখন অদূরে সাঁওতাল গ্রামে বোঙ্গার পূজা চলছিল। কেউ কাউকে বাধা দেয়নি। সহস্রতন্ত্রী বীণার সরু মোটা নানা তার, কোনোটার সুর উঁচু কোনটা নিচু। গুণী বাদকের হাতে সব তারের ধ্বনি মিলিয়ে পরিপূর্ণ সুর-সঙ্গীত বাজে। তাই কোন তারই বাদ দেওয়া চলে না। কৃপণাত্মারা শুধু এই বৈচিত্র্যকে মেরে এমন অপূর্ব সমৃদ্ধ বীণাকে একঘেয়ে একতারাতে পরিণত করতে চান। বাংলার মহাগুরুরা এই সুর-সঙ্গীতই চেয়েছেন। তাঁরা বাদ দেননি, পূর্ণ করেছেন।

বাংলা দেশের একটি সুকুমার পরশ যে আছে তা বুঝি বাংলার মসলিনের তাঁতী, পটুয়া, দপ্তরী ও সোনা রূপার সূক্ষ্ম কাজে। এই সুকুমার একটি মানবতার বোধ ও সমন্বয়ের ভাব মনে ছিল বলেই মহাপ্রভু সংসারে ও সন্ন্যাসে একটি সমন্বয় করেছিলেন। বাউলদের সাধনা ও সঙ্গীতের মধ্যেও সেইটি পাই। রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের মানবসেবার মধ্যেও অধ্যাত্মসাধনা ও মানব সংসারের সেবার সমন্বয়।

বাংলা দেশে খাদ্যেও সমন্বয়। বাংলার রান্নায় নানা তরিতরকারীর একত্র সমাবেশ। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও তার প্রভাব এখন পড়েছে। বাংলার সন্দেশ রসগোল্লাও অন্য সব প্রদেশের হৃদয় জয় করেছে। এই যুগে আর একটি জিনিষ বাংলাদেশ সকলকে দিয়েছে তা হোলো ছেলে-মেয়েদের সুন্দর অর্থযুক্ত নাম। নামে আর এখন বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী চেনবার যো নেই। সাজ-সজ্জাতেও বাংলাদেশ অন্যকে অনেকটা আপন করে তুলতে পেরেছে।

নানা তন্ত্রীর বীণার মত নানা কবিতার কাব্য-মালা বা anthologyর পথও প্রথম দেখিয়েছে বাংলাদেশ। ১০০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি বঙ্গাক্ষরে লেখা কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়ের পুঁথি টমাস সাহেব সম্পাদন করেছেন। ১২০৫ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণ সেনের সময়ে শ্রীধর দাস সদুক্তি কর্ণামৃত রচনা করেন। তার ৪২ বছর পরে কাশ্মীরের জল্হণ কবি সংগ্রহ করেন তাঁর সুভাষিত মুক্তাবলী। ১৩৩৬ সালে সংগৃহীত হয় শার্ঙ্গধর পদ্ধতি ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে সুভাষিতাবলী। তার পর ক্রমে নানাস্থানে আরও নানারকমের কাব্যচয়নিকা সংগ্রহ করা হয়। ১৫৪১ সালে শ্রীরূপ গোস্বামীর পদ্যাবলীতে নানা ভক্ত কবির বাণী সংগৃহীত দেখি। এর ৬৩ বৎসর পরে পাঞ্জাবে গুরুদের বাণী সংগৃহীত হয় গ্রন্থসাহেবে। তার কিছু পূর্বে রাজপুতানায় দাদূর প্রার্থনায় রচিত হয় "সর্বাঙ্গী" ও "গুণগঞ্জনামা"।

বাংলার মাটিতে বীজ মাত্রই মূর্তিমান হয়ে ওঠে। বাংলা দেশের কাজই কি তবে অরূপ সব ভাবকে রূপ দেওয়া? ভারতে নানা দেশে দেবতার ধ্যান মনে মনে রেখেই (ঘটে বা শিলাদিতে) পূজা হয়। বাংলা দেশই সকলকে মৃন্ময় প্রতিমা দেখিয়েছে, আর সকলের উপর তার প্রভাবও ক্রমে দেখা যাচ্ছে। বাংলার মহাকবিরাও অনেক অমূর্ত ভাবকে মূর্তি দিয়েছেন। কিন্তু এই ক্ষেত্রে জগতে বাংলা দেশেরই একটি অপূর্ব কীর্তি হলো ভাবরূপক কাব্য বা allegory। ১০৬৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি মধ্যভারতের কীর্তিবর্মার রাজ্যকালে কৃষ্ণ মিশ্র প্রবোধ চন্দ্রোদয় নামে নাটক লেখেন। তাঁর বাড়ী ছিল রাঢ়ের ভূরিশ্রেষ্ঠ গ্রামে। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে কবি কর্ণপুর রচনা করেন চৈতন্য-চন্দ্রোদয়। ১৬৬২-৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রবোধ-চন্দ্রোদয়ের পারসী অনুবাদ হয়। তার নাম গুলজার-ই-হাল। এই পদ্ধতিতেই পরে বেনিয়ান তাঁর "পিলগ্রিমস প্রগ্রেস" রচনা করেন। আজ সারা জগতে তার সমাদর। এই ভাবরূপক কাব্যের সূচনা বৌদ্ধযুগে দেখা গেলেও তা চাপা পড়ে যায়। তাকে জাগিয়ে তোলেন বাঙ্গালী কবি।

মাতৃভাবে উপাসনাই বাংলায় বেশি প্রচলিত' হয়ত তা দ্রাবিড় প্রভাবেই ঘটেছে। মাতৃভাবের উপাসনাতেই যে বাংলা দেশ দুর্বল হবে একথার কোনো অর্থ নেই। গুরুগোবিন্দ যখন নিরীহ শিখদের বীর করে তুলতে চাইলেন তখন বঙ্গ-

প্রচলিত মাতৃভাবের সাধনার **গ্রন্থ মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও চণ্ডী** তিনি অনুবাদ করিয়ে **শিখদের** মধ্যে প্রচলিত করলেন। তাঁর ব্যবস্থায় শান্ত বৈরাগী বন্দাও বীরযোদ্ধা হয়ে উঠলেন। **কুন্তী দ্রৌপদী** কিরূপ বীর ছিলেন তা মহাভারত পড়লেই দেখা যায়। আর বীর নারী **বিদুলার** উপদেশগুলিতে মনে হয় আগ্নেয়গিরির অগ্নিবর্ষণ চলেছে। মহাভারতের উদ্যোগ-পর্বের ১৩৩তম অধ্যায়টি পড়ে দেখবেন।

তন্ত্র শাস্ত্র আলোচনা করলে বুঝতে পারি মানবের মহত্ত্ব। সর্ব চরাচরে সব তত্ত্ব মানবেরই মধ্যে। তন্ত্রমতে মানবের মধ্যে যুক্ত করে বিশ্ব চরাচরকে উপলব্ধি না করলে মানুষের সাধনা কখনই সম্পূর্ণ হতে পারেনা। আর এই বিশ্বচরাচরের প্রকৃতির মধ্যেই সর্বশক্তি। শক্তি বাদ দিলে শিবও শব মাত্র। **মহানির্বাণ তন্ত্র** বলেন, পরাপ্রকৃতিই আমাদেরই ঘরে ঘরে কন্যা-পত্নী-জননীরূপে নারী মূর্তিতে বিরাজিতা। এই নারীর অবমাননায় আদ্যা-শক্তিরই অবমাননা। বাংলার বৈষ্ণব বাউলেরাও বলেন, সর্বমানবভাবে না পেলে ভগবানকে পাওয়াই হোলোনা। কাজেই মানবের মধ্যেই বিশ্বচরাচর ও বিশ্বাত্মা এই কথা বাংলা দেশের তন্ত্র ও বৈষ্ণব-বাউল সর্বমতেরই সার কথা।

গুড় হতেই নাকি গৌড় নাম। বাংলার মূলেই তবে মাধুর্য আছে। কিন্তু ইক্ষু পিষ্ট না হলেও ইক্ষুরসকে অগ্নিতে সিদ্ধ না করলে তো গুড় হয়না। প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে সাধনার মিলনে মানব-সংস্কৃতি-সমুদ্র মন্থন করে যে অমৃত উঠবে তার একটি প্রধান সাধনপীঠ হয়তো এই বঙ্গদেশ। তাই বাংলাদেশে এত পেষণ ও এত দাহ দেখা যাচ্ছে। কবে হতেই তো তার আরম্ভ। কবে তার শেষ হবে কে জানে? এই জন্যই বাংলার রামমোহন দেশ হতে দূরে গিয়ে রাখলেন তার দেহ। সারাজীবন রবীন্দ্রনাথ একটু বিশ্রাম পাননি। রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে এজন্য বাংলার ছেলেমেয়েরা কী দুঃখই না পেয়েছে। খৃষ্ট বলেছেন, 'যে গাছটার কাছে কিছু আশা আছে তাকেই কেটেছেঁটে বহু দুঃখ দেওয়া হয়।' দুঃখ তো দেখছি, পরিপূর্ণতা দেখা দেবে কবে? এইজন্যই পরপর রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ প্রভৃতি কত মহাগুরুকেই ভগবান বাংলাদেশে পাঠালেন। তাঁদের সাধনার ফল কখনো ব্যর্থ হবেনা। আমাদের চরিত্রগত কৃপণতা যেন সেই পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায় এইটেই বারবার দেখতে হবে।

(৮)

এইজন্যে এই সম্মিলনে সব কথার উপরে বলছি চরিত্রের কথা, সব দাবীর উপরে জানাচ্ছি চরিত্রের দাবী। মূল বাংলা দেশেও বার বার এই দাবী অনেকেই জানিয়েছেন। এখানে আমিও তা-ই জানাচ্ছি। এই দাবী যতক্ষণ পূর্ণ না হয় ততক্ষণ তো এই কথা পুরাতন হবে না। আজ মূলস্থান বাংলাদেশে যদি এই সাধনা পূর্ণভাবে না হয়ে থাকে তবে তাকে পূর্ণ করতে হবে এই প্রবাসী বাঙ্গালীদের তপস্যায়। বিরাট বটগাছের মূল যখন গাছটার সব অভাব পূর্ণ করতে না পারে তখন মূলকে তার শাখাগুলি বলে, "ভয় নেই ভাই মূল, আমরা তো চারদিকে আছি। আমরা চারদিক থেকে নানা শেকড় মাটিতে পাঠিয়ে দিচ্ছি, নতুন রসধারা আসবে নতুন নতুন সব আশ্রয়স্তম্ভ রচিত হবে। তোমার সব অভাব আমরাই চারদিক হতে পূরণ করে দেব।"

প্রশ্ন হতে পারে, "এই সাধনার জন্য যে **বৃহৎ তপস্যা** ও দৃষ্টি চাই তা **প্রবাসী হয়ে** আমরা পাব কেমন করে?" অনেক সময় যে দৃষ্টি মূলস্থান-বাসীরা না পান তা পেয়ে ধন্য হন প্রবাসীরা। ঘরে থাকলে যে দৃষ্টিটি খোলেনা, সেই দৃষ্টি খুলে যায় বাইরে গেলে দূরে গেলে। **কি করে সে রকম হয়** তা বলছি।

১৯২৪ সাল, ২১শে মার্চ, দোল পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় গঙ্গা ও তার দুইকূল প্লাবিত। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চীনে-জাপানে চলেছি। সন্ধ্যার পর গঙ্গার মোহানার কাছাকাছি গঙ্গার শোভা কবিগুরু দুই চোখ ভরে দেখছিলেন। দেখতে দেখতে তিনি বললেন, "**দেশকে ছাড়বার সময়ই** তার যথার্থ রূপটি চোখে পড়ে। বারবারই আমার জীবনে তা দেখেছি। মায়ের গর্ভে থেকে শিশু মাকে দেখতে পায়না, দেখতে পায় গর্ভের বাইরে এসে, আরও ভাল করে দেখতে পায় বুঝতে পারে দূরে গেলে। এই জন্যই আমরা জীবনে যাকে বুঝিনে তাকে বুঝি তার মৃত্যুতে।"

অথর্ববেদের একটি মন্ত্র মনে এলো—
"অন্তি সন্তং ন জহাতি অন্তি সন্তং
ন পশ্যতি।" (১০,৮,৩২)

"যাকে হারাইনি, তা যত ভালোই হোক না, তাকে দেখতেও পাইনা।" কথাটা খুবই সত্য। তাই প্রবাসী বাঙ্গালীদেরই বাংলাদেশকে ভাল করে চেনবার কথা। দেশের জন্য তাদের বেশি দরদী ও ত্যাগী হবার কথা।

পূর্বকালে মধ্য এসিয়ায় শ্যামদেশে চীনে বহু ভারতীয় লোক বাস করেছেন। তাঁরা যেমন করে ভারতকে চিনেছিলেন ভালবেসেছিলেন ও ভারতের জন্য দারুণ দুঃখ স্বীকার করেছিলেন, তেমন করে হয়তো খাস ভারতীয়েরাও পারেননি। মধ্য এসিয়ায় **কুমারজীব,** কাবুলের **গোতম সঙ্ঘ দেব,** শ্যামদেশের **সংঘবর্মণ** চীনবাসী ব্রাহ্মণপুত্র **প্রজ্ঞাদেব** প্রভৃতি বহু মহাপুরুষ তার উদাহরণ। ভারতের গৌরবার্থে তাঁরা প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হননি। তাঁরা কত দুর্গম পথে গিয়ে ভারতের সংস্কৃতি ও সাধনা অন্যদেশে বিতরণ করেছেন। তাঁরা প্রত্যেকে মনে করতেন, "আমি আমার মাতৃভূমির সুদূরস্থিত একমাত্র সংস্কৃতি-দূত।" মূল-ভারতে হয়তো এতটা সচেতন সাধনা তখন দেখা যায়নি। দূরে গিয়েই যেন দেশের সঙ্গে তাঁদের যোগ আরও দৃঢ় হোলো ইতিহাসেও বার বার এই লীলাই দেখা যায়।

হাজার দেড়েক বছর আগে ভারত হতে অনেক **তামিলবাসী সিংহলে** গেলেন। তাঁরা এখনও পুরাতন সেই তামিল ভাষা ও সাহিত্য বাঁচিয়ে রেখেছেন। ভারতে এখন কোনো তামিল পণ্ডিত বিনা টীকা ভাষ্যে "কুরাল" তা "আলবর"দের বাণী বুঝতে পারেন না। কিন্তু সিংহলী তামিল মুচি মেথরও তা অনায়াসে বুঝতে পারেন। কয়েক শতাব্দী পূর্বে যে সব **স্পেনীয়েরা** আমেরিকা গিয়ে বাস করেছেন তাঁদের সন্ততিরা প্রাচীন স্পেনীয় কবিদের ভাষা অনায়াসে বুঝতে পারেন, খাস স্পেনের লোকেরা তা পারেন না। শ' দেড়েক বছর আগে কিছু **রুশ দেশীয়** লোক এসে আমেরিকায় এসে সান-ফ্রান্সিস্কোর কাছে এক এক পর্বতের চারদিকে বসবাস করেন। এখনও তাঁরা তাঁদের দেশের পুরাতন সব সঙ্গীত-কলা ও সাহিত্য পুরোপুরি বজায় রেখেছেন। এখন খাস রুশ দেশ থেকে তা দেখতে রুশীয়েরা সেখানে যান। কারণ রুশ দেশ তা হারিয়ে ফেলেছে। **বালিদ্বীপে** হিন্দুদের ধর্মে যতটা উৎসাহ ভারতীয় হিন্দুদের ততটা আছে কি না সন্দেহ। কাজেই দেশের সন্তানদের নানাদিকে না পাঠালে দেশ ক্রমে প্রাণহীন হয়ে পড়ে। ভারতীয়েরা যখন সপ্তসাগর পাড়ি দিয়ে নানা দেশ যাওয়া আসা করতেন তখন দেশ ছিল শক্তিশালী। ভারতবর্ষ যেই সমুদ্র যাত্রা তুলে দিল অমনি একশ বছর না হতেই ভারতে বিদেশী অভিযান আসতে লাগলো, আর পরাজিত হয়ে ভারত পরাধীন হতে সুরু কোরলো।

ভারতীয়রা পররাজ্যলোভী ছিলেন না। পূর্ব-ভারতীয় বৌদ্ধ নাবিকরা পূর্বে দিকে গিয়ে সকলের সঙ্গে যে আত্মীয়তা করলেন তাতে সেই দিক হতে ভারত নিরাপদ হোলো। পশ্চিম ভারতীয় জৈন সাধকেরাও যদি সেই রকম পশ্চিমদিকে সকলের সঙ্গে সংস্কৃতি ও ধর্মগত আত্মীয়তা করে রাখতে পারতেন তবে ঐ দিক হতেও ভারতের বিপদ কখনো আসতো না। ভারত যে দিকে আপনাকে বিস্তৃত করতে না পারলো সেই দিক দিয়েই তা মরণ এলো।

দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলেও দেশ থেকে বাইরে যেতে হয়। বিপরীত স্রোতে নৌকা নিয়ে যেতে হলে নৌকা ছেড়ে নেমে গুণ টানতে হয়। নৌকা হতে দূরে থাকলেও গুণের মধ্য দিয়ে যোগটা বজায় থাকা চাই। আজ এই সম্মিলনে বারবার সেই কথাই মনে রাখতে হবে।

গুণ টানতে হলেও নানাদিকে নানাজনে টানলে চলবে না, সংহতি ও উদ্দেশ্যের ঐক্য চাই, তবেই সব প্রতিকূলতা জয় করা যায়। আবার গুণ টানতে হলে যে **মাটিতে** দাঁড়িয়ে টানতে হবে তাতেও সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। আগে যাঁরা বাঙ্গলা দেশ ছেড়ে এই সব দেশে আসতেন, তাঁরা এই দেশকে শ্রদ্ধা করেছেন ও এই দেশবাসীকে ভালবেসেছেন। এখানকার সঙ্গেও তাঁরা সুখে-দুঃখে অন্তরে অন্তরে যুক্ত ছিলেন। এখন যদি আমরা সেই ধর্ম হতে ভ্রষ্ট হই তবে আমাদের সাধনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। আমাদের উচিত স্থানীয় লোকদের সঙ্গে প্রতি-যোগে যুক্ত হওয়া ও এখানকার সামাজিক আচার-বিচার সংস্কৃতি সাহিত্য ধর্ম প্রভৃতি ভাল করে জেনে বাঙ্গলা সাহিত্যকে তার দ্বারা সমৃদ্ধ করা। এমন করে সর্বভারতের তথা বাংলা দেশের একটি পূর্ণাঙ্গ সুবিচারপূর্ণ ইতিহাস বাংলাতে রচনা করা সম্ভব হবে।

অবশ্য এমন দিন ছিল যখন আমরা কোনো অন্যায় করলেও এই দেশীয়েরা তা সহ্য করতে বাধ্য হতেন। কারণ তখন রাজকর্মে বাঙ্গালী, ডাক্তার উকীল বাঙ্গালী। এখন সেদিন নেই। এ'রাও যোগ্য হয়েছেন। এ'দের এই যোগ্যতাতে প্রবাসী বাঙ্গালীদের কম গৌরব নয়। কারণ অনেক বাঙ্গালী পাশ্চাত্য বিদ্যার গুরু হয়ে এদেশে এসেছিলেন। তা না হোলেও আশ্রয় ভূমিকে তুচ্ছ করা বা সেই দেশবাসীর সঙ্গে আত্মীয়তা না রাখা অতিশয় অন্যায় হোতো। অন্যকে ছোট করে কে কবে বড় হতে পারে!

(৯)

জাতিভেদ কখনও দক্ষিণ ভারতের মত এই সমতল বাংলা দেশে তীব্র হতে পারে নি। এখানেই ঐক্য ও সংহতি সব প্রদেশ থেকে বেশি হবার কথা। কিন্তু ফলে দেখি উল্টো। আগে আমাদের দেশে জাতিভেদ সত্ত্বেও এক জাতির ও এক সমাজের লোকের মধ্যে একটি সুন্দর সাম্যবাদ ছিল। এক-জন হাইকোর্টের জজের ও দরিদ্র পাঠশালার গুরু মশায়ের মধ্যে কোনো প্রভেদ করা সমাজের কোনো ক্ষেত্রে তখন সম্ভব ছিল না। তারপর সাম্যবাদী ইংরাজী সাহিত্য দেশে এলো। মনে ভাবলাম জাতিভেদের যেটুকু বিষ আছে ক্রমে তা ধুয়ে মুছে যাবে। কিন্তু একী দুর্ভাগ্য, এখন আবার সব অত্যন্ত ঘৃণিত রকমের জাতিভেদ দেখা দিয়েছে। সে জাতিভেদের বিচার হচ্ছে **টাকা-পয়সা** দিয়ে। পূর্বে প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে পরস্পরে খুব একটা ঐক্য ও সৌহৃদ্য ছিল। আর এখন শুনি সেদিন আর নেই। এক এক সহরে এই রোগটা নাকি আরও দারুণ। সংস্কৃতি ভুলে যাঁরা টাকার উপর নতুন আভিজাত্য স্থাপন করতে

চাচ্ছেন তাঁরা মনে রাখবেন এই যুদ্ধে অনেক মনুষ্যত্বহীন অসাধু লোক লক্ষ লক্ষ টাকা কামিয়েছেন। সেই সব দলের সঙ্গেই কি এক পংক্তিতে বসতে পারলে ভাল হবে? তারপর ভবিষ্যতে কার ছেলেপিলে কেমন চাকরী পাবেন তারই বা ঠিক-ঠিকানো কি আছে? স্বাধীনভাবে সংস্কৃতির সাধনা করা চলে। সেই সংস্কৃতি ভাসিয়ে দিয়ে যদি পরায়ত্ত চাকরীর দিকেই তাকিয়ে থাকি, আর তাও না জোটে তবে কোন্ দুর্গতির অতল-স্পর্শ গহ্বরে যে তলিয়ে যেতে হবে তাই ভেবে কূল পাইনে। তা ছাড়া এখন পাশ্চাত্য আরও নতুন নতুন নানা রকমের সাম্যবাদ আমাদের দেশে আসতে সুরু করেছে তার কাছেই বা আমরা তবে মুখ দেখাবো কোন্ লজ্জায়?

বাঙ্গালী ছাড়া আর সবাই পরস্পরকে সহায়তা করে। একটি শিখ একটি মাদ্রাজী কি একটি চীনবাসী যেখানে গেছে সেখানে ক্রমে ক্রমে সেই দেশবাসীর একটি উপনিবেশ বসে গেছে। চাকুরের সঙ্গে সেই দেশী মুদি শিল্পী উকীল ডাক্তার একে একে আসতে থাকেন। বাঙ্গালীদের দেখি ঠিক বিপরীত। যে শাখায় বসে আছি একদিন সেই শাখা ছেদন করেছিলেন এক মূঢ় কালিদাস আর এখন করছি আমরা। স্বদেশদ্রোহী এরূপ ক্ষুদ্রতার প্রশ্রয় দেওয়া কখনই শ্রেয় নয়।

আমাদের এই ক্ষুদ্রতার সুবিধা আদায় করেন অন্যেরা। রবীন্দ্রনাথের কবিতা যখন বাংলার চিত্ত জয় করতে সুরু করেছে তখন থেকেই তার বিরুদ্ধে আমাদেরই নানাবিধ চেষ্টা চললো। প্রথমে বলা হোলো ওর মধ্যে কিছুই নেই, যা আছে তা ন্যাকামি ও ফাঁকি। তারপর যখন দেখা গেল তবু তার আদর হচ্ছে তখন বলা হোলো ওর সবটাই বিদেশী, খৃষ্টানী। **গীতাঞ্জলি** পড়বার পরে যখন য়ুরোপে একটা বিস্ময় জাগলো, যখন পাশ্চাত্ত্য সব মনীষীরাই বললেন, "এইসব কথা আমাদের কাছে একেবারে অভিনব", তখন আমাদের সুরও বদলালো। আমরা তখন বললাম, "তাইতো এই সব কথা তো সবই বেদে আছে, বৈষ্ণবদের মধ্যেও আছে, এইসব কবিতার এক অক্ষরও নতুন নয়।"

বিলেতে যাঁরা প্রাচ্যদেশ শোষণ ও শাসন করেন রবীন্দ্রনাথের এই সম্মান তাঁদেরও ভাল লাগেনি। তাঁরা আমাদের দেশবাসীদেরই কথাই সব উধৃত করে প্রমাণ করালেন যে, রবীন্দ্রনাথ এই সবই পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও খৃষ্টধর্ম হতে পেয়েছেন। তখন রবীন্দ্রনাথকে কবীর প্রভৃতি অনুবাদ করে দেখাতে হোলো যে, এই রকমের কথা পাশ্চাত্ত্যদের আসবার আগেও ভারতে ছিল। তাতে আবার হিন্দীওয়ালা কেউ কেউ বললেন, "তবে তো রবীন্দ্রনাথ কবীরের কাছেই সব নিয়েছেন।" অমনি এভেলিন অন্ডার হিল প্রভৃতি বললেন কবীরও এই সব কথা খৃষ্টধর্মের কাছে পেয়েছেন। তখন বলতে হোলো কবীরের এইসব কথা খৃষ্টের পূর্ব-যুগ থেকেই ভারতে চলে আসচে।

আর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কবীরের বা অন্যসব সাধকের বাণীর যে মিল আছে তা আগাগোড়া বাদ দিলেও রবীন্দ্রনাথের রচনা সমুদ্রের একটুও আয়তন কমবে না; তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যাঁরা কথাবার্তা বলেছেন বা তাঁর পত্রগুলি যাঁরা পড়বেন তাঁরাই বুঝবেন রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার তো অন্ত ছিল না। তার শত ভাগের একভাগও তিনি তাঁর রচনায় ধরে রাখতে পারেন নি। একটা কথা এইখানে বলি, যাঁরা এত জোর গলায় রবীন্দ্রনাথকে কবীরের কাছে ঋণী বললেন তাঁরাই কবীরকে এতদিন পর্যন্ত হিন্দী সাহিত্যের নবরত্নের মধ্যে স্থান দেননি। যখন রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে জগতে কবীরের সমাদর হোলো তখনই তাঁরা কবীরকে পংক্তিতে তুললেন। এখনও তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ কবীরের এই সম্মানটুকু পছন্দ করেন না।

এবারও **P. E. N. সম্মিলনে** দেখলাম যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে খাটো করতে চান তাঁদের উপজীব্য প্রমাণ সব বাঙ্গালী সমালোচকদেরই লেখা। সেই সব লেখা উধৃত করে কেউ কেউ আলাপ করলেন যে, ভারতের এই যুগের শ্রেষ্ঠ কবি বাংলা দেশের নন তিনি পাঞ্জাবের। আর তার উপকরণ যোগালেন বাঙ্গালী সব সমালোচকের দল। কি চমৎকার! ছিন্নমস্তা দেবীর মত আমরা আপন রক্তলোলুপ রাক্ষসাচার। জোঁকের রক্ত জোঁকে খায় না এই কথা আমরা মানিনে। অথচ এইসব নিন্দাপরায়ণ আমরাই বিলেতে গেলে রবীন্দ্রনাথের পরম-আত্মীয় পরিচয়ে সুবিধা আদায় করতেও ছাড়িনে। আবার নিন্দকের অনেকেই তাঁর কাছে ঋণী ও নানাভাবে স্নেহপ্রাপ্ত।

মহাত্মাজীর নিমন্ত্রণে ১৯২০ সালে এপ্রিল মাসে রবীন্দ্রনাথ গুজরাটে যান সেখানকার সাহিত্য-পরিষদের মহোৎসবে সভাপতিত্ব করতে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপে ও তাঁর কাব্য পড়ে গুজরাটে তাঁর প্রতি একটি গভীর শ্রদ্ধা জাগ্রত হোলো দেখে এলাম। পর বছর আমি আমার নিজের কোনো কাজে গুজরাটে গিয়ে দেখি রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ও শান্তিনিকেতনের কুৎসা অনেকের মুখে। একটু বিস্মিত হলাম। কারণটা বোঝা গেল না। আমার পরম বন্ধু এবং রবীন্দ্র সাহিত্যভক্ত স্বর্গগত করুণাশঙ্কর কুবেরজী ভট্ট বললেন, "এই সবই আপনার দেশবাসীর কীর্তি। এখানে এসে এই সব বিষ ছড়িয়ে গেছেন। এই রকম নীচতা কোথাও দেখলেই বুঝবেন যে, এর মধ্যে জ্ঞাতিভাই কেউ আছেন। একটা জৈন গল্প জানেন? একবার এক কামার কতকগুলি বাঁটহীন কুড়ল দড়িতে গেঁথে গলায় ঝুলিয়ে জঙ্গল পথে যাচ্ছিল। এতগুলি কড়ল একসঙ্গে দেখে তো গাছদের হৃৎকম্প উপস্থিত! তখন একটি বৃদ্ধ গাছ বললে, 'এখনো ভয় নেইরে ভাই। দেখছিস নে এইসব লোহার কুড়লের পিছনে এসে এখনো আমাদের জ্ঞাতিরা যুক্ত হয়নি। এখনো যে কুড়লের বাঁটই নেই।"

কুঠারমালিকাং দৃষ্ট্বা সর্বে কম্পানিতা দ্রুমাঃ।
বৃদ্ধ দ্রুমোবদৎ মাভৈর্ষ্ম সন্তি জ্ঞাতয়ো মম॥

এইসব আত্মঘাতী ক্ষুদ্রতায়ই আমরা দিন দিন মরতে বসেছি। তারপর এইসব সমালোচনার বা অর্থ কি? বড় একটা সাহিত্যের রাজত্ব তো বিশেষ কোনো একটা যুগে বা সংকীর্ণ একটি দেশে সীমাবদ্ধ নয়। ভবিষ্যৎ যুগের সমালোচকেরা ভাববেন "সেই যুগে সমঝদারদের কি রকম সাহিত্য দৃষ্টিই ছিল!" মহামূল্য রত্নকে যদি আমরা সামান্য কাচ বলি তবে কি রত্নের কোনো জ্যোতি কমে? ভর্তৃহরি বলেন, তাতে জাহির হয় শুধু সেই জহুরীরই মূঢ়তা যে রতনকে তার প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করতে চায়।

কুৎস্যাঃ স্যুঃ কুপরীক্ষকা হি মণ যো যৈ র্বর্ততঃ
পাতিতাঃ

(১০)

তাই বারবার এই কথাই মনে হচ্ছে, স্বার্থদ্বেষ দ্বন্দ্ব ক্ষুদ্রতা ছেড়ে মহৎ আদর্শে বড় হয়ে সকলকে এক হতে হবে। এদেশের সুখ দুঃখের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। শুধু তাই নয়, আমাদের চরিত্রের জোরে এইসব দেশের সঙ্গেও বাঙ্গলা দেশের যোগ সত্য করে তুলতে হবে। নানাদিক দিয়েই আমাদের এক হবার জন্য তাগিদ আছে। আমাদের সাধনার দ্বারা তাকে সত্য করে সার্থক করে তুলতে হবে। বাঙ্গলা দেশ ও অবাংলার মধ্যে প্রেমের যোগ স্থাপন করতেই হবে।

একই রকমের **অত্যাচার** ও উৎপীড়নে বাংলা দেশ ও এই দেশ আক্রান্ত। **সংস্কৃতির** দিক দিয়েও আমরা পরস্পর সম্বন্ধ (*Complementary*)। আর্যাবর্তের সর্বধারাময়ী গঙ্গার জলেই নিষ্পন্ন হয়েছে বাংলার দেহ, সেখানেই শেষ হয়েছে তার অঞ্জলি। আবার বাংলার বুকের উপর দিয়ে বইছে যে "পুরবৈয়া" প্রাণবায়ু তাতেই আসছে এদেশের অমঙ্গল ও জীবনের প্রেরণা, মৃতপ্রায় কাশীকে পুনর্জীবিত করলেন অহল্যাবাঈ ও রাণী ভবানী, মধুসূদন সরস্বতী তাঁর জ্ঞানের যজ্ঞবেদি দীপ্ত করে তুলেছিলেন এই যুক্তপ্রদেশস্থ কাশীতেই। যখন কাশীর পণ্ডিতেরা তুলসীদাসকে কাশী ছাড়া করতে বদ্ধপরিকর তখন মধুসূদনই তাঁকে কাশী ছাড়তে দিলেন না। তাইতো কাশীতে তুলসীদাসের "রামচরিত মানস" লেখা সম্পূর্ণ হোলো। এই মধুসূদন পূর্ববঙ্গ কোটালীপাড়া নিবাসী। বৃন্দাবন নবপ্রাণ পেলো মহাপ্রভুর ভক্তগণের সাধনায়। বাংলা হতে মানসিংহ দেবীকে নিয়ে গেলেন রাজপুতনায়, বাঙ্গালীর সব বিষ্ণুবিগ্রহ বাধ্য হয়ে আশ্রয় নিল রাজস্থানে। বিদ্যাধর ভট্টাচার্য দিলেন জয়পুরের নব পরিকল্পনা। বৃন্দ কবি তাঁর সত পূর্ণ করলেন ঢাকা সহরে। আরবী কবি সাধকশ্রেষ্ঠ জায়সী মালিক মহম্মদের "পদ্মাবতী" বাঙ্গালী কবি আলাওয়ালকে দিয়ে বাংলায় অনুবাদ করালেন আরাকানের রাজা মাগন ঠাকুর। এই সবই সে কালের কথা। পৌর্বাপর্যের ঠিক সুসংগতি রক্ষা না করেই তার গোটা কয়েকের মাত্র উল্লেখ এখানে করা গেল। এমন আরও বহু আছে।

এই যুগেও হিন্দী হিন্দুস্থানীর প্রথম সব গ্রন্থ ছাপা হয় বাংলাদেশের কলিকাতায়। এই যুগে প্রথম হিন্দী গদ্য রচয়িতা সদাসুখলাল, লল্লুজীলাল, সালে মিশ্র, ইনসা অল্লা খাঁ প্রভৃতির সঙ্গে রামমোহনও একজন এবং সংস্কৃতির খাতিরে হিন্দী গদ্য লেখক সদাসুখলাল এবং তিনিই প্রথম। বর্তমানে হিন্দী সাহিত্যের জনক কবি হরিশ্চন্দ্রের পূর্বপুরুষ পশ্চিম দেশ হতে বাংলাদেশে যান। তাঁর গুরুজনেরা মুর্শিদাবাদ ছেড়ে কাশীতে এলেও তিনি বাংলা সাহিত্যে সুরসিক ছিলেন এবং তাঁদের বাড়ীতে বাংলার চর্চা ছিল। বিদ্যাসাগর ও তিনি পরম মিত্র ছিলেন। এমনভাবে বাংলা দেশ ও এই দেশ পরস্পর সংবদ্ধ। চৈতন্য চরিতামৃত বাংলা ভাষার পরমসম্পদ। তা লেখা হয় বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনই রূপসনাতন জীব গোস্বামী প্রভৃতি সকলের সব লেখার তীর্থস্থান। বলদেবের গোবিন্দ ভাষ্যও এই দেশে লেখা।

ভারত জননীর এক হাত বাংলা দেশ ও এক হাত এই দেশ। জগৎ ভরা আজ অশেষ দুঃখ-দুর্গতি। সেই দুঃখ অবসানের জন্য জননী আজ ভগবৎ চরণে প্রণাম করতে উদ্যত। তাই তাঁর দুইখানি হাত প্রণামাঞ্জলিতে যুক্ত করতে হবে। মায়ের সেই প্রণামটি পূর্ণ করবার জন্যই তিনি ঘরছাড়া করে আপনাদের এখানে এনেছেন। চাকরী ও আর যত বাহ্য প্রয়োজন সবই অবান্তর কথা। মায়ের পূর্ণ প্রণতির জন্য বাংলা ও অবাংলা এই দুই দেশের মধ্যে যোগসাধন আপনাদের দ্বারাই পূর্ণ হবার প্রতীক্ষায় রয়েছে।

মায়ের এই উভয় পাণিযুক্ত করা প্রণতিকে পূর্ণ করবার জন্য আপনাদের প্রত্যেককেই প্রাণপণ সাধনা করতে হবে। সেই সাধনার জন্য যে মহাচরিত্র চাই সেকথা কখনই ভুললে চলবে না। প্রবাসী প্রত্যেক বাঙ্গালীকে এই মহোৎসবে সেই মহাদায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।

বঙ্গবাণী আজ যে আপনাদের প্রবাসী বানিয়ে তাঁর মন্দিরের বাইরে বসিয়ে দিয়েছেন তার আরও

একটি গভীর অর্থ আছে। আপনাদের প্রত্যেককে তিনি তাঁর দীপাবলী মহোৎসবের প্রদীপ করেছেন। দীপাবলীর দীপকে তো ঘরের মধ্যে নিয়ে যাওয়া চলে না। সারা জগতে আজ যে সংস্কৃতির মহাদীপাবলী উৎসব চলেছে তার মধ্যে আমাদের দীপাবলী কই? আপনাদের প্রত্যেককে তার জন্য দীপ্ত হয়ে উঠতে হবে। বহু দুঃখ ও দাহের মূল্যে সেই দীপ্তিটি কিনতে হয়।

আপনাদের মধ্যে আজ যে নানা অনৈক্য দেখা যাচ্ছে তারও সমাধান হবে এই মহোৎসবে। আপনাদের মধ্যে কেউ ধনী কেউ নির্ধন, কেউ তরুণ কেউ বৃদ্ধ, কেউ খ্যাত, কেউ অখ্যাত, কোনো দীপটি সোনার কোনোটি পিতলের, কোনোটি মাটির, কোনোটি পাথরের। তারপর নানা প্রদীপে নানা রকমের তেল নানা রকমের পলতে। ভেদ বিভেদের আর অন্ত নেই। কিন্তু যখন সার্থকতার শিখায় সবাই দীপ্যমান হয়ে উঠবেন তখন সব রকমের পার্থক্য একই সাধনার আলোকে ঐক্যময় হয়ে যাবে। তখন আর দ্বেষবিদ্বেষ কিছুই থাকবে না। তখন ঋষিদের ভাষায় বলতে পারবো—'ভাইয়ে ভাইয়ে আর দ্বেষ থাকবে না, বোনে বোনে সব দ্বেষ আজ হতে দূর হয়ে যাবে।' মহাদীপোৎসবে সব অনৈক্যের অবসান হবে।

মা ভ্রাতা ভ্রাতরং দ্বিক্ষণ্ মা স্বসারম উত স্বসা।

(অথর্ব বেদ, ৩, ৩০, ৩)

(১১)

যতটুকু বলা উচিত, হয়তো তার বেশিই বলেছি। যদি অন্যায় ও অসংগত কিছু বলে থাকি তবে আমিও আপনাদেরই একজন এই কথা মনে করে ক্ষমা করবেন। আত্মীয়জনের কল্যাণ কামনাতেই হয় তো এই অপরাধ হয়েছে। তবু যেন মনে হচ্ছে ঠিক যা বলা উচিত ছিল তা বলা হয়নি। যেমন বজ্রশক্তিতে মহাবাণী উচ্চারণ করা উচিত ছিল সেই শক্তিও জীবনে নেই, সেই ধ্বনিও কণ্ঠে নেই। তাই আমাদের ভাষা ছেড়ে হাজার হাজার বছরের পুরনো বৈদিক সব ঋষিদের অগ্নিমন্ত্রেই বলি—

"হে মানব, তুমি আত্মা, তুমি বিভু, তুমি মহান। তুমি আপনাকে অপমানিত করিও না।

হে সত্তম, জীবনে যতটুকু দীপ্ত জ্বলন্ত হইল ততটুকুতেই ব্রহ্ম হইলেন দীপ্যমান। যতখানি না জ্বলিল ততখানিই চলিল মৃত্যুর পথে।

হে তপস্বী, অগ্নিতে জ্যোতিতে দীপ্ত হইয়া উঠুক তোমার জীবন। ইহারই নাম তপস্যা।

হে যজ্ঞ, জীবন যে জ্বলিয়া দীপ্ত হইয়া ওঠে তাহাই জীবনের সামগান।

হে বীর যখন তুমি জ্বলন্ত প্রদীপ্ত, তখনই তুমি পূর্ণ।

হে সুবীর্য, যখন তুমি দীপ্ত ভাস্করবৎ জ্যোতির্ময় তখনই তুমি মূর্তিমান পৌরুষ।

হে নৃতম, আপন তেজে ও তপস্যায় জ্বলিয়া উঠ, দীপ্ত হও, অন্যকে দীপ্ত কর।

হে মহনীয়, ধূমমুক্ত জ্যোতির মত সর্বদিক উদ্ভাসিত কর।

হে সুব্রত, দীপ্ত হও, অন্যকে দীপ্ত কর, দীপ্যমান থাক, কখনো যেন তোমার এই জ্যোতি ক্ষুণ্ণ বা শক্তিহীন না হয়।"

মাত্মানমবমন্যস্ব "
আত্মাসি ত্বং বিভুর্মহান॥
এতদ্ বৈ ব্রহ্ম দীপ্যতে যদগ্নি র্জ্বলতি
অথৈ তন্ম্রিয়তে যন্ন জ্বলতি॥
সোঽগ্নিনা জ্যোতিষা ভাতি চ ত তপতি চ॥
জ্বলতি স উদ্গীথঃ॥
জ্বলদ্ অসি পূর্ণম্ অসি॥
বলমসি ভ্রাজোদুসি॥
স্বতেজসা জ্বলতি জ্বালয়তি॥
সর্বাদিশঃ প্রকাশয়ন॥
জ্যোতিরিবাধূমকঃ॥
দীপ্তো দীপয়ন দীপ্যমানঃ॥*

*মীরাটে অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে প্রদত্ত মূল সভাপতির অভিভাষণ।

ভারতের শ্রমিক ও স্বাবলম্বন

বিশ্ব বিশ্বাস

কিছুদিন আগে আমাদের প্রতিবেশী এক ভদ্র মজুরের পরিবারে একটা দুর্ঘটনা ঘটে। এ রকম দুর্ঘটনা বিশেষ কিছুই নয়। হামেশাই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এই ঘটনাই আমার মনে রেখাপাত করিয়া আছে। ঘটনাটা এইরূপঃ—

কলিকাতার উপকণ্ঠে যে বিরাট মিল অঞ্চল সেখানে হাজার হাজার লোক কলকারখানায় খাটিয়া জীবিকানির্বাহ করে। ইহাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোক হিন্দুস্থানী হইলেও বাঙালীর সংখ্যা কম নয়। ইহারা কেহ বা বাঙালী হরিজন আর কেহ বা দুঃস্থ মধ্যবিত্ত ভদ্র বাঙালী। হিন্দুস্থানী মজুর পরিবারস্থ মেয়েরাও কারখানায় কাজ করে। বাঙালী মেয়েদের মধ্যে যাহারা কলকারখানায় খাটে তাহারা না হয় হরিজন সম্প্রদায়ের মেয়ে, না হয় পতিতা মেয়ে। মধ্যবিত্ত ভদ্র বাঙালী মজুর ছাড়া আর সবায় মিলের বস্তিতে বাস করে। আমি যে ভদ্র মজুর পরিবারের কথা বলিতেছি তাহারা বাস করিত মিল এলাকা হইতে অনেক দূরে বাঙালী পাড়ায়। তাহার কারখানার শ্রমিকেরা ধর্মঘট করে এবং যতদূর সংবাদ রাখি তাহাতে সে ধর্মঘট এখনও চলিতেছে। কারখানার মালিক হিন্দুস্থানী। লোহালক্কড়ের কারখানা। যুদ্ধের বাজারে মিলিটারি অর্ডারের গুণে কারখানাটি পুরাদমে চলিতেছিল কিন্তু বর্তমানে বহু কণ্ট্রাক্ট বাতিল হওয়ায় কারখানা চালানর দিকে তাহার বেশী গা নাই ফলে মনিবের মনোভাব একদম অনমনীয়। ধর্মঘট তাহার নিকট শাপে বর হইয়াছে।

শ্রমিকরা দুই মাসাধিককাল ধর্মঘট চালাইয়াও মালিককে দাবাইতে পারিল না এবং তাহাদের সামান্য মাত্র ন্যায্য দাবী অগৃহীত রহিয়া গেল। প্রায় হাজার খানেক শ্রমিক। ইহাদের জীবিকানির্বাহ হইতে লাগিল ভিক্ষার অর্থে এবং ইউনিয়নের সংগৃহীত অর্থে। যে পরিবারটির কথা আমার বক্তব্য সে ভদ্রলোকটি বাস করিত মিল এলাকা হইতে চার মাইল দূরে একটি বাসা বাড়িতে। বিদেশে একে ত' আত্মীয়-স্বজন ছাড়া। তার উপর ধর্মঘটের ফলে তাহার অবস্থা হইল একেবারে নিঃসহায়। প্রথম প্রথম সে কিছু সাহায্য পাইত কিন্তু পরে অসুস্থ হইয়া পড়ায় সে সাহায্য আনিতে পারিত না ফলে সে বিনা চিকিৎসায় এবং অন্নাভাবে মারা যায়। তাহার এই শোচনীয় মৃত্যুতে আমার মনে প্রশ্ন জাগে ভিক্ষান্নে ধর্মঘটীরা বাঁচিয়া কি অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাহাদের দাবী লইয়া কঠোর মনোভাব সম্পন্ন মালিকদের সঙ্গে যুঝিতে পারে?

ভিক্ষান্নের অবস্থা যা' দেখা যায় তাহাতে এ প্রশ্নের উত্তর স্বভাবতই মনে হয় নেতিবাচক। ভিক্ষা মানে ট্রেনে এবং স্টেশনে ডেলী প্যাসেঞ্জারদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা। এই সব যাত্রীদের বেশীর ভাগ লোক ধর্মঘটের তাৎপর্য বোঝেন না এবং ধর্মঘটীদের সাহায্য করা যে দেশের কাজ তা' জানেন না। বুঝিলেও এ দুর্মূল্যতার বাজারে প্রতিদিন তাহাদের পক্ষে সাহায্য করাও সম্ভব নয়। তা'ছাড়া পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের পর হইতে সাহায্য করিয়া করিয়া দেশের লোক যে কোন প্রকার সাহায্যদানে সাধারণত বীতরাগ হইয়া পড়িয়াছেন। একদিনের ঘটনা উল্লেখ করিলেই বোঝা যায় তাহারা কত তাচ্ছিল্য ও অবমাননার মধ্যে কী সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর সাহায্যই না পায়।

ট্রেনে ভিক্ষা করিতেছে শ্রমিকরা চাবিবন্ধ লেবেল আঁটা বাক্স যাত্রীদের সামনে ধরিয়া। শ্রমিকরা মালিকের অকথ্য নির্যাতন এবং তাহাদের দাবীর প্রতি অকরুণ উপেক্ষার কথা বলিয়া জনসাধারণের মনে করুণা উদ্রেকের চেষ্টা করে। একজন যাত্রী বলিলেনঃ কাজ বন্ধ ক'রে সাহায্য নিতে এসেছ? শ্রমিকরা তাঁহাকে বুঝাবার জন্য অনেক কথা বলিল কিন্তু দেখিলাম যে তাঁহাকে বোঝানো বৃথা কারণ তিনি ধর্মঘটের তাৎপর্যই বোঝেন না এবং শ্রমিক যে কারখানার উৎপাদনের অংশীদার তাহা তিনি হৃদয়ঙ্গমই করেন না। তিনি জানেন শ্রমিক দু'মুঠো অন্নের জন্য চাকর ছাড়া আর কিছুই নয়। আরও দু'একজন যাত্রী এই রকম কৈফিয়ৎই চাহিতে লাগিলেন। আমি এবং একজন কলেজের ছাত্র তাঁহাদের এই অন্যায় মাতব্বরীতে বাধা দিয়া বলিলামঃ কিছু সাহায্য ক'রে কৈফিয়ৎ তলব ক'রলে কি ভাল দেখায় না? বলা বাহুল্য সে ভদ্রলোকরা কিছুই সাহায্য করিলেন না।

ভিক্ষার এই অবস্থা। এই ভিক্ষা ও সহায়তার উপর নির্ভর করিয়া অগণিত মজুর যে নির্দয় মালিকদের নিকট হইতে তাহাদের ন্যায্য পাওনা আদায় করিতে সক্ষম হইবে ইহা আশা করা বাতুলতা। অথচ এই ধর্মঘট ছাড়া তাহাদের অন্য কোন হাতিয়ার নাই—যাহা দ্বারা মালিকের অন্যায় জুলুম বন্ধ হইতে পারে এবং উৎপাদনের অন্যতম অংশীদার শ্রমিক শ্রেণীর ন্যায্য অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। শ্রমিকদের বঞ্চনা জগতের অন্যতম পাপ; এই পাপের অবসান যে কোন প্রগতিশীল মনোভাবসম্পন্ন দেশপ্রেমিক ও সত্যাশ্রয়ীর অভিপ্রেত। এই অবসানের একমাত্র হাতিয়ার ধর্মঘট। ভিক্ষান্ন দ্বারা ধর্মঘট বেশী দিন চালানো যায় না। এই ধর্মঘটকে সফলতার পাদপ্রদীপে লইয়া আসিবার জন্য প্রয়োজন শ্রমিকদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন ও সক্ষমতা। আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করিব।

দেখা যাইতেছে যে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন থাকা দরকার। এরূপ অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন থাকা দরকার যাহাতে ধর্মঘটের সময় তাহাদিগকে অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া না থাকিতে হয় এবং যাহাতে মাঝপথে সংগ্রাম বন্ধ হইয়া তাহাদিগকে মালিকের নিকট নত হইতে বাধ্য না করে। এইজন্য প্রত্যেক কারখানার মজুরদের এইরূপ একটি যৌথ-অর্থ তহবিল থাকা দরকার যাহা ধর্মঘটের সময় ব্যবহৃত হইতে পারে। এইরূপ অর্থ তহবিলের নাম হইবে "ধর্মঘট—অর্থভাণ্ডার"। প্রত্যেক শ্রমিক সপ্তাহান্তে অথবা মাসান্তে তাহাদের বেতন হইতে কিছু নির্দিষ্ট চাঁদা হিসাবে এই তহবিলে দান করিবে। তা'ছাড়া কারখানার শ্রমিকদের বিবাহশ্রাদ্ধ প্রভৃতি পারিবারিক অনুষ্ঠানে অথবা ধর্মানুষ্ঠানে খরচ বাঁচাইয়া একটা চাঁদা আদায় হইবে যাহা ঐ তহবিলে জমা থাকিবে। ধর্মঘটের প্রয়োজন রোজ রোজ হয় না। বছরে যদি একবার করিয়াও ধর্মঘটের প্রয়োজন হয় তাহা হইলেও তৎকালের মধ্যে উক্ত তহবিলে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চিত হইবে এবং ধর্মঘট দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলেও ইহা তাহাদের যথেষ্ট পরিমাণে সহায়তা করিবে। আর একটা কথা; একটা ধর্মঘট দীর্ঘকাল ধরিয়া সফলভাবে চালাইতে পারিলে অনেক দিনের জমানো অভাব অভিযোগ দূরীভূত হয় এবং বহুদিন নূতন কোন সমস্যার উদ্ভব নাও হইতে পারে।

আর একটি প্রস্তাব করা যায়। মজুরদের পরিচালনাধীনে এরূপ একটি অর্থকরী যৌথ প্রতিষ্ঠান থাকা দরকার যার মধ্যে রবিবার, ছুটির দিন এবং কারখানার কাজের সময়ের পরে মজুরেরা অর্থ উপায় করিবে

এবং সেই অর্থ উক্ত তহবিলে জমা থাকিবে। এখন দেখা যাক্ এইপ্রকার অর্থকরী যৌথ প্রতিষ্ঠানে কি কি প্রকার কাজ চলিতে পারে। তাহাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনায় নিম্নলিখিত শিল্পগুলির নাম করা যায়। যথাঃ—

১। জ্বালানী কাষ্ঠের ব্যবসা।

কলকারখানা এলাকার দূরে এবং অনতি-দূরে মস্তমস্ত আম কাঁঠাল বাঁশ প্রভৃতির বাগান আছে। এই সব বাগান হইতে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করিয়া অথবা প্রাচীন ফলহীন গাছ কাটাইয়া জ্বালানী কাষ্ঠের ব্যবসা চলিতে পারে।

২। যৌথ চাষবাস ও ফল ও তরিতরকারি উৎপাদন।

কলকারখানা এলাকার দূরে এবং অনতি-দূরে অনেক পতিত জমি পাওয়া যায়।

৩। ফল-ফলারির বাগান জমা নেওয়া এবং বাজারে ফলফলারি বিক্রয়।

৪। পুকুর জমা নেওয়া এবং মাছের চাষ ও মাছ বিক্রয়।

৫। বাঁশ ও বেতশিল্পজাত দ্রব্য (ঝুড়ি, ধামা, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি) তৈয়ার ও বিক্রয়।

৬। চরকা ও তাঁতশিল্প।

৭। পোল্ট্রি ও ডেয়ারী ফার্ম।

উপরোক্ত যে কয়টি শিল্পের কথা বলা হইল তার সুযোগ ও সুবিধা মিল অঞ্চলে প্রচুর এবং এইসব শিল্প কলকারখানায় কার্যরত শ্রমিকদের পক্ষে সুবিধাজনক, কারণ কারখানার কাজ কামাই না করিয়া এবং ছুটির দিনে ও কারখানার কাজের পরে কাজ করিয়া এইসব শিল্প চালানো যাইতে পারে। এর জন্য দরকার শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন ও সঙ্ঘভাব। কংগ্রেস কিংবা অনুরূপ কোন দেশ-হিতৈষী প্রতিষ্ঠান অথবা কোন শ্রমিক প্রতিষ্ঠান কারখানায় কারখানায় গঠিত মজুর সঙ্ঘের ভিতর দিয়া এবং শ্রমিক কর্মীদের সহায়তায় শ্রমিকদের মধ্যে এবম্প্রকার সংগঠন ও সঙ্ঘভাব আনয়নের এবং ধর্মঘট অর্থ তহবিল ও অর্থকরী যৌথ প্রতিষ্ঠানের গঠন ও পরি-চালনার ভার লইবে। এই সঙ্গে আরেকটি জিনিসের দরকার এবং তাহা হইতেছে শ্রমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এরও ভার লইবে কংগ্রেস অথবা তদনুরূপ কোন দেশ ও মজুর হিতাকাঙ্ক্ষী প্রতিষ্ঠান। এর পরিচালনায় বিশেষভাবে শিক্ষিত শিক্ষকগণ বস্তিতে বস্তিতে স্থাপিত নৈশ বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করিবেন। এই শিক্ষার বিষয়বস্তু হইবে সামান্য বাঙলা, হিন্দী ও উর্দু লিখিতে ও পড়িতে শিখানো, একটু আঁক, দেশ-বিদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, দেশের মুক্তি আন্দোলন ও শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস এবং পরিশেষে ধর্মঘট-অর্থভাণ্ডার ও অর্থ-করী যৌথ প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি শ্রমিকদের সংগঠন সম্বন্ধে শ্রমিকদের ব্যুৎপত্তি দেওয়া ও ওয়াকিবহাল করা।

পরাধীন ও শোষিত ভারতের শ্রমিক শক্তি ভারতের মুক্তি-আন্দোলনের এক বিরাট সম্ভাবনাময় শক্তি। তাহাদের কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি তুলিয়া দিয়া তাহাদের সংগ্রামী শক্তিকে ক্ষয়িত ও নীচু করা কোনমতেই উচিত নয়। ধনতন্ত্রী মালিকদের মালিকানা প্রভূত্বের মুখে তাহাদের প্রতি মুহূর্তের সংগ্রাম অপরিহার্য ও অনিবার্য। স্বাব-লম্বনের পথে তাহাদের দাঁড় করাইয়া উঁচু মাথায় তাহাদের সংগ্রামী ও সংগ্রামমুখর দেখিতে সবারই কামনা। তাই এই প্রবন্ধে উল্লিখিত প্রস্তাবের অবতারণা।

বিদেশীয় শাসকের হাতে পরাধীন দেশে সর্বহারা বিপ্লব সংঘটিত হয় না কোনদিন। স্বাধীন দেশেই সর্বহারা বিপ্লবের আবির্ভাব ঘটে। কোটি কোটি সর্বহারার দেশ ভারতে তাই সর্বহারা বিপ্লবের সূচনা হয়নি এখনও, যা হইয়াছে তাহা হইতেছে বিদেশীয় এবং সাম্রাজ্যবাদীর শোষণমূলক শাসনের হাত হইতে মুক্তি পাবার আন্দোলন অর্থাৎ স্বাধীনতার আন্দোলন। এ আন্দো-লনে আজ ভারতের ছাত্র ও শিক্ষক, জমি-দার ও প্রজা, ধনী ও নির্ধন, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত, স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্য, হিন্দু ও মুসলমান, সৈনিক ও নাগরিক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যোগদান করিয়াছে। ভারতীয় শ্রমিকও যে এ আন্দোলন হইতে দূরে সরিয়া নাই তারও প্রমাণ পাইয়াছি আমরা। আজাদ হিন্দ ফৌজের নাম আজ শ্রমিকদের ঘরে ঘরে। গত নবেম্বরের ঐতিহাসিক দিনে নিরস্ত্র ছাত্রদের পাশে সার্জেন্টের গুলীর মুখে নির্ভীক যোদ্ধার মত দাঁড়াইয়াছিল ভারতীয় শ্রমিক। যে বিক্ষোভ সেদিন দেখা গিয়াছিল, কলিকাতা ও কলিকাতার উপকণ্ঠে সহরতলীতে তাহাতেও বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছে ভারতীয় শ্রমিকগণ। তাহারা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছে যে, তাহারা ভারতের মুক্তি আন্দোলনের নির্ভীক ও সংগ্রামী যোদ্ধা।

ভারতীয় শ্রমিক শুধু মুক্তি-আন্দোলনের সৈন্যশক্তি নয়, পরন্তু ভারতের জাতীয় সম্পদ-শক্তিও বটে। ভারতের সম্পদ অপহরণে সাম্রাজ্যবাদীদের কাজে আমরা যেমন প্রতিবাদ জানাই শ্রমশক্তি অপহরণেও আমাদের তেমন প্রতিবাদ জানানো দরকার। ভারতের শ্রমিকরা নিজেরাই তাহাদের শক্তি অপহরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছে। আমাদের চেয়ে তাহাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। আমাদের সাথে তাহারাও সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণে পর্যুদস্ত কিন্তু তাহাদের অবস্থা আরও এক ধাপ নীচে। স্বদেশী ও বিদেশী ধনতন্ত্রী মালিকদের মালিকানার যূপকাষ্ঠে নিত্যবলি হইতেছে তাহাদের শক্তি আশা ও আকাঙ্ক্ষা। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সাথে প্রতিবাদ উঠা চাই এর বিরুদ্ধে; তা না হলে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের একটা বিরাট সংগ্রামশক্তি ও সম্পদশক্তি নষ্ট হইবে। অতএব তাহাদের বাঁচবার জন্য তাহাদের ধর্মঘটরূপ হাতিয়ারকে উঁচু রাখবার জন্য তাহাদের মধ্যে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন বিধান অবশ্য কর্তব্য।

সম্প্রতি সংবাদপত্রে (আনন্দবাজার ও হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড) ভারতের জনপ্রিয় অভিনয়শিল্পী শ্রীমতী কানন চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্পী ও কর্মীদের একটি সঙ্ঘ স্থাপনার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। দেশ-এর পাঠকদের কাছে প্রবন্ধটিতে নতুন কথা কিছুই পাওয়া যাবে না, কারণ শ্রীমতী কানন যা বলেছেন, দেশ-এর বিভাগে তা নিয়ে বরাবরই আলোচনা চালিয়ে আসা হয়েছে, তবে চলচ্চিত্রের সঙ্গে জড়িত এবং প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালিনী একজনের কাছ থেকে সঙ্ঘ স্থাপনার প্রস্তাবটা চলচ্চিত্রের কর্মী ও শিল্পীদের কাছে বেশী আবেদন জাগাতে পারবে। ছবি যারা দেখে তারা জানেই না যে, প্রত্যেকখানি ছবি তৈরীর পিছনে কত দুঃসহ দারিদ্র্যের দীর্ঘশ্বাস বয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ টাকার লেনদেন চলে যায়, কিন্তু যাদের ছাড়া ছবি তৈরীই হতে পারে না, তাদের অবস্থার দিকে হেলাভরেও কেউ একবার তাকায় না। তারকারা লাখ লাখ টাকার বিনিময়ে কাজ করছে, কিন্তু সে ভাগ্য কজনের হয়? সবায়ের সে ভাগ্য হওয়া সম্ভবও নয়, বরং বেশীর ভাগ লোককেই কোনরকমে দিন কাটাতে হয়। অভিনয়শিল্পীদের তবুও কখনও কখনও ভাগ্য খুলে যাওয়ার সুযোগ আসে, কিন্তু কলাকুশলীদের যা সেই পাথুরে-কপালই থেকে যায়। চলচ্চিত্রের জাঁক দেখেই লোকে ভুলে যায়, অন্তরালে যে অশ্রুময় কাহিনী নিহিত থাকতে পারে, সে কথা কেউ ভাবতেই পারে না। চলচ্চিত্রে যারা কাজ করে, তারা যে আর পাঁচজনেরই মত মানুষ, তাদেরও দুঃখ, দারিদ্র্য ও সমস্যাসংকুল জীবন হতে পারে এ কারুর মনেও হয় না। অথচ চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে এবং শিল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসে একথা আমরা বলতে পারি যে, এদের মত sincere and selfless লোক আর কোন শিল্পে আছে কিনা সন্দেহ। ভারতীয় শিল্পের যা কিছু মর্যাদা তা এরাই এনে দিয়েছে, মালিকরা নয়, মহাজনরা নয়। অথচ এদের মাথাতেই কাঁঠাল ভাঙা হয়ে চলেছে। কর্মী ও শিল্পীদের নিজেদেরই তাই নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে হবে, নিজেদের সঙ্ঘবন্ধ হতে হবে; শিল্পী-জনোচিত উদারতা ও উদাসীনতা দেখিয়ে মালিকদের গাড়ি আর বাড়ি বাড়িয়ে যাবার সুযোগ করে দেওয়া নির্লজ্জ মনুষ্যত্বহীনতা ছাড়া কিছু নয়, এ নিস্পৃহতার কোন মানে হয় না। চলচ্চিত্রের সমস্ত কর্মী ও শিল্পীদের একত্রিত হতে হবে, তাদের নিজেদের দাবী বুঝিয়ে নিতে হবে।

রঙ্গজগৎ

এবারের বড়দিন অনেক বছর পর প্রমোদের দিক থেকে খুবই জমাটি হয়েছে। নামকরা প্রমোদগৃহের প্রায় প্রত্যেকটিতেই নতুন আকর্ষণ—মঞ্চের দিক থেকে কালিকায় 'মেজদিদি', স্টারে 'শতবর্ষ আগে' আর সিনেমার দিক থেকে বীণা ও সিটিতে 'আমীরী', প্রভাত, ম্যাজেস্টিক, কামাল টকীজে 'গাঁও কী গোরী', প্যারাডাইসে 'মজদুর', শ্রী-আলেয়া-সেণ্ট্রাল-ছায়া-পার্ক শো হাউসে 'একদিন কা সুলতান', গণেশ টকীজে 'দেবদাসী', জ্যোতিতে



রূপশ্রীর 'মৌচাকে ঢিল' চিত্রে
প্রমীলা ত্রিবেদী

'মীনা', রূপবাণীতে 'গৃহলক্ষ্মী' এবং মিনার-বিজলী-ছবিঘরে 'ভাবীকাল' নতুন আকর্ষণ; এছাড়া কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের 'অভ্যুদয়'-ও বড়দিনের একটা বড় আকর্ষণ ছিল। বছরের আরম্ভও হচ্ছে ভালভাবেই; আসছে সপ্তাহে মুক্তিলাভ করবে জ্যোতিতে আর্ট ফিল্মসের হিন্দী ছবি 'তকরার', ক্রাউন সিনেমায় ইউনাইটেড ফিল্মসের 'ভাইজান', শ্রী-আলেয়া-পূর্ণতে রূপশ্রীর 'মৌচাকে ঢিল'। বাজার যদিও মন্দা হ'য়ে আসছে দিনদিনই, কিন্তু প্রমোদ ব্যবস্থা-গুলির দিকে নজর দিলে তার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। দক্ষিণ কলকাতায় নতুন চিত্রগৃহ 'উজ্জ্বলা'-র দ্বারোদ্ঘাটন দিনও এগিয়ে আসচে।

বিবিধ

ফিল্মিস্তানের পঞ্চম চিত্রখানি অশোক-কুমারের পরিচালনায় তোলা আরম্ভ হয়েছে।

* * * *

কংগ্রেস নেতা পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থের লেখা একটি গল্পকে রামনীক প্রডাকসন্স চিত্ররূপ দান করবে, ছবিখানির নাম 'ইনক্লাব'।

* * * * *

সায়গল 'ওমর খৈয়াম' চিত্রের নাম ভূমিকায় অবতরণ করবেন।

* * * * *

জদ্দনবাই তার কন্যা অভিনেত্রী নারগইসের নামে একটি প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান স্থাপনা ক'রেছেন, প্রথমে তুলছেন 'রোমিও জুলিয়েট'।

* * * * *

বম্বের খবরে প্রকাশ অভিনেতা সুরেশ বিবাহ করেছে রাজকমল পিকচার্সের শান্তা রাণীকে।

* * * * *

ইণ্ডিয়ান মোসন পিকচার্স প্রোডিউসার্স এসোসিয়েসনের সম্পাদক পদে আর এল গোগতে ইস্তফা দেওয়ায় তৎপদে কে এম মুলতানিকে গ্রহণ করা হ'য়েছে।

* * * * *

নলিনী জয়ন্ত কলকাতায় আজাদ হিন্দ্ সাহায্য ভাণ্ডারের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কয়েকটি আসরে গান গেয়ে টাকা তোলায় সহায়তা ক'রেছেন।

* * * * *

বম্বের পৃথ্বী থিয়েটার 'আজাদ হিন্দ্' নাম দিয়ে একটি নাটক মঞ্চস্থ করছে, অপর একটি প্রতিষ্ঠান 'চলো দিল্লী' নাম দিয়ে একখানি ছবি তোলার উদ্যোগ ক'রেছে, এছাড়া 'জয় হিন্দ্' নামে সাংবাদিক আবাক একখানি ছবি তোলার কথা তো আগেই ঘোষণা ক'রেছেন।

* * * * *

ছবির প্রচারকার্য চালাবার জন্যে আচার্য আর্ট প্রডাকসন্সের প্রচারসচিব কুলকারনী বম্বে থেকে করাচীতে বিমানযোগে গিয়েছিলেন—এ ব্যাপার এই প্রথম।

* * * * *

প্রমীলা ত্রিবেদী বম্বের প্রভাত ফিল্মসের ছবিতে অভিনয় করার চুক্তি ক'রে এসেছে। ফণী মজুমদার ও মণিকা দেশাইয়ের বিবাহে সেও অন্যতম সাক্ষী উপস্থিত ছিল।

স্টুডিও সংবাদ

ভ্যারাইটি পিকচার্সের হিন্দী চিত্র "প্রেম কী দুনিয়া" ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে শ্রীযুত জ্যোতিষ ব্যানার্জি'র পরিচালনায় গৃহীত হইতেছে। মঞ্চসফল নাটক 'পি ডবলিউ ডি-র' কাহিনী অবলম্বনে আলোচ্য চিত্র গঠিত হইতেছে। বিভিন্নাংশে অহীন্দ্র চৌধুরী, অলকানন্দা, আমিনা খাতুন, ছবি বিশ্বাস, বসির হোসেন, কল্পনা রায় ও রাজলক্ষ্মী অভিনয় করিতেছেন। প্রযোজক শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন বসু ছবিখানির সাফল্যের জন্য বিশেষ যত্ন লইতেছেন।

* * * * * *

রূপশ্রী লিমিটেডের কৌতুকোজ্জ্বল চিত্র শীঘ্রই একযোগে শ্রী পূর্ণ ও আলেয়ায় মুক্তিলাভ করিবে। সম্ভবত ৪ঠা জানুয়ারী ছবিখানি মুক্তিলাভ করিবে।

* * * * * *

গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় সিনে প্রোডিউসার্সের 'মাতৃহারা'র চিত্রগ্রহণ কালী ফিল্মস স্টুডিওতে দ্রুত সমাপ্তির দিকে আগাইয়া যাইতেছে। প্রধান অংশে জহর গাঙ্গুলী, সন্তোষ সিংহ, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন চক্রবর্তী, কমল মিত্র, বেচু সিংহ, মলিনা, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি অভিনয় করিতেছেন।

* * * * * *

বহুদিন পর গত সপ্তাহে রাধা ফিল্মসের নিজস্ব হিন্দী ছবির কাজ শুরু হয়েছে। এখানে দিলীপ মুখার্জি'র পরিচালনায় "দানা" (খাবার) চিত্র নির্মাণ হচ্ছে। 'দানার' কাহিনী মন্মথ রায়ের সুনিপুণ লেখনীর ছোঁয়ায় দানা বেঁধে উঠেছে বলে শোনা গেল। দিলীপবাবু একক পরিচালন ক্ষেত্রে এই প্রথম আত্ম-প্রকাশ করলেও দীর্ঘদিন তিনি বিভিন্ন যশস্বী পরিচালকের সহকারী ছিলেন।

* * * * *

২৮শে ডিসেম্বর টালিগঞ্জস্থিত ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে অঞ্জলি পিকচার্সের "ঝরাফুল" চিত্রনাট্যের শুভ মহরৎ উৎসব সম্পন্ন হয়। তদুপলক্ষে অঞ্জলি পিকচার্সের স্বত্বাধিকারিণী শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী শহরের বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাহিত্যিকগণকে একটি চায়ের আসরে আহ্বান করেন।

"ঝরাফুল" একটি দেশাত্মবোধক সামাজিক কাহিনী। অঞ্জলি পিকচার্সের কর্ণধার শ্রীযুত অমিয়মাধব সেনগুপ্ত আলোচ্য চিত্রনাট্যে দরিদ্র পল্লীবাসীদের অভাব অভিযোগের বিষয় বিবৃত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। প্রবীণ পরিচালক শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (ডিজি) ইহার পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের সহঃ সম্পাদক নাট্যকার শ্রীযুত দেবনারায়ণ গুপ্ত ইহার চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করিয়াছেন। বিভিন্ন অংশ নবাগতা সুধা মুখার্জি, নবাগত অজিত মুখার্জি ও দেবীপ্রসাদ এবং মণিকা গাঙ্গুলী, অহীন্দ্র চৌধুরী, শরৎ চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ রূপায়িত করিবেন।

ইতস্তত

ফ্রেডর সোলোগাব

শহরে একটি পাথরে বাঁধান রাস্তা ছিল।' এক গরুর গাড়ির চাকা একটি পাথরকে আলগা ক'রে দিয়ে চলে গেল। পাথরটি তখন আপন মনে বলল, "কেন আমি অন্যান্য পাথরের সঙ্গে চেপ্টাচেপ্টি হয়ে পড়ে থাকি। আমি আলাদা থাকবো।"

এক বালক যাবার সময় পাথরটি তুলে নিল।

পাথরটি আপন মনে বলল, "আমার একটু বেড়াবার ইচ্ছে ছিল তাই বেড়াচ্ছি। আমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারি।"

বালকটি পাথরটিকে একটি বাড়ির দিকে ছুঁড়ে দিল।

পাথরটি আপন মনে বলল, "উড়বার ইচ্ছে ছিল তাই উড়ছি। এ আর কি, কেবল ইচ্ছে করার অপেক্ষা।"

দুম করে এক কাঁচের সার্সিতে পাথরটি লাগল এবং সার্সি ভেঙে গেল।

সার্সি রেগে বলল, "এই স্কাউন্ড্রেল কি হচ্ছে?"

পাথর উত্তর করল, "ভেঙে গিয়ে ভালই করেছ। আমার পথে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ালে আমি তাকে সহ্য করি না।"

পাথরটি একটি নরম বিছানার উপর পড়ল এবং ভাবল, "অনেক ঘুরেছি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা যাক।"

ঘরে একটি চাকর ঢুকল এবং বিছানায় পাথরটি দেখে তুলে নিল এবং জানালা দিয়ে ছুঁড়ে পুনরায় রাস্তায় ফেলে দিল।

তখন পাথরটি অন্য পাথরগুলোকে চীৎকার করে বলল, "ভাই সব ভাল ত? আমি এই মাত্র এক মস্ত বাড়ি থেকে বেড়িয়ে ফিরচি। কিন্তু আমি আভিজাত্য মোটেই পছন্দ করি না। সাধারণের জন্য আমার মন কাঁদছিল, তাই ফিরে এলাম।"

মৎস্যন্যায়

একটি বড় মাছ একটি ছোট মাছকে ঘিরে ধরে তাকে গিলে ফেলতে চাইল। ছোট মাছটি ভয়ে একটু পেছিয়ে অনুযোগের সুরে বলল, "এটা অন্যায়। আমিও বাঁচতে চাই। আইনের চোখে সব মাছই সমান।"

বড় মাছটি উত্তর করল, "তাতে কি হয়েছে। আমরা উভয়েই সমান কিনা সে বিষয় আমি তর্ক করতে রাজী নই। কিন্তু তুমি আমাকে যদি তোমায় খেতে না দাও—তবে তুমি আমাকে খেয়ে ফেল। ভয় নেই। আমি মোটেই বাধা দেব না।"

ছোট মাছটি তখন হা করে বড় মাছটির চতুর্দিকে ঘুরল এবং কামড় বসাবার চেষ্টা করল—কিন্তু পারল না। অবশেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তুমিই আমাকে গিলে ফেল।" অনুবাদক—শ্রীফণিভূষণ কর

খেলা ধূলা

অস্ট্রেলিয়ান ম্যানেজারের উক্তি

ভারত ভ্রমণকারী অস্ট্রেলিয়ান সার্ভিসেস ক্রিকেট দলের ম্যানেজার মিঃ কিল জনসন দেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের সম্পর্কে উচ্চ ধারণামূলক উক্তি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "ভারতীয় দলে বর্তমানে অন্তত ছয়জন খেলোয়াড়ের নাম করা যাইতে পারে, যাঁহারা পৃথিবীর যে কোন শ্রেষ্ঠ দলে স্থান পাইবার উপযুক্ত। মিঃ জনসনের এই উক্তি খুবই আনন্দদায়ক সন্দেহ নাই, তবে তিনি ভারতে অবস্থানকালে কোন স্থানেই এইরূপ উক্তি করেন নাই কেন? বোধ হয় তখন তাঁহার ধারণা ছিল, ভারতের খেলোয়াড়দের বিভিন্ন খেলায় পরাজিত করিয়া নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করিয়া যাইবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন তাঁহার আশা পূরণ হইল না, সম্মান ক্ষুন্ন করিয়া দেশে ফিরিতে হইল, তখন সাফাই গাইবার জন্য বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, "পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দলে স্থান পাইবার উপযুক্ত।" মিঃ জনসনের এই উক্তির জন্য তাঁহাকে আমরা ধন্যবাদ দিতেছি। তিনি অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একজন সভ্য। সুতরাং তিনি ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে নিয়মিতভাবে ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়ার ন্যায় টেস্ট ম্যাচ খেলা হয়, তাহার ব্যবস্থা অনায়াসেই করিতে পারেন। তিনি এই বিষয় চেষ্টা করিতেছেন শুনিলে বিশেষ সুখী হইব।

ডন ব্রাডম্যান পুনরায় খেলিবেন

বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় ডন ব্রাডম্যান পুনরায় খেলায় যোগদান করিতেছেন। তিনি টেস্ট ম্যাচেও খেলিবেন বলিয়া অনেকের ধারণা। এই সংবাদ খুবই সুখের বিষয়। ব্রাডম্যানের বয়স বর্তমানে মাত্র ৩৭ বৎসর। তিনি এই সময় খেলা ত্যাগ করিলে খুবই দুঃখের হইত। ইতিপূর্বে বহুবার আমরা সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে বলা হইয়াছে "ব্রাডম্যান খেলিতে পারিবেন না," "তিনি খেলা হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন" ইত্যাদি। আমরা তখন এই সকল সংবাদ বিশ্বাস করি নাই। এখন দেখিতেছি ঠিকই করিয়াছি।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের ইংল্যান্ড ভ্রমণ

ভারতীয় ক্রিকেট দল ইংল্যান্ডে যাইবে তাহা স্থির হইয়া গিয়াছে। এমন কি ভ্রমণ তালিকাও গঠিত হইয়াছে। ইংল্যান্ডের সকল শ্রেষ্ঠ কাউন্টী দলই ভারতীয় দলের সহিত খেলিবেন তাহা এই ভ্রমণ তালিকা হইতে জানা গেল। তবে আমাদের আশ্চর্য করিয়াছে "টেস্ট ম্যাচ" খেলার সময় মাত্র তিনদিন করায়। এইরূপ ব্যবস্থা করিবার কি কারণ থাকিতে পারে বুঝি না। তবে এক এক সময় সন্দেহ হয় দুর্মুখের কথার পশ্চাতে কোন সত্যতা আছে। দুর্মুখেরা বলিয়া থাকেন তিনদিন টেস্ট ম্যাচের ব্যবস্থা না করে, করে কি? শেষে হেরে যাবে? তিনদিনের খেলা জোড়াতালি দিয়ে কোন রকমে অমীমাংসিতভাবে শেষ করা যেতে পারে। চারদিন হলে অস্ট্রেলিয়ানদের মত হার স্বীকার করতে হবে যে? ইহার পশ্চাতে যাহাই থাকুক না কেন, আমরা তাহা লইয়া মাথা ঘামাইতে প্রস্তুত নহি। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভ্যগণ কেন এই বিষয় একটু দৃষ্টি দিতেছেন না? "জো হুকুম" করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। অনায়াসে বলিয়া পাঠাইতে পারেন "রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় সকল খেলার মীমাংসা যাহাতে হয় তাহার জন্য সময় বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। টেস্ট খেলার সময় বাড়াইয়া না দিলে কিরূপে চলিবে?"

বাঙলা দলের সাফল্য

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের প্রথম খেলায় বাঙলা দল যুক্তপ্রদেশ দলকে ৪৪ রানে পরাজিত করিয়াছে। এই জয়লাভের ফলে উল্লাস করিবার কিছুই নাই। বাঙলা দলের ব্যাটিং করিবার শক্তি যে বিশেষ নাই তাহা এই খেলায় ভাল করিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে। পরবর্তী খেলায় হোলকার দলকে পরাজিত করিতে হইলে বর্তমানের দল লইয়া সম্ভব হইবে না ইহা জোর করিয়াই বলিতে পারি। এই খেলায় সাফল্যলাভ করিতে হইলে, অন্ততঃপক্ষে সমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইলে দল হইতে রাজা মহারাজা হইতে আরম্ভ করিয়া খ্যাতনামা অনেক খেলোয়াড়কে বাদ দিতে হইবে। আমরা আশা করি, বাঙলার ক্রিকেট পরিচালকগণ এই সকল দিক বিবেচনা করিয়া পরবর্তী খেলার জন্য দল গঠন করিবেন।

খেলার বিবরণ

বাঙলা দল প্রথম ব্যাটিং লাভ করিয়া মাত্র ১২৬ রানে ইনিংস শেষ করে। যুক্তপ্রদেশ দলও প্রথম ইনিংসে ৯৯ রান করে। বাঙলা দল দ্বিতীয় ইনিংসে ২৩৯ রান করে। ইহার প্রত্যুত্তরে যুক্তপ্রদেশ দল ২২২ রান করে ও খেলায় ৪৪ রাণে পরাজিত হয়। খেলার ফলাফলঃ—

বাঙলা প্রথম ইনিংসঃ—১২৬ (পি বি দত্ত ৬০, এস ব্যানার্জি নট আউট ২৪, বসির ৪২ রাণে ৭টি ও ফিরাসৎ ১৬ রানে ৩টি উইকেট পান)

যুক্তপ্রদেশ দলের প্রথম ইনিংসঃ—৯৯ রানে (ডি আর পুরী ২৫ রানে ৬টি ও এস ব্যানার্জি ২২ রানে ৩টি উইকেট পান)

বাঙলা দলের দ্বিতীয় ইনিংসঃ—২৩৯ রান (এন চ্যাটার্জি ৭১, পি বি দত্ত ৫১, পার্থসারথী ৩৬, ফিরাসৎ ৬৮ রানে ৫টি ও মজিদ ৪৯ রানে ৩টি উইকেট পান)

যুক্তপ্রদেশ দলের দ্বিতীয় ইনিংসঃ— ২২২ রান (এস গাঙ্গুলী ৩৬, ওয়াহেদুল্লা ৫১, জাসিম ৪৪, পুরী ৫৯ রানে ৪টি, এন চৌধুরী ৪৮ রানে ৪টি উইকেট পান)

অধিকারীর কৃতিত্ব

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পশ্চিমাঞ্চলের খেলায় বরোদা দল নবনগর দলকে পরাজিত করিয়াছে। প্রথম ইনিংসের ফলাফলে খেলার জয়পরাজয় নিষ্পত্তি হইয়াছে। এই খেলায় বরোদা দলের পক্ষে এইচ আর অধিকারী পর পর দুই ইনিংসে শতাধিক রান করিয়াছেন। ব্যাটিং বিষয়ে অধিকারী এখনও যে ভারতীয় দলে স্থান পাইবার উপযুক্ত তাহা তিনি এই খেলায় প্রমাণিত করিয়াছেন। অস্ট্রেলিয়ান দলের বিরুদ্ধে অধিকারীকে খেলিতে দেওয়া হয় নাই। ইংল্যান্ডগামী ভারতীয় দলে বোধ হয় স্থান দেওয়া হইবে। নিম্নে ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

বরোদা দলের প্রথম ইনিংসঃ—৩২৮ রাণ (অধিকারী ১২৯, এম এম নাইডু ৬০)

নবনগর প্রথম ইনিংসঃ—২১৮ রাণ (যাদবেন্দ্র সিংহজী ৫৮, আমীর ইলাহি ৬৫ রানে ৪টি উইকেট পান)

বরোদা দলের দ্বিতীয় ইনিংসঃ—৫ উই: ৩৬৩ রান (অধিকারী নট আউট ১৫১ গুলমহম্মদ ৮৭, মুবারক আলী ৯২ রানে ২টি উইকেট)

নবনগর দলঃ—৮ উইকেটে ১৩৯ রান।

হায়দরাবাদ দল বিজয়ী

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার দক্ষিণা- ঞ্চলের খেলায় হায়দরাবাদ দল মধ্যপ্রদেশ ও বেরার দলকে এক ইনিংস ও ১১৮ রানে পরাজিত করিয়াছে। হায়দরাবাদ দলের পক্ষে প্রবীণ খেলোয়াড় আইবর। শত রান করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। খেলার ফলাফলঃ—

হায়দরাবাদ দলঃ—৩৯৯ রান (আইবর ১০, আলী হাসান ৮৫, গোলাম আমেদ ৭৬ ঠাকুর ১১১ রানে ৫টি লোখান্দে ৯: রানে ৩টি উইকেট পান)

মধ্যপ্রদেশ ও বেরার—প্রথম ইনিংস—১৫ রান (টি এস নাইডু ৫৬, গোলাম আমে ৬৫ রানে ৭টি উইকেট পান)

মধ্যপ্রদেশ ও বেরার—দ্বিতীয় ইনিংস- ১২৭ রান।

দেশী সংবাদ

১৮ই ডিসেম্বর—মহাত্মা গান্ধী অদ্য অপরাহ্নে শান্তিনিকেতনে পোঁছেন। গান্ধীজী তাঁহার গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে আশ্রমে প্রবেশ করেন। তিনি বলেন যে, এই আশ্রমকে তিনি তাঁহার তীর্থক্ষেত্র বলিয়া গণ্য করেন।

দিল্লীতে সামরিক আদালতে আজাদ হিন্দ ফৌজের ক্যাপ্টেন শাহ নওয়াজ, ক্যাপ্টেন সাইগল এবং ধীলনের বিরুদ্ধে আনীত মামলার আসামী পক্ষের কৌঁসুলী শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাইয়ের সওয়াল শেষ হয়।

১৯শে ডিসেম্বর—মহাত্মা গান্ধী শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের মধ্যবর্তী আম্রকুঞ্জের ছায়ায় দীনবন্ধু স্মৃতি হাসপাতালের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। হাসপাতালটি স্বর্গত দীনবন্ধু সি এফ এণ্ডরুজের স্মৃতিরক্ষাকল্পে নির্মাণ করা হইতেছে। জনসাধারণ প্রদত্ত দান হইতে ইহার ব্যয় হইবে।

কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত শশাঙ্কশেখর সান্যাল এবং শ্রীযুত ডি কে লাহিড়ী চৌধুরী যথাক্রমে কলিকাতা সহরতলী অ-মুসলমান, প্রেসিডেন্সী বিভাগ অ-মুসলমান এবং বঙ্গীয় জমিদার নির্বাচকমণ্ডলী হইতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

২০শে ডিসেম্বর—কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীযুত সত্যপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় রাজসাহী, চট্টগ্রাম বিভাগ অ-মুসলমান নির্বাচন কেন্দ্র হইতে হিন্দু মহাসভা প্রার্থী শ্রীযুত মনোরঞ্জন চৌধুরীকে পরাজিত করিয়া সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

কংগ্রেসপ্রার্থী নাড়াজোলের কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁ বর্ধমান বিভাগ অ-মুসলমান নির্বাচন কেন্দ্র হইতে ১৭১১৯ ভোট পাইয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রীযুত বঙ্কিম মুখার্জিকে (হিন্দু মহাসভার প্রার্থী) পরাজিত করিয়া কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

নিখিল ভারত রবীন্দ্র স্মৃতিরক্ষা কমিটির জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদার অদ্য সকালে শান্তিনিকেতনে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং রবীন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডার সম্পর্কে তাঁহার সহিত আলোচনা করেন। রবীন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডারে এ পর্যন্ত মোট ১২ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের ভূতপূর্ব জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ হরিবিষ্ণু কামাথ বর্ধমানে একজনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, "আমার বিশ্বাস, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আবার ভারতে ফিরিয়া আসিবেন, কিন্তু অস্থায়ী গভর্নমেন্টের প্রেসিডেন্টরূপে নয়—স্বাধীন ভারতের জাতীয় গভর্নমেন্টের প্রেসিডেন্টরূপে।"

মহাত্মা গান্ধী অদ্য শান্তিনিকেতন হইতে রামপুরহাট হইয়া সোদপুরে প্রত্যাবর্তন করেন।

২১শে ডিসেম্বর—কলিকাতা দেশবন্ধু পার্কে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেন যে, ভারত আর বিলম্ব করিতে পারে না, ভারতের সমস্যা চরমে পৌঁছিয়াছে—অবিলম্বেই ইহার সমাধান প্রয়োজন। অন্যথায় যে ঝড়ের লক্ষণ দেখা যাইতেছে, সেই ঝড় সারা ভারতকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করিবে। পণ্ডিতজী বলেন যে, ভারতে এমন শক্তি অর্জন করিতে হইবে, যাহাতে পৃথিবীর কোনশক্তিই তাহার সমক্ষে দাঁড়াইতে না পারে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচনের যে ফলাফল এ পর্যন্ত ঘোষণা করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, ১০২টি নির্বাচিত আসনের মধ্যে ৯৭টি পূর্ণ হইয়াছে। তন্মধ্যে কংগ্রেস ৫৫টি, মুসলিম লীগ ২৭টি, স্বতন্ত্র ৫টি, ইউরোপীয় ৮টি ও আকালী শিখ ২টি আসন পাইয়াছে। স্বতন্ত্র পাঁচটি আসনই জমিদারেরা পাইয়াছেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজের কুড়িজন মণ্টগোমারী জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট তাঁহারা বলেন যে, গত ১৯শে অক্টোবর জেলে আজাদ হিন্দ ফৌজের একদল লোকের উপর লাঠি চালনা করা হয়। তাঁহাদের মধ্যে তিনজন পরে মারা যান।

২২শে ডিসেম্বর—কলিকাতায় মহাত্মা গান্ধী এবং বাঙলার গভর্নর মিঃ কেসির মধ্যে পুনরায় সাক্ষাৎ ঘটে। এই সাক্ষাৎকারের সময় গান্ধীজী বাঙলায় এখনও যে বহুসংখ্যক রাজনীতিক বন্দী কারাগারে আছেন, তাঁহাদের মুক্তিদানের জন্য বিশেষ জোর দেন।

২৩শে ডিসেম্বর—অদ্য প্রাতে শান্তিনিকেতনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে বিশ্বভারতীর বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এইদিন অপরাহ্নে চীন-ভারত সাংস্কৃতিক পরিষদের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ প্রসঙ্গে পণ্ডিত নেহরু বলেন যে, চীন, ভারত এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের একযোগে চলা এবং পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করা প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের সহিত আঁটিয়া উঠা অসম্ভব।

হাওড়া টাউন হলে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় বিভিন্ন বক্তা ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে ফরোয়ার্ড ব্লকের ন্যায় বামপন্থী দলের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন। সদ্যমুক্ত রাজবন্দী অধ্যাপক জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

কলিকাতা ট্রামওয়ে কোম্পানীর এজেন্ট কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তার নিকট এক পত্রে লিখিয়াছেন যে, কলিকাতা কর্পোরেশন যে মূল্যে (৩ কোটি ৬৯ লক্ষ ৩৫ হাজার ২ শত টাকা) ট্রামওয়ে ক্রয়ের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, ট্রাম কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ড তাঁহাকে উহাতে সম্মত না হইবার জন্য নির্দেশ দিয়াছেন।

অদ্য অপরাহ্নে সোদপুরে খাদি প্রতিষ্ঠান আশ্রমে বাঙলা কংগ্রেসের প্রতিনিধিবৃন্দের সহিত মহাত্মা গান্ধীর এক ঘরোয়া সম্মেলন হয়। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল আলোচনা চলে। প্রকাশ, এই আলোচনা সভায় রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, বাঙলার দুর্ভিক্ষ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাসমূহ সম্পর্কে আলোচনা হয়।

২৪শে ডিসেম্বর—নীলগঞ্জ বন্দিশিবির হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত আজাদ হিন্দ ফৌজের লেঃ এ সি নায়ার মাদ্রাজে ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট একটি চাঞ্চল্যকর কাহিনী প্রকাশ করেন। উহাতে দেখা যায় যে, ১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে গুলী করিয়া হত্যা করিবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তাহা ব্যর্থ করিয়া দেওয়া হয়।

বিদেশী সংবাদ

১৮ই ডিসেম্বর—ভারতে যে পার্লামেণ্টারী প্রতিনিধি দল প্রেরিত হইতেছে, উহার ৮ জন সদস্যের নাম ঘোষণা করা হইয়াছে। তন্মধ্যে মিসেস ওয়ালহেড (শ্রমিক) নামে একজন নারী এবং মিঃ সোরেনসেন, মিঃ রিচার্ড, মেজর ওয়াট ও মিঃ বটমলী নামক শ্রমিক দলের ৪ জন সদস্য রহিয়াছেন। রক্ষণশীল দলের দুইজন ও উদারনৈতিক দলের একজন সদস্য আছেন। মিঃ রিচার্ড এই সদস্য দলের নেতৃত্ব করিবেন।

১৯শে ডিসেম্বর—অদ্য কমন্স সভায় ইণ্ডিয়া বিলের (জরুরী অবস্থা ঘোষণা সংক্রান্ত) দ্বিতীয় দফার আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। যুদ্ধকালে ভারত গভর্নমেণ্ট যে সকল জরুরী ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, সেগুলির আইনগত ভিত্তি সম্পর্কে সন্দেহ দূরীকরণের জন্যই এ বিল আনীত হইয়াছে।

ওয়েণ্ডসওয়ার্থ কারাগারে ভূতপূর্ব ভারত সচিব মিঃ আমেরীর পুত্র জন আমেরীর ফাঁসি হইয়া গিয়াছে।

লণ্ডনের এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, আজাদ হিন্দ ফৌজের গোয়েন্দা বিভাগের অধ্যক্ষ এস এল চোপরার আবেদন আজ প্রিভি-কাউন্সিলের জুডিসিয়াল কমিটি অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ১৯৪৪ সালের ১৮ই ডিসেম্বর দিল্লীর স্পেশ্যাল জজ চোপরাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং উচ্চতর আদালত উক্ত রায় অনুমোদন করেন। এই রায়ের বিরুদ্ধে মিঃ চোপরা প্রিভিকাউন্সিলে আপীলের অনুমতি চাহিয়াছিলেন।

২১শে ডিসেম্বর—জর্জিয়ার কোন কোন অংশ যাহা এখন তুরস্কের অধীনে আছে এবং ১৯১৮ সালের পূর্বে বাটুম ও কার্স প্রদেশের অন্তর্গত ছিল, তাহা প্রত্যর্পণ করিবার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়ন তুরস্কের নিকট দাবী জানাইয়াছেন।

বার্লিন হইতে লণ্ডনের সংবাদপত্র "অবজার্ভারে" প্রেরিত এক বিবরণে বলা হইয়াছে যে, বড় বড় জার্মান শহরে পুনরায় নাৎসী তৎপরতার লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। কয়েক মাস আগেও হিটলারের বাঁচিয়া থাকার কথা শুনিলে অধিকাংশ জার্মানই বিদ্রূপ করিত। এখন কিন্তু অবস্থা বিপরীত দাঁড়াইয়াছে। এখন বহু লোকের সুদৃঢ় বিশ্বাস এই যে, হিটলার সুযোগের অপেক্ষায় সময়াতিপাত করিতেছেন এবং শুভমুহূর্তে আবির্ভূত হইবেন।

লণ্ডনের "ইকনমিস্ট" পত্রিকায় লেখা হইয়াছে যে, মধ্যপ্রাচ্যে বৃটিশ সৈন্যের সংখ্যা যদি হ্রাস করা হয়, তাহা হইলে সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত একটা বোঝাপড়া সম্ভব হইতে পারে। রাশিয়ানদের বিশ্বাস, গত কয়েক মাসে মধ্যপ্রাচ্যে বহু বৃটিশ সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছে এবং রাশিয়ানদের মতে তাহাদের সংখ্যা ৫ লক্ষের কম নহে। রাশিয়ানদের সন্দেহ এই বিশ্বাসে পরিণত হইতে চলিয়াছে যে, বস্তুত রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিযুক্ত করিবার জন্যই সৈন্য সমাবেশ করা হইতেছে।

লণ্ডনের অবজার্ভার পত্রিকায় প্রকাশ, আমেরিকার কাছ হইতে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ পাইবার যে প্রস্তাব রাশিয়া করিয়াছিল, উহার জবাবে কঠোর রাজনৈতিক সর্ত আরোপ করিয়া রাশিয়ার কাছে পাল্টা প্রস্তাব পাঠাইয়াছে।

২৪শে ডিসেম্বর—চীনা কম্যুনিস্টদের সংবাদে প্রকাশ, উত্তর-চীনে কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইবার জন্য ২০ লক্ষ সরকারী সৈন্য প্রেরণ করা হইতেছে।

দেশ

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

১২ বর্ষ] শনিবার, ২২শে পৌষ, ১৩৫১ সাল। Saturday, 6th January, 1945 [৯ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

আত্মশক্তির সাধনা

হিন্দু মহাসভার বিলাসপুরে অনুষ্ঠিত ২৬তম অধিবেশনে ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সভাপতিরূপে তাঁহার অভিভাষণে যাহা বলিয়াছেন, তাহা নানা দিক দিয়া অনুধাবনযোগ্য। তিনি তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন ঃ

"যে ক্ষমতায় ভারতেরই অধিকার এবং বৃটিশ গভর্নমেণ্টকে যে ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতে হইবে, বর্তমানে তাহা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের হাতেই আছে। সুতরাং পূর্ববর্তী প্রস্তাব ভারত প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, এই অজুহাতে বড়লাট তাঁহার দায়িত্ব এড়াইতে পারেন না। বৃটিশ এখানে যে সর্বনাশ করিয়াছে, তাহার প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত রাজনৈতিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক ঐক্য সম্ভব নয়। এইজন্যই মীমাংসার প্রথম প্রচেষ্টা বৃটেনকেই করিতে হইবে এবং ইহার ব্যতিক্রম বিশ্বাসভঙ্গ এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য এড়ান ভিন্ন অন্য কিছুই নয়।"

স্বার্থের দিক হইতে শাসিতের মধ্যে বিভেদ জীয়াইয়া রাখা এবং ভাগ-বাঁটোয়ারার তাল-বাহনা আমদানী করা শাসকের পক্ষে স্বাভাবিক। ভারতে ব্রিটিশ নীতি যে সুস্পষ্টভাবেই এই উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হইতেছে শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সেদিন নিউইয়র্কে ইণ্ডিয়া লীগের সভায় অভ্রান্ত স্পষ্ট ভাষায় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সর্বাপেক্ষা গ্লানিকর এই যে, আমরাও তাহাতে অংশ গ্রহণ করিতেছি এবং নানারূপ ইন্ধন জোগাইতেছি। সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করার প্রকৃষ্ট উপায় সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান গঠনে ও পরিচালনায় নয়, বরং তাহা সম্ভবপর সর্বপ্রযত্নে অনুসৃত ঐক্য সাধনায়। ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা আমাদের দৈন্য ঘুচিবে না, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ এই কথার উপরই বিশেষ জোর দিয়াছেন। হিন্দু মহাসভার অধিবেশন সমাপ্ত হইবার পর কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া একটি জনসভায় তিনি তাঁহার সেই উক্তিরই প্রতিধ্বনি করেন। তিনি বলেন, গ্রীসের ব্যাপারে চার্চিলকে গ্রীসে ছুটিতে হইয়াছিল এবং যাহারা সেখানে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অবলম্বন করিয়াছে, তাহাদের সংগে সাময়িকভাবে হইলেও কথাবার্তা চালাইতে হইল। কিন্তু ভারতের স্বদেশপ্রেমিকেরা বিদ্রোহী, তাহাদের সংস্রব পরিত্যাজ্য। প্রকৃত সত্য হইল এই যে, আমরা দুর্বল। আমাদের শক্তি অর্জন করিতে হইবে, যতদিন পর্যন্ত আমরা শক্তি অর্জন করিতে না পারিব এবং ঐক্যবদ্ধ না হইব, ততদিন পর্যন্ত আমাদের কথা মর্যাদা দিয়া কেহ শুনিতে চাহিবে না এবং তৎসম্বন্ধে কোন বিবেচনা করা যে প্রয়োজন আছে, ইহাও মনে করিবে না। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের সহিত আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত।

প্রচার সচিবের বিজ্ঞপ্তি

ইংরেজি ১৯৪৪ সাল অতিক্রান্ত হইয়া নববর্ষ আরম্ভ হইল। নববর্ষে নূতন আশা মানুষের হৃদয়কে আন্দোলিত করে; কিন্তু আমরা তেমন কোন প্রেরণাই অন্তরে উপলব্ধি করিতেছি না। ভারতের পক্ষে, বিশেষভাবে বাঙলার পক্ষে ১৯৪৪ সাল যেমন দুর্বৎসর গিয়াছে, ১৯৪৫ সালও তেমনই দুর্বৎসর থাকিবে, ইহাই মনে হয়। বাঙলা সরকারের প্রচার-বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুত পুলিনবিহারী মল্লিক ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে সম্প্রতি একটি বেতার-বক্তৃতা করিয়াছেন। এই বক্তৃতাকে সরকারী সালতামামী হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। তিনি আমাদের অনেক সৌভাগ্যের কথা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন এবং বাঙলা সরকারের কৃতিত্বের জন্যই দুর্ভাগ্যের বহু কারণ সত্ত্বেও আমরা খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা—সকল দিক হইতে অনেক সৌভাগ্যের অধিকারী [illegible] আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা চোখের সম্মুখে দেশের সর্বত্র যে অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে প্রচার-সচিবের এই সব কথা আমাদের প্রাণে বিশেষ সান্ত্বনার সঞ্চার করে না। বাঙলা দেশ হইতে নিরন্নের হাহাকারের এখনও নিবৃত্তি ঘটে নাই, ব্যাধিতের করুণ ক্রন্দন সকল দিক হইতে আমাদের কর্ণে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। চিকিৎসার ঔষধ নাই, শিশুর দুগ্ধ নাই, বস্ত্রহীনের লজ্জা নিবারণের সম্বলের অভাব। এই দুঃখ, এই তাপ, দুরন্ত দারিদ্র্যের এই জ্বালা চারিদিকে দেখিয়া ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া থাকিবার সময় কোথায়? সরকারী পরিকল্পনার অনেক কথা আমরা শুনিয়াছি, কিন্তু জাতি দুর্গতির চরমসীমায় উপনীত হইয়াছে, এমন অবস্থায় ব্যাপক এবং সর্বাঙ্গীণ পুনর্গঠনের আশু প্রয়োজন। সমগ্র জাতির প্রাণশক্তি বৈপ্লবিক প্রেরণায় স্পন্দিত হইয়া উঠিলেই তেমন পুনর্গঠন সার্থকতা লাভ করিতে পারে; স্বার্থ-সংকীর্ণতার সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া মানবতার উচ্ছ্বাসে তখন নির্মল শতদলের মত জাতীয় জীবনের বিকাশ ঘটে। বাঙলার আত্মা আজ সুপ্ত; সেই সুপ্ত আত্মা মানব-মর্যাদার সোনার কাঠির স্পর্শেই জাগিবে, কাহারও অনুগ্রহে বা কৃপায় তেমন জাগরণ ঘটিবে না। অনুগ্রহের কথা অনেক শুনিয়াছি, অনুগ্রহ পরাধীন জাতির পক্ষে নিগ্রহেরই সমতুল্য। আজ সেবার প্রয়োজন। স্বদেশপ্রেমিক সেবক সন্তানদলের জন্যই আজ স্বদেশ-জননী অপেক্ষা করিতেছেন। লোল-রসনা দিগ্বসনা মায়ের বেদনাময় ধ্বনি আমাদিগকে আকুল করিয়া তুলিতেছে। মায়ের সন্তান দল, জননীর সেবাব্রতে আত্মনিবেদন করিয়া মানব-জীবনের দৃপ্ত গরিমায় প্রতিষ্ঠিত হউক। জাতি ভিক্ষান্নের দিকে তাকাইয়া থাকিবার দৈন্য পরিত্যাগ করুক।

সপ্রু কমিটির বৈঠক

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে অদলীয় মীমাংসা কমিটির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অধিবেশনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু কমিটির কর্মপদ্ধতি বর্ণনা করেন। কমিটি চারটি সাব কমিটি গঠন করিয়াছেন। প্রথম সাব কমিটি ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের ভিত্তি, দ্বিতীয় সাব কমিটি তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের সমস্যা, তৃতীয় সাব কমিটি খৃস্টান, শিখ, এংলো-ইণ্ডিয়ান ও অন্যান্য অমুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা এবং চতুর্থ সাব কমিটি শাসনতন্ত্রের অর্থনৈতিক দিক সম্পর্কে বিবেচনার উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়াছে। স্যার তেজবাহাদুরের পরিকল্পিত এই অদলীয় মীমাংসা কমিটির উদ্যোগ শুভেচ্ছা-প্রণোদিত সন্দেহ নাই। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, কোন দেশে প্রচণ্ড বৈপ্লবিক পরিস্থিতির উদ্ভবের পর জনমত গঠিত হইলে তবে নূতন শাসনতন্ত্র রচনার প্রয়োজন হয়। এরূপ ক্ষেত্রে শাসক-শক্তি ঐক্যবদ্ধ জনগণের প্রতিনিধিগণের দ্বারা রচিত শাসনতন্ত্র মানিয়া লইতে বাধ্য হয়। এখানে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিগণের রচিত শাসনতন্ত্র স্বীকার করিয়া লইতে সম্মত আছেন কি? আমরা কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের তাহার বিপরীত মনোভাবই লক্ষ্য করিতেছি। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ রাখিয়া তাঁহাদের মুক্তি দান সম্বন্ধে অচলায়তনের মত মনোভাবের যে পরিচয় বৃটিশ গভর্নমেণ্ট দিতেছেন, তাহাই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ভারতীয় কংগ্রেস ভারতের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার ও ঐক্য সাধনার প্রতীক। একমাত্র কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দই ভারতের জনমত গঠন করিতে পারেন। তাঁহাদিগকে কারারুদ্ধ রাখিয়া ভারতের জনমত গঠনে একটা নিষ্ক্রিয় অবসাদের সৃষ্টি করা হইয়াছে। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ভারতের জনমত গঠনে সক্ষম, তাঁহাদের অধিকাংশই আজ কারাগারে আবদ্ধ। কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের মুক্তি এবং কংগ্রেসের সঙ্গে গভর্নমেণ্টের আপোষের সম্বন্ধে সম্প্রতি যে সব গুজব শোনা যাইতেছে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু তাহাকে নিতান্ত বাজে বলিয়া মনে করেন। আমাদেরও সেইরূপই বিশ্বাস। এরূপ ক্ষেত্রে আমরা সপ্রু কমিটির এই বৈঠকের কোন গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। ইহা একটি পণ্ডিতী আলোচনা সভা মাত্র, দেশবাসী ইহাই মনে করে।

পরলোকে ডাঃ সরসীলাল সরকার

প্রখ্যাতনামা মনোবিকলনতত্ত্ববিদ্ ও চিকিৎসক ডাঃ সরসীলাল সরকার মহাশয়ের পরলোকগমনে আমরা একান্ত মর্মাহত হইয়াছি। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭১ বৎসর হইয়াছিল। কেবল চিকিৎসা বিদ্যায়ই নয়, গণিত শাস্ত্র, রসায়ন শাস্ত্র এবং মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধেও তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার জন্য বিদ্বৎসমাজে তিনি সুপরিচিত। প্রাণিতত্ত্ব ও পদার্থ বিদ্যা সম্বন্ধেও তিনি অসাধারণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। পাঠ্য-

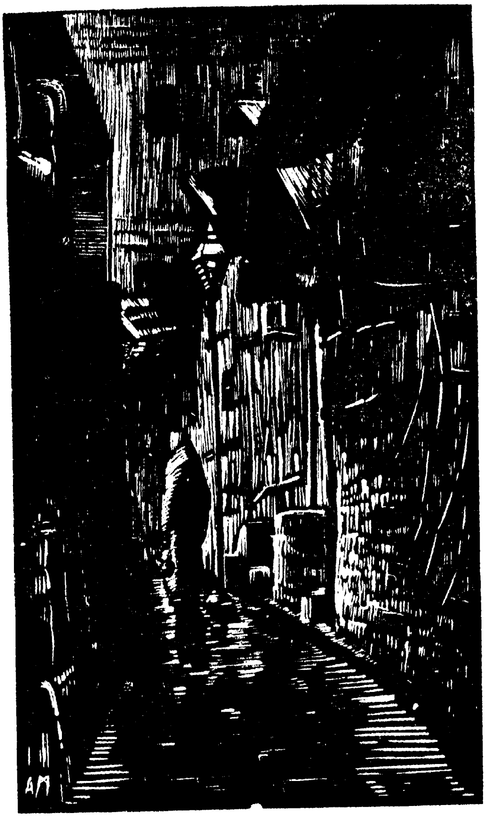


জীবন হইতেই ডাঃ সরকার অনন্যসাধারণ মেধা ও প্রতিভার পরিচয় দেন। এণ্ট্রান্স, ফার্স্ট আর্টস ও বি-এ পরীক্ষায় তিনি বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৯৪ সালে রসায়ন-শাস্ত্রে তিনি এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের স্নেহভাজন ছাত্ররূপে পরিগণিত হন। সুপ্রসিদ্ধ মনোবিকলনতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক ফ্রয়েড্ পত্রালাপের মারফতে ডাঃ সরকারকে ছাত্ররূপে গ্রহণ করেন। পরলোকগত ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ও স্বামী বিবেকানন্দের মহনীয় প্রভাবের ভিতর দিয়া তাঁহার জীবনাদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছিল। অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার অধিকারী হইয়াও তিনি নিরভিমান ছিলেন। তাঁহার এই নিরভিমানতা ও আত্মপ্রচার-বিমুখতার জন্যই তাঁহার পাণ্ডিত্যের সম্পূর্ণ পরিচয় লাভ করিবার সুযোগ সাধারণের হয় নাই। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার মত একজন সুপণ্ডিত উদারচেতা মনীষীর পরলোকগমনে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হইল। 'আনন্দবাজার পত্রিকার' পরলোকগত সম্পাদক শ্রদ্ধেয় প্রফুল্লকুমার সরকার মহাশয় বৈবাহিকসূত্রে তাঁহার আত্মীয় ছিলেন। আমরা আজ আমাদের একজন একান্ত হিতৈষীকে হারাইয়া আত্মীয়-বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিতেছি। ডাক্তার সরকারের ভগিনী শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার ও তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিজনবর্গকে আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি এবং তাঁহার পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

বাঙলার চাউল রপ্তানি

বাঙলা সরকার চাউল রপ্তানি করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। বাঙলা দেশে চাউলের কি বাড়তি হইয়াছে কিংবা দেশের লোক খাইয়া শেষ করিতে পারিতেছে না, সেজন্যই কি সরকারের এই উদ্যম? এখনও তেমন কোন সরকারী বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যায় নাই। জানা গিয়াছে যে বাঙলা সরকারের খাদ্যশস্য সংগ্রহের চেষ্টার ফলে প্রায় দশ লক্ষ টন চাউল সংগৃহীত হইয়াছে। এই চাউল গুদামজাত করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিতে বাঙলা সরকার অসমর্থ, অর্থাৎ মজুত চাউল হইতে কিছু চাউল বাহিরে না পাঠাইলে তাহা অব্যবহার্য ও নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। চাউল রপ্তানির এই বিষয়টি এ প্রদেশের খাদ্য সমস্যার দিক হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আগামী বৎসরে বাঙলায় মোট চাউল সরবরাহের অবস্থা কি, তাহা না জানিয়া বাহিরে চাউল রপ্তানি করিবার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। নূতন আমন শস্যের অবস্থা সুনিশ্চিতভাবে কিছুই জানা যায় না; তবে ইতিমধ্যেই বাঙলা দেশের প্রায় সকল স্থানেই চাউলের মূল্য যে বৃদ্ধি পাইতেছে এ সংবাদ আমরা প্রত্যহই পাইতেছি। এরূপ অবস্থায় আগামী বৎসরে বাঙলায় চাউলের সচ্ছলতা থাকিবে, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ আমরা দেখিতে পাইতেছি না। তাহা ছাড়া কলিকাতার জন্য চাউল সরবরাহের দায়িত্ব যে বাঙলা সরকারকেই বহন করিতে হইবে, একথা তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য। বাঙলায় বহু বৎসর ধরিয়া খাদ্য শস্যের ঘাটতি চলিতেছে, ব্রহ্মদেশ বা অন্য কোন স্থান হইতে এখানে চাউল আমদানী হইবার সম্ভাবনাও নাই; এক্ষেত্রে শুধু বাঙলা সরকারের চাউল মজুত রাখিবার অব্যবস্থার ফলে বাঙলা দেশ পুনরায় গুরুতর অন্ন সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে পারে না। আমরা কর্তৃপক্ষকে এ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিতেছি।

আর্ট স্কুল প্রদর্শনীর কয়েকটি কাঠখোদাই



কলকাতার ব্ল্যাক্‌আউট শিল্পী: কে এফ্‌ আমেদ



ভিখারিণী শিল্পী: মুরলীধর টালী



রায়গড়ের গ্রাম

দেশের কথা

বৃহতের বেদনা

বেদনার মূল্য আছে। বৃহত্তর বেদনার অনুভূতির ধারায় মানবের মহিমা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে; মানুষ ক্ষুদ্র স্বার্থের আবেষ্টন হইতে যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই মুক্ত হইয়া আত্মোৎসর্গের মধ্যে আপনার অচল আনন্দময় সত্তার সন্ধান পায়। এইভাবে জাতির সকল স্তরে নবজীবনের রস সঞ্চারিত হয়। সম্প্রতি প্রেসিডেন্সী কলেজ ভবনে নারী সেবাসঙ্ঘের উদ্যোগে সংগঠিত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিতে গিয়া শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু মানব-মনের মূলীভূত এই রহস্যের উপর আলোকসম্পাত করিয়াছেন। তিনি বলেন—

"বাঙলার সেই দারুণ দুর্গতির দিনের কথা আমার স্মৃতিপথে উদিত হইতেছে। সেদিন জঠর জ্বালায় নারী নিজ দেহ বিক্রয় করিয়াছে। জননী তাহার শিশুসন্তানকে রাজপথে পরিত্যাগ করিয়াছে। চোরাবাজারে শিশুসন্তান ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে—সেই সঙ্গে এমন সংবাদও আমরা পাইয়াছি যে, রেলপথে টন টন খাদ্য প্রেরিত হইয়াছে; কিন্তু তাহা ক্ষুধার্ত জনগণের মুখ পর্যন্ত পৌঁছে নাই। বাঙলার কর্তৃপক্ষ এক্ষেত্রে দূরদৃষ্টি ও রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। কিন্তু এই বিপদে বাঙলার নারীসমাজে মহাপ্রাণতার বিপুল জাগরণ ঘটিয়াছে। তাঁহারা সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া যে উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, এই চরম দুর্বিপাকে তাহাই একমাত্র আশার আলো। তাঁহাদের প্রেরণা সমগ্র মানবসমাজে সাড়া যোগাইয়াছে এবং সাম্প্রদায়িক ভেদ-বিদ্বেষগত দুঃস্থ বাঙলার এই বিপদপাতে উহা প্রমাণিত হইয়াছে। জাতিধর্ম ও বর্ণের বিভেদ বাঙালী ভুলিয়াছে। এই বিপদে বাঙলার যে ঐক্য এবং সংঘ-শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, ভারতের মুক্তি প্রচেষ্টায় তাহা অনুপ্রেরণা সঞ্চার করিবে।"

মনীষার নিরিখ

বৃহতের এই সংবেদনেই মানুষের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সার্থকতা এবং সেইখানেই সে মানুষ হিসাবে মানুষ। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বিজ্ঞান শাখার সভাপতি ডক্টর মোহাম্মদ কুদরত-এ-খোদার অভিভাষণে আমরা এ সম্বন্ধে অনুপ্রাণনা লাভ করিয়াছি। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বলেন—

"দেশপ্রেমের প্রেরণা লইয়া গণ্ডির বাহিরে আসিয়া আমাদের কর্মক্ষেত্রকে বিরাট ও বিস্তৃত করিতে হইবে। সেখানে ধর্মের গোঁড়ামি থাকিবে না। সমাজ-জীবনে কোন ক্ষুদ্রতা থাকিবে না—সর্বত্র জাগিবে মানবতার মুক্ত আদর্শ। আমাদের জাতীয়তা এই পথেই বিকাশলাভ করিবে। আমার মনে হয়, যাহারা ভারতের একাংশ লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে চেষ্টা করে, তাহারা দেশাত্মবোধহীন; পরন্তু তাহাদিগকে আমরা দেশদ্রোহী বলিতেও কুণ্ঠিত হই না। এক শ্রেণীর লোক এই অখণ্ড ভারতকে ক্ষুদ্র গণ্ডি-দ্বারা ভাগ করিতে চাহে। যাহারা এইরূপ ধারণা পোষণ করে, অথবা অন্যরূপে সমাজে বিভেদ ঘটাইবার ব্যবস্থা দেয়, তাহারা সকলেই দেশদ্রোহী।"

আমাদের লীগপন্থী সহযোগী ডক্টর কুদরত-এ-খোদার অভিভাষণ পাঠ করিয়া রুষ্ট হইয়াছেন। গত ১৪ই পৌষ আজাদের সম্পাদকীয় মন্তব্যে লেখা হইয়াছে—

"ইহা সত্যই অত্যন্ত দুঃখজনক—অন্ততঃপক্ষে ডক্টর কুদরত-এ-খোদার ন্যায় মনীষী ব্যক্তির নিকট আমরা ইহা আশা করিতে পারি নাই। তিনি বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরী ছাড়া কিছু বুঝেন না, ইহাই আমরা জানি।"

বিজ্ঞান-সাধনাই তাঁহার ধ্যান-জ্ঞান বলিয়া অনেকের ধারণা হইতে পারে; কিন্তু সেই সাধনার মূলে ডক্টর কুদরত-এ-খোদার দেশ ও জাতির সম্বন্ধে যে চেতনা রহিয়াছে, আমরা বলিব, এখানেই তাঁহার মনীষার পরিচয়।

মানবতাই ধর্ম

এই প্রসঙ্গে প্রভুপাদ অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর একটি উক্তি আমাদের স্মরণ হয়। সম্প্রতি সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনীর উদ্যোগে তাঁহার ৭৮তম জন্মতিথি অনুষ্ঠিত হইয়াছে! অভিনন্দনের উত্তরে বাঙলার এই সর্বজন-



বরেণ্য বৈষ্ণবাচার্য যে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন, তাহাতে মানবের বেদনা সম্বন্ধে তাঁহার সদাজাগ্রত চেতনারই পরিচয় পাওয়া যায়। বাহিরের কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠানই ধর্ম নয়। সহৃদয়তা এবং সার্বভৌম সেবার প্রাণবত্তার পথেই মানব-মহিমার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। প্রভুপাদ শ্রীযুত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী এক্ষেত্রে বাঙলা দেশে অত্যুজ্জ্বল আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কার্সিয়াংয়ের যক্ষ্মা রোগীদের স্বাস্থ্য নিবাসের জন্য কুড়ি হাজার টাকা দান করিয়া তিনি মানব-সেবার সার্বভৌম আদর্শে সর্বস্ব দিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কারণ, তিনি ধনী নহেন। তাঁহার এ দান প্রাণের দান এবং এখানেই তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের অপরিম্লান মহিমা প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি দেখাইয়াছেন, ধর্ম শুধু সাম্প্রদায়িকতা বা সংকীর্ণতা নয়; নিষ্ঠা বলিতে অনেক ক্ষেত্রে আমরা শুধু ঐ জিনিসগুলিই বুঝিয়া থাকি। তাঁহার আদর্শ এই ভ্রান্তি নিরসন করিবে।

সংস্কার ও সমাজ-জীবন

মানব-সেবার এই প্রেরণার পথেই ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনা সমাজ-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে এবং সেজন্য যুগোপযোগী সংস্কারকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। কিন্তু সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তনের কথা শুনিলেই একদল লোক হিন্দু ধর্ম রসাতলে গেল বলিয়া ধুয়া তোলেন। প্রস্তাবিত হিন্দু কোডের বিরুদ্ধেও এইরূপ ধুয়া তোলা হইতেছে। সেদিন কলিকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে এই বিষয়ের আলোচনার জন্য শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর সভানেত্রীত্বে একটি সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলেন—

"মেয়েরা যদি পিতার সম্পত্তি লাভ করে, তাতে হিন্দুধর্মের কি ক্ষতি হইতে পারে, তাহা আমার বোধগম্য হয় নাই। কিছুদিন আগে পর্যন্ত নিয়ম ছিল পিতার মৃত্যুর পর ছেলেই সম্পত্তির অধিকারী হত। ৫।৬ বৎসর হইল সে আইন পরিবর্তন করে স্ত্রীকে সম্পত্তির সমান অংশীদারিনী করা হয়েছে। আশা করি, দুই বৎসরের মধ্যে হিন্দুধর্ম ধ্বংস হয় নাই। বিধবা বিবাহ সম্বন্ধেও একদিন ধুয়া উঠেছিল হিন্দুধর্ম রসাতলে গেল। আজ বিধবা বিবাহ চলা হয়েছে; কিন্তু হিন্দুধর্ম রসাতলে যায়নি। পিতার কিঞ্চিৎ সম্পত্তি মেয়েরা পেলে সমাজ ও ধর্ম রসাতলে যেতে পারে না। নিজের ভগ্নীকে কিছু দিলে ধর্ম ও সমাজ যদি রসাতলে যায়, তবে আমি বলব, ধর্ম ও সমাজ রসাতলে গিয়েই আছে।"

প্রকৃত কথা এই যে, আমাদের মধ্যে বৃহৎ প্রয়োজনবোধ প্রখর নহে। আমরা গতানুগতিক ধারা ধরিয়া নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থকে নিরাপদ করিয়া চলিতে চাই। মৃত জাতিরই এই লক্ষণ।

সংস্কারের প্রয়োজন কেন?

শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার এই সভায় রাও বিলের আলোচনা-প্রসঙ্গে বর্তমান

সমাজ-জীবনের এই অসাড় অবস্থার দুর্গতিকে উন্মুক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন—

"একান্নবর্তী পরিবার বিলুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নারীজাতি মহা দুর্দশায় পতিত হয়েছে। যারা সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হতে পারে না, তারা একান্নবর্তী পরিবারের আশ্রয়ে সম্মানের সঙ্গে থাকতে পারত। কিন্তু সে সুযোগ দিন দিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যাঁরা কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থে গিয়েছেন, হিন্দু বিধবারা কি দারুণ দুর্দশার মধ্যে দিনাতিপাত করছেন, তাঁরাই সেটা উপলব্ধি করতে পারছেন। যাঁরা হিন্দু বলে অহংকার করেন, তাঁদের মা-বোনেরা মহাদুর্দশায় পতিত হয়েছে, এটা গর্বের বিষয় নয়। সত্বর এই অবস্থার সংশোধনের চেষ্টা না করলে তাঁরা হিন্দু বলে পরিচয় দেবার যোগ্য হবেন না। যাঁরা হিন্দুধর্মের মহিমা কীর্তন করেন সেই মহিমা বজায় রাখবার জন্য তাঁরা কতটা চেষ্টা করেছেন, হিন্দু জাতি যাতে অবনতির দিকে যেতে না পারে, সেদিকে কতটুকু দৃষ্টি দিয়েছেন। তাঁদের মা-বোনেরা ভিখারীর অধম হয়ে তীর্থস্থানে ভ্রমণ করছেন দেখেও তাঁরা প্রতিকারের কোন চেষ্টাই করছেন না।

পুরাতন ও নূতনের যোগ

যুগোচিত এই সংস্কারের পথেই পুরাতনের সঙ্গে নূতনের যোগ ঘটিতে পারে এবং মানবের সনাতন জীবনের প্রাণপূর্ণ প্রতিষ্ঠা সেই পথেই সম্ভব। সেদিন কলিকাতায় নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের অষ্টম বার্ষিকী অধিবেশনের



উদ্বোধন করিতে গিয়া ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় এই বিষয়ের উপরই জোর দিয়াছেন। তরুণদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি তাঁহার অভিভাষণে বলেন—

"মানব সমাজের সেবাই তরুণদের আদর্শ হওয়া উচিত। অভাব, ব্যাধি, স্থবিরতা অজ্ঞানতা এবং আলস্য, এই পাঁচটি সমস্যা প্রত্যেকের সম্মুখে দেখা দেয়, মানব-সমাজ যাহাতে এইগুলি হইতে মুক্ত হইতে পারে, তদুদ্দেশ্যে মানব-সমাজকে সেবা করা ছাত্রদের প্রধান কর্তব্য, তাঁহারা যেন একথা বিস্মৃত

ভারতীয় ফ্যাসিজম্ বলিতে তিনি যে

না হন। মনুষ্য-সমাজকে এই সব ব্যাধি হইতে মুক্ত হইতে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহারা যেন সর্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকেন।"

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে এই যে, ইহাই যদি যুবকদের আদর্শ হয়, তবে দেশের কথা, জাতির কথা, এসব বলা হয় কেন? শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। ছাত্রীদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলেন—

"যাহারা আন্তর্জাতিক বুলি আওড়ায়, ভারতের যে একটা মানচিত্র আছে, তাহা তাহাদের মনে থাকে না; আবার এমন অনেকে আছে, যাহাদের দৃষ্টি হিমালয় পর্বতের পরপারে যায় না। উভয় পক্ষই ভ্রমাত্মক ধারণা পোষণ করে; কারণ, ভারতবর্ষ তাহার বিরাটত্বের মধ্যে সমগ্র মানব-জাতির সমস্যা বহন করিতেছে। বিশ্বের সঙ্গে মিলিতে চাহিলেই মেলা যায় না, সেজন্য আত্মীয়তার বন্ধন গড়িয়া তুলিতে হয়। এইরূপে ধ্বনি করা হয় যে, কংগ্রেস লীগ এক হোক্, কিন্তু কিরূপে হইবে? সস্তা কথা ব্যবহার করিও না। আমি, তুমি, সে আমরা সকলে দৈনন্দিন জীবনে আমাদের পরস্পরের মধ্যে সংস্রবের সূত্রে, পরস্পরের সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের দ্বারা একে অপরকে জানিয়া বুঝিয়া এবং আপনার করিয়া এক হই। এই পথেই আত্মীয়তার ভাবকে আমরা জাতীয়তার পথে সুদৃঢ় করিতে পারি।"

কিন্তু জাতীয়তার নাম শুনিলেই এক শ্রেণীর লোক নাসিকা সংকুচিত করেন। জামসেদপুরে আহূত নিখিল ভারত লেবার ফেডারেশনের সভানেত্রীস্বরূপে মিস মণিবেন কারা সেদিন জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকদের নিন্দা করেন। তিনি বলিলেন, আমরা বিশ্বের সঙ্গে যোগ দিয়া স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিকতার অভিমুখে অগ্রসর হইব। মিস কারা বেন মিঃ এম এন রায়ের দলের রাজনীতিক অনুরাগিণী। সেদিন কলিকাতায় অনুষ্ঠিত রেডিক্যাল ডেমোক্রাটিক দলের সম্মেলনের সভাপতিস্বরূপে মিঃ এম এন রায় যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে ভারতের জাতীয়তাবাদীদের উপর বক্রোক্তি রহিয়াছে। তিনি বলেন—

"এই যুদ্ধে ফ্যাসিজম্ ও ইম্পিরিয়ালিজম্ এই উভয়েরই অবসান হইবে। ভারতকে এখন একটা নূতন করিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। ভারতকে এখন ধনতান্ত্রিক জাতীয় গবর্ণমেণ্ট এবং গণতান্ত্রিক জনগণের গবর্ণমেণ্ট, এই উভয়ের মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইতে হইবে। এই নির্বাচন হইতেছে ফ্যাসিজম্ এবং স্বাধীনতার মধ্যে একটিকে গ্রহণ। আজ মৃতকল্প সাম্রাজ্যবাদ বর্তমান ভারতীয় ফ্যাসিজমের সঙ্গে হাত মিলাইতে চাহিতেছে। ভারতকে যদি প্রকৃত স্বাধীনতালাভ করিতে হয়, তবে এই অশুভ সংযোগ ধ্বংস করিতেই হইবে।"

এস্থলে মৃতকল্প সাম্রাজ্যবাদ বলিতে মিঃ রায় যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকেই বুঝাইয়াছেন, ইহা সহজেই বোঝা যায়; কারণ ভারতের জাতীয়তাবাদের সঙ্গে হাত মিলাইবার প্রশ্ন অন্য ক্ষেত্রে উঠে না এবং কর্মীদের সভায় ডাক্তার সৈয়দ মামুদ যে কংগ্রেসের উপরই কটাক্ষপাত করিয়াছেন, ইহাও দুর্বোধ্য নয়; কিন্তু এক্ষেত্রে একটি বিষয় দুর্বোধ্য থাকিয়া যাইতেছে, তাহা এই যে, এই উভয়ের মধ্যে হাত মিলাইবার চেষ্টার তো কোন পরিচয়ই পাওয়া যাইতেছে না। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে বিনাবিচারে বন্দী রাখা, দেশব্যাপী কংগ্রেসীদের উপর নির্যাতন নিপীড়নকেই কি মিঃ রায় উভয়ের মধ্যে প্রেম-সম্ভাষণ বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছেন এবং সেই ধারণার বলে শুধু এক-তরফা কংগ্রেসীদের বিরুদ্ধতা করিয়া তিনি কল্পিত অশুভ সংযোগকে ধ্বংস করিতে চাহেন? কিন্তু তাহাতে মৃতকল্প সাম্রাজ্যবাদই পুষ্ট হইয়া উঠিবে না কি?

কংগ্রেস-ব্রিটিশ নীতি

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতীয় ফ্যাসিজম্ ওরফে কংগ্রেসীদের সঙ্গে কেমনভাবে হাত মিলাইবার চেষ্টা করিতেছে সম্প্রতি ডাক্তার জীবরাজ মেটা তাঁহার একটি উদাহরণ দিয়াছেন। তিনি বলেন—

"কস্তুরবার মৃত্যুর কয়েকদিন আগে আমাকে দিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিবার কথা হয়। আমাকে এই অনুরোধ জানাইবার আট ঘণ্টা পর কারাগারসমূহের ইন্সপেক্টার-জেনারেল আমাকে যারবেদা সেণ্ট্রাল জেল হইতে আগা খাঁর প্রাসাদে লইয়া যান। আমি সেখানে গিয়া যখন কস্তুরবার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিতেছিলাম, তখন গান্ধীজী ইন্সপেক্টার-জেনারেলকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি আমার সঙ্গে কয়েকটি কথা বলিতে পারেন কি না। ইন্সপেক্টার-জেনারেল অনুমতি দিতে অস্বীকৃত হন এবং বলেন যে, রোগীর অবস্থা খারাপ বলিয়া তিনি নিজের দায়িত্বে এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অনুমতি না লইয়া আমাকে যারবেদা জেল হইতে সেখানে লইয়া গিয়াছেন; এক্ষেত্রে গান্ধীজীকে আমার সঙ্গে কথা বলিবার অনুমতি দিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে তিনি অসমর্থ।"

পত্নী মুমূর্ষু; এরূপ অবস্থায় যাহাকে চিকিৎসকের সহিত কয়েকটি কথা বলিতে দিতেও আপত্তি সেখানে হাতে হাত মিলাইবার মনোভাবেরই প্রভাব বটে। ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অন্যতম সদস্য। গত ১২ই এবং ১৬ই ডিসেম্বর তিনি তাঁহার ভগ্নী শ্রীমতী যমুনার নিকট আমেদনগরের বন্দিশালা হইতে যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়, তিনি অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন; অধিকাংশ সময়েই শয্যাশায়ী হইয়া থাকিতে হয়। পূর্বাপেক্ষা তাঁহার ওজন হ্রাস পাইয়াছে। পুস্তকাদি পাঠ করিবার সামর্থ্য তাঁহার নাই। এইরূপ ভগ্নস্বাস্থ্য অবস্থাতেও ডক্টর ঘোষকে কারারুদ্ধ রাখিতে হইবে, গবর্ণমেণ্ট এমন জিদ লইয়াই চলিতেছেন। কংগ্রেসীদের সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত মিলাইবার ইহাও কি লক্ষণ বলিয়া বুঝিব?

আত্মশক্তির উদ্বোধন

বস্তুত সেদিন হায়দরাবাদের কংগ্রেস-

কথা বলিয়াছেন, আমরা তাহাই সমর্থন করি। ডাক্তার মামুদ বলিয়াছেন, কমিউনিস্টদের শত যুক্তি সত্ত্বেও বর্তমান যুদ্ধকে তিনি জনযুদ্ধ বলিয়া মনে করেন না। ঘটনাচক্রের গতিতে তাঁহার এই উক্তির সঙ্গতিই প্রতিপন্ন হইবে। আমরা দেখিতেছি, প্রত্যেক জাতিই নিজের নিজের স্বার্থকে মুখ্য লক্ষ্যস্বরূপে রাখিয়া যুদ্ধ করিতেছে এবং আত্মশক্তি সুদৃঢ় করিতে চাহিতেছে। ভারতকেও নিজের শক্তিতে সংহত হইয়া নবসৃষ্টিতে অংশগ্রহণের অধিকার লাভ করিতে হইবে। ডাক্তার মামুদের উক্তিতে আমরা তেমন কথাই শুনিতে পাইয়াছি। তিনি বলেন—

"ভারতের বর্তমান রাজনীতিক অবস্থার জন্য নৈরাশ্যে অভিভূত হইবার কোন কারণ নাই। ১৯৪২ সালের আন্দোলনে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই, ইহা সত্য; কারণ, এই আন্দোলনকে সার্থক করিতে হইলে যতটা ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজন ছিল, আমরা তাহা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হই না; কিন্তু দেশের লোকে যে কতটা ত্যাগ করিতে পারে, ঐ আন্দোলনে নিশ্চয়ই আমরা তাহার কিছু পরিচয় পাইয়াছি। বর্তমানে জগতে কতকগুলি মহতী শক্তি কাজ করিতেছে, আমি ইহা স্বীকার করি এবং এই সব শক্তি গণতান্ত্রিকতা ও স্বাধীনতার অনুকূলে অবস্থার সৃষ্টি করিবে, ইহাও বোঝা যায়; কিন্তু এই শক্তিসমূহের সঙ্গে নিজেকে অন্বিত করিতে হইলে ভারতকে প্রধানত আত্মশক্তির উপরই নির্ভর করিতে হইবে—ভারতের স্বাধীনতালাভের পথ একমাত্র সেই পথ। আমেরিকা অথবা অন্য কোন দেশ বা জাতির উপর নির্ভর করিয়া ভারতের মুক্তি আসিবে না।"

দুর্বল কখনও সবলের সঙ্গে মিলিতে পারে না, ভারতকে যদি জগতের জাগ্রত শক্তির সহযোগিতা লাভ করিতে হয়, তবে নিজের অবস্থার উপযোগী পথে নিজের শক্তিকে প্রতিষ্ঠা করিয়া লইতে হইবে—নতুবা ভারতের জনগণের জীবনধারার সঙ্গে অপর কোন প্রবল শক্তির সহৃদয়তার সঙ্গতি ঘটিবে না এবং গভীরভাবে নবসৃষ্টির বেদনা তাহার মধ্যে জাগাইতে সক্ষম হইবে না। আমাদের ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস।

জনযুদ্ধের স্বরূপ কি?

বর্তমানের এই যুদ্ধ জনযুদ্ধ কি না, এ সম্বন্ধে স্বামী সহজানন্দের কথা নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য; কারণ তিনি নিখিল ভারত কিষাণ মহাসভার সভাপতি; সুতরাং জনগণের সহিত তাঁহার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। সম্প্রতি কংগ্রেসের সঙ্গে কিষাণ সভার সম্পর্কের আলোচনা করিয়া একটি বিবৃতিতে তিনি বলেন—

"আজ নয়, ১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কিষাণ সভা "সাম্রাজ্যবাদী বনাম জনযুদ্ধ" এই জে জিগীর শুনিতে পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে নিজেদের মত প্রকাশ করিয়াছে। সর্বময় প্রভুত্ববাদী ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম দেশের সকল সম্প্রদায়ের জনগণের করিলেই সার্থকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হইতে পারে। এবং সেক্ষেত্রে দেশ এবং জাতির স্বাধীনতাই সহযোগিতার ভিত্তিভূমি স্বরূপে গণ্য হইবে। রাশিয়া এই ভিত্তির উপরই স্বদেশের জন্য সংগ্রাম চালাইতেছে। রাশিয়ার যুদ্ধকে সত্যই জনযুদ্ধ বলা চলে। ঐরূপভাবে ভারতে যদি জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই গভর্নমেণ্টের প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্বে যুদ্ধ পরিচালিত হয় তবে ভারতের বর্তমান এই যুদ্ধ সমগ্র দেশের আন্তরিক সহযোগিতার বলে জনযুদ্ধে পরিবর্তিত করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা হয় নাই। বিগত আগস্ট আন্দোলনের পর সাহাবাদ, গয়া এবং বিহারের অন্যান্য জেলায় আমাদের বহুসংখ্যক অগ্রগামী কর্মীদিগকে দণ্ডিত এবং কারারুদ্ধ করা হইয়াছে। অন্যান্য প্রদেশের সম্বন্ধেও এইরূপ কথাই বলা যাইতে পারে। এমন অবস্থায় বলা চলে কি কিষাণ সভাগুলি সাম্রাজ্যবাদীদের হাতের টিপে চলিতেছে অথবা সেগুলি জাতীয়তা বা কংগ্রেস বিরোধী?"

স্বামী সহজানন্দ যে সর্ত দিয়াছেন, যুদ্ধ যদি সেই সর্তে অর্থাৎ জাতীয় গভর্নমেণ্টের অধীনে পরিচালিত হয়, তবে তাহাকে জনযুদ্ধ বলিতে আমরাও প্রস্তুত আছি, কিন্তু তৎপূর্বে নয়।

মিত্রশক্তির সমরনীতি

কোথায় জনস্বার্থ আর কোথায় বর্তমান সমরনীতি? অন্যান্য দেশে যুদ্ধের সাফল্যের জন্যে জনগণের কল্যাণ সাধনের দিকে সমধিক লক্ষ্য রাখা হয়। ইংলণ্ড এবং আমেরিকা সাক্ষাৎ-সম্পর্কে যুদ্ধে লিপ্ত, কিন্তু ভারতের ন্যায় সেখানে নিরন্নতা এবং মহার্ঘতা নাই; অথচ এই যুদ্ধোদ্যমের মধ্যে দুর্ভিক্ষে গত বৎসর এক বাঙলা দেশেই ৩০ লক্ষ নরনারী মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ভারতীয় বৈজ্ঞানিক প্রতিনিধি দলের নেতাস্বরূপে স্যার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ সম্প্রতি আমেরিকার আটলাণ্টা সহরে বক্তৃতাকালে বলিয়াছেন—আমাদের দেশের বেশীর ভাগ লোকই অর্ধাশনে দিন কাটায়। ভারতের সর্বত্র অজ্ঞতা, দারিদ্র্য এবং অনশন বিরাজ করিতেছে। ভারতকে সর্বপ্রথমে এই সমস্যার সমাধান করিতে হইবে, কিন্তু ইহা করিতে হইলে রাষ্ট্রনীতিক স্বাধীনতা সর্বপ্রথমে প্রয়োজন; ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ ভারতের অর্থনীতিক দুর্গতির জন্য গলদাশ্রুলোচন হইলেও ভারত শাসন ব্যাপারে তাঁহাদের শোষণ-স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে রাজী নহেন। এক্ষেত্রে আমেরিকার দায়িত্ব রহিয়াছে। অধ্যাপক জে এন মুখার্জি তাঁহাদিগকে তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন; তিনি বলেন, আপনারা স্বীকার করুন আর না করুন, ভারতের ব্যাপারে আপনারা জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু আমেরিকা কি ভারতের স্বাধীনতাকামী সন্তানদের পক্ষ সত্যই সমর্থন করে? মার্কিণ গভর্নমেণ্ট যে এক্ষেত্রে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের নীতিতেই সায় যোগাইয়া চলিতেছেন, ইহা বুঝিতে বাকী নাই।

আটলাণ্টিক সনদের খবর

যুক্তরাষ্ট্রের উদারনীতিক দল মার্কিন গভর্নমেণ্টকে আটলাণ্টিক সনদের নীতিতে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছেন। একটি বিবৃতিতে তাঁহারা প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে জানাইয়াছেন—

"গ্রেট বৃটেন এবং রাশিয়া ইউরোপের নিজের নিজের প্রভুত্বের গণ্ডী বাঁধিয়া লইবার চেষ্টায় আছে; যদি এই চেষ্টা পরিত্যক্ত না হয়, অর্থাৎ ইউরোপ গণতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী পুনর্গঠিত না হয়, তবে এসিয়াকে লইয়া আরও বেশী সমস্যায় পড়িতে হইবে। সেখানে ইউরোপীয় প্রভুদের বিরুদ্ধে অধীন জাতিসমূহের মনোভাব উত্তরোত্তর উগ্র আকার ধারণ করিতেছে। যুদ্ধের ফলে এসিয়ায় স্বাধীনতা এবং সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি জাগ্রত হইয়াছে। আমরা এই সত্য উপলব্ধি করিয়া নিজেদিগকে অবস্থার উপযোগী পথে পরিচালিত করিতেছি না; ইহার ফলে এসিয়াবাসীদের মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইতেছে। ভারতবর্ষ হইতে ফিরিয়া মিঃ ফিলিপস্ ইহা আপনাকে জানাইয়াছিলেন। ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতি এবং অর্থনীতিক সমৃদ্ধি সকলই আছে; এমন দেশকে অবিলম্বে স্বাধীনতা প্রদান করা কর্তব্য।"

মার্কিন উদারনীতিক দল আবার আটলাণ্টিক সনদের কথা তুলিয়াছেন। শুনিয়াছিলাম, আটলাণ্টিক সনদ বলিয়া কোন বস্তুই নাই এবং তাহাতে কেহ স্বাক্ষরও করে নাই। গেলাব এজেন্সী খবর দিতেছেন যে, তেমন বস্তু আছে। প্রিন্স অব ওয়েলস রণতরীর উপর তাহা বিলাস-বস্তু হিসাবে প্রস্তুত হইয়াছিল। মিঃ চার্চিল আমেরিকায় গেলে তাঁহার হস্তাক্ষরকামী একদল লোক সেই কাগজে তাঁহাকে দিয়া একটা সহিও করাইয়া লইয়াছিলেন; প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টও এই শ্রেণীর অনুগতদের পাল্লায় পড়িয়া সেই কাগজে একটা সহি দিতে বাধ্য হন।

সুতরাং আটলাণ্টিক সনদ আছে; কিন্তু তাহা চার্চিল এবং রুজভেল্টের অনুগতগণের পক্ষে প্রভুস্মৃতির উদ্দীপক একটি স্মারক পদার্থ মাত্র। সম্প্রতি আমেরিকার ফিলাদেলফিয়া রেকর্ড পত্র এই সনদের কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—

"আটলাণ্টিক সনদ কে বলে লিখিত হয় নাই, তাহা লিখিত হইয়াছে; জগতের নরনারীর অন্তরে তাহা লিখিত হইয়াছে; তাহা মার্কিন দেশের সেনাদের গৃহে গৃহে লিখিত হইয়াছে, শিশুদের স্কুলপাঠ্যের পাতায় পাতায় লিখিত হইয়াছে এবং বৃহৎ আদর্শের পক্ষে যাহারা প্রাণ দিয়াছে, তাহাদের শোণিতে তাহা লিখিত হইয়াছে। মার্কিন দেশের তরুণেরা আটলাণ্টিক সনদ এবং দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা বাণী এবং জাতীয় পতাকাকে সমানভাবে সম্মানের চক্ষে দেখে। নাৎসীদের মরণকামড় সনদের সে আদর্শসিদ্ধির গতি স্থগিত করিতে পারে, কিন্তু বিজয়লাভে সম্মিলিত শক্তির সংকল্প ক্ষুণ্ণ করিতে সমর্থ হইবে না।"

নাৎসীরা রোমের যাদুঘর হইতে অনেক মূল্যবান জিনিস সরাইয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দপ্তরখানা হইতে আটলাণ্টিক সনদ তাহারা চুরি করিয়াছে,



সত্যাসত্য

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

রবিবারের সকাল। বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মিশনের বড় হল ঘরটায় পাড়ার গণ্যমান্য ভদ্রলোকের ভিড় বেড়ে চলেছে। রায়বাহাদুর হৃদয়বিকাশ, হিন্দু রক্ষা সমিতির সহ-সম্পাদক জগৎ চৌধুরী, বালিগঞ্জ ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বিভূতি দত্ত গুপ্ত, পাড়ার হাইস্কুলের হেড-মাস্টার হীরেন সোম একে একে সবাই এসে পৌঁছেছেন। প্রত্যেকেই মিশনের শুভাকাঙ্ক্ষী এবং পৃষ্ঠপোষক। কেউ কেউ পরিচালক সমিতির সদস্যও আছেন। সপ্তাহের অন্য দিনগুলিতে প্রত্যেককেই নানা বৈষয়িক কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়, নিঃশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ থাকে না। রবিবারের এই সময়টাতে তবু খানিকটা অবকাশ মেলে! একটু অসাংসারিক, একটু অবৈষয়িক পরিবেশে মনকে মেলে ধরে তবু খানিকক্ষণ হাঁপ ছাড়া যায়।

চা, সিগারেট, খবরের কাগজ এবং আধা-আধ্যাত্মিক আলোচনায় বৈঠক বেশ জমে উঠেছে। অধ্যক্ষ স্বামী অখিলাত্মানন্দ প্রত্যেককেই স্মিতহাস্যে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন; পারিবারিক কুশল সম্বন্ধে ঔৎসুক্য এবং কারো অসুখ-বিসুখের খবর শুনলে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন, বিষয়বস্তুভেদে আলোচনার যে দু'তিনটি ধারা চলেছে তার সবকটির সঙ্গেই নিজেকে সংশ্লিষ্ট রাখছেন, আবার গেরুয়াধারী যে তরুণ টাইপিস্ট ব্রহ্মচারীটি অফিসের কয়েকখানি জরুরী চিঠিপত্র টাইপ করছে, ফাঁকে ফাঁকে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে তাকে কিছু কিছু প্রয়োজনীয় নির্দেশও দিয়ে আসছেন।

কিশোরবয়সী আর একজন নবীন ব্রহ্মচারী এসে ইতিমধ্যে ঘরে ঢুকল এবং স্বামীজীর সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে জানাল একটি মেয়ে বাইরে অপেক্ষা করছে।

স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন, 'মেয়ে? কি চায়?'

'আমাদের অবলাশ্রমের নাম শুনে এসেছে। আশ্রয় চায়।'

মহিলা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক স্বামী প্রকাশানন্দই এসব ব্যাপারের বিধি-ব্যবস্থা করেন। কিন্তু একটা জরুরী কাজে কাল তিনি শিলং রওনা হয়ে গেছেন। তাঁর স্থানে অফিসিয়েট করবার মত সন্ন্যাসী কিংবা ব্রহ্মচারীদের মধ্যে প্রবীণ বিচক্ষণ কেউ বর্তমানে উপস্থিত নেই। স্বামীজী মুহূর্তক্ষণ কি একটু ভেবে বললেন, 'আচ্ছা, উপাসনা ঘরের পাশের ঘরটিতে তাঁকে নিয়ে গিয়ে বসতে বলো। একটু পরেই আমি যাচ্ছি।'

ঘাড় নেড়ে সশ্রদ্ধ সম্মতি জানিয়ে ব্রহ্মচারীটি তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল। কিন্তু



চা, সিগারেট, খবরের কাগজ এবং আধা-আধ্যাত্মিক আলোচনায় বৈঠক জমে উঠেছে।

চৌকাঠ পেরোতে না পেরোতেই তার বিস্মিত কণ্ঠ শোনা গেল, 'এই যে, আপনি এখানেই চলে এলেন যে! স্বামীজী আপনাকে ও-ঘরে অপেক্ষা করতে বলছেন, চলুন।' কাতর নারীকণ্ঠে উত্তর এলো, 'অনেকক্ষণ ধরেই যে অপেক্ষা করছি বাবা।'

রায়বাহাদুর বললেন, 'স্বামীজী ইচ্ছা করলে এ ঘরেও ওঁকে আসতে বলতে পারেন। আমাদের সবারই তো চুল এখানে পাকা।'

বিভূতিবাবু বললেন, 'কারো বা দু' আনি, কারো বা দশ আনি, এই যা পার্থক্য।'

স্বামীজী ব্রহ্মচারীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, এখানেই নিয়ে এসো।'

বয়স বছর তেইশ চব্বিশ হবে। পাড়া-গাঁয়ের নিম্নশ্রেণীর মেয়ে বলে প্রথম দৃষ্টিতেই বোঝা যায়। স্বাভাবিক স্বাস্থ্যে যে শারীরিক গড়নকে নিতান্তই ভোঁতা মনে হোত, অমার্জিত রুচি এবং অশিক্ষার পুরু প্রলেপে যে মুখশ্রী চোখেই পড়ত না, কিংবা পড়লেও চোখকে পীড়িতই করত, শীর্ণ এবং রুক্ষ হয়ে হঠাৎ যেন তাতে অদ্ভুত একটু তীক্ষ্ণতা এসেছে। ক্লিষ্ট রোগজীর্ণ মুখে এই সামান্য লাবণ্যটুকু নিতান্ত অপ্রত্যাশিত বলেই চোখকে যেন তা একটু অকস্মাৎ বেশিমাত্রায় আকর্ষণ করে।

মেয়েটি একা নয়। ভাঁজকরা ময়লা কাপড়ে জড়ানো একটি শিশুও আছে কোলে। আকৃতি দেখে মনে হয়, বয়স এখনো মাস পোরেনি। পরনে আধা-ময়লা খাটো একখানা শাড়ি। সবুজ লতাপাতার পাড়। কিন্তু এই পাড়টুকু ছাড়া আর কোথাও কোন সধবার লক্ষণ নেই। সমস্ত অঙ্গ নিরাভরণ। সিঁথিতে কি কপালে সিঁদুরের কিছুমাত্র চিহ্ন চোখে পড়ে না। শাড়ির লতানো পাড়টিকে হয়তো সেইজন্যই একটু বিসদৃশ বলে ঠেকে। শাড়ির আঁচল কপাল পর্যন্ত নামেনি। বোধ হয় নামবে না বলে সে চেষ্টাও আর করা হয়নি।

ঘরে ঢুকে মেয়েটি মেঝের উপরই বসতে যাচ্ছিল। স্বামীজী উত্তরের সরু টুলটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, আহা-হা মাটিতে কেন, ওর ওপরে বোসো।'

টুলের এক কোণে গিয়ে মেয়েটি আড়ষ্ট-ভাবে বসলে স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোত্থেকে তুমি আসছ মা?'

মেয়েটি বলল, 'ভুবনবাবুর বাড়ি থেকে।'

'ভুবনবাবু কে? তাঁর বাড়িই বা কোথায়?'

'আমি তাঁর ওখানেই ছিলাম।'

স্বামীজী বললন, 'তাতো বুঝতে পারছি। কিন্তু তিনি থাকেন কোথায়?'

'এই কলকাতাতেই থাকেন বাবা।'

জগৎবাবু অসহিষ্ণুভাবে বললেন, "আহাহা কথা কেন বাড়াচ্ছ? কোন রাস্তায় কত নম্বর তাই আমরা জিজ্ঞেস করছি।'

মেয়েটি বলল, 'তা তো জানিনে বাবা।'

জগৎবাবু মেয়েটির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'রাস্তার নামও জানো না, নম্বরও জানো না? কতদিন কলকাতায় আছ সত্য ক'রে বলো দেখি।'

মেয়েটি মুখ নিচু ক'রে বোধ হয় মনে মনে হিসাব করল তারপর বলল, 'সাত আট মাস।'

জগৎবাবু একটু হাসলেন, 'সাত আট মাস ধ'রে কলকাতায় আছ অথচ যেখানে থাকতে তার ঠিকানা জানো না, একথা কি সত্য ব'লে আমাদের বিশ্বাস করতে বলো।

ভুল ক'রেছ সময়টা আর একটু কম ক'রে বললে ভালো করতে।'

এ কথার জবাব না দিয়ে মেয়েটি মুখ নিচু ক'রে চুপ করেই রইল।

রায় বাহাদুর প্রসঙ্গান্তরে গেলেন, আচ্ছা মা, তোমার কোলে ওটি কি? ছেলে না মেয়ে?'

'ছেলে বাবা।'

বেশ, বেশ, দীর্ঘায়ু হোক, স্বাস্থ্যবান হোক, পণ্ডিত হোক, যশস্বী হোক।

জগৎ চৌধুরী মৃদু হেসে বললেন, 'আর রায় বাহাদুরিটা বাদ পড়ল কেন। ওটা বুঝি পরের ছেলের জন্য কামনা করতে মন সরে না?'

জগৎবাবু রায় বাহাদুরের সমবয়সী এবং বিশিষ্ট বন্ধু। রায় বাহাদুর তীক্ষ্ণ একটু হাসলেন, 'রামঃ রামঃ সরকারী খেতাবে আজকাল কি কোন বাহাদুরি আছে ভাই, ও কেবল দশজনের দুয়ো কুড়োবার জন্য। তার চেয়ে জাতকের জন্য জাতির নেতৃত্বপদ কামনা করি। আশীর্বাদের কিছুটাও যদি ফলে অন্তত উপ বা সহটুকুও যদি সঙ্গে থাকে তাহলেই যথেষ্ট। সভায় সমিতিতে মালা আর হাততালির অভাব হবে না।'

হাস্যের সঙ্গে একটু ভিন্নার্থবোধক উপসর্গের যোগ হচ্ছে দেখে বিভূতিবাবু তাড়াতাড়ি পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে গেলেন, ছেলেটি তো তোমার ভারি সুন্দরই হয়েছে দেখতে, আচ্ছা, ওর বাপ কোথায় বাছা?'

মেয়েটি একবার সকলের দিকে তাকিয়ে আবার মুখ নিচু করল, তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, 'গাড়ি চাপা পড়ে মারা গেছে।'

সকলেই সমস্বরে আফশোষ জানালেন, 'ঈস্‌স্‌, আহাহা।' একটু পরে জগৎবাবু জিজ্ঞাসা করল, কত দিন হোল? কবে ঘটল এই দুর্ঘটনা?

'সেও মাস সাতেক হোল বাবা। ও তখন তিন মাসের পেটে।'

সকলেই পরস্পরের দিকে তাকালেন, জগৎবাবু মৃদু কণ্ঠে বললেন 'দেখলেন, এবার আর হিসাবে ভুল হয়নি।'

স্বামীজী বললেন, আচ্ছা, তোমার সঙ্গে কেউ এসেছে? কে তোমাকে রেখে গেল ওখানে?'

'ভুবনবাবুর মহুরী?'

'মহুরী? কই তিনি?'

'চলে গেছেন।'

'চলে গেছেন? কেন, এতদূর পর্যন্ত সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসতে পারলেন, আর এইটুকু তাঁর সবুর সইলো না? আমাদের সঙ্গে দেখা না ক'রেই চলে গেলেন? জেনে গেলেন না তোমাকে আমরা রাখি কি না রাখি।

রায় বাহাদুর বললেন, 'Perhaps that devil himself is the culprit.'

মেয়েটি বলল, 'মহুরীবাবু বললেন, ওখানে গেলেই তুমি থাকতে পাবে। আমার অনেক কাজ আছে। আমি এখন যাই, আর এসব ব্যাপারে মিশনওয়ালারা নাকি অনেক অকথা কুকথা সব জিজ্ঞাসা করে। বুড়ো ব্রাহ্মণ মানুষ। সে সব আমার কানে সইবেই না।' আবার সকলে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে একটু মৃদু হাসলেন। স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, সেই ভুবনবাবুর কোন চিঠি আছে তোমার কাছে?'

'না বাবা, চিঠিপত্র তো কিছু নেই।'



মেয়েটি মেঝের উপর বসতে যাচ্ছিল।

'হুঁ, আচ্ছা, এতদিন তুমি সেখানে থাকতে পারলে, আর হঠাৎ আজই বা তোমাকে তাঁরা এই আশ্রম দেখিয়ে দিলেন কেন? সেখানেই তো থাকতে পারতে, মেয়েটি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তারপর বলল, 'গিন্নীমা অবশ্য অনেকদিন আগে থাকতেই চলে যেতে বলছিলেন। শেষে ও যখন হোল তখন কিছুতেই আর রাখলেন না। বললেন, আমার অবিয়েত সোমত্ত সব ছেলে। পাড়ার শত্তুররা এরই মধ্যে কত কি বলাবলি আরম্ভ করেছে। তোমাকে আব আমি রাখতে পারিনে বাছা। তুমি এক আশ্রম-টাশ্রমে গিয়ে থাক।'

জগৎবাবু একটু বিশেষ অর্থবাচক দৃষ্টিতে সকলের দিকে তাকালেন তারপর একটু মৃদু হেসে আবার সেই মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার গিন্নীমার পাড়ার শত্তুররা যা বলাবলি করত সেটা সত্যি কি মিথ্যা তাই জানতে চাইছি।'

মেয়েটি কোন জবাব দেবার আগে হঠাৎ হেডমাস্টার হীরেনবাবু অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠলেন, 'আপনার জ্ঞানের পিপাসা অসাধারণ জগৎবাবু। কিন্তু ব্যাপারটা কি মেয়েটিকে দিয়ে একেবারে স্বীকার না করিয়ে নিলেই নয়। না এই মুখরোচক আলোচনা কিছুতেই ছাড়তে পারছেন না?'

জগৎবাবু ক্রুদ্ধভাবে একবার হেড-মাস্টারের দিকে তাকালেন কিন্তু পরক্ষণেই মুখে অদ্ভুত একটু হাসি টেনে বললেন, "মাস্টারমশাই পৃথিবীর সমস্ত ব্যাপার যদি মাস্টারীর মত অমন সহজ হোত তাহ'লে আর ভাবনা ছিল না। মুখরোচক আলোচনাটা ছাড়তে পারছি না তা ঠিকই। কারণ সত্য ঘটনা যথাযথ আমাদের জানা দরকার। এ নিয়ে পুলিসের হাঙ্গামা আছে। তাছাড়া কে প্রকৃত দোষী তা জেনে যদি সম্ভব হয় এই প্রতিষ্ঠান থেকে তার প্রতিবিধানও আমরা ক'রে থাকি। আপনাদের মত Puritan হয়ে অন্যায় দুষ্কৃতি দেখে চোখ বুজে থাকি না। শুচিতা রাখতে চাই বলেই শুচিবায়ুতা আমাদের ছাড়তে হয়।'

হীরেনবাবু হাসলেন, 'লোকে বলে মাস্টারেরা নাকি স্কুল ঘরের বাইরেও তাদের মাস্টারীর অভ্যাস ছাড়তে পারে না। সমস্ত পৃথিবীটাকে তারা তাদের পাঠশালা মনে করে। মাস্টারদের তরফ থেকে এ দোষ আমি স্বীকার করছি। কিন্তু আমার মনে হয়, দোষটা কেবল আমাদের মাস্টারদেরই নয়। অভ্যাসটা সকলেরই আছে। অভিনেতা-দের কাছে গোটা জগৎটাই রঙ্গমঞ্চ আর নেতাদের কাছে বক্তৃতামঞ্চ—এইটুকু যা তফাৎ। সম্পূর্ণ সত্য যখন না জানলে আপনার চলছে না তখন মেয়েটিকে একটু আড়ালে নিয়ে ও সব কথা খুঁটে খুঁটে জিজ্ঞাসা করুন। এই হাটের মধ্যে একটি মেয়েকে এ ধরণের প্রশ্ন করা আপনার শুচিতায় না বাধতে পারে, কিন্তু ভদ্রতায় বাধা উচিত ছিল। স্বামীজী, তার চেয়ে আলাদা নিরিবিলি একটা ঘর দেখিয়ে দিন না জগৎবাবুকে।'

রায়বাহাদুর হেসে উঠলেন, 'এতক্ষণে একটা দারুণ hit দিয়েছে মাস্টার।'

জগৎবাবু ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'হীরেন-বাবু, আপনার কুশ্রী এবং অশ্লীল ইঙ্গিতে আমি অত্যন্ত আপত্তি করছি। এতক্ষণ ধ'রে আপনিই না শুচিতা আর ভদ্রতার বড়াই করছিলেন!'

হীরেনবাবু বললেন, 'কোন কুশ্রী ইঙ্গিত করবার সাধ্যিই কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ছিল না।'

স্বামীজী বিব্রতভাবে বললেন, 'আর কি আরম্ভ করলেন হীরেনবাবু। দয়া ক'রে চুপ করুন। কেন নিজেদের মধ্যে মিছামিছি —বরং আসুন, উপস্থিত বিষয় সম্বন্ধে একটা ইতিকর্তব্যতা ঠিক করা যাক।'

জগৎবাবু বললেন, 'আমি আর ওর

মধ্যে নেই মশাই। বিষয়টা যখন আপনারই জুরিসডিকসনে তখন কি করবেন না করবেন আপনি নিজেই ঠিক করুন। তবে প্রকৃত তথ্য আমাদের জানা দরকার এইটুকু কেবল আমার কথা।'

স্বামীজী বললেন, 'সে তো নিশ্চয়ই।'

তারপর তিনি বিস্মিত এবং বিমূঢ় মেয়েটির দিকে তাকিয়ে সস্নেহে অত্যন্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলা আরম্ভ করলেন, 'শোনো মা, একবার যখন এখানে এসে পড়েছ তোমার আর কোন ভয় নেই, কোন চিন্তা ভাবনা আর তোমাকে করতে হবে না। ব্যবস্থা সাধ্যমত আমরা করবই। প্রাণ থাকতে কোন অমঙ্গল তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। সব রকমের ব্যবস্থাই এখানে আছে। এখানে মেয়েদের আমরা লেখাপড়া শেখাই—অবশ্য যে যতটুকু গ্রহণ করতে পারে—তারপর আছে হাতের কাজ যাতে তোমরা নিজেরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পার, ভবিষ্যতে দাসীবৃত্তি কিংবা আরও কোন জঘন্য উপায়ের আশ্রয় কিছুতেই যাতে তোমাদের আর না গ্রহণ করতে হয়, সেজন্য আলাদা একটা বাড়ি নিয়ে তাঁত বসিয়েছি সেখানে। ইচ্ছা করলে সেসব কাজ শিখতে পারবে। শীঘ্রই আর একটা কারখানা খোলা হবে যাতে ছোটখাট চামড়ার কাজও তোমরা শিখতে পারবে। তারপর আবার যারা গৃহাশ্রমে ফিরে যেতে চায় তাদের জন্য সে ব্যবস্থাও আছে। দেখে শুনে এসব মেয়েদের ফের আমরা বিয়ে দিয়ে দি। তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। কিন্তু এই আশ্রমে ঢুকবার আগে তোমাকে যে সমস্ত সত্য কথা অকপটে আমাদের কাছে খুলে বলতে হবে মা।'

মেয়েটি বলল, 'খুলে তো আমি সবই বললাম।'

স্বামীজী পূর্ববৎ স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন, 'না মা, সব হয়তো ঠিক বলোনি। বলা যে সহজ নয় তা মানি। কিন্তু কেন বলতে পারবে না? অন্যায়ের বিরুদ্ধে তোমরা কিছু খুলে বলতে পারোনি বলেই তো তোমাদের এই দশা। সংসারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলতে হবে দোষ তোমাদের নয়, দোষ দুর্বৃত্তদের, দোষ সেই ভীরু কাপুরুষদের। এখানে তোমার মত অনেকেই আছে মা। যতদূর আমি জেনেছি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের নিজেদের কিছু-মাত্র দোষ নেই। কেউ বা অভাবের তাড়নায় নিতান্ত পেটের দায়ে এভাবে স্খলিত হয়েছে, কাউকে বা নিজেরই কোন নিকট আত্মীয় নানা লোভ দেখিয়ে টেনে এনে এই সর্বনাশের পথে নিঃসহায়ভাবে ফেলে গেছে। সব তুমি খুলে বলো, কোন ভয় নেই তোমার, কোন লজ্জার কারণ নেই, [illegible] লজ্জা আর গ্লানি সেই সুযোগান্বেষী, সুবিধাবাদী পাষণ্ড পুরুষের, তোমার কিসের লজ্জা মা। আচ্ছা এখানে যদি সঙ্কোচ বোধ কর, তুমি বরং ঐ ঘরে চলো, সেখানে সব কাহিনী খুলে বলবে, দেখি কোন বিধান আমরা করতে পারি কিনা। 'এসো মা, আমার সঙ্গে বরং ওঘরে চলো—'

মেয়েটি মুখ তুলে একবার সকলের দিকে তাকাল তারপর স্বামীজীর দিকে চেয়ে বলল, 'অন্য ঘরের দরকার নেই, আমি এখানেই সব বলতে পারব।'

স্বামীজী বললেন, 'কিন্তু ও ঘরে গেলেই তো ভালো হয়, এক্ষেত্রে মেয়েদের একটু লজ্জা তো খুবই স্বাভাবিক।' মেয়েটি শান্তভাবে বলল, 'না আমার কোন



হীরেনবাবু তাঁর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাতেই জগৎবাবু থেমে গেলেন।

লজ্জা করবে না। আপনারা যা ভেবেছেন তাই ঠিক। এ ছেলে আমার স্বামীর নয়।' এই প্রত্যাশিত স্বীকারোক্তিতে সকলেই যেন চমকে উঠলেন।

জগৎবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'তবে কার?'

'তা জানি না।' মেয়েটির কণ্ঠে যেন একটু জেদের আভাস।

জগৎবাবু হাসলেন, 'এইতো, আবার মিথ্যা বলতে সুরু করলে! তুমি জানো না সে কি ক'রে সম্ভব? কথায় বলে মনের অগোচরে পাপ নেই আর মায়ের অগোচরে—'

হীরেনবাবু তাঁর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাতেই জগৎবাবু তাড়াতাড়ি থেমে গেলেন।

মেয়েটি যেন তৎক্ষণাৎ তার কথার ভুল বুঝতে পারল! একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'অগোচরে থাকবে না কেন, এতো আর একজন দু'জন নয়, যে খেয়াল থাকবে।'

জগৎবাবু অর্থব্যঞ্জক ভঙ্গিতে বললেন, 'ও তাই বলো। ক'জন ছিল, কে কে তারা।'

মেয়েটি আর একবার মুখ তুলল। তারপর বেশ সহজ অকুণ্ঠভাবে বলল, 'বাবুর ছেলেরা ছিলেন তিন ভাই—'

জগৎবাবু ব'লে উঠলেন, 'Good God! All of them! আর, আর—এরপরও আবার কেউ ছিল নাকি?'

মেয়েটি একবার বুঝি একটু ইতস্তত করল তারপর, বলল, 'হ্যাঁ, সেই বুড়ো মহুরীবাবুও।'

রায়বাহাদুর বললেন, 'Just see, I guessed it previously.'

জগৎবাবু বললেন, 'আশ্চর্য, আর তুমি সকলের অত্যাচারই মুখ বুজে সহ্য ক'রে গেলে, কোথাও স'রে আসতে পারলে না?'

মেয়েটি জগৎবাবুর দিকে সোজাসুজি তাকাল, তারপর বলল, 'স'রেই তো এখানে আপনাদের কাছে এলাম বাবু।'

হঠাৎ কথাটা কেমন যেন একটু অশ্লীল ব'লে মনে হোল জগৎবাবুর কাছে। কিন্তু তখন তখনই প্রতিবাদ করবার মত কোন জবাবও যেন তিনি খুঁজে পেলেন না। এমন কি একটা ধমক পর্যন্ত তার মুখে জোগাল না। তার পরিবর্তে স্বামীজীর দিকে চেয়ে বললেন, 'শুনলেন তো সব। এবার নামধামগুলি জিজ্ঞেস ক'রে জেনে নিন। তারপর যা ব্যবস্থা হয় করুন, ইতিহাস যা শুনলুম, তাতে তো খুব অসহায় ব'লে মনে হয় না।' কিছুদিনের জন্য বিশ্রামের প্রয়োজন, সেইজন্যাই বোধ-হয় এখানে আসা। চলুন রায়বাহাদুর, বেলা অনেক হোল।'

সকলেই উঠে পড়লেন। স্বামীজী তাঁদের পিছনে পিছনে আশ্রমের সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলেন। তারপর ফিরে এসে ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে গেলেন। মেয়েটি শিশুসন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মাঝে মাঝে দু'এক ফোঁটা জল শিশুটির গায়ের ওপর ঝরে পড়ছে।

স্বামীজী একটু যেন চমকে উঠে বললেন, 'কি হোল তোমার ছেলের? অসুখ ছিল নাকি ওর?'

মেয়েটি জলেভরা দুটি চোখে অসহায়-ভাবে স্বামীজীর দিকে তাকাল, 'না বাবা, অসুখ নয়, পরের ওপর রাগ ক'রে আমি যে ওকে অপমান করলাম।'

স্বামীজী বিস্মিত হয়ে বললেন, 'অপমান করলে কি ক'রে?'

'হ্যাঁ, বাবা। গায়ের রাগে মিথ্যা বানিয়ে বানিয়ে আমি যে ছেলের মান খোয়ালুম, স্বামীর মান খোয়ালুম! আমার যে নরকেও স্থান হবে না বাবা।'

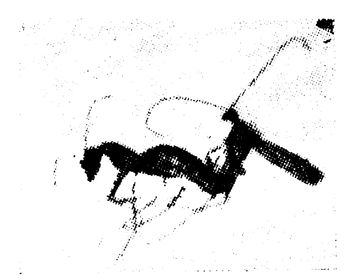
স্বামীজী একটু যেন চমকে উঠে অধিকতর বিস্ময়ে স্তব্ধ এবং নির্বাক হয়ে গেলেন। সত্যিই কি তাই? এই অকথ্য মিথ্যাচারের স্বারা মেয়েটি কি কেবল তার স্বামীপুত্রকেই অপমান ক'রেছে?

বিজ্ঞানের কথা

বিষ-পিঁপড়ের জীবন কাহিনী

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

কয়েক বছর আগের কথা। কীটপতঙ্গ সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানে সুন্দরবনে গিয়াছিলাম। পসর নদীর মোহানায় একটা জঙ্গলের মধ্যে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ঘুরিয়া কতকগুলি কীটপতঙ্গ সংগ্রহ করিবার পর 'লঞ্চে' ফিরিয়া আসিতেছি, হঠাৎ সম্মুখস্থ একটা ঝোপের কাছে ঘাসের উপর একটা অদ্ভুত বস্তু নজরে পড়িল। বস্তুটা বিশেষ কিছুই নহে—ছোট্ট একটি কালো বিষ-পিঁপড়ে। এই বিষ-পিঁপড়ে সকলের নিকটই পরিচিত, পথেঘাটে অহরহ দেখা যায়। আর সকলের মত ইহারা আমারও অপরিচিত নয়; তথাপি সাধারণ একটা পিঁপড়ে আমার নজর আকর্ষণ করিল কেন বলিতেছি। পিঁপড়েটা প্রায় হাত তিনেক দূরে আমার বিপরীত দিকে মুখ করিয়া ছোট্ট একটা ঘাসের উপর বসিয়াছিল। কিন্তু আমার ছায়া পড়িবা-মাত্রই বিদ্যুৎবেগে ঘুরিয়া দাঁড়াইল। পিঁপড়ে যে এমন অদ্ভুত কাণ্ড করিতে পারে, ইহা তো কখনও নজরে পড়ে নাই। যাহা হউক, আরেক দিকে সরিয়া দাঁড়াইলাম। কি আশ্চর্য! পিঁপড়েটাতো ঠিক নজর রাখিয়াছে—আমার দিকেই আবার ঘুরিয়া দাঁড়াইল। ব্যাপারটা কি—অবাক হইয়া ভাবিতেছি—এমন সময় ফিরিয়া আসিবার সংকেত জানাইয়া লঞ্চের বাঁশী বাজিয়া উঠিল। এমন অপূর্ব বস্তুটাকে হাতছাড়া করিয়া যাইব? না হয় একটু দেরীই হইবে। এই ভাবিয়া 'ক্লোরোফরম্ স্প্রে' ও ধরিবার যন্ত্র ঠিক করিয়া অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইলাম। কিন্তু হাত দুয়েকের মধ্যে আসিতেই পিঁপড়েটা যেন যাদুমন্ত্রবলে আমার চোখের উপরই অদৃশ্য হইয়া গেল। জায়গাটা ছোট ছোট ঘাসে আবৃত হইলেও বেশ পরিষ্কার। তথাপি তাহাকে আর খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলাম না। হতাশ হইয়া ফিরিবার উপক্রম করিতেছি হঠাৎ দেখি—আমার পিছনেই কিছু দূরে একটা ঝরা পাতার আড়াল হইতে সে শুঁড় নাড়িতে নাড়িতে বাহির হইয়া আসিতেছে। আর ইতস্তত না করিয়া প্রচুর পরিমাণে ক্লোরোফরম্ বাষ্প প্রয়োগ করিয়া তাহাকে ধরিয়া লইয়া আসিলাম। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই সে আবার চাঙ্গা হইয়া উঠিল, ম্যাগ্নিফাইং গ্লাসের সাহায্যে দেখিয়া বুঝিলাম—সেটা মোটেই পিঁপড়ে নয়। ছোট্ট একটা মাকড়সা। বিষ-পিঁপড়ের চেহারা, গায়ের রং বেমালুম অনুকরণ করিয়াছে। অনুকরণটা যে কিরূপ নিখুঁৎ তাহা প্রত্যক্ষ না করিলে বর্ণনায় সম্যক বুঝানো যায় না। যাহা হউক, মাকড়সাটা একটা সাধারণ পিঁপড়ের আকৃতি ধারণ করিল কেন—ইহা জানিবার জন্য কৌতুহল অদম্য হইয়া উঠিল। এই পিঁপড়েগুলোকে সাধারণভাবে চিনিতাম বটে, কিন্তু বিশেষভাবে ইহাদের সম্বন্ধে কিছুই জানিতাম না। অনুসন্ধানের ফলে দেখিতে পাইলাম—পিপীলিকাতত্ত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিকেরা এই পিঁপড়েগুলি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা কৌতুহল পরিতৃপ্তির পক্ষে যথেষ্ট নহে। তা ছাড়া ইহাদের সম্বন্ধে কতগুলি বিষয়ে যে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াছেন তাহা নিজেরাই স্বীকার করিয়াছেন। ইহা হইতেই এই পিঁপড়ে ও অনুকারী মাকড়সাদের সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হই। কয়েক বছরের পর্যবেক্ষণ ও



বিষ-পিঁপড়েদের যৌন-মিলন

গবেষণার ফলে এই পিঁপড়েদের সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছি এস্থলে তাহারই কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতেছি।

এই পিঁপড়েগুলির বৈজ্ঞানিক নাম—ডায়াকামা ভ্যাগানস্। বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইহারা বিষ-পিঁপড়ে, কাঠ-পিঁপড়ে ও কাঠ-জিঁয়া প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত। এই পিঁপড়েগুলি প্রায় আধ ইঞ্চি লম্বা হয়। শরীর আগাগোড়া শক্ত খোলায় আবৃত। পেটের আকৃতি ডিম্বাকার। বুক ও পেট একটি সূক্ষ্ম বোঁটায় সংযুক্ত। গায়ের রং কালচে ধূসর, কিন্তু ব্রোঞ্জের মত আভাযুক্ত। পিঠের উপর পিছনের দিকে হেলানভাবে অবস্থিত দুইটি কাঁটাওয়ালা একটি অদ্ভুত উপাঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। দেহের প্রান্তভাগে ধনুকের মত বাঁকানো একটি হুল আছে। হুলটি শরীরের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত থাকে; কিন্তু দংশন করিবার সময় উদরের মাংসপেশীর চাপে বাহিরে প্রসারিত করিয়া দেয়। হুলটির আগাগোড়া একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে। ঐ ছিদ্র শরীরাভ্যন্তরস্থ বিষের থলির সহিত সংযুক্ত। অন্যান্য দংশনকারী পিপীলিকারা যেমন প্রধানত চোয়ালের সাহায্যেই আত্মরক্ষা করিয়া থাকে ইহারা কিন্তু সেরূপ করে না। হুলই ইহাদের আত্মরক্ষার প্রধান অস্ত্র। বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে কিছুকাল পর্যন্ত যন্ত্রণা অনুভূত হয়, সামান্য একটু স্ফীতি ব্যতীত অন্য কোন উপসর্গ দেখিতে পাওয়া যায় না।

উগ্রবিষ ও সুতীক্ষ্ম চোয়াল প্রভৃতি আত্মরক্ষার উপযুক্ত অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও ইহারা খুবই ভীরু স্বভাবের পরিচয় দিয়া থাকে। আবছায়ার মত হঠাৎ কিছু একটা দেখিলেই থমকিয়া দাঁড়াইয়া যায়। শুঁড়টি পর্যন্ত নড়ায় না। ঠিক প্রস্তরমূর্তির মত নিশ্চলভাবে অবস্থান করে। অন্যান্য পিঁপড়েদের মত ইহারা সারবন্দী হইয়া অথবা দলবদ্ধভাবে বিচরণ করে না। সর্বদা এককভাবে খাদ্যান্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ায়। একাকী বিচরণ করে বলিয়াই হয়তো অতি-মাত্রায় সাবধানতা অবলম্বন করে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত খাদ্যকণিকা অথবা কীটপতঙ্গের মৃতদেহাদি সংগ্রহ করিয়াই ইহাদের জীবন-যাত্রা নির্বাহ হইয়া থাকে। বিষ-পিঁপড়েরা সাধারণত আত্মরক্ষার জন্য চোয়াল ব্যবহার বা শিকার করিবার জন্য হুল প্রয়োগ করে না। বাচ্চা ও খাদ্যদ্রব্যাদি বহন করিবার জন্যই চোয়াল ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু যদি কোনগতিকে জীবন্ত কীটপতঙ্গ শিকার করিবার সুযোগ উপস্থিত হয়, তখন চোয়াল ও হুল এই উভয় অস্ত্রকে একসঙ্গে ব্যবহার করে। শিকারকে কামড়াইয়া ধরিবার সঙ্গে সঙ্গেই শরীরের প্রান্তভাগ বাঁকাইয়া অনবরত হুল ফুটাইতে থাকে।

বিষ-পিঁপড়েরা সমতল জমি হইতে কিছু উপরে গর্তে অথবা ফাটলে বাস করে। এক একটি গর্তের মধ্যে বড় জোর দেড়শত বা সামান্য কিছু বেশী সংখ্যক পিপীলিকা দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ গর্তেই ৫০।৬০টির বেশী পিঁপড়ে থাকে না। ইহাদের গর্ত বা বাসা অতি সাধারণ ধরণের, কোন নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। কেবল সময়ে সময়ে এটুকু দেখা যায় —যেখানে পিঁপড়ের সংখ্যা বেশী সেখানে

তাহারা মৃত শোঁয়াপোকার শুষ্ক দেহগুলিকে গর্ত বা ফাটলের চওড়া মুখে সারবন্দি করিয়া পর্দার মত ঝুলাইয়া রাখিয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন নৈপুণ্যের বিষয় প্রত্যক্ষ করি নাই। ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গেই ইহারা একে একে বিষয়কর্মের সন্ধানে বহির্গত হয় এবং কিছু একটা খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারিলেই মুখে করিয়া বাসায় লইয়া আসে। বাসা ছাড়িয়া বিশ ত্রিশ গজের বেশী দূরে যায় না। এইরূপে সারাদিন আহার সংগ্রহ চলিতে থাকে কিন্তু সন্ধ্যার পূর্বেই সকলে বাসায় আসিয়া সমবেত হয়। সাধারণত পিঁপড়েদের বাসায় পুরুষ, রাণী, বিভিন্ন জাতীয় কর্মী, সৈনিক প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের পিপীলিকা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বিষ-পিঁপড়েদের উপনিবেশে কেবলমাত্র এক জাতীয় কর্মী পিপীলিকারই সন্ধান মিলে। কদাচিৎ দুই একটি ডানাওয়ালা পুরুষ দেখা যায় মাত্র। কর্মী বা শ্রমিক বলিলে প্রজননক্ষমতাহীন একপ্রকার স্ত্রী পিপীলিকাকে বুঝাইয়া থাকে। পিপীলিকা বলিলে আমরা এই কর্মীদিগকেই বুঝিয়া থাকি এবং ইহাদিগকে দেখিয়াই তাহাদের জাতি নিরূপিত হয়। অধিকাংশ বিভিন্ন জাতীয় পিপীলিকারই রাণী ও পুরুষদের ডানা গজাইয়া থাকে, কিন্তু কোন জাতীয় কর্মীদেরই ডানা গজায় না। রাণী ও পুরুষ সাধারণত কর্মীদের অপেক্ষা আকারে বড় হয় এবং এই তিন শ্রেণীর পিপীলিকার মধ্যে আকৃতি বা প্রকৃতিগত কোন সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। যৌন-সম্মিলনের সময় উপস্থিত হইলে রাণী ও পুরুষ পিঁপড়েরা ডানা মেলিয়া আকাশে উড়িয়া যায় এবং উড়ন্ত অবস্থায়ই যৌন-সম্মিলন ঘটিয়া থাকে। এই সময় নানাপ্রকার শত্রু অথবা ঝড়বৃষ্টির কবলে পড়িয়া অনেকেই নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। যাহারা বাঁচিয়া যায় তাহারা যে কোন একটা উপনিবেশে আশ্রয় গ্রহণ করে অথবা নূতন আশ্রয়স্থলের পত্তন করিয়া সেস্থলে ডিম পাড়িতে সুরু করে। যৌন-মিলনের কিছুদিন পরেই রাণীদের ডানা খসিয়া যায় কাজেই আর যেখানে সেখানে যাইবার উপায় থাকে না। এইজন্যেই নূতন নূতন উপনিবেশ গড়িয়া ওঠে। অবশ্য কোন কোন বাসায় পিঁপড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে কতগুলি অন্যত্র যাইয়া নূতন উপনিবেশ তৈয়ারী করিয়া থাকে। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রায় সর্বত্রই নূতন বাসার সঙ্গে পুরাতন বাসার যোগাযোগ রক্ষিত হইতে দেখা যায়। বাসা নির্মাণ, বাসস্থান পরিষ্কার রাখা, খাদ্যসংগ্রহ, সন্তান পালন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য কর্মী পিপীলিকারাই করিয়া থাকে। পুরুষ ও স্ত্রীরা সম্পূর্ণ অলস। এমন কি খাওয়ার ব্যাপারে পর্যন্ত ইহারা কর্মীদের মুখাপেক্ষী। উপযুক্ত খাদ্য তৈয়ারী করিয়া কর্মীরা মুখের কাছে না ধরিলে তাহাদের খাওয়াই হয় না। সাধারণত পিপীলিকাদের ইহাই জীবনযাত্রার রীতি। কিন্তু বিষ-পিঁপড়েদের জীবনযাত্রা প্রণালী পর্যালোচনা করিলে কতগুলি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

বিষ-পিঁপড়েদের মধ্যে পুরুষ ও কর্মী ব্যতীত পক্ষযুক্ত রাণী বলিয়া বিশিষ্ট আকৃতির কোন পিপীলিকা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই পিপীলিকাদের রাণী খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য কীটতত্ত্ববিদগণ বহু চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাদের স্ত্রী-পিপীলিকা বা রাণীর সন্ধানে আমিও অসংখ্য গর্ত অনুসন্ধান করিয়াছি; কিন্তু কোথাও তাহাদের সন্ধান মিলে নাই। এক একটি গর্তে ৬০।৭০টি কর্মী, দুই একটি পুরুষ, কিছু ডিম, কয়েকটি লার্ভা বা শূক ও পুত্তলী ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। গর্তের অভ্যন্তরে আনাচে-কানাচে দুই একটি স্ত্রী-পিপীলিকা আত্মগোপন করিয়া থাকিতে পারে এই সন্দেহে গর্তের মধ্যে ক্লোরোফরম্ বাষ্প প্রবেশ করাইয়াও কিছু ফল হয় নাই।



পুরুষ বিষ পিঁপড়ের প্রজনন-কোষ
(বর্ধিতাকারে গৃহীত আলোক-চিত্র)

ক্লোরোফর্মের উগ্র গন্ধ মোটেই ইহারা সহ্য করিতে পারে না, সঙ্গে সঙ্গেই লুক্কায়িত স্থান হইতে বাহির হইয়া আসে এবং ডিম, পুত্তলী ও পুরুষগুলিকে মুখে করিয়া কোন নিরাপদ স্থানে রক্ষা করে। পক্ষযুক্ত রাণীর অস্তিত্ব থাকিলে এরূপ অবস্থায় অবশ্যই কোন-না-কোন ক্ষেত্রে তাহাদিগকে দেখা যাইত। এমন কি অবশেষে বাসা খুঁড়িয়া ফেলিয়াও কোথাও সেরূপ কোন পিপীলিকার সন্ধান করিতে পারি নাই।

এ অবস্থায় স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে—রাণী নাই; তবে ডিম পাড়ে কে? এবং পুরুষগুলিরই বা প্রয়োজন কি?

অনুসন্ধান করিবার সময় কখনও কখনও লক্ষ্য করিয়াছি—এক গর্তে তাহাদের সংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় ডিম ও বাচ্চা লইয়া একদল নূতন গর্তে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। কয়েকবার এইরূপ নূতন উপনিবেশ স্থাপন করিতে দেখিয়া মনে হইয়াছিল—তবে কি কোন পুরাতন বাসায় দুই একটা মাত্র রাণী আছে, যাহারা প্রচুর ডিম পাড়িয়া যাইতেছে এবং কর্মীরা সেগুলিকেই বিভিন্ন উপনিবেশের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লইতেছে? এই ধারণার বশবর্তী হইয়া নানাপ্রকার অনুসন্ধান করিয়াও কোন ফল হইল না। কোথাও রাণীর সন্ধান পাওয়া গেল না।

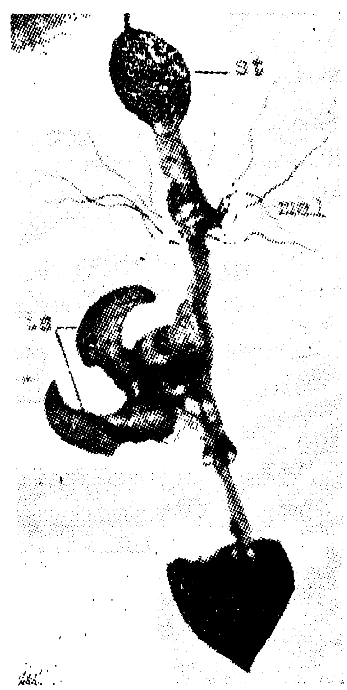
নিম্নশ্রেণীর কীটপতঙ্গের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে অনিষিক্ত ডিম হইতে বাচ্চা উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। এইরূপ ব্যাপারকে "পার্থেনোজেনেসিস্" বলা হয়। বৈজ্ঞানিকেরা যাহাদিগকে অপুষ্টাঙ্গ স্ত্রী পিপীলিকা বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন সেই "কর্মীরাই" কি তবে ডিম পাড়ে? কিন্তু "পার্থেনোজেনেসিসে" যেসকল বাচ্চা উৎপন্ন হইবে তাহা স্ত্রী, পুরুষ ও কর্মী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় হওয়া সম্ভব নয়। কর্মীদের বাচ্চা হইলে তাহাদের কেবল কর্মী হইয়াই জন্মিবার কথা। কিন্তু পুরুষগুলি আসে কোথা হইতে? বিশেষত পরীক্ষার ফলে কর্মীদের পরস্পরের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্যই দৃষ্টিগোচর হইল না। কাজেই প্রকৃত রহস্যটা জানিবার জন্য ইহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাপ্রণালী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িল।

কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় গর্তের মধ্যে ইহাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিবার উপায় নাই। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য, ইহারা বেশ স্বচ্ছন্দমনে চলাফেরা করিতে পারে, এরূপ একটি বড় কাচপাত্রের মধ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া একটি গর্ত হইতে ডিম ও বাচ্চাসমেত সমুদয় পিপীলিকাগুলিকে আনিয়া ছাড়িয়া দিলাম। কাচের স্বচ্ছ দেয়ালের মধ্য দিয়া পরিষ্কারভাবে ইহাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিবার কোনই অসুবিধা রহিল না বটে, কিন্তু যথেষ্ট খাদ্য ও সুখসুবিধা সত্ত্বেও ইহারা পাত্রের মধ্যে থাকিতে চাহিল না। সকলগুলি একসঙ্গে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া চতুর্দিকে ইতস্তত ছড়াইয়া পড়িল। অবশেষে পরস্পর পরস্পরের সন্ধান পাইয়া কোন ফাটলের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তখন কাচপাত্রটিকে অপর একটি জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে বসাইয়া তাহাতে পুনরায় কতগুলি পিঁপড়ে ছাড়িয়া দিলাম। জলকে ইহারা ভয় করে, কারণ জল লাগিলেই ইহাদের শরীর ভিজিয়া যায় এবং সহজেই ডুবিয়া মরিবার সম্ভাবনা থাকে। এবার পিঁপড়েগুলি কাচপাত্রের গা বাহিয়া বাহিরের দিকে জল পর্যন্ত আসিয়া অনেকক্ষণ ইতস্তত করিল এবং অন্য কোনদিকে বাহির হইয়া যাইবার রাস্তা আছে কি না দেখিবার জন্য চতুর্দিকে ঘোরাফেরা করিতে লাগিল। বাহির হইবার কোন উপায় নাই দেখিয়া অগত্যা একে একে অসীম সাহসের সহিত আস্তে আস্তে জলের উপর নামিয়া সাঁতার কাটিতে কাটিতে

সোজা জল পার হইয়া চলিয়া গেল। অতি সন্তপণে জলের উপর একটি সূচ ছাড়িয়া দিলে তাহা যেমন ভাসিয়া থাকে, সেইরূপ সতর্কতার সহিত জলে নামিবার ফলে পাগুলি ডুবিয়া গেলেও সর্বশরীরে জল লাগে না। কাজেই তখন পায়ের সাহায্যে সাঁতার কাটিয়া অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হয়। একটিকে জলে নামিতে দেখিলে ভেড়ার পালের মত অপর পিপীলিকাগুলিও তাহাকে অনুসরণ করিয়া পর পর সাঁতার কাটিয়া পার হইতে থাকে। লার্ভা, ডিম ও পুত্তলীবহনকারী পিঁপড়েরা সহজে জলে নামিতে চায় না। কিন্তু অনেকে পলায়ন করিবার পর অবশেষে তাহারাও ডিম, পুত্তলী প্রভৃতি মুখে করিয়া জলে নামিয়া পড়ে। পুত্তলীবহনকারী অপেক্ষাকৃত সহজেই পার হইতে পারে কারণ পুত্তলী একটা ফাঁপা আবরণে আবৃত থাকায় সোলার মত জলে ভাসিয়া থাকে। ডিম ও লার্ভাবহনকারীরা বেশ নাকানিচুবানি খাইয়া জল অতিক্রম করে। অনেকে আবার ডুবিয়াও মারা যায়। স্বাভাবিকভাবে বাস করিবার জন্য আহারবিহারের যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কিছুতেই ইহারা কৃত্রিম বাসস্থানে থাকিতে চায় না।

পূর্বেই বলিয়াছি, ইহারা সমতল ভূমি হইতে দুই-এক ফুট উঁচুতে পুরানো গাছের গুঁড়ি বা দেয়ালের ফাটলে বাসস্থান নির্বাচন করে। কারণ বৃষ্টি বা বর্ষার জলে সমতল ভূমি প্লাবিত হইয়া গেলে বিস্তৃত জলাশয় সাঁতরাইয়া পার হইবার কোনই উপায় থাকে না। বিশেষত নিজেরা কোনগতিকে উদ্ধার পাইলেও ডিম, বাচ্চা প্রভৃতি কিছুতেই বাঁচাইতে পারে না। যে সকল পিপীলিকা সমতল ভূমিতে গর্ত খুঁড়িয়া বাস করে তাহারা জলপ্লাবন হইতে আত্মরক্ষার জন্য অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। শত শত পিপীলিকা ডিম, বাচ্চা, স্ত্রী ও পুরুষদিগকে মধ্যস্থলে রাখিয়া তাহার চতুর্দিকে পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া বড় একটা ডেলা পাকাইয়া যায়। সংখ্যা বেশী হইলে সময় সময় তিন চারটা ডেলাও পাকাইয়া থাকে। ডেলা পাকাইবার ফলে জলের উপর ভাসিতে থাকে এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে না। জল নামিয়া গেলে সকলে মিলিয়া আবার সার বাঁধিয়া নূতন গর্তের সন্ধানে চলিতে আরম্ভ করে। বর্ষাকালে আমাদের দেশে অহরহই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বিষ-পিঁপড়েদের ডেলা পাকাইবার কৌশল জানা নাই। জলে পড়িলেই ইহারা সাঁতরাইয়া নানাদিকে চলিয়া যায়। এভাবে একবার ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলে ইহাদের পক্ষে পুনরায় একত্রিত হইবার কোনই সম্ভাবনা থাকে না। এজন্যই বোধ হয় ইহারা বিশেষ বিবেচনার সহিত বাসস্থান নির্বাচন করিয়া থাকে।

জল হইতে দূরে থাকিবার জন্য ইহাদের এই সহজাত সংস্কারের বিষয় অবগত হইয়াই পূর্ববর্ণিত প্রচেষ্টায় অকৃতকার্য হইয়াও আর এক অভিনব উপায়ে জলের সাহায্যে ইহাদিগকে কৃত্রিম বাসস্থানে পোষ মানাইতে পারিয়াছিলাম। ইহাদের বাসস্থান নির্ণয় করিয়া তাহার চতুর্দিকে উঁচু করিয়া কাদা মাটীর বাঁধ বাঁধিয়া দিলাম। বড় একটা কাচপাত্রের তলার দিকে কিছু মাটী দিয়া তাহার উপরে যাতায়াতের পথ রাখিয়া শক্ত কাগজের দুইটি কুঠুরীর মত নির্মাণ করিয়া পাত্রটিকে বাঁধের মধ্যস্থলে রাখিয়া দিলাম। পাত্রের মুখের কাছে প্রায় দেড় ফুট ব্যাস-বিশিষ্ট মোটা একখানা কাগজের চাকতি



পুরুষ বিষ পিঁপড়ের খাদ্যনালী, পাকস্থলী ও প্রজনন-কোষ
(বর্ধিতাকারে গৃহীত আলোক-চিত্র)

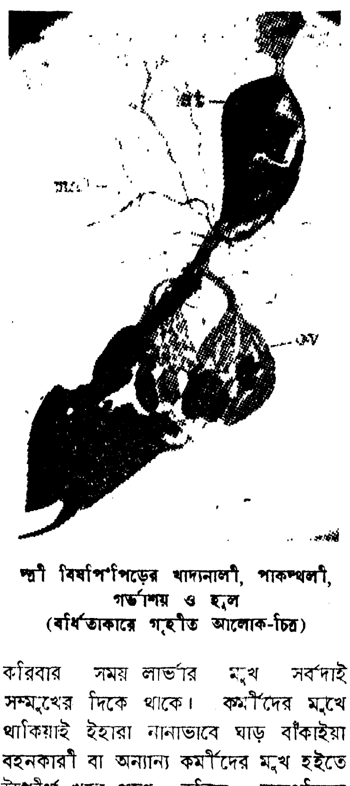
গাড়ী বারান্দার মত বসাইয়া দিলাম যেন পিঁপড়েগুলি উহার উপর ইচ্ছামত চলাফেরা করিতে পারে। নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য উহার উপর ছড়াইয়া রাখিলাম। পিপীলিকার গর্তের মুখ হইতে সেই গোলাকার বারান্দা পর্যন্ত একখানা চ্যাপ্টা বাখারি সিঁড়ির মত পাতিয়া দেওয়া হইল। দুই-তিন ঘণ্টা বাদেই কতগুলি বিষ-পিঁপড়ে সেই সিঁড়ি দিয়া যাতায়াত সুরু করিল এবং খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া বাসায় লইয়া আসিতে লাগিল। দুই-তিন দিন যাতায়াত করিবার পর ইহারা এই অভিনব স্থানের সঙ্গে বেশ পরিচিত হইয়া গেল। তখন গর্তের চতুর্দিকে জল ছিটাইয়া আস্তে আস্তে বাঁধটীকে জলপূর্ণ করিয়া দিলাম। গর্তে জল প্রবেশ করিতেই পিঁপড়েগুলি ডিম, বাচ্চা প্রভৃতি মুখে লইয়া বাখারি বাহিয়া কৃত্রিম বাসস্থানে জমায়েৎ হইতে লাগিল। দুই-তিন দিন জল রাখিয়া দেওয়ায় তাহারা আর ঐ নূতন বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া গেল না। সুবিধাজনক বাসস্থান পাইয়াছে বলিয়াই যেন মনের আনন্দে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তখন কাচের পাত্রটি তুলিয়া আনিয়া পরীক্ষাগারে অন্য একটা জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে বসাইয়া দিলাম। এই উপায়ে বিভিন্ন বাসা হইতে পিপীলিকা সংগ্রহ করিয়া তাহাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিবার যথেষ্ট সুবিধা করিয়া লইয়াছিলাম।

কোন কোন বৈজ্ঞানিক এই অভিমত পোষণ করিতেন যে, প্রচুর পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্য পাইলে কর্মী পিপীলিকারা হয়তো ডিম প্রসব করিতে পারে। ইহা সত্য কিনা পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে একটা পাত্রের পিপীলিকাগুলিকে সপ্তাহে চার পাঁচটা মাত্র ভাতের কণিকা দিয়া স্বল্পাহারে রাখিয়াছিলাম। একদিন দেখি—একটা পুরুষ বিষ-পিঁপড়ে উড়িয়া আসিয়া দেওয়ালে বসিল। খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া উড়িয়া গেল। আবার একটু পরেই ঘুরিয়া আসিয়া স্বল্পাহারী পিপীলিকাদের বাসার একধারে বসিয়া প্রসাধনে লাগিয়া গেল। বার বার পা দিয়া শুঁড় ও ডানাগুলিকে পরিষ্কার করিয়াও যেন তার তৃপ্তি হইতেছিল না। প্রায় পাঁচ-সাত মিনিট এভাবে কাটিবার পর একটা কর্মী-পিঁপড়ে হঠাৎ ঘুরিতে ঘুরিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। পুরুষ-পিঁপড়েটাকে দেখিতে পাইয়া সে বার দুই-তিন এদিক ওদিক ঘুরিয়া শুঁড় দিয়া বেশ করিয়া শুঁকিয়া লইল। অবশেষে পুরুষটার ঘাড় কামড়াইয়া ধরিয়া একেবারে উঁচু করিয়া বাসার ভিতরে লইয়া গেল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পুরুষ পিঁপড়েটার রকম-সকম দেখিয়া মনে হইল যেন সে এ ব্যাপারের জন্যই প্রতীক্ষা করিতেছিল। ঘাড়ে কামড়াইয়া ধরিবার সময় সে একটুও নড়াচড়া করে নাই, ঠিক যেন মরার মত শক্ত হইয়া ছিল। কর্মী-পিঁপড়ে তাহাকে লইয়া গিয়া অন্যান্য পিঁপড়েদের মধ্যে ছাড়িয়া দিল। কিন্তু ছাড়িয়া দিবার পরও পুরুষটি কাৎ হইয়া মরার মতই পড়িয়া রহিল। তখন অপর একটি কর্মী আসিয়া তাহাকে মুখে তুলিয়া লইল। এইরূপে এক মুখ হইতে অন্য মুখে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি চলিল। অবশেষে ছাড়িয়া দিলে সে তাহাদের দলে মিশিয়া একস্থানে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। পূর্বে এই বাসাটার মধ্যে অন্য কোন পুরুষ পিঁপড়ে ছিল না। পুরুষটি আসিবামাত্রই বাসার সর্বত্র যেন একটা সাড়া পড়িয়া গেল। তাহাদের চালচলন অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া ইহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইল যে, তাহারা অতিমাত্রায় উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছে।

এই ঘটনার পরের দিন সকালে দেখিতে পাইলাম, একটি শ্রমিক-পিপীলিকার সহিত পুরুষ পিপীলিকাটি যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হইয়াছে। পুরুষটি ঈষৎ বক্রভাবে শ্রমিকের পিঠের উপরদিকে খাড়াভাবে অবস্থান করিতেছে। শ্রমিক পিপীলিকাটা তাহাকে লইয়াই এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করিতেছে এবং সময় সময় এক স্থানে চুপ করিয়া থাকিতেছে। এই ব্যাপার দেখিয়া এবং আরও কতগুলি পরীক্ষার ফলে বিষ-পিঁপড়েদের স্ত্রীপুরুষ ও প্রজনন ব্যাপার সম্বন্ধে একটা নিশ্চিত মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিয়াছি

হুইলার প্রমুখ বিশিষ্ট পিপীলিকাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—ক্যাম্‌সোমারমেক্স্‌, লেপ্‌টোজেনিস্‌ প্রভৃতি গণভুক্ত পিপীলিকাদের মধ্যে যেমন রাণী অভাবে দুই-একটি শ্রমিক পিপীলিকা অতিরিক্ত আহারের ফলে প্রজনন শক্তি সম্পন্ন হইয়া থাকে, ডায়কামা বা বিষ-পিঁপড়েদের মধ্যেও বোধ হয় সেইরূপ ব্যবস্থাতেই প্রজনন ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, কারণ তাঁহারাও অনুসন্ধান করিয়া ডায়াকামা পিপীলিকার পক্ষযুক্ত বা পক্ষহীন কোন রাণী পিপীলিকার সন্ধান করিতে পারেন নাই। এইজন্যই তাঁহারা অনুমান করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, ইহাদের মধ্যে খুব সম্ভব দুই-একটি "গাইনেকয়েড" শ্রমিক পিপীলিকা দ্বারাই বংশ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু তথাকথিত শ্রমিক পিপীলিকার সহিত পুং-পিপীলিকার যৌনসঙ্গম প্রত্যক্ষ করিবার পর বহু সংখ্যক কর্মীর উদরদেশ ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখিয়াছি—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহাদের প্রজননক্রিয়ার উপযোগী পূর্ণাঙ্গ শারীরগঠন যন্ত্রাদি বিদ্যমান এবং তাহাদের ডিম্বকোষ ছোট বড় অসংখ্য ডিমে পরিপূর্ণ। কাজেই সহজেই ধারণা হয় যে, বিষ-পিঁপড়েদের মধ্যে কেবল স্ত্রী ও পুরুষ এই দুই রকম পিপীলিকাই রহিয়াছে; নপুংসক কর্মী বলিয়া আলাদা কিছু নাই। স্ত্রীরাই উপযুক্ত সময়ে ডিম পাড়িয়া থাকে এবং প্রয়োজনমত শ্রমিকের কার্যেও আত্মনিয়োগ করিয়া থাকে।

স্ত্রী-পিঁপড়ে কিছুক্ষণ পরে পরে এককালীন প্রায় ২৫।৩০টি ডিম পাড়িয়া থাকে। ডিমগুলি খুব ছোট, সরু ও লম্বাটে। একপ্রকার আঠালো পদার্থের সাহায্যে ডিমগুলি পরস্পর গায়ে গায়ে লাগিয়া থাকে। ৫।৭টি কখনও কখনও ১০।১২টি ডিম এইরূপে এক সঙ্গে জুড়িয়া শ্রমিকরা মুখে করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। কখনও মাটীতে নামাইয়া রাখে না। খাওয়ার বা জলপান করিবার সময় ডিমগুলি অপর কোন শ্রমিকের মুখে তুলিয়া দিয়া ছুটি লয়। দিন ৫।৭ পরে ডিমের উপরের সূক্ষ্ম পর্দা বিদীর্ণ করিয়া লার্ভা বা শূক বাহির হয়। এই লার্ভার আকার মিলিমিটারেরও কম। লার্ভার গায়ের রং দুধের মত সাদা। ইহার পিছনের দিক মোটা কিন্তু মুখের দিক ক্রমশ সুচালো হইয়া থাকে। লার্ভার গায়ে সারবন্দীভাবে কতগুলি কাঁটা থাকে, অবশ্য অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতিরেকে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। শরীরটা আগাগোড়া অঙ্গুরীর মত ভাঁজে ভাঁজে সজ্জিত। ইহার ফলে ইচ্ছামত শরীর সংকুচিত ও প্রসারিত করিতে পারে, লার্ভার আকৃতি দেখিতে 'কমা' চিহ্নের মত, মুখের দিক সর্বদাই বক্রভাবে থাকে। সম্মুখভাগে সূক্ষ্ম কাঁটার মত পায়ের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। এক একটি শ্রমিক এক একটি লার্ভাকে সাঁড়াশীর মত চোয়ালে চাপিয়া ধরিয়া বহন করিয়া থাকে। বহন



স্ত্রী বিষপিঁপড়ের খাদ্যনালী, পাকস্থলী, গর্ভাশয় ও হুল
(বর্ধিতাকারে গৃহীত আলোক-চিত্র)

করিবার সময় লার্ভার মুখ সর্বদাই সম্মুখের দিকে থাকে। কর্মীদের মুখে থাকিয়াই ইহারা নানাভাবে ঘাড় বাঁকাইয়া বহনকারী বা অন্যান্য কর্মীদের মুখ হইতে উদ্গীর্ণ খাদ্য গ্রহণ করিয়া দ্রুতগতিতে বাড়িতে থাকে। এই সময় ইহাদের চক্ষু থাকে অপরিণত অবস্থায় এবং মুখের কাছে চোয়ালের মত অপরিণত দুইটি দাঁত দেখিতে পাওয়া যায়। মুখ ঘুরাইয়া, গলা বাড়াইয়া ইহারা বহনকারীর সঙ্গে খেলা করিয়া থাকে। শ্রমিকরা সময় সময় ইহাদিগকে মাটীতে ছাড়িয়া দেয় তখন বিড়ালের বাচ্চারা যেমন মায়ের সঙ্গে খেলা করে, কতকটা সেরূপ শরীর সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করিয়া ইহারা বহনকারীর সঙ্গে নানাপ্রকার আদর আপ্যায়নের ভাব প্রকাশ করে। চার পাঁচ মিলিমিটার পর্যন্ত বড় হইলে লার্ভা আহার বন্ধ করিয়া শ্রমিকের মুখে থাকিয়াই গুটি বাঁধিতে আরম্ভ করে। মুখ হইতে অতি সূক্ষ্ম রেশমের মত সুতো বাহির করিয়া লার্ভা তাহার নিজের শরীরের চতুর্দিকে জড়াইতে থাকে। প্রায় ৪।৫ ঘণ্টার মধ্যেই মোটা একটি ভাতের মত গুটি গড়িয়া তোলে। গুটিটা প্রথম অবস্থায় সাদা থাকে। ক্রমশ আরও বেশী সুতা জড়াইবার সঙ্গে সঙ্গেই রংটা একটু কালচে বেগুনী হয়। আরও ৪।৫ ঘণ্টা পরে একেবারে গাঢ় কালচে-বেগুনী রং ধারণ করে, তখন আর ভিতরের লার্ভাটাকে বাহির হইতে পরিষ্কারভাবে দেখা যায় না, গুটি বাঁধা শেষ হইলে লার্ভা আবরণের মধ্যে নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করে এবং কয়েকদিনের মধ্যেই ধীরে ধীরে পুত্তলীতে পরিণত হয়। গুটি অবস্থায়ও শ্রমিকেরা ইহাদিগকে মুখে করিয়াই ঘুরিয়া বেড়ায়। ১৫।২০ দিন পরে যখন কর্মীরা বুঝিতে পারে যে, বাচ্চা বাহির হইবার সময় হইয়াছে, তখন তাহারা গুটির মাঝামাঝি কাটিয়া দেয় এবং পূর্ণাঙ্গ পিপীলিকা বাহির হইয়া আসে। এই সময় অনেক কর্মী মিলিয়া নানাপ্রকারে সদ্যোজাত পিঁপড়েটির অঙ্গ চাটিয়া দিতে থাকে। গুটি হইতে বাহির হইবার পর ইহাদের শরীরের রংটা একটু ফিকে দেখায়। ৪।৫ ঘণ্টার মধ্যেই শরীর সম্পূর্ণ শক্ত হয় এবং স্বাধীনভাবে চলাফেরা আরম্ভ করিয়া দেয়।

কতগুলি ব্যাপারে বিষ-পিঁপড়ের বেশ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। আহারান্বেষণে ঘোরাঘুরি করিবার সময় ইহাদিগকে অনুসরণ করিয়া ইহাদের বাসস্থান নিরূপণ করা খুবই কষ্টকর, কারণ সামনে আসিয়া নজর রাখিলে বাসা নিকটে থাকিলেও তাহাতে প্রবেশ করে না। তাড়া দিলে বাসায় না ঢুকিয়া আশে পাশে কোথাও আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করে। শত্রু যাহাতে বাসস্থানের সন্ধান না পায় বোধ হয় এই উদ্দেশ্যেই এরূপ করিয়া থাকে। বাসা নির্মাণে ইহারা কিছুমাত্র পরিশ্রম করে না। এমন কি অন্যান্য পিপীলিকার মত মাটি খুঁড়িয়া বাসার পরিসর বৃদ্ধি করা দূরে থাক, বাসাটা একটু পরিষ্কার রাখিবার চেষ্টাও করে না। তবে কৃত্রিম বাসস্থানের মধ্যে অতিরিক্ত জঞ্জাল বা খাদ্যদ্রব্যের পরিত্যক্ত অংশ বাসার চতুর্দিকে জমা করিয়া একটা সুদৃঢ় অবরোধ প্রস্তুত করে। খাবার পাইলেই টানিয়া অথবা সমর্থ হইলে মুখে করিয়া গর্তের ভিতর লইয়া যায়, বাহিরে কখনও খায় না। এক একটি খাবার টুকরা এক সঙ্গে সকলে মিলি[White H]ড়াড়ি করিয়া খায়। খাওয়ার [ealth & Protecti][& Training Special E]য়ে প্রায় সর্বদাই হাত [ম]াজিয়া পরিষ্কার

করিতে দেখা যায়। শীতকালে ইহারা প্রায়ই বাসার বাহিরে আসে না। পাগুলি সম্মুখে ও পিছনে প্রসারিত করিয়া সারবন্দিভাবে মাটিতে মুখ সংলগ্ন করিয়া পড়িয়া থাকে। এক একবারে ডিম ফুটিয়া অধিকাংশই স্ত্রী-পিপীলিকা বাহির হয়, দুই চারটি মাত্র পুরুষ জন্মগ্রহণ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে মোটেই পুরুষ থাকে না, অন্যান্য বাসা হইতে উড়িয়া আসিয়া কিছুদিন বাস করিবার পর আবার চলিয়া যায়। বাসায় পুরুষ-পিপীলিকা উড়িয়া আসিবামাত্রই স্ত্রী-পিপীলিকারা তাহাকে মুখে করিয়া লইয়া যায় এবং নানাভাবে যত্ন করে। পুরুষেরা খুব দ্রুতগতিতে উড়িতে পারে; কিন্তু একবার কোন বাসায় আসিয়া বসিলে আর সহজে নড়িতে চাহে না।

শীতকাল ব্যতীত বছরের অন্যান্য সময়ে ইহাদের তথাকথিত শ্রমিক পিপীলিকাদের মধ্যে এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে দুইটি শ্রমিক বা কর্মী যেন পরস্পর পরামর্শ করিয়াই গর্ত হইতে বাহির হইয়া আসে। একটি আগে চলে, অপরটি অগ্রবর্তীর শরীরের পশ্চাদ্ভাগ একরূপ স্পর্শ করিয়াই যেন তাহাকে অনুসরণ করিতে থাকে। প্রথমটি দাঁড়াইলে পিছনেরটিও দাঁড়াইয়া যায়। প্রথমটিকে কোনগতিকে আড়ালে ফেলিতে পারিলে অনুসরণকারী থমকিয়া দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর বেশী দূরে না যাইয়া ইতস্তত খোঁজাখুঁজি করিতে থাকে। প্রথমটিও অবশ্য চুপ করিয়া থাকে না। সেও ফিরিয়া আসিয়া সঙ্গীর অনুসন্ধান করে। সঙ্গীকে খুঁজিয়া না পাওয়া পর্যন্ত কেহই সেই স্থান পরিত্যাগ করে না। দুইজনে দেখা হইলেই আবার উভয়ে পূর্বের ন্যায় চলিতে থাকে। কিছুদূরে গিয়া ছায়ার মধ্যে কোনস্থানে পিছনেরটি ঘুরিয়া আসিয়া অপরটির মুখে মুখ ঠেকাইয়া অদ্ভুত ভঙ্গীতে শুঁড় কাঁপাইতে থাকে। কিছুক্ষণ এরূপ আদর আপ্যায়ন চলিবার পর সামনেরটি পিছনেরটির ঘাড় কামড়াইয়া ধরে এবং শরীরের শেষাংশ ধনুকের মত বাঁকা করিয়া তাহার পেটের নীচের দিকে চালাইয়া দেয়। যাহার ঘাড় কামড়াইয়া ধরে সে সুবিধা পাইলেই ছুটিয়া পলাইবার চেষ্টা করে। পলায়ন করিলেও অপরটি ছুটিয়া গিয়া আবার তৎক্ষণাৎ তাহাকে পাকড়াও করে। এই ব্যাপার প্রায় পাঁচ হইতে দশ মিনিট পর্যন্ত চলে। তারপর পরস্পর পরস্পরকে ছাড়িয়া দেয় এবং উভয়ে যে যার ইচ্ছামত যে কোনদিকে চলিয়া যায়। এই ব্যাপারটা প্রাতঃকালের দিকে অথবা সন্ধ্যার পূর্বে অর্থাৎ যখন আলোর প্রখরতা অপেক্ষাকৃত কম থাকে, তখনই ঘটিতে দেখা যায়। সকালবেলায় এক একটি বাসার আশেপাশে ১০।১৫টি, এমন কি সময়ে সময়ে আরও বেশী জোড়ায় জোড়ায় পিপীলিকাদের এরূপ অদ্ভুত ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে দেখা যায়। এই সময়ে ইহারা এমনই বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়ে যে, তুলিয়া লইলেও টের পায় না। এই অবস্থায় সময়ে সময়ে খাড়া দেয়াল বা কোন উঁচু স্থান হইতে উভয়কে নীচে গড়াইয়া পড়িতে দেখা যায়।

বিষ-পিঁপড়েরা হঠাৎ ভয় পাইলে অথবা কেহ তাড়া করিলে প্রাণপণে ছুটিতে থাকে, কিন্তু তাহাতে সুবিধা না হইলে একস্থানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া পড়ে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত একই স্থানে নিশ্চলভাবে অবস্থান করিবার ফলে অনেক সময় শত্রুর দৃষ্টি এড়াইতে সমর্থ হয়। গায়ের রঙের সঙ্গে আশেপাশের বর্ণসামঞ্জস্য থাকায় সহজেই শত্রুর দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে। শত্রুর নিকট হইতে পলায়ন করিবার সময় ক্লান্ত হইয়া পড়িলে উট পাখীরা নাকি বালির মধ্যে মাথা গুঁজিয়া এবং হরিণেরা ঝোপঝাড়ের অন্তরালে মুখ লুকাইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। মনে করে—নিজেরা যেমন কাউকে দেখিতে পায় না অপরেও বুঝি সেরূপ তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছে না। বিষ-পিঁপড়েদেরও এরূপ অদ্ভুত স্বভাব দেখিতে পাওয়া যায়। শত্রুর নিকট হইতে পলাইতে গিয়া ইহারা ইঁট কাঠ, খোলামকুচী প্রভৃতির নীচে চুপ করিয়া আত্মগোপন করিয়া থাকে। তখন উপর হইতে আবরণটি সরাইয়া লইলেও ঠিক সেই অবস্থায়ই থাকে, একটুও নড়ে না। মোটেই সে বুঝিতে পারে না যে, গোপনতার আবরণটি অপসারিত হইয়াছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে ঐরূপ উন্মুক্ত স্থানে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া থাকে। একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া চাহিয়াও দেখে না যে, সে সত্যই কোন কিছুর আড়ালে আছে কি না। বিষ-পিঁপড়ে কতদিন বাঁচে তাহা ঠিক বলা যায় না, তবে কৃত্রিম বাসার মধ্যে কয়েকটিকে প্রায় দুই বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকিতে দেখিয়াছি। ইহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাটিয়া দিলেও সহজে মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। শরীরের অর্ধাংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেও ইহারা সঙ্গীদের মুখ হইতে উদ্গীর্ণ খাদ্য গলাধঃকরণ করিয়া থাকে এবং তাহার ফলেই হয়তো কয়েকদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারে। ৫।৭ মিনিট জলে ডুবিয়া থাকিলে ইহারা ঠিক মৃতের ন্যায় অসাড় হইয়া পড়ে। দেহে প্রাণ আছে বলিয়া কোনক্রমেই মনে হয় না। কিন্তু জল হইতে তুলিয়া ১০।১৫ মিনিট হাওয়ায় রাখিয়া দিলেই আস্তে আস্তে আবার চাঙ্গা হইয়া ওঠে। এই অবস্থায় জীবনস্পন্দনের সাময়িক নিষ্ক্রিয়তার লক্ষণ ইহাদের মধ্যে পরিষ্কারভাবে দেখিতে পাওয়া যায়।

মাছ শুকাইবার নূতন উপায়

সিয়াটল, ২৩শে নভেম্বর—ডিট্রয়েট্ নিউজ জানাইয়াছেন যে, বৃটিশ কলম্বিয়ার অন্তর্গত ভেংকুভারের ক্যাপ্টেন ভিক্টর এম ডেভিড মাছ শুকাইবার নূতন উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। এই প্রণালীতে এক হাজার টন মাছকে ১৩০ টনে পরিণত করা যাইবে। ইহাতে মাছের ভিটামিন প্রোটিন ও খনিজদ্রব্য নষ্ট হইবে না। তিনি বিশ্বাস করেন যে, এতদ্বারা ইউরোপের বিধ্বস্ত দেশগুলির অধিবাসীদিগকে আহার্য যোগাইবার সমস্যার সমাধান হইবে।

ক্যাপ্টেন ডেভিড বৃটিশ কলম্বিয়ার কোন কারখানার মালিক এবং তাঁহার কতকগুলি মাছধরার জাহাজ আছে। তাঁহার উৎপাদিত দ্রব্য যাহাতে দেশের সর্বত্র প্রেরিত হইতে পারে, সে সম্ব[illegible] বিদেশি মৎস্য আহরণ শিল্পের প্রতি-[illegible]রিয়া থাকে। [illegible]মর্শ করিয়াছেন।

[illegible]কিবার জন্য ইহাদের [illegible]ন,—আমেরিকা মহাদেশ [illegible]ন টাট্কা কিংবা শৈত্য প্রয়োগে রক্ষিত মাছ চালান দিতে ৪০টি রেফ্রিজারেটর গাড়ীর প্রয়োজন হয়। কিন্তু নূতন প্রণালীতে শুষ্কীকৃত ঐ পরিমাণ মাছ পাঠাইতে মাত্র ২টি সাধারণ গাড়ি লাগিবে।

নূতন উপায়ে শুকানো মাছ সহজে রান্না করা যাইবে এবং লোকেও খুব পছন্দ করিবে। ইহা হইবে স্বাভাবিক খাদ্য এবং পৃথিবীর সর্বত্র বিমানে ভ্রমণকারীদের জন্য ও জরুরী রেশন হিসাবে ইহা ব্যবহৃত হইবে।

এই মাছে প্রচুর প্রোটিন ও ভিটামিন থাকিবে এবং ইহা সহজপাচ্য হইবে। যে কোন দেশের আবহাওয়ায় ইহা দীর্ঘকাল অবিকৃত থাকিবে এবং তজ্জন্য কোন রেফ্রিজারেটরের দরকার হইবে না।

এই উপায় আবিষ্কৃত হওয়ায় এখন আর গৃহিনীদিগকে বাজার হইতে ভিজা মাছ লইয়া বাড়ি যাইতে হইবে না।—মার্কিনবার্তা

শিশুমঙ্গলে

শিশুশ্রেণীতে সাধারণের বাহিরে যাহারা

শ্রীরেণু মিত্র, এম্‌-এ

প্রত্যেক শিশু শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদিগকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—এক সাধারণ আর সাধারণের বাহিরে যাহারা। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই সাধারণ পর্যায়ভুক্ত—কয়েকজন থাকে যাহারা সাধারণের বাহিরে। ভাল কিংবা মন্দ উভয়দিকেই সাধারণের বাহিরে হইতে পারে। আবার শারীরিক ও মানসিক উভয়ভাবেও সাধারণের বাহিরে হইতে পারে। শারীরিক দিক হইতে নানারকমের হইতে পারে,—কালা কিংবা কানে কম শোনে এমন; ক্ষীণ দৃষ্টি, উচ্চারণে দোষযুক্ত প্রভৃতি; মানসিক দিকেও যেমন মেধাবী ও ক্ষীণ বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে পারে। ইহা ব্যতীত এমন শিশুও আছে। যাহাদের বুদ্ধির যে একেবারে অভাব তাহা নয়, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগত ত্রুটিও নাই, কিন্তু হয় অতিরিক্ত দুষ্ট, শিশুকাল হইতে কোন-রকম শিক্ষা ও শৃঙ্খলার অভাবে কোন বাধা মানে না, নয় অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ; হয়তো বা অতিরিক্ত লাজুক কিংবা রুক্ষ-স্বভাব কিংবা সদা অপ্রফুল্ল। আবার আর একদল আছে যাহাদের মানসিক শক্তির বিকাশ হয় নাই, যাহারা অপ্রচুর জীবনীশক্তি বিশিষ্ট এবং সমাজের দশজনের সঙ্গে যাহাদের সমতা নাই। সাধারণের বাহিরে এইসব ছেলে-মেয়েদের সংখ্যা শ্রেণীতে যে অনেকে থাকে তাহা নয়, সমস্ত রকমেরই যে থাকে, তাহাও নয়—অবশ্য অনশনক্লিষ্ট দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে সংখ্যা একেবারে কম হইবারও কথা নয়, কিন্তু যতজন যে রকমেরই থাকুক না কেন, তাহারাও তাহাদের সেই সেই অবস্থা লইয়াই আজ সমাজের কাছে, দেশের কাছে, রাষ্ট্রের কাছে যতটা সম্ভব মানুষের মত বাঁচিবার দাবী করে। আজ পৃথিবীর সকল দেশেই সাধারণের বাহিরে এই সকল শিশুদের শিক্ষার বিশেষ সুযোগ আছে। কিন্তু আমরা এমনই হতভাগ্য যে, দীর্ঘদিন ধরিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াও আমরা নিজেদের জন্য কিছু করিতে পারিলাম না। আমাদের ইহা প্রয়োজন—এই দাবী আমরা দৃঢ়ভাবে জানাইতে পারি নাই বলিয়াই আমাদের দিন বৃথা চলিয়া গিয়াছে। দাবী যে জানাইতে পারি নাই তাহার একটি কারণ এই যে, শিক্ষার অভাবে আমাদের কী প্রয়োজন এবং তাহা কিরূপে মিটান যাইতে পারে আমরা জনসাধারণ তাহা কিছুই জানি না।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আজ এই সব শিশুদের শিক্ষার জন্য বড় বড় শিক্ষাবিদগণ নিযুক্ত আছেন। আমেরিকাতে এ বিষয়ে ব্যাপক আয়োজন হইয়াছে। কালা, অন্ধ, স্বল্পদৃষ্টিসম্পন্ন নির্বোধ প্রভৃতিদের জন্য সেখানে পৃথক আবাসিক বিদ্যালয় আছে, নানা রোগগ্রস্ত শিশুদের জন্য হাসপাতাল আছে। অল্প কিছুদিন হয় সেখানকার সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাই আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত উপায়ে দেওয়া হইতেছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে সাধারণের বাহিরে এই জাতীয় কত শিশু আছে, তাহার সংখ্যাও তাহারা বাহির করিয়া ফেলিয়াছে। হিসাবটা এইরূপ—(১) ৫ লক্ষ ক্ষীণবুদ্ধি শিশু, (২) ৩০ লক্ষ কালা, (৩) ৩ লক্ষ পঙ্গু, (৪) ৫০ হাজার ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন (৫) ৭½ লক্ষ শিশু সমস্যাপূর্ণ আচরণকারী, (৬) ৭০ হইতে ৮০ লক্ষ শিশুর খাদ্যাভাবে উপযুক্ত পুষ্টি হয় না, (৭) ১০ লক্ষ শিশু উচ্চারণদোষযুক্ত এবং (৮) ১০ লক্ষ শিশু অসাধারণ মেধাবী। ইহাদের শতকরা হিসাব যথাক্রমে (১) ২, (২) ২, (৪) ০·২—(ইহার মধ্যে অন্ধদেরও ধরা হইয়াছে), (৫) ৩, (৬) ২০, (৭) ৪, (৮) ৬।(১)

আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষাদানে অগ্রসর হইবার পূর্বেও এইরূপ হিসাব বাহির করিয়া লওয়ার প্রয়োজন আছে। আমেরিকা-গভর্নমেণ্টের এই হিসাব হইতে এই কথাটিই খুব স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠে যে, গভর্নমেণ্ট তাহার প্রত্যেকটি অধিবাসী-সম্বন্ধে সজাগ এবং প্রত্যেককে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া সমাজে দাঁড় করাইয়া তুলিতে সচেষ্ট। আমাদের দেশে এরূপ কোন হিসাব হয় নাই। আমাদের দরিদ্রদেশে এরূপ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই—একথা মানিয়া লওয়ার কোন অর্থ হয় না। পৃথিবীর সকল দেশে হইতেছে, আমাদের হইবে না কেন? আমাদের আবেষ্টন ও বৈশিষ্ট্যানুযায়ী ব্যবস্থা আমাদিগকে করিতেই হইবে। তাহারা পারে, আমরা পারিব না কেন?

শ্রেণীর শিশুদলের বুদ্ধির বয়স বাহির করিয়া তাহাদিগকে অন্তত তিনটি দলে ভাগ করিয়া লওয়া দরকার। একদল—যাহাদের আই, কিউ ৯০ হইতে ১১০, ইহারা সাধারণ পর্যায়ভুক্ত। আর একদল যাহাদের আই, কিউ ৯০-র কম, ইহারা ক্ষীণমেধা ও তৎপর্যায়ভুক্ত। আর একদল যাহারা মেধাবী বা অসাধারণ মেধাবী, তাহাদের আই, ১১০-র উপরে ১৪০ পর্যন্ত কিংবা তদূর্ধ্ব। বুদ্ধির দিক হইতে এইভাবে ভাগ করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে মেধাবী ও অসাধারণ মেধাবীদের জন্য এবং মানসিক শক্তির বিকাশই হয় নাই, এমন শিশুদের জন্য ভিন্ন শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা বিশেষ দরকার। কেননা, সাধারণের সঙ্গে তাহাদের সমতা নাই। একদলের শক্তি বেশি, অপর দলের শক্তি কম। শ্রেণীর শিক্ষাসূচী সাধারণ ছাত্রদের অনুযায়ী হয়। মেধাবী বা অসাধারণ ছাত্রদের কেবল এই-টুকু পড়িতে হইলে তাহাদের শক্তির অপচয় ঘটিয়া থাকে। এবং হাতে যখন কাজ না থাকে, তখন তাহারা তাহাদের শক্তিকে নানাভাবে প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহাতে অনেক ছেলে খারাপ হইবার সুযোগ ও সময় পায়। খারাপ ছেলে বলিতে কেবল বোকা ছেলেকেই বুঝায় না, পড়াশুনায় ভাল ছেলেরাও অন্যান্য নানা দোষে দুষ্ট হইতে পারে। মেধাবী ছাত্রের সংখ্যার হিসাব আমাদের দেশে করা হয় নাই বটে, কিন্তু যদি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মতই বাঙলা-দেশের মেধাবী ছাত্রের সংখ্যা ধরা যায়, তবে শতকরা ৬ জন হিসাবে বাঙলাদেশে মেধাবী ছাত্রের সংখ্যা মোট ৩½ লক্ষের উপর দাঁড়ায়। খাইতে না পাইলেও বাঙালী ছাত্রের মাথায় বুদ্ধি আজও আছে—একথা সর্বদাই শুনিতে পাই; তাই উপরের হিসাবে বিশেষ ভুল নাই বলা চলে। কিন্তু ইহাদের জন্য আমাদের কোনও ব্যবস্থা নাই; ইহাতে দেশের সমষ্টিশক্তির যে একটা বিরাট ক্ষতি হইতেছে তাহা অনুধাবনযোগ্য। কেবল বুদ্ধির বয়স-প্রাচুর্যতাই ভিন্ন শিক্ষাদানের দাবী করিতে পারে না। বুদ্ধির বয়স প্রাচুর্যতার সঙ্গে যাহাদের স্বাস্থ্য, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি অন্যান্য গুণও থাকে, তাহারাই ভিন্ন শিক্ষার অধিকারী। ইহাদিগকে তাড়াতাড়ি এবং বারে বারে প্রমোশন দিলেই সমস্যার সমাধান হয় না। সেরূপ করার একটা অসুবিধা এই যে, বয়সে বড় ছাত্রদের সঙ্গ

(১) White House Conference on Child health & Protection, Sec. III, Education & Training Special Education.

অনেক সময়ই অল্পবয়স্ক ছাত্রের পক্ষে ক্ষতিকর হয়। শ্রেণীর শিক্ষাসূচীতে মেধাবী ছাত্রদের জন্য ভিন্ন করিয়া ব্যবস্থা রাখা দরকার। সেই সূচী ভিন্ন ক্লাশে তাহাদের পড়ান উচিত। এই বিশেষ ক্লাশের ব্যবস্থা আজ সকল দেশেই স্বীকৃত হইতেছে। সেই ক্লাশে তাহাদিগকে বেশি করিয়া ব্যক্তিগত শিক্ষা ও স্বাধীনতা দিতে হইবে; এমনভাবে চালাইতে হইবে যাহাতে তাহারা নিজেরাই অনুসন্ধান, গবেষণা বা তত্ত্বপরীক্ষাতে উৎসাহী হয়। শিক্ষকের কথা শুনিয়া শুনিয়া মুখস্থ করার অভ্যাস কমাইতে হইবে। ভৌগোলিক দৃশ্য বা স্থান, ঐতিহাসিক স্থান, চিত্রশালা, যাদুঘর প্রভৃতি তাহাদিগকে দেখাইতে হইবে। সর্ব বিষয়ে যাহাতে তাহাদের ঔৎসুক্য বাড়ে এবং চিন্তা করিতে শেখে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তাহাদের সম্মুখে জীবনের একটা পরিপূর্ণ চিত্র তুলিয়া ধরিতে হইবে। পরিবার, সমাজ, দেশ ও রাষ্ট্রের অপেক্ষায় একটি ব্যক্তির সম্বন্ধ ও স্থান কোথায়, এই বিশ্বের চেতন অচেতন সকল বস্তুর সঙ্গে তাহার সম্পর্ক কি, ইত্যাদি পরিকার করিয়া অথচ তাহার বোধগম্যভাবে তাহাকে জানাইতে হইবে। তাহার চোখের সম্মুখে একটি সমগ্র ও কল্যাণময় চিত্র তুলিয়া ধরিতে হইবে। সে আজ কোথায়, কি অবস্থায় আছে, তাহাও তাহাকে বুঝাইতে হইবে। জীবনের এই চিত্র যে সাধারণ ছাত্রদের সম্মুখেও তুলিয়া ধরিতে হইবে, একথা এখানে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সাধারণ ছাত্রদের সংখ্যা বেশি এবং তাহারা দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রধান অংশ। দেশ, সমাজ, রাষ্ট্রের উন্নতি করিতে হইলে ইহাদের উন্নত করিতে হইবে। সাধারণ ছাত্রদের পক্ষে এ-সকল কথা বুঝিতে পারা যে অসম্ভব হইবে, তাহা নয়। তবে তাহাদিগকে সেইভাবে গঠিত করিতে বিশেষ সাহায্য করিতে হইবে। একথা মনে রাখিতে হইবে যে, কোন একটা বড় ভাব বা কর্ম কেহ একা চালাইতে পারিবে না; চারিদিকের প্রতিকূল আবেষ্টনী তাহাকে সর্বদা যে বাধা দিবে, তাহা কাটাইয়া উঠা সহজ নয়। তাই সকল ছাত্রকেই পরিপূর্ণ জীবন-চিত্রের কথা শুনাইতে ও বুঝাইতে হইবে। কেবল ছাত্রদের বুঝাইলেই হইবে না, তাহাদের পিতামাতা, অভিভাবকদের নিকটও এই বার্তা পৌঁছাইতে হইবে। সমাজের অপর সকলের মধ্যে প্রবেশ করাইতে হইবে। অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেককে আমাদের সম্বন্ধে সজাগ হইতে হইবে। আমরা যেমন তেমনই থাকিয়া যাইয়া ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় উন্নত করিতে চেষ্টা করিলে কোন লাভ হইবে না (এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমরা অন্যত্র করিয়াছি)। যাহা হউক, সাধারণত লোকের বিশ্বাস যে, কোন একদিকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকিলেই অন্য অনেক ব্যাপারেই তাহার বৈশিষ্ট্য থাকিবে, ইহার কোন অর্থ হয় না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গিয়াছে যে, এই লৌকিক বিশ্বাস ভুল। কোন এক বিষয়ে দক্ষতা থাকিলে অন্য প্রায় অনেক বিষয়েই দক্ষতা থাকিতে পারে এবং থাকে, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। অবশ্য সকল বিষয়েই যে থাকিবে, তাহা নয়। তাই সকল মেধাবী ও অসাধারণ মেধাবী ছাত্রদের যাহাতে পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে, তাহার সকল প্রকার সুযোগ দেওয়া কর্তব্য। একটা মুক্ত ও বৃহৎ আবহাওয়ার মধ্যে দৈহিক ও মানসিক সকল বৃত্তিকে প্রসারিত করিবার সুযোগ পাইলে যাহার মধ্যে যে শক্তিটি বিশেষভাবে থাকে, তাহা ফুটিয়া উঠিতে পারে এবং সেই সঙ্গে অপর অনেক গুণাবলীর বিকাশ পাইতে পারে। অবশ্য বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাই জীবনে বিশিষ্ট স্থান লাভ করিবার পক্ষে একমাত্র কথা নয়, সেকথা মনে রাখিতে হইবে। যাহাদের বেশি বুদ্ধি থাকে, তাহারাই যে নামকরা লোক হয়, তাহা নয়। অনেক সময় বুদ্ধি বেশি থাকাই ত্রুটিকর হইয়া দাঁড়ায়। দেশের জনসমাজের নেতা হইতে হইলে কম বুদ্ধিও যেমন অন্তরায়, অতিরিক্ত বুদ্ধি থাকাও অন্তরায়। কেননা, মানুষের দৈহিক ও মানসিক সমগ্র ব্যক্তিত্বটাই নেতৃত্ব করে, বুদ্ধি তাহার একটা উপাদান মাত্র। তবে কথা হইতেছে এই যে, যাহাদের মেধার তীক্ষ্ণতার সঙ্গে ব্যক্তিত্ব আছে, তাহাদিগকে সর্বপ্রকার সুযোগ দিয়া দেখিতে হইবে, তাহারা জীবনে বড় হইতে পারে কি না। দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্র যেন এই সব ছাত্রদের সেবা হইতে বঞ্চিত না হয়।

অনেকের মতে, মেধাবী ছাত্রদের জন্য এই বিশেষ ব্যবস্থা গণতন্ত্র-বিরোধী। কিন্তু প্রতিপক্ষ বলেন, বিভিন্ন স্থানে এইরূপ ক্লাশ খুলিয়া কুফল পাওয়া যায় নাই। শিশুরা হামবড়া বা গণতন্ত্র-বিরোধী ভাব দেখায় না। বরং সাধারণ ক্লাশে যেখানে তাহাদের প্রতিযোগিতা করার সুযোগ ছিল না, এখানে আসিয়া প্রতিযোগিতা করিতে হয় বলিয়া অহঙ্কারী হইবার সুযোগ পায় না। সাধারণ ক্লাশ ভাল ছাত্র হইতে বঞ্চিত হওয়াতে এই ব্যবস্থা সাধারণ ছাত্রের প্রতিযোগিতামূলক উন্নতির পক্ষে বাধার সৃষ্টি করিবে—তাহাও বলা চলে না। বরং যদি সকলে একই শ্রেণীতে শিক্ষা পায়, তবে ভাল ছাত্রকে দেখিয়া সাধারণ ছাত্র নিজের সম্বন্ধে আশাহীন হইয়া পড়িতে পারে, এই সম্ভাবনা থাকে। মোট কথা, এ পর্যন্ত দেখা গিয়াছে যে, মেধাবী ও অসাধারণ মেধাবীদের জন্য বিশেষ ক্লাশের ব্যবস্থা কোন পক্ষেরই ক্ষতিকর হয় না।

যে সকল শিশুদের মানসিক বৃত্তির বিকাশ হয় নাই, সমাজের সঙ্গে সমানভাবে চলিবার ক্ষমতায় যাহারা জন্ম হইতেই বঞ্চিত এবং যাহারা অপ্রচুর জীবনীশক্তি বিশিষ্ট, সাধারণের মধ্যে ফেলিয়া রাখিলে তাহাদের প্রতিও নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেওয়া হয়। তাহাদের ব্যক্তিগত অধিকারের কথা বাদ দিয়া সমাজের দিক হইতে দেখিলেও বলা যায় যে, তাহারা যখন বাঁচিয়া থাকিবে, তখন এমনভাবেই তাহাদের বাঁচান উচিত যাহাতে তাহারা সমাজের ভারস্বরূপ না হয় এবং তাহাদের সাধ্যমত শক্তি দ্বারা নিজের ও অপরের কাজ করিয়া যাইতে পারে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, শিশুদের এইরূপে হওয়ার একমাত্র প্রধান কারণ বংশানুবর্তন। বহু পরিবারের ইতিহাস ইহার প্রমাণ দিয়াছে। এইরূপ অবস্থার খুব কম সংখ্যাই রোগ বা আকস্মিক দুর্ঘটনার ফলে হয়। এইরূপ অবস্থার কোন ঔষধ আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহার একমাত্র চিকিৎসা হইতেছে, আবেষ্টনীকে যথাসম্ভব তাহার উপযোগীভাবে ভালর দিকে পরিবর্তন করিয়া তাহাকে শিক্ষা দেওয়া। এই জাতীয় শিশুর বংশ বৃদ্ধি যাহাতে না হয়, তাহার জন্য যে একটা উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, তাহা হইতেছে এই জাতীয় শিশুর সন্তানাদি হওয়া বন্ধ করা। কি প্রকারে এই জাতীয় শিশুর বংশবৃদ্ধি বন্ধ করা যাইতে পারে, সে আলোচনা এই প্রবন্ধের অন্তর্গত নয়। এখানে সাধারণের বহির্ভূত এইরূপ শিশুকে কিরূপে যতটা সম্ভব সামাজিক জীবরূপে গড়িয়া তোলা যায়, আমরা তাহাই দেখিতে চেষ্টা করিব। অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে, মানসিক বৃত্তির অসম্পূর্ণতা ৭।১৪ অথবা ২১ বৎসর বয়সের মোড়ে সারিয়া যাইবে এবং তাহারা উহাদের জন্য কিছু না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা ভুল। যত শীঘ্র সম্ভব এই সকল শিশুর শিক্ষা আরম্ভ করিয়া দেওয়া বাঞ্ছনীয়; দেরি করা মারাত্মক। উহাদের যতটা শক্তি আছে, সবটুকুকে কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহাদের জন্য ভিন্ন বিদ্যালয় বা ভিন্ন ক্লাশ করিতে হইবে। যত কম বুদ্ধির প্রয়োজন হয়, এমন কতকগুলি কাজের মধ্য দিয়া তাহাদিগকে চালাইয়া লইতে হইবে। উহাদের মধ্যে যাহাদিগকে সম্ভব, কিছু লেখাপড়া করান যাইতে পারে। কিন্তু জীবিকার্জন করিবার মত লেখাপড়া ইহারা শিখিতে পারিবে না, ইহা মনে রাখিতে হইবে। রান্না করা, সেলাই করা, নানারকম শারীরিক পরিশ্রমের কাজ, বাগানের কাজ, নানারকম শিল্পকর্ম ইত্যাদির মধ্য দিয়া তাহাদিগকে সমাজে দাঁড় করাইতে হইবে। অভ্যাসই ইহাদের প্রধান সহায়। বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুরা সারাদিন বা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এক কাজ কিছুতেই করিতে পারিবে না, কর্মবৈচিত্র্য তাহাদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। কিন্তু এই সব বুদ্ধিহীন

শিশুদের প্রত্যেকের ইচ্ছা, ঝোঁক ও শক্তি অনুযায়ী সাধারণত একটি কর্মের দিকেই জোর দিতে হইবে। অল্প বয়স হইতে সেই একটি কর্ম ক্রমাগত করিয়া আসিতে থাকিলে অনেকেই তাহার মধ্যে বেশ দক্ষতা লাভ করে এবং তাহা দ্বারাই নিজের ও সমাজের সেবা করিয়া যাইতে পারে। ইহাদিগকে শিক্ষা দিবার সময় এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে যে, এইরূপ প্রত্যেকটি ছেলে বা মেয়েকে তাহাদের অবস্থানুযায়ী একটি স্থান সমাজে লইতে পারার যোগ্য করিয়া দেওয়াই শিক্ষার লক্ষ্য। ইহাদিগকে শিক্ষা দিবার কালে পুঁথিগত কিছু বিদ্যা, হস্তলিপি, সামাজিক ব্যবহার ও অন্যান্য শিক্ষার সহিত মিলাইয়া শিক্ষা দিতে হইবে এবং শিশুর ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও প্রয়োজন অনুসারে কোনটির উপর কম বেশি জোর দিয়া চলিতে হইবে। দেখা গিয়াছে যে, এইরূপ ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন শিশুদের নানারূপ হস্তশিল্পে দক্ষ করিয়া তোলা যায় এবং তাহাতেই সে জীবিকার্জনে সমর্থ হয়। তাই এইদিকে বিশেষ জোর দিতে হইবে। শিশুর বুদ্ধি যতটুকু পুঁথিগত বিদ্যা গ্রহণ করিতে সক্ষম, ততটুকু বিদ্যা তাহাকে দিতে হইবে। শিশুর মানসিক শক্তি যতটুকু আছে, সেই অনুসারে তাহাকে ততটুকু বিদ্যা দান করিলে তাহার এই সামান্য পুঁথিগত বিদ্যা তাহাকে জীবনে আনন্দ দান করিবে এবং তাহাকে জীবনের উচ্চস্তরে লইয়া যাইতে সাহায্য করিবে। কিন্তু ইহার জন্য তাহার মানসিক শক্তির উপর চাপ দিয়া জোর করিতে যাওয়া কখনও উচিত হইবে না। তাহার প্রথম কারণ, সে তাহা হজম করিতে পারিবে না, দ্বিতীয় কারণ, এই প্রচেষ্টা তাহাকে যৎপরোনাস্তি বিপন্ন করিবে এবং এই প্রচেষ্টার ফলে সে অসুখী হইবে। ইহাতে তাহাকে অসামাজিক করিয়া ফেলিতেও পারে। তৃতীয় কারণ, ক্ষীণবুদ্ধি শিশুকে তাহার ক্ষমতার বাহিরে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিয়া চেষ্টা, যত্ন ও টাকা-পয়সার যথেষ্ট অপচয় হইবে। এই জাতীয় ক্ষীণবুদ্ধি শিশুর পক্ষে সামাজিক আচার-ব্যবহার প্রভৃতিতে এই অভ্যাস জন্মাইতে হইবে। সামাজিক শিক্ষা ইহাদের অত্যধিক প্রয়োজনীয়। কেননা, এমন হয় যে, একটি ক্ষীণবুদ্ধি শিশু সামান্য পুঁথিগত বিদ্যা ও সেই সঙ্গে কোন শিল্প শিক্ষা করিয়াছে, অথচ সামাজিক রীতিনীতি, চলাফেরা সম্বন্ধে তাহার কোন জ্ঞান জন্মে নাই; তখন সেই শিশু দশজনের সঙ্গে চলিতে পারে না। ইহাতে তাহার অর্জিত জ্ঞানটুকুও কোন কাজ দেয় না এবং সে বিফলমনোরথ হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে যদি সে পুঁথিগত শিল্প-বিদ্যা কমও শিক্ষা করে, অথচ সামাজিক রীতিনীতি, চালচলন ও অন্যান্য আদব-কায়দায় অভ্যস্ত হয়, তাহা হইলে অন্যের তুলনায় নিজেকে অযোগ্য বোধ করার দুর্বলতা তাহার কমিয়া যাইবে। তখন তাহার অন্যান্য বিদ্যা কাজে লাগিবে। এই সামাজিক ব্যবহার তাহাকে অভ্যাসের সাহায্যে শিক্ষা দিতে হইবে। এই সব শিশুকে প্রতিযোগিতামূলক খেলায় সাধারণ শিশুর সঙ্গে খেলিতে দিতে হইবে; কারণ, এমন নহু ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন শিশু আছে, যাহারা সাধারণ শিশুর মতই খেলায় উপযুক্ত, এমনকি সাধারণ হইতে অপেক্ষাকৃত ভালও। এই ব্যবস্থাতে ক্ষীণ-বুদ্ধিদের নিজেদের অযোগ্য বোধ করার দুর্বলতা অনেক পরিমাণে দূর হইবে।

একদল ছেলে আছে, যাহাদের বুদ্ধিরও একান্ত অভাব নাই, বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গগত ত্রুটিও নাই; তবু তাহাদিগকে সাধারণ পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। ইহাদের মধ্যে কেহ আছে অতিরিক্ত দুষ্টু, শিশুকাল হইতে কোন রকম ট্রেনিং বা কোন রকম শৃঙ্খলার মধ্যে না থাকায় এখন আর কিছুতেই স্থির হইয়া কিছুই করিতে পারে না। আমাদের দেশে এরূপ ছেলের সংখ্যা কম নয়। কেননা পিতামাতার গৃহে শিক্ষা বা ট্রেনিং এবং শৃঙ্খলা বলিয়া আমাদের সাধারণত কিছু নাই বলিলে ভুল হয় না। শিশুকাল হইতে কোন শৃঙ্খলার মধ্যে বর্ধিত না হইলে বিদ্যা-লয়ে তাহাদিগকে কোন শৃঙ্খলার মধ্যে আনা এক দুরূহ ব্যাপার, সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি এগুলি খুব মারাত্মক অবস্থা নহে। শিক্ষকের সস্নেহ ব্যক্তিত্ব ও কৌশলপূর্ণ ব্যবহারই ইহাদিগকে আয়ত্তে আনিতে পারে। এইরূপ কোন শিশুর ঝোঁক কিরকম, প্রথমে তাহা বাহির করিয়া লইতে হইবে। শিশুর স্ফূর্তি বা আনন্দ বজায় থাকে, অথচ শৃঙ্খলার বাহিরে না যায়, এমনভাবেই তাহার সহিত ব্যবহার করিতে হইবে। সর্বদা মনে রাখিতে হইবে, কঠোর বা নিষ্ঠুর শাস্তি, বকাবকি এবং শিশুর কোন কথা, কর্ম বা অবস্থা লইয়া বিদ্রূপ শিশুশিক্ষার মস্ত বড় অন্তরায়। সাধারণের বাহিরে এইরূপ শিশুদের পিতামাতা বা অভিভাবক-দের জীবনধারা এবং শিশুদের সঙ্গে তাঁহাদের সম্বন্ধ জানিয়া লইলে শিক্ষক শিশুর মনস্তত্ত্ব সহজে ধরিতে পারিবেন। সাধারণের বাহিরে মনস্তত্ত্বগত সব রোগীর পক্ষেই একথা সত্য। এখন আমরা যাহাদের কথা আলোচনা করিতেছি, তাহাদের সকলেরই রোগ কমবেশি মনস্তত্ত্ব বিকৃতির ফলে হইয়াছে। আবেগপ্রবণ শিশুরা যখন যাহা ইচ্ছা করে, কোন একটা বিষয়ের প্রতি অতিরিক্ত আসক্ত হয়, দশজনে যেরূপভাবে চলে, সেরূপভাবে চলিতে পারে না, পড়া বা কোন কাজে মন বসাইতে পারে না। ইহাদের সম্বন্ধেও খুব সতর্ক কৌশলে চলিতে হইবে। অনেক সময়ই প্রথমেই ইহাদিগকে পড়ার চাপ না দিয়া ইহাদের পছন্দমত ক্রমে উৎসাহিত করিলে সেখানে তাহারা সাড়া দেয়। যে কোন শিশুদের যে কোন কাজ যখন দিব, তখন একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, তাহাদিগকে এমন কাজ দিতে হইবে, যাহার দ্বারা সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা পরিস্ফুট হইতে পারে। কোন কিছু সৃষ্টি করিতে পারার ঝোঁক কেবল বয়স্কদের মধ্যেই সাধারণ বা স্বাভাবিক নহে; শিশুর পক্ষেও তাহা মস্ত বড় সত্যি কথা। তাঁহাদের সমস্ত খেলা ও কাজকে যদি তাহাদের অজানিতে এমনভাবে প্রবর্তিত করা যায়, যাহাতে কোন কিছু, তাহা যত সামান্যই হউক—সৃষ্টি হয়, তবে তাহা শিশুর জীবনের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ হয়। কোন কিছু নিজে সৃষ্টি করিলে শিশুর মনস্তত্ত্ব কেবল যে সেই সৃষ্টবস্তু সম্বন্ধেই অন্যরকম হয়, তাহা নহে; তাহার দেহ-মনের গতি একটা স্বাভাবিক অবস্থা লাভ করে। বুদ্ধি পাইবার সমস্ত কিছুতে নিজেকে প্রকাশ করিবার যে প্রবণতা বা ঝোঁক, সে নিজের ভিতরে অনুভব করে, তাহাকে সৃষ্টির মধ্যে রূপ দিতে পারিলে সমস্ত কিছু সম্বন্ধেই তাহার মনস্তত্ত্ব বদলায়; কেননা তখন তাহার মনস্তত্ত্ব স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে। ইহাতে তাহার দেহ-মনের পুষ্টি অনেক উন্নত ধরণের হয়। ইহা সাধারণ বা সাধারণের বাহিরে সকল শিশু সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। যাহা হউক, যে শিশু পড়া পড়িত না, কিন্তু কর্মের মধ্যে যোগ্যতা দেখাইতে পারে, তাহাকে তখন ইহা বুঝাইয়া দেওয়া চলে যে একটা বিষয়ে সে যখন ভাল, অপর বিষয়টাও সে কেন আয়ত্ত করে না? তাহা হইলে তাহার সব দিক দিয়া কত ভাল হয়। তখন লেখাপড়া সম্বন্ধেও তাহার আগ্রহ জন্মিবে, সেই আগ্রহে সে লেখাপড়া যাহা করিবে, তাহাই যথেষ্ট। এইরূপ ব্যাপার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় লাভ করা গিয়াছে।

অতিরিক্ত লাজুক কিংবা অতিরিক্ত রুক্ষ-স্বভাব কিংবা সদা অপ্রফুল্ল শিশুদের শিক্ষা দিতে যাইবার আগেও তাহাদের বুদ্ধির বয়স যেমন বাহির করিতে হইবে, তেমনি তাহাদের মনস্তত্ত্বও বিশ্লেষণ করিতে হইবে এবং তাহাদের পূর্ব জীবনের প্রতি দৃষ্টি দিতে হইবে। দৈহিক ও মানসিক কিরূপ আব-হাওয়ায় তাহারা বর্ধিত হইয়াছিল, তাহা জানা গেলে তাহাদের বিশেষ স্বভাবগুলি সৃষ্ট হইবার কারণ স্পষ্ট হইবে। আধুনিক শিশু-বিজ্ঞানের ইহা একটি মস্ত বড় দান। আমাদের মনে রাখিতে হইবে—শিশুর পরবর্তী জীবনের সমস্ত বিকাশের জন্য তাহার প্রথম পাঁচ বৎসরের শিক্ষাই দায়ী। চেতন এবং অচেতনভাবে প্রথম দিন হইতে এই পাঁচ বৎসর পর্যন্ত যাহা শিশুর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাই পরবর্তী জীবনে তাহাকে চালাইয়া লইবে। শিশুর বাল্যের দৈহিক ও মানসিক সকল বৃত্তি যদি স্বাভাবিকভাবে পুষ্ট হয়, তবে শিশু

স্বাভাবিক হয়; অন্যথা একটা না একটা মানসিক রোগের অধিকারী হইয়া বসে। অতএব রোগের কারণ শিশুর অতীত জীবনে পাওয়া যাইবে। কারণ জানিয়া শিক্ষক তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন। আমাদের দেশে যদি কোন শিশুর মনস্তত্ত্ব এরূপ হয় যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পক্ষে তাহার সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব নয় এবং সাধারণভাবেও তাহাকে লেখাপড়া কিছু শেখান যায় না, তবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন। অন্যান্য দেশে তাহাদের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা রহিয়াছে। বিদেশে সকল স্থানে এই সকল মনস্তাত্ত্বিক রোগীদের জন্য মনস্তত্ত্ববিদ্ দ্বারা পরিচালিত হাসপাতাল প্রভৃতি আছে। আমাদের দেশে কি তেমন কিছু হয় না? আমরা হওয়াইতে জানিনা বলিয়াই আমাদের কিছু হয় না। মানুষের ক্ষুধাবোধ যখন হয় এবং তীব্রভাবে হয়, তখন তাহা মিটাইবার জন্য সে কি না করে? আমাদের ক্ষুধাবোধ আজও জাগ্রত হয় নাই। তাই দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় অনেক বস্তুই ভালভাবে গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না। লাজুক ছেলেরা এত অতিরিক্ত লাজুক কেন, তাহার কারণ তাহার প্রথম জীবনে সন্ধান লইতে হইবে এবং পরিবারের বর্তমান আবেষ্টনেও খোঁজ লইতে হইবে। তাহাকে দশজনের মধ্যে প্রথমেই আনিয়া জোর করিয়া সামাজিক করার চেষ্টা এবং না করিলে শাস্তি দেওয়া আজ নীতিবহির্ভূত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। শিক্ষক প্রথমে তাহার সহিত মিশিতে চেষ্টা করিবেন, অনেক সময় শিশুরা শিক্ষকের সহিত মিশিতে লজ্জা পায়; তখন শিশু পছন্দ করে এমন অপর শিশুর সহিত তাহাকে মিশিতে প্রবৃদ্ধ করিতে হইবে। তাহাকে ধীরে ধীরে সামাজিক করিতে হইবে। যে খেলায় বা যে কাজে তাহার উৎসাহ তাহাকে তাহাতে নিযুক্ত করিতে হইবে।

যে ছেলে সদা অপ্রফুল্ল, তাহারও ইতিহাস জানিতে হইবে। তাহার স্বভাব হইতেই এমন একটি সূত্র খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, যাহার সাহায্যে তাহাকে স্বাভাবিক শিশুরূপে বাহির করিয়া আনা যায়। এক কথায় এই সকল কমবেশি মনস্তাত্ত্বিক রোগীর সহিত সতর্কভাবে মনোবিজ্ঞান অনুধাবন করিয়া চলিতে হইবে। শিক্ষকের পক্ষে সেজন্য অপরিসীম ধৈর্য থাকা প্রয়োজন।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ত্রুটিপূর্ণ শিশুরও অভাব নাই। অন্ধদের ভিন্ন বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা প্রয়োজন। যাহারা কানে কম শোনে বা চোখে কম দেখে, এমন শিশুদের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা করিতে হইবে। যাহারা চোখে কম দেখে তাহাদিগকে শ্রেণীর সম্মুখভাগে বসাইতে হইবে। গৃহে যাহাতে প্রচুর আলো প্রবেশ করে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বোর্ডে বড় বড় লিখিতে হইবে। বড় অক্ষরে ছাপার বই তাহাদিগকে দিতে হইবে। লেখার কাজ কমাইয়া তাহাদিগকে কানে শুনাইয়া শিক্ষা দিতে হইবে। অপর দিকে যাহারা কানে কম শোনে তাহাদিগকে লেখার কাজের মধ্যে দিয়াই অধিকাংশ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বোর্ডের কাজ বেশী করিয়া করিতে হইবে। প্রথম শ্রেণীতে এই দুইরূপ শিশু থাকিলে অসুবিধা নাই: কেননা শিক্ষক প্রথম শ্রেণীকে দুইভাগে ভাগ করিয়াই পড়ান। অন্য শ্রেণীতে এইরূপ থাকিলে তাহাকে ভিন্ন শিক্ষা দেওয়া ছাড়া উপায় নাই। অসুবিধা? অসুবিধার কথা প্রথমেই বড় করিয়া দেখা দিলে সংসারে কোনদিনই কোন কাজ হইত না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কত আশ্চর্য কাজ হইয়া যাইতেছে—সে সকল করার মধ্যে কোন অসুবিধা, কোন বাধা ছিল না কি? অসুবিধা জয় করিতে হইবে: সকল দেশই নিজেদের প্রয়োজনবোধকে মিটাইবার জন্য সমস্ত অসুবিধা জয় করিয়া কাজে অগ্রসর হইতেছে। আমরা আমাদের অসুবিধা জয় করিতে পারিব না কি?

একা

বিমলচন্দ্র ঘোষ

একা জেগে বসে আছি চোখে নেই ঘুম
কত চিন্তা, কত কাজ, হৃদয়ে নিঝুম
কত কাব্য, কত ছন্দ, কত সুর গান,
আচ্ছন্ন ব্যথার মত মৌন অভিমান;
কেন এই জাগরণ অলস উদাস?
ঘুম নেই শান্তি নেই কেন বারোমাস?
বাহিরে জ্যোৎস্নার আলো রাত্রি কুহুডাকা
কেন এ দুর্ভোগ শুধু একা জেগে থাকা?

পরের আশ্রয়ে থাকি ছোট ঘরখানি
পথপার্শ্বে বকুলের মৃদু হাতছানি
প্রতিদিন জানালার পরপার থেকে
ক্লান্তিহীন কত কথা বলে যায় ডেকে,
বুঝি নাকো আজো তা'র সুরভিত ভাষা
রোমাঞ্চিত বকুলের মুগ্ধ ভালবাসা,
প্রতিদানে জানায়েছি মৌন অভিমান
মনে হয় এ জীবন বিষাদের গান!

এসে গেছি যৌবনের প্রায় মাঝামাঝি
এই মহানগরীতে অট্টালিকারাজি
উদ্ধত নীরব সাক্ষী পথের দু'পাশে
আজো আছে মাথা তুলে শহুরে আকাশে
চারিদিকে লক্ষ কোটি পদচিহ্ন আঁকা
নিরাশ্রিত পথিকের শুধু বেঁচে থাকা,
ঘোষণায় কী মুখর কঠিন ফুটপাত
এযাবৎ করে যাই নিত্য পদপাত।

একা একা কেটে যায় বিফল রজনী
আসে কত শুকতারা কত সন্ধ্যামণি,
এই রুক্ষ নাগরিক মহাকাশ জুড়ে
যাযাবর কত পাখি চলে উড়ে উড়ে
কোন্ মহাবনচূড়ে তা'দের আবাস?
ডানার আওয়াজে পাই দূরের আভাষ,
কোন্ স্বর্ণবালুচর কোন্ সিন্ধুতীর?
ডেকে ডেকে বার বার হৃদয় অধীর!

সহে-যাওয়া দারিদ্র্যের ঘৃণিত কবর
আমার শয়নকক্ষ পরের খবর
কে রাখে? সময় কোথা? পরাজিত মন
এলোমেলো ছন্নছাড়া চিন্তায় মগন
সারারাত ঝিঁঝিঁ ডাকে ভাঙা কড়িকাঠে
তৃতীয় নয়ন অন্ধ ভাগ্যের ললাটে,
একটু প্রেমের স্পর্শ, এককণা হাসি
অভাবে যৌবন আজো জন্ম-উপবাসী।

সারারাত জেগে আছি কেহ নেই পাশে
সামাজিক জীবনের ঘোর সর্বনাশে
কা'র এত দুঃসাহস? কোন্ সে নায়িকা?
এ দারিদ্র্য-আগুনের প্রবল দাহিকা
সহ্য কোরে একাকিনী হ'বে স্বয়ম্বরা?
শোনাবে প্রেমের গান চিরমধুক্ষরা,
বাহিরে চাঁদের আলো শুভ্র উদাসিনী,
একা জেগে বসে আছি মৌন তমস্বিনী।

ঐতিহাসিককালে বাংলার জনপ্রবাহ

ডক্টর শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

জনপ্রবাহ ত একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা; সে-ধারা ত একটা নির্দিষ্ট যুগে নির্দিষ্ট সময়ে আসিয়া ঠেকিয়া যায় না এবং তাহার ইতিহাস কোথাও শেষ হইয়া যায় না। সেই ধারা এখনও বহমান। কাজেই, প্রাচীন বাংলাদেশে ঐতিহাসিককালে সেই চিরবহমান ধারায় আরও কোনও কোনও জনের রক্তস্পর্শ লাগিয়াছে কি না, লাগিলে কতটুকু লাগিয়াছে এবং সেই প্রবহমান ধারাকে কিভাবে কতটুকু রূপান্তরিত করিতে পারিয়াছে বা পারে নাই, তাহার পরিচয়ও এই সঙ্গেই লওয়া প্রয়োজন।

খৃষ্টীয় প্রথম শতকে গ্রীক ভৌগোলিক ও জ্যোতির্বিদ টলেমি (Ptolemy) তাঁহার 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থে গঙ্গার পূর্বশায়ী দেশগুলির পরিচয় দিতে গিয়া মুরুণ্ড (Murandooi) নামে এক জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন। পঞ্জাব অঞ্চলে এক মুরুণ্ড উপ-কোমের উল্লেখ গ্রীক ঐতিহাসিকেরা একাধিকবার করিয়াছেন; ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই মুরুণ্ডেরা সুপরিচিত। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে এই মুরুণ্ডদের উল্লেখ আছে কুষাণবংশীয় "দেবপুত্রসাহীসাহানুসাহী" এবং শকদের সঙ্গে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, এই মুরুণ্ডরা জন হিসাবে শক-কুষাণদেরই সমগোত্রীয়। শক-কুষাণেরা এক মিশ্র জন। পূর্ব-ভারতে গঙ্গার পূর্বাঞ্চলে যে মুরুণ্ডদের কথা টলেমি বলিতেছেন, তাহারা পঞ্জাবের মুরুণ্ডদেরই একটি শাখা হওয়া বিচিত্র নয়। তবে এই মুরুণ্ডরা বাংলাদেশে নূতন কোনও রক্তপ্রবাহ বহন করিয়া আনে নাই, তাহা একপ্রকার নিশ্চয় করিয়া বলা যায়।

বাংলার বাহিরের অনেক রাজবংশের পরাক্রান্ত রাজারা সৈন্যসামন্ত লইয়া বহুবার বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়াছেন, কম-বেশি অংশ জয় করিয়াছেন এবং তাহার পর বিজয়-গর্ব লইয়া, বহুবিধ ঐশ্বর্য লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছেন। সৈন্যসামন্ত ইত্যাদি সঙ্গে যাহারা আসিয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশ বিজেতা প্রভুর সঙ্গেই ফিরিয়া গিয়াছে। কিছু যাহারা স্থায়ী বাসিন্দারূপে হয়ত থাকিয়া গিয়াছে, তাহারা জনসমুদ্রে জলবিন্দুবৎ কোথায় যে বিলীন হইয়া গিয়াছে, তাহার কোনও হিসাব নাই। ইহারা [illegible] ও [illegible] পট্টোলীগুলিতে এবং সমসাময়িক বাংলার অন্যান্য লিপিতে দেখা যায় অনেক অবাঙালী ভারতীয় উপজাতির উল্লেখ। ভূমি দান-বিক্রয়ের পট্টোলীগুলিতে দান-বিক্রয় যাহাদের নিকট বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে, সেখানে বিভিন্ন রাজকর্মচারী, স্থানীয় মহত্তর, গৃহস্থ, কুটুম্ব ইত্যাদির পরই নাম করা হইতেছে নানা উপজাতির। দৃষ্টান্তস্বরূপ মদনপালের মনহলি পট্টোলীর তালিকাটি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে; রাজকর্মচারীদের পরেই তালিকাগত করা হইয়াছে "গৌড়-মালব-চোড়-খস-হূণ-কুলিক-কর্ণাট-লাট-চাট ভট্ট" প্রভৃতি (রাজ) সেবকদের। ইহাদের মধ্যে মালব, চোড়, খস, কুলিক, কর্ণাট, লাট সকলেই অবাঙালী; হূণেরা ত মূলত অ-ভারতীয়ই, কিন্তু ইতিপূর্বেই তাহারা অন্তত চার পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া এদেশে বাস করিয়া ভারতীয় বনিয়া গিয়াছে। আমার ধারণা এবং অন্যত্র এ ধারণার কারণ বলিতে চেষ্টা করিয়াছি—এই সব অবাঙালী জাতির লোকেরা বাংলাদেশে আসিয়াছিল বেতনভুক্ সৈনিকরূপে, না হয় রাজ-সরকারে একান্ত নিম্নস্তরের কর্মচারিরূপে। বৃহদ্ধর্ম পুরাণ এবং ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণেও এই রকম কয়েকটি ভিন্-প্রদেশী জাত-এর খবর পাইতেছি, যথা—খস, যবন, কম্বোজ, খর দেবল বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ। যেভাবেই হোক্ এই সব লোকেরা ক্রমশ বাংলাদেশেরই বাসিন্দা হইয়া গিয়াছিল এবং এ-দেশেরই বিশাল জনসমুদ্রে নিজেদের বিলীন করিয়া দিয়াছিল। বাংলাদেশের জনপ্রবাহের বেগবান্ ধারায় ইহারা নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। কর্ণাট হইতে কল্যাণের চালুক্য রাজবংশ, তামিলভূমি হইতে চোল রাজবংশ একাদশ শতকে বাংলাদেশে সার্থক বিজয়াভিযান প্রেরণ করিয়াছে; যে-সব সৈন্য-সামন্ত এই সব অভিযানের সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহাদের কিছু এই দেশে থাকিয়া যাওয়া অসম্ভবও নয়। ইহাদের আগে মালব রাজ যশোধর্মণও এক অভিযানে পূর্ব-ভারতে আসিয়াছিলেন। প্রতিহারবংশীয় রাজারাও বাংলাদেশে একাধিক বিজয়াভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন। শৈলবংশীয় রাজারাও এক সময়ে এদেশে এক সমরাভিযান পাঠাইয়াছিলেন। এই সব বিচিত্র সেনাবাহিনীর কিছু কিছু অংশ হয়ত পশ্চাতে থাকিয়া গিয়াছিল এবং তাহারাই যে পরবর্তীকালে মালব, চোড় (চোল), কর্ণাট লাট প্রভৃতি নামে রাজসেবক হইয়া পাল ও সেন লিপিগুলিতে দেখা দেয় নাই, তাহা কে বলিবে? হূণ, খস ইত্যাদিরাও হয়ত এইভাবেই আসিয়া থাকিবে। খসেরা ত হিমালয়ের সানুদেশের পার্বত্য জন; মোঙ্গলীয় রক্তের প্রভাব ইহাদের মধ্যে থাকা বিচিত্র নয়। ধর্মপালের খালিমপুর লিপিতে বাংলাদেশের মন্দিরে লাটদেশীয় ব্রাহ্মণ পুরোহিতের উল্লেখ আছে; আদি-মধ্যযুগের দু'একটি লিপিতে বাংলার বাহিরের ভিন্ন-প্রদেশাগত ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের উল্লেখ আছে। অন্যান্য বর্ণের লোকেরাও নিশ্চয়ই নানা কাজে এদেশে আসিয়াছিল এবং অনেকেই কালক্রমে এদেশেরই বাসিন্দা হইয়া গিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে অন্ধ্ররাও পাল আমলে বাংলাদেশে আসিয়াছিল। একটু অন্য প্রসঙ্গে লিপিগুলিতে ইহাদেরও নাম পাওয়া যায় একেবারে চণ্ডালদের সঙ্গে। কেন যে সমাজের একেবারে নিম্নতম স্তরে চণ্ডালদের সঙ্গে ইহাদের স্থান নির্ণীত হইয়াছিল, তাহা বুঝা যায় না। যাহাই হউক, যে-ভাবেই আসিয়া থাকুক, এবং সমাজের যে স্তরেই থাকুক, অগণিত জন-প্রবাহের মধ্যে ইহারা সংখ্যায় এত স্বল্প এবং ইহাদের প্রত্যেকের ধারা এত ক্ষীণ যে, নর-তত্ত্বের দিক হইতে আজ আর তাহাদের পৃথক্ করিয়া চিনিয়া লইবার উপায় নাই, বিরাট্ বহমান প্রবাহের মধ্যে তাহারা একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া, ইহারা সকলেই ত পূর্ববর্ণিত কোনও না কোনও বৃহত্তর জনের অঙ্গীভূত ছিল এবং সে-সব জাতি ঐতিহাসিক যুগের পূর্বেই বাংলাদেশে তাহাদের রক্তপ্রবাহ সঞ্চার করিয়া গিয়াছিল; যাহারা পারে নাই, তাহাদের ঐতিহাসিক বংশধরেরা পরবর্তীকালে যে স্বল্পসংখ্যায় বাংলাদেশে আসিয়াছিল, যে ক্ষীণ ধারা সঙ্গে আনিয়াছিল, তাহাতে সুস্পষ্ট নির্দশন

আঁকিয়া দেওয়া সম্ভব ছিল না।

রাজা-রাজকুমারেরা অনেক সময় ভারতবর্ষেরই ভিন্‌প্রদেশী রাজকুমারীদের বিবাহ করিয়া আনিতেন; বাঙালী পাল রাজারাই করিতেন, কর্ণাটদেশাগত সেন রাজারা ত করিতেনই। পুরুষানুক্রমে কয়েক পুরুষ ধরিয়া এইরূপ হইয়াছে, এমন দৃষ্টান্তও আছে। রাজারাজড়ার ত কোন জন-বর্ণ নাই; কাজেই মহিষী নির্বাচন করিতে গিয়া জন-বর্ণ দেখিবারও প্রয়োজন হইত না, রাজবংশ, প্রভুবংশ হইলেই চলিত; এখনও ত তাই চলে! বিশেষত, রাষ্ট্রীয় কারণ থাকিলে ত কথাই নাই। কিন্তু এই ধরনের দৃষ্টান্তও বিরাট জনগণপ্রবাহে জলবিন্দুবৎ; কাজেই, মুষ্টিমেয় ভিন্নপ্রদেশাগত নারীও বিশাল জনসমুদ্রে বিলীন হইয়া গিয়াছেন। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম।

সদ্যবর্ণিত এই সব দৃষ্টান্ত ছাড়া বাংলার ইতিহাসে কয়েকটি রাজবংশের পরিচয় আছে যাহারা বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বাংলায় আসিয়া নিজেরা রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিয়া এদেশের কম-বেশী অংশে রাজত্ব করিয়াছেন, পুরুষানুক্রমে বসবাস করিয়াছেন এবং এই দেশেরই বিরাট জনগণপ্রবাহে কালক্রমে বিলীন হইয়া গিয়াছেন। তুর্কী-বিজয়ের পূর্বে পর্যন্ত বাংলাদেশে এই রকম তিন চারিটি প্রধান প্রধান রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। সপ্তম শতাব্দীর শেষার্ধে খড়্গ নামে একটি রাজবংশ সমতট অঞ্চলে প্রায় তিন চার পুরুষ ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন; খড়্গোদ্যম, জাতখড়্গ, দেব-খড়্গ ও রাজ-রাজভট—এই চারিজন রাজার নাম আমরা জানি। খড়্গ এই উপান্ত নামটি কেমন যেন সন্দেহজনক এবং ভিন্‌প্রদেশী অবাঙালী নাম বলিয়াই মনে হয়, অথচ ইঁহারা কোথা হইতে আসিয়াছিলেন জানিবার উপায় নাই। তিন পুরুষ ধরিয়া ইঁহারা অন্তত উপান্ত নামে নিজেদের জন-পরিচয় অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিলেন, কিন্তু চতুর্থ পুরুষে তাহা পরিত্যাগ করিয়া একেবারে যেন দেশী বাঙালী বনিয়া গিয়াছিলেন। দশম শতকে কম্বোজাখ্য আর এক রাজবংশ গৌড়ে কিছুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। দিনাজপুর জেলার বাণগড়ে প্রাপ্ত একটি স্তম্ভলিপিতে ইঁহারা "কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতি" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন; ইর্‌দা তাম্রপট্টেও ইঁহাদের উল্লেখ আছে। এই কাম্বোজান্বয়জরা কাহারা? কোথা হইতে ইঁহারা আসিয়াছিলেন? দেবপালের মুঙ্গের শাসনে এক কাম্বোজের উল্লেখ আছে, কিন্তু সেই কাম্বোজদেশ যে উত্তর-পশ্চিমের গন্ধার দেশের সংলগ্ন দেশ, এসম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু বাণগড় স্তম্ভলিপি ও ইরদাপট্টের কাম্বোজ যে মুঙ্গের শাসনের কাম্বোজ, আমার তাহা মনে হয় না। বহুদিন আগে রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বলিয়াছিলেন এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাহা সমর্থন করিয়াছিলেন যে, এই কাম্বোজরা তিব্বত, ভোটান প্রভৃতি হিমালয়ের সানুদেশের কোন মঙ্গোলীয় জাতির শাখা, এবং বর্তমান উত্তর বঙ্গের কোচ-পলিয়া-রাজবংশীদের পূর্বপুরুষ। সুনীতিবাবু কম্বোজের সঙ্গে কোচ শব্দের একটা শব্দতাত্ত্বিক যোগও অনুমান করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি এই মত এখন পরিত্যাগ করিয়াছেন; কেন করিয়াছেন, জানি না। আসামের পূর্বতম প্রান্তে চীনদেশের সীমায় য়ুনান প্রদেশকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত প্রাচ্য ভৌগোলিক ও ব্যবসায়ীরা গন্ধার বলিয়াই অভিহিত করিতেন; ত্রয়োদশ শতকেও রসিদ-উদ-দীন্ এই দেশকে গন্ধার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই গন্ধারেরই সংলগ্ন এক কম্বোজদেশ ছিল না, কে বলিবে? বিশেষত পূর্ব-দক্ষিণ সমুদ্রশায়ী চম্পাভূমি-সংলগ্ন কম্বুজদেশ যখন পূর্ব হইতেই এত সুপরিচিত? তাহা ছাড়া ব্রহ্মদেশের পেগু শহরের নিকটস্থ পঞ্চদশ শতকের সুদীর্ঘ কল্যাণী শিলালিপিতে রাজা ধম্মচেতি ঐ দেশে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস ও ধর্মসংস্কারের যে-বিবরণ উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন, তাহাতে কম্বোজ-সংঘ নামে এক বৌদ্ধধর্মগোষ্ঠীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা যে সেই উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কাম্বোজদের সঙ্গে সম্পৃক্ত একথা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। আমার ত মনে হয়, আসামের পূর্ব সীমান্তের গন্ধার সংলগ্ন একটা কম্বোজ দেশ ছিল, এবং বাংলার কাম্বোজ-রাজবংশ সেই দেশ হইতে আগত। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে ইহারা মোঙ্গলীয় পরিবার-অন্তর্ভুক্ত ছিল, এই অনুমান অসঙ্গত নয়, এবং বাণগড় শিলালিপির সাক্ষ্য স্বীকার করিলে ইহারা যে এদেশে আসিয়া এ দেশের শৈবধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। বৃহদ্ধর্মপুরাণ এবং ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে বাংলাদেশে যে-সব অবাঙালী জনের নাম করা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কম্বোজ অন্যতম। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা হইতে একাধিক মোঙ্গলীয় জন যে প্রাচীনকালে বাঙালীর জনপ্রবাহে রক্তধারা মিশাইয়াছে, একথা আগেই উল্লেখ করিয়াছি। বস্তুত বাংলা ও আসামের প্রাচীন ইতিহাসে এই অঞ্চল হইতে একাধিক সমরাভিযান ব্রহ্মপুত্র-করতোয়া অতিক্রম করিয়া বাংলাদেশে বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কামরূপরাজ ভাস্কর বর্মণের স্বল্পকালস্থায়ী উত্তরবঙ্গাধিকার তাহার একটিমাত্র দৃষ্টান্ত।

আর এক বর্মণ রাজবংশ একাদশ ও দ্বাদশ শতকে পূর্ববঙ্গে প্রায় পাঁচ ছয় পুরুষ ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই বর্মণেরা বাংলার দক্ষিণে কোন প্রদেশ, সম্ভবত উড়িষ্যা হইতে আগত। কিন্তু যে ভিন্‌প্রদেশাগত রাজবংশ বাংলাদেশে আসিয়া প্রায় দুই শত বৎসর ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং বাঙালীর সমসাময়িক সমাজ-বিন্যাসকে আমূল বদলাইয়া স্মৃতি-শাসনের রূপান্তর ঘটাইয়া সমাজের উচ্চস্তরে নূতন এক সমাজ-বিন্যাস গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, সেই সেন-রাজবংশের কথা এই প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই সেন রাজারা নিজেদের পরিচয় দিয়াছেন "কর্ণাট ক্ষত্রিয়" বলিয়া। তাঁহারা যে দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটদেশ হইতে আসিয়াছিলেন, একথা আজ সর্বজনবিদিত। কর্ণাটদেশবাসী চালুক্য রাজবংশ একাদশ শতকে বাংলা ও বিহারে একাধিক সমরাভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন; এই সব অভিযানের সঙ্গে যেসব সৈন্যসামন্তরা আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই যে পরবর্তীকালে তিরহুত ও নেপালে "কর্ণাটক" রাজবংশ, রাঢ়ে ও বঙ্গে "কর্ণাট-ক্ষত্রিয়" রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এ অনুমান ইতিহাসসম্মত। সেন রাজারা সাধারণত বৈবাহিক আদান-প্রদান ভিন্ প্রদেশের রাজবংশের সঙ্গেই করিতেন—রাজারাজড়া ত তাহা করিয়াই থাকেন—; কিন্তু একথাও সত্য যে, দুই শত বৎসরে তাঁহারা একেবারে বাঙালী বনিয়া গিয়াছিলেন এবং বাঙালীর জনপ্রবাহে নিজেদেরকে বিলীন করিয়া দিয়াছিলেন। কর্ণাটদেশের উচ্চবর্ণের লোকেরা ত মোটামুটি জন হিসাবে গোলমুণ্ড, উন্নতনাস অ্যালপাইন পরিবারভুক্ত; উচ্চবর্ণের বাঙালীরাও তাহাই; কাজেই, "কর্ণাট ক্ষত্রিয়" সেনরাজবংশ বাংলাদেশে এমন নূতন কোনও রক্তধারা বহন করিয়া আনেন নাই, যাহা বাংলাদেশে ছিল না; আনিলেও সে ধারা এত ক্ষীণ ও শীর্ণ যে, বেগবান্ স্রোতপ্রবাহে কোথায় যে তাহা মিশিয়া গিয়াছে, আজ আর তাহা ধরা পড়িবার উপায় নাই।

তুর্কী বিজয়ের পরও বাংলাদেশে এই ধরনের শীর্ণ ক্ষীণ রক্তধারার স্পর্শ কিছু কিছু লাগিয়াছে। ভারতবর্ষের বাহির হইতে যেটুকু আসিয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত দু'চারিটি দেওয়া যায়। কিছু কিছু আরবী মুসলমান পরিবার বাণিজ্য ব্যপদেশে বাংলাদেশে আসিয়া বসবাস করিয়াছেন; নোয়াখালি-চট্টগ্রাম অঞ্চলে, বাংলার অন্যান্য জেলায়ও স্বল্পসংখ্যায় ইঁহাদের দর্শন মেলে। শতাব্দীর পর শতাব্দীর আবর্তে ইঁহারা বাঙালী মুসলমানদের সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছেন। নেগ্রিটো-রক্তসংপৃক্ত হাব্‌সীদের কথাও বলা যায়; বাংলাদেশে প্রায় পাঁচ ছয়জন হাব্‌সী সুলতান বহুদিন ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছেন; তাহা ছাড়া দিল্লী-আগ্রার অনুকরণে এদেশেও হাব্‌সী প্রহরী রাখার চলন কিছু কিছু ছিল। ইহারাও বাঙালীর রক্তেই নিজেদের রক্ত মিশাইয়াছে;

তাহার কিছু কিছু নিদর্শন হঠাৎ চোখে পড়িয়া যায় বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের উচ্চস্তরেও; কৃষ্ণ বর্ণ, প্রশস্ত নাসা, ঊর্ণাবৎ রুক্ষ কেশ, পুরু উলটানো ঠোঁট দেখিয়া হঠাৎ চমক লাগিয়া যায়। আরাকানী মগ প্রভাবও উল্লেখ করা যায়। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে পর্তুগীজ ও মগ জলদস্যুর উৎপাতে বাংলার সমুদ্র উপকূলশায়ী জেলাগুলি পর্যুদস্ত হইয়াছিল; ইহারা চুরি ডাকাতি করিয়া মেয়ে ধরিয়া লইয়া আসিত আরাকান প্রভৃতি অঞ্চল হইতে এবং এদেশ হইতে বাহিরে লইয়া যাইত। এই সব মেয়ে বিক্রয় করাই ছিল ইহাদের ব্যবসা। বরিশাল, খুলনা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি প্রভৃতি স্থান ছিল এই ব্যবসার কেন্দ্র। এই-ভাবে কিছু কিছু মগ রক্তও বাঙালীর রক্ত-প্রবাহে সঞ্চারিত হইয়াছে। "ভরার মেয়ে"র যে প্রবাদ-কাহিনী আমাদের দেশে প্রচলিত তাহাও নিরর্থক স্বপ্নকল্পনা মাত্র নয়। এইভাবেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বাংলাদেশে জাতি-সমন্বয় চলিয়াছে, চলিতেছে এবং সমগ্র জীবনপ্রবাহকে সমন্বিত গতি ও রূপদান করিতেছে।

অনুবাদসাহিত্য

জোসেফের শিক্ষা

জোসেফ গারনাণ্ড

হলের বেয়ারাটা সেলাম জানাল। আপনি কি মনে করেন? আমি নিশ্চয় পৃথিবীতে উন্নতির পথে যাচ্ছি। উপর থেকে উপরে। তবু আমি বিস্মিত হয়ে যাই। নিশ্চয়ই ঊর্ধ্বগামী কোন পথ আছে (যদিও আমরা খুব কমই এর বিরুদ্ধে সতর্কবাণী পেয়ে থাকি)।

এখন আমার মত চরিত্রের লোকের পক্ষে উপরে ওঠা কিংবা নীচে নামা স্বাভাবিক নয়; আমরা জোসেফরা—অকৃত সংকল্প, কঠিন-চরিত্র কিংবা হাল্কা চরিত্রের দল—আমরা যেখানে আছি, সেইখানেই আমাদের থাকা উচিত। অন্যেরা কাজ করে, আমরা বিবেচনা করি; অন্যের কথা বলে, আমরা শুনি। আমাদের চারদিকের প্রত্যেকেই হয় উঠছে, নয় পড়ছে। সামাজিক লিফট্‌, ব্যবসায়ের লিফট্‌, কর্তব্যের লিফট্‌ অন্যদের জন্য দরজা খুলে দেয়, কিন্তু আমরা যেই ঢুকতে যাই, অমনি দরজা যায় বন্ধ হয়ে। আমরা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকি।

হলের বেয়ারা বলল: "ধন্যবাদ মহাশয়।" আমি কি ওকে বকশিস দিয়েছি? আমি কি হেসেছি? না, ও দরজা খুলে ধরে দাঁড়িয়েছিল—আমি তার মধ্য দিয়ে নাক উঁচু করে চলে গেলাম শুধু।

আর কয়েক মাস আগে সে আমাকে ভিতরে যেতে দিতে দ্বিধা বোধ করত।

এ কিসের ফল তাও আমি জানি— পিছন দিকে তাকিয়ে আমি তা বুঝতে পারি—এ সেই জানুয়ারীতে তৈরী করা নতুন স্যুটের ফল। অবশ্য স্যুট তৈরীর সময় হয়ে গেছিল হয়ত; আমার সব ছেঁড়া স্যুটই আমাকে একে একে ছেড়ে যাচ্ছিল। সার্জটা পোকায় কাটতে সুরু করেছিল এবং কেন জানি না। না বুঝেই আমি আমার ফ্ল্যানেলে তৈরী ভাল ব্যাগ জোড়া দিয়ে দিলাম আমার জানালা পরিষ্কারকারী লোকটার ভাই-পোকে। আমি পরেও তাকে দেখতে পেতাম—আগের চেয়ে অনেক বেশী চটপটে অডিয়নের ৪ পেনির দোকানে ঢুকছে।

তারপর এক রাত্রে চোর ঘরে ঢুকে আমার টেইল কোট এবং আধ বোতল গিন নিয়ে চম্পট দিল; যদিও বহু বছর ধরে আমি সান্ধ্য পোষাক পরিনি, এই ক্ষতিতে আমি হতাশ হয়ে পড়লাম।

আমি যুদ্ধের জন্যে স্যুট কেনা স্থগিত রেখেছিলাম। আমি ভাবলাম: "অনেক দিন যখন আর স্যুট তৈরী করাব না, তখন এ স্যুটটা ভাল করেই করি।" আমি টোটেনহ্যাম কোর্ট রোডের দিকে পিছন ফিরে স্যাভাইল রোর দিকে চললাম।

দর্জি মিঃ লভিবণ্ডের নাকটা লাল আর উচ্চারণ সুইটজার্ল্যাণ্ডবাসীর মত; তিনি আমার অসভ্যোচিত পোষাক দেখে কাশি দিয়ে পিছিয়ে গেলেন।

তিনি কেমন কেমন গলায় বললেন: "আপনি বোধ হয় শিল্পী।"

"হয়ত"—আমি সম্মতি জানালাম।

আমি দম বন্ধ করে রইলাম—আর তাঁর সহকারীরা আমায় চিমটিয়ে, লম্বা করে, নম্বর নিয়ে বিব্রত করে দিল এবং তারপর যেন ব্যঙ্গাত্মকভাবেই আমায় বের করে দিল।

জিনিসগুলো আনতে যেতে অনেক স্থির সংকল্পের প্রয়োজন হল, কিন্তু আমার রেশন কুপন ত কাটা হয়ে গেছিল।

কয়েক সপ্তাহ পরে একটি মধুর দিনে আমি পুরনো পোষাক ছেড়ে নতুন পোষাক পরলাম এবং যেন হাওয়ায় উড়ে চললাম। মিঃ লভিবণ্ড তাঁর আঙুলের অগ্রভাগগুলো টিপে বললেন: "আমি আপনার যাওয়া দেখব এবং দেখে নিশ্চয় খুব সুখ পাবো।" মিঃ লভিবণ্ডের দৃষ্টির তল দিয়ে আমি বণ্ড স্ট্রীটের সূর্যালোকের মধ্যে গিয়ে পড়লাম। আমি একটি জুতোর দোকান দেখলাম যেখানে আগেকার দিনে আমার ঢোকার সাহস হত না। এখন আমি স্থির মস্তিষ্কে গিয়ে ঢুকলাম। মোকাসিন্স আর এক জোড়া শূকর-চর্মের স্লিপার। আর কেনই বা কিনব না? দস্তানা। তারপর ফারকলার দেওয়া একটা ওভার কোট। ককটেল, ডিনার, সিগার। সেই সন্ধ্যায় আমি যখন ট্যাক্সী থেকে নামলাম, তখন আমার সহরবাসীরা বিস্মিত হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। পোষাকের জন্যে আমাকে নতুন আবাস স্থান খুঁজে বার করতে হল; আমাকে আরও রোজগার বাড়াতে হল (তা আমি কোন রকমে পেয়েছিলাম); খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমি দেখলাম যে, আমি একটা বেশী ভাড়ার ফ্ল্যাটে এসে উঠেছি, সবখানে ট্যাক্সী করে যাচ্ছি, বড় বড় লোকের সঙ্গে দেখা করছি, আয়কর দিচ্ছি, পার্টি দিচ্ছি।

অতিথিরা চলে যাবার পর আমি আয়নার মধ্য দিয়ে নিজের দিকে তাকিয়ে বলতাম: "কিন্তু এ ত তুমি নও। তুমি কখনও এমন মনোরম সন্ধ্যার ব্যবস্থা করতে পারোনি"—সন্ধ্যাটি প্রকৃতই মনোরম হয়েছিল—"এ কখনও সেই পুরোনো ধীর স্থির জোসেফ নয়।"

আমি একা থাকলেও মধ্য ইউরোপীয় ধরণে কথা বলতাম। আমার অজ্ঞাতসারেই এ অভ্যাস জন্মেছিল; আমার নতুন পরিচিতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রত্যেকেই ভাল ইউরোপীয় ছিলেন—তবে খারাপ ইংরেজী বলতেন। লোকেরা আমায় ইয়োসেফ বলতে সুরু করেছিল এবং আমাকে এ ব্যাপারে ও ব্যাপারে ডাকত। "অবশ্য ইয়োসেফও আসবে।" ইয়োসেফ কে? আমি ফিরে চারদিকে দেখার চেষ্টা করতাম, কিন্তু সে সময়ের মধ্যে স্যাণ্ডুইচও চলে যেত—আমি এসে পার্টির দল বৃদ্ধি করতাম।

সব রকম কাজের মধ্যে আমাকে জোর

করে ঢোকানো হ'ত। আমার পূর্ব ইউরোপ-নিবাসিনী ঠাকুরমার জন্যে (ভগবান তাঁর মঙ্গল করুন) কোন না কোন স্বাধীনতা আন্দোলন আমাকে দাবী করত। বিরক্তির বিষয় এই ছিল যে, সাংঘাতিক কর্মচাঞ্চল্য সত্ত্বেও এ আন্দোলন কখনও নিজেকে স্বীকৃত করাতে পারে না। অল্প সময়ের মধ্যে আমি দেখলাম যে, বিভিন্ন কমিটির সভায় আমি বক্তৃতা দিচ্ছি—রাজনীতিবিদদের উপদেশ দিচ্ছি। বিভিন্ন বিষয়ে আমার মতামত সসম্ভ্রমে শ্রুত হ'ত। আমি প্রবন্ধও লিখতাম। অনেক সময় সম্পাদকদের অনুরোধে প্রসিদ্ধ লেখকদের গল্পের অনুবাদও আমায় করতে হ'ত এবং সেগুলো সাধারণত হাউণ্ডস্‌ডিচের সাধারণ ভোজনাগারের গল্প না হয়ে স্টারি অস্কলের কাফের গল্প হ'ত বলে, সবাই তার মধ্যে চমৎকার রসের সন্ধান পেত।

আমার নতুন ধরণের বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে এমন একজন ছিল যে, তার অদম্য উৎসাহের দ্বারা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। সে আমাকে পলায়নী বৃত্তি সম্পন্ন বলে অভিযুক্ত করত : "ঈশ্বরের দিব্যি, আমরা সবাই জীবন থেকে পালিয়ে যাচ্ছি—আমরা পলায়নবাদী।" সে নিজে ছিল এর বিরুদ্ধবাদী। সে সব সময় সবচেয়ে অপ্রীতিকর কাজ পছন্দ করত। তুমি যে অন্য কিছু এড়াতে চাচ্ছ তার যথেষ্ট প্রমাণ হচ্ছে যে তুমি কোন কিছু করতে চাও; তবে সেই অন্য জিনিসটি খুঁজে বার কর এবং তাই কর।

কাজেই যখন পায়োটরের খাবার ইচ্ছা হ'ত সে তখন পড়তে সুরু করত কিংবা বেড়াতে যেত। সে গান, ভাল মদ এবং চটুল মেয়ে ভালবাসত; আমি তাকে রেডিওতে কেটেলবির গান শুনতে দেখ্‌তাম, মদের তলানি পর্যন্ত খেতে দেখতাম আর দেখতাম নাইট-ক্লাবে বুড়ী মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে যেতে। সিগারেট ভালবাসলেও সে খেত পাইপ; ঠাণ্ডা জিনিসটা ঘৃণার চোখে দেখলেও সে নিজের ঘরের তাপ রাখত ৪৫ ডিগ্রী। সে 'গন্‌ উইথ দি উইণ্ডে'র টিকিটের জন্যে তুষারস্রাবী সন্ধ্যায় লম্বা সারিতে দাঁড়িয়ে থাকত, সোয়েডেনবর্গের শিষ্য হয়েছিল এবং প্রতিদিন কয়েকঘণ্টা কৌতুক মেলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাঙা মোটর দেখত। তার দেয়ালের ছবিগুলো—থাক আর বেশী বলে কাজ নেই।

আত্ম-নিয়ন্ত্রণে এর চেয়ে বেশী স্বার্থ-ত্যাগ করা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। প্রথম প্রথম এই সব স্বার্থত্যাগের ফলে পায়োটরের ভাবধারাকে উজ্জ্বল বলে মনে হ'ত। অন্যদের নিজ নিজ চটুলতা ও মলিনতা সম্বন্ধে সজাগ করার জন্যে শুধু তার উপস্থিতিই যথেষ্ট ছিল। মনে হ'ত সে এমন জায়গায় প্রবেশ করছে যেখানে আমরা যারা নিজেদের পছন্দ মত কাজ করি, তাদের পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।

যদিও এই বাস্তববাদের মধ্যে খুঁৎ ছিল—যেটা আমরা নই পায়োটরই আবিষ্কার করেছিল। কষ্ট তার নিজের সন্তুষ্টি নিয়ে আসে; সে একদিন বিকালে টক মসেজ চিবোতে চিবোতে এ সত্য আবিষ্কার করেছিল এবং কাজেই অনুরূপ পরিবর্তন সাধন করতে হয়েছিল। পলায়নী মনোবৃত্তি বিরোধীকে এখন পলায়নী মনোবৃত্তি-বিরোধিতার লোভানি সম্বন্ধে সতর্ক হয়ে উঠতে হয়েছিল। যে সব পথ এতদিন সোজা মুক্তির লক্ষ্যে পৌঁছেচে বল মনে হ'ত, এখন তাদের বিষয়ে জাগত সন্দেহ। মনে হ'ত পায়োটরের পরাজয় যেন অনিবার্য।

তাকে অসুস্থ দেখাতে লাগল। তার চোখে আর পূর্বের উজ্জ্বলতা ছিল না, তার গলা কর্কশ হয়ে গেল এবং তারপর তার গলার গ্ল্যাণ্ডগুলো অদ্ভুতভাবে ফুলে গেল। পায়োটরের কর্ণমূলে প্রদাহ হয়েছিল। এই রোগটি তার কাছে হাস্যকর এবং যন্ত্রণাদায়ক বলে মনে হ'ত এবং তার নিজের ব্যাপারে এ অসুখটা তার মোটেই পছন্দসই ছিল না। রোগটি তার অন্তর্বিরোধ প্রসমনে কিছুটা সাহায্য করেছিল।

আমাদের সমাজ থেকে দূরে অপসারিত এই পায়োটরই এখন আমাদের কল্পনা-বিলাসের বিরুদ্ধে সতর্ক করত। সে বলত যে আমি যে সব লোকের সঙ্গে মিশছিলাম তাদের অধিকাংশই বর্তমান ছেড়ে ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্যস্ত—তারা যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনা কিংবা অন্য কোন না কোন পরিকল্পনা নিয়ে ছিল ব্যাপৃত। তার মতে এটা ছিল ঘৃণ্যতমভাবে কর্তব্য এড়ানো—চরম ভীরুতা। তখন আমি নিজে চারটি কমিটিতে ছিলাম। সে চোখে জল নিয়ে আমাকে সেগুলো ছেড়ে দিতে বলত। সে আরও বলত : "আর তুমি অ্যানার সঙ্গেও অত্যন্ত বেশী মিশছ। অ্যানা ছিল ক্ষুধিতা একজন পোল রমণী।

কিন্তু আমি ছেড়ে দেই কিভাবে? একবার যদি উর্ধগামী পথে চলা সুরু করা যায়, তবে আত্মসংবরণ করা কঠিন। হলের বেয়ারাটি সেলাম করল। লিফট্‌ আমাকে উপরে নিয়ে চলল। ৮-তলার উপর আমার ফ্ল্যাট আমাকে স্পর্শযোগ্য সাধারণ জিনিসের উপর টেনে তুলেছিল।

আমি মেঘের মধ্যে বাস করতাম। কাছ দিয়ে মেঘ ভেসে যেত, কিংবা মেঘ জমে থাকত—বড় ও ছোট মেঘ, স্বচ্ছ মেঘ, নীল-সবুজ আকাশে ভাসমান বরফ পাহাড়ের মত মেঘ; কিংবা আমি যখন জানালার পাশে বসে থাকতাম, তখন আমার দৃষ্টির সামনে ভেসে উঠত মহা শূন্যতা—অসীমের নিষ্প্রভ বিবর্ণতা। আমি কখনও এ দৃশ্য থেকে ক্লান্ত হতাম না। দৃষ্টির সম্মুখে আকাশ যেন পরিবর্তনশীল সমুদ্র—মেরু অঞ্চল থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত—দ্বীপ পরিবৃত। অদ্ভুত সকাল, সুন্দর সন্ধ্যা, বালিশের মত ঢেউ তোলা বিকাল, উজ্জ্বল মধুর সূর্যাস্ত—এগিয়ে যাও, দ্বিধা অনুভব কর, জানালা ছেড়ে দূরে চলে যাও। অনেক সময় সমস্ত দিন ধরে এই আলোর গতি প্রতিরোধ করার কেউ থাকত না; তারপর হয়ত ভ্রমরগুঞ্জন করে কোন এরোপ্লেন অনন্তপ্রসারী আকাশের বুকে টেনে দিত একটি সরল রেখা কিংবা টেলিফোনের ঘণ্টা উঠত বেজে। "তুমিই কি ইয়োসেফ? তোমায় আমরা কখন দেখতে পাব? ওঃ ব্যস্ত বুঝি? তুমি কেমন লোক, সর্বদাই ব্যস্ত! আর অ্যানা?"

ওখানে এক খণ্ড মেঘ যাচ্ছে—বিস্কুটের মত দেখতে—কিন্তু এটা কিসে পরিবর্তিত হচ্ছে?—শ্বেত ভল্লুকে।

আর অ্যানা—সে সব সময় ক্ষুধিতা; রেস্তোরাঁতে যেয়ে তার পার্ট্রিজ ব্রেষ্ট ছিঁড়ে এবং পুরুষকে গিলে খাওয়া চাই। তবে আমাকে বিরক্ত করা কেন? কিন্তু ভাব দেখে মনে হয় আমাকেও তার পাওয়া চাই। সে আমার ফ্ল্যাট পছন্দ করে। এ ফ্ল্যাটের ভূতপূর্ব মালিক ছিল তার প্রিয় বন্ধু—কাজেই বিড়ালের মত সেও মনে করত যে এ ফ্ল্যাট তার।

সে আমার জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকা পছন্দ করে না।

"ইয়োসেফ্‌!" সে তীক্ষ্ম সুরে বিস্ময়োক্তি করত। আমি ফিরে তাকিয়ে দেখি হলভরা মানুষের মাথা। অপরিচিতে ঘর ভর্তি। পার্টি চলছে। কেউ কেউ কথা বলছে, কেউ শুনছে—কেউ বা এ দল ও দল করে ছুটে বেড়াচ্ছে—যাবার পথে খাচ্ছে কিংবা ভাবধারা সংগ্রহ করছে। "দয়া করে মাপ করুন।" সুদূর কোণে অর্ধ বৃত্তাকারে কয়েকজন লোক বসে এক গাদা ছবি দেখছিল। ব্রিজ্‌ক্রিগের ছবি কিন্তু ধ্বংস এবং মৃত্যুর স্থান দখল করেছে খামখেয়ালী জ্যামিতি। শিল্পী বিষণ্ণভাবে প্রতীক্ষা করে প্রদর্শন এবং বিনয়ের দ্বৈত ভূমিকা অভিনয় করছে। কেউ একটা রসগ্রাহী উক্তি করে—অন্যেরা তার প্রতিধ্বনি করে। অন্য কোণে বিরোধিতার জন্যে প্রসিদ্ধ রাজনীতি-বিদ্‌ বসে গভর্নমেণ্ট, যুদ্ধ এবং আগামী শান্তির তীব্র সমালোচনা করছেন। গল্পের পর গল্প ক্ষমতাবানদের অযোগ্যতা এবং মূর্খতার কথা প্রকাশ করছে। "অসম্ভব!" আমরা রুদ্ধশ্বাসে বলি। "হায় ভগবান! বেশ বেশ! বিস্ময়কর! বুড়ো দৈত্য কি সত্যই তাই বলেছিল?" প্রত্যেকেই আঘাত পায় এবং বিস্ময়াভিভূত হয়। পাজামা

পরিহিতা একটি দীর্ঘাঙ্গী বিবর্ণা নারী আমার দিকে ফিরে বলেঃ "কিন্তু এ বিষয়ে করা যায় কি?" তারা সবাই যা করে। আবার মদ খায়। কথা বলে, প্রতিবাদ করে, নতুন শয্যাসংগী কিংবা শয্যাসঙ্গিনী খুঁজে বার করে—টেবিলে রাখা জলে আঁকা ছবি দেখে।

দলগুলো আরও ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে যায়, একদল বল্কান সমস্যা, অপর দল ব্যালে নৃত্য, তৃতীয় দল বাজেট সমালোচনা করে; শিল্পী এক জোড়া ছবি বিক্রী করে চলে যায়; রাজনীতিবিদের একটি সভায় বক্তৃতা দেবার আছে; নৈশ ভোজনের দল তৈরী হয়, অ্যানা বলে যে সে এত ক্ষুধার্ত যে, তার কাঁদবার ইচ্ছা করছে। সবাই দুঃখিত (মদ ফুরিয়ে গেছে) যে এত শীঘ্র পার্টি ভেঙে যাচ্ছে।

অবশেষে দরজা বন্ধ হয়ে যায়। আমি থার্মোমিটার দেখিঃ ৭৮ ডিগ্রী। এই কৃত্রিম তাপ সমন্বিত গৃহে বাইরে তুষারপাত হলেও উত্তাপ ৭০ ডিগ্রীর নীচে নামে না। আমি বাতি নিবিয়ে দিয়ে প্লেট এবং গ্লাসের মধ্য দিয়ে কোনমতে জানালার দিকে এগিয়ে যাই। চাঁদের আলো। নীচে রাস্তা, ছাদ, বাগান, স্কোয়ার এবং গির্জা সব চাঁদের আলোতে জমে গেছে। এক কোণ থেকে একটি রেডিও ফাঁদে ধরা পড়া জন্তুর মত শব্দ করছে। বড়দিন কাছাকাছি এসে পড়েছে। ম্যান্টেল পিসের (বড়দিন উৎসবের গাছ) কার্ডের উপর হলি গাছের শাখা ও বরফ।

হলি এবং বরফ—আর আমার ইয়ুল কাঠ পুড়ে পুড়ে কমলা রঙের আলো দিচ্ছে। বিদ্যুৎ আবার আমাদের পানীয় শীতল-কারী ছোট ছোট বরফের টুকরোও সরবরাহ করে এবং আমার পরের বাড়ীর প্রতিবেশী—বিষণ্ণচোখ দৈত্যের মত দেখতে, হাতের নখগুলো ভাঙা—সে রেফ্রিজারেটরের মধ্যে মাথা দিয়ে বড়দিনের আগমন বুঝতে পেরেছিল।

এই বিরাট বাড়িতে যে দিকে তাকানো যায়, একই দৃশ্যঃ করিডরে নম্বর-দেওয়া ঘর; ঘণ্টা, পিতলের হাতল; চুণকাম, উত্তপ্ত ধাতু, গন্ধ, সিগারের ধোঁয়া এবং কাঠের বার্ণিসের আবহাওয়া। রঙ-মাখা নরনারী—নরম মুখ এবং অদ্ভুত অসহায় দেহ। এদের কারও কারও জন্ম এখানেই—তারা এই বিরাট বাড়িটির বাইরে কখনও গেছে বলে মনে হয় না—এই বিরাট বাড়িটিতে দোকান আছে, ব্যাঙ্ক আছে এবং সিনেমাও আছে।

বাইরের জগতের লোকদের চেয়ে এরা যেন সম্পূর্ণ অন্য জাতের। বাইরের জগতের লোকদের আমি দেখতে পাই দূরবীণের ভেতর দিয়ে—দরজায় দাঁড়ানো, চুল্লীর ওপর ঝুঁকে পড়া, ছাতা নিয়ে বেড়ানো কিংবা কোণে সারিবন্ধভাবে দাঁড়ানো এবং তাদের বিকৃত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে অসুস্থতা এবং অভাবের ছাপ। কোন কোন সময় রাত্রে যখন এই পথবাসীদের মধ্যে স্বাধীনতার মোহ ছড়িয়ে পড়ে, তখন মনে হয় যে, তাদের গলার উদ্ধত স্বর ভেসে এসে আমার সাই বেলিয়াসের রেকর্ড বাজানো কিংবা অ্যানার দেওয়া পার্টিকে পরিহাস করে। তখন কোন কবির আবৃত্তি শুনতে শুনতে আমি জানালার দিকে ঝুঁকে পড়ি এবং কান খাড়া করে রাখি; গলার স্বরগুলো ভেসে আসে; এক মুহূর্তের জন্যে আমার মধ্য থেকে একটি স্বর উত্তর দেয় এবং আমি ফিরে পার্টির দিকে তাকাই, বক্তৃতারত মুখগুলো, অসহায় চোখের সামনে আলোগুলো। আমি আমার নিকটতম প্রতিবেশীর দিকে ফিরিঃ আপনি কি বলছিলেন?"

এই জ্যোৎস্না স্নাত রাত্রে বাইরের ছাদ এবং চিমনির ছায়ার দিকে তাকিয়ে আর এই অত্যুষ্ণ শুকনো ঘরে থাকা অসম্ভব বলে মনে হ'ল। এ সময়ে শূন্য লিফ্‌ট আমাকে নিয়ে মাটিতে নেমে গেল। বেয়ারা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে সেলাম জানাল। আমি পথে বেরিয়ে পড়লাম।

এই তবে পায়ে চলা পথ (আমার নরম গালচে পাতা করিডরের কথা মনে পড়ল); এই হচ্ছে চাঁদের আলো—একমাত্র মেঘই একে নির্ভয়ে দিতে পারে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে যে দুর্ভাগা শীতে কাঁপছে এবং ভাঙা গলায় আমাকে ডাকছে, সেও নিশ্চয় মানুষ। "চকমকি স্যার। চকমকি! এক প্যাকেট চকমকি!" আমি অন্ধকারে প্রসারিত হাতের মধ্যে ৬ পেনি ফেলে দেই; কিন্তু আঙুলগুলো আমার জামার হাতা টেনে ধরে। আমার চেনা একটি গলার স্বরঃ "ইয়োসেফ্!"

"পায়োটর!" আমি বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠি।

"এ কি সত্যই তুমি?"

"হাঁ ইয়োসেফ্, আর কেউ নয়।"

"কিন্তু এরকম জীবন—আমার আর যেতে ইচ্ছা করছে না। তোমার নীতির কথা স্মরণ করে আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাবো না দয়া করব—বুঝতে পারছি না। পায়োটর, তুমি কি এই বাস্তবতারই সন্ধান করছিলে—তুমি কি সুখী?"

সে মাথা নাড়ে। "এত কম সুখী আমি কখনও ছিলাম না। আমি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দুঃখী লোক। আমি যেসব নীতিতে শেষ পর্যন্ত সমর্থন করে যাব, সে সবের জন্যে একটা পটভূমিকা, একটা উপযুক্ত আবহাওয়া—অল্প কথায় অর্থ চাই। যেমন ধর, আমি যদি তোমার সঙ্গে স্থান বদল করতে পারতাম—"

"আমি তোমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।"

"ইয়োসেফ্!.........তুমি নিশ্চয়ই একথা বলছ না। এ শুধু কথার কথা বলছ......"

"আমি তোমাকে সব দিচ্ছি—ফ্ল্যাট, বন্ধু-বান্ধব, অ্যানা। তুমি বুঝছ? তুমি দেখবে যে টাকা আপনিই আসবে। তুমি যদি কাল সকালে আস, আমি তোমাকে সব দিয়ে দেব; আমি প্রথমে কয়েকটি জিনিস সংগ্রহ করতে চাই। দাঁড়াও, এখনই আমরা স্যুট বদল করে কাজ সুরু করি।"

"এখানে এবং এখনই? কিন্তু, ইয়োসেফ, এখন বড় শীত।"

"আমাকে ব্যর্থ করো না। এটা নতুন স্যুট, সেটা ভেবে দেখো। আর আমাকে ইয়োসেফ বলে ডেকো না। জে অক্ষর দিয়ে জোসেফ বল।"

আমরা দুজন অন্ধকারের মধ্যে পোষাক বদলালাম। চন্দ্রালোকে পদ-শব্দ, একটি পুলিশ এগিয়ে আসছে; আমরা স্তব্ধ হয়ে রইলাম, পায়োটর নত হয়ে জুতোর ফিতে লাগাচ্ছে, আমি এক পায়ের ট্রাউজার খুঁজছি। পুলিশটি আমাদের এদিকে তাকাল, কিছু দেখতে না পেয়ে চলে গেল।

আমরা ষড়যন্ত্রকারীর মত পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

"বিদায় তবে পায়োটর—আগামী কাল দেখা না হওয়া পর্যন্ত। অ্যানা বিস্মিত হয়ে যাবে। সে আমি তোমার জন্যেই রেখে দিলাম।"

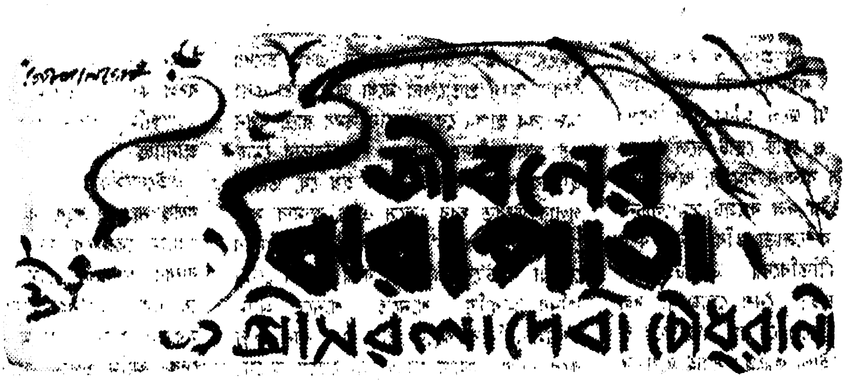
"বিদায় প্রিয় ইয়োসেফ্—"

"জোসেফ্।"

"মাপ কর ভাই!"

আমি নেতৃত্ব হারাণো কুকুরের মত বাসায় ফিরে চলেছি। আমি স্যুট ত্যাগ করেছি এবং সেই সঙ্গে মিথ্যা সম্মানও ছেড়েছি। পায়োটর (সেই পুরণো পায়োটর) নিশ্চয়ই ঠিক বলত! বাস্তবতার দিকে এগিয়ে চল। আমি দরজার ভিতর ঢুকলাম। বেয়ারাটি এখন তার ছোট কাচের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে, খবরের কাগজ দেখছে; সে মুখ তুলে চাইল, হাই তুলল—আবার পড়তে সুরু করল। নিম্নগামী পথের আরম্ভ। আমি পুনরায় জোসেফ্ হয়ে দাঁড়িয়েছি।

অনুবাদক—শ্রীগোপাল ভৌমিক



দিদি

দিদি—হিরন্ময়ীর স্মৃতি আমার মনে একটি সুবাসের মত ভরা আছে। যেমন হাসানুহানা গাছের কাছ দিয়ে গেলে সন্ধ্যাবেলা একটা সুবাস বয়ে আসে, যেমন যুঁই বেল ক্ষেতের হাওয়া ভোরের বেলায় একটি সুবাসস্নিগ্ধতা আনে—ঠিক তেমনি যেন। তাঁর রক্তচর্মের শরীরটি ছেড়ে ভিতরকার স্নেহভক্তি-প্রীতিময়তার সুবাসই তাঁকে আমার মনে জাগরূক রেখেছে।

কাশিয়াবাগানে এসে অবধি দিদিই আমাদের পরিবারের কর্ণধার হন। তাঁর আমাদের জন্মদিনের উৎসব প্রবর্তনের কথা বলেছি। অন্য অনেক রকমেও তিনি যেন বড় ছোট সকলের অভিভাবিকা হলেন। ভক্তি-প্রীতি-সেবায় তাঁর সহজ তৎপরতা রোজ দেখা দিতে লাগল। যেমন মায়ের প্রতি তেমনি বাবামশায়ের প্রতিও কি যত্ন ছিল তাঁর। একটা পুরানো চাকর—আমাদের ঠাকুরদাদার আমলের—একবার বাবামশায়ের কাছে কি লাগিয়ে দিদির সঙ্গে বাবামশায়ের একটু মনান্তর সাধন করে। দিদি জন্মে সেটা ভুলতে পারেন নি। বাবামশায়ের সঙ্গে মন-ভাঙ্গাভাঙ্গি? এতদূর ক্ষতি করা?

দিদির স্নেহে আমার মাতৃস্নেহের অভাব অনেকটা পূরণ হয়েছিল। আমার যখন যা সাধ হ'ত তাঁকে ধরলেই পেতুম। একবার জানালুম, রোজ সন্ধেবেলা একটি করে বেলফুলের মালা পেলে ভারি মন খুশি হয় আমার। অম্নি বাজার থেকে সেটা নিয়মমত আসার বন্দোবস্ত করে দিলেন দিদি। একবার জোড়াসাঁকোয় একটি মেয়ের গলায় একটি অভিনব প্যাটার্নের সুন্দর সোনার নেকলেস দেখে আমারও সখ হ'ল সেই রকম নেকলেস পরতে। কে দিলে স্যাক্‌রাকে দিয়ে গড়িয়ে ঠিক সেই রকম নেকলেস আমায়? মা নয়—দিদি। তখন তাঁর বিয়ে হয়েছে—নিজের সংসারের নিজে হর্তাকর্তা। যাকে যা খুশি দিতে পারেন, যেমন ইচ্ছে খরচ করতে পারেন।

দিদির বিয়ে হয় ষোল বৎসর বয়সে আমাদের পিসেমশায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সিমলার বাড়িতে থাকতেই ফণিদাদা পিসেমশায়ের সঙ্গে প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন। তখন থেকেই তাঁর দিদিকে বিয়ে করবার ইচ্ছা হয়। সেই অভিলাষ পূর্ণ করার জন্যে গিলক্রিস্ট স্কলারশিপের প্রচেষ্টায় কৃতকার্য হয়ে বিলেত যান। সেখান থেকে গভর্নমেন্টের এডুকেশন সার্ভিস নিয়ে এসে প্রথমে প্রেসিডেন্সী কলেজে বোটানির অধ্যাপক হন। তার পরে রাজসাহী ও হুগলী কলেজে বদ্‌লি হন। শেষজীবনে প্রেসিডেন্সী ও বর্ধমান ডিভিসনে ইন্সপেক্টর হন। যতদিন কলকাতায় ছিলেন দিদিরা কাশিয়াবাগানেই থাকতেন।

দাদামশায়ের নাতনিদের সবায়ের যেমন হয়, দিদিরও বিয়ে তেমনি হয়েছিল জোড়াসাঁকোর উপাসনার দালানে। আমরা সকলে সেই উপলক্ষে কাশিয়াবাগান থেকে জোড়াসাঁকোয় গিয়ে ছিলুম কিছুদিন ধরে। দিদির বিয়েতে দিদির পরম বন্ধু খুসী নিত-কনে হয়ে দিদির সঙ্গে সভায় গিয়ে বসেছিল। তখনো আমাদের বাড়ির মেয়েদের দালানে বিয়ের সভায় যাওয়া দস্তুর হয়নি। খুসী পরনে সবুজ রঙের পাৎলা বেনারসী। ঐ রঙটা তার পছন্দ। আমরা সবাই বল্লুম 'অন্য' রঙ পর, সবুজ রঙে তোমায় ভাল লাগে না।' সে বল্লে "আমার সবুজ রঙ ভাল লাগে, নাইবা সবুজ রঙে আমায় ভাল লাগল।" বাসরের আমোদ-উৎসবস্বরূপ রবিমামা 'বিবাহোৎসব' বলে একটি গীতি-নাটিকা রচনা করে অভিনয় করালেন দিদির সমবয়সী বা তাঁর চেয়ে কিছু বড় বোনেদের দিয়ে। এতে দিদির খুশিও ছিল। সরোজাদিদি তাতে ছিলেন নায়িকা—অন্যরা সব তাঁর সখী। দুজন পুরুষ ছিল, একজন নায়ক ও একজন তার আমুদে সখা। দীপুদাদার প্রথমা স্ত্রী দিনুর মা—সুশীলা বোঠান ও সুপ্রভাদিদি—এই দুজনে ঐ দুই পুরুষ সেজেছিলেন।

বিয়ের পর থেকে দিদির বাপ-মা ও ভাই-বোনের প্রীতি টান বিশেষ করে প্রকট হল। সব বিষয়ে মায়ের সাহচর্য করতে লাগলেন। সে সময় থিয়সফির খুব প্রচার। আমাদের বাড়িতে মহিলা-থিয়সফিক্যাল সভা হ'ত, তার প্রেসিডেণ্ট মা। যাঁদের স্বামী বা বাড়ির পুরুষেরা থিয়সফিস্ট, তাঁদেরই স্ত্রী ও বাড়ির মেয়েরা আসতেন। কলকাতার নানা পরিবারের মেয়েদের আনাগোনায় মায়ের সঙ্গে তাঁদের বেশ সখিত্বস্থাপন হল। মাদাম ব্লাভাট্‌স্কি ও কর্ণেল অল্‌কটের শুভাগমন ও প্রায়ই হ'তে থাকল আমাদের বাড়িতে। তাঁরা এসে মেয়েদের দীক্ষা দিতেন।

একদিন সবাই হলঘরে বসে আছেন। অল্‌কট সাহেব একটা কি কথা কইতে কইতে হঠাৎ উঠে সোঁ করে চলে গেলেন পাশের ঘরে। সেটা আমাদের ছেলেদের শোবার ঘর। দুই এক মিনিট সেখানে থেকে আবার হলঘরে ফিরে এলেন। সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল—কি ব্যাপার? অল্‌কট বল্লেন,—"মহাত্মা কুথোমির আবির্ভাব হয়েছিল ঐ ঘরে, তাঁকে একটা বার্তা দিতে এসেছিলেন। তাঁর ডাক পেয়ে অল্‌কট গিয়েছিলেন ঐ ঘরে। যা শোনাবার তা শুনিয়ে চলে গেছেন কুথোমি।" আমরা বিস্ময়ে আনন্দে শিউরে উঠলুম। আমাদের শোবার ঘর পবিত্র হয়ে গেছে মনে হল। মহাত্মা কুথোমি এসেছিলেন ঐ ঘরে? কি সৌভাগ্য আমাদের। আমি থিয়সফিতে দীক্ষা পাবার জন্যে আকুল হলুম। দিদি দীক্ষিত হয়েছেন, কিন্তু আমার বয়স কম বলে তখনও অনধিকার। আমি ভাবতে লাগলুম কবে বড় হব, কবে দীক্ষার অধিকার হবে! অল্‌কট সাহেব একদিন কুথোমির একখানি ছবি—অয়েল পেণ্টিং নিয়ে এলেন। ছবির চোখে একটি অসাধারণত্ব আছে বটে। সে চোখ তোমার বাহির-অন্তর ভেদ করে তোমাতে প্রবেশ করছে যেন। অনেকদিন ধরে সে চোখের দৃষ্টি আমায় haunt করত।

একবার সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে গিয়ে হঠাৎ আমার ঘাড়ে একটা মোচড় আসে,

ঘাড় তুলতে পারি না আর, বিছানা থেকে উঠতে পারি না। একটু নড়লে চড়লে ব্যথা হয় ভয়ানক। বাবামহাশয় অল্‌কট সাহেবকে আনালেন—তিনি মেস্‌মেরাইজ করে সারিয়ে দেবেন ব'লে। মেসমেরিস্ট বলে অল্‌কট সাহেবের বিশেষ খ্যাতি ছিল। তিনি এসে দুটো চারটে 'পাস' দিয়ে আমায় বল্লেন —'ওঠ!' আমি বল্লুম—'অসম্ভব। ঘাড় তুলতে পারছিনে, এপাশ-ওপাশ করতে পারছি নে, উঠব কি করে!' তিনি বল্লেন— 'পারবে। ওঠ' বলে আমার হাত ধরলেন। আমি ভয়ে ভয়ে মাথা তুলতে চেষ্টা করলুম— দেখলুম, আশ্চর্য—পারছি ত; ঘাড়ে লাগল না ত! আমার হাতে হাত রেখে অল্‌কট আমায় একেবারে উঠিয়ে বসালেন—ঘাড়ে তখন খট্‌ করে একটা শব্দ হল, এক মুহূর্তের জন্যে তীব্র ব্যথা বোধ হল, কিন্তু উঠতে পারলুম। অল্‌কট একটা গ্লাসে খানিকটা জল মন্ত্রপূত করে রেখে গেলেন, দুতিন ঘণ্টা অন্তর একটু একটু খেতে বল্লেন। তার পরদিন সন্ধেবেলায় আর একবার এলেন, বল্লেন—"ভাল হয়ে গেছ। দেখ কিছু ব্যথা নেই।" সত্যিই তাই দেখলুম। মেস্‌মেরিজমের উপর বাড়িশুদ্ধ সকলের শ্রদ্ধা খুব বেড়ে গেল। তখন থেকে মেসমেরিজমের নানারকম phenomena পরখ করার জন্যেও সকলের ভারি আগ্রহ হল। থিয়সফির সভায় যেসব মেয়েরা আসতেন, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন—ভবানীপুরের নবীন বাঁড়ুয্যের বোন বলে প্রখ্যাতা। তিনি সন্ন্যাসিনীর বেশ ধারণ করতেন। তাঁর একটি ভাইঝি সঙ্গে আসত, সে তার স্বামীকে ত্যাগ করেছিল, স্বামী তাকে চায়; কিন্তু সে স্বামীকে চায় না—সে চায় নির্বাণের পথে যেতে। এই পরিবারের সবাই অদ্ভুত। নবীন বাঁড়ুয্যের ছেলেটি মেসমেরিজমে সিদ্ধপুরুষ হয়ে গিয়েছিল। সে এক একদিন এসে তার কেরামতি দেখাত। একজন ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে আধঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্ন [illegible] দেখত, নিজের ইচ্ছামত উঠাত বসাত, হাসাত কাঁদাত। [illegible]

দিন [illegible] বোঠান [illegible] থিয়সফি- [illegible] সোসাইটির মেম্বর ছিলেন। একদিন আবিষ্কার হল যে তার ভিতরও মেসমেরিজম্‌ করার ক্ষমতা আছে। তাঁর একটি পালিতা, দাসীপুত্রী ছিল—নাম তার নির্মলা। তাকে তিনি মাঝে মাঝে মেসমেরাইজ করতে লাগলেন। বোঠান আড়াল থেকে [illegible] মিষ্টি যা কিছু খেতেন—ঘুমন্ত নির্মলার মুখে সেই স্বাদ আসত। এ বিষয়ে যাতে সে ঠকাতে না পারে, যা'তে মটকা মেরে পড়ে থেকে [illegible] না পায় কি [illegible] তাই [illegible] আমরা [illegible] সতর্কতা অবলম্বন করতুম। ঠকাবার উপায়ই ছিল না। সত্যি-

সত্যিই সে মেসমেরিক নিদ্রাগ্রস্ত অবস্থাতেই সব কিছু করত, বলত। বোঠান কোন কোন দিন তাকে আদেশ দিতেন—"হিমালয়ে চলে যাও, সেখান থেকে ঘুরে এস।" সে খানিকক্ষণ পরে যেন অত্যন্ত শীতার্ততা প্রকাশ করত। ক্রমে বাড়িশুদ্ধ সকলে বোঠানকে এই বশী-করণক্রিয়া থেকে নিরস্ত করতে লাগল। ইচ্ছাশক্তির এরূপ অযথা অপব্যয়ে নিজের শরীর দুর্বল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা।

মাদাম ব্লাভাটস্কির প্রতি শ্রদ্ধায় যখন মান্দ্য পড়ল, থিয়সফির দল ভঙ্গ হল, তখন থিয়সফির সূত্রেই যাঁদের সঙ্গে পরিচয় আরম্ভ হয়েছিল, সেই সব মহিলাদের নিয়ে 'সখি-সমিতি' নাম দিয়ে মা একটি সমিতি স্থাপন করলেন। 'সখি-সমিতি' নামটি রবি-মামার দেওয়া। কুমারী ও বিপন্না বিধবাদের বৃত্তি দিয়ে পড়ান, পড়া সাঙ্গ হলে তাদের শিক্ষয়িত্রীরূপে বেতন দিয়ে অন্তঃপুর-মহিলাদের শিক্ষার জন্যে নিযুক্ত করা, মফঃস্বলে ধর্ষিতা নারীদের জন্যে প্রয়োজন হলে উকিল ব্যারিস্টার নিযুক্ত করে মোকদ্দমা চালান, বাঙলার বিভিন্ন জেলা থেকে শিল্প সংগ্রহ করে মেলা করা, তাতে মেয়েদের দ্বারা অভিনয় করান প্রভৃতি নানা আয়োজনে 'সখি-সমিতি' বিখ্যাত হয়ে উঠল। 'মায়ার খেলা'র প্রথম অভিনয় 'সখি-সমিতি'তে হয়। সেবার দাদা ও সুরেন স্টেজ ম্যানেজার ছিলেন। মায়াকুমারীদের মাথায় অলক্ষ্য তারে বিজলীর আলো জ্বালান তাঁদের একটি বিশেষ কারিগরি ছিল। আর সবাই অতি ভয়ে ভয়ে ছিল—পাছে বিজলীর তার জ্বলে উঠে মায়াকুমারীদের shock লাগে! কিন্তু তাঁরা নতুন বৈজ্ঞানিক, নির্ভীক! আশুবাবুর বিয়ের বাসরেও তাঁরা মসলন্দের তলায় বিজলীর তার পেতে তাঁকে চমক দিয়ে দিয়ে ক্ষেপিয়ে তুলেছিলেন— জামাইবাবু স্থির হয়ে বসতেই পারছেন না—শ্যালীরা হেসে হেসে অস্থির। মেলাটি বেথুন স্কুলের চাতালে হয়। মেলা সুন্দর করে [illegible] স্টল ঘেরা প্রভৃতি সব কাজেই দাদাদের ব্যাপৃত থাকতে হয়েছিল, বহুদিন ধরে [illegible], তাতে তাঁর পড়ায় খুব অমনোযোগ হয়। [illegible]

আমাদের সংস্কৃতের [illegible] পণ্ডিত বলতেন,—মা, পড়ায় [illegible] করে ছেলেকে এই সব কাজে [illegible] মাথাটি খাচ্ছেন। সত্যি [illegible] ফেল করলেন। আমি [illegible] হয়ে গেলুম। আমরা সমান ক্লাসে [illegible] আমার চেয়ে এক ক্লাস [illegible] ছিলেন। পরের বছর এণ্ট্রান্স দেবার সময় [illegible] দাদার হল নিয়ম [illegible] আরও এক বছর [illegible] গেলেন। আমি সে বছর [illegible] তিনি [illegible] বছর দিলেন এণ্ট্রান্স। যাহোক সব [illegible] পাসিয়ে গেল যখন সেই বছর তাঁকে বিলেত পাঠান

হল, আর কয়েক বছর পরে তিনি সেখান থেকে সিভিল সার্ভিস পাশ হয়ে এলেন।

দিদির বিয়ের পূর্বে কাশিয়াবাগানে পাড়ার মেয়েদের জন্যে আমরা দুজনে মিলে একটা পাঠশালা খুলেছিলুম। দিদি হলেন প্রধানা শিক্ষয়িত্রী আমি হলুম তাঁর এসিস্ট্যাণ্ট। তখন তাঁর বয়স চোদ্দ পনের, আমার বয়স দশ এগারো। আমরা নিজেরা তখন দিনের বেলা বেথুন স্কুলে যাই, সকালে সন্ধ্যায় বাড়িতে সতীশ পণ্ডিতের কাছে স্কুলের পড়া তৈরি করি, সংস্কৃতের পণ্ডিতের কাছে সংস্কৃত, ওস্তাদ ও মেমের কাছে গান, সেতার ও পিয়ানো শিখি, আর ইস্কুল থেকে ফিরেই তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুয়ে কিছু খেয়ে নিয়ে সাড়ে চারটে থেকে সাড়ে ছটা পর্যন্ত দুই ঘণ্টা রীতিমত ইস্কুল চালাই। বাঙলা, ইংরেজি, অঙ্ক ও সেলাই—এই চারটি বিষয়ই শেখাতুম আমরা নিজে। প্রায় কুড়িটি মেয়ে আসত, কেউ কুমারী কেউ বা বাল-বিধবা। চাঁদনির সিঁড়ির উপর ধাপে ধাপে বসান হত তাদের ঠিক যেন কোন বড় ইস্কুলের গ্যালারীতে বসেছে। তারা যখন খিড়কির দুয়োর দিয়ে পুকুরে জল তোলার জন্য নিত্য আনাগোনা করত, তখনি তাদের দেখে আমাদের মনে তাদের জড় করে পড়ানোর কল্পনা উদয় হয়। সন্ধ্যের পূর্বে যোড়াসাঁকোর আত্মীয়দের প্রতিদিনই সমাগম হত। আমরা তাঁদের কারো কারো দ্বারা মেয়েদের পরীক্ষা গ্রহণ করাতুম—একবার রবি-মামার হাত দিয়ে প্রাইজ দেওয়ার সমারম্ভেরও ত্রুটি হয়নি। দিদির বিয়ের পর আমি কিছুকাল একলা সে স্কুল চালালুম। যখন আমার এণ্ট্রান্স পরীক্ষার দিন ঘনিয়ে এল, তখন সে স্কুল বন্ধ করতে হল।

উপর্যুপরি অনেকগুলি সন্তানবিয়োগ হয় দিদির। তাঁর হৃদয় স্নেহদানের জন্য বুভুক্ষিত ছিল। তিনি সখি-সমিতির আশ্রিত কোন কোন অনাথ বালিকাদের নিজের কাছে রেখে পালনের জন্য উন্মুখ হলেন। তারাই তাঁকে "মা" বলে। ঠিক নিজের মেয়ের মতো তাদের জন্যে সব করেন তিনি। এই সময় বরানগরে শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত বিধবাশ্রমের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। মায়ের প্রতিষ্ঠিত সখি-সমিতি যখন কাল-প্রভাবে ম্রিয়মান হয়ে পড়ল, তখন তাকে সঞ্জীবিত রাখার চেষ্টায় দিদি তাকে নাম ও আকারের নানা পরি-বর্তনের ভিতর দিয়ে চালিয়ে বর্তমান বিধবা শিল্পাশ্রমে পরিণত করলেন। এই শিল্পাশ্রমটি তাঁর একান্ত উদ্যম, বিপুল অধ্যবসায় অনেক দ্বন্দ্ব ও অনেক প্রীতি দিয়ে গড়া। তাঁর দেশসেবার অনুপ্রেরণা মাতৃভক্তি হতে এসেছিল; মাতার কীর্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে সখি-সমিতিকে কালোপযোগী রূপান্তর দেওয়ার প্রচেষ্টায়

বিধবা শিল্পাশ্রমের জন্ম। নিজের বলে' যা কিছু তার প্রতি তাঁর যেমন অনুরাগ, সেই নিজের কিছুটার বিরুদ্ধে যে কেউ এতটুকু হাত তুলতে আসছে বলে সন্দেহ হয়েছে, তাঁর তার প্রতি তেমন খরদৃষ্টি, তার বিরুদ্ধতা থেকে নিজেরটিকে বাঁচানর দৃঢ়তা। তাই প্রখরে-মধুরে মিশ্রিত ছিলেন দিদি। যারা তাঁর মাধুর্যের স্পর্শে এসেছে, তারা চিরমুগ্ধ, অন্যেরা চিরক্ষুব্ধ।

একবার মা যাচ্ছিলেন মেজমামার সঙ্গে কারোয়ারে। কতদিন ধরে তার জন্যে উদ্যোগ-আয়োজন চলছিল। বাড়িতে দর্জি বসে গিয়েছিল, মায়ের জন্যে নতুন নতুন কাপড় সেলাই চলছিল। সঙ্গে সঙ্গে দিদিরও দু-চারখানা হয়ে যাচ্ছিল। মা যাবার দুদিন আগে থেকে দিদির চোখে জল এল। মা তাঁর সঙ্গিনী ছিলেন—তাই মায়ের সঙ্গহীন দিনগুলোর কল্পনায় তাঁর চোখ জলে ভরল। আমার পক্ষে মা এ-বাড়ি থাকুন বা মেজ-মামার বাড়িতে কারোয়ারে গিয়ে থাকুন—কোন তফাৎই হয় না। তাঁর সঙ্গ আমি কখন পাইনে—দূরে দূরে ঝি-চাকর, পণ্ডিত মাস্টার, পড়াশুনার মধ্যেই থাকি। তাই তাঁর বিরহ-সম্ভাবনা আমার মনে কোন ঢেউ তুললে না। দিদি বিয়ের কয়েক বছর পরে নিজের বাড়ি চলে গেলে আমি একা যখন মায়ের কাছে থাকতে লাগলুম—দাদাও যখন বিলেতে, তখন থেকে মায়ের বেশী কাছাকাছি হলুম। সেদিন কিন্তু দিদির কান্নায় ও আমার চোখ শুকনো থাকায় প্রমাণ হয়ে গেল, আমি ভালবাসতে জানিনে। দিদিই খোঁটা দিলেন।

মার জন্যে সব করতে পারেন বলে' সকলের জন্যেই কি পারেন? তা নয়। মা ছাড়া অধিকাংশেরই প্রতি দিদি পরম উদাসীন। কলকাতায় যে বছর জুবেয়ার সাহেবের অনুষ্ঠিত প্রকাণ্ড প্রদর্শনী হয়—মা তাঁর 'বকুল-ফুল'কে তাতে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে দিদির কাছাকাছি থাকতে বলেন—দিদি ভাল করে সব দেখাতে শুনাতে পারবেন বলে'। এদিকে সে প্রদর্শনী এত বড়, আর তাতে চিত্তাকর্ষক এত কিছু দ্রষ্টব্য রয়েছে যে, সেসব ফেলে বকুল-ফুলকে গাধাবোটের মত টেনে বেড়ান তাঁর পক্ষে কতক্ষণ সম্ভব? দিদি আপন মনের বেগে এ-ঘর ও-ঘর এ আঙিনা ও আঙিনায় ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছেন। এদিকে হেঁটে হেঁটে বকুলফুলের পা ব্যথা হয়ে গেছে, মাঝে মাঝে বেঞ্চে বসে যে বিশ্রাম করে করে যেতে পারেন সে খেয়াল তাঁর মাথায় আসেনি। হঠাৎ আমাকে এক জায়গায় দেখতে পেয়ে ডাকতে আমি তাঁর কাছে গেলুম, আমার হাত ধরে ধরে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর অনুরোধে আমি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রইলুম। কিছু অসাধারণ কাজ করি নি, এ ছাড়া আর কিছু করা সম্ভবই ছিল না এ অবস্থায়। বাড়ি ফিরে গিয়ে বকুলফুল মার কাছে দিদির বিরুদ্ধে নালিশ আর আমার সম্বন্ধে তারিফ করলেন। উল্টো পুরাণ হল। আমি পেলুম ভীষণ লজ্জা—যেন দিদি ও মার কাছে অপরাধী! জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বকুলফুলের আমার প্রতি টান ও দিদির প্রতি মান যায়নি।

দিদির ভিতর নেতৃত্ব ভাব ছিল বলেছি—সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থাশক্তিও ছিল। তাঁর প্ল্যান করা, তাঁর দ্বারা "Conducted tour"এ ফণিদাদার কলেজের ছুটির সময় আমরা বছর বছর দেশভ্রমণে বেরোতে লাগলুম। ফণিদাদাকে টেনে হিঁচড়ে দিদিই নিয়ে যেতেন। যা-কিছু বন্দোবস্ত করার দিদিই করতেন—স্টেশনে স্টেশনে নামা, ব্রেক-ভ্যান থেকে লগেজ নামান, সঙ্গী চাকরকে দিয়ে খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় করা—এ সবেরই কর্তা দিদি। ফণিদাদা বড় স্টীমারে জোড়া ঢেউয়ে ঢেউয়ে ধাক্কা খাওয়া একখানা জলিবোটের মত বিরক্ত হয়ে গজর গজর করতে করতে চলতেন। শেষ গন্তব্যে পেঁছে থিতিয়ে বসে তবে স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচতেন। আমি দিদিকে ঝঞ্ঝাট পোহাবার কতকটা সাহায্য করতুম। দাদা বিলেত চলে যাওয়ায় আর বাবামহাশয় আমাদের সঙ্গে যেতে অনিচ্ছুক হওয়ায় মা ও আমি এই দুজনেই কেবল দিদিদের সহযাত্রী হতুম। আমাদের ছেড়ে কোথাও যেতে দিদির সুখই হত না।

দিদি "ভারতী"তে মাঝে মাঝে প্রবন্ধ লিখে মায়ের সাহায্য করতেন। মৌলিক প্রবন্ধ তিনি লিখতেন না, কিন্তু প্রয়োজনীয় সাময়িক তথ্যের ইংরেজি হতে অনুবাদ করে বাঙলা পাঠকের সহজসাধ্য করা তাঁর কাজ ছিল। তাঁর নিজস্ব মৌলিক রচনা ছিল কতকগুলি সনেট। যেমন কারো কারো গানের গলা মিষ্টি ও করুণ, অথচ সে বড় গাইয়ে নয়—তাঁর কবিতাগুলি ছিল সেই রকম সুমিষ্ট ও সকরুণ।

আমি যখন বি-এ পাশের পর মহীশূরে যাবার জন্যে ধরাধরি করলুম, আর অতি-কষ্টে বাবামহাশয়ের সম্মতি পেয়ে সেখানে যাত্রা করলুম, দিদির প্রাণের সৌরভ আমার জন্যে দুটি সনেটের আকারে 'ভারতী'তে বেরিয়ে আমার হাতে মহীশূরের প্রবাসে পেঁছল। দিদি কিন্তু আমাকে ছাড়ান দিলেন না—'ভারতী'র যুগ্ম-সম্পাদকের কাছে ফেলে আমাকে দূর থেকে বাঁধলেন ঘরের সঙ্গে।

তাঁর হৃদয়ের কোরকে যে মাতৃস্নেহ আত্মোৎসর্গের জন্যে নিজের ছেলেমেয়ের অপেক্ষা করছিল, তার চরিতার্থতা হল অনেক বছর পরে। জগতের কাছে তাঁর শেষ মূর্তি তাঁর 'মা' মূর্তি। তাঁর ঘর আলো-করা বুকে ভরা দুটি ছেলে ও একটি মেয়েকে রেখে তিনি অনন্তশয়নে গেলেন।

—ক্রমশ

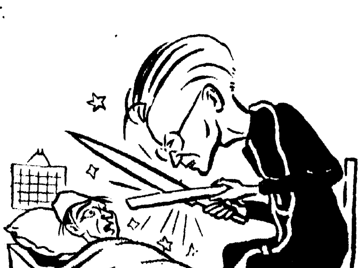
"আমরা মিথ্যাবাদী বলিয়াই ত এত ভীরু। এবং ভীরু বলিয়া, এমন মিথ্যাবাদী। আমরা ঘুসি মারিতে, লড়াই করিতে পারি না বলিয়া যে আমরা হীন, তাহা নহে,—স্পষ্ট করিয়া সত্য বলিতে পারি না বলিয়া আমরা এত হীন। আবশ্যক বা অনাবশ্যক মত মিথ্যা আমাদের গলায় বাধে না বলিয়াই আমরা এত হীন। সত্য জানিয়া আমরা সত্যানুষ্ঠান করিতে পারি না বলিয়াই আমরা এত হীন। পাছে সত্যের দ্বারা আমাদের তিলার্ধমাত্র অনিষ্ট হয়, এই ভয়েই আমরা মরিয়া আছি।"

—রবীন্দ্রনাথ

রাজস্ব সচিবের পদে একজন সুযোগ্য ভারতীয়কে নিয়োগ করিবার অনুরোধ জানাইয়া বণিক-সভা লাট সাহেবের নিকট একটি "তার" প্রেরণ করিয়াছেন। বিশু খুড়ো দন্তবিকাশ করিয়া বলিলেন—"টেলিগ্রাফ করার পয়সাটাই জলে গেল। খবরের কাগজে দেখিসনি বিদেশ থেকে ত্রুটিহীন বিলাতি আলু আমদানী হচ্ছে। এদেশের মাটিতে আমরা ত্রুটি-বিচ্যুতিহীন আলু গজাতে পারলাম না, অর্থসচিব তো মস্ত বড় কথা।" খুড়োর দিব্যদৃষ্টির তারিফ করিতে করিতে অর্থসচিবের সমস্যা ছাড়িয়া অতঃপর আলুর কথাই ভাবিতে লাগিলাম। আলু হয়ত আসিবে, কিন্তু সেই আলু কার পাতে কতটা পড়িবে, খবরটায় তার কোন নির্দেশ না থাকাতে আলুর আগমন ঘোষণায় কোন উৎসাহ বোধ করিলাম না।

* * *

হিন্দু মহাসভার বিলাসপুরের অধিবেশনে গৃহীত এক প্রস্তাবে পাকিস্থানী পরিকল্পনাকে Major Surgical operation-এর সঙ্গে তুলনা দেওয়া হইয়াছে এবং এই operation যে হিন্দুস্থানের পক্ষে মঙ্গলজনক নয় তাহা স্পষ্টাক্ষরেই ঘোষণা করা হইয়াছে। কিন্তু চিকিৎসক কায়েদে আজম এদিকে অস্ত্রোপচারের জন্য ছুরি শানাইয়া বসিয়া আছেন



সুতরাং বিলাসপুরের প্রস্তাব হয়ত কল্পনা বিলাসেই থাকিয়া গেল। তা ছাড়া বিনা-অস্ত্রে চিকিৎসায় রাজি হইলেও লীগপন্থীরা নিশ্চয়ই চাঁদসীর মলম ব্যবহারে রাজি হইবেন না, তার বদলে হাকিমী চিকিৎসাকেই সমর্থন করিবেন। এই চিকিৎসা সংকটে পড়িয়া হিন্দুস্থানের নাভিশ্বাস আর কতদিন থাকিবে সেই কথা ভাবিয়াই শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছি।

* * *

ট্রামে-বাসে

পাকিস্থান প্রসঙ্গে আরও একটি খবরের কথা মনে পড়িয়া গেল। সম্প্রতি জনৈক ব্যারিস্টার লণ্ডনে পাকিস্থান আন্দোলনের একটি শাখা কার্যালয় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে মহামান্য আগা খাঁর পৃষ্ঠপোষকতা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার নিকট একটি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতেও কায়েদে আজমের পক্ষ হইতে অনুরূপ এক পত্র নাকি মহামান্য আগা খাঁর নিকট পাঠানো হইয়াছিল। কিন্তু আগা খাঁ সাফ জবাব দিয়াছেন যে, তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখিতে অপারগ। ইহাতে লীগপন্থীরা গোসা করিবেন না। আগা খাঁর এই জবাবকে লীগ বিদ্বেষ বলিয়া যেন তাঁহারা ভুল না করেন। মোদ্দা কথা এই যে, রেসের হ্যাণ্ডিকোপ্ কষার পর তাঁর হাতে যে সময় থাকে—তা দিয়া কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়া তাঁর পক্ষে সত্যই সম্ভব নয়!

* * *

যে অতলান্তিক সনদ লইয়া এতদিন হৈচৈ আর এত ঢক্কা-নিনাদ করা হইয়াছে তাহা নাকি একটি বিরাট ফাক্কিকারি ছাড়া আর কিছুই নয়, কেননা—প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বলিয়াছেন সেই সনদে কেহই স্বাক্ষর করেন নাই। আর শুধু তাই নয়, স্বাক্ষরের জন্য কালিকলম পর্যন্ত নাকি ছিল না! বিস্ময়ে বাকশূন্য হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট আমেরিকাবাসী না হইয়া যদি স্বনামখ্যাত নওগাঁবাসী হইতেন তাহা হইলে বরং তাঁর এই বিবৃতির একটা অর্থ করা যাইত। কথাটা বিশু খুড়োকে বলিতেই তিনি আবার দেঁতো হাসি হাসিলেন এবং বলিলেন—"আমেরিকাতেও



Prohibition আইন বহুদিন উঠে গেছে!"

* * *

পশ্চিম রণাঙ্গনে যাঁহারা যুদ্ধ করিতেছেন—তাঁহারা যাহাতে অতঃপর রণক্ষেত্রের পশ্চাৎভাগে স্ত্রীদের সঙ্গে একত্রে ছুটি উপভোগ করিতে পারেন তাহার নাকি ব্যবস্থা হইতেছে। ভারতীয় সৈন্যদের এই অভূতপূর্ব সুযোগের কোন সুবিধা দেওয়া হইবে কিনা খবরটায় তেমন কোন ইঙ্গিত নাই। হয়ত হইবে না,



কেননা আমরা "পথি নারী বিবর্জিতা" নীতি অনুসরণ করি বলিয়া আমাদের সনাতন আদর্শে সমরকর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই হস্তক্ষেপ করিবেন না। সুতরাং "ওপার হতে বাজাও বাঁশী, এ-পার হতে শুনি, অভাগিয়া নারী হাম যে সাঁতার নাহি জানি" বলিয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জন ছাড়া দেশীয় সৈন্য-সহধর্মিণীদের অন্য পন্থা নাই!

* * *

বঙ্গীয় আইন পরিষদে রেশনিং অফিসের নারী ও পুরুষদের যৌথ ক্লাব সম্বন্ধে একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয় এবং ডাঃ সান্যাল কতকগুলি বিভ্রান্তকর প্রশ্ন করিতে থাকেন। কিন্তু তাঁহার প্রশ্ন শেষ হওয়ার আগেই ডেপুটি স্পীকার সভা ভঙ্গ করিয়া দেন। স্পীকারের এই ব্যবহারে অনেক কাগজেই বিক্ষোভ প্রকাশ করা হইয়াছে, কিন্তু আমরা বলি তিনি ন্যায্য কাজই করিয়াছেন। কেননা, নারী ও পুরুষ সম্বন্ধে প্রশ্নের মীমাংসা কোনদিনই হয় নাই। সুতরাং ডাঃ সান্যাল এই অবান্তর প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বৃথা সময়-ক্ষেপ না করিলেই পারিতেন। আর তাছাড়া নারীদের সম্বন্ধে আলোচনায় চক্ষুলজ্জা হওয়া যে স্বাভাবিক, স্পীকার মহোদয়ের কার্যে তারই প্রমাণ পাইলাম। ডাঃ সান্যালের দেখিতেছি চোখের চামড়া একেবারেই নাই!

ভগবানকে কহিলাম "প্রভু, এবারে এমন কতকগুলি অদ্ভুত বাণী আমাকে দিয়া দিন, যাহা পৃথিবীতে লইয়া গিয়া পৃথিবীর লোকগুলিকে বেশ ...একটু তাক লাগাইয়া দিতে পারি।"

ভগবান কহিলেন "বৎস, লোককে তাক্ লাগাইবার জন্য এমন অদ্ভুত বাণীর কোনো দরকার নাই যাহা তুমি জান না। সহজ সত্য কথা সহজ সত্যভাবে বলিও, তাহা হইলেই লোকে তাজ্জব বনিয়া যাইবে। তাক্ লাগাইবার ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায়।"

ভগবানের পরামর্শ শিরে ধারণ করিয়া পৃথিবীর পথে রওনা হইলাম। ঠিক এইখানটায় স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল।

* * *

স্বপ্ন ভাঙিয়া গেলেও স্বপ্নাদ্য ভগবৎ পরামর্শটি অনেক ক্ষেত্রেই কাজে লাগাইয়াছি এবং দেখিয়াছি উমর্ধটির কাজ করে। অতি সহজ কথা শুনিয়া শ্রোতারা মনে করিয়াছে মস্ত জটিল কথা বলিতেছি, এবং যে কথা নিতান্তই পুরাতন সে কথা শুনিয়াই ভাবিয়াছে "তাই তো, এ যে বড় নূতন নূতন কথা বলিতেছে দেখিতেছি!" ফলে যেখানে মোটেই অবাক হইবার কথা নয়, সেখানে শ্রোতারা অবাক হইয়া গিয়া আমাকে অবাক করিয়াছে।

* * *

সীমা ও অসীমের কথাই ধরুন না কেন, রবীন্দ্রনাথের "সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর" শুনিয়া অনেকেই ভাবিয়াছিলেন তাই তো! ...রবি ঠাকুর কি সব অদ্ভুত কথা বলিতে সুরু করিয়াছেন!" এবং তিনি নোবেল পুরস্কার পাইবার পরে অনেকেই এ কথাটি [illegible] করিয়াছেন। অথচ কথাটা অতি সহজ সত্য কথা, সহজ ভাষায় বলা, কিছু অদ্ভুত বা নূতন নহে। (দুনিয়ায় কিছুই হয়তো নূতন নাই। এমন কি Solomonএর "There is nothing new under the Sun." অর্থাৎ "সূর্যের নীচে কিছুই নূতন নাই" উক্তিটিও হয়তো নূতন নয়। এ বিষয়ে সুযোগ হইলে পরে আলোচনা করা যাইবে।)

* * *

সীমার মধ্যে অসীমের লীলার একটি ছোট উদাহরণ দিতেছি। কোনো ভাস্করের ভাস্কর্যশালায় একটি পাথরের খন্ডের কথা মনে করুন। আয়তনে সেটি সীমাবদ্ধ; কিন্তু ঐ সীমাবদ্ধ আয়তনের মধ্যেই ভাস্কর্যের যে সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে, তাহা সীমাবদ্ধ নহে। অসীম অতীতে যত অসংখ্য রকমের মুখ হইয়াছে, বর্তমানে যত মুখ আছে এবং সীমাহীন ভবিষ্যতে যে অসংখ্য প্রকার মুখের আবির্ভাব ঘটিবে, তাহাদের প্রত্যেকটি মুখই ঐ পাথরের খন্ডের মধ্যে রহিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেকটি মুখের উপরে রহিয়াছে বাড়তি পাথর; ঐ বাড়তি পাথরটুকু [illegible] চাঁছিয়া ফেলিয়া দিতে পারিলেই [illegible] পাওয়া যাইবে। ইহাই [illegible] সহজ কথা। [illegible] কিন্তু [illegible] জটিল [illegible]।

* * *

সঙ্গীত জগতে সাতটি মূল সুর এবং কড়ি ও কোমল মিলিয়া পাঁচটি বিকৃত সুর, মোট এই বারোটি অসীম সুরের মধ্যে রাগরাগিণীর কি অসীম সম্ভাবনাই না রহিয়াছে। আমাদের অনন্ত [illegible] প্রকাশের অসীম সম্ভাবনা [illegible] বর্ণমালার মধ্যে। [illegible] কি আমি যে সীমাবদ্ধ আমি, আমার [illegible]

[illegible]

পূর্বে অনন্ত যুগ ধরিয়া জীবনের যে অনন্ত প্রবাহ বহিয়া আসিয়াছে তাহার সহিত আমি নিবিড়ভাবে সম্বন্ধযুক্ত। [illegible]

* * *

এই প্রসঙ্গে মনে পড়িয়া গেল কয়েক বছর আগে একটি ইংরাজী মাসিক কাগজে (Scientific America) পরমাণু ভাঙার (splitting the atom) একটি ছবি দেখিয়াছিলাম। ছবিটি দেখিয়া মশা মারিতে কামান দাগার বিখ্যাত প্রবাদটির মুখ চূর্ণ হইয়া গেল। বন্ধু ধনপতি কহিল "ঐ দৈত্য-মার্কা যন্তোর দিয়ে পরমাণু ভাঙবে কি হে? ও দিয়ে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভাঙা যায়!" বৈজ্ঞানিক বন্ধু কহিল "পরমাণু দেখতে— অথবা না দেখতে—অত্যন্ত ছোট্ট হলেও ওর ক্ষমতা (energy) অসীম।" আমি অবৈজ্ঞানিক লোক, পরমাণুর ক্ষমতাটমতার কথা ভাল বুঝিলাম না, এখনো বুঝি না। কিন্তু এ কথাটা আমার মনে হইল যে, পরমাণু অতি ক্ষুদ্র এবং সীমাবদ্ধ হইলেও তাহার খণ্ডিত হইবার সম্ভাবনা অসীম। একটি পরমাণুকে টুকরা করিলে ঐ টুকরাগুলির প্রত্যেকটিকে আরো ছোট টুকরায় পরিণত করা যাইতে পারে। ঐ 'আরো ছোট' টুকরাগুলিকে আবার 'আরো-আরো ছোট' টুকরা করা চলে। এইভাবে ক্ষুদ্রকে ক্ষুদ্রতর করার কোন শেষ নাই। মানুষের পক্ষে এই অন্তহীন অভিযান অসম্ভব হইলেও ইহার গাণিতিক সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা তো যায় [illegible] সুতরাং দেখা গেল একটি পরমাণুর সীমার মধ্যেও ক্ষুদ্রতর খণ্ডে খণ্ডিত হইতে থাকিবার অসীম সম্ভাবনা রহিয়াছে।

* * *

একটু আগে বলিতেছিলাম, জগতে নূতন কিছু নাই। ধনপতি বলে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী বলার চেয়ে বরং রচনাবলীর রবীন্দ্রনাথ বলাটাই বেশী শুদ্ধ। শুনিয়াই আপনাদের [illegible] "আমার [illegible]" [illegible]

"গোঁফকে বলো তোমার আমার, গোঁফ কি
কারুর কেনা?
গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, তাই দিয়ে
যায় চেনা।"

ধনপতির মত এই যে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী বলিতে আমরা যাহাদের বুঝি, তাহারা নূতন কিছু নয়, রবীন্দ্রনাথের জন্মের পূর্বেও তাহারা ছিল—অশরীরী, অপ্রকাশিত বটে, কিন্তু ছিল। ধনপতির নিজস্ব ভাষায় "তারা সব ভাসছিলো অনন্ত শূন্যে রেডিয়োর অশরীরী সঙ্গীতের মতো। ধরা পড়লো তারা রবি ঠাকুরের মগজের রেডিয়ো-সেটে। রবি ঠাকুরের স-কলম হাত সেই মগজের [illegible] কাগজের [illegible]। তাই [illegible] বিশ্ব-[illegible] জন্মের ইতিহাস।" [illegible] মগজের রেডিয়ো-সেটে ধরা না পড়ে [illegible] মগজের রেডিয়ো-সেটে, তাহলে [illegible] রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলী বলে, তারাই [illegible]

ধনপতি-গ্রন্থাবলী। তোমার মগজ রেডিয়ো-সেটে [illegible] অরুব-[illegible] মনে করিয়া [illegible] ঐ একটু আপনারে [illegible] রবীন্দ্রনাথ [illegible] পারিলাম না। [illegible]

* *

পাগল ধনপতির বচন আরো খানিকটা উদ্ধৃত করিতেছি। "তাহলেই বুঝছো, রবি ঠাকুর আসলে রবীন্দ্র গ্রন্থাবলীর মূর্ত্তিমতী মন, প্রকাশক যন্ত্র। ও জিনিস প্রকাশ করতে পেরেছেন বলে [illegible] [illegible] রেডিয়ো-সেটটি ভগবান ও'র মগজে না দিয়ে তোমার মগজে দিয়ে দিলে বিশ্বকবি উনি না হয়ে তুমিই হতে।"

পাগলের কথা শুনিয়া হাসিও পাইল, রাগও হইল। কহিলাম, "তুমি তাহলে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা অস্বীকার করতে চাও? অর্থাৎ সোজা ভাষায় বলতে চাও প্রতিভা-টতিভা তাঁর কিস্সু ছিলো না?"

ধনপতি আমার উষ্মাকে স্মিতহাস্যে উড়াইয়া দিয়া কহিল, "প্রতিভা অস্বীকার করি নি, প্রতিভার স্বরূপটা বিশ্লেষণ করেছি মাত্র। ঐ যে রবীন্দ্রনাথের মগজে রেডিয়ো-সেটটি ছিলো, তোমার আমার যা ছিলো না এবং নেই, ঐটি হচ্ছে তাঁর প্রতিভা। তোমরা চোখ বুজে থাকতে ভালোবাসার দল, তোমাদের এই এক মস্ত দোষ, কোনো একটা জিনিস কেউ তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করলেই ভাবো—এই রে! লোকটা অবিশ্বাস করছে, ছুঁড়ে মেরে উড়িয়ে দিতে চাইছে। সেকেলে-পন্থী ধর্মবিলাসী ভাবদ-ভক্তেরা যেমন, ভক্তি-আফিমের নেশায় বুঁদ হয়ে যুক্তির দিকে পেছন ফিরে থাকতে ভালোবাসে, কেউ তাদের ভক্তির মুখ যুক্তির দিকে ঘুরিয়ে দিলে [illegible] [illegible] দেয়।"

* * * *

ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জন্যই বোধ করি ধনপতি আগের কথার জের টানিয়া বলিতে লাগিল, "ব্যাপারটা কি রকম জানো? নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কারের [illegible] [illegible] নিউটন আবিষ্কার করার [illegible] [illegible] হলো। নিউটন মাধ্যাকর্ষণ সৃষ্টি করেন নি, মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব সৃষ্টি করেন নি, প্রকাশ করেছিলেন মাত্র।......অথবা যেমন কুরী দম্পতি রেডিয়াম আবিষ্কার করার আগেও রেডিয়াম ছিলো। রেডিয়াম-উত্ত বাতাসে ভাসছিলো। কোনো মগজের রেডিয়ো-সেটে সাড়া জাগাবার জন্য। কুরী-দম্পতির মধ্য দিয়েই সে নিজেকে প্রকাশ করলো—এই হলো রেডিয়াম আবিষ্কারের ভেতরের কথা।......ইউক্লিডের জিওমেট্রি যে জিনিসকে বলো (যদিও জিওমেট্রির ইউক্লিড্ বলাই বেশী ঠিক) তা ইউক্লিডের আগে থেকেই ছিলো।........দরবারী কানাড়া, মিঞা কি মল্লার, মিঞা কি সারং আর মিঞা কি টোড়ী, এসব রাগগুলো মিঞা তানসেনের আগেই ছিলো; শুধু তান-সেনের মধ্য দিয়ে এদের প্রকাশ হলো আমাদের কাছে। এসব সোজা কথাগুলো তো আমি তোমায় [illegible] দেখালাম।"

কিন্তু ভাবিয়া দেখিবার আর সময় ছিল না, কারণ [illegible] করা ছিল এবং তখন প্রায় পৌনে [illegible]টা বাজিয়া গিয়াছে। [illegible]

আর্ট স্কুলের চিত্র প্রদর্শনী

এটি সপ্তদশ বার্ষিক প্রদর্শনী। গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলে প্রতি বছরই এই ভাবের প্রদর্শনী হয়। প্রতি বছরই স্কুলের সমুদয় ছাত্রছাত্রী, প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক সম্প্রদায় এই প্রদর্শনীকে চিত্রসম্ভারে সমৃদ্ধ করেন। প্রতি বছরই প্রদর্শনীতে জনসমাগম হয় এবং কাগজে কাগজে কিছু না কিছু লেখাও হয়ে থাকে।

কিন্তু প্রতি বছরের সঙ্গে ঠিক এ বছরের তুলনা হয় না। তুলনা হয় না অনেকগুলি কারণে। যে কোন দর্শক প্রথমেই সানন্দে স্বীকার করবেন যে, শুধু চিত্রের একমাত্র সংখ্যার দিক দিয়ে এ বারের প্রদর্শনী অন্যবারের থেকে সমৃদ্ধতর নয় চিত্রের উৎকর্ষের দিক দিয়ে অধিকতর সার্থক—একথা স্বীকার করতেই হয়। প্রায় প্রত্যেকটি ছবিই স্বতন্ত্র সমালোচনার দাবী রাখে। তৃতীয় কথা, এইবার কয়েকটি নতুন বিভাগের অবতারণা। যেমন 'রিলিফ ওয়ার্ক' ও 'পটারী বিভাগ'। 'পটারী' বিভাগটি নতুন হলেও প্রশংসনীয় হয়েছে। এ ছাড়া লিথো, এচিং ও উডকাট প্রণালীতে রচিত ছবিগুলি যে-কোনও প্রদর্শনীর পক্ষেই গৌরবের বিষয় বলতে হবে।

মোটামুটিভাবে এবারের প্রদর্শনীর বিশেষত্বের কারণ এগুলি হলেও লক্ষ্যণীয় বিষয় অনেক আছে। অত্যন্ত আশার কথা আর্ট স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা যেমন ক্রমেই বৃদ্ধির দিকে, চিত্র রচনার প্রতি ছাত্রছাত্রীর আন্তরিক আগ্রহ ও প্রেরণাও তেমনি যথেষ্ট বাড়ছে বলতে হবে। যুদ্ধের যে উন্মত্ত উত্তেজনাময় মুহূর্তে আমরা বাস করি, নিশ্চিন্ত হবার অবকাশ যখন দুর্লভ, নানা রকম আশঙ্কা ও আতঙ্ক যখন আমাদের মনকে গ্রাস করে আছে, চোরাবাজার, খাদ্য পরিস্থিতি ও নানা সংকটের দুর্যোগ যখন একজোটে আমাদের মাথার উপর ভেঙ্গে পড়ছে তখন চারুকলা চর্চায় ছাত্রছাত্রীদের এইরূপ প্রেরণা ও সাধনা সত্যই প্রশংসনীয় শুধু নয়—আনন্দের বিষয়। যে কোনও দুর্যোগ মুহূর্তে মানুষের স্রষ্টা মন নিষ্ক্রিয় থাকে না। শিল্পী সাহিত্যিকের পক্ষে একথা সমানভাবেই প্রযোজ্য। প্রদর্শনীর ছবিগুলি দেখলে মনে হয় না যে, ছাত্রছাত্রীদের মনঃসংযোগের পথে কোনও বাধা ছিল। তাদের শিল্পরচনায় উৎসাহের কোনও অভাব চোখে পড়ে না। আর্ট স্কুলের কর্তৃপক্ষও এ বিষয়ে কম উৎসাহী না হয়ে কৃতিত্বেরই পরিচয় দিয়েছেন।



সন্ধ্যার তালগাছ শিল্পী : সফিউদ্দীন আহমেদ

প্রদর্শনী সম্বন্ধে বলতে গেলে দুঃখের কথাই বেশী বলার থাকে। আজও আমাদের দেশে স্থায়ী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হল না। আজও আমাদের দেশে ছবিকে জাতীয় সম্পত্তির মর্যাদা দেওয়া হল না। আজও আমাদের দেশে ছবিকে কৃষ্টির সহজ সুন্দর বাহন হিসাবে গ্রহণ করা হয়নি। আজও আমাদের দেশে সাধারণের কাছে চারুকলাকে পৌঁছে দেবার ও তাদের কাছে চিত্রকে অনিবার্যরূপে প্রয়োজনীয় করে গড়ে তোলবার কোনও ব্যবস্থাই হয়নি। জাতির আত্মা চিত্রের বর্ণসুষমায় প্রতিফলিত হয়, একথা কথা হিসাবেই আমরা জানি, জাতি হিসাবে এর মূল্য দিইনি। শুধু স্বল্প সংখ্যক ধনীর বিলাস উপচার বা মিউজিয়ামের ঐতিহাসিক রেকর্ড হিসাবে ছবিকে অবরোধ করে রাখা অপরাধ, এটা আমরা মুখেই স্বীকার করি। অর্থবানের অভাব না থাকাতেও এখনও একটা স্থায়ী গ্যালারী হয়নি। চিত্রপ্রীতির অভাব না থাকলেও এখনও ক্রেতার সংখ্যা খুব বেশী নয়। সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের অভাব না থাকলেও ছবির সম্বন্ধে সামান্য লেখাই ছাপা হয়। অনেক অপ্রয়োজনীয় তত্ত্ব অনর্থক আলোচিত হলেও ছবি আঁকা বা ছবি দেখা বা ছবি কেনা বা ঐ ধরণের লেখা অলিখিত থেকে যায় বা ছাপা হয় না। সভ্যদেশে শুনি ছবিকে শিক্ষার বাহন হিসাবে ধরা হয়। রুচির ও সৌন্দর্য জ্ঞানের সহায়ক হিসাবে চিত্রকলার প্রভাব



কাশীর ঘাট শিল্পী : রমেশ দত্ত

কম নয় (aesthetic ও spiritual দিক ত আছেই) তাই সেখানে প্রদর্শনীর পর প্রদর্শনী বসে। যাতে বেশী ছবি বেশী লোক দেখে জাতীয় কল্যাণের তাগিদে লোকশিক্ষার আদর্শে। আবার এমন প্রদর্শনী আছে যা পাড়ায় পাড়ায় শহরের বাইরে দেশের পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে বেড়ায়। ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী বলে যাকে বলা হয়।

আমাদের দেশে এসব প্রসঙ্গ এক রকম অবান্তর বলতে হবে তবে বছরের মধ্যে একাধিক প্রদর্শনী করা আমার মনে হয় অসম্ভব নয়। এ বিষয়ে আর্ট স্কুলের কর্তব্য অনেক আছে। বৎসরে একটি বার্ষিক প্রদর্শনী শুধু না ক'রে আরও কয়েকটি করার ব্যবস্থা করা বোধ হয় শক্ত নয়। এক একটি প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের কাজ করার 'স্পীড্' অনেক বেড়ে যায়—কাজও বাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ছবি দেখার রুচি ও অভ্যাস বাড়ে সাধারণের। প্রদর্শনী কমিটির অবশ্য আর একটি জিনিসের দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার বলে আমার মনে হয় সেটি হচ্ছে 'পাব্লিসিটি'। বিজ্ঞাপনধর্মী যুগে এ জিনিসটি অপরিহার্য। এ বিষয়ে তাঁরা নির্বাক ও নিষ্ক্রিয় থাকলে প্রদর্শনীর সার্থকতা কমে যায়—শিল্পী ও শিল্পের পুরো মূল্যদান হয় না। আমি শুধু এই কথাই বলতে চাই যে, বেশী লোকের কাছে বড় করে একথা বলতে হবে। সাময়িক পত্রের সাহচর্য খুবই দরকার, তাঁদের এটি একটি দায়িত্ব বলে মেনে নেবার সময় এসেছে বলে মনে হয়। যে-কোন কন্‌ফারেন্স সম্বন্ধে তাঁরা পাতার পর পাতা ছেপে বাজারে ছাড়তে পারেন—এ স্বাধীনতা অবশ্য তাঁদের আছে। কিন্তু ছবি সম্বন্ধে পাতা সাজিয়ে একটা পুরো 'সাপ্লিমেণ্ট' না হোক দু'একটা পাতা খরচ যে বাজে খরচ হবে তা আমার মনে হয় না। লেখা যেমন একটা ভাববাহী মিডিয়াম, ছবিও ত তাই। বাঙলাদেশের একটি ভাল ল্যাণ্ডস্কেপ ছবি এক কলম বর্ণনার চেয়ে কি হিসাবে ছোট বুঝি না। আমার মনে হয় ছবিকে আমরা ঠিক মূল্য দিতে বোধ হয় এখনও শিখিনি।



ভুটিয়া রমণী
শিল্পী: কুমারী কমলা রায় চৌধুরী



গোয়ালিনী
শিল্পী: দেবকুমার রায় চৌধুরী



লক্ষ্মণ শিল্পী: বীরেন্দ্রনাথ দাস



বুদ্ধ ও সুজাতা (সিমেণ্টের কাজ) শিল্পী: কুমারী নমিতা লাহা

এতগুলি কথা সত্যই দুঃখের কথা। এর পরেও অবশ্য আশার কথা আছে। আস্তে আস্তে আমাদের দেশে ছবি বোঝার মত হৃদয়বৃত্তি জন্মাচ্ছে। ছবি সংগ্রহের প্রবৃত্তিও কিছু কিছু দেখা দিচ্ছে। রূঢ় বাস্তবের পিছনে ভাবসত্ত্বা বিশেষত যা চোখে ফুটে ওঠে এমন দৃষ্টিকেন্দ্রিক অনুভূতির যে নেশা আছে আমাদের সাধারণের মধ্যে তার কিছু কিছু প্রকাশ দেখা যাচ্ছে। আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছেই শুনলাম এ বছর ছবি বিক্রী বেশ ভাল হয়েছে। তুলনায় অন্য বছরের থেকে অনেক বেশী। অনেকে অবশ্য বলতে পারেন, "এখানেও ইনফ্লেশানের অত্যাচার।" একথা পুরো সত্য বলে আমার মনে হয় না।

এইবারে আমি ছাত্রছাত্রীদের সম্বন্ধে ও তাদের কাজের সম্বন্ধে কিছু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেব। প্রথমেই চোখে পড়ে কয়েকটি কৃতী ছাত্রছাত্রীর ছবি রচনা, পদ্ধতি (টেকনিক) ও বর্ণসম্পাতের দিক দিয়ে পাকা শিল্পীর হাতের কাজের স্তরে উঠেছে। তাদের কাজে সাহসের ও মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। জলরঙা ছবিতে বা তৈলচিত্রণে প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য।

মুরলি টালির 'আমার মা' পোর্ট্রেটটি অপূর্ব, উডকাটেও তার কৃতিত্ব বেশ পরিস্ফুট। কুমারী কমলা রায় চৌধুরীর 'ভুটিয়া নারী'র স্টাডি অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সুন্দর হয়েছে। কুমারী নমিতা সাহার সিমেণ্টের 'বুদ্ধ ও সুজাতা' প্রশংসনীয় সৃষ্টি সন্দেহ নেই—সিমেণ্ট কাস্টিং-এর একটি সার্থক নমুনা বলা যেতে পারে। রতন ঠাকুরের অনেকগুলি ভাল কাজের মধ্যে 'সর্দার' 'গণেশ' 'গুহা' সত্যই সুন্দর। সুপ্রভাত নন্দন, দেবকুমার রায় চৌধুরী, রবিন চন্দ, রণেন দত্ত, গৌরীশঙ্কর পাল মিসেস আইওলা মুখার্জির রচনাগুলি যথেষ্ট কৃতিত্বের দাবী করে। পটারীর কাজে কুমারী মৃদুলা রায়ের কারুদক্ষতা অপূর্ব। শিক্ষক শ্রেণীর মধ্যে সফীউদ্দিন আমেদের 'সন্ধ্যার তালগাছ' চিত্রটি মনোরম। আনওয়ারউল হকের ল্যাণ্ডস্কেপে নতুন ভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়। উডকাটে সত্যেন ঘোষাল, বাসুদেব রায়, আদিনাথ মুখার্জি, এস আমেদ প্রভৃতির অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য লিথো এবং অপূর্ব উডকাটের চিত্রগুলি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মুর্যাল পেণ্টিংএ বীরেন্দ্র দাস ও তিলক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর রচনাগুলি বর্ণবিন্যাসে সার্থক হয়েছে। এ ছাড়া পাকা শিল্পী-দেরও অনেকগুলি ছবি আছে। বি মজুম-দারের ল্যাণ্ডস্কেপ সত্যই মাধুর্যে তাঁরই উপযোগী। পূর্ণ চক্রবর্তী, সমর ঘোষ প্রভৃতি অনেক বিশিষ্ট শিল্পীর ছবিও প্রদর্শনীকে সমৃদ্ধ করেছে। সতীশ সিংহের ছবি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অধ্যক্ষ রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর অনেক-গুলি ছবি বিভিন্ন পদ্ধতির অঙ্কন-চাতুর্যে দর্শককে মুগ্ধ করে। বিশেষ করে 'হেনরী বর্ণ-এর কন্যা' ও 'সাঁওতাল জননী' প্রভৃতি কয়েকটি ছবি সত্যই অনবদ্য এবং তাঁর প্রতিভার পরিচায়ক।

শ্রীশৈল চক্রবর্তী



ভবী ভুলিবার নহে।

গভর্নমেন্ট এখন সাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বিতরণ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করছেন

মজুতদারি ও অতিলাভ নিবারণ আইনের জের টেনে সাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি-বিতরণ নিয়ন্ত্রণের আদেশ পাশ হয়। ১৯৪১ সালের জুলাই মাসে এই আদেশ আইনে পরিণত হয়। এই আদেশের উদ্দেশ্য এই যে কেবল দু'একটি বড় বন্দরে সব বিক্রি না হয়ে যেখানে প্রয়োজন বেশি দ্রব্যাদি যাতে সেখানেও পৌছায়।

এই আদেশ অনুসারে—

১। নির্দিষ্ট তালিকাভুক্ত জিনিসগুলির প্রত্যেক আমদানিকারক বিদেশ থেকে যে জিনিস আসবার সম্ভাবনা আছে অথবা এসে পৌছেচে সে জিনিস সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ সিভিল সাপ্লাইজ-এর কণ্ট্রোলার জেনারেলের কাছে দাখিল করতে বাধ্য।

২। কণ্ট্রোলার জেনারেলের অনুমতি বা নির্দেশ ছাড়া আমদানিকারক এই সব জিনিস বিক্রি করতে পারবেন না। মাল পৌছবার রিপোর্ট দাখিল করার ২১ দিনের মধ্যে কোনো নির্দেশ না পেলে বিক্রি করতে পারবেন।

৩। কেউ এদেশে নির্দিষ্ট তালিকাভুক্ত কোনো জিনিস প্রস্তুত করলে তাকে কণ্ট্রোলার জেনারেলের কাছে উৎপাদনের খরচের এস্টিমেট এবং বিতরণের নির্ধারিত ব্যবস্থার বিবরণ অবশ্য দাখিল করতে হবে।

৪। আভ্যন্তরীণ বিতরণের ব্যবস্থার জন্য কণ্ট্রোলার জেনারেল দেশের সর্বত্র এজেণ্ট নিয়োগ করবেন এবং এই সব জিনিস কেবল তাদের মারফতেই বিক্রি হতে পারবে।

কণ্ট্রোলার জেনারেলের ব্যাপক ক্ষমতা আছে। তিনি এই সংক্রান্ত ব্যবসা সম্পর্কে যে কোনো সংবাদ জানতে চাইলে তা জানাতে হবে এবং তিনি খাতাপত্র ও দলিলাদি পরীক্ষা করতে অথবা সে স্থান সার্চ করাতে পারবেন।

ঠিক বিতরণে ঘাটতি কমে

যুক্তপ্রদেশে মজুতদারি ও অতিলাভ

৮৭ জনের শাস্তি

লক্ষ্ণৌ, ১৭ই অক্টোবর—সেপ্টেম্বর মাসে যুক্তপ্রদেশের ৩২টি জেলায় মজুতদারি ও অতিলাভ (নিবারণ) আইন ভঙ্গ করা সম্পর্কে ১০৯টি মামলার বিচারে ৮৭টি মামলায় আসামীরা শাস্তি পায়। আটানব্বইটি নতুন মামলা দায়ের করা হয়।

সংবাদপত্রে এই ধরণের খবর পড়ুন। প্রতি সপ্তাহে আরও অনেক মজুতদার ও অতিলাভকারীদের সাজা হচ্ছে।

✱ নির্দিষ্ট তালিকায় এ পর্যন্ত ৩১টি জিনিস ধরা হয়েছে। সম্পূর্ণ তালিকাটি এই ঠিকানায় পাওয়া যাবে— ম্যানেজার অব পাব্লিকেশান্স্ সিভিল লাইন্স্, দিল্লী



HOARDING & PROFITEERING

HPPO

PREVENTION ORDINANCE

নিউ দিল্লী থেকে ডিপার্টমেণ্ট অব ইণ্ডাস্ট্রিজ অ্যাণ্ড সিভিল সাপ্লাইজ কর্তৃক প্রচারিত।

AAA 182১



ক্রিকেট

বাঙলা দেশে এই বৎসর ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মধ্যে শতাধিক রাণ করিবার প্রবল উত্তেজনা দেখা দিয়াছে। প্রতিদিনই প্রায় মাঠের খেলার ফলাফল অবলোকন করিলে দেখা যায় দুই কি ততোধিক খেলোয়াড় শতাধিক রাণ করিয়াছেন। ইহা খুবই আনন্দের বিষয়; তবে বোম্বাইয়ের খেলোয়াড়গণ দ্বিশতাধিক রাণের যেরূপ হিড়িক লাগাইয়াছেন, তাহাতে বাঙলা দেশের খেলোয়াড়গণ কিরূপে নিখিল ভারত দলে স্থান পাইবেন তাহাই চিন্তার বিষয়। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বোম্বাইর ক্রিকেট ষ্ট্যাণ্ডার্ড বাঙলা অপেক্ষা বহু উচ্চস্তরে। পূর্বেও ছিল এবং বর্তমানেও তাহা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বোম্বাইর খেলোয়াড়দের ইহার জন্য রীতিমত সাধনা করিতে হয় নিশ্চয়ই। বাঙলা দেশের খেলোয়াড়গণও সেই পথ অনুসরণ করুন। সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয় ইহা বলা বাহুল্য।

সম্প্রতি বোম্বাইর ব্রাবোর্ণ ষ্টেডিয়ামে রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার দুইটি নূতন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বোম্বাইর ক্রিকেট খেলোয়াড়গণই ইহা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইঁহারা একই ইনিংসে দুইজনে দ্বিশতাধিক রাণ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া এই দুইজন খেলোয়াড় তৃতীয় উইকেটের জুটিতে ৩৭৩ রাণ সংগ্রহ করিয়া নূতন রেকর্ড করিয়াছেন। ইহাকে সকল জুটির অতিক্রমকারী রাণ সংখ্যা বলিলেও অন্যায় হইবে না। বোম্বাইর খেলোয়াড় বিজয় মার্চেণ্ট ও আর এস মোদী এই দুইটি রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইঁহারা ধন্য। ইঁহাদের প্রচেষ্টায়



জে এম মেটা

আরও নূতন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হউক ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পশ্চিমাঞ্চলের সেমি ফাইন্যাল খেলায় বোম্বাই দল শোচনীয় ভাবে এক ইনিংস ও ৩১২ রাণে পশ্চিম ভারত রাজ্য দলকে পরাজিত করিয়াছেন। গত বৎসরের রণজি ক্রিকেট বিজয়ী পশ্চিম ভারত রাজ্য দলের এই শোচনীয় পরিণাম খুবই দুঃখের বিষয়। তবে এই দলে কয়েকজন বিশিষ্ট খেলোয়াড়কে খেলিতে দেখা যায় নাই। দল গত বৎসর অপেক্ষা যে অনেক শক্তিহীন ছিল ইহা সকলেই মানিয়া লইবেন। বোম্বাই দল এই খেলায় যেরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে আশা হয় পরবর্তী খেলায় শক্তিশালী বরোদা দলকে রীতিমত বেগ দিবেন। এই খেলাটি যে দর্শনযোগ্য হইবে বলাই বাহুল্য।

পশ্চিমাঞ্চলের সেমি ফাইন্যাল খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

পশ্চিম ভারত রাজ্য দল প্রথম ইনিংসঃ— ১৮৮ রাণ (শান্তিলাল গান্ধী ৮০, জয়ন্তীলাল ৪৬, ফাদকার ৫ রাণে ৬টি ও জে কোরে ৬৪ রাণে ২টি উইকেট পান)।

বোম্বাই দলের প্রথম ইনিংসঃ—৬ উইঃ ৫৯২ রাণ (বিজয় মার্চেণ্ট ২১৭, আর এস মোদী ২১০, কে সি ইব্রাহিম ৫৫, পালওয়ার ৬৬ রাণ নট আউট, নয়ালচাঁদ ১২৬ রাণে ৩টি উইকেট পান)।

পশ্চিম ভারত রাজ্য দল দ্বিতীয় ইনিংসঃ— ৯২ রাণ (পুরুষোত্তম ২১, তারাপোর ২০ রাণে ৫টি ও এম এন রায়জী ৪১ রাণে ৩টি উইকেট পান)।

টেনিস

টেনিস খেলায় বাঙালী খেলোয়াড় কোনদিনই ভারতের শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে নাই। দিলীপ বসু কিছু অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারও পতন আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। পূর্ব ভারত টেনিস প্রতিযোগিতায় তিনি পূর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। খসরু সেন ও নসু সেনেরও খেলা পড়িয়া গিয়াছে। ইহা খুবই পরিতাপের বিষয়। ইহাদের কাহারও বয়স এত অধিক হয় নাই, যাহাতে বলা চলে "খেলা পড়িয়া যাইবার বয়স হইয়াছে।" পূর্ব ভারত টেনিস প্রতিযোগিতায় জিম মেটা সিংগলস ও ডাবলস উভয় বিভাগেই সাফল্যলাভ করিয়াছেন। ইনি কয়েক বৎসর প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন নাই। ইহার বয়সও পূর্বোক্ত খেলোয়াড়দের সকলের চেয়ে বেশী। অথচ ইনি কেবল সাফল্যলাভ করেন নাই উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ভারতের শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড় বলিয়া অভিহিত ইফতিকার আমেদকে যে ভাবে পরাজিত করিয়াছিলেন, যাঁহাদের এই খেলা দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করিবেন "বিজয়ীর মত খেলিয়াছেন।" বাঙালী খেলোয়াড়গণ কবে ইহাদের মত অদম্য উৎসাহ, অপূর্ব দৃঢ়তার সহিত খেলিতে শিক্ষা করিবেন জানি না।

পূর্ব ভারত টেনিস প্রতিযোগিতায় এই বৎসর সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য করিয়াছে মহিলা বিভাগে কেহ যোগদান না করায়। কলিকাতার মাঠে বিভিন্ন ক্লাবে বহু মহিলাকেই টেনিস খেলিতে দেখা যায়। অথচ পরিচালকগণ ইহাদের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইলেন কেন বুঝি না।

পূর্ব ভারত টেনিস প্রতিযোগিতা নিখিল ভারতীয় অনুষ্ঠান। জিম মেটা সেই প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ করিয়া নিখিল ভারতীয় শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের মধ্যে গণ্য হইলেন। ইতিপূর্বে নিখিল ভারত কোন প্রতিযোগিতায় জিম মেটাকে মিক্সড ডাবলস ব্যতীত এইরূপ সাফল্য অর্জন করিতে দেখা যায় নাই। আমরা জিম মেটাকে অভিনন্দিত করিতেছি। নিম্নে পূর্ব ভারত টেনিস প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ—

সিংগলস ফাইন্যালঃ—জে এম মেটা ৬—৪, ৬—৪, ৬—৪ গেমে সুমন্ত মিশ্রকে পরাজিত করেন।

ডাবলস ফাইন্যালঃ—জে এম মেটা ও সুমন্ত মিশ্র ৬—৪, ১১—৯, ৬—৩ গেমে ইফতিকার আমেদ ও মানমোহনকে পরাজিত করেন।

এ্যাথলেটিকস্

বাঙলা দেশের উদীয়মান এ্যাথলীটদের মধ্যে উন্নততর নৈপুণ্য লাভের এক প্রবল ইচ্ছা দেখা দিয়াছে। ইহারা একত্র হইয়া এই জন্যই নাকি একটি ইউনিয়ন গঠন করিতেছেন। এই ইউনিয়নে বর্তমান অলিম্পিক এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ নাই। কেবল অভিজ্ঞ এ্যাথলীটদের লইয়া গঠিত হইয়াছে। এই ইউনিয়ন শিক্ষা, প্রতিযোগিতায় যোগদান ব্যবস্থা প্রভৃতি পরিচালনা করিবেন। এ্যাথলীটদের উপর কোন প্রতিযোগিতায় কোনরূপ অবিচার হইলে তাহার প্রতিবাদ ও বিহিত ব্যবস্থা করিবেন। সবেমাত্র একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে, সুতরাং এই সম্বন্ধে কোন মন্তব্য না করাই ভাল। তবে এই ইউনিয়নের পরিচালকগণের নিকট আমরা এইটুকু অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন বেঙ্গল অলিম্পিকের অনুরূপ কার্যদক্ষতার পরিচয় না দেন।



১৯৪৪ শেষ হ'য়ে গেল। চলচ্চিত্র ইতিহাসে এ সালটি খুব বেশী স্মরণীয়—ভারতীয় চিত্রশিল্পের প্রসারক্ষেত্র যে কত ব্যাপক হ'তে পারে এবং তার তুলনায় বর্তমান শিল্প যে কত সামান্য তার পাকাপোক্ত প্রমাণ পাওয়া গেল এই সালে। এর আগের পাঁচ বছরের তুলনায় ১৯৪৪ সালে ছবি অবশ্য সংখ্যায় কম উঠেছে কিন্তু অর্থাগম হ'য়েছে পাঁচ বছরের আয়ের যে সমষ্টি তার চেয়েও বেশী, খরচ পাঁচ বছর আগের চেয়ে পাঁচ গুণ বেশী হওয়া সত্ত্বেও। সরকারী লাইসেন্সের অনুপাতে ডিসেম্বর শেষে হওয়ার সঙ্গে অন্ততঃ দু'শখানি ছবি সমগ্র ভারতে যাবতীয় ভাষায় শেষ হবার কথা ছিল সে জায়গায় ১৮৫ খানির বেশী হ'য়ে ওঠেনি যার মধ্যে কলিকাতায় মুক্তিলাভ ক'রেছে মাত্র ৯৩ খানি, ১১ খানি বাঙলা ছবি নিয়েও। বাকী ছবি মুক্তিলাভ ক'রতে পারেনি চিত্রগৃহের অভাবে; বেশীর ভাগ ছবি একযোগে দুটো-তিনটে এবং বহু ক্ষেত্রে চারটে চিত্রগৃহে মুক্তি দিয়ে এইভাবে প্রদর্শনকাল সংক্ষিপ্ত ক'রে বেশী ছবি মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা ক'রেও কোন ফল পাওয়া যায়নি। ক'লকাতায় ৫২টি চিত্র-গৃহের মধ্যে অধিকাংশ ছবিঘরই প্রথম মুক্তিগৃহে পরিণত হ'য়ে যাওয়া সত্ত্বেও সমস্যার সমাধান হয়নি। দু'টো শ্রেষ্ঠ চিত্রগৃহ তো পূর্ব বৎসরে মুক্তি-প্রাপ্ত ছবি নিয়েই কাটিয়ে দিলে। এদের একটি হ'চ্ছে 'রূপবাণী'—'শহর থেকে দূরে'র সুবর্ণ জয়ন্তী ক'রতেই এবছরও শেষ হ'য়ে গেল এখানে; এটা অবশ্য বাঙলা চিত্র ইতিহাসের একটা মস্ত বড় ঘটনা, বাঙলা ছবির সুবর্ণ জয়ন্তী এই প্রথম বলেই নয়, প্রাদেশিক ছবি হওয়া সত্ত্বেও বাঙলা ছবি যে কি অপরিসীম জনপ্রিয়তা অর্জন ক'রতে পারে সে বিষয়েও চোখ খুলে দিয়েছে এ ছবিখানি, আর এ জনপ্রিয়তা শুধু কলকাতাতেই সীমাবধ্ধ ছিল না, সমগ্র বাঙলা দেশে প্রদর্শিত হয়ে এই এক বছরের মধ্যেই ছবিখানি টিকিট বিক্রী করিয়ে টাকা তুলেছে প্রায় বারো লাখ টাকা: অপর চিত্রগৃহটি হচ্ছে 'রক্সী', এখানে 'কিসমৎ' ছবিখানি এখনও চলেছে এবং মনে হয় শত সপ্তাহ উদ্‌যাপন অনায়াসেই হয়ে যাবে। এ বছরের সব ভাষায় ছবি মিলিয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে 'উদয়ের পথে'—কোন ছবি যে এত জনপ্রিয় হতে পারে, সকল শ্রেণীর এবং সকল বয়সের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে এমন সাড়া এনে দিতে পারে 'উদয়ের পথে'র আগে তা জানা যায়নি, না হিন্দী ছবি থেকে না কোন বাঙলা ছবি থেকে। বাঙলা দেশে যে কোন ভাষায় যে কোন ছবিরই জনপ্রিয়তাকে অনেক অনেক গুণ ছাপিয়ে গিয়েছে 'উদয়ের পথে'।

জনপ্রিয়তার মাত্রাহিসেবে 'উদয়ের পথে'র পর কোন গৌরবের আসনে বসবার মত আর বাঙলা ছবি এ বছরে আসেনি। তিনখানি হিন্দী ছবির রজতজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়েছে—প্রথম নিউ সিনেমাতে 'ওয়াপস' দ্বিতীয় হচ্ছে 'রাম রাজ্য' গণেশ টকীতে, আর অপরখানি ম্যাজেষ্টিকে 'বসন্ত'—শেষেরটির কৃতিত্ব এই যে,



নৃত্যশিল্পী গোপীনাথ ও থেঙ্কামণি

তৎপূর্ব বৎসর রক্সীতে সুবর্ণ জয়ন্তী সপ্তাহ পর্যন্ত প্রদর্শিত হয়েও দ্বিতীয়বার মুক্তিলাভ করে রজতজয়ন্তী উদ্‌যাপনে সমর্থ হয়েছে—এটাও একটা নতুন রেকর্ড। বাঙলা ছবির মধ্যে 'মাটির ঘর' ও 'সন্ধি' জনপ্রিয়তার দিক থেকে উল্লেখযোগ্য অবদান—প্রথম ছবিখানি রজতজয়ন্তী উদ্‌যাপন করেছে। এ বছর ছবির গড়পরতা প্রদর্শনকাল হচ্ছে ১২ সপ্তাহের একটু বেশীকাল।

ছবির ব্যবসা যে কি পরিমাণ ফেঁপে উঠেছে, কয়েকটি হিসেব থেকেই তা অনুমান করা যায়। 'কিসমৎ' ছবিখানি সমগ্র ভারতবর্ষে ৪০ লক্ষ টাকারও বেশী টিকিট বিক্রী করেছে: 'শকুন্তলা' এক বম্বেতেই মাত্র একটি চিত্রগৃহে বিক্রী করেছে ১০ লক্ষ টাকা—এখনও চলছে ছবিখানি শত সপ্তাহ উদ্‌যাপনের পথে, বম্বেতে 'রাম রাজ্য'ও এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে—'রামরাজ্য'র আর একটি রেকর্ড হচ্ছে যে, ছবিখানি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন বারোটি স্থানে জয়ন্তী পালনে সমর্থ হয়েছে। প্রথম সপ্তাহে বিক্রীত অর্থের রেকর্ড স্থাপন করেছে 'চল চলরে নওজোয়ান' বম্বের রক্সীতে ৩৩০০০৲ টাকা উঠিয়ে; এর পরের রেকর্ড ঐ চিত্রগৃহেই 'কাদম্বরীর' ৩২০০০৲ টাকা—বাঙলা ছবির মধ্যে নূতন রেকর্ড স্থাপন করেছে চিত্রায় 'উদয়ের পথে'।

ছবির দামের দিক থেকে রেকর্ড স্থাপন করেছে 'চল চলরে নওজোয়ান' সমগ্র ভারতের জন্য ১৮ লাখ টাকায় বিক্রীত হয়ে, এর পরই 'দ্রৌপদী' ১৩ লাখ। খরচার দিকেও রেকর্ড এই ছবি দু'খানিরই—যথাক্রমে ১২ ও সাড়ে ১০ লাখ করে। এ বছরে ছবির গড়পড়তা খরচা প্রায় আড়াই লাখে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। খরচ বেড়েচে জিনিসের মহার্ঘতার জন্যে যতটা না হোক, অভিনয়শিল্পীদের পারিশ্রমিকের জন্যে তার চতুর্গুণ। সবচেয়ে বেশী পারিশ্রমিক অশোককুমারের — 'হুমায়ুন' চিত্রে ছমাসের কড়ারে তিনি পাবেন ৮৫ হাজার টাকা; পৃথ্বীরাজ একখানা ছবির জন্য দাবী করেছিলেন দেড় লাখ, শেষ অবধি সে চুক্তি আর হতে পারেনি। এ বছরে সর্বাধিক পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত পরিচালক হচ্ছেন নীতিন বসু—ফিল্মিস্তানে একখানি ছবি তুলতে তিনি এক লাখ টাকা পাবেন। বাঙলায় পরিচালকদের মধ্যে সর্বাধিক পারিশ্রমিক নীতিন বোসেরই শিষ্য শৈলজানন্দের—'মানে-না-মানা'র জন্য তিনি পাবেন তিরিশ হাজার।

এবারে লাইসেন্স ব্যাপারের জন্যে প্রয়োজনা প্রতিষ্ঠান নতুন কয়েকটিমাত্র গড়ে উঠেছে, তাও অধিকাংশই নিষ্কর্মা বসে আছে। পরিবেশন প্রতিষ্ঠান খোলার বেশ হিড়িক দেখা গিয়েছে এবং সমগ্র ভারতে প্রায় পঞ্চাশটি নূতন পরিবেশক ব্যবসা আরম্ভ করেছে—ছবির দর বাড়ার এটাও একটা কারণ ছবির সংখ্যা বাড়েনি; কিন্তু নতুন পরিচালক অনেক এসেছেন এ বছরে। সবচেয়ে কীর্তিমান 'উদয়ের পথে'র পরিচালক বিমল রায়, আর বাকীরা হচ্ছেন ঃ ছবি বিশ্বাস (প্রতিকার), অপূর্ব মিত্র (সন্ধি), ধরমশী (হামারি বাত), ওয়ালি (লেডী ডাক্তার), মজনু (পাপী), কে বি লাল (লাল হভেলী), অধ্যাপক আত্রে (দিল কী বাত), কেশবরাও দাতে (মালি), আশু ব্যানার্জি (অল স্টার ট্রাজেডী), রবীন্দ্র দাভে (পুঁজী), মনু সেন (বিরিঞ্চী বাবা), সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায় (গোঁজামিল), শোর দৌলৎভী (পাথরোঁকা সদাগর), ভজহৎ মির্জা চাঙ্গেজী (শাহেনশা বাবর), চিমনলাল ত্রিবেদী (শরাফৎ), মণি ঘোষ (সন্ধ্যা), পণ্ডিত শিবকুমার (জমীন), জি আর দুরাণী (জুদাই), এইচ রাওয়েল (শুক্রিয়া) ও কিশোর শর্মা (ডাঃ কুমার)।

নূতন অভিনয়শিল্পী যাঁদের দেখা গিয়েছে তাঁরা হচ্ছেন ঃ নারগীশ (তকদীর), মৃদুলা (জোয়ার ভাঁটা), বিনতা বসু (উদয়ের পথে), বেবী মাধুরী (বিশ্বাস), সুমিত্রা (সন্ধি), বিজয়া দাস

(সন্ধ্যা), বর্‌ণা (প্রতিকার), জয়শ্রী (শকুন্তলা), পদ্মা ব্যানার্জি (আগে কদম), রঞ্জন (পর্‌লিশ), লতিকা (পরখ), দীলিপ-কুমার (জোয়ার ভাঁটা), বরকত মেহরা (পাপি), সর্‌শীলারাণী (দ্রৌপদী), বেগম পারা (চাঁদ), বেবী সরোজিনী (পর্বতপে অপনা ডেরা), বেবী শকুন্তলা (রাম শাস্ত্রী), বেবী নলিনী (মালি), নাজ শান্তি (লেডী ডাক্তার), বিমান ব্যানার্জি (সন্ধি), সাপ্রু (জমিন), বিপিন মর্‌খার্জি (শেষরক্ষা)।

চিত্রশিল্পের সংশিলষ্ট পরলোকগত ব্যক্তিরা হচ্ছেন ঃ ডি জি ফালকে (প্রথম ভারতীয় পর্‌ণ দৈর্ঘ চিত্রের নির্মাতা), কবি ও পরিচালক অজয় ভট্টাচার্য, পরিচালক হেমন্ত গর্‌প্ত (অভিসার ও সমাজ), পরেশ বসর্‌ (চারর্‌শিল্পী), হিমাংশর্‌ দত্ত সর্‌র-সাগর, শৈল দেবী, সর্‌রযোজক আমির আলি (নয়া তরাণা), পরিচালক হরসদ মেহতা (ঘর কী শোভা), সর্‌রযোজক আল্লা সাহেব মানকর, সর্‌রযোজক হরিপদ রায় ও প্রহ্লাদ।

চিত্র জগতের যাঁরা বিবাহ সর্‌ত্রে আবন্ধ হয়েছেন ঃ পরিচালক নীরেন্দ্র দেশাই ও নলিনী জয়ন্ত, পরিচালক কেদার শর্মা ও কমলা চ্যাটার্জি, করণ দেওয়ান ও মঞ্জর্‌লা, বসন্ত ঠেঙড়ী ও কুসর্‌ম দেশপাণ্ডে, পরিচালক বসন্ত যোগলেকর ও সর্‌মতী গর্‌প্তে, সর্‌বর্ণলতা ও পরিচালক পেশী বিলিমোরিয়া, কজ্জন ও কমল আমরোহী। তা ছাড়া মায়া ব্যানার্জি, প্রযোজক দলসর্‌খ পাঞ্চোলী, পরিচালক রবীন্দ্র দাভে, পরিচালক সর্‌নী, স্নেহপ্রভা, রমলা, ভারতভূষণ দেবী মর্‌খার্জি, নবীন যাজ্ঞিক, বাসন্তী প্রভৃতিও বিবাহিত হয়েছেন।

চিত্র প্রযোজনায় বাঙালী মহিলার আত্মনিয়োগ এ বছরের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা—প্রথম সম্মানের অধিকারিণী 'শেষরক্ষা'র প্রযোজক শ্রীমতী প্রতিভা শাসমল। এর পর শ্রীমতী কাননও চিত্র প্রযোজনায় হাত দিয়েছেন। ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রতি বিদেশীদের উৎসাহ বেড়ে যাওয়ার অনেক লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। বিলেতের ঈগল-লায়ন পিকচার্সের কর্ণধার ই টি কার ভারতে ছবি তোলা বিষয়ে জ্ঞান আহরণের জন্য একটা সফরও ক'রে গিয়েছেন। চিত্র নির্মাণে জ্ঞান আহরণ এবং প্রধানত আমেরিকান নবতম যন্ত্রপাতি আমদানীর উদ্দেশ্যে ভারতীয় প্রযোজকদের কেউ কেউ যর্‌ক্তরাষ্ট্রে গিয়েছেন। ত্রিবাঙ্কুর রাজ পরিষদ কর্তৃক চলচ্চিত্রকে সরকারীভাবে শিক্ষা বিতরণের অন্যতম উপাদান বলে স্বীকৃত হওয়া বছরের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কলকাতার সিনেমাগর্‌লিতে স্লাইড দেখানো বন্ধ ও বিরামকাল পাঁচ মিনিট বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও রর্‌পক কাহিনী অবলম্বনে ছবি তোলার দিকে এ বছর প্রযোজকদের বেশী ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ প্রগতিমর্‌লক বস্তু উপহার দিয়ে লোকের মন গড়ে তোলার এই যে সর্‌যোগ ছিল প্রযোজকরা তা গ্রাহ্যই আনছেন না। চিত্র সাংবাদিকরাও সব ঝিমিয়ে পড়েছেন, কাগজ নিয়ন্ত্রণ আদেশের জন্যে পত্র পত্রিকার কলেবর নিতান্তই সংক্ষিপ্ত হওয়ায় চিত্র সংবাদ কি সমালোচনা এক রকম উঠেই গেছে। বঙ্গীয় চলচ্চিত্র সাংবাদিক সঙ্ঘের বার্ষিক সম্মানপত্র বিতরণ উৎসবটি এবারে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হয়েছিল এবং এই অনর্‌ষ্ঠানের সংবাদ চিত্র নিউজ প্যেরেডের মারফতে সমগ্র ভারতে প্রদর্শিত হয়।

নূতন ও আগামী আকর্ষণ

এ সপ্তাহের একমাত্র মর্‌ক্তি হচ্ছে উত্তরা, পর্‌রবী, পর্‌র্ণ ও আলেয়াতে রঞ্জিৎ ফিল্মসের "বিষকন্যা", যার প্রধান ভূমিকায় আছেন সাধনা বসর্‌, সর্‌রেন্দ্র ও পৃথিরাজ। শহরের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ অবশ্য পর্‌রবীতে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলনীর অধিবেশন। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এই অধিবেশনটির উদ্বোধন করবেন—ভারতের বহর্‌ খ্যাতনামা গাইয়ে, বাজিয়ে ও নাচিয়ে এতে যোগদান করছেন। কালিকাতে সেভেন আর্ট সেণ্টারের নৃত্যনাট্য কামনা এবং শ্রীরঙ্গমে ৮ই থেকে ধীরেন ঘোষের উদ্যোগে নৃত্যানর্‌ষ্ঠানও অন্যতম আকর্ষণ।

* * *

আসছে সপ্তাহে মর্‌ক্তিলাভ করবে প্যারাডাইসে বাবর্‌রাও প্যাটের পরিচালিত ও সর্‌শীলারাণী অভিনীত 'দ্রৌপদী।' এর অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন চন্দ্রমোহন, ডেভিড কে এন সিং, মজহর খাঁ, বদরীপ্রসাদ প্রভৃতি। আরও দর্‌'খানি ছবি আসছে সপ্তাহে মর্‌ক্তিলাভ করার সম্ভাবনা রয়েছে। একখানি হ'চ্ছে মিনার্ভায় রমলা, ঈশ্বরলাল, মায়া ব্যানার্জি ও মর্‌বারক অভিনীত জয়ন্ত দেশাই প্রডাকসন্সের 'ললকার' আর অপরখানি হচ্ছে প্রভাত সিনেমায় মনোরমা ও জহর্‌র রাজা অভিনীত ক্যারাভান পিকচার্সের 'ভাই'।

বিবিধ

ইন্দ্রপর্‌রী স্টর্‌ডিওতে বম্বের সানরাইজ পিকচার্সের 'ঘর' নামক যে ছবিখানি তোলা হচ্ছে তার অন্যতম প্রধান ভূমিকাটিতে ইয়াকুব বম্বেতে অন্যান্য ছবির সঙ্গে জড়িত থাকায় এখানে তিনি তার অংশ অভিনয় করার দিনই শর্‌ধর্‌ আসবেন উড়ো জাহাজে আর সেই দিনই ফিরবেন—এইভাবে মাস তিনেক তাঁকে উড়ো জাহাজে আসা যাওয়া করতে হবে।

* * *

কলম্বিয়ার ছবি 'ইনভেডার' তুলতে খরচ হয় বিশ লাখ টাকা আর এক বছর প্রদর্শনের পর তার বিক্রয়লব্ধ অর্থ হ'চ্ছে প্রায় এক কোটি পাঁচ লক্ষ টাকা।

* * *

ফিল্মিস্তানে ছবি তুলতে পরিচালক নীতিন বসর্‌কে তার চিত্রকাহিনী ও চিত্রনাট্য প্রযোজক মর্‌খার্জিকে দিয়ে অনর্‌মোদন করিয়ে নেবার সর্ত আছে। প্রথম শ্রেণীর এক পরিচালককে এভাবে আর কখনও নতি স্বীকার ক'রতে শোনা যায়নি।

* * *

মিনার্ভার ঐতিহাসিক চিত্র ভিস্তি সাক্কাতে নায়িকার ভূমিকাভিনেত্রী মেহতাব যে অলঙ্কার ব্যবহার ক'রবেন তার দাম দর্‌লক্ষ টাকা।

* * *

১৯৩১ থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত ভারতীয় ছবি সেন্সার হ'য়েছে মোট ১৯৬৬ খানি; ঐ সময়ে বিদেশী ছবির সংখ্যা হ'চ্ছে ৪২৩০ খানি।

* * *

নির্মাতাদের সঙ্গে কোনরকম গোলযোগ হওয়ায় অভিনেত্রী সিতারা হরতাল সর্‌রর্‌ করে দিয়েছে যার ফলে 'ফর্‌ল'এর চিত্রগ্রহণ বন্ধ থাকতে বাধ্য হ'য়েছে।

* * *

'ডাঃ কোটনীশ' শেষ করে শান্তারাম 'ওমর খৈয়াম' তুলবেন। বহর্‌কাল ধরেই এ ছবিখানি তোলার সখ তাঁর।

* * *

গর্‌জরাটী পত্রিকা মহলের খবর যে ওখানকার ইস্টার্ন পিকচার্স 'গর্‌রর্‌দেব' নাম দিয়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনী অবলম্বনে একখানি ছবি তুলবে। 'বিবেকানন্দ' তোলার ঘোষণাও এরা ক'রেছে।

* * *

মাদ্রাজের চিত্র-সাংবাদিক লক্ষ্মীকান্তমকে নিহত করার অপরাধে নামী গায়ক-অভিনেতা ত্যাগরজ ভাগবতার ও এন এস কৃষ্ণণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

* * *

গত বড়দিনে গ্লোব থিয়েটারে হরেন ঘোষের উদ্যোগে ত্রিবাঙ্কুরের খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী গোপীনাথ ও তার স্ত্রী থঙ্কামণি তাদের কলালয়মের শিক্ষার্থী সমভিব্যাহারে একটি নাচের আসর বসিয়েছিলেন। ভারতীয় নৃত্যের গৌরবকে যারা বাড়িয়ে দিয়েছেন শ্রীগোপীনাথ তাদের অন্যতম এবং ভারতীয় নৃত্যের জাতটা যে আজও বজায় আছে তা এদের মত নৃত্যশিল্পীদেরই প্রচেষ্টাতে। নৃত্য ছন্দ ও সর্‌ন্দর ভাবভঙ্গীর দ্বারা বিস্ময়কর কারর্‌ কৌশলের পরিচয় দানে এ সম্প্রদায়ের কৃতিত্ব সত্যই অসাধারণ।



নব তারকা-বিস্ময়

সুশীলা রাণী

চিত্র-সৌন্দর্যের নূতন ধারা
প্রবর্তনে আসছে

দ্রৌপদী

চিত্রে আগামী ১২ই জানুয়ারী

প্যারাডাইসে

মাত্র ৪ সপ্তাহে যে ছবিতে লাখ টাকার কাছাকাছি টিকিট বিক্রয় হয়েছে—সে ছবি কেমন, তা দেখে এসে বলবেন সত্যি আর একবার দেখে আসবার মত কি না?
কোন্ সে ছবি? কেন সে ছবি বার বার লোকে দেখছে? কেন সহরময় তার নাম ছড়িয়ে পড়েছে?
এইসব প্রশ্নের মীমাংসা
সানরাইজ পিকচার্সের

মা বাপ :: মা বাপ

আপনার আমার ঘরে অহরহঃ
যা ঘটে থাকে, তারই সরস গল্প

—শ্রেষ্ঠাংশে—
বীণা — নাজির — ইয়াকুব — জগদীশ
দীক্ষিত — কল্যাণী — মির্জা মুশারফ্

সেন্ট্রাল ও প্যারামাউণ্ট

প্রত্যহ—৩টা, ৬টা ও ৯টায়
১২শ সপ্তাহেও ভীড় চলছে।
পরিবেশক—বাসন্তী ফিল্ম্

সিলেট ইনডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—সিলেট
কলিকাতা অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

পূর্ববঙ্গ ও আসামের প্রায় সকল বাণিজ্য-প্রধান কেন্দ্রে শাখা ও এজেন্সী আছে।

কার্যকরী তহবিল—১ কোটি টাকার উপর

প্রতিভা-সমুজ্জ্বল নবাগত
শিল্পিবৃন্দের অপূর্ব সমাবেশ!

—এন আই ষ্টুডিওর মিলনাত্মক চিত্র—

প ন ছী

শ্রেষ্ঠাংশেঃ—মনোরমা — আজমল
সহরে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে
অদ্য—৩টা, ৬টা ও রাত্রি ৯টায়

গণেশ ও পার্ক শো

—বোম্বে পিকচার রিলিজ—

সহরের সর্বশ্রেষ্ঠ ছবি
বোম্বে টকিজের
এ বছরের উজ্জ্বলতম অবদান

জোয়ার-ভাঁটা

—শ্রেষ্ঠাংশে—
সামীম — মৃদুলা — দিলীপ
—প্রদর্শিত হইতেছে—

জ্যোতি ও শ্রী

প্রত্যহ—২॥টা, ৫॥টা ও রাত্রি ৮॥টা
প্রত্যহ—৩টা, ৬টা ও রাত্রি ৯টা

ভোট গণনায় দেখা গেল
আত্রের প্রার্থীরই

দিল-কী-বাত

৪র্থ সপ্তাহ!
জয়জয়কার হইয়াছে
শ্রেষ্ঠাংশে ঃ
বনমালা, দুর্গা খোটে, দীক্ষিত ও ঈশ্বরলাল
দেখুনঃ

প্রভাত

বি, বি, ২৬৮৩
বেলা ৩টা, ৬টা ও রাত্রি ৯টায়

বর্ষশেষেও যে আনন্দের স্মৃতি অবিস্মরণীয় মাধুর্যে অক্ষয় হয়ে আছে অগণিত রসগ্রাহী দর্শকের মনে——
নববর্ষ সমাগমে
সেই অক্ষয় স্মৃতিকেই আবার নবরূপে নতুন করে জাগিয়ে তুলবে।
—চিত্ররূপার—

সন্ধি

প্রযোজনাঃ দেবকী বসু
পরিচালনাঃ অপূর্ব মিত্র
ভূমিকায়—সুমিত্রা, অহীন্দ্র, বিমান, ফণি রায়
৩৩শ সপ্তাহ!! প্রত্যহ—২॥, ৫॥, ৮॥টা

মিনার-বিজলী-ছবিঘর

—এসোসিয়েটেড ডিষ্ট্রিবিউটার্স রিলিজ—

মুক্তির প্রতীক্ষায় থাকুন—



এস·ডি·প্রোডাকসন্সের
নিবেদন—
পরিচালনা
চিত্ত বসু
রচনা· প্রেমেন্দ্র মিত্র
সঙ্গীত· রবীন চট্টোপাধ্যায়

কত·দূর

ভূমিকায়ঃ—শ্রীমতী মলিনা, জহর,
ধীরাজ, শৈলেন, প্রভা, পূর্ণিমা

কানন — ছবি বিশ্বাস
সম্মেলনে অপূর্ব একখানি আগামী চিত্র



বিচিত্র ভূমিকায়
কানন দেবী
ডিলুক্স পিকচার্সের নিবেদন

সংসার

রচনা ও পরিচালনা
প্রেমেন্দ্র মিত্র
সঙ্গীত: ধীরেন মিত্র, রবীন চট্টোপাধ্যায়

অন্যান্য ভূমিকায়ঃ
জহর, তুলসী লাহিড়ী, শ্রীমতী প্রভা, পূর্ণিমা

মনীষী রোম্যাঁ রোল্যাঁ

বিশ্ববিখ্যাত মনীষী রোম্যাঁ রোল্যাঁ ফ্রান্সের অন্তর্গত ইয়ন জিলার ভেজেল নামক স্থানে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৯ বৎসর হইয়াছিল। রোম্যাঁ রোল্যাঁ প্রবন্ধকার, সমালোচক এবং এক সময়ে সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি শান্তিবাদী ছিলেন। তিনি ১৯১৬ সালে সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাঁহার রচিত জীবনী সংগ্রহের মধ্যে মহাত্মা গান্ধীর জীবনী অন্যতম।

১৮৬৬ সালের ২৯শে জানুয়ারী রোম্যাঁ রোল্যাঁ বার্গান্ডির ক্লামেসি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। প্যারিসে তাঁহার ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়। ১৮৯৫ সালে তিনি সাহিত্যে 'ডক্টর' উপাধি লাভ করেন এবং অতঃপর পাঁচ বৎসর ইতিহাসের অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং তৎপর ৯ বৎসরকাল সংগীত কলার অধ্যাপক পদে কাজ করেন। বিগত মহাসমরের প্রথম সূত্রপাতে তিনি সুইজারল্যাণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং 'রেডক্রসের' কার্যে ব্রতী হন। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তিনি বিশ্বমৈত্রী প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। এই প্রচেষ্টার মূলে ছিল তাঁহার সুমহান আদর্শবাদের প্রেরণা। ফলে জার্মানীতেও তিনি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন এবং ফরাসী ও জার্মান জাতির মধ্যে আধ্যাত্ম যোগসূত্র প্রতিষ্ঠার নূতন আলোকরেখা উজ্জ্বল হইয়া উঠে। ১৯১৪ সাল হইতে মনীষী রোম্যাঁ রোল্যাঁ সুইজারল্যাণ্ডে প্রথমে জেনেভা এবং পরে মন্ট্রোর নিকটবর্তী ভিলেনভে স্থায়ীভাবে বাস করিতে আরম্ভ করেন। ইতিমধ্যে সংগীত সমালোচক হিসাবেও তাঁহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। গ্যেটে ও বিতোভেন সম্পর্কে তাঁহার সমালোচনামূলক পুস্তক বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিতোভেন মাইকেল এঞ্জেলো ও টলস্টয়ের মহান চরিত্র ও মানবপ্রীতি বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বিশ্ব-শ্রেষ্ঠ মনীষীত্রয়ের যে জীবনী রচনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রতিভার অপূর্ব অবদান। তবে শিল্পী ও স্রষ্টা হিসাবে নাটক রচনায়ই তিনি বিশেষ সাফল্য, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করেন। নাট্য-জগতেই তাঁহার সৃজনী-প্রতিভার চরম বিকাশ হয়। টলস্টয়ের ন্যায় রোম্যাঁ রোল্যাঁরও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, শিল্প ও সাহিত্য সাধনার চরম ও পরম উদ্দেশ্য হইতেছে নির্যাতিত মানবতার দুঃখভার লাঘব করা। এই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া তিনি গণনাট্য প্রবর্তনে উদ্যোগী হন; কিন্তু ইহার পশ্চাতে জনসাধারণের সহানুভূতি ও সমর্থন না থাকায় এই প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ঔপন্যাসিক হিসাবেই মনীষী রোম্যাঁ রোল্যাঁ বিশ্ববিখ্যাত হন; বিশ্বসাহিত্যের বিরাট দরবারে গৌরবমণ্ডিত আসন লাভ করেন। তিনি সাধারণ শ্রেণীর পাঠক সমাজের জন্য উপন্যাস লেখেন নাই। তিনি দার্শনিকের অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি লইয়া মানবজীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবলী ও মানবাত্মার গূঢ়তম রহস্য বিশ্লেষণ করিয়া একটা মহত্তর সত্যের সন্ধান দিয়াছেন। তাঁহার রচিত বিশ্ববিখ্যাত বিরাট উপন্যাস 'দ্যাঁ ক্রিস্তপ' ইহার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। ১৯০৪ সাল হইতে ১৯১২ সাল পর্যন্ত এই উপন্যাসখানি ধারাবাহিকভাবে একটি ফরাসী পাক্ষিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।



পুস্তকখানি ১০ খণ্ডে সম্পূর্ণ হয়। এই পুস্তকখানি লিখিয়াই তিনি সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার পান। পুস্তকখানির খ্যাতি সমগ্র জগতে ছড়াইয়া পড়ে এবং সংগে সংগে উহা রুশ, জার্মান, ইংরাজী, পোলিশ, স্পেনীশ ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়। মানুষের সৃজনী-প্রতিভা নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়াও কিরূপে উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে দুঃখ-দ্বন্দ্বের নির্মম সংঘাতের মধ্যে সৃষ্টির আনন্দ কিরূপে শতদলের মতো স্তরে স্তরে বিকশিত হয়—সত্যের নূতন আলোকপাতে দৃষ্টিভঙ্গী কিরূপে সম্প্রসারিত হয়, বিতোভেন ও নিজের জীবনের পটভূমিকায় লিখিত পুস্তকখানিতে নিপুণ তুলিকাস্পর্শে তিনি তাহাই রূপায়িত করিয়াছেন। যুদ্ধের ধ্বংসলীলার মধ্যেও দুইটি তরুণ হৃদয়ের ভালবাসার করুণ কাহিনী সম্বলিত 'পিয়ের লুস' (১৯২০) নামক পুস্তকখানিও পাঠকসমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। রোম্যাঁ রোল্যাঁর প্রভাবে ফ্রান্সে এক নবযুগের সূচনা হয়—অধ্যাত্মজীবনের নবজন্ম হয়। 'জ্যাঁ ক্রিস্তপ'এর মধ্য দিয়া তিনি যে আদর্শ প্রচার করিয়াছেন, তাহা শুধু ইউরোপে নহে পরন্তু আমেরিকা, চীন, জাপান ও ভারতের জনগণ মুগ্ধচিত্তে তাঁহাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে। বিগত মহাসমরের পর মনীষী রোম্যাঁ রোল্যাঁ 'মহাত্মা গান্ধী'র জীবনী (১৯২৩) প্রকাশ করায় এবং প্রাচ্য-প্রতীচ্যের ভাবধারার সমন্বয় সাধনের দৃঢ় মত প্রকাশ করায় পুনরায় সমগ্র জগতের দৃষ্টি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া তিনি মহাত্মা গান্ধী, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ এবং ব্রাহ্ম ধর্ম ও খৃষ্ট ধর্মের তুলনামূলক একখানি পুস্তক রচনা করেন। 'মহাত্মা গান্ধী'র জীবনী প্রকাশের পর তিনি ১৯৩০ সালে 'ধ্যানী ভারত' শীর্ষক নিবন্ধমালার পর্যায়-ভুক্ত পরবর্তী পুস্তক তিনখানি প্রকাশ করেন। নোবেল পুরস্কার দিবার সময় বিশেষভাবে গভীর মানবপ্রীতি ও ভাব-প্রবণতা ও মহৎ আদর্শের কথা উল্লেখ করা হয়।

আমরা পরাধীন ভারতবাসী, অন্য দিক হইতে রোলাঁর সংগে আমাদের সম্পর্ক ছিল। তিনি ভারতবর্ষকে আন্তরিক শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন। ভারতের অধ্যাত্ম সাধনা শান্তিকামী রোলাঁর চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং এই দিক হইতে ভারতের চিন্তানায়ক ও মনীষী এবং মহাপুরুষদের সংগে রোলাঁর আধ্যাত্মিক সংযোগ সূত্র স্থাপিত হয়। ১৯২৩ সালে রোলাঁর লিখিত মহাত্মা গান্ধীর জীবনী প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি মহাত্মাজীর অবলম্বিত নিরুপদ্রব অহিংসা নীতির সমর্থন করাতে জগতে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্ম সাধনাও রোলাঁকে আকৃষ্ট করিয়াছিল; রবীন্দ্রনাথেরও তিনি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। ইউরোপে রোলাঁর সঙ্গে রবীন্দ্র-নাথের যখন সাক্ষাৎ ঘটে, তখন তিনি তাঁহাকে বিবেকানন্দের গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করতে অনুরোধ করেন। রোলাঁ তদনুযায়ী বিবেকানন্দের এবং রামকৃষ্ণের বাণীসমূহ পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হন। ইহার পর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামীজীর সম্বন্ধে রোলাঁর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। রোলাঁ পরলোকগমন করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার টলস্টয়, হুগো, ইমার্সন প্রভৃতি মনীষীর ন্যায় তাঁহার স্মৃতি ভারতবাসীর নিকট পূজিত হইবে। পরাধীন মানব সমাজ এই উদারচেতা মানব স্বাধীনতার উপাসক মহা-মানবের কথা কোন দিন বিস্মৃত হইবে না।

যুদ্ধের প্রসঙ্গ

১৯৪৪ সাল শেষ হয়ে গেল। নববর্ষের প্রারম্ভে বিগত বৎসরের হিসাবনিকাশ নেওয়ার একটা রীতি আছে। আজ সালতামামি করতে বসে দুঃখবেদনা, অপমান-লজ্জা, অক্ষমতা আর ব্যর্থতার যে তালিকা একে একে চোখের সম্মুখে ভেসে উঠছে, তাতে অপরের প্রতি যাই হোক, নিজেদের প্রতি ধিক্কারেই মন লজ্জাহত হয়ে পড়ছে। যুদ্ধের সুযোগে ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের অসহনীয় উপেক্ষা, স্পর্ধা ও প্রশ্রয়ে দেশের মধ্যে যে রোগ, দারিদ্র্য, অশিক্ষা আর অনাচারের সৃষ্টি হয়েছে, তাতে মনে যতই জ্বালার সৃষ্টি করুক, জাতি হিসাবে আমরা নিজেরাই যে সুষ্ঠুভাবে এমন কি সাধারণভাবেও স্বজাতির প্রতি কর্তব্য পালন করতে পারিনি, সেকথা আমাদের পক্ষে আরও বেশী গ্লানিকর হয়ে রয়েছে। দেশের আস্থাভাজন শ্রদ্ধেয় নেতারা যখন কারাগারে অবরুদ্ধ, তখন আমলাতন্ত্রী গভর্নমেণ্টের ভারতরক্ষা আইনের নাগপাশ ও সুবিধাবাদীদের বিভ্রান্তিকর কার্যকলাপ দেশের মধ্যে এক অতি অসুস্থ আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে। অসংখ্য লাঞ্ছনায় বিপর্যস্ত জাতির মধ্যে যেটুকু প্রাণশক্তি অবশিষ্ট আছে, তাকেও নিঃশেষে মুছে ফেলার দেশব্যাপী এক অতি হীন ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত চলেছে। মানুষের মত বাঁচবার দাবী দেশের মানুষের কণ্ঠে যাতে ধ্বনিত হয়ে না ওঠে, তজ্জন্য কুযুক্তি ও বড় বড় ফাঁকা কথার ধাঁধা মানুষের সহজ বুদ্ধি ও স্বচ্ছ দৃষ্টিকে ঘুলিয়ে দিচ্ছে। বাক্যের ধূলো, ছদ্মবেশী বন্ধুত্বের বিশ্বাসঘাতকতা আর মতবাদের কুয়াসায় রুদ্ধশ্বাস জনসাধারণ প্রকৃত পথের সন্ধান করছে। সে পথের সন্ধান যাঁরা দিতে পারেন, সাম্রাজ্যবাদী সতর্কতা তাঁদের জনসাধারণের কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছে। সত্যকার পথের নির্দেশ দেশবাসী যখন পাবে, তখন আজকার চরম দুঃসময়ে যারা তাদের ক্লৈব্য ও দীনত্বের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের নিশ্চয়ই তারা ক্ষমা করবে না। এই পটভূমিকার মধ্য থেকে যে তথ্যটি সব থেকে রূঢ় মূর্তিতে প্রকটিত হচ্ছে, তা হল এই, প্রত্যক্ষভাবে ভারতবর্ষ বর্তমানে যুদ্ধক্ষেত্র না হলেও যুদ্ধের আনুষঙ্গিক সমস্ত রকমের দুর্ভোগ ভারতবর্ষেই এসে পুঞ্জীভূত হয়েছে। এ পরিহাস কার?

নিজের দেশের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে যদি পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি দেওয়া যায়, তাহলেও কোন আলোর রশ্মি আমাদের মনকে উদ্ভাসিত করে না। যুদ্ধের প্রারম্ভে যে সব আশার বাণী, মনোরম স্বপ্ন মানুষের মনকে পুলকিত করেছিল, আটলাণ্টিক সনদের পরিণতি, গ্রীসে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী রূপ, আর দীর্ঘকাল যুদ্ধের পরেও পরাধীন জাতিদের ভাগ্য সম্বন্ধে মিত্রশক্তির অনিশ্চিত বাক্যজাল সে পুলকের শেষ স্পন্দনটুকু পর্যন্ত মানুষের মন থেকে মুছে দিতে বসেছে। মানুষের আর্তপ্রাণ আজ সব কথা ভুলে গিয়ে চাচ্ছে শুধু যুদ্ধের পরিসমাপ্তি।

১৯৪৪ সালের মধ্যে ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হবে এবং তারপরে কমবেশী বৎসর কালের মধ্যে হবে প্রাচ্যের যুদ্ধ বিরতি—দায়িত্বশীল রাষ্ট্র ধুরন্ধরেরা দৃঢ় কণ্ঠেই একথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু ১৯৪৪ সাল শেষ হয়েও ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হয়নি, ১৯৪৫ সাল তার যে জের টেনে আরম্ভ হয়েছে, তাতে এ বছরেও ইউরোপের যুদ্ধ শেষ হবে কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কারণ আছে।

সম্প্রতি জার্মানি ইউরোপের পশ্চিম রণাঙ্গনে যে পুনরাক্রমণ আরম্ভ করেছে, তার ফলাফল এখনও অনিশ্চিত। কিন্তু মিত্রপক্ষের সমরব্যবস্থা যে তাতে বেশ খানিকটা পর্যুদস্ত হয়েছে এবং যুদ্ধ সমাপ্তির কালও যে তাতে অনিবার্যভাবেই খানিকটা পিছিয়ে পড়বে, তাতে বোধ হয় সন্দেহ নেই।

জার্মানেরা যেভাবে অগ্রসর হয়েছে, তাতে মনে হয়, তাদের উদ্দেশ্য মিউজ নদীর তীরে পৌঁছানো এবং ঐ নদী তীরে অবস্থিত লীজ, নামুর ও সেডান—এই তিনটি প্রধান যাতায়াতকেন্দ্র দখল করা। বর্তমানে স্তাভেলট ও বাস্তোনে অঞ্চলে যে যুদ্ধ চলেছে এবং বাস্তোনে থেকে হোফালিসের মধ্য দিয়ে লীজ শহরাভিমুখী রাস্তা দখলের জন্য যে প্রচণ্ড সংগ্রাম হচ্ছে, তাতে এই কথাই মনে হয়। রকেফোর্টও জার্মানেরা অধিকার করেছিল। কিন্তু রয়টার সংবাদ দিয়েছেন, আমেরিকান ১ম আর্মি পুনরায় তা দখল করেছে। নাৎসীদের অগ্রগতি এখন খুব দ্রুত না হলেও আক্রমণের প্রচণ্ডতা বিশেষ হ্রাস পেয়েছে বলে মনে হয় না।

পূর্ব রণাঙ্গনের যুদ্ধ হাঙ্গারীর রাজধানী বুদাপেস্তেই প্রচণ্ডতম হয়ে উঠেছে। এ রণক্ষেত্রেও জার্মানির প্রতিরোধ শক্তি উপেক্ষণীয় নয়। বুদাপেস্তের রাস্তায় রাস্তায় প্রচণ্ড সংগ্রাম চলেছে। রয়টার বলছেন, এ যুদ্ধ স্ট্যালিনগ্রাডের যুদ্ধকেও প্রচণ্ডতায় ছাড়িয়ে গেছে। রুশ সৈন্যেরা বুদাপেস্ত শহরের পশ্চিমদিকের দু-তৃতীয়াংশ দখল করেছে বলে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা জানিয়েছেন।

আরাকান অঞ্চলের যুদ্ধে মিত্রপক্ষ বিনা বাধায় রাথিডংএ প্রবেশ করেছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। রাথিডং বুথিডং থেকে প্রায় ৩০ মাইল উত্তর-পূর্বে মায়ু নদীর তীরে অবস্থিত।

ফিলিপাইনে লেট দ্বীপের যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি, যদিও সংবাদের মারফৎ প্রায় প্রত্যহই জানানো হচ্ছে, লেট দ্বীপ সম্পূর্ণ অধিকৃত হতে আর বিলম্ব নেই। লেট দ্বীপ অধিকৃত হলেও যে ফিলিপাইন খুব সহজে অধিকৃত হবে না, তা অনুমান করা চলে। কারণ জাপানকে তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে ফিলিপাইন রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতেই হবে। কারণ ফিলিপাইনের যুদ্ধে পরাজিত হলে প্রশান্ত মহাসাগরে জাপান অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়বে।

জাপানের বিরুদ্ধে চীনের অভিযানেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য কিছু দেখা যাচ্ছে না। চীনের এই অসাফল্যের দায় অনেকটা চাপানো হচ্ছে মার্শাল চিয়াং কাইসেকের উপর—কম্যুনিস্টদের সঙ্গে তাঁর অসহযোগের কথা উল্লেখ করে। বিশেষ করে সম্প্রতি দুজন শ্বেতাঙ্গ সাংবাদিক সহযোগী এক পত্রিকায় সেইরূপ মতই প্রকাশ করেছেন। চীনা জাতীয়তাবাদীদের পক্ষ থেকে তার তীব্র প্রতিবাদও করা হয়েছে। বস্তুত এ সম্বন্ধে পূর্ণতর বিবরণ না পেয়ে কোন সিদ্ধান্তে আসা মোটেই সঙ্গত হবে না। বর্তমান রাজনৈতিক জটিলতার মধ্যে এসব সংবাদকে খুব সতর্কতার সঙ্গে বিচার করে না দেখলে পদে পদে ভুল করবার সম্ভাবনা আছে।

ইংরেজি নববর্ষের আরম্ভে আমরা পৃথিবীর যে চিত্র দেখছি, তাতে এই রক্তাক্ত হানাহানির যে শীঘ্র অবসান হবে তার কোনই সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। এই সর্বনাশা অভিযান যে দীর্ঘকাল চলবে, এ আজ খুব স্পষ্ট। কিন্তু সেই দীর্ঘতার যে শেষ কোথায় বা কতদিনে তা আজও আগেকার মতই অস্পষ্ট হয়ে আছে। —বিষ্ণু দত্ত

গঙ্গোত্রী

সুবোধ ঘোষ

(৯)

মাত্র ভোর হয়েছে, সারা রাত্রির দুর্ভাবনার অন্ধকার সবে মাত্র প্রসন্ন আলোকের আভায় স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। কেশব ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। কখনো পুকুরের ধারে, কখনো কলাবাগানের আশে পাশে, কখনো নীচের ক্ষেতের নরম আলের ওপরে, সারা রাত্রির বিষণ্ণতার বন্দীত্ব থেকে মুক্ত হয়ে কেশবের মনটাও যেন স্বচ্ছল আনন্দের আবেগে প্রস্ফুট আলোকের মত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল।

শুধু তাই নয়, অদ্ভুত এক বিস্ময়ের পুলকে কেশবের চোখের দৃষ্টিটা চারদিকের দৃশ্যের মর্ম সন্ধান করে ফিরছিলো। এ কী দৃশ্য? এর অর্থ কি? কি হয়েছে মান্দার গাঁয়ের জীবনে?

জীবনে এরকম দৃশ্য দেখেনি কেশব। সারা মান্দার গাঁয়ের মাটী কাঁপছে। সদ্যোজাগ্রত পৃথিবীর সহস্র অদৃশ্য উৎস থেকে যেন প্রাণের স্রোত ফুঁড়ে উঠেছে। মান্দার গাঁয়ের পথ, ক্ষেত, মাঠ ছাপিয়ে ছুটে আসছে। জনতার স্রোত। দলে দলে তারা আসছে। নানা রূপে, নানা বর্ণে, নানা ছন্দে। কেশবের সমুখ দিয়েই একদল সাঁওতাল নরনারী চলে গেল গেরুয়া মাটীর পথচলা ধুলোয় তাদের পা হাঁটু পর্যন্ত রঙীন হয়ে গেছে। কতদূর থেকে এরা আসছে কে জানে? কত রাত থেকে উঠে, ঘুমের আরাম আর স্বপ্নের মায়া ছেড়ে দিয়ে এরা পথ চলতে আরম্ভ করেছে কে জানে? মেয়েদের পিঠে পিঠে পুঁটলি-বাঁধা শিশুরা তখনো অকাতরে ঘুমোচ্ছে। সদ্য ঘুম-ভাঙা পাখির আলাপের মত জনতা আস্তে আস্তে কথা বলে, আস্তে আস্তে হাসে। নতুন দিনের প্রথম আলোকের সঙ্কোচের মত তারাও যেন ধীরে ধীরে সাড়া দিয়ে জাগছে।

এরা কোন্ গাঁয়ের লোক, ঠিক বুঝতে পারে না কেশব। প্রত্যূষের বাতাসে যেন তারা দূরান্তর থেকে ভেসে চলে এসেছে। কিন্তু কেন? আজ হাটবার নয়, মান্দার গাঁয়ে কোন মেলা নেই, তবু কোন্ মহোৎসবের আহ্বানে এরা গাঁয়ের ভেতর কাতার দিয়ে ঢুকছে. অনেক চেষ্টা করেও কিছু বুঝতে পারে না কেশব।

সাঁওতাল নরনারীর জনতা চলে গেল। কেশবের চোখে পড়লো, পশ্চিমের ডাঙা ধরে একটা ভাঙা হাটের জনতা যেন আবার একত্র হয়ে একমুখী আবেগে গাঁয়ের দিকে ছুটে আসছে। দূর তালবনের ঝড়ের মত তাদের হর্ষধ্বনি মাঝে মাঝে বেশ স্পষ্ট হয়ে শোনা যায়। সারা ডাঙার ওপর পূবালী রোদের কুচি চিক্ চিক্ করছে। সারা জনতার মূর্তিটাও অদ্ভুত রকমের বদ্‌লে গেছে। হাটের জনতার মত বিস্রস্ত মালিন্যের চিহ্ন কোথাও নেই, যেন কোন নদীর জোয়ারের জলে স্নান সেরে সবাই ফিরে আসছে এক পথে।

কেশব বুঝতে পারে, জনতা ঠিক ফিরে আসছে না। তারা আসছে। এই মান্দার গাঁয়ের দিকেই তারা আসছে। তারা ভিন্ গাঁয়ের লোক, কিন্তু মান্দার গাঁয়ের জীবনের নদীতে কোন্ জোয়ার জেগেছে? কিসের আহ্বানে, কোন্ কারণে, কোন্ পুণ্যোদকের স্পর্শ নিতে তারা আসছে?

হাঁটতে হাঁটতে কিছুদূর এগিয়ে গেল কেশব। এখান থেকে গাঁয়ের কাঁচা হাঁটুরে রাস্তাটা আরও প্রশস্ত হয়ে দুদিকে চলে গেছে, দীঘির ঘাটের দিকে আর স্কুলের মাঠের দিকে।

স্কুলের মাঠের দিকের পথটা হঠাৎ যেন বাঁশবনের যবনিকার আড়ালে গুমুরে উঠলো। প্রায় হাজারখানেক মানুষের একটা অভিযান হৈ-হৈ উচ্ছ্বাসে প্রমত্ত হয়ে পথের মোড়ে দেখা দিল। কেশব চিনতে পারে, এরা ভৈরবপুরের লোক, মুসলমান চাষী আর জোলার দল। বোধ হয় সমস্ত ভৈরবপুর উৎখাত হয়ে মান্দার গাঁয়ে চলে এসেছে। কেউ বাদ যায়নি, আশী বছরের বুড়োরাও আছে, তিন-চার বছরের ছেলেমেয়েরাও আছে। জনতার মধ্যে মাঝে মাঝে দু'একটা দোলায়মান পাল্‌কি দেখা যায়। হুঁকো হাতে দু'চারজন করে বুড়ো মাত্‌বর পাল্‌কির ভেতর বসে আছে। তাদের মধ্যে কেউ বা সত্যিই পঙ্গু, কেউ বা জ্বরে ও ব্যাধিতে অশক্ত। কিসের এক আগ্রহ ও উল্লাসে, সারা জনতার মুখচ্ছবি যেন প্রতি মুহূর্তে রং বদ্‌লাচ্ছে, অস্থির হয়ে উঠছে।

সারা মান্দার গাঁয়ের মাথায় তখন সকাল-বেলার রোদ ঝল্‌সে উঠেছে। কেশব আবার ঘরের দিকে ফিরলো। এখনো কোন চেনা-মুখের সাক্ষাৎ পায়নি কেশব। তা হ'লে বরং একটা প্রশ্ন করে মান্দার গাঁয়ের এই আকস্মিক আলোড়নের হেতুর একটা সন্ধান পেত, বিস্ময় দূর হতো।

দীঘির ঘাট কোন্ দিকে? সবার মুখে এই এক প্রশ্ন। এক একটি জনতা পথে দেখা দেয়, কেশবকে প্রশ্ন করে। পথের প্রহরীর মতই কেশব হাত তুলে দীঘির ঘাটের পথ চিনিয়ে দিয়ে এগিয়ে পড়ে।

সহজে এগিয়ে যেতে পারে না কেশব। লোকের ভীড় ক্রমেই বাড়ছে। ভীড়ের ব্যস্ততা আরও বাড়ছে। মান্দার গাঁয়ের কোন পথ আর নীরব নেই, কোন পথ শূন্য নেই। দলে দলে নানান্ গাঁয়ের নানা জাতের জনতা একে একে দেখা দিয়ে দীঘির ঘাটের পথে গাছপালার ভীড়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

কেশব হঠাৎ চুপ করে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়ালো। বহু কণ্ঠের একটা মিলিত সঙ্গীতের স্বর বাতাসে শিহর জাগিয়ে এগিয়ে আসছে। ধীরে ধীরে তারা সামনে এসে পড়লো। একটা স্কুলের ছাত্রের দল, কোন্ গাঁয়ের তা ঠিক বুঝতে পারে না কেশব। কেশব শুধু মনপ্রাণ সংযত করে সেই সঙ্গীতের অর্থ বুঝতে চেষ্টা করে। কিসের গান গায় ছেলেরা?

এই সঙ্গীতের অর্থ কেশবের চেতনায় স্পন্দিত হয়ে প্রতিধ্বনি তোলে। অর্থ বুঝতে কোন কষ্ট হয় না। কিন্তু বিশ্বাস করতে ভয় করে। সত্যিই কি এই গান আজ কোটী জীবনের কর্মে জ্ঞানে ও ধ্যানে সত্য হয়ে উঠেছে? সত্যিই কি হিন্দুস্থানের দুর্ভাগ্যের কুহেলিকা কেটে গেল? এক মহা-মানবের আবির্ভাব হয়েছে ভারতের মাটীতে, এ কি পঞ্জিকা আর জ্যোতিষীর গণনার মত একটা কথার কথা মাত্র, না সংসারের ঘটনার নিয়মে পরিণত এক সত্যের বাণী?

এতদিনে সত্যিই নতুন নিয়মে জেগে উঠছে মান্দার গাঁ। এ দৃশ্য মান্দার গাঁয়ের প্রচলিত ইতিহাসের ব্যতিক্রম। কিন্তু কেশবের বিদ্রোহী চিত্ত এই নতুনত্বের দিকে শত্রুর মত তাকাতে পারে না। বাইরের পৃথিবী এক বিচিত্র ও অভিনব রূপে মান্দার গাঁয়ের



সঞ্চয় পক্ষ

গভর্নমেন্ট সিকিউরিটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

যারা অল্প টাকা লাগাবে তাদের জন্য

ন্যাশনাল সেভিংস্ সার্টিফিকেট

* ৫০০০্ টাকা পর্যন্ত কিনতে পারেন এবং তিন বছর পর ভাঙাতে পারেন।
* প্রত্যেক ১০্ টাকাতে বারো বছর পরে আপনি ১৫্ টাকা পাবেন। এটা শতকরা ৪ ১/৬ % সুদের সমান।
* আয়কর দিতে হয় না।
* গভর্নমেন্ট নিযুক্ত এজেন্টের কাছে এবং সেভিংস্ ব্যুরো ও পোস্ট-অফিসে পাওয়া যায়।

কর্পোরেশন, ব্যাঙ্ক ও মহাজনদের জন্য

ভিক্টরি লোন

* যত টাকার ইচ্ছা কিনতে পারেন।
* ১৯৫৭ সালে পূর্ণ মূল্য ফেরত দেওয়া হবে।
* শতকরা ৩্ টাকা সুদ দেওয়া হবে।
* দরকার হলে সব সময়েই বিক্রি করা সহজ।
* ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার যে কোনো ভারতীয় শাখায় এবং গভর্নমেন্ট ট্রেজারি ও সাবট্রেজারিতেও আবেদনপত্র নেওয়া হয়।

এখনই সঞ্চয়ের সময়

ভারত সরকারের অর্থ বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত

AAA 1248

ঘুমন্ত সত্তাকে আজ সকালে আক্রমণ করেছে, কিন্তু তবু রাগ করতে পারে না কেশব। কিসের আক্রমণ, কিসের অভিযান, তা'ও যে ঠিক বোঝা যায় না।

তবু না বুঝে আজ ঘরে ফিরবে না কেশব। আজ যেন মান্দার গাঁয়ের অবরোধ সমাপ্ত হয়ে গেছে। গাঁ-ভরা কাঁটার বেড়াগুলি আজকের ভোরের আলোর সংগে সংগে উপড়ে গিয়েছে। মাঠের ফাটলগুলি জোড়া লেগে গেছে। আমবাগানের প্রবেশপথের সকল সংকীর্ণতা ঘুচে গেছে। কেশবের মনে হয়, গীতার বাণী বোধ হয় নিতান্ত মিথ্যে নয়। বড় বেশী গ্লানি জমেছিল মান্দার গাঁয়ে, তাই যুগের সন্ধিক্ষণে নিশ্চয় কোন মহামানব সম্ভব হয়েছেন।

বেলা বাড়ছিল। কোনখানে স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছিল না কেশব। চারদিকের বর্ণ ও শব্দের নতুন ইঙ্গিতের আকুলতা তাকে উতলা করে তুলছিল। ঘুরতে ঘুরতে স্কুলের মাঠের দিকে অনেকদূর এগিয়ে এল কেশব। নতুন স্কুলবাড়ীর সামনে সেই মাঠের ঘাসে সেই পুরাতন সবুজ আজও ঠিক তেমনি আছে। নিশ্চিহ্ন আর্য পাঠশালা ধুলো হয়ে মিশে গিয়েছিল, কিন্তু আবার বোধ হয় মাটীর আড়ালে অংকুর হয়ে জেগে উঠছে।

কেশবের ধারণা ভুল হয়নি। দূরে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখছিল কেশব। ইংরিজী স্কুলের বাড়ীটা যেন উদ্দাম শব্দের তান্ডবে চৌচির হয়ে যাচ্ছিল। হেডমাস্টার দিনমণি বিশ্বাস বেত হাতে বিদ্রোহের বাতাসকে সায়েস্তা করার জন্য চারদিকে ছুটোছুটি করছিলেন। স্কুলের চেয়ার টেবিল বেঞ্চ ব্ল্যাকবোর্ডগুলি যেন একটা হঠাৎ বিস্ফোরণে মাঠের ওপর ছিটকে এসে পড়ছিল। এ-বি-সি-ডি শাসনতন্ত্রের যত সুগম্ভীর উপচারগুলিকে টেনে এনে ছাত্রের দল মাঠের ওপর জড়ো করে রাখছিল। থেকে থেকে জয়ধ্বনি উঠছিল।

দৃশ্যটাকে স্বচক্ষে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছিল না কেশব। সত্যিই কি পাপের ঘরে আগুন লাগলো এতদিনে? ইংরিজী স্কুলের অবান্তর অস্তিত্ব আজ কিসের আঘাতে টলমল করে উঠলো? কার নির্দেশে? কোথায় লুকিয়েছিল এই আয়োজন? সারা মান্দার গাঁ ঘুরে এই আয়োজনের কোন আভাষ কেন সে খুঁজে পায়নি এতদিন?

স্কুলের ছাত্রেরাএকদল হয়ে মাঠের ওপর দাঁড়ালো। জয়ধ্বনি তুললো। একটা পতাকা দুলে উঠলো। মাঠের ওপর দিয়ে ছাত্রের দল দুলতে দুলতে এগিয়ে এল বারোয়ারী কালীতলার দিকে, পূবদিকে ঘুরে গেল, দীঘির ঘাটের পথ ধরে।

সকল অভিযান দীঘির ঘাটের দিকে, সকল আগ্রহ দীঘির ঘাটের দিকে, সকল পদধ্বনির লয় দীঘির ঘাটের দিকে। দীঘির ঘাটের দিকে কি হঠাৎ কোন তীর্থ পত্তন হলো?

এই প্রশ্নের উত্তরটুকু জানবার জন্য ছটফট করছিল কেশব। আর একটু এগিয়ে দীঘির ঘাটের কাছে অনায়াসে পেঁছে যেতে পারে, পথের ওপর এমন কোন বাধা নেই। সবাই অবাধে চলে যাচ্ছে। কিন্তু কেশব যেতে পারে না। তার মনের ভেতরেই অজানা একটা বাধা নিজের অস্পষ্টতায় দুর্লঙ্ঘ্য হয়ে রয়েছে। এই রহস্য ভঞ্জন না হলে সে ঘরে ফিরতে পারে না, দীঘির ঘাটের দিকে যাবারও সাধ্য নেই। এই রহস্যের মর্ম অল্প অল্প চেনা যায়, আভাযে কিছুটা জানা যায়। কিন্তু এই জানা সত্য হলেই বা কি, মিথ্যে হলেই বা কি? কেশবের পথ এই পর্যন্ত এসেই ফুরিয়ে গেছে।

নন্দীবাবুদের পড়ো ভিটের ওপর একটা একচালায় একদল ভাগলপুরী গয়লা গরু-মোষ নিয়ে বাথান খুলেছে। ক্লান্তভাবে ঘুরে ঘুরে পড়ো ভিটেটার কাছে এসে দাঁড়ালো। ভিটেটার শ্রীহীন ধ্বংসের কাঁটা-ভরা জঞ্জালের মধ্যেও অজস্র নীলফুল ফুটে রয়েছে। অন্যদিন হলে শুধু কাঁটাবনের দৃশ্যটাই বড় হয়ে চোখে পড়তো কেশবের। কিন্তু আজ বারবার নীলফুলগুলির স্নিগ্ধতার সংগে তার বিস্ময়ভরা চোখের দৃষ্টি এক হয়ে মিশে যাচ্ছিল।

যা সুপ্ত দিন, তাই আজ জাগছে। যা সুপ্ত হয়েছিল, তাই আজ ব্যক্ত হয়েছে। আজকের সকালে মান্দার গাঁয়ের মাটীতে হঠাৎ কোন নতুনের আবির্ভাব হয়নি, আপন মাটীর দিবাগুণেই আজ নতুন সৌরভ ছড়াচ্ছে মান্দার গাঁ। মান্দার গাঁয়ের সহস্র নীলফুল কাঁটার আড়ালে শুধু চাপা পড়েছিল। আজ আড়ালের বাধা ভেঙে গেছে।

কেশব দেখলো, ভাগলপুরী গয়লারা ব্যস্ত হয়ে কাজকর্ম সেরে, হাতমুখ ধুয়ে নিল। যত্ন করে মাথায় বড় বড় পাগড়ী বাঁধলো, তারপর সবাই এক সঙ্গে রওনা হলো। সেই একই অবধারিত পথে, দীঘির ঘাটের দিকে।

রোদের তাপ বাড়ছে ক্রমশ, মধ্য দিনের খর উজ্জ্বলতায় মান্দার গাঁকে ঘিরে ধরেছে। দু-একটা ক্লান্ত পাখী এরই মধ্যে পাতার ছায়া খুঁজে বেড়াচ্ছে। কেশবও যেন অচল হয়ে গিয়েছিল। এখান থেকে কেউ যদি হঠাৎ দয়া করে তাকে টেনে নিয়ে না যায়, তাহলে সে কোনদিনে যেতে পারবে না। ঘরেও না বাইরেও না।

অনেকক্ষণ হলো পথের সাড়াশব্দ নিঝুম হয়ে গিয়েছিল। সংসারের সকল ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি মিছিল করে দীঘির ঘাটের কাছে গিয়ে একত্রিত হয়েছে। এখানে শুধু শূন্যতা, আর সেই শূন্যতাকে একাকী বৃথা পাহারা দেবার জন্য কেশবের মন পড়ে রইল।

শেষ পথিকটিও চলে গেল। এক বৃদ্ধ, ঠুক্ ঠুক্ করে লাঠি ঠুকে হাঁপাতে হাঁপাতে আসছিল। কেশবের কাছে এসে প্রশ্ন করলো—দীঘির ঘাট?

—এই সোজা পথ, চলে যান।

বৃদ্ধ চলে যাচ্ছিল। কেশব হঠাৎ প্রশ্ন করলো—দীঘির ঘাটে কি ব্যাপার হচ্ছে মাত্‌বর?

বৃদ্ধ ফিরে দাঁড়ালো, কষ্টে সৃষ্টে ধীরে ধীরে ঘাড় তুলে কেশবের দিকে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে বললো—সভা হ'বে?

দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করার মত নির্লজ্জতা ও দুঃসাহস ছিল না কেশবের। নইলে সে নিশ্চয় আবার প্রশ্ন করতো—কিসের সভা?

ঠুক্ ঠুক্ করে লাঠি ঠুকে বুড়ো মাত্‌-বরের মূর্তিটা হেঁটে চলেছিল। কেশব তাকিয়ে দেখছিল। এই শান্ত দৃষ্টির মধ্যে কিছুটা হিংসা কাতরতার আবছায়াও যেন উঁকি দিচ্ছিল। এই বুড়োও ঠুক্ ঠুক্ করে এগিয়ে যেতে পারে, শুধু কেশব পারে না। সবাই পথ খুঁজে পাচ্ছে, শুধু কেশব পায় না।

চমকে উঠে মুখ ফিরে তাকালো কেশব। কাঁধের ওপর কার একটা হাতের স্পর্শ ঘনিষ্ঠ হয়ে লুটিয়ে পড়েছে পেছন থেকে।

অজয় মিত্তির হেসে হেসে জিজ্ঞেস করলো—এখানে হাঁ করে কি দেখছিস্?

অজয়কে স্পষ্ট করে দেখেও সেই রূঢ় চমকের আকস্মিকতা কেশব কাটিয়ে উঠতে পারলো না। উত্তর দিতে পারলো না।

অজয় বললো—আজকের দিনেও তুই এখানে একা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছিস্, আশ্চর্য!

কেশব উত্তর দিল না। আজকের দিনেও এখানে চুপ করে না দাঁড়িয়ে থেকে আর কোন উপায় নেই কেশবের, সেই নীরব হতাশ্বাসের সত্যটুকুই কেশবের চোখে করুণ হয়ে ফুটে উঠছিল।

অজয় মিত্তির চোখ নামিয়ে নিল। অন্য-দিকে মুখ ঘুরিয়ে সান্ত্বনার সুরে বললো—চল, এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবি না।

কেশবের নতুন করে বার বার মনে হচ্ছিল, কাঁটা বনের চিহ্ন মুছে গেছে, শুধু নীল ফুল ফুটছে আজ। (ক্রমশ)

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

২৬শে ডিসেম্বর—গতকল্য রাত্রে পূর্ব বঙ্গের একটি অঞ্চলে জাপ বিমানসমূহ আক্রমণ চালায়। দুইখানি জাপ বিমান সমুদ্রে পতিত এবং দুই-খানি বিমান জখম হয়। মিত্রপক্ষের বিমান-সমূহের কোন ক্ষতি হয় নাই; সৈন্য বিভাগের কিছু লোক হতাহত হয়।

২৭শে ডিসেম্বর—কলিকাতা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে নিখিল ভারত র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন আরম্ভ হয়। শ্রীযুত এম এন রায় উহাতে সভাপতিত্ব করেন।

মহাত্মা গান্ধী ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হইবার পর কণ্ঠনালীর প্রদাহে আক্রান্ত হন। মাঝে মাঝে তাঁহার শরীরের তাপ বৃদ্ধি পায়। এই পীড়ার ফলে গান্ধীজী বেশ দুর্বল এবং অবসন্ন হইয়া পড়েন।

নাগপুরে একখানি সামরিক বিমান চুরমার হইয়া পতিত হওয়ায় তিনজন বেসামরিক ব্যক্তি নিহত ও তিনজন আহত হয়।

২৮শে ডিসেম্বর—কলিকাতার মহম্মদ আলী পার্কে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের অষ্টম বার্ষিকী সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখার্জি উহাতে সভা-পতিত্ব করেন। এই সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু ভারতের স্বাধীনতা লাভ ত্বরান্বিত করিবার উদ্দেশ্যে ভারতের যুব সমাজকে দলগত বিভেদ ভুলিয়া ঐক্যবদ্ধ হইতে আহ্বান জানান।

কাণপুরে ডাঃ জীবরাজ মেহতার সভাপতিত্বে নিঃ ভাঃ চিকিৎসক সম্মেলনে গৃহীত প্রধান প্রস্তাবে ভারত গবর্নমেণ্ট কর্তৃক বিদেশী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের ভারতে আমন্ত্রণের আপত্তি জ্ঞাপন করা হয় এবং অধিক পরিমাণে জাল ঔষধপত্র বাজারে চালু হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

২৯শে ডিসেম্বর—ন্যাদিল্লীতে অদলীয় মীমাংসা কমিটির কার্য আরম্ভ হয়। কমিটির সভাপতি স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে কমিটির উদ্দেশ্য ও কার্য কিরূপ হইবে তাহা বিবৃত করেন।

কলিকাতা নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মুক্তি দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং বিনা বিচারে রাজনৈতিক কর্মী-দের আটক রাখার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়।

৩০শে ডিসেম্বর—দিল্লীতে ডাঃ এল কে হায়দরের সভাপতিত্বে ভারতীয় অর্থনৈতিক সম্মেলনের ২৭তম অধিবেশন আরম্ভ হয়। উদ্বোধনী বক্তৃতায় স্যার আরদেশীর দালাল ঘোষণা করেন যে, ভারতের অর্থনীতি সম্বন্ধে গবেষণা এবং আলোচনা করিবার জন্য গবর্ন-মেণ্ট একটি 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইকনমিক রিসার্চ' স্থাপন করিবেন।

সামরিক অফিসারদের নিকট হইতে ঘুষ গ্রহণ করার অপরাধে মেজর ই ই ডানেট সামরিক আদালতের বিচারে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁহাকে চাকুরী হইতেও বরখাস্ত করা হয়।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে নারী সেবা সঙ্ঘের হস্তশিল্প প্রদর্শনী উপলক্ষে এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু দুর্ভিক্ষ ও সংক্রামক ব্যাধিক্লিষ্ট দুঃস্থা নারী, শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিদের তথা সমগ্র বাঙালী জাতিকে স্বাস্থ্যের দিক হইতে পুনর্গঠন করার প্রয়ো-জনীয়তা বিবৃত করেন।

৩১শে ডিসেম্বর—ভারত গবর্নমেণ্টের সিভিল সাপ্লাই বিভাগ কলিকাতায় কয়েক লক্ষ টাকা মূল্যের পশমের মাল উদ্ধার করে। এই সম্পর্কে পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

স্যার তেজবাহাদুর ও ডাঃ আম্বেদকরের মধ্যে পত্রালাপ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। তাহাতে জানা যায় যে, ডাঃ আম্বেদকর মীমাংসা কমিটির কার্যে সহযোগিতা করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলনের অষ্টম অধিবেশন আরম্ভ হয়। অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

নিখিল ভারত কিষাণ সভার প্রেসিডেণ্ট স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী কংগ্রেসের কিষাণ শাখা সৃষ্টি প্রচেষ্টা সম্পর্কে এক ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন। কিষাণ সভা সাম্রাজ্যবাদী সমর্থন-কারী, কংগ্রেস ও জাতীয়তা বিরোধী—এই অপ-বাদ তিনি অস্বীকার করেন।

১লা জানুয়ারী—কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে প্রস্তাবিত হিন্দু কোড সম্বন্ধে আলোচনার উদ্দেশ্যে এক বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান হয়। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু সভা-নেতৃর আসন গ্রহণ করেন। বহুসংখ্যক মহিলা সভায় যোগদান করেন। প্রস্তাবিত হিন্দু কোডের সমর্থন ও বিরোধিতা করিয়া অনেকগুলি বক্তৃতা প্রদত্ত হয়।

ইংরাজী নববর্ষ উপলক্ষে যাহারা উপাধি পাইয়াছেন, তাহাদের নাম প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য স্যার সুলতান আমেদ কে সি এস আই এবং কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ সৈয়দ নাসিম আলি নাইট (স্যার) উপাধি লাভ করেন।

২রা জানুয়ারী—নাগপুরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের দ্বাত্রিংশৎ বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। স্যার শান্তিস্বরূপ ভাটনগর মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

পুণার এক সংবাদে প্রকাশ, শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই প্রধানত ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে আমেদ নগর দুর্গে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

বিদেশী সংবাদ

২৬শে ডিসেম্বর—বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল ও পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ইডেন এথেন্সে পৌঁছেন।

পশ্চিম রণাঙ্গন—জার্মানরা বেলজিয়ামের ১৭ মাইল ভিতরে ও বাস্তোন হইতে ১৮ মাইল পশ্চিমে লিব্রাম্‌ত অধিকার করে।

পূর্ব রণাঙ্গন—রুশ ট্যাঙ্কবাহিনী বুদাপেস্ট শহরে প্রবেশ করে।

২৭শে ডিসেম্বর—গ্রীস—এথেন্স সম্মেলন শেষ হয়। এলাস প্রতিনিধিগণ সম্মেলনে যোগদান করেন।

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল এথেন্সে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন,—"যদি আমরা হস্ত-ক্ষেপ না করিতাম, তাহা হইলে একটি বিরাট হত্যাকাণ্ড ঘটিত। তিনি আশা করেন যে, সম্মিলিত বৈঠকের ফলে সমস্যার সমাধান হইবে। এথেন্সে বৃটিশ দূতাবাসের বাহির হইতে জনৈক এলাস সৈন্য মিঃ চার্চিলকে লক্ষ্য করি চোরাগুলী ছোড়ে। গুলীটি তিনশত গ দূরে এক যুবতীর দেহে গিয়া লাগে।

পশ্চিম রণাঙ্গন—জার্মানরা মিউজ নদী বাঁকে দিনা, নামুর এবং হুয়ের সমীপবর্তী মিত্রপক্ষীয় ত্রিভুজাকার আত্মরক্ষা ব্যূহ অঞ্চলে প্রবেশ করে। এই ঘাঁটিগুলিতে পৌঁছায় জার্মা পানৎসের বাহিনী আক্রমণ সুরুর স্থান হইতে ১১ দিনে ৭০ মাইল অগ্রসর হইল।

২৮শে ডিসেম্বর—গ্রীস—সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয় যে, আর্কবিশপ ডামাসকিনোস এথেন্স সম্মেলন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখিয়াছেন।

পূর্ব রণাঙ্গন—লালফৌজ দলে দলে বুদা-পেস্ট শহরে প্রবেশ করে। শহরের প্রত্যেকটি সুদৃঢ় গৃহ এক একটি দুর্গে পরিণত হয়।

পশ্চিম রণাঙ্গন—জার্মান সাঁজোয়া বাহিনী রকেফোর হইতে মিউজ অভিমুখে যে অভিযান সুরু করিয়াছিল, সেলে ও কানেতে তাহার গতি-রোধ করা হয়। বেলজিয়াম ও লুক্সেমবুর্গে আক্রমণ চালাইয়া যে স্ফীতিমুখ জার্মানরা সৃষ্টি করে, তথায় স্থানে স্থানে মার্শাল রুনস্টেডটের বাহিনী আজ পশ্চাদপসরণ করে।

২৯শে ডিসেম্বর—পশ্চিম রণাঙ্গনের কয়েকটি এলাকায় জার্মানরা আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামে ব্যাপৃত হয়। বেলজিয়ামস্থ মার্কিন বাহিনীর নিকট হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, রণাঙ্গনের একস্থানে জার্মানরা বিশৃঙ্খলভাবে সরিয়া পড়ে এবং জেনারেল প্যাটনের সৈন্যেরা তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করে।

গ্রীক প্রধান মন্ত্রী পাপান্দ্রু পদত্যাগ করেন।

৩০শে ডিসেম্বর—গ্রীসের রাজা গ্রীসের রাজ-প্রতিনিধিরূপে আর্কবিশপ দামাস্কিনোসকে নিয়োগ করেন।

পূর্ব রণাঙ্গন—লালফৌজ অস্ট্রিয়া সীমান্ত হইতে অনুমান ৫০ মাইল দূরে পৌঁছে।

৩১শে ডিসেম্বর—পশ্চিম রণাঙ্গন—মিউজ ও মোসেল নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে উভয়পক্ষই বিপুল সৈন্য সমাবেশ করিয়াছে। মিত্রবাহিনী রকেফোর্ট দখল করে।

১লা জানুয়ারী—হের হিটলার বেতারযোগে জার্মান জাতির উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন যে, ১৯৪৬ সালের পূর্বে যুদ্ধ শেষ হইবে না। জার্মানীর জয়লাভ না হওয়া পর্যন্ত এ যুদ্ধের অবসান হইতে পারে না। কারণ জার্মানী কদাপি আত্মসমর্পণ করিবে না।

বিশ্ববিখ্যাত মনীষী মঃ রোমাঁ রোলাঁ ফ্রান্সের ইয়ন জেলার ভেজেল নামক স্থানে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৯ বৎসর হইয়াছিল।

ব্রহ্মের আরাকান রণাঙ্গনে মিত্রবাহিনী বিনা বাধায় রথিডাউং দখল করে।

পূর্ব রণাঙ্গন—মস্কোর সংবাদে বলা হইয়াছে যে, বুদাপেস্টের রাস্তায় রাস্তায় প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিয়াছে—তীব্রতায় এই সংগ্রাম স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে।

গ্রীস—বৃটিশ সৈন্যরা এথেন্সের দুই-তৃতীয়াংশ ও পিরেউসের অর্ধাংশ সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে। গ্রীসের আর্কবিশপ দামোস্কিনোস যথারীতি রাজপ্রতিনিধি পদে অভিষিক্ত হন।

২রা জানুয়ারী—পশ্চিম রণাঙ্গন—বেলজিয়ামে বাস্তোন শহর পরিবেষ্টন করার জন্য জার্মান-গণ ৬ ডিভিসন সৈন্য এবং শক্তিশালী বিমান-বহর নিয়োজিত করিয়াছে, কিন্তু জেনারেল প্যাটনের বাহিনী দৃঢ়ভাবে নিজেদের ঘাঁটি রক্ষা করিতেছে।

ইউরোপ অভিযানে মিত্রপক্ষের প্রধান নৌ-সেনাপতি স্যার বারট্রাম র‍্যামজে অদ্য ফ্রান্সে এক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হইয়াছেন।

দেশ

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

১২ বর্ষ] শনিবার, ২৯শে পৌষ, ১৩৫১ সাল। Saturday, 13th January, 1945 [১০ম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বাঙলা হইতে চাউল রপ্তানি

বাঙলা হইতে চাউল রপ্তানি করিবার জন্য বাঙলা সরকার ভারত গভর্নমেণ্টের নিকট যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, শুনিতেছি সে সম্বন্ধে পাকা ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। এতদুদ্দেশ্যেই ভারত সরকারের খাদ্য সচিব স্যার জওলাপ্রসাদ শ্রীবাস্তব সম্প্রতি কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। সংবাদে দেখিতেছি, স্যার জওলাপ্রসাদ কলিকাতায় আসিয়া শহরের উপকণ্ঠ-বর্তী কয়েকটি অঞ্চলে গিয়া সরকারী খাদ্য বণ্টন ব্যবস্থা কিরূপভাবে নিয়মিত হইতেছে, তাহা পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন এবং কতকগুলি সরকারী গুদামও ঘুরিয়া দেখিয়াছেন। ভারত সরকারের খাদ্য সচিব শহরের উপকণ্ঠবর্তী কয়েকটি অঞ্চল কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এইভাবে পরিদর্শন করিয়া কি ধারণা লাভ করিয়াছেন, আমরা বলিতে পারি না; তবে আমাদের কথা এই যে, এই পরিদর্শনের সঙ্গে যদি বাঙলা দেশ হইতে খাদ্য রপ্তানির যৌক্তিকতা তিনি উপলব্ধি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার সেরূপ সিদ্ধান্ত সংগত হইবে না। বাঙলা সরকারের গুদামের চাউল, আটা, ময়দা নষ্ট হইতেছে, নানা স্থান হইতে এখনও এমন খবর পাওয়া যাইতেছে। ইহা সত্য, কিন্তু তদ্দ্বারা বাঙলাদেশে খাদ্যশস্যের অতিমাত্রায় প্রাচুর্য ঘটিয়াছে, ইহা প্রমাণিত হয় না। আমরা পূর্ব হইতেই বলিয়া আসিতেছি যে, বাঙলাদেশে হৈমন্তিক শস্যের ফসল এবার আশাপ্রদ হয় নাই এবং চাউলের মূল্য মফঃস্বলের সর্বত্র দস্তুরমত বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। গত বৎসরের দুর্ভিক্ষে বাঙলার সমাজ জীবন সমগ্রভাবে বিপর্যস্ত হইয়াছে। ইহার উপর সর্বত্র দুরন্ত ম্যালেরিয়ার প্রকোপ চলিতেছে। সরকারী বহুবিধ বিজ্ঞপ্তি সত্ত্বেও কুইনাইন এবং ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক অন্যবিধ ঔষধ সরবরাহের সুব্যবস্থা এখনও হয় নাই, একথা আমাদিগকে বলিতেই হইতেছে। ম্যালেরিয়ার প্রকোপের এই সমস্যা, শুধু লোকক্ষয়েরই সমস্যা নয়, ইহার সঙ্গে দেশের খাদ্য এবং অর্থনীতিক সমস্যাও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় সাহায্য সমিতির সেক্রেটারী শ্রীযুত রঞ্জিৎ রায় সম্প্রতি মাদারীপুর পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়া সংবাদপত্রে যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, ম্যালেরিয়ার আক্রমণে সে অঞ্চলের শতকরা ৫০ জন লোক শয্যাশায়ী আছে, ইহার ফলে ধান কাটিবার লোক মিলিতেছে না; শুধু যে মাদারীপুরের অবস্থা এইরূপ ইহা নয়, বাঙলাদেশের মফঃস্বল অঞ্চলের এই অবস্থা সাধারণ আকার ধারণ করিয়াছে, একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এক্ষেত্রে বাঙলা হইতে বাহিরে খাদ্য রপ্তানি করি-বার যুক্তিযুক্ততা আমরা কিছুতেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না এবং ভারত সরকারও কিভাবে বাঙলা সরকারের এই যুক্তিতে সম্মতি দান করিলেন, ইহাও আমাদের বুদ্ধির অগম্য; পরে, ইহাও শুনিতেছি যে বাঙলা হইতে বাহিরে চাউল রপ্তানি করা হইবে না এমন ব্যবস্থা হইয়াছে; বস্তুত ব্যাপারটা এখনও রহস্য বিশেষ হইয়া রহিয়াছে এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে, বাঙলার স্বার্থ সম্পর্কিত এত বড় একটা গুরুতর বিষয়ের সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত করা হইল, অথচ দশের লোকে তাহার ভিতরের কথা কিছুই জানিতে পারিল না। এ ক্ষেত্রে সরকারের এই গোপন নীতি অবলম্বনের কারণ কি? ইহা নিশ্চয়ই মন্ত্রীদের পক্ষে জনগণের প্রতি তাঁহাদের দায়িত্ব বোধের পরিচায়ক নহে।

দেশাই-ওয়াভেল আলোচনা

বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাইয়ের সাক্ষাৎকারের ব্যাপার লইয়া এতদিন পর্যন্ত সাংবাদিক মহলে অনেক প্রকার গবেষণা হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি নাগপুরের 'হিতবাদ' পত্র এই রহস্যের উপর আলোক প্রক্ষেপ করিয়াছেন। হিতবাদ বলেন, মনে হয় শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই এই মত পোষণ করেন যে, বর্তমান রাজনীতিক অচল অবস্থাজনিত সমস্যার জন্য এবং সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রি-মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত না থাকাতে জাতির অগ্রগতি রুদ্ধ হইতেছে। তিনি নাকি ওয়ার্ধায় গিয়া মহাত্মাজীকে ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, কলিকাতার শ্বেতাঙ্গ বণিক সভার বক্তৃতায় বড়লাট যাহা বলিয়া-ছেন এবং জাতীয় গভর্নমেণ্ট সম্বন্ধে কংগ্রেসের যে ধারণা এতদুভয়ের মধ্যে একটা মাঝামাঝি ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা যাইতে পারে। ইহা হইতে মোটামুটি ইহাই বোঝা যায় যে, শ্রীযুত দেশাই কংগ্রেস কর্তৃক পুনরায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পক্ষপাতী; কিন্তু জাতির অগ্রগতির পক্ষে বর্তমান ক্ষেত্রে তাহা কিরূপে সাহায্য করিবে, আমরা বুঝিতে পারি না। কারণ দেখা যাইতেছে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতের উপর হইতে তাঁহাদের কর্তৃত্বের বজ্রমুষ্টি বিন্দুমাত্রও শিথিল করিতে প্রস্তুত নহেন। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দান করা হইবে না, সেদিনও বড়লাটের

শাসন পরিষদে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সোসিয়ালিস্ট সহকারী ভারত সচিব লর্ড লিস্টওয়েল এ ক্ষেত্রে কিছুই করিতে পারিলেন না, বিলাতের শ্রমিক সভায় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবী করিয়া কড়া প্রস্তাব গৃহীত হইল, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করিলেন না। শাসন নীতি যদি এইভাবে জনমতকে বিদলিত করিয়াই চলে, তবে দেশসেবক কংগ্রেস কর্মীদের পক্ষে মন্ত্রী সাজিয়া সেই শাসনতন্ত্রের শোভা বর্ধন করা বিড়ম্বনাকর হইবে বলিয়াই আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস। তাঁহাদের তেমন দীনতা স্বীকারে কংগ্রেসের রাষ্ট্রীয় আদর্শই বিচলিত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

পাপ-পণ্যরূপে নারী ও শিশু

বর্তমান যুদ্ধকালীন বিপর্যয়কর সর্বনাশা পরিস্থিতির মধ্যে বাঙলা আজ পঙ্কিলতার কোন্ আবর্তে আসিয়া নামিয়াছে, বিষন্ন চিত্তে তাহাই কেবল বার বার স্মরণ করিতে হয়। যে নারী দেশের শক্তিরূপিণী, যে শিশু ভাবী সমাজের আশা ভরসার স্থল, তাহাদের অনেকে আজ পাপ-পণ্যরূপে পরিগণিত হইয়াছে। এই পাপ-ব্যবসায়ের উচ্ছেদ-সাধনের উপায় উদ্ভাবন-কল্পে সম্প্রতি কলিকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট্ হলে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই সভার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি সকল সম্প্রদায় ও দল-উপদলের শত সহস্র নর-নারী যোগদান করিয়াছিলেন। আর্থিক দুর্গতি-সঞ্জাত অসহায় অবস্থার সুযোগ লইয়া, নারী ও শিশু বিক্রয়ের পাপ-ব্যবসায় ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতেছে মনে করিয়া এই সভা আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই নীচ পাপ-বৃত্তির তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। গভর্নমেন্ট নারীদের রক্ষা ও সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা-কল্পে দৃঢ়হস্তে অবিলম্বে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করুন এবং বঙ্গীয় পাপ ব্যবসায় নিরোধ আইনটি এমনভাবে সংশোধিত করা হোক, যাহাতে ঐ আইনের ব্যবস্থাসমূহ এই পাপ দমন করিতে কার্যকরীভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে,—এই এই মর্মে সভায় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই সভার সভানেত্রীরূপে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু আবেগপূর্ণ ওজস্বিনী ভাষায় যে বক্তৃতা করেন, তাহা প্রণিধান-যোগ্য। তিনি এ সম্পর্কে পুরুষের গুরুতর দায়িত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। সভার আলোচনায় জানা যায় ১৯২১ সালে কলিকাতায় পতিতার সংখ্যা ছিল ১০,২০৭, আর তাহা বাড়িতে বাড়িতে ১৯৪৪ সালে দাঁড়াইয়াছে ৪৫ হাজারেরও উপর। বাঙলার বাহিরের দূর-দূরান্তর প্রদেশ হইতেও বহু দুর্গতা নারীকে পতিতাবৃত্তির জন্য কলিকাতায় আমদানী করা হইতেছে।

কলিকাতায় পতিতার এই অসম্ভাবিত-রূপে বর্ধিত সংখ্যা খুবই উদ্বেগজনক। দেশের সুস্থ আবহাওয়া যে কতদূর কলুষিত হইয়াছে, তাহা এই সংখ্যা হইতেই অনুমান করা যায়। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য কয়েক জন এই পাপ-ব্যবসায়ে অসহায় নারীগণের আত্মবিক্রয়ের কারণস্বরূপে আর্থিক দুর্গতির কথা উল্লেখ করেন। আমরাও এই দিকটার উপরই জোর দিতেছি। বহু পরিবারের উপার্জনক্ষম পুরুষ অন্নাভাবে আগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, শেষে তাহার পরিবারস্থ নারী ও শিশু পাপ-ব্যবসায়ে ব্যবহৃত হইয়া কদর্য লালসার যূপকাষ্ঠে আত্মবলি দিতেছে। দেশে যুদ্ধ-পরিস্থিতির দরুণ যে সমস্ত পাপের ও হীনতার প্রাদুর্ভাব হয়, যুদ্ধক্ষেত্রের অধিকতর নিকটবর্তী হওয়ায় বাঙলায় তাহা পূর্ণমাত্রায় বীভৎসরূপে দেখা দিয়াছে।

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত সভার আলোচনায় কলিকাতার যে পতিতা-গণের সংখ্যা বলা হইয়াছে, তাহারা প্রকাশ্য-ভাবে পাপ-পথে নামিয়াছে বা নামিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহা ছাড়া গোপনে যে কত পাপ-স্রোত বহিতেছে, তাহার সংখ্যা কে জানে? দেশের নারীত্বের ও মানবত্বের এই হীনতম অবমাননার প্রতি-বিধানকল্পে জাতিবর্ণ, দল-উপদল-নির্বিশেষে সকলেরই অবিলম্বে চেষ্টিত হওয়া অত্যাবশ্যক। লাঞ্ছনা, কলঙ্ক ও বেদনার প্রতিবিধানে শ্রেণীগত ও দলগত কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

সংস্কৃতির মিলন

নিখিল মানবের বেদনার ভাষা যেমন এক, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রেও সর্ব দেশের সর্ব জাতির সূক্ষ্ম রসানুভূতিও তেমনই এক। জাতি, ধর্ম, দেশ, কাল ইত্যাদির বিভিন্নতা সত্ত্বেও মানুষের সংবেদনশীল মন রসের আবেদনে সমভাবে সাড়া না দিয়া পারে না। সম্প্রতি কলিকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত সঙ্গীত কংগ্রেসের অধিবেশনে স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণও সেই কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"এই অধিবেশনে নর ও নারী, হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষকে সমবেত দেখা যায়। রাজ-নৈতিক বা অন্যান্য ক্ষেত্রে পৃথকীকরণ মনো-ভাবের বিরুদ্ধে আমাদিগকে কঠোর সংগ্রাম করি হইতেছে, কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষে হিন্দু-মুসলমান নরনারী সকলের পক্ষেই এ একটা মনস্তাত্ত্বিক ঐক্য সৃষ্টি করা সম্ভব, য রাজনীতিক্ষেত্রে রূপ পরিগ্রহ করিতে পারিবে

বেদনার ভাষা যখন এক, তখন জা বৃহত্তম বেদনা যে পরাধীনতা, তাহ নিরসন ও স্বাধীনতা লাভের ব্যাপারে কোন ভেদ বৈষম্য, বাদ-বিসংবাদ থাকি পারে না। ভারতে যে তাহার অন্যথা দে যাইতেছে, তাহার কারণ স্বার্থান্ধ চক্রান্তে কারসাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। শিক্ষ ও সংস্কৃতির আরও প্রসার হইলে এখন যেসব ব্যক্তি এই হীন কুচক্রান্তের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে, তাহারা তাহাদে ভুল বুঝিতে পারিবে এবং সাংস্কৃতি মিলনের এক পরম ঐক্য-বন্ধনে তাহার আবদ্ধ হইবে। সম্প্রতি রাশিয়ার একী সংবাদে প্রকাশ, সেখানে মুসলমানগণ যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় নানারূপ আনুকূল করিতেছে, তাহাদের মধ্যে নিরক্ষর কেহই নাই। ধর্মগত, সম্প্রদায়গত কোন প্রশ্নই তাহাদের কাছে বড় নহে, স্বদেশ ও স্বজাতির স্বার্থই তাহাদের কাছে বড় হইয়া উঠিয়াছে; সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ ঐক্য-সূত্রে তাহারা আবদ্ধ হওয়াতেই ইহ সম্ভবপর হইয়াছে।

বাঙলার সেচ বিভাগ

সম্প্রতি কলিকাতার সরকারী দপ্তরখানায় দামোদর নদ পরি-কল্পনা, সেচ-ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার্থ কেন্দ্রীয়, বাঙলা ও বিহার গভর্নমেন্টের প্রতিনিধিগণের এক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলনের ফলে যদি কোন কার্যকরী পন্থা অবলম্বিত হয়, তবেই দেশের পক্ষে মঙ্গল। কিন্তু অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে আমাদের আশঙ্কা হইতেছে, সরকার পক্ষের এই উদ্যম শুধু আলোচনাতেই পর্যবসিত হইবে। সম্প্রতি সুন্দরবন অঞ্চলে বিদ্যাধরী নদীর বন্যার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই বন্যার ফলে মহামারী দেখা দিয়াছে। তৃণাদি জলমগ্ন থাকায় গবাদি পশুরও মড়ক দেখা দিবার সম্ভাবনা। জমির উপর লোনা মাটির আস্তরণ পড়ায় তাহা চাষের অযোগ্য হইয়াছে। দেশের বর্তমান এই শোচনীয় খাদ্য সমস্যার দিনে এরূপ বন্যা যে কতদূর ক্ষতিকর, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমরা বাঙলা সরকারের সেচ-বিভাগকে অধিকতর কর্মশক্তির ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে বলিতেছি। অন্যথায় এই গুরুতর পরিস্থিতির ফলে দেশের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিবে। তৎসম্বন্ধে আমরা বাঙলা সরকারকে সতর্ক করিয়া দিতেছি।

দেশের কথা

ব্রিটিশের যুদ্ধোত্তর লক্ষ্য

"বর্তমান যুদ্ধ কোন কোন স্থানের পক্ষে জনযুদ্ধ হইতে পারে কিন্তু আমরা ভারতবাসী আমাদের পক্ষে ইহা জনযুদ্ধ নয়." গত ২১শে পৌষ কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের উদ্যোগে আহূত কলিকাতার একটি সভায় শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু স্পষ্ট ভাষাতেই এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। ইহা সর্বাংশেই সত্য। কারণ বর্তমান যুদ্ধকে আমাদের পক্ষে জনযুদ্ধ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিবার পূর্বে ভারতের সম্বন্ধে ব্রিটিশের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার প্রশ্নই আসিয়া দেখা দেয়। সম্প্রতি নয়াদিল্লী হইতে সৈন্যদের জন্য প্রকাশিত সংবাদপত্রে বিশিষ্ট মার্কিণ সাহিত্যিক মিঃ জন লুই ফিসারের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে ইংলণ্ডের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর অতি চিত্তাকর্ষক আলোকসম্পাত করা হইয়াছে। মিঃ লুই ফিসার লিখিয়াছেন—

"মিঃ চার্চিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিলোপ করিবার ইচ্ছা তাঁহার নাই বলিয়া পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়াছেন, ইহা ব্যতীত ভারতের সম্বন্ধে তাঁহার বোধ হয় অন্য কিছু বলিবার নাই। যুদ্ধের পর ব্রিটেন যদি তাহার সাম্রাজ্যের এক পাদ পরিমিত স্থানও ছাড়িবার প্রস্তাব করে, তবে তেমন প্রস্তাবে রক্ষণশীল ব্রিটিশ রাজনীতিক মহলের নিকট প্রতিবাদের তুফান উঠিবে। যুদ্ধের ফলে গ্রেট ব্রিটেনের অর্থনীতিক অবস্থা টলটলায়মান হইয়া উঠিয়াছে। সে প্রায় দেউলিয়া হইবার মত অবস্থায় গিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহাকে এই অবস্থা হইতে টানিয়া লইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অথবা রাশিয়াকে যুদ্ধের পর কয়েক বৎসর পর্যন্ত তাহাকে বন্ধুভাবে সাহায্য করিতে হইবে।"

গ্রেট ব্রিটেনের বর্তমান অবস্থার বিশ্লেষণ করিয়া মিঃ ফিসার বলেন—

"বৃটেন তাহার মাল কাটতির বাজারের মোটা অংশ—অর্ধেকেরও বেশী হারাইয়াছে। ইহার বেশীর ভাগই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আত্মসাৎ করিয়াছে। এখন ঋণ ও ইজারা ছাড়াও বিদেশে মার্কিনের মাল যুদ্ধের পূর্বে যে পরিমাণ কাটিত,তাহা অপেক্ষা বেশী কাটতি হইয়াছে। দ্বিতীয়ত জাপানীরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া দখল করায় বৃটেন কর্তৃক বিদেশে লগ্নী অর্থের প্রায় অর্ধেক পরিমাণ শত্রুর হাতে গিয়াছে, কিংবা বিশেষভাবে নষ্ট হইয়াছে। উপরন্তু ঋণ ও ইজারা ছাড়াও গ্রেট ব্রিটেন অন্যান্য দেশ হইতে এক কোটি ডলার ঋণ করিয়াছে। তৃতীয়ত বৃটেন বোধ হয় চিরতরেই জাহাজে মাল চালানোর ব্যবসায়ে এবং আন্তর্জাতিক অর্থের লেন দেনের কারবার প্রভৃতি লাভজনক ব্যাপারে তাহার আধিপত্য হারাইতেছে।"

ভারতে শোষণের দায়

মিঃ সামনার ওয়েলস মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী রাষ্ট্রসচিব ছিলেন। 'শান্তি সম্বন্ধে মার্কিণের চিন্তাধারা' শীর্ষক তাঁহার সদ্য প্রকাশিত একখানি পুস্তকে ব্রিটিশের এই যুদ্ধোত্তর অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। মিঃ ওয়েলস লিখিয়াছেন—



"গ্রেট ব্রিটেনকে যদি তাহার যুদ্ধ-পূর্ব অবস্থার জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিতে হয়, তাহা হইলে ১৯৩৯ সাল অপেক্ষা তাহাকে আরও ১৫০ কোটি ডলার মূল্যের দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করিতে হইবে। সে যদি তাহার রপ্তানি দ্বিগুণ করিতে সমর্থ না হয়, তাহা হইলে দেশের লোকের জীবনযাত্রার মান বিশেষভাবে হ্রাস পাইবে; কিন্তু এতদিন দুঃখ ভোগের পর কেহই জীবনযাত্রার মান হ্রাস করিতে সম্মত হইবে না। সুতরাং যুদ্ধোত্তর ব্রিটেনে ইহা লইয়া প্রচণ্ড সমস্যার সৃষ্টি হইবে। পৃথিবীর সর্বত্র জাতীয়তাবাদের প্রসারে ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক প্রাধান্যও হ্রাস পাইবে। ব্যবসা-বাণিজ্য, মুদ্রা বিনিময়, অর্থ বিনিয়োগ, জীবন-যাত্রার মান বৃদ্ধি, সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা প্রভৃতি সম্পর্কে সে আর ইচ্ছানুরূপ কিছু করিতে পারিবে না। ১৬৮৮ সাল হইতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্রিটেন যে শক্তির ভার সাম্য রক্ষা করিবার নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছে, তাহা আর ভবিষ্যতে তাহাকে নিরাপত্তা ও প্রধান্যের নিশ্চয়তা প্রদান করিতে সমর্থ হইবে না।"

যুদ্ধের ফলে গ্রেট ব্রিটেনের যে অর্থনীতিক জীবনে কি পরিমাণ রুধির-ক্ষয় ঘটিয়াছে উল্লিখিত মন্তব্যে সে পরিচয় কিছু মিলিবে। যুদ্ধের পর তাহার স্বাস্থ্যের পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে ভারতকে কি পরিমাণ অংশ গ্রহণ করিতে হইবে, ব্রিটিশের যুদ্ধোত্তর ভারত-নীতি সম্পর্কে ইহা সর্বপ্রথমে বিবেচ্য।

ভারত হাতে রাখাতে স্বার্থ

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি সভা একটি প্রতিষ্ঠাশালী প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান হইতে মিঃ লরেন্স রোজিঙ্গার "এসিয়ার পরাধীন দেশসমূহের স্বাধীনতায় পাশ্চাত্য জগতের ক্ষতি" শীর্ষক একখানা পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তিনি বলেন—

স্বাধীন দেশসমূহের অপেক্ষা নিজেদের অধীন দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থ বিনিয়োগে স্বার্থ অধিক। ১৯৩৮ সালে ব্রিটিশ ব্যবসা-বাণিজ্যের হিসাব হইতেই এই বিষয়ের গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি হইবে। এই হিসাবে দেখা যায়, গ্রেট ব্রিটেন হইতে যত মাল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে, তাহার ক্রেতা দেশ-সমূহের মধ্যে ভারত তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। ভারতের বাজারে ব্রিটিশ পণ্যের হ্রাসকে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা নিশ্চয়ই নিরুদ্বেগের চোখে দেখে নাই; কারণ দেশের এক সম্প্রদায়ের অর্থনীতিক জীবনের সঙ্গে রপ্তানীর গভীরভাবে সম্পর্ক রহিয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধের পর ভারতের বস্ত্র ব্যবসায়ে ব্রিটিশের ক্ষতি ঘটিতে থাকে। ঐ সময় ল্যাঙ্কাসায়ারে ব্যাপকভাবে বেকার সমস্যা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

ভারত স্বাধীনতা লাভ করিলে বৈপ্লবিক অভিব্যক্তির পথে ভারতের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাইবে, এবং সেক্ষেত্রে ভারতের জন-গণের সহযোগিতা করিলেই গ্রেট ব্রিটেনের ব্যবসাবাণিজ্যগত স্বার্থও সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইত পারে, মিঃ রোজিঙ্গার এই যুক্তি দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন—

কোন দেশকে অধীন রাখিতে হইলে যদি সেই দেশের লোকের বিরুদ্ধতাই করিতে হয়, তবে তাহাতে বিজেতা শক্তির অর্থনীতির স্বার্থের সহায়ক হইতে পারে না। ঐসব দেশ যদি স্বাধীনতা লাভ করে, তবে অর্থনীতিক জীবনের সর্বাঙ্গীণ জাগরণের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। এই হিসাবে কোন দেশের অর্থনীতির পরিবর্তন সাধনের মূলে জাতীয়তাবোধের জাগরণের উৎসাহদান করাও প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ভারত স্বাধীনতা লাভ না করিলে সে এখনও শ্রমশিল্পের পথে উন্নত দেশস্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না এবং জাতীয় গভর্নমেণ্ট ব্যতীত অন্য কোন গভর্নমেণ্ট সেকালের ধরণের পরিচালিত ভারতের কৃষি এবং সমাজের পরিবর্তন সাধন করিবার পূর্ণ দায়িত্ব প্রতিপালনে সমর্থ হইবে না। এ ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিলেই যে ইঙ্গ-ভারতীয় প্রীতির সম্পর্ক ছিন্ন হইবে, এমন মনে করা ভুল হইবে। ভারতের সঙ্গে ব্রিটিশ জাতির বহু দিনের অর্থ-নীতিক, রাজনীতিক এবং সাংস্কৃতিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় স্বাধীন ভারত অন্যান্য দেশের চেয়ে গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক রাখিতে চাহিবে; ইহা বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নয়। তবে পরাধীনতার এই বন্ধন তরবারির বলে ছিন্ন না হইয়া উভয়ের সম্মতিক্রমে মোচন হইলেই ভাল আশা করা যায়।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সঙ্কীর্ণ স্বার্থের দৃষ্টিতে আজ অভিভূত; তাঁহারা সহজে এমন যুক্তি মানিয়া লইবেন বলিয়া মনে হয় না।

ভারত শোষণের চেষ্টা

প্রকৃতপক্ষে শোষণ এবং শাসন একের সঙ্গে অন্যটির যোগ রহিয়াছে; এমন অবস্থায় ভারত স্বাধীনতা লাভ না করিলে ব্রিটিশের সঙ্গে ভারতবাসীর স্বার্থ সংঘাত অনিবার্য হইয়া উঠিবে। সম্প্রতি ভারতীয় বণিক সভার অধিবেশন হইয়া গেল। এই অধিবেশনের সভাপতিস্বরূপে মিঃ বি এম বিড়লার প্রদত্ত অভিভাষণে এই স্বার্থ-সংঘাতের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি বলেন—

"এদেশের বিশিষ্ট ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ ইংলণ্ড এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণে গিয়াছেন। তাঁহাদের সংবর্ধনার জন্য আহূত কোন কোন সভায় ব্রিটিশ বাণিজ্যপতিগণ যে সব বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহা হইতে মনে হয়, তাঁহারা এখনও ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাবধারায় চিন্তা করেন। ইহারা ইংলণ্ডের মূলধন ভারতে খাটাইবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের বৈজ্ঞানিকদিগকে অনেক উপদেশ বাণী শুনাইয়াছেন। ইংলণ্ডের মূলধন ভারতে খাটানোতে আমাদের আপত্তি নাই, বরং আমরা তাহাতে আনন্দের সঙ্গেই রাজী হইব; কিন্তু সেক্ষেত্রে সর্ত থাকিবে এই যে, যে সব শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই টাকা খাটিবে, সেগুলি আমাদের দ্বারা পরিচালিত হইবে। আমাদিগকে সাহায্য করিবার ভাব লইয়াই ব্রিটিশ ব্যাপারীদিগকে এক্ষেত্রে কাজ করিতে হইবে, কিন্তু সহযোগিতা করিবার ছলে আমাদের শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার মতলবে নয়। ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা যেন একথাটা এখনও বোঝেন যে, ভারতবর্ষকে যন্ত্রপাতি দিয়া সাহায্য করিবার অধিকার তাঁহাদেরই একচেটিয়া নয়। আমরা ব্রিটেনের নিকট হইতে তেমন সাহায্য লইতে চাহিব এবং সেজন্য দস্তুরমত মূল্য দিতেও প্রস্তুত আছি; কিন্তু ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা যদি এমন আশা করেন যে, আমরা তাঁহাদের অধীন হইয়া চলিব তবে আমরা বরং অন্য দেশ হইতে ঐ ধরনের সাহায্য লাভের চেষ্টা দেখিব; তবু ইংরেজের কাছে যাইব না। আমরা যদি এমন পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হই, তবে তাহা নিশ্চয়ই প্রীতিপ্রদ হইবে না। কিন্তু সে দোষ আমাদের নয়; যাহারা আমাদের ঘাড়ে আমাদের স্বার্থবিরোধী সর্তসমূহ আরোপ করিতে চায়, তাহারাই সেজন্য দায়ী।"

স্বাধীনতাই প্রথমে প্রয়োজন

সুতরাং ভবিষ্যতের সম্বন্ধে ভারতের অবস্থা ব্রিটিশ প্রভুত্বমুক্ত স্বাধীনতা লাভের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে ইহা বুঝিতে গোল থাকে না। শ্রীযুক্ত গগনবিহারীলাল মেটা যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ব্যবসায় সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য সেখানে গিয়াছিলেন। তিনি সম্প্রতি দেশে ফিরিয়াছেন। যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগের পূর্বে তিনি ভারতের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। এই বিবৃতিতে তিনি বলেন—

ভারতের জনগণের নিকট দায়িত্বশীল প্রতিনিধিত্বমূলক জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না হইলে ভারতের অবস্থার উন্নতি সাধিত হইতে পারে না; ইহা নিশ্চিতরূপে বুঝিয়াই ভারতের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় স্বাধীনতা লাভের জন্য জাতীয় আন্দোলন সমর্থন করিয়াছেন। কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয় শ্রমশিল্পী বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলিয়াছেন যে, এইরূপ জাতীয় গভর্নমেণ্ট ভিন্ন ভারতে অন্য কোনরূপ অর্থনীতিক পরিকল্পনারও সার্থকতা লাভের সম্ভাবনা নাই। অতীতের দুঃখজনক অভিজ্ঞতা হইতে ভারতের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বুঝিতে পারিয়াছেন যে, জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত



ভারতের জন্য যেসব আর্থিক নীতি ও ব্যবস্থা অনুসৃত হইবে, ঐগুলি ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডলের নির্দেশ অনুসারেই হইবে; এরূপ অবস্থায় সেগুলি যে ভারতের স্বার্থের অনুকূলে হইবে, তাহা বলা চলে না।

মিঃ সামনার ওয়েলস তাঁহার সদ্য প্রকাশিত গ্রন্থে ব্রিটিশ শাসনে ভারতের অর্থনীতিক উন্নতিসাধনে প্রযুক্ত পরিকল্পনাসমূহের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

ভারতের যে উন্নতি হইয়াছে, তাহার বৃহত্তর অংশের মূলে রহিয়াছে টাকা খাটাইয়া লাভ করিবার প্রবৃত্তি। এইসব নীতি অথবা ভারতের বিভিন্ন বড়লাটের মনোমত জাঁকালো পরিকল্পনাসমূহ ভারতকে আধুনিক দেশে রূপান্তরিত করিতে সহায়তা করিয়াছে, ইহা সত্য; কিন্তু ভারতের মূল সমস্যার তাহাতে কোন প্রতীকার হয় নাই। ঐগুলি ভারতীয় জনসাধারণের বিষম দারিদ্র্যকে স্পর্শও করিতে পারে নাই।"

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতিস্বরূপে স্যার শান্তিস্বরূপ ভাটনগরও পরাধীন অবস্থাই যে ভারতের দুর্গতির মূলে রহিয়াছে এমন কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি অভিভাষণে বলেন—

ভারতে জনসাধারণের প্রতিনিধিত্বমূলক জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠাই যে, ভারতের জাতীয় উন্নতি সাধনের প্রকৃষ্টতম ও সহজ উপায়, তাহা বলাই বাহুল্য। যাহা হউক, বর্তমানে তাহা নাই বলিয়া ভারতের চিন্তাশীল নর-নারীগণ তাঁহাদের দেশের জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য বর্তমান অবস্থার মধ্যে এবং ভবিষ্যতের আশায় যে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে না এরূপ মনে করা সংগত হইতে পারে না। আমার এই দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে, দেশবাসী শ্রমিক ও বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ভারতের কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধনে সাধ্যমত কার্য ক না।

স্যার শান্তিস্বরূপের উক্তির শেষাং যুক্তির সংগে আমাদের বিশেষরকম মত রহিয়াছে। ব্যক্তিগত সদিচ্ছা কিংবা মু মেয়ের মনীষা সমগ্র জাতির ব্যা সমস্যার কোনদিনই সমাধান করিতে স হয় না; শুধু সমুন্নতির বৈপ্ল প্রেরণায় জাগ্রত জনগণের প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত গবর্ণমেণ্টের চেষ্টা তাহা সম্ভব।

উক্তি ও শাসননীতি

কিন্তু আজ ভারতের সম্বন্ধে মৌলিক প্রশ্নটিই অনেক ক্ষেত্রে চা দেওয়া হইতেছে। সম্প্রতি কলিকা রোটারী ক্লাবের রজত জয়ন্তী ভোজ সভ বাঙলার গভর্নর মিঃ কেসী দেশে উন্নতিসাধনে বে-সরকারীভাবে প্রবৃ হইবার জন্য আমাদিগকে আহবান করিয়াছেন বাঙলা দেশের বর্তমান অবস্থার ক উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন—

আমার মনে হয়, বর্তমানে বাঙলায় জ হিতকর সেবাকার্যে যেমন সুবিধা আ জগতের কুত্রাপি তাহা নাই। বাঙলার অবস্ কি ভাবিয়া দেখুন। আয়তনে এই প্রদে ইউনাইটেড কিংডমের অপেক্ষা কিছু ছোট, ভূ এখানকার অত্যন্ত উর্বর। সমস্তটা অঞ্চল কৃষিদের দ্বারা কর্ষিত এবং তাহাদের প্র সকলেই খাদ্যশস্য উৎপাদনে ব্যাপৃত; কিন তথাপি আমরা দেখিতেছি, স্বাভাবিক অবস্থাতে এই প্রদেশের উপযোগী খাদ্যশস্য এখানে উৎপ হয় না এবং অপ্রিয় হইলেও ইহা সত্য যে বাঙলার অধিবাসীদের অধিকাংশ কায়ক্লে জীবনধারণ করে, মাত্র বাঁচিয়া থাকিবার জন যাহা প্রয়োজন তাহাও অধিকাংশের জুটে না।

বাঙলার গভর্নর বাঙলার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন সুদীর্ঘকালব্যাপী ব্রিটিশ শাসনের নিন্দা ইহার অপেক্ষা আর কিছু হইতে পারে বলিয়া মনে করি না। এই প্রসঙ্গে মিঃ কেসিকে আমরা এই কথা বলিতে পারি যে, জনসেবার প্রবৃত্তি বাঙলা দেশে যতটা জাগ্রত ভারতের অন্য কোন প্রদেশেই ততটা নহে। জাতীয়তার প্রেরণায় যাঁহারা প্রণোদিত, তাঁহারাই এক্ষেত্রে অগ্রণী হইয়া থাকেন। হিসাব করিলে দেখা যাইবে দেশসেবা এবং জনসেবার আদর্শে অনুপ্রাণিতদের মধ্যে নির্যাতিতের সংখ্যা সব সময়েই বাঙলা দেশে অধিক হইয়া থাকে। মিঃ কেসির উক্তিতে বাঙলার দুর্গত জনগণের প্রতি তাঁহার সহানুভূতির পরিচয় আমরা পাইতেছি; কিন্তু শাসনের মূলীভূত নীতির গতি কোন দিকে এক্ষেত্রে তাহাও বিবেচ্য হইয়া পড়ে। জনস্বার্থে রাষ্ট্রশক্তির একান্ত চেতনা ব্যতীত, বে-সরকারী সেবা প্রবৃত্তিও স্বচ্ছন্দ হইতে পারে না এবং তেমন আবহাওয়া গড়িয়া উঠে না; সমস্যার ব্যাপকতার

তুলনায় বে-সরকারী প্রচেষ্টা একান্তই সামান্য সার্থকতা লাভ করিতে পারে; কিন্তু সে কথা এখানে তুলিব না।

জগতের যুগ-সন্ধিক্ষণ

বস্তুতঃ বাঙলার দুর্গতি কিংবা ভারতের দুর্গতির প্রতীকার সাময়িক কোন তুকতাকে হইবে না। সে ধরণের চিকিৎসায় ব্যাধি কিছুদিন চাপা থাকিতে পারে; কিন্তু আরও জটিল আকার ধারণ করিবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন শাসনতন্ত্রে জাতীয় স্বার্থবোধে জাগ্রত জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা। ব্রিটিশ জাতির সদিচ্ছার উপরেই তাহা নির্ভর করে না। সম্প্রতি বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলনের সভাপতিস্বরূপে মিঃ হুমায়ুন কবির তাঁহার অভিভাষণে সে কথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন—

"ভারতবাসীদের কাছে একটা সুযোগ আসিয়াছে, যদি তাহারা ইহা গ্রহণ করিতে পারে, তবেই ভবিষ্যতের কিছু আশা আছে। যুদ্ধ বিরতির সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক ঈর্ষার বিরতি ঘটিবে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জঠরে ইতিমধ্যেই তৃতীয় মহাযুদ্ধের ভ্রূণ বিকাশ লাভ করিতেছে। এই যুদ্ধের আবহাওয়ার মধ্যেও ইঙ্গ মার্কিন, ইঙ্গ-রুশ এবং রুশ-মার্কিন স্বার্থ সংঘর্ষের ব্যাপার গোপন রাখা সম্ভব হইতেছে না। সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ আরও ভয়াবহ হইয়া উঠিতেছে। এবং জগতের সর্বত্র তাহারা ধনতন্ত্রী এবং সাম্রাজ্যবাদীদের এইভাবে যুদ্ধ চালনায় বিরক্ত হইয়া পড়িতেছে। ইংলণ্ডে পর্যন্ত সাধারণ ইংরেজদের মনে এই চিন্তা দেখা দিয়াছে যে, প্রত্যেক কুড়ি বৎসর পর পর এই ধরণের এক একটি যুদ্ধ এবং তৎসম্পর্কিত দুঃখ-দৈন্য ও ক্লেশ বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যের জন্যও বাঞ্ছনীয় নয়। সুতরাং ভারতবাসীরা যদি আজ স্বাধীনতা অর্জন করিতে সমর্থ হয় তবে, ইংরেজ জনসাধারণ ভারতের উপর ব্রিটিশ প্রভুত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সংগ্রাম করিতে অস্বীকৃত হইতে পারে। অবশ্য, ইহা আশা করা যায় মাত্র এবং ভারতবাসীরা যদি স্বাধীনতা লাভ করে, তবেই এমন সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। নতুবা, ভারতবাসীদিগকে স্বাধীনতা দান করিবার জন্য ব্রিটেশ জনসাধারণ চেষ্টা করিবে, এমন আশা দুরাশা মাত্র। ভারতবর্ষ একবার যদি স্বাধীন হয়, তবে তাহাকে পুনরায় অধীন করিবার জন্য ব্রিটিশ জাতি চাহিবে না. আমরা বড় জোর এইটুকুই আশা করিতে পারি।"

মিঃ হুমায়ুন কবিরের এই উক্তি জনযুদ্ধের জিগীরওয়ালাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনে সাহায্য করিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

বৈপ্লবিক প্রবৃত্তির সাড়া

আমরা আগাগোড়াই একথা বলিয়াছি যে, বর্তমান যুদ্ধকে আমরা কিছুতেই জনযুদ্ধ বলিতে প্রস্তুত নহি; তবে মিঃ হুমায়ুন কবিরের মত আমরাও সমর্থন করি; অর্থাৎ এই যুদ্ধের ফলে জগতের সর্বত্র জনগণের মধ্যে আত্মাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য একটা বৈপ্লবিক প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিতেছে। 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রে আনে ও'হেয়ার ম্যাক করমিক গ্রীস, বেলজিয়াম এবং ইতালীর বর্তমান সমস্যার আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন—

"ব্যাপার ততটা সহজ নয়, জার্মাণ অধিকৃত এ সব দেশেই বিপ্লবী দল আছে এবং সর্বত্র মিত্রশক্তির দ্বারা তাহারা এতদিন পর্যন্ত উৎসাহিত হইয়াছে এবং মিত্রশক্তি কর্তৃক তাহারা অস্ত্রশস্ত্রেও সুসজ্জিত হইয়াছে। উদ্ধারকারী মিত্রশক্তির বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিবার জন্য যখন উহারা প্রকাশ্য দিবালোকে আসিল, তখন উদ্ধারকারীদের সেনাবাহিনীর আচরণের বিরুদ্ধে তাহাদিগকে গোপনে অথবা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ অবলম্বন করিতে হইল। সমস্যার গুরুত্ব কতখানি গ্রীসে আমরা তাহার প্রথম পরিচয় পাইলাম। কিন্তু এই দৃষ্টান্তই শেষ দৃষ্টান্ত নয়। ইউরোপের এবং সমগ্র মানব জগতের শান্তি এই সমস্যা সুষ্ঠু সমাধানের উপর নির্ভর করিতেছে। এক্ষেত্রে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সাহসী এবং আদর্শবাদী তরুণের দলের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হইতেছে। প্রত্যেক দেশেই এই বৈপ্লবিক শক্তিকে আশ্রয় করিয়া মিত্রশক্তির পক্ষে জটিল সমস্যার উদ্ভব হইতেছে এবং ইহাদের এই বৈপ্লবিক প্রাণশক্তি যদি কার্যক্ষেত্র না পায়, তবে অধিকতর উগ্র আকার ধারণ করিবে। শুধু মানচিত্রের উপর নজর রাখিলে চলিবে না. এই আদর্শপ্রাণ যুবকের দলই জগৎকে নূতন আকার দান করিতে চেষ্টা করিবে। ইহাদের সঙ্গে বুঝাপড়া করিতে গিয়া মিত্রশক্তি ভবিষ্যৎ জগতেরই সম্মুখীন হইতেছেন। এ পর্যন্ত তাঁহারা এক্ষেত্রে একান্ত দূরদৃষ্টির অভাবই প্রদর্শন করিয়াছেন।"

গ্রীস, বেলজিয়াম, ইতালীর সম্পর্কেই মিত্রশক্তির পক্ষে এই সমস্যা দেখা দেয় নাই—ভারতেও এই সমস্যার সম্ভাব্যতাকে তাঁহারা নিজেদের সংকীর্ণ স্বার্থগত বিচারবুদ্ধির ভ্রমে পুষ্ট করিয়া তুলিতেছেন। এক্ষেত্রেও সত্যকে সহজভাবে স্বীকার না করিয়া কূটনীতির খেলায় তাঁহারা প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এমন নীতির প্রতিক্রিয়াজনিত বিড়ম্বনাও তাহাদিগকে ভোগ করিতে হইবে।

যুদ্ধোত্তর জগৎ ও ভারত

দেখিতেছি, ধর্ম জগতেও এই চিন্তাধারা সাড়া জাগাইয়াছে। চীন, জাপান, ফিলিপাইন, কোরিয়া এবং ভারতের ২৩ জন পাদরী সম্প্রতি একটি বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন। এই বিবৃতিতে তাঁহারা বলেন, মিত্রশক্তি যদি এশিয়াতে তাহাদের প্রাধান্য পাকা রাখিতেই চেষ্টা করিতে থাকেন, তবে এশিয়ার পূর্বঅঞ্চল সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বন্দ্বভূমিতে পরিণত হইবে। মিঃ এম আর মাসানি সেদিন বোম্বাইতে একটি বক্তৃতায় এ সম্বন্ধে বলেন—

সাবেক সাম্রাজ্যবাদীরা তো আছেই। ব্রিটেন, ফরাসী, ওলন্দাজ—ইহারা সকলেই ব্রহ্মদেশ, মালয়, ইন্দো-চীন এবং পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের উপর নিজেদের দখল পুনরায় কায়েম করিতে চাহিতেছে; ইহা ছাড়া দুইটি নূতন রকমের সাম্রাজ্যবাদের চাপও এশিয়ার উপর আসিয়া পড়িতেছে; তন্মধ্যে একটি মার্কিণ, ইহা এখনও অঙ্কুর অবস্থায় আছে। সম্ভবতঃ অর্থনৈতিক প্রভুত্বের আকার পরিগ্রহ করিবে। অপরটি রাশিয়া। সেও উত্তরোত্তর সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রস্বরূপে নূতন আশঙ্কার কারণ সৃষ্টি করিয়াছে।

যুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক আদর্শের প্রেরণায় এই সব সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিবে মিঃ মাসানি ইহা বিশ্বাস করেন না। আমরাও তাঁহার সেই মতই সমর্থন করি।

স্বাধীনতার নূতন সনদ

আটলাণ্টিক সনদ দস্তুরমত পাকা দলিল এবং তাহা ১৯৪১ সালে যেমন বৈধ ছিল, ১৯৪৫ সালেও সেইরূপই আছে, আমেরিকার ভূতপূর্ব সহকারী রাষ্ট্র সচিব মিঃ সামনার ওয়েলস সম্প্রতি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। সেই সঙ্গে তিন এই এই আশঙ্কাও ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যদি অবিলম্বে ঐ সনদে স্বীকৃত অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বিত না হয়, তবে শেষটা রাজনীতির কূট খেলায় গণতান্ত্রিক প্রয়োজন সিদ্ধির পক্ষে উহা ব্যর্থ হইতে পারে। বলা বাহুল্য মিঃ সামনার ওয়েলসের এই উক্তিতে আমাদের পক্ষে আশা করিবার কিছুই নাই; কারণ শুধু সদুপদেশের জোরে আটলাণ্টিক সনদ কার্যকর হইয়া উঠিবে এমন বিশ্বাস আমরা আদৌ অন্তরে পোষণ করি না। এই সঙ্গে এই মর্মে আর একটি খবর দেখিতেছি যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব ভাইস প্রেসিডেণ্ট মিঃ ওয়ালেস অধীন দেশসমূহের স্বাধীনতার জন্য নূতন একটি সনদ প্রণয়নে মনোনিবেশ করিয়াছেন এবং ইহাও শুনিতেছি যে, এই দলিল ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রযুক্ত হইবে। এই নূতন সনদ সাবেকী আটলাণ্টিক সনদ অপেক্ষা অধিক স্পষ্ট হইবে ইহাও প্রকাশ; কিন্তু আমরা ইহাই সোজাসুজি বুঝি যে, এই সব রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজীর অবসান ঘটিলেই ভাল হয়। আমাদের মতে শক্তির প্রতি ভক্তি ইহাই রাজনীতির সার মর্ম এবং সে সত্য সনাতন; এক্ষেত্রে আদর্শবাদের বড় বড় কথা শুধু সংকীর্ণ স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যেই পরিকল্পিত হইয়া থাকে এবং সে স্বার্থ সিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত সেগুলির মৌখিক প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয়।

ট্রামে-বাসে

ইংরেজী নববর্ষের প্রারম্ভে আমাদের ট্রামে-বাসের সহযাত্রীদের সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। সারা বৎসর ধরিয়া যে অপরিসীম ধৈর্যের সঙ্গে তাঁহারা বাদুড় ঝোলা হইয়া ট্রামে-বাসে ভ্রমণ করিয়াছেন, হাতে ক্ষমতা থাকিলে তাঁদের এই অতি-মানবীয় সহিষ্ণুতার জন্য নববর্ষে কোন গালভরা খেতাবের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিতাম। যাহা হউক, প্রস্তাবিত কল্পনানুসারে ১৯৪৫ সালের প্রথমে যা সম্ভব হইল না, তাহা ১৯৪৬ সালে সম্ভব হইবে অর্থাৎ ট্রাম কোম্পানী হস্তান্তরিত হইবে এবং আমরা অতঃপর স্ত্রী-পুত্র-পরিবার লইয়া বসিয়া গড়াইয়া ট্রামে ভ্রমণ করিতে পারিব, অন্ততঃ পদদ্বয়কে অ-পিষ্ট অবস্থায় রাখিয়া এককোণে দাঁড়াইয়া যাইতে পারিব—নববর্ষে সহযাত্রীদের জন্য সেই প্রার্থনাই করিতেছি। আমাদের ট্রাম ধরার ভাগ্য উত্তরোত্তর বর্ধিত হউক।

* * * *

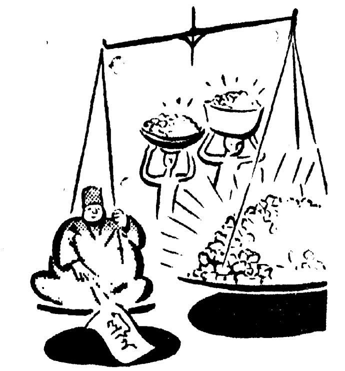
অন্যান্য বছরের তুলনায় এবারে সর্বসাধারণের মধ্যে বিতরিত খেতাবের পরিমাণ বড়ই কম বলিয়া মনে হইল। আমাদের সর্বগ্রাসী অভাব এবং অভিযোগের মধ্যে এই খেতাবই ছিল একমাত্র সান্ত্বনা। কিন্তু খেতাব বণ্টনের ধারা দেখিয়া মনে হইল সরকার এই ব্যাপারেও রেশনিংএর ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছেন। যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার



মধ্যে খেতাবের অব্যাহত ধারার সুব্যবস্থার জন্য আমরা এখন হইতেই সদাশয় গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া রাখিতেছি। দেশের স্বাধীনতা, বন্দী নেতাদের মুক্তি প্রভৃতি অশেষবিধ প্রার্থনার মত আমাদের এই প্রার্থনাটি যেন গবর্ণমেণ্ট না-মঞ্জুর না করেন।

* * * *

মহামান্য আগা খাঁকে মাপিয়া হীরক উপঢৌকন দেওয়া হইবে বলিয়া তাঁর শিষ্য সম্প্রদায় একটি সংবাদ প্রচার করিয়াছেন। আগা খাঁর অনুরক্তদের বৈভব বিশ্ববিশ্রুত। স্বর্ণের পর এই হীরক অর্ঘ্য আর একবার তাঁহাদের কুবেরত্বই স্মরণ করাইয়া দেয়। এই প্রসঙ্গে মহামান্য আগা খাঁর লীগের সঙ্গে যুক্ত থাকার অস্বীকৃতির কথা আর একবার মনে পড়িয়া গেল। পাল্টা জবাব হিসাবে কায়েদে আজমকে মাপিয়া হীরক উপঢৌকনের ব্যবস্থা যদি লীগপন্থীরা করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আগা খাঁ হয়ত বুঝিতে পারিবেন—এই প্রতিষ্ঠানটি একেবারে নেহাৎ ফেল্‌না নয়। তারপর



আগা খাঁর মেদবহুলতার তুলনায় কায়েদে আজমের ওজনও ঢের কম: সুতরাং অতি সস্তায় এই কিস্তিটা মাৎ করিয়া দেওয়া যায়।

* * * *

একটি সাম্প্রতিক খবরে প্রকাশ, মহাত্মা গান্ধী নাকি কাগজ বাঁচাইবার নীতিটি যথারীতি পালন করিতেছেন। কোন পত্রের উত্তর দিতে হইলে—সেই পত্রেরই অপর পৃষ্ঠায় কিম্বা স্থানাভাব হইলে ব্যবহৃত খামের ভিতরের অংশটিও তিনি ব্যবহার করিতেছেন। অথচ একদিন ছিল যখন মহাত্মা সর্ত লিখিয়া দিবার জন্য জিন্না সাহেবকে এক সীট পুরো কাগজ সই করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। আজ এই কাগজ নিয়ন্ত্রণের দিনে মহাত্মা হয়ত ততখানি কাগজ আর দিতে পারিবেন না এবং যতটা দিতে পারিবেন, তাতে বোধ হয় জিন্না সাহেবের অনন্ত সর্তের এক-চতুর্থাংশও ধরিবে না। ভারতের ভাগ্যই এমনি! সুবর্ণ সুযোগগুলি হাতের কাছে আসিয়াও ফস্‌কাইয়া যায়!

* * * *

প্রচার সচিব গোয়েবল্‌স্‌ জার্মান miracle হিটলারের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতায় বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার সম্বন্ধে প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ হইয়া পড়িয়াছেন। এই গুণকীর্তনের প্রসঙ্গে তিনি জার্মানীর নরনারীকে শুনাইয়াছেন যে, হিটলার যেমন সাধাসিধা ভাবে ভাতে-ভাত খাইয়া দিন কাটান সেই ভাবে যদি জার্মান অধিবাসীরা খানাপিনা করিতে পারিত, তাহা হইলে আর দেশের খাদ্য সংকট কখনই হইত না। প্রচার সচিব মহাশয় বেফাঁসভাবে খাদ্য সংকটের কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু



সে যাহা হউক, "German miracleকে আরও বিস্ময়ের বস্তু করিয়া তুলিতে হইলে —তাহাকে একবার বাংলায় পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করুন। ভাতে-ভাত হইতেও সাধাসিধা খাদ্য এখানকার ডাস্টবিন হইতে কুড়াইয়া খাইতে শিখিলে জার্মান নরনারীর সম্মুখে হিটলার আরও উচ্চতর আদর্শ সংস্থাপন করিতে পারিবেন এবং ইহার পর হিটলারী নীতি সম্বন্ধে মানুষের আর সন্দেহের কোন অবকাশ থাকিবে না।

* * * *

"ম্যার দিস্" বলিয়া বিশু খুড়ো যেভাবে চেঁচাইয়া ট্রামে চড়িলেন এবং তার অনুরক্ত ভ্রাতুষ্পুত্রদের প্রতি যেভাবে তাঁর কদম্ব-বিড়ম্বিত শ্মশ্রুরাজির ভিতর হইতে দন্তবিকাশ করিতে লাগিলেন, তাহাতে মনে হইল খুড়ো বুঝি নববর্ষে খেতাব পাইয়া গিয়াছেন। কৌতূহল সম্বরণ করিতে না পারিয়া অগত্যা জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি খুড়ো, খেতাব পেলে নাকি?' উত্তরে খুড়ো হাসিতে হাসিতেই বলিলেন—"খেতাব নয়, পাঁঠা।" বাংলা সরকার ছাগ-প্রজননে মন দিয়াছেন সুতরাং "দুঃখনিশা গেছে কেটে!" জানিতাম খুড়ো মাংসের খুব ভক্ত, কিন্তু মিশকালো দেশী পাঁঠা ছাড়া খুড়ো কখনই রামছাগলের মাংস খান না। খুড়োকে ভড়কাইয়া দিবার জন্য বলিলাম—"জানো, এসবই হবে রামছাগল"। মুহূর্তের মধ্যে খুড়োর হাসি মিলাইয়া গেল—কিন্তু পরক্ষণেই সামলাইয়া নিয়া বলিলেন,—"আমার সঙ্গে ওস্তাদি করতে হবে না। লীগ মন্ত্রিমণ্ডল ছাগ প্রজননে "রাম" কথাটাকে বিনা বাধায় ঢুকতে দেবেন, আর তাই আমি বিশ্বাস করব?"—সত্যি, খুড়োর Political foresightএর তুলনা হয় না।

শিক্ষা দেওয়া সহজ নয়!

শিবরাম চক্রবর্তী

"মাস্টারি? মাস্টারির কথা বলছ? মাস্টারির কথা আর বোলো না।" আমি বল্লাম।

এখনো আমি ইস্কুলের স্বপ্ন দেখি, সে কথা সত্যি। বই বগলে পড়তে যাচ্ছি, খাতাকলমে এগ্‌জামিন দিচ্ছি, মাস্টারের হাতে কানমলা খাচ্ছি—এসব দৃশ্য দেখি এখনো। এবং এসব আমার কাছে সুখস্বপ্ন।

কিন্তু—কিন্তু মাস্টারির স্বপ্ন কখনো আমি দেখি না।

মাস্টারি কখনো করিনি যে তা নয়। একবার করতে হয়েছিল কিছুদিনের জন্য, বকলমে যদিও। কিন্তু তার স্মৃতি আমার কাছে দুঃস্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়।... শিক্ষা দিতে গিয়ে শিক্ষালাভ করতে কি ভালো লাগে? কেউ বলুক?

"বেশ ভালো বেতন ছিল কিন্তু।" অনুরোধের উপর বন্ধুর উপরোধ।

"যত টাকাই দিক্ প্রাণ থাকতে আর নয়।" আমি শিউরে উঠি।

"দশ বছর মাস্টারি করলে গাধা হয়ে যায় বলে। সেই ভয়েই নাকি—?"

বন্ধুর মধ্যে বন্ধুরতা দেখা দেয়।

"গাধা হয় কিনা জানিনে, তবে ছাত্র হয়ে যেতে হয় সত্যি। আমাকে তো দশ দিনেই ছাত্রত্ব স্বীকার করতে হয়েছিল,—কিন্তু সেজন্যে নয়।"

"এর আগে মাস্টারি করেছিল বুঝি কখনো?" বন্ধু বিস্মিত হোলো।

"হ্যাঁ, করতে হয়েছিল। একবার, এক বন্ধুর বিকল্পে। আমার জীবনে সেই প্রথম আর সেই শেষ।"

"কিন্তু শিক্ষাদান তো মহৎ ব্রত।" বন্ধু তথাপি নাছোড়।

"তা জানি। কিন্তু শিক্ষা দেয়া সহজ নয়, সে কথাও আমার জানা আছে। শিক্ষা দিতে গিয়ে উলটে শিক্ষা পেয়ে আসতে হয়। আর সত্যি কথা বলতে কি, শিক্ষালাভ করতে আমার একদম ভালো লাগে না। এটা আমার ছেলেবেলার থেকেই।" আমি প্রকাশ করেই ফেলি।

"সেই কারণেই তুমি বনেদী শিক্ষক হতে পারতে। শিক্ষালাভে যাদের অরুচি তারাই তো শেখায়। তোমার বনেদ্ বেশ পাকা ছিল।" বন্ধু বল্লঃ "তোমার আপত্তির কারণটা শুনতে ইচ্ছে হয়। কী হয়েছিল মাস্টারি করতে গিয়ে জানতে পারি?"

"সে এক মর্মন্তুদ কাহিনী। শুনবে নিতান্তই?—তাহলে শোনো।..."



"—আমার কাছে সুখস্বপ্ন।"

"আমার এক বন্ধু ছিল ইস্কুল মাস্টার। অসুখে পড়ে আমাকে তার বদলি দিয়ে মাস খানেকের ছুটি নিয়ে সে দেশে গেল। অসুখের মধ্যেও এতটুকু সুখ মাস্টারদের সয় না—তাদের অদেষ্টই এইরূপ। এমনি সাবু তাকে দিতে পারো, কিন্তু তার সঙ্গে একটু যদি মিছরি মিশিয়ে দাও তাহলেই তার হয়ে গেছে। সেই মিছরিটুকুই তার কাল হবে।

ছুটি বলে' মাস্টারদের কিছু নেই। দশটা চারটে ইস্কুল তো আছেই—তার ওপরে এবেলা ওবেলা টিউশানি। সকাল, বিকাল, সন্ধ্যে, রাত্রি—সমান ছুটোছুটি। ছুটি নেই। ভ্যাকেশনেও ছুটি নেই। রেহাই দেয় কে? মরবার আগে মাস্টারদের ছুটি হয় না। এবং ছুটি পেলেই তারা মারা পড়ে। আমার বন্ধুটিও বোধহয় এই কারণেই দিন দশেক ছুটি উপভোগ করতে না করতেই আমার মাস্টারি পাকা করে দিয়ে ইহলোক এবং এই ইস্কুলের বালকদের মায়া কাটালেন।

মাস্টারি পাকা হলে কি হবে, মাস্টারির ব্যাপারে আমি কাঁচা ছিলাম নেহাৎ। পাকা মাস্টার যে কখনো দেখিনি তা নয়,—পঠদ্দশায় দেখেছি, শিক্ষকদশাতেও দেখলাম। সেই ইস্কুলেই দেখা গেল—বেশ পাকা পাকা শিক্ষক। অনেক ভালো ভালো লোক এই ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন—জানি। তবে আমি যে তাঁদের পাকচক্র কাটিয়ে বেরিয়ে আসতে পেরেছি সেজন্যে খোদাকে ধন্যবাদ!

কেবল মাস্টাররাই নন্, পড়ুয়াদেরও বেশ পাকা পাকা বলতে হবে। এই দোতরফা পরিপক্ক প্যাঁচে পড়ে যে অভিজ্ঞতা—যে অমানুষিক অভিজ্ঞতা আমি লাভ করেছি তা কহতব্য নয়—তুমি কি নিতান্তই শুনতে চাও?—

নেহাৎ না শোনালে যদি না ছাড়ো তো শোনো। আমার কিন্তু সে দুঃখ-কাহিনী কাউকে বলার উৎসাহ হয় না। জানো তো ইস্কুলের আমার যা বিদ্যে তাতে ভালো ছাত্র কোনো দিন আমায় বলা চলত না, তবু তারই বহরে মাস্টারিটা বোধহয় ভালোই চালিয়ে নেব, এইরূপ আমার ধারণা ছিল। ছাত্র হওয়ার পক্ষে যা কিছুই নয়, শিক্ষক হওয়ার পক্ষে তাই যথেষ্ট, এমনকি গুরুতরও বলা যায়। ছোটরা তো বড়োদের পড়া নিতে পারে না—এটা এক মস্ত সুবিধা। অতএব কাজটা পাকাপাকি হতেই কোমড় বেঁধে লেগে গেলাম।

বলেছি তো পড়ুয়ারা বেশ পাকাপোক্ত। অনেকেরই দাড়িগোঁফ বেরিয়ে গেছে, কেউ কউ আবার বয়সে আমার বড়। অমন চক্ষু বিস্ফারিত কোরো না, ওতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, এ যুগের কথা তো বলছিনে। তখনকার কালে প্রায়ক্ষেত্রে বাল্যশিক্ষা ও বাল্যবিবাহ এক সঙ্গে সুরু হোতো—ষোলো বছরে পা দেবার পরে। চাণক্যের উপদেশ মত, পাঁচ বছর পর্যন্ত আদরে থেকে, দশ বছর বাপ মা খুড়ো জ্যাঠার তাড়না সহ্য করে' ষোলো বছরে একেবারে পাঠা হয়ে পঠদ্দশালাভ! বই এবং বউ—দুরকম পাঠ্য একসঙ্গে—সিস্টেমটা কিছু মন্দ ছিল না। যাই হোক, আমার একটু মুস্কিল হোলো, ওরা আমায় মানবে কি, উলটে আমারই ওদের মান্য করে' চলতে হোতো।

তবু চালিয়ে নিয়েছিলাম। আমি লেখক বলে আমাকে ওরা বাঙলার মাস্টার করে দিয়েছিল। লেখক হওয়া সত্ত্বেও, যতগুলো বাঙলা বানান আমার নির্ভুল জানা ছিল, ওদের পড়াতে পড়াতে প্রায় তার সমস্তই আমি ভুলে গেলাম। এক-একটা শব্দের যে কতদূর সম্ভাবনা আছে, কতগুলো বানান হতে পারে, তা এগ্‌জামিনের খাতা দেখলে জানা যায়। এক পৃথিবী বানানই আমি আট রকমের দেখেছি—প্রত্যেক ছেলের মাথায় পৃথিবী বানাবার আলাদা আইডিয়া। তুমি যদি পৃথিবীর বানান এখন আমায় জিজ্ঞেস কর, আমি হয়ত সঠিক বলতে পারব না। আদি যুগের সেই মাস্টারির দৌলতে আমার ষত্ব-ণত্ব-জ্ঞান পর্যন্ত লোপ পেয়েছে।

তবু, এত বোঝা বওয়াও আমার পক্ষে ভারী ছিল না, বোঝাতেও বেশ পারতুম, কিন্তু মুস্কিল বাধলো বুঝতে না পারায়। সেটা আমার দিক থেকেও বটে, ওদের দিক থেকেও বটে। উভয়তঃই এই মিস্‌আণ্ডার-স্ট্যাণ্ডিংটা ঘটলো এবং ঘটতে লাগল ক্রমাগত। খাঁচার পাখী আর বনের পাখীর মধ্যে যেমনটা নাকি একদা ঘটেছিল। দুজনে কেহ কারে বোঝাতে নাহি পারে, সমস্ত বোঝার ওপরে এই শাকের আঁটিটাই বেশি বিড়ম্বনা হয়ে উঠল—উটের পিঠে অবুঝ শেষ কুটোটির মতন।

কর্মধারয় জিনিসটা কি, ওদের প্রশ্নের জবাবে একদিন আমি বোঝাচ্ছিলাম। বলছিলাম যে ওটা যা তা কথা নয়, গীতার কথা। কথাটা কর্মধারয় নয়, কর্মের ধারা। তবে সংস্কৃত করে বহুবচনে কর্মধারয় হয়তো বলা যায়—আমি ঠিক বলতে পারব না, তোমাদের সংস্কৃতের পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস কোরো। আসল কথা হচ্ছে, কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। এই বলে আঙুল নেড়ে গীতার সমূহ ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছি, ওরা একযোগে ঘাড় নাড়তে সুরু করল।

"তা নয় স্যার।" শুনতে হোলো ওদের মুখে।

"তা নয়, তবে কি?" জিজ্ঞেস করলুম আমি।

তবে যে কি তার উত্তর না দিয়ে, বোধহয় আরও বেশি ওয়াকিবহাল হবার উদ্দেশ্যেই ওদের একজন প্রশ্ন করে বসলো—"তাহলে দ্বন্দ্বটা কী, বলুন তো।"

"দ্বন্দ্ব? দ্বন্দ্ব হচ্ছে খুব খারাপ।" আমি বললাম। একটুও গোপন করলাম না। "এবং সর্বদা দ্বিধার সঙ্গে জড়ানো। কথায় বলে, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব। কখনো শোনোনি?"

কখনো যে শুনেছে এরূপ আমার বোধ হোলো না। ওরা বল্লে, দ্বন্দ্ব হচ্ছে একটা সমাস।

আশ্চর্য নয়। এই কথাটা যেন আমিও কোথায় শুনেছিলাম। কোথায় আমার ঠিক মনে নেই, তবে মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে আছে। দ্বন্দ্ব যে কেবল সমস্যা নয়, সমাস হওয়াও সম্ভব, আমার মনের কোথায় যেন বদ্ধমূল হয়েছিল—সেখান থেকে প্রতিধ্বনি এলো। কিন্তু তাহলেও, হাজার কৌতূহল হলেও সমাসটা যে কী সে কথা তো আর ওদের জিজ্ঞেস করা যায় না!

"আচ্ছা, তদ্ধিতটা কি স্যার?" সাম্‌লাতে না সাম্‌লাতে আবার এক আক্রমণ।

"বোধহয় আরেকটা সমাস?"

"উহুঁ। তদ্ধিত হচ্ছে প্রত্যয়।" তারা বল্লে। একেবারে সমস্বরে।

অবশ্যি, তারা বল্লেই যে আমাকে প্রত্যয় করতে হবে তার কোনো মানে নেই। কিন্তু আমি আর কথা না বাড়িয়ে, এর ওপর ফের বহুব্রীহি আর ষষ্ঠী তৎপুরুষের প্রশ্ন ওঠবার আশংকা হতেই তার আগেই ক্লাস থেকে উঠে এলাম। এসে সটান্ বাড়ি ফিরে ব্যাকরণ নিয়ে পড়লাম। ইস্কুলের অতো বছরে যার তিন পাতাও সারতে পারিনি, তার আদ্যোপান্ত এক নিশ্বাসে এক রাত্রে সারা করলাম।



"আচ্ছা, তদ্ধিতটা কি স্যার?"

কিন্তু ভেবে দ্যাখো, এত হাঙ্গামা করে' পড়ানো পোষায় না। আজ ব্যাকরণ, কাল টেক্‌স্ট্ বই, পরশু সুবলচন্দ্রের অভিধান, এইসব পড়ে—পড়ে পড়ে মুখস্থ করে' প্রত্যহ যদি ওগ্‌লাতে হয়, তাহলে ফের কেঁচে ইস্কুলে গিয়ে ভর্তি হলেই পারি—মাস্টার হয়ে পড়াতে যাওয়া কোন্ দুঃখে? তাছাড়া, কেবল ইস্কুলেই নিস্তার নেই, ইস্কুলের বাইরেও ঝক্কি কম ছিল না। রাস্তায় ঘাটে পথে বিপথে কলকাতার অলিতে গলিতে আমার ছাত্ররা ছড়িয়ে পড়েছিল। যেখানেই যাই, যেদিকেই পা বাড়াই, কেউ না কেউ সামনে এসে পড়ছে—আর "নমস্কার স্যার" শুনতে হচ্ছে আমায়। হয়তো এক জায়গায় স্থির হয়ে একটু আলুকাবলি কিনে খাচ্ছি, অম্‌নি একজন সম্মুখে এসে দাঁড়ালো: "নমস্কার স্যার্।"

ভদ্রতার খাতিরে—যদিও শিক্ষক-ছাত্রের ভেতরে ভদ্রতার সম্পর্ক নয় ঠিক—তাহলেও আমার ভাগ থেকে একটু দিতেই হয়। "চাখবে একটু? নাও।"

আলুকাবলি খাওয়া যে অতি গর্হিত কর্ম এবং খেলে পেট কামড়ায়, ছেলেটার ভাবখানা যেন এই রকম। তবু নেহাৎ আমি সাধছি, আর আমি গুরুজন, গুরুজনের কথার অবাধ্য হতে নেই, সেইজন্যেই যেন বাধ্য হয়ে একটু হাত পেতে নেওয়া। এবং তার পরেই আমাকে চীনে-বাদাম কিনতে সে উদ্বুদ্ধ করে—"ওগুলোও খেতে বেশ স্যার্।"

আরে, তাকি আর আমি জানিনে? চীনেদের চেনবার আগে থেকে আমি চীনে বাদাম চিবুচ্ছি, তবে কিনা ছাত্রটি চলে যাবার অপেক্ষায় ছিলাম, এইমাত্র। কিন্তু গুরু-শিষ্য-সম্বন্ধ যে এতদূরে অচ্ছেদ্য হতে পারে তা কে ভাবতে পেরেছিল?

এইভাবে কি সিনেমায় কি রেস্তরাঁয় কি হেদোর ঘাটে আর কি ফুটবলের মাঠে ছাত্রদের সাথে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে আরো আমি কাহিল হয়ে পড়লাম। কী-ই বা বেতন পেতাম, তার ওপর ওদের খাইয়ে আর সিনেমা দেখিয়েই ফতুর হবার দশা হোলো। আর কী চেনাটাই ওরা আমায় চিনেছিল। আমি ওদের অনেক সময়ে চিনতে না পারলেও ওরা আমায় ঠিক চিনে নিত—কি করে' পারত জানিনে। আমি মোটে দুটি ক্লাসে পড়ালেও, গোটা ইস্কুলটাই যেন আমার ছাত্র হয়ে গেছল। এবং তারা বোধহয় কেউ বাড়িতে থেকে সময়-নষ্ট করত না। ঠিক যে আমার অপেক্ষায় পথে পথে ওৎ পেতে থাক্‌ত তা আমি অবশ্যি বল্‌তে চাইনে, তবু রাস্তাটাই যেন ওদের একমাত্র আস্তানা, এক এক সময়ে আমার এমন সন্দেহ যে না হোতো তা নয়।

বেশি কি বলব, এই বল্লেই যথেষ্ট হবে যে, একমাত্র ওদের ভয়েই এতটা বয়স পর্যন্ত চরিত্র স্খলনের আমার সুযোগ হোলো না। আমাকে সচ্চরিত্র থেকে যেতে হোলো অনিচ্ছা সত্ত্বে—এক রকম বাধ্য হয়েই। ইচ্ছে থাকলেও অনুচিত পথে পা বাড়াবার কোনোদিন আমার সাহস হোলো না। কি জানি, সেদিকেও যদি কারো গায়ে ধাক্কা লাগে আর সে অম্‌নি করযোড়ে বলে' ওঠে, নমস্কার স্যার্, তাহলেই তো তখন হয়েছে! আমার প্রাক্তন ছাত্ররা কলকাতার কোথায় নেই? যদিও তাদের অনেকেই এখন মাস্টার কিম্বা অধ্যাপক কিম্বা মিনিস্টার হয়ে গেছে তাহলেও আমার তো ছাত্রই! আর আমি তাদের না চিনতে পারলেও,—এখন তো চিনে ওঠা আরো কঠিন,—তারা আমায় ঠিক চিনে রেখেছে। তাদের হাতে নিস্তার নেই। বার্নাড শ বলেছেন, যারা কোকেন্ খায় নি আর

এদিকে সেদিকে এক-আধটু গতিবিধি-করে নি, তারা নাকি এযুগের মানুষ বলেই গণ্য নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভুল করে' কবে একবার মাস্টারি করেছিলাম বলে' কোক্‌শাস্ত্র আর কামশাস্ত্র উভয়ই এ জীবনে আমার অজ্ঞাত থেকে গেল। মোক্ষলাভ আমার হোলো না। ভয় হয় আবার আমায় জন্মাতে হবে। সাধ রয়ে গেল, কিন্তু স্বাদ রইলো না এই জন্যেই,—কিন্তু উপায় নেই, বেশ বুঝতে পারছি।

আমার দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। বন্ধু বলেন—"কেন, কোকেন তুমি এখনো খেতে পারো। সে সুযোগ যায় নি। ইচ্ছে করলে, বাড়ির মধ্যে লুকিয়ে খেয়ো, কেউ টের পাবে না।"

"হ্যাঁ, ঐ ভরসাটা এখনো আছে। তবে জানো কি বন্ধু, অর্ধেক মনুষ্যত্বে—আধখানা মানুষ হয়ে লাভ নেই। উপনিষদ বলেছেন, নাল্পে সুখমস্তি।" আমি ঘোষণা করি।

"দুঃখের কথা যাক্‌। তোমার মাস্টারির কথা বলো।"

"তাইতো বল্‌ছি। তবু, ছেলেদের নিয়ে কেটে যাচ্ছিল কোনোগতিকে, আলুকাবলি চীনেবাদাম ফুটবল্‌ মাঠের অকস্মাৎ দর্শনী পেয়ে পেয়ে আমার ব্যাকরণ-জ্ঞানের বিরুদ্ধে কোনো দিন তারা কিছু বলে নি, আমার বিপক্ষে তাদের কোনো অভাব অভিযোগ ছিল না। অন্যান্য শিক্ষককে তারা যেমন নাস্তানাবুদ করত বলে' শোনা যেত, আমাকে কখনো সেরূপ বিপদে ফ্যালে নি। বরং আমাকে তারা একটু যেন স্নেহের চক্ষেই দেখত, এখন মনে হয়।

তবু মাস্টারিটা আমার টিকলো না। মেয়েদের শত্রু যেমন পুরুষরা নয়, মেয়েরাই আসলে, তেমনি ছাত্ররা নয়, মাস্টাররাই মাস্টারের বেশি আতঙ্ক। একজন মাস্টারের জন্যই মাস্টারিটা আমায় ছেড়ে দিতে হোলো শেষ পর্যন্ত।"

"হেডমাস্টার বুঝি?" জিজ্ঞেস করল বন্ধু। "একদিন ক্লাসে এসে তোমার পড়ানোর পরীক্ষা নিতেই তোমার বিদ্যে-বুদ্ধি সব টের পেয়ে গেলেন? ধরা পড়ে গেল শেষটায়?"

"না, সেরূপ কোনো দুর্ঘটনা ঘটে নি। হেডমাস্টার অতি চমৎকার—অমন লোক হয় না। বলতে কি, সব কটি মাস্টারই খাসা, কেবল একজন বাদে। লোকটার নাম আমার মনে নেই। তাকে আমরা গড়গড়ি বলতাম।

গড়গড়ি ছিল সেকেন্ড মাস্টার। প্রৌঢ় মানুষ, হেড্‌মাস্টারের চেয়েও বয়সে ভারী। একদম্‌ সেকেলে লোক। কি রকমের যেন! কিছুতেই তাকে একটাও কথা আমি কওয়াতে পারিনি। কিছুতেই না।"

"লাজুক প্রকৃতির বোধহয়?"

"আমিও তাই ভাবতুম। বল্‌তে কি, লোকটা আমার বেশ ভাবনার বিষয় হয়ে পড়েছিল। এরকম অমিশুক লোক কখনো আমি দেখিনি। মাস্টারদের বস্‌বার ঘরে তার টেবিলে তার মুখোমুখিই আমায় বস্‌তে হোতো! আর এমন খারাপ লাগত আমার! মিনিটের পর মিনিট্‌ কেটে যাচ্ছে অথচ একটা কথা নেই।

আমি কথা বলবার কয়েকবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বৃথাই, গড়গড়ি একদম্‌ স্পীকটিনট। গায়ে পড়ে ভাব করতে গেছি, কিন্তু গড়গড়ি গায়েই মাখে না। আমলই দেয় না আমায়। উচ্চবাচ্য করা দূরে থাক্‌, নমস্কার কর্‌লে প্রতিনমস্কার পর্যন্ত জানায় না। এমন দুর্জ্ঞেয় দুর্ভেদ্য ব্যক্তি জগতে বিরল।



"......হৃদ্যতার সম্পর্ক স্থগিত হোলো......"

অবশেষে আমি হাল ছেড়ে দিলাম। নিজ মনে বল্লাম, আর গড়াগড়ি দিয়ে কাজ নেই, গড়গড়ি, তোমায় গড় করি! তুমিও যদি চুপ্‌চাপ্‌ থাকো ত আমিও চুপচাপ। তোমার সঙ্গে কথা না বললে যে আমার ভাত হজম হবে না তাও নয়। কেউ সেধে কথা বলবার জন্যে মাথার দিব্যিও দেয়নি আমায়।"

"অজান্তে হয়তো গড়গড়ির প্রাণে তুমি ব্যথা দিয়ে থাক্‌বে কখনো?" বন্ধু অনুমান করেন।

"আমারও তাই মনে হোতো। কি করে' তা হতে পারে তাই আমি ভাবতুম। কিন্তু ভেবেও যেমন কূল পাইনি, ভালো করে' ভাববার সময়ও ছিল না। একে তো সকালে উঠেই ইস্কুলের পড়া করতে হোতো—"

"ইস্কুলের পড়া?" বন্ধুর দুটি চোখ ছানাবড়া হয়ে ওঠে।

"বাঃ, ইস্কুলের পড়া করতে হবে না? পড়ানো কি চাট্টিখানি নাকি? আমাকে আবার দুদিনের পড়া সারতে হোতো—যে পড়া কাল দিয়েছি আর যা কালকের জন্য দেব—দুদিক বজায় রাখতে হোতো আমায়। আর সে পড়া কি কম? ব্যাকরণ, অভিধান, মানের বই—সব মুখস্থ—একেবারে জিহ্বাগ্রে।"

"মনে থাক্‌তো সব?".

"থাক্‌লে তো বাঁচতাম। ছোটবেলায় পড়া ফাঁকি দেবার জন্য এক এক সময়ে দুঃখ হোতো, কিন্তু না দিলেই বা কি, এতদিনে ভুলে মেরে দিতাম ঠিক! মস্তিষ্ক তো আমার কোন দিনই বর্ধমান নয়, আসলে চব্বিশ পরগণা। মেমরি স্টেশনই সেখানে নেই। তবুও প্রাণপণে চেষ্টা করতাম—যতটা পারি। তারপর, হ্যাঁ, যা বল্‌ছিলাম। পড়াশুনা সেরে, নেয়ে টেয়ে, নাকে মুখে গুঁজে ইস্কুলে পোঁছতে প্রায়ই লেট্‌ হয়ে যেত। বিশ্রাম ঘরে আমার বসবার জায়গায় গিয়ে হাঁপ ছাড়বার আগেই দেখতাম গড়গড়ি নিজের ক্লাসে চলে গেছেন। তারপর তিনি এসে চেয়ারে বস্‌তে না বস্‌তেই আমার ক্লাস। কেবল টিফিনের সময়টুকু যা আমরা একটু মুখোমুখি হতাম। কিন্তু এর মধ্যে কখন্‌ যে আমি ও'র মনোকষ্টের কারণ হতে পারি আমি তো ভেবে পেতাম না। যাই হোক্‌, এইভাবে মুখ ভার করে' তো দিন কাট্‌ছিল, হঠাৎ একদিন কালো মেঘের ধার ঘেঁষে রুপালী পাড় দেখা দিল।"

"গড়গড়ি হাস্‌ল?"

"হ্যাঁ। হাস্‌লই বলা যায়। মাস দেড়েক তখন আমার মাস্টারি চল্‌ছে। সেদিনও লেট্‌ হয়েছে, হন্তদন্ত হয়ে ইস্কুলের দিকে ছুট্‌ছি, মোড়ের কাছটায় পোঁছে দেখি, গড়গড়ি দাঁড়িয়ে। প্রশান্ত-ভাবে দাঁড়িয়ে, কোনো তাড়া নেই। আমাকে দেখে তিনি একটু হাসলেন। সে হাসিতে বন্ধুবাৎসল্য কিম্বা অপত্যস্নেহ কি প্রকাশ পেয়েছিল আমি জানি না।

তাঁর হাসি দেখে নিজের তাড়ার জন্য আমার লজ্জা হোলো। আমি দাঁড়ালাম। কিন্তু তখনো আমার ধারণা হয়নি যে, আমার জনাই তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। আমার ছাত্ররা যেমন কলকাতার সর্বত্র সব মোড়ে ওৎ পেতে অপেক্ষা করে, তাঁরও প্রায় সেই দশা হয়েছে তখনো আমি ধরতে পারিনি।

কেবল হাসিই নয়, কুশলপ্রশ্ন আবার! "এই যে, শরীর ভালো বেশ?"—গড়গড়ির মুখ থেকে স্বকর্ণে আমায় শুন্‌তে হোলো। আর কী স্নেহবিগলিত সুর! আমার মাথা ঘুরে পড়ে যাবার কথা, তবু কি করে' জানি না, খাড়া রইলাম।

"লোকটা লাজুক প্রকৃতির ছিল আমার মনে হয়।" টিপ্পনি কাট্‌ল বন্ধু ঃ "লজ্জার বাঁধ ভাঙতেই তার এতদিন গেল।"

"আমারো তাই মনে হোলো তখন।

আমি মনে মনে বল্লাম—আমার এতদিনের ধারণা ভুল। ভদ্রলোক সত্যিই সদাশয়, কেবল লজ্জার বাধাতেই এতদিন মুখ খুলতে পারেননি। আজ এতদিন বাদে আমাকে একান্তে বিরলে পেয়ে নিজেকে উন্মুক্ত করেছেন। তারপর কুশল প্রশ্ন সেরে যখন তিনি আমার গলা জড়িয়ে ইস্কুলের দিকে এগুতে লাগলেন, তখন আমার বিস্ময় কোন্ চূড়ান্তে গিয়ে ঠেকেছে তুমি আঁচ করতে পারো।"

গড়গড়ি স্নেহভরে আমাকে টেনে নিয়ে বল্‌তে বল্‌তে চল্লেন—"একটা কথা তোমাকে বল্‌ব ভায়া—কিছু যদি না মনে করো—"

গড়গড়ি—কথা বল্‌ছে—আমার সঙ্গে? গড়গড় করে' বল্‌ছে—অবাধে এবং সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে—এতেই আমি এত অভিভূত হয়েছিলাম যে কি বল্‌ব!

"না না, কি মনে করব! মনে করাকরির কি আছে?" আমি গদ্‌গদ হয়ে গেলাম: "কিচ্ছু আমি মনে করিনি। ভেবে দেখ্‌লে, আপনি এই ইস্কুলে বহুদিন রয়েছেন, আপনি একজন প্রবীণ শিক্ষক। আর আমি নতুন আমদানী। আপনার সঙ্গে আমার ঠিক সমান তালের সম্পর্ক তো নয়। তা আমি বুঝতে না পারি তা নয়। এবং সেই কারণেই আমি কোনোদিন কিছু মনে করিনি। আপনিও কিছু মনে করবেন না, এই আমার অনুরোধ।"

"না, সে সম্বন্ধে আমি কিছু মনে করিনি—" গড়গড়ি বল্লেন।

"হ্যাঁ, তাই। তাই বল্‌ছিলাম। ও নিয়ে কিছু মনে করবার নেই। তারপর, আজ যখন আমাদের ভাব হয়ে গেল, হৃদ্যতার সম্পর্ক স্থাপিত হোলো, তখন আজ থেকে সেকথা অতীতের কথা। আপনিও সে কথা ভুলে যান, আমিও ভুলে যাই।"

এই বলে আমিও গড়গড়িকে—এক হাতে যতদূর নেয়া যায়—জড়িয়ে ধরলাম। তবে আলিঙ্গন তেমন জোরালো হোলো না, বলাই বাহুল্য।

মোড় থেকে ইস্কুল কাছেই। কাজেই জড়াজড়ি করে' যাবার বেশি পথ এবং সময় ছিল না। তাছাড়া, জর্জরিত হয়ে গড়গড়িকে একটু যেন বিমনা দেখা গেল। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগ্‌লেন।"

"অবার সেই পুরনো লজ্জা দেখা দিল বুঝি?" জিজ্ঞেস করল বন্ধু।

"না, ঠিক ব্রীড়াবনত নয়, তবু কেমন যেন সংকুচিত। আমার দিক থেকে এতখানি উৎসাহে যেন একটু হক্‌চকানো। ন যযৌ ন তস্থৌ গোছের অবস্থা আর কি! যাই হোক, আমরা পায়ে পায়ে ইস্কুলের দিকে এগুতে লাগলাম। ওদিকের গির্জার ঘড়িতে এগারোটা তখন বেজে গেছে। আমিই বক্‌তে বক্‌তে যাচ্ছি—গড়গড়ির মুখে কোনো কথা নেই।"

"তোমার বিহ্বলতায় বোধহয় বোবা মেরে গেছেন?" বন্ধুর মন্তব্য।

"আমারো তাই মনে হোলো। ভাবের গোড়াতেই এতটা ভাবাতিশয্য হয়ত ভালো হয়নি, আমি ভাবলাম। ঐটুকু পথ আর আমাদের কোনো কথোপকথন হোলো না। কেবল আমি কথা কইলাম আর উনি আমার জবাবে দু'একবার হুঁ হাঁ করলেন মাত্র। তারপর ইস্কুলের গেটে পা দিয়েই তিনি ধাঁ করে ফিরে দাঁড়ালেন— গির্জার ঘড়ির দিকে তাকালেন একবার।

"ঐ যাঃ! লেট্ হয়ে গেল আজ্‌কে।" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লেন গড়গড়ি: "আজ পঁচিশ বছর এই ইস্কুলে মাস্টারি করছি, একদিনের জন্যও আমার লেট্ হয়নি।"

"বলেন কি মশাই?" আমি চমৎকৃত হয়ে বল্লাম: "এতো দস্তুরমতো একটা রেকর্ড। আমি তো এই মাস দেড়েক মাত্র কাজ করছি, কিন্তু এর মধ্যেই আমার অন্তত দিন দশেক লেট্ হয়ে গেছে।"

আমাকে বাহুবন্ধন থেকে মুক্তিদান করে' এবং নিজেও মুক্ত হয়ে তাঁর হাতটা আমার কাঁধে তিনি রাখলেন,—"আমি তা জানি। এবং......এবং এই কথাটাই—" আম্‌তা আম্‌তা করে তিনি বল্লেন: "এই কথাটাই তোমাকে আমি বল্‌তে চাইছিলাম।"

দুধ খাও

কানাই সামন্ত

শুনেছ কী বলেছেন শ্রীনলিনী সরকার—
দুধ অতি উত্তম, দুধ খাওয়া দরকার।
দুধ খেয়ে চোখে বাড়ে জেল্লা।
গায়ে এত জোর হয়, দেহ যেন দেহ নয়
গড়খাই কেল্লা—
কী ভীষণ মজবুৎ।
পাঞ্জাবী রজ্‌পুত,
অদম্য যুদ্ধে,
হাঁক ছাড়ে ডাক ছাড়ে—দুধ দে।

বলেছেন নাকি শুনি মহামুনি চার্বাক—
টাকাকড়ি থাক্ আর না-ই থাক্,
খুব করে দুধ খাও, খুব করে খাও ঘি,
দ্যাখো ধার পাও কি।—
আসল সুধে কী কাজ? সুদ দাও
না-ই দাও, জামবাটি পেতে বলো—দুধ দাও।

পাঁচ সের—দশ সের—আরে আরে থাক্ থাক্
যে বলে সে বীর না কি? চার্বাক
বলে যা গেছেন শুনি মহামুনি তাঁর বাক্—
ম্লেচ্ছ যবন নই, আমরা তো আর্য্যই—
মানব না? বলছ কী? দুধ খাওয়া ধার্য্যই।
এই জেনো করণীয়, এই জেনো কার্য্যই।
পন্থা ন বিদ্যতে, মর্ম কি ভিদ্যতে
ধর্মের এই বই!
অতএব দুধ কই?

আহারে ও অনাহারে গোরু প্রায় সবই শেষ।
ছটাকখানেক দুধ থাকে যদি অবশেষ
মণ মণ জল ঢেলে গোয়ালারা ঘর ঘর
বিলি করে বেড়াচ্ছে। সত্বর
ছাঁক্‌নি ঢাক্‌নি আর ঘড়া-ঘটি বের কর্।

"আমাদের জাতি যেমন সত্যকে অবহেলা করে, এমন আর কোন জাতি করে কিনা জানিনা! আমরা মিথ্যাকে মিথ্যা বলিয়া অনুভব করি না। মিথ্যা আমাদের পক্ষে অতিশয় সহজ স্বাভাবিক হইয়া গিয়াছে। আমরা অতি গুরুতর, এবং অতি সামান্য বিষয়েও মিথ্যা বলি। অনেক কাগজ বঙ্গদেশে অত্যন্ত প্রচলিত হইয়াছে, তাহারা মিথ্যা কথা বিক্রয় করিয়া জীবিকানির্বাহ করে, পাঠকদের ঘৃণাবোধ হয় না।"
—রবীন্দ্রনাথ

ব্যবসা বাণিজ্য

আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা সম্মেলন ও ভারত

শ্রীঅনিলকুমার বসু, এম-এ

গত এক বৎসর ধরিয়া যুদ্ধোত্তরকালের আন্তর্জাতিক মুদ্রার মানদণ্ড লইয়া আমেরিকা ও ইংলণ্ডের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান ও পরস্পর আলোচনা চলিতেছে। যুদ্ধাবসানে সুসংস্কৃত জগতে মুদ্রার মাপকাঠি সম্পর্কে ব্রিটেনের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা Lord Keynes যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা "Keynes plan" বলিয়া ইতিমধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।। তাহাতে আন্তর্জাতিক মুদ্রাকে "Baner" নামাভিষিক্ত করা হইয়াছে। অপরপক্ষে মার্কিন দেশ হইতে যে পরিকল্পনা প্রণীত হইয়াছে, তাহাতে আন্তর্জাতিক মুদ্রার "unitas" নামাকরণ হইয়াছে। দুইটি পরিকল্পনার মধ্যে যথেষ্ট বৈষম্য থাকায় পরস্পর আলাপ-আলোচনা দ্বারা ইঙ্গ-মার্কিন যুক্ত পরিকল্পনা ভাবী জগতের মুদ্রার মানদণ্ডরূপে গৃহীত হইয়াছে। এই বিষয়ে কয়েক মাস পূর্বে Breton Woods-এর সম্মিলিত মিত্র জাতির একটি অধিবেশন আহূত হইয়াছিল। উক্ত সম্মিলনীতে যোগদানের জন্য ভারতবর্ষও নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, উক্ত অধিবেশনে ভারতের তরফ হইতে যে দুইটি প্রধান দাবী পেশ করা হইয়াছিল, তাহার একটিও গৃহীত হয় নাই। ভারতের প্রথম দাবী ছিল—আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (International monetary Fund) পরিচালকমণ্ডলীতে ভারতের একজন স্থানীয় প্রতিনিধি নিয়োগ করা এবং দ্বিতীয় দাবী—অনুকূল বাণিজ্যের ফলে ব্রিটেন হইতে ভারতের পাওনা যে সহস্র কোটি পরিমিত স্টার্লিং আছে তাহার একটি বিলিব্যবস্থা করা। এই দুইটি ন্যায্য দাবী অগ্রাহ্য হওয়ায়, প্রত্যেক ভারতবাসীমাত্রই দুঃখিত হইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা হইলেও ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত পরিকল্পনায় আমাদের যোগদান করা বিধেয় কিনা তাহাই আমরা বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

ক্রমে যে কালের ঢেউ আসিতেছে, তাহার বিপরীতগামী হওয়া কোন দেশের পক্ষেই সম্ভব নয়। বিজ্ঞান প্রচলনের ফলে প্রত্যেক দেশই পরস্পর একগোষ্ঠীভূত হইয়া পড়িতেছে। বর্তমানে নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা সম্ভবপর হইলেও, নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা সম্ভব নয়। এক জাতির অপর জাতির সাহায্য ব্যতিরেকে স্থির হইয়া দাঁড়াইবার সুযোগ নাই। পরস্পরের সহযোগিতা ও সহানুভূতি বর্তমান জগতে বাঁচিবার একমাত্র অভয় মন্ত্র। ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এইরূপ সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী। কাজেই কালের গতিকে স্বীকার করিয়া সেইভাবে নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করা বুদ্ধিমানের কাজ। বর্তমান বৈজ্ঞানিক জগতে কোন জাতির পক্ষেই অপর জাতির সহিত ব্যবসায় বাণিজ্যের আদানপ্রদান ব্যতীত নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকিবার জো নাই। পরস্পর ব্যবসায় বাণিজ্যের সূত্রে নিজেদের দেনাপাওনা মিটাইবার নিমিত্ত সর্বজনগ্রাহ্য একটি মুদ্রামান প্রয়োজন—যাহাকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। প্রত্যেক ব্যবসায়রত দেশকে তাহার নিজস্ব মুদ্রামানকে উক্ত আন্তর্জাতিক মুদ্রামানের সহিত সুসংবদ্ধভাবে বাঁধিয়া দিতে হইবে। উক্ত আন্তর্জাতিক মুদ্রার তুলাদণ্ডে স্বজাতিক (national) মুদ্রার বিনিময়হার নিরূপিত হইয়া থাকে। কিন্তু বিনিময়হারের স্থায়িত্ব আন্তর্জাতিক ব্যবসায় বাণিজ্য ক্ষেত্রে কতগুলি কার্য কারণের উপর নির্ভর করে। জাগতিক নিয়মে প্রত্যেক কার্যেরই একটি বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। অর্থনৈতিক জগতেও সেই নিয়ম পুরাপুরি প্রয়োগ করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক, স্বর্ণ রপ্তানির ফলে দুইটি দেশে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, যে দেশ হইতে স্বর্ণ রপ্তানি হইল, সেই দেশে স্বর্ণের মূল্য বাবদ অনেক নগদ টাকা হাতে আসিয়া পড়ে। অধিক সংখ্যক টাকা চালু হইবার ফলে সেখানে জিনিসপত্রের দাম সাধারণত ঊর্ধগামী হয়। কাজেই দেখা যায় যে, স্বর্ণ রপ্তানির সাধারণ প্রতিক্রিয়া হইল জিনিসপত্রের বাজার দর বাড়াইয়া দেওয়া এবং সেইহেতু মুদ্রার ক্রয়শীলতা কমাইয়া দেওয়া। অপরদিকে যে দেশে স্বর্ণ আমদানী হইল, সেখানে নগদ মূল্যে স্বর্ণ ক্রয় করিতে হইল বলিয়া অনেক টাকা বাজার হইতে অপসৃত হইয়া যায়। এই অপসরণের ফলে জিনিসপত্রের দাম স্বাভাবিক নিয়মে পড়িতে থাকে এবং মুদ্রার ক্রয়শীলতা (Purchasing power) বৃদ্ধি পায়। এই যে স্বর্ণ রপ্তানি ও আমদানী যে প্রতিক্রিয়া বাজার দর ও মুদ্রার ক্রয়শীলতা সম্পর্কে সৃষ্টি করিয়া থাকে, সেই প্রতিক্রিয়াকে যদি নানাবিধ উপায়ে নিষ্ক্রিয় করিয়া দেওয়া হয়, তবে স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করিবার অভাবে, মুদ্রার বিনিময় হার নির্দিষ্ট রাখিবার পথে নানাপ্রকার অন্তরায় সৃষ্টি হয়। সেই মত যদি কোন দেশ অধিকমাত্রায় আমদানী করার ফলে অন্য দেশের নিকট অধিক পরিমাণে ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে, সেই দেশ যদি বিদেশ হইতে দ্রব্যসামগ্রীর আমদানী কমাইয়া ও সেই সঙ্গে স্বদেশজাত রপ্তানি বাড়াইয়া নিজের দেনা মিটাইতে প্রয়াসী না হয়, তবে একই অবস্থার উদ্ভব হয়। এই প্রসঙ্গে পাওনাদার দেশের ইচ্ছা অনিচ্ছার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার কথা আলোচনা করা যাইতে পারে। পাওনাদার দেশ যদি দ্রব্যসামগ্রীর বিনিময়ে নিজের পাওনা মিটাইতে অনিচ্ছুক থাকে, তাহা হইলেও বিনিময় হারের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নানাপ্রকার জটিলতার সৃষ্টি হয়। অধিক অর্থাগমের জন্য পাওনাদার দেশের আর্থিক অবস্থা দেনদার দেশ হইতে সাধারণত উন্নততর থাকে। এমত অবস্থায় পাওনাদার দেশের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য থাকা সত্ত্বেও যদি অপর দেশের প্রয়োজনানুযায়ী টাকা ধার দিতে (foreign trading) সে দেশ অগ্রসর না হয় অথবা অপর দেশ হইতে দ্রব্যসামগ্রীর আমদানী বৃদ্ধি করিয়া নিজের পাওনা মিটাইতে অগ্রণী না হয়, তবে আন্তর্জাতিক ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গোলযোগ দেখা দেয়। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, আন্তর্জাতিক মুদ্রা সমস্যা প্রতি দেশের বাণিজ্য নীতি, আভ্যন্তরিক মুদ্রানীতি ও আন্তর্জাতিক ব্যবসায় বাণিজ্য ক্ষেত্রে সেই নিয়োগ-বিনিয়োগ (International investments) প্রভৃতি জটিল বিষয়ের উপর নির্ভর করে। বাণিজ্যরত দেশগুলির অর্থনৈতিক অবস্থার স্তরভেদেও এই সকল সমস্যার গুরুত্ব নিরূপিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভারত ও চীনের ন্যায় কৃষিপ্রধান অনুন্নত কোন দেশের পক্ষেই বিদেশজাত শিল্প-সামগ্রীর দুর্বার স্রোতের মুখে তাহার দুর্বল শিল্পগুলিকে বাঁচাইয়া রাখা সম্ভবপর নয়; এই সকল অনুন্নত দেশের পক্ষে কোন স্থায়ী বিনিময়-হার মোটেই সুবিধা হবে না। দেখা গিয়াছে যে, স্থায়ী বিনিময়-হার রাখিতে গিয়া এই সকল কৃষিপ্রধান দেশগুলিকে শিল্পোন্নত অন্যান্য দেশের তুলনায় বৈদেশিক মন্দার (Outside Sharp) প্রতিক্রিয়া হইতে অনেক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছে। বিশেষত, ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশের পক্ষে আভ্যন্তরিক স্থায়িত্ব বৈদেশিক বিনিময়-হারের স্থায়িত্ব অপেক্ষা সমধিক প্রয়োজনীয়। যুদ্ধোত্তরকালে ভারতের

অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নকল্পে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনানুযায়ী কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় করিতে হইবে। কাজেই এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী ও ফলপ্রসূ করিতে হইলে ভারতকে কোন নির্দিষ্ট বিনিময়-হার মানিয়া লইলে চলিবে না। ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থানুযায়ী উক্ত বিনিময়-হারের নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে একটু রদবদল করিবার স্বাধীনতা দিতে হইবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-স্রোত অবাধ রাখিতে হইলে প্রত্যেক দেশকেই কতকগুলি নীতি মানিয়া চলিতে হয়, যথা—যদি কোন দেশে বৈদেশিক বাণিজ্য আনুকূল্যে প্রচুর অর্থাগম হয়, তবে সেই দেশকে প্রথমেই উদ্বৃত্ত অর্থ দ্বারা নিজের দেনা পরিশোধ করিয়া তারপর অন্য দিকের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। দেনা পরিশোধের পূর্বে অন্য কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না। অপর দিকে যদি কোন দেশে প্রতিকূল বাণিজ্যের ফলে বিদেশে অনেক টাকা দেয় হয়, তবে প্রথম সর্তই হইবে বিদেশে যেসব নিয়োজিত অর্থ আছে (Foreign investments), তাহা উঠাইয়া নিজের দেনা পরিশোধ কার্যে মনোনিবেশ করা। এই সর্তটি পালন করিয়া তারপর নিজের দেশজাত দ্রব্য-সামগ্রীর রপ্তানি বাড়াইয়া বাণিজ্যের প্রতিকূল-গতি রোধ করা বিধেয় এবং এই সকল সর্ত ঠিক ঠিক মত পালিত হইতেছে কিনা, তাহা লক্ষ্য রাখিবার জন্য একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টিকল্পেই কয়েক মাস পূর্বে আমেরিকাতে Breton Woods Conference আহূত হইয়াছিল এবং উক্ত সম্মিলনীতে প্রত্যেক মিত্র দেশকেই আমন্ত্রণ করা হয়। ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এবং নিজেদের জাতীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উক্ত আন্তর্জাতিক মুদ্রা-প্রতিষ্ঠানে যোগদান করা বিধেয় কিনা, তাহাই এক্ষণে আলোচনা করিব।

পূর্বেই বলিয়াছি, Breton Woods Conference-এ ভারতের প্রধান দুইটি ন্যায্য দাবী গৃহীত না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহৃত হইয়াছে। ভারতের পাওনা স্টার্লিং ব্যালেন্স উক্ত সম্মিলনীতে আলোচনার বহির্ভূত বিষয় বলিয়া ধরা হইয়াছে এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা-তহবিলের পরিচালক-মণ্ডলীতে ভারতকে কোন স্থায়ী আসন দেওয়া হয় নাই। এইখানে উক্ত ইঙ্গ-মার্কিন যুগ্ম পরিকল্পনার কয়েকটি বিশিষ্ট ধারা আলোচনা করা সমীচীন। বর্তমান পরিকল্পনায় Unitas বা Baner বলিয়া কোন আন্তর্জাতিক মুদ্রার নামকরণ হয় নাই। আন্তর্জাতিক মুদ্রা-তহবিলের (International Monetary Fund) সম-গতি সভ্য দেশের Central Bankএ স্ব স্ব জাতীয় মুদ্রায় রাখিবার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। কিন্তু তহবিলের স্বর্ণ-সম্পত্তি কোথায় রাখা হইবে, তাহা কোন নির্দিষ্ট হয় নাই। প্রত্যেক সভ্য দেশকে (Member Country) একটি বিশিষ্ট অংশ (Quota) উক্ত তহবিলে জমা রাখিতে হইবে। প্রয়োজনানুসারে যাহাতে নির্দিষ্ট অংশের (Quota) শতকরা ৭৫ ভাগ কোন দেনাদার দেশ বৎসরে উক্ত তহবিল হইতে ধার লইতে পারে, সেই ব্যবস্থা আছে। তবে সর্ব-সাকুল্যে কোন সময়েই ধারের পরিমাণ নির্দিষ্ট Quota-র শতকরা ২০০ ভাগের বেশি হইতে পারিবে না। যদি বাণিজ্যানুকূল্যে কোন দেশের মুদ্রার চাহিদা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলে বিন্যস্ত Quota-র শতকরা ৭৫ ভাগের বেশী হয়, তাহা হইলে অধিক চাহিদা হেতু সেই দেশের মুদ্রাকে মহার্ঘ (Slarce) পর্যায়ে ফেলা হইবে এবং যাহাতে ঐ মহার্ঘ মুদ্রা সকল সভ্যদেশই ভাগাভাগি করিয়া পাইতে পারে তাহার বিধি রহিয়াছে। ইহার অর্থ হইল এই যে, কোন দেনাদার দেশ উক্ত তহবিলে প্রদত্ত শতকরা ৭৫ ভাগের বেশী উদ্বৃত্ত দেশ হইতে মাল ক্রয় করিতে পারিবে না। তারপর প্রত্যেক সভ্যদেশেরই International monetary Fundএর পরিচালক-মণ্ডলীর অনুমতি লইয়া শতকরা ১০ বিনিময় হার পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে। এইরূপ স্বাধীনতা ভারতের ন্যায় অনুন্নত দেশের পক্ষে কল্যাণকর। যদি কোন সভ্যদেশ নির্দিষ্ট অংশের বেশী স্বর্ণ মজুত করিতে আরম্ভ করে, তবে উক্ত স্বর্ণের অর্ধাংশ দ্বারা তহবিল হইতে স্বদেশীয় মুদ্রা বাধ্যতামূলকভাবে ক্রয় করিবার বিধি বলবৎ আছে। ইহার অর্থ হইল এই যে, কোন দেশ তহবিল হইতে ধার করা অর্থের সাহায্যে যাহাতে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অধিক স্বর্ণ মজুত করিতে না পারে। যুদ্ধবিরতির অব্যবহিত তিন বৎসর পর পর্যন্ত নিজেদের ঘর সামলাইবার জন্য বিবিধ মুদ্রানীতি অবলম্বনের স্বাধীনতা প্রত্যেক দেশকে দেওয়া হইয়াছে। ইহাই হইল ইঙ্গ-মার্কিন যুগ্ম পরিকল্পনার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ধারা এবং সকল দিক বিবেচনা করিয়া ভরতের এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়াই সর্বথা বিধেয়। ভারতের দিক হইতে এইরূপ একটি মুদ্রানীতি গ্রহণ করার যে সকল অসুবিধা ছিল, তাহা আলোচ্য পরিকল্পনাতে বহুলাংশে দূরীভূত হইয়াছে। বিনিময়হার পরিবর্তনের স্বাধীনতা ভারতের অক্ষুণ্ণ থাকিবে। Fundএর পরিচালকমণ্ডলী ভারতের আভ্যন্তরিক অর্থনীতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না। যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ভারতের কর্মনীতি গঠন করিবার স্বাধীনতাও থাকিবে। এক-মাত্র আপত্তি হইল ভারতের স্টার্লিং সমস্যাকে এই পরিকল্পনা হইতে একেবারে ছাঁটিয়া দেওয়া। ইহা একবাক্যে সকলেই স্বীকার করিবেন যে ভারতবর্ষ নিজের রক্ত জল করিয়া, নিজেকে বঞ্চিত করিয়া অর্ধাশনে অনশনে থাকিয়া নিজের দ্রব্যসম্ভার যুদ্ধ চালাইবার নিমিত্ত বৃটেনের হাতে তুলিয়া দিয়াছে। এক্ষণে প্রায় ১,২১৩·৫৮ কোটি পরিমিত স্টার্লিং ভারতের পাওনা হইয়াছে। এই অর্থের সহিত ৪০ কোটি লোকের বৃহত্তর স্বার্থ জড়িত। যে সমস্যা সমাধানের উপর পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ লোকের ভাগ্য নির্ভর করে, সেই সমস্যাকে একেবারে গৌণ বলিয়া আলোচ্য বিষয় হইতে বাদ দেওয়া গর্হিত কার্য। আলোচ্য পরিকল্পনাতে এই সকল যুদ্ধজনিত দেনাপাওনার একটি বিলি ব্যবস্থা করা নিতান্ত উচিত ছিল। তারপর ভারতের মত একটি জনবহুল দেশকে পরিচালকমণ্ডলীতে একটি স্থায়ী প্রতিনিধি পাঠাইবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করার অর্থ নিপীড়িত জাতির জনমতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা। উক্ত পরিকল্পনাতে একটি স্থানে লিখিত আছে যে, যুদ্ধ বিরতির পর কয়েক বৎসর (Transitional period) পর্যন্ত স্টার্লিং দেশগুলির মধ্যে যে নীতি বলবৎ আছে তাহার কোন আশু পরিবর্তন ঘটিবে না। কিন্তু ভারতের তরফ হইতে স্পষ্ট বলিয়া দিতে হইবে যে, এইরূপ অনুশাসনের অর্থ এই না যে, ভারত বর্তমান হারেই স্টার্লিং মুদ্রার সহিত রৌপ্যমুদ্রাকে বাঁধিয়া দিবে। ভারত স্বাধীনভাবেই এই বিষয়টি আলোচনা করিবে।

Breton Woodsএ যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন ও উন্নয়নকল্পে একটি আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার প্রস্তাবও গৃহীত হইয়াছে। অন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের যাঁহারা সভ্য হইবেন তাঁহারাই কেবল উক্ত ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিতে পারিবেন।

উক্ত ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য হইল যুদ্ধবিধ্বস্ত রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক অবস্থার সংস্কার করা এবং যুদ্ধোত্তরকালের প্রয়োজনানুগ জিনিষপত্র উৎপাদনের পথ সুগম করা। এই সম্বন্ধে যে সকল রাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থা ভাল নহে, তাহাদিগকে যথাবিহিত সাহায্য দানে তাহাদের অবস্থার উন্নতি বিধান করাও এই ব্যাঙ্কের একটি প্রধানতম উদ্দেশ্য। এই ব্যাঙ্কের তরফ হইতে যতখানি না সোজাসুজি ধারের বন্দোবস্ত হইবে, তার চাইতে অন্যের দেওয়া ধার পরিশোধ করার দায়িত্ব এই ব্যাঙ্ক বেশী গ্রহণ করিবে। যুদ্ধোত্তরকালে ভারতের শিল্পোন্নয়নের জন্য এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলি ফলপ্রসূ করিবার জন্য বিদেশ হইতে নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি, [illegible] ও দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা [illegible] সাময়িকভাবে

ভারতের মজুতে স্টার্লিং ব্যালেন্স অকেজো হইয়াছিল তথাপি ভারতকে উক্ত স্টার্লিং জামিনে আন্তর্জাতিক ব্যাংক হইতে বিদেশ-জাত দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিবার মত ধার দেওয়া হয় তাহা হইলে উক্ত স্টার্লিং ব্যালেন্স কিছুটা ভারতের প্রকৃত কাজে লাগিতে পারিবে। এই ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতের যদি এমন একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় বা স্টার্লিং জামিনে ভারত আন্তর্জাতিক ব্যাংক হইতে যে ঋণ গ্রহণ করিবে, সেই ঋণ সুদেআসলে নির্দিষ্ট সময় অন্তে পরিশোধ করিবার দায়িত্ব ব্রিটেন নিবে, তবে ভারত পরোক্ষে স্টার্লিং ব্যালেন্সের কথঞ্চিৎ সদ্ব্যবহার করিতে পারে এবং ব্রিটেনও উক্ত স্টার্লিং ঋণ যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ফিরাইয়া দিবার ঘন ঘন তাগিদ হইতে রক্ষা পাইল। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে ভারতের আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলে যোগদান করা কর্তব্য। যে স্টার্লিং সমস্যার সমাধান মুদ্রা সম্মিলনীতে সম্ভব হইল না, তাহাই আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের সাহায্যে অনায়াসে সমাধান হইতে পারে। তাহা ছাড়া এ দেশের সহিত অপর দেশের স্বার্থ ক্রমেই যেরূপ জড়িত হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে ভারতের পক্ষে দূরে সরিয়া থাকা সম্ভবপর নহে। ভবিষ্যৎ জগতে ভারতকে তার স্থায়ী আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে এইরূপ একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিতেই হইবে।

সুরকার হিমাংশু দত্ত

নারায়ণ চৌধুরী

সুরকার হিমাংশু দত্ত, 'সুরসাগর', বাঙলা গানকে কোন্ দিক দিয়ে কীভাবে কতদূর সমৃদ্ধ করেছেন, সে সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা অনেক-দিন আগেই রচিত হওয়া উচিত ছিল। তা যখন হয়নি তাতেই বোঝা যায়, আমরা বাঙালীরা শুধু গান শুনতেই ভালোবাসি, গানের মূল্য বিচারে তেমন উৎসাহ পাইনে। এখনও গান এদেশে কেবলমাত্র কানের জিনিস হয়েই আছে, মগজের সাহায্যে অর্থাৎ কালিকলমের মধ্যে দিয়েও যে তাকে বোঝা দরকার, সেটা কারু মনেই হয় না। বরং বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়, অনেকে সেটাকে রীতিমতো অপছন্দই করেন। সে যাই হোক, হিমাংশু দত্তর জীবিতকালে যেটা সম্ভব হয়নি তাঁর মৃত্যুকে উপলক্ষ করে কেউ সে-কাজ করবেন, এরূপ একটি আশা মনে উদিত হয়েছিল। কিন্তু যতোগুলি আলোচনা চোখে পড়লো তাতে হিমাংশু দত্তর কোষ্ঠী বিচারটাই প্রধান হয়ে উঠেছে, তাঁর কৃতিত্বের পরিমাপ নয়। জীবনকে বাদ দিয়ে সেখানে জীবন বৃত্তান্তটাই প্রকট। বিষয় নয়, বিষয়ের বর্ণসূচী। আর যদিবা কেউ তাঁর সংগীতের মূল্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন, সেটা মুখ্যত সিনেমার সঙ্গে জড়িয়েই করেছেন। কিন্তু হিমাংশু দত্তর আসল পরিচয় তা নয়, সিনেমার গানে তাঁর সৃষ্টি-কুশলতার ভগ্নাংশমাত্র প্রকাশ পেয়েছে।

'সুরসাগর' আজন্ম সুরের পূজারী। খুব ছোটবেলা থেকেই এইদিকে তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। গানের প্রতি তাঁর এই অত্যধিক প্রীতি ও নিষ্ঠা আকস্মিক ব্যাপার কিছু নয়, তাঁদের গৃহের আবেষ্টনীতেই এর প্রভাব ছিল। এক এক পরিবারে যেমন এক একটি বিশেষ প্রবণতা প্রকাশ পায়, এঁদের পরিবারের তেমনি ছিল সংগীতের প্রবণতা। বালক হিমাংশু-কুমারের মধ্যে সেই প্রবণতা খুব গভীরভাবেই সঞ্চারিত হয়েছিল। তাঁর মাতার কাছ থেকেই প্রথমে তাঁর সংগীতশিক্ষা। পরবর্তী জীবনে হিমাংশু দত্ত স্বরলিপি প্রণয়নে ও স্বরলিপি উদ্ধারে এতো যে সুদক্ষ হয়ে উঠেছিলেন, তার প্রাথমিক শিক্ষা তিনি তাঁর মায়ের কাছ থেকেই লাভ করেছিলেন। তাঁর বড়োদাদা শ্রীযুক্ত শচীন্দ্র দত্তও একজন কৃতী সংগীতবেত্তা—যন্ত্রসংগীতে তাঁর কৃতিত্ব



অনন্যসাধারণ। সংগীতের ঔপপত্তিক (Theoretical) দিকটিও তাঁর হাতের মুঠোয়। এহেন যোগাযোগের ফলে খুব অল্প বয়স থেকেই যে হিমাংশু দত্তর সংগীতপ্রতিভা বিকশিত হয়ে উঠতে পেরেছিল তা বোধ করি সহজেই অনুমান করা চলে।

কিন্তু যেভাবে বাঙালী ছেলেরা সাধারণত গান শেখে হিমাংশু দত্ত ঠিক সেভাবে কখনও গান শেখেন নি। এই দিক দিয়ে তাঁর সংগীতশিক্ষার পদ্ধতিকে প্রায় একক বলা চলে। আমরা ছোটবেলায় যখন গান গাইতে শিখি সেটা গান শিখ্‌বো বলে শিখি না; আপনা থেকেই গান আমাদের গলায় ভর করে। বয়সটাই তখন এমন যে গান শোনামাত্র সুরের যাদু মনকে থিতিয়ে আনে—পরের গলার গান অবিলম্বে এবং অবলীলাক্রমে নিজের গলায় উঠে আসে। এই অধ্যায়টিতে স্বতঃস্ফূর্তির ভাবটাই প্রবল, নির্বিশেষ আবেগই তখন আমাদের মুখে সুর জোগায়। কিন্তু আরো যখন বড়ো হই, তখন আর এ ভাবটি থাকে না—তখন মনে হয় গান 'শিখবো', সেটা ভালো-ভাবে শিখ্‌বো এবং ওস্তাদের কাছ থেকে শিখবো। আর সত্যি, আমরা তখন ওস্তাদের কাছে 'নাড়া' বেঁধে, সাকরেদ হয়ে আদাজল খেয়ে লেগে যাই রাতারাতি ওস্তাদ হবো বলে। সবাই যে হই তা নয়, তবে কেউ কেউ হন। কাজেই দেখা যায় সংগীতশিক্ষার এই অধ্যায়টিতে চেষ্টার ছাপ খুব সুস্পষ্ট—আর সেটা নিয়ন্ত্রিত হয় একটি সক্রিয় ইচ্ছার দ্বারা।

কিন্তু হিমাংশু দত্তর ক্ষেত্রে উপরোক্ত সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম চোখে পড়ে। বরং বলা চলে, তাঁর বেলায় প্রক্রিয়াটা ঘটেছিল উল্টোভাবে। অর্থাৎ তাঁর সংগীত শিক্ষা প্রথমে সক্রিয় সাধনার খাত বেয়ে পরে আবেগাকুলতার মহাসমুদ্রে এসে মিশেছিল। নিষ্ঠা ও অভিনিবেশের দ্বারা সংগীতের বৈজ্ঞানিক রূপটিকে প্রথমে আয়ত্ত করে পরে তিনি সংগীতের রসের দিকটিতে মজেছিলেন। সংস্কৃতে যেমন সাহিত্য, কাব্য প্রভৃতি পাঠের আগে একাদিক্রমে দ্বাদশ বৎসর ব্যাকরণ অধ্যয়ন করার রীতি আছে এ-ও অনেকটা তেমনি। হিমাংশু দত্তর প্রকৃতিতে সংগীত সহজাত হলেও গোড়ায় তিনি সংগীতের বৈজ্ঞানিক দিকটিকে আয়ত্ত

করবার দিকে বেশী ঝ‍ুঁকেছিলেন—তারই ফলে অতি অল্প বয়সেই রাগরাগিণী ও স্বরলিপির জ্ঞান তাঁর অধিগত হয়েছিলো। অতি কিশোর বয়সেই তিনি যে-কোন প্রচলিত রাগরাগিণীর ঠাট, জাতি, পকড়, বাদী, বিবাদী, সম্বাদী; রাগটি ঔড়ব কি খাড়ব জাতীয়, উত্তরাঙ্গ কি পূর্বাঙ্গ তা অনায়াসে বলে দিতে পারতেন—আর স্বরলিপি তো ছিল তাঁর নখদর্পণে। ভাতখণ্ডেজীর "হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি—ক্রমিক পুস্তক মালিকার" ছয় ছয়টি ভল্যুম সর্বদা তাঁর পাশে পাশে ফিরতো—তিনি কোনপ্রকার যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে মুখে মুখে সেসব স্বরলিপি চটপট গলায় তুলতে পারতেন—পুঁথির স্বরসঙ্কেত মুহূর্তেকে তাঁর কণ্ঠে গান হয়ে বেরোতো। ইউরোপীয় সঙ্গীতেই শুধু এই ধরণের শিক্ষার রেওয়াজ আছে—আমাদের দেশে এ জিনিসটি অতি বিরল। ভাতখণ্ডে প্রবর্তিত লক্ষ্ণৌর ম্যারিস কলেজে অবশ্য এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। তাতে আর কিছু হোক আর না হোক, সুরজ্ঞানের ভিত্তিটি যে খুব পাকা হয় তাতে আর সন্দেহ নেই।

হিমাংশু দত্তর মন যে বিজ্ঞানীর মন ছিল তা এই থেকেই বোঝা যায়। গোড়া থেকেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা তিনি তাঁর সঙ্গীত-সাধনাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন এবং শেষ বয়স পর্যন্ত এই দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর অটুট ছিল। আমাদের দেশের সঙ্গীতশিক্ষার্থীদের মধ্যে কিন্তু এ জিনিসটি বড়ো চোখে পড়ে না—তাঁদের শুধু আবেগ আর আবেগ, প্রেরণা আর প্রেরণা। অবশ্য, আবেগ ও প্রেরণা ভালো জিনিস, বিশেষত কলাশিল্পের ক্ষেত্রে এদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাই বলে বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে একেবারে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আবেগকে সম্বল করে রইলুম তাও ভালো নয়। এতে গায়ক বলে নাম কিনতে হয়ত আট্‌কায় না—কিন্তু সঙ্গীতসাধনার ভিত্তিটি চিরকাল কোথাও না কোথাও কাঁচা থেকে যায়। সঙ্গীত শিক্ষার্থীরা এইদিকে একটু মন দিলে তাঁরা যে সবিশেষ উপকৃত হবেন, সেকথা বলাই বাহুল্য।

তাই বলে এ যেন না কেউ মনে করেন, হিমাংশু দত্ত শুধু স্বরলিপির মাতামাতি নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। সুরের বাইরেকার মূর্তি নিয়েই তিনি কেবল খুসী ছিলেন না—তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবার সাধনাও তাঁর ছিলো। আর সেই সাধনাতেও তিনি অনুরূপ সিদ্ধকাম হয়েছিলেন। গোড়ায় তিনি সুরের বহিরঙ্গ নিয়ে একটু অতিরিক্ত মাতামাতি করেছিলেন বটে, কিন্তু ক্রমেই তাঁর কণ্ঠ আবেগে নুয়ে আসতে লাগলো। সুরের বিশুষ্ক দেহে দেখা দিলো রক্ত-মাংস, এলো প্রাণ। সা-রে-গা-মা-র বিচ্ছিন্ন রূপ ঘুচে গিয়ে দেখা দিলো সুরের সমগ্র রূপ—বিশ্লেষণ থেকে সংশ্লেষণ। যাঁরা হিমাংশু দত্তর প্রথম যৌবনের গান শুনেছেন তাঁরা বুঝতে পারবেন আমি কী বলতে চাইছি। তাঁর সে সময়কার কণ্ঠের যাদু আজও আমাদের মনে আছে। রবীন্দ্রগীতির সরল সৌন্দর্য, আধুনিক সঙ্গীতের সূক্ষ্ম কারিকুরি, আর ভজনের আবেগ—সবই তাঁর কণ্ঠে কী অপরূপ মহিমায় ফুটে উঠতো! পরে অবশ্য তাঁর কণ্ঠ ক্রমেই ম্লান হয়ে এসেছিল—কিন্তু সেটা এইজন্যে নয় যে, তিনি আর গাইতে পারতেন না। তাঁর সঙ্গীত সাধনার আবেগ সম্পূর্ণ এক ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করেছিল—গান গাওয়া থেকে উত্তরিত হয়ে তিনি চলে এসেছিলেন সুর বাঁধার তীরে। অপরের কণ্ঠে সুর জোগাবার ভার তিনি নিয়েছিলেন। কাজেই কণ্ঠচর্চার সময় তাঁর অল্পই ছিলো। নূতন নূতন সুর তৈরীর নেশা তাঁকে এমনভাবে পেয়ে বসেছিল যে, এই নূতন আনন্দ তাঁর সমগ্র ব্যক্তিত্বকে অভিভূত করে ফেলেছিলো বলা চলে। সুর কণ্ঠ ছেড়ে তখন তাঁর মগজে বাসা বেঁধেছে, মগজ থেকে হৃদয়ে। তাই তাঁর কণ্ঠের অভিব্যক্তি আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে এসেছিলো।

হিমাংশু দত্ত, 'সুরসাগর' প্রধানত সুরকার, তারপর অন্য কিছু। তাঁর সম্বন্ধে একথাটি আমাদের সব সময় স্মরণ রাখা দরকার। তাঁর 'সুরসাগর' উপাধি এই দিকটিকে বিশেষ করে চিহ্নিত করে রেখেছে। বস্তুত, প্রায় তরুণ বয়সেই যখন তাঁকে সারস্বত সমাজ থেকে 'সুরসাগর' উপাধিতে ভূষিত করা হয় তখন আমরা আনন্দিত হয়েছিলুম, কিন্তু বিস্মিত হইনি। সুরযোজনায় তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় তার আগে থেকেই আমরা পেয়েছিলুম। প্রথম তিনি যে গানটিতে সুরকরণ করেছিলেন, সেটি হলো একটি গজল—লোকান্তরিত অজয় ভট্টাচার্যের রচনা। তার প্রথম চরণটির সঙ্গে অন্তত পরিচয় নেই এমন লোক খুব কম খুঁজে পাওয়া যাবে। সেটি হলো 'হাস্নুহানা আজ নিরালা, ফুটিলি কেন আপন মনে।' এরপর একাদিক্রমে তিনি বহু গানে সুরযোজনা করেছেন। অজয় ভট্টাচার্য ও সুবোধ পুরকায়স্থ ছিলেন তাঁর গানের পদকর্তা—তাঁরা পদ রচনা করে দিতেন, তিনি নিরালায় বসে তাতে সুরযোজনা করে যেতেন। আর সেই গান তাঁর নিজের কণ্ঠে, জ্ঞান দত্তর (বর্তমানে বোম্বাইয়ে আছেন) কণ্ঠে ও কিছু পরবর্তী কালে কুমার শচীন দেববর্মণের কণ্ঠে ক্রমাগত গুঞ্জরিত হয়ে ফিরতো। হিমাংশু দত্তর কুমিল্লার আবাসগৃহ সঙ্গীতের একটি মধুচক্র ছিলো—তার সান্ধ্য বৈঠকগুলিতে সুরের নিরবচ্ছিন্ন অখণ্ড স্রোত বয়ে যেতো। মাঝে মাঝে বাইরে থেকেও গুণীজন তাঁদের গৃহে সমাগত হতেন। শান্তিনিকেতনের ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয় যখনই কুমিল্লা যেতেন, হিমাংশু দত্তর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করতেন। উভয়ের মধ্যে গভীর সম্প্রীতির বন্ধন ছিল। হিমাংশুকুমার বয়সে ক্ষিতিবাবুর পুত্রের তুল্য ছিলেন—তা হলেও তাঁদের ভেতর একটা স্নেহসিক্ত বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের সংস্পর্শে এসেই হিমাংশু দত্ত প্রথম কবীর, দাদু, সুরদাস প্রভৃতি মধ্যযুগীয় সাধকদের দোঁহা ও ভজন গানের অপরূপ মাধুর্যের পরিচয় পান। পরবর্তী জীবনে ক্ষিতিবাবু যেখানেই ধর্মীয় ব্যাখ্যার জন্যে আমন্ত্রিত হয়ে যেতেন, হিমাংশু দত্তকে সহচররূপে নিতেন তাঁর কথকতায় সুর জোগাবার জন্যে। হিমাংশু দত্তর ভজন যেন শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্যাখ্যানের পরিপূরক ছিল—একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটির কথা ভাবা যেত না। রেডিওতেও এই যোগাযোগ অনেকে প্রত্যক্ষ করে থাকবেন।

'সুরসাগর' কোন ধরাবাঁধা ওস্তাদের কাছ থেকে সঙ্গীতশিক্ষা করেন নি। তার কারণ বোধ হয় এই যে, ওস্তাদের অতিরিক্ত গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতা তাঁর ভালো লাগতো না। শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে তিনি আজন্ম স্বাধীনচারী ছিলেন—পারতপক্ষে তথাকথিত ওস্তাদদের ছায়া মাড়াতেন না। এটি হবার আরও একটি কারণ এই যে, ছোটবেলা থেকেই ভাতখণ্ডেজীর শিক্ষা তাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। ভাতখণ্ডেজীর প্রতি ওস্তাদদের বিরোধিতা সর্বজনবিদিত। সেটাও অজ্ঞাতসারে তাঁর মনকে ওস্তাদদের প্রতি বিরূপ করে থাকবে। ওস্তাদদের একদেশদর্শিতা ও সংরক্ষণকামিতা তিনি আদপেই সহ্য করতে পারতেন না। এ ছাড়া শান্তিনিকেতন ও বিশেষ করে রবীন্দ্রগীতির প্রভাবও তাঁর জীবনে অসামান্য। কবির সঙ্গীতের আদর্শ খুব ছোটবেলা থেকেই তাঁর মনকে আলোড়িত করে তুলেছিল—এ বিষয়ে তাঁর মা তাঁর সহায় হয়েছিলেন। হিমাংশু দত্ত রবীন্দ্রগীতির একজন গভীর অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। কবির কতো গানই যে তাঁর জানা ছিল! জানা ছিল মানে লোকমুখ থেকে শুনে জানা নয়—নির্ভুলভাবে জানা, অবিকৃতভাবে জানা। পরবর্তী জীবনে রবীন্দ্রগীতির সুর তাঁর সুরযোজনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু সেকথা যথাস্থানে বলব। আপাতত এই আমাদের বলবার উদ্দেশ্য যে, ওস্তাদপন্থী গতানুগতিকতার প্রতি তিনি বরাবরই বিরূপ ছিলেন। ধরাবাঁধা শিক্ষায় তিনি বিশ্বাস করতেন না। তাঁর পরিশীলিত পরিমার্জিত মনের ঝোঁক ছিল অবাধ অথচ স্বেচ্ছা-নিয়ন্ত্রিত আত্মবিকাশের দিকে। হিমাংশু

দত্ত শুধু সঙ্গীতজ্ঞই ছিলেন না, তিনি একই কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁর শিক্ষা ছিল বিচারবোধ দ্বারা দীপ্ত, রুচি ছিল মার্জিত। দুঃখের বিষয় এই মার্জিত রুচি আমাদের দেশের তথাকথিত সঙ্গীতজ্ঞদের অনেকেরই নেই—শিক্ষায় যেমন তাঁরা পশ্চাদ্‌গামী, রুচিতেও তেমনি অমার্জিত। এদেশে সঙ্গীত যে শিল্পকলার অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে অগ্রগামী হতে পারছে না, তার মূল বোধ হয় এখানেই।

'সুরসাগর' গজল দিয়ে সুর-যোজনার সুরু করেছিলেন বটে, কিন্তু পরে আর তাঁকে বড়ো একটা গজল সুর দিতে দেখা যায় নি। তিনি হাল্‌কা সুরে ও মুখ্যত দাদ্‌রা ছন্দে এক সঙ্গে অনেক গান রচনা করলেন। আদ্ধা ও হালিয়া কার্ফার ছন্দেও কিছু কিছু সুর তিনি রচনা করেছিলেন। তাঁর এই যুগের সুরগুলির মধ্যে 'তার কাজল নয়নে ছিল', খুঁজে দেখা পাইনে যাহার', 'ওগো মরমিয়া', 'আজি এ মাধবী রাতে', 'জানি না অজানারে', 'ও বীণ কার', 'আজ ফাগুনে প্রথম দিনে', 'এলো কোন্ চৈতী হাওয়া গন্ধ উতল বনে বনে', 'আবেশ আমার যায় উড়ে কোন্ ফাগুনে', 'সে কোন নব ফাগুন প্রাতে' প্রভৃতি বহু গানের সুরের নাম করা যায়। এর পর তাঁর সুরে চটুলতার ভাবটি একটু কমে আসে ও তার স্থলে দেখা দেয় রবীন্দ্রগীতিসুলভ স্থির সৌন্দর্য ও কমনীয়তা। রবীন্দ্রনাথের গানে যেমন চারটি 'কলি' থাকে, হিমাংশু দত্তর এ যুগের সুরগুলিও তেমনি চারটি 'কলি'কে অবলম্বন ক'রে গ'ড়ে উঠলো। রবীন্দ্রনাথের গানের আসল মাধুর্য যেমন তাদের সঞ্চারীতে, হিমাংশু দত্তও তাঁর গানের সঞ্চারীগুলিতে তাঁর হৃদয়ের সঞ্চিত মধু নিঃশেষে ঢেলে দিলেন। তাঁর 'আজি আমারি কথা', 'ঝরা চামেলি বনে', 'আজি বাদল রাতে', 'ঊষার উদয়ক্ষণে' প্রভৃতি গানের সুরই তার প্রমাণ। এ সময়ে তিনি কিছু কিছু ঠুংরী ভাবান্বিত সুরের গানও তৈরী করলেন। যেমন, 'বসন্ত তোর লীলা কি আজ হ'লো অবসান', 'তব স্মরণখানি', 'ফাগুন আজি কেন' প্রভৃতি।

তারপরই তাঁর ঝোঁক গেল হিন্দী খ্যাল গান ভেঙে বাঙলা গান বাঁধার দিকে। পর পর অনেকগুলি খ্যাল তিনি বাঁধলেন—কিন্তু তাঁর সুরের প্রসাদ গুণে সেগুলির আর হিন্দুস্থানী চেহারা রইলো না—তাদের ভেতর খাঁটি বাঙলা সুরের আদল এসে পড়লো। বাঙলা গানের সুর হিন্দুস্থানী সুরকে আত্মস্থ ক'রে তাদেরকে স্বকীয় মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করলো। 'সুরসাগরের' 'যদি দখিনা পবন', 'আলো-ছায়া দোলা উতলা ফাগুনে', 'মম মন্দিরে এলে কে তুমি' 'মঞ্জু রাতে আজি' প্রভৃতি গানগুলি এই পর্যায়ের। তাঁর বিখ্যাত সুর 'নতুন ফাগুনে যবে' অবশ্য হিন্দুস্থানী গান ভেঙে করা নয়—তবে তার ভেতর হিন্দুস্থানী সুরের বাঁধুনি খুব স্পষ্ট। 'রাগেশ্রী' রাগের ওপর সুরটির ভিত্তি—তবে বাঙলা সুরের নিজস্ব জারক-রসে জীর্ণ হ'য়ে তার চেহারা আগাগোড়া বদলে গেছে। তাঁর 'দুর্গা' সুর ভেঙে করা 'ফাগুনের সমীরণ সনে', 'তিলক-কামোদ' সুরে 'আজি মধু রাতে কার বাঁশী বাজে হায়', তিলঙ সুরে 'বাজে রিণিকি ঝিনি তাহার নূপুরে শুনি' ও 'জাগি রজনী' 'জয় জয়ন্তী' রাগে 'ফিরে এলো শ্রাবণ ধারে' প্রভৃতি গানগুলি সম্বন্ধেও একথা অল্পবিস্তর প্রযোজ্য। সুর হিসাবে তাঁর 'ছিল চাঁদ মেঘের পারে' গানটির সুর আমার মতে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি কিছু কিছু নাচের সুরও তৈরী করেছিলেন। যেমন 'বল্ হিম ঋতু বল্', 'ধীরে ধীরে চরণে', 'ঝরাণো পাতার পথে।' এদের ভেতর ইউরোপীয় সুরের ধাঁচ খুব স্পষ্ট।

এরপরই তিনি সংগীত পরিচালকরূপে সিনেমায় যোগদান করেন। এটা যে তিনি ইচ্ছার বশে করেছিলেন তা নয়, অন্ন সংস্থানের তাগিদই ছিল তার ভেতরের কথা। তাঁর সিনেমায় দেওয়া অনেক গানই জনপ্রিয় হয়েছে, কিন্তু আমরা বলবো যথার্থ 'সুরসাগর' সেসব গানে তেমনভাবে উপস্থিত নেই। পূর্বেকার অধ্যায়ের গানে তাঁকে আমরা তাঁর যথার্থস্বরূপে যেমনভাবে পাই, সিনেমার গানে তেমনভাবে পাই না। তার কারণ, সিনেমার সুরে বিভিন্ন দর্শকের বিভিন্ন রুচির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ক'রে সুরদানের একটি মধ্যপথ আবিষ্কার ক'রে নিতে হয়। এতে যে সুরকে অবিকৃত রাখা আর সম্ভব হয় না, সেকথা বলাই বাহুল্য। দর্শককে খুসী করার পথ হ'লো মধ্যপথ—কিন্তু সে পথ শিল্পীর পথ নয়। অবশ্য দর্শকদের এবং সেই সঙ্গে প্রযোজককে খুসী করবার জন্যে সুরকে মাঝে মাঝে সাধারণের স্তরে নামিয়ে আনতে হয়ই, কিন্তু তা দিয়ে শিল্পীর বিচার হওয়া উচিত নয়। আর্থিক প্রেরণায় যে কোন শিল্পীকেই বাস্তবের সঙ্গে কিছু না কিছু আপোষ-রফা ক'রে চল্‌তে হয়, কিন্তু সেটা তাঁর যথার্থ স্বরূপ নয়। সিনেমার গান দিয়ে তাই হিমাংশুকুমারকে বিচার করলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। তবে এই ক্ষেত্রে তাঁর দান একেবারে অনুল্লেখযোগ্যও নয়। 'রাতের ময়ূর ছড়ালো যে পাখা' প্রভৃতি বহুল প্রচারিত গানগুলিতে বিশেষত্ব অবশ্যই কিছু আছে। তাঁর এইসব গানগুলিতে মিশ্রণের প্রক্রিয়াটা বড়ো স্পষ্ট প্রত্যক্ষ, ফল্গুধারার মতো অন্তরালসঞ্চারী নয়। এতে গানগুলি অবশ্য খুব চটকদার দেখায়, কিন্তু তাদের ঐশ্বর্যের পুঁজি অপেক্ষাকৃত অল্প। সিনেমার সুর না হ'লেও 'তাঁর বিখ্যাত 'তাজমহল' গানটি 'প্রেমের না হবে ক্ষয়,' 'চাঁদ ভোলে নাই চামেলিরে তার' প্রভৃতি গানগুলিকেও এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা চলে। 'তাজমহল' গানটি সুরের দিক থেকে যেমনই হোক তার আবেদনটি গীতি কবিতার। গানটির জনপ্রিয়তার মূল এখানেই।

হিমাংশু দত্তর জীবনে সিনেমার অধ্যায়টি এক বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। এই সময় থেকেই তিনি ভারতীয় সুরে পাশ্চাত্য harmony-র প্রয়োগ সম্বন্ধে সাগ্রহ পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। তাঁর পরিচালিত ঐক্যতানবাদনে সেই প্রচেষ্টা সুস্পষ্ট ধরা পড়ে। এই পথে তিমিরবরণই একমাত্র তাঁর সহগামী—এদেশে আর কেউ যে orchestration-এ Harmonies-এর রীতি প্রয়োগের কথা গভীরভাবে চিন্তা করেছেন এমন মনে হয় না। গানের melody-তেও harmony প্রবর্তনার প্রাথমিক চেষ্টা তিনি করেছিলেন। বেঁচে থাকলে হিমাংশু দত্ত এই ক্ষেত্রে যে আরও অনেক স্থায়ী কাজ ক'রে যেতে পারতেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সুরসাগর নতুন রাগিণীও তৈরী ক'রে গেছেন। আধুনিক সুরকার আর কেউ এ বিষয়ে কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন কি না সন্দেহ আছে। তাঁর 'পুষ্পচন্দ্রিকা' রাগ একটি অনবদ্য সৃষ্টি। রসজ্ঞরা এতে তাঁর সৃষ্টি-কুশলতা, গভীর মার্গ সংগীত জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হবেন।

হিমাংশু দত্তর সুরদানের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই দুটি জিনিস আমাদের আলোচনা করা দরকার। এক তাঁর রবীন্দ্র সংগীতের গভীর জ্ঞান, দ্বিতীয়, তাঁর মার্গসংগীতের (ভারতীয় ক্লাসিক্যাল সংগীত) প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। ওস্তাদের কাছ থেকে ধরাবাঁধা নিয়মিত শিক্ষা গ্রহণ না করলেও তিনি ঘরে বসে ক্লাসিক্যাল গান সম্পর্কে দস্তুরমতো শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। এ দুয়ের সমন্বয়েই তাঁর সুর—অথচ, সেটা রবীন্দ্র গীতিও নয়, ক্লাসিক্যাল গানের বাঙলা সংস্করণও নয়। সেটা নির্বিশেষে 'সুরসাগরের' সুর। তাঁর যে কোন সুর শুনলে ব'লে দেওয়া যেতো এটি তাঁরই সুর—অন্য কারু নয়। সুরকারের পক্ষে এই স্বাতন্ত্র্যটুকু অর্জন করাই হ'লো আসল। রবীন্দ্রনাথের পর কাজী নজরুল, অতুলপ্রসাদ, দিলীপকুমার, পঙ্কজ মল্লিক এবং হিমাংশু দত্তর এই স্বাতন্ত্র্য ছিল—আর কোন সুরকারের মধ্যে এ জিনিস চোখে পড়ে না। হিমাংশু দত্ত সুরযোজনায় নির্বিচার মিশ্রণ পছন্দ

করতেন না। মিশ্রণের প্রক্রিয়ায় তিনি রবীন্দ্রানুসারী পথ অনুসরণ করতেন—সংযমের পথ, মিতব্যয়িতার পথ এবং অন্তরালের পথ। তাঁর মিশ্রণ বরাবরই ঘোমটার আড়ালে চলতো, প্রখর দিবালোকে স্পষ্ট অনুদ্ঘাটিত হ'তে ছিল তার নববধূর সংকোচ। সেই সংকোচকে সিনেমায় প্রবেশ করার আগে পর্যন্ত তিনি কখনও অবমাননা করেননি।

আমাদের দেশে সুরকারের মর্যাদা এখনও যথাযথ স্বীকৃত হয়নি। গায়ক অথবা বাদককে নিয়েই আমাদের মাতামাতি—অথচ যিনি তাদের কণ্ঠে ও যন্ত্রে সুর জোগান তিনি এখনও পাদপ্রদীপের আড়ালেই রইলেন। ইউরোপে কিন্তু এর উল্টো। সেখানে Composer-এর যে সম্মান executantএর সম্মান তার সিকির সিকিও নয়। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে বলেছেন, আমাদের দেশের সুরকারদের মধ্যে আত্ম-অবলুপ্তির (Self-effacement) প্রেরণা বড়ো প্রবল, তাঁরা নিজেরা মুছে যেতে রাজী, কিন্তু সুরগুলিকে ভবিষ্যৎ বংশীয়দের জন্যে রেখে যাওয়া চাই-ই। কতো রাগরাগিণীই তো এযাবৎ প্রচলিত আছে, কিন্তু তাদের কয়টির স্রষ্টার নাম আমরা জানি? গায়ক হিসাবে হিমাংশু দত্তর স্মৃতি হয়ত অচিরাৎ মুছে যাবে, কিন্তু সুরকাররূপে তাঁর প্রতিষ্ঠাকে কোনক্রমেই মলিন হতে দেওয়া উচিত নয়।

অনুবাদসাহিত্য

ছায়াপথের রূপকথা

(লাফ্‌কাডিও হার্ণ হইতে)

প্রাচীন জাপানে যে সকল চিত্তাকর্ষক উৎসব অনুষ্ঠিত হইত, তন্মধ্যে ছায়াপথের বয়নরতা বালিকা তানাবাতা শুমের উৎসবই ছিল সর্বাপেক্ষা মনোমুগ্ধকর। প্রধান শহরসমূহে এই পর্বদিন বর্তমানে ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হয় না এবং টোকিও এই উৎসবের কথা প্রায় বিস্মৃত হইয়াছে। কিন্তু মফঃস্বলের অনেক জেলায় এবং জাপানের রাজধানী টোকিওর নিকটবর্তী অনেক গ্রামেও উক্ত উৎসব এখনও সাধারণভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে। সপ্তম মাসের সপ্তম দিবস (প্রাচীন পঞ্জিকা অনুযায়ী) মফঃস্বলের কোন সেকেলে শহরে বা গ্রামে গেলে সম্ভবত দেখা যাইবে যে, অনেক বাড়ির ছাদে অথবা উঠানে সদ্য কাটা বাঁশ পোঁতা রহিয়াছে এবং প্রত্যেক বাঁশে অনেক রঙীন কাগজ ঝুলান আছে। প্রত্যেক কাগজে তানাবাতা বা তাহার স্বামী হিকোবোশির প্রশস্তি-গাঁথা লিখিত থাকে। উৎসব শেষে কবিতা লেখা কাগজসহ বাঁশগুলি নিকটবর্তী নদীতে নিক্ষেপ করা হয়।

এই পুরাতন উৎসবের আনন্দ উপভোগ করিতে হইলে সেই সব নক্ষত্র দেবদেবীর উপাখ্যান জানিতে হইবে, যাহাদের উদ্দেশ্যে রাজ-পরিবারবর্গ পর্যন্ত সপ্তম মাসের সপ্তম দিন অর্ঘ্য নিবেদন করিতেন। উপাখ্যানটি চৈনিক। জাপানের জনসাধারণ আখ্যানটিকে নিম্নোক্তরূপে গ্রহণ করিয়াছে—

তানাবাতা শুমে নামে আকাশ-দেবতার এক সুন্দরী মেয়ে ছিল। সে তাহার স্নেহময় পিতার জন্য পরিচ্ছদ বয়ন করিয়া দিন কাটাইত। একদিন তাহার স্বর্গীয় বাসভবনের দরজায় বসিয়া তাঁত বুনিতে বুনিতে সে দেখিতে পাইল, কোন কৃষকের এক সুন্দর ছেলে একটি ষাঁড় লইয়া তাহাদের বাড়ির পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। ছেলেটিকে দেখিয়া তানাবাতা আকৃষ্ট হইল। তাহার শক্তিমান্ পিতা ঐশিক শক্তিবলে মেয়ের গোপন অভিলাষ জানিতে পারিয়া চাষার ছেলের সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। কিন্তু নব-দম্পতি পরস্পরের প্রেমে এত মুগ্ধ হইয়া পড়িল যে, নভোদেবতার প্রতি তাহারা তাহাদের কর্তব্য সম্পাদনে অবহেলা করিতে লাগিল, মাকু চলাচলের শব্দ বন্ধ হইল এবং ষাঁড়টি গোচারকের অভাবে স্বর্গের মাঠে মাঠে ঘুরিতে লাগিল। ইহাতে নভোদেবতা অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে পৃথক করিয়া দিলেন। ইহার পর হইতে দুইজনকে স্বর্গ নদীর দুই তীরে বাস করিবার আদেশ দেওয়া হইল। কিন্তু বৎসরে একবার—সপ্তম মাসের সপ্তম রাত্রি তাহারা পরস্পর মিলিত হইবার অনুমতি লাভ করিল। সেই রাত্রে আকাশ পরিষ্কার থাকিলে স্বর্গের পাখীরা নিজেদের দেহ ও ডানা বিস্তৃত করিয়া মন্দাকিনীর উপর একখানি সেতু তৈয়ার করিত এবং সেই সেতুর সাহায্যে প্রেমিক-যুগল মিলিত হইতে পারিত। কিন্তু বৃষ্টিপাত হইলে স্বর্গ নদী এত স্ফীত ও প্রসারিত হইয়া পড়িত যে, সেতু-রচনা সম্ভব হইত না। সুতরাং স্বামী-স্ত্রী সপ্তম মাসের সপ্তম রাত্রিতেও সর্বদা মিলিত হইতে পারিত না; এমনও হইত যে, প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য ক্রমাগত তিন-চারি বৎসর ধরিয়া তাহাদের মিলন ঘটিতে পারিত না। কিন্তু তাহাদের প্রেম ছিল চির নূতন—চিরস্থির এবং পরবর্তী সপ্তম মাসের সপ্তম রাত্রিতে সুখময় মিলনের আশায় তাহারা উভয়ে প্রত্যহ আপনার কর্তব্য করিয়া যাইত।

প্রাচীন যুগের চীনবাসীরা ছায়াপথকে আলোক-নদী স্বর্গনদী রজত-ধারা প্রভৃতি রূপে কল্পনা করিত। পাশ্চাত্য লেখকদের মতে বয়নরতা বালিকা তানাবাতা ছায়াপথের তারকাপুঞ্জের উত্তর দিকের একটি তারকা, আর তাহার প্রণয়ী চাষার ছেলেটি ছায়াপথের অপর পার্শ্বে "একুইলা"র একটি নক্ষত্র। জাত-সুয়াশিন নামক একটি প্রাচীন গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, এই দেবদেবী মানব-যোনিজাত। এক সময় তাহারা স্বামী-স্ত্রী-রূপে চীনে বাস করিত। স্বামীর নাম ছিল ঈশিশ, স্ত্রী হাকুয়ো নামে পরিচিত ছিল। তাহারা সবিশেষ নিষ্ঠার সহিত চাঁদের উপাসনা করিত। প্রত্যহ সূর্যাস্তের পর নির্মল আকাশে চন্দ্রোদয় দেখিবার জন্য অধীর আগ্রহে তাহারা অপেক্ষা করিত এবং দূর-দিগন্তের কোলে যখন ধীরে ধীরে চাঁদ ডুবিতে থাকিত, তখন তাহারা বাড়ির নিকটবর্তী পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়া যতক্ষণ চাঁদ সম্পূর্ণে ডুবিয়া না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত চাঁদের রূপরাশি দেখিতে থাকিত। তারপর চন্দ্র অস্ত গেলে উভয়ে মিলিয়া দুঃখপ্রকাশ করিত। নিরনব্বই বৎসর বয়সে স্ত্রীর মৃত্যু হয়। হাঁড়িচাচা পাখীর পাখায় ভর করিয়া তাহার আত্মা স্বর্গে চলিয়া যায়। সেখানে সে একটি তারকায় রূপ পরিগ্রহ করে। তখন ১০৩ বৎসরের বৃদ্ধ স্বামী চাঁদের আলো দেখিয়া দেখিয়া স্ত্রীর মৃত্যুশোক ভুলিতে চেষ্টা করে।

স্বর্গে গিয়া হাকুয়ো চিরযৌবন ও চিরলাবণ্য লাভ করে। নিদাঘের এক রাত্রে হাঁড়িচাচাকে বাহন করিয়া হাকুয়ো তাহার স্বামীকে দেখিবার জন্য স্বর্গ হইতে নামিয়া আসে। হাকুয়োকে দেখিতে পাইয়া বৃদ্ধের খুব আহ্লাদ হয়। কিন্তু তারপর হইতে বৃদ্ধের একমাত্র ভাবনা হইল কি করিয়া সুখময় তারকা-জীবন লাভ করত স্বর্গ-নদীর পরপারে গিয়া হাকুয়োর সহিত মিলিত হইতে পারে। অবশেষে সেও একটি কাকের পিঠে চড়িয়া আকাশে আরোহণ করিল এবং সেখানে এক নক্ষত্র-দেবতায় রূপান্তর গ্রহণ করিল। কিন্তু তাহার আশানুযায়ী সে তৎক্ষণাৎ হাকুয়োর সহিত মিলিত হইতে পারিল না। কারণ, তাহার ও তাহার স্ত্রীর নির্দিষ্ট স্থানকে বিভক্ত করিয়া মন্দাকিনী প্রবাহিত এবং স্বর্গের দেবরাজ (তেন-তেই) সেই নদীতে স্নান করেন বলিয়া তাহাদিগকে নদী পার হইবার অনুমতি দেওয়া হইল না। অধিকন্তু নদীতে কোন সেতুও ছিল না। তবুও শুধু সপ্তম মাসের সপ্তম দিন তাহাদিগকে মিলিত হইবার অনুমতি

দেওয়া হইল। সেই দিন স্বর্গাধিপতি বুদ্ধের দেশনা শুনিবার জন্য "জেন-হোডোতে" যাইতেন। এই দিকে হাঁড়িচাচা ও দাঁড়কাকগুলি মিলিয়া তাহাদের উড়ন্ত দেহ ও পাখা প্রসারিত করিয়া একখানি সেতু তৈয়ার করিত এবং হাকুয়ো সেই সেতু পার হইয়া তাহার স্বামীর সহিত মিলিত হইত।

জাপানের তানাবাতা উৎসব আর চীনের বয়ন-দেবী ছি-নিউ এর উৎসব যে আদতে এক, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। মনে হয়, প্রাচীন কাল হইতে জাপানের এই পর্বদিন, বিশেষ করিয়া মেয়েদের পর্বদিন রূপে প্রচলিত এবং তানাবাতা শব্দটির হরফগুলি দেখিতে একটি বয়নরতা মেয়ের মত দেখায়। কিন্তু দুই তারকা-দেবীর উৎসব একই দিনে (সপ্তম মাসের সপ্তম দিন) হওয়ায় কোন কোন জাপানী পণ্ডিত তানাবাতা নামের প্রচলিত ব্যাখ্যা লইয়া সন্তুষ্ট নহেন; তাঁহারা বলেন, আদতে তানাবাতা শব্দটি "তানে" (বীজ বা শস্য) এবং "হাতা" (তাঁত) এই দুইটি শব্দ লইয়া গঠিত হইয়াছিল।

জাপানের প্রাচীনতম কাব্য-সংগ্রহ "মানিওশুতে" (৭৬০ খৃষ্টাব্দ) দেবতাকে হিকোবোশি নামে এবং দেবীকে তানাবাতা শুমে নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু পরবর্তীকালে উভয়েই তানাবাতা নামে অভিহিত হইয়াছিল।

প্রাচীন জাপানে সাধারণের ধারণা ছিল যে, প্রেমিক-যুগলের মিলন মানবের সৌভাগ্য সূচনা করে। সেই দেশের অনেক স্থানে আজও তানাবাতা উৎসবের দিন সন্ধ্যাকালে ছেলে-মেয়েরা সুর করিয়া একটি ছোট গান গায়ঃ তেনকি নি নারি (নির্মল হও হে আকাশ)। আইগা প্রদেশে প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন-মুহূর্তে ছেলে-মেয়েরা তানাবাতাকে পরিহাস করিয়া গাহিয়া উঠে,—

> তানাবাতা, শোন শোন চলছ কেমন ধেয়ে,
> দৌড় নাকো পড়ে যাবে হঠাৎ হোঁচট খেয়ে।

কিন্তু বর্ষণমুখর ইজুমু প্রদেশে ইহার বিপরীত বিশ্বাসই প্রচলিত। এই স্থানের লোকের বিশ্বাস যদি সপ্তম মাসের সপ্তম দিন আকাশ নির্মেঘ থাকে, তবে তাহাদের কোন অমঙ্গল ঘটিবে। এই বিশ্বাসের কারণ দেখাইতে গিয়া তাহারা বলে, তারকা দুইটির সম্মিলনে অনেক পাপগ্রহের সৃষ্টি হইবে এবং তাহারা অনাবৃষ্টি ও অন্যান্য অমঙ্গল ঘটাইয়া দেশকে বিধ্বস্ত করিবে।

আধুনিক পণ্ডিতগণ মনে করেন, তেম্পি ও শোহোর (৭৫৫ খৃষ্টাব্দ) সপ্তম মাসের সপ্তম দিনে তানাবাতা-উৎসব সর্বপ্রথম জাপানে অনুষ্ঠিত হয়। উপরোক্ত দেবদেবীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত একটিমাত্র মন্দিরের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। মন্দিরটি "তানাবাতা-জিঞ্জা" নামে অভিহিত। ওয়ারী প্রদেশের হোশিয়াইমুরা গ্রামে অনাবাতা-মোরি নামক নিকুঞ্জের অভ্যন্তরে এই মন্দিরটি অবস্থিত। *

কিন্তু তেম্পি ও শোহোর পূর্বেও বয়ন-কুশলা কন্যার উপাখ্যান জাপানে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ, প্রাচীন পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে যে, ইয়োরোর (৭২৩ খৃঃ) সপ্তম বৎসরের সপ্তম রজনীতে যামাগামি নো ওকুরো নামক জনৈক কবি নিম্নোক্তরূপে একটি গান রচনা করিয়াছিলেন :—

> মন্দাকিনীর তীরে বসে পথটি চেয়ে থাকা
> সফল হবে সফল হবে আজ,
> পূর্ণ করে দীর্ঘ দিনের অগাধ আকাঙ্ক্ষা
> অঙ্গনে মোর আসবে হৃদিরাজ।......
> রত্নখচা মেখলাটির গ্রন্থি দিয়ে খুলে
> কটি থেকে হেলা ভরে ফেলে দেব ধূলে।

চীনের প্রথা অনুসরণ করিয়া বোধ হয় ১১৫০ বৎসর পূর্বে প্রথম জাপানের রাজ-পরিবারের মধ্যে তানাবাতা-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে দেশের সর্বত্র অভিজাত ও যোদ্ধৃ পরিবারসমূহ রাজকীয় দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এবং ক্রমে হোশিমাৎসুরি উৎসব—যাহা তারকা-উৎসব নামে পরিচিত—সাধারণের মধ্যে এমন প্রচারলাভ করে যে, অবশেষে সপ্তম মাসের সপ্তম দিন বস্তুত সম্পূর্ণরূপে জাতীয় পর্বদিনে পরিণত হয়। অবশ্য এই পর্বদিনের উৎসব বিভিন্ন কালে এবং বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

রাজপ্রাসাদে এই উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত। "কোজি-কোন্-গেন"এ ইহার চিত্রসম্বলিত ব্যাখ্যাসহ সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। সপ্তম মাসের সপ্তম দিন সন্ধ্যাবেলা রাজপ্রাসাদের পূর্বদিকে "সেইরোদেন"এ মাদুর পাতিয়া তাহার উপর চারিখানি চৌকি রাখা হইত। চৌকিগুলির উপর নক্ষত্র-দেবতাদের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য সাজান থাকিত। প্রচলিত প্রথানুযায়ী আহার্য উপচার ব্যতীত ধেনো মদ, ধূপ, গালানির্মিত লাল ফুলদানীতে ফুল, একটি বীণা, একটি বাঁশি এবং পাঁচ রকমের সুতা পরান একটি পাঁচ ছিদ্রযুক্ত সূঁচ চৌকির উপর সাজাইয়া দেওয়া হইত। অর্ঘ্যসম্ভার উজ্জ্বল দেখাইবার জন্য চৌকির পার্শ্বে কালো গালার তৈল-প্রদীপ জ্বলিত। উৎসব-স্থানের অপর পার্শ্বে একটি জলের গামলা এমনভাবে বসান হইত, যেন তানাবাতা তারকার আলো সেখানে প্রতিফলিত হয়। এবং রাজ-পুরনারীরা সেই জলে প্রতিফলিত আলোকে একটি সূঁচে সুতা পরাইবার চেষ্টা করিতেন। যিনি সুতা পরাইতে পারিতেন, তাঁহার সেই বৎসরে ভাগ্য খুব ভাল যাইবে, ইহাই ছিল তাঁহাদের বিশ্বাস।

রাজসভাসদ্গণ উক্ত পর্বদিনে রাজ-প্রাসাদে উপঢৌকন পাঠাইতে বাধ্য ছিলেন। উপঢৌকনসামগ্রী এবং তাহা প্রেরণের রীতি আদেশক্রমে স্থিরীকৃত হইত। সম্ভ্রান্ত বংশের কোন অবগুণ্ঠনবতী মহিলা উৎসব-পোষাকে সজ্জিত হইয়া উপঢৌকনপূর্ণ থালা প্রাসাদে বহন করিয়া নিতেন। তাঁহার মাথার উপরে একখানি বৃহৎ লাল ছাতা ধরিয়া একজন অনুচর সঙ্গে সঙ্গে যাইত। সাতখানা তাঞ্জাকু (কবিতা লিখিবার জন্য সরু ও লম্বা উৎকৃষ্ট রঙীণ কাগজ), সাতটি কুদ্জু পাতা, সাতটি কালির বড়ি, সাতখানা সোমেন (সেমই), চৌদ্দখানা লিখিবার তুলিকা এবং রাত্রে সংগৃহীত শিশির সিঞ্চিত একটি জামপল্লব উপঢৌকন-সামগ্রীরূপে থালায় করিয়া নীত হইত। রাজপ্রাসাদে টাইগার তারকার উদয়কালে—ভোর চারি ঘটিকায় উৎসব আরম্ভ হইত। নক্ষত্র-দেবতাদের প্রশস্তি লিখিবার জন্য কালি তৈয়ার করিবার পূর্বে দোয়াতগুলি যত্নের সহিত ধুইয়া এক একটি কুদ্জু পাতার উপর রাখা হইত। তারপর এক একটি দোয়াতের উপর রাখা হইত এক একটি শিশিরসিক্ত জামপল্লব। জলের পরিবর্তে শিশির সংযোগে কালি তৈয়ার করা হইত। সম্রাট্ মিং হুঙের সময়ে চীনের রাজপ্রাসাদে এই উৎসব যেভাবে অনুষ্ঠিত হইত, যেন তাহারই অনুকরণে জাপানে সম্পূর্ণ উৎসবটি সম্পাদিত হইত।

টোকুগোয়া শোগুনাতের সময়েই তানা-বাতা উৎসব জাতীয় উৎসবে পরিগণিত হয়। উৎসবের অনুষ্ঠানরূপে সদ্যকাটা বাঁশের শীর্ষদেশে বিভিন্ন রঙের তাঞ্জাকু বাঁধিয়া দিবার প্রথা প্রচলিত হয় মাত্র বুনশেই যুগ (১৮১৮ খৃঃ) হইতে। পূর্বে অত্যন্ত মূল্যবান্ কাগজ দিয়া তাঞ্জাকু তৈয়ার করা হইত এবং তখন এই কুলীন উৎসব যেমন আড়ম্বরপূর্ণ ছিল, তেমনি ছিল ব্যয়বহুল। টোকুগোয়া শোগুনাতের সময়ে বিভিন্ন রঙের একপ্রকার সস্তা কাগজ প্রস্তুত হয় এবং পর্বদিনের অনুষ্ঠান এত ব্যয়সুলভ হইয়া যায় যে, গরীব ব্যক্তির পক্ষেও পর্বোৎসব সম্পন্ন করা সহজ হইয়া পড়ে।

স্থানভেদে উৎসব অনুষ্ঠানের রীতি বিভিন্ন ছিল। ইজুমু প্রদেশের সকল অধিবাসী সামুরাই বা সাধারণ শ্রেণীর লোক ছিল। তাহারা একই পদ্ধতিতে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিত এবং এই উৎসব অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইত।

ফিউডাল যুগে জনসাধারণের জীবনযাত্রা কী মধুর ছিল, তাহার কিছু আভাস আমরা উৎসবগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণপাঠে পাই। সপ্তম মাসের সপ্তম দিন টাইগার তারকার উদয়কালে সকলে ঘুম হইতে উঠিয়া কালির বড়ি ও লিখিবার তুলিগুলি ধুইয়া রাখিত। তারপর বাড়িসংলগ্ন বাগান হইতে জাম-পল্লবের উপর শিশির সংগ্রহ করা হইত। এই শিশির 'আমানোগোয়া নো শুজুকি' (স্বর্গ-নদীর শীকর) রূপে পরিচিত এবং এই শিশির সংযোগে যে কালি তৈয়ার হইত, সেই কালিতে কবিতা লিখিয়া বাগানে পোতা বাঁশের মাথায় বাঁধিয়া দেওয়া হইত। প্রথানুযায়ী বন্ধুবান্ধবেরা তানাবাতা উৎসবের দিন একে অন্যকে নূতন দোয়াত উপহার দেয়। বাড়িতে নূতন দোয়াতে নূতন কালি গোলা হয়। তারপর বাড়ির প্রত্যেকে কবিতা লেখে। প্রাপ্তবয়স্কেরা তাহাদের ক্ষমতা অনুযায়ী তারকা দেবদেবীর প্রশস্তি গাথা রচনা করে, আর বালকবালিকারা হয় শ্রুতিলিপি লেখে না হয় ছড়া বাঁধিবার চেষ্টা করে। যে সকল শিশু অপরের সাহায্য

---

* অবশ্য এরূপ নামের কোন গ্রামের উল্লেখ বর্তমানের কোন ডাইরেক্টরীতে পাওয়া যায় না।

ব্যতীত তুলি ধরিতে পারে না, তাহাদের মা দিদি বা দাদা তাহাদের কচি হাত ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া তাঞ্জাকুর উপর আমানোগোয়া, তানাবাতা, কশায়াগি নো হাশি (হাঁড়িচাচার সেতু) প্রভৃতি উৎসব সংক্রান্ত এক-আধটি কথা লিখিয়া দেয়। বাগানে ডালপাতা সহ সদ্যকাটা দুইটি আস্ত বাঁশ—একটি পুরুষ বাঁশ (ওতকো-ডাকি), একটি স্ত্রী বাঁশ (ওন্ন ডাকি) পোতা থাকে। বাঁশ দুইটির মধ্যে ছয় ফুট ব্যবধান রাখা হয়। এক বাঁশ হইতে অন্য বাঁশ পর্যন্ত একখানি দড়ি টাঙানো হয় এবং এই দড়িতে পাঁচ প্রকার রঙীন কাগজ ও পাঁচ রঙের সুতার গুটি ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। কাগজের ঝালরগুলি উপরকার পোষাক কিমোনোর প্রতীক। কবিতালিখিত কাগজগুলি বাঁশের ডালে ও পাতায় বাঁধিয়া দেওয়া হয়। বাঁশ দুইটির মধ্যখানে অথবা ঠিক সামনে একখানা চৌকির উপর তারকা-দেবদেবীর উদ্দেশ্যে অর্ঘ্যভরা পাত্রগুলি সাজাইয়া রাখা হয়। ফল, সোমেল, ধেনো মদ, শসা, তরমুজ ইত্যাদি দিয়া উপচারসামগ্রী রচিত হয়।

কিন্তু উৎসব সংক্রান্ত সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে 'নেমুনাগাশি' বা 'ঘুম ভাঙগান' অনুষ্ঠান ছিল সর্বাপেক্ষা মনোমুগ্ধকর। সকাল হইবার আগে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা নেমুরিপাতা ও বীনপাতার পল্লব একত্রে লইয়া কোন সরিতের দিকে যাইত। সরিতের ধারে পেঁাছিয়া পল্লবগুলি স্রোতে ছুড়িয়া দিয়া তাহারা একটি ছোট গান ধরিত। অনুষ্ঠানটি রূপক এবং গানটির মর্মার্থ এইরূপঃ—

"সরিতের স্রোতে সব অলসতা যাক ভেসে,
ভেসে যাক,
উদাম যত পত্রের মত হৃদয়ে জাগিয়া থাক।"

ইহার পর নূতন বৎসরে তাহাদের অলসতা দূর করিয়া কর্মোদ্যম অটুট রাখিবার জন্য ছেলেমেয়েরা সরিতে ঝাঁপ দিয়া স্নান করিত বা সাঁতার কাটিত।

নিম্নে তানাবাতা উৎসব সংক্রান্ত কয়েকটি জাপানী কবিতা (তংকা) এখানে অনুদিত হইয়াছে, তাহাদের প্রধান আকর্ষণ বোধ হয় এই যে, কবিতাগুলির ভিতর দিয়া রচয়িতাগণ নায়ক-নায়িকার মানবসুলভ প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন। এখনও আমাদের কাছে তানাবাতা নিষ্ঠাবতী ও প্রেমাতুরা জাপানী স্ত্রীরূপে পরিচিতা; এবং হিকো-বোশিকেও দেবমহিমামণ্ডিত বলিয়া আমাদের ধারণা হয় না: চীনের প্রচলিত নীতিবোধ জীবন ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সীমারেখা টানিয়া দিবার পূর্বে—ষষ্ঠ কি সপ্তম শতাব্দীর একজন তরুণ জাপানী স্বামীরূপেই হিকো-বোশি আমাদের কল্পনায় প্রকাশ পায় এবং এই কবিতাগুলির মধ্যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি মানবমনের আদিম অনুভূতি রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে বলিয়া ইহা পাঠে আমাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। কবিতাসমূহ পাঠ করিতে করিতে সুদূর সুনীল আকাশের বুকে আমরা জাপানের প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ঋতুসমূহ প্রতিফলিত দেখিতে পাই;—দেখিতে পাই, স্বর্গনদীর তরঙ্গ-স্রোত দ্রুতবেগে বহিয়া চলিয়াছে, মাঝে মাঝে চরগুলি জাগিয়া রহিয়াছে; নদীটি কখনও কখনও ফুলিয়া উঠিতেছে, আর নদীগর্ভে উপলখণ্ডগুলি মৃদু শব্দে গড়াইয়া যাইতেছে; শরতের মৃদু হাওয়া লাগিয়া কলমীলতার শীর্ষদেশ নুইয়া পড়িতেছে এবং আরাশিয়ামার কুয়াসা আসিয়া নদী-তীরে জাল বিস্তার করিতেছে। হিকোবোশির নৌকার অনুরূপ কাঠের খোঁটায় বাঁধা এক-দাঁড়ওয়ালা নৌকা এখনও অপ্রচলিত নয় এবং যে 'হিকি ফুনেতে' করিয়া তানাবাতা-শ্মে তাহার দয়িতকে ঝড়ের রাতে আসিতে বলিয়াছিল, সেইরূপ চ্যাপ্টা গাধাবোটের মত গুণ-টানা নৌকা এখনও গ্রাম্য খেয়াঘাট-গুলিতে ব্যবহৃত হয় এবং তানাবাতাশ্মে যেমন তাহার প্রিয় স্বামীর জন্য কাপড় বুনিয়াছিল, আজও তেমনি শরতের মধুময় রাত্রে গ্রাম্য মেয়েরা দরজায় বসিয়া কাপড় বুনে।

মন্দাকিনীর তীরে বসে পথটি চেয়ে থাকা
সফল হবে সফল হবে আজ,—
পূর্ণ করে দীর্ঘ দিনের অগাধ আকাঙ্ক্ষা
অঙ্গনে মোর আসছে হৃদিরাজ।.........
রঙ্গখচা মেখলাটির গ্রন্থি দিয়ে খুলে
কটি থেকে হেলা ভরে ফেলে দেব ধুলে।*

*   *   *

ওপারের সমীরণ
এই তটে এসে নিবিড় রভসে দেয় মধু চুম্বন।
এই আকাশের মেঘের মেয়েরা মুক্ত সহজ গতি
ওপারের ঐ আকাশেতে যায় হয় না কাহারো ক্ষতি
মোর সুন্দরের প্রিয়তম সাথে কিন্তু কখনো নয়
যে-কোনরূপ অতি সাধারণ দুটি বাণী-বিনিময়।

*   *   *

এইটুকু নদী হায়,
এপার হইতে উপল ছুঁড়িলে ওপারে পেঁাছে যায়!
অমরাবতীর তীক্ষ্ণ স্রোতটি মোদের করেছে ছিন্ন,
মিলনের আশা বৃথা করি হায় শারদ জোছনা
ভিন্ন!

*   *   *

শারদ-সমীর বহিল ভুবনে যবে
মনেরে শুধানু মিলন কখন হবে?
বহুবাঞ্ছিত প্রিয় মোর হৃদিরাজ
বাহু পাশে মোর আসিতেছে বটে আজ।

*   *   *

স্বরগনদীর তীরে তীরে
কুহেলিকা রচে মায়া জাল,
প্রিয় আশে যেথা বসে বসে
কাটিয়েছি বৃথা কতো কাল!
সুরধুনী চাপিয়া আঁচল
শুধায়েছে সমবেদনায়,
উদাসিনী হলি কার তরে
বল তোর মন কারে চায়?

* পঙ্‌ক্তি দুইটি প্রাচীন জাপানী সাহিত্যে উল্লিখিত এক মধুর প্রথা স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রেমিক-প্রেমিকা বিদায়ের পূর্বে পরস্পরের ভিতরকার কটিবন্ধ (হিমো) বাঁধিয়া দিত এবং তাহাদের পরবর্তী মিলন না হওয়া পর্যন্ত এই গ্রন্থি স্পর্শ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইত। কবিতাটি ইয়োরোর ৭ম বর্ষে ৭২৩ খৃঃ রচিত বলিয়া প্রকাশ।

শাসন করিয়া বিলাস বসন
তানাবাতা একা আবেশে মগন।
না খুলিতে ঊষা অবগুণ্ঠন
তুলও না নদি খর গর্জন
তরঙ্গ প্রভাবে
বিরহ-বিধুর পদ্ম-আঁখির তন্দ্রা টুটিয়া যাবে।

*   *   *

কপট কুয়াসা মন্থর পদে অঞ্চল উড়াইয়া
ঐ পার হতে এই পারে আসে মায়াজাল বিরচিয়া।
তাহারে হেরিয়া চকোরীর প্রাণ
অসীম আশায় গেয়ে ওঠে গানঃ
প্রেমিক আমার বেয়ে তরীখান
বয়ানে টানিয়া হাসি,
আসিছে আমার অন্তর-দ্বারে আমারেই ভালোবাসি।

*   *   *

মন্দাকিনীর ঐখানে ওই
যসুর খেয়াঘাটে
তরণী এক ভাসছে দুলে
ঊর্মিমালার মাথে।
বোলো প্রিয়ার কানে কানে
তারি আশায় এই স্থানে
দুর্বিষহ দিবসগুলি করছি গো যাপন,
সে যে আমার হৃদয়-মণি একান্তই আপন।

*   *   *

রঙীন বদন প্রিয়ার সাথে এই নিশিতে আমি
স্রোতস্বতীর স্নিগ্ধ বুকে যাবোই যাবো নামি।
সেথায় আছে কঠিন ধবল উপল-উপাধান,
তাহার 'পরে শিরটি রেখে রইবো গো শয়ান।

*   *   *

শরতের মৃদু হাওয়া দেয় যবে দোল,
শাপলার দেহমনে জাগে হিল্লোল;
মনে ভাবি মিলনের হয়েছে সময়,
প্রিয়তম বঁধু মোর আসে নিশ্চয়।

*   *   *

হঠাৎ যবে পরাণখানি উতল হয়ে ওঠে
আকাশ-পথে মলয় সাথে দয়িত পানে ছোটে,
তখন কানে সুরধনীর কুলুধ্বনি বাজে
ঝপ্‌ঝপাঝপ্ বৈঠা শুনি পড়ছে নদী মাঝে।

*   *   *

মধুর নিশীথে যদি সুন্দরের
প্রিয়া পাশে সুখেতে শুইয়া কুভু থাকি,
উভয়ের বাহু 'পরে উভয়ে
সোহাগভরে সযতনে শিরখানি রাখি,
ডেকোনা মোরগ বন্ধু, গেয়োনা
প্রভাত-গীতি কৃপা কোর তৃষিতের প্রতি
হলেও হোক না ভোর অরুণ খুলুক
দোর, তাহাতে তোমার কিবা ক্ষতি?
কর 'পরে কর রাখি মুখ 'পরে মুখ
কাটাইয়া দেই যদি লাখ লাখ যুগ
অনন্ত প্রেমের তবু নাহি হয় ক্ষতি;
(বিচ্ছেদ বিধান তবে কেন বিশ্বপতি?)

*   *   *

হোক না প্রিয়া অনেক দূরে
পাঁচশো মেঘের পুঞ্জপারে,
দৃষ্টি যেথায় পথ খুঁজে না পায়;
তবু দিনের অবসানে
প্রিয়তমার কুটির পানে
রইবো চাহি পরাণ তারে চায়।

*   *   *

শরতের আগমনে—
ঢেউগুলো যবে ঢাকা পড়ে ঘন কুয়াসার আবরণে
আশায় আকুল নয়ন যুগল নদী পানে ছুটে যায়,
এই ভাবে মোর আশার রজনী কতো না কাটিল
হায়!

*   *   *   *

আজ এই শুভ রাতে
তানাবাতাশুমে মিলিবে তাহার
প্রিয় হিকোবোশি সাথে।

শোন ওগো ঢেউ সব,
স্রোতস্বতীর থির বুকে আজি তুলিও না কলরব।

* * * *

ঝঞ্ঝাবায়ু বহিছে আজ সারা আকাশ ব্যেপে,
স্বর্গনদীর ঊর্মিরাশি উঠেছে তাই ক্ষেপে।
শোন প্রিয়, আজ তোমাকে এই মিনতি ক'রি,
অবিলম্বে এসো যেন গুণ-টানা না'য় চড়ি।

* * * *

প্রথম যেদিন শরতের সমীরণ
বহিলো পৃথিবী বুকে,
চলিনু সেদিন সচপল দ্রুচরণ
নদী চর পানে সুখে।
সেই হতে নদী পারে
বরষ-বিরহ ভারে
বসে আছি আমি, বোল ওগো বোল তারে।

* * * *

আসছে বুঝি তানাবাতা আমার পানে ধেয়ে
আপন তরী বেয়ে।
দীপ্ত উজল চন্দ্রাননে
কালো চপল ছায়া হেনে
এখনো তাই যাচ্ছে ভেসে মেদুর মেঘের মেয়ে।

* * *

প্রাচীন কবিরা তানাবাতার উপাখ্যান যেভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন হয়ত সেই উপাখ্যান পাশ্চাত্য কবিদের অন্তরে অতি ক্ষীণ অনুভূতিরই সঞ্চার করে। তথাপি কখনও কখনও চন্দ্রোদয়ের পূর্বে নক্ষত্রালোকিত স্বচ্ছ নীরব আকাশের বক্ষ হইতে সেই পুরাতন কাহিনীর মায়া আমার মনে নামিয়া আসে; বিজ্ঞানের স্থূল সত্য কথা আমি ভুলিয়া যাই ভুলিয়া যাই আকাশের বিপুল ভীষণতা। তখন ছায়াপথকে এরূপ গ্রহসমষ্টির সমাবেশ বলিয়া মনে হয় না যাহার লক্ষ লক্ষ সূর্য পৃথিবীর তিমিরান্ধকার অভ্যন্তরকে আলোকিত করিতে পারে না; ছায়াপথ তখন সেই স্বর্গ-নদী আমানোগোয়া রূপেই আমার নয়নে প্রতিভাত হয়। আমি স্পষ্ট দেখিতে পাই ইহার উজ্জ্বল স্রোত চঞ্চল বেগে বহিয়া চলিয়াছে, কুয়াসার জাল তীরে তীরে বিস্তৃত হইতেছে, আর শরতের মৃদু হাওয়া লাগিয়া শাপলার শীর্ষদেশ বার বার লুটাইয়া পড়িতেছে। আমি দেখিতে পাই তারকার তাঁতে বসিয়া শ্বেতাম্বর পরিহিত ওরিহিমে কাপড় বুনিতেছে, আর অপর তীরে আখ্যানোক্ত ষাঁড়টি চরিয়া বেড়াইতেছে, এবং আমি বুঝিতে পারি এই পৃথিবীর বুকে যে শিশিরকণা ক্ষরিত হইতেছে, তাহা সেই মাঝির দাঁড় হইতেই ছিটকাইয়া পড়িতেছে। তখন আমার মনে হয় স্বর্গ অতি নিকটে, স্বর্গ—আরামদায়ক উষ্ণ এবং স্বর্গে মানুষের অধিকার আছে। আমার চারিদিকে যে-নিস্তব্ধতা বিরাজ করে তাহা যেন চিরস্থিত শাশ্বত প্রেমের স্বপ্ন দিয়া পরিপূর্ণ—এই প্রেম চির-ব্যাকুল, চির সবুজ—দেবতাদের অপত্য-শাসনে এই প্রেমের তৃষ্ণা চিরকালের জন্য অতৃপ্ত।

রোমাঁ রোল্যাঁ ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনী

রোমাঁ রোলাঁ আজ নীরব। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের বিবেকবুদ্ধিও আজ নীরব হয়ে গেছে। বিগত মহাযুদ্ধে স্বদেশবাসীর হাতে বিড়ম্বিত ও তিরস্কৃত হয়েও তিনি নিরপেক্ষ দেশে দাঁড়িয়ে "যুদ্ধের কোলাহলের ঊর্ধ্বে" থেকে পৃথিবীর সকলবর্ণিত মানুষের দুয়ারে তাঁর বাণী পোঁছে দিয়েছেন। সতর্ক করে দিয়েছেন, সকল দেশের অত্যাচারীকেই। নিজের সাধনার প্রতি আস্থা, বিশ্বাসের প্রতি নির্ভরতা দিয়ে তিনি লজ্জা দিতে পেরেছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিল্পী ও বিজ্ঞানীকে, যাঁরা দেশের শাসনযন্ত্রের স্বার্থ পূরণ কর্তে গিয়ে বঞ্চিত করেছেন মানবসমাজকে, মানুষের সাধনাকে।

জনগণকে তিনি তিরস্কার করেননি কোন দিন। চিরদিনই তাঁর একথা জানা ছিল, ঘৃণা কর্তে যেমন, তিরস্কার কর্তেও তেমনই তাঁরা অন্ধ। তিনি প্রশংসা করেছেন তাদের রণক্ষেত্রের বীরত্বকে, একটা কিছুকে আদর্শ বলে ধরে নিয়ে এই অপরিসীম আত্মত্যাগ তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। 'এবাভ দি ব্যাট্‌ল্'-এ তিনি লিখেছেন "তরুণের দল কী অপরিসীম আনন্দ নিয়ে তৃষ্ণার্ত ধরিত্রীর জন্য তোমরা রক্ত বিসর্জন করছ!"

তিনি আরো বলেছেন, "হে বিশ্বের বীরের দল! এই সুন্দর রৌদ্রস্নাত পৃথিবীতে ধ্বংসের কি বিপুল সাধনাই না চলছে! একটা আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তোমরা রণক্ষেত্রে এসেছ, এগিয়ে যাচ্ছ মৃত্যুর দিকে......তোমরা সকলেই আমার প্রিয়।"

বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়কদের তিনি প্রশ্ন করেছেন, এই প্রাণবন্ত ঐশ্বর্য, বীরত্বের মণিরত্ন নিয়ে কেন তোমরা ছিনিমিনি খেলছ? আত্মত্যাগে উন্মুখ এই সব বীরের সামনে কোন্ আদর্শ তোমরা তুলে ধরেছ?"

সেদিন কেউ তাঁর কথায় কান দেয়নি। কিন্তু যুদ্ধ যেদিন শেষ হল এবং দেখা গেল, যে আশা নিয়ে যুদ্ধ চলেছিল শান্তির দিনে তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেছে। সেদিন মানুষ আবার রোলাঁর কথা স্মরণ করল এবং তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও নৈতিক সাহসের প্রশংসায় উন্মুখ হয়ে উঠ্‌ল।

১৯২৬ সালে জন হেনেস্ হোমস লিখলেন "মানব ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা অন্ধকারময় যুগে তুমি মানুষের সামনে আলোকবর্তিকা তুলে ধরেছ। একদিকে উন্মত্ত পৃথিবী, কিন্তু তুমি ধীর ও শান্ত। সমস্ত পৃথিবীতে বিদ্বেষের ঝড় বইছে যখন, তখন তোমার বুকে ছিল এক শান্তির আশ্রয়। সে শান্তির আশ্রয়ে গিয়ে মানুষের মুক্ত আত্মা শান্তি খুঁজে পেল।"

চার্লস ট্রেভেলিয়ান লিখলেন ঃ "অভিনন্দন জানাই তাঁকেই, যিনি বিশ্বব্যাপী ঘৃণার রাজত্বে বসে কাউকে ঘৃণা করলেন না।"

এইচ জি ওয়েলস লিখলেন ঃ "পৃথিবীতে এমন একজন লোকও নেই, যাঁকে আমি আপনার মত শ্রদ্ধা করি। এর কারণ আপনার সাহিত্যিক প্রতিভা নয়। মানুষের প্রতি প্রেমের ধর্মে আপনার সুগভীর আস্থাই আপনাকে এই শ্রদ্ধা জানাবার কারণ।"



রোমাঁ রোলাঁ ও রবীন্দ্রনাথ

বিগত মহাযুদ্ধের পর যেদিন শান্তি ফিরে এল, সেদিন এমন সহস্র জনের শ্রদ্ধার্ঘ্য তিনি পেয়েছিলেন, কিন্তু তা বহু বৎসর পর। তাঁর সংগ্রামের দিনে তাঁর পাশে কেউ ছিল না। মনের দিক থেকে ও দৈহিক অস্তিত্বের দিক থেকে রোলাঁ ছিলেন একক ও পরিত্যক্ত।

কিন্তু রোলাঁর কাছে অপরিচিত ও ইউরোপের অশান্তির কেন্দ্র থেকে বহু দূরে বসে আর একটি মুক্ত ও মহান্ আত্মা মানুষের দুঃখে বেদনাবোধ ক'রেছিল। মানুষকে তিনিও ঠিক রোলাঁর মতই সতর্ক করে দিয়েছিলেন। সে সময় রবীন্দ্রনাথ ও রোলাঁ পরস্পরের কাছে অপরিচিত, পরস্পরের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎও হয়নি। পৃথিবীর দুই প্রান্তে বসে তাঁরা দুজন যে একই ভাবে চিন্তা করছেন, এ তাঁদের মোটেই জানা ছিল না। বিগত মহাযুদ্ধ মূলত ছিল ইউরোপীয় যুদ্ধ। সেই মহাবিপর্যয়ের প্রত্যক্ষে কোন আলোড়ন ভারতবর্ষ অনুভব করেনি, কিন্তু বৃটিশ ডোমিনিয়নের অংশরূপে ভারতবর্ষকেও রক্ত বিসর্জন দিতে হয়েছিল। হাজার হাজার মাইল দূরে কি যে ঘট্‌ছে, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠার কোন প্রয়োজন ভারতবর্ষের কবির ছিল না। কিন্তু সি এফ এন্ড্রুজের উক্তি থেকে আমরা জানতে পারি,—"১৯১৪ সালের মে মাসে মানবসমাজের আসন্ন বিপর্যয়ের কথা চিন্তা করে কবি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠ্‌লেন। কিছুকাল চলল তাঁর এই দুঃখভোগ, তাঁর এই মৃত্যুযন্ত্রণা। মনের প্রথম আলোড়ন কেটে গেল। কিন্তু আবার জুন মাসের শেষভাগে বা জুলাই মাসের প্রথমভাগে আসন্ন বিপর্যয়ের আশঙ্কা তাঁর কাছে নূতন হয়ে দেখা দিল। এ সময় লেখা হ'ল তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোট কবিতাঃ—

"এবার যে ঐ এল সর্বনেশে গো।
বেদনায় যে বান ডেকেছে
রোদনে যায় ভেসে গো।"

—বলাকা

আগস্ট মাসে আরম্ভ হ'ল ফ্রান্স ও জার্মানীর ধ্বংসকারী যুদ্ধ। এ যুদ্ধের প্রথমের দিকে তীব্র বেদনা বোধ করলেন তিনি—চলে গেলেন নির্জনে। কবিতায় রূপ দিলেন বিশ্বের এ ধ্বংস-রূপকে। প্রথমটি হচ্ছে "তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে কেমন করে সইব!" অপরটি হচ্ছেঃ—

"যত দুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ, অমঙ্গল,
যত অশ্রু জল,
যত হিংসা হলাহল,
সমস্ত উঠিছে তরঙ্গিয়া,
কূল উল্লঙ্ঘিয়া,
উর্ধ্ব আকাশেরে ব্যঙ্গ করি'।
তবু বেয়ে তরী
সব ঠেলে হতে হবে পার,
কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার,
শিরে লয়ে উন্মত্ত দুর্দিন,
চিত্তে নিয়ে আশা অন্তহীন,
হে নির্ভীক, দুঃখ-অভিহত।
ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি। মাথা করো নত।
এ আমার এ তোমার পাপ।
বিধাতার বক্ষে এই তাপ
বহুযুগ হতে জমি' বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়,—
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ,
জাতি-অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান,
বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।"

শেষটিতে তিনি দেখালেন, অনাচার, অত্যাচার ও পাপ বিশ্বে আপন প্রতিষ্ঠা কায়েম করে নিয়েছে।

পৃথিবীর দুইটি শ্রেষ্ঠ প্রতিভা মানুষের কল্যাণের ক্ষেত্রে একই বাণী নিয়ে আসলেন, এ কি নিতান্তই আকস্মিক ঘটনা? না, এর মধ্যে ভবিষ্যতের শুভ সম্ভাবনার ইঙ্গিত রয়েছে? স্টিফেন জুইগ রোলাঁ সম্পর্কে যা বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও তা' অবিকল বলা যায়, তিনি বলেছেন, "রোলাঁ আমাদের জন্য রেখে গেছেন আর একটি ধর্ম,—কল্পনাপ্রবণ লেখক মানুষের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, মানুষের আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শকরূপে,—ফরাসী জাতি বা বিশ্বের অপরাপর জাতির পক্ষ হয়ে তিনি জানিয়েছেন নৈতিক বাণী।......মানবধর্মে দীক্ষিত রোলাঁ মানুষের প্রতি আমাদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে পারেন।" সত্যিকার শিল্পীমনের পরিচয় এখানেই। সত্যের প্রতি গভীর অনুরাগই রয়েছে তাঁদের শিল্পসৃষ্টির মূলে। শুধু মধুর শব্দলহরী বা মধুর আবেষ্টন নিয়ে তাঁরা সঙ্গীত রচনা করেন নি। আত্মার যে ঐক্যবাণী ভালবাসার পৃথিবীকে সম্পদশালী করে তুলতে পারে ও অকল্যাণের হাত থেকে মানব-মনকে মুক্ত করতে পারে, তারই সুর-যোজনা করেছেন এ'রা দুজনে। তাঁদের কাছে মাত্র একটি আনন্দ,—সৃষ্টির আনন্দ। পৃথিবীতে বীরত্ব আছে মাত্র একটি স্থানে। তা' হ'ল জীবনকে চেনা ও জানায় ও জীবনকে ভালবাসায়।

রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেমের কাহিনী ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা আছে। তাঁর প্রথম জীবন থেকে আরম্ভ করে ১৯৪১ সালের জন্মদিন পর্যন্ত যে সকল কথা তিনি এ দেশ সম্পর্কে বলেছেন, তাতে স্বদেশবাসীর প্রতি তাঁর অপ্রতিহত শ্রদ্ধার প্রকাশ আছে। পদে পদে অপমানিত ও বঞ্চিত, জাতীয়-জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ব্যর্থ, জীবনের সকল সম্পর্ক হারিয়ে তাদের একমাত্র বিলাসিতা হ'ল আত্মপ্রতারণা, তাদের আত্ম-সম্মান ঘোষণার একমাত্র পথ হ'ল অত্যাচারীকে ঘৃণা করা। কিন্তু কবি জীবনে কদাপি এই সব দুর্বলতার প্রশ্রয় দেন নি। ১৯১৭ সালে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে তিনি ভারতবর্ষের জন্য যে প্রার্থনা-বাণী রচনা করলেন, তাতে বলা হ'ল,—

"Make us strong that our worship may flower in love and bear fruit in work".

রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা রোলাঁকে তাঁর স্বদেশবাসীরা ভুল বুঝেছিলেন অনেক বেশি। রোলাঁ তাঁর দেশকে ভালবাসতেন গভীরভাবে, কিন্তু ফ্রান্সের সমরশক্তির গৌরব থেকে তিনি অনেক বেশি ভালবাসতেন ফ্রান্সের আত্মাকে। সবার উপরে সত্য কথা হ'ল এই যে, দেশের নামে মানুষের যে সকল মিথ্যাকে উচ্চাসন দিতে যায়, তার চেয়ে তিনি অনেক বেশি ভালবাসতেন সত্যকে। তিনি বলতেন, সত্য যা', তা' সবার পক্ষেই সত্য। কিন্তু প্রত্যেক জাতির জীবনে কতকগুলি মিথ্যা আছে—যেগুলিকে আদর্শবাদের পোষাক পরিয়ে মানুষের সামনে হাজির করা হয়। সত্যের প্রতি আনুগত্যের অর্থ হ'ল দেশের প্রতি আনুগত্য? কিন্তু এর বিপরীত কথাটা কদাপি সত্য নয়। রাজনীতিকরা এ বিপরীত কথাটাকেই সত্য ব'লে চালিয়ে নিতে চান।

রোলাঁ বললেন : "বৃহৎ জাতিকে কেবলমাত্র সীমান্তরক্ষাই করতে হয় না, নিজের সুবুদ্ধিকেও রক্ষা করতে হয়। যে সকল অবিচার, মূর্খতা ও মিথ্যার বেসাতি যুদ্ধের ফলে চালু হয়ে ওঠে, তা থেকেও আত্মরক্ষা করতে হবে।......আমি চাই যে, ফ্রান্সকে সবাই ভালবাসুক। আমি চাই যে ফ্রান্স জয়ী হউক। কিন্তু তা কেবলমাত্র অস্ত্রশক্তিতে নয়, কেবলমাত্র অধিকারের দাবীতেও নয়, মহৎ প্রাণের প্রতিষ্ঠায়, ফ্রান্সের জয়লাভই আমার কাম্য। আমি চাই যে ফ্রান্স এত শক্তিশালী হয়ে উঠুক যে, তারা যুদ্ধ করবে, অথচ কাউকে ঘৃণা করবে না। যাকে আঘাত করবে, তাকে যেন ফ্রান্স আপন "ভাই" বলে, ভ্রান্ত পথচারী ভাই ব'লে গ্রহণ করতে পারে।

"জ্যাঁ ক্রিস্তোফের" অলিভিয়ার মুখে সকল কথা ফুটে উঠেছে, সেগুলি মহাত্মা গান্ধীর মুখের কথার মতই। অলিভিয়ার বললেন,—"আমি ফ্রান্সকে ভালবাসি। কিন্তু ফ্রান্সের জন্য আমি আত্মাকে হত্যা করতে পারি না বা বিবেককে বঞ্চিত করব না। কেননা, এ করলে প্রতারণা করা হবে আমার জন্মভূমিকেই। নিজের মধ্যে বিদ্বেষ খুঁজে পাই না যখন, তখন বিদ্বেষ জানাব কি ভাবে? নিজের বিশ্বাসের প্রতি আস্থা রেখে কি ভাবে আমি ঘৃণা দেখাতে পারি?...... আমি ঘৃণা করব না। শত্রুর প্রতিও আমি সমান ব্যবহার করব। সর্বপ্রকার বিক্ষোভের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি দৃষ্টিকে স্বচ্ছ রাখব। সকল কিছু দেখে নেবো স্বচ্ছ দৃষ্টিতে। ভালবাসব সবাইকে।" বিগত মহাযুদ্ধকালে তিনি তাঁর দৃষ্টিকে স্বচ্ছ রেখেছিলেন। বর্তমান যুদ্ধের সর্বপ্রকার আলোড়ন-বিলোড়ন ও বিক্ষোভের মধ্যে তিনি তাঁর দৃষ্টিকে স্বচ্ছ রেখে চলেছেন, এ আশা স্বভাবতই করা যায়। তাঁর কণ্ঠস্বর যে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না, এটাই মানব-সমাজের বড়রকমের ক্ষতি। যে বিশ্বে প্রত্যেক জাতির জন্য সকল জাতির দাবীকে দাবিয়ে রাখতে চাইছে, যেখানে বিজয়ীর ঔদ্ধত্য বিজিতকে আত্মহত্যাকর নৈরাশ্যের দিকে ঠেলে নিয়ে চলছে, যে পৃথিবীতে লেনিনের উত্তরাধিকারীরাও মাতৃভূমির স্বার্থরক্ষার জন্য অন্য সকল বৃহত্তর স্বার্থকে বিসর্জন দিচ্ছে, সে পৃথিবীতে ভারতবর্ষের গান্ধী ও ইউরোপের রোলাঁ ছাড়া আজ মানবসমাজকে কেই-বা পথ দেখিয়ে নিতে পারেন? একজনের মৌনতা বাধ্যতামূলক। আর একজনের বাণী মানুষের কাছে এসে পৌঁছয় না। গত মহাযুদ্ধের অবসানে প্রেসিডেণ্ট উইলসনকে আহ্বান করে রোলাঁ যা' বলেছিলেন, ভবিষ্যতে মিত্রপক্ষ যেদিন চূড়ান্তভাবে জয়লাভ করবে এবং প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট শান্তি-সম্মেলনে যোগ দিতে ইউরোপে পদার্পণ করবেন, সেদিন সেকথা বলবার মত কি কেউ ইউরোপে থাকবেন?

রোলাঁ বলেছিলেন উইলসনকে : "প্রেসিডেণ্ট আপনার এবং একমাত্র আপনারই মহান্ কর্তব্য হ'ল পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া। সমগ্র বিশ্বের শ্রদ্ধা রয়েছে আপনার উপর।...জর্জ ওয়াশিংটন ও এব্রাহাম লিংকনের বংশধর আপনি—আপনি অগ্রসর হউন, কোন বিশেষ দলের জন্য নয়, কোন ব্যক্তিবিশেষের জন্য নয়, সকলের মঙ্গলসাধনের সংকল্প নিয়ে আপনি অগ্রসর হউন। মানব মহাসম্মেলনের যারা প্রতিনিধি, তাদের ডেকে নিয়ে আসুন। পৃথিবী এমন বাণী শুনতে চায়, যা বিভিন্ন দেশের সীমারেখা ও বিভিন্ন শ্রেণীর পার্থক্য লোপ করে দেবে। স্বাধীন মানবদলের মৈত্রী-প্রতিষ্ঠাতারূপেই আপনাকে আমরা চাই। মৈত্রীসাধকরূপেই আপনার পরিচয় যেন অনাগত যুগ বহন করতে পারে।"

এরূপ কণ্ঠ কি আবার শুনতে পাওয়া যাবে? না, রোলাঁর কঠোর ভবিষ্যদ্বাণীই সত্য হবে? তিনি বলেছিলেন, যুদ্ধে কেউ জয়ী হয় না—সবাই পরাস্ত হয়। মানুষের ইতিহাসে এ কথাটাই কি সত্য হয়ে থাকবে?*

---

* ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৪৪ "হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে" প্রকাশিত **Sentinels of the East and West** প্রবন্ধ হইতে অনুবাদ।

লেখু-ভেক

অ · কৃ · ব

বৈষ্ণব বিনয় কথাটির সহিত আপনারা যেমন সকলেই পরিচিত আমিও তেমনি ছিলাম। সেদিন এ জিনিষটির প্রত্যক্ষ উদাহরণ দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল একটি বৈষ্ণব আশ্রমে। ব্যাপারটিকে 'বিনয় প্রতিযোগিতা' বলিলেই চলে।

সংকীর্তন শেষ হইয়াছে। আমি প্রধানত যে ব্যাপারটির জন্য সংকীর্তনের আসরে যোগ দিয়া থাকি সে ব্যাপারটির, অর্থাৎ ভোজের, আন্দাজ আধ ঘণ্টাটাক দেরী আছে। এই ফাঁকে ভক্তবৃন্দের মধ্যে ধর্মজগৎ-সংক্রান্ত নানারূপ আলাপ আলোচনা চলিল। ভগবান কি উদ্দেশ্যে বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, মানব-জীবনের উদ্দেশ্য এবং পরিণতি কি, পৃথিবীর বর্তমান শোচনীয় পরিস্থিতিতে শান্তির একমাত্র পথ কি, এই জাতীয় সমস্যা একটির পর একটি আসিতে এবং সমাহিত হইতে লাগিল।

ঠিক আমার পাশে দুটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক বসিয়া ছিলেন, ক—বাবু এবং খ—বাবু। বিনয় প্রতিযোগিতা শুরু হইল এই দুজনের মধ্যে। ক—বাবু কহিলেন "ধন্য আপনি। তাঁর নাম নিয়ে পড়ে আছেন; এর চেয়ে বড় জিনিস মানুষের জীবনে কি আছে? আর আমি হতভাগ্য সংসারের মায়াতেই বন্দী হয়ে পড়ে আছি। দিন আপনার পায়ের ধুলো দিন।" খ—বাবু কহিলেন, "ছি ছি, কি যে বলেন আপনি। আমার মতো দীনহীন পাপীর কি আর সহজে উদ্ধার আছে? আপনার পায়ের নখের যোগ্যও যে নই আমি। আমিই বরং আপনার পায়ের ধুলো শিরোধার্য করে ধন্য হবো।" পায়ের ধুলোর জন্য কিছুক্ষণ প্রায় দুজনের ধস্তাধস্তি চলিল, কিন্তু পরস্পরের প্রাণপণ বাধা প্রদানের ফলে চারিটি পায়ের ধুলোই যেমন ছিল তেমনি রহিয়া গেল। ক—বাবু কহিলেন, "আমাকে আপনার দাসানুদাস মনে করে আশীর্বাদ করুন, যেন তাঁর চরণে মতি থাকে। আপনাদের মতো নিষ্পাপ মহাপুরুষের আশীর্বাদে আমাদের মত পাপীতাপীর"—

দুই কানে আঙুল দিয়া খ—বাবু জিভ কাটিয়া কহিলেন, "বলবেন না, বলবেন না। অমন কথা শুনলেও আমার কান খসে পড়বে। সংসারের কাদায় শুয়োরের মত গড়াচ্ছি, দিন যাচ্ছে মিছে কাজে আর রাত্রি যাচ্ছে ঘুমিয়ে। ভুলেও একবার প্রভুর নাম নিই নে। আপনার তো ভেতরে ভেতরে অনবরত নামধ্যান চলছে। ধন্য আপনি।"

কদলীপত্র আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত ক—বাবু প্রাণপণে বুঝাইলেন তিনি নিজে অতি বড় পাষণ্ড এবং খ—বাবুই ধন্য। খ—বাবু প্রাণপণে বুঝাইলেন তিনি নিজে সংসার নরকের একটি জঘন্য কীটানুকীট এবং ক—বাবু নিশ্চয় কোন শাপভ্রষ্ট দেবতা, বৈকুণ্ঠে স্বয়ং নারায়ণ পানে অপেক্ষা করিতেছেন কবে তাঁহার শাপের মেয়াদ ফুরাইবে। বলা বাহুল্য প্রতিযোগিতায় কোন মীমাংসা হইল না।

* * *

এই জাতীয় বিনয়ের লড়াই প্রকৃতপক্ষে অবিনয়ের লড়াই মাত্র এবং বৈষ্ণব বিনয় আসলে অবিনয়ের চরম। প্রত্যেক বৈষ্ণব মনেপ্রাণে জানেন যে বিনয়েই মহত্ত্ব, সুতরাং যে যত বিনয়ী সে তত মহৎ; অবিনয় নীচতা, সুতরাং যে যত অবিনয়ী সে তত নীচ। বিনয়ে নত হওয়াই বৈষ্ণব মতে উঁচু হইবার মোক্ষম উপায়, কাজেই বিনয় প্রতিযোগিতার আসল অর্থ প্রতিপক্ষকে প্রাণপণে বিনয়ে পরাস্ত করিয়া যথাসম্ভব নীচুতে নামাইয়া দিয়া নিজেকে যথাসম্ভব উঁচুতে তুলিয়া দেওয়া। "আমি আপনার চরণের দাসানুদাস" বলার সঠিক অর্থ এই যে আমি আপনার চেয়ে অনেক বেশী উচ্চ অবস্থায় উঠিয়াছি। ব্যাপারটা অনেকটা বাঙলার লাট সাহেবের একজন মহকুমার হাকিমকে "your most obedient servant" (আপনার বাধ্যতম ভৃত্য) লেখার মত।

* * *

অধিকাংশ বিনয়েরই প্রকৃত স্বরূপ অবিনয়। ইংরাজী ভাষায় cynic বলিয়া কেহ কেহ হয় তো আমাকে গালি দিবেন, তবু নির্লজ্জভাবে স্বীকার করিতেছি, আমি বিনয়কে ধাপ্পা এবং অতি বিনয়কে অতি ধাপ্পা মনে করিয়া থাকি। Hypocrisy বলিয়া ইংরাজীতে যে একটা কথা আছে, তাহা অধিকাংশ বিনয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য!

যে লেখক মনে করেন বর্তমান সাহিত্য জগতে তিনিই শ্রেষ্ঠতম প্রতিভা (সম্ভবতঃ শতকরা পঁচাত্তরজন লেখকই এরূপ মনে করেন) তাঁহার রচনা সম্বন্ধে আলোচনা উঠিলে তিনি বিনয়ে গলিয়া মুখে বলিবেন, "ছি! ছি! কি যে বলেন! কি আর এমন লিখি?"......ইত্যাদি এবং মনে মনে বলিবেন, "কই, আর কেউ লিখুক তো দেখি আমার কাছাকাছি!"

যে অভিনেতা মনে করেন, শুধু তাঁহার নাম নাই বলিয়াই দেশ তাঁহার অপূর্ব প্রতিভার সম্মান দিতেছে না এবং শিশির ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী ইত্যাদি কয়েকটা লোক শুধু নামের জোরেই এতটা ইয়ে পাইতেছে, তিনিও হয় তো মুখে বলিবেন, "কি আর এমন"......ইত্যাদি।

পয়সাওয়ালা লোকেরাও নিজেদের আর্থিক অবস্থার ব্যাপারে বিনয় প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহার অবশ্য একটা ব্যবহারিক কারণ আছে—চাঁদার খাতা এবং ঐ জাতীয় অন্যান্য খাতার সচেতন অথবা অবচেতন ভয়।

* * *

যেদিকে যাই সেদিকেই বিনয় দেখিতে দেখিতে প্রাণ যেন হাঁফাইয়া উঠিয়াছে; একটু অবিনয় দেখিলে বরং মনটা একটু শান্তি পায়, বলে "এবারে অন্ততঃ খানিকটা খাঁটি জিনিস পাইয়াছি।"

একবার একটি ঘরোয়া সাহিত্য সভায় জনৈক সাহিত্যামোদী ভদ্রলোককে সভাপতি করিয়াছিলাম। তিনি জীবনে কখনও 'সাহিত্য করা' যাহাকে বলে তাহা করেন নাই, আমাদের সভার সভাপতি হইবার তাঁহার একমাত্র যোগ্যতা ছিল এই যে, সাহিত্যে তিনি আমোদ পাইতেন। তিনি যখন অভিভাষণ দিতে উঠিলেন, তখন ভাবিলাম তিনি মামুলী প্রথায় অতি ভাষণ শুরু করিবেন এবং সভাপতি পদের পক্ষে তাঁহার অযোগ্যতা অন্ততঃ আধ ঘণ্টা ধরিয়া প্রমাণ করিবেন।

কিন্তু বিস্মিত ও আনন্দিত হইলাম তাঁহার অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া। সভাপতি পদের সম্মান লাভ করিয়া আনন্দিত হইয়াছেন, একথা সংক্ষেপে স্বীকার করিয়া তিনি সাহিত্যের পাঠক হিসাবে সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার সামান্য বক্তব্য সামান্য ভাষাতে এবং সংক্ষেপেই শেষ করিলেন! বহু বড় বড় সভায় বড় বড় সভাপতির বড় বড় অভিভাষণ শুনিয়াছি, ভুলিয়াও গিয়াছি। কিন্তু আমাদের সেই সামান্য সাহিত্য সভার সামান্য সভাপতির সামান্য অভিভাষণটির কথা যে ভুলিতে পারি নাই, তাহা তাঁহার বিনয়-অভিনয়-হীনতার বিশেষত্বটুকুর জন্যই।

* * *

আমাদের সভাপতি ভদ্রলোক যে বিনয় দেখান নাই ইহাতে আমরা সম্মানিত বোধ করিয়াছিলাম এবং তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়াছিলাম। তিনি যদি সবিনয়ে তাঁহার অযোগ্যতা প্রমাণ করিতেন, তাহা হইলে প্রকারান্তরে ইহাই বলা হইত যে আমরা মূর্খ অথবা মাত্রাজ্ঞানহীন বলিয়াই সভাপতি পদে তাঁহার মত অযোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচিত করিয়াছি, সুযোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচিত করার মত সুবুদ্ধি আমাদের নাই।

* * *

বিনয় মাত্রই ধাপ্পা একথা আমি বলিতেছি না। অধিকাংশ বিনয়ই ছদ্মবেশী অবিনয়। মেকী বিনয় অল্প জলে ফরফরায়মান শফরীর মত আত্মপ্রকাশপ্রিয়; খাঁটি বিনয় গভীর জলের মাছ, আত্মপ্রকাশের প্রয়োজন বোধ করে না বলিয়াই আত্মপ্রকাশের জন্য ব্যস্ত নয়। প্রতিভা যেখানে অল্প, আদর্শ যেখানে সীমাবদ্ধ, অল্পবিদ্যা ভয়ংকরীর মত সেখানেই আসে অহংকার বোধ এবং এই অহংকার বোধই বিনয়ের অহংকার বো এবং এই অহংকার বোই বিনয়ের ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু প্রতিভা যেখানে বিরাট, সম্মুখে যখন সীমাহীন আদর্শ, অহংকারের ক্ষুদ্রতা সেখানে আসিতে পারে না বলিয়াই সেখানে বিনয় প্রকাশের আড়ম্বর নাই; বিনয়ের খ্যাতির লোভ সেখানে নাই।

মানুষ সাধনার পথে যত বেশী অগ্রসর হয়, পথের অসীমত্ব ততই বেশী করিয়া উপলব্ধি করে; যত বেশী জানে ততই বেশী করিয়া অনুভব করে যাহা জানা হইয়াছে, তাহা কত সামান্য; যত বেশী শেখে ততই বেশী করিয়া বুঝিতে পারে, শিখিবার আরও কত বাকী। সংগীত-যাদুকর আবদুল করিম খাঁ বলিতেন, আজীবন সংগীত সাধনা করিয়াও তিনি সামান্যই শিখিতে পারিয়াছেন; তাঁহার সে স্বীকৃতি প্রকৃত বিনয়—অহমিকার মুখোস-পরা প্রকাশ নহে, সম্মুখে প্রসারিত সংগীত-সমুদ্রের অসীমত্বের গভীর উপলব্ধি। কিন্তু বছর কয়েক কালোয়াতীর চর্চা করিয়া তরুণ "সংগীতাচার্য" যখন অমায়িকভাবে মৃদু হাসিয়া "আপনাদের পাঁচজনের আশীর্বাদে কোনরকমে একটু আধটু"......ইত্যাদি বলিয়া বিনয় প্রকাশ করেন, তখন তাহাতে গোপন গর্বের অংশই বেশী থাকে, কারণ সংগীতের পথে অল্প অগ্রসর বলিয়াই সম্মুখে প্রসারিত অনন্ত সংগীত সমুদ্রের দৃশ্য তাহার চোখে এখনও আসিয়া পড়ে নাই, পিছনের কালোয়াতির চর্চাটাকেই ('সাধনা' বলিলাম না) তিনি অত্যন্ত বড় করিয়া দেখিতেছেন।

"জ্ঞান-সমুদ্রের তীরে উপল খণ্ড কুড়াইতেছি মাত্র"—একথা বলা নিউটনের শোভা পাইয়াছিল, কেননা জ্ঞান যে বাস্তবিকই একটি অনন্ত সমুদ্র ইহা তিনি গভীর সত্য হিসাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন।

সংক্ষেপে বলিতে পারা যায় অসীম সম্ভাবনার তুলনায় যাহা সম্ভব হইয়াছে, তাহার হাস্যকর অকিঞ্চিৎকরত্ব যখন উপলব্ধি করি, তখন সেই উপলব্ধিই প্রকৃত বিনয় বোধ। প্রকৃত বিনয় আত্মসচেতন নহে। আমি বিনয় প্রকাশ করিতেছি এ সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন হইয়া যে বিনয় প্রকাশ করে, তাহার বিনয় অহমিকারই প্রকারান্তর মাত্র। এখানে আমার একটি ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে খানিকটা তুলিয়া দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। ইংরাজী যাহারা না বোঝেন তাঁহারা না বুঝিলেও বিশেষ ক্ষতি হইবে না।

"When in our heart of hearts we feel the colossal insignificance of the finite realised as compared with the infinite unrealised (and unrealisable)—that feeling is the essence of true humility".

বিজ্ঞানের কথা

রক্ত ভাণ্ডার

হিমাংশু সরকার

মানুষ ব্যাংকে টাকা জমায় তার ভবিষ্যৎ ভেবে। ব্যাংকে যারা টাকা জমা রাখে তারাই শুধু দরকারের সময় পেতে পারে। অন্য কোন লোক যদি ব্যাংকে গিয়ে বলে যে, তার টাকার প্রয়োজন সেজন্য অমুক লোকের তহবিল থেকে তাকে কিছু টাকা দেওয়া হোক, তা হলে সকলেই তাকে পাগল ছাড়া আর কিছু বলবে না। কিন্তু পৃথিবীতে এমন ব্যাংকও আছে যেখানে যে কোন লোক নিজের ইচ্ছায় জমা রেখে যাচ্ছে আর প্রয়োজনে যে কেউ সেই জমা থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য যেটা জমা রাখা হচ্ছে এবং ব্যয় হচ্ছে সেটা টাকা নয়—রক্ত! মানুষের রক্ত! আর এই ব্যাংক হচ্ছে রক্ত জমা রাখার ব্যাংক যাকে ইংরাজীতে



রক্তদাতার হাত থেকে শিশিতে রক্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে

ব্লাড ব্যাংক (Blood Bank) বলা হয়। ব্লাড ব্যাংককে বাঙলায় 'প্রাণ-সঞ্চিতা', প্রাণ ভাণ্ডার, রক্ত ভাণ্ডার, রক্তাধার, প্রাণ রস বলা যেতে পারে।

মানুষের শরীরে রক্ত এক অপরিহার্য অংশ। এই রক্ত শরীরের সব অংশে বিভিন্ন শিরা এবং ধমনীর দ্বারা চলাচল করছে। প্রত্যেক মানুষের শরীরের রক্তের একটি নির্দিষ্ট মাপ ও চাপ আছে। এর কম-বেশী কোনটাই মানুষের পক্ষে ভাল নয়।

কোন কারণে শরীর থেকে অধিক পরিমাণে রক্তপাত হলে মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে, কারণ শরীর এত শীঘ্র প্রয়োজনানুরূপ নূতন রক্ত তৈরী করে ক্ষতি পূরণ করতে পারে না। আবার অনেক ক্ষেত্রে এমনও হয় যে, মানুষ হঠাৎ কোন আঘাত পেলে ভয়ে শরীরের রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। এর কোন উপায় করা যায় কিনা এই নিয়ে গবেষণা করে দেখতে গিয়ে চিকিৎসকেরা লক্ষ্য করলেন যে, যদি কোন উপায়ে শরীরের ভিতর অন্য কোন লোকের রক্ত সঞ্চারিত করা যায় তাহলে মানুষকে বোধ হয় মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা যায়।

একজন সুস্থ লোকের শরীরে প্রায় ১২০ আউন্স রক্ত থাকে। অর্থাৎ সমস্ত শরীরের ওজনের তের ভাগের এক ভাগ; মোটামুটিভাবে ১২০ আউন্স রক্তের ৮০ ভাগ তরল আর ৪০ ভাগ ঘন। তরল অংশকে প্লাজমা (Plasma) বা রক্তরস বলা হয়, আর ঘন অংশের নাম কর্পাসলস্ (Corpuscles) বা রক্ত কণিকা। সাধারণতঃ রক্ত কণিকা দুই প্রকারের—একটি লাল রক্ত-কণিকা (Red blood corpuscles) অপরটি সাদা রক্ত-কণিকা (white blood corpuscles)। এই দুই প্রকার রক্ত কণিকা ছাড়া প্লাজমাতে আরও অনেক বস্তু দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে, যথা—গ্লুকোজ, এ্যামিনো এসিড সিরাম এ্যালবুমেন, ফাইব্রীনোজেন ইত্যাদি। প্লাজমার একাংশকে সেরাম (Serum) বা রক্তমস্তু বলা হয়েছে। প্লাজমা বা সেরামএর রং ফিকে হলদে হলেও রক্তকে লাল দেখানর কারণ আমরা সমষ্টি-গতভাবে লাল রক্ত-কণিকাগুলিকে প্লাজমার মধ্যে দেখি বলে।

এখন দেখা যাক এই রক্ত ভাণ্ডারের কি করে উৎপত্তি হলো। প্রায় ৩০০ বছর আগে চিকিৎসকেরা লক্ষ্য করলেন যে, অনেক ক্ষেত্রে মানুষের শরীরের পরিমাণমত রক্তের অভাবে মৃত্যু ঘটে। তখন কয়েক জন চিকিৎসক এই নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন যে, কোন মানুষের শরীরে অন্য লোকের রক্ত সঞ্চার করলে কোন কোন ক্ষেত্রে রোগীর আশ্চর্য-রকম উপকার পাওয়া যায়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে রোগীর অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গিয়ে রোগীর মৃত্যুও ঘটে। এর পর উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত রোগীর শরীরে রক্ত সঞ্চার প্রায় এক অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে ছিল বলা যায়।

এই সময় ভিয়েনার বিখ্যাত চিকিৎসক কার্ল ল্যান্ডস্টাইনার (Karl Landsteiner (১৯৩০ সালে নোবেল পুরস্কার পান) আবিষ্কার করলেন যে, প্রত্যেক মানুষেরই রক্ত সমশ্রেণীর নয়। রক্তের শ্রেণীবিভাগ আছে। শ্রেণী বলতে আমাদের মনে হতে পারে, হিন্দু, মুসলমান, নিগ্রো, সাদা, কালো হলদে ইত্যাদি জাতের রক্ত। কিন্তু সমাজিক গণ্ডীতে রক্তের এই রকম শ্রেণী ভাগ করলেও আসলে বৈজ্ঞানিক প্রথায় দেখলে রক্তের শ্রেণীভাগ অন্য প্রকারে করা হয়। এই শ্রেণীভাগে পৃথিবীর সব মানুষের রক্তকে চার প্রকার রক্তে ভাগ করা যায়। এর মধ্যে জাতিগত বা ভৌগোলিক কোন প্রভেদের প্রশ্ন উঠে না।

এখন যদি এমন হয় যে, এক শ্রেণীর রক্ত অন্য শ্রেণীর রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হয় তাহলে শরীরের সমস্ত রক্ত জমে গিয়ে রক্ত চলাচল দ্রুত বন্ধ হয়ে যাবে এবং ফলে লোকটির মৃত্যু ঘটবে। আর যদি রক্ত সমশ্রেণীর হয় তাহলে দুই রক্ত মিশ্রিত হবে এবং ফলে উপকার পাওয়া যাবে। কিন্তু রক্তের শ্রেণী বিভাগ জানা থাকা সত্ত্বেও একজনের শরীর থেকে অন্যের শরীরে রক্ত সঞ্চার খুব সহজ-সাধ্য হলো না। কারণ রক্ত প্রয়োগের আগে দুই পক্ষের রক্তের প্রকার নির্ণয় করে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে রক্ত প্রয়োগের আগেই রোগীর মৃত্যু ঘটতো।



সেণ্ট্রিফিউজ যন্ত্রের সাহায্যে রক্ত থেকে প্লাজমা আলাদা করা হচ্ছে

এই সময় আর্থার কোকা (Arthur Coca) নামে এক চিকিৎসক চার প্রকার রক্ত দ্রুত চেনবার এক সহজ উপায় বার করলেন। এতে অবশ্য কিছু পরিমাণে রক্ত-সঞ্চারের অসুবিধা দূর হলো, কিন্তু আর এক অসুবিধা দেখা দিল; সেটি এই যে, সব সময় রক্ত-দাতাকে রক্ত-গ্রহিতার নিকট উপস্থিত হয়ে রক্ত দিতে হতো। গত মহাযুদ্ধে দেখা গেল যে, রক্ত সঞ্চারের দ্বারা আহত সৈনিকদের যথেষ্ট উপকার পাওয়া গেলেও যুদ্ধ ক্ষেত্রে সব সময় রক্ত-দাতা পাওয়া সম্ভব হতো না। আমরা দেখি যে, শরীরের কোন ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বের হয়ে আসবার অল্পক্ষণ পরেই রক্ত জমে যায়। আর ঠিক এই কারণেই রক্ত-দাতার শরীর থেকে রক্ত বাইরে বার করে এনে রক্ত গ্রহিতার শরীরে আর সঞ্চার করবার উপায় থাকতো না।



শিশির ভেতরে ওপর দিকে প্লাজমা এবং নীচে রক্ত কণিকা জমা হয়েছে

এই অসুবিধার সৃষ্টি হওয়াতে ১৯১৪ সালে লুই এ্যাগট (Luis Agote) নামে এক চিকিৎসক পরীক্ষা করে দেখলেন যে, কোন মানুষের শরীরের রক্ত যদি সোডিয়াম সাইট্রেটের (Sodium Citrate) সঙ্গে মিশ্রিত হয় তাহলে সেই রক্ত প্রায় এক সপ্তাহ কাল তরল এবং অবিকৃত অবস্থায় রক্ষা করা যায়। আর এই মিশ্রিত রক্ত যদি কোন রোগীর শরীরে প্রয়োগ করা যায় তাহলে সব ক্ষেত্রেই ভাল ফল পাওয়া যায়। ডাঃ লুইএর এই পরীক্ষার পর থেকেই পরক্ষোভাবে রক্ত সঞ্চার করা সম্ভব হয়েছিল বলা যায়।

ডাঃ লুইএর এই আবিষ্কার কতদূর কার্যকরী হত পারে তা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য রকফেলার ইন্স্টিটিউটের একজন ডাক্তার ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন লোকের রক্ত সংগ্রহ করে সেই রক্ত সোডিয়াম সাইট্রেটের দ্বারা রক্ষা করে যুদ্ধে আহত সৈনিকদের চিকিৎসা করতে আরম্ভ করলেন। তিনি এই চিকিৎসায় খুব সন্তোষজনক ফল দেখতে পেলেন। এই সময় একজন সামরিক চিকিৎসক ক্যাপ্টেন গর্ডন-ওয়ার্ড' (Captain Gardonward) লক্ষ্য করলেন যে, রক্তের থেকে রক্ত-কণিকা বাদ দিয়ে যদি প্লাজমা রোগীর শরীরে প্রয়োগ করা যায় তাহলে খাঁটী রক্ত বা পূর্ণ রক্ত (whole blood) প্রয়োগের সমান কার্যকরী হয়।

ক্যাপ্টেন ওয়ার্ডের পর্যবেক্ষণ নিয়ে সেই সময় আর কোন গবেষণা হয়নি। তারপর মস্কোর ডাঃ য়ুদিন (Dr. Yudin) গবেষণা করে সোডিয়াম সাইট্রেটের সঙ্গে মিশ্রিত করে রক্তকে তরল অবস্থায় এক মাসের বেশী রাখতে সক্ষম হলেন। তার এই সফলতার উপর নির্ভর করে চিকাগোর এক হাসপাতাল দস্তুর মত এক ব্লাড ব্যাঙ্ক স্থাপন করে প্রয়োজন মত তার প্রয়োগ আরম্ভ করল।

এই সময়ে প্রায় ১৯৩৬ সালে আমেরিকার ডাঃ জন ইলিয়ট (Dr. John Elliott) ক্যাপ্টেন ওয়ার্ডের পর্যবেক্ষণের ওপর গবেষণা করে দেখলেন যে, সত্যই মানুষের শরীরের পূর্ণ রক্ত সঞ্চার না করে রক্তের মধ্য থেকে শুধু প্লাজমা নিয়ে রোগীর শরীরে প্রয়োগ করলে পূর্ণ রক্ত প্রয়োগের মতই ফল পাওয়া যায়। তা ছাড়া এই প্লাজমা প্রয়োগে আর এক বড় সুবিধা, রক্তের কোন শ্রেণী নির্ধারণের প্রয়োজন হয় না। যে কোন রক্তের প্লাজমা যে কোন লোকের শরীরে বিনা বাধায় সঞ্চার করা চলে। তাছাড়া পূর্ণ রক্ত প্রয়োগের সময় রক্ত-দাতার কোনরূপ রোগ থাকলে রক্ত-গ্রহীতা সে রোগে সংক্রামিত হতে পারতো, কিন্তু প্লাজমা সঞ্চারে এইরূপ রোগে সংক্রামিত হবার কোন ভয় থাকে না। কারণ রক্ত থেকে রক্ত-কণিকা বাদ দিয়ে প্লাজমা সংগ্রহের সময় বেশীর ভাগ রোগই রক্ত-কণিকাগুলির সঙ্গে বাদ পড়ে যায়। পরীক্ষার ফলে আরো দেখা গেল যে, এই প্লাজমাকে বোতলে পুরে তরল অবস্থায় হিমকক্ষের



প্লাজমা শুষ্ক করবার যন্ত্র

মধ্যে রাখলে দীর্ঘকাল অবিকৃত অবস্থায় থাকে।

এর প্রায় চার বছর পরে ১৯৪০ সালে ডাঃ ম্যাক্স স্ট্রুমিয়া (Dr. Max Strumia) প্লাজমাকে জমিয়ে গুঁড়ো করে রাখবার পদ্ধতি পরীক্ষা করে বার করলেন। তখন আর প্লাজমাকে তরল অবস্থায় না রেখে একে শুকিয়ে গুঁড়ো করে বোতলে পুরে রাখা সম্ভব হ'ল এবং এর প্রয়োগ আরো সহজ হয়ে দাঁড়াল। তা ছাড়া আগে যেমন প্লাজমা প্রয়োগের আগে অথবা কোন স্থানে প্রেরণের দরকার হ'লে হিমকক্ষ সাহায্য ছাড়া চলত না, এই শুষ্ক প্লাজমার বেলা আর তার দরকার হয় না; অথচ এর কার্যকারিতাও কমে না। এই শুকনো প্লাজমা বোতল থেকে বার করে দরকার মত পরিশোধিত জলের সঙ্গে মিশিয়ে অল্পায়াসেই যে কোন স্থানে এর প্রয়োগ সহজসাধ্য হয়ে এল। আর এই কারণেই আগেকার সেই পুরাণ পূর্ণরক্ত সঞ্চার প্রথা উঠে গিয়ে এখন এই প্রথা সর্বত্র প্রবর্তিত হ'ল।

এখন রক্তদাতার কাছ থেকে রক্ত সংগ্রহের পর কি করে শুষ্ক প্লাজমায় রূপান্তরিত করা হয় সেইটে দেখা যাক্। প্রথমে রক্তদাতার হাতের ধমনীর মধ্যে সিরিঞ্জের ছুঁচ ফুটিয়ে শরীরের ভেতর থেকে রক্ত টেনে এনে একটা খালি পরিশোধিত শিশির মধ্যে ভরা হয়। রক্ত গ্রহণ শেষ হওয়া মাত্রই শিশির মুখ ভাল করে এটে, লেবেল মেরে সেগুলোকে হিমকক্ষ অথবা বরফের বাক্সে ভরে, কাছাকাছি কোন গবেষণাগারে পাঠান হয়। সেখানে প্রথমে প্রত্যেক রক্তের নমুনা পরীক্ষা করে দেখা হয় যে, তা সম্পূর্ণ রোগবীজাণু বিহীন কিনা। রক্তবীজাণুবিহীন না হলে সে রক্ত আর কোন কাজে লাগান হয় না। পরে বীজাণু বিহীন রক্ত যে শিশিতে রক্ত নেওয়া হয়েছে, সেই শিশি শুদ্ধ সেণ্টিফিউজ যন্ত্রে বসান হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে শিশিগুলো চাকার মত প্রত্যেক মিনিটে প্রায় দু হাজার বার এক ঘণ্টা ধরে ঘোরান হয়। এই ঘোরানর ফলে রক্তের সব রক্ত কণিকাগুলি শিশির তলায় থিতিয়ে যায় আর প্লাজমা শিশির ওপর দিকে জমে। প্লাজমার রং এই সময় ফিকে পীত রং-এর মত দেখায়। পরে এই প্লাজমা শিশির ভেতর থেকে সংগ্রহ করে এক বায়ুশূন্য যন্ত্রের ভেতর প্রায় ৭২ ঘণ্টা রেখে দেওয়া হয়, ফলে প্লাজমা প্রথমে জমে যায় এবং পরে সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক হয়ে যায়। এই শুষ্ক প্লাজমাকে বায়ুশূন্য শিশির ভেতর ভরে যন্ত্রের সাহায্যে শিশির মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে এই শিশিগুলো প্রয়োজন মত স্থানান্তরিত করা হয়। একজন সাধারণ সুস্থ লোক একবারে প্রায় ১৬ আউন্স রক্ত দিতে পারে, এতে তার স্বাস্থ্যহানি বা সাধারণ কাজকর্মের কোন ক্ষতি হয় না। আমাদের দেশে কলকাতায় অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউশন অফ হাইজিন নামক প্রতিষ্ঠান সাধারণের কাছ থেকে রক্ত সংগ্রহ করে এখানে প্রয়োজনের জন্য জমা করে রাখেন।

এ হল রক্তের উপকারিতার একটা দিক, কিন্তু এইখানেই এর শেষ নয়। ১৯৪০



শিশিতে ভরা শুষ্ক প্লাজমা তাকে সাজান রয়েছে

সালে জৈব রাসায়নিক ডাঃ এড্‌উইন জে কন (Dr. Edwin J. Cohn) রক্তের উপাদান-গর্লি সম্বন্ধে গবেষণা করতে গিয়ে আরও কয়েকটি জিনিস আবিষ্কার করলেন।

প্রথমে ডাঃ কন দেখলেন যে রক্তের মধ্যে সিরাম এলব্যুমেন ঘনীভূত অবস্থায় থাকার দর্ন একটা রোগীর জন্য যতটা প্লাজমা দরকার তার পাঁচ ভাগের এক ভাগের সিরাম এলব্যুমেনেই কাজ পাওয়া যায়।

এ ছাড়া গবেষণার ফলে আরো একটি জিনিস দেখা গেল, সেটা হচ্ছে যে, রক্তের মধ্যে যে প্লবিউলিন বস্তু আছে তাতে আমাদের শরীরে বিভিন্ন ধরণের রোগ প্রতিরোধক জীবাণ্গর্লি এসে বাসা বাধে। এইটে জানবার পর এখন দরকার মত প্লবিউলিন বেছে নিয়ে রোগ অন্যায়ী প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, রক্ত জমে যায় তার কারণ রক্তের মধ্যে থ্রম্বিন (thrombin) এবং ফাইব্রীনোজেন্ (fibrinogen) নামক রাসায়নিক বস্তু থাকে। এখন এই দ্ই বস্তুকে পৃথক করে নিয়ে শ্কিয়ে গ্ড়ো তৈরী করা হচ্ছে। তাছাড়া এই দ্ই বস্তুর পাতলা পর্দা (film) ফেনা, আঠা ইত্যাদি তৈরী করে শরীরের পোড়া স্থানে ক্ষতে, অস্ত্রোপচারে অথবা মস্তকের কোন ক্ষতের জন্য বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে এই স্ববিধা হয় যে, ক্ষত স্থানের রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যায় এবং ক্ষত খ্ব তাড়াতাড়ি সেরে ওঠে।

ইতিমধ্যে আবার দ্জন চিকিৎসক পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, রক্তের লাল রক্ত-কণিকাগ্লি নষ্ট না করে এক প্রকার প্রলেপ তৈরী করে, বিষাক্ত ক্ষত পোড়া ঘা ইত্যাদির ওপর লাগালে আশ্চর্য রকম উপকার পাওয়া যায়। শোনা যাচ্ছে যে, লাল রক্ত-কণিকা শ্কিয়ে গ্ড়ো করে ব্যবহারেও নাকি উপকার পাওয়া যায় এবং এর স্থায়িত্ব এবং কার্যকারিতাও কম নয়।

এই সময়ে আবার ডাঃ কুক্‌সে (Dr. Cooksey) দেখালেন যে, এই লাল রক্ত কণিকাগ্লো প্র্ণ রক্ত প্রয়োগের পরিবর্তেও ব্যবহার করা যায়। তিনি লাল রক্ত কণিকা গ্লো, প্লাজমা অংশ নিয়ে নেবার পরই সাধারণ লবণের জলের মধ্যে অবিকৃত অবস্থায় রাখতে সক্ষম হলেন। তিনি এই লবণের জলে রক্ষিত রক্তকণিকা রক্তহীন রোগীদের শরীরে প্রয়োগ করে প্র্ণ রক্ত সঞ্চারের মতই উপকার পেলেন।

রক্তের এবং তার উপাদানের নানা প্রকার ব্যবহার দেখে এইটেই আশা করা যায় যে, য্দ্ধের পর আরো গবেষণার ফলে এমন হবে যে, আমরা এই রক্ত থেকে আমাদের শরীরের সব প্রয়োজনীয় ওষ্ধ পাব। বর্তমানে শরীরের কোথায় কেটে গেলে অথবা আঘাত লাগলে আমরা হাতের গোড়ায় আইডিন অথবা ঐ জাতীয় কোন ঔষধ লাগাই। কিন্তু পরে এমন হবে যে, আমরা এই আইডিন জাতীয় ওষ্ধের পরিবর্তে রক্তের কোন উপাদানের তৈরী ওষ্ধ প্রয়োগে আরো ভাল ফল পাব।

"মহাকবি কখন্ জন্মগ্রহণ করেন, মহাবাক্য কখন্ উচ্চারিত হয়? মন্ষ্যজাতি সম্দ্রবিশেষ, সেই সম্দ্র মথিত হইলে, তবে তাহা হইতে অমৃত উঠে। মন্ষ্যসমাজ এইর্প অনেকবার মথিত হইয়াছে, অনেকবার অমৃত উঠিয়াছে। অনেক মান্ষের হইয়া যখন একজনে কথা কয়, অনেক মান্ষকে শ্নাইবার জন্য যখন একজন কোন সংবাদ লইয়া আসে, তখন সেই কথা অমৃততুল্য, সেই কথার বিনাশ নাই। বহ্ দ্ঃখে, কিম্বা বহ্ স্খে বহ্দিন পরে এমন বাক্য নির্গত হয়। বাঙালী কি এমন অবস্থায় পতিত হইয়াছে যে, তাহর আকুল হৃদয় মথিত হইয়া অমৃতমণ্ডিত কোন সংগীত বাহির হইয়া পড়িবে?"

—নগেন্দ্রনাথ গ্প্ত

ভারতীয় সভ্যতায় বাঙালার স্থান

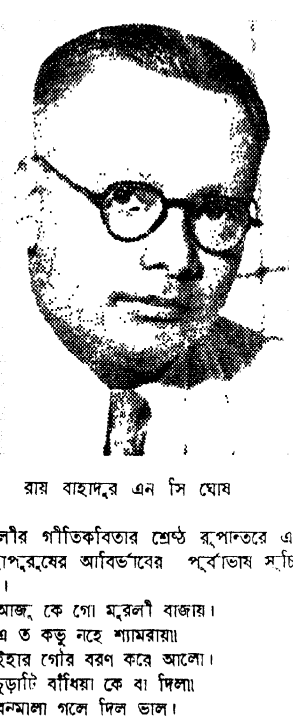
রায় বাহাদুর শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের এই বিরাট অনুষ্ঠানে বৃহত্তর বঙ্গ শাখার পৌরোহিত্যের ভার দিয়ে আমাকে যে অশেষ গৌরবে ভূষিত করেছেন, তার জন্যে আপনাদের কাছে আমার বিনীত কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এ গুরুভার বহন করবার শক্তি, সামর্থ্য বা অধিকার কোনটাই আমাতে নেই; কাজেই ত্রুটি প্রমাদের সম্ভাবনা যথেষ্ট, তার জন্যও পূর্বে থেকেই আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে রাখচি। অক্ষমতা জেনেই আপনাদের কার্যকরী সমিতির তরফ থেকে যখন আমার প্রতি এই অনুরোধ প্রথম আসে, তখন আমাকে অব্যাহতি দেবার জন্যেই তাঁদের জানিয়েছিলেম; কিন্তু আপনাদের কর্মী সঙ্ঘের কর্মকুশলতা ও ত কম নয়—কাজেই তাঁরা মুহূর্তের মধ্যে ব্যূহ রচনা ক'রে আমার ওপর চতুর্দিক থেকে শর নিক্ষেপ আরম্ভ করে দিলেন—আমার আর তিষ্ঠাবার ক্ষমতা রইল না—পরাভব অনিবার্য হ'ল—তাই আজ সকল অক্ষমতা আর ত্রুটি সত্ত্বেও আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত হয়েছি।

আপনাদের এই সম্মেলনের পূর্বতন অধিবেশনে বৃহত্তর বঙ্গ শখ্যার তাৎপর্য ও এই শাখার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বঙ্গের অনেক কৃতী সন্তান, খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও বিবিশণ্ট বিশেষজ্ঞ তাঁদের মতামত অশেষ যোগ্যতার সঙ্গেই ব্যক্ত করে গেছেন। এই সব আলোচনা কতক পাঠ করবার সুযোগ আপনাদের শ্রদ্ধেয় কর্মসচিব মহাশয় আমাকে দিয়েছিলেন—তজ্জন্য আমি তাঁর কাছে ঋণী। এ সম্বন্ধে পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। বৃহত্তর বঙ্গের উন্মেষ কবে কোথায় কিভাবে দেখা গেছে আর তার উপাদানই বা কি আর সেই উপাদানের সংরক্ষণই বা কিভাবে হ'তে পারে তাই আজকের আলোচ্য বিষয়।

সমাজ সংস্থানে, ভাবধারায়, সাহিত্যে, ধর্মে যখনই বাঙ্গলার প্রাণশক্তি তার ভৌগোলিক পরিসীমা ছাপিয়ে উঠে বাঙ্গলার বাহিরে তার প্রভাব বিস্তার করেচে, তখনই বৃহত্তর বঙ্গের উন্মেষ হয়েচে। বাঙ্গলা একদিন বৌদ্ধ ছিল। কতদিন কত শতাব্দী ধরে বাঙ্গালী ভগবান বুদ্ধের স্মরণাপন্ন হ'য়ে তার জীবনাতিপাত করেচে তার সম্যক ইতিহাস আজ মেলে না। ভগবান বুদ্ধের সেই সাম্যমূলক জীবনধারার কোন চিহ্নই আজ বাঙ্গলায় দৃষ্ট হয় না, সে শ্রমন নেই, সে মঠ নেই সে বিহার নেই, তবে সেই লুপ্তধারা যে আমাদের মন্দিরে মন্দিরে আজও লুক্কায়িত নেই তাই বা কে বলতে পারে? বৌদ্ধ যুগের শেষভাগে বাঙ্গলায় সিদ্ধাচার্যদের প্রভাব যে ভারতীয় মধ্যযুগের সাধন ধারাকে অনুপ্রাণিত করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই. ঐতিহাসিক গবেষণায় তা সুপ্রমাণিত হয়েচে। মধ্যযুগের এই লৌকিক সাধনায় গুরু রামানন্দ শিষ্য সন্ত কবীর। হিন্দী সাহিত্যে ত‍াঁর পদাবলীর স্থান সর্বোচ্চে আর তাঁর পদাবলীই হিন্দী ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। বৌদ্ধযুগের পরবর্তী বাঙ্গালার সহজ সম্প্রদায়ের অপভ্রংশ ভাষায় রচিত পদাবলীর প্রভাব কবীরের অনেক পদাবলীতে বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। বৃহত্তর বঙ্গের উন্মেষের এইটিই প্রথম নিদর্শন বলে আমার মনে হয়। মধ্যযুগের এই সাধক কবিদের গানের উৎস ভারতবাসীর প্রাণকে সহজেই স্পর্শ করেছিল তার একমাত্র কারণ এ যে মর্মের বাণী, তাঁদের মনে প্রাণে হৃদয়ে আবিষ্কৃত অদ্বৈত পরমানন্দ রূপই মূর্ত হ'য়ে এই সব কাব্যে গানে ফুটে উঠেছিল। এ ত মন্ত্র পড়ে পূজো নয়, পরব্রহ্ম প্রত্যক্ষ সত্যরূপে তাঁদের জীবনে আবির্ভূত ...ছিলেন বলেই সহজ সুন্দররূপে তাঁদের কথা কাব্যে গানে প্রকাশ পেয়েছিল।

বাঙ্গলা দেশে এই ধর্মের বাণী শোনালেন জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, এঁদের বাণী, এঁদের গান ত দেশের গণ্ডীর মধ্যে ধরে রাখবার নয়। এ বাণী যে চিরন্তর—এর প্রভাব যে সারা মানব হৃদয়ে। যাঁর আবির্ভাবে ভিতরের থেকে আনন্দের আলোকে মানুষের সকল ভেদ মিটিয়ে দেয় সেই দেবতার দূত ছিলেন এঁরা। এঁরাই বাঙ্গলাকে তখনকার যুগে বৃহত্তর করে তুলেছিলেন।



রায় বাহাদুর এন সি ঘোষ

বাঙ্গালীর গীতিকবিতার শ্রেষ্ঠ রূপান্তরে একদিন মহাপুরুষের আবির্ভাবের পূর্বাভাষ সূচিত হয়েছিল।

আজু কে গো মুরলী বাজায়।
এ ত কভু নহে শ্যামরায়॥
ইহার গৌর বরণ করে আলো।
চুড়াটি বাঁধিয়া কে বা দিল॥
বনমালা গলে দিল ভাল।
এনা বেশ কোন দেশে ছিল॥
চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে।
এরূপ হইবে কোন দেশে॥

শতাব্দী না যেতেই চণ্ডীদাসের এই ভবিষ্যদ্বাণী ফলে গেল এই বাঙ্গলা দেশেই। সেই প্রদীপ্ত কাঞ্চনবর্ণ, নয়নাভিরাম শচীর দুলাল নবদ্বীপে অবতীর্ণ হলেন।

চৈতন্যযুগে বাঙ্গলার যে বৃহত্তর রূপ দেখতে পাওয়া যায় এমনটি আর কখন চোখে পড়ে না। ভগবৎ প্রেম সারা পৃথিবীতে একটিবারই রূপ গ্রহণ করেছিল, সে এই চৈতন্যরূপে আর এই বাঙ্গলা দেশেই। প্রেমের পরশে সকল ভেদাভেদ মুছে যায়, সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়—এই ত‍াঁর শিক্ষা, ত‍াঁর জীবন এই সত্যের প্রতীক। প্রেমের অভয় পতাকা উড়িয়ে তিনি একদিন সারা ভারতকে শুনিয়েছিলেন—"চণ্ডালোপি দ্বিজঃ শ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ।" বঙ্গদেশের প্রধান পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম, কাশীর বিদ্বানমণ্ডলীর অগ্রণী জ্ঞানাচার্য প্রবোধানন্দ সরস্বতী দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিতকুলভূষণ ঈশ্বর ভারতী, তখনকার এই দিকপাল ...রথী সবাই একে একে চৈতন্যদেবের স্মরণাপন্ন হ'লেন। প্রেমভক্তির অপূর্ব বন্যায় সারা দেশকে ভাসিয়ে দিলেন। তীর্থকেন্দ্র থেকে সুদূর বৃন্দাবন পর্যন্ত এই প্রেম বন্যায় উদ্বেল হ'য়ে উঠ্‌ল। মানুষের প্রাপ্য মর্যাদা সকলকে সমভাবে দানই ছিল এই দেবমানবের একটি প্রধানতম শিক্ষা। বাঙ্গলা দেশ থেকেই এই সাম্যমূলক ধর্মাশ্রিত নবজীবন ধারার শঙ্খনিনাদ সারা ভারতে নির্ঘোষিত হ'ল। বাঙ্গলা দেশ বৃহত্তর মহত্তর হয়ে উঠল। এর পেছনে ছিল কৃষ্ণাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের আচণ্ডাল প্রেম, তিনি ছিলেন বহুভাষাবিদ, যখন যেখানে গেছেন তাদের ভাষায় কথা কয়ে তাদের প্রাণস্পর্শ করেছেন। "কভু বা তামিল বুলি বলে গোরা রায়" এই দেশে ভ্রমি দীর্ঘকাল। সকলের ভাষা বুঝে শচীর দুলাল।

তাঁর আবির্ভাবের যুগে বাঙ্গলা দেশ প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল—দিকে দিকে প্রাণশক্তির বিকাশ দেখা দিয়েছিল। স্মার্ত রঘুনন্দনের অনুশাসন আজও লোকে মেনে চলেচে রঘুনাথের নব্যন্যায় সারা ভারতবর্ষের বিদ্বজ্জনকে নবদ্বীপে আকৃষ্ট করেচে, আগমবাগীশের তন্ত্রশাস্ত্র নূতন সাধন পথের নির্দেশ করে দিয়েচে, জিমূতবাহনের দায়ভাগ বাঙ্গলা দেশের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে লোক চক্ষের সামনে ধরে দিয়েচে।

এই যুগের পরবর্তী ভারতাকাশ তমসাচ্ছন্ন। কোথায় কচিৎ ক্ষীণালোক মাত্র দৃষ্ট হয়। এ সময়কার ভারত ইতিহাসের তথা বাঙ্গলার নিশীথরাত্রে ভেদের পিশাচের বিকট নৃত্যই বেশী করে চোখে পড়ে মধ্যযুগের মরমিয়া কবিদের প্রভাব যে একেবারে ছিল না তা নয়—বাঙ্গলার বাউল তাঁদেরই উত্তর সাধক, তারা গ্রামে গ্রামে একতারা বাজিয়ে যে গান গেয়ে বেড়াত সে একতারার তার ঐক্যের তার। তারা তাদের অন্তরের আত্মীয়তা থেকে হিন্দুকে, মুসলমানকে এক করে জানতে পেরেছিল—তারাই ঋষিবাক্য নিজেদের সাধনায় প্রমাণ করেছিল—আপনাকে চিনেছিল সকলের মাঝে—তাই পাথরে গড়া ভেদের বেড়া, সমাজের অনুশাসন তাদের ধরে রাখ্‌তে পারেনি। বাঙ্গলার বাউলের সে ঐক্যের গান বৃহত্তর বঙ্গেরই গান।

বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্য আবার ফুটে উঠেছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে। বাঙ্গলার প্রাণের স্বরূপ থেকে নানারূপে নানাযুগে বৈচিত্র্যের ধারায়, তার শিল্পকলায়, সাহিত্যে, ধর্মে, কর্মে রসমূর্তিতে ফুটে উঠেচে। বাঙ্গলার এই অনন্তরূপ ও অমর প্রাণ দুর্বার সৃষ্টি লীলাস্রোতে একটা স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য চিরকাল রক্ষা করে এসেছে বলেই বাঙ্গলা একেবারে মরেনি—তাই ত আজ আবার বাঙ্গালী তার প্রাণের স্বরূপ নিয়ে বাঁচতে চায়, তার গানে, শিল্পে কল্পকলার রূপান্তরে তাকে আবার একবার ফুটিয়ে দেখতে ও দেখাতে চায়।

বিশ্বের সাড়া যুগে যুগে বাঙ্গালী পেয়েছিল বলেই সে আজও বেঁচে আছে। সাধনার দ্বারা সে একদিন জেনেছিল—"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা, নর বপু তাহার স্বরূপ।" সে গেয়েছিল,

শোনহে মানুষ ভাই সবার উপরে
মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই

বাঙ্গালী সাধক কবি "কালো মেঘ উদয় হ'ল অন্তর অম্বরে" দেখে গেয়েছেন,

"মা আমার অন্তরে আছ
তোমায় কে বলে অন্তরে শ্যামা"

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল আঘাত ও আক্রমণ এই বাঙ্গলা দেশের উপরেই পড়েছিল। এ একটা ভাঙ্গাগড়ার বিরাট যুগ। পৃথিবীর ইতিহাসে এমনটি

মেলা শক্ত। শতাব্দীকাল ধরিয়া এই ঘাতপ্রতিঘাত চলেছিল। সাংস্কৃতিক আঘাতের সম্মোহন এমনই যে, আহত হয়েও আমরা সুদূরের আদর্শ ধরতে গিয়েছি, অনুকরণ করতে আগুয়ান হয়েছি, আত্মরক্ষারও চেষ্টা করেছি। চঞ্চলও নানাদিকে নানাভাবে দৃষ্ট হয়েছে; সেই জাতীয় চাঞ্চল্য আবার বহুবিধ ধারার সৃষ্টি করেছে। এইসব স্রোতধারা কখন মিলিত হ'য়ে, কখন বিচ্ছিন্ন হ'য়ে, কখন একপথে কখন বিপরীত পথে ছুটেছে—কত ভাঙ্গন-গড়ন চলেচে। যুগপ্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় যখন সংস্কারে মনোনিবেশ করেছেন, পাশ্চাত্যের আলোকসম্পাতে আমাদের ঘরের সম্পদ বেদ উপনিষদাদির পুঁথির ধূলি ঝাড়ার যখন ব্যবস্থা চলেচে তখন শিক্ষিত সমাজের অন্তরালে যে বৃহত্তর সমাজ নির্জীব হ'য়ে পড়েছিল তাদেরও সনাতন বাণী শুনিয়ে জাগিয়ে তুললেন সাধক রামপ্রসাদ:

"আপনাতে আপনি থেকো যেয়োনা মন
কারু ঘরে।
যা চাবি তাই বসে পাবি, খোঁজ নিজ
অন্তঃপুরে।
পরমধন এই পরশমণি যা চাবি তাই
দিতে পারে।
ও মন, কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির
নাচ দুয়ারে।"

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ সংস্কারের যুগ, বহুতর মনীষী এ যুগে তাঁদের প্রচেষ্টা জাতীয় সংস্কারে নিয়োজিত করেছিলেন।

সেই প্রাণের সাড়ায় অমূল্য সাহিত্যসম্ভার গড়ে উঠ্‌লো—শিক্ষা বিস্তারে কত মহান পুরুষ-সিংহ তাঁদের জীবনাতিপাত করলেন। সেই যুগেই মহৎ আদর্শ লক্ষ্য করে বাঙলার বহু কৃতীসন্তান উত্তর ভারতের নানান্‌ সহরে ছড়িয়ে পড়লেন ও তাঁদের প্রভাব স্ব স্ব কার্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। সাহিত্যে কাব্যে নানা রসে নানা দিকে বাঙালী তখন গৌরবমণ্ডিত হয়েছে। সংস্কার যুগের অন্তে এক অপূর্ব সমন্বয় যুগের সূচনা হলো—শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংস দেবের আবির্ভাবে ও স্বামী বিবেকানন্দের তাঁর গুরুদত্ত সত্য প্রচারে।

শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব একটা ব্যক্তিগত অভ্যুদয় নয়, এ একটা যুগধর্মের সমন্বয় ও বিকাশ। বাঙালীর স্বভাবধর্মের এ একটা অত্যাশ্চর্য অভূতপূর্ব প্রকাশ। কোন মহাশক্তির বলে এই নিরক্ষর পূজারী ব্রাহ্মণের মধ্যে এরূপ গভীর অধ্যাত্মবোধ জেগে উঠ্‌লো, জগতের যাবতীয় বিরোধীয় ধর্মমত সাধনার ও অনুভূতির এমন অদৃষ্টপূর্ব সমন্বয় সাধিত হল, তা একান্তই দুজ্ঞেয়। বর্তমান ভারতে এত বড় ঘটনা আর ঘটেনি, এর সম্যক উপলব্ধি আজও হয়নি।

স্বামী বিবেকানন্দ মার্কিণ দেশে ও ইউরোপে তাঁরই বাণী, ভারতের সেই সনাতন বাণী সমন্বয়ের বাণী শোনালেন। সকলকে স্তম্ভিত করে দিলেন। ভারতবর্ষ তথা বাঙলা দেশকে বিশ্বের দরবারে বসবার অধিকারভুক্ত করলেন। বৃহত্তর বঙ্গের এ প্রকাশ অতীব মহান।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর পুরোভাগে যুগাচার্য বিবেকানন্দ আর আমাদের বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেশকে তাঁদের অবদানের গৌরবে যে উচ্চস্থানে প্রতিষ্ঠিত করলেন তার আর তুলনা হয় না।

বিবেকানন্দের গভীর অধ্যাত্মবোধ ও প্রগাঢ় দেশাত্মবোধপ্রসূত মহান বাণী আর রবীন্দ্রনাথের ঐক্যের গাঁথা আমাদের সম্যকভাবে অনুপ্রাণিত করলে, আমাদের ভিতর যা কিছু ক্ষুদ্রতর ভাব আছে তা কাটিয়ে উঠে বৃহত্তর ভাবের দিকে অগ্রসর হওয়ার কোন বাধাই থাক্‌বে না। আমাদের ক্ষুদ্রতা, আমাদের দলাদলি প্রীতি, আমাদের জাতীয় অহমিকাদৃষ্ট স্বাতন্ত্র্য, যে সব দোষে আজ আমরা পীড়িত, তা মুহূর্তে অপসারিত হয়ে যায়, যদি একবার আমরা আমাদের এই মহাপুরুষদের বাণী, তাঁদের শিক্ষা, জীবনে প্রতিফলিত করতে চেষ্টা করি।

আজ আমাদের ভেবে দেখবার বস্তু যথেষ্ট আছে—বাঙলার ভাবসম্পদ, বাঙলার কৃষ্টি, বাঙলার অতুলনীয় কাব্যসাহিত্যসম্ভার সকল সম্পদ সত্ত্বেও বাঙলা আজ তার যোগ্য আসন ভারত সভায় পায় না কেন? এ প্রশ্নের উত্তর সুকঠিন। আমরা আজ বৈশ্যযুগে বাস করছি। বাঙলার জমিদারীর যুগের সদরওয়ালার যুগ চলে গেছে—এখন ব্যবসা বাণিজ্যে, শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রতিপত্তি লাভ না করতে পারলে আমাদের আর উপায় নাই। ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিও যৌথভাবে কাজ করা। আমাদের অভাব সেইখানে। এই চরিত্রগত দোষটির নিরাকরণ একান্ত ও আশু প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ এগিয়ে চলেছে ব্যবসায়ের পথে বাণিজ্যের পথে, শিল্পকার্যের কলকারখানার পথে। আমাদেরও এগিয়ে চলতে হবে। আমাদের কৃষ্টি আমাদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই এগিয়ে চলা যায়। একদিন গেছে, বেশী দিনের কথা নয় যখন বাঙালী উত্তর পশ্চিম ভারতের নানাস্থানে প্রভূত সম্মান-স্নেহ-প্রীতির অধিকারী হয়েছে, আজ সে ভাব নিয়ে আমরা সকলের অপ্রিয় হয়ে দাঁড়িয়েছি কেন? স্বাতন্ত্র্যের দোহাই দিয়ে আমরা আমাদের জাতীয় অভিমান ও অহংকারের দাস হইনি কি? কাজেই প্রীতির যায়গায় এসেছে দ্বেষ স্নেহের যায়গায় এসেছে বিরোধ। আমাদের নিজেদের আত্মানুসন্ধান করে দেখতে হবে কোথায় আমাদের ত্রুটি ঘটেছে। প্রবাসী বাঙালী যারা ইতঃপূর্বে বঙ্গের বাহিরের বাঙলা দেশকে গৌরবান্বিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে স্বনামধন্য একজন আমাদের সৌভাগ্যক্রমে আজিও এখানেই বর্তমান। তাঁরা যেখানেই বাস করেছেন, সেখানে সকলকেই আত্মীয়ের চক্ষে দেখেছেন—তাঁদের আনন্দে তাঁদের উৎসবে যোগ দিয়েছেন—তাঁদের শোকদুঃখে আন্তরিক সহানুভূতিতে এঁদের প্রাণস্পর্শ করেছেন। আমাদের আজ বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা চল্‌বে না—সকলকেই প্রেমের ডোরে—স্নেহের ডোরে বাঁধতে হবে। সংস্কৃতির কেন্দ্র গঠন করে তুলতে হবে যায়গায় যায়গায়—যেখানে ভাবের বিনিময় হতে পার্‌বে—আদান প্রদান চল্‌তে পারবে অকুণ্ঠিত ভাবে। বাঙলার দেবার অনেক আছে, দিতে হবে দেবার মতো করে, প্রাণের সঙ্গে যোগ রেখে, নেবারও আছে অনেক, নিতেও হবে সেইভাবে। হিন্দী, পারসী, উর্দু সাহিত্যে কত অমূল্য সম্পদ রয়েছে। সেই সব আহরণ করে বাড়াতে হবে আমাদের ভাবসম্পদ; তবেই না বিরোধ বিসম্বাদ কেটে গিয়ে মৈত্রীতে দেশ ভরে উঠ্‌বে—সহজ হবে আমাদের সকলের এগিয়ে চলা।

কর্মক্ষেত্রে, শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে, যেখানে আমাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ বেশী করে সম্ভবে সেই সব ক্ষেত্র সন্ধান করে নিয়ে আমাদের প্রসার বাড়াতে হবে—শিক্ষার দ্বারায়, কর্মকুশলতার দ্বারায়, প্রাণাতিপাত চেষ্টার দ্বারা। একটা উদাহরণ দিই। বৈদ্যুতিক যুগ এখন এসেছে। Electrical Engineer ও Electricl Artisanএর প্রয়োজন হবে অনেক। আমার বিশ্বাস আমাদের দেশের ছেলেদের এ বিষয়ে দক্ষতার সম্ভাবনা বেশী। এমন করে এই শিক্ষার বিস্তার করা দরকার যাতে আমাদের দেশই সারা ভারতের প্রয়োজন মেটাতে পারে। শুধু তাই নয়—আমাদের দেশের যাঁরা ধনী, মা-লক্ষ্মীর পেটিকা নিয়ে বসে আছেন—আর যাঁরা শিল্পসৃষ্টির কার্যে ব্যাপৃত হয়েছেন তাঁদের সকলেরই ভেবে দেখা উচিত কি উপায়ে বৃহৎ বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায়। বৈদ্যুতিক শক্তির বহুল প্রসার বৃহত্তর শিল্প-বাণিজ্যে, আর কৃষি উন্নতির মূলে, এ বিষয়ে কাল-বিলম্ব করা চল্‌বে না। একবার আসুন হিমালয় হতে কুমারিকা অবধি, সিন্ধু নদের সাগর সঙ্গম থেকে ব্রহ্মপুত্রে মেঘনার বঙ্গোপসারে মিলন কেন্দ্র অবধি অন্তরকে প্রসারিত করে দেখি কোথায় কি প্রতিষ্ঠান আছে যা বৃহত্তর বঙ্গের পরিচায়ক। প্রথমেই লক্ষিত হয়—রামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠান—দূরদূরান্তরে ভারতবর্ষের কত নগরে উপনগরে এই সন্ন্যাসীর আশ্রমের প্রতিষ্ঠান জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সেবার কার্যে ব্রতী থেকে আমাদের দেশের মুখোজ্জ্বল করছে—আমরা কয়জন বঙ্গবাসী দেশে ও বিদেশে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কথা জানি বা তার পোষকতা করি। ভাববার কথা নয় কি?

তারপরই চোখে পড়ে বিশ্ববরেণ্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতী। কবিবরের এই অপূর্ব প্রতিষ্ঠান প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাবরাজ্যের অদ্বিতীয় মিলন কেন্দ্র। তিনি যে আদর্শে এটিকে বহুবর্ষ ধরে তাঁর শোণিত সিঞ্চনে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তার প্রতি বঙ্গবাসী আমরা দেশে ও বিদেশে কি কর্তব্য সাধন করছি? আমাদের গুরুদেব বিশ্বকবি তিন বৎসর অতীত হয়ে গেছে, দেহত্যাগ করে অমরধামে নিত্যালোকে বিরাজ করছেন—কি ভাবছেন তিনি। তাঁর দেশবাসী আমরা আমাদের কি তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানটিকে সজীব রাখবার বিষয়ে কোন দায়িত্ব নেই?

তারপর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম। বাঙলাদেশ থেকে বহুদূরে সমুদ্র পণ্ডিচেরীতে মহাযোগী তাপস শ্রেষ্ঠ শ্রীঅরবিন্দ তাঁর তপস্যায় নিমগ্ন রয়েছেন—কার জন্যে? তাঁর সাধনা ও সিদ্ধি নিজের জন্যে নয়, তাঁর নিজের মুক্তিতেই নিজের জন্য নয়—মানব জাতির জন্যে। মানব সমাজ যাতে একটা নূতন পদবীতে উন্নীত হতে পারে—যাতে ভগবানের এক নূতন প্রকাশ পার্থিব লীলায় ধরা দেয়। এ ক'টি প্রতিষ্ঠানই বৃহত্তর বঙ্গের পরিচায়ক নয় কি? বঙ্গবাসী আমরা দেশেই থাকি বা প্রবাসেই থাকি আমাদের সকলকারই এগুলির প্রতি কর্তব্য আছে, তা স্মরণ করিয়ে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

যে দেশে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ যুগধর্মের অপরূপ শিক্ষা দিয়ে গেছেন—যুগাচার্য বিবেকানন্দ ভারতের সেই উদাত্ত বাণী দেশে ও বিদেশে প্রচার করে গেছেন—বিশ্ববরেণ্য রবীন্দ্রনাথের ঐক্যের গান—সাম্যের গাঁথা—সমন্বয়ের বাণী সবেমাত্র স্তব্ধ হয়েছে, তাপসশ্রেষ্ঠ শ্রীঅরবিন্দ আজও যেখানে মানব সমাজের কল্যাণার্থে তপস্যায় নিরত—সেই দেশ সেই জাতির যে ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন থাকবে এ আমি বিশ্বাস করিনে। মেঘ এসেছে, মেঘ কেটে যাবে, তবে আমাদের মানুষ হতে হবে। বিবেকানন্দের সেই জ্বলন্ত ভাষায় বৃহত্তর বঙ্গের তথা সারা ভারতের নিখিল ভারতবাসীর সেই প্রার্থনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমার এ সামান্য প্রসঙ্গ শেষ করি।

"হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এ লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীর ভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী......আমায় মানুষ কর।"

কানপুরে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে বৃহত্তর বঙ্গ শাখার সভাপতির অভিভাষণ।

জীবনের ঝরাপাতা

শ্রীসরলা দেবী চৌধুরানী

[১০]

উৎসব

বাঙালী ঘরের বারো মাসে তের পার্বন আমাদের জীবনে ছিল না। জোড়াসাঁকোর ছেলেমেয়েদের উৎসবের মধ্যে ছিল এক ১১ই মাঘ। সেটা অন্যদের দুর্গাপুজোর মত। অথচ দুর্গাপুজো উৎসবের অনেক অঙ্গ-বিচ্যুত আমাদের ১১ই মাঘ। প্রথমতঃ কুমোরের হাতে গড়া কালো মাটীর ঠাকুর ঢাকঢোল বাজিয়ে ঘরে এনে পুজোর দালানে স্থাপন করা, তারপর তাতে চোখের সামনে রং লাগান, চক্ষুদান—এসবের আমোদ ছেলেদের মোটেই হত না। এইতেই ত সাকার পুজোয় ও নিরাকার ব্রহ্মোপাসনায় তফাৎ হয়ে গেল দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্ট্রীটস্থ ৬নং বাড়িতে ও অন্যান্য ঠাকুর বাড়িতে— এমন কি পাশাপাশি ছয়ের এক —৬।১—নম্বরের বাড়িতে। এটি ছিল আমাদের প্রমাতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় বাড়ির সব পুরুষদের বৈঠকখানা বাড়ি। পরে ভাইদের সঙ্গে মাতামহ দেবেন্দ্রনাথের বিষয় বিভাগ হলে—এটি হয়ে গেল তাঁর ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের বাড়ি। গগনেন্দ্র সমরেন্দ্র ও অবনীন্দ্রের পিতা গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার মা ও মাতুলদের খুড়তুত ভাই ছিলেন। তাঁদের ৬।১নংয়ের বাড়িতে সবরকম পুজো আর্চা চলতে থাকল—শুধু ৬নংয়ে বন্ধ হয়ে গেল। তাঁরা অন্যান্য শাখার ঠাকুর গোষ্ঠী জ্ঞাতিদের স্রোতে গা ঢেলে দিলেন—৬নং সে স্রোত থেকে উঠে তীরে এসে দাঁড়াল একা। শুধু ধর্মগত বিশ্বাস ও পারিবারিক আচার-ব্যবহারে মহর্ষির বাড়ি আলাদা রইল তা নয়, সামাজিক মেলামেশা, পরস্পরের ক্রিয়াকর্মে যৌতুকাদি আদান-প্রদান, যাতায়াতাদিও বন্ধ হয়ে গেল। কেবল গুণু মামার সঙ্গে বড়মামা মেজমামাদের সোদরোপম ভ্রাতৃস্নেহ থাকায় এ দুবাড়ির পুরুষদের সামাজিক সম্বন্ধ একেবারে বিচ্ছিন্ন হতে পারেনি—মেয়েদের হয়ে গিয়েছিল। পারিবারিক আচার অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাপক বাড়ির কর্তারা হলেও, তার ধারক, চালক ও পোষাক মেয়েরাই হন—গীতায় তাই বলা হয়েছে—বাড়ির মেয়েরা বিগড়লে বা বিমুখ হলে কুলাচার টেঁকে না। ও-বাড়ির কোন পুজাপার্বণে এ-বাড়ির বৌঝিদের যাওয়া বন্ধ করলেন, মহর্ষির কুলাচার স্বতন্ত্র হল, মহর্ষির ভাইদের কুলাচার পূর্ববৎই রইল। কিন্তু হিন্দু সাকারবাদীর পক্ষে নিরাকারেও ভগবদোপাসনা লঘুম্মন্য নয়। তাই এ-বাড়ির ১১ই মাঘের উপাসনায় যোগ দিতে ও গান শুনতে ও-বাড়ির সবাই আসতেন—মেয়েরাও। পাথুরিয়াঘাটা থেকে রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কালীকৃষ্ণ ঠাকুর প্রভৃতি বাড়ির কর্তারাই কিন্তু শুধু দুপুরবেলা একবারটি এসে মহর্ষির নিমন্ত্রণ রক্ষা করে চলে যেতেন,মেয়েরা নয়, মেয়েদের কাছে নিমন্ত্রণ পৌঁছতও না। বিজয়ার প্রণামও তাঁরা দিতে আসতেন। বাইরেই আসতেন, বাইরেই বসতেন, বাইরে থেকেই চলে যেতেন। তাঁদের আগমনবার্তা অন্দরে পৌঁছিলেই বাড়ির মেয়ে বউয়েরা খড়খড়ি দিয়ে উঁকি-ঝুঁকি মেরে তাঁদের দেখতে ধাবিত হতেন। ক্রমেই বেশি ছাড়াছাড়ি হতে লাগল। উত্তর-পুরুষে মহর্ষির পরিবারের সঙ্গে অন্যান্য ঠাকুর পরিবারের ব্যবধান উত্তরোত্তর বাড়তে থাকল, আর মহর্ষির ভাইয়ের পরিবারের সঙ্গে কমতে থাকল। ৬।১নং পাথুরিয়াঘাটা কয়লাহাটার সঙ্গে বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হতে লাগল। ৬নং রইল উন্নতশিরে দাঁড়িয়ে একা, নিজের বিশ্বাসে অটল, বিচারে স্বাধীন, আচারে স্বতন্ত্র। এমন দিন এল ব্যবহারগত যেসব সংস্কারে মহর্ষির পুত্র কন্যা বা অগ্রণী হয়েছিলেন সমস্ত ঠাকুর-গোষ্ঠীর শাখা-প্রশাখায় তা অনুপ্রবিষ্ট হল--অন্তঃপুর প্রথা উঠে গেল, স্ত্রীশিক্ষার প্রচার হল, সঙ্গীতানুশীলন মেয়েদেব জীবনের অঙ্গ হল। ভেদ রয়ে গেল শুধু পুজো ও উপাসনাপদ্ধতিতে। এক কথায় ব্রহ্মোৎসবে বা দোলদুর্গোৎসবে।

আমরা তাই আর কিছু জানিনে, দেখিনি—শুধু ব্রহ্মোৎসব দেখেছি। অতবড় কথাটা আমাদের মুখ দিয়ে বেরোতনা—আমাদের মুখে ও মনে ছিল শুধু একটি কথা **"১১ই মাঘ"**। সাধারণ ব্রাহ্ম ও নব-বিধানীদের কারো ছিল ১০।১৫ দিনব্যাপী, কারো একমাসব্যাপী ব্রহ্মোৎসব, আমাদের ছিল শুধু একটি দিন, ১১ই মাঘ। কিন্তু আমাদের শৈশবে সেদিনের আগমনীস্বরূপ আসত একমাস আগে থাকতে উঠানে লোহার থাম। অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ও অত্যন্ত ভারি ভারি থাম, তার একটু ধাক্কা লাগলেই মাথা ফেটে যেতে পারে। সেগুলিকে দিনকতক ধরে খানিকটা তফাৎ তফাৎ করে উঠানধারে লাইন টেনে ফেলে রাখা হত। তারপর অনেক হাত নীচু পর্যন্ত গর্ত খুঁড়ে বনিয়াদ মজবুত করে সেগুলি পোঁতা হত। ১০ই মাঘে এক থাম থেকে আর এক থামে গাঁদাফুলের মালা লম্বা করে ঝুলিয়ে দেওয়া হত, আর তার মাঝে মাঝে থামের গায়ে শামাদান ও দেওয়ালে বেলোয়ারের ঝাড় লাগান হত। উপরের দুদিককার বারান্দায়ও ঝাড় টাঙ্গিয়ে রাখা হত মোমবাতি কিন্তু মাত্র একদিন আগে বসান হত, বেশী আগে বসালে পাছে চুরি হয়ে যায়।

৯ই মাঘের দিন বিকেলবেলায় তেতালার ছাদ থেকে উঠানের উপর শামিয়ানা খাটান হলে সমস্ত বার বাড়িটা অন্ধকারে ছেয়ে যেত। কিন্তু সেই অন্ধকারই আমাদের মনে উৎসবের ভাবকে ঘনিয়ে আনত। বিজলীর প্রচলনে যেবার প্রথম উঠানে থাম আনা ও পোঁতা বন্ধ হল আমাদের আনন্দের একটা বড় অংশ কেটে ফেলে দেওয়া হল। বিজলীর দীপমালাতে চোখ অভ্যস্ত হতে ও মন তাকে মঞ্জুর করতে কয়েক বৎসর কাটল।

এ-বাড়ির ১১ই মাঘের উৎসব এবং ওবাড়ির পুজোয় একটা কিন্তু বড়রকম পার্থক্য ছিল ছেলেমেয়েদের পক্ষে—নতুন কাপড় পরা না পরায়। ১১ই মাঘে আমাদের নতুন কাপড় পরার কোন রেওয়াজ ছিল না, ভাল সাজগোজ করা হত এই পর্যন্ত। একমাস আগে থাকতে ঘরে ঘরে 'পুজোর বাজার' করে করে বাড়ির প্রত্যেক লোকটির হাতে—নতুন কাপড় জামা উপহার দেওয়ার জন্যে সমগ্র বাঙালী জাতি যে নিযুক্ত থাকে, কলকাতার রাজপথে সেই সময় সময় বড়-মানুষদের ঘর থেকে মেয়ের শ্বশুর বাড়ি যে পুজোর তত্ত্ব বাহিত হয়—আমাদের বাড়িতে সে সবের কিছুই ছিল না। তাই প্রিপ্যারেটরি ক্লাসে উঠে সকলে যখন একদিন আমাদের রচনার বিষয় দেওয়া হল, "A comparison between X'mas & Durgapuja"—আমার মাথায় বিশেষ কোন কথাই জুটল না। যে বিষয়ে জানিনা কিছু, সে বিষয়ে লিখব কি? শিক্ষয়িত্রী আমাকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে ইঙ্গিত

দিলেন—"X'masএ বাড়ির লোকের সঙ্গে মিলনের জন্যে ইংরেজরা যেমন উন্মুখ থাকেন পুজোর ছুটিতে বাঙালীরাও তেমনি। X'masএ খৃস্টানেরা পরস্পরকে যেমন উপহার দেন—পুজোর সময় হিন্দুরাও তেমনি।" এই মোটা রকমের কতকগুলি সাদৃশ্যের ইঙ্গিত পেয়ে একটা কিছু ধরতে ছুঁতে পেলুম—নয়ত ও বিষয়ে মাথা আমার একেবারে ফাঁক ছিল। যা লিখলুম এবার তাতে একটা রচনা খাড়া হয়ে উঠল বটে—কিন্তু লেখাটা নিজের অভিজ্ঞতাপ্রসূত হল না, নিজের হৃদয়রসে জড়ান হল না।

আমার বোধ হয় নতুন কাপড় পরাটা দুর্গাপুজোর আনুষঙ্গিক ছিল বলেই বলেই দাদামশায় ১১ই মাঘের ব্রহ্মোপাসনায় সে জিনিসটা একেবারে স্থানই দেননি। কিংবা হয়ত ১১ই মাঘের উৎসব একটি বীজের ক্রমোদ্ভব—তাঁর বাড়িতে রামমোহন রায়ের প্রবর্তিত প্রথম ব্রহ্মোপাসনার সাম্বৎসরিক অনুষ্ঠানের অনুবৃত্তিমাত্র, মূলত পারিবারিক কোন ব্যাপার নয়, সুতরাং এতে পারিষরিক কোনো বিশেষ বিধানের স্থান নেই এই জন্যে সেদিন পরিবারে সকলের নতুন কাপড় পরার অবশ্য কর্তব্যতা বিবেচিত হয়নি—বলতে পারিনে। ফলে দিনে নতুন কাপড় পরার সংস্কার আমাদের রক্তেমজ্জায় বসে যায়নি। বিজয়ায় পরস্পর-মিলন এবং সম্পর্ক-অনুযায়িক প্রণাম বা আলিঙ্গনাদি ব্যাপারও এ পরিবারের সংস্কারভুক্ত হয়নি। সেটা পরিবারের কারো কারো মধ্যে প্রচলিত হল আশু চৌধুরী ও তার ভ্রাতাদের সঙ্গে বিবাহসূত্রে জড়িত হয়ে তাঁদের পরিবারের অনুকরণে। কিন্তু আমাদেরও একটি পারিবারিক উৎসবের দিন ছিল যেদিন পরস্পরকে আলিঙ্গন প্রণামাদি করা হত। সে নববর্ষে, ১লা বৈশাখে। নতুন কাপড় পরার কতকটা রেওয়াজও সেইদিনটিতে ছিল। এক হিসেবে এইটিই আমাদের যথার্থ পারিবারিক মিলনের দিন। সেদিন অতি ভোরে ব্রাহ্মমুহূর্তে দেউড়িতে ঘণ্টা বেজে উঠত। ঘুমিয়ে থাকলেও জেগে উঠে, বাড়িসুদ্ধ পুরুষেরা সকলে প্রস্তুত হয়ে নবশুভ্রবস্ত্র পরিধান করে, উঠানে উপাসনা-সভায় সমবেত হতেন, আর মেয়েরা খড়খড়িতে। উপাসনাদি হয়ে গেলে বয়সের তারতম্য অনুসারে প্রণাম আলিঙ্গনাদি শেষ করে—মেয়েমহলেও—সরবৎ পান করানো হত বাইরে—আর বাড়ির লোকদের সেদিন সকলের একত্র ভোজন হত মধ্যাহ্নে। এক হিসেবে নববর্ষের মিলনোৎসবটি বেশি অন্তরঙ্গভাবে পারিবারিক হলেও ১১ই মাঘের উৎসবটিই উৎসব বলে আমাদের মনে প্রতিভাত হত। যাই হোক গুণে গেঁথে এই দুটি সামাজিক উৎসব ছিল আমাদের। বাকি যা ছিল—পৌষসংক্রান্তিতে পিঠে গড়া—সেটা একটা বিরাট অনুষ্ঠান বটে—এতবড় পরিবারের অনুকূল—কিন্তু বাইরের সঙ্গে সংযোগের অভাবে ততটা উৎসবের মত নয়—ঘরোয়া আনন্দ, ননদ-ভাজ মেয়ে বৌরা মিলে গড়া ও বামুনেরা ভেজে দিলে এ-ঘর ও-ঘরে বণ্টন করা।

১১ই মাঘের উৎসব ছিল উপাসনা ও সঙ্গীত প্রধান উৎসব। সেকালের ১১ই মাঘের বেদীতে উপবিষ্ট হতেন তিনজন আচার্য—তার মধ্যে কখন কখন দ্বিজেন্দ্রনাথ বা সত্যেন্দ্রনাথও একজন আচার্য হতেন—তাঁদের সমবেত কণ্ঠে বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণের বেদমন্ত্র ধ্বনিতে কর্ণ ভরিত ও আহ্লাদিত করতে অর্ধেক উঠান ভরে যেত। বাকী অর্ধেক আগন্তুক আসত সংগীতের মোহে। এমন বেদ ধ্বনিও বাঙলায় কেউ কোথায় শোনেনি ইতিপূর্বে আর এমন গুরু গম্ভীর অথচ সুমধুর সংগীত রসে প্লাবিত হয়নি বাঙলার অঙ্গন। নদীয়ার কীর্তন এক জিনিস—এ আর এক জিনিস। বৈষ্ণব ভক্তদের কীর্তন ভাবেতে মজে দশাপ্রাপ্ত হয়ে ধূলায় অবলুণ্ঠন প্রধান, আর ১১ই মাঘের সংগীত ভাবেতে উড্ডীন হয়ে মর্ত হতে স্বর্গে অবরোহণ প্রধান। বিশেষত রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর ভ্রাতাদেরসহ ১১ই মাঘের সংগীতের আসরে নামলেন তখন ব্রহ্মের উপাসনায় হৃদয়ের কোণে কোণে যেখানে যত নদী খাল বিল শুকনো ছিল সব ভরে উঠল। আর "মনে কর শেষের সেদিন কি ভয়ংকর নয়," শুধু "তুমি অগম্য অপার" ইত্যাদি বর্ণনামূলক নির্গুণ ব্রহ্মের স্তুতি নয়। এখন হল সমস্ত বাহ্য বা অন্তরপ্রকৃতিতে প্রতিভাত সগুণ ঈশ্বরের আবাহন। বৈষ্ণবদের লক্ষ্মী বিষ্ণু বা শাক্তদের শিব-কালীর স্থলে খৃস্টদের Personal God-এর অবতারণা—

"বিশ্ববীণা রবে বিশ্বজন মোহিছে
স্থলে জলে, নভতলে বনে উপবনে,
নদী নদে, গিরি গুহা পারাবারে।"

* * * *

"আজ আনন্দে প্রেমচন্দ্রে নেহারো
হৃদি গগন মাঝে!
কর জীবন সফল।"

* * * *

হল— "তোমার কথা হেথা কেহত বলে না
করে মিছে কোলাহল,
সুধা সাগরের তীরেতে বসিয়া
পান করে শুধু হলাহল!

* * * *

হল— "অনেক দিয়েছ নাথ!
আমার বাসনা তবু পুরিল না
দীন দশা ঘুচিল না, অশ্রুবারি মুছিল না
গভীর প্রাণের তৃষা মিটিল না মিটিল না!
দিয়েছ জীবন মন, প্রাণপ্রিয় পরিজন
সুধাস্নিগ্ধ সমীরণ, নীলকান্ত অম্বর
শ্যাম শোভা ধরণী!
এত যদি দিলে সখা,
আরো দিতে হবে হে,
তোমারে না পেলে আমি
ফিরিব না, ফিরিব না!"

Personal God-এর অনুভূতি নিরাকারত্বে হয় না। যিনি চক্ষুশ্য চক্ষু শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং তাঁকে চক্ষুকর্ণবান্ চরণ হস্তবান্ বলে' কল্পনায় না আনলে অন্তরে তাঁকে অঙ্গবান করে না দেখলে তাঁকে পাওয়াই হয় না। তাই রামমোহন যুগের পরবর্তী ব্রহ্মোৎসবের রবীন্দ্রের ব্রহ্ম বা ঈশ্বর 'অপানিপাদ' নন, তিনি 'সর্বতো অক্ষি' "সর্বত্র শিরোমুখ"। তাই তাঁর পরিচালিত ১১ই মাঘে পর পর গাওয়া হয়েছে—

"বড় আশা করে এসেছি গো
কাছে ডেকে লও
ফিরায়ো না জননি।
আর আমি যে কিছু চাহিনে,
চরণতলে বসে থাকিব,
আর আমি যে কিছু চাহিনে,
'জননী বলে শুধু ডাকিব'

* * * *

"আজি শুভ দিনে পিতার ভবনে
অমৃত সদনে চল যাই।"

* * * *

সকাতরে ঐ কাঁদিছে সকলে
শোন শোন পিতা।"

* * * *

"হেরি তব বিমল মুখভাতি
দূর হল গহন দুখ রাতি

* * * *

এস হে গৃহদেবতা এ ভবন
পুণ্য প্রভাবে কর পবিত্র!"
তব প্রেম-আঁখি সতত জাগে
জেনেও জানি না।"

* * * *

হল— "এ কি অন্ধকার এ ভারতভূমি
বুঝি পিতা তারে ছেড়ে গেছ তুমি
প্রতি পদে পদে ডুবে রসাতলে
কে তারে উদ্ধার করিবে।"

আর কত তুলব? আদি ব্রাহ্ম সমাজের ব্রহ্ম সংগীত পুস্তকের প্রথম ভাগ থেকে দশম একাদশ ভাগ পর্যন্ত যত দূর ছাপান হয়েছে সগুণ সাকার ঈশ্বর ভাবের সব রকম সংগীত স্তরে স্তরে সঞ্চিত আছে। ভাবের ও ভাষার পার্থক্য দেখলে চিনতে পারা যাবে রামমোহন রায়ের সময়কার নিরাকার ব্রহ্ম কেমন করে ভাবের ঘরে একদম সাকার হয়ে নেমে ব্রহ্মবাদীর আকর নিরাকার অভেদ জ্ঞানের ভিত্তিই পুনঃস্থাপিত করলেন। অথচ ভাবের ছবির চৌকাঠ পেরিয়ে গেলেই—মাটি-খড়ে, ধাতু প্রস্তরে, বর্ণে-চিত্রে ভাবের উপলক্ষ্য ভগবানকে পূর্ণ লক্ষ্য করে মূর্ত করে আঁকড়ে ধরলেই রবীন্দ্রনাথ উত্যক্ত বিচলিত হয়ে

উঠতেন। তাঁর আজন্ম 'নিরাকার' পূজার সংস্কারে ঘা লাগত। আশু চৌধুরী ও তাঁর ভাইদের সঙ্গে জোড়াসাঁকোর বৈবাহিক সংযোগ স্থাপনের কিছু পরে তাঁর ভগ্নী ডাক্তার উমাদাস বাঁড়ুয্যে পত্নীর সঙ্গে আমরা অনেকে পূজার ছুটী যাপনে বেনারসে যাই। প্রমথ চৌধুরীর তখন ইন্দিরার সঙ্গে সদ্য বিবাহ হয়েছে। তাঁরাও ছিলেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রকাণ্ড বাড়ি হর-ধাম-এ আমরা সবাই ছিলুম। বৌবাজারের বসু মল্লিক পরিবারের দেম মল্লিকও সেবার সপরিবারে বেনারস গিয়েছিলেন। এক রাত্রি আমাদের বিশ্বেশ্বর মন্দিরের প্রসিদ্ধ আরতি দেখানোর জন্যে তিনি বন্দোবস্ত করলেন। আমরা সবাই মন্দিরের সামনে বসলুম। পাণ্ডারা আমাদের চারিদিক ঘিরে রক্ষে করতে লাগল—যাতে ভিড় ভেঙ্গে আমাদের উপর না পড়ে। সে কি আরতি আর ভক্তের কি ভিড় ও জয়োল্লাস! বিশ্বেশ্বরের সে আরতি দেখে চিত্ত পুলকিত নমিত না হয়ে যায় না। এতদিন শুধু গুরু নানকের পদভাঙা রবীন্দ্রের ব্রহ্ম সংগীত বলে গাইতুম—

"তাঁর আরতি করে চন্দ্র তপন
দেব মানব বন্দে চরণ,
আসীন সেই বিশ্ব শরণ
তাঁর জগৎ মন্দিরে।"

আজ সেই গানের ভাবেরই সত্যবৎ অনুভূতি লাভ হল। আরতি শেষে শত সহস্র বৎসর ধরে অগণ্য ভক্তের ভক্তিভাব-ভরিত সেই গগনতলে বিশ্বেশ্বরের মন্দির দ্বারে আজকের সহস্র সহস্র ভক্তদের ভক্তি তরঙ্গে ভক্তি মিলিয়ে আমরাও উদ্দেশে প্রণত হলুম।

এই কথাটা কলকাতায় ফিরে গেলে রবিমামার কাণে যখন পৌঁছল তিনি আমাদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হয়ে বল্লেন—"তোরা এই রকম করে পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিলি? মিথ্যাচার করলি?"

হায়! ৬নং জোড়াসাঁকোর বাঁধা অবিশ্বাসের পথ থেকে সরে অনেক ছেলে-মেয়ে বউই যে যুক্তির অবলম্বনেই পুরোণ বিশ্বাসের Valley-তে চলে এসেছেন সে বিষয়ে ক্রমেই যত পরিচয় পেতে থাকলেন ততই রবিমামা ক্ষুন্ন হতে থাকলেন।

ছেলেবেলায় ১১ই মাঘের সংগীতে আমরা যে অংশ গ্রহণ করতুম সে বড়দের দ্বারা চালিত নিয়ন্ত্রিত হয়ে যতটুকু করবার ততটুকু মাত্র দিন পনের আগে থেকে গান-অভ্যাসের আসরে বসে গান শেখা ও সে রাত্রে গান গাওয়া এবং গানের সঙ্গে সঙ্গে বাজান। কিন্তু কয়েক বছর পরে নিয়ন্ত্রণের ভার কিছু কিছু আমরাও নিলুম। আমাদের সংগীতপ্রেম সেদিনটাকে কিছুটা নিজের নিজস্ব না দিয়ে পারলে না। আমরা চার-জনে—সুরেন, বিবি, দাদা ও আমি—প্রত্যেকে একটা না একটা কিছু যন্ত্র বাজাতুম—কেউ কেউ দুটো তিনটেও বাজাতে পারতুম—হার্মোনিয়ম বাজানটা ত আমাদের গণ্যর মধ্যেই ছিল না! আমরা আপনাআপনির মধ্যেই ইংরেজীগতের কন্সার্ট প্রায়ই করতুম। ১১ই মাঘের সংগীত প্রোগ্রামে প্রতি গানের আরম্ভে সেই গানের রাগ বা রাগিনীর খানিকটা আলাপ মিলিতযন্ত্রে খানিকক্ষণ ধরে করে তারপর গানটি ধরাতে লাগলুম। আমাদের এই দলে প্রতিভা দিদির কোন কোন বোনও থাকতেন। সে সময়ে এবিষয়ে এত উৎসাহ ছিল আমাদের মনে পড়ে—একবার সকালের উপাসনায় যোড়াসাঁকোয় এসে, খেয়েদেয়ে আবার আমরা বির্জিতলায় —তখন মেজমামীরা সেখানে থাকতেন—ফিরে গেলুম, সেখানে সন্ধ্যের কন্সার্টের জন্যে খানিকক্ষণ নিরিবিলি প্র্যাকটিস করে জিনিসটা সর্বাঙ্গশোভন করতে পারব বলে। আবার সন্ধ্যের পূর্বেই যন্ত্রপাতি ঘাড়ে করে আমরা এসে স্ব স্ব স্থান গ্রহণ করলুম। গানের পূর্বে ইংরেজী ধাঁচের এই রকম খানিকটা উপক্রমণিকার দস্তুর এখন Radio এবং Gramophone Record গানে ঢুকেছে। সে সময় বাঙলা গানে এটা সম্পূর্ণ নতুন ছিল।

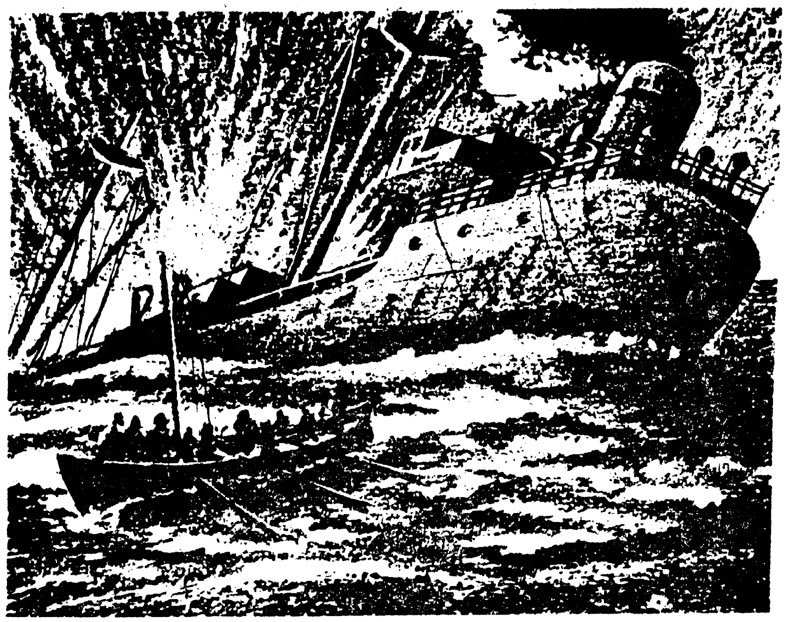
একেই জোড়াসাঁকোর ছেলেমেয়েরা উৎসব-আনন্দে পরিক্ষীণ ছিল ১১ই মাঘ ছাড়া কোন বড় উৎসব তাদের ছিল না—তার উপর লাহোর থেকে একবার ফিরে দেখি সেটিও তাদের প্রায় চলে গেছে। শান্তিনিকেতনে রবিমামার আশ্রম জমে উঠবার পর থেকে তিনি বাড়ির ছেলে-মেয়েদের ত্যজ্য করে তাঁর আশ্রমের ছেলে-মেয়েদের প্রাধান্য দিতে লাগলেন। ১১ই মাঘের উৎসবের জন্যে গান ও বাজনার প্র্যাকটিসে বাড়ির ছেলেমেয়েদের আর যোগ রইল না। বোলপুর আশ্রমের ছেলে-মেয়েরাই একেবারে সেখান থেকে তৈরী হয়ে এসে গাইতে বসে যায়। আগেকার সঙ্গীতের অংশবহনে প্রতিভা দিদির যে বোনেরাও যুক্ত ছিলেন—তাঁদের কাছে অনুযোগ শুনলুম—আমরা এ বাড়ির মেয়েরা কোথায় যাই? আমাদের আর পাল-পার্বণ নেই, ঐ একটি ১১ই মাঘ। হিন্দু বাড়িতে দুর্গাপূজার উৎসবে বাড়ির সব ছেলেমেয়েদের কি আহ্লাদ। লোকজনের আনাগোনা, আদর অভ্যর্থনা খাওয়া দাওয়া, নতুন কাপড় পরে ঘুরে ঘুরে বেড়ান—তাদের কত রকমের আনন্দ! আমাদের ১১ই মাঘে পারিবারিক খাওয়াদাওয়াও কবে থেকে উঠে গেছে, বাকী ছিল ঐ গানবাজনায় যোগটুকু। রবিকাকা তা থেকেও আমাদের বঞ্চিত করে দিলেন। সারা বছরের এই একটিমাত্র পারিবারিক উৎসব আমাদের—তাও রইল না। আমরা কি সাধারণ সমাজের দলে ঢুকব এখন, না নববিধানের? আমরা যদি হিন্দু সমাজের বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ি, তাতেও গঞ্জনা দেন। আমাদের ভাগ্যে তাঁর ঠাট্টা বিদ্রূপ অবজ্ঞা ঔদাসীন্য—পরের বাড়ির মেয়েদের ভাগ্যে ১১ই মাঘের উৎসব—

এবড় ভীষণ মর্ম-ব্যথার অনুযোগ। বাস্তবিকই কর্তা দাদামশায় থাকতে থাকতেই বায়সঙ্কোচের উদ্দেশ্যে ১১ই মাঘের উৎসবের কায়া মলিন ও ক্ষীণ হতে আরম্ভ হয়েছিল। তাঁর দেহাবসানের পর থেকে ওটি শীর্ণ বিশীর্ণ হতে হতে এখন ত একরকম গতাশুই হতে চলেছে। জোড়াসাঁকোর উঠানখানা যতদিন রয়েছে, ততদিন বোধ হয় কর্তা দাদামশায়ের উইল অনুসারে নমো নমো করেও ১১ই মাঘ চালাতে হবে। সে উঠান কিন্তু এখন রাজপথ। সেজমামার ছোট ছেলে ঋতুদাদার অংশ একজন মারোয়াড়ীর কাছে বিক্রীত। তাদের উঠান দিয়ে যাতা-য়াতের অধিকার আছে। ১১ই মাঘের উপাসনা ও গান যখন চলছে ঠিক সেই সময় সেই অংশের ছাদ ও খড়খড়ি বেয়ে মাড়োয়ার গিন্নীর উনুন জ্বালানর ধোঁয়া ও ফোড়নের গন্ধ উঠানে চলে আসে। আর নীচেরতলায় উঠানের গায়ে সংলগ্ন বাড়ির ভিতরমুখো সব অন্ধকেরে ঘরগুলি খোট্টা ও দেশ-বিদেশী ভাড়াটেতে ভরা। তাদের আগমন ও নিষ্ক্রমণের কোন সময় নির্ধারিত নেই। ১১ই মাঘ ব্রহ্মোপসনা সভার ভিতর দিয়ে যার যখন খুসী সভা ভেদ করে গতায়াত করতে পারে ও করবে। এই দুর্যোগের দিনে বোলপুরের ছেলেমেয়েরাও আর গাইতে আসে না—বোলপুরেই ধুমধাম করে ১১ই মাঘ হয়, এখানে কলকাতার বিভিন্ন রবীন্দ্র সংগীত প্রতিষ্ঠানের ছেলেমেয়েদের জড় করে গানের যোগান হয়। যে সকল উৎসব অনুষ্ঠান জোড়াসাঁকোতে ছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরিবারগত, তাঁর মৃত্যুর পর থেকে ক্রমশ হয়ে গেল তাঁর কীর্তিমান কনিষ্ঠ পুত্রের প্রতিষ্ঠানগত। যেমন ঐ বাড়ীর ইমারৎ-খানার ইঁটাতাবিতে মহর্ষির সম্পর্কিত যে কোন লোকের অধিকার নেই, তেমনি তাঁর প্রচলিত উৎসবাদিতেও আর তাঁর রক্তের বলেই কারো রক্তগত অধিকার নেই।

পদ্মা যেমন কত প্রাচীন কীর্তি ও কীর্তিমান বংশের অবলোপ করে সরে গেছে আর এক প্রান্তে, মহর্ষি ও তাঁর বংশের যোড়াসাঁকোস্থ কীর্তিকলাপ তেমনি পাশকাটিয়ে গেছে চলে শান্তিনিকেতনে—যার ছাতিমতলার বুনিয়াদের উপর গড়ে উঠেছে অভ্রভেদী রবীন্দ্র তাজমহল। যোড়াসাঁকো এখন কুর্জনের কানুনের দ্বারা রক্ষণীয় ধ্বংসাবশেষ।

ক্রমশ

কেউ একজন মুখ খুললো



ফলে দশলক্ষ গ্যালন কেরোসিন সমুদ্রের জলে মিশল ও ভারতের শত শত গ্রামে কেরোসিনের অভাব ঘটল

অসতর্ক কথায় জীবন নষ্ট হয় এবং তা ছাড়াও যে সব জিনিসপত্র ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না, সে সব অমূল্য জিনিসপত্রও নষ্ট হয়। কেরোসিন তারই একটিমাত্র। শত্রুপক্ষ আমাদের জাহাজ ডুবিয়ে দিলে আমরা খাদ্য এবং ওষুধপত্র হারাই।

কেউ একজন মুখ খুলেছিল বলে—

এই বিবৃতিটি পাঠ করার সময় আপনি যেখানেই থাকুন, মনে রাখবেন আপনার ট্রেণের কামরায়, ক্লাবে, হোটেলে অথবা টেলিফোনে কথা বলার সময় শত্রুর গুপ্তচর হয়তো নিকটেই থেকে অসতর্ক কথা শুনছে। আপনার চিঠি হারিয়ে গিয়ে তার হাতে পড়তে পারে। তাকে হার মানানোর একটি-মাত্র উপায় আছে—আপনার সতর্কতা ও সংযম।

জাহাজ, সৈন্যদের গতিবিধি, নতুন রাস্তা, রেলপথ, এরোড্রোম বা অস্ত্রসম্ভার সম্বন্ধে আপনি যতটুকু জানেন তা নিয়ে আলোচনা না করার, তা প্রকাশ না করার, এমন কি আপনি যে কিছু জানেন এরকম কোন ইঙ্গিত পর্যন্ত না করার জন্য নিজেকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করলে নাবিকদের নিরাপত্তা ও জনসাধারণের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এসে পৌছানোর নিশ্চয়তা সম্পর্কে আপনার চরম সহায়তা করা হবে।

আপনার জন্য যেন বিপদ না ঘটে

ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রণ্ট কর্তৃক প্রচারিত

AAA 1341

গত বছরের হিসেব থেকে দেখা গেল যে, প্রদর্শনক্ষেত্র হিসেবে ক'লকাতাই এখন ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বড়। ভারতের যে কোন শহরের চেয়ে যে কোন ভাষাতেই বেশী সংখ্যক ছবিই মুক্তি হয় না শুধু, অর্থের আমদানীর দিক থেকেও কলকাতায় কৃতিত্ব আর সমস্ত শহরের চেয়ে বেশী, এখানে চিত্র গৃহের সংখ্যাও অনেক বেশী। এ ছাড়া এ শহরের আর একটা স্থায়ী আকর্ষণ রয়েছে মঞ্চ—তাও চলেছে বেশ জনাকীর্ণভাবেই। সুতরাং নিঃসংশয়ে কলকাতার অধিবাসীদের সবচেয়ে প্রমোদ-প্রিয় ব'লে অভিহিত করা যেতে পারে। এক সময় এই প্রমোদপ্রিয়দের বিচারের মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকতো সমগ্র ভারত এবং তাদের বিচারের ওপর শ্রদ্ধাও ছিল সবায়ের। বাইরে থেকে এসে সবাইকেই স্বীকার ক'রে যেতে হ'তো যে এখানকার দর্শকদের যেমন ভাঁওতায় ভুলিয়ে দেওয়া যায় না তেমনি এখানকার সমালোচকদেরও অন্যান্য প্রদেশের মত, প্রলুব্ধ ক'রে ন্যায়-বিচারের পথ থেকে হটিয়ে আনা যায় না।

সে গৌরব বোধ হয় আজ আর দাবী করা যায় না। দর্শকরা আজ তাদের সেই আগেকার বিচারবুদ্ধি যেমন হারিয়ে বসেছে, সমালোচকরাও তেমনি গিয়েছে একেবারেই নিশ্চুপ হ'য়ে। তা না হ'লে গত বছরের প্রায় ৯০ খানি ছবির মধ্যে ২ খানির বেশী উল্লেখ করায় যত অবদান না হওয়া সত্ত্বেও প্রায় অর্ধেক সংখ্যক ছবিই বিপুল আর্থিক সাফল্য লাভে ধন্য হ'তে পেরেছে! এখন লোকে ধ'রে নিয়েছে, যা জিনিসই পরিবেশন করো কলকাতার বাজারে ঠিক চলে যাবেই—এ ধারণা এখানকার লোকের বিদ্যা, জ্ঞান, রুচি ও কৃষ্টির ওপরে কটাক্ষপাত করে না কি? কলকাতার মত জায়গায় দর্শকদের বিচারবুদ্ধি ভোঁতা দেখলে লোকে জেনে শুনে বাজে জিনিস পরিবেশন ক'রতেও দ্বিধা ক'রবে না—আজ কার্যক্ষেত্রে হ'চ্ছেও যেন তাই।

নূতন মঞ্চ-পরিচয়

বিন্দুর ছেলে (শ্রীরঙ্গম)—কাহিনী ঃ শরৎচন্দ্র; নাট্যকার ঃ দেবনারায়ণ গুপ্ত; প্রয়োজনা ঃ শিশিরকুমার, সুরযোজনা ঃ রতন দাঁ; ভূমিকায় ঃ **মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, কালীপদ সরকার, পুরু মল্লিক, শ্রীমান সৌরীন্দ্র, কুমারী কেতকী, বিমল দে,** মণি শ্রীমানী, প্রভা, সাবিত্রী, নিভাননী প্রভৃতি। গত ২০শে ডিসেম্বর প্রথম মঞ্চস্থ হ'য়েছে।

প্রখ্যাত উপন্যাস অবলম্বনে নাট্যনিবেদন সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা ক'রেছি। এ ধরণের নাটকগুলির সাফল্য সম্ভাবনা প্রচুর থাকে যদিও পাকা নাটকের



রূপ গুণ সচরাচর বর্জিতই থেকে যায়। 'বিন্দুর ছেলে'র নাট্যকারের বাহাদুরী এই যে তিনি কাহিনীর মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেননি। যার ফলে নিতান্ত আড়ম্বরহীনভাবে নাটকখানি মঞ্চস্থ হ'লেও শুধু শরৎচন্দ্রের লেখার জোরটাই দর্শকদের মোহিত ক'রে রাখে সর্বক্ষণ, কাহিনীর গতি তরতর ক'রে মনকে এগিয়ে নিয়ে যায় ধাপে ধাপে। এই অব্যাহত গতিটা বজায় রেখে যাওয়া



'দ্রৌপদী' চিত্রের নায়িকা সুশীলারাণী

নাট্যকারের কিছুটা কৃতিত্বের পরিচয় দেয়! 'বিন্দুর ছেলে' বাড়ির পাঁচজনকে নিয়ে বসে দেখবার মত বেশ জমাটি একটা ঘরোয়ানাটক হয়েছে।

অভিনয়ে বিন্দুর ভূমিকায় সাবিত্রীই কৃতিত্ব দেখিয়েছে সবচেয়ে বেশী—পর্দায় গায়ের সেই মাকাল ফলটি ব'লে বিশ্বাসই হয় না—শিশিরকুমারের অধীনে থেকে, শুধু মঞ্চাভিনয়ে নিযুক্ত থাকলে সাবিত্রী অভিনেত্রী জীবনে কীর্তি রেখে যেতে পারে মনে হ'ল সেদিনের অভিনয় দেখে। যাদবের ভূমিকায় মনোরঞ্জন তাঁর স্বাভাবিক দক্ষতাকে অক্ষুণ্ণই রেখেছেন। কালীপদ সরকারের মাধব বেমানান সব দিক থেকেই। ছোট্ট মেয়ে কেতকী অমূল্যকে বেশ প্রাণবন্ত ক'রে তুলেছে। প্রভা ও নিভাননীও নিজেদের গৌরব সম্পূর্ণ বজায় রেখেছেন।

বিবিধ

প্রতিমা দাশগুপ্তা তার স্বামী মিঃ হকের সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন জানিয়েছে ব'লে শোনা গেল।

* * * *

ধীরেন্দ্র দেশাইয়ের পরিচালনায় শাহু মোদক ও নলিনী জয়ন্তের অভিনয়ে ফিল্মিস্তানে যে ছবিখানি উঠবে তার প্রযোজক হবেন অশোককুমার—প্রযোজনায় অশোককুমারের এই হবে হাতে খড়ি।

*

প্রভাতের পরিচালক ডি ভি কাশ্যপ পুণায় এক ক্রীশ্চান শিক্ষয়িত্রীর প্রেমে পড়ে বিবাহ ক'রেছে।

*

হিন্দু-মুসলমান মিলন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে গল্প থাকায় ইউনিটি ফিল্মের হিন্দী ছবি "ভাই চারা"কে পাঞ্জাব সরকার আমোদ-কর থেকে রেহাই দিয়েছেন।

*

প্রমোদ-কানন প্রোডাকসন্সের হ'য়ে শ্রীমতী কানন নীরেন লাহিড়ীর পরিচালনায় যে ছবিতে অভিনয় ক'রছেন তার নাম শেষ পর্যন্ত ঠিক হ'য়েছে 'বনফুল'।

*

আর্ট ফিল্মসের 'তকরারের' খালি বম্বে প্রান্তের স্বত্বই পাঁচ লক্ষ টাকায় বিক্রী হ'য়ে গেছে অর্থাৎ এই হিসেবে সমগ্র ভারতের স্বত্বের জন্য দাম হয় প্রায় লাক্ষ দশেক।

* * * * *

এই মাসে কাপাদিয়া ডিস্ট্রিবিউটার্স ও বিজয় পিকচার্স এই নামে কলকাতায় দুটি পরিবেশন প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হ'য়েছে।

* * *

তলোয়ার প্রডাকসন্স লাহোর ছেড়ে আবার কলকাতায় ছবি তুলতে এসেছে এবং

ইতিমধ্যে শ্রীভারতলক্ষ্মী স্টুডিওতে দু'খানা ছবি তোলার চুক্তি ক'রেছে।

*

ভদ্রবংশীয়া মুসলমান রমণী দ্বারা অভিনীত হলে সে ছবি বর্জন করা হবে এই ধরণের একটা আন্দোলন বম্বের উর্দু পত্রিকা মহলে ক্রমশই তীর হ'য়ে উঠছে। বম্বের উর্দু পত্রিকা মহল এ ব্যাপারটার ধুয়া ধরে লক্ষ্ণৌ ও দিল্লী থেকে। ইতিমধ্যেই এর জোরে আরোবিয়ান নামক এক উর্দু সাংবাদিকের ভাগ্যে অভিনেত্রী বীণার হাতে চপেটাঘাত লাভ হয়েছে।

*

মমতাজ শান্তির জন্মতিথি উপলক্ষ্যে তার স্বামী ওয়ালী সাহেব শুধু বিশিষ্ট অভিনেত্রীদের নিমন্ত্রণ করেন। এ ধরণের সামাজিক অনুষ্ঠানে স্বামীকে বাদ দিয়ে শুধু স্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করলে সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা যায় না, এই ব'লে নির্মলা নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান ক'রে এক চিঠি দেয়। সেই চিঠিতে নির্মলা আরও লেখে যে, মমতাজ শান্তি পর্দানশীনা ব'লেই যদি এই ব্যবস্থা হ'য়ে থাকে তাহ'লে নিজের গৃহে অন্যের স্ত্রীকে ডেকে এনে দেখবার অধিকারই বা ওয়ালী সাহেবের থাকবে কেন? মমতাজ শান্তি নাকি এতই পর্দা মেনে চলে যে স্টুডিওতে গিয়ে ছবি তোলা না হওয়ার সময়টুকু সে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরে বসে থাকে।

*

ছবিতে গানের বাজারও খুব চড়ে যাচ্ছে দিন দিন। এ ব্যাপারে সবচেয়ে রোজগার বেশি মদোকের, মাসে তিন থেকে পাঁচ হাজার। 'ফুল' ছবিখানির ন'খানা গানের জন্য গানের লেখককে দেওয়া হচ্ছে প'য়ত্রিশ হাজার টাকা। 'চল চল-রে নওজোয়ান'এর জন্য প্রদীপকে শতখানেক গান রচনা ক'রতে হয়—যে গানগুলি বাতিল হ'য়ে গেছে এখন সেগুলিরই দাম হাজার হাজার টাকায় উঠেছে।

*

'বেগম' ছবিখানির সংগীত নির্দেশনা শেষ হ'লে ফিল্মিস্তান তাদের পরবর্তী ছবির জন্যে শচীন দেব বর্মণকে নিযুক্ত ক'রবে। এ ছবিখানির কাহিনীর জন্যে শোনা যায়, ফিল্মিস্তান 'উদয়ের পথে' লেখক জ্যোতির্ময় রায়ের সংগে কথাবার্তা কইছে।

*

গত বছরের যে হিসেব তাতে দেখা যায় যে, বাঙলা ও হিন্দী ছবি বছর শেষ হওয়ার সময় পর্যন্ত প্রায় ৪৮ খানি সম্পূর্ণ হ'য়ে মুক্তি প্রতীক্ষায় আছে আর প্রায় ৭০ খানার চিত্রগ্রহণ চলেছে।

*

টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্সের 'ইউথ ইন ক্রাইসিস' নামক একখানি ছবি মাদ্রাজ ও বাঙলাদেশে সেন্সর কর্তৃক প্রদর্শন নিষিদ্ধ হ'য়েছে।

*

তোলা শেষ হওয়ার আগেই ইন্দ্রপুরীতে বম্বের প্রতিষ্ঠান সানরাইজ পিকচার্সের সর্বভারতীয় স্বত্ব আহমেদাবাদের এক পরিবেষক ৮ লাখ টাকায় কিনে নিয়েছে। এখানকার রেডিয়েণ্ট পিকচার্স ৫ লাখ টাকায় কিনে নিয়েছে ওয়াদিয়া মুভিটোনের 'পিয়া মিলন'। এখনকার রেকর্ড চল চলরে নওজোয়ানে'র ১৮ লাখ টাকা দাম ছাপিয়ে আরও বেশি টাকাতে পাঞ্চোলীর 'শিরী ফরহাদ' বিক্রী হবার কথা হচ্ছে।

*

নূতন ও আগামী আকর্ষণ

এই শুক্রবার থেকে প্যারাডাইসে নিউ হন্স পিকচার্সের বহুল প্রচারিত 'দ্রৌপদী' মুক্তিলাভ ক'রবে। এই উপলক্ষে পরিচালক বাবুরাও প্যাটেল এবং নায়িকা সুশীলা-রাণী ক'লকাতায় এসে হাজির হ'য়েছেন।

*

এই সপ্তাহে মনোরমা, জহুর রাজা ও সতীশ অভিনীত 'ভাই'ও প্রভাত ও ম্যাজেস্টিকে মুক্তিলাভ ক'রলো।

*

কালিকা থিয়েটার 'অচল প্রেম'এর মহলা নিয়ে ব্যস্ত আছে, আর এদিকে শিশির-কুমার তাঁর পরবর্তী নাটক সুধীর চৌধুরীর লেখা 'তুলসীদাস' মঞ্চস্থ করার আয়োজন ক'রছেন।

ক্রিকেট

বাঙলার ক্রিকেট ইতিহাসে তথা ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় রচিত হইল। ইতিপূর্বে ভারতের কোন বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়ের জন্য "জয়ন্তী উৎসব" অনুষ্ঠিত হয় নাই। মোহনবাগান ক্লাবের কর্তৃপক্ষগণ ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্ববিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় কর্ণেল সি কে নাইডুর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালন করিয়া এক অভিনবত্ব সৃষ্টি করিলেন। ভবিষ্যতে ভারতের অনেক বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়ের জন্য জয়ন্তী উৎসব হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ভারতের আর একজন প্রবীণ ক্রিকেট খেলোয়াড় আছেন যাঁহার জয়ন্তী উৎসব হওয়া একান্তই প্রয়োজন। ইনি সম্প্রতি রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলায় পর পর দুই ইনিংসে শতাধিক রাণ সংগ্রহ করিয়াছেন।

কর্ণেল নাইডুর জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে মোহনবাগান ক্লাব এক তিন দিনব্যাপী ক্রিকেট খেলার আয়োজন করেন। এই খেলায় কর্ণেল নাইডুর দলের সহিত মোহনবাগান ক্লাবের সভাপতি শ্রীযুত জে এন বসুর দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এই খেলা দেখিবার জন্য তিন দিনই



কর্ণেল সি কে নাইডু



সি টি সারভাতে

বিপুল জনসমাগম হয়। জে এন বসুর দলে সিংহলের দুইজন খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় জয়বিক্রম ও শতশিবম যোগদান করেন। ইহা ছাড়া ভারতের একমাত্র ফাস্ট বোলার বিহার ক্রিকেট দলের অধিনায়ক এস ব্যানার্জি জে এন বসুর দলে খেলেন। এই খেলায় ব্যাটিং ও বোলিং উভয় বিষয়েরই উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। দুইটি দলের চারিজন



খেলোয়াড় শতাধিক রাণ করেন। জে এন বসুর দলের পক্ষে এস এস জয়বিক্রম ১২৩ রাণ, কর্ণেল নাইডুর দলের পক্ষে বি বি নিম্বলকার ১৮৬ রাণ, সি টি সারভাতে ১৩৩ রাণ ও মুস্তাক আলী ১০৯ রাণ করেন। বোলিংয়ে নাইডুর দলের সি এস নাইডু দুই ইনিংসের খেলায় মোট ১৫টি উইকেট দখল করিয়া অসাধারণ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন।

প্রথমে জে এন বসুর দল খেলা আরম্ভ করেন ও প্রথম দিনের সমস্ত দিন খেলিয়া ৪৭৩ রাণে প্রথম ইনিংস শেষ করেন। জয়বিক্রম শতাধিক রাণ ও শতশিবম ৫৭ মিনিটে ৮০ রাণ করিয়া দলকে রাণ সংগ্রহ করিতে সাহায্য করেন। সি এস নাইডু একাই ৮টি উইকেট দখল করেন। পরের দিন কর্ণেল নাইডুর দল খেলা আরম্ভ করিয়া ৩২১ রাণে প্রথম ইনিংস শেষ করে। সারভাতে দুর্ভাগ্যবশত দুই রাণের জন্য নিজস্ব শতরাণ পূর্ণ করিতে পারেন না। জে এন বসুর দল প্রথম ইনিংসে ১১৬ রাণে অগ্রগামী থাকিয়া দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করেন। দ্বিতীয় দিনের শেষে ৫ উইকেটে ৮০ রান করেন। তৃতীয় দিনে মধ্যাহ্ন ভোজের পূর্বে জে এন বসুর দলের দ্বিতীয় ইনিংস ১৬৮ রাণে শেষ হয়। একমাত্র শতশিবম ৪২ রাণ করিতে সক্ষম হন। সারভাতে ও সি এস নাইডুর বোলিং এই বিপর্যয় সৃষ্টি করে। কর্ণেল নাইডুর দল ২৮৪ রাণ পশ্চাতে পড়িয়া দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা আরম্ভ করিলেন। প্রথম উইকেট ০ রাণে পড়িল। কিন্তু ইহার পর সারভাতে ও নিম্বলকার ভীষণ পিটাইয়া খেলিয়া একত্রে ১৪৫ মিনিটে ২৯৬ রাণ সংগ্রহ করিলেন। কর্ণেল নাইডুর দল ১ উইকেটে বিজয়ী হইল। ইহারা দুই-জনেই শতাধিক রাণ করিলেন। সময় উত্তীর্ণ না হইয়া যাওয়ায় খেলা চলিতে লাগিল। দিনের শেষে দেখা গেল কর্ণেল নাইডুর দল ৫ উইকেটে ৫২৫ রাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তবে এই সম্পর্কে কতকগুলি কথা না বলিয়া পারা যায় না যে, তৃতীয় দিনের শেষে জে এন বসুর দলের কয়েকজন খেলোয়াড় যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন তাহাতে বাঙলার মুখে চূণকালি লেপণ করা হইয়াছে। তাঁহারা বাঙলার ক্রিকেট পরিচালকগণের নিকট হইতে কোনরূপ শাস্তিমূলক উক্তি পর্যন্ত শুনিলেন না ইহাতে খুবই আশ্চর্য হইতে হয়। নিম্নে খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

খেলার ফলাফল:—

জে এন বসুর দলের প্রথম ইনিংস্ :—৪৩৭ রান (এম সেন ৫৪, শতশিবম্ ৮০, জয়বিক্রম ১২৩, কে ভট্টাচার্য ৪৩, এন চ্যাটার্জি ৩১; সি এস নাইডু ১৩৫*রানে ৮টি, সারভাতে ১২৭ রাণে ১টি উইকেট পান)

কর্ণেল নাইডুর দলের প্রথম ইনিংস্ :—২০১ রান (সারভাতে ৯৮, ভায়া ৮৪, গাইকোয়াড় ৪০, নিম্বলকার ২৯; এস ব্যানার্জি ১২৩ রানে ৩টি, জয়বিক্রম ৩৩ রানে ৩টি, এন চ্যাটার্জি ১৫ রানে ২টি. এম সেন ৪৪ রানে ৩টি উইকেট পান)

জে এন বসুর দলের দ্বিতীয় ইনিংস্ :—১৬৮ রান (এম সেন ৩০, শতশিবম ৪২ এস ব্যানার্জি ২৯; সারভাতে ৫৯ রানে ৪টি,



শতশিবম্



জয়বিক্রম

সি এস নাইডু ৫৯ রানে ৭টি উইকেট পান)

কর্ণেল নাইডুর দলের দ্বিতীয় ইনিংস্ :—৫ উইং ৫২৫ রান (নিম্বলকার ১৮৬, সারভাতে ১৩৩, মুস্তাক আলী ১০৯, সি এস নাইডু ৪৭; এস ব্যানার্জি ৭৪ রানে ১টি, এন চৌধুরী ৪৪ রানে ১টি, মহারাজা ৩৩ রানে ১টি উইকেট পান)



কর্ণেল সি কে নাইডুর "জয়ন্তী উৎসব" ক্রিকেট খেলায় যোগদানকারী খেলোয়াড়গণ

সময়ের প্রসঙ্গ

ইউরোপের পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মানরা নূতন যে আক্রমণ করেছে সে সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে রয়টারের সংবাদদাতারা জানিয়েছেন যে, সমগ্র পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মানরা মিত্রপক্ষের রণ পরিকল্পনা এবং সময়তালিকা ওলট-পালট করে দিয়েছে। এ আক্রমণের খুঁটিনাটি সাফল্যের কথা ছেড়ে দিয়ে জার্মানদের শুধু এই সাফল্যের কথাও যদি বিচার করা যায়, তা'হলেও তার গুরুত্ব খুব কম বলে মনে করবার কোন কারণ নেই। এতে একদিকে যেমন রণক্ষেত্রকে গুছিয়ে নিতে মিত্রপক্ষের অনেক সময় যাবে, তেমনি জার্মানীও আক্রমণের আসন্ন আশঙ্কা থেকে কতকটা দম নেবার সুযোগ পেয়ে অনেকটা গুছিয়ে নেবার সুবিধা পাবে। 'গ্লোবের' সংবাদদাতা জার্মানদের মনোবল সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, জার্মান স্থলবাহিনী এখনও নিয়মানুবর্তী সুসংবদ্ধ সুসজ্জিত এবং সুপরিচালিত এবং সৈন্যদের মনোবল এখনও দৃঢ়। শুধু জার্মান সৈন্যেরাই নয়, এই সংবাদদাতার মতে জার্মানীর ভেতরে জার্মানদের মনোবল সেনা বাহিনীর মনোবল অপেক্ষাও দৃঢ়তর। কারণ নিদারুণ ধ্বংস ও অভাবের মধ্যেও তারা নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে। বিভিন্ন সংবাদদাতার এই সব মন্তব্যের পটভূমিকায় যদি বর্তমান আক্রমণকে খতিয়ে দেখা যায় তা হলে এর দূরপ্রসারী ফল সম্বন্ধে আশঙ্কিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। ঘোষিত সময়ের মধ্যে তারা বেলজিয়াম অধিকার করতে পারেনি বা প্যারিসে ঢুকতে পারেনি এ নিয়ে উল্লসিত না হয়ে তাদের ক্ষুদ্র সাফল্যকেও গুরুত্ব দিয়ে দেখা সমর-নীতির দিক থেকে উচিত হবে বলে মনে হয়। কারণ, বিপক্ষের শক্তিকে ছোট করে দেখে পরিণামে পস্তানোর চেয়ে ছোটকেও বড় করে দেখে এবং তা' প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হয়ে অল্পায়াসে সাফল্য অর্জন করার মধ্যে বুদ্ধির পরিচয় তো থাকেই, স্বস্তিও থাকে। অবশ্য জার্মানীর বর্তমান আক্রমণকে ছোট করে দেখার সংগত কোন কারণ আছে বলে আমরা মনে করি না। প্রায় চার সপ্তাহ হল এই আক্রমণ হয়েছে। কিন্তু এখনও কোথাও উল্লেখ-যোগ্যভাবে এই আক্রমণের গতি রুদ্ধ হয় নাই। এই আক্রমণের ফলে প্যালাটিনেট থেকে মার্কিন সপ্তম আর্মি বিতাড়িত হয়েছে, জার্মানরা স্ট্রাসবুর্গের ১১ মাইল উত্তরে রাইন নদী পার হয়েছে। এবং ভিসেমবুর্গের দক্ষিণে তারা ম্যাজিনো লাইনে প্রবেশ করেছে। পরে আরও জানা গেছে যে, যে জার্মান সৈন্যদল রাইন নদী অতিক্রম করেছিল তাদের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা মন্তব্য করেছেন, জার্মানরা এখানে শক্তি বৃদ্ধি করতে পারলে কার্লসরুয়ের দিকের মার্কিন ত্রিভুজাকৃতি ব্যূহ বিপন্ন হয়ে পড়বে। তিনি আরও বলেছেন যে, এর ফলে ইতিমধ্যেই ফ্রান্সে নূতন আলোড়ন দেখা দিয়েছে। আইসেনহাওয়ারের ৮ই জানুয়ারীর ইস্তাহারে প্রকাশ, স্ট্যাসবুর্গের ২০ মাইল দক্ষিণে আলসাস সমভূমিতে জার্মানরা ট্যাঙ্কের সহায়তায় রাইন-রোন খালের তীর ধরিয়া উত্তরদিকে এগিয়ে যায় এবং ভিতার্ন-হাইম ও ফিজেনহাইম থেকে মার্কিন সৈন্যদের হঠিয়ে দেয়। আলসাসের যুদ্ধ সম্বন্ধে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা বলেছেন যে, এখানে যদি জার্মানরা জয়-লাভ করতে পারে তাহলে তাদের মনোবল একেবারে চরমে উঠবে।

আর্দেনের রণক্ষেত্রে জার্মাণরা আর বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। এখানে আর্দেন স্ফীতিমুখের পূর্ব অংশে ব্রিটিশ সৈন্যেরা দু'হাজার গজের মত এগিয়ে গেছে। আর মার্কিন সৈন্যেরা স্ফীতিমুখের উত্তরাংশে লীরশের আড়াই মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত মারকুরে পেঁৗছেছে।

পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মানী আত্মরক্ষা-মূলক সংগ্রাম করছে বটে, কিন্তু সেখানেও তারা বিস্ময়কর প্রতিরোধ শক্তির পরিচয় দিয়েছে। দীর্ঘ এবং প্রবল আক্রমণের ফলেও বুদাপেস্ত এখনও অধিকৃত হয়নি। দানিয়ুবের তীরে যে ভীষণ যুদ্ধ চলেছে রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতার ভাষায় "সোভিয়েট-জার্মান যুদ্ধের ইতিহাসে এর তুলনা নেই।" জার্মানরা বুদাপেস্তে অবরুদ্ধ বাহিনীর সঙ্গে মিশবার চেষ্টা করছে, আর রুশ বাহিনী অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনার দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে। হাঙ্গারীতে সোভিয়েট বাহিনী এস্তারগম পুনরধিকার করেছে, এবং দানিয়ুবের উত্তরে রুশ সৈন্য জার্মান ব্যূহ ভেদ করে ভিয়েনার পথে নিত্রা নদীর দিকে এগিয়ে চলেছে। নিত্রা নদী অস্ট্রিয়ার সীমান্ত থেকে ৫০ মাইল দূরে অবস্থিত। বুদাপেস্ত শহরের মধ্যেও রুশবাহিনী খানিকটা এগিয়ে গেছে।

ইউরোপের এই উভয় রণক্ষেত্রের অবস্থার ফলে মিত্রপক্ষীয় রণকৌশলেরও পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন হয়েছে। এ সম্বন্ধে রয়টারের সমর সংবাদদাতার নিম্নোক্ত কথাগুলো প্রণিধানযোগ্য—

"পশ্চিম রণক্ষেত্রে মিত্রপক্ষের বিপর্যয়ের ফলে এবং বুদাপেস্তে রুশ অগ্রগতি রুদ্ধ হওয়ার ফলে, তেহেরাণ সম্মেলনে 'যুগপৎ আক্রমণের' যে রণ-পরিকল্পনা স্থির করা হয়েছিল তার পরিবর্তনের সম্ভবনা দেখা যাচ্ছে। তেহেরাণের সামরিক ব্যবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তন খুব শীঘ্রই করা হবে বলে মনে হয়।......এই রদবদলের ফলে সামরিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্র সম্পর্কিত নীতি, বিশেষত সুদিনের সম্ভাবনায় জাপানের বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল—তার পরিবর্তন হতে বাধ্য।"

দীর্ঘকাল যুদ্ধরত এবং বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত জার্মানীর পক্ষে বর্তমান অবস্থায় কোন বড় রকমের সাফল্য লাভ করা সম্ভব হবে না বলেই যদিও সমর পারদর্শীরা অনুমান করছেন, তবুও এই দীর্ঘতর যুদ্ধের সম্ভাবনাও রণক্লান্ত পৃথিবীর কাছে অসহনীয় বলে মনে হচ্ছে।

পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধের এই অবস্থার ফলে প্রাচ্য রণক্ষেত্রে রণনীতির পরিবর্তন আবশ্যক হলেও গত কয়েকদিন ধরে এ অঞ্চলের যে সব সংবাদ পাওয়া গেছে তা প্রায় একটানা সাফল্যেরই সংবাদ। এর মধ্যে বড় রকমের সাফল্য হল মিত্রপক্ষের আকিয়াব দ্বীপ ও শহর অধিকার। গত তিন বৎসর ধরে মিত্রপক্ষ আকিয়াব অধি-কারের চেষ্টা করে আসছেন। কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টা সফল হয়নি। কাজেই এবারের আকিয়াব অধিকারে তাঁদের উল্লসিত হবার কারণ আছে। আকিয়াবে ব্রিটিশ পক্ষের সৈন্যেরা প্রবেশ করবার আগেই জাপানীরা মালপত্র নিয়ে আকিয়াব ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কাজেই আকিয়াব দখলের জন্য কোন যুদ্ধ করতে হয়নি। জাপানীদের হঠাৎ আকিয়াব পরিত্যাগের কারণ কি অনুমান করা শক্ত। তবে ভারতীয় বাহিনী কর্তৃক সোয়েবো দখলের ফলে মান্দালয়ের যুদ্ধ যে আসন্ন তা সহজেই বোঝা যায়। কারণ সোয়েবো মান্দালয় থেকে মাত্র ৫০ মাইল দূরে অবস্থিত। মান্দালয় রক্ষার ব্যবস্থা দৃঢ়তর করা জাপানীদের আকিয়াব ত্যাগের একটা কারণ হতে পারে। যে কারণেই আকিয়াব পরিত্যক্ত হউক, আকিয়াব ত্যাগে জাপানী বিমান কর্তৃক বাঙলাদেশে বোমাবর্ষণের সম্ভাবনা অনের হ্রাস পেল বলে মনে হয়। কারণ এখানে বোমাবর্ষণের আকিয়াবই নিকটতম ঘাঁটি ছিল। কলকাতায় যে বোমা বর্ষিত হয়েছিল তা আকিয়াবের ঘাঁটি থেকেই করা হয়েছিল বলে অনেকে অনুমান করেন।

ফিলিপাইনের যুদ্ধেও মার্কিন বাহিনী মিন্দারো দ্বীপের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত পালুয়ান নামক স্থান অধিকার করেছে এবং লুজান দ্বীপে অবতরণের আয়োজন করছে। ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলা লুজান দ্বীপেই অবস্থিত। এই আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য জাপানীরাও প্রচুর আয়োজন করছে বলে সংবাদদাতারা অনুমান করেছেন। —বিষ্ণুগুপ্ত



[১০]

দীঘির ঘাটে জনসভা। হাজারে হাজারে লোক সেই দুপুরের চন্ড রোদ মাথায় নিয়ে বসেছিল। ধীর স্থির সংযত জনতা, কোন আলোড়ন নেই, উদাস হর্ষের উচ্ছ্বাস নেই, উত্তেজনা নেই, এক বিচিত্র শান্ত মানবতার অংশ। সকল কৌতুহল দুচোখের কোণে চিকচিক করে। সকল আগ্রহ ধীর নিঃশ্বাসের ছন্দে স্পন্দিত হয়, সারা জনতা যেন একটি বিশেষ প্রাণের সূত্রে এসে গাঁথা পড়ে গেছে।

এই বিরাট জনতার কেউ বোধহয় স্পষ্ট করে জানেও না কেন তারা এখানে এল, কি কারণে ও কি উদ্দেশ্যে? তারা শুধু চলে এসেচে দুর্বার এক আহ্বানের ইঙ্গিতে, অজ্ঞাত এক পরিণামের মঙ্গল কুড়িয়ে নিতে। মাত্র দুদিন হ'ল তাদের গাঁয়ে গাঁয়ে সন্ধ্যে সকাল কারা যেন কানে কানে ডেকে গেছে, চুপে চুপে বলে গেছে, আবার কখনও বা মাঝ বাজারে ঢোল পিটিয়ে গর্জন করে গেছে—কাল দুপুরে মান্দার গাঁয়ের দীঘির ঘাটে জনসভা, স্বরাজের লড়াই সুরু হবে।

দুদিন ধরে গাঁয়ের বাতাসে এই প্রশ্নের ঝড় চলেছে—স্বরাজ কি জিনিস? কে লড়বে? কি ভাবে লড়তে হবে? এবং এই স্বরাজ পেলেই বা কি হবে?

সাঁওতাল গাঁয়ের মাঝি মাঝিনরা এক রকম বুঝেছে। স্বরাজ হলে ঐ মঙ্গল দারোগাটা চিরদিনের মত বিদায় নেবে। লকড়ি ভাঙ্গতে গেলে লাঠি নিয়ে তেড়ে আসবে না। শুকনো পাতা কুড়োতে গেলে গ্রেপ্তার করে সদরে চালান দেবার জন্য কোনো ভয়ের দূত ওৎ পেতে আর বসে থাকবে না। রোদ জল বাতাসের মত গাছের পাতা আর কাঠের আগুন তাদের ভোগে সুখে ও তৃপ্তিতে সার্থক হবে। স্বরাজ হবে।

গফুরাবাদের চাষী আর জোলারা লাঠি নামিয়ে চুপ করে বসে আছে, তারা বিশ্বাস করে লাঠালাঠির একঘেয়ে দুঃখ এইবার ঘুচে যাবে। কেউ আর বাঁধের জল রুখতে পাইক বসাবে না। রাতারাতি আল ভেঙ্গে ক্ষেতের মাপ চুরি করবে না। আর মাল-গুজারি দিতে হবে না। এক এক চকে লাগান জমি নিয়ে মনের সুখে লাঙ্গল ঠেলবে সবাই। ধানের বখরা হিসেব কর্তে কোনো রাজাবাবুর সরকার আর আসবে না। যার হাত তার লাঙ্গল, যার লাঙ্গল তার জমি। গফুরাবাদের চাষীরা জানে স্বরাজ হবে।

চাষী জনতার গায়ে তবু দু একটা গামছার আভিজাত্য ছিল। মাতব্বরদের মাথায় মোটা মোটা পাগড়িও ছিল। কিন্তু জোলাদেরই সাজসজ্জার কোন জৌলুষ নেই। ভয়ানক রিক্ততায় ও নিরাভরণে ওরাই সবার চেয়ে বেশী দীন হয়ে পড়েছে। রোগা রোগা রুক্ষ কালো মূর্তি, আদুড় গা, পরনে ছেঁড়া ছেঁড়া গামছা। ঘরের তাঁত ওদের দেহের হাড়ের মতই জিরজিরে, থেকেও নেই। ঐ হাড়ে জীবনকে বহন করা যায় না। তাই জীবন ওদের কাছে বোঝা।

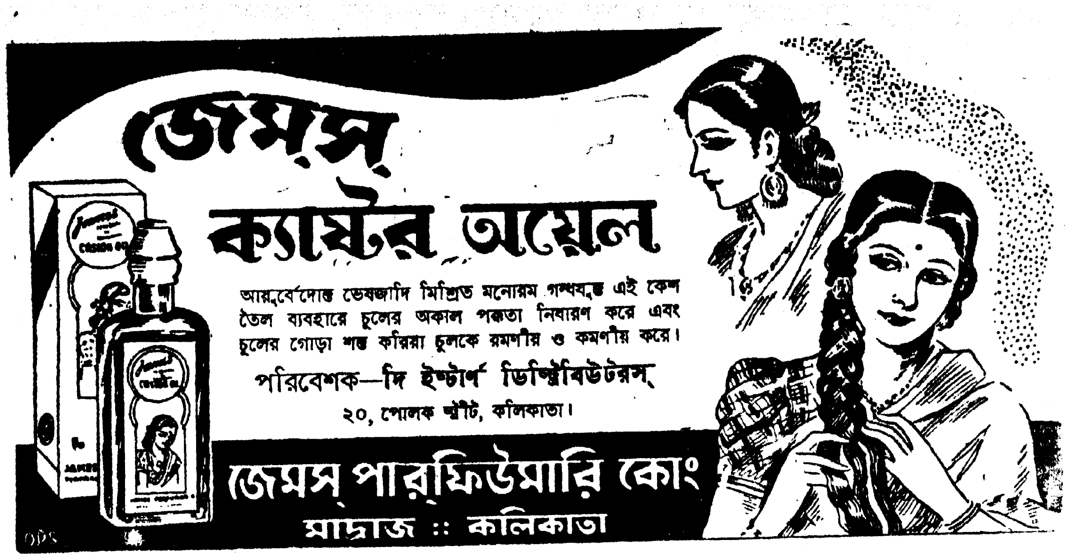
জোলারা জানে তিন চারদিন থেকে তাদের গাঁয়ের ভেতরে ও বাইরে একটা চঞ্চল বার্তা দৌড়ে ফিরে বেড়াচ্ছে। আবার নাকি চরকা ঘুরবে, নাটাই ঘুরবে, মাকু নাচবে। বিলিতী কাপড় বিক্রী বন্ধ করে দিয়েছেন গান্ধী মহারাজ। সারা জীবনের ও সারা যুগের শত্রু সস্তা বিলিতী কাপড়কে ঘরবার করে দিয়েছেন যিনি, কত শক্তিমান তিনি? অনাহারের রাত্রি ভোর হলো এতদিনে। আর হাটের সাধুজীর দুয়ারে গিয়ে ধর্ণা দিতে হবে না, খত লিখে সুতো কিনতে হবে না, সারা মাসের মেহন্নতের সৃষ্টিকে পুঁটুলী-বেঁধে ঐ সানুকারের লুব্ধ হাতদুটির আশ্রয়ে জমা দিতে হবে না। এবার সত্যিই সুদিন আসবে, যারা এতদিন পরকে ঠকিয়ে সুখ করেছে, তারাই মরবে, তারাই সায়েস্তা হবে। এবার জেগে উঠবে তারা, যারা এতদিন শুধু সহ্য করেছে। আবার আসবে সবাই, তাঁতী জোলার দুয়ারে দুয়ারে রাজাগরীব সবাই ঘুরে বেড়াবে, সেধে দাম দিয়ে একখানা কাপড় কিনে ধন্য হয়ে ফিরে যাবে। জোলারা বিশ্বাস করে, এইবার স্বরাজ হবে।

জনসভার মাঝখানে একটা কাঠের মঞ্চ তৈরী করা হয়েছিল। মঞ্চের ওপর যারা বসেছিল, তাদের অনেককেই কেউ চেনে না। গাঁয়ের লোকেরা তাদের জীবনে এই প্রথম দেখলো, তাদের সবারই একরকমের পোষাক, মুটিয়া কাপড়ের জামা গায়ে, মাথায় সাদা কাপড়ের টুপি। তারা কে কোন্ জাতের, হিন্দু না মুসলমান, গরীব না বড়লোক, পণ্ডিত না মূর্খ—এসব কোন খবর রাখে না এই হাজার হাজার গেঁয়ো মানুষের জনতা। তবু আশ্চর্য, তাদেরই দুটি মুখের কথা শুনতে বুকভরা আগ্রহ নিয়ে সবাই বসে আছে স্থির হয়ে। প্রকাণ্ড হ্রদের জলের মত জনতার মূর্তিটা বিনা উচ্ছ্বাসে নিঃশব্দ তরঙ্গের মত মাঝে মাঝে দুলে উঠছিল, দেখবার আগ্রহে। একটী যুবক মঞ্চের ওপর প্রকান্ড একটা ছবি নিয়ে এসে রাখলো, ফুলের মালা জড়িয়ে দিল ছবির গায়ে। হাজার হাজার নরনারী যেন কোন অদৃশ্য সৈনাধ্যক্ষের ইঙ্গিতে এক সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো, বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় তাকিয়ে রইল ছবির দিকে—ঐ গান্ধী মহারাজের মূর্তি।

জীবনে তারা এই প্রথম দেখলো, মহারাজের মূর্তি যে এই রকমের হতে পারে। এ একেবারে নতুন মহারাজা। মাথায় মুকুট নেই, গায়ে মণিমাণিক্য অলংকার নেই, এ রাজা সিংহাসনে বসেন না, হাজার হাজার দুঃখী গ্রাম্য কৃষকের চক্ষু আজ প্রথম দেখলো, ঠিক তাদেরই মত রূপ আর সাজ নিয়ে এই নতুন রাজা দেখা দিয়েছেন। ইনিই স্বরাজ আনবেন। ইনি বন্দুকের গুলীর সামনে হাসতে হাসতে বুক পেতে দেন, ইনি কাউকে আঘাত করেন না, কাউকে হিংসে করেন না। উনি একাধারে ঋষি ও রাজা, পীর ও আমির। এই গান্ধী মহারাজার কথা শোনাতে এসেছে তাঁর শিষ্যেরা। পূজারতির শান্ত আবেশ নিয়ে, নমাজের মত শুদ্ধ সংযম আর নিষ্ঠা নিয়ে জনতা প্রতীক্ষায় বসেছিল।

সভার কাজ আরম্ভ হলো। লক্ষ নরনারীর সকল দুঃখের সমস্যাকে আজ নিকাশ করা হবে। সভায় মঞ্চটী যেন তাদেরই জীবনের এক পরম নাটমঞ্চ। সকল দৈন্য, অপমান ও ক্লেশের পাপকে আজ এই নাটমঞ্চে উচ্চারিত বাণী নিশ্চিহ্ন করবে, সেই সুর জাগছে—ধীরে ধীরে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে শোনা যাচ্ছে।

একটী ছেলে নাটমঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে গান গাইল—জয় জয় জাগ্রত স্বদেশ।


জেমস্
ক্যাষ্টর অয়েল
আয়ুর্বেদোক্ত ভেষজাদি মিশ্রিত মনোরম গন্ধযুক্ত এই কেশ তৈল ব্যবহারে চুলের অকাল পক্কতা নিবারণ করে এবং চুলের গোড়া শক্ত করিয়া চুলকে রমণীয় ও কমণীয় করে।
পরিবেশক—দি ইষ্টার্ণ ডিষ্ট্রিবিউটরস্
২০, পোলক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
জেমস্ পারফিউমারি কোং
মাদ্রাজ :: কলিকাতা


সুস্বাদু ও প্রীতিপ্রদ হতেই হবে...
তবে অবশ্য কর্ম্মশক্তি ও সৃষ্টি করা চাই!
ডাল্‌ডায় এটা নিশ্চয় হয়—আমাদের পরিবারের দিকে চেয়ে দেখুন
প্রত্যেক স্ত্রীলোকের শেখা উচিত কোন্ কোন্ খাদ্য কার্য্যশক্তি সৃষ্টি করতে সব থেকে ভাল। ডাল্‌ডার রান্নার বইতে (শুধু ইংরাজীতে) খাদ্য মূল্য সম্বন্ধে, অনেক দরকারী তথ্য এবং দেশের উপর ভারতীয় পাক-প্রণালী আছে। আপনার একখানা রাখা উচিত। Dept. A308 P.O. Box No. 353, Bombay—এই ঠিকানায় চার আনার ডাক টিকিট পাঠান।
আপনি যখন আপনার পরিবারের জন্য রান্না করেন তখন কি কখনও একথা ভাবেন? খাবার, খেতে ভাল হলেই হবেনা — যারা খাবে তাদের কর্ম্মশক্তি সৃষ্টি করার ক্ষমতাও খাবারের থাকা চাই। কোন্ কোন খাবার বেশী কর্ম্মশক্তি সঞ্চারক, আর অনেক খাবার যা আমরা খুব নিয়মিত খাই সেগুলো এ বিষয়ে বিশেষ ভাল নয়। এটা আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে তত ভাল নয়—বস্তুতঃ যথেষ্ট ক্ষতিকর, বিশেষ করে ছোট ছেলেমেয়েদের পক্ষে। কিন্তু খাদ্যকে অধিকতর কার্য্যশক্তিদায়ক করা কঠিন নয়। একটা উপায় হচ্ছে খাদ্য ভিটামিনযুক্ত ডাল্‌ডা দিয়ে রান্না করা। রান্নার এই যে উপকরণ এতে এমন কতকগুলি জীবন ধারণের পক্ষে দরকারী খাদ্যোপাদান আছে যা প্রকৃতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্যশক্তি সঞ্চারক। এবং আপনি আর কিছু দিয়ে রান্না করে, খাবারকে ডাল্‌ডা যেমন সুস্বাদু করে তার থেকে ভাল করতে পারবেন না। একবার পরীক্ষা করে দেখুন।
The DALDA COOK BOOK
ভিটামিনযুক্ত ডালডা
কার্য্যশক্তির জন্য

গানের সুরটা যেন জনতার ভেতর সাঁতার দিয়ে বেড়াতে লাগলো। এ সংগীতের সব কথার অর্থ বোঝা যায় না, কিন্তু সুরটা বুঝতে দেরী হয় না। একেবারে হৃদয়ের সুর, এক অবনত জীবনের গ্লানি বিরাট এক পুণ্যস্রোতের ছোঁয়ায় ধুয়ে মুছে যাচ্ছে. কঠোর কর্মের পরীক্ষায় সকল বেদনা পুড়ে যাচ্ছে। এত করুণ হয়েও এ গানে হতাশা নেই, এ গানে কোন হুংকার নেই, আছে নির্ভয় আত্মদানের আহবান।

দরবেশ গোছের চেহারা আর একজন উঠে দাঁড়ালেন মঞ্চের ওপর। একটা চারণ সংগীতে গাইলেন। জনতা নিশ্বাস রুদ্ধ করে অকল্প্য এক বেদনার জ্বালা সহ্য করতে লাগলো। দূর পঞ্জাবের এক সহরের কোণে একটি উদ্যান, নাম জালিয়ানওয়ালাবাগ। আজকের এই সভার মতই সেখানে হাজার হাজার নরনারী শিশু স্বরাজের প্রতিজ্ঞা নিতে এক হয়ে বসেছিল। কামান ও বন্দুকের মুখে আগুন ছুটিয়ে প্রার্থনাকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বাগানের গাছে গাছে রক্তের ছিটা লেগেছে। বাগানের মাটীতে এক একটি অসহায় প্রাণ ছিন্নভিন্ন হয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে। পঞ্জাবের শোকের শিখা ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। আহুতির সাড়া পড়েছে দেশময়। দরবেশ গাইছিলেন—আজ তোমাদের সবাকার চিত্তে এই তাপ লাগুক, আহুতির জন্য প্রস্তুত হও। জীবন পণে স্বরাজ নিতে হবে। মৃত্যুকে উপেক্ষা করতে হবে। হিন্দু-মুসলমানের 'বেরাদারী' অটুট হয়ে যাক।

দরবেশের সংগীতের সেই অস্থির শিখার জ্বালা ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল। গানের সুরের গুঞ্জন ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। স্তব্ধ জনসভার মধ্যে আর এক নতুন সুরের গুঞ্জন শোনা গেল, ভোমরার গুণ্ গুণ্ শব্দের মত।

জনতার দৃষ্টি চঞ্চল হয়ে উঠলো। এ আবার কোন্ যাদুকরের যন্ত্রের আওয়াজ ?

মঞ্চের ওপর রোদের মধ্যে চোখমুখ লাল করে একটী অল্প বয়সের মেয়ে চরকা কাটছিল। এই মেয়েটিকে মান্দার গাঁয়ের লোকেরাই শুধু চেনে, সঞ্জীব চাটুয্যের মেয়ে মাধুরী। (ক্রমশ)

"—নিঃসংশয়ে কাজ কর, নির্ভয়ে অগ্রসর হও। নূতন নূতন জ্ঞানের জন্য অনুসন্ধান কর, সত্যের জন্য সংগ্রাম কর, জগতের কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া চিরজীবন লাভ কর। যে স্রোতে পড়িয়াছ, এই স্রোতকেই অবলম্বন করিয়া উন্নতি তীর্থের দিকে ধাবমান হও, নিমগ্ন হইলে লজ্জার কারণ নাই, উত্তীর্ণ হইতে পারিলে তোমাদের জন্ম-লাভ সার্থক হইবে, তোমাদের দুঃখিনী জন্মভূমি ধন্য হইবে।" —রবীন্দ্রনাথ

স্মৃতি

বিমলচন্দ্র ঘোষ

সৃষ্টির সেই প্রথম সকাল থেকে
কত পাখি গেল ডেকে,
কত সূর্যের আলোয় তোমার নাম
অম্লান স্মৃতি-পল্লবে কত যত্নে রেখেছি এ'কে।
তুমি চলে যাও ছায়ায় ছায়ায়
প্রাণে প্রাণে কত মায়া,
বিষাদের মত ম্লান আলোকের
প্রভাতী প্রতিচ্ছায়া।

রাত্রি পোহায়,
সকালেই যেন রাত্রি আসে,
দিবাস্বপ্নের নদীতে স্মৃতির পদ্ম ভাসে;
কল্লোল গানে ক্ষীণ হতে ক্ষীণ তোমারি নাম।
কত পাখি যায় ডেকে॥

দেশী সংবাদ

৩রা জানুয়ারী—আন্তর্জাতিক ব্যবসায় সম্মেলনের ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গের ডেপুটি লীডার শ্রীযুত জি এল মেটা গতকল্য বিমানযোগে কলিকাতায় পৌঁছেন।

কলিকাতার বস্তি অঞ্চলের উন্নতি বিধানের জন্য অদ্য বাঙলা সরকারের উদ্যোগে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে এক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। বাঙলার গবর্নর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

কলিকাতায় নূতন রেশন কার্ড বিলি আরম্ভ হইয়াছে এবং ২৯শে জানুয়ারীর মধ্যে বিলি শেষ হইবে।

নাগপুর হাইকোর্ট যাভলী দাঙ্গা মামলায় ৩৮ জন আসামীকে মুক্তিদানের আদেশ দিয়াছেন। আগস্ট হাঙ্গামা সম্পর্কে এই মামলার উদ্ভব হইয়াছিল।

মিঃ সি সি মিলার পদত্যাগ করায় তাঁহার স্থলে মিঃ জিওফ্রে ডবলিউ টইসিন সি আই ই বাঙলার শ্বেতাঙ্গ নির্বাচন কেন্দ্র হইতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

৪ঠা জানুয়ারী—নাগপুরে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে সমাগত পাঁচশত বৈজ্ঞানিক এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, হিন্দুদের মধ্যে স্ব-গোত্র বিবাহ প্রচলিত হইলে উহা জীব-বিজ্ঞানের দিক হইতে ক্ষতিকর হইবে না।

ঢাকার সংবাদে প্রকাশ, ঢাকার সরকারী গুদামের ৪২ হাজার মণ পচা আটা বিনষ্ট করিয়া ফেলিবার জন্য জেলা ফুড কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন।

৫ই জানুয়ারী—সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রী অর্থ-সচিব মিঃ গজদারকে পদত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

কলিকাতায় নিঃ ভাঃ সঙ্গীত কংগ্রেসের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয়।

মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি বায়ারস কিজহাতিয়ুর বোমা মামলার আপীলের রায় দিয়াছেন। তিনি নিঃ ভাঃ ব্যক্তিস্বাধীনতা সঙ্ঘের বোম্বাই শাখার সেক্রেটারী ডাঃ কে বি মেনন এবং অপর তিনজনকে ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। অপর ১৬ জন আসামী সাত বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

৬ই জানুয়ারী—বিগত দুর্ভিক্ষ প্রসূত ব্যাপক আর্থিক দুর্গতির ফলে বাঙলায় নারী ও শিশু বিক্রয়ের পাপ ব্যবসা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ায় যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আলোচনার জন্য শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর সভানেতৃত্বে কলিকাতায় এক বিরাট জনসভার অনুষ্ঠান হয়।

শ্রমিকনেতা এবং বর্তমানে নিরাপত্তা রক্ষার্থে আটক বন্দী শ্রীযুত আর এস রুইকরের পরিজনগণের মাসিক ভাতা গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে মাসিক ষাট হইতে সত্তর টাকা বাড়াইতে প্রাদেশিক গবর্নমেণ্ট মঞ্জুর করিয়াছেন।

কলিকাতার অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট ভারতরক্ষা আইনানুসারে ১৫০ রীম ফুলস্কেপ কাগজ প্রতি রীম নিয়ন্ত্রিত মূল্য সাড়ে চারি টাকার স্থলে ১৩৸০ করিয়া বিক্রয় করিয়া অতিরিক্ত মুনাফা করার অভিযোগে শ্রীযুত কেবলচাঁদ দাগা এবং শ্রীযুত অমরনাথ বসুকে যথাক্রমে ৫০ হাজার ও ২৫ হাজার টাকা করিয়া অর্থদণ্ড, অনাদায়ে ৮ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিবার আদেশ দিয়াছেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ

বজবজে বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইসেন্সিয়েট কনফারেন্সের একাদশ অধিবেশন হয়। ডাক্তার অমূল্যধন মুখার্জি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

৭ই জানুয়ারী—অদ্য অপরাহ্নে যাদবপুর কলেজ প্রাঙ্গণে বঙ্গীয় জাতীয় শিল্প পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন।

কলিকাতায় মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে এক জনসভায় শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু "ইসলামের আদর্শ" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন।

টিটাগড়ে মোমিন (আনসার) সম্মেলনের অধিবেশন হয়। মিঃ আব্দুল করিম আনসারী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

স্বামী রামলক্ষ্মণ নামক একজন যোগী গতকল্য অপরাহ্নে দিল্লীতে ডালমিয়া নিবাসের প্রাঙ্গণে এক চতুষ্কোণ গর্তে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। ১৬ ঘণ্টা পরে অদ্য তাঁহাকে বাহির করা হয়। গর্তের উপর হইতে মাটি সরান হইলে তাঁহাকে উপবিষ্ট, কিন্তু অজ্ঞান অবস্থায় দেখা যায় এবং মাথায় বরফ দেওয়ার পর তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসে।

৮ই জানুয়ারী—সিন্ধুর মন্ত্রী মিঃ এম এইচ গজদার পদত্যাগ করিয়াছেন এবং গবর্নর তাঁহার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

মুসৌরী এবং দার্জিলিংয়ে প্রবল তুষারপাত হইয়াছে।

ভূতপূর্ব কাকোরী মামলার বন্দী এবং নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদস্য শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল চার বৎসর কারারুদ্ধ থাকিবার পর গতকল্য ফতেগড় সেণ্ট্রাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

বাঙলা গবর্নমেণ্ট কলিকাতা কর্পোরেশনের অধীন ভ্যাক্সিনেশন সার্ভিস এবং এস্টাব্লিসমেণ্টের (টীকা বিভাগ) পরিচালনা ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

৯ই জানুয়ারী—পাঞ্জাবের রাজস্বসচিব স্যার ছুট্যুরাম পরলোকগমন করিয়াছেন।

চট্টগ্রামের এক সংবাদে প্রকাশ, চট্টগ্রামে ধান্য এবং চাউলের দর বৃদ্ধি পাইতেছে। তিন সপ্তাহ পূর্বে যে চাউল আট টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেছিল, এখন তাহা কুড়ি টাকা মণ দরে বিক্রয় হইতেছে।

বিদেশী সংবাদ

৩রা জানুয়ারী—ব্রহ্ম—বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যরা আকিয়াব বন্দরে অবতরণ করিয়া আকিয়াব বন্দর দখল করিয়াছে।

৪ঠা জানুয়ারী—জাপ সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের সংবাদে প্রকাশ যে, বিশেষজ্ঞ নগর-পরিকল্পনাকারীরা বিমান আক্রমণের ক্ষতি এড়াইবার জন্য ভূনিম্নে নূতন টোকিও নগরী নির্মাণের এক পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং ইতিমধ্যেই তদনুসারে কার্য আরম্ভ হইয়াছে।

ওয়াশিংটনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মার্কিন রাষ্ট্রসচিব মিঃ স্টেটিনিয়াস বলেন, "ইতালীতে সরবরাহ প্রেরণ সম্পর্কে যে আলোচনা চলিতেছে তাহাতে বৃটিশের সহিত আমাদের কোন বড় রকমের মতানৈক্য ঘটে নাই।"

মার্কিন সাংবাদিক ড্রু পিয়ার্সন নিউইয়র্ক ডেলী মিরার' পত্রিকায় একটি গুপ্ত দলিল প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। ইতালীতে খাদ্য যোগান সম্পর্কে বৃটেন ও মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের তীব্র মতভেদের বর্ণনা করিয়া বৃটিশ রাজদূত লর্ড হ্যালিফাক্স মার্কিণ পররাষ্ট্র দপ্তরে এই দলিলখানি পেশ করেন। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, বৃটেন ইতালীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য সরবরাহ বৃদ্ধির পরিকল্পনা বিরোধিতা করিতেছে।

৫ই জানুয়ারী—গ্রীস—জেনারেল প্লাসটিরাস গঠিত নূতন গবর্নমেণ্ট আর্কবিশপ দামাস্কিনোসের সম্মুখে শপথ গ্রহণ করেন।

সোভিয়েট গবর্নমেণ্ট পোলিশ লুবলিন গবর্নমেণ্টকে অনুমোদন করিয়াছেন।

৬ই জানুয়ারী—পশ্চিম রণাঙ্গন—জার্মানরা সমগ্র পশ্চিম রণাঙ্গনে মিত্রপক্ষের রণপরিকল্পনা বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। জার্মানরা পালাতিনেট হইতে মার্কিন ৭ম আর্মিকে বিতাড়িত করিয়াছে এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার সংযোগস্থল বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

মার্কিন কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে প্রেরিত একটি নববর্ষের বাণীতে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে, ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইউরোপে নাৎসী প্রতিরোধের অবসান হইতে পারে।

৭ই জানুয়ারী—গ্রীস—গতকল্য রাত্রে এথেন্স ও পিরাউস সম্পূর্ণরূপে এলাস মুক্ত হইয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগর—মিত্রপক্ষের রণতরীবহর ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের প্রধান দ্বীপ লুজনের পশ্চিম উপকূলে লিঙ্গায়েন উপসাগরে প্রবেশ করিয়াছে এবং উপকূলভাগে গোলাবর্ষণ করিতেছে।

পূর্ব রণাঙ্গন—বুদাপেস্টের পূর্ব উপকণ্ঠের অধিকাংশ সোভিয়েটের হাতে আসিয়াছে। জার্মানরা বুদাপেস্টের রাস্তায় রাস্তায় আগুন ধরাইয়া দেয়।

প্রশান্ত মহাসাগর—আমেরিকানরা মিন্দারো দ্বীপে পল্জিয়ান দখল করিয়াছে।

৮ই জানুয়ারী—ব্রহ্ম রণাঙ্গনে ভারতীয় বাহিনী সোয়েবো দখল করিয়াছে। সোয়েবো মান্দালয়ের পথে শেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং উহা মান্দালয় হইতে ৫০ মাইল দূরে অবস্থিত।

পশ্চিম রণাঙ্গন—ডিসেমবুর্গের দক্ষিণে জার্মানরা ম্যাজিনো লাইন ভেদ করিয়াছে।

হাঙ্গেরীতে সোভিয়েট বাহিনী এস্তারগম পুনরধিকার করিয়াছে।

৯ই জানুয়ারী—পূর্ব রণাঙ্গন—বুদাপেস্টের প্রবেশপথগুলি দখল করিবার যুদ্ধে জার্মাণরা প্রচুর পরিমাণে ট্যাঙ্ক ও পদাতিক সৈন্য নিয়োগ করিয়াছে।

পশ্চিম রণাঙ্গন—আর্দেন রণাঙ্গনের, উত্তরাংশে ফিল্ড মার্শাল রুণ্ডস্টেডটের সৈন্যদল আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামে ব্যাপৃত আছে।

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট যুদ্ধকালীন চতুর্থ বাজেট পেশ করেন। তিনি বাজেটে আগামী বৎসরের জন্য ৮ হাজার ৩ শত কোটি ডলার ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছেন। যুদ্ধের জন্য ব্যয় হইবে প্রায় ৭ হাজার কোটি ডলারে।

দেশ

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন — সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

১২ বর্ষ ৷ শনিবার, ৭ই মাঘ, ১৩৫১ সাল। Saturday, 20th January, 1945 [১১শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ

ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ গত ১৪ই জানুয়ারী ভারত গভর্নমেণ্টের আদেশে আমেদনগর বন্দিশালা হইতে বিনাসর্তে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে যে সরকারী ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট ভাষাতেই একথা বলা হইয়াছে যে, তাঁহার পীড়ার উপসর্গগুলি হ্রাস না পাওয়াতে এবং সম্প্রতি অন্য এক পীড়ার



জন্য তাঁহার অস্ত্রোপচার হওয়াতে গভর্নমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তাঁহাকে আটক রাখার আর কোন প্রয়োজন নাই। ডক্টর সৈয়দ মামুদকে যদি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যস্বরূপে গ্রহণ করা যায়, তবে এ পর্যন্ত গভর্নমেণ্ট ওয়ার্কিং কমিটির তিনজন সদস্যকে মুক্তিদান করিলেন। বলা বাহুল্য, এইরূপ মুক্তিদানের সঙ্গে ভারতের রাজনীতিক সমস্যা সমাধানের জন্য ব্রিটিশ মন্ত্রিমণ্ডলের বা ভারত গভর্নমেণ্টের আগ্রহের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। সেদিন মিঃ হেরাল্ড ল্যাস্কি সমগ্র ভারতবর্ষকে বিরাট কারাগার বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, যতদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ না করিবে, ততদিন পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতাকামী সন্তানগণের লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের অবসান ঘটিবে না। কিছুদিনের নিমিত্ত একটি কারাগারের দ্বার তাঁহাদের জন্য উন্মুক্ত হইলেও তাহাদিগকে পুনরায় অপর কারাগারে গিয়া প্রবেশ করিতে হইবে। ডক্টর ঘোষ বঙ্গের স্বদেশপ্রেমিক এবং বীর সন্তান। আমরা তাঁহাকে সশ্রদ্ধভাবে অভিনন্দিত করিতেছি এবং ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি নিরাময় হইয়া দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে নবীন প্রেরণা দান করুন।

বুনিয়াদী শিক্ষা

সেবাগ্রামে বুনিয়াদী শিক্ষা-সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গেল। এই সম্মেলনে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতির শিক্ষক, পরিচালক ও অনুরাগিবৃন্দ যোগদান করেন। শারীরিক অসুস্থতা ও তজ্জন্য মৌনব্রত অবলম্বন করা সত্ত্বেও মহাত্মা গান্ধী এই সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন। সম্মেলনের সভাপতি ডাঃ জাকির হোসেন তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনা সম্বন্ধে গভর্নমেণ্টের নীতি যেরূপই হোক না কেন, জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হোক্ বা না হোক, সর্বভারতীয় ভিত্তিতে এই সব শিক্ষা-পরিকল্পনা সার্থক করিয়া তুলিতে তাঁহারা কৃতসঙ্কল্প। সভায় গত ১৯৩৭ হইতে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত সাত বৎসরের বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার কার্যের ফলাফল আলোচনা করা হয়। বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতি মহাত্মা গান্ধীর পরিকল্পনা। কেবল রাজনীতিক বিষয়েই নহে, শিক্ষা, সমাজ, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়েও মহাত্মা গান্ধী গভীরভাবে চিন্তা করেন। তাঁহার এই চিন্তাধারা যেমনই অভিনব, তেমনই বিপ্লবী মনের পরিচায়ক। এদেশে আবকারি বিভাগের আয় শিক্ষা ব্যাপারে নিয়োগ করা হইয়া থাকে। বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইলে, মাদকদ্রব্য বর্জন সম্পর্কে দেশবাসীকে সচেতন করাও এই মন্ত্রিমণ্ডলের কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইল। তাহাতে আবকারি বিভাগের আয়ের ঘাটতির ফলে শিক্ষা ব্যাপারে সরকারী ব্যয়-নির্বাহে সমস্যা দেখা দিল। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের দৃষ্টিতে দেশে মাদকদ্রব্যের অবাধ প্রচলন করিয়া প্রকারান্তরে দুর্নীতির বিস্তারের পোষকতা করিয়া শিক্ষা বিস্তারের নীতি বেদনাদায়ক ও অসঙ্গত পন্থা বলিয়া বিবেচিত হয়। শিক্ষার ব্যয়-নির্বাহের এই সমস্যার সমাধানকল্পে মহাত্মা গান্ধী বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনা উদ্ভাবন করেন। এই শিক্ষা পদ্ধতির বিশেষত্ব এই যে, ইহা পুঁথিগত শিক্ষা নয়, এই শিক্ষারীতি অনুসারে মানুষের হাত ও মন একই সঙ্গে কাজ করে। এই পরিকল্পনা অনুসারে মুখ্যত কোন শিল্পবস্তুকে অবলম্বন করিয়া শিক্ষার সূচনা হয়। যে কোন শিল্পবস্তু সম্বন্ধে শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার উৎপত্তি, ইতিহাস ও তৎসংক্রান্ত ভৌগোলিক ও অর্থনীতিক দিক সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। আক্ষরিক শিক্ষাও চলে ইহার পাশাপাশি। ইহাতে শিক্ষা কেবল মগজের ভারস্বরূপ হইয়া পড়ে না, হাতের কাজে শিক্ষা লাভ করিয়া আনন্দ ও আর্থিক সাহায্য একসঙ্গে দুই-ই লাভ হয়।

বনিয়াদী শিক্ষা ও সরকারী মনোভাব

মহাত্মা গান্ধীর এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিনিধিগণের গত সাত বৎসরের যে অভিজ্ঞতা ও কার্যক্রমের বিবরণ জানা যায়, তাহা হইতে মনে হয় নানা প্রতিকূলতা ও অসুবিধা সত্ত্বেও এই শিক্ষা পরিকল্পনা ক্রমশ উন্নতি ও প্রসার লাভ করিতেছে এবং ইহার সঙ্গে গ্রামোদ্যোগ, চরকা, কুটির শিল্প ইত্যাদি যেরূপ অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত তাহাতে এই শিক্ষা-পদ্ধতি ভারতের পল্লী-জীবনের যথার্থ কল্যাণ সাধনে প্রযুক্ত হইয়াছে। যে শিক্ষা ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া এতগুলি হিত-সাধন সম্ভবপর হইতে পারে, তাহার উপযোগিতা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা যে প্রচুর এবং তাহার পরিকল্পনা যে একটি বিস্তৃত পটভূমিকাকে আশ্রয় করিয়া করা হইয়াছে, তাহা সহজেই বোঝা যায়। তৎসত্ত্বেও সরকারী অনমনীয় মনোবৃত্তি যে এই শিক্ষা-পরিকল্পনা গ্রহণে অগ্রসর হইবে, তাহা কেহ আশা করে না। কিন্তু এ অবস্থারও পরিবর্তন ঘটিবে; এ সম্বন্ধে আমরাও মহাত্মা গান্ধীর কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছি:—

"আজ যাঁহারা নয়ী তালিমের প্রতি অবজ্ঞা দেখাইতেছেন, অবশেষে তাঁহারাই ইহার একান্ত অনুরাগী হইয়া উঠিবেন এবং নয়ী তালিম সর্বজনগ্রাহ্য হইবে। আমাদের সাত লক্ষ গ্রাম আজ সকল দিক দিয়াই দারিদ্র্যের প্রতীক- ঐগুলিকে যথার্থ সমৃদ্ধিশালী করিয়া তোলা উচিত। এই সমৃদ্ধি বাহির হইতে আসিবে না; প্রতি গ্রামবাসীর শ্রমের দ্বারাই গ্রামগুলি সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে।"

ভারতের নারী

এদেশের অনেকের ধারণা, সামাজিক মর্যাদা ও অধিকারের দিক দিয়া ভারতীয় নারীদের স্থান পাশ্চাত্য নারীদের অপেক্ষা অনেক নীচে। অনেক ইংরেজ ও আমেরিকা-বাসী লেখকের পুস্তকে ভারতীয় নারীগণের বিকৃত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ইহাতে বহুদিন হইতেই পাশ্চাত্য দেশ-সমূহের যে সব ব্যক্তির ভারতের সম্বন্ধে কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নাই, তাঁহাদের মনে ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে। ভারতের সম্পর্কে যাঁহারা এইরূপে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন, সম্প্রতি "ভারতীয় নারী-সমাজ" সম্বন্ধে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু যে বক্তৃতা দান করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের ভ্রান্তির নিরসন হইবে। তিনি বলিয়াছেন, মানব-জাতির প্রগতির অর্ধেক দায়িত্ব নারীদের উপরই নির্ভর করে। এদেশে অনেকের ধারণা, ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পর হইতেই এদেশের নারীগণের জাগরণের সূত্রপাত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে আমরা ইহার বিপরীত কথাই জানিতে পারি। কি সাহিত্যে, কি শিল্পে, কি উচ্চ চিন্তার ক্ষেত্রে ভারতীয় নারী যখন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়াছে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তখনও, সভ্যতার জন্ম হয় নাই, কিংবা তখন সেসব দেশে সভ্যতার শৈশব অবস্থা। সুপ্রাচীনকাল হইতেই ভারত নারীকে দেশ ও সমাজের শক্তিরূপিনী বলিয়া মনে করে। অবশ্য একথা অস্বীকার করা চলে না যে,—মর্যাদার দিক দিয়া নয়,—শিক্ষা ও সামাজিক সমস্যার দিক দিয়া ভারতীয় নারীদের পূর্ব গৌরব কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়। সমাজের নানা স্তরে এখনও অনেক কুপ্রথা অচলায়তনের মত দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং নারী জাতির কল্যাণ-সাধনে তাহার উচ্ছেদ সাধন যে অবশ্য কর্তব্য, ইহাও স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু পাশ্চাত্যের অধিবাসীরা নারীর সমস্ত জড়তা ভাঙিয়া দিয়া সহচরীরূপে পাইতে উৎসাহী বটে, কিন্তু রাজনীতিক ব্যাপারে নারীকে সমানাধিকার দিতে তাহারা এখনও দ্বিধা বোধ করিয়া থাকে। এ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্তা নাইডু তাঁহার বক্তৃতায় ইংলণ্ডে নারীদের ভোটাধিকার আন্দোলন-কালের একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী লর্ড এস্‌কুইথ নারীগণের ভোটাধিকারের বিরুদ্ধতা করিয়া বলেন যে, নারীরা ভোটাধিকার পাইলে তাহারা স্বভাবসুলভ কোমলতা হারাইয়া পুরুষোচিত কঠোরতা লাভ করিবে। অথচ এদেশে ভোটাধিকারের জন্য নারীদের কোনরূপ আন্দোলন করিতে হয় নাই। এদেশে রাজনীতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে— অনেক নারী পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী, ডেপুটি স্পীকার ও আইন সভার সদস্য হইয়াছেন। ভারত চিরকালই নারীকে কল্যাণী মূর্তিতে দেখিয়াছে। কাজেই নারীকে যথাযোগ্য অধিকার দানে কোথাও তাহার স্বার্থবোধ জাগ্রত ও পীড়িত হয় নাই।

স্বায়ত্তশাসনের প্রহসন

কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড ইত্যাদি কতকগুলি স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ভার গভর্নমেণ্ট এদেশবাসীর হস্তে অর্পণ করিয়া পরাধীন এবং হয়ত সেইহেতুই নাবালক ও অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত দেশবাসীকে স্বায়ত্তশাসন ব্যাপারে হাতেখড়ি দেওয়াইতেছেন। কিন্তু এই নামে-মাত্র স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা ব্যবস্থার উপরও সরকারী হস্ত মাঝে মাঝে অকস্মাৎ যেরূপ অবিবেচনা প্রসূত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে প্রযুক্ত হয়, তাহাতে এই সব প্রতিষ্ঠান পরিচালনাধিকার যে স্বায়ত্ত তাহা ভুলিয়া যাইতে হয়। গভর্নমেণ্টের এইরূপ হস্তক্ষেপে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং তাহার ফলে কার্যে ব্যাঘাত ঘটে। সম্প্রতি পাবলিক হেলথ জরুরী অর্ডিন্যান্স জারি করিয়া বাঙলা সরকার কর্পোরেশনের টিকা দেওয়ার বিভাগের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করায় এইরূপ একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। সেদিন কর্পোরেশনের সভায় কর্পোরেশনের অধিকারে এই সরকারী হস্তক্ষেপের নিন্দা করা হইয়াছে। সভার বিবরণে প্রকাশ, মিউনিসিপ্যাল আইনের ১৬ ধারা অনুসারে বাঙলা সরকার কর্পোরেশনকে বাধ্যতামূলক টিকাদানের জন্য নোটিশ দেন। ইহার পর জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর কর্পোরেশনের হেলথ্ অফিসারের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং টিকা-দানের ব্যবস্থা পরিদর্শন করেন। গত ৩রা জানুয়ারী কর্পোরেশন বাঙলা সরকারের জন-স্বাস্থ্য বিভাগের সেক্রেটারির নিকট একটি পরিকল্পনা দাখিল করেন। এই পরিকল্পনা সম্পর্কে কোনরূপ সরকারী মতামত পাওয়ার পূর্বেই কর্পোরেশনের উপর পূর্বোক্তরূপ অর্ডিন্যান্স জারি হয়। বসন্ত রোগ প্রতিরোধকল্পে টিকা-দান অবশ্য ও আশু কর্তব্য, এসম্বন্ধে আমাদের দ্বিমত নাই। কর্পোরেশনের সব কিছু ব্যবস্থাই আমরা নির্বিচারে সমর্থন করি না। কিন্তু এ প্রসঙ্গে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, ইতিপূর্বে কলিকাতায় বসন্ত রোগের প্রকোপ যেরূপ ভয়াবহভাবে দেখা দিয়াছে, এবার কি অবস্থা তাহা অপেক্ষাও গুরুতর? যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে এই অতিরিক্ত সরকারী উৎসাহের কারণ কি? বিশেষত কর্পোরেশনের সহিত যে আলোচনা হইতেছিল, তাহার মাঝখানে এবং কর্পোরেশনের টিকা-দান সম্পর্কে কার্যাবলী সন্তোষজনক কি না, তৎসম্পর্কে কোন হিসাবপত্র গ্রহণ না করিয়াই বা কর্পোরেশনের অধিকারে এইরূপ সরকারী ক্ষমতা প্রয়োগের হেতু কি? এরূপ ক্ষেত্রে সদস্যগণের ও দেশবাসীর মধ্যে এইরূপ ধারণার সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয় যে, টিকা-দানের ব্যাপার একটা অছিলা মাত্র, আসলে গভর্নমেণ্ট সমগ্রভাবেই কর্পোরেশনের পরিচালনাভার কুক্ষিগত করিতে চাহেন। এরূপ সংশয়ের উদ্ভব হইলে এবং আমাদের অন্যান্য প্রশ্নের উত্তরে গভর্নমেণ্টের বক্তব্য কি, তাহা দেশবাসী জানিতে চাহিতে পারে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এক ইউরোপীয় দল ছাড়া কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি সমস্ত দলের সদস্যগণই বিক্ষুব্ধ হইয়া এই সরকারী হস্তক্ষেপের নিন্দাবাদ করিয়াছেন। আমরা এ প্রসঙ্গে গভর্নমেণ্টকে বিশেষ বিবেচনা প্রসূত কার্যনীতি অবলম্বন করিতে —অন্যথায় বিক্ষোভ — হইবে মাত্র।



গৃহলক্ষ্মী
(লিথো প্রিন্ট)
শ্রীনন্দিতা কৃপালানি

পল্লী-প্রাঙ্গণ
(লিথো প্রিন্ট)
শ্রীঅজিতকেশরী রায়



অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য

কলিকাতার লর্ড বিশপ রেভারেণ্ড ডক্টর ফস ওয়েস্টকট কিছুদিন আগে একটি বক্তৃতায় ঐক্য প্রতিষ্ঠার উপর জোর দিয়াছেন। কলিকাতার ওয়াই এম সি হলে বক্তৃতায় তিনি বলেন—

এক যিনি তিনিই বহু হইয়াছেন। ঐক্যের ভিতর দিয়া বহুত্বকে উপলব্ধিই মানবজীবনের মূলনীতি এবং বিশ্ব প্রকৃতির মূলেও সেই একই সত্য নিহিত রহিয়াছে। জীবনের সম্বন্ধে এই সত্য দৃষ্টি লাভ করিলে বহুত্বের মধ্যে ভেদ বা অনৈক্য সত্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না, ঐক্য এবং অভেদই দেখা যাইবে। তখন বোঝা যাইবে, বিভিন্ন জাতি এবং সমাজ স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া মানব-সমাজকে সমগ্র-ভাবেই সমৃদ্ধ করিতেছে। আমরা ইহাই চাই যে, বাঙালী তাহার জাতিগত বৈশিষ্ট্যগুলিতে সমৃদ্ধ হউক। সব খাঁটি বাঙালী হোক। পাঞ্জাবী খাঁটি পাঞ্জাবী হোক। এই ভাবে সমগ্রভাবে ভারতের সংস্কৃতির সমৃদ্ধি ঘটুক। আমরা সেই দিনের অপেক্ষা করিতেছি, যে দিন জগতের বিভিন্ন জাতি এইভাবে নিজেদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য-গুলি সুগঠিত করিয়া সমগ্রভাবে বিশ্ব মানব-সমাজের সেবার যোগ্যতা লাভ করিবে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে এইরূপ ঐক্য লাভ করিবার উদ্দেশ্যেই বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘ পরিকল্পিত হয়; কিন্তু শুধু কতকগুলি বিধান কোন প্রতিষ্ঠানকে প্রাণ দিতে পারে না; এই দিক হইতে ত্রুটির জন্যই বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

আমাদের মনে আছে, রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-রাষ্ট্র সঙ্ঘকে "দস্যু-সঙ্ঘ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের মূলে যে আদর্শ ছিল, সঙ্ঘের নিয়ামকগণ তাহার বিপরীত পথেই কাজ করিয়াছেন। ঐক্যের পথে তাঁহারা চলেন নাই, বরং বিভেদ সৃষ্টির পথেই পরিচালিত হইয়াছেন।

শোষণ প্রবৃত্তির স্বরূপ

শাসনের পথে অপর জাতিকে শোষণ করিবার প্রবৃত্তিই ইহার মূলে রহিয়াছে। শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত আমেরিকার সাংবাদিকদের নিকট সম্প্রতি এ সম্বন্ধে বলেন—

"বর্তমান বিশ্ববিধানে অধীন দেশের স্থান নাই। জাতি এবং বর্ণনির্বিশেষে সকলের অধিকার স্বীকৃতির পথেই শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে। আমরা ভারতে এই বর্ণবৈষম্যের ভাবটা তীব্রভাবে উপলব্ধি করিয়া থাকি। শ্বেতাঙ্গ জাতিরা বর্ণবৈষম্যের জন্য কৃষ্ণকায় প্রাচ্য জাতিসমূহকে ঘৃণা করে। এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়া জাপানীরা তাহাদের প্রচার-কার্যে জোর পাইতেছে। তাহারা এই দাবী করিতেছে যে, জাপানীরা এশিয়ার মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিতেছে। সুতরাং আজ পাশ্চাত্য জাতিসমূহের পক্ষে আগাইয়া গিয়া এই কথা বলা উচিত যে, যুদ্ধের পর বিভিন্ন জাতির সমাধিকার স্বীকৃতিকেই তাহারা যুদ্ধের আদর্শস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছে।"

শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রীও সেদিন মাদ্রাজ শহরের একটি সভায় বিশ্বশান্তি সমস্যায়

দেশের কথা

এই বর্ণবৈষম্যের গুরুত্বের উপর জোর দিয়াছেন। তিনি বলেন—

"জগতের শ্বেতাঙ্গ জাতিরা এখনও গর্বের সঙ্গে এই দাবী করে যে, তাহাদের গাত্রবর্ণের জন্য বিধাতার নিকট হইতে অপর জাতিকে তাহাদের স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিবার এবং তাহাদের অভিভাবকস্বরূপে তাহাদিগকে শাসন করিবার অধিকার তাহারা লাভ করিয়াছে। এই উদ্ভট এবং উৎকট বিশ্বাসকে চিরদিনের জন্য লোপ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমাদের দেশের আদর্শপ্রাণ পুরুষদের সাধনার প্রয়োজন আছে। বর্তমানে এই বর্ণবৈষম্য জগতের পক্ষে অন্যতম দুরপনেয় কলঙ্ক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই ব্যাপারে আমাদিগকে এক হইয়া দাঁড়াইতে হইবে এবং এই পাপের অবসান ঘটাইতে হইবে।

শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের আশা খুবই ভাল; কিন্তু রাষ্ট্রীয় শক্তি ব্যতীত এই সব আদর্শ-বাদের কোন যুক্তিই টিকে না। দুর্বলের প্রতি প্রবলের মনোভাবে অনুকম্পার ছাপ থাকিয়াই যায় এবং সেজন্য ব্যবহারেও বৈষম্য স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। আমরা জানি, ইংরেজ এবং মার্কিন রাজনীতিকগণ এক-সঙ্গে বলিবেন যে, তাঁহাদের সমরাদর্শে বিশ্বমানবের সাম্য ও স্বাধীনতা সম্পূর্ণ-রূপেই স্বীকৃত হইয়াছে এবং বর্ণবৈষম্যের কোন স্থান তাহাতে নাই।

শ্বেতাঙ্গ প্রভুত্বের প্রচেষ্টা

আমেরিকার আন্তর্জাতিক প্যাসিফিক রিলেসন্স কনফারেন্সে এসিয়াবাসী সম্পর্কে বর্ণবৈষম্যের প্রশ্ন লইয়া দস্তুরমত একটা বিতর্ক ঘটে। ব্রিটিশ প্রতিনিধিগণ এক্ষেত্রে তাঁহাদের মামুলী যুক্তি উপস্থিত করেন। তাঁহারা বলেন মালয়, চীন এবং ভারতবাসীদের মধ্যে জটিল মতানৈক্যের জন্যই সেখানকার রাজনৈতিক অবস্থার বর্তমানে প্রতিকার সাধন করা সম্ভব হইতেছে না। অর্থাৎ এ সম্পর্কে শ্বেতাঙ্গগণ নিতান্তই সাধুপুরুষ। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপার কি? ভারতবাসীদিগকে সে কথা নূতন করিয়া বলিতে হইবে না। ট্রান্সভাল ভারতীয় কংগ্রেস কর্তৃক প্রদত্ত একটি ভোজসভায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিদায়ী হাইকমিশনার স্যার সাফায়াৎ আহাম্মদ খান এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলেন—

"১৯২০ সাল পর্যন্ত ট্রান্সভাল প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে অন্যান্য অধিবাসীদের সম্পর্ক প্রীতিকর ছিল বলা চলে; কিন্তু তাহার পর হইতেই ভারতীয় বিদ্বেষের একটা ঢেউ উঠিতে আরম্ভ করে এবং তদবধি অবিশ্রান্ত গতিতে এখানে ভারত-বিদ্বেষী আইন প্রবর্তনের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। গত বৎসর নাটালে পর পর তিনটি অর্ডিন্যান্স প্রবর্তনে ইহার চরম পরিণতি দেখা যায়। এইসব আইন ট্রান্সভালের ভারতীয় প্রজাদের মৌলিক অধিকার হরণ করিয়া লইয়াছে। এই ধরণের আইনগুলি যতদিন বলবৎ থাকিবে, ততদিন ভারতীয়দের ভাগ্য একেবারে নৈরাশ্যজনক। ব্যবসাসের লাইসেন্স বন্ধ করিয়া দেওয়া হইলে ভারতীয়রা কি করিয়া বাঁচিবে?"

কেনিয়ার নূতন উদ্যম

দক্ষিণ আফ্রিকার ঢেউ দেখিতেছি কেনিয়াতেও গিয়া লাগিয়াছে। 'ডেলী হেরাল্ড' পত্রের বৈদেশিক সম্পাদক মিঃ উইলিয়ম টাউলার লিখিতেছেন—

"কেনিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে সহযোগিতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে এক সম্মেলন আহূত হইতেছে। এজন্য জেনারেল স্মাটসকে কেনিয়াতে যাইতে অনুরোধ করা হইয়াছে। প্রস্তাবটি কেনিয়ার শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরা কেনিয়া ব্যবস্থা পরিষদের মারফতে করিয়াছেন; এজন্য ইহাতে স্বভাবতঃই সন্দেহের উদ্রেক হইতে পারে। পূর্ব আফ্রিকার দেশীয় অধিবাসীদের উন্নতি সাধনের গরজ লইয়া যে এমন প্রস্তাব করা হয় নাই, এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি। দক্ষিণ আফ্রিকার বাসিন্দা কৃষ্ণকায়দিগকে চিরদিন পরাধীন করিয়া রাখিয়া শ্বেতাঙ্গদের জন্য সুবিধা আদায় করাই আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদের সর্বকালীন নীতি। এই কারণেই কেনিয়াতে ফিল্ড মার্শাল স্মাটসকে প্রয়োজন হইয়াছে। বিশ্ববিশ্রুত রাজনীতিবিদ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি থাকিলেও জেনারেল স্মাটস্ বর্ণ-বৈষম্যমূলক নীতির সমর্থক; এই নীতির শেষ উদ্দেশ্য হইল এই যে, প্রয়োজন হইলে বাহির হইতে শ্বেতাঙ্গদিগকে আমদানী করিয়া আফ্রিকাবাসীদিগকে দাবাইয়া রাখিতে হইবে। কেনিয়াবাসী শ্বেতাঙ্গদেরও এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হইবে, অতীত ও বর্তমানের শোষণ ব্যবস্থা-সমূহ ভবিষ্যতের জন্য আরও সুদৃঢ় করা।"

অথচ এই জেনারেল স্মাটসই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের একজন ধারক, বাহক ও সমর্থক এবং ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, মিত্র-পক্ষের অন্যান্য শক্তিগণ এক্ষেত্রে ব্রিটিশের নীতিতেই কার্যত সায় যোগাইয়া চলিতেছেন।

মার্কিনের সাম্যের আদর্শ

কাজে যাহাই হোক্ বোলচালে ত্রুটি নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট মিঃ রুজভেল্টের বাণী উল্লেখ করা যাইতে পারে। গত ৬ই জানুয়ারী মিঃ রুজভেল্ট মার্কিন রাষ্ট্রসভার নিকট তাঁহার প্রদত্ত অভিভাষণে বলেন—

পৃথিবীর জনসাধারণ আজ চায় স্বাধীনতা, তাহারা শান্তি চায়; কিন্তু জনগণের প্রার্থিত এই শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সহজ নয়। আমরা যদি মনে করি যে, আমাদের শত্রুরা অস্ত্র সমর্পণ করিলেই এই শান্তি আমাদের লভ্য হইবে, তবে আমাদের পক্ষে গুরুতর ভ্রম হইবে। আমাদের

শত্রুবর্গের এইভাবে বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে প্রথম এবং আবশ্যক সোপানই হইতে পারে; কিন্তু স্থায়ী শান্তি জনগণের সহযোগিতা ব্যতীত প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। একথা ভুলিলে চলিবে না, ব্যক্তির মত জাতিরও স্বতন্ত্র দৃষ্টি আছে। সব ব্যক্তি যেমন একরূপ চিন্তা করে না, সেইরূপ সব জাতিও একরূপ ভাবে না বা সেভাবে চলে না; এরূপ ক্ষেত্রে কোন জাতি যদি শক্তিমদে উন্মত্ত হইয়া মনে করে যে, অপরের সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার অধিকার শুধু তাহারই একচেটিয়া তবে তাহাতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং উন্নতির সাহায্য হয় না। বিশ্বরাজনীতিতে শক্তির একটা মূল্য আছে, আমরা ইহা অস্বীকার করিতে পারি না, জাতির রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে যেমন শক্তির মূল্য আছে, সেইরূপ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তাহা রহিয়াছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক জগতে এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শক্তি মানব কল্যাণের দায়িত্ববোধে নিয়মিত হওয়া প্রয়োজন।

কথাগুলি খুবই ভাল, সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মিত্রশক্তির নীতি এই আদর্শে পরিচালিত হইতেছে কি?

ব্রিটিশের সামরিক লক্ষ্য

নয়াদিল্লী হইতে প্রকাশিত "কনট্যাক্ট" পত্রে মিঃ জেমারী বি নামক একজন মার্কিন রাজনীতিক লেখকের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে লেখক ব্রিটিশের বিভিন্ন দল—সংরক্ষণশীল, উদারনীতিক এবং সোসিয়ালিস্ট, মোটামুটি ইঁহাদের সামরিক লক্ষ্য কি, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন—

'যুদ্ধে জয়লাভ করাই ইঁহাদের সকলের প্রথম লক্ষ্য; দ্বিতীয়ত ইঁহারা সাম্রাজ্যকে অক্ষুন্ন রাখিতে চাহেন এবং সাম্রাজ্য-স্বার্থকে সুদৃঢ় করিবার জন্য ইঁহারা আগ্রহপরায়ণ। তৃতীয়ত ইঁহারা জগতের সর্বত্র ব্রিটিশের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে উৎসুক; কারণ ইঁহাদের বিশ্বাস এই যে, ব্রিটিশের যেমন প্রভাব শুধু যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষেই মঙ্গলকর ইহা নয়, সমগ্র জগতের পক্ষেই তাহা কল্যাণকর।

এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের একটি সুচিন্তিত যুক্তির কথা আমাদের মনে পড়ে। "রাও বিলের" আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, আমরা অনেকেই—যাহা বিশ্বাস করিতে আমাদের ভাল লাগে, তাহাই বিশ্বাস করি; আমাদের সে বিশ্বাস ভিত্তিহীন হইলেও আমরা ততটা তলাইয়া দেখি না; পক্ষান্তরে যদি কেহ সেক্ষেত্রে আমাদের ভুল দেখাইতে চেষ্টা করে, আমরা উত্তেজিত হইয়া পড়ি। বিশ্ব-জগতে ব্রিটিশ প্রভাব অক্ষুন্ন রাখিবার মনোবৃত্তির মূলে সূক্ষ্মগতিতে এই স্বার্থ-প্রবৃত্তিই কাজ করিতেছে।

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর নীতি

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিলের নীতিতে সাম্রাজ্যবাদের দুষ্পূরণীয় প্রবৃত্তিই উগ্র আকারে ফুটিয়া উঠিতেছে। প্রসিদ্ধ মার্কিন সাংবাদিক মিঃ ড্রু পিয়ারসন কয়েকটি গোপন দলিল প্রকাশ করিয়া সম্প্রতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের চক্ষুশূলে হইয়া পড়িয়াছেন। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী গ্রীসের ব্রিটিশ সেনাধ্যক্ষ জেনারেল স্কোবির নিকট যে আদেশ প্রেরণ করেন, ইটালীর মার্কিন দূত মার্কিন গবর্ণমেণ্টকে তাহা তারযোগে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। মিঃ পিয়ারসন এই তারেরও বিবরণ সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন। মিঃ চার্চিল কর্তৃক জেনারেল স্কোবির নিকট প্রদত্ত নির্দেশে দেখা যায়,—

চার্চিল বলেন, গুলী চালাইবার সময় এলাস দল নারী এবং শিশুদিগকে সম্মুখে রাখিতে পারে। স্কোবিকে এক্ষেত্রে চাতুর্যের সঙ্গে কাজ করিতে বলা হয় এবং বলা হয়, তিনি যেন এবিষয়ে কোন ভুল না করেন। স্কোবিকে আরও নির্দেশ দান করা হয় যে, গ্রীসের রাজধানীতে যদি কোন সশস্ত্র ব্যক্তি ব্রিটিশের কর্তৃত্বে বাধা দেয় কিংবা যাহারা ব্রিটিশের সহযোগিতা করিতেছে, তাহাদিগকে আক্রমণ করে, তবে তিনি যেন তাহার উপর গুলী চালাইতে কোনরূপ ইতস্তত না করেন। তিনি যেন মনে করেন যে, ব্রিটিশের অধিকৃত একটি শহরে তিনি স্থানীয় বিদ্রোহীদের সম্মুখীন হইয়াছেন। মিঃ চার্চিল বলেন, স্কোবির অধীনে যে সেনাদল আছে, তাহাদের সাহায্যে তিনি এলাস দলকে এরূপ শিক্ষা দিতে সমর্থ হইবেন বলিয়া মিঃ চার্চিল বিশ্বাস করেন যাহাতে অন্য কেহ এলাসদের মত কাজ করিতে সাহসী হইবে না। উপসংহারে চার্চিল ইহাও জানান যে, স্কোবি তাঁহার নির্দেশ অনুসারে যাহা কিছু করিবেন, চার্চিল তাহাতেই তাঁহাকে সমর্থন করিবেন। এথেন্স শহরটি ব্রিটিশের হাতে রাখিতেই হইবে এবং সেখানে ব্রিটিশ প্রভুত্বও অক্ষুন্ন রাখিতে হইবে।

মিঃ রুজভেল্টের বাণী এক্ষেত্রে কতটা রক্ষিত হইতেছে ভাবিবার বিষয়। শক্তির সঙ্গে জনমতের সহযোগিতা লাভ করিতে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর কতখানি আগ্রহ, গ্রীসের ব্যাপারে আমরা তাহার কিছু পরিচয় পাইতেছি। যুদ্ধের পরে এই ধরণের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যদি প্রভাব বিস্তার করে, তবে অধীন জাতিসমূহের পক্ষে ভবিষ্যতের কি আশা থাকিতে পারে?

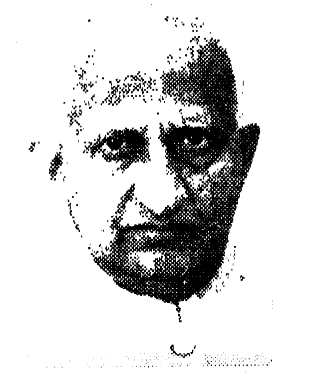
কথা নহে কাজ

সেদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু ভারতবর্ষের জাতীয় গভর্নমেণ্ট ও স্বাধীনতার স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি ছাত্র-সমাজকে সম্বোধন করিয়া বলেন—

আমরা সকলেই বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের অবস্থার মধ্যে বাস করিতেছি। যুদ্ধের পরে বিভিন্ন দেশের অবস্থা কি হইবে? বৃহৎ শক্তি বলিয়া যে সকল দেশকে অভিহিত করা হয়, তাহাদের মনোভাবই বা কিরূপ দাঁড়াইবে, এইসব প্রশ্ন আমাদের মনে স্বভাবতই দেখা দেয়। আমাদিগকে কি যুদ্ধের পর বৃহৎ শক্তিসমূহের হুকুম তামিল করিয়াই চলিতে হইবে, অথবা ইহার পর মানব-মুক্তির যেসব পরিকল্পনা হইবে, তৎসম্বন্ধে আমাদের কোন কথা বলিবার সত্যই অধিকার থাকিবে? আমি বলিব, এক্ষেত্রে মতামত দান করিবার অধিকার আমাদের থাকা চাই-ই; কারণ তাহা মানব-সমাজের প্রত্যেক অংশের প্রতিই প্রযোজ্য হওয়া আবশ্যক। ঐসব অধিকার ভারতের প্রতিও যখন প্রযোজ্য হইবে, তখন তৎসম্বন্ধে এখন হইতেই আমাদিগকে অবহিত হইতে হইবে এবং তজ্জন্য নিজেদের মধ্যে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

এ সম্বন্ধে চিন্তা করিলে বিভিন্ন দলের মধ্যে আপোষ-নিষ্পত্তি সূত্রে একটি গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার কথাই মনে উঠিবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জনগণের স্বার্থবোধে সমষ্টির চেতনাই জাতীয় গভর্নমেণ্টের প্রকৃত ভিত্তি-স্বরূপে কাজ করিতে পারে। শ্রীযুক্তা নাইডু তাঁহার বক্তৃতায় এ বিষয়টি উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন—

কংগ্রেস, হিন্দুসভা এবং মহম্মদ আলী জিন্না সকলেই জাতীয় গভর্নমেণ্টের কথা চিন্তা



করিয়া থাকেন। লর্ড ওয়াভেলও জাতীয় গভর্নমেণ্টের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে দেশের পক্ষে যাহা কিছু কল্যাণকর তদনুযায়ী পদাধিষ্ঠিত মন্ত্রীরা তাঁহাদের শাসন-নীতি পরিচালনা করিবেন, জাতীয় গভর্নমেণ্ট বলিতে ইহাই বুঝায়; কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে প্রশ্ন থাকিয়া যায় এই যে, কোন্ ভিত্তির উপর তাঁহারা জাতীয় গভর্নমেণ্ট পরিচালনা করিবেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অনৈক্য, অবিশ্বাস, এমন কি সামাজিক ক্ষেত্রেও পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে অনিচ্ছা—এই অবস্থার মধ্যে তাঁহারা ভারতবর্ষের জন্য কিভাবে জাতীয় গভর্নমেণ্ট গঠন করিয়া তুলিবেন? এরূপ অবস্থায় তরুণদিগকেই আগাইয়া আসিতে হইবে। সর্বপ্রকার সংকীর্ণতা ও অন্ধতার বিরুদ্ধে তাহাদিগকে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইবে এবং তাহাদিগকেই ঐক্য ও মিলনের অগ্রদূত হইতে হইবে। তাহারা যদি মানবসুলভ সহানুভূতি লইয়া পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে পারে, তবে ভারতের রাষ্ট্রনীতিক সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব।

প্রকৃতপক্ষে জাতীয় গভর্নমেণ্ট, এই কথাটির ভিতর কিছু নাই। স্বাধীন দেশে জাতীয় গভর্নমেণ্টের দৃষ্টিভঙ্গীও জাতীয়তা অর্থে স্বার্থ এবং সংকীর্ণতার দ্বারা দূষিত হইতে পারে; কিন্তু পরাধীন দেশকে বিজেতৃ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া যেখানে জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়,

সেখানে জাতীয়তার দৃষ্টি স্বভাবতঃই মানবতার সংবেদন প্রভাবে আত্মাবদানের ঐকান্তিকতার পথে সম্প্রসারিত হয় এবং বৃহত্তর মানব-সমাজের অভ্যুন্নতির মূলে মোটামুটিভাবে সাহায্য করিয়া থাকে। শাসনতন্ত্রের সাময়িক কোন নির্দিষ্ট আকার বা গঠনের চেয়ে জনগণের প্রতি সহানুভূতির গতি, সেখানে শাসনতন্ত্রকে সুদৃঢ় করে। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাইয়ের সঙ্গে নবাবজাদা লিয়াকৎ আলীর আলোচনার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিছুদিন হইল এই আলোচনা লইয়া খুবই গবেষণা হইয়াছে। ফলতঃ যদি জনগণের শক্তির সম্বন্ধে শাসকদের চেতনা এতদ্বারা জাগে, তবে ইহা কিছুটা সাফল্যলাভ করিতে পারে নতুবা ইহাতে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ভারত সম্পর্কিত নীতির পরিবর্তন ঘটিবে বা লর্ড ওয়াভেলের কৃপায় আমরা কেন্দ্রে বা প্রদেশগুলিতে হিন্দু-মুসলমান সমান অংশে বাঁটোয়ারার জোরেও প্রকৃত কোন অধিকার লাভ করিব, আমরা ইহা মনে করি না। দেখিতেছি, বিলাতি রাজনীতিক মহলে যুদ্ধোত্তর ভারতের সম্বন্ধে ইতিমধ্যে এই দিক হইতেই চিন্তা দেখা দিয়াছে। সম্প্রতি লণ্ডনের একটি সভায় ভারতের ভবিষ্যৎ পুনর্গঠন সম্বন্ধে বক্তৃতা-কালে ভারতের ভূতপূর্ব অর্থসচিব লর্ড হেলি বলেন—

যুদ্ধের পর ভারতের সেনাদলগুলিকে ভাঙ্গিয়া দিলে একটা সমস্যা দেখা দিবে। ইহারা জীবনের সঙ্গে নূতন আশা ও আকাঙ্ক্ষা এবং জীবনযাত্রার উন্নততর মান লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিবে। ইহাদের দৃষ্টি নূতন হইবে। আমরা যদি ইহাদিগকে প্রকৃতভাবে সাহায্য করিতে পারি, তবে ইহারা আমাদের সহায়ক হইবে। যদি আমরা তাহা না পারি, তবে ইহাদিগকে লইয়া আমাদিগকে সমস্যায় পতিত হইতে হইবে; কারণ ইহাদের মধ্যে অসন্তোষ বিস্তার লাভ করিবে এবং তাহা অশান্তির কারণ সৃষ্টি করিবে।

দেখিতেছি বৃটিশ রাজনীতিকগণ ভবিষ্যতের এই সংকট হইতে নিজেদের স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখিবার উদ্দেশ্যে ভারতের রাজনীতিক সমস্যার বিষয় চাপা দিয়া অর্থ-নীতিক উন্নতির জন্য অশ্রুবর্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু মনিবগিরির মহিমায় স্বাধীনতার প্রেরণায় জাগ্রত জাতিকে শান্ত রাখা সম্ভব নয়; সুতরাং সে চেষ্টায় তেমন কিছু সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না।

দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন

স্বার্থের দায়ই রাজনীতিক চিন্তাধারাকে নিয়মিত করিয়া থাকে এবং সে প্রয়োজনের চাপে অনুদারও ক্ষেত্রবিশেষে উদারনীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। যুদ্ধের চাপে পড়িয়া নিজেদের স্বার্থ রক্ষারই দায়ে আমেরিকা নিগ্রোদের সম্বন্ধে উদারনীতি অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আমেরিকার এসোসিয়েটেড নিগ্রো প্রেসের লণ্ডনস্থ সম্পাদক মিঃ ডানবার সম্প্রতি লিখিয়াছেনঃ—

"আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় বর্তমান জীবনের সকল ক্ষেত্রে নিগ্রোদিগকে তাহাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও নানারকম সুবিধা দিতে বাধ্য হইতেছে। ইহার পূর্বে শ্বেতাঙ্গগণ নিগ্রো-দিগকে কোনদিনই এরূপ দৃষ্টিতে দেখে নাই। বর্তমানে নিগ্রোরা একটা রাজনীতিক মর্যাদা এবং রাষ্ট্র ব্যাপারে কিছু ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে তাহারা অত্যধিক সংখ্যায় উঁচু চাকরী পাইতেছে। অনুমান ১৫ লক্ষ নিগ্রো যুদ্ধসম্পর্কিত শিল্পবাণিজ্যে ব্যাপৃত আছে এবং দুই হাজারের অধিক নিগ্রো কণ্ডাক্টর, বাস ড্রাইভার প্রভৃতির কাজ করিতেছে।"

অবশ্য ইহা বড় রকমের কিছু নয় এবং এই দৃষ্টি যে স্থায়ী হইবে, ইহাও বলা যায় না। কার্য প্রয়োজনেই নিগ্রোদের সম্বন্ধে এমন নজর দেখা যাইতেছে। বর্তমানে ব্রিটিশ জাতিকে মার্কিনের হাতের মুঠার মধ্যে থাকিয়া চলিতে হইতেছে। মার্কিন জাতির এই দৃষ্টি পাছে ভারতের সম্পর্কে সম্প্রসারিত হয় এবং স্বার্থ প্রয়োজনের দিক হইতে সাময়িকভাবেও তাহাতে ব্রিটিশের উপর চাপ পড়ে, এজন্য ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট বহু পূর্ব হইতে চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরুদ্ধে মার্কিনে জোর প্রচারকার্য চলিতেছে, সে সম্বন্ধে আমরা সকলেই কিছু কিছু খবর রাখি। সম্প্রতি দেওয়ান চমনলাল আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। এই প্রচারকার্যের সম্বন্ধে তিনি বলেন,—

আমেরিকায় ভারত বিদ্বেষী প্রচারকার্যের জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট বৎসরে ৬ কোটি এবং ভারত গভর্নমেণ্ট ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে-ছেন। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত দশ হাজার বেতনভোগী কর্মচারী এই প্রচারকার্যে-রত আছে। গ্রেট ব্রিটেনে মুদ্রিত পাকিস্থানী ইস্তাহারসমূহ উড়ো জাহাজযোগে আমেরিকায় লইয়া গিয়া সেখানে চতুর্দিকে প্রচার করা হইতেছে।

এই দুই শক্তিই সাম্রাজ্যবাদী; ইহার উপর আবার রাশিয়া রহিয়াছে। মিঃ সি এন জুৎসী ব্রিটিশ এবং মার্কিনদের সম্বন্ধে রাশিয়ার দৃষ্টিভঙ্গীর আলোচনা করিতে গিয়া একটি প্রবন্ধে সম্প্রতি লিখিয়াছেন,—

ঐতিহাসিক একটা বিপ্লবের ঢেউ উঠিতেছে এবং ঘটনাচক্র সেইদিকেই যাইতেছে। রাশিয়া সমগ্র ইউরোপের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার মতলব লইয়া চলিতেছে। স্ট্যালিন এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, বার্লিনের উপর লাল পতাকা উড়িবে; কই তিনি তো মিত্রশক্তির পতাকার কথা বলিলেন না। ইরাণের তেলের ব্যাপারও পাকিয়া উঠিতেছে। ইহার পর রাশিয়া যদি ভারতের প্রশ্ন এবং নিগ্রোদের সমস্যা তোলে তবে ব্রিটেন এবং মার্কিনের পক্ষে জবাব দেওয়া কঠিন হইবে। ব্রিটেন এবং আমেরিকার সম্মুখে অদূর ভবিষ্যতে কিরূপ প্রশ্ন দেখা দিতে পারে; এইগুলি দ্বারা তাহার কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে।

সুতরাং শান্তি কোথায়? যতদিন পর্যন্ত জগতের দুর্বল জাতিসমূহ নিজেরা শক্তি-শালী হইতে না পারিবে, ততদিন প্রবলের গৃধ্নুতা হইতে তাহাদের নিস্তার নাই। অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য দেখিবার মত সুবুদ্ধি জগতে বিশেষভাবে পশুবল প্রমত্ত পাশ্চাত্য জাতিসমূহের পক্ষে এখনও স্বাভাবিক হয় নাই।

পাপের শাস্তি

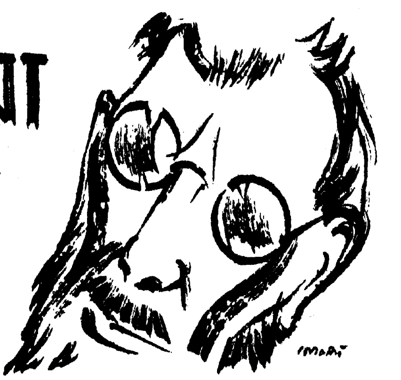
প্রকৃতপক্ষে দুর্বলতাই সবচেয়ে বড় পাপ এবং পরাধীনতা জাতিগত দুর্বলতারই ফল। জগতে এই পাপ বিদ্যমান থাকিতে শান্তি হইতে পারে না এবং ঐক্য বা সাম্যও সম্ভব নয়। পরাধীনের দুর্বলতা প্রবল শক্তির মনে প্রভেদ এবং অনৈক্য ও অপ্রত্যয় বাড়াইয়া দেয়। সম্প্রতি পাটনার 'সার্চলাইট' পত্রে গোরক্ষপুরের বিশিষ্ট কংগ্রেস-নেতা শ্রীযুত শিব্বানলালের মামলা সম্পর্কে যুক্ত-প্রদেশের ডেপুটি ইন্সপেক্টর-জেনারেল মিঃ সি পি লাকের একখানা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি তাঁহার স্ত্রীর কাছে এই পত্রে লিখিতেছেন—

কংগ্রেসীদলের বিখ্যাত বিদ্রোহী শিব্বানলাল শকসেনাকে আমরা কিছুদিন হইতে পাকড়াও করার চেষ্টা করিতেছিলাম। জনৈক গ্রাম্য মাতব্বর মহারাজগঞ্জের নিকট গতকল্য তাহাকে ধরাইয়া দিয়াছে। ইহাতে অসম্ভব রকমের স্বস্তিবোধ করিতেছি। এই লোকটাই এরিক মসকে হত্যা করার চেষ্টা করিতেছিল। আজ সকালে ৭-৩০ মিঃ হইতে ৯-৪৫ মিঃ পর্যন্ত আমি জেলে তাহার সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়াছি। বিহার এবং এখানে অন্যান্য জেলায় যে সকল হাঙ্গামা হইয়াছে এই শূয়ার তাহার কিছুই জানে না বলিয়া ভাণ করিতেছে। পুলিস অফিসারদের জ্যান্ত পোড়াইয়া মারা প্রভৃতি ধরণের কতকগুলি মারাত্মক ঘটনার কথা তাহাকে বলিলাম। ইতরটা কয়েক ফোঁটা মেকি চোখের জল ফেলিয়া বলিল—কংগ্রেস পতাকা ইহাতে কালিমালিপ্ত হইল, গান্ধীজী ইহা শুনিলে নিশ্চয়ই অনুশোচনায় কৃচ্ছ্র সাধন করিবেন। এই পাজী শূয়ারটা নিজেই অনেকগুলি নৃশংস কার্য করিয়াছে। এইসব কংগ্রেসী দেশপ্রেমিকদের ভণ্ডামীটা একেবারেই অসহ্য। যেসব গোলযোগ ও ক্ষতি হইয়াছে, সেজন্য লোকটা আদৌ দুঃখিত নয়। আরও ক্ষতি করার আগেই সে ধরা পড়িয়াছে, এইজনাই তাহার দুঃখ। উহার সেলের মধ্যেই আমি উহাকে প্রায় মারিয়া ফেলিয়াছিলাম।"

শ্রীযুত শিব্বানলালের মামলা সম্বন্ধে আমরা কোন কথা বলিতে চাহি না; তাঁহার প্রতি মিঃ লাকের ব্যবহারও এদেশের পুলিশের ইতিহাসে একেবারে নূতন কিছুই নয়; কিন্তু কংগ্রেস এবং মহাত্মাজীর প্রতি মিঃ লাকের মনোভাব এক্ষেত্রে লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রবল জাতি মাত্রেই পরাধীন জাতির লোকদিগকে অনেক ক্ষেত্রেই এইরূপ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে এবং এই দৃষ্টি ব্রিটিশ ও ভারতবাসীর মধ্যে বিরোধের ভাব দৃঢ় করিয়া তুলিতেছে। জগতের দুর্বল জাতিসমূহ স্বাধীনতা না পাইলে শুধু নৈতিক আদর্শের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে এই দৃষ্টির অনিষ্ট-কারিতা হইতে জগৎ মুক্ত হইবে না।

ভাঙা চশমা

নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়



মফঃস্বল শহরে ষাট টাকা মাইনের স্কুল মাস্টারী। তার সঙ্গে কুড়ি টাকা করে দুটো ট্যুশনি। মোট তা হলে দাঁড়ালো একশো টাকা। একজন ফার্স্ট ক্লাস এম এ'র জীবনে চূড়ান্ত আর্থিক পরিণতি। উচ্চাকাঙ্ক্ষার চতুর্বর্গ।

কন্ট্রোল আর কালোবাজার। ইনফ্লেশন। রেশন কার্ডের অবরুদ্ধ অঞ্জলি দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় যা চুঁইয়ে পড়ে তাতে চিঁড়ে ভেজে না। অণুর মুখ আষাঢ়ের মেঘের মতো অন্ধকার। বাইরের ঝড় ঝাপটা যদিবা সহ্য হয়, প্রেয়সীর অপ্রসন্ন মুখ দেখে বাণপ্রস্থ নিতে ইচ্ছে করে। কয়েকবারই ভেবেছি কা তব কান্তা বলে, একদিন যাত্রা করব হরিদ্বারের পথে। কিন্তু দার্জিলিং মেলের হ্যাণ্ডেলে দোদুল্যমান অবস্থা দেখে বৈরাগ্য ছাড়িয়ে নির্বেদ আসে। সন্ন্যাস নেওয়াটা শক্ত নয়, কিন্তু ট্রেনে কাটা পড়ে অপঘাত মৃত্যুটা কেমন যেন লোভনীয় বলে মনে হয় না।

স্কুল মাস্টার আমরা—ভাবী যুগের দেশনেতা, সমাজনেতা,—অথবা হয়তো বুদ্ধ চৈতন্যের মতো মহামানবেরাই আমাদের মন্ত্রবাণীতে লালিত হয়ে উঠছে। বুনো রামনাথের মতো তেঁতুল পাতার ঝোল খেয়েই অবশ্য আমাদের মতো জ্ঞানতপস্বী আচার্যের খুশি হয়ে থাকা উচিত—কিন্তু দেখলাম কিছুতেই মানসিক প্রশান্তির ওই স্তরটাতে নামা যাচ্ছে না। বিশেষ করে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মতো লর্ড ওয়াভেল এসে একদা আমার অনুপপত্তির সন্ধান নেবার জন্য পনেরো টাকা ভাড়ার এই টিনের চালায় পদার্পণ করবেন—এতখানি আশাবাদী হওয়াও শক্ত। সুতরাং দিক্‌বিদিক্‌ লক্ষ্য না করেই মস্ত একটা ঝাঁপ দিলাম। যুদ্ধের বাজার মানেই তো স্পেকুলেশন। অতএব—

অতএব টিঁকে যাই তো ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, নতুবা পুনর্মূষিক। 'ত্বয়া হৃষীকেশ'—শাস্ত্রের শাঁসবাক্য তথা সারবাক্য উচ্চারণ করে নিজেকে উদ্বুদ্ধ করলাম।

ব্যাপারটা আর একটু স্পষ্ট করা দরকার। শহরের একজন বিশিষ্ট নাগরিকের মৃত্যুতে প্রথম ঘণ্টার পরেই স্কুল ছুটি হয়ে গেল। ছেলেরা তাদের উদগ্র শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করবার জন্যে কেউ কেউ তৎক্ষণাৎ পেয়ারা গাছে উঠল, কেউ কেউ ক্রিকেট নামিয়ে স্কুলের মাঠে পিটোতে সুরু করলে, আবার দল বেঁধে জনকয়েক যাত্রা করলে শহরের বাইরে ডাঁসা কুলের সন্ধানে। আর আমরা টীচার্স রুমে বসে চীনে বাদাম আর সিগারেট সহযোগে অবিলম্বে বর্তমান যুদ্ধটা শেষ করে দেবার জন্যে একটা অত্যন্ত জরুরী খসড়া তৈরী করতে লেগে গেলাম।

এমন সময়ে অকুস্থলে হেড্ মাস্টারের প্রবেশ। পরম বৈষ্ণব লোক—গলায় কণ্ঠি। সেক্রেটারীর বাড়িতে খোল বাজিয়ে নাম-কীর্তন করেন। অত্যন্ত বিনয়ী, ছেলেদের বেত মারবার আগে সনিশ্বাসে বলেন, কৃষ্ণের জীবের ওপর কৃষ্ণের কাজ করতে হবে—কৃষ্ণের ইচ্ছা। দপ্তরী বলে, ও'র বেতের সঙ্গে নাকি সুতো দিয়ে তুলসী পাতা বাঁধা আছে।



অণু পাশে থাকলে

হেড্ মাস্টার ঘরে ঢুকলেন হাতে একখানা ছাপানো চিঠি নিয়ে। বললেন, একটা খবর আছে আপনাদের জন্যে। দেখুন, কৃষ্ণের ইচ্ছেয় কারো কারো হয়তো সুবিধে হয়ে যেতে পারে।

জার্মানীকে আপাতত বিপন্ন রেখে আমরা এক সঙ্গেই চিঠিখানার ওপরে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। রোমাঞ্চিত হওয়ার মতো খবরই বটে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জানাচ্ছেন গ্রামে গ্রামে রিলিফ ওয়ার্ক করবার জন্যে সাব-ডেপুটি গ্রেডের কয়েকজন অফিসার নিয়োগ করা হবে। আমাদেরই নাকি প্রেফারেন্স দেওয়া হবে সর্বাগ্রে। যদিও অস্থায়ী চাকরী, তবুও যদি কেউ ইচ্ছুক থাকেন, তা হলে হেড্ মাস্টারের মনোনয়ন অনুসারে—

স্কুল মাস্টারের বরাতেও শিকে ছেঁড়ে তা হলে। অতএব উকিল বন্ধুর কাছ থেকে ধার করা প্যাণ্টালুন আর বেমানান কোট পরে ইণ্টারভিউ দিয়ে এলাম। এবং বললে আপনারা হয়তো বিশ্বাস করবেন না —চাকরী হয়ে গেল। বারোয়ারী কালী পাঁচশিকের ভোগ পেলেন আর অণু অচির ভবিষ্যতে হাকিম-গৃহিণী হওয়ার মধুময় স্বপ্ন দেখতে লাগল। একে বনিয়াদী পরিবারের মেয়ে, তার ওপরে গ্র্যাজুয়েট। স্কুল মাস্টারের স্ত্রী হয়ে ওর শিক্ষাদীক্ষা প্রত্যেকদিন ওকে ধিক্কার দিচ্ছিল। মনে মনে ভাবলাম হোকনা আবুহোসেনের নবাবী, তবু অন্তত কয়েকটা দিন অণুর মুখে হাসি ফুটে উঠুক।

হেডমাস্টার বললেন, কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স। যান, কৃষ্ণের ইচ্ছেয় হয়তো উন্নতি হয়ে যেতে পারে। আর আপনাদের মতো ব্রাইট ইয়ংম্যান—

আমি সনিশ্বাসে বললাম, আজ্ঞে হাঁ, সবই কৃষ্ণের ইচ্ছা।

কিন্তু হাকিম হতে চাইলেই যে হাকিম হওয়া যায় না, কয়েক দিনের মধ্যেই সেটা মর্মে মর্মে টের পাওয়া গেল। মাসের মধ্যে কুড়ি দিনই ট্যুরে বেড়াতে হয়। সাইকেলের চাকার নীচে পেরিয়ে যাই মাইলের পরে মাইল, দুর্ভিক্ষ আর ম্যালেরিয়া জীর্ণ গ্রাম আণ্ডার প্যাণ্টের ক্রীজ আর হ্যাটের ঔদ্ধত্য দেখে চমকে ওঠে। অবিশ্রান্ত সেলাম পাই, দলে দলে লোক সাহায্যপ্রার্থী হয়ে ডাকবাংলোর সামনে এসে ভিড় করে। প্রভুত্বের আস্বাদ নতুন—রক্তখাওয়া বাঘের মতো চেতনায় মত্ততা জাগিয়ে তোলে। মনে হয় এই তো জীবন—এম-এতে ফার্স্ট

ক্লাস পাওয়ার সত্যিকারের সম্মানটা এতদিনে আমি আদায় করে নিয়েছি। আপনি মনিব, আপনি মা-বাপ, আপনি জেলার কর্তা। টেস্টের নম্বর জানবার জন্যে ছেলেরা এসে যখন দ্বারস্থ হত, তখন অবচেতন গৌরবে বুকটা ভরে উঠত সত্যি। কিন্তু তার সঙ্গে এর তুলনা!

ওষুধ-কম্বল-রেশনের ব্যবস্থা। সরকারী দাক্ষিণ্য উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে মুক্তধারার মতো। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কেটে যায় অবিশ্রান্ত কাজের চাপে। তবুও মাঝে মাঝে মনটা ক্লান্ত আর সংশয়গ্রস্ত হয়ে ওঠে। শ্মশানের ওপর অনুগ্রহ বৃষ্টি করে কী লাভ।

শ্মশান। তা বই আর কী। মন্বন্তর নির্বিবাদে বয়ে গেছে—এসেছে ম্যালেরিয়া। শীতের সন্ধ্যায় ঝোপ জঙ্গল থেকে খানিকটা বিষাক্ত আর শ্বাসরোধী অন্ধকার এসে যেন আচ্ছন্ন করে দেয় পৃথিবীকে। এনোফিলিসের গুঞ্জনে সন্ধ্যাবেলাতেই মশারির মধ্যে আশ্রয় নিই। বাইরের ধানকাটা মাঠ আবার আলোয় বিষণ্ণ পাণ্ডুর হয়ে পড়ে থাকে—পচা ডোবার জ্বলে আলেয়া। দূরে দূরে শেয়ালের ডাক শুনি—শকুনের আর্তনাদ অবরুদ্ধ বাতাসে ছড়িয়ে যায়। কিন্তু মানুষের গলা শুনতে পাই না—শিশুর কান্না ভেসে আসে না। ম্যালেরিয়া আর দুর্ভিক্ষে হতশেষ মানুষ ইঁদুরের মতো চিঁ চিঁ করে। আর না খেয়ে মায়ের বুকে ছটফট করে শুকিয়ে মরে গেছে শিশুরা—ভাবী স্বাধীন ভারতের মানবকের দল।

নানা দুর্বল মুহূর্তে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চায় স্কুল মাস্টারের নিরীহ সত্যসন্ধ মন। যেন একটা বিরাট প্রহসনের বিদূষক বলে মনে হয় নিজেকে। যাদের মৃত্যুর জন্যে কৈফিয়ৎ দিয়েই আমরা পাপ ক্ষালন করতে পারব না, তাদের কবরের ওপর 'রিলিফে'র সান্ত্বনা ছড়ানো যেন তাদের অপমান করা ছাড়া আর কিছুই নয়। কী প্রয়োজন ছিল এর। যারা মরতে বসেছে শান্তিতেই মরতে দাও তাদের। যাদের নগ্ন করোটি নিয়ে আজ শেয়ালেরা নদীর চড়ায় টানাটানি করছে—তাদের কংকাল মুখে আজ নিশ্চয়ই আমাদের দাক্ষিণ্য দেখে আনন্দের হাসি উৎসারিত হয়ে উঠছে না। কোটর-সর্বস্ব চোখে যদি আগুন থাকত, তা হলে এতদিনে সে আগুনের জ্বালায় আমরা নিঃশেষে ভস্ম হয়ে যেতাম।

কিন্তু কী হবে এ-সব অবান্তর ভাবনায়। চাকরী করতেই এসেছি। আবু হোসেনের রাজত্ব—পরমায়ু তিন মাস না ছ মাস কে জানে। তবুও হাকিমী তো বটে।

আর্দালী হৃদয় প্রামাণিক খাবার নিয়ে আসে। মশারির মধ্যে নিরাপদ আশ্রয়ে বসেই আহার পর্বটা শেষ করে নিই। তারপরেই ডাক-বাংলোর ফিতের খাটে লেপের তলায় আলসামন্থর তন্দ্রা জড়িয়ে আসে। ভয়ানক শীত পড়েছে এবার। স্বপ্নের ভেতর অপুর মুখখানা দেখা দিয়ে মিলিয়ে যায়, মনে পড়ে বাইরে শীতার্ত দিক-প্রান্তর মৃত্যুর মধ্যে থর থর করে কাঁপছে।

......দুঃখে সুখে দিন যায়। মাইনে ছাড়াও কিছু কিছু মেলে। স্কুল-মাস্টারী বিবেক আগে মাঝে মাঝে চাবুক মারতে চাইত, কিন্তু এখন সমস্ত সহজ হয়ে গেছে। আগাগোড়া যন্ত্রটাই এক সুরে বাঁধা। বিবেকের তাগিদে যে মূর্খ বেসুর গাইতে যায়, তিন দিনেই কানে মোচড় খেয়ে তারস্বরে ঐকতান তুলতে হয় তাকে। মনে মনে ভাবি, সবই কৃষ্ণের ইচ্ছা।

সেদিন সকালে চা খেয়ে ডাক-বাংলোর বারান্দায় এসে বসলাম। শীতের



ডাক্‌বাংলোর নীচে ভিড় জমেছে।

রোদ মধুর উষ্ণতায় সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে টেবিলের ওপরে পা তুলে দিলাম। ভারী ভালো লাগছে। দু মাস আগে ঠিক এমনি সময় ছাত্রকে নিয়ে মল্ল যুদ্ধে লেগে যেতাম—মূর্তিমান নির্বুদ্ধিতা দেখে মনে হত নিরেট মাথাটার ওপরে সবেগে নেস্‌-ফিল্ডখানা আছড়ে ফেলে বেরিয়ে চলে যাই। কিন্তু মাসান্তে কুড়িটি করে টাকা। পড়বার জন্যে নয়, প্রাইভেট টিউটর রাখবার জন্যেই।

তার সঙ্গে কী আকাশ-পাতাল তফাৎ। জিতেছি নিশ্চয়ই—জীবনের চক্রনেমি উল্টো গতিতে ঘুরতে সুরু করেছে। ভালো করে 'কোরাস্' গাইতে পারলে পাকাপাকি হয়তো হয়েও যেতে পারি, এমনি একটা আশা উপরিওলা সেদিন দিয়েছেন। দুর্ভিক্ষের জয় হোক—রিলিফের জন্যেই তো এমন চাকরীটা আমি পেয়ে গেলাম। মড়ক বিশেষ না হলে জীববিশেষের পার্বণ হয় না, আমাদের দিকটাও তো দেখতে হবে।

ডাক-বাংলোর নীচে ভিড় জমেছে। হৃদয় প্রামাণিক নামধাম লিখছে খাতায় আর রামদুলার কম্বল বিতরণ করছে দুঃস্থদের। অমানুষিক মানুষের একটা বীভৎস সমাবেশ। ছেঁড়া কাপড়ের ভেতরে হাড় বের করা অতীতের মানুষগুলো ঠক ঠক করে কাঁপছে। কাঁধ পর্যন্ত জটা বাধা চুল, মুখে এলোমেলো দাড়ি, চোখের দৃষ্টিতে ঘষা কাচের মতো অর্থহীন শূন্যতা।

হঠাৎ হৃদয়ের ওপর লক্ষ্য পড়তেই আমার নিশ্চিত আরামটা যেন চমক খেল একটা।

উনিশ কুড়ি বছরের একটি মেয়ে। এতদিনে কেন যে দালালে নিয়ে যায় নি, সেইটেই আশ্চর্য। অনাহার শীর্ণ হলেও যৌবনশ্রী এখনো প্রকট, আর শতজীর্ণ গাত্রবাসের ভেতর দিয়ে সেই যৌবন অসহায় করুণতায় নিজেকে বাইরের আলোতে মেলে ধরেছে। দেখলাম, হৃদয়ের চোখে আগুন। খাতায় সে নাম লিখছে বটে, কিন্তু দৃষ্টিটা মরা গোরুলোভী শকুনের মতো তীক্ষ্ন আর নির্লজ্জ।

রাগে আর বিরক্তিতে শরীর জ্বালা করে উঠল। ডাকলাম, হৃদয়।

হৃদয় উঠে এল তটস্থ হয়ে।

—আজ্ঞে?

—কে ওই মেয়েটা?

হৃদয় যেন হকচকিয়ে গেল একটু। সন্দিগ্ধ এবং সংকুচিতভাবে একবার তাকালো আমার দিকে। তারপরে ঠোঁট চেটে বললে, আজ্ঞে, ওই কমলপুরের—

—ওকে কম্বল দিয়ে এক্ষুনি বিদায় করে দাও, বুঝেছ?

—আজ্ঞে। ঘাড় নেড়ে সবিনয়ে জবাব দিলে হৃদয়, তারপর ফিরে গেল নিজের জায়গায়। বেশ বুঝতে পারছি মনে মনে কদর্য ভাষায় নিশ্চয় গালাগালি দিচ্ছে আমাকে। কিন্তু স্কুলমাস্টারী মনটাকে এখনো জয় করে উঠতে পারেনি—এসব ইতরতা দেখে আপনা থেকেই সেটা বিষিয়ে ওঠে।

সকালের সোনালি রোদটা মনের সামনে বিস্বাদ হয়ে গেল। হৃদয়ের চোখে যে আগুন দেখলাম একি আমাদের সকলের পক্ষেই সত্য নয়? মানুষের চরম দুর্গতির সুযোগ কি আমরা সবাই নিচ্ছি না, ষাট টাকা মাইনের স্কুলমাস্টার থেকে হাকিমীর এই রাজতক্ত—মাঝখানের পথটা কিসে তৈরী? চকিতের জন্যে মনে হল এর চাইতে নগণ্য মাস্টারীটাই বোধ হয় ছিল ভালো, অন্তত—

—নমস্কার স্যার।

চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল।

সামনেই দাঁড়িয়ে একজন ভদ্রলোক—অথবা ভূতপূর্ব ভদ্রলোক বললেই বোধ হয়

নির্ভুল হয় সংজ্ঞাটা। গায়ে অত্যন্ত ময়লা কাধ ছে'ড়া লংক্লথের পাঞ্জাবী—যেন চামড়ার সংগে সে'টে রয়েছে সেটা। ধূলি ধূসর কাপড়টা মালকোঁচা মেরে পরা। পায়ের ফিতেহীন লাল ক্যাম্বিশের জুতোর আগা দিয়ে তিন চারটে আঙুল বেরিয়ে পড়েছে। বুক পর্যন্ত শাদা কালো দাড়ি, চোখে কাচ ভাঙা চশমা

নিজের অজ্ঞাতেই মনটা সংকুচিত হয়ে উঠল। সেই দুঃখের চিরন্তন ফিরিস্তি শুনতে হবে। পুত্র-কন্যা-গৃহিণীর দুর্গতি, ধানের দর, দেশের অবস্থা। উপসংহারে কিঞ্চিৎ বেশি পরিমাণে সাহায্য পাওয়ার সকাতর আবেদন।

বললাম, কী বলবেন, বলুন।

কিন্তু ভদ্রলোক আমার অনুমানের ধার দিয়েই গেলেন না। সগর্বে বললেন, আমি এখানকার মাইনার স্কুলের হেডমাস্টার। আপনাকে একটা পরামর্শ জিজ্ঞেস করতে এলাম।

বললাম, বসুন—বসুন।

ভদ্রলোক প্রবলবেগে মাথা নাড়লেন : না, না বসব না। আমরা কি আর হাকিমের সামনে চেয়ারে বসতে পারি। শুধু একটা কথা জিজ্ঞেস করব আপনাকে। আচ্ছা বলুন তো, প্রিপোজিশন না পড়লে কি ইংরেজী শেখা যায় কখনো?

এবার আমি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে লোকটির দিকে তাকালাম। হ্যাঁ—যা ভেবেছি তাই। ভদ্রলোক ঠিক আত্মস্থ নেই। ঘোলা চোখ দুটো লাল টকটক করছে। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে সে যেন আমার দিকে তাকাচ্ছে না—তাকাচ্ছে আমার শরীরের ভেতর দিয়ে পেছনের দেওয়ালটার দিকে। কালো বিবর্ণ ঠোঁটের দু পাশে শুকিয়ে রয়েছে লালার দাগ, তার ওপর কোথা থেকে উড়ে এসে বসছে নীল রঙের একটা প্রকাণ্ড মাছি।

আমি বিব্রত হয়ে বললাম, সে তো নিশ্চয়। প্রিপোজিশনই তো ইংরেজির আসল জিনিস।

—এই দেখুন, দেখুন। এত করেও একথা আমি ওদের বোঝাতে পারলাম না। এই-জন্যেই তো আজকালকার এম-এ পাশ করা ছেলেরা অবধি এক লাইন ইংরেজী লিখতে গিয়ে পাঁচটা ভুল করে বসে থাকে। আচ্ছা, নমস্কার।

ভদ্রলোক ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন। দেখলাম লোকগুলো তাঁর দিকে কেমন একটা অদ্ভুত নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আমার মানসিক জিজ্ঞাসাটা অনুভব করে মৃদু হাসল হৃদয়। বললে, ও কিছু না হুজুর, পাগল।

—পাগল?

—হ্যাঁ, পাগল হয়ে গেছে। আগে হেড-মাস্টার ছিল, এখন—

হৃদয়ের কথাটা শেষ হতে পেল না। একদল লোক এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। কাজের আবর্তে তলিয়ে গেলাম মুহূর্তের মধ্যে। মৃত্যুর এত প্রাচুর্যের মধ্যেও যে দুর্ভাগারা মরতে পারেনি তারা বাঁচবার জন্যে এখনো একটা প্রাণান্তিক প্রয়াস করতে চায়।

সন্ধ্যার ডাকে অণুর চিঠি পেলাম।

পুরু নীল রঙের খাম—অভ্যস্ত রীতিতে কোণাকুণিভাবে ঠিকানা লেখা। ওর হাত-বাক্সের মিষ্টি গন্ধ চিঠিটার সর্বাংগে যেন জড়িয়ে রয়েছে। আজ পনের দিন ধরে অবিশ্রান্ত 'টুরে' ঘুরছি—ওর সংগে দেখা নেই। নির্জন আর নিরানন্দ গ্রামের মধ্যে আড়ষ্ট সন্ধ্যায় মনটা হু হু করে উঠল। বিয়ের পরে দুজনে কখনও এক সংগে এতদিন আলাদা হয়ে থাকিনি। মাস্টারী জীবনে দুঃখ ছিল অনেক, অতৃপ্তি ছিল



আচ্ছা বলুন তো।

অগণিত; কিন্তু শীতের এই ক্লান্ত সন্ধ্যায় অন্তত অণুর কাছ থেকে আমাকে কেউ বিচ্ছিন্ন করতে পারত না। সমস্ত দিনের অতি বাস্তবতার পরে সন্ধ্যার রোমান্স আসত ঘনিয়ে। মোমবাতির আলো জেবলে দুজনে বৈষ্ণব পদাবলী পড়তাম : সেই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকত, লাখ উদয় কর চন্দা—

সত্যি তো চাঁদ উঠেছে। শীতের মরা জ্যোৎস্না—কুয়াশায় আড়ষ্ট আর বিষণ্ণ। দূরের মাঠ পাণ্ডুর আলোতে মায়াময় হয়ে আছে। গ্রামগুলো যেন খণ্ড খণ্ড কালো অন্ধকারের সমষ্টি। মাঠের পাশ দিয়েই একটা ক্ষীণস্রোতা জ্যোৎস্না আর হিমের নলিদা জড়িয়ে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে।

বসে থাকতে ইচ্ছে করল না। শীতের জ্যোৎস্না যেন ডাকছে। ওই মাঠের ভেতর দিয়ে একটু বেড়িয়ে এলে কেমন হয়? গায়ে একটা ওভারকোট চড়িয়ে নেমে পড়লাম।

পায়ে চলা ছোট পথ। ঘন ঘাস জমেছে দু'পাশে। কণ্টিকারী আর সেয়াকুল কাঁটা মাথা তুলেছে এখানে ওখানে। শিশিরে ভিজে রয়েছে সমস্ত, আমার জুতোটাকেও ভিজিয়ে দিচ্ছে। বাঙলাদেশের চোখের জলের মতো শিশির বিন্দু চাঁদের আলোয় টলমল করছে। শীতের দিনে সাপের ভয় নেই, আকাশের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কের মতো হে'টে চললাম।

কুয়াশার আড়ালে চাঁদ হাসছে। অণুর অশ্রুসজল মুখখানির মতো। বুকের মধ্যে একটা শূন্যতা ধু ধু করছে। নাঃ আর পারা যায় না। যেমন করে হোক অন্তত দুদিনের জন্যেও একটিবার ওর কাছ থেকে ঘুরে আসা দরকার।

হাঁটতে হাঁটতে ছোট নদীটার কাছে চলে এলাম। খাড়া পাড়ি পর্যন্ত ঘাসে ঢাকা জমি, নীচে নদীর ঘোলা জল তির তির করে বয়ে যাচ্ছে। মাঝখানে একটা বেড়ার মতো টানা রেখায় কতগুলো ডালপালা মাথা তুলে রয়েছে, বোধ হয় মাছ ধরবার কোনো বন্দোবস্ত হয়েছে ওখানে। তার গায়ে জমে রয়েছে একরাশ কচুরি—বাতাসে তারি গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে।

মাটির খেয়ালে মাথা তুলেছে এলোমেলো কতগুলো ঢিবি—ইতস্তত বিকীর্ণ এক-রাশ ছিন্নমুণ্ডের মতো। তারি একটার ওপরে রুমাল পেতে বসে পড়লাম। ওপারে বালুচর—ফুল ঝরে যাওয়া মুমূর্ষু কাশের বন। সামনে চাঁদ জবলছে। শূন্য দৃষ্টিতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। অণু পাশে থাকলে—

—নমস্কার স্যার।

চমকে উঠলাম। যেন মাঠ ফুঁড়ে মাইনার স্কুলের সেই হেডমাস্টার আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। অস্পষ্ট জ্যোৎনায় ভালো করে চেনা যায় না—শুধু ভাঙা চশমার কাচটা জবল জবল করছে।

—হাওয়া খাচ্ছেন বুঝি? কিন্তু বড্ড ঠাণ্ডা স্যার, অসুখ করবে। তার চাইতে চলুন না, আমার ইস্কুলটা দেখে আসবেন। অনেক কষ্টে একা হাতে এটাকে গড়ে তুলেছি, গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে ছাত্র জোগাড় করেছি। আসুন, একবার দেখে যান।

আমি সভয়ে বললাম, রাত্রে কিসের স্কুল মশাই?

—আজকাল সব সময়েই স্কুল হয় স্যার। দিন রাত সব সময়। দয়া করে একবার পায়ের ধুলো দিতেই হবে। আপনাদের মতো লোককে পাওয়ার সৌভাগ্য তো আর সব সময়ে হয় না।

হেডমাস্টার আমার মুখের সামনে এসে ঝুকে দাঁড়াল। চশমার পেছনে দুটি অপ্রকৃতিস্থ চোখের দৃষ্টি আমি যেন শিরা-স্নায়ু দিয়ে অনুভব করতে পারলাম। একটা দুর্গন্ধ নিশ্বাস এসে আমার মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়ল—বন্যজন্তুর নিশ্বাসের মতো।

ইচ্ছা হল ছুটে পালিয়ে যাই—চীৎকার করে লোক ডাকি। কিন্তু ভাঙা চশমা দুটা আমার দিকে মেলা রয়েছে জ্বলন্ত নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে—যেন আমাকে হিপ্‌নটাইজ্‌ ক'রে ফেলছে।

বরফের মতো ঠাণ্ডা আর অতিকায় মাকড়শার পায়ের মতো কালো কালো কতগুলো বাঁকা আঙুলে হেডমাস্টার আমার একখানা হাত চেপে ধরলে। সমস্ত শরীরটা আবার ভয়ে রোমাঞ্চিত হয়ে গেল। কিন্তু আমি কথা বলতে পারলাম না—কেবল জ্বলন্ত চশমার আড়ালে দুটো দুর্বোধ্য চোখের দিকে চেয়ে রইলাম। লোকটা সত্যি সত্যিই মানুষ তো? না দূরের বাঁকের ও শ্মশানঘাটা থেকে উঠে এল কোনো একটা অশরীরী আত্মা, মৃত বাঙলার প্রেতমূর্তি?

—আসুন স্যার দয়া করে, আসতেই হবে আপনাকে।

অতিকায় মাকড়শার হিমশীতল পাগুলো হাতের ওপর চেপে বসেছে—চামড়ার খোঁচা লাগছে নখের, যেন বরফের দাঁত বসে যাচ্ছে। ছাড়িয়ে নেবার ইচ্ছে হল, কিন্তু পারলাম না। পৌষের শীতের সঙ্গে ভয়ের শিহরণ মিশে গিয়ে আমার সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপিয়ে দিতে লাগল।

আমি কম্পিত গলায় বললাম, কাল সকালে—

—না স্যার, কোনো ওজর আপত্তি শুনব না আপনার। এক্ষুনি আসতে হবে। হাতে ধরে মিনতি করছি স্যার। বুড়ো মানুষ, আধপেটা খেয়ে ইস্কুলটাকে গড়ে তুলেছি। আপনি একবার দেখবেন না?

কেন জানি না, আমি চলতে সুরু করে দিলাম। শিশিরে ভেজা মাঠ পেরিয়ে অন্ধকার আমের বন। পায়ের নীচে ঝরা ছাড়িয়ে আসতেই সামনে দেখা দিলে খোড়ো একটা আটচালা বাড়ি। অর্ধেকটা ধ্বসে পড়েছে—বাকীটার পাতা আর ধুলোর গন্ধ। বাগানটা খড় ঝরে যাওয়া চালের ভেতর দিয়ে জ্যোৎস্নার পাণ্ডুর আলো চিত্র-বিচিত্র একটা



নদীর ওপারে কাশবনের মধ্যে তারস্বরে চীৎকার করে উঠল শেয়াল

বিরাট বোড়া সাপের মতো ঘরের মধ্যে কুণ্ডলি পাকিয়েছে। হেডমাস্টার আমার হাত ধরে টেনে তারই ভেতরে নিয়ে গেলেন। আমি শুধু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পচা খড় আর গোবরের ভাপসা-গন্ধ নিশ্বাসে নিশ্বাসে টানতে লাগলাম।

—এই আমার ইস্কুল স্যার। সারাজীবন তিল তিল করে গায়ের রক্ত দিয়ে একে গড়ে তুলেছিলাম। বৌয়ের হার বিক্রী করে চালা উঠিয়েছি, মনে আশা ছিল দেশের ছেলেদের লেখাপড়া শেখাব হেডমাস্টার হবো। কিন্তু স্যার, কেন এল দুর্ভিক্ষ? কোথায় গেল আমার ছাত্রেরা? না খেয়ে মরে গেল, পালিয়ে গেল শহরে। আমার সারাজীবনের সব কিছু স্বপ্ন এমন করে কে শেষ করে দিলে বলতে পারেন?

আমি কথা বলতে পারলাম না। শুধু বিস্ফারিত চোখে জ্বলন্ত ভাঙা চশমার দিকে তাকিয়ে রইলাম।—না, না, স্যার—এ হতেই পারে না। হঠাৎ চীৎকার করে উঠল হেডমাস্টার, ভাঙা বাড়িটা আতঙ্কে যেন শিউরে উঠল : আছে, সবাই আছে। তারা কোথাও যায়নি, যেতে পারে না। আপনি শুনুন স্যার, কেমন পড়াতে পারি আমি।

ভাঙা বেড়ার গায়ে কবাট শূন্য একটা জানলার দিকে তাকিয়ে হেডমাস্টার সুরু করলেন : বয়েজ, আজ তোমাদের প্রিপোজিশন পড়াব। তোমরা জানো, ভালো করে যদি ইংরেজী শিখতে হয়—

আমি প্রাণপণে সংযত করে নিলাম নিজেকে। পালাতে হবে, পালাতে হবে এখান থেকে। একবার হেডমাস্টারের দিকে তাকালাম। যেন নিজের মধ্যে তলিয়ে গেছেন, আমার উপস্থিতির কথা ভুলে গেছেন তিনি। নিঃশব্দে রোমাঞ্চিত কলেবরে আমি বেরিয়ে এলাম, তারপরে দ্রুত পায়ে আমবাগানের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললাম। শুধু দূরে থেকে হেডমাস্টারের দরদ ভরা গলা কানে। আসতে লাগল : প্রথমেই ধরা যাক 'ইন' আর অন। এদুটোর ব্যবহার—

পায়ের নীচে ঝরা আমের পাতাগুলো মর মর করতে লাগল। যেন চোরের মতো পালিয়ে যাচ্ছি আমি। মনে হল, বিদ্যার এই তীর্থে আমার থাকবার অধিকার নেই—আমার ছোঁয়াতেও এখানকার সব কিছু শুচিতা মলিন হয়ে যাবে। আমি ব্রতচ্যুত, লোভী, স্বার্থপর।

আমার দামী কোটের ক্রীজগুলো জ্যোৎস্নার আলোয় ঝকঝক করতে লাগল। হাকিমী জুতোর উদ্ধত পদক্ষেপে আর্তনাদ করতে লাগল ধুলোয় ভরা গ্রামের পথ। হেডমাস্টারের মন্ত্র উচ্চারণের মতো টানা কণ্ঠস্বর দূরে অস্পষ্ট হয়ে এল আর নদীর ওপারে কাশবনের মধ্যে তারস্বরে চীৎকার করে উঠল শেয়াল।

মেঠোপথ

বিমলচন্দ্র ঘোষ

কাকেরা উড়ে যায়। আকাশে আলোছায়া
সূর্য উদাসীন।
বিলীন বনমায়া ঝিল্লি ঝঙ্কারে।
বিবাগী বালুচর॥

ওপারে পলাতক পাখিরা উড়ে যায়
সচল মসীরেখা,
বিজন মেঠোপথ ধূসর লোকালয়ে
মিশেছে আঁকাবাঁকা।

চীনের ব্যঙ্গ চিত্র

শ্রীযতীন্দ্র সেন

চীনের শিল্প-ইতিহাসের যে ধারা পাওয়া গেছে, তা' অতি প্রাচীন। পীত নদের উপত্যকাভূমি খনন করে চীনের যে সমস্ত সুপ্রাচীন শিল্প নিদর্শন উদ্ধার করা হয়েছে, তা বিশেষজ্ঞগণের মতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের। চীনের উপর দিয়ে যুগে যুগে নানা দিগ্বিজয়ীর বিজয়-অভিযান চলে গেছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এই সুপ্রাচীন বিস্তৃত ভূখণ্ডে নানা শিল্প-ধারা প্রবর্তিত হয়েছে। এমনি করে সুপ্রাচীন কালে শাং, চু, য়িন্, হান্ প্রভৃতি নানা পদ্ধতিতে চীনের শিল্প রূপায়িত হয়ে উঠেছিল। এতো গেল অলংকৃত পাত্র ও অন্যান্য মণ্ডন-শিল্প, ভাস্কর্য, উদ্গত চিত্র ইত্যাদির কথা।

চীনের সব চেয়ে যে প্রাচীন চিত্র-শিল্পের নিদর্শন পাওয়া গেছে, তা খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের বলে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। চীনের আদি চিত্রকর হিসাবে ওয়াং-হি-চাই, ওয়াং-হিয়েন-চাই উইইহাই প্রভৃতির নামও আমরা জানতে পেরেছি। এইসব প্রাচীন চিত্রে খুবই শিল্পনৈপুণ্য পরিলক্ষিত হয়। এ থেকে চীনের চিত্রশিল্পের ধারা যে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক থেকে সুরু হয়েছে, তা মনে করা সংগত হবে না; বরং খৃঃ পূঃ বহু শতবর্ষ পূর্ব থেকেই চীনের চিত্র-শিল্প আরব্ধ হয়েছিল, এই কথাই মনে হয়।

কিন্তু চিত্র-শিল্পে ব্যঙ্গ-চিত্র অঙ্কন চীনের সর্বাপেক্ষা আধুনিকতম প্রচেষ্টা। চীনের এই সর্বাধুনিক শিল্প-প্রচেষ্টার বয়স বারো বৎসরও হয়নি। বহু সহস্র বৎসরব্যাপী চিত্রে ও ভাস্কর্যে চীন যে অসাধারণ শিল্প-সাধনা ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে, তার তুলনায় চীনের এই নূতন উদ্যম একেবারে সদ্যোজাত শিশু বলা যেতে পারে।

সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিক্রিয়াশীল পরিস্থিতির ফলেই চীনে উদ্ভব হ'ল ব্যঙ্গচিত্র-শিল্পের। অল্প কয়েকজন প্রগতিশীল, কল্পনাপ্রবণ চীনা যুবক প্রথমে আত্মনিয়োগ করলেন ব্যঙ্গ-চিত্র অঙ্কনে। চৈনিক শিল্পক্ষেত্রে বিপ্লবী মনের পরিচয় পাওয়া যায় এখান থেকে। প্রথম প্রথম উদ্ভট, হাস্যকর সামাজিক ব্যাপার নিয়েই আঁকা হচ্ছিল ব্যঙ্গচিত্র। এঁরা গতানুগতিক চিত্রপদ্ধতিতে ফুল, লতা-পাতা আর পাশ্চাত্য শিল্পরীতি অনুসারে নিরাবরণ নারীমূর্তির চিত্রাঙ্কনে তৃপ্ত থাকতে পারছিলেন না। তা ছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশের, বিশেষত পাশ্চাত্যের ব্যঙ্গ চিত্রের নির্মম শ্লেষ, আর হাস্যরসের উপভোগ্য আনন্দের আবেদনও পেঁৗছেছিল তাঁদের কাছে। এর ফলেই চিত্র-শিল্পক্ষেত্রে প্রায় একরূপ নবাগত এইসব চিত্রকরদের মনে জাগল ব্যঙ্গ-চিত্র অঙ্কণের প্রেরণা।

চীনের ব্যঙ্গ-চিত্রশিল্প রাজনৈতিক রূপ গ্রহণ করল জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া অধিকারের পর থেকে। তিন কোটী লোকের



সর্বহারাদের স্বর্গে মিলিত ম্যাক্সিম গোর্কি ও চীনের গোর্কি লুসুন্
(এই চিত্রটি "সাংহাই স্কেচ্" নামক পত্রিকার প্রচ্ছদপট)
শিল্পী : ওয়াং ৎসে মেই

আবাসস্থল যে বিস্তৃত ভূভাগ, হাত বোমার সাহায্যে কেবলমাত্র একখানি রেললাইন আর দুখানি স্লিপারের ক্ষতিসাধন করার অপরাধে তা জাপানের কুক্ষিগত হয়ে গেল। মাঞ্চুরিয়ার এই ভাগ্যবিপর্যয়ে চীনের ব্যঙ্গ-চিত্রকর দলে এল একটা নূতন প্রেরণা, সুরু হ'ল একটা শিল্পরীতি সম্বন্ধীয় নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর আন্দোলন, রূপায়িত হ'য়ে উঠল ব্যঙ্গ-চিত্রে জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে চীনের প্রতিবাদ।

কেবলমাত্র ব্যঙ্গ-চিত্র নিয়েই 'সাংহাই-স্কেচ্' নামক পত্রিকাখানির আবির্ভাব হ'ল। এতে সামাজিক ব্যাপারের বিদ্রূপাত্মক ব্যঙ্গ-চিত্র সাধারণত প্রকাশিত হ'ত। ১৯৩৩-৩৪ সালে রাজনীতিক ব্যাপার প্রকাশে কড়াকড়ি সুরু হওয়াতে, প্রচারসংখ্যা বাড়াবার উদ্দেশ্যে নানারূপে উপভোগ্য ব্যাপারের ব্যঙ্গ-চিত্র এই পত্রিকাটিতে প্রচুর-ভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা হ'ল। ঠিক এর পরেই বেশীর ভাগ রাজনীতিক রচনা নিয়ে আর ব্যঙ্গ-চিত্রে সজ্জিত হয়ে প্রকাশিত হ'ল 'মডার্ন স্কেচ্' নামক পত্রিকাটি। ব্যঙ্গ-চিত্র প্রকাশের জন্য আরো কয়েকখানি পত্রিকার আবির্ভাব হয়েছিল, কিন্তু এগুলি বেশী দিন টেকেনি। চীনের ব্যঙ্গ-চিত্র সম্বন্ধীয় অন্যতম নামকরা পত্রিকা 'মডার্ন পাক'-(Modern Puck)এও বহু ব্যঙ্গ-চিত্র ছাপা হ'ত। চীনে জাপানী আক্রমণের সূত্রপাত হওয়ার পর থেকে সবগুলি ব্যঙ্গ-চিত্র পত্রিকাই সাংহাই থেকে প্রকাশিত হতে লাগল। কতকগুলি সংবাদপত্রেও ব্যঙ্গ-চিত্র প্রকাশিত হ'তে লাগল। ১৯৩৭ সালের আগস্ট মাসে সাংহাইতে জাপানী আক্রমণ আসন্ন হ'য়ে উঠল। চীনের ব্যঙ্গ-চিত্রশিল্পিগণও ব্যঙ্গ-চিত্র অঙ্কন করে জাপানীদের বিরুদ্ধে চীন সরকারের প্রচার-কার্যে যোগদান করলেন। জাপানীরা যে চীনের আধুনিক চিত্রশিল্প, বিশেষ করে ব্যঙ্গ-চিত্রশিল্প উৎখাত করতে চেষ্টিত, তা চীনের এই নবীন শিল্পসম্প্রদায়ের কাছে সুস্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান হয়েছিল। এই হ'ল চীনের ব্যঙ্গ-চিত্রশিল্প প্রচেষ্টার মোটামুটি ইতিহাস।

চীনের চিত্রকরদের মধ্যে খুব অল্প-সংখ্যকেরই নিছক হাস্যরস পরিবেশনের দিকে ঝোঁক দেখা যায়। এইসব চিত্রকরদের মধ্যে রাজনৈতিক ও জাতীয় চেতনা খুব সামান্যই পরিলক্ষিত হয়। চীনের চিত্রকর-দের মধ্যে এমন একজনও মিলবে না, যিনি একমাত্র ব্যঙ্গ-চিত্র অঙ্কনে আত্মনিয়োগ করেছেন। চীনের এই চিত্রকরদের মধ্যে যাঁরা ব্যঙ্গ-চিত্রাঙ্কনে প্রথমে ব্রতী হলেন, তাঁদের সংখ্যা বেশী নয়; তাঁরা অন্যান্য পাঁচরকমের কাজের সঙ্গে ব্যঙ্গ-চিত্রও আঁকতে সুরু করলেন।

এসব সত্ত্বেও চীনের ব্যঙ্গ-চিত্রশিল্প যে, রাজনীতিক রূপ নিয়ে গড়ে উঠল, তার একমাত্র কারণ হচ্ছে এই যে, এঁরা মনে মনে

সকলেই সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র-বিরোধী এবং এ'দের শতকরা নব্বুই জনেরই তীব্রতম আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে জাপানের উপনিবেশ বিস্তারের উদগ্র ক্ষুধা থেকে নিজেদের সভ্যতা-সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য ও মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করা। এই কারণেই তাঁরা জাপানী আক্রমণে হ'য়ে উঠলেন সন্ত্রস্ত, সচেতন ও সক্রিয়। আর এই কারণেই ১৯২৭ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত যুঝে যুঝে যে প্রাচীনপন্থী আমলাতান্ত্রিক নানকিং গভর্নমেণ্টের অবসান ঘটল, তার বিরুদ্ধে তাঁরা হয়ে উঠলেন বিরূপ। জাপানী আক্রমণের সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মনো-



"অন্যে যা' ফেলে দেয়, আমরা তা' কিনি।"
শিল্পী : ৎসা জো-হং

ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাসিবাদ, সামন্ততন্ত্র, নানা রাজনীতিক ব্যাভিচার ইত্যাদির বিরুদ্ধে তাদের প্রতিক্রিয়াশীল মন সজাগ হ'য়ে উঠল এবং তাঁদের এই বিক্ষুব্ধ, বিরূপ মনোভাব বিদ্রূপের কশাঘাত নিয়ে রূপায়িত হ'য়ে উঠল ব্যঙ্গ-চিত্রে। কেবল রাজনীতিক ও সামাজিক ব্যাপারেই নয়, যে সমস্ত চিত্রশিল্পী পাশ্চাত্য ও চীনা চিত্রকলার সংমিশ্রণে নূতন শিল্পরীতি গঠনের মতো দুঃসাহসিক কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁদের প্রতিও এ'দের অশ্রদ্ধা তিক্ততর হ'য়ে উঠতে লাগল।

চীনের যে সমস্ত উদারনৈতিক, প্রগতিশীল জাতীয় মনোভাবাপন্ন বুর্জোয়া সম্প্রদায় জাপানীদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত গণতান্ত্রিক জাতীয় 'ফ্রণ্ট' গঠনে আগ্রহশীল ছিলেন, তাঁরা ব্যঙ্গ-চিত্রশিল্পীদের সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এই অভিযানে উৎসাহ দান করতে লাগলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পীদের মধ্যে রাজতন্ত্রের আমূল পরিবর্তন সাধনের দিকে যে ঝোঁক দেখা যাচ্ছিল এবং যার ফলে জনগণের জাগরণ সম্ভবপর হ'তে পারে বলে মনে হচ্ছিল, তার দিকে 'বুর্জোয়া' সম্প্রদায়ের সন্দিগ্ধ দৃষ্টিও প্রখর হ'য়ে উঠতে লাগল।

চীনের যে কয়েকজন চিত্রকর ব্যঙ্গ-চিত্রের ক্ষেত্রে প্রথমে অবতীর্ণ হন তাঁদের প্রায় সকলেই বয়সে তরুণ। এ'দের কারও বয়সই চল্লিশ পার হয়নি। এ'দের অধিকাংশেরই বয়স কুড়ির নীচে, অথবা কুড়ির কিছু উপরে। কোন বিশিষ্ট রাজনীতিক দলের অন্তর্ভুক্ত নন তাঁরা। কিন্তু তাঁরা সকলেই জাতীয় মনোভাবাপন্ন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের। নিছকভাবে ব্যঙ্গ-চিত্র অঙ্কন পেশা এ'দের কারো নয়। কেউ হয়তো বিদ্যালয়ের শিক্ষক, কেউ হয়তো ছাপাখানায় কাজ করেন, কেউ হয়তো বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকেন, কেউ বা ঠিকাভাবে অন্য কোথাও কাজ করেন। ব্যঙ্গ-চিত্রাঙ্কনে একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারলে শ্লেষ-ব্যঞ্জনায়, আনন্দ-ঘন হাস্য-রস পরিবেশনে ও শিল্পনৈপুণ্যে এই নব শিল্পী সম্প্রদায় আরও উৎকর্ষ লাভ করতে পারতেন। কিন্তু তার পক্ষে প্রধান অন্তরায় এই যে, ব্যঙ্গ-চিত্র এ'কে এ'দের আশানুরূপ এমন কি প্রয়োজন মেটাবার মতোও অর্থাগম হ'ত না। চীনে পূর্ণ পৃষ্ঠার একখানি রঙীন ছবি আঁকলে যে কোন চিত্রকার পেয়ে থাকেন তিন থেকে পাঁচ ডলার। অথচ একখানি ব্যঙ্গ-চিত্রের জন্য এই ব্যঙ্গ-চিত্রকারগণ পেতেন ৫০ সেণ্ট, কিম্বা এক ডলার, বড় জোর দেড় ডলার। কেবল ব্যঙ্গ-চিত্র এ'কেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হ'লে কমপক্ষে পঞ্চাশখানি ব্যঙ্গ-চিত্র প্রতি মাসে প্রকাশিত হওয়ার দরকার। কিন্তু এই পঞ্চাশখানি ব্যঙ্গ-চিত্র প্রতি মাসে আঁকার অবসরও এ'দের কারুরই মিলত না। কারণ ছবি কাগজে ছাপার তদ্বির তাগাদায় এ'দের অনেক সময় ব্যয়িত হ'য়ে যেত। যাঁরা নিয়মিত বেতনভোগী চিত্রকর হিসাবে ব্যঙ্গ-চিত্র আঁকতেন, তাঁদের বেতনও ছিল খুব সামান্য।

কাজেই ব্যঙ্গ-চিত্র আঁকা লাভজনক কাজ নয় বলেই যে সব চিত্রশিল্পী অর্থ ও যশপ্রার্থী, তাঁরা এতে আকৃষ্ট হন নি। চীনে ব্যঙ্গ-চিত্রাঙ্কনে আত্মনিয়োগ করার অর্থই ছিল দারিদ্র্য ও দুঃখ-দুর্দশা বরণ করা। প্রথম যে চীনা চিত্রকর দল ব্যঙ্গ-চিত্রাঙ্কনে ব্রতী হন, তাঁদের শিল্পসাধনার ইতিহাস ও পরিণতি শোচনীয়রূপে মর্মন্তুদ। প্রথমে দশজন চিত্রশিল্পী ব্যঙ্গ-চিত্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হন। এ'দের মধ্যে একজন শোচনীয় দুঃখ-দুর্দশার ভিতর দিয়ে নিজের জীবনকে টেনে এমন অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হলেন যে, তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করবার মতো অর্থও তিনি রেখে যেতে পারেন নি। একজন ব্যঙ্গ-চিত্রকর সরকারী চাকুরী গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। সরকারী চাকুরী গ্রহণের পর ফ্যাসাদে পড়বার ভয়ে তিনি উল্লেখযোগ্য আর কোনো ব্যঙ্গ-চিত্র আঁকেন নি। অপর একজন ব্যঙ্গ-চিত্রশিল্পীর কুওমিনটাং দলবিরোধী একখানি ব্যঙ্গ-চিত্র প্রকাশ করবার পর থেকেই, ব্যঙ্গ-চিত্রের আসর থেকে অন্তর্ধান হ'ল। আর একজন ব্যঙ্গ-চিত্রকর ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে উহান্ গভর্নমেণ্টের পতন ও কম্যুনিস্ট দল ও কুওমিনটাং দলের মধ্যে মতবিরোধ ঘটবার পর থেকে বামপন্থী দলের উপর যে নিপীড়ন শুরু হ'ল, তা থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য প্রায় চার বৎসর ধরে ফেরার হয়ে বেড়াতে লাগলেন। অবশিষ্ট ছয়জন ব্যঙ্গ-চিত্রকর ব্যঙ্গ-চিত্রাঙ্কণের উদ্দেশ্য নিয়ে দলবদ্ধ হলেন এবং এই পলাতক শিল্পিবন্ধুর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন। অবশেষে তাঁরা মিলিত হ'লেন অপ্রত্যাশিতরূপে একটা অদ্ভুত অবস্থায়। যে ব্যঙ্গ-চিত্রকরের চরম দারিদ্র্যের মধ্যে মৃত্যু হল বলে পূর্বে উল্লেখ করেছি, তাঁর যথোচিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সামাধার উদ্দেশ্য নিয়ে একে একে সেই মৃত বন্ধুর পার্শ্বে সমবেত হলেন এই সাতজন শিল্পী। এ'দের কেউই জানতেন না যে, তাঁদের অপর কেউ সেখানে যাচ্ছেন মৃত বন্ধুর শেষ ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে। চিরদরিদ্র শিল্পী-বন্ধুর শবদেহের পার্শ্বে মিলন হ'ল এ'দের।

এই সাতজন ব্যঙ্গ-চিত্রকরদের মধ্যে তিনজন মাসিক ৫০ ডলার বেতনে চাকুরি করতেন, তা ছাড়া আরও উপরি কাজ করে'



মাঞ্চুরিয়ার স্বর্গ
শিল্পী : টে ৎসুং-কুং

এ'দের মাসিক আরো ৫০ ডলার উপার্জন হ'ত। এ'রাই তখন ছিলেন চীনের সবচেয়ে সেরা ব্যঙ্গ-চিত্রশিল্পী। অপর চারজন চিত্রকর সুযোগ ও অবসর অনুসারে ব্যঙ্গ-চিত্র আঁকতেন, তা ছাড়া হয়তো শিক্ষকতা, সম্পাদকতা, সংবাদপত্রসেবা বা অন্য কোনো কাজ করতেন।

কাজেই এই যে কয়েকজন ব্যঙ্গ-চিত্রকরের কথা এখানে উল্লেখ করলাম এ'দের কেউই

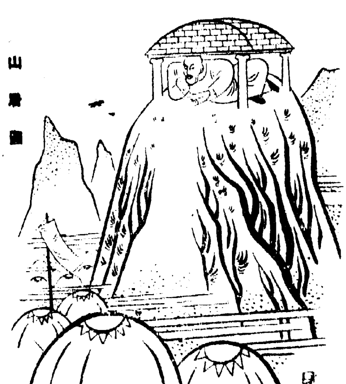
উচ্চ আদর্শবাদী নন এবং কেবলমাত্র ব্যঙ্গ-চিত্রের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করে' অপরিহার্য ক্ষয়-ক্ষতি বরণ করে নেওয়ার মতো তেমন দৃঢ় সংকল্পও ছিল না এ'দের। কাজেই এ'রা এ'দের অবসর মতো ব্যঙ্গ-চিত্রের উপাদান ভেবেচিন্তে বার করতেন এবং খেয়াল-খুশী মতো রেখা সঙ্গতির মধ্যে তা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করতেন। অনন্যকর্মা হয়ে কেবল ব্যঙ্গ-চিত্রের জন্যেই সমস্ত চিন্তাধারা ও কর্মশক্তি নিয়োগ করতে পারেন নি বলে এ'দের ব্যঙ্গ-চিত্র সাধারণ-ভাবে আশানুরূপ উৎকর্ষলাভ করতে পারে নি। এ'দের মধ্যে দু'একজন ছাড়া আর কারও মধ্যেই একটা সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত চিন্তাধারা ও প্রকৃত বিপ্লবী মনের পরিচয় বড় একটা পাওয়া যায় না।

এবার চীনের কয়েকজন ব্যঙ্গচিত্র শিল্পীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে এ প্রবন্ধের উপসংহার করব।

ব্যঙ্গচিত্রের মারফতে হাস্যরস পরিবেশনের জন্য ওয়াং-আও চীনে বিশেষ করে পরিচিত। ইনি বয়সে তরুণ। ব্যঙ্গচিত্র আঁকা ছাড়া সংবাদপত্রসেবাও করেন ইনি। মিঃ উইলি বাফুন্ এ'র ব্যঙ্গচিত্রের একজন কল্পিত ব্যক্তি। যা কিছু উদ্ভট ও তাঁর মনে হাস্যরসের উদ্রেক করে' তা তিনি মিঃ বাফুনকে অবলম্বন করে তাতে রূপ দেন। একদিন হয়তো মিঃ বাফুন্ বরফে ঢাকা পথে যেতে যেতে দেখলেন, একটা ভিখারী, উপযুক্ত কাপড়-চোপড়ের অভাবে শীতে কাঁপছে। মিঃ বাফুন্ তাকে নিজের পোষাক খুলে দিয়ে নিজে বরফের উপর শুয়ে রইলেন। আর একদিন হয়তো মিঃ বাফুন দেখলেন, নগ্ন-দেহে একটা ভেনাসের প্রস্তরমূর্তি। তাঁর শুচি-বায়ুগ্রস্ত মনে বাধল। তিনি তাতে প্ল্যাস্টার লাগাতে লেগে গেলেন। এমনি ধরণের বিদ্রূপাত্মক চিত্র আঁকেন তিনি। ওয়াং-আও'র কল্পিত মিঃ বাফুন যে হাস্যরসের অবতারণা করেন, তা জীবন্ত মিঃ চার্লি-চ্যাপলিনের অনুরূপ।

চ্যাং-কোয়াং-উ-রা তিন ভাই। তিন জনেই ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী। এ'দের মধ্যে যিনি বড়, তিনি সাংহাই আর্ট স্কুলের শিক্ষকতা করতেন। পনেরখানা পত্রিকায় প্রথম থেকে বরাবর তাঁর ব্যঙ্গচিত্র ছাপা হয়ে এসেছে। সাধারণত চীনের নেতাদের নিয়ে ব্যঙ্গচিত্র আঁকেন ইনি। এ'র ব্যঙ্গচিত্র এতো সুস্পষ্ট ব্যঞ্জনাময়, হাস্যরসের ধরণ এতো উন্নত স্তরের এবং তাঁর বিদ্রূপীকৃত মতামত এতো নির্ভীক যে, যে সব নেতা বা নায়ক তাঁর ব্যঙ্গচিত্রের বিদ্রূপভাজন হ'তেন, তাঁরা এ'র মতামত প্রায় ক্ষেত্রেই মেনে নিয়ে নিজেদের সংশোধন করতে চেষ্টিত হ'তেন। ১৯০৭ সালে তিনি তরুণ নেতারূপে চিয়াং-কাই-শেককে নিয়ে একখানি ব্যঙ্গচিত্র আঁকেন। এইরূপে চীনের বহু নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তি এ'র ব্যঙ্গভাজন হয়েছেন।

চীনের ব্যঙ্গচিত্রকরদের মধ্যে সবচেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠ হচ্ছেন উ-কু। ব্যঙ্গচিত্রের সম্পূর্ণতা সাধনে কিছুতেই তৃপ্তি নেই এ'র। পত্রিকার সম্পাদকেরা তাঁর পারিশ্রমিকের এক-পঞ্চমাংশ দিলেও ক্ষুণ্ণ হন না ইনি, বরং কিসে তাঁর ছবি সুন্দরতররূপে ব্যঞ্জনাময় আর পরিস্ফুট হবে সেদিকে সর্বদা সতর্ক লক্ষ্য এ'র। চীনের আর একজন ব্যঙ্গচিত্রকর হচ্ছেন ইয়ে-চেন্-উ। ইনি চ্যাং-কোয়াং-উ ও উ-কু'র মতোই ব্যঙ্গ-চিত্রাঙ্কনে চীনা কালি আর তুলির অজস্র ব্যবহার করেন। এই দুটি জিনিসের সাহায্যে



রণ-শিবিরের ঊর্ধে পর্বত চূড়ায় ধ্যান-নিমগ্ন চিয়াং কাইশেক্
শিল্পী : চ্যাং কোয়াং-উ

ব্যঙ্গচিত্রের ব্যঞ্জনাময় রেখাগুলি যে কি করে ফুটিয়ে তোলা যায়, তাই আশ্চর্য। অন্যান্য ব্যঙ্গচিত্রকরদের ব্যঙ্গচিত্র আঁকতে কলম, জল-রং এবং অন্যান্য যে সমস্ত শিল্প-উপকরণ পাশ্চাত্য ব্যঙ্গচিত্রকরেরা ব্যবহার করেন, তা না হলে চলে না। চীনের পুরানো শিল্প-পদ্ধতিকে বাদ দিয়ে ব্যঙ্গচিত্র আঁকেন না এই তিনজন শিল্পী। বরং দু হাজার বছরের পুরানো হান্-শিল্পপদ্ধতির উপর নূতন রূপায়ণ এনে দিয়ে ব্যঙ্গচিত্র আঁকেন এ'রা। এদিক দিয়ে প্রাচীন ও নবীন শিল্পরীতির সমন্বয় সাধন করে ব্যঙ্গচিত্র ক্ষেত্রে অভিনব পদ্ধতির প্রবর্তন করেছেন এ'রা। এ'দের ব্যঙ্গচিত্রের আঙ্গিক বা টেক্নিক পাশ্চাত্যের কাছ থেকে ধার-করা নয়।

পাশ্চাত্যের প্রসিদ্ধ ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী মিঃ জর্জ গ্রস্জ চীনে আগমন করলে সেখানকার নবীন ব্যঙ্গচিত্রকরেরা যথেষ্ট প্রেরণা পেয়েছিলেন। তাঁরা এই পাশ্চাত্য ব্যঙ্গচিত্রকরের শিল্পরীতি ও কৌতুকভঙ্গী একেবারে নিজস্ব করে নিয়েছিলেন। চীনের এই সব চিত্রকরদের মধ্যে মানাং-চান্ ও সাজো-হাং-এর নাম উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্ত শিল্পী 'মডার্ন স্কেচ' পত্রিকায় এবং দ্বিতীয়জন চীনের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সাপ্তাহিক 'লাইফ উইক্লি নিউজ্'এ ব্যঙ্গচিত্র আঁকতেন। চীনের এই সব চিত্র-শিল্পীদের উপর সোভিয়েট ব্যঙ্গচিত্রকর বোরিস এফিমভ্, ইংলণ্ডের ডেভিড্ লো এবং আমেরিকার ফিটজ্ প্যাট্রিক্ ও ফ্রেড এলিস-এর প্রভাব কম নয়।

চীনের ব্যঙ্গচিত্রের অসম্পূর্ণতা আছে। হয়তো রেখাসঙ্গতি কিছুটা আড়ষ্ট ও কষ্টকল্পিত এবং ততটা ব্যঞ্জনাময় এখনো হয়ে উঠতে পারে নি, তৎসত্ত্বেও চীনের ব্যঙ্গচিত্র অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ আশাপ্রদরূপে গড়ে উঠেছে। এই ব্যঙ্গচিত্রাঙ্কনে পাশ্চাত্য শিল্পরীতি ও ভাব গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু তা পাশ্চাত্যের নিছক অনুকৃতি নয়।

১৯৩৭ সালে সাংহাইতে অনুষ্ঠিত ব্যঙ্গ-চিত্রের প্রদর্শনীতে যে সমস্ত ব্যঙ্গচিত্র প্রদর্শিত হয়েছিল, তা থেকে মনে হয়েছিল চীনে ব্যঙ্গচিত্রের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা প্রচুর। ব্যঙ্গচিত্রে সজ্জিত হয়ে যে সমস্ত পত্রিকা যুদ্ধপূর্ব যুগে প্রকাশিত হ'ত তার এক একখানির প্রচারসংখ্যা ছিল গড়ে চল্লিশ হাজার। চীনের তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে ব্যঙ্গচিত্রের সুতীক্ষ্ণ শ্লেষ উপভোগ্য আনন্দ ও হাস্যরসের আবেদন পৌঁছেছে।

যে সাংহাই শহর ছিল একদিন ব্যঙ্গ-চিত্র অংকনের ও প্রকাশের কেন্দ্রস্থল, তা আজ জাপানের অধিকারে। জানি না এই সমস্ত ব্যঙ্গচিত্রকর কে কোথা ছিটকে পড়েছেন আর ব্যঙ্গচিত্রের রূপসজ্জা নিয়ে যে সমস্ত পত্রিকা প্রকাশিত হত, সেগুলিরই-বা বর্তমান দশা কি। চীনের সামাজিক প্রগতি সাধনের কথা বাদ দিলেও চীনের প্রশংসনীয় স্বদেশপ্রেম উদ্বোধনে, অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে সর্বস্ব ত্যাগ ও স্বীয় প্রাণ তুচ্ছ করেও, স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার সংকল্প সৃজনে চীনের ব্যঙ্গচিত্র-শিল্পের বিশেষ করে রাজনীতিক ও যুদ্ধ-বিষয়ক ব্যঙ্গচিত্রশিল্পের দান যে অসামান্য তা স্বীকার না করে' পারা যায় না।

গঙ্গোত্রী

সুবোধ ঘোষ

[১১]

সভার স্তব্ধতায় শব্দের শিহর জাগিয়ে, জয়ধ্বনি তুলে, পতাকা হাতে ঢুকলো ইংরিজী স্কুলের ছাত্রের দল। সমস্ত জনতা যেন এই হর্ষের আশাপথ চেয়ে মুহূর্ত গুণছিল। জয়ধ্বনির হর্ষে বাতাসের পরমাণু হাজার বিস্ফোরণে ফেটে পড়তে লাগলো। মহাত্মা গান্ধী কি জয়, স্বতন্ত্র ভারত কি জয়, হিন্দু-মুসলমানের জয়।

শঙ্কার পালা শেষ হয়ে গেছে, অপমান মানবার দিন ফুরিয়ে গেছে, আজকের লগ্নে সবাইকে শুধু উঠে দাঁড়াতে হবে, লড়তে হবে।

কিসের লড়াই ?

সভাপতি উঠে দাঁড়ালেন। সমস্ত জনতা হৃদয়ের সমস্ত বিশ্বাস ও নিষ্ঠা দিয়ে শুনলো সেই প্রতিজ্ঞার কথা—সরকারের সংগে সকল সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে আমরা স্বরাজ গড়ে তুলবো।

সভাপতি হাতযোড় করে আবেদন করলেন—স্বাধীনতার নামে, স্বরাজের নামে, ভারতমাতার সন্তানের নামে আপনারা সরকারী সংস্রব ছাড়ুন।

ইংরিজী স্কুলের একটি ছাত্র এগিয়ে এসে জানালো—আজ থেকে আমরা ইংরিজী স্কুল ছাড়লাম।

জনতা জয়ধ্বনি তুলে অভিনন্দন জানালো।

কিন্তু আর কৈ ? জনতার মধ্যে আর কোন সাড়া দেখা গেল না। সরকারী চাকুরীর ঘৃণাকে দূরে ঠেলে ফেলে দেবে, আর কে কে আছে ? আর কি কেউ নেই ?

সত্যি আর কেউ ছিল না। এর মধ্যে ভুদেব চাটুয্যে ছিল না, দিনমণি বিশ্বাস আসেনি। শুধু চাষী মুটে মজুর কারিগর আর সাঁওতালের দল, এর মধ্যে সরকারী চাকুরীর তকমা নেই কারও।

সভাপতি অনেকক্ষণ ধরে জনতার দিকে আগ্রহে তাকিয়ে রইলেন। জনতাও যেন অপ্রস্তুত হয়ে বসেছিল। আজকের এই শুভদিনে, তাদের মধ্যে এমন একজনও কি নেই, যে এই কলঙ্ক-বর্জনের গৌরব নিতে পারে ?

জনসভার মাঝখান থেকে ধীরে ধীরে উঠে এল একজন। সভামঞ্চের কাছে এসে একটা নীল উর্দি আর একটা বল্লম সঁপে দিল। বুকে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা জানালো—স্বরাজের নামে আজ থেকে আমার চৌকীদারী চাকরীতে ইস্তফা দিলাম।

রতন চৌকীদার। সারা জনতা যেন রতন চৌকীদারের নাম গান গেয়ে বাতাস মুখর করে তুললো। অভিনন্দনের ঝড় মেতে উঠলো—সাবাস্ রতন চৌকীদার।

রতন হাতযোড় করে বললো—চৌকীদার নই, আমি রতন।

হাজার হাজার গ্রাম্য নরনারী এই অঘটনকে স্বচক্ষে দেখলো। সত্যিই সেদিন আর নেই, এবার সবই নতুন রকম হয়ে যাবে। চৌকীদারও অক্লেশে হাসতে হাসতে উর্দি ঠেলে ফেলে, চাকরী ছেড়ে দেয়। আজ থেকে হাওয়া বইল অন্য দিকে। এই হাওয়া সবাইকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে, স্বরাজ হবে।

বিকেল হয়ে আসছিল। জনতা বসে আছে, সৈনিকের ছাউনীর মত জনসভার রূপ। এ পর্যন্ত শুধু প্রতিজ্ঞার কথা শুনেছে তারা, এখনো লড়াইয়ের কথা ওঠেনি। গফুরাবাদের চাষীরা যদি লাঠি নামিয়ে রেখেছিল, কিন্তু হাতের কাছেই ছিল। কি জানি কিসের নির্দেশ আসে! কে জানে এই মুহূর্তেই হয়তো লড়াই সুরু করতে হবে। আজ কিছু একটা করবেই তারা, নইলে ছয় ক্রোশ পথ হেঁটে, ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে গিয়ে কেন এসেছে তারা ?

সভাপতি বললেন—বিলিতি কাপড় কেউ ছোঁব না। এই অপবিত্র বস্তুটাই আমাদের জীবনের গোলামির সবচেয়ে বড় কলঙ্কের চিহ্ন। আজও আমরা লাঙল ঠেলে ক্ষেতে ক্ষেতে ফসল ফলাই। সেই রকম আজও আমরা আবার চরকা তাঁতে কাপড় বুনবো। আমাদের নিজের তৈরি মোটা ভাত-কাপড়ে আমরা স্বরাজ আনবো। বিলিতি কাপড় দূর কর।

ছাত্রের দল গায়ের জামা খুলে ফেললো! এক জায়গায় স্তূপাকার করে রাখলো! আগুন ধরিয়ে দিল।

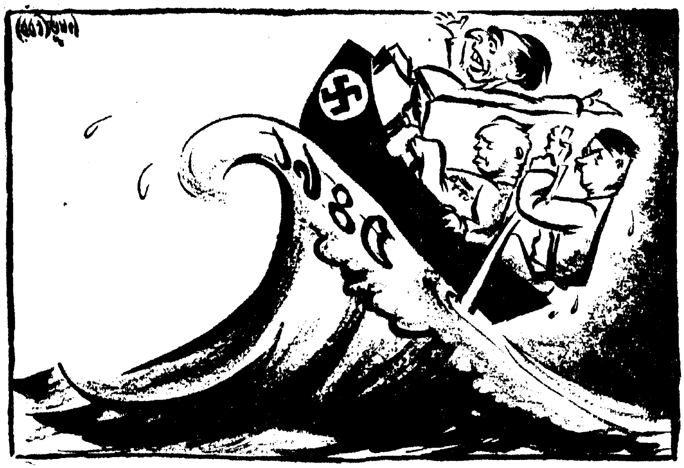
সত্যি করেই আরম্ভ হলো বহ্ন্যুৎসব। আর কোন সংশয় নেই। জনতা চঞ্চল হয়ে উঠছিল। তাদের অনুভবের স্তরে স্তরে এই বহ্ন্যুৎসবের দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ছে। তারা শুধু বুঝতে পারে, লড়াইয়ের নিশানা হয়ে গেল। এইবার আরম্ভ হবে। এ লড়াই যেমন তেমনি লড়াই নয়। এইভাবে সকল অসার সাধ পুড়িয়ে দিয়ে স্তব্ধ হতে হবে।

সভাপতি বললেন—এই যে আগুন জ্বললো আজ, সে-আগুন নিভবে না, যতদিন না স্বরাজ হয়।

জনতা তাই ভাবছিল। আগুনের খেলা থামবে না সহজে। তার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এ-আগুনে কত ঘরের সুখ পুড়ে যাবে, কে জানে। তবু স্বরাজ হবে। তাই ভয় পেলে চলবে না। যা বলেছেন গান্ধী মহারাজ, তাই সত্যি হবে, তাই করতে হবে। অনেক দূর থেকে তারা হেঁটে এসেছে, অনেক দিন থেকেই তারা পথে পথে হাঁটছে, কাঁটা ফুটেছে পায়ে। তাই আজ এ-আগুনকে বরণ করে নিতেই হবে, সকল কাঁটা পুড়ে যাবে।

বহ্ন্যুৎসবের সাড়া দিল সবার আগে সাঁওতাল জনতার মনে। আগুনের উৎসবে তাদের আরণ্য জীবন চিরদিন অভ্যস্ত। জংগলের সকল হিংসাকে তারা আগুন দিয়ে তাড়ায়। শত পুরুষ ধরে তারা আগুনের সামনে নেচে আসছে। আগুনের সম্মুখেই তাদের জীবনের প্রেম নৃত্যপর হয়ে ওঠে, মাদল বাজে। কত অমংগলের ডাইন-ডাইনী পুড়ে ভস্ম হয়েছে এই আগুনের কুণ্ডে। আগুনের ব্রত করে কত রোগ মারী উপদ্রব তারা সংসার থেকে দূর করেছে। শত পুরুষের বীরগাঁথা তারা আজও গান গেয়ে স্মরণ করে। তাদের সংগ্রামের পুণ্য প্রতীক এই আগুন, জন্মের আনন্দ এই আগুনের শিখায়।

সাঁওতাল নরনারী হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে এক সুরে নেচে নেচে গান গাইতে, সুর করে দিল—আগুন জেবলে জংগলের সকল কাঁটা দূর কর, পথ পরিষ্কার কর, গান্ধী মহারাজ আসছেন। অন্ধকার দূর কর, আগুনের আলো জবাল, গান্ধী মহারাজ এসে আমাদের রাঙা পলাশের গাছ দেখতে পাবেন।



ততঃ কিম্ ?

জনতার জয়ধ্বনির মধ্যে গফুরাবাদের মাতব্বরেরা এসে মাথার বিলিতি কাপড়ের পাগড়ী খুলে আগুনে ফেলে দিল।

সভাপতি বললেন—আদালতে কেউ যেও না। নিজেদের ঝগড়া নিজেরা মেটাবো। ভগবান ছাড়া, আমাদের পঞ্চায়েতের চেয়ে বড় কোন আদালত সংসারে নেই।

সাড়া পড়ে গেল জনতার মধ্যে। হাঁ, আর কেউ আদালতে জানাব না। আইনকে তারা ভাল করে চিনেছে। আর আইনের বিচার নেই। ছোট ছোট বৈঠকে জনতা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে আলোচনা হলো। সব শুদ্ধ এগারটি গ্রামের পঞ্চায়েৎ তখুনি তৈরি হয়ে গেল। স্বরাজের নামে শপথ নিল সবাই, পঞ্চায়েৎকে তারা জীবনের সকল কাজে স্বীকার করবে যতদিন না স্বরাজের আদালত হয়।

সভাপতি বললেন—এই ইউনিয়ন বোর্ডের কি প্রয়োজন? গ্রামের কোন উন্নতি হয়েছে? কিছু না। জনতা একবাক্যে উত্তর দিল। দুঃখের বোঝা আরও বেড়েছে। চুরি-ডাকাতি আরও বেশী হয়েছে। ভিখিরীর সংখ্যা বেড়েছে। গাঁজা-আফিমে গ্রামের বুক ভরে গেছে। প্রত্যেক হাটে বেশ্যে বসেছে। জুয়ার দোকান লাইসেন্স পেয়েছে। পুল বাঁধা হয় না, সাঁকো ভেঙে গেছে, পথ টুকরো টুকরো হয়েছে, বাঁধের জল শুকিয়েছে, আর ট্যাকসো বেড়েছে। মানুষ মরলেও ট্যাকসো দিতে হচ্ছে।

সভাপতি বললেন—ইউনিয়ন বোর্ডের সংস্রব ছাড়তে হবে। ওর মধ্যে কোন মঙ্গল নেই। যাঁরা দেশকে ভালবাসেন, যাঁরা দেশ-ভাইয়ের মুখে হাসি ফোটাতে চান, তাঁরা ইউনিয়ন বোর্ড ছেড়ে পঞ্চায়েৎ গড়ে তুলেন। এই পঞ্চায়েৎ আমাদের গ্রামের বুকের হাড়। ভেঙে গিয়েছিল, আবার তাকে জোড়া দিতে হবে।

একে একে নয়জন বোর্ডের সদস্য উঠে এলেন। জনতার সামনে শপথ করলেন—আমরা বোর্ডের সদস্য-পদে ইস্তফা দিলাম।

সভাপতি বললেন—গাঁজা-আফিমের পাপ আমরা স্পর্শ করবো না। এই বিষ আমাদের অমানুষ করছে। পৃথিবীতে কোন সভ্যদেশে এই অনাচার নেই। স্বাধীন দেশের আবগারী বিভাগ গাঁজা-আফিমের বিষ দমন করে। আমাদের সরকারের আবগারী বিভাগ আফিমের বিষ বেচে পয়সা করে। আজ থেকে আমরা এই অন্যায়কে আর সইব না। গাঁজার দোকানের পথ আটক করে আমরা দাঁড়িয়ে থাকবো, আমার ভাইকে আমি বিষ খেতে দেব না। এই আমাদের লড়াইয়ের পথ। লাঠির মারে আমরা হটবো না, বন্দুকের গুলীতে আমরা নড়বো না, সঙ্গীনের খোঁচায় আমরা সরবো না।

জয়ধ্বনির মধ্যে, প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতির কলরবের মধ্যে, বিলিতি কাপড়ের টাটকা ছাইয়ের গরম হাওয়ার মধ্যে সভা ভঙ্গ হলো। সন্ধ্যে হয়ে আসছিল।

জনতা ফিরে চললো। আবার দল বেঁধে মান্দার গাঁয়ের পথ-মাঠ ছাপিয়ে জনতা চললো। সারাদিনের চাঞ্চল্যে ও উপবাসেও তাদের শরীরে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। সাঁওতাল মেয়েদের পিঠে পুটুলী-বাঁধা শিশুরা তেমনি আরামে ও অকাতরে ঘুমোচ্ছে।

স্বরাজের হাওয়া লেগেছে ভারতের সংসারে। তারই ছোটখাট একটি ব্রত হয়ে গেল দীঘির ঘাটের জনসভায়। দুটি গান, দুটি প্রতিজ্ঞা, দু-চারিটি কথা। তবু জনতা যেন বুক ভরে নিয়ে গেল। অনেক কিছু পেল।

জনসভাটা যেন যজ্ঞের মত, কতকগুলি মন্ত্র-স্তব আর আরতির মধ্যে শেষ হয়ে গেল। স্পষ্ট করে কিছু বোঝা গেল না, স্পষ্ট ভাষায় কিছু নির্দেশ দিল না। গফুরাবাদের চাষীরা শান্তভাবেই আবার লাঠি কুড়িয়ে নিল।

কিন্তু সমস্ত জনসভায় মূর্তি আর রব ছাপিয়ে যেন আভাষে একটা বড় কথা ফুটে উঠেছে। সবাই যেন নিজের মনের দিকে তাকিয়ে দেখতে পায়, যত বেদনা লুকিয়ে আছে এইখানে, তারই সমাপ্তির লগ্ন এসেছে ঘনিয়ে। তারই জন্য লড়াই।

(ক্রমশ)



একই উদ্দেশ্যে

শিক্ষার বিষয়বস্তু—ইতিহাস

শ্রীঅনিলমোহন গুপ্ত, এম এ

আমাদের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি যে আলোর চাইতে ধোঁয়া বেশী ছড়াচ্ছে সে কথা বোঝাবার জন্য আজকাল আর কোন প্রবন্ধ লেখার দরকার হয় না। এই ধোঁয়া এড়াবার জন্য আমরা নাকে রুমাল গুঁজে চোখ বন্ধ করে পথ চলি—তার বেশী কিছু করবার আছে বলে ভাববার মত সময় আমাদের নেই। মূল্যবান সময়ের আমরা সদ্ব্যবহার করি পথে ঘাটে মাঠে ক্লাবে আড্ডা দিয়ে, কায়দামাফিক সভায় কেতাদুরস্ত বক্তৃতা করে, অন্নহীনের দেশে লাখ টাকার গল্প আজ রাজা উজীরের রূপ কাহিনী নিয়ে।

শিক্ষার বিকৃতিটা আজকাল কদর্যভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, জাতীয় জীবনের কতখানি বিড়ম্বনা অশিক্ষা ও কুশিক্ষাকে বাহন করে স্তূপীকৃত হতে পারে তা আমরা প্রত্যক্ষ করছি। শিক্ষা বলে যে অদ্ভুত জিনিসটাকে আমরা মেনে নিয়েছিলাম তা যে আমাদের কোন লক্ষ্যে পৌঁছাতেই সাহায্য করছে না তা আজকাল আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বীকার করে নিতে হচ্ছে। এমনকি যাঁরা শিক্ষার নৌকার কর্ণধার হয়ে হাল ধরে বসে আছেন তাঁরাও স্বীকার করছেন যে নৌকাটার আগাগোড়া সংস্কার দরকার। 'অর্থকরী বিদ্যা' কার্যক্ষেত্রে নিদারুণ বিশ্বাসঘাতকতা করছে। স্কুল কলেজের সিঁড়ি বেয়ে রাজদরবারে ভিক্ষাপাত্র হাজির করলেই শূন্য থালি পূর্ণ হবে এই আশায় যাঁরা দিন গুণছিলেন তাঁদের দরবারে পৌঁছার পথও জনতার ভীড়ে অবরুদ্ধ; আবার জনসাধারণের মধ্যে ফিরে যাবার দরজার তালাটিও বন্ধ। আমাদের বর্তমান শিক্ষার যে দেশের মাটির সঙ্গে কোন যোগ নেই একথা সর্বজনস্বীকৃত। প্রাণহীন বলেই এ শিক্ষা স্পন্দনহীন জড়—আজ একশ বছর পরেও জাতির মধ্যে এগিয়ে যেতে পারেনি। এই শিক্ষা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক বলেই একে আমরা সম্পূর্ণভাবে ভুলে যেতে পারি বিদ্যালয়ের গন্ডীর বাইরে পা বাড়িয়েই। গরীবের দেশের বিপুল অর্থ এরই পেছনে শতবর্ষব্যাপী ব্যয়িত হয়েছে আর পরিণামে আমরা লাভ করেছি নির্মম দারিদ্র্য, লোভধর্মী কুশিক্ষা।

তবু এই বিরাট ব্যর্থতার কারণগুলি খতিয়ে দেখার চেষ্টা আমরা অল্পই করি তার কারণ বোধ হয় এই যে শিক্ষাকে আমরা বিলাসিতার বহুবিধ উপকরণের অন্যতম বলে দেখতেই শিখেছি। শিক্ষাকে স্কুল কলেজের ধারণার সঙ্গে আমরা এমন-[illegible] থেকে আমরা একে এতদূরে নিয়ে যেতে শিখেছি, যে শিক্ষার ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলিই আমাদের চোখে পড়ে, তার বিরাট রূপ অতলস্পর্শী প্রভাব আমরা কল্পনাও করতে পারি না। যে জল প্রবাহ বিরাট তড়িৎ শক্তির জন্ম দিয়ে মানুষের সেবায় নিয়োজিত হতে পারে—সে-ই প্লাবনের বেশে গ্রাম নগর বিধ্বস্ত করতে পারে। শিক্ষাকে আমরা মর্যাদা দেই নি। জীবনে একে প্রতিষ্ঠিত করার কোন আয়োজন আমাদের ব্যবস্থার মধ্যে নেই, একে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করা হয়নি, তাই কুশিক্ষার বেশে সে আমাদের নাড়ীতে নাড়ীতে প্রবেশ করেছে। ওটাকে আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের অধঃপতনের মূল কারণ বলে নির্দেশ করতে পারি।

ব্যাপকভাবে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি নির্দেশ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। মোটামুটি বলা যেতে পারে যে ক্রমবিকাশের যে ধারা জগতে আমরা দেখতে পাই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সে ধারার অনুসরণ করেনি। ক্রমবিকাশের প্রত্যেক স্তরে দেখা যায় যে বাইরের জটিলতা বেড়ে চলে কিন্তু ভেতরকার ঐক্য হয় আরো নিবিড়। প্রাণের যখন প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল তখন তা ছিল একটি মাত্র কোষ। আজ সংখ্যাহীন কোষ নিয়ে আমাদের যে দেহ তাতে জটিলতার অন্ত নেই কিন্তু এদের অন্তর্নিহিত ঐক্য আরো নিবিড়। পৃথিবীর বয়স যত বাড়ছে তথ্যও ততই পরিমাণে বাড়ছে, তথ্যকে আমরা নূতন নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে শিখছি। বলা যেতে পারে যে শিক্ষার ক্রমবিকাশের পর্যায়ে পর্যায়ে নূতন নূতন ইন্দ্রিয়ের আবির্ভাবের মত নূতন নূতন বিষয় বস্তুর সৃষ্টি হয়েছে। আমরা কিন্তু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে একীভূত ও প্রাণবন্ত করতে পারিনি। সজীব দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মত এরা আমাদের শিক্ষার প্রাঙ্গণে জঞ্জালের সৃষ্টি করছে মাত্র। আমাদের পাঠ্যতালিকায় ইতিহাস আছে, ভূগোল আছে, ভাষা, বিজ্ঞান, অঙ্ক, কিছুরই অভাব নেই, অথচ প্রত্যেকটি বিষয়ের সঙ্গে অন্যটির অসহযোগ। কতগুলি বিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে জোড়া দিয়ে যেমন কোন সজীব প্রাণীর সৃষ্টি সম্ভবপর নয় তেমনি কতগুলি বিষয়বস্তুকে একত্রিত করে পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করলেই শিক্ষার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা যায় না। পরস্পরের সঙ্গে সংযোগবিহীন, জীবনের স্বাভাবিক পরিবেশ হতে সম্পূর্ণভাবে বিযুক্ত বিভিন্ন বিষয়বস্তু আমাদের শিক্ষাকে ব্যাহত করছে। কি করে বিভিন্ন বিষয়-[illegible] ও প্রয়োজনীয় করে তোলা যায় এই প্রবন্ধগুলিতে আমরা তারই আলোচনা করবার চেষ্টা করব।

ইতিহাস আমাদের পাঠ্যতালিকার একটি বাধ্যতামূলক শিক্ষণীয় বিষয়। আমরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সুরু থেকেই এই বিষয়টি পড়তে সুরু করে থাকি, কিন্তু তবু পৃথিবী বা তার ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা অনন্যসাধারণ। ইতিহাসের কোন ব্যবহারিক প্রয়োগ আমরা জীবনে করি না,—অর্থাৎ অন্যান্য বিষয়ের মত ইতিহাস আমরা বিদ্যালয়ে পড়ে থাকি পরীক্ষা পাশ করার জন্য, জীবনে যে এর কোন প্রয়োজন আছে সে শিক্ষা আমরা কোথাও পাই না। জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন বলে শিশুর কাছে এগুলি অর্থহীন তাই তারা ইতিহাস মুখস্থ করে আয়ত্ত করে না। ইতিহাস শেখা এজনাই শিশুর কাছে কঠিন ভোলা সহজ। আমাদের জীবনে সমস্যার অন্ত নেই,—প্রতিনিয়তই এদের সংখ্যা বেড়ে চলছে। এই সমস্যার অনেকগুলি নূতন আবেষ্টনীর মধ্যে পুরোনো সমস্যারই পুনরাবৃত্তি। যুগ-যুগান্তের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা আমাদের বর্তমান সমস্যাগুলির বিশ্লেষণ করতে ও সম্ভাব্য সমাধানের আবিষ্কার করতে সাহায্য করবে এইটেই ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষা এবং প্রয়োজন। কিন্তু তিথিসালের ও রাজা-রাজড়ার জীবন কাহিনীর আড়ালে ইতিহাসের এই প্রধান উদ্দেশ্যটাই চাপা পড়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ কখনো ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন যে এখানে ভারতবর্ষ কই! আমরা দেশী-বিদেশী রাজা আর যোদ্ধাদের চমকদার জীবনী অসংখ্য পড়ি, কিন্তু যে ভারত বিস্মৃত অতীতের গৌরবময় সিংহাসন থেকে বর্তমানের নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের অমানুষিকতার মধ্যে নেমে এলো তার ইতিহাস কোথায়! বিচ্ছিন্ন কোলাহল, আড়ম্বর ক্ষণিক ঐশ্বর্যের আড়ালে জাতির দুর্ভাগ্যের ইতিহাস চাপা পড়ে গেছে। আমরা কি করে নেমে এসেছি, কোথা থেকে কোন্ পথে আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি;

কি করে আবার উঠতে পারি তা শিশুর কাছে খুলে ধরা হয় না, তাকে উদ্বুদ্ধ করা হয় না জাতীয় দুর্ভাগ্যকে জয় করে সৌভাগ্যের সূচনা করতে, বিভিন্ন সভ্যতার যাত্রাপথের চিহ্ন দেখে নিজের জাতীয়-জীবনের পথটিকে বেছে নিতে। এইখানেই আমাদের ইতিহাস পড়ার প্রথম ব্যর্থতা।

পুঁথিপত্রে আমরা বলে থাকি বটে যে ধারাবাহিকভাবে যুগে যুগে পৃথিবী কেন এবং কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে ইতিহাস তারই পরিচায়ক; কিন্তু বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের হাতে আমরা যে-সব ইতিহাসের বই দিয়ে থাকি তাতে না আছে কোথাও পৃথিবীর সমগ্ররূপ না আছে ধারাবাহিক বিবর্তনের কোন সুসম্বদ্ধ আলোচনা। পৃথিবী সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানটা অনেকটা চার অন্ধের হাতী সম্বন্ধে জ্ঞানের মত। পৃথিবীর সমগ্র রূপ বা কালের যাত্রার ধারাবাহিক ছাপ কোনটাই ইতিহাস পড়ে আমাদের মনের ওপর পড়ে না। স্কুলে আমরা ভারতের ইতিহাস ও ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়ি, কলেজে আমাদের সামনে উপস্থিত করা হয় গ্রীস, রোম, ইউরোপের ইতিহাস। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, প্রথম থেকেই পৃথিবীটাকে টুকরা টুকরা করে আলোচনা করা হয়। যখন আমরা ভারতের ইতিহাসও পড়ছি ইংলণ্ডের ইতিহাসও পড়ছি তখনও আমরা একটা দেশ থেকে আর একটা দেশকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন দেখতে শিখি, ফলে দুই দেশের ইতিহাস এক সঙ্গে বৎসরের পর বৎসর আলোচনা করা সত্ত্বেই যখন এক-দেশে একটা যুগান্তরকারী ঘটনা ঘটছে তখন অন্য দেশে কি হচ্ছে এই খবরটুকুও রাখা প্রয়োজন মনে করি না আর ধারা-বাহিকতার দিক থেকে দেখতে গেলেও আমরা যেভাবে বিভিন্ন দেশের ইতিহাস আলোচনা করি সেটা একান্ত এলোমেলো।

এখানে হয়ত প্রশ্ন উঠতে পারে যে ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়তেই শিশু নাজেহাল হয়ে ওঠে, তার সামনে পৃথিবীর ইতিহাস ধরতে গেলে চাপেই সে মারা পড়বে। ইতিহাস সম্বন্ধে একান্ত ভ্রান্ত ধারণাই আমাদের এই আশঙ্কার কারণ; সাল তারিখ মুখস্থ করা আর রাজা রাজবংশ বীরদের জীবনী মুখস্থ করাকেই আমরা ইতিহাসের মুখ্য বিষয় বলে ঠিক করে ফেলেছি, পৃথিবীর ইতিহাস শিশুর কাছে ধরতে তাই আমরা ভয় পাই। সাল তারিখ জানার কোন প্রয়োজন নেই বা জীবনী পড়া নিষ্প্রয়োজন এটা আমাদের বক্তব্য নয়। জীবনী পাঠ আমাদের যতটা উন্নত করতে পারে তেমন আর কিছুতে পারে কিনা আমার সন্দেহ আছে; কিন্তু জীবনীর আলোচনা আমরা মাতৃভাষা বা অন্যান্য ভাষা শেখার মারফৎ অনেক ভালভাবে করতে পারি। সাল তারিখের বিশদ আলোচনাও ভবিষ্যতের ব্যাপকতর বিশদ ঐতিহাসিক আলোচনার অঙ্গীভূত করে শিশুকে অনেকখানি ভারমুক্ত করা চলে। কোন তারিখে বুদ্ধের জন্ম হয়েছিল, বা কোনদিন সীজার ইংলণ্ডের মাটিতে পা দিয়েছিলেন, কোনবারে ইংরাজরা বণিকের বেশে ভারতবর্ষে এসে নেমেছিল তার সূক্ষ্ম বিচার প্রথম শিক্ষার্থীর কাছে অর্থহীন। কিন্তু যুগের পর যুগ পৃথিবীর কি করে পরিবর্তন হয়েছে, কি করে এবং কেন একটা সভ্যতা গড়ে উঠেছে আবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এগুলি জানার প্রয়োজন তার অত্যন্ত বেশী। কি করে হিংসা ও বিলাসিতা বার বার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সভ্যতাকে ধূলার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে, কি করে সত্যনিষ্ঠা, কর্মনিষ্ঠা, সংঘবদ্ধতা ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত জীবনে মানুষকে উন্নত করেছে তা চোখ মেলে চেয়ে দেখার ও প্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করার প্রয়োজন প্রত্যেক শিশুর রয়েছে। করে একটা ব্যাপার ঘটে বা না ঘটে তা ঘটনা-সমুদ্রের অসংখ্য তরঙ্গের মধ্যে একটাকে জেনে রাখার মত নিরর্থক ব্যাপার কিন্তু যে এই সমুদ্রের ওপর তার পোতখানিকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায় তার পক্ষে কোন জাতীয় ঢেউকে কিভাবে আয়ত্ত করতে হয় তা না জানা মারাত্মক। আমাদের কার্য-সূচীটা কিন্তু ঠিক উল্টা. সন তারিখের বিরাট তালিকা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা নিয়েই আমরা উদ্ব্যস্ত কিন্তু ইতিহাসের ধারাটিকেই আমরা উপেক্ষা করে থাকি। ইতিহাসকে সজীব ও প্রয়োজনীয় করে তুলতে হলে আমাদের নূতন করে ইতিহাস লেখা প্রয়োজন এবং শিক্ষাদানের ব্যবস্থাকে নূতন করে গড়া দরকার। সাত আট বছরের প্রাথমিক শিক্ষায় জগতের ধারাবাহিক অগ্রগতির সঙ্গে শিশুর পরিচয় ঘটার পর বিরাট পৃথিবীর যে কোন অংশের বা যুগের ইতিহাসের বিশদ আলোচনা করবার অধিকার তার জন্মাবে সেটাই স্বাভাবিক।

ইতিহাস সম্বন্ধে আর একটা ধারণা আছে যে ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের জীবনের গল্পের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের বিষয়বস্তু শিশুর সামনে উপস্থাপিত করাই ইতিহাস শেখানোর সবচেয়ে সোজাপথ। এইজন্যে সাধারণ ও শিশুপাঠ্য ইতিহাসগুলি কেবল কতগুলি জীবনচরিতমাত্র হয়ে থাকে। এর উপকারিতা সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে। আমাদের ধারণা এরকমভাবে ইতিহাসের গোড়ার পাঠ-গুলি শিশুর কাছে ধরলে তার অগ্রগতি ব্যাহতই হয়ে থাকে। আমাদের মনে হয় তিনটি কারণে প্রথম থেকেই জীবনীর চাইতে সমাজের ওপর জোর দেয়া দরকার। প্রথমতঃ একটি জীবনের চাইতে একটা সমগ্র সমাজ শিশুর কাছে অনেক বেশী বাস্তব। শিশুর পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে যুক্ত করে শিশুকে জীবনী যতটা শেখানো যায় তার চেয়ে অনেক বেশী পারা যায় সামাজিক নানাবিধ অবস্থার কথা শেখাতে। ব্যক্তি বিশেষের জীবনকথার চেয়ে সামাজিক আচার-ব্যবহার, বিশ্বাস অবিশ্বাস, রীতিনীতি, সুখ দুঃখ শিশুকে অনেক বেশী আকর্ষণ ও মুগ্ধ করে তাই এই জীবনী আলোচনা করার চেয়ে একটা সমগ্র সমাজের বিকাশকে আয়ত্ত করা তার পক্ষে সহজ। জীবনী শেখার অনেক সোজা উপায় হচ্ছে ভাষা শিক্ষা ও অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। মহৎ জীবনের অধিকাংশ চিন্তা ও সংগ্রাম শিশুর কাছে সহজ বোধগম্য নয়, তাই জীবনীকে সাজানো প্রয়োজন ঐতিহাসিকভাবে নয় শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে।

দ্বিতীয়তঃ জীবনীর ওপর অতিরিক্ত প্রাধান্য আরোপ করলে ইতিহাসের গতি ব্যাহত হয়। যুগে যুগে যুগ পরিবর্তনের মূলে যাঁরা থাকেন তারা তখনকার সামাজিক ব্যবস্থার প্রয়োজনেই সৃষ্ট হয়ে থাকেন। সমাজের সমস্যাগুলির আলোচনা করতে গেলে তাঁদের জীবনী স্বাভাবিক-ভাবেই জীবন্ত পটভূমিকার ওপর আলোচিত হতে পারে। আমরা কিন্তু সাধারণতঃ জীবনীটাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি এবং একটি ব্যক্তি বিশেষকেই বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা করতে গিয়ে ইতিহাসের জীবন্ত ধারাটিকে হারিয়ে ফেলি।

তৃতীয়তঃ মানুষের হৃদয় নামক পদার্থটা জীবনী আলোচনার কালে বার বারই আমাদের ভুল পথে নিয়ে যায়। বীরপূজা আমরা করে থাকি এবং সেটা করাও হয়ত ভাল। কিন্তু বীরত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন মানুষের মান আলাদা তাই বীরকে সম্মান দেখাতে গিয়ে আমরা অনেক সময় ইতিহাসের অবমাননা করে থাকি। আমাদের অহেতুক ঘৃণা বা ভালবাসার দ্বারা ইতিহাস অনেক সময় রঞ্জিত হয়ে থাকে। সমগ্র সমাজকে আমাদের ইতিহাস পাঠের কেন্দ্র করলে আমরা এর কুফল থেকে অনেকটা মুক্ত হতে পারি।

আমরা তাই ইতিহাস যুগানুক্রমিকভাবে সাজাবার প্রস্তাব করি। পৃথিবীর জন্ম হতে আমাদের বর্তমান কাল পর্যন্ত সময়কে আটটা ভাগ করে এবং সমাজকে কেন্দ্র করে ইতিহাস শেখানোর কাজ আরম্ভ করলে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাটা সার্থক হবে বলেই আমাদের ধারণা। অবশ্য আমাদের শিক্ষাদান ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ নূতন করে গড়তে হবে সেকথা পূর্বেই বলেছি। শিশু শিখবে তার অন্তরের তাগিদে পরীক্ষা পাশ করার জন্য মুখস্থ করে নয়। নূতন শিক্ষাদান ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা আমরা অন্যত্র করার চেষ্টা করেছি।

লেখু-ভেক

অ · ক্রূ · র

এবারে কবি ও কবিতা সম্বন্ধে খানিকটা আলোচনা করিব ঠিক করিয়াছি। কবিতা-টবিতা এককালে লিখিতাম বটে, কিন্তু আমি ঠিক কবি নই। তবু এক্ষেত্রে আলোচনার সুবিধার জন্য কল্পনা করিয়া নিতেছি আমি কবি। ধৃষ্টতা হইলে মার্জনা করিবেন।

*　　*　　*

আমার মধ্যে দুই আমি রহিয়াছে—কবি আমি এবং সাধারণ মানুষ আমি। এই দ্বিত্বের কথাটা ভুলিলে অনেক ভুলে পড়িবেন, এক আমির ব্যাপার অন্য আমির ঘাড়ে চাপাইয়া। যেমন ধরুন কবি আমি কবিতায় কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেই যে বাস্তবে হরিণ-নয়না কালো মেয়েকেই বিবাহ করিব, এরূপ আশা করিলে ভুল করিবেন, কেন না বিবাহ যে করিবে সে সাধারণ মানুষ আমি, কবি আমি হইতে আলাদা। কাব্যে মুগ্ধ হইতে হাঙ্গামা নাই কিন্তু কাব্যের মুগ্ধতার জের বাস্তবে টানিতে হইলেই বিপদ। ... এককালে আমি একটি কবিতায় আকাশের দিকে তাকাইয়া বুক পাতিয়া শত শত বজ্রকে একসঙ্গে চ্যালেঞ্জ করিয়াছিলাম। আমার কবিতার সেই বজ্র চ্যালেঞ্জ দেখিয়া জনৈক পাঠক বড় আশা করিয়া আমার বজ্র-ঠেকানো বুক দেখিতে আসিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য তিনি বড় নিরাশায় ফিরিয়া গিয়াছিলেন। ভদ্রলোকের এ কথাটা জানা ছিল না যে কবিতার বুকে এবং বাস্তব বুকে অনেক তফাৎ। ... যে কবি কবিতায় দানছত্র খুলিয়া বসিয়াছেন তাঁহার কাছে একবার গিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চান তো দেখিতে পারেন, কিন্তু মনিব্যাগটা বাড়ীতে ফেলিয়া যাওয়াই নিরাপদ হইবে, কেন না ভদ্রলোক হয় তো ফস্ করিয়া কিছু ধার চাহিয়া বসিতে পারেন। ... কবি আমি কবিতায় "এসো হে আর্য এসো হে অনার্য" বলিয়া দুবাহু বাড়াইলেও সাধারণ মানুষ আমি বাস্তবে "ভাগো হে আর্য ভাগো অনার্য" বলিয়া অনায়াসেই দুহাতে ঘুষি দেখাইতে পারি। এবং তাহাতে কিছু অসঙ্গতি হয় বলিয়াও আমি মনে করি না। ডাক্তার জেকিল্ (Dr. Jekyll) যাহা করিবেন মিস্টার হাইড্ (Mr. Hyde)ও যে তাহাই করিবে এমন কোনো কথা নাই। এই দ্বিত্বের কথাটা মনে রাখিলে অনেক অকারণ দুঃখের হাত হইতে বাঁচিয়া যাইব।

*　　*　　*

মনে পড়ে ইংরাজ কবি আলেক্জাণ্ডার পোপের (Alexander Pope) কয়েকটি লাইন ছেলেবেলায় পড়িয়াছিলাম:

"Thus let me live unseen, unknown,
Thus unlamented let me die,
Steal from the world, and not a stone
Tell where I lie."

অর্থাৎ "জীবনটা যেন আমার লোকচক্ষুর আড়ালেই কাটে, আমার মৃত্যুতেও কেউ যেন শোক না করে। পৃথিবী হইতে চুপচাপ যেন আমি সরিয়া পড়ি, আমার কবর যেন কোন প্রস্তর ফলক দ্বারা আবৃত হইয়া আমার অন্তিম শয্যার স্থান প্রদর্শন না করে।" আমি তখন স্কুলের নীচু ক্লাশের ছাত্র, প্রত্যেক কবির মধ্যে যে একটি কবি আমি এবং একটি সাধারণ আমি থাকে, অতশত জানা ছিল না। কবির ধাপ্পা-বাজীর কথা মনে করিয়া ব্যথিত হইয়া শিক্ষক মহাশয়কে প্রশ্ন করিলাম কবিতায় যেরূপ লিখিয়াছেন, যদি বাস্তবিক তাহাই কবির অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে এত ঘটা করিয়া কবিতা লেখার এবং তাহা প্রকাশ করার দরকার হইল কেন? শিক্ষক মহাশয়ের অতি স্পষ্ট জবাবটি এখনও মনে আছে—একটি প্রচণ্ড চপেটাঘাত। তাঁহার উপর তখন অত্যন্ত, অথচ অসহায়ভাবে চটিয়াছিলাম বটে, কিন্তু এখন আর কোন রাগ নাই। এখন বুঝিতেছি আমার বাহ্যত অবান্তর প্রশ্নে যে বেদনা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই অথবা আমার প্রশ্নের যথাযোগ্য জবাব ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই বলিয়াই আমাকে চপেটাঘাত করিয়াছিলেন।

*　　*　　*

এবারে আমার আগের কথাতেই ফিরিয়া আসা যাক্। আরেকবার পাঠককে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, বর্তমান আলোচনায় নিজেকে আমি কবি বলিয়া কল্পনা করিয়া নিয়াছি।

আমি কবিতা লিখি কেন? যেমন ক্ষুধা পায় বলিয়া খাই, তৃষ্ণা পায় বলিয়া পান করি, হাসি পায় বলিয়া হাসি, কান্না পায় বলিয়া কাঁদি, তেমনি কবিতা পায় বলিয়া কবিতা লিখি। হাসি না পাইলে হাসি যেমন হয়, অথবা কান্না না পাইলে কান্না যেমন হয়, কবিতা না পাইলে জোর করিয়া লেখা কবিতাও ঐ জাতীয়ই হইয়া থাকে। যাহাদের কবিতা পায় না, অথচ কবিতা লেখার ইচ্ছা আছে, তাহাদের উপকারার্থে আমি একখানি 'সরল কবিতা-রচনা শিক্ষা' রচনা করিবার পরিকল্পনা করিতেছি; ইহাতে সরল ও জটিল, সমিল ও বেমিল, গদ্য ও পদ্য প্রভৃতি নানা জাতীয় কবিতার রচনাপ্রণালী অতি সরল ভাবে লিপিবদ্ধ থাকিবে। পুস্তিকাটি প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত অনিশ্চিতভাবে অপেক্ষা করিবার ধৈর্য যাহাদের নাই, তাঁহাদের কিছুটা ঠাণ্ডা করিবার জন্য এখানে খানিকটা নমুনা দিতেছি।

*　　*　　*

মনে করুন একটি প্রেমের কবিতা লিখিতে হইবে। জনৈক আনাড়ী বন্ধু সুরু করিয়াছিলেন:

"মিলন হবে তোমার সাথে না জানি কোন্ লগনে"

অত্যন্ত গোলমেলে লাইনটি। প্রথমতঃ, 'লগনে'র সঙ্গে আপনি মিল দিবেন কি দিয়া? একেবারে 'ক' হইতেই সুরু করিয়া দেখুন: কগনে, খগনে, গগনে, ঘগনে ... ইত্যাদি। মিল দিবার কিছুই পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ, বাক্যটির অর্থ অত্যন্ত পরিষ্কার, বর্তমান যুগের কবিতার উপযোগী যথেষ্ট পরিমাণে ঘোলাটে নয়। তৃতীয়তঃ, প্রেম-পক্ষীর দুইটি পক্ষ—মিলন ও বিরহ। দ্বিতীয় পক্ষকে একেবারে জাজ্বল্যমানভাবে বাদ দেওয়ার ফলে সে পক্ষটির পক্ষপাতী দলকে বিরূপ করায় চালে ভুল হইল। কারণ এমনিতেই কবিতার পাঠক এত কম যে, তাহার উপর একদল পাঠককে অখুসী করিয়া হারানো সোজা লোকসান নয় কবির পক্ষে। এ যুগে কবিতা যাহারা পড়ে তাহাদের বিশেষত্ব এই যে, কবিতার অর্থ পরিষ্কার বুঝিতে পারিলে [illegible] বিগড়াইয়া যায়, অর্থ বুঝিতে না পারিলে তত বিগড়ায় না। "অসম্ভব লিখেছে মাইরি, কিচ্ছু বুঝতে পারলুম না" এ জাতীয় সপ্রশংস উক্তি এ যুগেরই বিশেষত্ব।

কবি আমি এইরূপ সুরু করিয়াছিলাম:

"তোমারে বুঝেছি কিনা বুঝি নাই,
আজো বুঝি নাই।"

বুঝুন একবার কি ব্যাপার! প্রথমেই একটা হেঁয়ালি, যাহা পাঠক-পাঠিকাকে ভাবাইয়া তোলে। কবির এই সংশয়-দোলায় দোদুল্যমান অবস্থা তাহাদেরও দোলায়। "হয়তো কবি বুঝিয়াছেন, কিন্তু বুঝিতে পারেন নাই যে তিনি বুঝিয়াছেন। অথবা হয়তো বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু বুঝিতে যে পারেন নাই তাহাও নিশ্চিতভাবে বুঝিতে পারেন নাই। অথবা হয় তো ......" ইত্যাদি।

তারপর মিলের ব্যাপারেও কত সুবিধা! 'নাই'-র সঙ্গে অনেক কিছু মেলে; 'ক' হইতে আরম্ভ করিয়া দেখুন। 'কাই' মিলিলেও বাঙলা ভাষা বহির্ভূত বলিয়া অচল, কিন্তু আগে একটি 'তা' লাগাইলেই 'তাকাই' হইয়া বেশ সার্থকভাবেই মেলে। তারপর খাই, গাই, চাই, ছাই, (বা) জাই অথবা (সা)জাই, (বু)ঝাই, (কা)টাই অথবা (ফা)টাই, ঠাঁই, (আই)ঢাই; তাই, (ব)থাই অথবা (ক)থাই, (স)দাই, ধাই, পাই, (লা)ফাই, বাই, ভাই, ইত্যাদি। মিলের একেবারে ছড়াছড়ি; বাঁশবনে ডোমকানা না হইয়া মাথা ঠাণ্ডা করিয়া দরকারমত বাছিয়া নিয়া কাজে লাগাইতে পারিলেই হইল।

এই শব্দ-তালিকা হইতে আমি 'তাই' বাছিয়া নিয়াছিলাম এবং দ্বিতীয় লাইনটি এরূপ লিখিয়াছিলাম:

"কাঁদিয়া হারায় সুর বাঁশী মোর বারে বারে
তাই।"

প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাইয়া যাওয়ার পর হইতে প্রেম কাব্যে বাঁশীর স্থান কায়েমী হইয়া আছে, প্রেমের মত বাঁশীও পুরাতন হয় না। আর কান্নাকে একেবারে বাদ দিয়া যে প্রেম তেমন দানা বাঁধে না, এ কথা প্রেমিক মাত্রেই জানেন। সুতরাং প্রেমের কবিতায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ জিনিসটা কোন-না-কোন আকারে ঢুকাইতেই হইবে। যথা আঁখিজল, আঁখিঝরে, নয়নসজল, অশ্রু, ছলছল, বাদল ইত্যাদি। তাছাড়া আমার এ লাইনটিতে হেঁয়ালিরও অভাব নাই। বাঁশী কাঁদিয়া সুর হারাইবেই বা কেন এবং কিভাবে হারাইবে? প্রশ্নকর্তা একটু দার্শনিক ধরণের হইলে প্রশ্ন করিতে পারেন "সুর জিনিসটা আসলে থাকে কোথায়?"

কবিতাটির প্রয়োগক্ষেত্র যথাসম্ভব ব্যাপক করিবার উদ্দেশ্যেই আমি 'প্রিয়' এবং 'প্রিয়া' (অথবা অনুরূপ কোনো শব্দ) ব্যবহার করি নাই, এবং কবিতাটি যাহার উক্তি তিনি এই দুই জাতের মধ্যে কোন্ জাতের এ সম্বন্ধে কোথাও স্পষ্ট ইঙ্গিত দেই নাই। ফলে প্রিয়গণ ইহাতে প্রিয়ার উদ্দেশে তাঁহাদের মনের কথার সুর পাইবেন, এবং প্রিয়াগণ পাইবেন প্রিয়র উদ্দেশে তাঁহাদের মর্মবাণীর প্রতিধ্বনি। অথবা প্রিয়গণ কবিতাটিকে নিজ নিজ প্রিয়ার উক্তি কল্পনা করিয়া রোমাঞ্চ অনুভব করিবেন, এবং প্রিয়া পাঠিকাগণ নিজকে এই কবিতাটির লক্ষ্য কল্পনা করিয়া রহস্য-ঘায়েল প্রিয় বেচারাদের প্রতি অনুকম্পায় পুলকিতা হইয়া উঠিবেন। কবিতাটি এখনো কোথাও ছাপা হয় নাই এবং

দেওয়া হইবে কিনা জানি না, কিন্তু দিতে হইলে দেওয়া যায় "যে কোনো প্রিয়ের প্রতি যে কোনো প্রিয়া" অথবা "যে কোনো প্রিয়ার প্রতি যে কোনো প্রিয়"—ইংরাজ কবি রবার্ট ব্রাউনিং-এর (Robert Browning) "যে কোনো স্বামীর প্রতি যে কোনো স্ত্রী"র (Any wife to any husband) অনুকরণে।

এবারে 'নাই' ও 'তাই'র সঙ্গে মিল দিতে হইবে। ফর্দের সুরু হইতে দেখা যাক। প্রথমেই 'তাকাই'। তাকানো বাদ দিয়া প্রেম হইতে পারে না। এখন প্রশ্ন, তাকানোটা 'তোমা'পানে হইবে, না 'আকাশ' পানে হইবে? (প্রেম যেখানে অতলস্পর্শ, সেখানে 'তুমি' ও 'অকাশ'-এর মাঝামাঝি আর কিছু টানা অশোভন।) অনেক ভাবিয়া এক্ষেত্রেও এক ঢিলে দুই পাখী মারিবার ব্যবস্থা করিলাম 'তুমি' ও 'আকাশ'কে এক সঙ্গে মিলাইয়া দিয়া। 'তাকাই' মিলটি ব্যবহার করিতে হইবে পঞ্চম লাইনে, ইতিমধ্যে দু-লাইনের (তৃতীয় ও চতুর্থ) শেষে ব্যবহার করিতে হইবে অন্য মিল। পঞ্চম লাইনে যে চরম পরিণতি দেখাইব, তৃতীয় ও চতুর্থ লাইনে তাহার বিবর্তন দেখাইতে হইবে। লিখিলাম :

"মনে হয় সীমাহারা আকাশের তারায় তারায়
মোর দুটি আঁখিতারা বারে বারে আপন হারায়
তৃপ্তিহীন দুই চোখে তোমাপানে যখনি তাকাই।"

অর্থাৎ তোমাপানে তাকানোও যা, অসীম আকাশের পানে তাকানোও তাই—এ দুয়ের যেদিকেই তাকাই না কেন, আমার আঁখিতারা দুটির অবস্থা একই হয়। ('আকাশের' তারার সঙ্গে 'তোমার' কিসের তুলনা করা যাইবে ইহা একটা সমস্যা বটে। আমি 'হারায়' কথাটির সঙ্গে মিল দিবার জন্যই দায়ে ঠেকিয়া 'তারায়' কথাটি লাগাইয়াছি। কিন্তু আমার মনে হয় আকাশের সঙ্গে তুলনার সম্মান লাভের আনন্দে 'তুমি' এই সামান্য খুঁটিনাটি লইয়া মাথা ঘামাইবে না। আকাশের সঙ্গে তাহার তুলনা বাস্তবিক চলে কিনা তাহা লইয়াও 'তুমি' মাথা ঘামাইবে মনে হয় না, কেন না মিষ্টি কথাকে মিথ্যা বলিয়া জানিলেও বিশ্বাস করিতে ভাল লাগে।)

তাহা হইলে এবারে কবিতার পাঁচটি লাইন মোটের উপর এইরূপ দাঁড়াইল :

"তোমারে বুঝেছি কিনা বুঝি নাই,আজো
বুঝি নাই!
কাঁদিয়া হারায় সুর বাঁশী মোর বারে বারে তাই।
মনে হয় সীমাহারা আকাশের তারায় তারায়
মোর দুটি আঁখিতরা বারে বারে আপন হারায়
তৃপ্তিহীন দুই চোখে তোমাপানে যখনি
তাকাই।"

ইহার পরে 'খাই' মিলটি ব্যবহার চলে কি? লায়লী-মজনু, রোমিও-জুলিয়েট, শিরী-ফরহাদ প্রভৃতি জগতের শ্রেষ্ঠ প্রেমিক প্রেমিকারাও খাওয়া জিনিসটাকে বাদ দিয়া চলিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু প্রেমের মত সূক্ষ্ম ব্যাপারে খাওয়ার মত স্থূল ব্যাপারের অবতারণা না করাই ভাল। 'গাই' (গান গাওয়া অর্থে), ঠাঁই, প প্রভৃতি মিল ব্যবহার করা চলে।

* * * *

নমুনা যথেষ্ট হইয়াছে, আর নয়। আপনা বুঝিতে পারিয়াছেন যে মিলের একটা ফ আগে করিয়া নিয়া তারপর বাকী অংশগু ভরাইবার জন্য একটু মাথা খাটাইলেই কবি লেখা যায়। এমন কিছু কঠিন কাজ না অর্থাৎ কবিতা লেখক হওয়া কঠিন নয়। কি কবি ইচ্ছা করিলেই হওয়া যায় না। কবির লেখককে ভাষা ও মিল খুঁজিতে হয়, কি ভাষা ও মিল নিজেরাই কবিকে খুঁজিয়া বাহি করিয়া ধরা দেয়।

* * * *

বেমিল বেছন্দ গদ্য কবিতা এ যুগের কবি বেশ প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। (আমি কাহাকে চটাইতে চাহি না বলিয়াই যাহাদের মাত্র 'কবিত লেখক' বলা উচিত তাহাদেরও কবি বলিতেছি ইহার অন্যতম কারণ এই যে, ইহাতে সা সছন্দ পদ্য-কবিতা লেখার মত হাঙ্গামা না ......এই এলোমেলো যুগে অধিকাংশের জীবনে মিল, ছন্দ, সুর খুঁজিয়া পাওয়া যায় ন অধিকাংশ জীবন-ধারকই জীবন ধারণেই কো অর্থ খুঁজিয়া পায় না। বর্তমান কবিতাও যদি বর্তমান জীবনের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে চায় তাহা হইলে বিস্মিত বা দুঃখিত হওয় উচিত নয়।

ব্যবসা বাণিজ্য

সিকিম দার্জিলিঙের বাজার

অধ্যাপক শ্রীঅনিলকৃষ্ণ সরকার

বাঙলার উত্তরে হিমালয় অঞ্চলে অন্ন-সংস্থান করিবার কি সুযোগ সুবিধা বাঙালী যুবকের আছে, তাহাই এই প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। সিকিম রাজ্যের অধিবাসীর সংখ্যা এক লক্ষের কিছু উপরে এবং দার্জিলিঙ জেলার লোকসংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। শহর, চা-বাগান ও বাজারের অধিবাসীদের প্রয়োজনীয় চাউল, ডাইল প্রভৃতি খাদ্য দক্ষিণস্থ বাঙলার সমতল হইতে প্রেরিত হয়। এতদ্ব্যতীত বস্ত্র, তৈজসপত্রাদি এখানে অন্যত্র হইতে আমদানী হয়। এই সব ব্যবসায় বহুকাল পূর্বে হইতে মারোয়াড়ী মহাজনগণ করিয়া আসিতেছে।

সিকিম দার্জিলিং হইতে কাঠ, চা, কমলা-লেবু, বড় এলাচ, ঘৃত, মাখন ও চামড়া ও বীজের জন্য আলু রপ্তানি হয়। বাঙালী পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলি কারবারের প্রসারের এদিকে সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে। যাঁহাদের মূলধন মাঝামাঝি রকমের তাঁহারা এতদ-ঞ্চলের বাজারগুলিতে দোকান বা আড়ৎ খুলিতে পারেন। আর যাঁহাদের অল্প মূলধন তাঁহারা ছোট বাজারে মাল কিনিয়া নিকটস্থ বড় বাজারে বেচাকেনা করিতে পারেন। এজন্য তাঁহাকে মাল বহনের জন্য বোল্‌দে ঘোড়া রাখিতে হইতে পারে। ইহা ছাড়া তাঁহারা রাং ঝালাই, ছাতি মেরামতি, ফোটোগ্রাফী প্রভৃতির ব্যবসায়ও করিতে পারেন। তিব্বতের পশম এবং ঐ দেশের অধিবাসীদের প্রয়োজনীয় সুতী বস্ত্রাদি ও ধাতব তৈজসপত্রাদি কালিম্পঙ বাজার হইয়া আমদানী রপ্তানি হয়। কাজেই এখানেও ব্যবসায়ের সুবিধা আছে।

হিমালয় পাহাড়ের দক্ষিণে ও পদতলে বাঙলার সমতলভূমি। ইহার অল্পখানিক অংশ দার্জিলিঙ জেলার মধ্যে পড়ে। উহা তরাই ও দুয়ার নামে পরিচিত। এই জায়গায় যথেষ্ট ধান ও পাট এবং চা ও কাঠ উৎপন্ন হয়।

তরাই ও পাহাড় অঞ্চলে চাষ-আবাদের জন্য বাঙালীরা জমি পায় না। তবে যদি পাহাড়িয়া পত্নী বিবাহ করে, তাহা হইলে পত্নীর নামে জমি পাইতে পারে। কিন্তু রেল রাস্তা ও বড় বড় বাজার এবং কালিমপঙ শহরের ডেভলপমেন্ট এরিয়ায় কমলা, ডেয়ারী, আনারস, কপি প্রভৃতি আবাদের উপযোগী জমি যে কোন বাঙালীই পাইতে পারে। এক্ষণে সিকিম ও দার্জিলিঙ জেলাস্থিত বিভিন্ন বাজার-গুলির অবস্থান ও বিবরণ দিব।

শিলিগুড়ি দার্জিলিঙ জেলার একটি মহকুমা শহর ও বড় গঞ্জ। এখান হইতে পশ্চিমে বিহারে কিষেণগঞ্জ, উত্তরে দার্জিলিঙ এবং উত্তর-পূর্বে গেলখোলা বা তিস্তা ব্রীজ বাজার পর্যন্ত ৩টি রেলপথ গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত পশ্চিমে তিতুলিয়া, উত্তরে পানিঘাটা পাকা বাড়ি, দার্জিলিঙ, গেলখোলা-কালিম্পঙ প্রভৃতি স্থানের দিকে ৪টি মোটর রাস্তা এখান হইতে নির্গত হইয়াছে। কালিম্পঙগামী রাস্তার সিবোক নামক স্থান থেকে একটি মোটর রাস্তা তিস্তা নদী পার হইয়া জলপাইগুড়ি

তরাইএ প্রবেশ করিয়াছে। অল্প পুঁজিয়ালা অনেক বাঙালী বেপারী শিলিগুড়ি হইতে মাছ ও ডিম লইয়া এই ৪টি রাস্তার উপর অবস্থিত বাজারগুলিতে বেচিয়া আসে। শিলিগুড়িতে বহু কাঠ গোলা ও ২।৩টি চাউলের কল আছে। এখান হইতে ধান, পাট রপ্তানি হয়।

কিষেণগঞ্জ রেলপথে মাটিগাড়া ও গলগলি। মাটিগাড়াতে পাট ও অন্যান্য দ্রব্যের বেচাকেনার জন্য প্রতি সপ্তাহে বড় হাট বসে। পাংখাবাড়ী ও পাণিঘাটা ছোট বাজার, স্থানীয় চা-বাগানের মজুর এখানে তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য খরিদ করে। পাণিঘাটায় নেপাল তরাই হইতে মাখন আমদানী হয়। এই দুইটি বাজার কার্সিয়াং পাহাড়ের পদতলে ৭।৮ মাইলের মধ্যে অবস্থিত।

পাণিঘাটা হইতে একটি টাট্টুর চলার উপযোগী পথ মিরিক পাহাড়ে উঠিয়াছে। মিরিক বাজার হইতে চামড়া রপ্তানি হয়। মিরিক থেকে আর একদিনমানের পথ দূরে সুকিয়া বাজার; নেপালের আলু, মাখন ও চামড়া বিস্তর পরমাণে এখানে আমদানী হয়।

সুকিয়াথেকে নেপাল দার্জিলিং সীমান্ত ধরিয়া একটি টাট্টুপথ উত্তরে গিয়াছে। সুকিয়ার ৩ মাইল পশ্চিমে 'সীমানা-বস্তী' ছোট বাজার। ঐ টাট্টুপথ ধরিয়া তুমিলিং, সান্দককু ও ফালুলিং-এ যাওয়া যায়। এই সব জায়গায় বাজার নাই। তবে এই অঞ্চলে লেপচা ও নেপালীদের গরুর গোষ্ঠ আছে। মাখন তৈয়ারী হয়। এই মাখন ব্যবসায়ে মারোয়াড়ী ও ইউরোপীয় মহাজনদের দাদন রহিয়াছে।

ফালুলিং থেকে খানিক উত্তরে গিয়ে সিকিম রাজ্যের ডেন্টাম বাজারে নামিতে হয়। ডেন্টাম থেকে একদিনের পথ দূরে কেজিং ও রিঞ্চেনপঙের বাজার। ডেন্টাম ও কেজিং থেকে মাখন, চামড়া ও বড় এলাচ রপ্তানি হয়। রিঞ্চেনপঙ থেকে ২ দিনে সিঙলা বাজার। আর একদিন পথ দূরে পুল বাজার। পুল বাজার থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত গোয়েঙ্কা কোম্পানীর ইলেকট্রিক রেলওয়ে আছে। ইহার সাহায্যে আলু দার্জিলিং বাজারে আমদানী হয়। কিছু মাখন, বড় এলাচ ও কমলা এই পথে যায়।

কেজিং থেকে মধ্য বা দক্ষিণ সিকিমের প্রধান শহর নামচী যাইতে হয়। এই নামচী বাজার সিকিমের সর্বাপেক্ষা জনবহুল অঞ্চল মধ্যে অবস্থিত। এই বাজার হইতে কমলা, মধু, বড় এলাচ, চামড়া রপ্তানি হয়। নামচী থেকে উত্তরে তিস্তার খাদে নামিতে হয়। তিস্তার ঝুলা পুলে পার হইয়া এক মাইল দক্ষিণে সিংতাম বাজারে যাইতে হয়। সিংতাম লাঙ্গটক-গামী মোটর রাস্তার উপর স্থিত। ডেন্টাম, কেজিঙ, নামচী প্রভৃতি স্থানের কিছু দূরে উত্তর-পশ্চিমে কাঞ্চনজঙ্ঘার বরফ রাজ্য। গোষ্ঠ চারণ ও মধু আহরণই এই অঞ্চলের অধিবাসীদের একমাত্র উপজীবিকা।

শিলিগুড়ি হইতে রেল ও মোটর পথে ৩২ মাইল দূরে তিস্তা ব্রীজ বাজার। এখানে সিকিমের কমলা মোটরপথে আসিয়া রেলে উঠে। এই মোটরপথের এক শাখা ১০।১২ মাইল দূরে কালিমপঙ গিয়াছে। অপর শাখা মল্লী, রংপু ও সিংতাম বাজার হইয়া ৪০ মাইল দূরস্থিত সিকিমের রাজধানী লাঙ্গটক পৌঁছিয়াছে। লাঙ্গটকের উচ্চতা প্রায় ৬০০০ হাজার ফুট- দার্জিলিঙের ন্যায়। উত্তর সিকিমে তৈয়ারী রাগ বা কম্বল, চামড়া, আপেল, সামান্য মাখন এবং তিব্বতের কাম্পাজঙ প্রদেশ থেকে রপ্তানি উল, গালা প্রভৃতিও এখানে কিছু আমদানী হয়। মারোয়াড়ী, পেশোয়ারী প্রভৃতির দোকান আছে। স্কুল মাস্টার ছাড়া বোধ হয় কোন বাঙালী বাসিন্দা নাই।

লাঙ্গটকের উত্তরে ২।৩ দিন পথ দূরে চুঙথাঙ, তারপর লাচেন ও লাচুঙ। এখানে কুটিরশিল্প হিসাবে সিকিমের বিখ্যাত রাগ তৈরী হয়। আপেলের বাগান সামান্য এই অঞ্চলে আছে। এদের পরেই তিব্বতের কাম্পাজঙ প্রদেশ।

কালিমপঙ থেকে একটি রাস্তা তিব্বতের গিয়াংসি ও লাসা অভিমুখে গিয়াছে। এই পথে পেদঙ, রেণক, রোঙলী নামীয় ছোট ছোট বাজারগুলি অবস্থিত। তারপর ১২০০০ ফুট উপরে নাথাং বাজার। সার্থবাহীদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য এই বাজারগুলি চলে। এই পথের আলগড়া থেকে একটি রাস্তা লাবা বাজার হইয়া দক্ষিণ জলপাইগুড়ি ডুয়ার্সের ডামডিমের দিকে নামিয়া গিয়াছে। কালিমপঙ থেকে প্রায় ৩২ মাইল দূরে এই পথের উপরে গোরুবাথান বাজার। এখানে কমলা ও মাখন আমদানী হয়; ইহা বাঙলার সমতলভূমির উপর অবস্থিত।

ডামডিম থেকে মালবাজার চালসা হইয়া ঘোড়া বা মোটরপথে হিমালয়ের তোডে-শৃঙ্গের নিম্নদেশে নামিয়া তোডে-তাঙ্গদা বাজারে যাওয়া যায়। সেখানে ভুটিয়ারা মাখন বেচিয়া কেরোসিন ও লবণ লইয়া যায়। অল্প পুঁজীপতি উৎসাহী বাঙালী এই স্থানেও দোকান খুলিতে পারে। এখানে আজও কোন মারোয়াড়ী যায় নাই।

দার্জিলিঙ রেলপথে ঘুম থেকে সোনাদা ও টুঙ পর্যন্ত রেলপথের নিম্নে বিস্তর কপির আবাদ। উহাই গ্রীষ্মকালে কলিকাতায় আমদানী হয়। সোনাদায় বহু পাহাড়িয়া গোয়ালার বাস। সেখানে বসিয়া একজন বাঙালী ডেয়ারী ব্যবসা করিতেছেন।

রাও বিল

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

রাও কমিটির প্রস্তাবিত হিন্দু কোড বা সংহিতার প্রধান লক্ষ্য ২টি—(১) বৃটিশ ভারতের হিন্দুরা এখনও যেসব বিষয়ে প্রাচীন হিন্দু আইন দ্বারা শাসিত হয়, সে সব বিষয়ে বৃটিশ ভারতবর্ষের সমস্ত হিন্দুর জন্য এক আইনের প্রবর্তন; (২) প্রাচীন হিন্দু আইনের বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী যে সকল সংস্কার বা পরিবর্তন প্রয়োজন, সেই সকল সংস্কার ও পরিবর্তনের ব্যবস্থা করা। এই লক্ষ্য ২টির প্রথমটি বৃটিশ ভারতের সমস্ত হিন্দুকে এক অখণ্ড হিন্দুজাতিরূপে পরিণত করার একটি বড় উপায়। বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ভাষাভাষী হিন্দুগণের মধ্যে বর্তমান অবস্থায় যোগসূত্র স্থাপন নিতান্ত প্রয়োজন। দেশের মধ্যে হিন্দু সংগঠনের যে কথা শুনা যায়, সেই সংগঠনের ইহা একটি প্রধান উপায়। বৃটিশ ভারতবর্ষের সমস্ত হিন্দুর জন্য এক আইন প্রবর্তনের উপায়—বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত হিন্দু আইনের কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে এক আইনের রূপ দেওয়া।

রাও কমিটির প্রস্তাবিত সংহিতার দ্বিতীয় লক্ষ্যটি এইজন্য প্রয়োজন; ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজশাসনের প্রতিষ্ঠা হওয়ার পূর্বকালে যে উপায়ে হিন্দু আইনের সংস্কার হইত, সেই উপায় এখন অসম্ভব হইয়াছে এবং হিন্দু আইনের স্বাভাবিক পরিণতি ও সংস্কারের ধারা বন্ধ হইয়াছে। আইনসভায় হিন্দু আইনের সংস্কার না করিলে বর্তমান কালোপযোগী তাহার সংস্কার আর সম্ভব নয়।

রাও কমিটির প্রস্তাবিত সংহিতা সম্বন্ধে যে সকল আন্দোলন ও আলোচনা হইয়াছে, তাহার মধ্যে ২টি বিষয় লইয়াই সচরাচর আলোচনা দেখা যায়—(১) হিন্দুর উত্তরাধিকার আইন; (২) হিন্দুর বিবাহ সম্বন্ধীয় আইন। হিন্দুর উত্তরাধিকার আইন সম্বন্ধে রাও কমিটির প্রস্তাবের মর্ম এই রকমঃ—নিকটসম্পর্কীয়গণের উত্তরাধিকারে মোটামুটি দায়ভাগের অনুসরণ এবং দূরসম্পর্কীয়গণের উত্তরাধিকারে মোটামুটি মিতাক্ষরার অনুসরণ। কারণ, নিকটসম্পর্কীয়গণের উত্তরাধিকারে দায়ভাগের বিধান মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছার অধিকতর অনুরূপ এবং দূরসম্পর্কীয়গণের উত্তরাধিকারে মানুষের বিশেষ কোন স্বাভাবিক ইচ্ছা থাকে না। সেখানে একটি ন্যায়সম্মত সরল বিধিরই বিশেষ প্রয়োজন এবং মিতাক্ষরার বিধি এইরূপ ন্যায়সম্মত বিধি ও দায়ভাগের বিধির চেয়ে অনেক সরল।

দ্বিতীয়তঃ, রাও কমিটির প্রস্তাবে স্ত্রী-সম্পর্কীয়দের উত্তরাধিকারের স্বত্ব প্রচলিত আইন অপেক্ষা বেশি স্বীকার করা হইয়াছে। এই স্বীকারের বিরুদ্ধেই বিরুদ্ধমত সব চেয়ে বেশি প্রবল। বিশেষতঃ, বাপের সম্পত্তিতে মেয়েকে ছেলের অর্ধেক অংশ দিবার যে প্রস্তাব, তাহার বিরুদ্ধেই অনেকে বিশেষ করিয়া আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। আপত্তিকারিগণ বলেন যে, ইহাতে হিন্দুর সম্পত্তি বহুভাগে বিভক্ত হইয়া হিন্দুর আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটাইবে। এই আপত্তি ও আশঙ্কা ভিত্তিহীন। আপত্তিকারিগণ ভুলিয়া গিয়াছেন যে, সম্পত্তির যাহাতে ভাগ বেশি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য করিয়াই হিন্দুর উত্তরাধিকার আইন রচিত



হয় নাই। তাহা হইলে পিতার এক পুত্র অথবা দুই পুত্র মাত্র উত্তরাধিকারসূত্রে পিতার সম্পত্তি পাইবে, এইরূপ বিধান হইত। সেইরূপ বিধানের অনুবর্তন প্রয়োজন, একথা কোন আপত্তিকারী এ পর্যন্ত বলেন নাই। উত্তরাধিকার আইনের একটি প্রধান লক্ষ্য—যাহাদের উত্তরাধিকার ন্যায়সম্মত বলিয়া মনে হয়, তাহাদিগকে উত্তরাধিকারী করা। অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যই উত্তরাধিকারের একমাত্র, এমন কি প্রধান উদ্দেশ্য নয়। সুতরাং বাপের বিষয়ে মেয়ের অংশ ও সে অংশ ছেলের অর্ধেক নির্ধারণ সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। যাঁহারা এই ব্যবস্থায় হিন্দুর আর্থিক অবনতির আশঙ্কা করেন, তাঁহারা সম্ভবত ভাবিয়া দেখেন নাই যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য ধর্মাবলম্বিগণের মধ্যে এবং বহু দেশে ছেলে ও মেয়ের একসঙ্গে উত্তরাধিকার প্রচলিত আছে এবং তাহাতে তাহাদের আর্থিক অবস্থা হীন হইয়াছে, ইহার কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। কেহ কেহ আপত্তি তুলিয়াছেন, মেয়েরা যখন স্বামীর উত্তরাধিকারিণী, তখন তাহাদিগকে পিতার উত্তরাধিকারিণী করা উচিত নয়। তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন নাই যে, একজনের উত্তরাধিকারিত্ব অপর জনের উত্তরাধিকারিত্বে বাধা হওয়া কোন ন্যায়ই সমর্থন করে না—যেমন একথা কেহ বলে না যে, ছেলে যখন পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী—তখন তাহাকে মাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করা উচিত নয়।

স্ত্রীলোকের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে রাও কমিটির প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আর একটি আপত্তি এই যে, স্ত্রীলোকদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে তাহাদের নিব্যূঢ়-স্বত্ব স্বীকার করা হইয়াছে। প্রকৃত কথা, এক দায়ভাগশাসিত বাঙলা দেশ ছাড়া মিতাক্ষরাশাসিত সমস্ত ভারতবর্ষেই এইরূপ নিব্যূঢ়-স্বত্বই স্বীকৃত হইয়াছে। মিতাক্ষরাকার সুস্পষ্টভাবে সেই ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। কেবলমাত্র প্রিভি কাউন্সিলের নজিরে সমস্ত ভারতবর্ষের স্ত্রী-উত্তরাধিকারিগণের সেই স্বত্ব লোপ হইয়াছে। দায়ভাগ প্রচারিত স্ত্রী-উত্তরাধিকারিগণের জীবন-স্বত্বের বিধি—যাহা শাস্ত্রবলে নহে, প্রিভি কাউন্সিলের নজিরবলে এখন সমস্ত ভারতবর্ষে প্রচলিত আইন, তাহার ফল কিছুমাত্র মঙ্গলকর নয়—ইহা প্রত্যেক আইন ব্যবসায়ী অবগত আছেন। উহা লইয়া যে মামলা মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহা স্ত্রী-উত্তরাধিকারিগণের নিরর্থক ক্লেশকর। সম্পত্তির শেষপুরুষ-অধিকারীর যে পুরুষ ওয়ারিশগণের হিতার্থে এই জীবনস্বত্ব কল্পিত, তাহারা প্রায়শই দূরসম্পর্কে সম্পর্কিত। তাহাদের অনুকূলে নিজের অত্যন্ত নিকট স্ত্রী-ওয়ারিশগণের সম্পত্তিভোগে বাধা জন্মানোর কিছুমাত্র অর্থ নাই।

এই উত্তরাধিকার আইন সম্বন্ধে অনেক হিন্দুর মনে একটা ভুল বিশ্বাস আছে। তাঁহারা মনে করেন যে, হিন্দুর উত্তরাধিকার আইন হিন্দুর ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই আইনের পরিবর্তনে হিন্দুর ধর্মে আঘাত লাগিবে। এই ধারণা সম্পূর্ণ অজ্ঞতা-প্রসূত। দায়বিভাগ বিধি ধর্মশাস্ত্রের ব্যবহার অধ্যায়ের অন্তর্বর্তী। ধর্মশাস্ত্রের ব্যবহার অধ্যায় যাহাকে ইংরেজিতে রিলিজিয়ন বলে, তাহার অন্তর্গত নহে। কারণ, ধর্মশাস্ত্র-নেতাগণ স্পষ্ট নির্দেশ দিয়াছেন যে, ব্যবহার-বিধি ও উত্তরাধিকার বৈদিক বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। উহার ভিত্তি অর্থশাস্ত্র ও লোকপ্রসিদ্ধি। সুতরাং উত্তরাধিকার বিধির পরিবর্তনে হিন্দুর ধর্ম অর্থাৎ রিলিজিয়নে কোন আঘাত লাগে না। লোক-ব্যবহারের উপর যাহার প্রতিষ্ঠা, লৌকিক অবস্থার পরিবর্তনে তাহার পরিবর্তন না ঘটিলে লোকযাত্রা ও সমাজযাত্রা সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ হয় না। সেই জন্য দায়ভাগকার জীমূত-

বাহন বাঙলাদেশে অন্যত্র প্রচলিত উত্তরাধিকারবিধির পরিবর্তন ঘটাইয়াছিলেন।

কথাটার একটু বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। পরের প্রবন্ধে তাহা করা যাইবে।

(২)

হিন্দু দায়াধিকার বিধি হিন্দু ধর্মের অঙ্গ; সুতরাং তার পরিবর্তনে ধর্মে আঘাত লাগে এই বিশ্বাসের মূলে আছে একটা ভুল ধারণা। সে ধারণা হচ্ছে—হিন্দুর ধর্মশাস্ত্রে ধর্ম কথাটা ইংরেজী রিলিজিয়ন শব্দের সমার্থবাচক। এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছে ধর্মশাস্ত্র কি তার টিকাকারদের মত থেকে নয় কয়েকজন ইউরোপীয় লেখকের গ্রন্থ থেকে। এইসব লেখকেরা হিন্দু সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বকে অপ্রমাণের জন্য একটি মত খাড়া করেছিলেন। হিন্দুর আইন তার ধর্ম অর্থাৎ রিলিজিয়ন থেকে পৃথক হয়ে পরিণতি লাভ করেনি। সকল সমাজেই আদিতে ধর্ম ও আইন অবিশ্লেষিত অবস্থায় থাকে। সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম অর্থাৎ রিলিজিয়ন থেকে আইন স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। এইসব ইউরোপীয় লেখকেরা প্রচার করেছিলেন যে, হিন্দু সভ্যতা এই শেষ স্তরে পৌঁছিতে পারেনি। হিন্দুর রিলিজিয়ন ও আইন চিরদিন অবিশ্লেষিত অবস্থায় থেকে গেছে। ইংরেজ লেখক হেনরি মেইন এই মতের একজন প্রধান প্রচারক। তাঁর প্রাচীন আইন বা এনসেণ্ট ল' নামক পুঁথী আমাদের দেশের আইন পরীক্ষার্থী ছাত্রদের পড়তে হয়। এই পুঁথিতে মেইন তাঁর মত প্রচার করেছেন। হিন্দু সভ্যতার কুৎসাকারীদের এই মতকে সাহেবের লেখা বলে' কোন অনুসন্ধান না করেই আমরা মাথা পেতে নিয়েছি এবং গর্বের সঙ্গে প্রচার করছি যে, আমরা হিন্দুরা ধর্মপ্রাণ জাতি. আমাদের যা কিছু সবই ধর্মের অঙ্গ। কিন্তু ধর্মশাস্ত্রকারগণ ও ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা নিবন্ধকারগণ রিলিজিয়ন ও আইনের মধ্যে সুস্পষ্ট ভেদরেখা নির্দেশ করেছেন। ওর প্রথমটি হচ্ছে বৈদিক, দ্বিতীয়টি লৌকিক। একই ধর্মশাস্ত্রের গ্রন্থে এই উভয়বিধ জিনিসের আলোচনা আছে, কিন্তু একের সঙ্গে অন্যের প্রভেদ সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা আছে। ধর্মশাস্ত্রে ধর্ম কথাটির অর্থ "কর্তব্য"। কর্তব্য ও অকর্তব্যের বিধি ও নিষেধ ধর্ম শব্দের অর্থ।

মনুসংহিতার অরম্ভে আছে, ঋষিগণ ভগবান মনুর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর কাছে সমস্ত ধর্ম আনুপূর্বিক জানতে চেয়েছিলেন। সেই ধর্ম শব্দের ব্যাখ্যায় মনুসংহিতার ভাষ্যকার মেধাতিথি লিখেছেনঃ—"ধর্ম শব্দঃ কর্তব্যতাবচনঃ। ধর্ম শব্দঃ কর্তব্যাকর্তব্যয়োর্বিধি প্রতিষেধয়োদৃষ্ট প্রয়োগঃ।" এর অর্থ পূর্বেই বলেছি। এই যে কর্তব্য ও অকর্তব্য ইহা হিন্দুর ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত রকম কর্তব্য ও অকর্তব্যকে সূচিত করে। যে সকল করণীয় ও অকরণীয় ঐহিক নয় পারত্রিক, সেগুলি রিলিজিয়ন অর্থে ধর্মের অন্তর্ভূত। আর যে কর্তব্য ও অকর্তব্য ঐহিক তারা ধর্ম; কিন্তু নন-রিলিজিয়স। রিলিজিয়ন অর্থে যে ধর্ম তার মূল হচ্ছে বেদ। আর যে ধর্ম নন-রিলিজিয়স তার মূল বেদ নয়, তার মূল লোকাচার ও লোকপ্রসিদ্ধি। বেদ হচ্ছে সেই ধর্মের প্রমাণ যা অন্য কোন প্রমাণ দিয়ে জানা যায় না। বেদ শব্দের ব্যাখ্যায় মেধাতিথি লিখেছেনঃ—"বিদন্তি অনন্য প্রমাণ বেদাং ধর্ম লক্ষণমর্থমস্মাদিতি বেদঃ" অর্থাৎ যে ধর্মের বিষয় অর্থাৎ কর্তব্যাকর্তব্যের বিষয় অন্য কোন প্রমাণ দিয়ে জানা যায় না তাই জানিয়ে দেয় বলেই বেদের নাম বেদ—যেমন অশ্বমেধ যজ্ঞ করলে স্বর্গলাভ হয় অন্য কোন প্রমাণেই তা জানা যায় না, সুতরাং এখানে বেদই একমাত্র প্রমাণ। কিন্তু মানুষের মঙ্গল কি অমঙ্গলের যে সকল উপায় লৌকিক প্রমাণেই জানা যায় সেটা বেদের বিষয় নয়, লৌকিক জ্ঞানের বিষয়। কারণ সেখানে বেদের কোন প্রয়োজন নাই। মেধাতিথি লিখেছেনঃ—"শ্রেয়ঃ সাধনং কৃষি সেবাদি ভবতি পুরুষস্য কর্তব্য স্তস্য চ তৎসাধন। স্বভাবঃ অন্বয় ব্যতিরেকাভ্যাম গমাতে। যাদৃশেন ব্যাপারেন কৃষ্যাদেঃ ব্রীহ্যাদি সিদ্ধিঃ সাপি প্রত্যক্ষাদবগম্য এব। যাগাদেস্ত সাধনত্বং যেন চ রূপেন অপূর্বোৎপত্তি ব্যবধানাদিনা তন্ন প্রত্যক্ষাদি অবগম্যস্" অর্থাৎ "কৃষি ও চাকুরী করে" মানুষের শ্রেয় সাধন হয় এ জ্ঞান লৌকিক. অন্বয় ব্যতিরেকে প্রমাণ দ্বারাই লোকে জানতে পারে। কি উপায়ে কৃষিকার্যের ফলে ধান প্রভৃতি ফসল ফলান যায় তা প্রত্যক্ষ প্রমাণেই মানুষ জানতে পারে। কিন্তু যাগ যজ্ঞাদির ফলে যে এক অপূর্বফলোৎপত্তি হ'য়ে পরকালে মানুষকে সুফল দেয় তা প্রত্যক্ষাদি কোন লৌকিক প্রমাণেই জানা যায় না।" সুতরাং এখানে বৈদিক প্রমাণ। কৃষি ও চাকুরীতে মানুষের ফল লাভ, কি চাষের উপায়—এই জ্ঞানের প্রমাণ বেদ নয়। বেদে যদি এ সম্বন্ধে কোন কথা থাকে তবে তা প্রসঙ্গত মীমাংসকদের ভাষায় অনুবাদ মাত্র। প্রকৃত বেদ অর্থাৎ বিধিনিষেধের তা অঙ্গ নয়।

যে সকল ধর্ম সংহিতা সম্পূর্ণাঙ্গ তাদের তিনটি ভাগ। সেইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির তিন অধ্যায়—আচার অধ্যায় ব্যবহার অধ্যায় ও প্রায়শ্চিত্ত অধ্যায়। মনুসংহিতায় এই তিন ভাগ আছে। যদিও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির অধ্যায় ভাগ ক'রে তাদের বিভাগ দেখান হয় নাই। মনুসংহিতার শেষ বা দ্বাদশ অধ্যায়ে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ আছে। এই ২টি প্রধান সংহিতা বা ধর্মশাস্ত্রে আচার ও প্রায়শ্চিত্ত অধ্যায় ও ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ-মূলক অধ্যায় বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যবহার অধ্যায় বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

বেদ প্রমাণে ও অন্য লৌকিক প্রমাণে কর্তব্যাকর্তব্যজ্ঞান সম্বন্ধে মেধাতিথি লিখেছেন যে, 'অন্যত্র যেমন ব্যবহার স্মৃতি প্রভৃতিতে জ্ঞান ন্যায়মূল, অর্থাৎ বেদমূল নয়, তা ক্রমে প্রদর্শিত হবে।' "অন্যত্রাপি ব্যবহারস্মৃত্যাদৌ যত্র ন্যায়মূলতা স্তত্র যথাবসরং দর্শয়িষ্যাম।" এবং মনুর সপ্তম অধ্যায়ে, যেখানে রাজধর্মের বিবরণ আরম্ভ হয়েছে সেখানে মেধাতিথি লিখেছেনঃ—"প্রমাণান্তরমূলোহি অত্র ধর্মা উচ্যন্তে। ন সর্বে বেদমূলাঃ।" অর্থাৎ, এখানে যে ধর্ম বলা হচ্ছে, তার মূলে অন্য প্রমাণ, এই ধর্মের সমস্ত বেদমূল নয়।

শাস্ত্রকারেরা এবং নিবন্ধকারগণ কেন যে ব্যবহার স্মৃতিকে বেদমূল নয় বলেছেন এবং অন্য লৌকিক প্রমাণ সাপেক্ষ বলেছেন তার কারণ ব্যবহার স্মৃতি কোন বিষয়ের কর্তব্যাকর্তব্যের উপদেশ—তার উপর একটু চোখ বুলালেই বুঝা যায়। ব্যবহার স্মৃতির বিষয় হচ্ছে আমরা এখন যাকে বলি মামলা মোকদ্দমা। মিতাক্ষরাকার লিখেছেনঃ "অন্য বিরোধেন স্বাস্থ্য সম্বন্ধিতয়া কথনং ব্যবহারো, যথা কশ্চিদিদং ক্ষেত্রাদি মদীয়ং ইতি কথয়তি। অন্যোপিতদ্ বিরোধেন মদীয়ং ইতি" অর্থাৎ একই বস্তুতে ২ ব্যক্তির পরস্পর বিরুদ্ধ স্বত্বের দাবীর নাম ব্যবহার—যেমন যদি একজন লোক বলে এ শস্যক্ষেত্র আমার ও অন্য লোক বলে ঐ শস্যক্ষেত্র তার, তাহলে তাকে বলে ব্যবহার।

ব্যবহার স্মৃতির কাজ সাংসারিক ভোগের বস্তুতে বিভিন্ন লোকের বিরোধী দাবীর বিচারের উপায় নির্ণয় করা। সুতরাং ও স্মৃতিতে আছে, রাজার বিচার সভায় কারা সভ্য হবেন, কি প্রণালীতে তাঁরা বিচার করবেন, কোন্ প্রমাণ গ্রাহ্য, কোন্ প্রমাণ অগ্রাহ্য এবং যে সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে লোকের বিরোধী দাবী হতে পারে, মোটামুটি তাকে ১৮ ভাগে ভাগ করে' তার আইনের ব্যবস্থা। স্মৃতিশাস্ত্রে এর নাম "অষ্টাদশ বিবাদ পদানি।" এর মধ্যে আছে—ঋণ, তার সুদ ও তার পরিশোধের আইন, নানাবিধ চুক্তির আইন, ক্রয় বিক্রয়ের আইন, জমির সীমা নিয়ে বিবাদের আইন, নানারকম অপরাধের ফৌজদারী আইন ইত্যাদি। অর্থাৎ মোটামুটি প্রাচীন হিন্দু আইন সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে' ব্রিটিশ আদালতে ইংরেজের প্রবর্তিত আইন দ্বারা যেসব বিষয়ের বিচারক হিন্দু, কি মুসলমান আজ মেনে নিচ্ছে। এতে হিন্দুর ধর্ম নষ্ট হয়েছে, অতি বড় সনাতনীও এমন কথা বলেন না।

এই সকল নিতান্ত লৌকিক বিষয়, যার ফলাফল ও মঙ্গলামঙ্গল হাতে হাতে পাওয়া যায় এবং মানুষের স্বাভাবিক লৌকিক জ্ঞানে যে বিধিব্যবস্থা করা যায়, প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা কি তাদের ভাষ্যকারেরা তা রিলিজিয়নের অঙ্গ, সুতরাং অপরিবর্তনীয় একথা কখনও মনে করেননি। সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনের ভার তাঁদের উপর ছিল। সুতরাং অর্থহীন গোঁড়ামি করার অবসর তাঁদের ছিল না। তার উপর তাঁরা ছিলেন তীক্ষ্ণ ধীসম্পন্ন, সাংসারিক

জ্ঞানে সম্পূর্ণ জ্ঞানবান পণ্ডিত। সেইজন্য তাঁরা স্পষ্ট নির্দেশ দিয়াছেন যে, ব্যবহার স্মৃতি লৌকিক জ্ঞান ও লৌকিক ব্যবহারের উপর স্থাপিত।

হিন্দুর দায়বিভাগ এই ব্যবহার স্মৃতির অন্তর্গত। সুতরাং ইহা মূল বেদ নয়, অর্থাৎ রিলিজিয়ন অর্থে হিন্দু ধর্মের অঙ্গ নয়। স্মৃতি-শাস্ত্রকারগণের মধ্যে একটা তর্ক প্রচলিত ছিল—বস্তুর উপর স্বামিত্ব, কি স্বত্ব, শাস্ত্র প্রমাণের বিষয়, না লোক-প্রসিদ্ধির বিষয়। সকল স্মৃতিকারেরা একবাক্যে বলেছেন যে, বস্তুর উপর-স্বত্ব কি স্বামিত্ব শাস্ত্র প্রমাণের বিষয় নয়, লৌকিক স্বীকৃতির বিষয়। মিতাক্ষরাকার বলেছেন যে, তা না হলে যে সকল অহিন্দু প্রত্যন্তবাসী শাস্ত্রের প্রমাণ গ্রাহ্য করে না, তাদের মধ্যেও বস্তুর স্বামিত্ব স্বীকৃত হয় কি করে? যে সকল বিভিন্ন প্রকারের বস্তুতে লোকের স্বামিত্ব জন্মে, স্মৃতিশাস্ত্রে তার ফর্দ দেওয়া আছে। কিন্তু ভাষ্যকারেরা বলেছেন যে, স্মৃতিশাস্ত্রে ঐ ফর্দ আছে বলেই ওকে শাস্ত্রের বিধি বলে মনে করতে হবে না। মিতাক্ষরাকার এর উদাহরণে যা বলেছেন, আমাদের বর্তমান আলোচনায় তা সকল সংশয় নিরসন করে। তিনি বলেছেন, 'যদ্যপি পত্নী দুহিতরশ্চ ইত্যাদি স্মরণং তত্রাপি স্বামী সম্বন্ধিতয়া বহুষু দায়বিভাগিতয়া প্রাপ্তিষু লোক-প্রসিদ্ধোপি স্বত্বে ব্যামোহ নিবৃত্যর্থং স্মরণমিতি সর্বমনবদ্যং" অর্থাৎ যেমন পুত্রহীন লোকের ধনের কারা অধিকারী হবে, সে সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য "পত্নী দুহিতরশ্চ" ইত্যাদি বচনে নির্দেশ দিয়েছেন, তবু এটা শাস্ত্রের বিধি নয়, কিন্তু ধন স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কবশত বহু লোক তার সম্পত্তিতে অধিকার দাবী করতে পারে, এজন্য লোকের সন্দেহ নিবৃত্তির জন্য এই বচন বলেছেন, যদিও এ দায়াধিকার বচনের উপর নয়—লোক-প্রসিদ্ধির উপর নির্ভর করে, তেমনি সম্পত্তি অর্জনের নানারূপ উপায় আছে জন্য স্মৃতিশাস্ত্রে সে সব উপায় বলা হয়েছে, বিধি-নিষেধের উদ্দেশ্যে নয়, লোক-প্রসিদ্ধ ব্যাপারের বর্ণনা হিসাবে।

এর পর যে দুইটি বিখ্যাত শ্লোক যাজ্ঞবল্ক্য নির্দেশ করেছেন, কোন্ কোন্ স্বোপার্জিত সম্পত্তি উপার্জনকারী নিজে রাখতে পারবেন, পরিবারের সকলের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে না, তার টীকায় এক জায়গায় মিতাক্ষরাকার লিখেছেন যে, এই প্রকরণের বচনগুলি প্রায়ই যা লোক-প্রসিদ্ধ ব্যবহার তারই অনুবাদ মাত্র অর্থাৎ শাস্ত্রের বিধি নয়। "লোক-প্রসিদ্ধস্যৈ বানুবাদ-কান্যেচ প্রায়েনাস্মিন্ প্রকরণে বচনানি।" লক্ষ্য করার বিষয়, "অস্মিন প্রকরণে" 'এই প্রকরণে যে প্রকরণের কথা মিতাক্ষরাকার বলেছেন, সে হচ্ছে—দায়বিভাগ প্রকরণ। সুতরাং মিতাক্ষরাকারের মনে কোন সন্দেহ ছিল না যে, যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যবহার অধ্যায়ের দায়ভাগ প্রকরণের বিধিগুলি বেদমূল নয়, অর্থাৎ হিন্দু রিলিজিয়নের অঙ্গ নয়, লোক-প্রসিদ্ধি ও লোক-ব্যবহার সে বিধির স্রষ্টা। মিতাক্ষরার অনেক পরবর্তী গ্রন্থ "বীর মিত্রোদয়" সোজাসুজি বলেছে, "প্রায়েণ ব্যবহার স্মৃতীনাং লোক-সিদ্ধার্থানুবাদকত্বামিতি সকল নিবন্ধভিরভিধানাৎ", অর্থাৎ ব্যবহার স্মৃতির প্রায় বচনগুলি যা লোকসিদ্ধ অর্থাৎ লোকের ব্যবহার সিদ্ধ তারই অনুবাদক—এই কথা সকল নিবন্ধকারেরা বলেছেন।

যাঁরা আপত্তি তুলেছেন যে, হিন্দুর দায়াধিকার বিধি পরিবর্তন করলে হিন্দুধর্মে আঘাত লাগবে, ধর্মশাস্ত্রকারগণ ধর্ম বলতে কি বুঝতেন, তার কোন খবর তাঁরা রাখেন না। রাষ্ট্র বা সমাজে কোন কিছু পরিচালনের দায়িত্ব আমাদের নাই জন্য সব কিছুতেই ধর্ম গেল রব তোলা সম্ভব হয়েছে। সে দায়িত্ববোধ থাকলে সময়ের প্রয়োজন অনুসারে দায়বিভাগের প্রচলিত বিধির পরিবর্তনে ধর্মহানির কথা কখনও উঠতে পারত না।

দায়ভাগ যে ধর্মের অঙ্গ—এই ভুল বিশ্বাস বাঙালীর মনে হওয়ার একটা অতিরিক্ত কারণ আছে। বাঙালী হিন্দু জীমূতবাহনের দায়ভাগ দ্বারা শাসিত। জীমূতবাহন অন্যত্র প্রচলিত দায়বিভাগ-ক্রমকে পরিবর্তন করেছিলেন। সেই পরিবর্তনের জন্য তিনি একটা তর্ক আশ্রয় করেছিলেন। সে তর্ক হচ্ছে এই—পার্বণ শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান করে যে যত বেশী উপকার করে, সম্পত্তির উত্তরাধিকারে তার দাবী তত বেশী। পার্বণ শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান হিন্দুর আচারধর্মের অন্তর্গত। সুতরাং মনে হতে পারে যে, দায়ভাগের দায়াধিকার বিধি হিন্দু-ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু দায়ভাগ গ্রন্থ যিনি পাঠ করেছেন, তিনিই জানেন যে, এই তর্কটা হিন্দুধর্ম অর্থাৎ রিলিজিয়নের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে জীমূতবাহন আদৌ মনে করেননি। এই তর্কটা জীমূতবাহন নিয়েছিলেন উদ্যোত নামা একজন পূর্বাচার্যের কাছ থেকে। উদ্যোতের কোন গ্রন্থ এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। দায়ভাগ গ্রন্থ থেকে যতদূর বোঝা যায়, কি উদ্যোত, কি জীমূতবাহন—দুজনেই এই তর্কটিকে ন্যায়ের যুক্তি বলেছেন, ধর্মের অনুশাসন বলেননি। জীমূতবাহন এই কথা বলে তাঁর বিচার শেষ করেছেনঃ—"তদর্জিত ধনস্য চ তদুপকার তারতম্যেন তদর্থং সম্পাদনস্য ন্যায্যত্বাৎ উপকার কৃত্বেনৈব ধনসম্বন্ধো ন্যায়-প্রাপ্তো মন্বাদীনামভি মতমিতি মন্যতে। অর্থাত্রাপরিতোষোবিদুষাং বাচনিক এবায়-মর্থঃ।" অর্থাৎ যার ধন পিণ্ড দানের তারতম্যে তার উপকারের তারতম্য হয়। সুতরাং বেশী উপকারীর ধনের উত্তরাধি-কারের দাবী ন্যায্য ও ন্যায়প্রাপ্ত—যাজ্ঞবল্ক্য মনু প্রভৃতির এইরূপ অভিমত—ইহাই আমি মনে করি। এতেও অর্থাৎ এইরূপ তর্কেও যদি পণ্ডিতেরা তুষ্ট না হন, তাহলে বলি যে, মনু প্রভৃতির বচন থেকেও আমি যে উত্তরাধিকার ক্রম স্থাপন করেছি, তা পাওয়া যায়। এর টীকায় দায়ভাগের টিকাকার শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার বলেছেন, "যাতা ন্যায় মূলত্বে বিদুষাণামসন্তোষ ততো বাচনিক এবর্থ ইতিমধ্যে অর্থাৎ যদি ন্যায়মূলক এই তর্কে পণ্ডিতেরা সন্তুষ্ট না হন, তবু জীমূতবাহনের মত ঋষিদের বচন থেকেও পাওয়া যায়। এটা সুস্পষ্ট জীমূতবাহন তাঁর দায়ক্রম বিধিকে বেদমূলে বলেননি, বলেছেন ন্যায়প্রাপ্ত অর্থাৎ ন্যায়মূলে দায়ভাগের উত্তরাধিকারবিধি জীমূতবাহন হিন্দুধর্ম অর্থাৎ রিলিজিয়নের উপর প্রতিষ্ঠা করেননি। করেছেন ন্যায়ের বা যুক্তির উপর।

অনেকে জানেন বাঙলা ভিন্ন সমস্ত ভারতবর্ষে যেখানে মোটামুটি মিতাক্ষরা দ্বারা লোকে শাসিত, পার্বণশ্রাদ্ধে পিণ্ডের উপর দায়াধিকার নির্ভর করে না, নির্ভর করে রক্ত সম্পর্কের উপর। রক্ত সম্পর্কে যে যত নিকট মিতাক্ষরার মতে সে তত নিকট উত্তরাধিকারী। আশা করা যায়, রক্ত সম্পর্কের মধ্যে ধর্মের বীজ কেহ খুঁজে বের করবেন না।

হিন্দুর দায়বিভাগ যে হিন্দুর ধর্মের অঙ্গ, এটা হিন্দু সভ্যতাকে খাটো করার জন্য পশ্চিম দেশে কোন কোন লেখক প্রচার করেছিলেন। আমরা সেই প্রচারকে প্রশংসাবাক্য জ্ঞানে মাথায় করে নিয়েছি। হিন্দু শাস্ত্রকর্তাগণ প্রকৃত কি বলেছেন, তা জানবার জন্য আমাদের কোন মাথা ব্যথা নাই। যে অনড় অবস্থায় আমরা অভ্যস্ত হয়েছি, যা তার অনুকূলে তাই হিন্দু-শাস্ত্রের বিধি—তাতে অনেকেই সন্দেহ করে না। কারণ, অনেক মানুষই—যা বিশ্বাস করলে খুশি হয়, তাই বিশ্বাস করে। সে বিশ্বাস যে সম্পূর্ণ অমূলক হ'তে পারে, তা তারা মনে করতে চায় না। কেউ প্রমাণ করে দেখালে তার উপর বিরক্ত হয় ও গালাগালি করে

(৩)

রাও কমিটির প্রথম খসড়ায় বিবাহকে ২ শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছিল—শাস্ত্রীয় বিবাহ ও লৌকিক বিবাহ। প্রচলিত হিন্দু বিবাহে যে সকল বিধি-নিষেধ আছে, শাস্ত্রীয় বিবাহে সে সমস্তই বলবৎ রাখা হয়েছিল। অর্থাৎ অসবর্ণ, সগোত্র ও সমান প্রবর বর-কন্যার মধ্যে বিবাহকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। পরিবর্তন কেবলমাত্র এইটুকু ছিল যে, বিবাহ হবে এক পত্নীক, অর্থাৎ এক পত্নী বর্তমানে পুরুষের দ্বিতীয়বার বিবাহ করা চলবে না। প্রস্তাবিত লৌকিক বিবাহে অসবর্ণ, সগোত্র ও সমান প্রবর বর-কন্যার বিবাহ বৈধ বিবাহ করা হয়েছিল। কেবল কতকগুলি নিকট সম্পর্কে সম্পর্কিত বর-কন্যার মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। অবশ্য এই বিবাহও ছিল এক পত্নীক। এই ২ শ্রেণীর বিবাহে ব্যবহারিক ফল একরকম হবে এই নির্ধারণ ছিল। অর্থাৎ উভয় প্রকার বিবাহিত স্বামী স্ত্রী ও তাহাদের সন্তানসন্ততিরা এক হিন্দু দায়াধিকার আইনে শাসিত হবে। লৌকিক

"দেশ"-এর নিয়মাবলী

বার্ষিক মূল্য—১৩৲ ষাণ্মাসিক—৬৷৷

বিজ্ঞাপনের নিয়ম

"দেশ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার সাধারণত নিম্নলিখিতরূপ:—

সাধারণ পৃষ্ঠা—এক বৎসরের চুক্তিতে

১০০" ও তদূর্ধ্ব ... ৩৲ প্রতি ইঞ্চি প্রতি বা[র]

৫০"—৯৯" ... ৩৷৷০ " " " "

সাময়িক বিজ্ঞাপন

৪৲ টাকা প্রতি ইঞ্চি প্রতি বার

বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ বিজ্ঞাপন বিভাগ হইতে জানা যাইবে।

সম্পাদক—"দেশ"

১নং বর্ম্মণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বিবাহের ফলে কেহ তার পরিবার থেকে বিচ্যুত হবে না বা দেবোত্তর প্রভৃতির সেবাইত থেকেও বঞ্চিত হবে না, দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা লোপ হবে না এবং লৌকিক বিবাহকারী পুত্রকে মৃতগণ্যে তার পিতার দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা হবে না। হিন্দু বিবাহের এই ২ শ্রেণী ভাগের উদ্দেশ্য ছিল সনাতনপন্থীদের আশ্বস্ত করা। শাস্ত্রীয় বিবাহে যখন চলতি সব নিষেধ বহাল থাকল তখন একটা অশাস্ত্রীয় লৌকিক বিবাহ স্বীকারে ক্ষতি কি? কিন্তু এইরকম শ্রেণী ভাগের বিরুদ্ধে ২টি আপত্তি আছে, প্রথম—এই শ্রেণী ভাগের উদ্দেশ্য কিছুতেই সিদ্ধ হবে না। কারণ সনাতনীদের তুষ্ট করে যদি এ আইন পাশ করাতে হয়, তবে এ আইন পাশ হবে না। কারণ দুই রকম বিবাহের ব্যবহারিক ফল যেখানে এক, অশাস্ত্রীয় লৌকিক বিবাহে পতি-পত্নীর হিন্দুর সমাজ ও ধর্মে সকল দাবী যখন সম্পূর্ণ বহাল থাকবে, তখন সনাতনপন্থী তুষ্ট বা আশ্বস্ত হবে কিসে। সনাতনপন্থীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও এই আইন যদি পাশ হয় তা হবে তাদের মতের জোরে যারা সমগ্র হিন্দু সমাজের যুগোপযোগী পরিবর্তন চায়, সমাজের বিধিবন্ধন থেকে ব্যক্তিবিশেষের মুক্তি মাত্র চায় না! এই শ্রেণী বিভাগের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তি এবং যা প্রধান আপত্তি তা হচ্ছে—এই শ্রেণী ভাগ হিন্দু বিবাহবিধির সংস্কার নয়, হিন্দুকে হিন্দু বিবাহবিধি অগ্রাহ্য করে বিবাহের স্বাধীনতা দেওয়া। এইরকম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যথেষ্ট মূল্য আছে। কিন্তু সমস্ত সমাজের উপর তার ফল গৌণ ফল। হিন্দুর বর্তমান সমাজ এই গৌণ উপায়ে পরিবর্তনের চেষ্টার যুগ ছেড়ে এসেছে। এখন প্রয়োজন, সমস্ত সমাজের হিতে হিন্দুর সামাজিক বিধি ব্যবস্থার উপযুক্ত পরিবর্তন, যার ফলে হিন্দু সমাজ দৃঢ় গড়ন ও নূতন বল পাবে।

এই সব আপত্তির ফলে রাও কমিটি বর্তমান যে খসড়া প্রকাশ করেছেন, তাতে শাস্ত্রীয় বিবাহ ও লৌকিক বিবাহের শ্রেণীভেদটা বহাল থাকলেও তার মধ্যে ভেদরেখা অতি অস্পষ্ট। এই শেষ খসড়ায় শাস্ত্রীয় বিবাহবিধির এক পরিবর্তিত ব্যবস্থার প্রস্তাব হয়েছে। সে বিধিতে অসবর্ণ, সগোত্র ও সমান প্রবর বর-কন্যার বিবাহে বাধা নাই; বরকন্যা সপিণ্ড ও বিশিষ্ট নিকট সম্পর্কে সম্পর্কিত না হলেই হল। প্রথম খসড়ার এক পত্নীক বিবাহের নিয়ম এতেও বহাল আছে। এই শাস্ত্রীয় বিবাহ ও প্রস্তাবিত লৌকিক বিবাহের মধ্যে প্রকৃত তফাৎ কিছুই নাই। সুতরাং এই লৌকিক বিবাহের প্রস্তাবটিকে প্রস্তাবিত হিন্দু বিবাহ আইন থেকে বর্জন করলে কিছুই ক্ষতি হয় না এবং তা করা উচিত। লৌকিক বিবাহ বা সিভিল ম্যারেজে ধর্মের গণ্ডীর স্থান অর্থ নাই। সুতরাং সেই রকম বিবাহকে হিন্দু বিবাহের অর্থাৎ ধর্মের গণ্ডীর মধ্যে বিবাহের একটা শ্রেণী গণ্য করার কোন অর্থ হয় না।

হিন্দু বিবাহ হিন্দুর ধর্মাচারের অংগ। সুতরাং বিবাহ-বিধির পরিবর্তন এই আচারের পরিবর্তন। কাজেই এ আপত্তি উঠা কিছুই বিচিত্র নয় যে, বিবাহ-বিধির এ রকম পরিবর্তন হিন্দু ধর্মকে আঘাত করে। এ রকম আপত্তির উত্তর—হিন্দুর আচার প্রয়োজন অনুসারে যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়ে এসেছে। কারণ তা না হ'লে কোন সমাজ বেশী দিন টিকে থাকতে পারে না। এই বিবাহ-বিধিতেই গৌতম-স্মৃতির সময় বিভিন্ন বর্ণের বিবাহ অবাধে প্রচলিত ছিল। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির সময় বর্ণগণের মধ্যে অনুলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল—অর্থাৎ উচ্চবর্ণের বরের সংগে নিম্নবর্ণ কন্যার বিবাহ বৈধ বিবাহ ছিল। সমাজ থেকে এই রকম অনুলোম বিবাহ খুব বেশী দিন লোপ হয় নাই। ব্রাহ্মণের শূদ্রা পত্নী বিবাহ মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য অবৈধ বলেন নি; কিন্তু নিন্দা করেছেন। এই রকম বিবাহ মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির সময়ের পরেও যে হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল, তার বহু প্রমাণ আছে। একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিঃ—"কাদম্বরীর" গ্রন্থকার বাণভট্ট তাঁর "হর্ষচরিতে" লিখেছেন যে, তিনি তাঁহার পিতার ব্রাহ্মণ পত্নীর গর্ভজাত সন্তান এবং পিতার শূদ্রা পত্নীর গর্ভজাত তাঁর দুটি ভাই ছিল। অথচ বাণভট্ট গর্ব করে লিখেছেন যে, তাঁর বংশ এই রকম বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের বংশ যে, তাঁদের বাড়ীর শুক পাখীরাও শুনে শুনে বেদমন্ত্র গান করত। বাণভট্ট সত্য বা ত্রেতার লোক নন। মহারাজ হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর লোক। অত্যন্ত আধুনিক গ্রন্থ, যেমন কালিকা পুরাণে কলিকালে কোন্ কোন্ আচার বর্জনীয়, তার ফর্দ আছে। এই ফর্দগুলিই প্রমাণ যে, হিন্দুর আচার যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। তার মধ্যে কতকগুলি হয়ত ইচ্ছাকৃত আর কতক সময়ের ও অবস্থার চাপে। অবস্থার চাপে যে সামাজিক আচার পরিবর্তন করতে হয়, ব্রাহ্মণ নির্বিশেষে বর্তমান হিন্দু সমাজে কন্যার বিবাহের বয়স তার একটি প্রমাণ। অতিবড় সনাতনীও এখন কন্যার বিবাহের বয়সে মনু যাজ্ঞবল্ক্যের বিধিনিষেধ মানতে পারেন না। সুতরাং হিন্দুর বিবাহ-বিধির সংস্কার বর্তমানে প্রয়োজন কি না, সেই কথাই বিবেচনার বিষয়; প্রাচীন আচার ও শাস্ত্রবিধি মাত্র তার নিয়ামক নয়।

প্রথম ধরা যাউক, বর্তমান সমাজে অসবর্ণ বিবাহের নিষিদ্ধতা। প্রাচীন হিন্দু সমাজে যে বর্ণবিভাগ, তার সংগে বর্তমান সমাজে বিবাহে জাতিভেদের গণ্ডী সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। বর্ণ বলতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারি বর্ণ বোঝা যায়। এখন যে জাতিভেদ বিবাহে বাধা, তা এই চারি বর্ণের ভেদ নয়; বহু জাতি ও উপজাতির ভেদ। এই ভেদ হিন্দু সমাজকে বহু ভাগে বিভক্ত ও নিতান্ত দুর্বল করেছে এবং দিন দিন বেশী দুর্বল করছে। এই জাতিভেদে বিবাহের বাধা উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা যাকে বলে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু, সেই নিম্নশ্রেণীর হিন্দুজাতির সংখ্যা লাঘব করে' ক্রমশ ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে। এ যাঁর চোখ আছে, তিনিই দেখতে পাচ্ছেন। অথচ এই সকল বর্ণ ও জাতির মধ্যে বস্তুগত কোন প্রভেদ খুঁজে পাওয়া আজ অসম্ভব। মনুর সবচেয়ে প্রাচীন ভাষ্যকার মেধাতিথি খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর লোক। তিনি তখনই প্রশ্ন তুলেছেন, ব্রাহ্মণ শূদ্রে যে ভেদ, এ কি রকম ভেদ? এ কি গো ও অশ্বের মত ভেদ যে চোখে দেখলেই চেনা যায়, কোন্‌টা গরু আর কোন্‌টা ঘোড়া। কিন্তু চোখে দেখে ত চেনা যায় না, কে ব্রাহ্মণ আর কে শূদ্র। সুতরাং তিনি মীমাংসা করেছেন—এ ভেদ কোন বস্তুগত ভেদ নয়। প্রাচীনকাল থেকে আগত শাস্ত্রকৃত ভেদ মাত্র। আমাদের হিন্দু সমাজে জাতিভেদের ভিত্তি জাতির গণ্ডীর বাইরে বিবাহে নিষিদ্ধতায়। এই নিষেধকে দূর না করলে হিন্দু সমাজ কোন দিনই দৃঢ়বদ্ধ এক সমাজ হয়ে গড়ে উঠবে না। এই নিষেধের সমর্থনে বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক যুক্তির নাম দিয়ে যা সব বলা হয়, সেগুলি যা আছে, তার সমর্থনে মনগড়া কল্পনা মাত্র; সত্যে তার কোন ভিত্তি নাই। এই নিষেধকে বহাল রেখেও আমাদের জাতিগত ভেদবুদ্ধিকে এড়িয়ে হিন্দু সমাজে সংহতি আনার আর যে সব চেষ্টা—যেমন অ-জল-চল জাতির হাতে মাঝে মাঝে সভা করে', জল খেয়ে তাদের কৃতার্থ করা, বৎসরে একবার তাদের সংগে এক পংক্তিতে বসে ভোজন করে তাদের সংগে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন—সম্পূর্ণ পণ্ডশ্রম—নিজের মন ও পরের মনকে ফাঁকি দেওয়া। এই জন্য হিন্দু বিবাহ বিধির সংস্কারে প্রথম প্রয়োজন হিন্দু বিবাহে বরকন্যার অসবর্ণত্বের বাধা দূর করা। সুতরাং রাও কমিটির শেষ খসড়ায় শাস্ত্রীয় বিবাহে এই বাধা দূর করার যে প্রস্তাব হয়েছে, হিন্দু সমাজের মংগলকামী সকল হিন্দুর তা সমর্থন করা উচিত।

প্রচলিত হিন্দু বিবাহে সগোত্র ও সমান প্রবরের বাধার মত অর্থশূন্য বাধা আর কল্পনা করা যায় না। গোত্র কাকে বলে? থিওরী হচ্ছে, জমদগ্নি প্রভৃতি কয়েকজন ব্রাহ্মণ সকল ব্রাহ্মণের আদিপুরুষ। এই কয়েকজনের নামই গোত্র নাম। সুতরাং যে ব্রাহ্মণের বংশপরম্পরা যে গোত্র প্রসিদ্ধ, ধরতে হবে তিনি সেই নামের আদি পুরুষ ব্রাহ্মণের বংশধর। যদি স্বীকার করা যায় এ থিওরী সত্য, এবং বহু শত পুরুষ পূর্বে সগোত্র স্ত্রীপুরুষ ব্রাহ্মণের এক পূর্বপুরুষ ছিল, কোন্ যুক্তিতে সেটা বিবাহে বাধা হতে পারে? সপিণ্ড বরকন্যার বিবাহ নিষেধের ব্যাখ্যায় শাস্ত্রকারেরা বলেছেন যে, তারাই সপিণ্ড—এক দেহ থেকে যারা উদ্ভূত—"সপিণ্ডতাতু এক শরীরাবয়-

বান্ধবয়েন ভবতি'' (মিতাক্ষরা)। এই অনাদি সংসারে সকলের মধ্যেই এই রকম সপিণ্ডতা সম্ভব। কিন্তু সেটা অতি প্রসঙ্গ। কারণ তা হ'লে কোন বিবাহই সম্ভব হয় না— "তচ্চ সর্বত্র সর্বস্য যথা কথঞ্চিদ নাদৌ সংসারে ভবতাতি প্রসঙ্গঃ'' (মিতাক্ষরা)। সুতরাং সপিণ্ড শব্দের অর্থকে নিতে হবে কাটছাঁট করে' একটা নিয়মিত কার্যকরী গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রেখে "পঙ্কজ'' শব্দের অর্থ যেমন করা হয়ঃ—

"অতশ্চায়ম্ সপিণ্ড শব্দোহ বয়বশক্ত্যা সর্বত্র প্রবর্তমানোতি নির্মন্থ্যা পঙ্কজাদি শব্দবন্নিয়ত বিষয় এব'' (মিতাক্ষরা)। এজন্য বিবাহের সপিণ্ডতা মাতার বংশে ৫ পুরুষ ও পিতার বংশে ৭ পুরুষেই শেষ হয়। হিন্দু বিবাহে সগোত্র নিষেধের বিরুদ্ধে হিন্দু শাস্ত্রকারদের এই যুক্তির সুষ্ঠুতর প্রয়োগের ক্ষেত্র আর নাই। যেখানে রক্তের সম্বন্ধ পরিজ্ঞাত, সপিণ্ড সম্বন্ধে সীমার বাহিরে হলেও তার সঙ্গে বিবাহ চলে, আর সেই সীমার মধ্যেও কন্যা 'ত্রিগোত্রান্তরিতা হলে তাকে বিবাহ করা যায়। কিন্তু যেখানে রক্ত সম্বন্ধের কোন ইতিহাস নাই, কেবল মাত্র বংশপরম্পরাগত একটা নাম সামাই বিবাহের অলঙ্ঘনীয় বাধা, এই রকম নিয়ম, যারা কোন কিছু বোঝাকেই ঘাড় ভেঙ্গে গেলেও ঘাড় থেকে নামাতে ভরসা পায় না, তারা ছাড়া আর কেউ সমর্থন করবে না। তা ছাড়া কল্পিত পূর্বপুরুষ সম্বন্ধ কেবল ত আছে ব্রাহ্মণের। সুতরাং শাস্ত্রমতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের প্রকৃত কোন গোত্র থাকতে পারে না। পুরোহিতের গোত্র থেকেই তাদের গোত্র কল্পনা করা হয় এবং শূদ্রের বিবাহে কল্পিত সগোত্রও কোন বাধা নয়ঃ—"প্রাগুক্ত মনু শাতাতব বচনে দ্বিজাতি গ্রহণং সগোত্র বর্জনে শূদ্রাদ্যাবৃত্যর্থম্'' (উদ্বাহতত্ত্ব)।

প্রবরের ব্যাপারটা আরও একটু ঘোরাল। কাকে প্রবর বলে, তার প্রকৃত অর্থ বহুদিন থেকেই হিন্দু সমাজে পণ্ডিতদেরও জানা নেই। প্রতি গোত্রে অনেকগুলি করে আছে। সেগুলিও ব্যক্তিবিশেষের নাম। একটা প্রসিদ্ধি এই যে, প্রবর প্রবর্তক ঋষিরা গোত্র প্রবর্তক ঋষিদের পুত্র পৌত্র। সুতরাং সগোত্র ও সমান প্রবরে লোকেরা খুব দূর সম্পর্কের হলেও এক বংশের লোক এবং যাদের প্রবর এক তাদের সম্পর্কটা ওরই মধ্যে একটু নিকট। কিন্তু মুস্কিল এই যে, ভিন্ন গোত্রেও এক প্রবরের নাম আছে, যেমন উপমন্যু গোত্রে এক প্রবর। বশিষ্ঠ আবার পরাশর গোত্রেরও এক প্রবর। বশিষ্ঠ অর্থাৎ ভিন্ন গোত্রের লোক এক প্রবর হতে পারে। আমরা সবাই জানি যে, সেজন্যই সমান প্রবরের বাধা বিবাহে সগোত্রের অতিরিক্ত আর এক বাধা। এ কি করে সম্ভব? সেইজন্য মেধাতিথি বলেছেন—স্মৃতি যখন বলেছে তখন তা স্বীকার করতেই হবে। অর্থাৎ ওটি অলৌকিক বস্তু, লৌকিক বুদ্ধিতে কিছুতেই বুঝা যাবে না। প্রকৃত কথা এই যে, ভাষ্যকার ও নিবন্ধকারদের সময় প্রবরের যথার্থ অর্থের স্মৃতিও লোপ হয়েছিল এবং নানা পরস্পরবিরোধী কল্পনা তার স্থান পূরণ করেছিল। যদি পাঠক রঘুনন্দনের উদ্বাহতত্ত্বে ধৃত মাধবাচার্যের প্রবরের ব্যাখ্যার সঙ্গে "অসপিণ্ডাতু যা মাতুঃ সগোত্রাচ যা পিতুঃ" এই মনু বচনের মেধাতিথির ভাষ্য মিলিয়ে দেখেন তবে এ সত্য হৃদয়ঙ্গম হবে, কিন্তু এখনও আমরা এই বহুদিন মৃত প্রবরের বাসি মড়া ঘাড়ে করে কষ্ট পাচ্ছি এবং বিবাহের ক্ষেত্রকে অকারণে সংকীর্ণ করে সমাজের অমঙ্গল ডেকে আনছি।

হিন্দু বিবাহে সপিণ্ডের মধ্যে বিবাহ নিষেধের বিধি নিকট সম্পর্কিত স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে বিবাহ নিবারণের নিয়ম। এই নিষেধ সকল সমাজের বিবাহ-বিধিতেই কোন না কোন রকমে আছে। হিন্দু সমাজের প্রচলিত নিয়মে পিতার বংশে ৭ ও মাতার বংশে ৫ সিঁড়ি উপরে ও নীচে এই নিষিদ্ধ সীমার গণ্ডি—"পঞ্চমাৎ সপ্তমাদূর্ধ মাতৃতঃ পিতৃতস্তথা" (যাজ্ঞবল্ক্য)। রাও কমিটির শেষ খসড়ায় শাস্ত্রীয় বিবাহে এই নিয়মই বহাল রাখা হয়েছে। অনেকে সম্ভব জানেন যে, এবিষয়ে সকল শাস্ত্রকার একমত ছিলেন না। কোন কোন শাস্ত্রকার এই গণ্ডীকে সংক্ষেপ করে পিতৃপক্ষ ৫ ও মাতৃপক্ষ ৩ পর্যন্ত মাত্র গণনার বিধি দিতেন—"ত্রীনতীত্য মাতৃতঃ পঞ্চাতীত্য চ পিতৃতঃ" (পৈঠীনসি)। গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী তাঁর হিন্দু আইন পুস্তকে বলেছেন যে, বাঙলাদেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যে পৈঠীনসির ৫ আর ৩ মতবাদই কার্যত চলে, যদিও বাঙালী স্মার্ত রঘুনন্দন ৭ আর ৫ গণনার জোর পক্ষপাতী। শাস্ত্রী গোলাপচন্দ্রের কথা হয়ত একটু অতিরঞ্জিত, কিন্তু বাঙলাদেশের অনেক জায়গায় ব্রাহ্মণদের মধ্যেও পৈঠীনসির মত কার্যত চলে, তাতে কোন সন্দেহ নাই। আমার নিজের মতে এই প্রস্তাবিত আইনে সপিণ্ডত্বের সীমা ৫ আর ৩-এ নির্দেশ করা উচিত। এই নিয়মের পক্ষে শাস্ত্রও আছে এবং বর্তমান হিন্দুর সামাজিক বোধ ও রুচিরও তা বিরুদ্ধ নয়। এই নিয়মে বিবাহ্য বর ও বিবাহ্যা কন্যার ক্ষেত্র বড় হবে, যার সামাজিক প্রয়োজন আছে।

রাও বিলের প্রস্তাবিত এক পত্নীক বিবাহের বিরুদ্ধ মত এপর্যন্ত চোখে পড়েনি। কারণ, আইনে যাই হোক, সমাজে আধুনিক হিন্দু বিবাহ মোটের উপর এক পত্নীকে অর্থাৎ আমাদের প্রায় সকলের মনের সম্মতি এক পত্নীকে বিবাহের আদর্শের দিকেই; বহু বিবাহ আইনে নিষিদ্ধ করলে অন্য দেশে ও সমাজে মাঝে মাঝে যেসব অসুবিধা ঘটে তা আমাদের মধ্যেও ঘটবে। কিন্তু তার কুফলের পরিমাণ বহু বিবাহের কুফলের তুলনায় অনেক কম। মানুষের কোন নিয়ম সম্পূর্ণ দোষমুক্ত করা যায় না। যেটা মোটের উপর ভাল তাকেই বেছে নিতে হয়।

রাও বিলে বিবাহ ভঙ্গের যেসব বিধি-নিষেধ আছে, তার একটা প্রধান প্রয়োজন হয়েছে এই এক পত্নীক বিবাহের আইনত প্রবর্তনে। পরের প্রবন্ধে রাও বিলের প্রস্তাবিত বিবাহ ভঙ্গবিধির আলোচনা করা যাবে।

(৪)

হিন্দু বিয়ের অনুষ্ঠানে বর বধূকে বলে "যদস্তি হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব। যদস্তি হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম॥"—আমার এই যে হৃদয় তা তোমার হোক, তোমার যে হৃদয় তা আমার হোক। অর্থাৎ বিবাহের ফলে বর বধূর হৃদয়ের যোগ হোক অতি নিবিড়। মন্ত্রের আর যে শক্তিই থাকুক, নরনারীর দুই হৃদয়কে এক করার ক্ষমতা নাই। ও মন্ত্রের উদ্দেশ্য নব বিবাহিত দম্পতির সামনে দাম্পত্য জীবন ও প্রেমের একটি আদর্শ ধরা ও প্রার্থনা করা যে দম্পতির জীবনে এ আদর্শ সফল হোক। কিন্তু এ সফলতা কদাচিৎ ঘটে। বেশীর ভাগ দম্পতির জীবনে নরনারী পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক যৌন আকর্ষণে প্রথমে আকৃষ্ট হয়। তারপর দৈনিক জীবনের সাহচর্যে, সন্তানের প্রতি স্নেহে, সংসারের নানা ঘাতপ্রতিঘাত এক সঙ্গে সহ্য করে মোটের উপর সুখে দুঃখে গার্হস্থ্য জীবন এক রকম কেটে যায়। স্বামী স্ত্রীর একাত্মতা দুর্লভ বলেই কাব্যে ও উপন্যাসে তার উজ্জ্বল চিত্রে মানুষ মুগ্ধ হয়; আর যদি বাস্তব জীবনে সে একাত্মতা কচিৎ দেখা যায়, তবে মানুষ তাতে কাব্য পাঠের আনন্দ পায়। অর্থাৎ দর্লভ বলে এই রকম একাত্মতাকে মানুষ অলৌকিক মনে করে। কিন্তু কখনও কখনও অদৃষ্টের নিষ্ঠুর অভিশাপে, কি স্বামী বা স্ত্রীর কৃতকর্মের ফলে সাধারণ রাগ-বিরাগের ও সুখ-দুঃখের গার্হস্থ্য জীবনও স্বামী-স্ত্রীর একসঙ্গে যাপন করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এই ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে স্বামী ও স্ত্রীকে মুক্তি দেবার জন্যই প্রায় সব সভ্য-সমাজে বিবাহের বন্ধন ছেদনের ব্যবস্থা করতে হয়।

বিবাহ বন্ধন অচ্ছেদ্য, কি তা ছেদন করা অত্যন্ত কঠিন, সমাজ ও আইনের এই রকম ব্যবস্থা নরনারীকে অনেক দুঃখকষ্ট অত্যাচার সহ্য করেও পরস্পরের প্রতি সহনশীলতার অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি করে। এই মনোভাবের অভাবে শিথিল বিবাহ-বন্ধন সভ্য-সমাজে বহু বন্ধনকেই শিথিল করে দেয়। সেই জন্য অনেক সভ্য-সমাজেই বিবাহের বন্ধন ছেদনকে যথাসম্ভব কষ্টসাধ্য করা হয়েছে। কিন্তু এরও একটি সীমা আছে। অবস্থা এমন হতে পারে যে, স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্যজীবন যাপন তাদের নিজেদের পক্ষেও শুধু মহাক্লেশকর নয়, সমাজের পক্ষে অমঙ্গলকর। তেমন জায়গায় বিবাহকে ভঙ্গ হতে দেওয়াই ব্যক্তিগত ও সমাজগত প্রয়োজন। প্রাচীন হিন্দু আইনে এই কারণে অনেক স্থলে স্বামীর স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার এবং স্ত্রীর স্বামীকে পরিত্যাগ করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। কোন্ অবস্থায় বিবাহকে ভঙ্গ হতে দেওয়া হবে এবং কখন হবে না এবং বিধিনিষেধ প্রণয়ন সব সময়েই

কঠিন। কারণ ব্যক্তির প্রয়োজন ও সমাজের প্রয়োজন এই দুইদিক বিবেচনা করে তবেই এর নিয়ম প্রণয়ন করা যায়। বিবাহবন্ধন যাতে স্বভাবতঃই অশিথিল থাকে, কিন্তু স্বামী কি স্ত্রীর জীবন একান্ত দুর্বহ না হয়, এই দুইদিকে সমান দৃষ্টি রাখলে তবেই বিবাহভঙ্গের বিধি গ্রহণযোগ্য হয়। রাও কমিটির প্রস্তাবগুলি এতে কতদূর সফল হয়েছে, সেটাই বিচার্য বিষয়।

অন্য নানা দেশের বিবাহভঙ্গের আইন অনুসরণ করে রাও কমিটি বিবাহভঙ্গের বিধিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। এক—কতকগুলি অবস্থায় স্বামী কিংবা স্ত্রীর আবেদনে আদালত প্রচার করতে পারবেন যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বৈধ ও আইনসংগত কোন বিবাহ আদৌ হয় নাই। দুই— অন্য কতকগুলি অবস্থায় স্বামী কি স্ত্রীর আবেদনে আদালত বৈধ বিবাহকে আদেশের তারিখ থেকে ভঙ্গ হল বলে নির্ধারণ করতে পারবেন। আদৌ সিদ্ধ বিবাহ হয় নাই—এই প্রচারের মোটামুটি কারণগুলি এই—(১) যদি বিবাহের সময় ও আদালতে আবেদনের সময় স্বামী কি স্ত্রীর পুরুষত্ব কি স্ত্রীত্ব না থেকে থাকে; (২) যদি স্বামী-স্ত্রী এই রকম সম্পর্কে সম্পর্কিত হয় যাদের মধ্যে আইনত বিবাহ নিষিদ্ধ; (৩) যদি বিবাহের সময় স্বামী কি স্ত্রী উন্মাদ বা জড়বুদ্ধি থাকে; (৪) যদি বিবাহের সময় স্বামী কি স্ত্রীর পূর্ব বিবাহের স্ত্রী কি স্বামী জীবিত থাকে এবং সেই পূর্ব বিবাহ বলবৎ থেকে থাকে; (৫) যদি স্বামী কি স্ত্রীর বিবাহে সম্মতি, অথবা যেখানে তাদের অভিভাবকদের সম্মতি বিবাহে প্রয়োজন, সেরূপ সম্মতি বলে কি ছলে বিবাহের অপর পক্ষ নিয়ে থাকে।

সিদ্ধ বিবাহ ভঙ্গের কারণগুলি মোটামুটি এই—(১) যদি স্বামী বা স্ত্রী বিকৃতমনা হয় বা চিকিৎসার অতীত এবং বিবাহভঙ্গের আবেদনের পূর্বে যদি ক্রমান্বয়ে সাত বৎসর এই রকম বিকৃতমনা থেকে থাকে; (২) যদি স্বামী কি স্ত্রী অচিকিৎস্য মহাকুষ্ঠ ব্যাধি-গ্রস্ত হয় যে ব্যাধি আবেদনকারী কি আবেদনকারিণীর ছোঁয়াচ থেকে উৎপন্ন হয়নি; (৩) যদি স্বামী কি স্ত্রী বিনা কারণে স্ত্রী কি স্বামীকে সাত বৎসর পর্যন্ত ত্যাগ করে থেকে থাকে; (৪) যদি স্বামী কি স্ত্রী অন্য ধর্মাবলম্বনের ফলে আর হিন্দু না থেকে থাকে; (৫) যদি স্বামী কি স্ত্রী সাত বৎসর পর্যন্ত সংক্রামক যৌনব্যাধিগ্রস্ত থেকে থাকে যে ব্যাধি আবেদনকারী কি আবেদন-কারিণীর ছোঁয়াচ থেকে উৎপন্ন নয় এবং (৬) যদি অন্য কোন স্ত্রীলোক স্বামীর রক্ষিতা হয়ে থাকে অথবা বারবনিতার জীবনযাপন করে।

বিবাহকে অসিদ্ধ প্রচারের বিধি ও সিদ্ধ বিবাহভঙ্গের বিধি—এ দুই-ই কেবল সেই সব বিবাহ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হবে যেসব বিবাহ হবে এই হিন্দু কোড বা সংহিতা আইন হয়ে পাশ হবার পর। অর পূর্বেকার কোন বিবাহে এসব বিধি প্রযুক্ত হবে না।

লক্ষ্য করার বিষয়, প্রস্তাবিত আইনে স্বামী ও স্ত্রীকে বিবাহের অসিদ্ধ প্রচার ও বিবাহ ভঙ্গে সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। বর্তমান আইনে হিন্দু স্বামী ইচ্ছা করলে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে পারে ও দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারে, তাতে কোন কারণ দেখাবার প্রয়োজন নাই। স্মৃতিশাস্ত্রে স্বামীর স্ত্রী পরিত্যাগের যেসব কারণ বলা হয়েছিল, সেগুলি আইনের ব্যবস্থা নয়; নৈতিক উপদেশমাত্র—বর্তমান আইনের এই বিধান এবং পরাশর সংহিতায় যেসব কারণে স্ত্রীকে স্বামী পরিত্যাগ করে অন্য স্বামী গ্রহণের ব্যবস্থা দেওয়া ছিল, তাও এখন আইনত বাতিল, এক বিধবার পুনর্বিবাহ ছাড়া যা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় আইন করে ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্যক্তির মর্যাদার দিক থেকে স্ত্রী-পুরুষের এই সাম্য অবশ্য গ্রহণীয় এবং সামাজিক দিক থেকে এতে অহিতের বিশেষ কোন সম্ভাবনা নাই। রাও বিলে যে সকল কারণে বিবাহ অসিদ্ধ কি ভঙ্গ হতে পারে, সেগুলি এমন কারণ যা সত্ত্বেও স্বামী কি স্ত্রীকে অনিচ্ছায় দাম্পত্য-জীবনযাপন করতে বাধ্য করা কেবল মানুষের প্রতি নিষ্ঠুরতা নয়, সমাজের পক্ষেও অমঙ্গলকর। রাও বিলের বিধিনিষেধগুলি ব্যক্তির প্রয়োজন ও সমাজের হিত কোনটাকে অগ্রাহ্য করে একদিকে বেশী ঝোঁক দিয়েছে বলে মনে হয় না। পূর্বকালে হিন্দু সমাজে এমন দিন ছিল, যখন এর চেয়ে অনেক লঘু কারণে বিবাহভঙ্গের বিধি ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দেখি—স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পর বিদ্বেষপরায়ণতা বিবাহ ভঙ্গের একটা কারণ ছিল—"পরস্পর দ্বেষান্মোক্ষঃ" (কৌটিল্য)।

বিবাহকে অসিদ্ধ প্রচার করা কি বিবাহকে ভঙ্গ করা দুই-ই নির্ভর করে স্বামী কি স্ত্রীর আদালতে আবেদনের উপর। সে রকম আবেদন করা-না-করা স্বামী কি স্ত্রীর ইচ্ছাধীন। খুব সম্ভব, বহুস্থলে বিবাহ ভঙ্গের কারণ উপস্থিত হলেও স্বামী বা স্ত্রী তার জন্য আবেদন করবে না। উন্মাদ স্ত্রীকে পরিত্যাগ না করে তার সেবায় স্বামী জীবন কাটিয়েছেন—এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই এবং উন্মাদ স্বামীমাত্রকেই তার স্ত্রী পরিত্যাগ করবে, এ রকম আশঙ্কাও অমূলক। তবে সব মানুষের—কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক—মন সমান নয়। সকলের কাছ থেকে অসাধারণ মহত্ত্ব কি প্রেম আশা করা যায় না এবং তার উপর ভিত্তি করে সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করা চলে না। ভাবী স্বামী অতি অল্পজীবী হবেন জেনেও সাবিত্রী সত্যবানকে স্বামিত্বে বরণ করে-ছিলেন; কিন্তু সকল স্ত্রীর সাবিত্রী হওয়া সম্ভব নয়। এটা একটা আদর্শ। অল্প লোকেই সে আদর্শের নাগাল পাবে। সাধারণ মানুষের সাধারণ চরিত্রের উপর ভিত্তি করেই সামাজিক বিধিনিষেধ গড়তে হয়। মহৎ জীবনের মহত্ত্বের পথও খোলা থাকবে, সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবনযাত্রার পথও খোলা থাকবে। রাও কমিটির প্রস্তাবগুলি এর অন্যথাচরণ করেনি। এক জায়গায় রাও কমিটির বিধিব্যবস্থায় কিছু ত্রুটি আছে মনে হয়। রাও কমিটির প্রস্তাবিত কোন কোন কারণে স্বামী বিবাহভঙ্গ করলে পরিত্যক্ত স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন—যেমন উন্মাদিনী স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ যদি ভঙ্গ হয়। তার কারণ আমাদের সমাজে ও পৃথিবীর অনেক সভ্য-সমাজেই স্ত্রী ও পুরুষের ধনতান্ত্রিক বৈষম্য।

যাঁরা ভয় করেন যে, বিবাহ অসিদ্ধ ও বিবাহভঙ্গের এই সব বিধি-বিধান হিন্দুর বিবাহবন্ধন ও সমাজকে শিথিল করবে, তাঁরা হিন্দু পুরুষ ও হিন্দু নারীকে অন্যান্য সমাজের পুরুষ ও নারীর চেয়ে মনে মনে নিশ্চয়ই হেয় জ্ঞান করেন। বিবাহ ভঙ্গের বিধি থাকলেও স্বামী ও স্ত্রী সুযোগ পেলেই বিবাহ ভঙ্গের চেষ্টা করবে —এ রকম ব্যাপার অন্য সমাজে ঘটে না। হিন্দু সমাজে কেন ঘটবে, তার কারণ নেই। যাঁরা কারণ আছে মনে করেন, তাঁদের অবচেতন মনে সম্ভব এই ধারণা আছে যে, হিন্দু স্ত্রী-পুরুষের বিবাহের যে বন্ধন, তা কেবল টিকে আছে, আইনে সেই বিবাহ, অন্তত স্ত্রীলোকের পক্ষে অচ্ছেদ্য বলে। *

* "আনন্দবাজার পত্রিকা" হইতে পুনর্মুদ্রিত।

বিজ্ঞানের কথা

বৈজ্ঞানিক পরিক্রমা

শ্রীবিজ্ঞানী

তথ্য ও তত্ত্ব

ধ্যান, ধারণা ও অভিব্যক্তি এই তিনের সমন্বয়ে ঘটে সৃষ্টি। হিন্দু পুরাণে কথিত আছে—সৃষ্টির পূর্বে ধ্যানস্থ বিধাতা অনন্ত শয্যায় শায়িত ছিলেন। তাঁর ধ্যানলব্ধ ধারণার অভিব্যক্তিই এই নিখিল বিশ্বের এখানে সেখানে ছড়ান আছে। এই সৃষ্টির মধ্যে মানুষ বিধাতার বিরাট ধারণার একটি ক্ষীণ প্রকাশ হলেও ক্ষীণতম নয়। সৃষ্টি, স্থিতি, লয়—বিশ্বগঠন ও পরিচালনার এই ত্রিধারার সূত্রগুলি বিধাতা সযত্নে প্রকৃতির মণিকোঠায় গুপ্ত রেখেছিলেন। কোন দুর্বল মুহূর্তে স্নেহের বশে মানুষকে বিশ্বস্রষ্টা তাঁর নিজস্ব বিরাটতম বুদ্ধির এক সূক্ষ্মতম কণা দান ক'রেছিলেন—যার ফলে মানুষ প্রকৃতির বিশালতম শক্তিকেও অবহেলায় জয় ক'রে চলার উদ্দেশ্যে বিশ্বলীলার মূলসূত্রগুলি একে একে আয়ত্ত্ব ক'রে চলেছে। অলক্ষ্যে থেকে বিধাতা হয়তো ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে উঠেছেন। কিন্তু তাঁর নিজেরই সৃষ্ট ক্ষীণকায়া মানুষের সাফল্যের গৌরবে হয়তো নিজেকেও গৌরবান্বিত মনে ক'রেছেন।

বিজ্ঞান আজ বহু বিস্তৃত। এর কর্মক্ষেত্র মানুষের শুধু সমাজজীবন, কর্মজীবনকেই প্রভাবান্বিত ক'রে নাই, তার ধর্ম-জীবনেও এনেছে প্রবল আলোড়ন। ইন্দ্রিয়ানুভূতি-লব্ধ তথ্যের ব্যাখ্যা করতে গিয়েই মানুষ গ'ড়ে তুলেছে তার দর্শন, তার বিজ্ঞান, তার ধর্ম। পূর্ব-জীবনে—সৃষ্টির আদিযুগে তথ্য ছিল প্রচুর, তথ্যের ব্যাখ্যা ছিল সামান্যই। তাই দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রও ছিল সংক্ষিপ্ত। এই সংক্ষিপ্ত দর্শন বা বিজ্ঞান শাস্ত্র যেখানে তথ্যের ব্যাখ্যা দিতে অসমর্থ হোল সেখানেই মানুষ ধর্মের শরণাপন্ন হ'য়েছিল। তাই যখন বিজ্ঞান ছিল সংক্ষিপ্ত, ধর্ম ছিল ব্যাপ্ত। সমাজ-জীবনে কর্ম-জীবনে ধর্মেরই ছিল প্রাধান্য। আজ এই অবস্থার হ'য়েছে আমূল পরিবর্তন। ইন্দ্রিয়ানুভূতি-লব্ধ তথ্যের ব্যাখ্যার জ্ঞানলাভ শেষ ক'রে অতীন্দ্রিয় রাজ্যে তথ্যানুসন্ধানী মানব তার বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি নিয়ে অভিযান করে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্র এত বেশী বিস্তৃত করে তুলেছে যে, কি সমাজজীবন, কি কর্মজীবন, সমস্ত ক্ষেত্রেই এখন ধর্মের প্রভাব সঙ্কুচিত করে বিজ্ঞান এসে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞানের এই সাফল্য মানুষের মাথায় আজ কাঁটার মুকুট হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিকে শোভা ও গৌরবের প্রতীক হলেও অন্যদিকে যে প্রচুর কষ্টদায়ক হয়ে পড়েছে। অথচ একে মাথায় স্থান না দিয়েও আজ এর উপায় নাই।

তথ্য ও তত্ত্ব নিয়েই বিজ্ঞানীর বিজ্ঞানশাস্ত্র। তথ্য থেকে বিজ্ঞানী তার তত্ত্বের সৃষ্টি করে। আবার তত্ত্ব থেকে সে ফলিত বিজ্ঞানে যায়। তথ্য ও তত্ত্ব থেকেই সে গড়ে তোলে মীমাংসিক বিজ্ঞান (Theoretical Science) ও পরীক্ষা বিজ্ঞান (Experimental Science)। আবার এই দুইয়ের সমন্বয় দেখানো হয় ফলিত বিজ্ঞানে। তথ্য থেকে তত্ত্ব বা মতবাদ এইভাবে গড়ে তোলাই ছিল বিজ্ঞানের গোড়ার কথা। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ উপগ্রহাদির উদয়াস্ত পরিদর্শন থেকে যে সকল তথ্য আহরণ করে নেওয়া হয়েছিল তার থেকেই তাদের তথ্য সমগ্র পরিদৃশ্যমান সাধারণ জগতের পদার্থ ও পদার্থের গতিবেগের নিয়মতান্ত্রিক তত্ত্বের (Theory of Matter and Motion) সৃষ্টি হয়েছিল। আবার নিছক তত্ত্ব থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়। বিজ্ঞানীর ধ্যানে যে তত্ত্বের উৎপত্তি তার থেকে সম্ভাব্য তথ্যের ধারণা করা হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত বিজ্ঞানশাস্ত্রে প্রচুর। তথ্য থেকে তত্ত্ব, তত্ত্ব থেকেও তথ্য। একের মধ্যে আরেকজনের আবির্ভাবের কল্পনা করা হয়। একজনের মধ্যে আরেকজনের সত্তার সন্ধান মেলে। দুইই ভিন্ন অথচ দুইই এক। একের সন্ধান যখন মেলে, জ্ঞানাকাশের দিকচক্রবালে তখন আরেকজনের আবির্ভাবের সূচনা হয়। বিজ্ঞানী উন্মুখ হয়ে তার আগমনের প্রতীক্ষা করে।

"ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ—
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া—
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ—
সীমা চায় হ'তে অসীমের মাঝে হারা—।"

তথ্য ও তত্ত্বের আবর্তনের সত্যিকার রহস্য কবি হয়তো এইভাবেই দেখিয়েছেন।

বৈজ্ঞানিক তথ্য, তত্ত্ব ও চিন্তাধারার গতি—

আপেল কেন অন্যদিকে গেল না, পৃথিবীই তাকে আকর্ষণ করে নিজের কোলে কেন নিয়ে এল—এই তথ্য বিজ্ঞানীর মনে যে প্রশ্নের উদ্ভব করেছিল তার থেকে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার প্রথম পরিবর্তন এনেছিলেন নিউটন্। আপাতত-দৃষ্টিতে প্রতীয়মান এই ক্ষুদ্র তথ্য থেকে যে বিরাট তত্ত্ব গড়ে তোলা হয়েছিল, সেই নিউটনীয় মতবাদ পদার্থ বিজ্ঞানে অনেক বড় বড় তথ্যাদি ও ঘটনার আবিষ্কার সম্ভব করেছিল। তথ্য ছিল, তত্ত্ব হোল, আবার এই তত্ত্ব থেকেই উত্তরকালে অনেক খবর পাওয়া গেল। বিজ্ঞানশাস্ত্রে নূতন অধ্যায়ের আরম্ভ ও শেষ হোল। নিউটনীয় মতবাদে সকলেই জানলে, পরিদৃশ্যমান জগতে সাধারণভাবে ইন্দ্রিয়ানুভূতির গোচর সাপেক্ষ প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর মূলসূত্র নিউটনের মতবাদেই সমগ্ররূপে সম্পূর্ণ। বৈজ্ঞানিক জগত যখন এইভাবে তথ্যাদির ব্যাখ্যা শেষ করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছে—তখন আবার নূতন মতবাদ দেখা দিল। মতবাদ প্রচার করলেন বৈজ্ঞানিকপ্রবর আল্‌বার্ট আইনস্টাইন। সাধারণ পরিমাপের গণ্ডী ছাড়িয়ে যদি বিশালতার রাজ্যে, বিশাল ও বিরাট ঘটনার সন্ধান করি, তাহলে কি হয়? পদার্থের কি গতি কি মাপ, কি আকার অথবা এইগুলির সমন্বয়ে যে সকল ঘটনার উদ্ভব, সেই সকলের পরিমাণ জ্ঞাপক মাপকাঠিগুলি যদি সাধারণ পরিমাপের গণ্ডী ছাড়িয়ে আলোকের গতির (Velocity of light "c"=3. 10^{10} cm.) পরিমাপের সমরেখায় উপনীত হয়, তাহলে কি হয়? এই বিরাট অতীন্দ্রিয় রাজ্যে নিউটনীয় মতবাদ চলবে কেন? আইন্‌স্টাইন্ বললেন, এর জন্য চাই আপেক্ষিক তত্ত্ব। পদার্থের মাপ তার সমস্ত গতিবেগেই সমান থাকবে—এটি আমাদের সাধারণ জগতের একটি বিশিষ্ট ঘটনা ও নিউটনীয় মতবাদের এই একটি নির্দিষ্ট নির্দেশ। কিন্তু এই পদার্থের গতি যদি আলোকের গতির কাছাকাছি হয়, তাহলে পদার্থের মাপের তারতম্য হবে—এই-ই হোল আইন্‌স্টাইনের রাজ্যের ঘটনা ও তাঁর মতবাদের অন্যতম নির্দেশ। নূতন তত্ত্ব থেকে এল, নূতন তথ্য। দুইয়ের সমন্বয়ে প্রাকৃতিক দর্শনশাস্ত্রে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাও নূতনভাবে নূতন পথে পরিচালিত হোল।

বিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথম দিকে বিজ্ঞানের কোনও কোনও ক্ষেত্রে এমন কতকগুলি নূতন নূতন তথ্যের সংবাদ পাওয়া গেল যে, তৎকালীন প্রচলিত মতবাদ বা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, তৎসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে একেবারেই অচল হয়ে দাঁড়াল। আবার তথ্য থেকে এল তত্ত্ব ও এই দুইয়ের সংযোগে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় এল আমূল পরিবর্তন। সাধারণ পরিদৃশ্যমান জগৎ ও বিশালতার জগত, এই দুই থেকে বিজ্ঞানীর

মনোযোগ আকৃষ্ট হোল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণিকাদের রাজ্যে। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গীতে নূতনত্বের আবির্ভাব দেখা দিল।

জড়ের রূপ সম্বন্ধে যে মতবাদ—ডাল্টন, এভোগ্যাড্রো, রাদারফোর্ড প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ গড়ে তুলেছিলেন, তার থেকে জানা যায় জড়, তাড়িৎ ও শক্তি এ সকলেরই আদি ও মৌলিকরূপ—কণা। শক্তির কণারূপ কল্পনা করেন প্লাঙ্ক; তিনি এর নাম দেন ফোটন্। তড়িতের মৌলিক কণার নাম হয় প্রোটন ও ইলেক্ট্রন। জড়ের কণার নাম হয় এটম্। জড়ের মৌলিক কণা এই এটম আবার কতকগুলি প্রোটন ও ইলেক্ট্রনেরই সমষ্টি। এটমের মধ্যে কতকগুলি প্রোটনের সমষ্টিকে কেন্দ্র করে কতকগুলি ইলেক্ট্রন সতত ঘূর্ণায়মান। এটমের মধ্যস্থিত প্রোটন ও ইলেক্ট্রনের সংখ্যা ও স্থিতির বিভিন্নতার উপর এটম তথা জড়েরও বিভিন্নতা নির্ভর করে। ঘূর্ণায়মান ইলেক্ট্রনের বেগভার কখনও কখনও বিশিষ্ট কারণে বিশিষ্ট অবস্থায় শক্তির কণা বা ফোটনরূপে প্রকাশ পায়। পদার্থের সংগঠন বা রূপ সম্বন্ধে, জড়, তাড়িৎ ও শক্তির কণার সমন্বয়ে এই যে, মতবাদ গড়ে তোলা হোল, তা কিন্তু বেশী দিন স্থায়ী হোল না। এর পরেই ব্যোম রশ্মির (Cosmic Ray) গবেষণায় আরও কতকগুলির আবিষ্কার হোল। এই কণাগুলির নাম দেওয়া হয় পজিট্রন্, নয়ট্রন্, বসু-কণিকা ও মেসন্। এই কণিকা সংক্রান্ত বিজ্ঞানের কোনও কোনও ক্ষেত্রে এও দেখা গেল যে, বস্তুর আদিরূপ কখন কণারূপে ও সেই সকল কণা গতিশীল হলে কখন কখন শক্তিরূপে প্রকাশ পায়। শক্তির প্রকাশের ধারাও আবার একরূপ নয়। কখনও কণারূপে যে শক্তির প্রকাশ দেখা যায়, সেই শক্তিই আবার কোনও একটি বিশিষ্ট ক্ষেত্রে তরঙ্গাকারে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রকৃতির এই যুগ্মধর্মের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হাইসেনবার্গ, ঘমার ফিল্ড, স্রডিঞ্জার প্রমুখ বিজ্ঞানীরা ঊর্মি বিজ্ঞান (Wave mechanics) ও অনিশ্চয়তার বিজ্ঞান (Uncertainty Principle) নামক মতবাদ গড়ে তুললেন। তাঁদের মতবাদ থেকে জানা যায়, কোনও বিশিষ্ট কণার পরিমাপ যখন পজিট্রন, নয়ট্রন প্রভৃতি কণার আয়তনের ("a"=10–31 C. M.) গণ্ডীর মধ্যে গিয়ে পড়ে এবং তারা গতি সম্পন্ন হয়—তখন তাদের ঘটনাবলীর কার্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করাও অনিশ্চয়তার মধ্যে গিয়ে পড়ে। আর এইজন্যই একক্ষেত্রে যাকে কণিকাকারে পাওয়া যায়—পরক্ষণেই সে তরঙ্গাকারে ধরা দেয়।

পদার্থ ও তার গতি সম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক তথ্যের এই দ্বিধারা বিজ্ঞান শাস্ত্রের তিনটি যুগান্তকারী মতবাদের তথা তত্ত্বের সৃষ্টি করে সমগ্র বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারায় যে চঞ্চলতার উৎপত্তি করে—তা শেষ হবার পূর্বেই বিজ্ঞানের আর এক ক্ষেত্রে এক নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেল। ব্যোম-রশ্মির গবেষণায় নূতন নূতন কণিকার আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে আর এক বিস্ময়কর ঘটনার আবির্ভাবে বৈজ্ঞানিক জগতে এক মহা সমস্যা উপস্থিত হোল। মহাশূন্য থেকে আগত ব্যোমরশ্মির কোনও বিশিষ্ট অংশ বিজ্ঞানীর যন্ত্রে প্রবিষ্ট হয়ে এক ধরণের কণা ও শক্তির বৃষ্টির সৃষ্টি করে। একে বলা হয় কস্মিক-রে শাওয়ার (Cosmic Ray Shower)। হিসাবে দেখা যায়, শূন্য থেকে আগত রশ্মির শক্তির পরিমাণ, তার থেকে সৃষ্ট কণিকা ও তাদের শক্তির সমষ্টির পরিমাণের অপেক্ষা অনেকাংশে কম। কি করে এ সম্ভব হয়? এক নির্দিষ্ট পরিমাণের শক্তি থেকে তার চাইতে বেশী পরিমাণের শক্তির আবির্ভাব কি করে সম্ভব হয়? আজ পর্যন্ত প্রচলিত মতবাদের প্রত্যেকটিই এই তথ্যের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধবাদী। হয় এই তথ্য ভুল, না হয় আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানশাস্ত্রে যত কিছু তত্ত্ব ও মতবাদের সন্নিবেশ করা হয়েছে—তা সমস্তই ভুল ও নিরর্থক। স্তম্ভিত বৈজ্ঞানিক জগত এই সমস্যার এখনও সঠিক উত্তর খুঁজে পান নাই। কিন্তু তাঁদের চিন্তাধারা আজ যেভাবে পরিচালিত হয়েছে তাতে জানা যায় যে, পদার্থ যখন একটি নির্দিষ্ট গতির ("c") পরিমাপের গণ্ডীর মধ্যে গিয়ে পড়ে, কণা যখন একটি নির্দিষ্ট সূক্ষ্ম আয়তনের ("a") মাপ পেরিয়ে যায়, শক্তি যখন একটি বিশিষ্ট সীমা ($E=10^5$ electron million volt) ছাড়িয়ে যায় তখন নূতন মতবাদ ও নূতন তত্ত্বের সন্ধান করে আনতে হবে। আধুনিক বিজ্ঞানীর চিন্তাধারা আজ সেই নূতন মতবাদের সন্ধানে পরিচালিত হয়েছে। কবি বলছেন, "আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে—"

কিন্তু বিজ্ঞানী বলছেন, "সত্য যতদূরেই হোক, আমি তত দূরেই যাব।"

ট্রামে-বাসে

কলিকাতায় অকালে বারিবর্ষণের ফলে শীতটা একটু মাত্রা ছাড়াইয়াই পড়িয়াছে এবং যুদ্ধকালীন বিলি ব্যবস্থার ফলে পশমী জামা কাপড়ের দুর্মূল্যতা এবং দুষ্প্রাপ্যতায় ট্রামে-বাসে চড়িয়া শীতে ঠক ঠক করিয়া কাঁপিতেছিলাম। এমন সময় অকস্মাৎ একটি সংবাদ শুনিয়া আবার চাঙ্গা হইয়া উঠিলাম। শুনিলাম বারিবর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে লাট প্রাসাদের সম্মুখে নাকি আবার রৌপ্যমুদ্রা বর্ষণও হইয়া গিয়াছে। লাট প্রাসাদের আনাচে-কানাচে অবস্থানকারী বাঁদর বাহিনীই নাকি এই কাণ্ড করিয়াছে বিশেষজ্ঞদের ইহাই অভিমত। কলিকাতার চোরাবাজারে বাঁদররাও যে বেশ দু'পয়সা কামাইয়া নিতেছে এই সংবাদটি তাহারই জ্বলন্ত প্রমাণ।

* * *

কলিকাতায় বসন্তের প্রকোপ বন্ধ করিবার জন্য যাহাতে যথারীতি ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় এবং জনসাধারণ অবিলম্বে স্বেচ্ছায় টিকা গ্রহণ করেন সেই জন্য কলিকাতা কর্পোরেশনের জনস্বাস্থ্য বিভাগের এই দায়িত্বটি প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট নিজের হাতে তুলিয়া নিলেন। জনস্বাস্থের কল্যাণে টিকার ব্যবস্থার উপর টীকা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু আমরা ভাবিতেছি কর্পোরেশনের নিশ্চিন্ত নিদ্রালুতার চিরব্যাধির জন্য যদি কোন নূতন টিকার ব্যবস্থা না হয় তাহা হইলে Parmanent disabilityর অজুহাতে এঁদের সমস্ত দায়িত্বই হয়ত একদিন হস্তান্তরিত হইয়া যাইবে। কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ এ সম্বন্ধে অবহিত হউন।

* * *

ডাক্তার আম্বেদকার তপশীলী শ্রেণীভুক্ত ছাত্র সম্প্রদায়কে রাজনীতি হইতে দূরে সরিয়া থাকিবার জন্য এক সারগর্ভ উপদেশ দান করিয়াছেন। তাঁহার এই মূল্যবান উপদেশ সম্বন্ধে অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা ইতিমধ্যেই অনেক কাগজে ছাপা হইয়াছে। আমরা ট্রাম-বাসের যাত্রীরা



বলাবলি করিতেছি ডাক্তার আম্বেদকার নিজেও বোধ হয় এই উপদেশের উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করেন নাই। দামোদরের বাঁধ বাঁধিবার অবিচলিত সংকল্পের প্রতিক্রিয়া হিসাবেই হয়ত তিনি দেশের রাজনৈতিক প্রবাহকেও বাঁধিয়া ফেলিবার উন্মাদ উপদেশটি দিয়া ফেলিয়াছেন!

* * *

হিটলারকে আমরা ছাড়িয়াও ছাড়িতে পারিতেছি না। তিনি যে বাঁচিয়া নাই সে সম্বন্ধে আবার একটি গবেষণাপূর্ণ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। জনৈক গবেষক প্রমাণ করিয়াছেন যে, হিটলারের সাম্প্রতিক ছবিতে যে একটি কান দেখা গেল সেইটির আদি হিটলারের অকৃত্রিম কানের সঙ্গে কোন সাদৃশ্য নাই, সুতরাং



তিনি আর ইহজগতে নাই। আমাদের বিশু খুড়ো বলিতেছেন—"তা নয়। একটি কান কাটা গিয়াছে বলিয়াই তিনি এখনও আড়ালে আবডালে পালাইয়া বেড়াইতেছেন। দুটি কান কাটা গেলেই তিনি যথাসময়ে সকলের সম্মুখে আসিয়া হাজির হইবেন।" খুড়োর থিওরিটা যিনি অপ্রমাণ করিতে পারিবেন তাঁকেই আমরা গবেষকের পরিপূর্ণ মূল্য দিতে প্রস্তুত আছি।

* * *

স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ নিখিল ভারত সংগীত কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে যে সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইলাম। নহি বিদ্যা সংগীতাৎ পরা—এই কথাও আমরা জানি। কিন্তু সংগীত কংগ্রেসে স্যার সর্বপল্লীকে সভাপতিত্ব করিতে দিয়া উদ্যোক্তাগণ ভাল কাজ করেন নাই। ইহার পর কায়েদে আজম জিন্না যদি নিখিল ভারত কুস্তি প্রতিযোগিতায়



পৌরোহিত্য করিবার জন্য দাবী করেন তাহা হইলে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করা শক্ত হইয়া উঠিবে। অনুরূপ পরিস্থিতির আসন্ন সম্ভাবনাতেই হয়ত শ্রীমতী সরোজিনী সংগীত কংগ্রেসে যোগদান করেন নাই—কথাটা বলিলেন বিশু খুড়ো। বুঝিলাম না বটে তবু খুড়োর কথায় সায় দেওয়া অভ্যাস হইয়া গিয়াছে বলিয়া বোকার মত মাথা নাড়িলাম।

* * *

একটি সংবাদে প্রকাশ, বুয়োর যুদ্ধের সময় আফ্রিকাতে এক নাপিতের দোকানে প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল চুল কাটাইয়াছিলেন। তারপর কত বৎসর চলিয়া গেল, মন্ত্রী মহাশয়ের চুল-ভরা মাথায় এখন মাথা ভরা টাক পড়িয়াছে। কিন্তু নাপিতের সেই চুল কাটার বাবদ মাত্র পাঁচ শিলিঙের দোকান বাকী এখনও তিনি দিয়া উঠিতে পারিলেন না। এটা কি তাঁর অভাব না স্বভাবের জন্য হইয়াছে তা বুঝিতে পারিলাম না। অভাবের জন্য হইলে কোন সিনেমা শো, ফুটবল বা ক্রিকেটের চ্যারিটি ম্যাচের ব্যবস্থা করিলেই টাকাটা উঠিয়া আসিতে পারে। কিন্তু স্বভাবের জন্য হইয়া থাকিলে ঋণ ও ইজারা-ব্যবস্থার মালিকদের আশংকার কারণ আছে!

* * *

ক্রিকেট খেলার প্রসঙ্গে লেফটেনেন্ট কর্ণেল সি কে নাইডুর কথা মনে পড়িয়া গেল। C. A. B-র একজন কর্তৃপক্ষের কানে কানে নাকি তিনি বলিয়াছেন, বাঙলার ক্রিকেট খেলোয়াড়রা যেন কখনও মনে না করেন যে, তাঁরা মস্ত বড় হইয়া গিয়াছেন। কথাটা সি কে কানে কানেই বলিয়াছিলেন। C. A. B-র কর্তৃপক্ষ তাহা ফাঁস করিয়া দিয়া ভাল করেন নাই। সি কে বা হার্ডস্টাফের মন্তব্যের উপর নির্ভর করিয়াই আমাদের খেলোয়াড়রা নাচিয়া কুঁদিয়া মাঠ চষিয়া বেড়াইতেছেন। এখন তাঁদের মুখেই আবার এই কথা শুনিলে আর আমাদের ক্রিকেট খ্যাতির কি আর অবশিষ্ট রহিল?

জীবনের ঝরাপাতা

শ্রীসরলা দেবী চৌধুরানী

[১১]

সংগীত

আজকাল বাঙলাদেশে মেয়েদের সংগীত বিদ্যাবিশারততায় কেউ কি কল্পনা করতে পারেন এমন দিন ছিল যখন এই বাঙলায় ভদ্রপরিবারের মেয়েদের মধ্যে সংগীত চর্চা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল—যখন নিজের বাড়ির মেয়েদের কণ্ঠেও প্রকাশ্যে গান শোনা নিতান্ত দুর্লভ ছিল? তাইত ১১ই মাঘে ঠাকুর বাড়ির মেয়েদের গানের আকর্ষণে কলকাতা ভেঙ্গে পড়ত। কিন্তু সে গান ধ্রুপদী চালের গাম্ভীর্য রক্ষা করা গান—সে পেশাদারী গায়িকাদের টপ্পা ঠুংরী খেয়ালের মূর্ছনায় মূর্ছনায় চিত্তবিঘূর্ণক গান নয়। রবিমামার সঙ্গে একবার আর একজনদের বাড়ি ব্রহ্মোৎসব সভায় গান গাইতে যাওয়া আমার মনে পড়ে—সে কাশিয়াবাগানের কাছাকাছিই কাশীশ্বর মিত্রের বাড়িতে। সেকালে খালি জোড়াসাঁকোয় ১১ই মাঘ হত বটে কিন্তু আদি সমাজী দুই একজন ভক্ত, ব্রাহ্মের বাড়ি নিয়মিত ব্রহ্মোৎসব হত। তাঁরা আদি ব্রাহ্ম সমাজের ব্রাহ্ম—তার অর্থ তাঁরা সাধারণ ব্রাহ্মদের মত আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম নন— আদি ব্রাহ্ম সমাজের বেদীতে যেসব আচার্যরা বসেন তাঁরাও নন—তাঁরা সমাজের উপাসনা গৃহে বা উৎসবের সভায় অমূর্ত ব্রহ্মের আরাধনিক বটে; কিন্তু পারিবারিক ও সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে পূর্ববৎ পৌত্তলিক বিধানের অনুবর্তক। থিওরিতে ও প্র্যাকটিসে তাঁরা এক নন। এইরকম একটি ব্রাহ্ম ছিলেন নন্দনবাগানের কাশীশ্বর মিত্র। আমাদের কাশিয়াবাগান বাড়ির ফটকের বাইরেই একটা মস্ত লম্বা পুকুর ছিল। তার আশপাশে গৃহস্থদের বাস। এ পুকুরে তাদের স্নান করা বাসনমার্জাদি কাজ চলত, কিন্তু এর জল মিঠে নয় বলে খাওয়া চলত না। সেই জন্যে আমাদের বাড়ির পুকুর থেকে পাড়ার মেয়েরা খাবার ও রাঁধবার জল নিয়ে যেত। আমাদের পুকুরের নাম ছিল পাড়ায় "মিছরি পুকুর"। কাশীশ্বর মিত্রের বাড়ির ঘাট ঐ পুকুরের উপর। তাঁর বড় ছেলে শ্রীনাথ মিত্রের স্ত্রীর সঙ্গে আমার মায়ের 'বকুলফুল' পাতান হয়েছিল। সে বছর তাঁদের বাড়ির ব্রহ্মোৎসবে রবিমামার ও আমার দুজনেরই গান হল। রবিমামার গলা তখন কি সুমিষ্ট আর তাঁর গান গাওয়া কি ভাব দিয়েই—১১ই মাঘের অক্ষয়বাবুদের দলের গানের সঙ্গে কি তফাৎ! রবিমামা ত একদিন গেয়েই চলে গেলেন, আমার ডাক পড়তে লাগল হপ্তায় হপ্তায় তাঁদের রবিবারের অধিবেশনে। তাছাড়া মধ্যে মধ্যে তাঁদের বাড়ির ভিতরে পারিবারিক আসরেও। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গানের পর গান গেয়ে যাই নানা রকমের—শ্রান্ত হইনে। সেকালে জোড়াসাঁকোয় পাতানর রেওয়াজটা খুব ছিল—আমার মায়ের অনেকগুলি পাতান সখি ছিলেন। কাশিয়াবাগানে এসে বকুল ফুলের পর হলেন "মিষ্টি হাসি!" ইনি বৌবাজারের এটর্নী শ্রীনাথ দাসের পুত্র 'সময়' সম্পাদক জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের পত্নী। এঁদের বাড়িতে আমার জন্যে গানের আড্ডা জমতে লাগল। অবিরাম non-stop গান—চার পাঁচ ঘণ্টা ধরে। গলা ব্যথাও হত না, শরীর ক্লান্তও হত না। তখন ১০।১১ বছর বয়স আমার। এর পর ব্যারিস্টার ডবলিউ সি ব্যানার্জির পত্নীর বাড়ি মধ্যে মধ্যে সখি সমিতির অধিবেশন হতে লাগল—তাঁর ননদরা অনেকেই থিয়সফিস্ট ছিলেন। সেখানেও আমার উপর গানের ফরমাসের শেষ নেই। সেকালে মেয়েদের মধ্যে গাইয়ের অপ্রাচুর্যতাবশতঃই আমার এত ডাক ছিল। মনে পড়ে মনোমোহন ঘোষ ব্যারিস্টারের ওখানে বঙ্গ নাটকে ও অন্যান্য বড় সাহেব মেমকে ডিনার ও ঈভনিং পার্টি দেওয়া উপলক্ষে মিসেস ঘোষ ৪নং থিয়েটার রোড থেকে ছুটে ছুটে কাশিয়াবাগানে আসতেন মা-বাবা ও আমাকে নিমন্ত্রণ করতে। ইংরেজী কায়দা অনুসারে তখনো আমার ডিনার পার্টিতে যাবার বয়স হয়নি—১৪ বছরেরও কম বয়সী আমি। ষোলর আগে কেউ বাইরে ডিনারে বসার উপযুক্ত গণ্য হয় না। কিন্তু necessity has no law—দিশী গান শোনাতেই হবে—সাহেব মেমদের দেখাতে হবে আমাদের দেশের মেয়েরাও সংগীতবিদ্যায় নিপুণা। তাই ইংরিজী গান ও বাজনার জন্যে প্রতিভাদিদি ও দিশীর জন্যে আমার প্রয়োজন ছিল। প্রতিভাদিদি খুব ভাল পিয়ানো বাজাতেন আর চমৎকার ইংরেজী গান গাইতেন। এমন কি প্রথম প্রথম তাঁর ইংরেজিয়ানা গলায় দিশী গান মানাত না, পরে ইংরেজী ছেড়ে হিন্দী গানেরই চর্চা আরম্ভ করলে তাতেই সুপটু হয়ে উঠলেন।

এর চেয়েও নিকটস্থ দিনের একটি ঘটনা মনে পড়ে। আমি লাহোর থেকে সেবার কিছু দিনের জন্যে কলকাতায় এসেছি। স্যার রাজেন মুখুয্যের বাড়ি হার্কোর্ট বাটলারের বর্মায় গবর্ণর হয়ে যাওয়ার উপলক্ষে বিদায় ডিনার পার্টিতে আমার নিমন্ত্রণ হয়েছে। প্রায় একশ লোকের ডিনার। স্যার ও লেডি আর এনের বিশেষ ইচ্ছা সে রাত্রে আমি গান গাই। সে রাত্রে হঠাৎ যাবার মুহূর্তে মায়ের মোটর গাড়ি বিগড়ে গেল—ডিনারে যাত্রার সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। ইংরিজী ডিনারপার্টি দিশী ভোজের পার্টি নয় যাতে যে যখন খুসী ধীরে সুস্থে গিয়ে উপস্থিত হল। এতে একেবারে ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় মিলিয়ে নিমন্ত্রণ গৃহে উপস্থিত হওয়া চাই। বাড়ির গাড়ির আশা ছেড়ে ট্যাক্সি আনতে পাঠান হল। ট্যাক্সি আসতে দেরী হচ্ছে, আমি ছটফট করছি। সামনেই আশু চৌধুরীর বাড়ি, সব জানলায় আলো ঝকমক করছে। সেখানে লোক সমাগম হয়েছে বুঝলুম—নিশ্চয়ই অনেক জানাশুনা লোকের গাড়ি এসেছে। চাকর পাঠান হল, আশুবাবুকে বলে একখানা বাইরে থাকা গাড়ি নিয়ে আসতে—গেরাজ থেকে তাঁর নিজের গাড়ি বের করে আনতে দেরী হবে বলে। চাকর ভিতরে ঢুকতেই পারলে না, আশুবাবুর সঙ্গে দেখা করতে পারা ত দূরের কথা।

আমি হতাশ্বাসে বসে রইলুম—স্যার ও লেডি রাজেন মুখুয্যেরা কি ভাববেন! এতদূর অভদ্রতা! ইংরেজি ডিনার টেবিলে প্রত্যেকের আসন নির্দিষ্ট থাকে, কে কার পাশে বসবে নাম লেখা থাকে—কেউ অনুপস্থিত হলে শেষ মুহূর্তে সব বন্দোবস্ত উল্টেপাল্টে যায় একটা বিশৃংখলা এসে পড়ে। ট্যাক্সি এল কিছু বিলম্বে। আমি কোনক্রমে পেঁছিলুম—সবাই টেবিলে বসতে যাচ্ছেন—আমার জন্যে অপেক্ষা করে করে। যথেষ্ট লজ্জিত হলুম। রাজেন মুখুয্যে বিলম্বের কারণ শুনে বল্লেন—"আমায় একটা টেলিফোন করে দিলেন না কেন—তক্ষুনি গাড়ি পাঠাতুম।"

ডিনারের পর আমার গান হল। ওঁদের ফরমাস ছিল—ইংরেজী রকমে হার্মোনাইজ করা কোন গান গাইবার। আমি প্রথমে "ওগো বিদেশিনি" পরে "সুন্দর বসন্ত বারেক ফিরাও" গাইলুম। বিদায়কালে অতীব ভদ্র স্যার হার্কোর্ট আমার কাছে এসে গভীরভাবে দেহ অবনত করে bow করে আমায় সুমধুর সংগীত'এর জন্য ধন্যবাদ দিলেন। এটার আবশ্যকতা ছিল না, সেইজন্যেই ভদ্রতার অত্যাধিক্যতা।

স্যার হার্কোর্ট বাটলার গবর্ণর হিসেবে কি রকম লোক ছিলেন জানিনে—কিন্তু বিলেতের এই বাটলার পরিবার অনেক পুরুষ যাবৎ শিক্ষা ও সৌজন্যে তাঁদের নিজের দেশেও প্রসিদ্ধ। এঁরই ছোট ভাই মণ্টেগু বাটলার লাহোরে ডেপুটি কমিশনার ছিলেন। তাঁর আসার কিছু পূর্বে লাহোরে অনেক রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটে গেছে, অনেক লোককে জেলে পাঠান হয়েছে। তাঁর শাসনকালেও কিছু কিছু গণ্ডগোল জারি ছিল—কিন্তু ক্রমাগত জেল ভর্তি করার পলিসি তাঁর ছিল না।

এই সময় "হিন্দুস্থান' নামে লাহোরের সাপ্তাহিক উর্দু রাজনৈতিক পত্রিকা প্রবল-প্রতাপী ছিল। ঘটনাচক্রে আমি তার স্বত্বাধিকারিণী এবং আমার স্বামী ও আমি দুজনে তার পলিসির নিয়ন্তা। অনেক খয়ের-খাঁ 'মুলাকাতের' দিন আমার স্বামী ও আমার নাম ডেপুটি কমিশনারের কানে তুলত। সর্দার অজিৎ সিংহের সহকর্মী সুফি অম্বাপ্রসাদ একজন বিখ্যাত উর্দু লেখক। তিনি ও তাঁর কয়েকটি সাঙ্গোপাঙ্গ' জেল থেকে ছাড়ান পেলেই সেইদিনই আমি তাদের 'হিন্দুস্থান'এর সম্পাদন কার্যে নিযুক্ত করলুম। সেটা অতি সাহসিকতার কার্য হল। কিন্তু ডেপুটি কমিশনার মণ্টেগু বাটলার সেজন্যে উতলা হয়ে আমায় রাতারাতি জেলে পাঠালেন না। তারপর দিন আমার স্বামীকে ডেকে বল্লেন, "তোমাদের শত্রু অনেক—বিশেষত তোমার স্ত্রীর। সুফি অম্বাপ্রসাদকে 'হিন্দুস্থানে' রেখেছ। সাবধানে কাজ নিও, শেষ পর্যন্ত আমায় যেন এরকম একজন মহিলার বিরুদ্ধে কঠোরতা অবলম্বন করতে না হয়।"

সুফি অম্বাপ্রসাদকে ডেপুটি কমিশনারের কথাটা শোনালে তিনি বল্লেন "লোহা আমি, গায়ে মধু মেখে বসলেও আমার গা চাটলে জিবে শক্ত লোহারই পরশ লাগবে।" ওডায়ারের রাজত্বকালে সর্দার ও সুফি ভারতবর্ষ থেকে পালিয়ে মুসলমানবেশে তুর্কীতে পেঁচেছিলেন এই গুজব। তখন ওডায়ারের হুকুমে 'হিন্দুস্থান' বন্ধ হয়েছে। শুনতে পাই ওডায়ারের সময় মণ্টেগু বাটলার পাঞ্জাবের এককোণে অনাদৃত হয়ে পড়েছিলেন—তাঁর সিনিয়রিটির উপযুক্ত পদ তাঁকে দেওয়া হয়নি। শাসন-কর্তার পরিবর্তন হলে অনেককাল পরে তিনি নাগপুরে গবর্ণরের পদ পেলেন। তাঁরই ছেলে মিস্টার আর বাটলার বিলাতে Under Secretary of State ছিলেন কিছুকাল। Franchise Commission-এ ভারতবর্ষে আসেন, আমার সঙ্গে কলকাতায় দেখা হয়।

বম্বে অঞ্চলে মেজমামার কাছে যতবার গিয়ে থেকেছি খাস বম্বেতে যাইনি, বম্বে প্রেসিডেন্সীর মহারাষ্ট্র বিভাগের কোন না কোন শহরে বা লোকালয়ে গেছি—যেমন সোলাপুর, সেতারা, পুণা, পণ্ডরপুর, মহাপলেশ্বর ইত্যাদি। সেসব জায়গার বাসিন্দা মারাঠীদের সংগীত কুশলতার যথেষ্ট পরিচয় পেয়েছি। মেয়েদের নয়, পুরুষদের। তাঁদের কণ্ঠে মারাঠী বা হিন্দি উঁচুদরের গান শুনতেই সময় অতিবাহিত হয়েছে। ভাল গলায় ভাল গানের গন্ধ কোথাও পেলে হয়। বিড়াল যেমন মাছের গন্ধে বিহ্বল হয়, আমিও তেমনি গানের গন্ধে উতলা হতুম, যত পারি লিখে নিতুম, শিখে নিতুম। নিজের ভাণ্ডারে না ভরলে আনন্দ পুরো হত না। সেতারায় সোহনি বলে একজন সাবজজ ছিলেন সুগায়ক। তাঁর কাছ থেকে সংগৃহীত একটি হোলির গান চমৎকার—পাঁব লগে কর যোড়ি শ্যাম মুঝে খেল ন হোরি। আর একটি গান ছিল কালী আর গোরীর ঝগড়া। এখানে আমার নিজের গানে সময় নষ্ট হওয়ার প্রশ্রয় দিতুম না, তাতে আমার সংগ্রহের সময়ে অকুলান হয়ে যাবে।

কিন্তু খাস বম্বে শহরে যখন একবার হপ্তা দুতিনের জন্যে গিয়ে রইলুম একটি ভাটিয়া ক্রোরপতি বন্ধুর গৃহে—সমুদ্র তীরে 'দরিয়া মহলে' তখন আমার নিজের গান শুনান থেকে আর বিশ্রাম গেলুম না। গৃহপতি নারানজী দ্বারকাদাস, তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোবর্ধন দাস তেজপাল—যিনি অন্য এক প্রভূত ধনী পরিবারে দত্তক গৃহীত হওয়ায় পরিবর্তিতনামা হয়েছিলেন—তাঁদের তিন-চারটি ভগ্নী ও স্ব স্ব পত্নীসহ পুরীর জগন্নাথ দর্শনে তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে কিছুদিন কলকাতায় যাপন করেছিলেন। সেই সময় তাঁদের সুপরিচিত মিত্র এলাহাবাদের চারুমিত্র মহাশয়কে তাঁরা সংবাদ পাঠান। চারুবাবু আমার পিতার পরম বন্ধু ছিলেন। বম্বের মেয়েদের কলিকাতা পরিদর্শনে সাথী হওয়ার ভার দিলেন তিনি আমার উপর। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে আলিপুরের চিড়িয়াখানা, বোটানিকাল গার্ডেন, মিউজিয়ম এইসব ঘুরে ঘুরে আমার সঙ্গে তাঁদের ভাব হয়ে গেল। বোনেরা কেউ কেউ কৃষ্ণভক্ত পরিবারে বিবাহিত কেউ কেউ শিবভক্তর ঘরে। বম্বেতে এই দুই সম্প্রদায়ে সেকালে তুমুল বিতণ্ডা চলত—রামপ্রসাদের "পাঁচেই এক, একেই পাঁচ, মন করো না দ্বেষাদ্বেষি"র উপদেশে কেউ কান দিত না। নারাণজীর এক বড় বোন নন্দীবাই বৈষ্ণবের ঘরে পড়েছিলেন। আর তিনি গান গাইতেন ভারি সুন্দর, তাঁর গানের পুঁজিও অনেক ছিল, তার মধ্যে "যা যারে ভম্‌রা দূর দূর যা" আমার এখন মনে পড়ছে, কেননা সেটা আমিও আগেই জানতুম। এঁরা সপরিবারে আমার গানের উপর ঝুঁকে পড়লেন। যদিও বাঙলা ভাষায় গান আমার, তবু গুজরাটি ও হিন্দীর সঙ্গে কথার সাদৃশ্যে তাঁরা খুব উপভোগ করতে লাগলেন। খুব রসগ্রাহী রসিক তাঁরা। আমিও যেমন তাঁদের ফরমাস করি, তাঁরাও তেমনি আমাকে একটার পর একটা গানের ফরমাস করেন। দু একটা গান তাঁদের কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল—"সে আসে ধীরে, যায় লাজে ফিরে, রিনিকি রিনিকি রিনিঝিনি, মঞ্জু মঞ্জু মঞ্জীরে, রিনিঝিনি ঝিন্নিরে!" এ গানটা যে কতবার আমাকে দিয়ে গাইয়েছেন ঠিক নেই। আমার সঙ্গে তাঁদের খুব মনের মিল হয়ে গেল। নন্দীবাই শুধু গান না, গান রচনাও করেন। আমার প্রেমিক হয়ে পড়লেন তিনি, আমার উপর একটা গানই বেঁধে ফেল্লেন। এই পরিবারের সঙ্গে ভাব আমার আজ পর্যন্ত অটুট আছে। অনেকেরই অবস্থান্তর ঘটেছে ক্রোরপতি থেকে প্রায় কপর্দকহীন হয়েছেন, অনেকেই ইহলোক থেকে চলে গেছেন। কিন্তু যাঁরা বাকী আছেন, অর্থবান হোন নিঃস্ব হোন—আজও বম্বে গেলে আমি তাঁদের খুঁজে পেতে বের করে দেখা করি।

পুণায় যেবার কংগ্রেস হয়, বাবা মহাশয়ের সঙ্গে মেজমামা প্রমুখ আমাদের যেসব আত্মীয়রা দর্শক হয়ে যান, নারাণজী তাঁদের সকলকে নিজের অতিথি করে রাজার হালে রাখেন। আমি সেবার সদ্য মহীশূর গেছি, তাই পুণায় আসতে পারিনি। কিন্তু শুনলুম তাঁদের অতিথি সংকার যে মাত্রায় হয়েছিল তা বর্ণনীয় নয়।

বম্বের আর এক পরিবারে আমার গান জমেছিল খুব। সে সম্পূর্ণ বিপরীত Circle-এ—মুসলমান মণ্ডলে। জাষ্টিস বদ্রুদ্দিন তায়েবজীর ভাইঝি জামাই মিস্টার আকবর হায়দরী কলিকাতায় Accounts Department-এর বড় অফিসার হয়ে আসেন। ইনিই পরে হায়দ্রাবাদের প্রধান মন্ত্রী হন। তাঁর পত্নী আমিনাও স্বামীর সঙ্গে কলকাতায় আসেন। আমার এক পার্সি পরম বন্ধু ছিলেন বরজোরজি পাদশা, বৃদ্ধ জমসেটজি টাটার দক্ষিণ হস্ত। ইনি হায়দারিদেরও বন্ধু। তাঁর কাছ থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে হায়দারিরা আমার উপর Call করে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। অতি সরল সহজ বন্ধুত্ব হয়ে গেল ওঁদের সঙ্গে আমার—এমন কি তাঁদের ছেলেমেয়ের জন্যে যে মৌলবী সঙ্গে এসেছিল, সেই 'ওস্তাদজি'র কাছে হপ্তায় ২।৩ দিন মুলে ফার্সিতে ওমর খৈয়ম পড়ার বন্দোবস্ত করে দিলেন আমার। আমার ফার্সি পড়ার সখ অনেক দিন থেকে। একবার মেজমামার সঙ্গে বম্বের Watson Hotelএ গিয়ে যখন হপ্তাখানেক থাকি, তার স্বত্বাধিকারী মেজমামার একজন মুসলমান বন্ধু হোটেলে প্রায়ই একবার করে আসতেন আমাদের তদারক করতে। তিনি একদিন একটা কার্ডে চার লাইন উর্দু কবিতা লিখে আমায় উপহার দিলেন। উর্দু পড়তে পারিনে, তিনিই পড়ে শোনালেন ও উর্দু কবিতার রসমাধুর্য বুঝিয়ে দিলেন। উর্দু লেখাটি যেন ছবির টানের মত সুন্দর, কিন্তু আমার অপাঠ্য। সেই পর্যন্ত আমার সখ গেল উর্দু পড়তে ও লিখতে শিখতে। বাড়ি ফিরে এসে কাশিয়া বাগানে উর্দু ওস্তাদ কোথা পাই? একজন মুসলমান ডাকপিয়নকে ধরে, তাকে মাসে দুটাকা বক্সিস দেওয়ার প্রলোভন দিয়ে তার কাছে উর্দু অক্ষর পরিচয় আরম্ভ করলুম। উর্দু প্রথম ভাগ সেই-ই শেষ করালে। উর্দু শিশুপাঠ্য পুস্তক দেখলুম বাঙলার মত নীরস নয়, হাস্যরসে রসাল। সে বইগুলির যদি এখনও চল থাকে, কেউ আনিয়ে দেখতে পারেন। একটা পাঠের মর্ম আমার মনে পড়ে—"একজন রুগী হাকিমের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, হাকিম সাহেব! খাওয়ার প্রশস্ত সময়টা কি বাৎলে দিন।"

হাকিম বল্লেন—গরীবের যে সময় খাওয়া জুটবে, আর ধনীর যে সময় ক্ষিদে লাগবে।

আর একটি—একজন কৃপণ রাধাবাইয়ের নাচ দেবে ভেবেছে। তাতে কি কি আয়োজন করতে হবে খোঁজ করে শুনলে—"তিন মণ তেলের যোগাড় সব প্রথমে দরকার। সারারাত ধরে নাচ চলবে, তাতে আলো জ্বালিয়ে রাখতে হলে তিন মণ তেলের কমে হবে না।" শুনেই সে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে বললে—"তিন মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না।" এইসব পাঠগুলি আমার ডাকপেয়াদা ওস্তাদটির সামনে 'পড়তে বাধ' বাধ ঠেকত। চাকর শ্রেণীয়র কাছে ত হেসে গড়াগড়ি যেতে পারিনে, তার সামনে গুরুগম্ভীর হয়ে বানান করে করে পড়ে' সে চলে গেলে হেসে বাঁচতুম।

দাদামশায় সেকালের শিক্ষাবিধি অনুসারে ফার্সিতে অধীত-বিদ্য ছিলেন। সব কবিদের মধ্যে হাফেজ তাঁর প্রিয়তম ছিলেন। হাফেজের একখানি কাব্য সংগ্রহ সর্বদা তাঁর হাতের কাছেই থাকত। তার থেকে আবৃত্তি করে করে নিজের এক একটা Psychological phase ব্যক্ত করতেন।

যেবার আমি ভারতীতে 'আহিতাগ্নিকা' কবিতা ও ঋগ্বেদের মন্ত্র অবলম্বনে "শুনঃশেপের বিলাপ" লিখি দাদামশায়কে ওদুটি পড়ে শোনান হয়। তিনি শুনে খুব প্রীত হন এবং আমায় বলেন—"আমি তোমায় হাফেজের এই কটি লাইন দিচ্ছি, এতে সুর বসিয়ে আমায় গেয়ে শোনাতে পারবে?" আমি বিনম্রভাবে স্বীকৃত হলুম। এক সপ্তাহ পরে তাঁর কাছে খবর গেল "সুর দেওয়া হয়েছে, যেদিন বলবেন শোনাতে যাব।"

দ্বিপুদাদার উপর হুকুম জারী হল আয়োজন করতে। বড়মাসিমা প্রভৃতি বাড়ির বড়রা এসে বসলেন ঈজিচেয়ারে ঠেসা দেওয়া অর্ধশায়িত দাদামশায়ের দুপাশে। তাঁর কানে Ear trumpet লাগান হল। আমি বেহালা বাজিয়ে হাফেজ গাইলাম আমার দেওয়া সুরে। দাদামশায় মজে মজে শুনতে লাগলেন। তার কিছুদিন পরে দ্বিপুদাদা এলেন আমাদের বাড়িতে কাশিয়াবাগানে। এসে বল্লেন—"চল আমার সঙ্গে হ্যামিল্টনের দোকানে। কর্তা হুকুম করেছেন তোর জন্যে হাজার টাকার মধ্যে একটা গয়না কিনে দিতে। তোকে এখন জানান বারণ ছিল—যেদিন দেবেন একেবারে হঠাৎ সেদিন জানবি—এই তাঁর ইচ্ছে। কিন্তু আমি ভেবে দেখলুম কি কিনতে কি কিনব শেষকালে তোর যদি না পছন্দ হয়, সুতরাং তোকে বলে দেখিয়ে তোর পছন্দ মত কেনাই ভাল। আর কাউকে বলিসনে এখন—আয়।" হাজার টাকার মধ্যে আমার পছন্দসই জিনিস হ্যামিল্টনে নেই, তাই পাশের দোকানে নিয়ে গেলেন দ্বিপুদাদা। সেখানে একটা হীরে ও চুণির সেট, নেকলেস ও এক জোড়া ব্রেসলেট আমার পছন্দ মত কিনলেন। তারপর প্রকাশ্যভাবে আমার একদিন ডাক পড়ল। বাড়ির লোকের সভা লাগল। দাদামশায় নেকলেসটি বের করে আমার হাতে দিয়ে বল্লেন—"তুমি সরস্বতী। তোমার উপযুক্ত না হলেও এই সামান্য ভূষণটি এনেছি তোমার জন্যে।" আমি তাঁর স্বভাবসুলভ সৌজন্যপূর্ণ কথা কয়টিতে অভিভূত হয়ে তাঁর স্নেহের দান অবনতমস্তকে গ্রহণ করলুম। হাফেজের সেই গানটির স্বরলিপি শত গানে আছে। কথাগুলি নিম্নে দিচ্ছিঃ—

দেশাবে চেহেরয়ে জাঁ মেশবদ্ গোবারেতনম্
খোশাদমেকে জাঁ চেহরা পরদা বরফগনম্॥
চ'ণী কফস ন সজায়ে চুমুনে খোসেল হানেস্তে
রবম্ বগোলসনে রেজোঁয়া কে মুরগে চমনম্॥

ইহার সংক্ষেপার্থ এই যে, আমার মত এমন সুকণ্ঠ পাখীর উপযুক্ত এই মর্তলোক নয়, আমি সেই যুগের কাননে যাব, যেখানকার আমি। এই গান তার পরেরবছর কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট মিস্টার সিওয়ানি সাহেব যেদিন আমাদের বাড়ি চা খেতে আসেন তাঁকে শোনান হয়েছিল। হিন্দু বাঙালী মেয়ের মুখে বিশুদ্ধ উচ্চারণে (দাদামশায়ের কাছে শেখা) ফার্সি গান শুনে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন। এই গান বম্বের মুসলমান পরিবারে আনন্দের তরঙ্গ তুলেছিল, আমাকে তাঁদের আরো নিকটতর করেছিল। কিন্তু এ গান তাঁদের মজলিসে গাওয়া অন্যতম একটি গান মাত্র। আমাদের যেমন সংস্কৃত গান শুনতে ভাল লাগে, কিন্তু তাতে পেট ভরে না—তাঁদেরও তেমনি। অন্যান্য বহু গান হিন্দী ও বাঙলা দুইই—তাঁদের ফরমাসে গেয়ে গেয়ে শেষ হত না। তাঁদের একটি প্রিয় গান ছিল যা প্রতিদিনই একবার করে গাওয়াতেন—সেটি আমার "নমো হিন্দুস্থান।" তার কোরাসে সবাই মিলে যোগও দিতেন।

বদ্রুদ্দিন তায়েবজীর ছয় ভাই ও তিন-চার বোন তাঁদের পুত্রকন্যা ও তাঁর নিজেরই দশবারোটি সন্তান নিয়ে শাখাপ্রশাখায় বিস্তৃত বৃহৎ পরিবার তাঁদের। হপ্তায় একদিন করে এর বাড়ি ওর বাড়ি বড়দের একত্র ভোজনের একটি নিয়ম বেঁধেছিলেন তাঁরা যাতে পারিবারিক সংহতিটা ঠিক থাকে। তাই পালা পালা করে এ-বাড়ি ও-বাড়িতে আমারও নিমন্ত্রণ থাকত। আমি আসলে অতিথি ছিলুম হায়দরীদের, কিন্তু 'rage' বা আগ্রহের বস্তু হলুম সকলের—আমায় নিয়ে কাড়াকাড়ি করা ফ্যাশন হয়ে পড়ল। মিসেস হায়দরীর পিসতুত বোন জঞ্জিরা দ্বীপের নবাবের বেগম হয়েছিলেন। তাঁর নাম নাজলি বেগম ও তাঁর ছোট বোন আতিয়াবিবি। নাজলি বেগমের অনুরোধ আমিনা এড়াতে পারলেন না। কিছুদিনের জন্যে আমায় জঞ্জিরায় নিয়ে যেতে দিলেন। আমার সঙ্গে পরিচয়ের পর তায়েবজী পরিবারে সঙ্গীতচর্চা ভালরকম করে আরম্ভ হল। আতিয়া ওস্তাদ রেখে গান শিখতে লাগলেন ও ভারতের ক্লাশিকাল সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতার সূচনা করলেন। কংগ্রেস-বিখ্যাত আব্বাস তায়েবজী বদ্রুদ্দিন তায়েবজীর ভ্রাতুষ্পুত্রও বটে, জামাতাও বটে। তাঁর একটি কন্যার গান কংগ্রেসের অনেকেই

শুনেছেন—অতি মৃদু মধুর কণ্ঠ তার। তার মুখে মীরাবাঈয়ের গান শুনে সকলে মুগ্ধ হন।

পঞ্জাবেও আমি যাবার পর থেকে মেয়েদের সংগীতচর্চা ভাল রকম করে হতে থাকল। মাদ্রাজ, মহীশূর ভিন্ন ভারতের আর কোন অংশে মেয়েদের সংগীতজীবন একেবারে বিকশিত দেখিনি—সে সংগীতের তুলনা উত্তর ভারতে নেই। "বন্দে মাতরম্" ও আমার গাবার পর থেকে ক্রমে ক্রমে ভারতে সর্বত্র মেয়েদের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগল। বন্দে মাতরম্-এর কথায় মনে পড়ে দিল্লী থেকে একজন বৃদ্ধ বড় ইংরেজ ব্যারিষ্টার একবার লাহোরে একটা মকদ্দমায় এসেছিলেন। আমাদের বাড়ি চা-য়ে এসে সেই সময় বাঙলার অফিসারদের দ্বারা স্থানে স্থানে নিষিদ্ধ গানটি শুনতে কৌতূহল প্রকাশ করেন। আমি গাইলুম—পিয়ানো সহযোগে। তিনি শুনে বল্লেন—By Jove! কথা বুঝি না বুঝি তোমার গাওয়া শুনে বুঝছি কি তুমুল আলোড়ন আনতে পারে মনে। আমার স্বামীর দিকে ফিরে বল্লেন—"আমি যদি Bengal Government হতুম তোমার স্ত্রীর বিরুদ্ধে externment order জারী করতুম, যাতে আর কখন বাঙলায় গিয়ে বাঙালীদের মাতিয়ে তুলতে না পারে।"

আমি ছাড়াও মাতাবার আরো অনেক লোকের জন্ম হল। বাঙলায় গায়িকার বন্যা এল। আলমোড়া পাহাড়ের উপর বিবেকানন্দ আশ্রমের অধিনেত্রী মিসেস সেভিয়র একবার বলেছিলেন—আর কিছু না, শুধু যদি জাতীয় গান গেয়ে গেয়ে ফেরো তুমি ভারতের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে সমগ্র দেশকে মাতাতে পার। সে কথাটা আমার মনে লেগেছিল। অনেক সময় ভেবেছিলুম, একটি চারণ দল গড়ে ঘরে ঘরে গেয়ে গেয়ে দেশকে জাগ্রত করব। কিন্তু তার জন্যেও আমার অপেক্ষায় দেশ বসে থাকেনি। সে কাজ আপনা আপনি হয়ে উঠেছে।

সংগীত ক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়ার সাময়িক প্রাথমিকতায় আমার গান ঘরে ঘরে লোকের মনে আসন পেয়েছে, তাদের আনন্দ দিয়েছে। কণ্ঠগুণের প্রাথমিকতায় নয়। আজ যদি এ কালের মেয়েদের সংগে পরীক্ষায় নামতে হত কলকে পেতুম না। আমার দ্বারা যা কাজ নেবার তা দেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নিয়ে নিয়েছেন। এখন পালা এসেছে আধুনিক মেয়েদের। (ক্রমশ)

পুস্তক পরিচয়

বিভিন্ন দেশের নারী ও সমাজ—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূ-পর্যটক। মূল্য আড়াই টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পোঃ গরিয়া, ২৪ পরগণা।

প্রত্যেক দেশের নারী-জীবনের সংগে সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। কোন দেশের সমাজ-জীবনকে বুঝিতে হইলে যেরূপ তথাকার নারী-প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা প্রয়োজন; সেইরূপ কোন দেশের নারী-জীবন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ না করিলে তত্রত্য সমাজ সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা লাভ সম্ভব হয় না। সাধারণভাবে নারী-প্রকৃতির কতকগুলি বিশিষ্টতা সব দেশের নারীতেই পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু এক্ষেত্রে বৈচিত্র্যও দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে রহিয়াছে। গ্রন্থকার এই বৈচিত্র্যের দিকটাই দেখাইতে চাহেন। এ কার্যে সার্থকতা-লাভ করিতে হইলে সমাজ-জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যাওয়া প্রয়োজন; শুধু বাহির হইতে দেখিয়া এই বৈচিত্র্যের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না, আর ব্যক্তিগত তেমন অভিজ্ঞতা না থাকিলে এতৎসম্পর্কিত বিশ্লেষণাত্মক আলোচনাও সরসতা লাভ করে না। গ্রন্থকারের 'জাপানী নারী' সম্পর্কিত গ্রন্থের সুদীর্ঘ সন্দর্ভটি অনেকাংশ এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কগত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে বেশ সরস ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। ব্রহ্মদেশের নারীর এবং চীন দেশের নারীর সম্বন্ধেও তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে, ইহার পরিচয় পাওয়া যায়; কিন্তু সাধারণ দৃষ্টি সেক্ষেত্রে বড় হইয়া কাজ করিয়াছে, রসবৈচিত্র্য উপলব্ধি করিবার মত সম্পর্ক বিগাঢ়তা লাভ করে নাই বলিয়া মনে হয়। তাঁহার লিখিত বহির্ভারতীয় নারী এবং ইউরোপের নারী অনেকটা পুঁথিগত বিদ্যার উপর গবেষণার মত হইয়াছে; নারী-রূপের রসভঙ্গিমা এবং বর্ণবৈচিত্র্য এক্ষেত্রে সেরূপ ফুটে নাই। মোটামুটি গ্রন্থখানি বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ এবং সরস। কয়েকখানি চিত্রে ইহার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

শ্রীমা—শ্রীআশুতোষ মিত্র প্রণীত। মূল্য আড়াই টাকা। প্রাপ্তিস্থান—দি শ্যামবাজার এম্পোরিয়াম, ১৩৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা।

গ্রন্থকার সুদীর্ঘ ত্রয়োদশ বর্ষকাল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত জননী শ্রীমার সেবকরূপে ছিলেন। এই সময় শ্রীমার কথাবার্তায় তিনি নোট লইয়াছিলেন। তাঁহার গৃহীত সেই নোটগুলির উপর ভিত্তি করিয়া পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানির বিশেষত্ব হইল এই যে, এই গ্রন্থ পাঠে শ্রীমার বাণীর ভিতর দিয়া তাঁহার পরম মাধুর্যময়ী চিন্ময়ী রূপের আমরা পরিচয় পাই। বাণীর সংগে লীলা এখানে জড়িত রহিয়াছে। ভাবময় এমন ঐশী বাণীর ছন্দে ভাব-ঘন আনন্দময় তনুর মাধুরীও মনশ্চক্ষে ফুটিয়া উঠে গ্রন্থকার সাধক এবং ভক্ত শ্রীমায়ের চরণ সেবার অনুরক্তিতে তাঁহার সে ভক্তি প্রীতিরসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। এমন গ্রন্থ পাঠে সকলেই উপকৃত হইবেন।

ভক্ত মনোমোহন—প্রকাশক স্বামী আত্মবোধানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয় ১নং উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা—২২৪।

স্বর্গীয় মনোমোহন মিত্র, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের পরমভক্ত ও লীলাসহচর ছিলেন। ঠাকুরের মহিমা কীর্তনই তাঁহার জীবনের ধ্যান ও জ্ঞান ছিল। ভক্ত সাধক রামচন্দ্র দত্ত, অক্ষয়কুমার সেন এবং মনোমোহনই প্রথমে ঠাকুরের লীলাতত্ত্ব প্রচারে ব্রতী হন। ঠাকুরের সম্বন্ধে মনোমোহন তৎকালীন 'ভক্তিমঞ্জরী' পত্রে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থে তাঁহার পবিত্র জীবনী কীর্তনসূত্রে সেসব কথাও অনেক ক্ষেত্রে উদ্ধৃত হইতেছে। মনোমোহনের জীবন বৈচিত্র্যময় এবং নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং সংশয়ের শত প্রতিকূলতার সহিত সংগ্রাম করিয়া কি ভক্তি, বিশ্বাস এবং চিত্তের দৃঢ়তার বলে মনোমোহন উন্নত জীবনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন, গ্রন্থখানি পাঠ করিলে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কৃপা-মহিমা কেমনভাবে মনোমোহনের জীবনকে স্পর্শ করিয়াছিল এবং তৎকালীন সমাজ-জীবন তাহা তরঙ্গ তুলিয়াছিল, গ্রন্থের আলোচনাসূত্রে পাঠকগণ ব্যাপকভাবে তাহা জানিতে পারিবেন। ঠাকুরের মধুময় উপদেশ এবং সাধক জীবনে তদুপলব্ধির অনেক গভীর এবং তত্ত্ব আস্বাদন করিতে এই গ্রন্থ অনেকখানি সাহায্য করিবে।

হরেক রকম—শ্রীআর্যকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য দশ আনা। প্রকাশক—এস এন মুখার্জি, ১২৫, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা।

ছেলেমেয়েদের কবিতার বই; দুইটি গল্পও আছে। লেখকের হাত কাঁচা। শিশু-সাহিত্যের রস-পরিবেশনে পাকা হাতের প্রয়োগ-নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয়। সাধনা করিলে লেখক সেদিকে উন্নতিলাভ করিতে পারিবেন।

কবিতা—শামসুদ্দীন প্রণীত। চয়নিকা পাবলিসিং হাউস, ৪২নং সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা। প্রাপ্তিস্থান—অশোক লাইব্রেরী, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা।

আধুনিক ধরণের কবিতা। লেখায় কবিধর্মের পরিচয় আছে। মানব-হৃদয়ের সংবেদনে কবিতাগুলি মর্ম স্পর্শ করে।

বিদ্যাসাগর কলেজ ম্যাগাজিনঃ—শীত সংখ্যা—১৯৪৪। প্রধান সম্পাদক—অধ্যাপক জিতেশচন্দ্র গুহ।

বিদ্যাসাগর কলেজ ম্যাগাজিন সুসম্পাদিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে। আলোচ্য সংখ্যাখানি পাঠ করিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। ইংরেজী অংশে বেলুড় মঠ রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের প্রিন্সিপাল স্বামী তেজসানন্দের লিখিত 'স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার আদর্শ' সুচিন্তিত এবং সারগর্ভ রচনা; 'আর্ট ফর আর্টস সেক' ভাল লেখা। বাঙলা বিভাগে 'সাহিত্যে অহমিকা', 'আমাদের সাহিত্যে ডিটেকটিভ উপন্যাস' আমাদের ভালো লাগিয়াছে। ছাত্রদের দ্বারা সুপরিচালিত এই সাময়িক পত্রিকাখানির আমরা উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

যুদ্ধের প্রসঙ্গ

পূর্ব রণাঙ্গনে বুদাপেস্ট অঞ্চলে যে প্রচণ্ড সোভিয়েট-জার্মান সংগ্রাম এখনও চলেছে, সেটাই রুশিয়ার শীতকালীন অভিযান কি না সে সম্বন্ধে এতদিন জল্পনা-কল্পনা শোনা গেছে। দু'একজন সমর সমালোচক অবশ্য বলেছেন যে, বুদাপেস্টে রুশবাহিনী যত প্রচণ্ড সংগ্রামই করুক না কেন, এ তার প্রধান অভিযান নয়, এ এমন কি শীতকালীন অভিযানও নয়। কারণ এদিক দিয়ে খাস জার্মানীতে আঘাত হানার অসুবিধা অনেক, পথও দীর্ঘ। খাস জার্মানীতে আঘাত হানার প্রচেষ্টা পোল্যাণ্ডের মধ্য দিয়েই সহজতর হবে। তাদের এ অনুমান যে সত্য তা সম্প্রতি মার্শাল কোনিয়েভের পরিচালনায় লাল-ফৌজের যে অভিযান আরম্ভ হয়েছে তা থেকেই বোঝা যায়। ওয়াশ'র ১২০ মাইল দক্ষিণে বারানফের পশ্চিম দিকে ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে এই আক্রমণ আরম্ভ হয়েছে। জার্মানীর ব্রেসলো নগরী ও সাইলেসিয়ার অভিমুখে অগ্রসর হওয়াই এ অভিযানের লক্ষ্য বলে মনে হয়। কারণ জার্মানীতে প্রবেশের এটাই সবচেয়ে কম ও সহজ পথ। রয়টার সংবাদ দিয়েছেন, এই অভিযানে অন্তত তিনটি সোভিয়েট আর্মি, দু'টি ট্যাঙ্ক কোর, ও অন্যান্য সেনা নিয়োজিত হয়েছে। স্টকহলমের 'দাগেনস্ নাইটিহারের' বার্লিনস্থ সংবাদদাতা জানিয়েছেন পোল্যাণ্ডে নতুন রুশ আক্রমণের মত এত বড় আক্রমণ দেখা যায় নাই। রুশ সৈন্যেরা ৫০০ বড় কামান, বহু ট্যাঙ্ক, বিমান ও অসংখ্য পদাতিক সৈন্য নিয়ে আক্রমণ চালাচ্ছে। এ পর্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে রুশ বাহিনী কিয়েলসের দক্ষিণে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে আক্রমণ চালিয়ে শিণ্ডকাজ শহর দখল করেছে। কিয়েলস থেকে ক্রাকাওতে যে রেলপথ আছে আক্রমণের ফলে তা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। জার্মাণ সাইলেসিয়ার সীমান্ত থেকে রুশবাহিনী এখন ৭০ মাইল দূরে রয়েছে। এই আক্রমণ সম্পর্কে মার্শাল স্ট্যালিনের যে ঘোষণাবাণী প্রকাশিত হয়েছে তাতে তিনি বলেছেন যে, নতুন আক্রমণটি যে অঞ্চলের উদ্দেশ্যে আরম্ভ হয়েছে সেখান থেকে পূর্ব দিকে বার্লিনে যাওয়ার সোজা পথ আছে। তিনি আরও বলেছেন—আর্দেন অঞ্চল থেকে ফন রুণ্ডস্টেণ্ড সরে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যে এ আক্রমণ আরম্ভ হয়েছে তা কোন আকস্মিক ব্যাপার নয়।

একথা বলা বাহুল্য যে, জার্মাণরা প্রাণপণে এ আক্রমণ প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করবে। কারণ এ অভিযান প্রতিহত করতে না পারলে খাস জার্মানীতে রুশ সৈন্যদের ঢুকে পড়বার নিশ্চিত সম্ভাবনা রয়েছে। জার্মান প্রতিরোধের এ পর্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গেছে তা মোটামুটি এইরূপ—কিয়েলসের দক্ষিণে এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে সোভিয়েট সৈন্যদের গতিরোধ করার জন্য জার্মাণ পদাতিক সৈন্যদের ক্রমাগত রণাঙ্গনের সামনের দিকে পাঠান হচ্ছে এবং জার্মাণ সৈন্যেরা পুনঃ পুনঃ পাল্টা আক্রমণ করছে। রয়টারের বিশেষ সংবাদদাতা বলেছেন, কিয়েলস্ ও ক্র্যাকাওয়ের প্রবেশ মুখে বর্তমানে প্রচণ্ড সংগ্রাম সুরু হতে চলেছে।

এদিকে জার্মাণ নিউজ এজেন্সী আরও সংবাদ দিয়েছে যে, ওয়ারশ'র দক্ষিণ-পূর্বে ওয়ারশ' ও স্যাণ্ডোমিরেজের মধ্যবর্তী অঞ্চলে পুলাই ও মাগনুসজব থেকে রুশ-বাহিনী এই নূতন আক্রমণ চালিয়েছে।

তাছাড়া ওয়াশ'র উত্তরে এবং পূর্ব-প্রুশিয়ার সীমান্ত থেকেও রুশ সৈন্যেরা আক্রমণ চালিয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে।

বুদাপেস্টের যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি। পুনঃ পুনঃ এ যুদ্ধের সমাপ্তির আশ্বাস সংবাদদাতারা দিচ্ছেন বটে, কিন্তু শীঘ্র যুদ্ধ অবসানের কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। রেড স্টার পত্রিকা মন্তব্য করেছেন—পেস্তে জার্মাণদের প্রতিরোধের অবসান হতে চলেছে। জার্মাণরা দানিয়ুবে নদীর তীরে বুদাতে কত সৈন্য সমবেত করেছে সেই হচ্ছে প্রশ্ন।

পশ্চিম রণাঙ্গন সম্বন্ধে সর্বশেষ যে সব সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে বুঝা যায় প্রায় সব রণাঙ্গনেই জার্মাণরা হটে যাচ্ছে, কোথাও বা প্রতিহত হয়েছে। তা ছাড়া তাদের সৈন্য ও সমরোপকরণ বিনষ্টও হয়েছে প্রচুর। অবশ্য ক্ষতির যে হিসাব সংবাদপত্রের মারফত পাওয়া যায় তা সব সময় নির্ভর-যোগ্য বলে ধরে নিতে নানা অসুবিধা আছে। কিন্তু তবুও জার্মাণদের ক্ষতির পরিমাণ যে খুব বেশী তা বেশ বোঝা যায়। কিন্তু এই পশ্চাদপসরণ বা পরাজয় রণনীতির খাতিরে বা সাময়িক কি না এবং এ ধাক্কা সামলিয়ে নেওয়া জার্মাণ বাহিনীর পক্ষে সম্ভব কি না তা বলবার সময় এখনও আসে নি।

অবশ্য আর্দেন স্ফীতিমুখের উত্তর প্রান্তে স্টেভলট ও মানমেডীর দক্ষিণে জার্মাণ প্রতিরোধের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে শেষ সংবাদে জানা গেছে। আর লারস-বার্তোয়া পথের পূর্ব দিকে জার্মাণরা স্থানে স্থানে প্রবল বাধা দিচ্ছে। ভস্‌জেস্ স্ফীতি-মুখের দক্ষিণ প্রান্তে এবং উত্তর আলসাসে ম্যাজিনো লাইনে জার্মাণরা প্রবল প্রতিরোধ করছে বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মিত্রবাহিনী এগিয়ে গেছে।

প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধে মার্কিণ সৈন্যদের লুজন দ্বীপে অবতরণ একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। লুজন ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের বৃহত্তম দ্বীপ। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী ম্যানিলা এই দ্বীপেই অবস্থিত। লুজনের আয়তন হল ৪০৮১৪ বর্গ মাইল। মার্কিন সৈন্যেরা অবতরণ করেছে লিংগায়েন উপসাগরের কূলে। এই অবতরণ কার্যে জাপ সৈন্যেরা উল্লেখযোগ্য কোন বাধা দেয় নি। মার্কিন সৈন্যেরা অবতরণের পরে লিংগায়েন উপসাগর থেকে দেশের অভ্যন্তরে ২০ মাইল এগিয়ে গেছে বলে প্রকাশ। জাপানীদের দিক থেকে এখনও কোন বিশেষ বাধা না পেলেও, তারা যে এখানে প্রবলভাবে বাধা দেবে তা অনুমান করা বোধ হয় অন্যায় হবে না। কারণ সামরিক গুরুত্বর দিক থেকে লুজনের গুরুত্ব খুব বেশী। তা ছাড়া ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ থেকে বিতাড়িত হলে প্রশান্ত-মহাসাগরের উপর জাপানী আধিপত্য অনেক পরিমাণে হ্রাস পাবে এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণে অবস্থিত জাপ অধিকৃত দ্বীপগুলি থেকে সমরোপকরণ সরবরাহের পথে জাপান অনেকটা বাধা পাবে। ফিলিপাইনের যুদ্ধ সম্বন্ধে আরও একটা কথা ভাববার আছে। ফিলিপাইন যুদ্ধের পরিকল্পনা ৪।৫ মাস পূর্বে হাওয়াই সম্ভব। তখন ইউরোপের যুদ্ধ শীঘ্র শেষ হয়ে যাবে এই আশা সমর-নেতারাও করেছিলেন। কাজেই প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধ পরিকল্পনা সে ব্যাপারের ভিত্তিতে হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু ইউরোপের যুদ্ধের অবস্থা আকস্মিকভাবে পরিবর্তিত হওয়াতে এই পরিকল্পনারও পরিবর্তন প্রয়োজন হতে পারে বলে মনে হয়। তা ছাড়া সম্প্রতি জার্মান ইউবোটের আক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়াতে মিত্রপক্ষের জাহাজ ডুবির সংখ্যাও বেড়ে গেছে। কাজেই সমান-ভাবে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য রণক্ষেত্রে দুটো বড় অভিযান চালান এবং নিয়মিতভাবে তার উপকরণ সরবরাহ করা সম্ভব হবে কিনা তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে মিত্রপক্ষের নৌ-বল ও সমর সামর্থ্যের ওপর। যদি ইউরোপের যুদ্ধের অবস্থা পরিবর্তনে সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধের পরিকল্পনা বদলের কোন প্রয়োজন হয়, তবে তা কিভাবে হবে বলা কঠিন। কিন্তু সংগ্রামের গতি ও প্রকৃতি দেখে তা অনেকটা আঁচ করা যাবে বলে মনে হয়।

ব্রহ্ম রণাঙ্গনে মিত্রবাহিনী মান্দালয়ের দিকে আরও অগ্রসর হয়ে গেছে বলে জানা গেছে। তারা মান্দালয়ের অনুমান ত্রিশ মাইল উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত মিচিনা-মান্দালয় রেলপথের ওয়েট লেট স্টেশন দখল করেছে বলে প্রকাশ। মিত্রপক্ষ মাইয়েবন উপদ্বীপের মাইয়েবন নামক স্থান ও ওর পশ্চিমে খানিকটা জায়গা দখল করেছে। এখানে এবং কালাদান উপত্যকায় জাপানীরা মিত্রবাহিনীর অগ্রগতিতে প্রবলভাবে বাধা দিচ্ছে।

—বিষ্ণুগুপ্ত

নূতন ছবির পরিচয়

দ্রৌপদী (নিউ হংস পিকচার্স) কাহিনী ও চিত্রনাট্য সুশীলারাণী; প্রযোজনা ও পরিচালনা বাবুরাও প্যাটেল; আলোকচিত্রঃ যতীন দাস; শব্দ গ্রহণঃ কৌশিক; সুরযোজনা ঃ পণ্ডিত হনুমানপ্রসাদ; ভূমিকায়ঃ সুশীলারাণী, ডেভিড, চন্দ্রমোহন, দীক্ষিত, বারীপ্রসাদ প্রভৃতি।

ছবিখানি ১২ই জানুয়ারী প্যারাডাইসে মুক্তিলাভ করেছে।

জুয়া খেলার স্বপ্নে যে ব্যক্তি বিভোর হয়ে থাকে দিন রাত তাকে ছবি তুলতে দিলে তার ছবিতে জুয়া ছাড়া আর থাকবেই বা কি? বাবুরাও প্যাটেলের 'দ্রৌপদী' হয়েছে তা-ই। নিজে রেসের ঘোড়ার মালিক, ঝানু রেসুড়ে বলে তার খ্যাতি আছে, তার মন, Sub-conscious মন সবই রেসে রেসে একেবারে বিভোর, সে অবস্থায় তার কাছ থেকে জুয়া ছাড়া আর কিছুর কল্পনা আশা করাই তো অস্বাভাবিক। 'দ্রৌপদী'র কাহিনী তাই পাণ্ডবদের পাশা খেলার মধ্যেই নিবদ্ধ থেকে গিয়েছে গল্পের আরম্ভ পাণ্ডবদের পাশা খেলায় নিমন্ত্রণ এবং শেষ পাণ্ডবদের পাশায় পরাজয়। অবশ্য দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণটা রাখা হ'য়েছে ছবির মধ্যে খানিকটা যৌন আবেদন সৃষ্টির জন্যে আর দ্রৌপদী তথা সুশীলারাণীর মুখ দিয়ে পুরুষের পশুচিত্ত কামনা চরিতার্থতা নিয়ে খানিকটা নীতি ও আদর্শের বুলি আওড়ে দেওয়াবার জন্যে।

সমগ্র ছবিখানি দেখে এই ধারণাই শুধু হয় যে, সুশীলারাণীকে রাতারাতি একেবারে উচ্চতম আসনে তুলে দেবার উদ্দেশ্যেই ছবিখানি যেন তোলা হয়েছে। কিন্তু তাতেও বাবুরাও প্যাটেল সাংঘাতিক ভুল ক'রে বসেছে—সুশীলারাণী কোন কেরামতীরই যোগ্যা নয় আর তার এই অসাফল্যই বাবুরাও প্যাটেলকে এমনি মর্মান্তিক আঘাত দিয়েছে যার জ্বালায় সে আজ ছবির বিরুদ্ধ-সমালোচকদের অভদ্র ভাষায় গালাগালি না দিয়ে শান্তি পাচ্ছে না মোটে। সুশীলারাণী উচ্চশিক্ষিতা, অন্তত তার এম এ, এল-টি উপাধি তার সাক্ষ্য দেয়; কিন্তু তাই বলে ভাল অভিনেত্রী হবারও যোগ্যতা তার আছে এ ধারণা বাবুরাও প্যাটেলের মনে জাগলো কি করে? সুশীলারাণীর রূপ শরৎচন্দ্রের ভাষায় বলতে গেলে 'চেলাকাঠ'টি যেন; অভিব্যক্তিতে বৈচিত্র্য নেই—করুণা, উষ্মা, বীতরাগ, উল্লাস সবক্ষেত্রেই একই ভাব। স্বর অত্যন্ত কর্কশ; গানগুলি প্রশংসা করবারই মত এবং শোনবারও মত, কিন্তু তা বাঈজীদের হার মানালেও চিত্ররসিকদের কাছে একটা 'আহামরি' কিছু বলে প্রতীয়মান হবে না।

ছবিখানি হ'য়েছে মঞ্চানুসৃত আদর্শে গঠিত সংশ্লিষ্টবিহীন কতকগুলো টুকরো দৃশ্যের সমষ্টি নিয়ে। কাহিনীর গতিও



নেই, তার মধ্যে নাটকীয় রস সমাবেশের অবকাশও নেই। এক একটা দৃশ্যকে খাড়া ক'রে নীতির বুলি আওড়ে যাওয়া হয়েছে (এ কাজটা প্যাটেল তার কাগজের মারফতেই তো করতে পারতো—কেন সাড়ে দশ লাখ টাকা খরচ করে এই ছবি তোলা!) সংলাপের রচনা চমৎকার, কিন্তু তাকে বিকশিত করিয়ে দেবার মত সমান দরের পরিস্থিতিই তৈরী হয়নি আগাগোড়া কোথাও। ছবির সংগীতাংশ প্রশংসাযোগ্য, আবহ তো বটেই, কণ্ঠসংগীত, যদিও নখানির মধ্যে সব কখানিই সুশীলা-রাণীর গাওয়া। রামগোপালের পঁচিশ হাজার টাকা দামের নাচটি সত্যিই উপভোগ্য তবে এ ছবির মধ্যে তা যেন গোবরে পদ্ম ফুল। সুশীলারাণীর একটা নাচ জোর করে সন্নিবেশিত হয়েছে এবং তাও হয়েছে নিতান্তই শিক্ষানবীশি স্তরের। ছবিখানির মধ্যে সবচেয়ে প্রশংসনীয় হচ্ছে শিল্প নির্দেশনা। মহাভারতীয় আমলের জমকালো ভাবটা ফুটে উঠেছে বেশ। আলোকচিত্র ও শব্দগ্রহণে ত্রুটি তেমন নেই।

ছবিতে নায়ক হচ্ছে শকুনী মামা; প্রকৃত-পক্ষে জুয়ার পক্ষ ও বিপক্ষ এই দুইয়ের সংঘাতই ছবির বিষয়বস্তু। জুয়ার পক্ষে শকুনী রায় দিয়ে গিয়েছে আর বিপক্ষে অগ্নোদ্গার করে গিয়েছে দ্রৌপদী—তাই ছবির প্রথম থেকে শেষ দৃশ্য পর্যন্ত এদের দুজনকেই শুধু দেখা যায়। শকুনীর ভূমিকায় ডেভিডের অভিনয় অনবদ্য হয়েছে এবং সমগ্র ছবিতে অভিনয় বলতে তাকে ছাড়া আর কাউকে উল্লেখ করা যায় না। দুঃশাসনের ভূমিকায় চন্দ্রমোহনকে ইচ্ছে করে যেন দাবিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভীমের ভূমিকায়ও নেমেছেন অতটাই নামকরা অভিনেতা মজহর খাঁ, কিন্তু দু একবার হুংকার ছাড়া তার আর কিছুই নেই, আর অর্জুন, নকুল, সহদেবের তো অস্তিত্বই নেই। যুধিষ্ঠিরকে একটা ভাঁড় বললেও চলে, ইচ্ছে করেই যুধিষ্ঠিরের এইরূপ পরিকল্পিত হয়েছে না অভিনেতার জন্যে ঐ রকম দাঁড়িয়েছে বলা শক্ত।

পরিশেষে বাবুরাওয়ের কথাই মনে এলো—কয়েক বছর আগে নিউ থিয়েটার্সের 'আঁধি' দেখে মন্তব্য করেছিল যে, আঁধি চলচ্চিত্র হলে আমি মহাত্মা গান্ধী—আজ তারই কথাই ফিরিয়ে দিয়ে বলতে হচ্ছে দ্রৌপদীকে যদি চলচ্চিত্র বলে ধরা যায় তাহলে বাবুরাও সত্যিই মহাত্মা।

নূতন ও আগামী আকর্ষণ

এ সপ্তাহে দুখানি হিন্দী ছবি মুক্তিলাভ করছে। প্রথম হলো মিনার্ভাতে জয়ন্ত দেশাই প্রডাকসন্সের 'ললকার', যার প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছে রমলা; আর দ্বিতীয়খানি হচ্ছে এ বি প্রডাকসন্সের নূরজাহান ও মাসুদ অভিনীত 'নাদান' ছবিখানি সেণ্ট্রালে মুক্তিলাভ করেছে। প্রথম-খানির পরিবেশক লালজী বিলিমোরিয়া আর দ্বিতীয়খানির চিত্রভারতী।

* * *

কালিকার মধ্য সাপ্তাহিক নাটক 'অচল প্রেম' কয়েকদিন পরই মঞ্চস্থ হবে। নাটকের কাহিনী ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের, নাটক স্বর্গীয় যোগেশচন্দ্রের, আর ভূমিকায় মলিনা ও কালিকার অন্যান্য সব শিল্পিবৃন্দ।

*

শ্রীপঞ্চমীর দিন রঙমহলে বিতণ্ডাহত 'সন্তান' মঞ্চস্থ হচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ অবলম্বনে বাণীকুমার রচিত এই নাটকটির প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করছেন অহীন্দ্র চৌধুরী।

*

আরেকটি নূতন আকর্ষণ হচ্ছে নিউ এম্পায়ারে হরেন ঘোষের উদ্যোগে নাচের আসর। এতে আছেন তিমিরবরণ, কেলু নায়ার এবং চিত্রাভিনেত্রী চিত্রা দেবী।

বিবিধ

মাদ্রাজে ১৯৪৪ সালে মাত্র চৌদ্দখানি পূর্ণ দৈর্ঘ্য ছবি মুক্তিলাভ করেছে, এর মধ্যে ২খানা ক্যানেরীতে, ৩ খানা তেলেগুতে আর ৯খানা তামিলে।

* * *

মাত্র এই সেদিন মেহবুব প্রডাকসন্সের 'তকদীর' চিত্রে প্রথম অবতরণ করলেও নরগীস এখন প্রতি ছবির জন্যে ৭৫০০০৲ টাকা চাইছে।

* * *

বাবুরাও প্যাটেল ও সুশীলারাণী কলকাতায় কতটা যে জনপ্রিয় তার পরিচয়ে এই বল্লেই হবে যে, বম্বের প্রযোজক, পরিচালক সানরাইজ পিকচার্সের ভি এম ব্যাস ছাড়া এদের সম্বর্ধনার জন্যে আর কেউ কোন অনুষ্ঠান ডাকেনি, এমন কি 'দ্রৌপদী' চিত্রের পরিবেশকরাও নয়।

* * *

চলতি ছবির তারকাকে হাউসে হাজির করার ঘোষণা কাগজে প্রকাশিত হলে তার ফল দাঁড়ায় শতখানেক ভাঙা চেয়ার, শো-কেসের কাঁচ ভাঙা, পর্দা গায়েব আর জনগণের হাতে কর্তৃপক্ষের নিগ্রহ, যা গত রবিবার ঘটলো প্যারাডাইসে, সুশীলারাণীর আগমনবার্তা নিয়ে।

* * *

বম্বের রক্সীতে 'চলচলরে নওজোয়ান' চলতে চলতে পুনর্সম্পাদন কাজও হতে থাকে এবং অবশেষে ছবিখানির আবার সেন্সারও করাতে হয়। এখন ছবিখানি নাকি আগের চেয়ে পাঁচশো'গুণ উন্নত হয়ে উঠেছে।

* * *

রাজকমল কলামন্দিরের আলোক চিত্র-শিল্পী শান্তারামের ভাই ভি অবধূত পাঞ্জাবের শোরী পিকচার্সের 'শালীমার' নামক ছবিখানির চিত্রগ্রহণ করার জন্য দিন পিছু হাজার টাকা পারিশ্রমিক নিয়েছে।

*

ক্রিকেট

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা শেষ হইতে চলিয়াছে। বিভিন্ন অঞ্চলের বা জোনের ফাইনাল খেলা বর্তমানে আরম্ভ হইয়াছে। এই সকল খেলা শেষ হইলে প্রতিযোগিতার সেমি ফাইনাল ও ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হইবে। বাঙলা দল গত বৎসর প্রতিযোগিতার ফাইনাল পর্যন্ত উঠিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিল। কিন্তু এই বৎসর সেইরূপ সৌভাগ্য আর হইবে না। এই বৎসরে বাঙলার দল গত বৎসর অপেক্ষা অনেক হীনশক্তিসম্পন্ন। রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের প্রথম খেলায় যুক্তপ্রদেশ দলের বিরুদ্ধে খেলিবার সময় তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বাঙলা দল পূর্বাঞ্চলের ফাইনাল খেলায় হোলকার দলের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য ইন্দোরে গমন করিয়াছে। প্রথম খেলায় যে সকল খেলোয়াড়গণকে লইয়া দল গঠিত হইয়াছিল তাহার কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু দলের শক্তি তাহাতে খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং সকল বিষয়েই হোলকার দল বাঙলা দল অপেক্ষা অনেক ভাল। ইহার প্রমাণ হোলকার দলের খেলোয়াড়গণ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কলিকাতার বিভিন্ন প্রদর্শনী খেলায় দিয়া গিয়াছেন। এইরূপ অবস্থায় বাঙলা দল পূর্বাঞ্চলের ফাইনাল খেলায় পরাজয় স্বীকার যে করিবেই এইরূপ ধারণা করিলে কোনরূপ অন্যায় হইবে না।

খেলায় হার-জিৎ আছেই সুতরাং তাহাতে দুঃখিত বা হতাশ হইবার কোনই কারণ নাই। তবে ভবিষ্যতে কিরূপে বাঙলার দলের শক্তি বৃদ্ধি করা যায় সেইদিকে পরিচালকগণ দৃষ্টি দিলে বিশেষ সুখী হইব। তাহা ছাড়া সম্প্রতি হোলকার দলের অধিনায়ক, ভারতের ক্রিকেট খেলার গৌরবতিলক কর্নেল সি কে নাইডু কলিকাতার বিভিন্ন প্রদর্শনী খেলায় যোগদান করিবার পর দেশে প্রত্যাবর্তনকালে যে বিবৃতি দিয়া গিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটি কথা বাঙলার ক্রিকেট পরিচালকগণকে ও খেলোয়াড়গণকে বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিতে অনুরোধ করি। তিনি বলিয়াছেন "নিয়মিত শিক্ষার ব্যবস্থা ও অধিক সংখ্যক প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ খেলিবার সুযোগ আমাদের ক্রিকেট খেলার উন্নতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় এবং সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন নিয়মানুবর্তিতার। সরাসরি বিদ্যালয় হইতে যাহাতে নিয়মিতভাবে ক্রিকেট খেলা প্রচলন হইতে পারে তাহার জন্য বিশেষ-ভাবেই চেষ্টা করা উচিত। নবউৎসাহী তরুণ খেলোয়াড়দের উপরই আমি বেশী ভরসা রাখি, তাহাদের উপরই আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ ও শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে।" বাঙলার ক্রিকেট পরিচালকগণ প্রবীণ অভিজ্ঞ ক্রিকেট খেলোয়াড়ের এই উপরোক্ত উক্তি স্মরণ করিয়া কর্মপদ্ধতি ঠিক করিলে অনতিবিলম্বে বাঙলার ক্রিকেট খেলার বর্তমান অবস্থার যে আমূল পরিবর্তন করিতে পারিবেন ইহা আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি। তবে সেই সুমতি কবে হইবে তাহাই ভাবি।

এ্যাথলেটিকস

বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশন পরিচালিত এ্যাথলেটিক স্পোর্টসের বিভিন্ন অনুষ্ঠান একের পর এক সম্পন্ন হইতেছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের স্ট্যাণ্ডার্ড খুব উচ্চ স্তরের না হইলেও অধিকাংশ বিষয় বাঙালী ও ভারতীয় এ্যাথলিটগণ সাফল্যলাভ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা পরম পরিতোষ লাভ করিলাম। আমাদের তীব্র কর্তব্য, কার্যকারী কর্মব্যবস্থার উল্লেখ, বাঙলার



এ্যাথলীটদের একটু চঞ্চল করিয়াছেন ইহা শুভ লক্ষণ। তাঁহারা সম্প্রতি যে "বেঙ্গল এ্যাথলীটস ইউনিয়ন" গঠন করিয়াছেন তাহা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহারা যদি কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তাহা হইলে আমরা অধিকতর আনন্দিত হইব। এইরূপ ইউনিয়ন গঠন না করিলে প্রকৃত উন্নতিকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পরিচালকগণকে তাঁহারা বাধ্য করিতে পারিবেন না।

ব্যাডমিণ্টন

ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড় সুনীল বসু সম্প্রতি বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। সেই খ্যাতি ও গৌরব তিনি যে শোভাবাজার ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতায় অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন দেখিয়া আমরা খুবই আনন্দিত হইলাম। এই খেলায় তিনি বেঙ্গল ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ানসিপের অর্জিত গৌরবের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। সিংগলস, ডাবলস ও মিক্সড ডাবলস তিনটি বিভাগেই সাফল্যলাভ করিয়াছেন। পূর্বাপেক্ষা খেলায় দৃঢ়তা ও উচ্চাঙ্গ নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য যে তিনি চেষ্টা করিতেছেন ইহার প্রমাণও শোভাবাজার ব্যাড-মিণ্টন প্রতিযোগিতায় পাওয়া গেল। এইভাবে যদি তিনি চলিতে থাকেন আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি যে, শীঘ্রই তিনি নিখিল ভারত ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ান বলিয়া অভিহিত হইবেন। সুস্থ ও সবল থাকিয়া তিনি উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হন ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

নিম্নে প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রদত্ত হইল।

পুরুষদের সিংগলস ফাইনাল:—সুনীল বসু ১৫-১৩, ১৫-১০ গেমে পি মুস্তফিকে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ফাইনাল:—সুনীল বসু ও পি ঘোষ ১৫-৫, ১৫-১০ গেমে এস ব্যানার্জি ও বিশু ব্যানার্জিকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস ফাইনাল:—সুনীল বসু ও মিস বি সেন ১১-১৫, ১৫-৭, ১৫-৭ গেমে মনোজ গুহ ও মিস এস দাসকে পরাজিত করেন।

কুস্তি

বঙ্গীয় অপেশাদার কুস্তি সঙ্ঘ বর্তমান বাঙলার একমাত্র প্রতিষ্ঠান যে বাঙলার তথা ভারতীয় মল্লযুদ্ধের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। গত কয়েক বৎসর প্রচেষ্টার ফলে এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালকগণ বাঙলা দেশে ব্যায়ামবীরদের মধ্যে কুস্তির কৌশল শিক্ষার জন্য নব প্রেরণা সৃষ্টি করিয়াছে। ইঁহাদের জন্যই বাঙলার বিভিন্ন জেলায় কুস্তি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ইহারা স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণের মধ্যে যাহাতে কুস্তি-কৌশল শিক্ষার প্রচলন হয় তাহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে-ছেন। সুতরাং এই প্রতিষ্ঠানটিকে বাঙলার একমাত্র কুস্তি পরিচালনার অধিকারী প্রতিষ্ঠান নামে অভিহিত করাই উচিত; কিন্তু সেইরূপ শক্তি এই প্রতিষ্ঠান কেন যে বাঙলার মল্লবীর-দের নিকট হইতে পাইতেছে না বুঝি না। বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশন, যাহাদের পরি-চালকগণ ইহাদের কোনরূপ ব্যবস্থা কোনদিন করেন নাই তাঁহারা কিরূপে যে এখনও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কুস্তি পরিচালনার জন্য সাহসী হন আমাদের বোধগম্য হয় না। বাঙলার মল্লবীরগণ কি চান যে বাঙলা দেশে দুইটি পরিচালকমণ্ডলী থাকে? তাহা যদি তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে, তবে তাঁহারা কেন ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া একটা মীমাংসার জন্য চেষ্টা করেন না? বঙ্গীয় অপেশাদার কুস্তি সংঘের সহিত জড়িত আছেন বিশ্ববিখ্যাত, বাঙলার গৌরব মল্লবীর শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ গুহ (গোবর বাবু)। তিনি নিজে উৎসাহী বাঙালী মল্লবীর-দের কৌশল শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া এই সঙ্ঘের পরিচালকগণের মধ্যে অধিকাংশই মল্লকৌশল সম্বন্ধে জ্ঞান রাখেন। অপরদিকে বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের কুস্তি বিভাগের পরিচালনা করেন এমন কতকগুলি লোক যাঁহাদের গোবরবাবুর ন্যায় খ্যাতি বা জ্ঞান, ইহা ছাড়িয়া দিলেও সাধারণ মল্লকৌশলের জ্ঞান আছে বলিয়া সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ইহাই যখন দুইটি পরিচালকমণ্ডলীর প্রকৃত রূপ তখন বাঙলার মল্লবীরগণের পক্ষে কাহারা প্রকৃত পরিচালকমণ্ডলী হইবার উপযুক্ত বিচার করা কি এতই কঠিন?

দেশী সংবাদ

১০ই জানুয়ারী—কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় কর্পোরেশনের টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা ও বিভাগটি গবর্ণমেণ্টের হাতে নেওয়া সম্পর্কে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভা দলের সদস্যগণ একযোগে বাঙলা গবর্ণমেণ্টের কার্যের তীব্র নিন্দা করেন।

মুসৌরীতে অস্বাভাবিক হিমবাত্যাসহ ৪০ ঘণ্টা তুষারপাত হয়। প্রকাশ, তুষারপাতের ফলে একটি বাড়ি ধ্বসিয়া পড়ে এবং তাহার ফলে দুইজনের মৃত্যু হয় এবং বার তেরজন গুরুতর আহত হয়।

গত ছয় বৎসরে ভারতবর্ষে বনিয়াদী শিক্ষার যে প্রসারলাভ করিয়াছে, তৎসম্পর্কে হিন্দুস্থানী তামিলী সঙ্ঘের সেক্রেটারীর এক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে।

নয়াদিল্লীর এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, মহামান্য সম্রাট বাহাদুর একটি ভারতীয় প্যারাসুট বাহিনী গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়াছেন।

নয়াদিল্লীতে শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই ও নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি খাঁর মধ্যে আলোচনা হয়।

১১ই জানুয়ারী—মহাত্মা গান্ধী অদ্য সেবাগ্রামে হিন্দুস্থানী তামিলী সঙ্ঘ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। তিনি এখনও দিবাভাগে মৌন অবলম্বন করিয়া থাকেন, কাজেই হিন্দুস্থানীতে লেখা তাঁহার বক্তৃতা ডক্টর জাকির হোসেন পাঠ করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে ছাত্রগণের এক বিরাট সভায় বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু ভারতবর্ষের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট ও স্বাধীনতার স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

কাশী-গোরক্ষপুর কেন্দ্র হইতে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী সর্দার যোগেন্দ্র সিং বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য শ্রীযুত খেদনলালের মৃত্যু হওয়ায় এই সদস্যপদ শূন্য হইয়াছিল।

অদ্য ফেডারেল কোর্টে ১৯৪৪ সালের ৩নং অর্ডিন্যান্সের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। রাজবন্দী শ্রীযুত বসন্তচন্দ্র ঘোষের পক্ষে মিঃ বি সি দে এই যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, ঐ অর্ডিন্যান্স অচল।

রক্সৌলের এক সংবাদে প্রকাশ, নেপালের রাজধানী কাটামুণ্ডু গত ৬ই জানুয়ারী হইতে তুষারপাত হইয়া আছে।

১২ই জানুয়ারী—অদ্য সেবাগ্রামে ডাঃ জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে বনিয়াদী শিক্ষা সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। মূল আলোচ্য বিষয় ছিল—বনিয়াদী স্কুলের শিক্ষকদিগের ট্রেনিং।

১৩ই জানুয়ারী—আগামী স্বাধীনতা দিবস সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী এক পত্রে লিখিয়াছেন যে, ২৬শে জানুয়ারী তারিখের জন্য কোন সংঘর্ষমূলক কার্যতালিকার প্রতি বিশেষ অনুরাগ নাই। তাঁহার ধারণায় গঠনমূলক কার্যতালিকাই প্রকৃত কার্যতালিকা। পতাকা অভিবাদন ও স্বাধীনতার সঙ্কল্পবাক্য পাঠ ইহার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হইয়াছে। সুতরাং ইহা বজায় রাখা উচিত। কিন্তু তিনি জনসমাবেশ ও শোভাযাত্রার পক্ষপাতী নহেন।

গোরক্ষপুরের বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা শ্রীযুত শিব্বানলাল শকসেনার মামলায় যুক্তপ্রদেশের জনৈক বৃটিশ পুলিশ অফিসারের (ডি আই জি) "প্রিয়তমা পত্নী"র নিকট লিখিত একখানি পত্র 'এক্সিবিট' হিসাবে দাখিল হইয়াছে। ১৯৪২

সাপ্তাহিক সংবাদ

সালের আগষ্ট আন্দোলন সম্পর্কে কিরূপ ব্যবস্থা করা হইত, এই পত্রে তাহার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।

১৪ই জানুয়ারী—ভারত গবর্ণমেণ্ট আমেদনগরে অবরুদ্ধ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অন্যতম সদস্য ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে মুক্তি দানের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। একখানা প্রেস কমিউনিকে বলা হইয়াছে যে, এই সিদ্ধান্ত কেবল ডাঃ ঘোষের স্বাস্থ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়াই করা হইয়াছে।

উড়িষ্যার প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত বিশ্বনাথ দাস মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

লক্ষ্মৌর হিন্দী পত্রিকা 'অধিকার'এর এক সংবাদে প্রকাশ যে, মুসলিম লীগের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা চৌধুরী খলিকুজ্জমান মিঃ জিন্নার নিকট পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ

১০ই জানুয়ারী—প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গন—বিরাট মার্কিণ সৈন্যদল ফিলিপাইনের লুজন দ্বীপে অবতরণ করে। অবতরণকারী সৈন্যদের সহিত জেনারেল ম্যাকআর্থারও অবতরণ করেন।

পশ্চিম ইউরোপীয় রণাঙ্গন—আর্দেন স্ফীতিমুখে ৮ হইতে ১০ মাইল অঞ্চল জুড়িয়া জার্মাণগণ পশ্চাদপসরণ করে। বেলজিয়ামে মার্কিণ বাহিনী কর্তৃক লা রসের ৪ মাইল উত্তর-পূর্বে সামরী অধিকৃত হয়।

পূর্ব ইউরোপীয় রণাঙ্গন—জার্মানরা বুদাপেস্টের দক্ষিণ-পূর্ব উপকণ্ঠ কিসপেস্ট নামক স্থান হইতে সরিয়া আসে। সোভিয়েট বাহিনী বুদাপেস্টের পূর্বাংশের রেলওয়ে স্টেশনের উভয় পার্শ্বে জার্মান ব্যূহে ফাটলের সৃষ্টি করে।

ব্রহ্ম রণাঙ্গন—চতুর্দশ আর্মির রণাঙ্গনে সোয়েবো বিমানক্ষেত্র মিত্রসেনার করতলগত হয়। পঞ্চদশ ভারতীয় কোরের রণাঙ্গনে কালাদান উপত্যকায় কিয়াউকটাও-এর ১৩ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে জাপানীরা প্রবলভাবে বাধা দেয়। আকিয়াবে জাপ বিমান হানা হয়।

মার্কিণ রাষ্ট্রবিভাগ হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ইঙ্গ-আমেরিকান তৈল-চুক্তির উদ্দেশ্য ও কার্যক্ষেত্র সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্ট হওয়ায় সেনেট হইতে উহা প্রত্যাখ্যানের জন্য প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে অনুরোধ জানান হইয়াছে।

যুদ্ধের পর জাপান সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া প্রয়োজন, সে সম্পর্কে প্রশান্ত মহাসাগরীয় সম্মেলনে সমাগত প্রতিনিধিরা এই সিদ্ধান্ত করেন যে, জাপানে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হইবে এবং জাপ সম্রাটের একচ্ছত্রাধিকার কাড়িয়া লইতে হইবে।

১১ই জানুয়ারী—প্রশান্ত মহাসাগর— মার্কিণ
বাহিনী ফিলিপাইনের রাজধা[illegible] ৯০
মাইলের মধ্যে গিয়া পৌ[illegible]
পশ্চিম ইউরোপ[illegible] ও
মার্কিণ বাহিনী [illegible] ব
৪ মাইল পর্য[illegible]
স্ফীতিমুখে[illegible]
স্যাং হু[illegible]
মার্কিণ [illegible]

গ্রীস—গ্রীক গবর্ণমেণ্ট অতঃপর যে নীতি অনুসরণ করিয়া চলিবেন, জেনারেল প্লাস্তিরাস আজ এক বিবৃতিতে তাহা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন যে, বিদ্রোহীরা যে সকল অধিকার দাবী করিতেছে বলিয়া জানাইতেছে, সেগুলি সমস্তই সরকারী নীতিতে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে।

পূর্ব ইউরোপীয় রণাঙ্গন—বুদাপেস্টের পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমে ঘোরতর ট্যাঙ্ক ও পদাতিক যুদ্ধের পর বুদাপেস্টের কেন্দ্রস্থলে বর্তমান যুদ্ধ চলিতেছে।

ব্রহ্ম রণাঙ্গন—চতুর্দশ আর্মির রণাঙ্গনে সোয়েবো সম্পূর্ণরূপে মিত্রসেনার করতলগত হইয়াছে।

অদ্য মার্কিণ বিমান বাহিনী সিঙ্গাপুর শহরে বোমা বর্ষণ করে।

এথেন্সে সরকারীভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে, এলাস প্রতিনিধি দলের সহিত জেনারেল স্কোবির বৈঠকে যুদ্ধ বিরতির সর্তাবলী সম্পর্কে বহুলাংশে মতৈক্য হইয়াছে।

১২ই জানুয়ারী—পূর্ব ইউরোপীয় রণাঙ্গন—লালফৌজ দক্ষিণ পোল্যাণ্ডে নূতন অভিযান আরম্ভ করিয়া জার্মান ব্যূহ ভেদ করে। ওয়ারশ'র ১২০ মাইল দক্ষিণে বারানফের পশ্চিম দিকে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়িয়া সোভিয়েট আক্রমণ সুরু হয়। বুদাপেস্টের সমগ্র উত্তর-পূর্বাংশ সোভিয়েট বাহিনীর অধিকারে আসে।

গত বৃহস্পতিবার রাত্রে আমেরিকার হটস্প্রিং-এ প্রশান্ত মহাসাগরীয় সম্মেলনে সুদূর প্রাচ্যে বৃটিশ অধিকৃত দেশের বাস্তব প্রশ্ন সম্পর্কিত আলোচনার সময় বৃটিশ ও ভারতীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে তুমুল বচসার সৃষ্টি হয়।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধিমণ্ডলীর নেত্রী শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত রয়টারের প্রতিনিধির নিকট বলেন যে, বৃটেন ভারতকে স্বাধীনতা দিবে বলিয়া যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল, সে সম্পর্কে সম্প্রতি সে দুইবার তাহার আন্তরিকতা প্রমাণের সুযোগ হারাইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় যে, বর্তমানে তাহার আর সে ইচ্ছা নাই।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় সম্মেলনে সুদূর প্রাচ্যের নিরাপত্তা সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার জন্য যে গোলটেবিল বৈঠক হইবার কথা হইয়াছে, শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত তাহাতে সভানেত্রীত্ব করিতে রাজী হইয়াছেন।

১৩ই জানুয়ারী—পূর্ব রণাঙ্গন—জার্মান নিউজ এজেন্সীর সংবাদে প্রকাশ, লালফৌজ দক্ষিণ পোল্যাণ্ডে নূতন অভিযান আরম্ভ করিয়াছে এবং ইতিমধ্যেই জার্মান ব্যূহ ভেদ করিয়াছে। বুদাপেস্টের শেষ জার্মান ঘাঁটির উপর আক্রমণের তীব্রতা চরমে পৌঁছিয়াছে এবং রাস্তায় রাস্তায় ঘোরতর সংগ্রাম সুরু হইয়াছে।

পশ্চিম রণাঙ্গন—মার্কিণ তৃতীয় আর্মির পদাতিক ও সাঁজোয়া বাহিনী গত ২৪ ঘণ্টায় ৩ মাইল অগ্রসর হইয়া বাস্তোনের দক্ষিণ-পূর্বে জার্মান স্ফীতিমুখের অবসান করিয়াছে। আর্দেন স্ফীতিমুখের সংগ্রামে মার্কিণ তৃতীয় আর্মির আক্রমণে দশ ডিভিসন জার্মান সৈন্য (প্রায় ৮০ হাজার) বিনষ্ট হইয়াছে।

মার্কিণের প্রশান্ত মহাসাগরীয় হেড-কোয়ার্টার্স হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ইন্দো-চীনের অদূরে এক যুদ্ধে ২৫ খানি জাপানী জাহাজ নিমজ্জিত হইয়াছে।

১৪ই জানুয়ারী—পশ্চিম রণাঙ্গন—আজ মার্কিন প্রথম আর্মি জার্মান স্ফীতিমুখের উত্তর প্রান্তে এক নূতন আক্রমণ সুরু করিয়াছে। স্টাভেলট ও মালমেডীর মধ্যে আক্রমণ সুরু করিয়া মার্কিন বাহিনী সর্বত্র ১২০০ গজ আগাইয়া গিয়াছে।

দেশ

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন — সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

১২ বর্ষ] শনিবার, ১৪ই মাঘ, ১৩৫১ সাল। Saturday, 27th January, 1945 [১২শ সংখ্যা

স্বাধীনতা দিবস

২৬শে জানুয়ারী ভারতের স্বাধীনতা দিবস। ভারতের বুকের উপর দিয়া কালের আবর্তগতি বহিয়া চলিয়াছে; কিন্তু এই নিত্য পরিবর্তনের ভিতরও ২৬শে জানুয়ারীর পুণ্য তিথি এক সনাতন সত্য ভারতবাসীদের অন্তরে উদ্দীপ্ত করিবে। এই দিনে স্বাধীনতার সমুন্নত আদর্শ ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকার সমুজ্জ্বল গরিমায় তাহাদিগকে বৃহদাদর্শে অনুপ্রাণিত করিবে। অতীতের অন্ধকার উজ্জ্বল করিয়া ভারতের শত শত আত্মদাতা বীর সন্তানের আশ্বাস-বাণী এই দিবসের প্রভাতের আলোকে তাহাদের ধমনীতে শোণিতস্রোত প্রবাহিত করিবে। সে বাণী পরাধীন ভারতের আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া বলিবে "ওরে ভয় নাই, ওরে ভয় নাই; নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।" বিদেশী শক্তির বাহুবল অনাহত এ ধ্বনিকে সংযত করিতে পারিবে না; এ কণ্ঠ রুদ্ধ করিবে, এমন শক্তি তাহার নাই। পক্ষান্তরে তাহার সেরূপ প্রচেষ্টায় ভারতের স্বাধীনতার আদর্শ সমধিক উজ্জ্বল হইয়াই উঠিবে; কারণ, প্রাণময় যে দান, পশুবলের দ্বারা তাহার উপর হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হয় না; পরন্তু তেমন চেষ্টায় প্রাণের আগুন দ্বিগুণ হইয়াই ছড়াইয়া পড়ে। স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় পতাকার বেদীমূলে আমরা ভারতের অপরিম্লান আত্ম-মহিমায় অগ্নিময়, প্রাণময় এবং বীর্যময় দেবতাকে বন্দনা করিতেছি। মৃত্যুর ভিতর দিয়া অমরত্ব লাভের জন্য আমরা যেন তাঁহার অমৃত-ময় আহ্বান লাভ করিতে পারি এবং

সাময়িক প্রসঙ্গ

পথের দুর্গমতার দায়ে যেন ভীরুতার দৈন্যকে মুহূর্তের মোহেও বরণ করিয়া না লই।

কয়লার সমস্যা

কিছুদিন পর্যন্ত কোন গতিকে সাধারণের প্রয়োজন মিটিতেছিল, কিন্তু কয়লার সমস্যা পুনরায় গুরুতর রকমে জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। কলিকাতা শহরে কয়লা মিলিতেছে না এবং তাহার ফলে অনেকের গৃহে চুল্লী জ্বলিতেছে না। বহু পরিবারকেই একবেলা রন্ধন করিয়া দুই বেলা চালাইতে হইতেছে। এই অবস্থা কতদিন চলিবে জানি না; তবে ইহা নিশ্চিত যে, অবিলম্বে যদি শহরে যথেষ্ট কয়লা সরবরাহ করা না হয়, তবে এই সমস্যা ব্যাপক আকার ধারণ করিবে এবং অন্যভাবেও বহু অনর্থ সৃষ্টি করিবে অথচ কয়লার অভাবজনিত এই সমস্যা নূতন কিছুই নয়; যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতেই ইহা চলিতেছে, তথাপি এ পর্যন্ত ইহার প্রতিকার সাধন করা কেন হইল না, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। অবশ্য এ সম্বন্ধে সরকার পক্ষের কৈফিয়ৎ দিবার মামুলি যুক্তি রহিয়াছে। তাঁহারা খনির শ্রমিক সমস্যার কথা তুলিবেন, বলিবেন এখন মাঠের ফসল তুলিবার সময়—এই সময়ে শ্রমিকেরা ক্ষেতের কাজে নিযুক্ত হইয়াছে; এজন্য সাময়িকভাবে কয়লার এই সমস্যা দেখা দিয়াছে এবং কিছুদিন পরেই অবস্থার প্রতিকার সাধিত হইবে; কিন্তু নিত্য আবশ্যক দ্রব্যের অভাবে বিপন্ন জন-সাধারণের পক্ষে এই ধরণের আশ্বাসে বিশেষ কিছু সান্ত্বনার কারণ নাই। এ সম্বন্ধে কলিকাতার শ্বেতাঙ্গ বণিক সভায় বড়লাটের বক্তৃতার কথা আমাদের মনে পড়ে। তিনি আমাদিগকে এই আশ্বাস দান করিয়াছিলেন যে, খনি হইতে কয়লা তুলিবার পরিমাণ ১৯৪৩ সাল হইতে ১৯৪৪ সালে মাসের পর মাস বৃদ্ধি পাইতেছে, অথচ কিছুদিন পূর্বে স্যার রামস্বামী মুদালিয়রের মুখে আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের কথা শুনিলাম। তিনি বলিলেন, ১৯৪৪ সালের জুন হইতে সেপ্টেম্বর—এই কয়েক মাসে খনিসমূহ হইতে যে কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে, তাহার পরিমাণ ১৯৪৩ সালের ঐ কয়েক মাসের অপেক্ষা কম। এক্ষেত্রে কাহার উক্তি আমরা অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিব? কয়লা উত্তোলনের এই প্রশ্ন ছাড়া এ ব্যাপারে মালগাড়ি সরবরাহের সনাতন প্রশ্নও রহিয়াছে। মালগাড়ির অভাবের জন্যই কলিকাতার কয়লা সরবরাহে এই সঙ্কট দেখা দিয়াছে কি না আমরা জানি না; কিন্তু ইহার মূলে কারণ যাহাই থাকুক না কেন, অবিলম্বে শুধু কথায় নয়, কার্যত ইহার প্রতিকার সাধিত হয়, আমরা ইহাই চাই।

অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র

নানাস্থানে অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎ-চন্দ্রের সপ্তম বার্ষিকী স্মৃতিতর্পণ সভা অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। নির্যাতিত মানবের জন্য তাঁহার মনে যে বেদনা সঞ্চিত ছিল, তাহা তাঁহার অনুপম রচনা-ভঙ্গীর ভিতর দিয়া প্রকাশ লাভ করিয়া বাঙলা কথা-সাহিত্যকে অভাবনীয়রূপে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছে। বাঙলা সাহিত্যে তিনি চিরকালই অমর হইয়া থাকিবেন এবং তাঁহার স্মৃতি বাঙালীর মন হইতে কখনও মুছি-

বার নয়। কিন্তু বাঙলার অন্যান্য পরলোকগত সাহিত্যিকের অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছে, শরৎচন্দ্র সম্বন্ধেও আমরা তাহার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করিতেছি না। তাঁহার স্মৃতি-রক্ষাকল্পে এখন পর্যন্তও তেমন কোন আয়োজন হইল না। ইহা শরৎচন্দ্র কিংবা অন্যান্য সাহিত্যিকের দুর্ভাগ্য নয়,—পক্ষান্তরে ইহা সমগ্র বাঙালী জাতির শোচনীয় দুর্ভাগ্য। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহাদের যাহা অবদান, তাহা তাঁহারা জাতির হস্তে উত্তরাধিকারস্বরূপ অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা সেই অবদানের এমনই অযোগ্য যে, আমরা তাঁহাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধানিবেদনের নিদর্শনস্বরূপ তাঁহাদের স্মৃতি-রক্ষার উল্লেখযোগ্য কোন ব্যবস্থাই করিতে পারি নাই। দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্র স্মৃতি-সমিতি শরৎচন্দ্রের স্মৃতিসৌধ নির্মাণের সাহায্যের জন্য দেশবাসীর নিকট আবেদন করিয়াছেন; তৎপ্রতি আমরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। শুধু সাময়িকভাবে কয়েকটি সভার অনুষ্ঠান নয়, শরৎচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার্থ স্থায়িভাবে যথাযোগ্য কোন ব্যবস্থা করিলে তবেই তাঁহার উদ্দেশে দেশবাসীর স্মৃতিতর্পণের আয়োজন সার্থক হইয়া উঠিবে।

সরকারী তৎপরতার নমুনা

শ্রীযুক্ত কে জি মশ্রুওয়ালার তিনখানি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি খোয়া যাওয়া সম্পর্কে সম্প্রতি যে কয়েকখানি চিঠি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়, তিনি কারামুক্তির নয় দশ মাস পূর্বে তাঁহার লিখিত তিনখানি পুস্তকের পাণ্ডুলিপি নাগপুর সেণ্ট্রাল জেল-কর্তৃপক্ষের মারফৎ গভর্নমেণ্টের নিকট পরীক্ষার্থ পেশ করেন। কারামুক্তির সময়ে অনুসন্ধান করিলে এবং তাহার পর কারাবিভাগের ইন্সপেক্টার-জেনারেলের কাছে কয়েকখানি পত্র লিখিলে তাঁহাকে জানাইয়া দেওয়া হয় যে, পাণ্ডুলিপিগুলির পরীক্ষা সম্পর্কে গভর্নমেণ্টের আদেশের প্রতীক্ষা করা হইতেছে এবং বিষয়টি গভর্নমেণ্টকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর গত ডিসেম্বর মাসে কারাবিভাগের সহকারী সেক্রেটারীর নিকট হইতে প্রাপ্ত এক পত্রে তিনি জানিতে পারেন যে, পাণ্ডুলিপিগুলি পাঠাইবার সময় পথিমধ্যে খোয়া গিয়াছে। জেলের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় নানা অসুবিধার মধ্যে অবিরাম পীড়িত দেহে শ্রীযুক্ত মশ্রুওয়ালা পাণ্ডুলিপিগুলি রচনা করিয়াছিলেন। গুরু পরিশ্রমের ফলস্বরূপ এই পাণ্ডুলিপিগুলি হারাইয়া যাওয়ায় তাঁহার যে ক্ষতি হইল, তাহা পূরণ হওয়া দুঃসাধ্য। ইহাতে সংশ্লিষ্ট কর্মচারিগণের অযোগ্যতা ও কর্তব্যকর্মে উদাসীনতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এ সম্পর্কে বিশেষভাবে তদন্ত হওয়া আবশ্যক এবং সত্যসত্যই যদি পাণ্ডুলিপিগুলি খোয়া গিয়া থাকে, তবে যাহাতে ভবিষ্যতে এরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়, সেজন্য যাহাদের অব্যবস্থায় ও অবহেলায় এরূপ ক্ষতিকর ব্যাপার হইয়াছে, তাহাদের সম্বন্ধে সমুচিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া উচিত। কিন্তু এ সম্বন্ধে গভর্নমেণ্ট যে কতদূর তৎপর হইবেন এ বিষয়ে একটি ঘটনা হইতে আমাদের মনে সন্দেহ জাগিতেছে। সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, লর্ড মেকলের ৪০ খানির উপর আসল মিনিটের পাণ্ডুলিপি ইম্পিরিয়াল রেকর্ড-বিভাগ হইতে খোয়া গিয়াছে। কতকগুলি বাণ্ডিলে সংলগ্ন শিলপ হইতে জানা যায়, ১৮৯৪ সালে মিনিটগুলি সিমলা হইতে ছাপার জন্য চাহিয়া পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু মিনিটগুলির অদৃষ্টে অতঃপর কি ঘটিল, তাহা জানা যায় না। ১৯০৪ সালে তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড মেকলের শিক্ষা-সম্বন্ধীয় প্রসিদ্ধ মিনিটের আসল পাণ্ডুলিপিখানি দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তখন তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহার পর সুদীর্ঘ ৩৮ বৎসর অতীত হইয়া গেলে, ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে ভারত গভর্নমেণ্ট বিভিন্ন বিভাগে এই আসল মিনিটগুলি অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় না। দ্বিতীয়বার অনুসন্ধানের ফলে ইম্পিরিয়াল রেকর্ড-বিভাগে মাত্র তিনখানি আসল মিনিটের সন্ধান পাওয়া যায়। খাস সরকারী বিভাগের মূল্যবান্ কাগজপত্র সম্বন্ধেই যখন সংশ্লিষ্ট ও ভারপ্রাপ্ত কর্মচারিগণ এরূপ অবহেলা ও অযোগ্যতার পরিচয় দেন, তখন শ্রীযুত মশ্রুওয়ালার পাণ্ডুলিপির ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার অন্যথা আশা করা যায় না। সরকারী ছত্রচ্ছায়ায় কেবল মোটা মাহিয়ানায় পুষ্ট না হইয়া এ সম্বন্ধে সচেতন থাকিবার মত কেহ কি নাই? এরূপ সরকারী অযোগ্যতা কেবল এক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য বহু ক্ষেত্রেই প্রতিনিয়ত দেশবাসী লক্ষ্য করিতেছে, অথচ তাহার প্রতিবিধান সম্বন্ধে যে কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, তাহা জানিবার উপায় নাই। হয়তো ইহার কারণ, তাহাতে সরকারী প্রেষ্টিজে আঘাত লাগে।

নেতাদের বন্দিজীবন

কারারুদ্ধ কংগ্রেস নেতাদের মুক্তিদানের সম্বন্ধে সম্প্রতি পার্লামেণ্টে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। প্রশ্নের উত্তরে ভারতসচিব মিঃ আমেরী বলিয়াছেন, কয়েকজন কংগ্রেস-নেতাকে স্বাস্থ্যঘটিত কারণে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে, অপর সকলকে দেশের নিরাপত্তার জন্য এখনও আটক রাখা হইয়াছে। দেশের নিরাপত্তার সঙ্গে বন্দীদের স্বাস্থ্যের যে সম্পর্ক মিঃ আমেরী স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন, তাহাতে লোকের মনে এই প্রশ্ন জাগিবে যে, স্বাস্থ্য যতদিন পর্যন্ত ভাল থাকিবে, ততদিন কারারুদ্ধ কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের মুক্তি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের মতে দেশের পক্ষে নিরাপদ নয়। তাঁহাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইলে তবে তাঁহাদের সম্বন্ধে দেশের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয় এবং ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তাঁহাদিগকে মুক্তিদান করিতে পারেন। কারারুদ্ধ কংগ্রেস-নেতৃগণের বন্দিজীবনের সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কোন সংবাদই পাই না। সম্প্রতি আমরা এ সম্বন্ধে যেটুকু সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে তাঁহাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমাদের বিশেষ উদ্বেগের কারণ ঘটিয়াছে। ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বন্দিশালা হইতে বাহিরে আসিয়া সম্প্রতি যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যাইতেছে, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল গুরুতরভাবে পীড়িত আছেন। ব্যাধির আক্রমণে কখনও কখনও তাঁহাকে গরম জল মধুর সহিত মিশাইয়া খাইয়া থাকিতে হয়। সর্দারজীর বয়ঃক্রম এখন সত্তর হইতে চলিল। এরূপ বয়সে তাঁহার স্বাস্থ্যের এমন অবনতি আশঙ্কার বিষয় সন্দেহ নাই। পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ মেরুদণ্ডের বেদনা প্রভৃতি জটিল রোগে ক্লেশভোগ করিতেছেন। রাষ্ট্রপতি আজাদ এবং পণ্ডিত জওহরলালের শরীরের ওজন হ্রাস পাইয়াছে। আমেদনগরের বাহিরে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের অনেকের স্বাস্থ্য ভাল নয়। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ এবং সীমান্ত গান্ধীর নানারূপ অসুস্থতার সংবাদ আমরা পাইতেছি। ডাক্তার অটল সম্প্রতি কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া লক্ষ্ণৌ জেলে অবরুদ্ধ মিঃ রফী আহম্মদ কিদোয়াইয়ের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জানাইয়াছেন যে, তিনি গুরুতর রকমে হৃদ্‌রোগে কষ্ট পাইতেছেন। অবিলম্বে তাঁহার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। দীর্ঘকাল বন্দিশালায় থাকার ফলে ভারতের এই সব জননায়কগণের এরূপ স্বাস্থ্যহানি সত্ত্বেও বর্তমানে তাঁহাদিগকে আটক রাখিবার জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের জিদের কি কারণ থাকিতে পারে, আমরা বুঝি না। মহাত্মা গান্ধীর কারামুক্তিতে দেশের নিরাপত্তা কিছু ব্যাহত হয় নাই; কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির তিনজন সদস্য বন্দিজীবন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তাহাতেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিপর্যস্ত হয় নাই, তথাপি স্বাস্থ্যহানি সত্ত্বেও অপরাপর নেতাদিগকে বন্দিশালায় রাখিতে হইবে, মানবতার দিক হইতেও এমন যুক্তি বিসদৃশ এবং নিন্দার্হ; কিন্তু চার্চিল-আমেরীর দল সকল রকমে নিন্দার অতীত। ভারতের জনমতকে পদদলিত করিয়াই তাঁহারা চলিবেন; সুতরাং তাঁহাদিগকে উপদেশ দিতে যাওয়া বৃথা।

দেশের কথা

জিন্নার নীতি-চাতুর্য

মিঃ জিন্না পাকিস্থানের সম্বন্ধে নূতন বুলি আওড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন। সম্প্রতি আমেদাবাদের ছাত্রদের এক সভায় তিনি বলেন—

জন বুলকে কোণঠাসা করিবার একমাত্র পথ হইতেছে পাকিস্থান। মোশলেম লীগের নীতি এবং কর্মপন্থা হিন্দুদের স্বার্থের পরিপন্থী, ইহা মনে করা ভুল এবং লীগ-নীতির লক্ষ্য প্যান-ইছলাম ইহাও জুজুর ভয় মাত্র।



পাকিস্থানের জন্য সংগ্রাম হিন্দুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম নয়, সে সংগ্রাম ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে। অখণ্ড ভারতের দাবী ব্রিটিশেরই ষড়যন্ত্রের পরিণতি। আপনারা যাহাই বলুন না কেন, ভারতের অখণ্ডত্বকে আমরা আঁকড়াইয়া ধরিয়া নাই, মেসিনগানের দ্বারাই ইহাকে বজায় রাখা হইয়াছে। আমাদের শত্রুরাই আমাদিগকে এই ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করিয়াছে। ব্রিটিশ রাজনীতিকগণের ষড়যন্ত্রের ফলেই অখণ্ড ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠার ধুয়া উঠিয়াছে। ভারতের দুই জাতি কখনই একমত হইতে পারিবে না, ইহা জানিয়াই ব্রিটিশ রাজনীতিকরা অখণ্ড ভারতের থিওরিকে উৎসাহ দিয়া আসিতেছে। এ দুই জাতিকে এমন অবস্থার মধ্যে তাহারা লইয়া আসিয়াছে, যে অবস্থায় তাহারা মধ্যস্থতা করিতে পারে এবং দুইটি বিড়ালের ঝগড়ার মধ্যস্থতা করিতে গিয়া বানর যেরূপ বিচার করিয়া দিয়াছিল, তাহাদের ইচ্ছা যে তাহারা তাহা করিতে সমর্থ হয়।

জিন্না সাহেবের মুখে এমন কথা শুনিবার পর আমাদের মনে স্বভাবতঃই একটা প্রশ্ন উঠে, তাহা এই যে, মধ্যস্থের এমন মতলব আছে, ইহা বুঝিবার পরও আমরা তাঁহাকে মধ্যস্থ মান্য করিতে যাই কেন? করাচীতে মুসলিম লীগের বিগত অধিবেশনের সভাপতিস্বরূপে মিঃ জিন্না নিজেই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষ ভাগ করিয়া দিয়া তবে সরিয়া পড়। মধ্যস্থের গোপন-রীতি তখন কি তাঁহার জানা ছিল না? আজ আমরা তাঁহার মুখে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা শুনিতেছি। আমেদাবাদে সাংবাদিকদের নিকট পাকিস্থান নীতির ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলেন—

"ভারত পরিত্যাগ কর," গান্ধীজীর এই প্রস্তাব বহু আবেগপূর্ণ আদর্শে পূর্ণ। আমি ঐ মত সমর্থন করি। আমি ছাড়া আরও বহু ভারতবাসী আছেন, তাঁহারাও ঐ মত সমর্থন করিবেন। গান্ধীজী দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর যাবৎ তাঁহার মতানুযায়ী ভারতের সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া কিছুমাত্র সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের পরিসমাপ্তি না ঘটিলে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর নয়। ব্রিটিশের কর্তৃত্ব ভারতে অব্যাহত থাকিতে হিন্দুদের নিকট হইতে পাকিস্থান লাভ করা আমার পক্ষে যতটা অসম্ভব, আমার নিকট হইতে অখণ্ড ভারত গ্রহণ করা হিন্দুদের পক্ষে তদপেক্ষা অধিক অসম্ভব। সব কিছুই ব্রিটিশের হাতে।

জিন্না সাহেব তাঁহার সুর সপ্তমে চড়াইয়া ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

যখন আমরা বলি যে, আমরা পাকিস্থানের জন্য সংগ্রাম করিব, পাকিস্থানের জন্য মৃত্যু বরণ করিব এবং সেজন্য আমাদের সর্বস্ব বিসর্জন দিব, তখন শুধু মোছলেম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলির জন্যই আমরা ঐ কথা বলি না; পরন্তু সমগ্র ভারতের জন্যই বলিয়া থাকি; যদি এখানকার ব্রিটিশ রাজের উচ্ছেদ করিতে না পারি, তবে কিরূপে আমরা পাকিস্থান লাভ করিব?"

মিঃ জিন্নার উক্তি অনুসারে দেখা যাইতেছে, অন্তত একটি ক্ষেত্রে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁহার আদর্শের মিল আছে এবং তাহা হইল ভারত হইতে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ সাধন; কিন্তু তিনি এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কংগ্রেসকে কোনদিনই সাহায্য করেন নাই; বরং প্রতিপদে বাধা দিয়া ব্রিটিশ শাসনকে এদেশে অক্ষুন্ন রাখিতেই চেষ্টা করিয়াছেন। আন্তরিকতাহীন এমন ধাপ্পাবাজীতে কোন বড় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। স্বভাবতঃই লোকে এমন প্রাণহীন যুক্তি এবং উক্তিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতেই দেখিয়া থাকে। আত্মোৎসর্গের পথেই স্বাধীনতা অর্জন করিতে হয় এবং প্রাণের বলেরই সর্বত্র জয়লাভ ঘটিয়া থাকে।

প্রধান ও প্রথম লক্ষ্য

স্বাধীনতা লাভই ভারতের পক্ষে বর্তমানে প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য; নিজেদের মধ্যে শাসনতান্ত্রিক খুঁটিনাটির বিচার তাহার পরের কথা। কংগ্রেস এই বিষয়ের উপর বরাবরই জোর দিয়া আসিয়াছে। সেদিন নিখিল ভারত ছাত্র কংগ্রেসের প্রতিনিধি শ্রীযুত প্রহ্লাদ মেটার নিকট মহাত্মা গান্ধী ইহা স্পষ্টরূপেই প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন—

কিরূপে যথাসম্ভব সত্বর আমরা স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ হইব, ছাত্রদিগকে তদুদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। ছাত্রদিগকে কংগ্রেসের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে একাত্ম হইয়া উঠিতে হইবে এবং বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ক্রমাগত সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে। তাঁহারা স্বাধীনতার চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য দেশকে প্রস্তুত করিয়া তুলিবেন।

অন্ধ্র মহিলা সম্মেলনের উদ্যোগে আহূত সাংবাদিকগণের একটি বৈঠকে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু কংগ্রেসের এই আদর্শকে সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন—

কংগ্রেস সম্মিলিত ভারতের পক্ষ হইতে কথা বলিতে চাহে। স্বাধীনতা লাভের জন্য অন্য সকল দল ও সম্প্রদায় যাহাতে পরস্পরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কাজ করিতে পারে, সেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য। ভারতের জনসাধারণের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিয়া এবং সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় স্বাধীনতা লাভ করিয়া কংগ্রেস যেদিন আপনা হইতেই ভাঙিয়া যাইবে, কংগ্রেসের সেই দিনই হইবে বিজয়ের দিন। প্রত্যেক ভারতবাসীর অন্তর স্বাধীনতা লাভের জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছে। স্বাধীনতা লাভের এই আগ্রহ এবং আকুলতাকে মৌলিক ভিত্তি করিয়া আমাদিগকে রাষ্ট্রীয় জীবন গঠন করিতে হইবে।

বলা বাহুল্য, শুধু এই পথেই ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থায়ী ঐক্য সম্ভব। ধর্মগত ভেদ-বিভেদের উপর জোর দিলে ভারতের সংহতি-শক্তি কার্যত শিথিল হইবে এবং তাহার ফলে বৈদেশিক প্রভুত্বই ভারতে স্থায়িত্ব লাভ করিবে। প্রকৃতপক্ষে সমগ্র জাতির স্বার্থ-বুদ্ধিকেই আজ জাগ্রত করিতে হইবে। সেদিন স্যার আজিজুল হক লাহোরে একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, জগতের মধ্যে বোধ হয়, একমাত্র ভারতবর্ষই আন্তর্জাতিক নীতিতে অপরের প্রতি অসৌজন্য এড়াইয়া চলিতে চায় এবং যদি সে বুঝিতে পারে, অন্যভাবে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব, তবে অপর জাতির সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিতে চাহে না। এক্ষেত্রে স্যার আজিজুল ভারতের পক্ষে যাহা প্রশংসার কথা বলিয়াছেন, আমরা কিন্তু তাহাকে ততটা প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখিতে পারি না; আমরা তাহাকে দুর্বলতা বলিয়াই মনে করি। আমরা বুঝি, এক্ষেত্রে ভারতের বৃহত্তর স্বার্থ-বুদ্ধিই জাগ্রত হয় নাই; তাই নিজে দুর্বল বলিয়া সে প্রবলের মতে সায় দিয়া চলিতে বাধ্য হয়; ইহা সৌজন্য নহে—এবং ইহা প্রশংসার বস্তু নয়; পক্ষান্তরে ইহা ঘৃণ্য। ভারতবাসীদের মনে সমগ্রের জন্য এই স্বার্থবুদ্ধি যাহাতে জাগ্রত না হয়, সেজন্য

ব্রিটিশ রাজনীতিকদের মস্তিষ্ক নিরন্তর সঞ্চালিত হইতেছে। তাঁহারা ব্রিটিশ শাসনের মহিমা কীর্তনের দ্বারা ভারতবাসীদের রাষ্ট্রীয় স্বার্থবুদ্ধিকে সুপ্ত রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন। বাঙলার ভূতপূর্ব গভর্নর লর্ড রোণাল্ডশে, অধুনা লর্ড জেটল্যান্ড বহুদিন পরে এই মতে [illegible] হইয়াছেন। তিনি সম্প্রতি লণ্ডনের [illegible] ইণ্ডিয়ার ক্লাবে বলিয়াছেন—

"[illegible] ভারতীয় জাতি যাহাতে মহান্ ব্রিটিশ [illegible] সংঘের অংশীদার হইতে পারে, ব্রিটেনের ভারত শাসনের ইহা লক্ষ্য। আমার ন্যায় যাহারা দীর্ঘকাল এই উদ্দেশ্যে সর্বান্তঃকরণে কার্য করিয়াছেন, তাঁহারা যখন দেখিতে পান যে, ভারতবাসীদের মধ্যে কতক লোক ব্রিটিশের এই লক্ষ্য সাধনের বিরুদ্ধতায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন তাহারা বড়ই ক্লেশ পান। ভারতের রাষ্ট্র-সাধনার বিরাট সমুজ্জ্বল সৌধে ফাটল ধরিবার এবং তাহা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইবার গুরুতর আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। মিঃ গান্ধী এবং মিঃ জিন্না এই দুই ব্যক্তি ভারতের ঐক্যের অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছেন। ইহাদের উভয়েরই দলবল খুব ভারী। ইহারা যতদিন পর্যন্ত ভারতের দুইটি প্রধান শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিবেন, আমার মনে হয়, ততদিন পর্যন্ত ব্রিটিশের সঙ্গে মীমাংসার কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু অনেকে নীরবে এবং নিভৃতে যাহাতে এই মীমাংসা সম্ভব হয়, সেজন্য এবং বিরোধের ভাব হ্রাস করিবার নিমিত্ত কার্যে প্রবৃত্ত রহিয়াছে। ই'হারা সাফল্য লাভ করিবেন কিনা, তাহা ভবিতব্যের উপর নির্ভর করিতেছে।

লর্ড জেটল্যান্ড মনেপ্রাণে সাম্রাজ্যবাদী। তিনি লর্ড কার্জনের সুযোগ্য শিষ্য। আর্যাবর্তের অন্তর বিশ্লেষণে তাঁহার দার্শনিক দৃষ্টি যতই থাকুক, তাঁহার মনের গোপন কোণ হইতে ব্রিটিশের স্বার্থ-বুদ্ধি সেজন্য একটুও শিথিল হইবে না, ইহা আমরা ভাল করিয়াই জানি; কিন্তু গান্ধীজী এবং মিঃ জিন্নাকে তিনি এক্ষেত্রে একসঙ্গে জুড়িলেন কেন, ইহাই আমাদের বুদ্ধির অগম্য; কারণ, মিঃ জিন্না তো মনে-প্রাণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদেরই সমর্থন করিয়া আসিতেছেন; অবশ্য রাজনীতিক প্রীতির গতি অতি সূক্ষ্ম।

স্বার্থ স্বার্থ সদা এই রব

রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশ্বপ্রেম, মানব-প্রীতি বা স্বাধীনতা এসব উচ্চ দার্শনিকতার বড় বড় কথা না তোলাই ভাল। দক্ষিণ আফ্রিকার অর্থসচিব মিঃ হফ্‌মেয়ার সম্প্রতি কেপটাউনে এক সভায় রাজনীতি ক্ষেত্রে খৃষ্টীয় ধর্মের আদর্শের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বেশ স্পষ্ট করিয়াই ইহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন—

শ্বেতাঙ্গ জাতিরা স্বার্থের দায়েই ভারতবাসী-দিগকে দক্ষিণ আফ্রিকায় লইয়া আসে এবং পুনরায় তাহারা নিজেদের সেই স্বার্থের দায়েই ভারতীয়দিগকে এই দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ভারতীয়দিগকে যদি তাহারা এদেশে রাখিতে সম্মত হয়, তবেও স্বার্থের জন্যই তাহা করিবে। এই এক বৎসরের মধ্যেই আমরা কি দেখিতেছি ভারতীয় সমস্যা নাটালে আজ যে আকার ধারণ করিয়াছে, প্রিটোরিয়া চুক্তিতে তাহার সুন্দরভাবে সমাধান করা হইয়াছিল; কিন্তু শ্বেতাঙ্গ জনসাধারণের অসহিষ্ণুতার জন্য সে চুক্তি ধ্বংস হইয়াছে। আমাদের ইতিহাসের ইহা একটি দুরপনেয় কলঙ্কস্বরূপ।

দুর্বল জাতি রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে সবল হইয়া না উঠিলে শুধু সদিচ্ছা বা অনুকম্পার প্রভাবে পরস্পরের মধ্যে স্বার্থ-সঙ্গতি ঘটা সম্ভব হইতে পারে না। প্রবলের সদিচ্ছা দুর্বলকে পীড়াই দেয়। রয়টারের একটি খবর পড়িয়া এ কথাটা বিশেষ কারণে আমাদের মনে পড়ে। ইংলণ্ডের ব্রাইটন স্কুলে শিক্ষকতা করিবার জন্য একজন ভারতবাসীকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। স্কুল কমিটির অন্যতম সদস্য কাপ্তেন বি ডব্লিউ হলম্যান এই নিয়োগের প্রতিবাদ করেন। বিলাতের 'ইভনিং স্টার' পত্রের টিপ্পনীকার এ সম্বন্ধে লিখিতেছেন—

ভানডিন সেকেণ্ডারী স্কুলে একজন ভারত-বাসীকে পরীক্ষামূলকভাবে শিক্ষক নিযুক্ত করা হইয়াছিল। কাপ্তেন হলম্যান এই নিয়োগের প্রতিবাদ করেন, ব্রাইটনের শিক্ষা কমিটি যে তাঁর প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়াছেন, ইহাতে আমি আনন্দিত হইয়াছি। এক্ষেত্রে কাপ্তেন হলম্যান ভারতবাসীদের সম্বন্ধে যে গ্লানিকর মন্তব্য করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায়, তখনই তাহার প্রতিবাদ হওয়া সত্যই উচিত ছিল। ভারতবাসীরা বিগত মহাযুদ্ধের সময় পশ্চিম সীমান্তে বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম করে, লর্ড কিচনার সেজন্য তাহাদিগকে কিরূপ উচ্চ সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিতেন, সেকথা কাপ্তেন সাহেবকে স্মরণ করাইয়া দিলে ভাল হইত। এই সঙ্গে লিবিয়ার মরুভূমিতে এবং ইতালীতে ভারতীয় সৈন্যদের বীরত্বের সম্বন্ধে জেনারেল আলেকজেণ্ডার এবং ফিল্ড মার্শাল মণ্টগোমারী কেমন উচ্চ ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন, তাহাও জানাইয়া দিলে হইত। বর্ণ বৈষম্য লইয়া মাতিয়া থাকিবার সময় গ্রেট ব্রিটেনের নাই। আমরা সে বৈষম্য দূর করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ব্রাইটন এক্ষেত্রে কার্যকর পন্থা নির্ধারণে পথ প্রদর্শন করিল। ব্রাইটনের ছেলেদিগকে শিক্ষা-দান করিবার জন্য কোন ভারতবাসী শিক্ষককে আমন্ত্রণ করিলে তাঁহাকে কিছু অনুগ্রহ করা হয় না। এক্ষেত্রে তাঁহার বিশেষ ক্ষমতাই বিচার্য; তাঁহার মুখের বর্ণ কিরূপ এ বিচার অপ্রাসঙ্গিক।

আমাদের মনে আছে, পরলোক-গত মিঃ সি এফ এণ্ড্রুজ বলিতেন, ভারতবাসীদের প্রতি সুবিচারের কথা বলিতে গেলেও ব্রিটিশের মনে বৈষম্যের একটা সংস্কার সূক্ষ্মভাবে কাজ করে। যতদিন পর্যন্ত ভারতবাসীরা স্বাধীনতা লাভ করিবে না, ততদিন উভয়ের মধ্যে সমদৃষ্টি স্বাভাবিক হইবে না। ভারত-বাসীদের প্রতি সমদৃষ্টির প্রয়োজন সম্বন্ধে ইভনিং স্টারের টিপ্পনীকার যেসব সুপারিশ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে মহামতি এণ্ড্রুজের সেই উক্তির সঙ্গতি প্রতিপন্ন হইতেছে।

বৈষম্যের কারণ বিশ্লেষণ

স্বার্থ বিচার রাজনীতির মূলে থাকিবেই এবং ধর্মের বা নীতির দোহাইতে তাহা কাটে না। শুধু সমাধিকারের ভিত্তিতে এ সমস্যার নিরসন হইতে পারে। সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার নাটাল ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি মিঃ এ এল কাজী কেপটাউনের একটি বক্তৃতায় বর্ণবৈষম্যের মূলগত মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি বলেন—

"বিভিন্ন জাতির গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকার না করার ফলেই বর্ণবৈষম্য দেখা দেয়। ভারতীয়দের বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গগণের এবং শ্বেতাঙ্গগণের সম্বন্ধে ভারতীয়দের বৈষম্যগত ধারণার মূলে এই মনস্তাত্ত্বিক সত্য নিহিত রহিয়াছে। যতদিন পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় ও শ্বেতাঙ্গদিগকে এক সঙ্গে থাকিতে হইবে, অথচ উভয়ের রাষ্ট্রগত সমানাধিকার স্বীকৃত না হইবে, ততদিন এ বৈষম্য থাকিবেই। কিন্তু এই বৈষম্যের ঢেউটা প্রবলের দিক হইতে, অর্থাৎ যাহাদের হাতে অধিকার থাকে, তাহাদের দিক হইতেই আসে। ভারতীয়দের নিকট হইতে ইহা উদ্ভূত হয় নাই; শ্বেতাঙ্গদের মনোবৃত্তি হইতেই এই ভেদবুদ্ধি উদ্গত হইয়াছে। শ্বেতাঙ্গ-গণ যে রাষ্ট্রীয় অধিকার নিজেরা লাভ করিয়াছে, ভারতীয়দিগকে তাহা হইতে বঞ্চিত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং তাহারা ভারতীয়গণের মর্যাদাবুদ্ধিতে আঘাত করিয়াছে। অধীন জাতির মধ্যে রাষ্ট্রীয় চেতনার যতই জাগরণ ঘটে, ততই তাহাদের মনে বিক্ষুব্ধ মর্যাদার পথে প্রবলের বিরুদ্ধে এই ভেদ দৃঢ় হইয়া উঠে। শ্বেতাঙ্গগণ দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী-দিগকে যে দৃষ্টিতে দেখে, ভারতীয়দিগকে সে দৃষ্টিতে দেখে না। দক্ষিণ আফ্রিকার খাস বাসিন্দাদের সম্বন্ধেও শ্বেতাঙ্গগণের মনে বৈষম্যের ভাব আছে; কিন্তু সে ভাব অনেকটা হীনরূপে দেখিবার ভাব এবং সে ভাবের সঙ্গে কতকটা করুণা বা স্নেহ মিশ্রিত থাকে; পক্ষান্তরে ভারতীয়দিগকে তাহারা হীনভাবে দেখিলেও, ভারতীয়েরা শ্বেতাঙ্গ জাতির স্বার্থে আঘাত করিতে পারে, এই আশঙ্কা লইয়া তাহারা ভারতীয়দিগকে দেখিয়া থাকে; এজন্য এক্ষেত্রে বর্ণবৈষম্য সমধিক, উগ্র এবং বিষাক্ত।"

ভারতবর্ষের সম্বন্ধে রায়

প্রকৃতপক্ষে স্বার্থহানির এই আশঙ্কার অনুপাতে বিদ্বেষবুদ্ধি দৃষ্টিকে দূষিত করিয়া ফেলে এবং জাতি ও ব্যক্তিকে নীচমনা করিয়া তোলে। স্বার্থরক্ষার দায়ে তখন আর সত্য মিথ্যা প্রভেদ জ্ঞান থাকে না। মিঃ বিভারলী নিকোলাসের সদ্য প্রকাশিত "ভারডিক্ট অন ইণ্ডিয়া" পুস্তকে এই মনোবৃত্তির পরিচয় নিরতিশয় জঘন্য রকমে উন্মুক্ত হইয়াছে। মিঃ বিভারলী নিকোলাস কিছুদিন পূর্বে ভারত ভ্রমণে আসেন। নয়াদিল্লীতে বড়লাটের প্রাসাদে তিনি রাজঅতিথির সম্মানে সম্মানিত হইয়া ভারতবর্ষের সম্বন্ধে বিচার করিতে প্রবৃত্ত হন। কাগজের এই দুর্দশার দিনেও নগদ নয় টাকা বারো আনা খরচ করিলে এই পুস্তক মিলিতে পারে। মিঃ নিকোলাস ভারতবর্ষে সত্যবাদী লোক বেশি দেখিতে পান নাই। তিনি লিখিয়া-

ছেন, ভারতবাসীদের মধ্যে খাঁটি সত্যবাদী লোক যাঁহাদের সংগে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে একজনও হিন্দু আছে কিনা সন্দেহ! তিনি বলেন,—'এখানে মিথ্যা সূক্ষ্ম কলার স্থান অধিকার করিয়াছে, সোজাসুজি মিথ্যা বলা, ঘুরাইয়া মিথ্যা কথা বলা, আকারে ইংগিতে মিথ্যা উক্তি, ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির ইহাই রীতি।' কিন্তু এই সাধু লেখক কতটা সত্যবাদী, শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনা হইতেই তাহা বুঝা যাইবে। তিনি লিখিয়াছেন—

"দার্জিলিঙের নিকট উঁচু পাহাড়ের উপর শান্তিনিকেতন অবস্থিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুমান ৪০ বৎসর পূর্বে ইহা প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাকে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু সে উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত হয় নাই; তবে তাঁহার ভ্রাতা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এতদিনে ইহাকে একটি আর্ট স্কুলে পরিণত করিয়াছেন। অবশ্য যদি আপনার এমন ধারণা থাকে যে, ঠাকুর জগতের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি এবং মিলটন এবং গোটের সংগে তাঁহার নাম করা চলে, তবেই শান্তিনিকেতনে যাইবার জন্য আপনার ইচ্ছা হইবে। কিন্তু আপনি যদি আমার মতাবলম্বী হন অর্থাৎ যদি আপনি মনে করেন যে, ঠাকুর একজন অমায়িক প্রকৃতির সামান্য কবি ছিলেন মাত্র এবং তিনি নিজে স্বীকার না করিলেও ইয়েটের কাছে তিনি বিশেষভাবে ঋণী; তাহা হইলে আপনি নিশ্চয়ই দূরেই থাকিবেন। যদি আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার ইচ্ছা আপনার থাকে, আমি আপনাকে অবনীন্দ্রনাথ এবং তাঁহার শিষ্যবর্গের ছবি দেখিয়া সময় নষ্ট করিতে পরামর্শ দিব না।"

ভারত গভর্নমেণ্টের প্রচারবিভাগ হইতে ভারতের হিতার্থে কিরূপ কর্মতৎপরতা প্রদর্শিত হইতেছে, সেদিন ভারত গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে ভারত সরকারের সংবাদ ও বেতার-বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ জি এস বোজম্যান আমাদিগকে তাহা শুনাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "শত্রুরা জানে, গণতান্ত্রিক দেশসমূহে চিন্তা ও বক্তৃতার স্বাধীনতা রহিয়াছে এবং সে এই স্বাধীনতাকে নিজেদের অনুকূলে খাটাইতে চায়। জনগণের মনে বিশ্বাসের স্থলে সন্দেহের উদ্রেক করা তাহাদের উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্যে তাহারা প্রচারকার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে।" শত্রুদের প্রচারকার্যের জন্য আমরা চিন্তিত নহি। আমরা জিজ্ঞাসা করি, মিঃ বিভারলি নিকোলাস শ্রেণীর পরম মিত্রদের এই ধরণের ভ্রান্ত প্রচারকার্যের দ্বারা জনগণের মনে ব্রিটিশের প্রতি বিশ্বাস এবং প্রীতির ভাবই কি বৃদ্ধি পাইতেছে? মিঃ বিভারলি নিকোলাসের এই প্রচারকার্যের সম্বন্ধে ভারত সরকারের মনের কথা জানিতে পারিলে আমরা কৃতার্থ হইতাম। ভারতে যদি জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত থাকিত, তবে নিশ্চয়ই ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সম্বন্ধে এইরূপ নির্লজ্জ মিথ্যা প্রচার করিয়া ভারতবাসীদিগকে অপদস্থ করা সম্ভব হইত না। কিন্তু সাম্রাজ্য-স্বার্থের দায় বড় দায়। এখানে মিথ্যাই ধর্ম হইয়া দাঁড়ায়।

মৈত্রীর মূলে মিথ্যার গতি

পাশ্চাত্য রাজনীতিকদের তথাকথিত মৈত্রীর মর্মে মর্মে স্বার্থভীরু অপ্রত্যয় কতটা মর্মান্তিক রূঢ়তা লইয়া গুপ্তভাবে রহিয়াছে, সেদিন মিঃ চার্চিলের উক্তিতে আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি। আমেরিকার দিকে প্রেমারক্ত নেত্রে তাকাইয়া ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী বলিয়াছেন—

ইদানীং আমাদের বিরুদ্ধ সমালোচকদের মধ্যে কেহ কেহ আমাদিগকে ক্ষমতান্বেষী এই বিশেষণে ভূষিত করিতেছেন। 'ক্ষমতান্বেষী' কাহাকে বলে? আমি আমার সমুদ্র পারের কতিপয় বন্ধুকে এতটা ভালভাবে জানি যে, তাঁহাদের মনে কোনরূপে আঘাত না করিয়াও আমি খোলাখুলিভাবে সকল কথা ব্যক্ত করিতে পারি। আমি জিজ্ঞাসা করি, পৃথিবীর অন্য যে কোন শক্তির অপেক্ষা দ্বিগুণ নৌবাহিনীর অধিকার হাতে রাখা কি ক্ষমতান্বেষিতা? পৃথিবীর প্রত্যেক অঞ্চলে বিমান ঘাঁটি স্থাপন করিয়া সর্বাপেক্ষা বিরাট বিমানবহর গঠন করা কি ক্ষমতান্বেষিতা? পৃথিবীর যত সোনা নিজেদের হাতে আনয়ন করা কি ক্ষমতান্বেষিতা? যদি তাহাই হয়, তবে ক্ষমতান্বেষিতার অভিযোগ অন্তত আমাদের বিরুদ্ধে করা চলে না। বলিতে দুঃখ হইলেও আমাকে বলিতে হইতেছে যে, ঐসব ঐশ্বর্য আমাদের নাই। মার্কিন কংগ্রেসের প্রতি মিঃ রুজভেল্ট সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, ক্ষমতান্বেষিতাতে ক্ষমতারই অপব্যবহার করা হয়। আমার বিশ্বাস, এই সভায় সকল দলের পক্ষ হইতে আমি অবাধে ঘোষণা করিতে পারি যে, এই বিষয়ে আমরা সকলেই প্রেসিডেণ্টের সংগে একমত। আমরা আরও কিছু দূর আগাইয়া যাইব। আমরা বলিব, অধিকতর স্পষ্ট ভাষায় নিজেদের অবস্থার কথা বলিব। বর্তমান যুদ্ধে আমরা আমাদের সর্বস্ব খোয়াইয়াছি। যুদ্ধ যখন শেষ হইবে, তখন বিজয়ী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আমরাই সর্বাপেক্ষা বেশী দুর্বল এবং দরিদ্র থাকিব।

চার্চিল সাহেবের এই বন্ধুপ্রীতি পরে বিশ্বজনীন সাম্যের ছন্দে ব্রিটিশের সমরাদর্শের বিশ্লেষণে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—

আমরা কোন রাজ্য চাই না কোন স্থানের তৈলের খনির উপর আমাদের লোলুপ দৃষ্টি নাই; আমরা কোন বিমান ঘাঁটি দাবী করি না। আমাদের দেশ একটি প্রাচীন জনমতানুযায়ী পরিচালিত রাষ্ট্রশক্তির দেশ, আমরা আমাদের নিজেদের দেশের সীমানার মধ্যে শান্তিতে থাকিতে চাই। জগতের কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের সংগে আমরা অসংগত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইতে চাই না। আমরা আমাদের নিজেদের অধিকার লইয়া সন্তুষ্ট থাকি এবং ছোট বা বড়, অপর কোন বন্ধুভাবাপন্ন রাষ্ট্রের সুবিধা বা অধিকারে অযথাভাবে হস্তক্ষেপ না করিয়া নিজেদের অধিকার রক্ষা করিতেই আমরা প্রস্তুত থাকি। আমাদের যাহা কিছু আছে আমরা তাহা দিয়াছি, ভবিষ্যতেও দিব। আমাদের প্রতি যাহা যোগ্য সেটুক ছাড়া বিনিময়ে আমরা অন্য কিছুই চাহি না। সুতরাং আমাদের এখানে কেহ বা অন্য দেশের কেহ যেন আমাদের উদ্দেশ্যসম্বন্ধে দুরভিসন্ধি আরোপ না করেন। ব্রিটেন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্বার্থপর, ক্ষমতান্বেষী, পররাজ্য লোভী, মতলববাজ, ইউরোপে অথবা অন্যত্র সাম্রাজ্য বিস্তার করাই তাহার উদ্দেশ্য এমন অভিযোগ যিনি আমাদের বিরুদ্ধে যেখান হইতে করেন, আমি তাহা খণ্ডন করিতেছি।

মিঃ চার্চিলের নিষ্কাম কর্মসাধনার কথা শুনিয়া আমাদের মনে কয়েকটি প্রশ্ন জাগিতেছে, তাহা এই যে, গ্রেট ব্রিটেন নূতন রাজ্য বা অধিকার না চাহিতে পারে, কিন্তু যেগুলি সে হাতে রাখিয়াছে, যেসব দেশকে সে পদানত করিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধ করিতেছে, সেগুলির সম্বন্ধে কি হইবে? পরাধীন ভারত ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর এই উক্তিকে বিশ্ব-শান্তি এবং মানব-স্বাধীনতার প্রতি বক্রোক্তিপূর্ণ পরিহাসস্বরূপেই গ্রহণ করিবে।

যুদ্ধোত্তর আদর্শের মূল্য

চার্চিল শুনিতে চাহিয়াছেন, ক্ষমতান্বেষী কে? কিন্তু ক্ষমতান্বেষী কে নয়? ইহাই আমাদের প্রশ্ন। যুদ্ধের পর সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার নূতন জগৎ গঠন করিবার জন্য মিত্রশক্তি মাতিয়া উঠিয়াছেন, আমরা প্রতিনিয়ত এই



কথা শুনিতেছি। চার্চিল আর নূতন কি শুনাইলেন? এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সম্প্রতি রয়টারের প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন—

"মিত্রপক্ষের শক্তিবর্গ শান্তিকামী এবং ন্যায়পরায়ণ, এমন কথা আমি শুনিয়াছি; কিন্তু আপাতত আমি তাঁহাদিগকে ক্ষমতান্বেষী জাতি বলিয়া অভিহিত করাই শ্রেয় মনে করি। বর্তমানে তাঁহারা শক্তিমদে উদ্ধত এবং ঔদ্ধত্যবশত তাঁহারা কিভাবে বিজয়ের পর নিজেদের মধ্যে অধিকতর ক্ষমতা ভাগবাটোয়ারা করিয়া লইবেন, তাহার ব্যবস্থা করিতেই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। যাঁহারা এই যুদ্ধের মূলীভূত তথাকথিত নৈতিক আদর্শ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই, আমি তেমন হতভাগ্যদের মধ্যে একজন। কারণ দেখিতেছি, এই যুদ্ধে বিজয় লাভের পর শক্তিবর্গের একদল অপর দলের অপেক্ষা অধিক অর্থ, অস্ত্রশস্ত্র এবং সংগতির

অধিকারী হইবে; সুতরাং মানবতার মৌলিক ভিত্তিতে এক্ষেত্রে শান্তি আসিবে না। এমন বিজয়ের সম্বন্ধে আমি বিশেষ উৎসাহ বোধ করিতে পারি না।"

এই দিকেই বাতাস ঘুরিতেছে। সেদিন 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সংবাদদাতা ত্রিশক্তির ভাবী সম্মেলন সম্বন্ধে, আলোচনা করিয়া পার্লামেণ্টের শ্রমিক সদস্য মিঃ ডি এন প্রিটের অভিমত আমাদিগকে জ্ঞাপন করিয়াছেন। যুদ্ধোত্তর ভারতে ব্রিটিশ নীতির সম্বন্ধে মিঃ প্রিট বলেন--

"ভারতবর্ষকে **ইহা আমাব বলা বা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হইবে না যে, গ্রীসের ন্যায় সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ যেখানে জড়িত, সেখানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সহজে পরাজয় মানিবে না; ভারতবর্ষ ইহা ভাল করিয়াই জানে।"**

মিঃ প্রিটের উক্তি সর্বাংশেই সত্য। ভারতবর্ষ শুধু ব্রিটিশের মতলবই জানে না; মিত্রশক্তির যুদ্ধোত্তর নীতির শেষ পরিণতি কি, সে তাহাও কল্পনা করিতে পারে। সে জানে, আমেরিকাও একদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষেই যোগ দিবে।

ত্রিশক্তির স্বার্থ-সংঘাত

রাজনীতিকদের বিশ্বপ্রেমের বুলির বালুচড়াতে বিভিন্ন শক্তির অন্তরের স্বার্থের ফল্গুধারা দিন দিন ক্ষীণ না হইয়া বরং উত্তরোত্তর বেগবতী গতি লাভ করিতেছে। এ সম্বন্ধে হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রের লণ্ডনস্থ নিজস্ব প্রতিনিধি সম্প্রতি লিখিয়াছেন---

"ত্রিশক্তির মধ্যে ঐক্যের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িতেছে, এই লক্ষণ দেখিয়া ব্রিটেন ভীত এবং ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। যে কোন রকমে হোক বর্তমান ঐক্য সুদৃঢ় করিতে সে সংকল্পবদ্ধ হইয়াছে। এই সঙ্গে সে নিজকে পশ্চিম ইউরোপের গুরু বলিয়া জাহির করিবার লোভও ছাড়িতে পারিতেছে না। গ্রীসের সম্বন্ধে যাঁহারা চার্চিলের নীতির সমর্থক, তাঁহাদের ধারণা এই যে, লোকে তাঁহাব নীতির যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিবে; কিন্তু সত্য এক্ষেত্রে বিপরীত হইয়াই দাঁড়াইতেছে। গ্রীসের ব্যাপারের ফলে মিঃ চার্চিল যুদ্ধ নেতা হিসাবে তাঁহার জনপ্রিয়তা হারাইয়াছেন। অন্য ক্ষেত্রেও তাঁহার বর্তমান মতিগতি জনগণের অন্তরে গুরুতর চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে ভারতের কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে: গ্রেট ব্রিটেন ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছাতে হোক ভারতের রাজনীতিক বন্দীদিগকে ক্রমিক ভাবে মুক্তিদানের নীতির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে এবং দুই এক দিনের মধ্যেই হোক কিংবা ত্রিশক্তির বৈঠকের পূর্বে—যে কোন সময়ে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এবং অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যদি মুক্তি লাভ করেন, তবে তাহা আশ্চর্যের বিষয় হইবে না। গ্রেট ব্রিটেন ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য পুনরায় তাহার অভিপ্রায় অভিব্যক্ত করিবে কেহ কেহ এইরূপ মনে করিতেছেন; যদি সত্যই এইভাবে কোন কাজ হয়, ক্রীপস প্রস্তাব অপেক্ষা তাহা সম্পূর্ণ নূতন রকমের হইবে এবং সে সম্বন্ধে খুঁটিনাটির বিষয় লইয়া এখনও বিবেচনা চলিতেছে। কিন্তু বিশেষ আশাশীলতা পোষণ করা সঙ্গত হইবে না এবং **বৈপ্লবিক রকমের কিছু ঘটিবে, ইহা মনে** করা বিপজ্জনক হইবে। **ব্রহ্ম, মালয় এবং** অন্যান্য অধিকার সম্পর্কে কি ব্যবস্থা হইবে, এবিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রীয় অছিগিরির কথা উঠিয়াছে। এসব প্রস্তাবের উত্তর গ্রেট ব্রিটেনের তরফ হইতে এক এবং তাহা এই যে, আমরা কিছুই করিব না, যেসব রাজ্য আমাদের দখলে আছে, সেগুলি আমরা হাতছাড়া হইতে দিব না।"

দেখিতেছি, মার্কিন যুক্তরাজ্যে হটস্প্রিংয়ে প্রশান্ত মহাসাগর সমস্যা সম্পর্কে যে বৈঠক হইয়া গিয়াছে, তাহাতে মার্কিন প্রতিনিধিগণ স্পষ্ট ভাষাতেই বলিয়াছেন যে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় রাষ্ট্রসমূহ এবং ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁহাদের নীতি এই হইবে যে, তাঁহারা পররাজ্য গ্রাসের উদ্যমকেই শুধু বাধা দিবেন কিন্তু বর্তমান রাজনীতিক অবস্থার পরিবর্তন সাধনে হস্তক্ষেপ করিবেন না। সুতরাং এসব বিশ্ব-শান্তির পরিকল্পনায় আমাদের স্বার্থ কিছুই নাই।

পরিবর্তন বিরোধী মনোভাব

স্বাধীনতা আন্দোলনের অনুকূলে ভারতের জাতীয় শক্তি জাগ্রত হয়, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ইহা চাহেন না; কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দিতে তাঁহাদের অস্বীকৃতির মূলে সেই যুক্তিই রহিয়াছে। সেদিন নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতিস্বরূপে মিঃ ফজল ইলাহী কুরবান সেকথা বলিয়াছেন। তিনি বলেন----

"ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের শক্তিকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে গভর্নমেণ্ট তাঁহাদের নীতি প্রযুক্ত করিতেছেন এবং সেই নীতির ফলেই মৌলানা আজাদ, পণ্ডিত নেহরু প্রভৃতি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও আমাদের শ্রমিক-নেতারা বন্দীভূত হইয়াছেন। আমি ভারতের সকলের পক্ষ হইতে এই নীতির তীব্র প্রতিবাদ করিতেছি। আমাদের মধ্যে রাজনীতিক বিষয়ে মতভেদ যেমনই থাকুক না কেন, নেতাদের মুক্তির বিষয়ে সকলেই একমত; কারণ বর্তমান রাজনীতিক সমস্যার সমাধান তাঁহাদের মুক্তির উপরই নির্ভর করিতেছে। দেশ আজ তাঁহাদিগকে নিজেদের মধ্যে চায়, আজ বাহিরে তাঁহাদের প্রয়োজন; স্বাধীনতার শক্তিকে সংগঠিত করিবার জন্য তাঁহাদের প্রয়োজন; বুভুক্ষা এবং ক্ষুধার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবার জন্য তাঁহাদিগকে প্রয়োজন; বাঙলার উৎসাদিত গ্রামসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য তাঁহাদের প্রয়োজন; কেরল বিহার এবং ভারতের অপরাপর অংশের মহামারী ও দুর্ভিক্ষ-বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদের প্রয়োজন। ভারত গভর্নমেণ্ট তাঁহাদিগকে মুক্তি দিতে চাহেন না; ইহা অস্বাভাবিক কিছু নয়; কারণ সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতিকগণ ভারতের অচল সমস্যাকে নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির সুযোগরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা রাষ্ট্রীয় নেতাদিগকে মুক্তি দিতে ভয় পাইতেছেন; তাঁহাদের এই ভয় যে, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ঐকান্তিক ভারতের স্বাধীনতা দাবীর সম্মুখীন হইতে হইবে। আজ আমরা জাতীয় গভর্নমেণ্ট দাবী করিতেছি; কারণ আমরা বেশ বুঝিয়াছি যে, সেই গভর্নমেণ্টই আমাদিগকে বাঁচাইতে পারে। আমরা যতই দৃঢ়তার সঙ্গে এই দাবী করিতেছি, কর্তৃপক্ষ **ততই ভীত হইতেছেন; কারণ তাঁহারা জানেন, জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে ভারতে তাঁহাদের স্বার্থসাধনের শেষ সম্বল নষ্ট হইবে।"**

সুতরাং ভারতের **স্বাধীনতার পথে** বাধাবিঘ্ন এখনও অনেক **রহিয়াছে।** সাম্রাজ্যবাদীরা সহজে নিজেদের ঘাঁটি ছাড়িবে না; এবং সংগ্রামও অবশ্যম্ভাবী।

পরমুখাপেক্ষিতার মূল্য

ভারতের স্বাধীনতার জন্য ভারতবাসীকেই সংগ্রাম করিতে হইবে। সেদিন ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বক্তৃতায় মাদ্রাজের ভূতপূর্ব কংগ্রেসী মন্ত্রী মিঃ ভি ভি গিরি স্পষ্ট ভাষাতেই এ কথাটা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন—

"এ বিষয়ে কাহারও দ্বিমত নাই। আমরা সকলেই জানি, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতের ব্যাপারে তাঁহাদের ক্ষমতা ছাড়িতে প্রস্তুত নহেন; পক্ষান্তরে তাঁহারা এই দেশের উপর তাঁহাদের সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব দৃঢ় করিতেই চেষ্টা করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় প্রকৃত স্বাধীনতা যদি আমরা লাভ করিতে চাই, তবে অপর কোন জাতির সাহায্যে আমরা তাহা লাভ করিতে পারিব না। আমাদেরই নিজেদের চেষ্টায়, নিজেদের শৃঙ্খলায়, ঐক্য এবং সংহতি-বলে আমাদিগকে তাহা লাভ করিতে হইবে। ব্রিটিশ স্যোসিয়ালিস্টদের বহুবিধ ঘোষণা আমি দেখিয়াছি। তাঁহারা বলেন যে, তাঁহারা ভারতের স্বাধীনতার পক্ষ সমর্থন করেন; কিন্তু আমার বিশ্বাস এই যে, চার্চিল পরিচালিত ব্রিটিশ সংরক্ষণশীল দল ও ইংলণ্ডের শ্রমিক দলের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নাই।"

যুদ্ধোত্তর জগৎ ও ভারত

সম্প্রতি অন্ধ্র প্রাদেশিক ছাত্র কংগ্রেসের সভাপতিস্বরূপে শ্রীযুত এন জি রঙ্গ আয়ার যুদ্ধোত্তর জগতে ভারতের জন-আন্দোলনের সম্ভাব্যতার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন---

"সাম্রাজ্যবাদ এবং **ফ্যাসিস্টবাদ এই দুইয়ের** বিরুদ্ধেই **সংগ্রাম** চালাইতে হইবে; ভারত সে সংগ্রামে জগতের সকল অত্যাচারিত, পীড়িত জাতির নেতৃত্ব করিতে **অগ্রসর হইয়াছে। অধীন জাতিসমূহ যদি অহিংসভাবে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, তবে শুধু সেই পথেই সাম্রাজ্যবাদের পরাভব ঘটিতে পারে। শোষণবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ এই দুইয়ের নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে অধীন জাতিগুলিকে নিজেদের পায়ে দণ্ডায়মান হইতে হইবে এবং সংগঠিত হইতে হইবে। মহাত্মা গান্ধী এই আন্দোলনের ভাষা এবং ভঙ্গী দান করিয়াছেন। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাঁহার ধর্ম সংগ্রামের ধারণা, দরিদ্রনারায়ণের সেবাকে ভিত্তি করিয়া জনসাধারণের সমস্যা সমাধানে তাঁহার প্রদর্শিত পথ এবং তাঁহার নির্দেশিত কিষাণ-মজদুর-প্রজারাজের বৈপ্লবিক এবং গণতান্ত্রিক আদর্শ রাজনীতিক জগতে অবিলম্বে অগ্নিময় উদ্দীপনা সঞ্চারিত করিবে এবং অধীন দেশসমূহের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামকারীদিগকে অনুপ্রাণিত করিবে।"**

সত্যই সমগ্র জগৎ এক বিরাট **বিপ্লবের সম্মুখীন হইয়াছে** এবং সে **বৈপ্লবিক** বেদনার অবদানে ভারতের স্থানও সামান্য **হইবে না। ভারতের মুক্তির উপরই বিশ্ব-মানবের মুক্তি নির্ভর করিতেছে।**



চৌকিদারের চাপ আর ডাকবাক্স, গ্রামের এইটুকুই শুধু আভিজাত্য। আর রানার আসে হাটবারে।

নইলে, আগে যেমন পাড়াগাঁ ছিল, এখনো তেমনি পাড়াগাঁ। জলা বাঁওড় আর ধানখেত। হঠাৎ এক একটা দাড়ায় বা ডাঙা জায়গায় বসবাস।

উত্তর পাড়া আর দখিন পাড়া। মানে ভদ্র পাড়া আর চাষাপাড়া।

ভদ্রপাড়ার পাঠশালা। চাষাপাড়া থেকেও কেউ কেউ আসে পড়তে। প্রায় তিন পো রাস্তা ধুলো-কাদা ভেঙে। তাদের মধ্যে হলধরই প্রথম ছাত্র।

আরো ছিল কয়েকজন। মাহিষ্য আর ক্ষীরতাঁতি। তারা আগেই পালিয়েছে। শুধু হলধরই নাম-দস্তখৎ পর্যন্ত ছিল। নাম সই করতে পেরেই ভাবল, ঢের হয়েছে। এখন আর কেউ বোকা পেয়ে বুড়ো আঙুলের মাথা ধরে টিপ-সই করিয়ে নিতে পারবে না। কলম ছুঁইয়ে ঢেড়া-সই করার জোচ্চুরি থেকে সে রেহাই পাবে।

বুঝে-সুঝে ধীরে-সুস্থে সে সই করে। সই করে নানান জায়গায়। দলিলের কানিতে, জবানবন্দির নিচে, হাতচিঠার মবলগবন্দিতে।

দস্তখৎই করতে পারে, কিন্তু পড়তে পারে না আগাগোড়া। বললে, ইস্কুল খুলব। আমাদের নিজেদের ইস্কুল। আগে বলত চাঁড়াল, এখন হয়েছি তপশিলী। আমরা চাষবাস করছি করি, কিন্তু আমাদের ছেলেরা চাকরি করবে।

দখিন পাড়ায় ইস্কুল বসল।

হোক ওদের পাকা দালান, আমাদের মাটির ঘরই ভাল। থাক ওদের পেটা-ঘড়ি, আমাদের ক্যানেস্তেরা পিটিয়েই চলবে। ব্ল্যাকবোর্ডে দরকার নেই, আমাদের তালের পাতাই যথেষ্ট।

চলল আকচাআকচি। চলল ছেলে-ভাঙানো।

তবু দুটো ইস্কুলই টিকে রইল কোনো-রকমে।

কিন্তু অন্যভাবে বদল ধরল চেহারায়। ভদ্রপাড়ায় জঙ্গল গজাতে সুরু করল। আশ-শেওড়া, কেয়োঠুঁটি, ভাঁট আর শেয়া-কুলের ঝোপ। ঢোলকলমি, মরিচা আর তেলাকুচার লতা। ঝোপঝাড়ের মাঝে হাড়-গোড় বের করা দুএকখানা কুঁড়ে ঘর। পাকা ইমারত যা দুএকখানা আছে, ঝরে ঝরে পড়ছে। জঙ্গলে-আগাছায় এত অন্ধকার, এক ঠাঁই থেকে আরেক ঠাঁইয়ে যেতে ভয় করে। থানা-সই হতে হয়।

দখিন পাড়ায় খোলা মাঠ, অঢেল ধানখেত। ঠান্ডা সবুজে চোখ জুড়িয়ে যায়। বাড়ির হাতায় কলা-কচুর বাগান। গোয়াল-ঘর। পোয়ালকুঁড়।

ভদ্রপাড়া পড়তি। চাষাপাড়া উঠতি। চাষা এখন চাষী হয়েছে, হয়েছে অনেক সম্ভ্রান্ত। আর ভদ্ররা হয়েছে বেকার, বাউন্ডুলে।

চাষাপাড়ার ইস্কুলে আরো উন্নতি হয়েছে। আগে তালপাতার ছিল, এখন হয়েছে খড়ের ছাউনি। ভেলকো বাঁশের খুঁটি। ক্যানেস্তেরার বদলে ঘণ্টা। চ্যাটাই ছেড়ে ছেলেরা এখন মাদুরে বসছে। মাস্টারের মাইনে বেড়েছে আট আনা।

যাই হোক, নেই ওদের বেঞ্চি-চেয়ার, নেই ব্ল্যাকবোর্ড, নেই বা প্লোব-ম্যাপ। ভদ্রপাড়ার ইস্কুল নাক উঁচিয়ে থাকে। বলে, গো-বদ্যির পাঠশালা। ইস্কুল বলতে পর্যন্ত স্বীকার হয় না।

চলছে এমনি টেক্কাটেক্কি—দেশে শিক্ষা-কর বসল। এলেন ইনস্পেক্টর।

ভদ্রপাড়ার দিকে আঙুল তুলে বললেন, 'চলবে না ও-ইস্কুল।'

'কিন্তু দখিন পাড়ারটা?'

'ওটাও না।'

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, এক গ্রামে একটার বেশি ইস্কুল থাকতে পারবে না। দুই ইস্কুল মানেই দুই দল, চলবে না আর কলহ-কচকচি। তাছাড়া, দুই স্কুলকে খয়রাতি করবার মত ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের পয়সা নেই।

'বেশ তো, এক ইস্কুলই যদি রাখতে হয়, আমাদেরটাই থাকুক।' ভদ্রপাড়ার কে বললে, 'এটাই হচ্ছে সবচেয়ে পুরানো। পাকা বাড়ি, বেঞ্চি-চেয়ার, ঘড়ি-ঘণ্টা—সবদিক দিয়ে এরই হক-হকিয়ত বেশি। তাছাড়া এর গা ঘেঁসেই নলকূপ—ছেলেরা জল খেতে পারে। নতুন যে কোনো জায়গায় ইস্কুল বসাবেন, কম-সে-কম হাজার টাকা খরচ। বাড়ি চাই, আসবাব চাই, নলকূপ না হলেও পুকুর চাই জল খাবার। চাই রাস্তাঘাট। অত জুটবে কোত্থেকে?'

যুক্তিগুলোকে এক কথায় হটিয়ে দেয়া যায় না। ইনস্পেক্টর সেদিক দিয়ে গেলেন না। বললেন, 'পাশেই যে ঠাকুরের থান।'

পাশেই কালীতলা। রক্ষাকালী। গাঁয়ে যখন মড়ক লাগে তখনই পুজো হয় মহানিশায়। তাও কচিৎ-কদাচিৎ।

তাহলে কি হয়, পাঁচ জাতের ছেলে নিয়ে ইস্কুল, সবাইর মন বাঁচিয়ে চলতে হবে। যে রক্ষা করবে সেই যদি অরক্ষণীয়া হয়ে ওঠে সেটা খুব শান্তির ব্যাপার হবে না।

'ঠিক, ঠিক।' হলধর-মহীধররাও উলটো দিকে তরফদারি করতে লাগল।

পঞ্চাশ বছরের উপর এই ইস্কুল। পঞ্চাশ বছরের উপর এই ঠাকুরের জায়গা। শেষ-কালে তোরাও উলটো গাইলি? তুই হরি ঘড়ুই? তুই অঘোর কয়াল তুই রামতারণ দুয়ারি?

একটা জিনিস অনেকদিন ধরে চলছে বলেই চিরকাল চলবে এমন কোনো কথা নেই। তাহলে আর মহাজনী আইন হত না, হত না ঋণশালিসী। তবে চিরকালই ওরা ফোঁত-ফেরার হয়ে থাকত। তাই না?

'তবে ইস্কুল হবে কোথায়?' তিক্ত গলায় ভদ্রপাড়া জিগগেস করলে।

'আমাদের দখিনপাড়ায়।' ফুর্তিতে উজিয়ে এল তপশিলীরা।

না, তাও না। দখিন পাড়ার ইস্কুলটা একেবারে এক টেরে। ওখানে হলে ভদ্র-পাড়ার ছেলেরা অসুবিধেয় পড়বে। ইস্কুল হবে গাঁয়ের মধ্যিখানে। প্রায় রশি মেপে। যাতে কোনো পাড়ারই না নালিশ থাকে।

ইনস্পেক্টর 'সাইট-সিলেকশন' বা স্থান নির্ণয় করলেন। চণ্ডীবাঁওড়ের ধারে। নামেই শুধু চণ্ডী। তা নিয়ে কারু আপত্তি নেই। কেননা খোদ গাঁয়ের নামই বিবি-বাজার।



চাষাভুষোরা কাস্তে দিয়ে খাগ কেটে কলম বানালে।

দড়ি ধরে সমান-সমান মাপতে গেলে ইস্কুল এনে বসাতে হয় ধানখেতের উপর, বিলের মধ্যে। তাই, উপায় না দেখে ইনস্পেক্টর ভদ্রপাড়ার দিকেই একটু আলগা দিলেন। চন্ডীবাঁওড়ের ধার ভদ্রপাড়ার সীমানায়।

কোনো পাড়াই খুশি হলো না। তবু অন্যের ইস্কুলটা চালু হলো না বলে দু' পাড়াই খুশি হলো।

যে জায়গাটা ঠিক করা হয়েছে সেটা নিবারণ বোস গয়রহের। তারা পাঁচ শরিক। অংশ নিয়ে ঝগড়া। একেক বছর একেক জন উপরিস্থ মালেকের ঘরে খাজনা দেয় আর ভর্তবোর মামলা করে। তবু আলসেমি করে আপোষে বা আদালতে কিছুতেই বাঁট করে নেয় না।

বিবাদী জমি—দিয়ে দিক ইস্কুলের কাজে, ভদ্রপাড়া ধরল গিয়ে বোসেদের। এ রাজি হয় তো ও রাজি হয় না ; ও রাজি হয় তো এ সেলামি চায়। তাছাড়া, জমিতে কোল-রায়ত আছে, হলধর-মহীধরদের জাতকুটুম—হিরেলাল মিদ্দে আর নন্দলাল সানাইদার। চাষাপাড়ার পরামর্শে তারা জমি ছাড়তে চায় না। খাজনা পাওনা আছে বকেয়া, উৎখাতের নালিশ করে দিলেই হয়। তবু বোসেরা উঠে বসতে চায় না। গাঁয়ে একটা ইস্কুল হলেই বা কি, উঠে গেলেই বা কি! কে আবার যায় ও সব নালিশ-ফয়শলার মাঝে!

'কই গো বাবুরা, জমি কি হল' চাষা-পাড়া ব্যস্ত হয়ে এসে জিগগেস করে।

'এই হচ্ছে—' বাবুরা কান চুলকোয়।

'তোমরা অনেক নেকাপড়া শিখেছ তোমরা সবুর করতি পাব, আমরা পারি না।' চাষাপাড়া ঘোঁট বাঁধল।

এ-জমি ছেড়ে ও-জমি, চন্ডীবাঁওড় ছেড়ে কালীবাঁওড়, কোথাও ভদ্রলোকেরা জমি পেল না। বিনা মুনফায় সূচাগ্র মেদিনী দান করতে কেউ প্রস্তুত নয়।

দখিন পাড়ার দিকে ষষ্ঠী আঁটুলির খাদাড় পড়ে আছে, তারই উপর চাষাপাড়া ঘর তুললে। দোচালা ঘর। বললে, 'এই আমাদের ইস্কুল।'

এই আমাদের ইস্কুল। চাষাভুষোরা কাস্তে দিয়ে খাগ কেটে কলম বানালে।

'ঠাকুরদের বললাম, দেই সুতো গেড়ে, ঠাকুরেরা তা শোনলেন না।' হলধর বললে মুরুব্বির মতঃ 'কেবল নিজেদের কোলে ঝোল টানবে। তখন বললাম উমেচরণের ভিটেয় একখানা দোচালা তুলে দিই! তা হবে কেন, তাতে ভটচাজ্জি মশায়ের ক্ষেতি হবে যে। সব শালা বিটলে। বাবুদের ক্ষেমতা কত বুঝেছি। ওদের ন্যাজ ধরে আর থাকব না। ঘর একবার খাড়া করতে পেরেছি, আমাদের এখন পায় কে। আমাদের দিকে ফজু মিয়া আছে, রজবালী আছে, মোমরেজ আছে—কারুর আমরা আর তোয়াক্কা রাখি না।'

'ষষ্ঠীর সঙ্গে একটা নেকাপড়া করে নিলে হত না?' কে একজন টিপ্পনি কাটল।

'নেকাপড়া না আরো কিছু! ষষ্ঠী যদি কিছু হেন্ডাপেন্ডা করে তবে তার গলা টিপে সাত হাত জিব বা'র করে ফেলব। কি রে ষষ্ঠী, গোলমাল করবি নাকি?'

ষষ্ঠী সামনেই ছিল, লজ্জিতের মত মুখ করে বললে, 'আমি কি ভদ্দর-লোকের মত ছোটলোক?'

ফজলে রহমান হল ইস্কুলের প্রেসিডেন্ট।

আর হলধর বললে বুক ফুলিয়ে, 'আমি ভাই-প্রেসিডেন্ট।'

গ্রামের মধ্যে প্রথম অবৈতনিক স্কুল। একেই স্বীকৃতি দিলেন ইনস্পেক্টর।

ভদ্রপাড়ার টনক নড়ল। ইনস্পেক্টরকে গিয়ে ধরে পড়ল, 'সেই যখন মধ্যিখানেই ইস্কুল হল না, তখন আগের মত দুটো ইস্কুলই চলুক না। ওরা নতুন করেছে করুক, আমাদের পুরোনোটাও বেঁচে উঠুক।'

'দুটো স্কুলকে গ্র্যান্ট দেবার মত পয়সা নেই।'

'নেই তো, ঐ বেজায়গার ইস্কুলকেই বা দেবেন কেন?'

'আপনারা পারলেন না, ওরা পারল, ওদেরই তো দেব একশোবার। ঠিক মধ্যিখানে না হলেও একেবারে সীমানায় হয়নি। দু' পাড়ার ছেলেরাই বেশ আসতে পারবে।'

তর্ক করা বৃথা। তাই ভদ্রপাড়া ধরল গিয়ে ষষ্ঠী আঁটুলিকে। বললে, 'উকিল-মুহুরীর কিছু লাগবে না তোর, সে এক নম্বর মামলা ঠুকে। অদানে-অব্রাহ্মণে যাবে অমন জমিটা!'

ষষ্ঠী চোখ পাকিয়ে বললে, 'খবরদার, ইদিক এসো না বলে দিচ্ছি। ওসব মন্দ কথায় আর কান দিচ্ছি নে। অনেক ন্যাকরা করেছ, আর লয়।'

ফুটো বেলুনের মত চুপসে গেল সবাই। উপায় কি।

উপায় ফের সেই ইনস্পেক্টরকেই ধরা। তাঁকে বোঝানো, এক ইস্কুলে সমস্ত গাঁয়ের সমান সুবিধে হবে না। উত্তর পাড়া দূরে পড়বে, ঠকবে। দাঁড়ায়-দাঁড়ায় বসবাস, মাঝখানে বাদা-বাঁওড়—গ্রামের যেরকম অবস্থিতি, দু' অঞ্চলে অনায়াসে দুটো ইস্কুল চলতে পারে। সরকার থেকে দুটো ইস্কুলকেই গ্র্যান্ট দেয়া উচিত।

ইনস্পেক্টর নরম হলেন। বললেন, 'জমি পেয়েছেন?'

'পেয়েছি। বোসেরা এতদিনে রাজি হয়েছে।'

এ উত্তর শুনবেন আশা করেননি ইনস্পেক্টর। বললেন, 'বেশ, সমস্ত গাঁয়ের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় ইস্কুলের জন্যে দরখাস্ত দিন, বিবেচনা করব।'

দরখাস্ত লিখে তার উপর সই নেয়ার হিড়িক পড়ে গেল।

সমস্ত গাঁয়ের পক্ষ থেকে। তাই চাই মুসলমান ও তপশিলীদেরও সই দরকার।

ভাগ্যধর মাঝি ইস্কুলের 'ছেরকট' বা সেক্রেটারি। সে বললে, 'তা—আমরা এট্টা ইদিকি করিছি, তোমরা—আপনারা এট্টা ওদিকি করবা, তাতে আমাদের কি? করতি পার কর। আমরা ওর মদ্দি নেই।'

'গ্রামে দুটো ইস্কুলই তো ছিল। সেই দুটোই যদি আবার হয়, তবে লোকসান কি?'

'নোকসান? তোমরা আমাদের পাঠ-শালাটা খাবা, তারই ফন্দি আঁটছ। আগে তো আমরা বলেলোম তোমাদের ইস্কুলডাই



ষষ্ঠী চোখ পাকিয়ে বললে, 'খবরদার ইদিক এসো না বলে দিচ্ছি—'



রহমান একগাল হেসে বললে,—'সই করতি শিখলাম কবে?'

হোক, তোমরা ঠাকুররা তা ফেংসে দিলে। এখন সাউগাড়ি করতে আসেছ। ওসব হবে-টবে না। তোমাদের ইস্কুল তোমরা দ্যাখবা, আমরা আমাদ্দের দ্যাখব। তখন ঘরখানা বাঁধবার জন্যি কত ব্যাগত্তা করেলাম, বাবু-দের ম্যাজাজ কি! আর এখন আমরা নিজিরা যেই এট্টা খাড়া করেছি—গা জবালা করতি লেগেছে।'

'তোমাদের ইস্কুল তো আমাদেরও ইস্কুল।' ভদ্রপাড়া পিঠে হাত বুলোয় ঃ 'আমাদেরটাও তোমাদের। গোটা কতক সই জোগাড় করে দাও।'

'ও-সব সই-সাবুদে আমরা নেই। আমাদের কমুটি আছে। সেই কমুটি যা বলবে তাই হবে।'

'আচ্ছা, বেশ তো, তোমাদের কমিটি আজ ডাক, আমরাও থাকবোখন।'

'কনে বসবা?'

'ভটচাজ্জি বাড়ি।'

'আচ্ছা বলে দেখি আর সব মুরুব্বি-দের। যদি রাজি হয়, যাবনে।'

'যাবোখন নয়। যেয়ো ভাই লক্ষ্মীটি।' ভদ্রপাড়া প্রায় পায়ে হাত বুলোয়ঃ 'দরখাস্তটা শিগগিরই দাখিল করতে হবে।'

'হেঁ-হেঁ ঠাকুর, তোমাদের তাড়া আর আমাদের তাড়া এক নয়। বুঝলে?' ভাগ্যধর অদ্ভুত করে হাসল ঃ 'সে দিনকাল আর নেই। তোমাদের চোল আমরা বুঝি।'

ভাগ্যধর হলধরের বাড়ি গেল। হলধর দাবায় উবু হয়ে বসে তামাক খাচ্ছে। সব শুনলে আগোগোড়া। চুপ করে রইল।

'ভদ্দরলোকেরা যাতি বলতেছে। যাবি?' জিগগেস করলে ভাগ্যধর।

'হেঁ-হেঁ, তুই লে-সে।' হলধর ঘৃণায় ঝংকার দিয়ে উঠল ঃ 'কি করতি যাবি? কেবল কথা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে বলবে'নে, আমরা কিছুই জবাব দিতি পারব না। তলে-তলে কাজ গুছিয়ে নেবে।'

ভদ্রপাড়া ফজলে রহমানের বাড়ি গেল। রহমান এক গাল হেসে বললে, 'সই করতি শিখেলোম কবে?'

'তবে অন্তত টিপ সই দাও।'

'ভাতের হাঁড়ি নামাতে গিয়ে বুড়ো আঙুল দুটো পুড়ে গেছে।' রহমানের দুটো আঙুলেই ন্যাকড়ার টিপলি।

অন্তত ভাই-প্রেসিডেণ্টের সই হলেও খানিক মান থাকে। গেল সবাই হলধরের বাড়িতে।

'শুধু একটা দস্তখৎ দে, হলধর।'

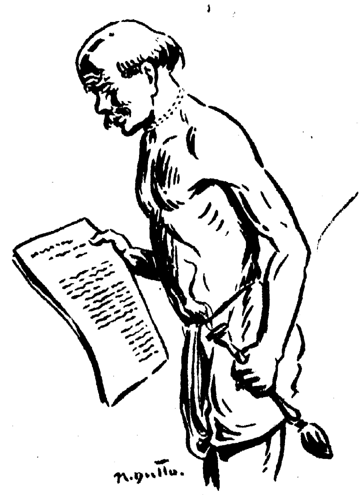
হলধর ঝিম মেরে রইল। শুধু একটা দস্তখৎ। তার নামের দস্তখৎ।

দারোগা এজাহারে সই করে। হাকিম রায়ে সই করে। লাটসাহেব সনদে সই করে। তেমনিই আজ তার দস্তখতের দাম।

'যে ইস্কুল তোকে দস্তখৎ করতে শিখিয়েছে সেই আবার নতুন করে তৈরি হচ্ছে, হলধর—' ভদ্রপাড়া কায়দা করে কথা ছুঁড়ল।

'কই দেখি দরখাস্তটা।'

উলটে-পালটে দেখতে লাগল হলধর। বললে, 'কিছুই পড়তি পাচ্ছি না যে।'



কিছুই পড়তি পাচ্ছি না যে

'পড়বার কিচ্ছু দরকার নেই। শুধু দস্তখৎ করে দে।'

হলধর হাসল। অশিক্ষিত বটে, কিন্তু বড় জ্ঞানীর হাসি। বললে, 'এতদিনে, এত বচ্ছর ধরে শুধু নাম-দস্তখৎটাই শিখোয়েছ। পড়তি শেখায়োনি কাঁচকলা। পড়তি শিখলেই যে সব ধরে ফ্যালব। তাই জোর করে রেখোছ কেবল অন্ধকারে।'

'বেশ তো, তোমাকে পড়িয়ে শোনাচ্ছি।'

'শোনা কথায় আর বিশবাস নেই ঠাকুর। আমার ছেলে গেছে আমাদের ইস্কুলে। নেকাপড়া শিখে আসুক সে লায়েক হয়ে। তখন সে পড়ে দেখবেনে দরখাস্ত। আমার বদলে তখন সেই সই করে দেবেনে। তদ্দিন থাক এটা আমার ঠেঙে। কি বল আপনারা?'

হলধর দরখাস্তটা সযত্নে ভাঁজ করতে লাগল। ভাঁজ করে গুঁজে রাখল চালের বাতায়।

আসিবার কথা ছিল

শ্রীকরুণাময় বসু

ছায়ামগ্ন ঝাউবনে দীর্ঘশ্বাসে বাড়ে দীর্ঘরাত,
হিমেল উত্তর বায়ু ঝাপটিছে রুদ্যমান পাখা;
আসিবার কথা ছিল, তাই মোর হৃদয়-বলাকা
শূন্যে খোঁজে লুপ্ত বাণী, বক্ষে লাগে বিদ্যুৎ আঘাত।
কুসুম অঙ্কিত পথে স্বর্ণ দিন লয়েছে বিদায়,
বসন্ত-বাসর-সন্ধ্যা দীপ্ত হল চাঁদের প্রদীপে;—
মেঘের নিশ্বাস লেগে সেই আলো জবলে আর নিভে,
বুকের সমুদ্র দোলা অন্ধকারে গুমরে বৃথায়।
আসিবার কথা ছিল, পথভোলা হে চির পথিক
তোমার বাউল মন ফিরিয়াছে দেশ-দেশান্তরে;
চির অনির্বাণ দীপ জবালিয়াছ অশান্ত অন্তরে,
একটি স্ফুলিঙ্গ তার মোর প্রাণে দাহ এনে দিক্।
নির্দয় নির্মেঘ পথে যাত্রীদল চলিয়াছে জানি,
তৃষার্ত বিশীর্ণ ঠোঁটে যুগান্তের অব্যক্ত পিপাসা;
তুমি কি এসেছ আজ, ওগো বন্ধু, দিলে ভালোবাসা,
দেছ কি তৃষ্ণার বারি, মৃত্যুহীন বরাভয় বাণী।
দিগন্তে বিদ্যুৎ রেখা, মেঘময় পশ্চিম গগন,
অভিসার লগ্ন এই, এস বন্ধু, আর কতোক্ষণ।

ইতিহাস ও সংস্কৃতি

ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

"ইতিহাস", অর্থাৎ "ইতি হ আস"—'এমনটি পূর্বে ছিল';—অতীতকালের কথা লইয়া ইতিহাস। অতীতকালের কাহার কথা? অতীতের মানুষের কথা। মানুষ ছাড়া অন্য জীব বা অন্য বস্তুর কথা, বিভিন্ন বিজ্ঞানের পর্যায়ে পড়ে; যেমন পৃথিবীর উৎপত্তি ও পূর্ব ইতিহাস লইয়া ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদের কথা লইয়া উদ্ভিৎতত্ত্ব, জীবের উৎপত্তি ও বিকাশ লইয়া জীবতত্ত্ব। মানুষের উদ্ভব ও প্রাচীনকালে মানুষের সভ্যতার ও সমাজের বিকাশ যে শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়, তাহা হইতেছে নৃতত্ত্ব বা নৃবিজ্ঞান। মানুষকে লইয়া যাহা কিছু ঘটিতেছে, মানুষ একা বা মিলিতভাবে যাহা কিছু করিয়াছে ও করিতেছে, সে সমস্তকেই ব্যাপকভাবে নৃতত্ত্ব বা নৃবিজ্ঞানের অধীনে ফেলা যায়। নৃবিজ্ঞানের ক্ষেত্রের মধ্যে আসে, মানুষের দেহের, ও আবেষ্টনী অনুসারে মানুষের প্রকৃতির, আলোচনা; মানুষের উদ্ভব, ও বিভিন্ন প্রকার মানুষের প্রসারের আলোচনা; মানুষের সমাজের ইতিহাস; ও সমাজ-তত্ত্ব, অর্থনীতি, রাষ্ট্রতত্ত্ব, শিল্প ও সংস্কৃতি, ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি মানব-ধর্মের প্রকাশভূমি যাহা কিছু জগতে বিদ্যমান। এই দৃষ্টিতে ইতিহাস (অর্থাৎ সুপ্রাচীন, প্রাচীন ও সাম্প্রতিক অতীতকালে সঙ্ঘবদ্ধ মানুষ যাহা করিয়াছে তাহার কথা) নৃতত্ত্ব বা নৃবিজ্ঞানের মধ্যেই আসে। সমাজতত্ত্ব ও অর্থনীতি ইতিমধ্যে Human Sciences বা মানব-বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে; কার্যকারণাত্মক ঘটনাবলীর আলোচনা বলিয়া ইতিহাসকেও তেমনি Human Sciences-এর মধ্যে একটা বড় স্থান দিতে হয়। ভাষাতত্ত্বও তেমনি Human Sciences-এর পর্যায়ে গৃহীত হইবার মত আর একটি বিজ্ঞান।

যাহা হউক, "ইতিহাস"-এর ক্ষেত্র এখন একটু বেশ ব্যাপকভাবেই ধরা হয়—জাতির সর্বাঙ্গীন সংস্কৃতির বিকাশের কথা তাহার ইতিহাসের মধ্যেই আজকাল গৃহীত হইয়া থাকে। আগে ইতিহাস বলিতে রাজা-রাজড়ার কথা, রাজাদের ও অন্য শাসকবর্গের কীর্তি ও কৃতিত্ব, রাজাদের সন তারিখ এবং রাজাদের রাজত্বের কালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া বড় বড় ঘটনার তারিখ ও বিবরণ—লোকে এইটুকুই বুঝিত। এখন আমরা জানি, এ-সব ঠিক বা পুরা ইতিহাস নহে, এসব হইতেছে ইতিহাসের কঙ্কাল। রাজার রাজত্বকাল, সন তারিখ—এ-সবকে আশ্রয় করিয়া তবে ইতিহাসের গতি বা ধারা বুঝা যায়, কিন্তু সমগ্রভাবে জাতির লোকদের প্রগতির আলোচনা, ইহাই হইতেছে সত্যকার ইতিহাস। সুতাকে অবলম্বন করিয়া যেমন মিছরির দানা বাঁধে, তেমনি সন তারিখ ও বিভিন্ন রাজার রাজত্বের সূত্রকে ধরিয়া কোনও মানব-সমাজের বিকাশের কথা পৌর্বাপর্যক্রমে আলোচনা করিতে পারা যায়। কোনও জাতির বা মানব সমাজের ইতিহাস হইতেছে, তাহার সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস।

"সংস্কৃতি" শব্দটি ইংরেজী Culture-এর প্রতিশব্দ হিসাবে বাঙলায় এখন বেশ



চলিতেছে। Civilisation বা "সভ্যতা" বলিলে আমরা ব্যাপকভাবে উৎকর্ষপ্রাপ্ত বা উন্নত মানব-সমাজের বহিরঙ্গ—তাহার উন্নত জীবনযাত্রাপদ্ধতি, তাহার সামাজিক রীতিনীতি, তাহার রাষ্ট্রনীতি, তাহার রূপশিল্প, বাস্তুশিল্প, পূর্ত, সাধারণভাবে তাহার সাহিত্য ও ধর্ম, এইসব বুঝি; এবং Culture বা সংস্কৃতি বলিলে বুঝি—তাহার উন্নত জীবনের অন্তরঙ্গ বস্তুগুলি—তাহার আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবন, তাহার সামাজিক জীবনের সৌন্দর্যময় প্রকাশ; তাহার সাহিত্য ও সৌন্দর্যবোধ;—তাহার বাহ্য সভ্যতার আভ্যন্তর প্রাণবস্তু যাহা, মুখ্যত তাহাই বুঝি। সভ্যতা-তরুর পুষ্প যেন সংস্কৃতি। "সংস্কৃতি" এই শব্দটি প্রাচীন ভারতে প্রযুক্ত হইত—ব্রাহ্মণ গ্রন্থে আমরা এই "সংস্কৃতি" শব্দ পাই—'যাহার দ্বারা কোনও বস্তু সংস্কৃত অর্থাৎ মার্জিত বা উন্নত হয়' তাহাই "সংস্কৃতি"। ইংরেজী Culture শব্দের ধাতুগত ব্যুৎপত্তি ধরিয়া, অন্বর্থক সংস্কৃত ধাতুজাত শব্দ "কৃষ্টি" শব্দ, আমরা Culture-এর প্রতিশব্দরূপে বাঙলায় ব্যবহার করিতেছিলাম, কিন্তু এই "কৃষ্টি" শব্দ রবীন্দ্রনাথের পছন্দ হয় নাই—বেদে "কৃষ্টি" মানে Tribe বা People অর্থাৎ জাতি বা জন বা জনগণ, এইজন্য তাঁহার আপত্তি ছিল। কিন্তু আমার ভূতপূর্ব ছাত্র কৃষ্ণনগর কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীযুত দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন যে, অর্বাচীন সংস্কৃতে-বৌদ্ধ সংস্কৃতে—"সভ্যতা" বা "সংস্কৃতি" অর্থে "কৃষ্টি" শব্দের প্রয়োগ ছিল এবং ইহার সমধাতুক শব্দ "উৎকর্ষ", উন্নতি-অর্থে সংস্কৃতে ও ভাষায় সুপ্রচলিত। সভ্যতার অন্তরঙ্গ দিক বুঝাইবার জন্য বাঙলা ভাষায় "সংস্কৃতি" শব্দ কত পূর্বে এবং কোথায় প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছে জানি না। আমি এই শব্দ ১৯২২ সালে প্রথম মারাঠীতে প্রযুক্ত দেখি, এবং তখন হইতে আমি রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন লাভ করিয়া বাঙলাতে ব্যবহার করিতেছি; নিজ দ্যোতনা-শক্তির বলে, এবং রবীন্দ্রনাথের অনুমোদনের সঙ্গে সঙ্গে, এই সুন্দর শব্দটি সহজেই বাঙলা ভাষায় সর্বজন-গৃহীত হইয়া গিয়াছে। দুই একজন বাঙালী মুসলমান লেখক "সংস্কৃতি"র বদলে আরবী "তমদ্দুন" শব্দ বাঙলায় চালাইতে চাহিতেছেন। "তমদ্দুন" কিন্তু ঠিক 'সংস্কৃতির' মত সূক্ষ্মভাবে সভ্যতার অন্তর্নিহিত মানসিক সৌরভ বা তদনুরূপ কিছুর দ্যোতনা আনে না; ইহা Civilisation অর্থাৎ নগরে যে সভ্যতা ও নাগরিকতা গড়িয়া উঠে (লাতীন civis নাগরিক, civilis নাগরিক-সম্বন্ধীয়, civitas নগর শব্দ হইতে জাত) তাহারই দ্যোতনা করে—"তমদ্দুন" শব্দের মূলে আছে "মদীনা" বা নগর। এই প্রসঙ্গে 'তমদ্দুন' শব্দটির উল্লেখ করিলাম এইজন্য যে, দুই একজন বাঙালী মুসলমান লেখক বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলমানের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিচার প্রসঙ্গে 'তমদ্দুন' শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। এতাবৎ বাঙলাদেশে যাহা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা হইতেছে মুখ্যতঃ গ্রামীণ জীবনকে আশ্রয় করিয়া "সভ্যতা" ও "সংস্কৃতি"—নগরকে আশ্রয় করিয়া "নাগরিকতা" অর্থাৎ Civilisation বা "তমদ্দুন" নহে।

যাহা হউক, বাঙালীর ইতিহাসের আলোচনা করিতে গেলে, তাহার সংস্কৃতির

আলোচনাই মুখ্যবস্তু হইয়া পড়ে। জাতি হিসাবে বাঙালীর রাষ্ট্রনৈতিক কৃতিত্ব বিশেষ লক্ষণীয় নহে। প্রাচীনকালে নিখিল ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে (সাংস্কৃতিক জীবনের কথা বলিতেছি না)—বাঙালীর আহৃত উপাদান লক্ষণীয় নহে। বাঙলা-দেশের রাজাদের মধ্যে কাহাকেও বিশেষভাবে তাঁহার যুগের বাঙালী জীবনের নিয়ন্তা বা পরিচালক বলিতে পারা যায় না—যে হিসাবে প্রাচীন গ্রীসের আথেন্স নগরীর শাসক পেরিক্লেস ও দিগ্বিজয়ী গ্রীক সম্রাট্ আলেক্সান্দর, ইংল্যান্ডের রাজা আলফ্রেড অথবা রাণী এলিজাবেথ, রুষ-দেশের সম্রাট্ পিটর, প্রাচীন ভারতের মহারাজ অশোক ও মধ্যযুগের সম্রাট আকবর, আমেরিকার রাষ্ট্রপতি এব্রাহাম লিংকন, ইঁহাদের স্ব স্ব জাতির পরিচালক বা নিয়ন্তা বলা যায়। বাঙালী অর্থাৎ বাঙলা-ভাষী জাতি নিজ বিশিষ্ট রূপ পাইতে কয়েক শতাব্দী কাটিয়া যায়; যখন বাঙালী জাতি সৃজ্যমান, তখন বাঙলাদেশ শাসিত হইত বিহার ও উত্তর-ভারত হইতে—মৌর্য ও গুপ্ত সম্রাট-দের আমলে। বঙ্গভাষী জাতির সৃষ্টির সময় হয়তো বিভিন্ন কালে এক বা একাধিক রাজা বা অন্য কোনও শ্রেণীর রাষ্ট্রনেতা এই জাতির মনের গতি এবং সমাজের প্রকৃতি নির্ধারণ করিয়া দিতে ও তাহার নিয়ন্ত্রণ করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু সেরূপ রাজা বা রাষ্ট্রনেতার কৃতিত্বের কথা মহাকাল অবলুপ্ত করিয়া দিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বাঙলাদেশেরও অধীশ্বর ছিলেন কিনা জানা যায় না; সম্ভবত অশোক বাঙলাদেশেরও সম্রাট ছিলেন এবং তাঁহার ধর্মরাজ্যের মধ্যে তাহা হইলে বাঙালী জাতির পূর্বপুরুষ নিশ্চয়ই আসিয়াছিল। অশোকের পরে বাঙলাদেশের একাংশে বাঁকুড়া জেলায় পুষ্করণার অধিপতি চক্রস্বামী বিষ্ণুর ভক্ত সিংহবর্মার পুত্র চন্দ্রবর্মার শিলালেখ পাই, কিন্তু তাঁহার নাম ছাড়া আর কিছুই জানা যায় নাই। গুপ্ত সম্রাটগণ বিহার ও মধ্যদেশ হইতে বাঙলায় রাজত্ব করিতেন। এদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ইতিহাসে আদিশূর রাজার নাম শুনা যায়। কিন্তু এই আদিশূর এখনও ঐতিহাসিকতার মর্যাদা প্রাপ্ত হন নাই। পাল বংশের প্রথম নামী রাজা ধর্মপাল একজন ক্রান্তিকারী শক্তিধর পুরুষ ছিলেন, হয়তো তাঁহার যুগেই বাঙালী জাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার অবকাশ পায়; কিন্তু সে বিষয়ে ইতিহাস নিস্তব্ধ। সেন বংশীয় বল্লাল সেন ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণের সমাজে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা আনিবার চেষ্টা করেন, তাহার ফল মধ্য যুগের বাঙালী হিন্দু সমাজে কতদূর উপকারক হইয়াছে তাহা বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়। বাঙালী হিন্দুর সমাজ নিয়ন্ত্রণে যেমন, তেমনি সমগ্র বাঙালার রাজ্য চালনে, কতকগুলি উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মণের হাত ছিল, কিন্তু সে অন্য কথা।

অন্য কোনও রাজা বাঙালী জাতির গঠনে বা পরিচালনে কোনও বড় কাজ করিতে পারিয়াছিলেন কি না, সে বিষয়ে ইতিহাস মূক হইয়াই আছে। মোগল যুগের পূর্বে তুর্কী পাঠান ও বাঙালী মুসলমান সুলতানদের আমলেও শাসকদের মধ্যে তেমন কোনও বিরাট পুরুষের উদ্ভব দেখা দেয় নাই, অন্তত তেমন কাহারও খবর না মিলিতেছে ইতিহাসে, না জীবিত আছে জনশ্রুতিতে। রাজা কাঁশ বা কংশ দনুজ-মর্দনদেব বাঙলাদেশে খৃীষ্টীয় চৌদ্দর শতকের দ্বিতীয় দশকে হিন্দু অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া সারা বাঙলায় নিজ ক্ষমতা স্থাপিত করেন, বাঙলার বিভিন্ন প্রান্তের টাঁকশালসমূহ হইতে মুদ্রিত তাঁহার বাঙলা-লিপিময় মুদ্রাসমূহ হইতে ইহা প্রমাণিত হয়; কিন্তু মহারাষ্ট্রে শিবাজী সতেরর শতকে যেভাবে মারাঠা জাতীয় জাগৃতির আবাহন করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য যে প্রকারে এখনও পর্যন্ত মহারাষ্ট্রীয় প্রজাবর্গের মধ্যে গানে ও কথায় তাঁহার কীর্তিকলাপ মুখরিত, দনুজমর্দনদেব অভাবনীয় ব্যাপার বাঙলাদেশে ঘটাইলেও তাঁহার কথা লোকের মনে ছাপ রাখিয়া যাইতে পারে নাই, ঐতিহাসিকেরাও তাঁহার ব্যক্তিত্ব নির্ধারণ করিতে গলদঘর্ম হইতেছেন। এইসব কারণে বলিতে হয়, বাঙলার ইতিহাসে রাজা-রাজড়াদের স্থান অল্প—রাজনৈতিক অপেক্ষা সাংস্কৃতিক, অভিজাতবর্গ অপেক্ষা জনসাধারণের জীবনকে ধরিয়াই ইহার মুখ্য কার্য বা বিকাশ ঘটিয়াছে।

ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশ সম্বন্ধে একথা বলা যায় না। আসাম, কেরল, গুরখা-বিজয় অর্থাৎ ১৭৬৮ খৃীষ্টাব্দ পর্যন্ত নেপাল, প্রভৃতি ভারতবর্ষের কয়েকটি প্রদেশ বা অঞ্চল, রাজনৈতিক অপেক্ষা সাধারণ সাংস্কৃতিক দিক হইতেই লক্ষণীয়। রাজপুতানা, দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগর, মহারাষ্ট্র (বিশেষ করিয়া শিবাজীর অভ্যুদয়ের পর হইতে), উৎকল (সুলেয়মান কিরানী ও তৎপুত্র দাউদ কর্তৃক উৎকল বিজয় পর্যন্ত), পশ্চিম সংযুক্ত প্রদেশ (দিল্লী-আগরা অঞ্চল)—এই প্রদেশগুলির সাংস্কৃতিক গৌরবের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা উভয়ই ছিল। ভারতবর্ষের মধ্য যুগের ইতিহাস এই-সব দেশের লোকেদের হাতেই গড়িয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতার শিবাজী-উৎসব উপলক্ষ্যে রচিত (১৩১০ সালে) তাঁহার সুবিখ্যাত কবিতাটিতে, উচ্চভাবের রাজনৈতিক, এবং শান্তিময় গ্রামীণ, এই দুই আদর্শের দ্বারা পরিচালিত মহারাষ্ট্র ও বাঙলাদেশের ভাবগত পার্থক্য ও সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যের চমৎকারভাবে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

"কোন্ দূর শতাব্দীর কোন্ এক অখ্যাত
    দিবসে   নাহি জানি আজি,
মারাঠার কোন্ শৈলে অরণ্যের অন্ধকারে
    ব'সে,   হে রাজা শিবাজী,
তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎ
    প্রভাবৎ   এসেছিল নামি'—
এক ধর্ম-রাজ্য-পাশে খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত
    ভারতে   বেঁধে দিব আমি।

সেদিন এ বঙ্গদেশ উচ্চকিত জাগে নি
    স্বপনে,   পায়নি সংবাদ,
বাহিরে আসেনি ছুটে, উঠে নাই তাহার
    প্রাঙ্গণে   শুভ শঙ্খনাদ!
শান্তমুখে বিছাইয়া, আপনার কোমল
    নির্মল   শ্যামল উত্তরী
তন্দ্রাতুর সন্ধ্যাকালে সব পল্লী-সন্তানের
    দল   ছিল বক্ষে ধরি'।

তারপরে একদিন মারাঠার প্রান্তর হইতে
                তব বজ্র শিখা
আঁকি' দিল দিগদিগন্তে যুগান্তের বিদ্যুদ্-
    বহ্নিতে   মহামন্ত্র লিখা।
মোগল উষ্ণীষ-শীর্ষ প্রস্ফুরিত প্রলয়-
    প্রদোষে   পক্বপত্র যথা,—
সেদিনও শোনেনি বঙ্গ, মারাঠার সে বজ্র-
    নির্ঘোষে   কি ছিল বারতা।

সেদিন এ বঙ্গপ্রান্তে পণ্যবিপণির এক
    ধারে   নিঃশব্দ-চরণ
আনিল বনিক্‌লক্ষ্মী সুরঙ্গ-পথের অন্ধকারে
                রাজসিংহাসন।
বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত
    করি'   নিল চুপে চুপে;
বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল, পোহালে
    শর্বরী,   রাজদণ্ডরূপে।"

কিন্তু বাঙলাদেশের সংস্কৃতিতে যে কখনও উচ্চ রাজনৈতিক আদর্শের এবং কর্মের সমাবেশ দেখা দেয় নাই, একথা বলা চলে না। তুর্কী-বিজয়ের পরে ইংরেজ আমল-পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে, নিখিল ভারতের জীবনে, বাঙালী তেমন বড় অংশ গ্রহণ করিতে পারে নাই, কিন্তু তুর্কী-বিজয়ের পূর্বে হিন্দু আমলে বাঙলাদেশ একবার অন্তত উত্তর ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে একটা সর্বোচ্চ স্থান গ্রহণ করিয়াছিল, এবং বাঙলার,গৌড়-বঙ্গের—একটা সম্মানপূর্ণ স্থান ছিল। আধুনিক ভারতের ইতিহাসে, ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামে, আধুনিক বাঙালীর—বিশেষ করিয়া বাঙালী-হিন্দুর অবদান, কি ভাবজগতে কি কর্মজগতে, সুপরিচিত, এবং সকলের দ্বারাই স্বীকৃত।

বাঙালীর ইতিহাস অর্থাৎ বাঙালীর সংস্কৃতির ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে, প্রথমেই বাঙালী জাতির উৎপত্তি ধরিয়াই আরম্ভ করিতে হয়। আজকাল সমভাষিতাকেই জাতীয়তার প্রধান লক্ষণ বলিয়া ধরা হয়। যতদিন বাঙলা ভাষার উদ্ভব হয় নাই, ততদিন বাঙালী জাতি বলিয়া একটা কিছুর কল্পনা করা যায় না। বাঙালী জনগণের পূর্বপুরুষ যখন অন্য ভাষা বলিত, তখন তাহাদের ঠিক বাঙালী বলা চলে না। টানা ও পড়িয়ান, এই দুইয়ের সূতা মিলিয়া বস্ত্র; টানা ও পড়িয়ানকে পৃথক্ সত্তায় বস্ত্র বলিয়া অভিহিত করা যায় না।

বাঙালী জনগণের গঠনে কি কি উপাদান আসিয়াছে, তাহার আলোচনা কিছু কিছু

হইয়াছে ও হইতেছে, আমিও কিছু আলোচনা করিবার প্রয়াস করিয়াছি। কিন্তু এখনও কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হয় নাই। যাহা কিছু বলা যায়, তাহা প্রধানত অনুমানের আধারে। কয়েকটি বিভিন্ন race বা জাতির সমবায়ে বাঙালী জনগণ গঠিত হইয়াছে; এবং এই গঠনকার্য আরম্ভ হইয়াছে কয় সহস্র বৎসর পূর্বে তাহা জানা যায় না। যে সকল বিভিন্ন জাতির লোকে বাঙলা দেশে আসিয়া বসবাস করিয়াছে, তাহাদের সকলের দৈহিক সমাবেশ কি রকম ছিল, তাহা ঠিকমত জানা যায় না। বাঙলায় বা ভারতবর্ষে কেনও প্রকারের মানবের উদ্ভব হয় নাই—বাহির হইতেই ভারতে মানবের আগমন হইয়াছিল। অনুমান হয়, প্রথম আসে Negrito নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু জাতীয় মানুষ, প্রাগৈতিহাসিক যুগে ইহারা আফ্রিকা হইতে স্থলপথে আরব ও দক্ষিণ ঈরানের পথে ভারতে আসিয়া পেঁছায়। বাঙলাদেশে ইহাদের কোনও চিহ্ন নাই—তবে সম্ভবত এদেশেও ইহারা আসিয়া বসবাস করিয়াছিল; আসামের নাগাদের মধ্যে ইহাদের অস্তিত্বের কিছু কিছু নিদর্শন মিলিতেছে; ইহারা হয়তো পরবর্তী জাতির লোকদের সহিত সংঘাতে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া যায় এবং ক্বচিৎ ইহারা তাহাদের মধ্যে মিশিয়া যায়। তাহার পরে আসে Proto-australoid বা "প্রাথমিক অস্ত্রালাকার " নামে অভিহিত একটি জাতি—ইহাদের ভাষার কোনও অস্তিত্ব নাই, তবে ভারতের প্রায় সর্বত্র এখনকার নিম্নশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে ইহারা মিশিয়া আছে। এই জাতির দৈহিক আকার-প্রকার সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ইহাদের পরে ভারতে এবং বাঙলাদেশে Austric ভাষী জাতি বা জনগণের আক্রমণ হয়। অস্ট্রিক জাতীয় লোকেদের আকৃতি কিরূপ ছিল, এবং কবে, কোথা হইতে, কোন্ পথ দিয়া তাহারা ভারতে আগমন করে, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু এই অস্ট্রিকভাষী লোক যে প্রায় সমগ্র ভারতময় বিস্তৃত হইয়াছিল, এবং গাঙ্গেয় উপত্যকায় তাহাদের যে বিশেষভাবে প্রসার ও উপনিবেশ ঘটিয়াছিল, এরূপ অনুমানের পক্ষে কতকগুলি যুক্তি আছে, সেগুলি ভাষাতত্ত্ব এবং সংস্কৃতিঘটিত যুক্তি। অস্ট্রিক-ভাষা এখন কতকগুলি অনুন্নত অরণ্যবাসী জাতির মধ্যে বিদ্যমান আছে—দেশের পরিস্থিতির পরিবর্তনের ফলে এইসব অনুন্নত জাতি, আর অনুন্নত এবং আরণ্য থাকিতেছে না। সাঁওতাল, মুণ্ডারী, হো, কুরকু, শবর, গদব প্রভৃতি মধ্য এবং পূর্ব ভারতের কতকগুলি ভাষা, এবং আসামের খাসিয়া ভাষা—এইগুলি অস্ট্রিকের নিদর্শন। গংগা-যমুনার দেশে ও সম্ভবত পঞ্চনদের দেশেও, অর্থাৎ উত্তর ভারতের সমতল ভূখণ্ডে, অস্ট্রিক-ভাষীরা এই অঞ্চলের এখনকার অধিবাসী, পাঞ্জাবী হিন্দী কোসলী বিহারী বাঙলা, উড়িয়া প্রভৃতি বলে এমন জনগণের মধ্যে, আত্মগোপন করিয়া আছে;—উত্তর ভারতের তথা বাঙলার অধিবাসীরা অস্ট্রিক জাতির সহিত, পরে ভারতে উপনিবিষ্ট দ্রাবিড়-ভাষী ও আর্য-ভাষী জাতি বা জনগণের মিশ্রণে জাত। দ্রাবিড়েরা পশ্চিম হইতে আসে বলিয়া বোধ হয়; তাহাদের উৎপত্তি দক্ষিণ ইউরোপের Mediterranean বা ভূমধ্যসাগরীয় জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্য হইতে। দ্রাবিড়েরা বেশি করিয়া দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম অঞ্চলে এবং দক্ষিণ ভারতেই উপনিবিষ্ট হয়, কিন্তু উত্তর ভারতের নদীমাতৃক সমতল ভূমিতেও তাহাদের বসবাস ঘটে, অস্ট্রিকদের (বা কোলদের) মধ্যে। বাঙলাদেশেও দ্রাবিড়দের আগমন ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়, এবং এখানে তাহারা অস্ট্রিকদের সঙ্গে মিশিয়া যায়। দ্রাবিড়দের পরে আসে আর্যেরা ইহাদেরও আগমন হয় পশ্চিম হইতে। আর্যেরা আসিবার পরে, ভারতে "মহামানবের মেলা" যেন পূর্ণ এবং সার্থক হইবার পথ পায়। আর্যেরা সভ্যতায়, নগর-গঠনে, বাস্তু ও অন্য শিল্পে, খুব উন্নত ছিল না। কিন্তু তাহারা ছিল কল্পনাশীল ও কৃতকর্মা জাতি। তাহারা এদেশের প্রাচীনতর দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক সভ্যতা ও সমাজনীতির আবেষ্টনীর মধ্যে পড়ে; এবং উত্তর ভারতবর্ষে যে অনার্য অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জনগণের মধ্যে নবাগত আর্যেরা উপনিবিষ্ট হয়, তাহাদের সঙ্গে ধীরে ধীরে রক্তে ও সভ্যতায় আর্যদের সংমিশ্রণ অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই সংমিশ্রণের ফলে, প্রাচীন ভারতীয় বা হিন্দু জনগণ ও হিন্দু সভ্যতার উৎপত্তি হইয়াছিল। খৃষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রকের মধ্যে; প্রথমটায় এই সভ্যতায় আর্যের আহৃত উপাদানসমূহই বিশেষ প্রবল থাকে, পরে বহু অনার্য (অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়) ভাব ও রীতিনীতি অল্পবিস্তর পরিবর্তিত আকারে দেখা দিতে থাকে; এবং ইহার ফলে, বৈদিক ও ঔপনিষদ ধর্ম ও চিন্তা এবং সভ্যতার পরে, তথাকথিত পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম ও ভাবধারা এবং এই যুগের ভারতীয় বা হিন্দু সভ্যতা, রূপগ্রহণ করে, আত্মপ্রকাশ করে। আন্তর্জাতিক সংঘাত ও সংমিশ্রণ না ঘটিলে কোনও বিশিষ্ট জাতীয় সংস্কৃতির উদ্ভব হইতে পারে না। উত্তর ভারতে এখনকার পাঞ্জাব ও সংযুক্ত প্রদেশে এবং বিহারে এইভাবে উত্তর ভারতীয় বা হিন্দু সংস্কৃতির ও জনগণের পত্তন ঘটিল—খৃষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রকের মধ্যেই। পরে ঠিক সেইভাবে বাঙলাদেশেও তাহা ঘটিল। কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলে এই মিশ্রণে, বিভিন্ন জাতীয় উপাদানের অল্পতা বা আধিক্যকে পরবর্তীকালের ভারতের নানা প্রাদেশিক সংস্কৃতির ও ভাষার প্রকৃতির পার্থক্যের একটি মুখ্য কারণ বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। কোথাও আর্য উপাদান বেশী ছিল, কোথাও বা দ্রাবিড় এবং কোথাও বা অস্ট্রিক অথবা প্রাথমিক-অস্ত্রালাকার; এবং পূর্বে আলোচিত এই কয়টি বিভিন্ন মৌলিক উপাদান ভিন্ন, হিমালয়ের দক্ষিণ অঞ্চলের প্রদেশসমূহে, উত্তর ও পূর্ব বাঙলায়, ও আসামে, আর একটি মানবীয় উপাদান ভারতের জনগণকে গড়িতে সাহায্য করিয়াছিল (বিশেষত আসামে, উত্তর ও পূর্ব বাঙলায়, ও নেপালে), এবং সেটি হইতেছে—ভোট-চীন বা মোঙ্গোল জাতির মানব। উত্তর চীন হইতে ইহাদের তিব্বতে আগমন হইয়াছিল খৃষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকের মধ্যভাগে; পরে ইহারা হিমালয় অতিক্রম করিয়া এবং আসামের পথ ধরিয়া ভারতবর্ষের উত্তরে ও উত্তর-পূর্ব কোণে উপনিবিষ্ট হয়।

এইভাবে উত্তর ভারতে ভারতীয় জনগণের উদ্ভব হইল, চারিটি বা পাঁচটি জাতির বিভিন্ন প্রকৃতির ও সংস্কৃতির মানুষের সংমিশ্রণের ফলে। এই সংমিশ্রণ সর্বত্র একভাবে হয় নাই, এবং এককালেও হয় নাই। উত্তর ভারতে এই সংমিশ্রণ কার্য পূরা হইবার পরে বাঙলাদেশে ইহার কার্যের আরম্ভ হয়। আবার উত্তর ভারতে এই সংমিশ্রণে solvent বা দ্রাবকের কাজ করিয়াছিল, আর্যের ভাষা—বৈদিক, লৌকিক সংস্কৃত এবং বিভিন্ন প্রাকৃত রূপে।

বাঙলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির কথা (অথবা সংস্কৃতির ইতিহাসের কথা) এই বার ধরা যাক। বাঙলা ভাষা তাহার আধুনিক অর্থাৎ বাঙলা রূপ গ্রহণ করিয়াছিল খৃষ্টীয় ১০০০-এর দিকে; অধুনালব্ধ প্রাচীন বাঙলার কতকগুলি নিদর্শন হইতে ইহা বেশ বুঝা যায়। উত্তর ভারতের আর্য ভাষা, উত্তর ভারতে ও বিহারে মিশ্র আর্য অনার্য জনগণের মধ্যে পরিবর্তিত হইয়া, খৃষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রকের মধ্যভাগে যে রূপ ধারণ করে, আর্য ভাষার সেই প্রাচ্য প্রাকৃতের একটি প্রকারভেদ মাগধী প্রাকৃত, সম্ভবত খৃঃ পূঃ চতুর্থ-শতক হইতে —মৌর্য রাজশক্তির বাঙলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় হইতে—বাঙলাদেশে প্রতিবেশী মগধ হইতে আগত রাজকর্মচারী বণিক, সৈনিক, ব্রাহ্মণ ভিক্ষু ও যতি এবং সাধারণ ঔপনিবেশিকগণ কর্তৃক আনীত হইতে থাকে। শতকের পরে শতক ধরিয়া যেমন যেমন এই মাগধী প্রাকৃতের পরিবর্তন মগধে হইতেছিল, বাঙলাদেশেও তেমন হইতেছিল। আর্য ভাষা বাঙলা দেশের কতকগুলি নগরে বা অন্য কেন্দ্রে প্রথমটায় বিহার ও উত্তর ভারত হইতে আগত ঔপনিবেশিকদের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে; পরে দেশের অভিজাত ও উচ্চবংশীয় লোকেদের দ্বারা এই ভাষা, রাজভাষা বলিয়া এবং শক্তিশালী উত্তর ভারতীয় সভ্যতা ও ধর্মের (ব্রাহ্মণ্য, জৈনধর্ম ও বৌদ্ধমতের) ভাষা বলিয়া সাধারণত বিনা আপত্তিতে সহজভাবে গৃহীত হইতে থাকে। আর্য ভাষার প্রতিষ্ঠার পূর্বে এদেশে কোল (অস্ট্রিক) ও দ্রাবিড় শ্রেণীর ভাষাই লোকে বলিত; এবং উত্তর ও পূর্ব বাঙলায় নবাগত ভোট-চীন বা ভোট-ব্রহ্ম গোষ্ঠীর ভাষাও কতকটা নিজ স্থান করিয়া লইয়াছিল। অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, ভোট-চীন এই বিভিন্ন জাতির মানুষকে একই ভাষাসূত্রে এবং একই

ধর্ম ও সংস্কৃতির সূত্রে বাঁধিয়া দিল, বিহারের পথ ধরিয়া আগত উত্তর ভারতের আর্যভাষা। বাঙলার অনার্য ভাষার লিপি ছিল না। লিপির শক্তিতে শক্তিশালী আর্য ভাষার যে মর্যাদা প্রথম হইতেই বাঙলাদেশে আর্য ভাষাকে মহীয়সী করিয়া তুলিয়াছিল, সে মর্যাদা এদেশের অনার্য ভাষার ভাগ্যে ঘটে নাই। তদ্ভিন্ন লিখিত বা পুস্তকনিবন্ধ শাস্ত্র লইয়া ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম যখন বাঙলায় আসিল এবং সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ পুরোহিত-শ্রেণী, বৌদ্ধ ভিক্ষু, সংঘ ও জৈন যতিগণের চেষ্টায় রাজ-শক্তির সহায়তায় ও আদর্শবাদী প্রচারকের উৎসাহে বলীয়ান আর্য ধর্ম তাহার তিনটি প্রধান রূপ লইয়া বাঙলায় অনার্য জনগণের মধ্যে যখন দেখা দিল, তখন আর্য ভাষা ও আর্য ধর্মের গতিকে প্রতিরোধ করিতে পারে, এমন কিছু বাঙলার অনার্য জগতে ছিল না। বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন প্রকারের ধর্ম তাহাদের মধ্যে ছিল বলিয়া অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় (ও পরে ভোট-চীন) জাতির লোকেরা ছিল খণ্ড ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত; তাহাদের মধ্যে ঐক্যের বা যোগসূত্রের অভাব ছিল এবং এই সব অনার্য জাতির পুরোহিত বা ধর্ম-নেতারাও সম্ভবত উত্তর ভারতের সমন্বয়াত্মক এবং উচ্চ কোটির দার্শনিক চিন্তায় সমুজ্জ্বল ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ আর্যধর্মের প্রতিস্পর্ধী কিছু তাহাদের পিতৃপুরুষ হইতে প্রাপ্ত আদিম-প্রকৃতির ধর্মানুষ্ঠান ও totemistic অর্থাৎ পিতৃপুরুষ রূপে কল্পিত পশু বা উদ্ভিদের কাহিনীর সহিত জড়িত পুরাণ-কথা হইতে প্রাপ্ত হয় নাই। আর্যভাষা ও আর্যধর্মের জয় এইভাবে সহজেই ঘটিয়াছিল। ধীরে ধীরে দেশের লোকেরা আর্যভাষা গ্রহণ করিতে থাকে, প্রাকৃতের প্রতিষ্ঠা হয়; এবং দলে দলে ব্রাহ্মণ পুরোহিত সংস্কৃত ভাষা এবং শাস্ত্র লইয়া বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আসিয়া বাস করিতে থাকেন—গুপ্ত যুগ হইতেই ভূমিদান করিয়া ব্রাহ্মণ বসানো একটা রীতিমত কার্যক্রম হিসাবে যেন গৃহীত হইতে থাকে। চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন খৃষ্টীয় ৪০০-র দিকে ভারতে তীর্থদর্শন উপলক্ষ্যে আসেন, তাঁহার ভ্রমণ কথা হইতে বুঝা যায় যে, ঐ সময়ের মধ্যে বাঙলাদেশে আর্যভাষা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। এবং তাম্রলিপ্তি বা তমলুকের মত স্থান এদেশে বৌদ্ধজ্ঞানের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে হিউএন্-ৎ-সাঙ্ বঙ্গদেশে আসেন, তাঁহার বর্ণনা পাঠে মনে হয়, সারা বাঙলা-দেশ তখন আর্যভাষী হইয়া গিয়াছিল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙলার সুবিখ্যাত পাল রাজবংশের অভ্যুদয় ঘটে; মনে হয়, সেই সময়ে অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোট-চীন জাতীয় লোকেরা উত্তর ভারতের ও বিহারের আর্যভাষী ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে সমভাষী হইয়া যাইবার ফলে এক ভাষার সূত্রে গ্রথিত একটি বিশিষ্ট nation বা জনগণ-এ পরিণত হইয়া ছিল। সমভাষিতাকে আশ্রয় করিয়া কিন্তু nationhood অর্থাৎ জাতীয়তা বা একরাষ্ট্রিকতার ধারণা তখন পৃথিবীতে কোথাও দেখা দেয় নাই—ভারতেও নহে। **(ক্রমশ)**

নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন

নারায়ণ চৌধুরী

বড়দিনের ছুটিতে কিম্বা ঠিক তার অব্যবহিত পরে কল্‌কাতায় সঙ্গীত-সম্মেলনের অনুষ্ঠান একটি নিয়মিত বাৎসরিক ঘটনায় পরিণত হ'তে চলেছে। বিগত ৫ই জানুয়ারী থেকে ১০ই জানুয়ারী পর্যন্ত ছয়দিন এবারেও সেই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হ'য়ে গেছে। তবে অন্যান্য বারের অনুষ্ঠানের সঙ্গে বর্তমান অনুষ্ঠানের তফাৎ আছে। এ বৎসর যে অনুষ্ঠানের আয়োজন হ'য়েছিল তা স্মৃতি-সম্মেলন—অল বেঙ্গল মিউজিক কন্-ফারেন্সের প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধ সঙ্গীতপ্রচারক লোকান্তরিত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের স্থায়ী স্মৃতিরক্ষাকল্পে গেলো বৎসর যে বার্ষিকীর সূচনা হয়েছে এটি তারই দ্বিতীয় সাম্বাৎসরিক অনুষ্ঠান।

ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বাঙলাদেশে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রচারের জন্য যা ক'রে গেছেন তার তুলনা হয় না। কিছুকাল আগে পর্যন্ত বাঙলায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তেমন ব্যাপক সমাদর ছিল না। সমাদর যতোটুকু ছিল তা শুধু পর্যাপ্ত-অবসর ভোগস্পৃহ মুষ্টিমেয় ধনী জমিদারদের মধ্যেই; জনসাধারণ সে সঙ্গীতের কখনও নাগাল পায়নি। ধনী-গৃহের দরদালানের অভ্যন্তরে বেলোয়ারি ঝাড়লণ্ঠনের তলায় তাকিয়া-ফরাস বিছানো মেঝেতে বৈঠকী গানের যে অফুরন্ত স্রোত বয়েছে, জনসাধারণ শুধু আঙিনায় দাঁড়িয়ে তার ছিঁটেফোঁটাই পেয়েছে, তাদের অধিকার এর বেশি আর কোনোকালে প্রসারিত হয়নি।

কিন্তু ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ এসে মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। তিনি দরদালানের গানকে বাইরের মুক্ত অঙ্গনে বহন ক'রে নিয়ে এলেন; যা ছিল মুষ্টিমেয়ের ভোগের জিনিষ তাকে ক'রলেন সর্বসাধারণের ভোগ্য। এখন থেকে আহারের আস্বাদন শুধু গন্ধগ্রহণের মধ্যেই নিবদ্ধ রইলো না; জনসাধারণ খাবার চেখেও দেখতে আরম্ভ করলে। এই ব্যাপক প্রচারের সবটুকু কৃতিত্ব না হোক অন্তত অনেকখানিই একা ভূপেন্দ্রকৃষ্ণের প্রাপ্য। তিনিই প্রথম ১৯৩৪ সালে ভারতের বিভিন্ন সঙ্গীতকেন্দ্র থেকে প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞদের কল্‌কাতায় আনিয়ে প্রকাশ্য কন্‌ফারেন্সে সর্বসাধারণকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শোনবার সুযোগ দিলেন। আজ যে সাধারণ্যে হিন্দু-স্থানী সঙ্গীত সম্পর্কে অভাবিত উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে সেটা মুখ্যত তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টার ফলে সম্ভব হ'তে পেরেছে। সঙ্গীতপ্রচার ছিল তাঁর জীবনের প্রধান করণীয় ব্রত—সঙ্গীতকে বাদ দিয়ে যে জাতীয় শিক্ষা সর্বাঙ্গীন হ'তে পারে না এটা মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন ব'লেই তিনি অমন নিষ্ঠার সহিত সঙ্গীত প্রচারের দিকে ঝুঁকেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি সে-ব্রত সম্পূর্ণ উদ্‌যাপিত ক'রে যেতে পারেন নি; মৃত্যু এসে তাঁকে তার আগেই ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

কিন্তু তাঁর সাধনা যে ফলপ্রসূ হ'তে আরম্ভ করেছে আলোচ্য সম্মেলনের প্রতি জনসাধারণের ঐকান্তিক আগ্রহ দেখেই তার খানিকটা আন্দাজ পাওয়া যায়। সম্মেলনে ধনীরাই যে শুধু সবগুলি আসন অলংকৃত করেছিলেন তা নয়, জনতার প্রতিনিধিও তাতে অনেক ছিলেন। অল ইন্ডিয়া মিউজিক কংগ্রেসের বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে সামান্যই বেরিয়েছে, তবু দলে দলে লোক প্রচারের অপেক্ষা না রেখেই সম্মেলনে ছুটে এসেছে। আরও আশ্চর্য, একাদিক্রমে ছয়রাত—এবং তাও সারারাত—গান শুনেও কেউ খুব বেশি ক্লান্তিবোধ করেন নি। এতে এই শুধু বোঝায় যে ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ যে জিনিষটি চেয়েছিলেন ঠিক তাই হ'তে

চলেছে—জনসাধারণ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে ক্রমেই আপনার ব'লে ভাবতে সুরু করেছে। এবং তাকে আয়ত্ত করবার প্রচেষ্টা করছে। এইসব বিবেচনায় আমাদের মনে হয় শুধু মাত্র সঙ্গীতপ্রচারকরূপেই নয়, জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম পৃষ্ঠপোষকরূপেই ভূপেন্দ্রকৃষ্ণের মর্যাদা হওয়া উচিত। অল ইন্ডিয়া মিউজিক কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ তাঁর উপযুক্ত সম্মাননার ব্যবস্থা দ্বারা একটি সত্যিকারের কাজ করেছেন। এবারকার কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেছেন স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ। সম্মেলনের উদ্বোধন করবার কথা ছিল শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর—কিন্তু তিনি অসুস্থতাবশত উপস্থিত হ'তে পারেন নি।

এ ছাড়া আরও অনেক মান্য গুণীজন সম্মেলনের সহিত সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। এই থেকেই সম্মেলনের গুরুত্ব ও আয়োজনের ব্যাপকতা খানিকটা ধারণা করা যায়।

এবারকার অনুষ্ঠানে ভারতের প্রসিদ্ধ গুণী প্রায় সকলেই আহূত হ'য়ে এসেছিলেন। এমন ব্যাপক গুণীসম্মেলন ইতিপূর্বে আর কোন কন্‌ফারেন্সে হয়েছে বলে আমরা জানি না। গীত, বাদ্য ও নর্তন—সঙ্গীতকলার এই ত্রিবিভাগেই বহু বিখ্যাত গুণীর সমাবেশ হ'য়েছিল। অনুমান হয় সহযোগী শিল্পীসহ প্রায় তিনশত শিল্পী এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের ভেতর অবশ্য স্থানীয় শিল্পীও ছিলেন, তবে এখানকার সবসেরা শিল্পীদেরই শুধুমাত্র গ্রহণ করা হ'য়েছিল। কণ্ঠসঙ্গীতের ক্ষেত্রে গুণীসম্মেলন হ'য়েছিল প্রায় অভাবনীয়—তবলার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। যন্ত্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে গুণীর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম ছিল, তবে শিল্পনৈপুণ্যের দিক থেকে তাঁদের কারও কারও কৃতিত্ব প্রায় অন্য সবার কৃতিত্বকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ছয়দিনে সবশুদ্ধ আটটি অধিবেশনে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়। সবগুলি প্রোগ্রামের বিশদ বিবরণ দেওয়া নানা কারণে অসম্ভব, তাই সব জড়িয়ে মোটামুটি একটি বিবরণ ও প্রধান প্রধান প্রোগ্রামগুলির মূল্যনির্ণায়ক আলোচনা নিম্নে উপস্থাপিত করা গেলো।

কণ্ঠসঙ্গীতের ক্ষেত্রে এবারকার সবচাইতে উল্লেখযোগ্য শিল্পী হ'লেন বোম্বাই-এর কেশরবাঈ কারকার। খ্যাল গানে এই মহিলা শিল্পীর কৃতিত্ব প্রায় অনন্যসাধারণ। ভালো ঠুংরী গাইতে পারেন এমন গায়িকা বহু আছেন, কিন্তু খ্যালে সচরাচর নারীদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর শিল্পী খুঁজে পাওয়া যায় না। শ্রীমতী কারকার এই নিয়মের একটি স্পষ্ট ব্যতিক্রম। ফৈয়াজ খাঁ সাহেবকে বাদ দিলে অতো বড়ো খ্যালের শিল্পী বর্তমানে আর দুটি আছেন কিনা সন্দেহ। আর নারীদের মধ্যে জোহ্‌রা বাঈ-এর পর অতো উঁচুদরের খ্যাল গায়িকা আজ পর্যন্ত হয়নি। কাজেই শ্রীমতী কারকারের উপস্থিতি এবারকার সম্মেলনের মর্যাদা যে অনেকখানি বাড়িয়েছে সেকথা বোধ হয় না বল্লেও চলে। তিনি অবশ্য এর আগেও দু'তিনবার কলকাতায় এসেছেন—তবু তাঁর গানের আকর্ষণ যে কিছুমাত্র কমেনি শ্রোতাদের উদগ্র আগ্রহই তার প্রমাণ। তিনি সম্মেলনে দু'দিন গাইলেন—রবিবার ও বুধবার। রবিবারে গাইলেন তিনি জৌনপুরী, বারোয়াঁ, সামন্তসারঙ, একটি অপ্রচলিত রাগিণী (পটমঞ্জরী?) ও "দ্রৌপদী পুকার" নামক বিখ্যাত ভজন গানটি। বুধবারে গাইলেন নন্দ, বসন্ত-কেদারা, রাইসা-কানাড়া ও ভজন।

কেশরবাঈ-এর কণ্ঠের বিশেষত্ব হ'লো এই যে তা বেশ বলিষ্ঠ পুরুষভাবযুক্ত ও জোরদার—ঠুংরী গায়িকাসুলভ মোলায়েম, মিহি, এলিয়ে-পড়া গলা তাঁর নয়। খ্যাল গানে সফল শিল্পী হ'তে গেলে কণ্ঠকে এমনভাবে মার্জিত করতে হয় যাতে বলিষ্ঠ "মর্দানা" ভাবটুকু গলায় সহজেই আসে—খ্যাল গানের রূপায়নে ও জিনিষটি ভালো ক'রেই দরকার। কুসুমকমনীয়, সুচিক্কন কণ্ঠ ঠুংরী গানের পক্ষে প্রশস্ত বটে কিন্তু খ্যালের সংহত রূপ ফুটিয়ে তোলার পক্ষে তা উপযুক্ত নয়। তাই খ্যালগায়িকাকে সাধনার দ্বারা কণ্ঠে দৃপ্ত ভঙ্গী আনতেই হয়। জোহ্‌রা বাঈ-এর এ জিনিষটি ছিল—কেশরবাঈ-এরও তা পূর্ণমাত্রায় আছে। শ্রীমতী কারকার তাঁর গুরু ভারতবিশ্রুত ওস্তাদ আল্লাদিয়া খাঁ সাহেবের কাছে একাদিক্রমে বহু বৎসর সঙ্গীত শিক্ষা করেছেন—শুধু বিভিন্ন রাগরাগিণী শিক্ষাই নয়, কণ্ঠকে খ্যাল গানের অনুরূপ মার্জিত ক'রে তোলাও যে সে সাধনার অঙ্গীভূত ছিল তা সহজেই অনুমান করা চলে। হীরাবাঈ বরোদাগারের গান শুনে যাঁরা অতিরিক্ত মুগ্ধ হন ও তাঁকে কেশরবাঈ-এর চাইতেও বড়ো গায়িকা বলতে ইতস্তত করেন না তাঁদের এই মূলগত কথাটুকু স্মরণ রাখা দরকার যে হীরাবাঈ-এর কণ্ঠ সম্পূর্ণত ঠুংরী-গায়িকার, কিন্তু কেশরবাঈ-এর তা নয়, প্রধানত খ্যাল গানের জন্যই তাঁর গলা তৈরী। কাজেই তাঁদের দুজনার ভেতর তুলনা চলতে পারে না, আর যদি বা চলে খ্যাল ও ঠুংরীর তফাৎটুকু মনে রেখেই তাঁদের যথাযোগ্য স্থান নিরূপিত হওয়া উচিত।

কেশরবাঈ-এর সুর বিস্তার আশ্চর্যভাবে সুনিয়ন্ত্রিত, কোথাও তাতে বাড়াবাড়ি নেই, দাপাদাপি নেই, সবটাই আগাগোড়া সুসংহত ও নিখুঁত। ইংরেজিতে যাকে 'finish' বলে তাঁর সুরবিস্তারে সেই 'finish'টুকু অতি প্রত্যক্ষ। তানেও তাঁর বিস্ময়কররূপে 'finished.' এমন সুকঠিন তান এমন অবলীলাক্রমে একমাত্র কেশরবাঈ-ই প্রয়োগ করেতে পারেন। আর আশ্চর্য তাঁর দম! এককালীন পাঁচ ছয় ওয়ার্দা তান করা তাঁর পক্ষে কিছুই নয়—এতে কোন কষ্টই তাঁর হয় না। কিন্তু সবচাইতে উল্লেখযোগ্য হলো তাঁর ব্যক্তিত্ব। এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিল্পী দুটি খুঁজে পাওয়া ভার। যতক্ষণ তিনি গান গান, তাঁর অসম্ভব ব্যক্তিত্ব দ্বারা শ্রোতাদের অভিভূত করে রাখেন—আপনি শ্রোতা, আপনার সাধ্য কি সেই ব্যক্তিত্বের প্রভাবকে এক মুহূর্ত ভুলে থাকেন। অর্ধ-সচেতনভাবে হলেও সেই সূক্ষ্ম, বিদেহী প্রভাব আপনার মধ্যে কাজ ক'রে যাবেই।

কিন্তু রোশেনারা বেগমের এই ব্যক্তিত্ব নেই। তাঁর গলা অসম্ভব তৈরী, তানও তিনি করেন চমৎকার। গাইবার ধরণটিও ভালো। কিন্তু কোথায় যেন কি নেই। খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে সেটি ব্যক্তিত্বের অভাব। এই ব্যক্তিত্বের প্রশ্নেই কেশরবাঈ তাঁকে ছাড়িয়ে বহুদূর চলে এসেছেন। আর তিনি কেমন যেন ছটফটে, চঞ্চল; কেশরবাঈ-এর আত্মপ্রত্যয়, গাম্ভীর্য ও সংযম তাঁতে নেই। ঠুংরীতেও হীরাবাঈ-এর আত্মসমর্পণের ভাব তাঁর ভেতর অনুপস্থিত। তবে রোশনারা যে একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। তাঁর কণ্ঠ অপরূপ মার্জিত, সাধা ও সাবলীল। তানেও কোন আয়াসের ছাপ চোখে পড়ে না। তিনি শনিবার রাত্রিতে বসন্ত রাগে বিলম্বিত ও দ্রুত দুটি খেয়াল, মারু-বেহাগের খেয়াল, প্রসিদ্ধ ভৈরবী 'যমুনা কী তীর' ও সর্বশেষে 'পিয়া কি মিলনে কি আশ' নামক সুপরিচিত যোগিয়া রাগের গানটি গাইলেন।

মহিলা শিল্পীদের প্রসঙ্গে ফিল্ম-প্রসিদ্ধ শান্তা আপ্তেরও নাম করতে হয়। তবে তাঁর গান সিনেমার গানের মতোই চটুল ও সস্তা—তাতে উল্লেখ করবার মতো কিছু নেই।

পুরুষ গায়কদের মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য হ'লেন পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর ও লাহোরের গোলাম আলি খাঁ সাহেব। প্রথমে পণ্ডিতজী সম্বন্ধে বলি। পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর একজন উঁচুদরের শিল্পী সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রকৃত সুরস্রষ্টা তাঁকে বলা চলে না। যে কয়দিন তিনি গাইলেন, বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী ও বিশেষ স্বরক্ষেপ ও 'প্রস্বন'-এর সাহায্যে তিনি সুর জমিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সুর তাঁকে ধরা দেয়নি। সাঙ্গীতিক পরিভাষায় যাকে সুরের 'ধুন' বলে সেই 'ধুন' তিনি সৃষ্টি করতে পারেননি। পণ্ডিতজীর আচরণ, বেশভূষা ও দেহ-সঞ্চালন সব কিছুর মধ্যে বেশ একটু আড়ম্বরপ্রিয়তা ও

আত্মপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। তদ্গত সাধকের ভাব তাঁর ভেতর ততটা নেই, যতটা আছে আত্মপ্রতিষ্ঠার মোহ। পরলোকগত আবদুল করিম খাঁ সাহেবের গানের সঙ্গে পাশাপাশি তুলনায় ওঙ্কারনাথের গানকে ছেলেখেলা ব'লে মনে হয়—মনে হয় করিম খাঁর ধারকরা জিনিস নিয়ে করিম খাঁকেই তিনি ব্যঙ্গ করছেন। কি খ্যাল, কি ঠুংরী—করিম খাঁ যখনই গাইতেন, সুরের ধ্যানে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ ক'রে দিতেন। সেই তদ্গত সাধকের মূর্তির পাশে ওঙ্কারনাথ বালখিল্য ঋষি মাত্র। তবে কনফারেন্সে যে-কটা ভজন গান তিনি গেয়েছেন, প্রাণ ঢেলেই গেয়েছেন এবং সত্যি কথা বলতে—এই ভজন গানগুলিই তাঁর একমাত্র শ্রোতব্য গান। খ্যাল গানের ক্ষেত্রে তিনি আমাদের সম্পূর্ণ নিরাশ করেছেন, যেমন আগেও কয়েকবার আমাদের নিরাশ ক'রে গেছেন। 'চৈতী-গৌরী' কি 'শ্রী-টঙ্ক' কি 'প্রণবেন্দ্র-মধ্যম' প্রভৃতি গালভরা রাগের গান গাইলেই যদি শ্রোতাদের নিরস্ত করা যেতো, তাহলে আর কথাই ছিল না। বরং তিনি শনিবার হেম রাগে যে গানটি গেয়েছেন, তাতে তিনি অপেক্ষাকৃত সংযম ও গাম্ভীর্যের পরিচয় দিয়েছেন। আর তাইতেই গানটি আমাদের খানিকটা ভালো লেগেছে।

ওস্তাদ গোলাম আলি খাঁ সাহেব দুটি অধিবেশনে গাইলেন—রবিবারের সকালের অধিবেশন (অবশ্য তাঁর গাইতে গাইতে সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল) ও মঙ্গলবার রাত্রির অধিবেশন। রবিবার গাইলেন তিনি পুরিয়া-ধানেশ্রী, বাহার ও কয়েকটি ঠুংরী এবং মঙ্গলবার শেষরাত্রের দিকে গাইলেন মালকোষ, ঠুংরী ও গজল। গোলাম আলি খাঁ সাহেবের গলা অসম্ভব সুরেলা ও মিষ্টি। উচ্চাঙ্গের গায়কদের মধ্যে কণ্ঠের মিষ্টত্ব প্রায়ই চোখে পড়ে না; ইনি তার প্রত্যক্ষ ব্যতিক্রম। তবে তাঁর কণ্ঠ খ্যালের উপযোগী নয়—এমন হাল্কা গলায় খেয়াল গান কখনই সম্যক্ স্ফূর্তিলাভ করতে পারে না। খ্যালের জন্য দরকার আরও ভারী ও জোরালো গলা—যা তাঁর নেই। তবে ঠুংরী গানের তিনি অধীশ্বর। কী অসম্ভব দরদ দিয়েই না তিনি ঠুংরী গান করেন—তাঁর সুরের যাদুতে শ্রোতার মন দেখতে না দেখতে ভরে ওঠে। তাঁর ঠুংরী ও গজল গানের ছোট ছোট পাঞ্জাবী তরকিফগুলোও লক্ষ্যণীয়। গোলাম আলী খাঁর অনায়াস, স্বচ্ছন্দ গাইবার ধরণটুকু প্রত্যেক গায়কেরই অনুকরণ করা উচিত।

গোয়ালিয়রের প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত কৃষ্ণরাও দুদিন গাইলেন। তিনি গুণী লোক বেশ বোঝা যায়, তবে কণ্ঠে আশানুরূপ মিষ্টত্ব না থাকায় শ্রোতাদের তিনি খুব বেশী তৃপ্তি দিতে পারেননি। তিনি প্রথম দিন গাইলেন পুরবীর খ্যাল ও শেষের দিন গাইলেন মালকোষ-কি-বাহার রাগের খ্যাল। মালকোষ-কি-বাহারের আয়াস সাপেক্ষ কঠিন *তান তিনি* অনায়াসে প্রয়োগ করেছেন—এটি কম কথা নয়। কনফারেন্সে তিনিই একমাত্র টপ্পা গাইলেন। তাঁর সঙ্গে দুদিনই তবলায় সঙ্গত করলেন কাশীর বিখ্যাত বাদক প্রোঃ আনোখীলাল।

কণ্ঠসঙ্গীতের ক্ষেত্রে তারপরে নাম করতে হয় পণ্ডিত নারায়ণরাও ব্যাস্ ও পটবর্ধনের। পণ্ডিত নারায়ণরাও ব্যাস্ চম্পক রাগের খ্যাল গাইলেন; কিন্তু রাগ বিস্তারে মোটেই তিনি শ্রোতাদের আনন্দ দিতে পারেন নি। তাঁর গলা চড়া, তবে মিষ্টি; কিন্তু তিনিও চাঞ্চল্যদোষবর্জিত নন; গান গাইতে বসে বড়ো ছটফট্ করেন, আর গান ধরেই একেবারে কদমে ছুটতে চান। তিনি তাঁর গ্রামোফোন-খ্যাত কয়েকটি জনপ্রিয় গানও গাইলেন। নারায়ণরাও ব্যাসের গান শুনে আমাদের মনে হ'ল, তিনি গ্রামোফোনে যতটা সফল-শিল্পী, বৈঠকে ততটা নয়—গ্রামোফোন রেকর্ডেই তাঁর গলা খোলে ভাল। পটবর্ধনের গাইবার ধরণও অনেকটা এইরকম, তবে ঈষৎ উন্নত। লাহোরের প্রোঃ দিলীপ বেদী কলকাতায় সুপরিচিত। তিনি সুর-বিস্তার অপেক্ষা তানে অধিক কুশলী। তাঁর কূটতানের কায়দাটাই বেশি করে চোখে পড়ে—সুরের ক্ষেত্রে তিনি তেমন মনোমুগ্ধকর নন। রায়গড়ের ওস্তাদ মুহাম্মদ খাঁ পুরোনো স্টাইলের কয়েকটি খ্যাল গান গেয়েছেন; কিন্তু তা একেবারেই রসিকদের পাতে দেবার অযোগ্য। তান ও বিস্তার শিখলেই যে গান হয় না; কিছু পরিমাণে কল্পনাশক্তিরও দরকার, মুহাম্মদ খাঁর নীরস গান সে কথাটাই আবার নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিলে। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কদের মধ্যে গাইলেন পুণার পণ্ডিত ডি ভি পুলস্কর ও ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র বালক শরাফৎ খাঁ। পণ্ডিত পুলস্করের কণ্ঠ খ্যালের উপযোগী; চমৎকার তাঁর সুর বিস্তারের কায়দা। কনফারেন্সে তিনি মালগুঞ্জ ও মল্লারের খেয়াল গেয়ে শ্রোতাদের চমৎকৃত করেন। মাস্টার শরাফৎ খাঁ কিছুদিন আগেও একবার ফৈয়াজ খাঁ সাহেবের সঙ্গে কলকাতায় এসেছিলেন। তখনই তাঁর তানের কায়দা দেখে আমরা বলেছিলাম, উত্তরকালে এই বালক প্রসিদ্ধ গায়ক হবেন। শরাফৎ খাঁ কণ্ঠটিকে আয়ত্ত করেছেন বেশ, তবে বালক বয়স ব'লে সুর এখনও গলায় স্থায়ীভাবে কেটে বসেনি। তাঁর তারার পর্দায় সুরের ওপর অতিরিক্ত জোর দেওয়ার অভ্যাসটি ত্যাগ করা উচিত।

যন্ত্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে এবারকার প্রধান আকর্ষণ হলেন মাইহারের সভাবাদক আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের সুযোগ্য পুত্র প্রোঃ আলি আকবর খাঁ। তিনি প্রথম দিন শ্রী ও দ্বিতীয় দিন পুরবীতে আলাপ ও *গৎ বাজিয়ে শোনালেন*। তাঁর সঙ্গে তবলায় সঙ্গত করলেন রামপুর ষ্টেটের প্রসিদ্ধ তবলা বাদক প্রোঃ আহম্মদ জান থেরাকুয়া। এই দুই শ্রেষ্ঠ গুণী সম্মেলনকে এবারকার অনুষ্ঠানের প্রায় প্রধান আকর্ষণ বললে ভুল বলা হয় না। পিতার সুনিপুণ শিক্ষায় প্রোঃ আলী আকবর এই বয়সেই স্বরোদ যন্ত্রটিকে এমনভাবে অধিগত করেছেন যে, এই ক্ষেত্রে সমগ্র ভারতবর্ষে বর্তমানে তাঁর আর জুড়ি নেই। যেমন তাঁর গমকের কাজ, তেমনি তাঁর হাতের ঝালা, ঠোক-ঝালা, লড়ি ও দুনি, চৌদুন তান। দুইদিনই যতক্ষণ তিনি বাজিয়েছিলেন, দর্শকগণ মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁর কলা-নৈপুণ্য নিরীক্ষণ করেছিলেন। প্রোঃ থেরাকুয়ার সঙ্গতিও তেমনি সোনায় সোহাগা। এমন মণিকাঞ্চন সংযোগ কদাচ সংঘটিত হয়। বিশেষ করে মঙ্গলবারের অধিবেশনে তাঁরা যে সৃষ্টি নৈপুণ্য দেখালেন তার তুলনা মেলে না। লয়ের এমন সূক্ষ্ম মার-প্যাঁচ একমাত্র এই দুই শ্রেষ্ঠ গুণীর পক্ষেই দেখানো সম্ভব। প্রোঃ আলী আকবর সম্বন্ধে একটি কথা বলবার আছে। পরিচয়-সূচীতে তাঁকে লক্ষ্ণৌর ব'লে পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তিনি বাঙালী শিল্পী—বাঙলাই তাঁর প্রকৃত স্বদেশ। জীবিকার জন্যে লক্ষ্ণৌতে থাকতে হয় ব'লেই যদি তিনি লক্ষ্ণৌবাসী হ'য়ে যান তা হ'লে যে কয়জন বাঙালী কলাকার বাঙলার বাইরে আছেন তাঁদের সকলকেই অবাঙালী ব'লে পরিচয় দিতে হয়। জানি এই মনোভাবের পেছনে দৃশ্যত যা চোখে পড়ছে তা ছাড়াও অন্য কারণ আছে—কেউ বাঙলার বাইরে থেকে আসছে শুনলেই শ্রোতাদের উৎসাহ চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাবে এটা আশা করা অন্যায় নয়, কিন্তু তাই ব'লে বাঙালীকে বাঙালী ব'লে দাবী করা যাবে না এটা অসঙ্গত ছাড়া আর কি? সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার আবেগ থেকে একথা যে আমরা বলছি তা নয়, আমাদের কথা এই যে, যিনি বাঙালী, তার স্বদেশের নামেই তাঁর পরিচয় হওয়া উচিত। উচ্চাঙ্গ সংগীতের ক্ষেত্রে মুষ্টিমেয় যে কয়জন বাঙালী কলাকার আছেন তাঁদেরও যদি এভাবে অ-বাঙালীর মতো ক'রে পরিচয় দেওয়া হয় তা হ'লে আমাদের সংগীত জগতে গর্ব করার কী থাকে? আর যাই হোক, লোকের মনে ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে পারে এমন পরিচয়জ্ঞাপন পদ্ধতি বর্জন করাই বোধ করি শ্রেয়।

গোয়ালিয়রের প্রসিদ্ধ স্বরোদবাদক হাফেজ আলী খাঁ সাহেবের কলা-নৈপুণ্যের নতুন ক'রে পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন আছে ব'লে মনে করি না। এবার নিয়ে তিনি

বহুবার কলকাতার কনফারেন্সগুলিতে বাজালেন। ওস্তাদ অথচ এমন অপরূপ মিষ্টি হাত—এ একমাত্র হাফেজ আলী খাঁর মধ্যেই চোখে পড়ে। তাঁর সঙ্গে তবলায় সঙ্গত করলেন রাইচাঁদ বড়াল। বুধবার রাত্রে সঙ্গত করলেন প্রোঃ থেরাকুয়া। যন্ত্র-সংগীতে তারপরে নাম করতে হয় কাশীর বিখ্যাত সানাইবাদক সম্প্রদায় বিসমিল্লা এণ্ড পার্টির। বিসমিল্লার দল শনিবার মালকোষ ও মঙ্গলবার পরজ-বসন্ত বাজিয়ে শোনালেন। দুটি ঠুংরীও তাঁরা বাজালেন। ঠুংরীর সুরগুলিই আমাদের অধিক আনন্দ দিয়েছে। লক্ষ্ণৌর প্রোঃ জোগ বেহালায় পণ্ডিত পুলস্করের সঙ্গে সঙ্গত করলেন ও এককভাবে জয়-জয়ন্তী রাগের গৎ বাজিয়ে শোনালেন। তাঁর কলা-কুশলতা স্বীকার করেও বলতে পারি তাঁর কাছ থেকে আরও উচ্চাঙ্গের বাদন আমরা আশা করেছিলাম। তবে তাঁর সঙ্গতির ধরণটি চমৎকার। কাশীর-সারেঙ্গীবাদক প্রোঃ গোপাল মিশ্র কি সঙ্গতি কি একক বাদনের ক্ষেত্রে অনস্বীকার্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

তবলার ক্ষেত্রে এমন প্রথম শ্রেণীর গুণী-সম্মেলন ইতিপূর্বে আর কখনও ঘটেনি একথা জোর ক'রে বলা যায়। রামপুরের ভারত বিশ্রুত ওস্তাদ প্রোঃ থেরাকুয়ার তবলার-লহরা একটি শোনবার ও দেখবার মতো জিনিস। অতি দুরূহ লয়ের কাজে তিনি সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। বিশেষ ক'রে যাঁরা তবলাবাদক ও সংগীতের লয়ের দিকে আসক্ত তাঁরা প্রোঃ থেরাকুয়ার কলানৈপুণ্য কখনও ভুলতে পারবেন না। বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ বাদক প্রোঃ সামসুদ্দিন খাঁর তবলা-লহরাও খুবই উপভোগ্য হয়েছে। কাশীর উদীয়মান বাদক প্রোঃ শান্তপ্রসাদের তবলা-লহরাও উল্লেখযোগ্য। তবে সঙ্গতির দিক থেকে কাশী-প্রসিদ্ধ প্রোঃ আনোখীলালের কৃতিত্ব সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। যন্ত্র এবং কণ্ঠ দুইএর সঙ্গে ঠেকাতেই তিনি সমান কুশলী। বুধবার রাত্রে তাঁর তবলা-লহরাও খুবই উচ্চাঙ্গের হয়েছিল। স্থানীয় তবলাবাদকদের মধ্যে শ্রীযুত হীরেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলীর তবলা-লহরা (তাল—পঞ্চম-সওয়ারী) এবং পরেশ ভট্টাচার্য ও জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সঙ্গত উল্লেখযোগ্য।

নৃত্যের ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন রায়গড়ের কথক নর্তক প্রোঃ কার্তিকরাম। আড়া-চৌতালের বিভিন্ন বোল তিনি চরণক্ষেপের সাহায্যে অবলীলা-ক্রমে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর এক স্থানে স্থির দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় পায়ের কাজগুলিও চমৎকার। বোম্বাইএর মিস জয়-কুমারীর নৃত্য, কিন্তু আমাদের মোটেই ভাল লাগেনি। তাঁর ভঙ্গীর রূঢ়তাও ততোধিক রুক্ষ দেহসঞ্চালন আমাদের চোখকে পীড়া দিয়েছে। শুধু পদক্ষেপে বোল ফুটিয়ে তোলাই যথেষ্ট নয়, তাকে লীলায়িত রূপ দেওয়াও দরকার—অন্তত নারীর কাছে আমাদের সেইরূপ প্রত্যাশাই থাকে।

অনুষ্ঠানের এই হ'ল মোটামুটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ। স্থানীয় যে সব শিল্পী অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন, তাঁদের গান ও বাদন কলকাতাবাসী অল্পবিস্তর সকলেই শুনেছেন, কাজেই তাঁদের আলোচনায় বিরত রইলুম। তা ছাড়া তাতে ক'রে অনেককে মনঃক্ষুণ্ণ করার আশঙ্কাও আছে। অনর্থক আর শত্রু বৃদ্ধি করতে চাইনে। প্রধান প্রধান স্থানীয় শিল্পীর নাম নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

(কণ্ঠসংগীত) ঃ ওস্তাদ আবদুল গফুর খাঁ, মোহিনীমোহন মিশ্র, যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, অনাথনাথ বসু, সুধীরলাল চক্রবর্তী, শচীনদাস (মতিলাল), যামিনী গাঙ্গুলী, রামকৃষ্ণ মিশ্র, তারাপদ চক্রবর্তী, সুখেন্দু গোস্বামী, বিজনবালা ঘোষ দস্তিদার, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবোধরঞ্জন দে, বীরেশ রায়, মীরা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

(যন্ত্র সংগীত) ঃ ঃ খলিফা দবীর খাঁ (বীন) বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী (সুর-রবাব), আলী আহম্মদ খাঁ (সেতার), শ্যাম গাঙ্গুলী (স্বরোদ), শোভা কুণ্ডু (সেতার), জিতেন্দ্রমোহন সেন (সেতার)।

(তবলা) ঃ হীরেন্দ্র গাঙ্গুলী, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ও পরেশ ভট্টাচার্য।

এবারে পরিচালনা সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা দরকার। সমস্ত রাত্রিব্যাপী সংগীতানুষ্ঠানের পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষীয় যিনিই করে থাকুন, তিনি যে শ্রোতাদের নিদ্রার ওপর অত্যাচার করেছেন একথা নিঃসংশয়ে বলবো। শ্রোতারা অবশ্য একদিকে সংগীত-সুধা, অপরদিকে নিদ্রাসুখ এই দুইয়ের মধ্যে প্রথমোক্তটিকেই বেছে নিয়েছেন, তা হলেও একথাটি স্মরণ রাখা দরকার যে, মানুষের অভ্যস্ত বিশ্রামেচ্ছার ওপর ক্রমাগত জুলুম করলে মিষ্টি জিনিসও তেতো হয়ে ওঠে। তা ছাড়া সমগ্র রাত্রিব্যাপী অনুষ্ঠানের কল্পনাটাই মধ্যযুগীয় মনোভাবপ্রসূত—সামন্ততন্ত্রের আবহাওয়ায় তার জন্ম। বর্তমান পারিপার্শ্বিককে এ জিনিসটির সঙ্গতি ও যুক্তিযুক্ততা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। গোলাম আলি খাঁ সাহেব ও রোসনারা বেগমের গানের সময় এমন অনেককে ঢুলতে দেখেছি যাঁদের সংগীতানুরাগ অকৃত্রিম, শুধু রাত্রিশেষের অভ্যস্ত আবেশের বশেই তাঁরা ঘুমিয়ে পড়তে বাধ্য হচ্ছেন। ভবিষ্যতে এই দীর্ঘবিলম্বিত অধিবেশনকে হ্রস্বতর করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলে ভালো হয়। আগামী অধিবেশনগুলিতে অন্য অনেক নিয়মের মধ্যে কর্তৃপক্ষের এই একটি নিয়ম করা উচিত যে, দেশীয় রাজ্য থেকে যেসব ওস্তাদ আসবেন, তাঁরা কেউ চটকদার পোষাক অথবা পাগড়ী, চুমকি-দেওয়া জোব্বা অথবা আচকান পরে আসতে পারবেন না। মেডেল ঝুলিয়ে আসা তো সর্বথা বর্জনীয়। এগুলি এমন পীড়াদায়ক ও অমার্জিত রুচির পরিচায়ক যে ওসব পোষাকে ভালো গানও ভালো শোনায় না। তারপর কর্তৃপক্ষের দেখা উচিত, যেখানে বসে শিল্পীরা গাইবেন, বাজাবেন সেই আসরটি যেন হট্টমন্দিরে পরিণত না হয়—চেনা অর্ধ-চেনা, অচেনা লোককে আসরে ঢুকতে দিয়ে তাকে মেছোহাটা বানিয়ে তোলার কোন অর্থ হয় না। অই হট্টগোলের পাশে প্রেস প্রতিনিধিদের বসবার জায়গা করাটাও অবিবেচনার পরিচায়ক। এ সম্পর্কে আরও অব্যবস্থা আমাদের চোখে পড়েছে, কিন্তু অভিযোগের লম্বা ফিরিস্তি দেওয়া এখানে আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

পরিশেষে একটি কথা। এতো বড়ো একটা সম্মেলন হয়ে গেল, কিন্তু তাতে বাঙলা-গানের কোনোই ব্যবস্থা ছিল না, এ বড়ো পরিতাপের বিষয়। ভাবুন, কলকাতার বুকের ওপর গানবাজনা হচ্ছে অথচ তাতে বাঙলা গান একেবারেই বরবাদ—নিজেদের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করার এর চাইতে বড়ো দৃষ্টান্ত আর কী হ'তে পারে! হিন্দুস্থানী সংগীত ভালো জিনিস, বড়ো জিনিস সবই মানলুম তাই বলে বাঙলা দেশে বাঙলা গানকে বর্জন করা একটু বাড়াবাড়ি নয় কি? সংগীতের ক্ষেত্রে এই মানসকুট—এই ক্ষুদ্রতাবোধ—আর কতোকাল আমাদের অভিভূত করে রাখবে? তারপর, প্রবেশ-মূল্য সম্পর্কেও কিছু বলা দরকার। টিকিটের হার কিছু কমালে প্রাপ্তির দিব থেকে যে কমতি হতো তা আমাদের মনে হয়না। ভূপেন্দ্রকৃষ্ণর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন করাই যদি কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য, তাহলে টিকিটের হার কমিয়ে জনসাধারণকে গান শোনাবার ব্যাপক সুযোগ দেওয়াই অধিক বাঞ্ছনীয় ছিল। ভবিষ্যতে কর্তৃপক্ষ উপরোক্ত ত্রুটিবিচ্যুতিগুলির সংশোধনে যত্ন নিলে সুখী হবো।

তবে সামান্য দোষত্রুটির কথা বাদ দিয়ে একথা বলা যায় কর্তৃপক্ষ এবারে যা করলেন এর আগে এতো বড়ো বিরাট ব্যাপার আর কেউ করেন নি—এতো সব গুণীজনকে কলকাতায় আনতে যে—প্রচণ্ড পরিশ্রম ও প্রচুর অর্থব্যয় প্রয়োজন হয়েছে কর্তৃপক্ষ তা বহন করতে যে বিন্দুমাত্র কার্পণ্যবোধ করেন নি তা তাঁদের আয়োজনের ব্যাপকতা দেখেই বোঝা যায়। শুধু এইজন্যেও তাঁরা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

অনুবাদসাহিত্য

বান এল

(চীনা গল্প)

টিং লিং

[গল্পটি চীনা লেখিকা টিং লিংএর The flood নামক গল্পের অনুবাদ। টিং লিং চীন দেশের একজন বিখ্যাত লেখিকা। চীনের যুবকদের নিকট এ'র লেখার আদর খুব বেশি। টিং লিংএর বাড়ি হুনান প্রদেশে। খুব গরীবের ঘরে এ'র জন্ম হয়। বহু কষ্ট স্বীকার করে টিং লিং লেখাপড়া শেখেন। পাঠ্যাবস্থায় তিনি বিপ্লবী দলে যোগ দেন। এ'র স্বামী হু ইয়ে পিন্ একজন লেখক ছিলেন এবং বিপ্লবী দলের নেতা ছিলেন। সাংহাইতে যখন টিং লিং এবং তাঁর স্বামী বিপ্লবী দলের কার্যে লিপ্ত ছিলেন, সেই সময় হু ইয়ে পিনের ফাঁসি হয়। টিং লিংও সেই সময় ধরা পড়েন। প্রথমে সকলে মনে করেছিল যে, টিং লিংএরও বোধ হয় ফাঁসি হয়েছে, কিন্তু পরে জানা যায় যে, টিং লিংকে নানকিংএর জেলে আটক করে রাখা হয়েছে। টিংলিংএর কয়েকটি বিখ্যাত বই—A Man's Birthday, Diary of a Suicide, The Diary of Sha-Fei ইত্যাদি।]

গ্রামের মেয়েরা ঘরের মাটির ওপর বসে কৌতূহলের সঙ্গে শুনছে। ঘরের ভেতরটা আবছা অন্ধকারে ভরা। খোলা দরজা দিয়ে বাইরের পাতলা চাঁদের আলো দেখা যাচ্ছে। মার কোলে মাথা রেখে পাঁচ বছরের লেও ইয়াও তার ক্ষুদে কান খাড়া করে ঘরের মধ্যে যা কথা হচ্ছে তা শুনছে।

কি যে শুনছে, তা সে নিজেই জানে না। শুধু এইটুকু সে বুঝতে পারছে যে এই মুহূর্তটা একটা কিছু শোনবার জন্যই।

কাছেই কোথায় একটা কুকুর ডেকে উঠল। এলোমেলো হাওয়া দিয়ে উঠল। বাইরের শোঁ শোঁ শব্দটা খুবসম্ভব, গাছের ভিতর দিয়ে বাতাস বয়ে যাবার শব্দ ছাড়া আর কিছু না।

—"শোন! কিছু কি শুনতে পাচ্ছ না? চুপ—দূরের শব্দটা শুনে মনে হচ্ছে নিশ্চয় কেউ আস্তে আস্তে কাঁদছে।"

—"ঐ, ঐখানে কেউ যেন চেঁচাচ্ছে।"

—"যাঃ, কৈ আমি তো কিছু শুনতে পাচ্ছি না।"

—"দাঁড়াও, ঐ, নিশ্চয় কার গলার শব্দ।"

কিছুক্ষণের জন্য ঘরের ভেতর কেউ কোন কথা বল্লো না। তারপর একটু নড়াচড়ার শব্দ শোনা গেল। কালা বুড়ী ঠাকুমা ফোকলা দাঁতের ভেতর দিয়ে বিড়বিড় করে কিছু বল্লো, "গণৎকার বলেছে এই বছরে আমার একটা ফাঁড়া আছে। খুব সম্ভব এখানে আসবে না,—না, বান আসবে না।" ঠাকুমা বলে উঠল,—আমার মনে হয় আমায় যেন কে বিপদের হাত থেকে সব সময় আগলে রাখছে। ভেবে দেখ, কত বিপদ-আপদের মধ্যে আমি বাস করছি। কখন কার কি হয় কেউ বলতে পারে না। আমি কিন্তু মরতে ভয় পাই না। আমার কি, আমার তো মরবারই বয়স হয়েছে, কিন্তু ছেলে, নাতি-পুতিদের ছেড়ে যাওয়াই কষ্টকর।"

"কপালের কাছে ছেলে, নাতি সবই সমান, মৃত্যুর কাছে এর কোন বাছ-বিচার নেই।"

—"কিন্তু এসব কথা ঠাকুমা যদি শুনতে পায়।"

—"ঠাকুরমার এবার শুয়ে পড়া উচিত। 'হাই' ঠাকুমাকে বিছানায় শুইয়ে দাও—এতক্ষণ বসে থেকে ঠাকুমা নিশ্চয় খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।"

"হাই" ঠাকুমার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বল্লো—"ঠাকুমা, শুতে চল—তোমার শোবার সময় হয়েছে।"

—"না, না,—এখন আমি শুতে যাব না, —ওদের না ফেরা পর্যন্ত আমি জেগে থাকব। ওরা এখন কোথায় কে জানে; কোনও সাড়াশব্দ তো পাওয়া যাচ্ছে না। কি মনে হয় আজ রাতেই কি কিছু হবে নাকি।"

—"আমি কি করে বলব। দেবতাই শুধু বলতে পারেন।"

—"দেবতা? দেবতা আবার আছে না কি? তাহলে আমাদের এ অবস্থা কেন? প্রত্যেক বছরই বান লেগে আছে—আর তার সঙ্গে তো আমরা দেবতাকেও ডাকতে ভুলি না। ও দেবতা নয়। আমাদের উচিত, মন্দির থেকে পাষাণ মূর্তি ফেলে দেওয়া। কেন, কেন আমরা নদীর বাঁধ বাঁধব? কেন, আমাদের রাতের পর রাত জেগে বাঁধ পাহারা দেব? আসুক, বান আসুক—আর তার সঙ্গে আমাদের এই মন্দিরের দেবতাকেও ভাসিয়ে নিয়ে যাক্।"

—"টা ফু চুপ কর। মন্দিরের ঐ বিগ্রহ নিয়ে কেন এত উত্তেজিত হচ্ছ।"

—"হ্যাঁ, কিন্তু ও যা বলেছে তা সত্যি। বান আর বান—এ তো প্রত্যেক বছরই লেগে আছে।"

"এবারটা অন্যবারের চেয়ে আরো খারাপ, একটু অপেক্ষা করেই দেখ।"

কেউ আর কিছু শুনতে চাচ্ছিল না। মেয়েরা সাধারণত কম কথা বলে, কিন্তু ভয়ে আর উত্তেজনায় সকলেই এখন কথা বলছিল। ঘরের ভেতরকার ছোটরা যারা তাদের বাপের সঙ্গে বাঁধের ধারে যেতে পায়নি, তারাও এদের মধ্যে কথা বলছিল। ঠাকুমা নিজের মনেই বকে যাচ্ছিল। "কত বছর আগে ঠিক বলতে পারি না, আমি তখন ঐ ছোট লাংএরের মত দেখতে। তখন আমরা সকলে কিছু খেতে না পেয়ে গাছের পাতা আর কাদা খেয়ে থাকতাম। হাত বদলে বদলে বংশের একজনের কাছ থেকে আর একজনের কাছে যাচ্ছি। চার দিকে দুর্ভিক্ষ আর মহামারী। চার পাশে সব মড়া পড়ে রয়েছে—কুকুর, শেয়ালের তখন খুব খাবার জুটছে। আমার পরিবারের সংখ্যা ক্রমে কমে আসতে লাগল —কত যে মরেছে তা বলে শেষ করা যায় না। প্রথমেই আমার ছোট ভাই মায়ের দুধ না পেয়ে শুকিয়ে মারা গেল। তারপর ছোট বোন খুড়ীখুড়ো মারা গেল আমার বয়স তখন মোটে সাত। সে যাত্রা আমি কোন রকমে বেঁচে গেলাম—আর এখন পর্যন্ত বেঁচে আছি। তোমরা বোধ হয় বিশ্বাস করছ না যে, ভিক্ষে করে আর এত মার-ধোর খেয়েও আজ পর্যন্ত আমি বেঁচে আছি কি করে। এখন আমার ৬০এর ওপর, প্রায় ৬৫ বছর বয়স। এখনও আমার সেদিনকার কথা খুব পরিষ্কার মনে পড়ছে। ঐ খুদে লাংএরের মত—"

লাংএর কিন্তু টাকপড়া ঠাকুমার সঙ্গে নিজের তুলনার কথা মোটেই ভাল লাগছিল না। ঠাকুমার ঐ একঘেঁয়ে বক্‌বকানি শুনে তার মনে কেমন যেন ভয় হচ্ছিল। খুব সন্তর্পণে ঘরের এদিক থেকে ওদিকে সে তার ভায়ের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। লা ইয়াও কান খাড়া করে চোখ আধবোজা অবস্থায় শুয়ে ছিল। ঠাকুমা যখন বকে যাচ্ছিল, তখন সে ঘরের ভেতরের আবছা চেহারাগুলোর দিকে একটার পর একটা লক্ষ্য করছিল। সে দেখল ঠাকুমার তোবড়ান গাল তার প্রত্যেক কথার সঙ্গে নড়ছে আর ঠাকুমাকে কি রকম অদ্ভুত দেখাচ্ছে। লা ইয়াওর খুব হাসি পাচ্ছিল, কিন্তু একটা অজানা শাসনের ভয়ে সে চুপ করে রইল।

বাইরে রিং রিং করে একটা শব্দ হল। শব্দটা ঠিক গুলীর শব্দের মত মনে হল। কিন্তু ওটা তা নয়, নিশ্চয় কোন একটা জিনিসের ওপর আঘাতের শব্দ; কিম্বা

হয়ত কেউ একটা কাঁচের পাত্র ভেঙ্গে ফেলল। সকলে হঠাৎ চুপ করে গেল। ঘরের মধ্যে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল। ঘরের লোকেরা এখন আবার বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ শুনতে পেল। ঠাকুমা আপন মনে বকে চলেছে—তাও শোনা গেল।

"কার দোষ? কে বলতে পারে? আমার স্বামী কত ভাল লোক ছিলেন। ছেলেও তাঁর মত ছিল। একদিনের জন্যও তারা কোন কাজে কুঁড়েমি করেনি। তবুও তারা দুজনেই মারা গেল। কেন? এ কি রকম বিচার? দেবতা কোথায়? আমার নিজের জন্য কিছু ভাবি না—আমার তো যাবার সময় হয়ে এসেছে। কিন্তু তোমরা—তোমাদের এ রকম কেন হবে? তবুও তোমরা আশা করছ যে, হঠাৎ একদিন জগতে সব বদলে যাবে। আমিও যৌবনে এ রকম আশা করতাম। অসম্ভব! এ দুঃস্বপ্ন। জীবনে ভাল মানুষী বোকামি। আমি মরে যাবার পরও জগতে এই রকমই চলবে—শুধু আরো দুঃখ কষ্ট বেড়ে যাবে।"

"জাহান্নমে যাক—দুঃখ আর কষ্ট, কিন্তু বোধ হয় এর শেষ সীমানায় পেঁছিবার পর নিশ্চয় সুসময় আসবে, না?"

বাইরে একটা কুকুর ডেকে উঠল,—ডাকটা ঘরের মাটির দেয়ালে এসে ঘা খেয়ে মিলিয়ে গেল। কুয়াসাচ্ছন্ন রাত্রি। পুকুরের ধারের গাছটার কাছে একটা আবছা মূর্তি দেখা গেল। ঘরে খোলা দরজা দিয়ে এখন পরিষ্কার দেখা গেল যে ওটা একটা মানুষ। লোকটা কুকুরটার নাম ধরে ডাক দিয়ে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল।

—"সান ই ব্যাপার কি? বাঁধের অবস্থা কি রকম? এর ফু কেমন আছ?"

সান ই বলে উঠল—"সারা বাড়িতে কি একটাও আলো নেই। কি হয়েছে কি? তোমরা কি মনে কর যে আমাদের মাথার ওপর প্রলয় ভেঙ্গে পড়বে?"

—"কোথাও এক ফোঁটা তেল নেই শুধু দুটো মোমবাতি আছে—তাও আবার দেবতার পুজোর জন্য ও দুটো তোলা আছে।"

—"তা, ব্যাপারটা কি রকম? আমরা যে কোন রকম সাড়া শব্দই পাচ্ছি না। বান কি নেমে গেছে, না নামেনি?"

—"নেমে গেছে? এ বান নামতে পারে না। বরং ঠিক তার উল্টো। তোমরা কি কাঁশরের বাজনার শব্দ শুনতে পাওনি। টাং গ্রামের অবস্থা খুবই খারাপ। ওখানকার বাঁধ খুবই পলকা—এখন আর ঐ বাঁধ শক্ত করবার সময় নেই। এ যেন অনেকটা সাপের কামড়ে মারা যাওয়ার পর ওঝা ডেকে চিকিৎসা করান। টাং গ্রাম কিছুক্ষণের মধ্যেই জলের নিচে ডুবে যাবে।"

—"আমাদের এখানকার অবস্থা কি রকম?"

—"এ বলা শক্ত। যদি বান টাং গ্রামের ওপর দিয়ে যায় তাহলে আমরা নিরাপদ। টাং গ্রামের মত আমাদের গ্রামে এত জায়গা নেই। সেইজন্য যদি আমাদের গ্রামেই বান আসে তাহলে আমাদের সকলকে টাং গ্রামে যেতে হবে। টাং গ্রামের লোকেরা নিশ্চয় এই বিপদের সময় ওদের গ্রামে আমাদের একটু জায়গা দেবে। যাক টা ফু, এর ফু, তোমরা সব এস। আমাদের আরো লোকের দরকার—চলে এস। বাঁধ যদি কোথাও একটু ভেঙ্গে যায় তাহলেই আর রক্ষা নেই।"

সে দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল আবছা অন্ধকারের মধ্যে। তার সুদৃঢ় শরীরের প্রত্যেকটা অংশই দেখা যাচ্ছিল। সে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বল্লে—"উত্তেজিত হোয়ো না,—চল যাওয়া যাক। এই টা মাও তুমিও আসতে পার। আর এস্ মাও তুমিও। তোমরা সবাই ছোট বটে, কিন্তু তোমাদের চোখ খুব পরিষ্কার। লাও ইয়াও তোমার যদি ভাল না লাগে, তাহলে না হয় এস না।"

এরা সবাই যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে—কারণ ঘরের মেয়েদের বক্-বকানির সামনে থেকে সরতে পারলেই যেন এরা বাঁচে। আর তাছাড়া বাঁধের ধারে গেলে বানটাও নিজের চোখে দেখতে পাওয়া যাবে।

ছেলেরা নীচু হয়ে ঘরের মধ্যে তাদের জামা খুঁজতে লাগল। সময়টা গরম কাল হলেও রাতটা বেশ শীত শীত ছিল, সেই জন্য এরা কেউ খালি গায়ে বাইরে যেতে চাচ্ছিল না।

—"কি রকম দেখতে, যতক্ষণ না আমি নিজে দেখছি ততক্ষণ বলতে পারব না। নিজে দেখার পরও ভাবতে পারবে না। যে দিকে তাকাবে দেখবে চারিদিকে শুধু জল আর জল, আর কি তার গর্জন। রাত্রে সে শব্দ শুনলে ভয়ে আঁৎকে উঠতে হয়।"

নির্ভীক সান ই যে দেবতাকেও পর্যন্ত ভয় করে না, তার মুখেও ভয়ের কথা শুনে মেয়েদের মনের অশান্তি আরো বেড়ে গেল।

—"এখন কটা বেজেছে? আমিও তোমার সঙ্গে যাব। রাত্রে আমি এখানে থাকতে পারব না। বাড়িটা যেন ভুতে-পাওয়া বাড়ির মত মনে হচ্ছে। আমিও তোমাদের সঙ্গে যেতে চাই।"

—"দূর বোকা, তুই গিয়ে কি করবি। বরং বাড়িতে থেকে লাংএর এবং চুচুদের দেখ। বাড়ির বাইরেটাও ভুতে-পাওয়া বলে মনে হবে।"

সান্ মু আর বেশি কিছু না বলে নিজের বসবার জায়গায় ঘরে বসল। ক্ষুদে চুচু তার পেছনে একটু নড়ে বসল।

টা ফু এবং অন্যরা দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এল। এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস তাদের গায়ে এসে লাগল। চাঁদ তখন মেঘের মধ্যে ঢাকা রয়েছে। মেঘের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে আকাশের তারা দেখা যাচ্ছে। কুকুর দুটো সঙ্গে নিয়ে এক মুহূর্তের মধ্যে তারা সেখান থেকে চলে গেল। গাছের আড়ালে আর তাদের দেখা গেল না। ঘরের লোকের যেন বাইরের জগতের সঙ্গে সব সম্পর্ক হারিয়ে ফেলল।

খাটের যেখানে টা ফু এতক্ষণ বসে ছিল লাংএর গরম জায়গাটা হাত দিয়ে ঘসতে লাগল। প্রথমটা সে তার বাবার জন্য কাঁদবে মনে করল, কিন্তু তারপর ভাবল তার চেয়ে তার ভায়ের পেছনে দৌড়ে যাবে। কিন্তু কি যে সে করবে কিছুই ঠিক করতে পারল না। লাংএর তাদের বাঁধের দিকে চলে যেতে দেখেছে। বাঁধটা তার কাছে একটা মজার জিনিস। দিনের বেলায় সে বাঁধের ধারে গিয়ে বাঁধের হলদে জলের মধ্যে চেয়ার, বাক্স, টেবিল, মুরগী, কুকুর সব ভাস্‌ছে দেখে এসেছে। লাংএর কাছে এসব এত মজার মনে হচ্ছিল যে, সে ভাত খাবার কথা ভুলে জলের মধ্যে ঐসব দেখছিল। কিন্তু এখন রাত্রিবেলা আর তার ঐ সব ভাবতে ভাল লাগছিল না।

বুড়ো ঠাকুমা আবার আরম্ভ করল—"আমি জানি বড়লোকেরা বানকে ভয় করে না। আমরা গরীবরাই ভয় করি, কারণ বান আমাদেরই শুধু ক্ষতি করে। বানে আমাদের গরু-বাছুর, খেত-খামার, ঘরদোর সব নষ্ট করে দেয়। চাংএর বাড়িতে আমি যখন ঝিএর কাজ করি, সেই সময়ের বানের কথা আমার আজও মনে পড়ছে। কত ভিখারী যে দেখেছিলাম তখন তা গুণে বলা যায় না। এরা অবশ্য সত্যিকারের ভিখারী না—বান তাদের ভিখারী করেছে। কিন্তু চাংদের কি? ছোট কর্তা তো মজা দেখার জন্য যেখানে বান এসেছিল সেখানে গেলেন। বুড়ো কর্তা তো সব ধান-চাল আটকে রেখে সাত আট গুণ চড়া দামে বিক্রি করে বেশ দুপয়সা রোজগার করলেন। তোমরা বিশ্বাস কর বড়লোকদের প্রাণ বলে কিছু নেই। দেবতাকে যতই ডাক না কেন, দেখবে বড়লোকদেরই দিন দিন টাকা বাড়ছে।

—খুব সম্ভব বড়লোকরা টাকার জোরে লক্ষ্মীকেও আটকে রাখতে পারে,—আর—"

একটা ইঁদুর ঘরের মধ্যে কোন ছিদ্রতে ধাক্কা দিয়ে একটা শব্দ করল।

—"বান এখনও আসেনি—কিন্তু ইঁদুর-গুলো এর মধ্যেই ঘোরাফেরা আরম্ভ করেছে, লক্ষণ দেখছি খুবই খারাপ। আমাকে বিশ্বাস কর আর না কর একটা

কিছু ঘটবেই। এমন এক সময় ছিল—"

হঠাৎ এক ঝলক বাতাস ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল—তার সংগে জলের এবং ভিজে মাটির গন্ধ এসে নাকে লাগল। দূর থেকে খুব অস্পষ্ট গলার শব্দ ভেসে এল। বাঁধের ধারে যারা কাজ করছিল তাদের মশালের আলোর রেশ দেখে মেয়েরা একটু ভরসা পেল। আবছা আলোয় মেয়েদের চোখের তারাগুলো এক মুহূর্তের জন্য জ্বলে উঠল। ক্ষীণ আলোর রেশ বাঁধের এক কোণে দেখা দিয়ে আবার মিলিয়ে গেল। দূর থেকে অস্পষ্ট গলার আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল, আস্তে আস্তে সেটাও মিলিয়ে গেল। চাঁদের আবছা আলোয় মেয়েদের মুখগুলো আরো করুণ মনে হচ্ছিল। বাতাসের শব্দ ছাড়া কিছুক্ষণের জন্য কিছুই শোনা গেল না। বিরাট অন্ধকারের মধ্যে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। কিছুক্ষণ বাদে দারুচিনি গাছের কাছে একটা কুকুরের ডাকের সংগে একটা অস্পষ্ট মূর্তি দেখা গেল, তারপর আর একটা, তৃতীয়, চতুর্থ। মূর্তিগুলো কাছে এলে বোঝা গেল চারজনের মধ্যে দুজন মেয়ে আর দুজন ছোট ছেলে।

—"আমাদের এখানে একটু আশ্রয় দাও। আমরা মা টান গ্রাম থেকে আসছি।"

—"মা টান থেকে? সে তো পরশু দিন বানে ভেসে গেছে, না?"

—"হ্যাঁ, বানেই ভেসে গেছে, সে এখান থেকে প্রায় ২৪ মাইল দূরে।"

—"ভেতরে এস বসো, আমাদের বলত কি হয়েছিল।"

মা টানের মেয়ে দুটো ক্লান্তিতে ঘরের ভেতর এসে ঢুকল, ছেলে দুটো ঘরের ঢোকবার আগেই দরজার কাছে পড়ে গেল।

—"যে রাত্রে বান এল, সেদিন খুব বৃষ্টি হচ্ছিল, বানে আমাদের সব ঘর-দোর ভেসে গেল। কোন কিছুই সংগে নেবার সময় পেলাম না। আমাদের ছোট মাটির কুঁড়ে বানের মুখে কুটোর মত ভেসে গেল। কিন্তু আমাদের পাড়াপ্রতিবাসীদের অবস্থা আরও খারাপ—শুধু তাদের কুঁড়ে না তারাও বানের সংগে ভেসে গেছে। খুব সম্ভব বান আসার সময় তারা তাদের জিনিসপত্র বাঁচাতে গিয়ে ঘর ছেড়ে বের হতে দেরী করেছিল। আমরা পরশু থেকে কিছুই খেতে পাইনি।"

—"আহা বেচারারা, দেখি আমাদের কি আছে। খুব সম্ভব চাট্টি ভাত ছাড়া আর কিছু নেই।"

—"তোমাদের গাঁয়ের পুরুষ মানুষরা কোথায়? তোমরা কোথায় যাচ্ছ? এখনও কি তোমাদের গাঁ জলের তলায় ডুবে আছে।"

"আমাদের সব পুরুষ মানুষরা গাঁয়ে থেকে গেছে।"

—"এতে আর লাভ কি? সেখানে তো থাকবার, খাবার, পরবার, কাজ করবার কিছুই নেই—"

—তারা গাঁ ছেড়ে আসতে চায় না। তোমরা ঠিকই বলেছ, সেখানে কিছুই নেই। মাঠের সব ধান জলের নীচে ডুবে গেছে—তবুও মাটির মায়া—তারা ছেড়ে আসতে পারছে না।"

—"তোমরা এখন কোথায় যাচ্ছিলে।"

"আমরা ইয়া সানু গ্রামে আমার এক ননদের বাড়িতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আজ সকালে রাস্তায় শুনলাম যে, ইয়া সানুএর অবস্থা আরো খারাপ। গাঁয়ের রাস্তা সব বন্ধ। কোথায় যে আমরা এখন যাব তা ভগবানই জানেন। আমাদের পুরুষরা ভাবছে যে আমরা ইয়া সানুএ গেছি।"

মেয়ে দুটো অল্পবয়সী, এদের বিশেষ কোন অভিজ্ঞতাও নেই—সেইজন্য এ রকম অবস্থায় পড়ে এরা খুব ঘাবড়ে গ্যাছে। একজন তো কাঁদতেই লাগল।

—"আমরা আবার ফিরে যাব।"

—"কোথায় মা টানে?"

—"এ ছাড়া আর উপায় কি। এখানটা অবশ্য নিরাপদ বলা যায়—"

—"এখানেও খুব নিরাপদ নয়। আমাদের সব লোকরা বাঁধের ধারে রয়েছে, কেউ বলতে পারে না কাল কি হবে।"

—"তা হলে! ধর যদি আমরা এখানে আটকা পড়ে যাই। আর আমাদের লোকেরা ভাববে যে আমরা ইয়া সানে রয়েছি—"

মেয়েটা ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে চীৎকার করে কেঁদে উঠল। বুড়ো ঠাকুমা এসব কিছুই শুনতে পাচ্ছিল না—শুধু চীৎকার করে কান্নার শব্দ শুনে ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল—"কি, কি হয়েছে কি? সত্যই কি অবস্থা খুব খারাপ।"

কেউ তার কথার উত্তর দিল না, বলতে কি কেউ তাকে লক্ষ্যই করল না। সকলে নিস্তব্ধ হয়ে বাইরে রাত্রের দিকে তাকিয়ে রইল। এমন সময় বাঁধের দিকে কাঁসরের আওয়াজ শোনা গেল। বাঁধের ধারের সেই কাঁসরের শব্দ মাঠের ওপর দিয়ে ভেসে এসে সমস্ত গাঁয়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। কাঁসরের শব্দ শুধু যে গাঁয়ের লোকদেরই মনে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল তা নয়, গাঁয়ের সব গরু, ছাগল তাদের খোঁয়াড় থেকে চীৎকার আরম্ভ করল। সমস্ত গাঁটা যেন ভয়ে জেগে উঠল। ঘরের মধ্যে থেকে একটি মেয়ে দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। তার দেখাদেখি অন্য সব মেয়েরাও বাইরে বের হয়ে এসে দারুচিনি গাছটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। শুধু বুড়ো ঠাকুমা রইল ঘরের মধ্যে।

লোকেরা চীৎকার করতে লাগল—"যাও, বাঁধের ধারে যাও। বাঁধকে বাঁচাতে হবে। একটি পুরুষও এ সময়ে ঘরে থেক না—কেউ পালিয়ে যেও না। এস, সকলে বাঁধের ধারে এস—"

কুকুরগুলো ক্ষেপা কুকুরের মত চীৎকার করতে লাগল। মশালের আলো সারবন্দী হয়ে নদীর বাঁধের দিকে চলেছে। গ্রামের সব লোকেরা সেখানে প্রাণপণ চেষ্টা করছে, বাঁধ বাঁচাবার জন্য।

কেউ মাটিতে হাঁটু গেড়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছে—"ভগবান আমাদের রক্ষা কর—বান থেকে বাঁচাও। বরুণদেব তুমি এই বান বন্ধ করে দাও।"

গাঁয়ের সব লোক জড়ো হয়েছে এক জায়গায়। সংখ্যায় এরা যতই বাড়ছে এদের ভয়ও বাড়ছে তত। ছোট ছেলেদের তারস্বরে কান্না, কুকুরের ডাক, মেয়েদের চীৎকার,—আর কাঁসরের আওয়াজ বেড়েই চলেছে। মশালের আলোগুলো যেন বেশি করে জ্বলছে।

—"বাঁধের ধারে,—ভাইরা সব বাঁধের ধারে এস।"

—"বাঁধকে বাঁচাতে হবে,—আমাদের পরিবারদের বাঁচাতে হবে।"

"ভাইরা তাড়াতাড়ি এস,—আর সময় নেই, মশালগুলো ধরো—আরো তুলে ধরো।"

গাঁয়ের জনস্রোত বাঁধের দিকে এগিয়ে চললো। এদের পেছনে আর একদল। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে উৎসাহ দিচ্ছিল। প্রত্যেক লোকের হাতেই মশাল।

—"সানু মু কোথায় যাচ্ছ? যেও না।"

"আমি আর এখানে বসে থাকতে পারব না।—আমিও বাঁধের ধারে ওদের সাহায্য করতে যাচ্ছি।"

—"আমিও তোমার সংগে যাচ্ছি।" তারা দুজনে প্রায় গড়াতে গড়াতে ঢালু পথটা দিয়ে বাঁধের দিকে নেমে গেল। ওদের লম্বা চুলগুলো বাতাসে উড়ছে দেখা গেল। ওদের সংগে সংগে আরও একদল বের হয়ে গেল—মেয়েরা শুধু ভয়ের সংগে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল। দূরে মশালের আলো মেয়েদের ওপর পড়ে ঘরের দেয়ালগুলোয় লম্বা লম্বা কালো ছায়া পড়ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে ছায়াগুলো মিলিয়ে গেল। মেয়েরাও একে একে হাতা খুন্তি হাতে নিয়ে বাঁধের ধারে পুরুষদের সংগে যোগ দেবার জন্য এগিয়ে চললো। নদীর জল বেড়েই চলেছে।

তৃতীয়ার এক ফালি চাঁদের আলোয় গাঁয়ের খোড়ো ঘরগুলো দেখা যাচ্ছিল। আকাশের ছায়াপথের ওপর তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল যেন ওখানেও তারার বান লেগেছে। মিঠে হাওয়া পশ্চিম দিক থেকে বইতে লাগল। গাঁয়ের ধানের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে হাওয়া বয়ে যাবার সময় মনে হচ্ছিল যেন এদের কানে কানে কিছু বলে যাচ্ছে। বুড়ো ঠাকুমা বিড়বিড় করে বলতে লাগল—"গণৎকার বলেছে এ বছর আমার একটা বড় ফাঁড়া আছে।"

[শ্রীইন্দ্রাণী সরকার কর্তৃক অনুদিত]

সংকলন

[এই বিভাগে বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন সাময়িক পত্র হইতে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধাবলীর নির্বাচিত অংশ মুদ্রিত হইবে]

নজরুল

শ্রীনলিনীকান্ত সরকার

তের শ' সাতাশ সালের অগ্রহায়ণ মাস। সান্ধ্যভ্রমণ সেরে আমাদের সেকালের "বিজলী" আপিসের বাড়িতে ফিরে দেখি, জনকয়েক তরুণকে নিয়ে চিরতরুণ বারীন্ দা' (বারীন্দ্র-কুমার ঘোষ) বেশ আড্ডা জমিয়ে বসেছেন। ঘরে ঢুকতেই তিনি আমাকে প্রশ্ন ক'রে বসলেন—"নজরুল ইস্‌লামের কবিতা পড়েছ?"

উত্তর দিলাম—"পড়েছি;—হাবিলদারের মতোই কবিতা।"

সঙ্গে সঙ্গে একটা উদ্দাম অট্টহাসির উত্তাল তরঙ্গ বেরিয়ে এল একটি তরুণের মুখের ভেতর থেকে। বারীন দা' সেই তরুণটির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ ক'রে বললেন—"ইনিই হাবিল-দার কাজি নজরুল ইস্‌লাম।"

আমি একটু লজ্জিত হ'য়ে পড়লাম, লোক-গুলোকে আগে-না-জেনে-শুনে ঐ অশোভন অভিমত প্রকাশের জন্য। কিন্তু আমি লজ্জিত হ'লে কি হয়? নজরুল ইসলাম যেন তাতে আরো বেশি আনন্দমুখর হ'য়ে উঠলেন।

তখন নজরুলের দু'-তিনটি কবিতা বেরিয়েছে "মোস্‌লেম ভারত" পত্রিকায়। তাঁর তখনকার সব রচনাতেই রচয়িতার নামের জায়গায় লেখা থাকতো হাবিলদার কাজি নজরুল ইসলাম। কোন কোন গুণগ্রাহী ব্যক্তি তাঁকে "সৈনিক কবি" বিশেষণেও ভূষিত করতেন। বিগত মহাযুদ্ধে তিনি বাঙালী পল্টনে যোগ দিয়ে হাবিলদার পদে উন্নীত হ'য়েছিলেন। যুদ্ধ-ক্ষেত্রের পদমর্যাদার মোহ তিনি বোধ হয় তখন কাটিয়ে উঠতে পারেন নি ব'লেই সাহিত্য-ক্ষেত্রেও নামের আগে হাবিলদার কথাটি জুড়ে দিতেন।

নজরুলের অভ্যুদয়ের যুগে যে-সব কবিতায় তাঁর স্বকীয়তা ফুটে উঠেছিল, সেগুলির মধ্যে আমি প্রথম পড়ি "শাতিল আরব" কবিতাটি। বোধ হয় ঐ শ্রেণীর কবিতার ঐটিই তাঁর সর্ব-প্রথম রচনা।

সেই প্রথম-দেখার-দিনের নজরুল উদীয়মান কবি মাত্র। তাঁর প্রতিভার দীপ্তি তখনও পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয় নি। রবীন্দ্র-প্রভাবিত কবিতাকুঞ্জের ভিতরে তাঁর কবিতা কয়টি একটুখানি স্বাতন্ত্র্য স্থাপন ক'রেছিল মাত্র। কিন্তু তাঁর মধ্যে যে বিপুল সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন ছিল, এটা তখনও অনেকেই জানতে পারেন নি। বাঙলা ও পারসিক শব্দের যোজনায় যে অপূর্ব-সুন্দর ছন্দঝঙ্কার তিনি তুলেছিলেন, তারই প্রতি অধিকাংশ রসিকজনের চিত্ত আকৃষ্ট হ'য়েছিল। এ নিয়ে উপহাসও করতো অনেকে। আমিও সে-দিন উপহাস ক'রেই বলেছিলাম—"হাবিলদারের মতোই কবিতা।"

নজরুল ইস্‌লাম মানুষটিকে সে-দিন খুবই ভালো লাগলো।—প্রাণখোলা হাসি, মন-খোলা কথা, দিল্-খোলা মানুষ। ওজন ক'রে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা ক'য়ে কৃত্রিম সভ্যতা জাহির করবার হাস্যকর প্রয়াসের বালাই নাই বরং তাঁর রসনার রস এমনই তরল ছিল যে, তথাকথিত সভ্যসমাজ তাতে যেন একটু অস্বস্তি বোধ করতেন তাঁর সান্নিধ্যে এসে। আমি কিন্তু নজরুলের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়েছিলাম এই স্বচ্ছ, স্পষ্ট, নির্ভীক মানুষটির জন্যে।

সে-সময় কলকাতায় সাহিত্যসেবীদের দুটি আড্ডা ছিল বড় রকমের। সুকিয়া স্ট্রীটে (বর্তমান কৈলাস বসু স্ট্রীট) কান্তিক প্রেসের তেতলায় ছিল "ভারতীর আড্ডা" আর



দ্বিতীয়টি ছিল ৩৮নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে "গজেনদা'র আড্ডা"। ভারতীর আড্ডার সকাল-বেলাকার আড্ডাধারীরা অনেকেই, যথাঃ—কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, নরেন্দ্র দেব, মোহিতলাল মজুমদার প্রভৃতি জমায়েৎ হ'তেন সন্ধ্যার সময় গজেনদা'র আড্ডায়। নজরুল এই আড্ডায় এসে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন। তখন তাঁর স্বরচিত সংগীত বেশি ছিল না, মাত্র একটি স্বরচিত গান তাঁর কণ্ঠে শোনা যেত "পথিক ওগো চল্‌তে পথে তোমায় আমায় পথের দেখা।"

কলকাতায় স্পেশাল কংগ্রেসের অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত হ'য়ে যাবার বছরখানেক পরে তুমুল রাজনৈতিক আন্দোলনে আইন-আদালত, স্কুল-কলেজ, রাস্তা-পার্ক এমন কি অন্তঃপুর পর্যন্ত যখন আলোড়িত, নজরুল ইস্‌লামের নূতন নূতন কবিতা ও গান সাহিত্য ও রাজনীতি উভয় ক্ষেত্রকেই উদ্দীপ্ত ক'রে তুল্‌লো। এই সময়েই নজরুলের প্রতিভা ছড়িয়ে পড়লো সারা বাঙলায়। সকালবেলাকার নবোদিত সূর্য যেন অকস্মাৎ মধ্যগগনে ভাস্বর হ'য়ে উঠে সকলকে বিস্ময়-বিমোহিত ক'রে তুললে।

নজ্‌রুল ইস্‌লাম সুকণ্ঠ ছিলেন না। কিন্তু স্বরচিত সঙ্গীত তাঁর নিজের কণ্ঠে যেন রূপে-রসে সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠ্‌তো। নজরুলের কণ্ঠে এমন একটি উপাদান ছিল যাতে তিনি তাঁর গানের অন্তর্নিহিত ভাবকে মূর্ত ক'রে এঁকে দিতেন শ্রোতাদের মানসপটে।

একটা কথা বলা প্রয়োজন। "বিজলী" কার্যালয়ে নজরুলকে প্রথম দেখার পর থেকে এই কালের ব্যবধান খুব বেশি নয়; হয়তো পাঁচ-ছ' মাস। কিন্তু জানি না কেমন ক'রে নজরুলের অন্তরের মানুষটি আমাকে এই অল্পকালের মধ্যে অচ্ছেদ্যবন্ধনে বেঁধে ফেললো।

নজরুল ইস্‌লাম এই সময় থাকতেন মেডি-ক্যাল কলেজের সম্মুখে ৩২নং কলেজ স্ট্রীটে "মোসলেম ভারত" কার্যালয়ের পাশের একটি ঘরে—এখনকার ভারতপ্রসিদ্ধ কমিউনিস্ট নেতা মুজফ্‌ফর আহ্‌ম্মদ সাহেব ছিলেন তাঁর সহ-কক্ষবাসীদের অন্যতম।

নজরুলের প্রাত্যহিক গতিবিধি ও কার্যসূচীর সন্ধান আগে থেকেই আমার জানা থাক্‌তো। একদিন সারা বিকেলটা নজরুলের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে ঠিক তার পরদিন সকালবেলায় গিয়ে দেখি, নজরুল ঘরে নাই। তাঁর একজন সহবাসী বন্ধু হাস্‌তে হাস্‌তে বললেন—"সে তো কাল রাত্তিরে কুমিল্লায় চ'লে গেছে।"

আমি বললাম—"কই, কাল তো কিছুই বললে না!"

"বলবে কি ক'রে? কাল সন্ধ্যার পরে একজন ভদ্রলোক এসে কী সব কথাবার্তা ক'য়ে কুমিল্লা যাবার প্রস্তাব করলেন; প্রস্তাব, অনুমোদন, সমর্থন সব মুহূর্তের মধ্যে—সঙ্গে-সঙ্গে শিয়ালদহ স্টেশনে যাত্রা।"

আমার চেয়ে এই সহবাসী বন্ধুরই চিন্তা হ'য়েছে বেশি। "প্রবাসী" পত্রিকার যেমন রবীন্দ্রনাথ, "মোসলেম ভারতে"র তেমনি ছিলেন নজরুল ইস্‌লাম। নজরুলের তখনকার লেখা প্রধানত বেরুতো "মোসলেম ভারতে" নজরুলের এই সহবাসী বন্ধুটি "মোস্‌লেম ভারতে"র কর্ণধার আফ্‌জল-উল হক।

নজরুলের আকস্মিক অন্তর্ধানে আমি ক্ষণিকের জন্য বিস্মিত হ'লেও না-জানিয়ে-যাবার ক্ষোভ আমাকে অভিভূত করেনি। কারণ আমি তাঁকে ভালো ক'রেই চিনতাম। অন্তরঙ্গ ছিলাম ব'লেই যে আমি একাকী তাঁর হৃদয়ের পান্থশালাটি জুড়ে ব'সে আছি, এ ভ্রান্ত বিশ্বাস আমার ছিল না।

বৈষ্ণব কবি শ্রীকৃষ্ণের গুণ-বর্ণনা ক'রেছেন—"সো বহুবল্লভ কান" ব'লে। নজরুলকে সে-সময় সেইরূপে বিশেষিত ক'রলে কিছুমাত্র সত্যের অপলাপ হ'তো না। তাঁর বলিষ্ঠ দেহ-মন, পৌরুষপূর্ণ রচনা, প্রেমপ্রবণ হৃদয়ের প্রতি স্বভাবতই অনেকে আকৃষ্ট হ'য়ে পড়তো। আচার্য শঙ্করের যেমন ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—নজরুলও তেমনি প্রেম-তান্ত্রিক সাধনায় এমন একটি স্তরে বাস করতেন, যেখান থেকে তাঁর মনে হ'তো যার-কাছে-আছি সেই সত্য, বাকী-সব মিথ্যা, মায়া। তাঁর চরিত্রের এই দিকটা জানা ছিল ব'লেই আমার কোন অভিমানের অভিযোগ ছিল না তাঁর ওপরে।

কুমিল্লায় তো তিনি গেলেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে যায়—না চিঠি না খবর, না খোঁজ না খবর। লোকমুখে ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা নানা গুজব রটতে লাগলো তাঁর সম্বন্ধে। সে-সবের সার-সংকলন ক'রে দাঁড়ালো এই যে, তিনি প্রথমত গিয়েছিলেন কুমিল্লার একটি পল্লীগ্রামে। সেখান থেকে ফিরে এসে কুমিল্লা শহরে অবস্থান করছেন এবং সতীন সেন প্রমুখ সেখানকার নেতৃবৃন্দের সহযোগে কুমিল্লা শহরটিকে বেশ তাতিয়ে তুলেছেন।

মাস ছয়েক কেটে যাবার পরে নজরুল ফিরলেন কলকাতায়। ফিরে আবার তিনি এখানকার আসর জাঁকিয়ে তুললেন। এই সময় তাঁর ইচ্ছা হ'লো একখানি সাপ্তাহিক বার করবার। কাগজের নাম হলো "ধূমকেতু।"

"আয় চলে আয় রে ধূমকেতু
আঁধারে বাঁধ্ অগ্নি-সেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে উড়িয়ে দে তোর
বিজয়-কেতন।

অলক্ষণের তিলক-রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা,
জাগিয়ে দে রে ডংকা মেরে আছে যারা
অর্ধ-চেতন।"

রবীন্দ্রনাথের এই আশীর্বাণী শিরে ধারণ ক'রে প্রতি সংখ্যা "ধূমকেতু" যে অগ্নিবৃষ্টি ক'রতে আরম্ভ ক'রলো তার একটি স্ফুলিঙ্গ নজরুলের "আগমনী" কবিতার ভিতর থেকে বেরিয়ে সটান গিয়ে পড়লো লালবাজার পুলিশের আপিসে। সঙ্গে সঙ্গে সিপাহী-শান্ত্রীতে "ধূমকেতু" আপিস ভ'রে গেল। তাঁরা তন্নতন্ন ক'রে খানাতল্লাসীর পর সেই সংখ্যা "ধূমকেতু" নিঃশেষে সংগ্রহ করলেন। নজরুলের নামেও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছিল, কিন্তু সকলের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি কখন যে অদৃশ্য হ'য়েছেন, সে সন্ধান কেউ দিতে পারলো না!

পুলিশের ঘ্রাণশক্তি জীবজগতে সুবিদিত। সুতরাং নজরুলকে আবিষ্কার করতে খুব বেশি দেরী হ'লো না। একদা সুপ্রভাতে সংবাদ পাওয়া গেল, কুমিল্লায় তিনি মিলেছেন। সেখান থেকে তাঁকে কলকাতায় এনে ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীটের পুলিশ আদালতে হাজির করা হ'লো। বিচারে জেল হ'লো নজরুলের।

নজরুল তখন হুগলী জেলে। বাঁধন-ভাঙা যার ব্রত, তাকে সামলায় কে! হুগলী জেলে তখন রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত আরও অনেক কয়েদী ছিলেন। নজরুল তাঁদের নিয়ে আরম্ভ করলেন জেলের শৃংখলা ভাঙতে, আর জেলের কর্তৃপক্ষও শৃংখল পরাতে লাগলেন তাঁকে ভালো ক'রে বাঁধতে। শাস্তি যখন চরমে উঠলো নজরুলও তখন চরমে উঠে আহার-ত্যাগের ব্রত গ্রহণ করলেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি তাঁকে প্রায়োপবেশন ভঙ্গ করবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে পত্র ও টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন। অনশনের আটাশ দিনে কয়েকজন নজরুল-অনুরাগী যুবক এসে আমাকে ধরলেন হুগলী জেলে গিয়ে তাঁর অনশন-ব্রত ভঙ্গ করাবার জন্যে। তাঁদের বিশ্বাস ছিল আমার অনুরোধ তিনি এড়াতে পারবেন না। কিন্তু নজরুলকে চিনতাম ব'লেই সে বিশ্বাস আমার আদৌ ছিল না, থাকলে আমি বহু পূর্বে স্বেচ্ছাক্রমেই গিয়ে তাঁকে খাইয়ে আসতাম। যাই-হোক, ঐ যুবক কয়টির আগ্রহাতিশয্যে সম্মত হলাম।

গেলাম দু'জনে—আমি আর পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। জেলে ঢুকতে পারলাম না। অনুমতি দিলেন না জেল-কর্তৃপক্ষ। ক্ষুণ্ণ মনে হুগলী স্টেশনে ফিরে এলাম—নজরে পড়লো প্ল্যাটফর্মের গা' ঘেঁষে জেলের পাঁচিল। দেখে মনে হ'লো দুর্লঙ্ঘ্য হ'লেও এ পাঁচিল ডিঙোনো একেবারে অসম্ভব নয়। আর যদিই বা ডিঙোতে না পারা যায়, তাতেই বা ক্ষতি কি? প্রকাশ্য দিবালোকে এই অপরাধমূলক প্রচেষ্টায় ধরা পড়বো নিশ্চয়ই এবং ধ'রে জেলের মধ্যে নিয়ে যাবে, এটাও সুনিশ্চিত। সুতরাং নজরুলের নিকটস্থ হবার এইটেই একমাত্র উপায় বলে স্থির করলাম। পবিত্রকে বললাম "তুমি আগে উবু হ'য়ে ব'সো—আমি তোমার দুই ঘাড়ে দুই-পা দিয়ে দাঁড়াই। তারপর তুমি আস্তে আস্তে দাঁড়াতে চেষ্টা কর। তোমার ঘাড়ের থেকে লাফ দিয়ে আমি পাঁচিলের উপরে যদি উঠতে পারি, তুমি আর এখানে থেকো না। সটান চ'লে যেয়ো। দু'জনে জেলে গিয়ে লাভ কি?"

তখন বোধ হয় বেলা দুটো। প্ল্যাটফর্মে যাত্রী বড় বিশেষ নাই। প্ল্যান মতো কাজ হ'লো। কায়ক্লেশে জেলের পাঁচিলের ওপরে উঠে ব'সলাম আমি। পবিত্র স'রে গেছে। পাঁচিলের ভিতরের দিকটা দেখে চক্ষু ছানাবড়া হ'য়ে গেল। ভিতরের দিকে দারুণ খাদ। অন্তত ২০।২৫ গজের নীচে মাটি! পাঁচিলের ওপরে আমি ঘোড়ায় চড়া ভঙ্গিতে ব'সে। জেলখানার ভিতরের মাঠে দেখলাম, মোক্ষদাচরণ সামধ্যায়ী মশায় বেড়াচ্ছেন। তিনি তখন হুগলী জেলে বন্দী ছিলেন। তাঁকে উচ্চ চীৎকার ক'রে বললাম—"নজরুলকে ডেকে দিন।"

তখন জেলখানায় কয়েদীদের দৃষ্টি পড়লো আমার দিকে। দলে দলে ছেলেরা জেলখানার ভিতরের মাঠে জুটতে লাগলো এই অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখবার জন্য। এরই ভিতরে দেখি দু' পাশে দুটি ছেলের কাঁধে ভর দিয়ে মাতালের মতো টলতে টলতে আসছেন নজরুল। বেশি দূর এগুতে পারলেন না,—একটি জায়গায় ব'সে পড়লেন। অতদূরে আমার চীৎকার হয়তো পৌঁছবে না ভেবে আমি জোড়হাত ক'রে খাবার জন্য ইঙ্গিতে অনুরোধ করলাম, প্রত্যুত্তরে নজরুলও জোড়হস্ত হ'য়ে ইঙ্গিতেই জানিয়ে দিলেন, তাঁর অনুরোধ রক্ষা করতে না পারার কথা।

বলা বাহুল্য এই সময়ের মধ্যে স্টেশন কর্মচারীরা ও কয়েকজন যাত্রী সমবেত হ'য়েছে আমার নিম্নস্থ প্লাটফর্মের ওপরে। স্টেশনের বাবুরা গালাগালি দিয়ে আমার চৌদ্দপুরুষের আদ্যশ্রাদ্ধ করছেন। ঐ ভিড়ের মধ্যে নেমে পড়লাম পাঁচিল থেকে লাফ দিয়ে প্লাটফর্মের ওপর এবং সরাসরি নীত হ'লাম স্টেশনের মধ্যে। স্টেশনের কর্তারা আমার সঙ্গে যে-ভাবে কথা বললেন, তাতে তাঁদের যেন দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, আমি বোমা-পিস্তলধারী সন্ত্রাসবাদী দলের কোনও সদস্য। যাই হোক, কিছুক্ষণ বাগ্-ধ্বস্তাধ্বস্তির পর কি-জানি-কেন তাঁরা আমায় মুক্তি দিলেন। পবিত্র ও আমি হতাশ হ'য়ে ফিরে এলাম। আমার পর আরও অনেকে অনেক রকমে চেষ্টা ক'রেছিলেন নজরুলকে খাওয়াবার জন্যে। তিনি কারও অনুরোধই রক্ষা করেন নি। সর্বশেষে তাঁর কুমিল্লার মাতৃসমা শ্রীযুক্তা বিরজাসুন্দরী দেবীর অনুরোধে তিনি আহারে সম্মত হ'য়েছিলেন। চল্লিশ দিন পরে নজরুল অনশন ভঙ্গ করেন।

নজরুলের জেলে থাকা কালে রবীন্দ্রনাথ বসন্তোৎসব করেন কলকাতায় এবং তাঁর "বসন্ত" নাটিকাটি উৎসর্গ করেন এই কথা লিখে—

শ্রীমান কবি কাজি নজরুল ইসলাম
স্নেহভাজনেষু

হুগলী জেল থেকে নজরুলকে স্থানান্তরিত করা হ'লো বহরমপুর জেলে। জেলে থেকেই তিনি বিভিন্ন সাময়িক পত্রে কবিতা পাঠাতেন। তখনকার দিনে কবিতার সাহিত্যিক মূল্য যতই থাক্ না কেন, আর্থিক মূল্য কিছুই ছিল না। (এ বিষয়ে একমাত্র ব্যত্যয় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।) কোন কাগজের মালিকই কবিতার জন্যে লেখককে টাকা দেওয়াটা অপব্যয় ছাড়া আর কিছু মনে করতেন না। জেলে থেকে পাঠানো যে কবিতাগুলি প্রবাসীতে প্রকাশিত হ'য়েছিল—ছোট বা বড় যে আকারেরই হোক—প্রত্যেকটি কবিতার জন্যে দশ টাকা হিসেবে দিয়ে নজরুলকে সম্মানিত করেছিলেন শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

আমার একবার ইচ্ছা হ'লো বহরমপুর জেলে নজরুলকে দেখতে যাবার। গেলাম বহরমপুরে। জেল কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করলাম। বিনা আয়াসেই আবেদন মঞ্জুর হ'লো। বেলা দশটা। হাজির হ'লাম জেলের ভিতরকার আপিস ঘরে। নজরুলের কাছে জেলের একজন কর্মচারী খবর পাঠালেন। কয়েক মিনিট পরেই এল নজরুল। এসেই তিনি হুকুম করলেন জেল কর্মচারীর ওপর আমার চা ও জলযোগের জন্যে। আমি তো হাঁ। এ আবার কী রকম কয়েদী রে বাবা!

জেলের আপিস ঘরেই অফিসারদের সম্মুখে আমাদের বিশ্রম্ভালাপ শুরু হ'লো। কলকাতা থেকে অন্তর্ধানের পর সে-দিন পর্যন্ত আদ্যোপান্ত ইতিহাস। হুগলীর জেল-কর্তৃপক্ষকে যে-সব গান গেয়ে ক্ষেপিয়েছিলেন, সেই গানগুলোও গাইতে আরম্ভ করলেন। জেলখানার আপিসে ব'সে গেল গানের আসর!

ইতিমধ্যে এসে হাজির ট্রে-তে ক'রে চা আর থালার ওপরে গরম গরম লুচি, বেগুন-ভাজা, হালুয়া। দেখলাম জেলখানাটিকে নজরুল নিজের ঘরবাড়ীর সামিল ক'রে তুলেছেন।

জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরে এসে বাঁধন-হারা নজরুল বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে হুগলীতে বাসা বাঁধলেন। হুগলী থেকে তাঁকে কৃষ্ণনগরে স্থানান্তরিত করলেন হেমন্তকুমার সরকার।

নজরুল কলকাতায় যাতায়াত করতেন। তিনি হুগলীতে যখন ছিলেন, সেই সময় কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টির একটি সংসদ সংগঠনের আয়োজন চলেছিল লোকচক্ষুর অগোচরে। মুজফ্ফর আহম্মদ, হেমন্তকুমার সরকার প্রভৃতির পরিচালনায় ৩৭নং হ্যারিসন রোড থেকে এই কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র "লাঙল" প্রকাশিত হ'য়েছিল। নজরুল "সাম্যের গান," "চাষীদের গান" "সব্যসাচী" প্রভৃতি কবিতা লিখে "লাঙল"-কে জনপ্রিয় ক'রে তুললেন।

এই সময় নজরুল রয়েছেন একদিন আমার বাড়িতে। দু'টি হিন্দুস্থানী পথচারী ভিখারী—একজন পুরুষ, অপরটি নারী—হার্মোনিয়মের সঙ্গে উর্দু গজল গেয়ে ঊর্ধ্বমুখে চলেছে সারা পল্লীতে মধু-বর্ষণ করতে করতে। নজরুলের আগ্রহে আমার বৈঠকখানায় তাদের ডেকে এনে গান শোনার ব্যবস্থা হ'লো। অনেকগুলো গান শুনিয়ে তারা বিদায় নিল। নজরুল তক্ষুণি বসলেন গান লিখতে। তাদের "জাগো পিয়া" গানটির রেশ তখনও আমাদের কানে যেন ধ্বনিত হ'চ্ছে। এই গানের সুর অবলম্বন ক'রে নজরুল কয়েক মিনিটের মধ্যে লিখে ফেললেন—
"নিশি ভোর হ'লো জাগিয়া, পরাণ পিয়া"

গানটি। তাঁর গজল গান লেখার শুরু এইখান থেকে। গজল গানের নেশা তাঁকে যেন পেয়ে ব'সলো। অসি ছেড়ে এই বাঁশী ধরবার জন্য কয়েকজন বন্ধু তাঁকে ব্যঙ্গবিদ্রূপও করেছিলেন যথেষ্ট। রসের সন্ধান পেলে কবি-প্রাণের প্রতিহত গতিমুখে সকল বাধাই তৃণখণ্ডের মতো ভেসে যায়। এ ক্ষেত্রেও তাই হ'লো। নজরুল এজন্য কয়েকজন রাজনৈতিক চরমপন্থীর বিরাগভাজন হ'য়ে পড়লেন।

কিন্তু অনুরাগ জাগ্‌লো অন্যত্র। গ্রামোফোন রেকর্ডের ব্যবসায়ীরা বুঝতে পারলেন নজরুলের গানে কাব্য-রস যে পরিমাণই থাক্ না কেন, গব্য-রসও আছে যথেষ্ট। সুতরাং তাঁরা এ সুযোগ ছাড়লেন না। তাঁরা নজরুল-দোহনের একটা পাকা ব্যবস্থা ক'রে ফেললেন। গ্রামোফোন কোম্পানীতে গিয়ে তাঁর আর্থিক সমস্যার সমাধান খানিকটা হ'লো বটে, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হ'লো বাঙলার রস-সাহিত্য। গ্রামোফোন রেকর্ডের জন্য লেখা অধিকাংশ গানই তাঁর প্রাণের প্রেরণায় নয়—পেটের জ্বালায়। অমুক গায়ক বা গায়িকার জন্য, এই ধরনের গান, এই জাতীয় সুরের কাঠামোতে, এতটুকু পরিসরে, এতটা সময়ের মধ্যে বেঁধে দিতে হবে—এই ধরনের ফরমাইসে রচিত পাইকারী গানে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়ে তিনি অচিন্তিতপূর্ব শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু নজরুল-প্রতিভার প্রকাশ স্বাধীন-প্রেরণাসম্ভূত, স্বতঃস্ফূর্ত হ'তে পারলো না, বাঙলা দেশের এ দুঃখ চিরকাল রয়ে যাবে।

হঠাৎ একদিন একটি বজ্রাঘাত হলো নজরুলের সংসারে। তাঁর চার বছর বয়সের শিশুপুত্র বুলবুল মারা গেল বসন্ত রোগে। ছেলেটি ছিল যেমন সুন্দর, তেমনি মধুর।

নজরুল যেন ভেঙে পড়লেন এই একান্ত অবলম্বনস্বরূপ পুত্রটিকে হারিয়ে। কিছুদিন পরে তিনি সে শোক সামলিয়ে উঠলেন। কিন্তু বাইরে আনন্দমুখর হ'য়ে উঠলেও তাঁর অন্তরের আগুন নেভেনি তখনও। বাইরের কোন কিছুর মধ্যে স্বস্তি না পেয়ে তিনি শান্তির সন্ধান করবার সংকল্প করলেন অধ্যাত্ম রাজ্যে। লালগোলা হাইস্কুলের হেডমাস্টার বরদাচরণ মজুমদার ছিলেন গৃহী-যোগী। তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নত অবস্থার কথা নজরুল জানতেন। ছুটে গেলেন বরদাচরণের কাছে। অন্তরে বিপুল প্রশান্তি নিয়ে নজরুল ফিরে এলেন কলকাতায়। অধ্যাত্ম-শক্তি লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সাধন-পথে স্বভাবতই যে অশুদ্ধ শক্তির দারুণ বাধা এসে দাঁড়ালো, তাকে অতিক্রম করতে নজরুল সমর্থ হ'লেন বটে, কিন্তু যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার ক'রে। সে ক্ষতি আজ পর্যন্ত পূরণ হয় নি। বিপুল প্রাণশক্তির আধার বলেই সে আসুরী শক্তির কাছ থেকে নিজেকে রক্ষা ক'রে তিনি আত্মস্থ হ'তে পেরেছিলেন। এর পর থেকেই নজরুলের জীবনের যেন আর একটি মোড় ফিরে গেল। ধর্ম-সাধনায় তিনি একাগ্র হলেন, সঙ্গে সঙ্গে চললো কোরাণ-পুরাণ-তন্ত্র-উপনিষদ প্রভৃতির অনুশীলন। এই সময়ের রচিত তাঁর সাধন-সংগীতগুলি সেই সাধনারই বহিঃপ্রকাশ।

কিন্তু নজরুলের মন অন্তর্মুখী হ'লেও তাঁর বাইরের আনন্দ-উৎসাহ কিছুমাত্র কমে নি, বরং বেড়েছিল। এদেশের সিনেমায় যখন বাণী-চিত্রের পরীক্ষামূলক প্রদর্শন চলেছে—দেখা গেল "ধ্রুব" নাট্যচিত্রের নারদের ভূমিকায় নজরুল। তাঁর "আলেয়া" গীতিনাট্য তখন সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হচ্ছিল। যিনি তাতে কবির ভূমিকা গ্রহণ ক'রেছিলেন, হঠাৎ তিনি একটি অভিনয়-রজনীতে অনুপস্থিত। নজরুল স্বয়ং সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'য়ে রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষেরও যেমন মান-রক্ষা করলেন, তেমনি বিস্মিত করলেন দর্শকদেরও।

অধ্যাত্ম-সাধনকালে জীবনের এই নবতম অধ্যায়ে তাঁর সৃজনী-প্রতিভার নূতন নূতন দ্বার খুলে গেল। বহু লুপ্তপ্রায় রাগ-রাগিণীকে তিনি সংগীত-বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে উদ্ধার ক'রে সেই সব সুরে গান রচনা করতে লাগলেন। কেবল তাই নয়, নির্ঝরিণী, রেণুকা, মীনাক্ষী, সন্ধ্যামালতী, বনকুন্তলা ও দোলনচম্পা নাম দিয়ে কয়েকটি নূতন রাগিণীরও সৃষ্টি করলেন। কলকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানে "হারামণি" ও "নবরাগমালিকা" অনুষ্ঠান-গুলিতে এই অসাধারণ শক্তির পরিচয় তিনি দিয়েছেন।

যে সময় তাঁর ভিতর থেকে এই নূতন নূতন শক্তির স্ফূরণ হচ্ছে, সংগীতে একটা নূতন রসের প্লাবন এসেছে, সে সময় সদানন্দ নজরুল পারিবারিক অশান্তিতে পীড়িত। স্ত্রী পক্ষাঘাত রোগে পঙ্গু—অজস্র অর্থব্যয়—আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক সকল রকম চিকিৎসায় বিফলতা প্রভৃতিতে তিনি যেন এক একদিন দিশেহারা হ'য়ে পড়তেন। তাঁর বর্তমান অসুখেরও উদ্ভব এই সময়েই। ......

কবিতা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৫১]



স্বাস্থ্যপ্রসঙ্গ

শরীরের কলকারখানা

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য, ডি টি এম

ছেলেবেলায় আমাদের দেশে একটা বাউলের গানে শুনেছিলাম—"ওরে ভাই, দেহটা এক আজব কারখানা, তাতে কল চালায় কতজনা।" তখন ভাবতাম এ গ্রাম্যকবির একটা কল্পনামাত্র, কিন্তু এখন বুঝতে পারি এই খাঁটি সত্যকথা। বাইরে থেকে চামড়ায় ঢাকা সুগঠিত মানুষের দেহটি দেখে কিছুই বোঝা যায় না, কিন্তু এর ভিতরে বিরাট এক কারখানা রয়েছে তার প্রত্যেক অংশে প্রত্যেক বিভাগে অনবরতই কাজ চলছে, সমস্তই নিয়মে বাঁধা, কোথাও একটুকু ত্রুটিবিচ্যুতি কিংবা ভুলচুক হবার যো নেই। তারই ফলে আমরা হাত-পা নাড়ছি, কথা বলছি, হাসছি খেলছি। এই কারখানার মধ্যে যদি কোথাও কোনো কল একটুমাত্র বিগড়ে যায় অমনি আমাদের হাসি-খেলা থেমে যাবে, আমরা আর সহজ মানুষটি থাকবো না। এই কারখানার সমস্ত কলগুলি যতক্ষণ ঠিকভাবে চলছে ততক্ষণই আমরা মানুষ, তার কোনো কিছু ব্যতিক্রম ঘটলেই আমরা নিতান্ত অসহায় অমানুষ। এক একটি মানুষের দেহ এক এক বিরাট কারখানা। কিন্তু কোনো কারখানাই কি অকস্মাৎ একেবারেই বিরাট হ'য়ে গড়ে ওঠে? তা নয়। যে-কোনো কারখানাই গড়া হোক, প্রথমে তার ভিত্তিস্থাপনা হওয়া চাই। প্রত্যেক কারখানার বেলাতেই একদিন প্রথমে কেউ একজন এসে একখানি ইট বসিয়ে তার ভিত্তিস্থাপনা শুরু ক'রে দেয়। তারপরে রাজমজুর আসে, মিস্ত্রিরা আসে, গাড়ি গাড়ি ইটকাঠ চুণ-সুরকি আসে, ধীরে ধীরে তার সমস্ত অংশ গড়ে উঠতে থাকে। তখন কোথাও বা কলঘর তৈরি হয়, কোথাও বা আপিসঘর তৈরি হয়, ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ঘরের বাঁটোয়ারা ক'রে, ভিন্ন ভিন্ন কাজের উপযোগী ক'রে তার পাকাপাকি ব্যবস্থা ক'রে নেওয়া হয়। তারপর তাকে সুদৃশ্য ক'রে সাজানো হয়, বাইরের থেকে রংচং লাগিয়ে তাকে চাকচিক্যশালী ক'রে নেওয়া হয়। এইসব প্রাথমিক গড়ার কাজ শেষ হ'য়ে গেলে তখন থেকে সুনিয়মে এবং সুশৃঙ্খলভাবে কারখানার কাজ চলতে শুরু হয়। মানুষের তৈরি কারখানার ইতিহাসে যদি এতটাই প্রস্তাবনা থাকে তবে প্রকৃতির হাতের গড়া জিনিস যে আরো সুকৌশলে এবং নিখুঁত-ভাবে তৈরি হ'য়ে উঠবে এতে আর আশ্চর্য কি? মানুষ তৈরির গোড়ার ইতিহাস থেকে যদি শুরু করা যায় তাহ'লে দেখা যাবে যে পিতা এবং মাতার দুটি বীজকোষ একদিন একত্রে মিলিত হ'য়ে একটি জন্ম-কোষ রচনা করে, এবং সেই কোষটি আশ্রয় পায় মাতার গর্ভে। অতি সূক্ষ্ম একটিমাত্র কোষ, এক ইঞ্চির দুশো ভাগের চেয়েও কম তার আয়তন সহজ চোখে দেখাই যায় না। মানুষ গড়ার এই হলো প্রথম ভিত্তি-স্থাপনা, ঐ একটিমাত্র অতি সূক্ষ্ম জন্ম-কোষের দ্বারা। তারপরে ইটকাঠ চুণ-সুরকি প্রভৃতি আর কিছুই এখানে দরকার নেই। প্রকৃতি স্বয়ং এখানে কারিগর, আর তার সম্বল ঐ একটিমাত্র কোষ। ঐ কোষের মধ্যে তখন অদ্ভুত এক প্রেরণার সঞ্চার হয়, সেই প্রেরণার বশে কোষটি অনবরত স্ফীতিপ্রাপ্ত হ'তে থাকে এবং আপন বেষ্টনীর মধ্যে নিজেকে ধারণ করতে না পেরে অনবরত দ্বিখণ্ড এবং দ্বিগুণিত হ'য়ে যেতে থাকে। ভিত্তিস্থাপনার পর থেকেই শুরু হয়ে গেল গড়ার কাজ, তখন থেকে এক মুহূর্ত আর বিরাম নেই। আদি জন্মকোষটি স্ফীত হ'য়ে দুভাগে ভাগ ক'রে হ'য়ে গেল দুটি কোষ। ঐ দুটি কোষ আবার স্ফীত হয়ে ভাগ করে হয়ে গেল চারটি কোষ। তখন এমনিভাবেই কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি চলতে থাকলো—চারটি থেকে আটটি, আটটি থেকে ষোলোটি, ষোলো থেকে বত্রিশ, চৌষট্টি ইত্যাদি। নিমেষে কোষগুলি স্ফীত হয়ে উঠছে আর দেখতে দেখতে সেগুলি বিভক্ত হ'য়ে সংখ্যায় দ্বিগুণ হ'য়ে উঠছে। যখন অনেকগুলি কোষ এমনিভাবে গায়ে গায়ে লেগে একসঙ্গে তাল পাকিয়ে উঠলো, তখন সেটা চোখে দেখা যায়, অ্যানাটমির ভাষায় তাকে বলে মোরুলা (Morula)। এখন থেকে এর সঙ্গে সঙ্গে আবার শুরু হলো অন্য রকমের কারিগরি, অর্থাৎ কোষগুলিকে বাঁটোয়ারা ক'রে ভিন্ন ভিন্ন কাজের উপযোগী ক'রে নেওয়া। যেগুলো বাইরের দিকে রয়েছে এবং চামড়া মাংস প্রভৃতি বাইরের জিনিস তৈরি করবার কাজে লাগবে সেগুলোর আকার এবং গঠন সেই অনুসারেই বদলে যেতে লাগলো। যেগুলো ভিতরের দিকে রয়েছে এবং ভিতরের যন্ত্রপাতি তৈরি করবার কাজে লাগবে, সেগুলোর গঠন এবং আকার স্বতন্ত্র ধরণের হ'তে লাগলো। অর্থাৎ যেন কতকগুলো কোষ হ'য়ে গেল ইটের মতো, কতকগুলো হোল কড়ি-বরগার মত, কতকগুলো জানালা-দরজার মত আবার কতকগুলো চুণ-সুরকির মতো। তখন এই সমস্ত সরঞ্জাম দিয়ে যেখানে যেটি গড়বার সেখানে সেটি গড়া হ'য়ে উঠতে লাগলো। কারখানার বাইরের গঠনটিও যেমনি ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ হ'য়ে উঠতে থাকলো, ভিতরে ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগেরও তেমনি ব্যবস্থা হতে থাকলো। যে ক্ষুদ্র কোষটি প্রথমে চোখেই দেখা যেতো না, সেটি তিনমাসের মধ্যেই হ'য়ে উঠলো ৪ ইঞ্চি লম্বা, তখন তার নাম হলো ভ্রূণ (Embryo)। সেটি ছয়মাসে হ'য়ে উঠলো এক ফুট লম্বা, আর নয় মাসে হ'য়ে উঠলো দেড় ফুট লম্বা এবং তিন সের ভারী এক পূর্ণাবয়ব শিশু (baby)। দশমাসে পড়ে যখন সেই শিশু ভূমিষ্ঠ হলো তখন তার ভিতরকার কলকারখানা সব তৈরি হ'য়ে গেছে তখন থেকে শুরু হবে তার নির্দিষ্ট কাজগুলো। এই শিশুটি আবার কালক্রমে মস্ত মানুষ হ'য়ে উঠবে, অর্থাৎ ছোটো কারখানাটি ক্রমে ক্রমে আরো প্রকাণ্ড হ'য়ে উঠবে।

বাইরের থেকে আমরা দেখি যে মানুষের শরীরে রয়েছে মাথাটা আর ধড়টা, আর তার সঙ্গে জোড়া রয়েছে দুজোড়া হাত-পা। কিন্তু এই মানুষের দেহের কারখানার মধ্যে ঢুকে যদি আমরা ভালো ক'রে বিশ্লেষণ ক'রে দেখি, তাহ'লে দেখা যাবে যে, এর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য নানারকমের বিভাগ রয়েছে, যেমন আমাদের আধুনিক কারখানা-গুলোতে থাকে। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জায়গায় যে স্বতন্ত্র রকমের বিভাগগুলো পৃথকভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে তা নয়, হয়তো নানা বিভাগের যন্ত্রপাতি এক সঙ্গেই গায়ে গায়ে লেগে রয়েছে, কিন্তু তারা পরস্পর নিজের নিজের নির্দিষ্ট কাজগুলি ঠিক ক'রে যাচ্ছে। প্রত্যেকটি বিভাগের পরিচয় দিতে পারা এখানে সম্ভব নয়, তবে মোটামুটি কিছু বলা যেতে পারে। প্রথমেই ধরা যাক অস্থি বিভাগ। আমাদের শরীরের মধ্যে ছোটো বড়ো লম্বা চওড়া অনেক রকমের অনেকগুলো হাড় আছে, পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা। এগুলো কাঠামোর কাজ করে। প্রতিমা গড়তে কাঠামো লাগে বাঁশের, কারখানা গড়তে কাঠামো লাগে লোহার, মানুষ গড়তে কাঠামো লাগে হাড়ের। এই হাড়ের উপরে ভর দিয়েই আমরা সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে পারি, শক্ত হয়ে ছুটোছুটি করতে পারি, আবার এই হাড়ের আড়ালে মস্তিষ্ক প্রভৃতি নরম যন্ত্রপাতিগুলো রয়েছে বলেই

আমরা বাইরের আঘাত থেকে সেগুলোকে রক্ষা করতে পারি। হাড়ের সঙ্গে সঙ্গে লেগে রয়েছে হাড়ের সন্ধিগুলো সেখানে শক্ত শক্ত বন্ধনী দিয়ে প্রত্যেকটি হাড়ের সঙ্গে অন্য অন্য হাড়কে এমনভাবে বেঁধে রেখেছে যার দ্বারা পরস্পরের মধ্যে কব্জার মতো কাজ হতে পারে, যারদ্বারা হাতপাগুলোকে আমরা ইচ্ছামত মুড়তে আর ছড়াতে পারি, যেমন খুশি খেলাতে পারি।

এর পরেই আসে মাংস বিভাগের কথা। শরীরের মধ্যে মাংসই থাকে সব চেয়ে বেশি, কারণ শরীরের যা কিছু ক্রিয়া মাংসের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। মাংসের প্রধান গুণ হচ্ছে স্থিতিস্থাপকতা, অর্থাৎ ইচ্ছামত এগুলো সংকুচিত আর প্রসারিত হ'তে পারে। শরীরের মধ্যে রয়েছে এমনি অসংখ্য মাংসপেশী। তার প্রত্যেকটির দুই প্রান্ত দুই স্বতন্ত্র জায়গায় আঁটা থাকে, সেটি সংকুচিত কিংবা প্রসারিত হ'লেই শরীরের এক অংশ অন্য অংশের কাছে সরে আসে কিংবা দূরে চলে যায়। এমনিভাবে কেবল মাংসপেশীর দ্বারাই আমাদের শরীরের সমস্ত স্থূলে এবং সূক্ষ্ম ক্রিয়াগুলি চলতে থাকে। ওঠা দাঁড়ানো কিংবা চলাবসা, যখন যা কিছুই আমরা করি, তা কেবল কতকগুলো মাংসপেশীর সংকোচন আর প্রসারণের দ্বারাই সম্পন্ন হ'তে থাকে। আমাদের পেটের মধ্যে, বুকের মধ্যে, এমন কি নাক-মুখ চোখের মধ্যেও রয়েছে মাংসপেশী, সেখানকার সব কাজগুলো তার দ্বারাই সম্ভব হচ্ছে।

তারপরে রক্ত-চলাচলের বিভাগ। এই বিভাগের প্রধান যন্ত্রের নাম হৃদযন্ত্র যা আমাদের বক্ষোদেশের মধ্যে থেকে অনবরত ধুকপুক্ করছে। এই যন্ত্রটিও মাংসপেশী দিয়ে তৈরী, যা প্রতি মিনিটে ৬০ থেকে ৮০ বার পর্যন্ত সংকুচিত আর প্রসারিত হচ্ছে মানুষ জেগেই থাক কিংবা ঘুমিয়েই থাক, এর একবারের জন্যও বিরাম নেই। এই হৃদযন্ত্রের মধ্যে রয়েছে চারটি গহ্বর, উপরকার দুটির দ্বারা রক্তকে গ্রহণ করা হয় আর নিচেকার দুটির দ্বারা রক্তকে পাম্প করে বাইরে চালান দেওয়া হয়। এই হৃদ-যন্ত্রের দুটি কাজ প্রথম দফায় বদ রক্তকে ফুসফুসের মধ্যে পাঠিয়ে দিয়ে অক্সিজেনের দ্বারা তাকে তাজা ক'রে ফিরিয়ে আনা, আর দ্বিতীয় দফায় সেই তাজা রক্তকে ধমনীর ভিতর দিয়ে চালান ক'রে দেওয়া। ধমনীগুলো সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হতে হ'তে চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে সর্বত্রই সমানভাবে তাজা রক্ত সরবরাহ করতে থাকে। শরীরের অসংখ্য স্থানে অসংখ্য ধমনী ছড়িয়ে আছে, সেগুলো শেষ পর্যন্ত জালক হ'য়ে মিলিয়ে যায়। সেই-জালক থেকে আবার অন্য এক দফা শিরা বেরিয়ে সূক্ষ্ম থেকে ক্রমশ মোটা হতে হতে শেষ পর্যন্ত হৃদযন্ত্রের মধ্যে গিয়া ঢোকে। এই শিরাগুলোর কাজ হচ্ছে চতুর্দিকে থেকে বদরক্ত নিয়ে হৃদযন্ত্রে পেঁ'ছে দেওয়া। অতএব ধমনী দিয়ে প্রতি মিনিটে ৬০ থেকে ৮০ বার তাজা রক্ত চালান যাচ্ছে আর শরীরের প্রতি কোষে কোষে সেই রক্ত অক্সিজেন এবং খাদ্য সরবরাহ করে সেখানকার আবর্জনা কুড়িয়ে নিয়ে বদরক্ত হয়ে তাই আবার শিরা দিয়ে ফেরত চলে যাচ্ছে। এই হলো রক্ত-চলাচলের কাজ।

এর পরে বায়ু বিভাগ। হাওয়া নইলে কোনো কারখানাই চলতে পারে না, হাওয়ার অক্সিজেন গ্যাস ভিন্ন আগুন জ্বলে না আগুন নইলে কোনো রকমের এনার্জি বা শক্তি উৎপন্ন হয় না। সুতরাং শরীরের মধ্যেও হাওয়া নেবার যন্ত্র চাই, এই যন্ত্রের নাম ফুসফুস। সর্বক্ষণ আমাদের নাক দিয়ে আর মুখ দিয়ে তারপর শ্বাস-নালী আর ক্লোম-শাখা-প্রশাখার ভিতর দিয়ে হাওয়া আমাদের দুই ফুসফুসের মধ্যে ঢোকে। কাজে কাজেই ঐ সমস্ত যন্ত্র-গুলি এই বিভাগের অন্তর্গত।

তারপরে হজম বিভাগ। কারখানা চালাতে অনবরত কয়লার ইন্ধন যোগানো চাই, তবেই তো আগুন জ্বলবে, তবেই তো শক্তি উৎপন্ন হবে। খাদ্য হচ্ছে আমাদের শরীরের সেই ইন্ধন, আর হজম যন্ত্রটা তার বয়লার। প্রত্যহ অন্তত দু'তিনবার করে সেখানে খাদ্যের জোগান দিতেই হবে। হজমের ঘরটা খুব প্রকাণ্ড, মুখ থেকে আরম্ভ করে মলদ্বার পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ ফুট লম্বা সরু মোটা এবং জড়ানো-পাকানো একটা নল। মুখ দিয়ে এই নলের মধ্যে খাদ্য প্রবেশ করে ক্রমে ক্রমে হজম হতে হতে শেষে যেটুকু অবশিষ্ট থাকে তা ছিবড়ে এবং মল হয়ে মলদ্বার দিয়ে বেরিয়ে যায়। এই সুবৃহৎ নলটির পাশাপাশি অনেকগুলো আনুষঙ্গিক যন্ত্র আছে যেগুলো খাদ্য হজম করাতে অনেক সাহায্য করে। যেমন মুখে রয়েছে দাঁত জিভ আর তিন জোড়া লালাগণ্ড। এখানে খাদ্যগুলো চর্বিত কুটিত এবং পিণ্ডীকৃত হয়ে লালার দ্বারা নরম হ'য়ে পেটের মধ্যে নেমে যায়। সেখানে অনেক রকম হজমের রস হাজির থাকে, আবার লিভার থেকে আর প্যাংক্রিয়াস থেকেও অনেক রকমের রস এসে সেখানে উপস্থিত হয়। তারপর চলতে থাকে অনেক রকম যন্ত্রের অনেক রকমের জটিল ক্রিয়া, কোনোটি বা রসের সঞ্চার করতে থাকে, কোনোটি বা খাদ্য থেকে সার রসগুলি আহরণ করে নিয়ে রক্তের মধ্যে চালান করতে নিযুক্ত থাকে। হজম বিভাগের যন্ত্রগুলির শুধু এইটুকুই কাজ।

এর পরে নিকাশ বিভাগ। চলতি কারখানায় আবর্জনা জমতেই পারে। নিত্য নিত্য পোড়া ইন্ধনের আবর্জনা, জলের আবর্জনা, তেলকালির আবর্জনা ভিতরের নিত্য ভাঙ্গা-চোরা আর বাইরের থেকে নিত্য উড়ে আসা ধুলোময়লার আবর্জনা। এগুলোকে নিত্য নিকাশ করতে হবে, জল দিয়ে ধুয়ে বের করে দিতে হবে। আমাদের কক্ষদেশের দুই পাশে অবস্থিত দুটি কিডনির কাজ হচ্ছে তাই। আমরা যত জল খাই সেই জল আবর্জনায় পূর্ণ হ'য়ে উঠলে তাকে রক্ত থেকে ছেঁকে নিয়ে কিডনি দুটি অনবরতই মূত্ররূপে নিকাশ ক'রে দিতে থাকে। সেই মূত্র ক্রমে ক্রমে মূত্রাশয়ে গিয়ে জমা হয়। কিছুক্ষণ অন্তর মূত্রাশয় পূর্ণ হয়ে উঠলেই বেগ এসে সেটুকু বাহিরে নিকাশ হয়ে যায়। এ ছাড়া আমাদের চামড়া দিয়ে যে ঘাম বেরোবার ব্যবস্থা আছে, তার যন্ত্রপাতি-গুলোও এই বিভাগেরই অন্তর্গত। পাছে কিডনি দুটি সমস্ত আবর্জনা নিকাশ করতে অসমর্থ হয়, তাই এই আরো এক রকমের আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা।

এর পরে প্রজনন বিভাগ। এইখানেই বীজকোষের জন্ম হয়, যার দ্বারা ভবিষ্যৎ বংশরক্ষার সূচনা হয়। পুরুষের বীজকোষ আলাদা এবং স্ত্রীলোকের বীজকোষ আলাদা সুতরাং তাদের কলকব্জাও আলাদা রকমের। তা ছাড়া পুংবীজ স্ত্রীবীজের সঙ্গে মিলিত হয়ে স্ত্রীলোকের গর্ভের মধ্যে সন্তানের সৃষ্টি করবে সুতরাং তার সুবিধার জন্য এই দুই জাতের মানুষের প্রজনন বিভাগের দুই স্বতন্ত্র রকমের যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

তারপর কর্তৃপক্ষ বিভাগ। শরীরের সমস্ত বিভাগেই কাজ করে এই বিভাগের অধীনে। কারখানার কর্তৃপক্ষেরা নিজের হাতে কিছু করেন না। আপন আপন অফিসে বসে টেলিফোনের দ্বারা চারিদিকে হুকুম চালান, সেই অনুসারে কাজ হয়। সুতরাং প্রত্যেক বিভাগের প্রত্যেক স্থানেই টেলিফোনের তারের ব্যবস্থা থাকা চাই। আমাদের শরীরেও তাই আছে, সেই তারগুলোর নাম নার্ভ। টেলিফোনে অবশ্য একই তারের ভিতর দিয়ে সংবাদের আদান-প্রদান চলতে পারে, কিন্তু আমাদের শরীরে তা নয়, এখানে সংবাদ আদানের তার এবং প্রদানের তার স্বতন্ত্র। শুধু তাই নয়, বাইরের সঙ্গে এবং ভিতরের বিভিন্ন বিভাগের পরস্পরের সঙ্গে যোগা-যোগের ব্যবস্থাও এখানে স্বতন্ত্র পাছে কিছু গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়, সেইজন্য এই বার্তা-বহু নার্ভগুলোকে দুই স্বতন্ত্র বিভাগের করে ভাগ ক'রে নেওয়া হয়েছে। যেগুলোর কেবল বাইরের সঙ্গে কারবার সেগুলো Cerebro-spinal system-এর অন্তর্গত, আর যেগুলোর শুধু ভিতরে ভিতরে কারবার, সেগুলো autonomic system-এর অন্তর্গত। বাহিরের প্রত্যেকটি খবরা-খবর প্রধান কর্তাদের জানান দরকার এবং

তাঁরা যেমন বলেন তাই করা দরকার, সেরিব্রো-স্পাইন্যাল নার্ভগুলো কেবল সেই কাজই করে এবং প্রত্যেকটি খবর আমাদের চেতনায় এনে উপস্থিত করে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কাজের সুবন্দোবস্ত করাই আছে, প্রত্যেক বিভাগের কর্মচারীরা অটোনমিক নার্ভের সাহায্যে পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ রেখে নিত্যকার কাজগুলি সুশৃঙ্খলভাবে চালিয়ে যাচ্ছে, সুতরাং কিছু বিগড়ে না গেলে প্রধান কর্তাদের কাছে কোনো খবর দেবার বা হুকুম নেবার দরকার হয় না, অতএব এই নার্ভগুলো আমাদের চেতনায় কোনো খবর আনে না, আমাদের অজ্ঞাতসারেই নিজের নিজের কাজ করে যায়। সুতরাং শরীরের কারখানার যাঁরা প্রধান কর্তা তাঁরা ভিতরের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থেকে বাইরের বিষয় নিয়েই ব্যাপৃত থাকতে পারেন। এই প্রধান কর্তারা থাকেন মস্তিষ্কের মধ্যে, এবং কতকগুলি থাকেন মেরুমজ্জার মধ্যে। শরীরের অধিকাংশ নার্ভ কিংবা বার্তাবহ সেখান থেকেই উৎপন্ন হয়। এ'রা যে কেবল বসে বসে হুকুম চালান তা নয়, অনেক রকমের দায়িত্ব এ'দের মাথার উপর। সর্বদিকে দৃষ্টি রেখে এ'রা সর্বদা হুঁশিয়ার হ'য়ে থাকেন, অতীত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে কারখানার মঙ্গলের দিকে কড়া নজর রাখেন, এর মঙ্গলের জন্যই অষ্টপ্রহর চিন্তা করেন, আবার প্রয়োজন হ'লে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেও কারখানাটিকে বাঁচিয়ে রাখেন। আনন্দের ভাগটা অবশ্য এ'রাই পান আবার দুঃখের ভাগটাও এ'দেরই মাথা পেতে গ্রহণ করতে হয়।

এই সমস্ত বিভাগ ছাড়া শরীরের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে কতকগুলো গণ্ড বা গ্ল্যান্ড আছে, সেগুলি বহির্নালীশূন্য। ভিতরে ভিতরে তারা রসক্ষরণ ক'রে রক্তের মধ্যে প্রেরণ করে তদ্দ্বারা শরীরকে সঞ্জীবিত করে শরীরের ক্রমোন্নতি ঘটায় এবং ইতরবিশেষের দ্বারা প্রত্যেক মানুষটিকে তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য এবং চরিত্র-বৈশিষ্ট্য দান করে।

মানুষের শরীরের সকল বিভাগের কথাই বলা হলো, বাকি রইল শুধু বহির্বিভাগের, অর্থাৎ আমাদের বহিরানুভূতির কথা —ইন্দ্রিয়গুলি এবং দেহের উপরকার চর্মটি। এইগুলির দ্বারাই আমরা বাইরের সঙ্গে ভিতরের যোগাযোগ রক্ষা করি। বাইরের থেকে যা কিছু গ্রহণ করবার এবং বাইরে আমাদের যা কিছু দান করবার বিষয় আছে, এইগুলির সাহায্যেই আমরা তা সার্থকভাবে সম্পন্ন করতে পারি। চোখ দিয়ে দেখি দৃশ্য, কান দিয়ে শুনি শব্দ নাক দিয়ে পাই আঘ্রাণ, জিভ দিয়ে পাই আস্বাদ, বহিঃপ্রকৃতিকে আমরা এই চতুর্বিধ উপায়ে উপভোগ করি। আমাদের চামড়াটাও কেবল-মাত্র আচ্ছাদন নয়, ওটাও একটা অনুভূতির যন্ত্র। চামড়ার সকল স্থানে অসংখ্য অনুভূতি গ্রাহী নার্ভ ছড়িয়ে আছে, তার দ্বারা আমরা পাই সকল রকমের স্পর্শ, আবার তার দ্বারা পাই শীতোষ্ণ এবং নানারূপ আঘাত ও বেদনার অনুভূতি।

এই আমাদের শরীরের বিরাট কারখানা। যাঁর পরিকল্পনা থেকেই এই কারখানাব প্রথম সৃষ্টি হয়ে থাক্, সে কথা এখন কারো জানা নেই, কিন্তু উপস্থিত এই কারখানার মালিক কে, এর ভালো-মন্দের ভার কার উপরে ন্যস্ত করা আছে, এর কাজের জন্য কার কাছে জবাবদিহি চাইতে হবে,—এর ম্যানেজার কে? ম্যানেজার আমরা প্রত্যেকেই নিজে নিজে, যেহেতু একমাত্র আমাদের উপরেই এর রক্ষণাবেক্ষণের ভার। এই কারখানার অন্তরালে রয়েছে অনন্ত সম্ভাবনা, অনেক কিছু সামগ্রীই এর থেকে উৎপন্ন হতে পারে। কালিদাসের নাটক, রবীন্দ্রনাথের কাব্য, বিবেকানন্দের দর্শন, আর জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার এই একই রকমের কারখানা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। চাষীর চাষ আর বাবুদের কেরানীগিরি এই একই রকমের কারখানার মাল। কোথায় কোন্ বস্তুটি উৎপন্ন হবে, তাই নিয়ে কোনো জবাবদিহি দেবার দরকার নেই, কিন্তু যেমনভাবে কারখানাটিকে সাজানো হয়েছে, তেমনিভাবে সেটিকে অবিকৃত এবং অক্ষুণ্ণ রাখবার দায়িত্ব সকলকেই মেনে নিতে হবে। নইলে এর দ্বারা চাষ করাও চলবে না, কেরানীগিরিও নয়। সুনিয়মে এবং সুশৃঙ্খলায় যা নির্মিত হয়েছে, অনিয়মে এবং বিশৃঙ্খলায় ব্যবহার করলেই সে জিনিস নষ্ট হয়ে যাবে, একথা সকলকেই স্মরণ রাখতে হবে। এ বিষয়ে অমনোযোগ করলেই হাতে হাতে ফল পেতে হবে, তখন আপশোষের সীমা থাকবে না।

আমি জানি, একজন স্নেহময় বাপ একবার তাঁর চারটি ছেলেকে চারটি ঘড়ি উপহার দিয়েছিলেন। প্রথম ছেলেটি ঘড়ির ব্যবহার জানতো না, যেখানে সেখানে অযত্নে ফেলে রেখে দিতো, দিনকতক বাদে তার ঘড়িটি খোয়া গেল। দ্বিতীয় ছেলেটি ব্যবহার জানতো, কিন্তু প্রায়ই দম দিতে ভুলে যেতো, বছরখানেকের বেশি তার ঘড়িটা আর টি'কলো না মরচে পড়ে নষ্ট হয়ে গেল। তৃতীয় ছেলেটি প্রত্যহই দম দিতো বটে, কিন্তু তার কোনো নিয়ম ছিল না, আর ঘড়িটা সে কখনো অয়েল করাতো না। তার ঘড়ি তিন বছরের বেশি টি'কলো না। চতুর্থ ছেলেটি খুব হুঁশিয়ার, প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে ঘড়িতে দম দেয়, কিছুকাল অন্তর অয়েল করায়, ঘড়িটি যত্নের সঙ্গে রাখে। তার কাছে ঘড়িটা আজও পর্যন্ত টি'কে আছে।

শরীরটা ঘড়ির চেয়েও অনেক বেশি দামী যন্ত্র। তাকে ঠিকভাবে চালু রাখতে হলে ঘড়ির চেয়েও অনেক বেশি যত্ন নিতে হবে। দিবারাত্র যে নিজের শরীর নিয়ে মহা চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে থাকতে হবে তাও নয়, আবার আপনা-আপনি বেশ চলে যাচ্ছে ভেবে পরম অবহেলায় নিশ্চিন্তভাবে যথেচ্ছাচার করে যেতে হবে তাও নয়। তবে ঘড়ির সম্বন্ধেও যেমন দম দেওয়া প্রভৃতি কতকগুলো নিয়ম মেনে চলতে হবে, শরীর সম্বন্ধেও তেমনি কতকগুলো নিয়ম মেনে চলতে হবে। শরীর রক্ষার জন্য মোটামুটি ছয় রকমের নিয়মের কথা বলা যেতে পারে—

১। প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে উপযুক্ত রকমের পরিমিত খাদ্য খাওয়া চাই, আর মাঝে মাঝে যথেষ্ট জল খাওয়া চাই।

২। আলো-বাতাসের মধ্যে থেকে গায়ে প্রচুর আলো-বাতাস লাগানো চাই।

৩। শরীরের আবর্জনাগুলোকে জমতে না দিয়ে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে নিকাশ করা চাই।

৪। শরীরকে যথেষ্ট খাটানো এবং যথেষ্ট বিশ্রাম দেওয়া চাই।

৫। শীতাতপ আর বৃষ্টি-দুর্যোগ থেকে শরীরকে সাধ্যমত রক্ষা করা চাই।

৬। পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থেকে রোগের সংক্রমণ ও রোগ-বীজাণুর আক্রমণ থেকে সাধ্যমত সাবধান থাকা চাই।

কেবল এই নিয়মগুলি যদি আমরা অবহিতভাবে মেনে চলি, তাহলে শরীর সম্বন্ধে চিন্তার আর কোনই প্রয়োজন থাকে না। আমরা আমাদের নির্দিষ্ট কর্তব্যগুলি যথাযথ পালন করে যেতে থাকলে শরীরও তার ভিতরকার অটোনমিক সিস্টেমের সাহায্যে ঘড়ির কাঁটার মত নির্দিষ্টভাবে চলতে থাকবে, কোথা দিয়ে দিনগত প্রাণধারণের কাজগুলো সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়ে যাচ্ছে, তা আমাদের জানতেও দেবে না। আর কিছু নয়, শরীরের চাহিদাগুলোর যথাযথভাবে যোগান দিয়ে—আর বাইরের বিপদ-আপদ বাঁচিয়ে চলতে পারলেই আমরা দীর্ঘায়ু আর সুস্থ হয়ে থেকে অবাধে নিজেদের কাজ করে যেতে পারবো। অবশ্য সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুপরিচালিত কলকারখানাও মাঝে মাঝে যেমন বিগড়ে যেতে পারে, সুনিয়ন্ত্রিত শরীরের কলকব্জাও তেমনি মাঝে মাঝে বিগড়ে যেতে পারে। তা যদি হয়, তবে তৎক্ষণাৎ সেটাকে মেরামত করিয়ে নিতে হবে। তবে বিশৃঙ্খলার প্রশ্রয় করিয়ে নিতে হবে। তবে বিশৃঙ্খলার প্রশ্রয় না দিয়ে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম মেনে যদি চলা যায়, তবে রোগ-পীড়ার সম্ভাবনা খুবই কম হয়। রোগকে আমরা অত্যন্ত ভয় করি, তাই নিয়ে অনেক রকমের দুশ্চিন্তা মনে পোষণ করি, কিন্তু যাতে রোগ নিবৃত্ত হয়, তার কোন ব্যবস্থা আগের থেকে করি না। বাঁধাবাঁধি নিয়মে চালাতে না জানলে কোন কল-কারখানাই সুশৃঙ্খলায় চলতে পারে না।

যে শিশু বাঁ হাতে কাজ করে

ডক্টর শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, এম এ, পি এইচ ডি

শিশুদের মধ্যে যাদের বাঁ-হাত অধিকতর সচল এবং সক্রিয় তাদের সম্বন্ধে আধুনিক শিশু-মনোবিজ্ঞান এমন কতকগুলো কৌতূহল উদ্দীপক, মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার ও আলোচনা করেছে, যা প্রত্যেক পিতা-মাতা ও শিশুর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীদের অবশ্যই জানা দরকার। শিশুকাল হতেই যারা বাঁ-হাতে কাজ করে আসছে, পরিণত বয়সে তাদের পক্ষে হাত পবির্তন করা সহজসাধ্য হয় না। শিশুদের মধ্যে কেউ কেউ গোড়া থেকেই কেন যে বাঁ-হাতে কাজ করতে সুবিধা বোধ করে, সে আলোচনা এখানে করছি না। এ অবস্থার পরিবর্তন যদি করাতে হয়, অর্থাৎ, ডান-হাতে কাজ করাতে হয়, তবে কি করে শিশুর দেহ-মনের স্বাভাবিক এবং সহজ স্ফূর্তি ব্যাহত না করে কিংবা বিকৃত অবস্থার সৃষ্টি না করে তা' সম্ভব, তাই এখানে আলোচনা করব।

সাধারণত দেখতে পাই, বাঁ-হাতে কাজ করাটাকে সবাই যেন একটা লজ্জাজনক ব্যাপার বলে মনে করেন। এর পক্ষে যুক্তি কি আছে, আমার জানা নেই। মহাভারতের বীর অর্জুন বাঁ-হাতে তীর ছুঁড়তে পারতেন বলে 'সব্যসাচী' নামে খ্যাত। এতে তাঁর গৌরব এতটুকু ক্ষুণ্ণ হওয়া দূরের কথা, বরং আরো বেড়েছে। এমন লোকও আছে, যাদের শিশুকাল থেকে বাঁ-হাত অধিকতর সচল ও সক্রিয়। কিন্তু বাঁ-হাতের সচলতা ও সক্রিয়তাকে নষ্ট না করে তারা সঙ্গে সঙ্গে ডান-হাতের সচলতা ও সক্রিয়তাকে বাড়াবার চেষ্টা করেছে। ফলে পরিণত বয়সে তারা অনেক কাজে—এমন কি লিখতেও—দুহাতই অনায়াসে সমানভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে। উভয় হাতই সব কাজে সমান দক্ষ এটা অবশ্য সচরাচর আমরা দেখতে পাই না। কারণ, তা বিশেষ শিক্ষা সাপেক্ষ। উভয় হাতকে সমানভাবে সক্রিয় করবার চেষ্টাতে লাভ বই ক্ষতি আছে বলে আমার মনে হয় না—পুরোপুরি সফলতা নাই বা হলো। সে যা-ই হোক, অবস্থার পরিবর্তন যদি করতেই হয়, তবে কি উপায়ে তা করতে হবে এবং সহজ উপায়ে সে চেষ্টা না করলে শিশুর দেহ মনের বিকাশ কিভাবে ব্যাহত ও বিকৃত হবার আশঙ্কা আছে, তাই এবার বলছি।

এমন দেখা গেছে যে, শাস্তির ভয় দেখিয়ে কিংবা শাস্তি প্রয়োগ করে যে স্থলে বাঁ-হাতে কাজ করবার সহজ ইচ্ছাকে দমনকরবার চেষ্টা করা হয়েছে, সে স্থলে শিশুর কথাবার্তার স্বাভাবিক উত্তর দিতে ইতস্তত করা, যেন কথা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, এমনি একটা অসহায় ভাব, উত্তর দিতে গিয়ে গলা দিয়ে স্বর বেরিয়ে না আসা ইত্যাদি অস্বস্তি ও গ্লানিজনক অবস্থার জন্য পূর্বোক্ত কারণই অনেকাংশে দায়ী। কোন কোন ক্ষেত্রে শিশুর তোতলামির কারণও এই অস্বাভাবিক চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। বাঁ-হাতে কাজ করে, এমন একটি শিশুকে কিছু লিখতে বলা হলো। শিশু বাঁ-হাত দিয়ে লিখতে গিয়ে খেলো পেনসিলের ঠোকা অথবা কানমলা। অপরাধ কোথায় শিশু সহজ চেষ্টায় তা ঠিক বুঝতে পারল না; তাই একটা প্রচ্ছন্ন ভয় ও বিমূঢ় ভাব তার মনে জেগে রইল। আবার যখন তাকে লিখতে বলা হলো, তখন বাঁ-হাতের স্বাভাবিক গতি আর মনের ভয়; এ দুই মিলে এমনি একটা পরস্পর বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি করলে, যার জন্যে সে না পারল বাঁ-হাতে লিখতে, না পারল ডান হাতকে দিয়ে সহজভাবে কাজ করাতে। এই যে একটা অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হলো, তার ফলে এক ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অপর ইন্দ্রিয়ের অন্বয় এবং ঐক্য সংগঠন হওয়া সহজসাধ্য এবং স্বাভাবিক হতে পারলো না কান নির্দেশ শুনলো কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই হাত যে কানের সঙ্গে সহজভাবে কাজ করবে তাতে ঘটল ব্যাঘাত। শিশু তাই কি লিখতে হবে শুনল, কিভাবে লিখতে হবে তাও জানে; কিন্তু লিখতে গিয়ে একটা দ্বিধায় পড়ে, অথবা কি লিখবে সঙ্গে সঙ্গে তা-ই না জেনে ইতস্তত করতে সুরু করলে।

শিশুর তোতলামির যে এটাই একমাত্র কারণ, এ কথা বলা আমার অভিপ্রেত নয়। তবে শিশুর সহজ ও স্বাভাবিক কথাবার্তা স্ফুরণের এটা একটা বড় অন্তরায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তোতলামির এটা একটা বড় কারণ, একথা বললে অত্যুক্তি করা হবে না। শিশুর মনের অভিব্যক্তি এবং সক্রিয়তার অনেক পূর্ব থেকেই দেহের সক্রিয়তা প্রকাশ পায়। এই সক্রিয়তা স্বচ্ছন্দ ও সহজ কাজকর্মের ভিতর দিয়ে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও পেশীসমূহের মধ্যে একটা সমন্বয় সৃষ্টি করে। বাক্য স্ফুরণে দেহের অংশবিশেষের, বিশেষত কণ্ঠসংলগ্ন পেশীর ও জিহ্বার সহায়তা এবং স্নায়ুর সংযোগ একান্ত প্রয়োজন একথা সম্ভবত কেউ অস্বীকার করবেন না। কিন্তু কোন কারণে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও পেশীসমূহের মধ্যে যদি সমন্বয়ে বাধা পড়ে, তবে বাক্যস্ফুরণের স্বচ্ছন্দতা ব্যাহত হবে। এতে আশ্চর্য হবার কোন কারণ নেই। দৈহিক সমন্বয়ের অভাব ছাড়াও মানসিক বিমূঢ়তা ও প্রচ্ছন্ন ভয় তোতলামির অন্যতম কারণ।

শিশুর দেহমনের স্বচ্ছন্দ ও সহজ অভিব্যক্তিকে ব্যাহত না করে পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। কিন্তু তা অতি নৈপুণ্যের সঙ্গে করতে হবে। এর জন্যে যতখানি ধৈর্য ও সহানুভূতি দেখানো প্রয়োজন, ততখানি না দেখালে কখনও সফলতা লাভ করা যাবে না। বলা বাহুল্য, এ চেষ্টা একেবারে গোড়াতেই আরম্ভ করা উচিত। কারণ, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শিশু কাজকর্মে যেমন অধিকতর অভ্যস্ত হতে থাকে, তেমনই তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও মাংসপেশীগুলোও ক্রমে অপেক্ষাকৃত যান্ত্রিক হয়ে পড়ে। তাই অবস্থার পরিবর্তন ক্রমেই অধিকতর আয়াসসাধ্য হয়ে যায়।

প্রথম অবস্থায় যখন শিশুর ডান-বাঁ জ্ঞান হয়নি, তখন কিছু দিতে গিয়ে 'ডান-হাতে নে বললে' শিশু তার অর্থ বুঝবে না। কাজেই এরূপ ক্ষেত্রে অন্য উপায় অবলম্বন করতে হবে। বিভিন্ন আকর্ষণীয় বস্তু শিশুর কাছে এমনভাবে বার বার ধরতে হবে, যাতে সে তার ডান হাত দিয়ে সেগুলো সহজে ধরতে পারে। লক্ষ্য রাখতে হবে, ডান হাতের কাছে ধরতে গিয়ে শিশুর যেন ধৈর্যচ্যুতি না ঘটানো হয়, কিংবা শিশু যেন মনে না করে যে তাকে অনর্থক বিরক্ত করবার জন্যে চেষ্টা করা হচ্ছে। এর পরিণাম ভাল না হয়ে খারাপ হতেও পারে। যেমন, বস্তুগুলো বাঁ-হাতের কাছে না পাওয়া পর্যন্ত শিশু কেঁদে কেটে অনর্থ ঘটাতে পারে। তাই, এরূপ ক্ষেত্রে বিশেষ কৌশল অবলম্বন করতে হবে। এ উপায়ে কিছুদিন অভ্যাস করালে ক্রমে শিশুর ডান হাত অধিকতর সচল এবং ডান হাতে কাজ করা স্বাভাবিক হয়ে যাবে। আর একটা পরিবর্তন যে হল, শিশু তা জানতেও পারবে না। সুতরাং কোন জটিল অবস্থার সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকবে না।

অপেক্ষাকৃত বয়স্ক শিশু, অর্থাৎ যে ডান-হাত ও বাঁ-হাতের পার্থক্য বুঝতে পারে এবং অন্যের ডান-বাঁ সম্বন্ধেও যার

ধারণা জন্মেছে, এমন শিশুর বেলা এরূপ চেষ্টা করা যেতে পারে, যাতে শিশু অন্যের কাজকর্ম দেখে নিজের অস্বাভাবিক অবস্থা সহজে বুঝতে পারে। কিন্তু এখানেও সাবধান হতে হবে, যেন বোঝাতে গিয়ে কোন বিদ্রূপ বা ব্যঙ্গাত্মক শব্দ ব্যবহার না করা হয়। শিশু যদি বোঝে যে, তার কাজে বিদ্রূপ বা উপহাসাত্মক কিছু আছে এবং যদি তা সহজভাবে গ্রহণ না করতে পারে, তবে নিজেকে অপরের চাইতে হীন বলে ধরে নেবার আশঙ্কা খুবই বেশী। এ ধারণা মনে একবার স্থান পেলে শিশুর স্বাভাবিক পরিণতি কখনই সম্ভব হতে পারে না। কাজেই এখানেও বিশেষ সাবধানতা ও কৌশল অবলম্বন করতে হবে। শিশুকে বুঝিয়ে দিতে হবে, এ অবস্থায় লজ্জা পাবার কিছু নেই এবং চেষ্টা করে এ অবস্থার পরিবর্তন করা খুবই সহজ। শিশু যদি তা বুঝে নেয়, তা হলে নিজের চেষ্টাতেই স্বাভাবিক হয়ে যেতে পারবে।

বাঁ-হাতের সঙ্গে বাঁ-দিকের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সক্রিয়তা ও সচলতা অনেক স্থলে দেখতে পাওয়া যায়। ফুটবল বা হকি খেলার মাঠে সচরাচর দেখা যায়, যারা বাঁ-হাতে কাজ করতে অধিকতর সুবিধা বোধ করে, তারা মাঠের বাঁ-দিকে ভাল খেলে। বাঁ-হাতের সঙ্গে বাঁ-পায়ের সক্রিয়তা ও সচলতা তেমন কোন সমস্যার সৃষ্টি করে না। কিন্তু যাদের বাঁ-হাতের সঙ্গে বাঁ-চোখ অধিকতর সচল ও সক্রিয় তাদের বেলা বিশেষ কতকগুলো জটিল সমস্যা দেখা দেয়। এরূপ স্থলে লিখতে বললে শিশু বাঁ-দিক থেকে না লিখে ডান-দিক থেকে লিখতে সুরু করে; পড়তে বললে শব্দকে উল্টো করে পড়ে। উল্টো লেখার বহু দৃষ্টান্ত খবরের কাগজে এবং স্কুল-কলেজে ছাত্রদের খাতায় আমরা দেখতে পাই। ইংরেজিতে একে "Mirror-writing" ও উল্টো পড়াকে "Mirror-reading" বলে। বাঙলা প্রতি শব্দ হিসেবে আমি যথাক্রমে "আরশি-লিপি" ও "আরশি-পাঠ" ব্যবহার করছি। "বড়"কে "ড়ব", "মন"কে "নম"; কিংবা "So"-কে "Os", "do"-কে "od"—এমনি দু' অক্ষরের শব্দকে উল্টো করে লেখা প্রায়ই আমাদের চোখে পড়ে। বাঁ-চোখের দৃষ্টি অধিকতর সক্রিয় ও সচল বলেই এরূপ ক্ষেত্রে শব্দের ডানদিকের অক্ষরের উপর আগে দৃষ্টি পড়ে, তাই ডানদিকের অক্ষরটা আগে বসে শব্দকে উল্টো করে দেয়। বড় শব্দের বেলাতেও এমনি ওলোট-পালট হতে দেখা যায়।

এরূপ ওলোট-পালট করে লেখা ও পড়া অস্বাভাবিক ও অনভিপ্রেত হলেও, এ অবস্থা এমন জটিল নয়, যে তা সংশোধন করা যায় না। কিন্তু কোন কোন স্থলে এমন দেখা গেছে যে, লিখতে গিয়ে শব্দের অক্ষরগুলোই ওলোট-পালট হচ্ছে না, সমস্ত লেখাটাই উল্টো হয়ে যাচ্ছে। প্রকৃত-পক্ষে "আরশি লিপি" বলতে এই শেষোক্ত অবস্থার কথাই বোঝায়। কিছু লিখে আরশির সামনে ধরলে "আরশি-লিপি" কথাটার অর্থ ঠিক বোঝা যাবে। এমনি অবস্থার একটি লোককে রাঁচি বাতুলালয়ে দেখেছি। লোকটি সাহেব; বয়স ত্রিশের কম হবে না। কিন্তু মনের দিক দিয়ে সে একটি চার-পাঁচ বছরের শিশু রয়ে গেছে। তাকে লিখতে বলা হলো—The boy is walking। বাক্যটিকে আরশির সামনে ধরলে আরশিতে যেভাবে দেখায়, ঠিক সেইভাবে উল্টো দিক থেকে এবং অক্ষর-গুলিও উল্টো করে সে লিখ্‌ল। এরূপ অবস্থা সংশোধন করা কতখানি সম্ভব, তা আজো গবেষণার বিষয়। এ অবস্থার সঙ্গে মানসিক অপরিণতি এবং দেহের-আভ্যন্তরিক ক্রিয়ার অস্বাভাবিকতা সচরাচর দেখতে পাওয়া যায়। কাজেই শুধু দৃষ্টির বা হাতের স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করে সন্তোষজনক ফল না পাওয়ারই সম্ভাবনা। এরূপ স্থলে অভিজ্ঞ দেহতত্ত্ব-বিদ্‌ও মনোবিকলনবিদ্‌দের পরামর্শ গ্রহণ করাই উচিত।


"লোকটির কাছে ব্লেড ছিল, কিন্তু নিয়ন্ত্রিত দামে আমাকে বিক্রি করতে অস্বীকার করল"
"এখুনি আমরা এব্যাপারে তদন্ত করছি"

জীবনের ঝরাপাতা

শ্রীসরলা দেবী চৌধুরাণী

[১২]

স্থলে জলে

স্কুলের বন্ধু মেয়েদের মধ্যে দুচারজনের আমাদের বাড়িতে এসে মধ্যে মধ্যে থাকার কথা বলেছি। আমরা কিন্তু কোথাও গিয়ে থাকবার অনুমতি পেতুম না—একটি বাড়িতে ছাড়া—সে খুসীর পিতৃগৃহে দুর্গামোহন দাসের বাড়ি। তখন তাঁরা সাহেবীপাড়ায় রডন স্ট্রীটে একটা প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ির উপরতলায় থাকতেন। স্বামী ও কন্যাগণ সহ খুসীর বড়দিদি সরলা রায়—ডাক্তার পি কে রায়ের পত্নী ঐ বাড়ির মাঝতলায় থাকেন। খুসীর মেজদিদি অবলা দাসের জগদীশ বসুর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে। তিনি নিজের বাড়িতে থাকেন। খুসীদের মায়ের মৃত্যু অনেকদিন আগে হয়েছে। তখন খুসীর দুই কনিষ্ঠ ভাই সতীশ ও জ্যোতিষ—পরে এস্ আর দাস ও জে আর দাস বলে' সুবিদিত—খুব ছোট ছোট ছিলেন। শুনতে পেতুম তাদের পিতা দুর্গামোহন দাস মাতৃহীন বালকদের এত সযত্নে ও সস্নেহে পালন করতেন, অনেক সময় মা বেঁচে থাকলেও শিশুরা অত আদরযত্ন পায় না। একবার জ্যোতিষের অসুখের সময় ডাক্তাররা মাসাবধি তার সন্দেশ রসগোল্লা খাওয়া নিষেধ করে দেন। সেই সময় দুর্গামোহনবাবু নিজেও তা খাওয়া বন্ধ করলেন—পাছে তাঁকে খেতে দেখলে ছেলের লোভ হয়। প্রতি পদে পদে সন্তানদের সঙ্গে তাঁর সহানুভূতির যোগ। তাই জন্যে সন্তানদের পিতৃভক্তিও তাঁর স্মৃতিতর্পণে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। এমন কি বৃদ্ধ পিতার সঙ্গীহীন দোসরহীন জীবনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা তাঁর সেবা, শুশ্রূষা ও একটি জীবনসঙ্গিনী লাভের প্রতি দৃষ্টি রেখে অতুলপ্রসাদ সেনের বিধবা মাতার সঙ্গে তাঁর বিবাহ সংঘটন করেন। অতুলপ্রসাদ ও তাঁর তিনটি বোনের পালনপোষণের ভার তিনিই গ্রহণ করলেন, ঠিক যেন নিজের ছেলে ও মেয়েদের মতই তারাও হল।

আমাকে খুসী যখন তাদের বাড়িতে নিয়ে যেতে লাগল, দেখলুম এদের বাড়ির চালচলনে অনেকটা সাহেবিয়ানা ঢুকেছে—বিশেষতঃ মিসেস পি কে রায়ের। তাঁর তিনটি মেয়ে লরেটো কন্‌ভেন্টে পড়তে যায়। আমাদের বাড়ির থেকেও প্রতিভাদিদি, তাঁর দুই একটি বোন ও বিবি—এঁরা লরেটোতে পড়তেন। কিন্তু বাড়ির হাওয়ায় ইংরেজিয়ানা মাথা তুলতে পারত না। এখানে বাঙালী মেয়েদের বাড়িতেও পরস্পরের সঙ্গে সদাসর্বদা ইংরেজিতে কথোপকথন সবপ্রথম শুনতে পেলুম। তার বেশ একটা চটক ছিল, বাঙালী ছোটমেয়েগুলির মুখে ফুট ফুট করে ইংরেজী ভাষণ বেশ মিষ্টি লাগত। কিন্তু সে মিষ্টতা আপাতমধুর—দেশপ্রিয়তার উজানে টেনে নিয়ে যাওয়া মিষ্টতা। বড় হয়ে যখন কালের হাওয়ার ধাক্কা খেয়ে আবার দেশের দিকেই চলতে ইচ্ছা হবে, তখন অনেক খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অগ্রসর হতে হবে। ইংগ-বংগ সমাজের যে সব মেয়েরা শুধু ইংরেজীতেই শিক্ষা পেয়েছেন—গোড়ার দিকে বাঙালী লেখাপড়া মোটেই শেখেন নি—পরজীবনে আহরিত বাঙলার উচ্চারণে তাঁদের একটা আড় থেকে যায়—না সেটা মেমেদের স্পষ্ট বিকৃত উচ্চারণ—না বাঙালীর স্বাভাবিক বাঙলা উচ্চারণ।

খুসী ও অবলাদিদি—লেডি বোস—বাঙালী মেয়েদের সঙ্গে বাঙলা স্কুলে মানুষ। অবলাদিদি উত্তরজীবনে তাঁর কার্যে কলাপে আচারে অনুষ্ঠানে প্রতি পদে পদে স্বদেশ ও স্বদেশী প্রেমের পরিচয় দিয়েছেন। আর সরলাদিদির সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই যে, বেংগল পার্টিসন আন্দোলনের সময় একদিন তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের সামনে দিয়ে গাড়ি করে যাচ্ছিলেন। তাঁর গাড়িতে হোয়াইটওয়ে লেডলর দোকান থেকে নেওয়া বিদেশী সওদা বোঝাই করা ছিল। স্বদেশী-মত্ত একদল ছেলে তাঁর গাড়ি রুখে গাড়ির সামনে রাস্তায় শুয়ে পড়ে তাঁকে অনুরোধ করলে—"মা বিদেশী জিনিসগুলো ফেলে দিন, নয়ত আমাদের বুকের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যান।" সেদিন ফলে কি হল ইতিহাসে তা লেখে না। কিন্তু সরলাদিদির বিদেশী ব্যবহার কোনদিন কম হতে দেখি নি! 'গোখলে মেমোরিয়াল স্কুল'—তাঁর কীর্তি। যেমন 'ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়' বলতে গেলে—অবলাদিদিরই কীর্তি। এই দুই স্কুলের পরিচালনার বিভিন্ন আদর্শেই দুই বোনের মনস্তত্ত্বের ভিন্নতা সুপরিস্ফুট।

খুসীর ভিতর কর্মবেগ ছিল না, কিন্তু আমাদের বাড়ির সংসর্গে ভাবেতে ও রুচিতে স্বদেশী হয়ে উঠেছিল। কর্মের দিক থেকেও একটি কর্মে সে আমার মায়ের সহায়কতা করেছিল। পূর্বে বলেছি বৃত্তি দিয়ে শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করে অন্তঃপুরে পাঠানর লক্ষ্য সখি সমিতির ছিল। সে লক্ষ্য সিদ্ধ হওয়া সময় সাপেক্ষ; কারণ যে সব মেয়েদের বৃত্তি দেওয়া হতে লাগল, তারা নিজেদের পড়াশুনা সাংগ করে উপযুক্ত হলে তবে ত বাড়ি বাড়ি গিয়ে পড়াবে! ইতিমধ্যে কিন্তু দুই এক বাড়ি থেকে আবেদন আসল শিক্ষয়িত্রীর জন্যে। খুসীর তখন বিয়ে হয়েছে—বিডন স্ট্রীটে বাঙালীপাড়াতে থাকে। তখনও তার সন্তানসন্ততি হয় নি। সে মাকে বললে—"আমার হাতে অনেক সময় রয়েছে, আমি যাব পড়াতে। ছাত্রীরা যে মাইনে দেবে সেটা সখিসমিতির ফণ্ডে জমা হোক।" খুসী যতদিন যেতে পারলে ততদিনই কিন্তু সখিসমিতির এই কাজটি চলল। কারণ বৃত্তিধারিণী মেয়েরা কেউ কার্যক্ষেত্রে নামেন নি। বৃত্তিবলে শিক্ষা প্রাপ্তা মেয়েদের ভাগ্যে বর জোটার জোয়ার লাগল। বৃত্তি গ্রহণের সময় একটা সর্তে তাদের বা তাদের অভিভাবকদের স্বাক্ষর দিতে হয়েছিল। তার মর্ম ছিল যে—এত বছর ধরে লেখাপড়া শিখে উপযুক্ত হবার পর এত বছর সখিসমিতির কাজ করতে হবে, না করলে তার জন্য সখিসমিতি যত টাকা খরচ করেছে ততটা টাকা সখিসমিতিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু সর্তটা শুধু কাগজে লেখাই রয়ে গেল। না কেউ কাজ করলে না কারো পূর্ব অভিভাবক বা স্বামী তার হয়ে টাকাটা সখিসমিতিকে ফিরিয়ে দিলে—একজন মাত্র কিয়দংশ ছাড়া। সখিসমিতির পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে মকদ্দমা আনা যেতে পারত—কিন্তু সখিসমিতি তার থেকে বিরত রইল। যারা চুক্তি ভংগ করলে, তাদের পাপ তাদের শিরে বোঝাই করে রাখলে, এবং অন্তঃপুরে শিক্ষয়িত্রী পাঠানর কল্পনাটি সখিসমিতির প্রোগ্রাম থেকে একেবারে মুছে ফেলা হল।

একাজ বহু বৎসর পরে হাতে নিলুম আমি —'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল' খুলে।

সাহেব পাড়ায় একটি বাঙালী পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে খুসীর বিশেষ বন্ধুতা ছিল —তাঁরা জাস্টিস চন্দ্রমাধব ঘোষের পত্নী, মেয়ে ও বৌ। তাঁর ছোট মেয়ে জগদীশ রায়ের স্ত্রী নলিনীর সঙ্গে খুসীর 'জ্যোৎস্না' পাতান ছিল। একবার খুসীদের বাড়ি যখন গেছি সে আমাকে তাদের বাড়ি নিয়ে যেতে চাইলে। এ বিষয়ে মায়ের অনুমতি নেওয়া হয় নি, তাঁকে না জানিয়ে কারো বাড়ি বেড়াতে যেতে খুব দ্বিধা আসতে লাগল মনে। খুসী বললে—"তোমার ভয় নেই, আমি গিয়ে তোমার মাকে বলব, কিছু বলবেন না তিনি।"

গেলুম সেখানে। গিয়ে যে অপূর্ব আনন্দ পেলুম তা আর বলবার নয়। চন্দ্রমাধব ঘোষের বড় মেয়ে—'দিদিমণি' সকলেরই দিদিমণি, তিনি টাকীর জমিদারনী, অল্প বয়সে বিধবা, নিঃসন্তান। বৈধব্যের পর পিতৃগৃহে মেম গভর্নেসের কাছে ইংরেজীতে সুশিক্ষিতা, বাঙলা ত ভালরকম জানেনই। আমাদের বাড়ির ধরণধারণ, শিক্ষাদীক্ষা, সাহিত্য ও সংগীত—সব কিছুর প্রতি তাঁদের বিপুল শ্রদ্ধা। সেই বাড়ির একজন মেয়েকে —স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যাকে—নিয়ে আসতে খুসীর প্রতি ভারি কৃতজ্ঞ হলেন, যেন আকাশের চাঁদ হাতে এনে দিয়েছে। আমার সঙ্গে তাঁদের স্নেহবন্ধন এত সুদৃঢ় হল—আমাকে এত চাইতে লাগলেন—খুসী যেন পিছনে পড়ে গেল। সত্যি তা নয়। তাঁদের হৃদয়ে খুসীর আসন তেমনি অটল রইল, শুধু আর একজনের জন্যে আরো একখানা আসন পাতা হল।

তারপরে আমার গান গাওয়ার পালা আরম্ভ হল—সেই যেমন অন্যান্য বাড়িতে হত; গায়িকার পক্ষে একটা তফাৎ এই যে, অন্যান্য বাড়িতে পুরুষ শ্রোতা ও সমজদার —এ বাড়িতে রসগ্রাহিণী মেয়েরা শুধু —যাঁদের সঙ্গে আমার রুচিতে রুচিতে হৃদয়ে হৃদয়ে মিল হয়ে গেল। নলিনীর ছেলেমেয়েরা দিদিমণিরই ছেলেমেয়ে যেন। তার দুটি ছেলে রবি, ছবি ও দুটি মেয়ে বীণা, বিভা। ছবির ভাল নাম অশোক—যিনি এখন স্যার এ কে রয়। তাকে দিদিমণি পোষ্য নিয়েছেন, লোকে দিদিমণিকেই তাঁর মা বলে জানে— বাড়িসুদ্ধ ছোটদের সবারই তিনি 'মামণি'।

বীণা স্কুলে যাবার যোগ্য হলে তাকে লরেটোতে পাঠান হল। সুন্দর মেয়েটির সুন্দর ঢলঢলে হাবভাব—সেজন্যে প্রাপ্য প্রশংসা প্রকৃতিদেবীর—আর সুন্দর তার পরিচ্ছদ—সেজন্যে প্রাপ্য প্রশংসা দিদিমণিদের সুরুচির। ছেলেবেলা থেকে লরেটোতে গিয়েও, ফিরিঙ্গি মেয়েদের সঙ্গে মেশামিশি করেও, বাড়িতেও ফিরিঙ্গি গভর্নেসদের দ্বারা পরিবৃত হলেও বীণার ভিতর এতটুকু ফিরিঙ্গিয়ানা প্রবেশ করতে পারলে না, দিদিমণিদের সুচারু অভিভাবকতায়।

রসায়নশাস্ত্রে বলে এমন এক একটা ধাতু আছে যা সবেতে dissolve হয়ে যায়—মিশ খায়। আমার ভিতর বোধহয় সেই রকম কোন একটা পদার্থ ছিল যাতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের সঙ্গেও মিশ খেয়ে যেতুম। খুসীর বড়দিদি মিসেস পি কে রায় আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়—আর আমার জাতীয় আদর্শ ও তাঁর আদর্শে মিল ছিল না—তবু তিনি আমাকে টানতে লাগলেন। তাঁর কতকগুলি গুণে আমি মোহিত হলুম। খুব আমুদে মজলিসী, হাসিখুশিতে ভরা, লোককে যত্ন করতে আপনার করে নিতে অদ্বিতীয়। তাঁর অন্তরে একটা seriousness—একটা গভীরতা ছিল, যা সচরাচর দেখা যায় না। বড় রকম কিছু-না-কিছু একটা করবার ইচ্ছা ভিতরে ভিতরে তাঁকে সর্বদা অনুপ্রেরিত করত। যদিও বাঙলা বেশী পড়েন নি—কিন্তু ইংরেজি ভারি সাহিত্যে Emerson প্রভৃতির রচনায় বিশেষ অনুরক্ত। তাঁদের লেখা নিয়ে আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে আলোচনা করতে বসে যেতেন। সব চেয়ে ভাল লাগত আমার তাঁর একাধারে ইংরেজিয়ানা ও দিশীয়ানা। যখন বালিগঞ্জে ছিলেন, তখন রবিবার দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্যে তাঁর বাড়িতে প্রায়ই লোকসমাগম হত ও বিকেলে টেনিস খেলা হত, অনেক বাইরের লোক আসতেন। রাঁধুনে নেই হয়ত, অসুখ করেছে। ঘর্মাক্তদেহে সারাদিন নিজে রেঁধেবেড়ে—বাঙ্গাল দেশের নানা সুস্বাদু ব্যঞ্জন ও বিকেলে চায়ের জন্য নানারকম খাবার—গা হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে ফিটফাট হয়ে টেনিস কোর্টে যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে দুচার হাত টেনিস খেলতেন, অতিথিদের আপ্যায়িত করতেন, পীড়াপীড়ি করে এটা ওটা সেটা খাওয়াতেন। রোগীর সেবায়ও একান্ত তৎপর দেখেছি তাঁকে। বিদেশীরা তাঁর গৃহে স্বগৃহের মত আরাম ও যত্ন পেত। একজন নরুইজিয়ান থীস্ট অর্থাৎ ব্রাহ্ম একবার কলকাতায় আসেন। গরীব, অর্থসম্বল বিশেষ নেই। আমাকে বলে' তাকে আমায় ফ্রেঞ্চ পড়াবার জন্যে রাখালেন। কিছুদিন পরে কঠিন কলেরা হল তার। সেই সময় সরলা রায় তাকে যেভাবে নার্স করলেন—না দেখলে অনুমান করা যায় না। বেচারাকে কিন্তু বাঁচাতে পারলেন না। মৈসোর থেকে রামস্বামী আয়েঙ্গার এসে তাঁরই বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিলেন। অতুলপ্রসাদ সেনের বোনের সঙ্গে তার বিবাহবন্ধন তিনিই বেঁধে দেন। গোখলে আর এক বিদেশী তাঁর আতিথ্য-নিগড়ে ধরা পড়লেন। শেষাশেষি কলকাতায় এলেই সরলা রায়ের গৃহই গোখলের আবাসস্থান হত। গোখলের সঙ্গে তাঁর সম্প্রীতির চরম নিদর্শন "গোখলে মেমোরিয়াল স্কুল।"

এ সব অনেক পরের ঘটনা। আমার পঠদ্দশাতেই খুসীর সঙ্গে তাদের বাড়ী আনাগোনায় তার বড় দিদির সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হল। দুর্গামোহন দাস ও চন্দ্রমাধব ঘোষ এই দুই পরিবারের সঙ্গে আমার সৌহার্দ্য বৃদ্ধিতে আমার মায়ের অনুমোদন ত রইলই, তিনি নিজেও সংযুক্ত হলেন। সরলাদিদি সখিসমিতির একজন উৎসাহী মেম্বর হলেন। দিদিমণিরাও হলেন।

একবার পূজার ছুটিতে ডাক্তার পি-কে রায় ও মিসেস রায় মাদ্রাজ হয়ে মহীশূরে যাত্রার সংকল্প করলেন—রামস্বামী আয়েঙ্গার এ বিষয়ে তাঁদের উৎসাহদাতা। সরলাদিদি আমায় বল্লেন—"যাবে সরলা আমাদের সঙ্গে? চল না।" আমি বল্লুম—"মারা কি যেতে দেবেন।" তিনি বল্লেন "আমি বলে' মত করিয়ে নেব।" সেকালে জলপথে ছাড়া মাদ্রাজ যাওয়া যেত না। আমি কখনো সমুদ্র দেখিনি, জলযাত্রাও করিনি। এ ভয়ানক সুযোগ—ওঁদের মত অভিভাবকের সঙ্গে যাওয়া। মা-বাবা-মহাশয় অনুমতি দিলেন। এই প্রথম বড় স্টীমারে চড়লুম আমি। এর আগে গঙ্গায় নতুনমামার 'সরোজিনী' বোটে মেজমামীদের সঙ্গে জলের উপর বাস কখনো কখনো করেছি। স্থির ধরণীর বক্ষে স্থলবাস ছেড়ে, কূলে বাঁধা তরণীর বক্ষে জলবাসের স্বাদ পেয়েছি। নিঝুম রাত্রে কোন স্টীমার বা বড় নৌকার ধাক্কায় যখন আমাদের বোট হঠাৎ দোলায়িত হয়ে উঠে তখন ঘুম ভেঙে অন্যান্য নৌকা থেকে মাঝিরা নানারকম কলরব করে, তাদের কণ্ঠধ্বনি মুখরিত আকাশের স্পর্শ পেয়ে মনে আসে বাড়িতে শুয়ে নেই, এক অভিনব পারিপার্শ্বিকে রয়েছি। ভোর হলে কুয়াসায় ছাওয়া গঙ্গার স্বচ্ছতা নিরোধ হয়ে যায়, কুয়াসা সরে সূর্যোদয়ের অনেক পরে সূর্য দৃশ্যমান হলেও সে সূর্যের সঙ্গে বাড়ির চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা বোধ হয়, আর বোটের জানলার ধারে বসে জলের তলায় চলায়মান জলজীবদের গতিবিধি দেখতে মজা লাগে—আমাদের নিত্যপরিচিত নিত্য-অভ্যস্ত স্থলজগৎ নয়, আর এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন জগতে যে এসেছি তা হৃদয়ঙ্গম হয়। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানির সমুদ্রগামী এক বৃহৎ জাহাজে মাদ্রাজ অভিমুখে যাত্রা করলুম। যেন হঠাৎ বিলেতের একখণ্ডে পদার্পণ করেছি। এখানে একেবারে ইংরেজী জীবনযাত্রা প্রণালী। ভোরের বেলায় ক্যাবিনের ভিতর স্টুয়ার্ডেস চা ও বিস্কুট দিয়ে যায়। তারপর উঠে স্টীমারের সরকারী স্নানাগারে

লম্বা টবে স্নান করে সারাদিনের মত বেশভূষা করে নিয়ে ৯টার সময় ভোজনাগারে যাওয়া। সেখানে প্রত্যেকের আলাদা স্থান নির্দিষ্ট আছে। আমাদের তিনজনের একটা টেবিল। ইংরেজী রকম প্রাতরাশের পর ডেকের উপর গিয়ে স্ব স্ব আরামকেদারায় বসে বা অর্ধশয়ান হয়ে বই পড়া, দৃশ্য দেখা, মধ্যে মধ্যে উঠে ডেকে পায়চারি করা, সহযাত্রীদের কারো সংগে আলাপ পরিচয় হলে তাদের সংগে গল্প করা—এই কাজ। কলকাতার জানাশুনা ইংরেজ ও আর্মানী দুই একজন ব্যারিস্টারও এই জাহাজে মাদ্রাজ বেড়াতে যাচ্ছিলেন। এই করতে করতে বেলা ১টা হয়ে যায়—তখন মধ্যাহ্নভোজনের জন্যে ভোজনাগারে পুনঃপ্রবেশ। এটা একটা গুরুভোজ, প্রাতর্ভোজনের মত লঘু নয়। এর পর স্ব স্ব ক্যাবিনে গিয়ে বিশ্রাম এবং ঘন্টা তিনচার পরে কেকাদি সমন্বিত বৈকালিক চা-পান হয় ক্যাবিনেই বা স্টীমারের ড্রইংরুমে। তারপর ডেকের উপর গিয়ে পাদচারণ বা কোন ব্যায়াম কিংবা ক্রীড়ার দ্বারা সান্ধ্যভোজনের জন্যে ক্ষুধা সঞ্চার। ডিনার খেতে ভোজনাগারে আসার সময় ডিনার সাজ পরে আসা চাই—নয়ত অভদ্র দেখাবে। মেয়েরা সেই সময় নিশ্চয়ই রেশমের পোষাক পরবেন—সুতির নয়। এই হল কায়দা। সেই কায়দা অনুসরণ করে যে যত চলবে, সে তত সভ্য বলে গণ্য হবে—নয়ত অসভ্য আখ্যা পাবে। চতুর্থ দিনে মাদ্রাজ পেঁছিন গেল। এর মধ্যে দেড় দিন মাত্র আমি খাড়া ছিলুম ও স্টীমারের জীবনপদ্ধতি অনুসরণ করেছিলুম। তারপরেই সমুদ্রব্যাধির কবলে পড়লুম। ক্যাবিনেই আমার দিনরাত্রি কাটতে লাগল—কোন কিছু খাওয়ার রুচি আর রইল না—খাদ্যবস্তু দেখলেই গা-বমি করে উঠত। স্টুয়ার্ডেস অনেক ভুলিয়ে ভালিয়ে আমাকে একটু কিছু খাওয়াত। এই খাওয়ার প্রাচুর্যের জন্যেই অনেক সাহেব মেম সমুদ্রযাত্রায় যেতে চায়। যাতায়াতের কয়লা খরচের চেয়ে খাবার যোগানতেই স্টীমার কোম্পানীর বেশি খরচ হয়। তাই খাবারের দামটা ভাড়ার অন্তর্গত। খাও আর না খাও—খাবারের দামটা ভাড়া থেকে কাটান যায় না।

চতুর্থ দিনে মাদ্রাজের উপকূল দেখা গেল। বন্দরের কাছাকাছি পেঁছিল জাহাজ। এবার জাহাজ থেকে তীরে পেঁছিতে 'কাটামারণ' নামে এক জাতীয় দিশী নৌকার আশ্রয় নিতে হবে। জাহাজ থেকে কাছি ধরে খালাসিদের সাহায্যে কোনরকমে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাইতে বাহিত হয়ে তীরে উঠতে হবে। তাতে ঝাঁপান, ঝাঁপিয়ে পায়ের ব্যালান্স রেখে দাঁড়ান বা বসা—এসবই মারাত্মক ব্যাপার। এ 'কাটামারণ' কিন্তু মাকু উলাউনের দ্বারা কোন যাত্রীর কোনদিন অপঘাত মৃত্যু ঘটায়নি। মাদ্রাজের বন্দরে আর কোন উপায়ে সেকালে যাওয়া অসম্ভব ছিল—উপকূলের সমীপস্থ জল ভীষণ দুরন্ত—তার বশীকরণ এই কাটামারণের দ্বারাই নির্বিঘ্নে হত। আমাদের অভ্যর্থনা করতে কূলে দাঁড়িয়েছিলেন বাঙালীবন্ধু—রজনী রায় মহাশয়—মাদ্রাজের তদানীন্তন একাউন্টান্ট জেনারেল। তিনি দাস পরিবারের বিশেষ বন্ধু—তাঁর স্ত্রী বিধুমুখী দেবী সুশীলাদিদির সম্পর্কে আমার সংগে সম্পর্কিত। তাঁদের ওখানে আট দশদিন কাটল আমাদের। রজনীবাবু তাঁর মাদ্রাজী বন্ধুদের পালা করে প্রতিদিন নিমন্ত্রণ করতে লাগলেন আমাদের সংগে আলাপ করিয়ে দেবার জন্যে। এঁরা কিন্তু সবাই প্রায় শিক্ষিত খৃষ্টান বা ব্রাহ্মসমাজী। তাঁদের হিন্দু উচ্চশ্রেণীর কোন মাদ্রাজী বন্ধু দেখলুম না। মাদ্রাজের হিন্দুরা তখন অত্যন্ত গোঁড়া।

রজনীবাবুদের হাতায় একজন সাধারণ মাদ্রাজীর গান শুনতে পেয়েছিলুম একদিন। আমার আর কাজকর্ম নেই—তাকে বাড়ির বারান্দায় ডাকিয়ে তার দুই একটা গান শিখে নিলুম, একটা হচ্ছে—

"বারুং নালুগুড়ো কৈধগিন্ন লে
বাসুদেব কি বরপুত্র!
রত্নসিংহাসন তল রাজয়ি রূপরিগ্গা
রি—রি—রি—রি—রি!"

কথা আমাদের পক্ষে উৎকট—কিন্তু সুর চমৎকার। একদিন ডিনার পার্টিতে সমাগত মিস্টার রায়ের মাদ্রাজী অতিথিদের তাঁদের দেশের গানই আমার মুখে শুনিয়ে দিলুম। তাঁরা অবাক হলেন, নিজেরা খৃষ্টান, তাই ইংরেজী গান ছাড়া নিজের দেশের গান তাঁরা গান না। আমার 'রি—রি—রি—রি'র আবৃত্তিতে বিশেষ আমোদ পেলেন, বল্লেন মাদ্রাজী সংগীতের চেহারাটি একেবারে ঠিকঠাক ধরে ফেলেছি। যেমন ইতিপূর্বে বাঙাল মাঝিদের গানে" মনমাঝি সামাল সামাল ডুবল তরী ভবনদীর তুফান ভারি—ই—ই মনমাঝি"তে 'ই'র টান ধরায় তাদের গানের চেহারা ফুটেছিল। এই আমার দক্ষিণী গান সঞ্চয়ের সূত্রপাত। রজনীবাবুর কন্যারাও গান করতেন—বিশেষত বড়-মেয়েটি—সুকুমারী সুগায়িকা. কিন্তু আমার মত বাতিকগ্রস্ত ত নয়। নাহলে কয়েক বৎসর মাদ্রাজে থাকাতে কত মাদ্রাজী সুর পুঁজি করে বাঙলাদেশে আনতে পারতেন। তা করেননি তাঁরা—বাঙালীসুলভ অন্য জাতির প্রতি ঘৃণাবশত তাদের সংগীতে কোন চমৎকারিতা পান না, যা পান শুধু একটা হাসিকৌতুকের অবসর।

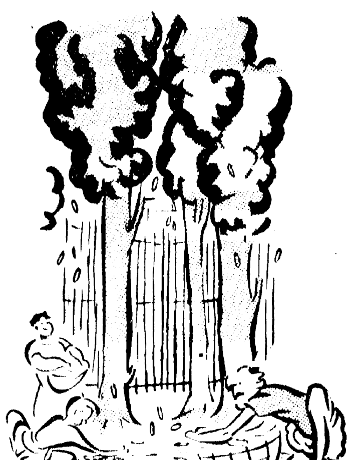
মাদ্রাজ থেকে আমরা মহীশূরে গেলুম। সেখানে ডাক্তার রামস্বামী আয়েঙ্গারের মাতুল দরবার বক্সী। তিনিই আমাদের অভ্যর্থনার সব আয়োজন করেছেন। আমরা সেখানে রাজ-অতিথি। মহীশূরে পদার্পণ করে দেখলুম একেবারে সংগীতের রাজ্যে প্রবেশ করেছি। সারাদিন-রাত্রি বায়ুতরংগে সংগীত ভেসে আসছে। উত্তর ভারতের সংগীতের মত নয়, দক্ষিণের একটি নিজস্ব অপূর্বতাসম্পন্ন। 'মহারাণী গার্লস স্কুল' দেখতে গেলুম। সেখানে দেওয়ানের পৌত্রীর তরংগায়িত কণ্ঠে ত্যাগরাজ নামে প্রসিদ্ধ তেলেগু কবির রচিত অনেকগুলি ওদেশী ক্লাসিকাল গান শুনে মুগ্ধ হলুম এবং মেয়েটিকে বাড়িতে আনিয়ে তার কাছ থেকে সেগুলি আদায় করলুম। দেশে ফিরে রবিমামাকে উপঢৌকন দিলুম। তিনি তাদের ভেঙে ভেঙে ব্রহ্মসংগীত রচনা করলেন—বাঙলার সুররাজ্য বিস্তৃত হল। ইতিপূর্বে গুজরাট থেকে তাঁদের নিজের সংগৃহীত গুজরাটি ভজনের কথা ও সুর এবং শিখগুরুদের পাঞ্জাবী গীতের ভাব ভাষা ও সুর নিয়ে মাতুলেরা আগেই বাঙলা সংগীতের ভান্ডারে প্রাচুর্য এনেছিলেন। নারীনাং মাতুলক্রমঃ। আমি তাঁদেরই গতানুগতিক হয়েছিলুম। —ক্রমশ

ট্রামে-বাসে

অত্যধিক তুষারপাতের ফলে সিমলার সঙ্গে বাইরের পৃথিবীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। জল জমিয়া যাওয়ায় এবং দুগ্ধ সরবরাহ বন্ধ হওয়ায় সিমলা-বাসী চা পর্যন্ত খাইতে পারিতেছেন না। এই প্রচন্ড শীতে চা খাইতে না পারাকে অবশ্যই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে। কিন্তু সিমলার পক্ষে পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকা তেমন একটা নূতন খবর নয়। এখন বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন শীতে, আর সাধারণ অবস্থায় বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকেন গরমে। এই গরম আবার—খাস শীতের দেশের আমদানী—পাখার হাওয়ায় শান্ত হয় না।

* * * * *

বাঙলার অস্ট্রেলিয়ান লাট মিঃ কেসির ভবনের সম্মুখে রৌপ্য মুদ্রা বর্ষণের সংবাদের সঙ্গে সঙ্গেই খবর আসিয়াছে, অস্ট্রেলিয়ার কোন অঞ্চলে নাকি সম্প্রতি শেম্পেন আর বীয়ার বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।



আমাদের কাব্যে পুরাণে দেবতাদের পুষ্প-বৃষ্টির কথাই এতদিন শুনিয়া আসিয়াছি। যুগধর্মের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া দেবতারা এখন যুগোপযোগী বৃষ্টিই ঢালিতেছেন। তাই প্রার্থনা, এতই যদি ভগবান করিলেন, তবে আমাদের অঞ্চলে কিছু চাউল আর কয়লা বৃষ্টির ব্যবস্থা যেন তিনি করিয়া দেন। মানুষের হাত হইতে এই দুইটি দুর্লভ বস্তু পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই আর নাই!

* * * * *

কৌতুকাবহ সংবাদ বণ্টনে আমেরিকার জুড়ি নাই। সম্প্রতি একটি সংবাদে প্রকাশ যে, যুক্তরাষ্ট্রের কোন অঞ্চলের এক বিদ্যালয়ে কাজ করিবার জন্য শিক্ষয়িত্রী সংগ্রহে বড়ই অসুবিধা হইতেছিল। উচ্চ বেতন এবং আনুষঙ্গিক নানা সুখ-সুবিধার তালিকা বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করিয়াও যখন কোন ফল হইল না, তখন কর্তৃপক্ষ প্রচার করিলেন যে—যাঁরা এই 'বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজে যোগদান করিবেন, তিন মাসের মধ্যে তাঁদের জন্য কর্তৃপক্ষ স্বামী সংগ্রহ করিয়া দিবেন। বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হওয়া মাত্রই নাকি শিক্ষয়িত্রীর কাজের জন্য তাড়ায় তাড়ায় আবেদন আসিতে লাগিল। যুদ্ধোদ্যমে বা সাধারণ অফিসের কাজে মহিলা কর্মী সংগ্রহের জন্য কর্তৃপক্ষ অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে আমাদের দেশেও উক্ত পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হইতে পারে। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

* * * * *

Casual leave, Privilege leave এবং তার সঙ্গে ঠাকুরমার গঙ্গাযাত্রায় যোগদানের জন্য ছুটি, স্ত্রীর মাথা ব্যথায় সেবাকার্যের জন্য ছুটি, নিজের পেট-কামড়ানির জন্য ছুটি, প্রভৃতি অসংখ্য ছুটির আবেদন পেশ করিয়া আমরা কখনও দীর্ঘ দিনের জন্য অফিস কামাই করি এবং কখনও-বা দুই-এক ঘণ্টার জন্য অফিস পলাইয়া মোহনবাগানের খেলা দেখি। সম্প্রতি যুদ্ধের কল্যাণে আর একটি নূতন ছুটির সন্ধান পাওয়া গেল। বর্মাতে যে সমস্ত সৈন্য যুদ্ধ করিতেছেন, তাঁহা-দিগকে পারিবারিক কর্তব্য সম্পন্ন করিবার সুযোগ দেওয়ার জন্য সমর-কর্তৃপক্ষ Baby Leave-এর ব্যবস্থা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য সিভিলিয়ানদের পক্ষে এই ছুটির অছিলা দেখাইয়া মোহনবাগানের খেলা দেখা চলিবে না।

* * * * *

প্রখ্যাতা চিত্র-তারকা শান্তা আপ্তে কলিকাতায় নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি গান গাহিবার সময় অন্য কোন গায়ক-গায়িকা মঞ্চের উপর থাকিতে পারিবেন না—এই দাবী নাকি তিনি সম্মেলনের কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিয়া-ছিলেন এবং কর্তৃপক্ষও এই দাবী মানিয়া



নিয়াছেন। হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের ললিত-কলার ভাষ্যকার মহাশয় বলিয়াছেন যে, সংগীতের মত একটি সার্বজনীন সম্মেলনে শ্রীমতী শান্তার এই অসঙ্গত দাবী পূরণ করিয়া বৈষম্য সৃষ্টির প্রশ্রয় দান করা কর্তৃপক্ষের শোভন হয় নাই। ভাষ্যকার মহাশয়ের বোধ হয় স্মরণ নাই যে, শ্রীমতী শান্তার সংগীত একটু রাগ-প্রধান। সিনেমার ব্যাপারে দুই-এক জায়গায়—তাঁর দীপক রাগের কথা স্মরণ করিয়াই হয়ত কর্তৃপক্ষ শ্রীমতীর নির্দেশ শুনিতে বাধ্য হইয়াছেন। আমরা তাঁদের বুদ্ধির তারিফ করি।

* * * * *

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের সহধর্মিণী স্বামীর সঙ্গে রাজনৈতিক সফরে যাইবার বায়না করিয়াছিলেন—কিন্তু "স্ত্রীদের বিশ্বাস করিবে না"—এই চাণক্য-নীতি দেখিতেছি আমেরিকাতেও অনুসৃত হয়, কাজেই রুজভেল্ট-পত্নীর আব্দার টিকিল না। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী এখন আমেরিকায়



আছেন। সর্বদেশীয় নারীদের স্বার্থ-সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ হইয়া "রাজপুরুষকে অবিশ্বাস" করিবার নীতিটিও তিনি প্রেসিডেন্ট-পত্নীকে শিখাইয়া দিতে পারিতেন এবং ফলে নারীর প্রতি পুরুষের এই ডিক্টেটারী মনোভাবের সমুচিত উত্তর দেওয়া যাইত। কিন্তু আমেরিকার "শ্বেতালয়ে" কৃষ্ণকায়া (আমাদের মাপকাঠিতে নয়) বিজয়-লক্ষ্মীকে অভ্যর্থনা করিতে অস্বীকার করিয়া প্রেসিডেন্ট-পত্নী সেই সুযোগ নষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু তবু আমরা বলি—Better late than never—সহ-যোগিতার এই মাহেন্দ্রক্ষণটির অপচয় ঘটিতে যেন প্রেসিডেন্ট-পত্নী না দেন। মিস্ মেয়ো বর্ণিত ভারতের বাইরেও একটি বৃহত্তর ভারত আছে, বিজয়লক্ষ্মীর সঙ্গে পরিচয়ে তিনি সেই পরিচয় পাইবেন।

গোবর্ধন বৈরাগী অনেক গানই আমাকে শুনাইয়াছিল, তাহাদের ভিতর একটি গান বারবার শুনিয়াও আমার আশ মিটিত না। গানটির খানিকটা এই:

"যে তোমার নিন্দা করে ভারী
সে তোমার আসল বন্ধু,
জানবা ওরে মন ব্যাপারী।
যে তোমারে ভাল বলে
সে আছে ঠকাইবার ছলে,
(তারে) প্রত্যয় যদি যাও রে বন্ধু
ঘটতে পারে কেলেঙ্কারী........"

এক সময় ছিলো যখন কেহ আমার লেখার নিন্দা করিলে দুঃখিত এবং ক্রুদ্ধ হইতাম, প্রশংসা করিলে পুলকিত এবং কৃতজ্ঞ হইতাম। বৈরাগীর গান কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করার পর হইতেই মন বদলাইয়া গিয়াছে; এখন আমার লেখার নিন্দা শুনিলে পুলকিত হই, কিন্তু প্রশংসা শুনিলেই উচ্ছ্বসিত এবং কৃতজ্ঞ হইয়া উঠি না। যাঁহারা লেখার নিন্দা করিয়া আমাকে দুঃখ দিতে অথবা লেখার প্রশংসা করিয়া আমাকে বাধিত করিতে চান তাহাদের অবগতির জন্য লিখিতেছি। যাহাদের সাহিত্যিক হইবার সাধ ও সাধনা আছে, তাহাদের দৃষ্টি ও আকর্ষণ করা উচিত মনে করিতেছি।

* * *

আমার লেখার কেহ প্রশংসা করিলে প্রথমেই আমি তাহাকে সন্দেহ করি। প্রশংসাকারীর কিছু টাকা ধার করিবার মতলব থাকার সম্ভাবনা আছে মনে হইলে আগেই তাহার কাছে কিছু ধার চাহিয়া তাহার পথ বন্ধ করিয়া রাখি। আমার সাহিত্য-প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া যাহারা আমার খরচায় সিনেমা দর্শন অথবা ভীম নাগের সন্দেশ ভক্ষণ আশা করিতেছেন তাহারা ভবিষ্যৎ হতাশার বীজ বপন করিতেছেন। কারণ গোবর্ধন বৈরাগী আমাকে এই একটি সত্য ভাল করিয়াই শিখাইয়াছে যে, প্রশংসা শুনিলে আমার যত ক্ষতির সম্ভাবনা আছে, নিন্দা শুনিলে তত ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। আমার নিজের লেখার ভাল দিকটা আমার নিজের দৃষ্টি এড়াইবার সম্ভাবনা কম এবং এড়াইলেও ক্ষতি বেশী হইবে না; কিন্তু আমার লেখার দোষগুলি আমার দৃষ্টি এড়াইয়া যাইবার সম্ভাবনাও যেমন বেশী, তাহাতে আমার ক্ষতিও তেমনি বেশী। অতএব নিন্দা করিয়া আমার লেখার দোষগুলির প্রতি যাহারা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাহারা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে আমার আসল বন্ধুর কাজই করেন। তাঁহাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

* * *

নিন্দা অনেক ক্ষেত্রেই ঈর্ষাপ্রসূত হইয়া থাকে এবং তাহাতে যুক্তির অভাবের অভাব হয় না। কিন্তু ঈর্ষাপ্রসূত নিন্দা হইলেও উপকারী আলোর রেখা যেটুকু পাওয়া যায় সেটুকুই লাভ। যাহারা সাহিত্য-জগতে বাস্তবিক উন্নতি করিতে চান তাঁহারা নিন্দাকে অবিচলিত মনে গ্রহণ করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে উপকৃতই হইবেন। লোকের প্রশংসাকে মনের মধ্যে বেশী আমল দিলে পিছাইয়া পড়িবারই সম্ভাবনা বেশী।

* * *

আলোচনাটা উত্তম পুরুষে চালাইতেছি বলিয়া আপনারা হয় তো আমার অহমিকার দরুণ মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া নিন্দা করিতে পারেন। কিন্তু...ঐ যে আগেই আভাস দিয়া রাখিয়াছি—নিন্দাতে আমি দুঃখিত হই না।

আমার কোন নিন্দিত লেখাকে বিশ্লেষণ করিয়া যদি দেখি লেখাটি বাস্তবিকই নিন্দার

লেখু-ডেক

অ·কৃ·র

যোগ্য, তাহা হইলে নিন্দুক ভদ্রলোককে বোদ্ধা বলিয়া মনে মনে শ্রদ্ধা জানাই। যদি দেখি আমার লেখাটি নিন্দার যোগ্য নয়, তাহা হইলে বুঝিতে পারি আমার অনিন্দ্য লেখাটিকে নিন্দা করিয়া নিন্দুক মহাশয় হয়তো নিজের গায়ের ঝাল মিটাইয়াছেন, অর্থাৎ নিজেকে খাট করিয়া পরোক্ষে নিন্দার ছদ্মবেশে শ্রদ্ধার অর্ঘ্যই আমাকে দিয়াছেন। অযথা প্রশংসা যদি নিন্দারই প্রকারান্তর হইয়া থাকে "(Undeserved praise is slander in disjuise"—Pope), তাহা হইলে অযথা নিন্দাও প্রশংসার প্রকারান্তর ছাড়া আর কি? এরূপ পরোক্ষ প্রশংসায় আনন্দিত না হইব কেন?

* * *

এতক্ষণ যাহা বলিলাম তাহা হইতে আপনারা নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছেন আমি "কাগজে-টাগজে লিখিটিখি" অর্থাৎ আমি একজন লেখক। (সেজন্য আমি গর্ব অনুভব করিবার কোন কারণ দেখি না, কেননা লেখা আসে বলিয়াই আমি লিখিতে পারি, না আসিলে কিছুতেই পারিতাম না। যে লেখা আমার আসে তাহা আমার না আসিয়া আপনার আসিলে আপনিও তাহাই লিখিতে পারিতেন এবং লিখিতেন।) বলা বাহুল্য, আমার চেয়ে অনেকেই ঢের বেশী ভাল লেখেন; সেজন্য আমার কোন দুঃখ নাই। (অবশ্য অনেকের চেয়ে আমি বেশী ভাল লিখিলেও আমি দুঃখিত হইতাম না।)

আমার মনে হয় আমরা সমস্ত লেখক এক টীমের খেলোয়াড়, সাহিত্যের খেলায় যে যাহার জায়গামত খেলিতেছি। আমাদের মধ্যে কোন খেলোয়াড় গোল করিলে সেটা খেলোয়াড় বিশেষের ব্যক্তিগত গোল নয়, টীমেরই গোল। অশরীরী, অলিখিত সাহিত্যের অনন্ত সম্ভাবনা অনন্ত শূন্যে ভাসিতেছে, আমাদের লেখকদের কাজ হইতেছে অশরীরীকে শরীর দেওয়া, সম্ভাবনাকে সম্ভব করা, অলিখিতকে লেখার বন্ধনে বন্দী করা। যাহারা আমাদের হাত এড়াইয়া অনন্ত শূন্যেই ভাসিয়া থাকিতে চাহিতেছে, আমরা খেলোয়াড় সাহিত্যিকের দল তাহাদিগকে টানিয়া আনিয়া সাদা কালোর বাঁধনে বাঁধিতেছি। সাহিত্যের খেলায় ইহাই আমাদের গোল করা। অল্প কিছুদিন আগে রবীন্দ্রনাথ সেণ্টার ফরওয়ার্ড এবং শরৎচন্দ্র সেণ্টার হাফে খেলিয়া অনেকগুলি চমৎকার গোল করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের পর নানা খেলোয়াড় যে যাহার সাধ্যমত বড়, মাঝারি, ছোট প্রভৃতি বিভিন্ন দরের গোল করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের করা সেই গোলগুলি শুধু তাঁহাদের ব্যক্তিগত গৌরব নহে—টীমেরই গৌরব। এই অতি সহজ সত্য কথাটা সহজ সত্যভাবে বুঝিতে পারিলেই অপর খেলোয়াড়ের গোল-সাফল্যে গাত্রদাহের এবং গোল-বিফলতায় আনন্দবোধের হীনতার হাত এড়াইতে পারিব।

* * *

নিন্দার যোগ্য হইয়া প্রশংসিত হওয়ার চেয়ে প্রশংসার যোগ্য হইয়া নিন্দিত হওয়া ভাল। সেজন্যই প্রশংসায় উদ্বিগ্ন যতটা হই, নিন্দায় ততটা হই না। ইহাও জানি যে, নিন্দা করিয়া নিন্দুক নিজেকে যত খাট করে নিন্দিতকে তত খাট করিতে পারে না। যে আমাকে নিন্দা করিয়া নীচুতে নামাইতে চায়, সে মনে মনে নিশ্চয়ই আমার উচ্চতা স্বীকার করে; আমাকে নিন্দা করার প্রচেষ্টাতেই তাহার হীনতাবোধ (inferiority complex) ধরা পড়িতেছে। পিঁপড়া হাতীকে নিন্দা করিতে পারে, কিন্তু হাতীর পিঁপড়াকে নিন্দা করার প্রবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনা কম।

* * *

আরেকটি কথাও বিশেষ করিয়া ভাবিবার আছে। আমার লেখা পড়িয়া সাধারণ পাঠক-মহল যদি নিন্দাসূচক মত প্রকাশ করে, যদি বলে "ইহার রসগ্রহণ করিতে পারিলাম না" তাহা হইলে আমার উচিত তাহাদিগকে বেরসিক মূর্খ বলিয়া গালি দিতে ব্যস্ত না হইয়া প্রথমে নিজেকেই পরীক্ষা করা এবং যে যে কারণে পাঠক সাধারণ আমার লেখার রসগ্রহণ করিতে পারিল না সেই কারণগুলি দূর করার চেষ্টা করা। "গান-ভঙ্গ" কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন (অথবা বলাইয়াছেন):

"একাকী গায়কের নহে তো গান
গাহিতে হবে দুই জনে,
গাহিবে একজন ছাড়িয়া গলা,
আরেকজন গাবে মনে।"

শ্রোতা যে গান মনে মনে গাহিতে পারে না সে গান উপভোগ করিতে পারে না। তেমনি পাঠক যখন আমার রচনা উপভোগ করিতে না পারে তখন বুঝিতে হইবে আমার মনের সুর আমি তাহার মনে জাগাইয়া তুলিতে পারি নাই, আমার রচনার এমন গুণ নাই যাহা তাহার মনে সাড়া জাগাইতে পারে। "হায়, পাঠক কি মূর্খ, কি দুর্ভাগ্য!" বলিয়া অনুকম্পা না করিয়া "হায়, আমি কি অক্ষম।" বলিয়া দুঃখ করাই এক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয়।

বর্তমান গণ-প্রাধান্যের যুগে গণ-মনের সহিত যে সাহিত্যের যোগ নাই, যে সাহিত্য সাধারণের মনে সাড়া জাগাইতে পারে না, যাহার রস গ্রহণ করিতে পারে মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন, সেরূপ গণ্ডীবদ্ধ সাহিত্যের সার্থকতা অতি সামান্য।

* * *

আমরা বর্তমান বাঙলার সাহিত্যিকগণ সাহিত্যে পলায়নী মনোবৃত্তিকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছি, বাস্তব জীবনকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করিতেছি, "সাহিত্যের জন্যই সাহিত্য" নীতিতে অবিশ্বাস করিয়া আমরা "জীবনের জন্যই সাহিত্য" নীতিতে বিশ্বাস করিতেছি। জনগণের জীবনের উপর দিয়া যে ঝড়-ঝাপ্টা বহিয়াছে ও বহিতেছে তাহার সমগ্র রূপটুকু নানা কারণে আমাদের রচিত সাহিত্যে ধরা না পড়িলেও যেটুকু ধরিতে পারিয়াছি তাহার সার্থকতাও কম নহে। সাহিত্যকে আমরা কল্পনা-বিলাস বলিয়া মনে করি না; যে সাহিত্য জীবনকে বৃহত্তর সার্থকতার দিকে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে না, সে সাহিত্যকে আমরা মর্যাদার অযোগ্য মনে করি।

* * *

কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে গণ-সাহিত্য নামে আমরা যাহা রচনা করিতেছি তাহা ঠিক গণ-সাহিত্য রূপে সার্থক হইয়া উঠিতেছে না কেননা গণ সম্বন্ধে রচিত হইলেই সাহিত্য গণ-সাহিত্য হয় না। আমাদের দেশের 'গণ' যতদিন "ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস" হইয়া থাকিবে, ততদিন গণ-মনের সহিত আমাদের রচিত সাহিত্যের মিলন ঘটিবে না এবং সে মিলন না ঘটিলে সাহিত্যও ঠিক গণ-সাহিত্য হইবে না, "গণ সম্বন্ধে রচিত সাহিত্য" পর্যন্তই হইয়া থাকিবে।



ছবির জগতে একটা নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। প্রযোজনা ও প্রদর্শন-গৃহের সংখ্যা আজ যত নাহোক্, তার চেয়ে বেশী হয়ে দাঁড়িয়েছে পরিবেশন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা। কলকাতায় আজ চিত্রগৃহের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ এবং পরিবেশন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও প্রায় ততোধিক, কিন্তু ছবির সংখ্যা সে তুলনায় ক'খানাই-বা। বছরে সমগ্র ভারতে তোলাই তো হচ্ছে পৌণে দু'শ ছবির কাছা-কাছি, তার মধ্যে থেকে তামিল, তেলেগু ও পাঞ্জাবি, মারাঠি বাদ দিলে শ' দেড়েক দাঁড়ায়, অর্থাৎ পরিবেশকদের মধ্যে যত কাড়াকাড়ি, ঐ শ' দেড়েক ছবি নিয়েই। সুতরাং ছবির দাম যে অদ্ভুত রকম বেড়ে যাবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। শুধু দাম বাড়াই নয় প্রতিযোগিতার মুখে প্রতি ছবির দরুণ একটা সেলামীও দাঁড়িয়ে যাচ্ছে যে টাকাটাকে "Black money" বলে অভিহিত করা হয়। যেমন ধরুন "চল চলরে নওজোয়ানে"র কথা—ছবিখানি বিক্রি হয়েছে আঠার লাখ টাকায়, কিন্তু শোনা যাচ্ছে যে, এছাড়া ঐ সেলামীর টাকাও ক্রেতাকে বড় কম দিতে হয়নি। পরিবেশকদের সংখ্যা যত বাড়বে, প্রতি-যোগিতাও হতে থাকবে তত তীব্র এবং "Black money"র অঙ্কও বাড়তে থাকবে সেই পরিমাণে। এই প্রতিযোগিতা শুধু ছবি কেনার ব্যাপারেই নয়, ছবি মুক্তি ব্যাপারেও সমান তেজী, যার ফলে প্রদর্শন-ক্ষেত্রের মধ্যেও বেশ শৃংখলাবদ্ধভাবে ব্যবসা করা অসম্ভব হয়ে উঠ্‌চে। টাকার জোর যে পরিবেশকদের বেশী, অর্থাৎ প্রদর্শককে, সোজা বাঙলায় বেশ মোটা রকম ঘুষ যে দিতে পারে, তার ছবিরই মুক্তিলাভের সম্ভাবনা থাকবে, আর বাকী সবাইকেই হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে—সেই সঙ্গে লক্ষ লক্ষ টাকাও বেকার হয়ে পড়ে থাকতে বাধ্য হবে। সদ্যজাগরিত আমাদের এই শিল্পের পক্ষে এটা মারাত্মক। তাই এটা রোধ করা একান্তই দরকার এবং রোধ করা মানেই হচ্ছে আর নতুন পরিবেশক প্রতিষ্ঠান গজিয়ে ওঠা বন্ধ করা; অন্য কোন উপায়ে, নাহিলে শেষ পর্যন্ত সরকারী সাহায্য নিয়ে যদি কোন আইন গড়তে হয়, তাও করতে হবে। না বাড়চে ছবির সংখ্যা, না ছবিঘরের, অথচ মাঝখান থেকে পরি-বেশকদের সংখ্যাবৃদ্ধি — কেলেঙ্কারী বাড়বেই তো।

নূতন ছবির পরিচয়

ভাই (ক্যারাভান পিকচার্স)—পরিচালনাঃ কে ডি মেহরা; সংগীত—গোলাম হায়দার; ভূমিকায়—মনোরমা, জহুর রাজা, সতীশ, রাধারাণী প্রভৃতি।

ছবিখানি গত ১৩ই জানুয়ারী প্রভাত ও ম্যাজিস্টিকে রেডিয়েণ্ট পিকচার্সের পরি-বেশনে মুক্তিলাভ করেছে।

যেসব ছবি দেখতে দেখতে চিত্র-নির্মাতাদের লাইসেন্স পাওয়ার রহস্যের কথাটাই মনে জেগে ওঠে "ভাই" সে-ই শ্রেণীরই ছবি। সত্যিই কোন্ কৃতিত্বের সার্টিফিকেট দেখিয়ে ক্যারাভান পিকচার্স আশাকে নিজের করে নিতে চায়। হরলাল রাজী না হলেও আশা পিতার মান বাঁচাবার জন্যে এ-বিবাহে সম্মতি দেয়। এদিকে জীবনের প্রণয়িনী ছিল রেখা—সে এ-বিবাহ বন্ধ করার জন্য ব্রীজকে নিজের বাড়িতে ডাকে। ঠিক সেই সময়ে জীবনের সহকারী কর্তার রেখার ঘরে তার গহনা চুরি করতে আসে এবং রেখাকে হত্যা করে। জীবনও এসে পড়ে এবং রেখাকে শায়িতা দেখে তার উপরই গুলী চালায় হত্যার উদ্দেশ্যে—তারপর ব্রীজ এসে পড়ে এবং ভাইকে বাঁচাবার জন্যে সমস্ত দোষ নিজের ঘাড়ে তুলে নেয়। পুলিশ অনুসন্ধানের পর আসল ব্যাপার জানতে পারে এবং দু ভাইকেই হত্যার অপরাধ থেকে মুক্ত করে



'চল-চলরে নও-জোয়ান' চিত্রে অশোককুমার ও নসীম।

যে ছবি তোলার লাইসেন্স পেতে পারে, তা আমাদের কাছে মস্ত বড় রহস্য। যাক্, এ-ছবির আলোচনায় আর বেশী গর্জন শোভা পায় না। ছবির কাহিনী নিতান্তই পাঞ্জাবি প্যাটার্নের এবং তার ট্রিটমেণ্টও সেইমত।

ব্রীজ বিলেত থেকে ডাক্তারী পাশ করে এসে দেখলে, বৈমাত্রেয় ভাই জীবন তার সম্পত্তি দিব্যি ভোগদখল করছে। ব্রীজ আসায় জীবনের অসুবিধে হল। ইতিমধ্যে ব্রীজ শেঠ হরলালের মেয়ে আশার প্রেমে পড়ে যায়, আবার জীবনও চায় আশাকে। মাঝে একরাত্রে জীবন মাতাল অবস্থায় আসে আর তাই নিয়ে ব্রীজের সঙ্গে হয় তার ঝগড়া। মা মাঝে এসে পড়ায় জীবন তাঁকেও অপমান করে বসে। ব্রীজ মাকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। শেঠ হরলাল জীবনের কাছে দেনদার—জীবন সেই সুযোগ নিয়ে

দেয়। জীবন এতদিনে ব্রীজের মহত্বের সামনে মাথা নত করে দেয়। শেষ পর্যন্ত ব্রীজই আশাকে বিয়ে করে।

ছবিখানিতে প্রশংসা করবার মত কিছুই পাওয়া যায় না। গানের দিক থেকে গোলাম হায়দারের নামটা আকর্ষণীয় বটে, কিন্তু তার কাজ নিতান্তই মামুলি ছাড়া নয়। সমস্ত গানেরই সুর যেন এক, অই বুড় একঘেয়ে। অভিনয়ে মনোরমা একা আর কতটা জমিয়ে তুলতে পারে, তার ওপর তেমন পরিচালক হলে হতো।

বিবিধ

সম্প্রতি বোম্বের গুজরাটি ভগিনী সমাজ গুজরাটি মেয়েদের চলচ্চিত্রে যোগ দেওয়া উচিত কি-না এই নিয়ে এক বিতর্ক সভার অনুষ্ঠান করে। মজার কথা এই যে,

ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পে নিয়োজিত মূলধনের প্রায় অর্ধাংশ গুজরাটিদের হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃত ভদ্রবংশোদ্ভবা কোন মেয়েই চলচ্চিত্রে যোগ দেয়নি আজও; অবশ্য সেদিন যোগদানে পক্ষপাতীদেরই বিতর্কে জয় হ'য়েছিল।

*

সাধনা বসুর ভাগ্যে একখানি ছবি তোলার লাইসেন্স লাভ হ'য়েছে। শ্রীমতী বসু খ্যাতনামা হিন্দী সাহিত্যিক ভগবতী-চরণ বর্মার গল্প নিয়ে ছবিখানি তুলবেন—প্রযোজনা তো ক'রবেনই, পরিচালনাও ক'রলে ক'রতে পারেন।

*

শান্তা আপ্তেরও লাইসেন্স প্রাপ্তির খবর শোনা যাচ্ছে।

*

প্যাঞ্চোলির 'শিরী ফরহাদ' এবং মেহবুবের 'হুমায়ুন' ছবি দু'খানির দাম প্রায় চব্বিশ লাখ টাকা ক'রে উঠেছে।

*

এক বছর পর—নিউ থিয়েটার্সের হিন্দী অবদান 'মেরী বহেন' বম্বে ও লাহোরে বিরাট সাফল্য লাভ ক'রেছে ব'লে খবর পাওয়া গেল।

*

লাহোরের অভিনেত্রী রাগিণী সম্প্রতি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হ'য়েছে এবং এর মধ্যে চমকপ্রদ বিষয় হ'চ্ছে যার সঙ্গে তার বিবাহ হ'লো সে তার জীবিতা আপন বড় ভগিনীর স্বামী মিঃ অসমৎ।

*

এম-পি প্রডাকসন্সের হিন্দী ছবি 'টু সিস্টার'এর বিজ্ঞাপনে ছবি বিশ্বাসকে বাঙলার শ্রেষ্ঠতম অভিনেতা (শিশিরকুমার ও অহীন্দ্র থাকতেও) এবং হিন্দী চিত্রে এই তাঁর প্রথম অভিনয় ('সৌগন্ধ'এ অভিনয় করার পরও) ব'লে ঘোষণা করা হ'চ্ছে—অবশ্য বাঙলার বাইরের কাগজে কাগজে।

*

গত মাসে আগ্রিপাদায় এক নাচের আসর বসাতে তার জন্যে পোস্টার ছাপিয়ে সাধনা বসু, সুরেন্দ্র দেশাই ও ম্যানেজার ভারতরক্ষা আইনের কবলে পড়ে। এদের গ্রেপ্তার করে মাজাগাঁওয়ের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হাজির করা হ'লে জামীনে মুক্তিলাভ করেন।

*

জয়পুর রাজ্য নিজেদের সেন্সার বোর্ড প্রতিষ্ঠা ক'রেছে। পাঁচজন সরকারী কর্মচারী এবার থেকে জয়পুরে প্রদর্শিতব্য সমস্ত ছবি দেখে তবে ছাড়পত্র দেবে।

*

উদয়শঙ্কর 'কল্পনা' নামে যে ছবি তুলছেন তাতে কম করে প্রায় আশিটি ভিন্ন ভিন্ন নৃত্য সংযুক্ত থাকবে। ছবিখানি তুলতে সময় লাগবে প্রায় বছর খানেক, শিল্পী থাকবেন প্রায় শ' দুয়েক এবং খরচ হবে অনুমান লাখ দশেক টাকা। সুর-সংযোজনা ক'রবেন বিষ্ণুদাস শিরালী।

*

দেবকী বসু ফেব্রুয়ারীর গোড়াতেই বম্বেতে যাচ্ছেন 'মেঘদূত'-এর কার্য উপলক্ষ্যে।

*

খ্যাতনামা চলচ্চিত্র সাংবাদিক চন্দ্রশেখর ওরফে মনোজ ভঞ্জ পরিচালক পদে বৃত হয়েছেন। তাঁর প্রথম ছবি হবে রূপশ্রী লিমিটেডের হয়ে একখানা বাঙলা। মনোজ-বাবু দীর্ঘকাল নিউ থিয়েটার্সে সহকারী পরিচালকরূপে থেকে বড় বড় পরিচালকদের সকলের সঙ্গেই কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন।

*

দেবকীবাবুর 'আপনাঘর' চিত্রের সহকারী পরিচালক মধুকর গুপ্তের 'দ্রৌপদী'র মুক্তি উপলক্ষ্যে সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি এখন নিউ হন্স পিকচার্সের জেনারেল ম্যানেজার। মধুকরের কৃতিত্ব আছে অনেক বিষয়েই। সেই নির্বাক যুগ থেকে অভিনয় আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত প্রায় ৮৬ খানি ছবিতে অবতরণ করেছেন—এ ছাড়া সাংবাদিক হিসেবেও তার বেশ খ্যাতি আছে। ভদ্রলোক বেশ মিশুকে এবং মিষ্টি স্বভাবের। তাঁর স্ত্রী নলিনী গুপ্তেও চিত্রাভিনেত্রী।

*

ভারতবর্ষে আমেরিকার অনুকরণে চলচ্চিত্র 'একাডেমী' পত্তনের চেষ্টা হবার খবর পাওয়া গেল। এর উদ্যোক্তা হচ্ছে কাণপুরের সৈয়দ মুজাফর কাজমী। এই সংসদ ভারতের তৈরী ছবিগুলির বৈজ্ঞানিক বিচার করবে। সংসদের উদ্দেশ্য হচ্ছে গঠন-মূলক সামাজিক ছবি প্রচারে সহায়তা করা, ভারতের গৌরবময় ইতিহাস কাহিনী অবলম্বনে ছবি তোলায় প্ররোচিত করা, ছবির সাহায্যে জনগণের জীবন ধারণের নিরিখকে উঁচু ক'রে তোলার চেষ্টা করা এবং শিক্ষামূলক ও সংবাদ-চিত্র তোলায় উদ্বুদ্ধ করা। এই সংসদের পাঁচজনকে নিয়ে একটি পরামর্শ সমিতি থাকবে, যার কাজ হবে সংসদের সাধারণ নিয়মকানুন অনুধাবনে প্রবৃত্ত করা এবং চলচ্চিত্র সংক্রান্ত ব্যাপারে সংসদকে উপদেশ দেওয়া। প্রতি নববর্ষের দিনে সংসদ (ক) শ্রেষ্ঠ চিত্র, (খ) শ্রেষ্ঠ মুসলিম সমাজ চিত্র, (গ) শ্রেষ্ঠ হিন্দু পৌরাণিক চিত্র, (ঘ) শ্রেষ্ঠ পরিচালক, (ঙ) শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ও (চ) শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর নাম ঘোষণা করবে। সংসদের সভ্য হতে পারবে জনসাধারণ, প্রদর্শক, পরিবেশক ও প্রযোজকরা।

*

আবার লাহোরের সেই মোটা খবর। এবার খাবার নিয়ে নয়, পোষাক নিয়ে। ঠান্ডায় গরম সুট তৈরী করা দুর্গা মোটার আর এক সমস্যা। একটা সুটের জন্যে ওর লাগে বিশ গজ কাপড়। ঘামে তাড়াতাড়ি নষ্ট হ'য়ে যায় বলে অন্তত তিনটে সুট না হলে ওর চলে না, অথচ কাপড় কণ্ট্রোল হয়েছে। কণ্ট্রোলারের আসলে সমস্যা।

*

বম্বের ন্যাশনাল স্টুডিও চিত্র কাহিনীর জন্যে একটি প্রতিযোগিতা প্রবর্তন ক'রেছে। প্রথম পুরস্কার সাড়ে তিন হাজার টাকা; হিন্দী বা ইংরেজীতে লিখে যে কেউই এই প্রতিযোগিতায় যোগদান ক'রতে পারে।

পেনিসিলিনের নূতন প্রয়োগ

মেমোরিয়াল হাসপাতালের ডাঃ ডার্ণন ব্রাইসন্ হার্শ্টিংটন্ বলিয়াছেন যে, পেনিসিলিনের সূক্ষ্মচূর্ণের নিশ্বাস টানিলে উহা নিউমোনিয়া শ্রেণীর ফুসফুস রোগের আক্রান্ত স্থলে সরাসরি প্রবেশ করে। ঔষধটির পরীক্ষা চলিতেছে।

ব্রাইসন লং আয়র্ল্যাণ্ডের বাইওলজিক্যাল লেবরেটরীতে এই নূতন চিকিৎসা পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। ইঁদুর ও খরগোসের উপর পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, পেনিসিলিন চূর্ণের নিশ্বাস টানিলে উহা সরাসরি আক্রান্ত-স্থলে প্রবেশ করে।

তিনি বলিয়াছেন যে, যক্ষ্মারোগীকে প্রমিন-৮ প্রভৃতি ঔষধও এইভাবে ব্যবহার করিলে ফল হয়।

কর্তব্য কি? ভাইয়ের স্নেহ ভাইকে কি করে ফিরিয়ে আনতে পারে পাপ পথ থেকে, তারই করুণ কাহিনী ঃ

ভাই ঃঃ ভাই

শ্রেঃ মনোরমা — সতীশ — রাধারাণী

নাচে-গানে আমোদ-প্রমোদে ভরপুর।

প্রভাত ও ম্যাজেষ্টিক

প্রত্যহ ৩, ৬ ও ৯টায়

রেডিয়াণ্ট রিলিজ

গৌরবোজ্জ্বল ১১শ সপ্তাহ

বম্বে টকীজের নৃত্যগীতিমুখর

জোয়ার-ভাঁটা

শ্রেঃ মৃদুলা, শামীম, দিলীপ, আগাজান

জ্যোতিঃ শ্রী

প্রত্যহ ২৷৷, ৫৷৷, ৮৷৷ — প্রত্যহ ৩, ৬, ৯টা

মা-বাপ—যাঁহারা সর্বরকমে এবং সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ এবং স্বর্গ হইতেও কাম্য, সেই মা-বাপকে যাহারা অশ্রদ্ধা করে, অত্যাচার করিতেও দ্বিধাবোধ করে না, তাহারা ভগবানের বিচারালয়ে কি ভাবে দণ্ডিত হয় তাহাই প্রমাণ করিবে সানরাইজের শ্রেষ্ঠ চিত্র—

মা-বাপ

পরিচালনা—ডি, এম্, ড্যাস

ভূমিকায়—বীণা — নাজির — জগদীশ ইয়াকুব — দীক্ষিত — মতিবাঈ — কল্যাণী

১৮-শ সপ্তাহে চলিতেছে

সিটি॰প্যারামাউণ্ট

প্রত্যহ—৩টা, ৬টা ও রাত্রি ৯টায়

অগ্রিম আসন সংগ্রহ করুন

বাসন্তী রিলিজ

সিলেট ইনডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস—সিলেট

কলিকাতা অফিস—৬, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়।

পূর্ববঙ্গ ও আসামের প্রায় সকল বাণিজ্য-প্রধান কেন্দ্রে শাখা ও এজেন্সী আছে।

কার্যকরী তহবিল—১ কোটি টাকার উপর

সঙ্গীতমূলক কৌতুককর চিত্ররূপ

৮ম সপ্তাহ!

এন আই ষ্টুডিয়োর

প ন ছী

শ্রেষ্ঠাংশে ঃ

মনোরমা — আজমল

প্রত্যহ ঃ বেলা ৩টা, ৬টা ও রাত্রি ৯টায়

গণেশ—

বম্বে পিকচার রিলিজ

সহরের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ!

খ্যাতনামা পরিচালক এবং শ্রেষ্ঠ চিত্রাভিনেত্রী

জয়ন্ত দেশাই ও রমলা

(তলোয়ার প্রোডাকশনের সৌজন্যে)

সমবায়ে প্রস্তুত অপূর্ব চিত্রার্ঘ্য

লালকার

অন্যান্য ভূমিকায় ঃ ঈশ্বরলাল—মায়া ব্যানার্জি

মিনার্ভা

প্রত্যহ ঃ বেলা ৩টা, ৬টা ও রাত্রি ৯টায়

বিলিমোরিয়া এণ্ড লালজী রিলিজ

শুক্রবার, ২রা ফেব্রুয়ারী হইতে



উত্তরা ঃ পূরবী ঃ পূর্ণ



৩য় সপ্তাহ!

কলকাতার জনগণের মধ্যে ইতিমধ্যেই বেশ হৈ-চৈ তুলেছে!

সুশীলারাণী

অভিনীত

দ্রৌপদী

প্যারাডাইসে

প্রত্যহ ঃ ২-৩০, ৫-৩০, ৮-১৫

গঙ্গোত্রী

সুবোধ ঘোষ

(১২)

কেশবের হাত ধরে টানাটানি করছিল অজয়; কিন্তু কেশব তবু উৎসাহের সঙ্গে সাড়া দিয়ে এগিয়ে যেতে পারলো না। কেশবের মন সত্যি করে প্রসন্নতায় ভরে উঠেছে, চারদিকের ইঙ্গিতের অর্থ খুবই স্পষ্ট করে বুঝতে পারছে, কিন্তু তবু একটা সংকোচ। এখনো একটা আড়ালে লুকিয়ে থাকতে চায় কেশব, অজয় বুঝতে পারে, কেন এই সংকোচ।

অজয় বললো—আমার ওপর খুব রাগ করে আছিস্ তুই।

কেশব—সেটা কি সত্যিই বুঝতে পেরেছিস্?

অজয়—হ্যাঁ।

কেশব—কি, বল্তো?

অজয় হেসে ফেললো—পৈতে আন্দোলন।

কেশবও হাসছিল—না, আমি আর রাগ করবো না, যত পারিস্ পৈতে আন্দোলন কর্।

অজয়—না, আর পৈতে আন্দোলনের দরকার নেই, তার চেয়ে বড় ঝড় এসে গেছে।

এতক্ষণে কেশব যেন অজয়ের হাতটা গভীর সৌহার্দ্যের আগ্রহে চেপে ধরলো।—সত্যি করে বলতো অজয়, যা যা শুনেছি, এসব কি সত্যি?

অজয়—কি শুনেছিস্?

কেশব—এই যে এইমাত্র বললি, ঝড় এসে গেছে।

অজয়—হ্যাঁ, এসে গেছে। আমিও প্রথমে বুঝতে পারিনি কেশব।

কেশব—এখন বুঝতে পেরেছিস্?

অজয়—হ্যাঁ, নইলে মাধুরীর মত মেয়েও কলেজ ছেড়ে দেয়?

কেশবের চোখের দৃষ্টিটা হঠাৎ প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে, অজয়ের মুখের ওপর ভোরের তারার মত জ্বল্‌জ্বল্ করতে থাকে, যেন বহু জিজ্ঞাসা একসঙ্গে আকুল হয়ে উঠেছে।

কেশব—মাধুরী সত্যিই কলেজ ছেড়ে দিল?

অজয়—তাই তো স্বচক্ষে দেখলাম। সঞ্জীব চাটুয্যে ঠিক করেছিলেন, মাধুরীও নাকি বিলেত যাবে। হঠাৎ হাওয়া ফিরে গেল।

চুপ করে রইল কেশব। ক্ষণিক স্তব্ধতার মধ্যে কেশব যেন তার হৃদয়ের সকল বাতায়ন খুলে দিয়ে সেই অদ্ভুত ঝড়ের বেগময় গুঞ্জন শুনেছিল। এই ঝড় মান্দার গাঁয়ের সকল বিকার ও ভ্রান্তিকে নিঃশেষে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, যা কিছু হারিয়ে গিয়েছিল, তাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাবে। অজয় মিত্তির ফিরে এসেছে, তার গলায় পৈতে নেই। মাধুরী ফিরে এসেছে, মাধুরী আর কলেজে পড়ে না। হয়তো দেবুও শীগ্‌গির ফিরে আসবে বিলেতের মায়া কাটিয়ে।

অজয়—না, এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি? চল্।

আবার কেশবের হাত ধরে আগ্রহে টান দিল অজয়। কেশব একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললো—না, ওদিকে যাব না। চল্ আমার বাড়িতে।

অজয়—না তোমাকে যেতেই হবে।

কেশব—পারবো না ভাই।

অজয়—কেন?

কেশব—আমার ভয়ানক অস্বস্তি লাগবে।

অজয় আশ্চর্য হয়ে কিছুক্ষণ কেশবের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কেশবের আচরণে তার সংকোচের কারণটা খুবই স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু চিরকালের মুখ-খোলা ও মন-খোলা কেশব ভট্‌চাযের আচরণে আজ হঠাৎ এত কুণ্ঠা কেন? সেই নির্ভীক ও অহঙ্কারী সকল হাঙ্গামার পাণ্ডা কেশব ভট্‌চায আজ আড়ালে লুকিয়ে থাক্‌তে চায়, জনসভা ও জনতার দিকে পেছন ফিরে সরে থাকতে চায়, কেন?

কেশবের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে নানা প্রশ্নের আলোড়নের মধ্যে অজয় তার বক্তব্যের খেই হারিয়ে ফেলছিল। একটু কেমনতর হয়ে গেছে কেশব। সেই পাঁচ বছর আগে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যেমন জজের রায় শুনেও ঐ প্রখর চোখের প্রতিজ্ঞা একটুও ঝাপসা হয়নি, আজ যেন সেই চোখে একটা বিসদৃশ অভিমানের ছায়া পড়েছে। পাঁচ বছর পরে কেশব ফিরেছে, আজ সব দিক দিয়ে ফিরে পাওয়ার লগ্ন পূর্ণ হয়ে উঠেছে, তবু কেশবের এই সংকোচ কেন?

অজয় মিছামিছি চেঁচিয়ে উঠলো— কি বলিল? অস্বস্তি, লাগবে?

কেশব আরও অপ্রস্তুত হয়ে একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে জবাব দিল—হ্যাঁ,

অজয়—অস্বস্তি লাগবার মত কাজ করেছিলে কেন? তখন মনে ছিল না? এখন সেকথা তুললে চলবে কেন? হাজার অস্বস্তি লাগুক, সব সহ্য করতে হবে। চল।

কেশব চারদিকে একবার যেন সলজ্জ ভয়ে উঁকিঝুঁকি দিয়ে তাকালো।

অজয় বললো—ওরকম করছো কেন? কেউ শুনে ফেলবে, এই ভয় হচ্ছে বুঝি?

কেশব—কেন এত বৃথা চেঁচিয়ে কথা বলছিস অজয়?

অজয়—দরকার বুঝলে দশজনের সামনে চেঁচিয়ে বলবো।

সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো কেশব। অজয়কে বুঝিয়ে বলার মত ভাষা সে খুঁজে পায় না। কি করে বোঝাবে কেশব, আজ আর ওসব কথার কোন অর্থ হয় না। আজ অবশ্য নতুন করে এসব কথা বলছে না অজয়, বহুবার বলেছে। তবু আজ সবই কেমন প্রগল্‌ভ বাচালতার মত মনে হয়, কোন সুর নেই। তাই আজ আর এসব কথা শোভা পায় না। সবই ফিরে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এই সুরের শেষ রেশটুকুও বোধ হয় মুছে গেছে, নইলে সে নিশ্চয়ই সবার আগে তার কাছে একবার আসতো, একটা চোখের দেখাও দিয়ে যেত।

কিন্তু একথা অজয় বোঝে না। কি করেই বা বোঝানো যায় যে, যে-মেয়ে কলেজে পড়েছে, কলেজ ছেড়েছে, স্বদেশী মন্ত্রের প্রচারিকা হয়েছে, জনতা ও জনসভার সম্মুখে দাঁড়িয়ে এক নতুন ঝড়ের নিশান দুলিয়ে ফিরছে, তার সঙ্গে আজ কেশব ভট্‌চাযের কি সম্পর্ক থাকতে পারে? অজয় বৃথা চেঁচিয়ে কেশবকে অপ্রস্তুত করে, একটু তলিয়ে বুঝতে পারে না। মান্দার গাঁয়ের মাটী ও মানুষকে ফিরে পেলেই সব পাওয়া হলো না। ঐ তো সামনেই রয়েছে মান্দার গাঁয়ের সেই বুড়ো অশত্থ গাছ, কিন্তু কই সেই ঝুরু ঝুরু হাওয়ার সুর? যতক্ষণ তা না পাওয়া যায়, ততক্ষণ কিছুই পাওয়া হলো না।

অজয় বললো—তাই বলছি, যদি ভাল

চাও তো আমার সঙ্গে এস।

কেশব বিমর্ষভাবে বললো—না তুমি যাও, তোমার কাছেই সব কথা শুনবো পরে।

অজয়—আমার যাবার অপেক্ষায় সেখানেও কেউ বসে নেই।

কেশব হাসলো—আমারও অপেক্ষায় কেউ বসে নেই।

অজয়—কি করে জানলে?

কেশব—তুমিই বা কি করে জানলে যে, সত্যিই কেউ অপেক্ষায় বসে আছে?

অজয়—না থেকে পারে না।

অজয় জোর গলায় যেন একটা অবিচল সত্যের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলো, জীবনের কোন ঘটনায় ও ইতিহাসের কেমন ওলট-পালটের মধ্যেও যেন এই সত্যের নড়চড় হতে পারে না। এ বিষয়ে অজয়ের কোন সংশয় নেই যে, জনসভার সহস্র ব্যস্ত চক্ষুর মধ্যে অন্তত একজোড়া চোখ মাঝে মাঝে অন্যমনা হয়ে নিকটে ও দূরে ও আশে-পাশে কাউকে খুঁজছে, তারই বন্ধু কেশব ভট্‌চাযকে। না খুঁজে পারবে না মাধুরী। নিশ্চয় সে জানে, কেশব জেল থেকে খালাস হয়ে গাঁয়ে ফিরেছে। না জানলেই বা কি? না খুঁজে সে থাকতে পারে না। অজয়ের আজও সে দৃশ্য মনে পড়ে। মীরগঞ্জ থেকে গাঁয়ে ফিরছিলো অজয়, পাঁচ বছর আগে, সেসন জজের আদালতে সেই মামলার রায় শুনে। সন্ধ্যেবেলা এই দীঘির ঘাটের পথের উপরেই দাঁড়িয়েছিল মাধুরী, আলো হাতে নিয়ে। কেউ সঙ্গে ছিল না। মাধুরীর সেদিনের চেহারাটি আজও অজয় স্পষ্ট মনে করতে পারে। সন্ধ্যার জোনাকীর মতই যেন অন্ধকারের মধ্যে একা একা ছটফট্ করছিল ঐটুকু মেয়ে মাধুরী। অজয়ের কাছে খবর শুনলো—কেশবের পাঁচ বছরের জেল। চুপ করে চলে গেল মাধুরী। অজয়ের আজও স্পষ্ট করেই মনে আছে, গাঁয়ের পথের সান্ধ্য নিঃশব্দতা মাধুরীর কান্নায় কী করুণ হয়ে উঠেছিল।

নিজের নিজের চিন্তায় ডুবেছিল দুজনে, সময়ের দিকে কারও লক্ষ্য ছিল না। তাই একটু চমকে উঠে দুজনেই বুঝতে পারলো—সভা ভঙ্গ হয়েছে। সহর্ষে ছোট ছোট জনতা আবার পথ ধরে এগিয়ে আসছে। সাঁওতাল নরনারীর দল ঝুমুরের সুরে গান গাইতে গাইতে চলে গেল। গফুরাবাদের মাতবরদের পাল্কী চলে গেল। কালীতলার দিকে ছাত্রদের জয়-ধ্বনি শোনা যায়। কাকের দল কলরব করে গাছের মাথায় মাথায় উড়ে বেড়ায়।

অজয় বিরক্ত হয়ে বললো—বেশ হলো। তোমার জেদ সার্থক হলো।

কেশবের হাত ছেড়ে একটু দূরে সরে দাঁড়ালো অজয়।

কেশব সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে অজয়ের হাতটা জোরে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইল। বললো—আমার ওপর আর রাগ করতে পারবে না অজয়, খবরদার।

সেই কোন্ কিশোরকালের সৌহার্দ্যের দোহাই আবার যেন হঠাৎ নতুন করে আগের মতই ছেলেমানুষী ভাষায় ধ্বনিত হলো। এ দোহাই উপেক্ষা করার মত শক্তি নেই অজয়ের।

অজয় বললো—রাগ করতে পারবো না ঠিকই, কিন্তু তুমি আমার কথাটা একটু মন দিয়ে শোন।

কেশব—হ্যাঁ শুনবো।

অজয়—চল মাধুরীদের বাড়ি।

কেশব—ছি ছি। কি অদ্ভুত কথা বলছো।

আবার চুপ করে রইল অজয়। কোথায় যেন কাঁটা বিঁধে আছে কেশবের মনে।

অজয়—তা'হলে বল তুমি মাধুরীর সঙ্গে দেখা করবে না।

কেশব—না।

অজয়—মাধুরীও কি তোমার সঙ্গে দেখা করবে না।

কেশব—সেটা আমি কি করে বলি?

অজয় কিছুক্ষণ সন্দিগ্ধভাবে কেশবের দিকে তাকিয়ে আভাসে যেন একটা তথ্য বুঝে নিল। অজয় বললো—মাধুরীর উচিত তোমার সঙ্গে দেখা করা।

কেশব—উচিত বৈকি।

অজয় হেসে ফেললো—ওঃ, এই কথা। এইজন্যে এত অভিমান।

হাসতে হাসতে কেশবের হাত ছাড়িয়ে অজয় পথ ধরে এগিয়ে গেল। কেশব সেখানেই দাঁড়িয়ে একবার অনুরোধ করলো—শোন্, তুই কথাটা ভালভাবে না বুঝেই......।

না থেমে, যেতে যেতেই অজয় বললো—কাল শুনবো, আজ আমার অনেক কাজ আছে। (ক্রমশ)

সাধারণ

শ্রীপ্রশান্ত চৌধুরী

শাজাহান হ'লে হ'তেম ফকির
তাজমহলের তলে
ভিক্ষুক হ'লে পরশ পাথরে
খুঁজিতেম পলে পলে।

আমি তা তো নই আমি সাধারণ
অতি সাধারণ জেনো
আলোছায়া সম তোমার জীবনে
সাধারণ ক'রে টেনো।

যুদ্ধের প্রসঙ্গ

সুইডেনের 'আফতনব্লাদেত' পত্রিকার বার্লিনস্থ সংবাদদাতা জানিয়েছেন, রুশ সৈন্য পোজনান শহরে প্রবেশ করেছে। সেখানে রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ চলছে। পোজনান পোল্যান্ডের একটি প্রাচীনতম এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শহর। পূর্বে এর নাম ছিল পোসেন (Posen)। পোজনান ভার্টা নদীর তীরে অবস্থিত। জার্মানীর প্রসিদ্ধ শহর ব্রেসলাউ থেকে পোজনান উত্তর দিকে অবস্থিত—দূরত্ব ৯০ মাইল। পোজনান থেকে বার্লিন ১৪৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে। পোজনান খুব সুরক্ষিত শহর। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় fortress-town. প্রাচীনকালে পোল্যান্ডের রাজারা পোজনানেই বাস করতেন। রুশ সৈন্যেরা যদি পোজনান দখল করতে পারে, তাহলে মার্শাল জুকভের বার্লিন-অভিযাত্রী সৈন্যদল যে বার্লিনের পথে একটা খুব সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করবে, একথা স্বীকার করতেই হবে। তাছাড়া পোজনান হস্তচ্যুত হ'লে পোল্যান্ডে উল্লেখযোগ্য কোন স্থান আর জার্মানীর হাতে থাকবে না। বর্তমান মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগে পোজনান শহরের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় দু'লক্ষ। শস্য, গো-মহিষাদি গৃহপালিত জন্তু, কাঠ, পশম প্রভৃতি ব্যবসার পোজনান একটা বড় কেন্দ্র ছিল। পোজনান একটা সামরিক গুরুত্বপূর্ণ রেল-জংশনও বটে।

মার্শাল কনিয়েভের বাহিনী জার্মানীর অন্তর্গত সাইলেসিয়াতে প্রবেশ করে জার্মানীর ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নগরী ব্রেসলাউয়ের দিকে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে। তারা জার্মানীর অপেলন্ শহর ও ব্রেসলাউ শহরের মধ্যবর্তী একস্থানে অডার নদীর তীরে পৌঁছেছে বলেও এক সংবাদ পাওয়া গেছে। ব্রেসলাউ ও অপেলন্ এই দুইটি শহরই অডার নদীর তীরে অবস্থিত। ব্রেসলাউ জার্মানীর খুব বড় শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র। ১৭০২ সালে এখানে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বর্তমান যুদ্ধের পূর্বে এর লোক সংখ্যা ছিল সাড়ে পাঁচ লক্ষের কিছু বেশী। মার্শাল কনিয়েভের বাহিনীর এখন ব্রেসলাউ অধিকার করাই লক্ষ্য। অপেলন শহর উত্তর সাইলেসিয়ার রাজধানী।

পূর্ব প্রুশিয়াতে মার্শাল চের্নিয়াকভস্কির পরিচালিত বাহিনী বাল্টিক সাগরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তারা এখন পূর্ব প্রুশিয়ার রাজধানী কোনিগসবার্গ শহর থেকে ২৫ মাইল দূরবর্তী ডিম নদীর তীরে পৌঁছেছে। সম্প্রতি কোনিগসবার্গে পৌঁছানোই এই রুশ বাহিনীর লক্ষ্য। কাজেই কোনিগসবার্গের যুদ্ধ যে আসন্ন হয়ে উঠেছে তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে। ইতিপূর্বেই মার্শাল চের্নিয়াকভস্কির বাহিনী ইন্‌স্টারবুর্গ শহর দখল করেছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। ইন্‌স্টারবুর্গ কোনিগসবার্গ থেকে ২৫ মাইল পূর্বে অবস্থিত। কোনিগসবার্গের দিকে যেসব রেল-পথ গেছে ইনস্টারবুর্গ তাদের একটি জংসন। কোনিগসবার্গ ও ইনস্টারবুর্গ দুটি শহরই প্রেগেল নদীর তীরে অবস্থিত। ইন্‌স্টারবুর্গের লোকসংখ্যা চার লক্ষের কিছু বেশি এবং কোনিগসবার্গের লোকসংখ্যা তিন লক্ষের মত। এ দুইই অবশ্য যুদ্ধের পূর্বের হিসাব। কোনিগসবার্গ পূর্ব জার্মানীর ব্যবসা-বাণিজ্যের একটা বড় কেন্দ্র। এ শহরটি চায়ের ব্যবসারও একটি খুব বড় কেন্দ্র। এখানেও একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এখানে জাহাজ তৈরির কারখানা ছিল। ইন্‌স্টারবুর্গ শহরেও চামড়া, বীয়ার, যন্ত্রাদির ব্যবসা-বাণিজ্য চলে। মার্শাল চের্নিয়াকভস্কির বাহিনী ইন্‌স্টারবুর্গ থেকে পশ্চিমদিকে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে।

পূর্ব প্রুসিয়ার দক্ষিণ অংশ থেকে মার্শাল রকোসভস্কির বাহিনী অগ্রসর হয়ে ট্যানেনবার্গ অধিকার করেছে। গত মহাযুদ্ধে ট্যানেনবার্গ ইতিহাসে প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। ১৯১৪ সালে যুদ্ধ বাধার কিছুদিন পরেই জার্মান সেনাধ্যক্ষ হিণ্ডেনবুর্গের পরিচালিত জার্মান বাহিনী তদানীন্তন রুশিয়ার জারের সৈন্যদের ভীষণভাবে পরাজিত করে। এই শহরেই মার্শাল ফন্ হিণ্ডেনবুর্গকে সমাহিত করা হয়েছিল এবং তার সমাধির ওপরে একটা স্মৃতিহর্ম্যও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জার্মান নিউজ এজেন্সী সংবাদ দিয়েছেন যে, জার্মানরা ট্যানেনবার্গ ছেড়ে আসবার আগে হিণ্ডেনবুর্গের শবাধার তুলে নিয়ে এসেছেন এবং স্মৃতিহর্ম্যটি বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছেন।

রুশিয়ার বর্তমান শীতকালীন অভিযানে পূর্ব প্রুসিয়া থেকে সাইলেসিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এই প্রধান রণাঙ্গন ছাড়াও স্লোভাকিয়াতে এবং হাঙ্গেরীতে রুশদের যে আক্রমণ চলেছিল তা' এখনও চলেছে। রয়টার গত ১৯শে জানুয়ারী জার্মান ইস্তাহার উদ্ধৃত করে সংবাদ দিয়েছেন যে, তার আগের দিন রাত্রে জার্মান বাহিনী বুদাপেস্ট থেকে পশ্চাদপসরণ করে দানিয়ুব নদীর পশ্চিমতীরে গিয়েছে। তাছাড়া হাঙ্গেরী-স্লোভাকিয়ার সীমান্তের কাছাকাছি কোৎসিসে শহর রুশসৈন্যেরা দখল করেছে। রুশিয়ার এ অভিযান ব্যাপকতার দিক দিয়েও যেমন সুদীর্ঘ, প্রচণ্ডতার দিক দিয়েও তেমনি ভয়ঙ্কর।

এই অভিযান সম্পর্কে একটা কথা এখানে স্বতঃই মনে হবে। তা হ'ল এই যে, যে জার্মান বাহিনী বুদাপেস্টে অপূর্ব দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে এবং এখনও করছে রুশিয়ার শীতকালীন অভিযান প্রতিরোধে তাদের এই অক্ষমতা কেন? তবে কি পশ্চিম রণাঙ্গনে নূতন করে অভিযান আরম্ভ করতে তাকে পূর্ব রণাঙ্গন থেকে এত সৈন্য অপসারিত করতে হয়েছে যার ফলে পূর্ব রণাঙ্গনের প্রতিরোধ-ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছে? অথবা এই পশ্চাদপসরণের মধ্যে জার্মানীর কোন রাজনীতিক অভিসন্ধি আছে? এর কোন্ কারণ যে ঠিক তা জার্মানরা নিজেরা ছাড়া অন্যের পক্ষে নিশ্চয় করে বলা সম্ভব নয়। কিন্তু এই কারণগুলো সম্বন্ধে আলোচনা স্বচ্ছন্দেই করা চলে। সে সম্বন্ধে আগামী সপ্তাহে আমরা আলোচনা করবো। এখানে একথা আপাতত বলা চলে যে, জার্মানী কোন একস্থানে প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করবে এবং সে প্রতিরোধ প্রচেষ্টা খুব প্রবলই হবে বলে মনে হয়। কিন্তু তা কবে এবং কোথায় তা এখনও নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। তবে ইতিমধ্যে সংবাদ পাওয়া গেছে যে জার্মান জেনারেল গুদেরিয়ানের উপর রুশবাহিনীর এই আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করার ভার অর্পিত হয়েছে। তাছাড়া জার্মান বেতারে ঘোষণা করা হয়েছে যে, পূর্ব রণাঙ্গন সম্বন্ধে ব্যবস্থা করার পূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে হিমলার এবং হিটলারের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ সহকর্মীদের সেখানে পাঠান হয়েছে। এবং তাতে আরও বলছে যে, পূর্ব রণাঙ্গনের প্রতিরোধ-ব্যবস্থা করা হয়েছে। পূর্ব রণাঙ্গনে জার্মানরা ভি—২ অস্ত্র ব্যবহার করছে বলেও সংবাদ পাওয়া গেছে।

—বিষ্ণুগুপ্ত

"দেশ"-এর
নিয়মাবলী

বার্ষিক মূল্য—১৩৲ ষাণ্মাসিক—৬৷৷৹

বিজ্ঞাপনের নিয়ম

"দেশ" পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার সাধারণত নিম্নলিখিতরূপ :—

সাধারণ পৃষ্ঠা—এক বৎসরের চুক্তিতে
১০০" ও তদূর্দ্ধ ... ৩৲ প্রতি ইঞ্চি প্রতি বার
৫০"—৯৯" ... ৩৷৷৹ " " " "

সাময়িক বিজ্ঞাপন

৪৲ টাকা প্রতি ইঞ্চি প্রতি বার

বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ বিজ্ঞাপন বিভাগ হইতে জানা যাইবে।

প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে নিয়ম

পাঠক, গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত উপযুক্ত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়।

প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় কালিতে লিখিবেন। কোন প্রবন্ধের সহিত ছবি দিতে হইলে অনুগ্রহপূর্বক ছবি সঙ্গে পাঠাইবেন অথবা ছবি কোথায় পাওয়া যাইবে জানাইবেন।

অমনোনীত লেখা ফেরৎ লইতে হইলে সঙ্গে উপযুক্ত ডাক টিকিট দিবেন। লেখা পাঠাইবার তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে যদি তাহা 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে লেখাটি অমনোনীত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। অমনোনীত লেখা ছয় মাসের পর নষ্ট করিয়া ফেলা হয়। অমনোনীত কবিতা টিকিট দেওয়া না থাকিলে এক মাসের মধ্যেই নষ্ট করা হয়।

সমালোচনার জন্য দুইখানি করিয়া পুস্তক দিতে হয়।

সম্পাদক—"দেশ"
১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা।

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার দুইটি জোনের বা অঞ্চলের ফাইন্যাল খেলা শেষ হইয়াছে। এই দুইটি খেলার ফলাফল দেখিলে বড়ই আশ্চর্য হইতে হয়। প্রত্যেক খেলায় বিজয়ী দল প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে শোচনীয়ভাবে ইনিংসে পরাজিত করিয়াছে। পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল—এই দুইটি অঞ্চলের খেলা শেষ হইয়াছে। পূর্বাঞ্চলের খেলায় হোলকার দল শোচনীয়ভাবে এক ইনিংস ও ২৯৮ রাণে বাঙলা দলকে পরাজিত করিয়াছে। পরবর্তী খেলায় অর্থাৎ দক্ষিণাঞ্চলের খেলায় মাদ্রাজ দল শোচনীয়ভাবে এক ইনিংস ও ১২৬ রাণে মহীশূর দলকে পরাজিত করিয়াছে।

পূর্বাঞ্চলের ফাইনাল খেলা

পূর্বাঞ্চলের ফাইনাল খেলায় বাঙলা দলের শোচনীয় পরাজয় দেখিয়া আমরা কোনরূপ আশ্চর্য হই নাই। ফলাফল যে এইরূপ হইবে ইহা পূর্ব হইতেই জানিতাম। বাঙলার ক্রিকেট পরিচালকগণ ইহার পর কি ব্যবস্থা করেন দেখিবার জন্য আমরা অপেক্ষা করিয়া থাকিলাম।

এই খেলায় হোলকার দল প্রথমে ব্যাট করিয়া ৫৩৮ রাণে ইনিংস শেষ করে। কর্নেল নাইডু ও সারভাতে উভয়ে শতাধিক রাণ করিয়া ব্যাটিংয়ে অপূর্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। বাঙলা দলের নৈরাশ্যজনক ফিল্ডিংয়ের জন্যই হোলকার দলের পক্ষে এত অধিক রাণ করা সম্ভব হয়। বাঙলা দলের এন চৌধুরী ও পি বি দত্তের বোলিং কার্যকরী হয়। পরে বাঙলা দল খেলিয়া মাত্র ৯০ মিনিট ব্যাট করিবার পর ৬৪ রাণে প্রথম ইনিংস শেষ করে। ফলে বাঙলা দলকে "ফলো অন" করিতে হয়। এই ফলো অনের সময় একমাত্র পার্থসারথি ছাড়া অপর সকল বাঙালী খেলোয়াড় হতাশব্যাঞ্জক ব্যাটিংয়ের পরিচয় দেন। তৃতীয় দিন কিছুক্ষণ খেলা চলিবার পর বাঙলা দল দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ১৭৬ রাণ করিতে সক্ষম হয় ও খেলায় এক ইনিংস ও ২৯৮ রাণে পরাজিত হয়।

খেলার ফলাফলঃ—

হোলকার দল প্রথম ইনিংসঃ—৫৩৮ রাণ (সারভাতে ১২৭, কর্নেল সি কে নাইডু ১৪১, মুস্তাক আলী ৩০, ডেনিস কম্পটন ২২, সি এস নাইডু ৫০, জে এন ভায়া ৬১, এইচ গাইকোয়াড় ৭১, এন চৌধুরী ৮১ রাণে ৩টি, পি বি দত্ত ৮৫ রাণে ৪টি ও ডোব্রীকেরী ৭৪ রাণে ২টি উইকেট পান)।

বাঙলা দলের প্রথম ইনিংসঃ—৬৪ রাণ (এম সেন ১৪, পার্থ সারথী ১১, নিম্বলকার ৮ রাণে ১টি, সি এস নাইডু ৩২ রাণে ৫টি ও সারভাতে ১৩ রাণে ২টি উইকেট পান)।

বাঙলা দলের দ্বিতীয় ইনিংসঃ—১৭৬ রাণ (পার্থসারথি ৬০, পি বি দত্ত ৩১, ডোব্রীকেরী ৩৩, সি এস নাইডু ৫৮ রাণে ৪টি ও সারভাতে ৪৩ রাণে ৪টি উইকেট পান)।

দক্ষিণাঞ্চলের ফাইনাল খেলা

দক্ষিণাঞ্চলের ফাইনাল খেলায় মাদ্রাজ দলের জয়লাভ খুবই যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে। মাদ্রাজ দল মহীশূর দল অপেক্ষা অনেক শক্তিশালী। এই খেলায় মাদ্রাজ দল প্রথম ব্যাটিং লাভ করে প্রথম ইনিংস ৩৬৩ রাণে শেষ করে। তরুণ উৎসাহী খেলোয়াড় অনন্তনারায়ণ ১২৪ রাণ



করিয়া শেষ পর্যন্ত নট আউট থাকে। দলের অধিনায়ক প্রবীণ খেলোয়াড় গোপালন ৫৫ রাণ করিয়া ব্যাটিংয়ে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। মহীশূর দলের অধিনায়ক পালিয়া ৭৩ রাণে ৫টি উইকেট লাভ করে। পরে মহীশূর দল খেলিয়া মাত্র ৭৮ রাণে ইনিংস শেষ করে। ইহা একরূপ বোলার রঙ্গচারীর জন্য সম্ভব হয়। তিনি ৩৩ রাণে ৭টি উইকেট পতন সম্ভব করেন। মাদ্রাজ দল ২৮৫ রাণে অগ্রগামী থাকায় মহীশূর দলকে "ফলো অন" করায়। পালিয়া প্রাণপণে ইনিংসে পরাজয় হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় ইনিংস ১৫৯ রাণে শেষ হয়। মাদ্রাজ দল এক ইনিংস ও ১২৬ রাণে বিজয়ী হন।

খেলার ফলাফলঃ—

মাদ্রাজ দল প্রথম ইনিংসঃ—৩৬৩ রাণ (অনন্তনারায়ণ ১২৪ রাণ নট আউট, আর নেলার ৬৩, গোপালন ৫৫, রবিনসন ৩৪, পি ই পালিয়া ৭৩ রাণে ৫টি ও রমারাও ৩৩ রাণে ২টি উইকেট পান)।

বাঙালী মুষ্টিযোদ্ধা প্রতিদ্বন্দ্বীকে নক আউট করিয়াছেন। সম্প্রতি রাঁচীতে সম্মিলিত গোরা সৈনিক দলের সহিত উক্ত বাঙালী মুষ্টিযোদ্ধা দলের লড়াই হয়। এই লড়াইতেও বাঙালী মুষ্টিযোদ্ধাগণ অর্জিত গৌরব অক্ষুন্ন রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন। লড়াইর ফল হইয়াছে এই যে, বাঙালী দল হইয়াছে ১১-৮ পয়েণ্টে বিজয়ী। এই বাঙালী মুষ্টিযোদ্ধাগণ বাঙলার গৌরব। ইঁহাদের উত্তরোত্তর উন্নতি ও সাফল্য কামনা করি। নিম্নে প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রদত্ত হইলঃ

ফ্লাই ওয়েটঃ—লেঃ মাসার পয়েণ্টে বি সরকারকে পরাজিত করে।

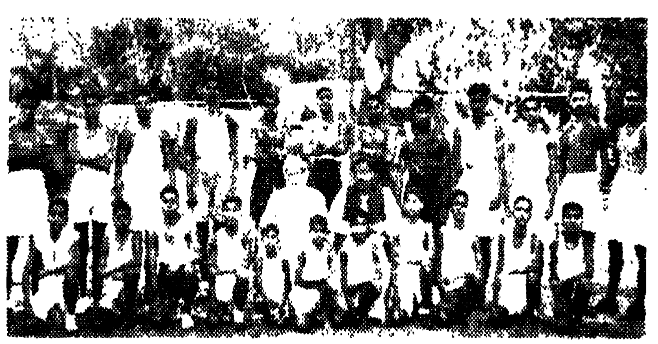
ব্যাণ্টম ওয়েটঃ—সন্তোষ চ্যাটার্জি পয়েণ্টে ব্রাথ্‌ডেট উইলিয়ামসকে পরাজিত করে।

ফেদার ওয়েটঃ—বেয়ারফুট পয়েণ্টে পি বসুকে পরাজিত করে। বিনোদ বসু প্রতিদ্বন্দ্বী সার্জেণ্ট ডে রিংয়ে উপস্থিত না হওয়ায় বিজয়ী ঘোষিত হয়।

লাইট ওয়েটঃ—হিমাংশু পাল তৃতীয় রাউণ্ডে গানার ল্যাডেলকে নক আউট করে।

কর্পোর‍্যাল স্ট্রাটফুল পয়েণ্টে ধীরেশ চৌধুরীকে পরাজিত করে।

ওয়েল্টার ওয়েটঃ—পি কে দে (অধিনায়ক) পয়েণ্টে গানার হজকে পরাজিত করে। হজ



পাবনা হিমাইৎপুর শক্তি-মন্দিরের ব্যায়াম উৎসাহিগণ

মহীশূর দল প্রথম ইনিংসঃ—৭৮ রাণ (এফ ইরাণী ২০, রমারাও ১৯, রঙ্গচারী ৩৩ রাণে ৭টি ও রামসিং ৩৩ রাণে ৩টি উইকেট পান)।

মহীশূর দল দ্বিতীয় ইনিংসঃ—১৫৯ রাণ (পি ই পালিয়া ৭৪, শ্যামসুন্দর ৪৮)।

মুষ্টিযুদ্ধ

বেঙ্গলী বক্সিং এসোসিয়েশনের বাঙালী মুষ্টিযোদ্ধাগণ গত দুই বৎসর হইল যেখানেই দলগত হিসাবে লড়িতে গিয়াছেন সেইখানেই বিজয়ীর সম্মান লাভ করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া বৈদেশিক সৈনিক দলের সহিত যখনই লড়াই হইয়াছে বাঙালী মুষ্টিযোদ্ধা দলকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয় নাই। আরও বিশেষত্ব এই যে, প্রত্যেকটি লড়াইতেই কোন না কোন

মুষ্ট্যাঘাতে জর্জরিত হইয়া তৃতীয় রাউণ্ডে অবসর গ্রহণ করে।

ব্যায়াম

বাঙলার অনেক প্রতিষ্ঠানই বালক বালিকাদের মধ্যে ব্যায়াম ও খেলাধূলার উৎসাহ বৃদ্ধি করিবার জন্য নানারূপ ব্যবস্থা করিতেছেন। ইঁহাদের প্রচেষ্টার মধ্যে অভিনবত্ব আছে স্বীকার করি, তবে কার্যকারিতা বিশেষ চোখে পড়ে না। কিন্তু পাবনা জেলার হিমাইৎপুর শক্তি মন্দিরের কর্মব্যবস্থা ও সফলতা দেখিয়া আমরা চমৎকৃত হইয়াছি। সকল ব্যায়াম বিষয়ে সকলের উৎসাহ থাকে না, এই নিছক সত্য কথাটা ইঁহারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। যে যে ব্যায়ামে উৎসাহী তাহাকে সেই ব্যায়ামে উন্নত করিতে সাহায্য করেন। আমরা এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কামনা করি।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

১৫ই জানুয়ারী—আমেদনগর দুর্গে আটক কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া অদ্য মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

অস্তি ও চিমুর মামলায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ১৫ জন আসামীর প্রাণদণ্ড মকুবের জন্য কলিকাতার ৬২ জন ব্যারিস্টারের স্বাক্ষরে এক আবেদন প্রচারিত হইয়াছে।

দিল্লীতে যানবাহনবিষয়ক পরামর্শদাতা পরিষদে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বড়লাট এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, রাস্তাঘাটের উন্নতি সাধনই ভারতবর্ষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির ভিত্তি।

অদ্য ফেডারেল কোর্ট রাজবন্দী বসন্তচন্দ্র ঘোষের আপীল ডিস্‌মিস করেন। আপীলকারীর পক্ষ হইতে বলা হয় যে, তিনি ভারতরক্ষা আইন-বিরোধী কোন কাজই করেন নাই। আইন-ব্যবসায়ীরূপে ভারতরক্ষা বিধানানুসারে অভিযুক্ত কয়েক ব্যক্তির পক্ষ সমর্থন করার দরুণই তাঁহাকে আটক করা হইয়াছে।

কলিকাতা পুলিশ বড়বাজার অঞ্চলে একখানি দোকান ও গুদামে হানা দিয়া ৩ লক্ষাধিক টাকা মূল্যের জিনিসপত্র উদ্ধার করেন।

১৬ই জানুয়ারী—বিখ্যাত বোম্বাই পরিকল্পনার দ্বিতীয়াংশ প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে ভারতের প্রধান প্রধান শিল্পপতিগণ রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রবাদ ও পুঁজিবাদের মধ্যে একটি সন্তোষজনক আপোষের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করিয়াছেন।

ঢাকার অতিরিক্ত দায়রা জজ যোলঘর পুলিশ প্রহারের মামলার আপীলে রাধাশ্যাম দাশ প্রমুখ সাতজন আপীলকারীর দণ্ড নাকচ করিয়া দেন।

সদ্য-কারামুক্ত ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ আমেদনগর বন্দিশালায় আটক কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের স্বাস্থ্য সম্পর্কে বলেন যে, দীর্ঘকাল আটক থাকার ফলে প্রায় সকলেরই স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়াছে। সর্দার প্যাটেলের স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদ্বেগের কারণ দেখা দিয়াছে। মৌলানা আজাদের ওজন ৪০ পাউণ্ড এবং পণ্ডিত নেহরুর ওজন ১৫ পাউণ্ড কমিয়া গিয়াছে।

সম্প্রতি বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের অষ্টম অধিবেশনে 'নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনে'র নাম পরিবর্তন করিয়া 'নিখিল ভারত ছাত্র কংগ্রেস' নাম রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

পাটনায় বিহার কংগ্রেসসেবী সম্মেলনের অধিবেশনে কংগ্রেসীদের কম্যুনিস্ট পার্টি, স্বামী সহজানন্দ পরিচালিত কিষাণ সভা এবং র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সদস্যদের সংস্রব ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৭ই জানুয়ারী—অদ্য লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ মার্টেনের নিকট শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র পাঞ্জাব জেলে আটক শ্রীযুক্ত অরবিন্দ বসু ও শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর পক্ষে আর দুইখানি 'হেবিয়াস কর্পাস' দরখাস্তের প্রাথমিক শুনানী হয়।

টাঙ্গাইলের এক সংবাদে প্রকাশ, ঘাটাইল থানার অধীন গঞ্জনা গ্রামের সুলতান খাঁ নামক একজন তালুকদার গত ১০ই জানুয়ারী প্রকাশ্য দিবালোকে বন্দুকের গুলীতে নিহত হন।

শিলং-এর সংবাদে প্রকাশ, আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগ প্রধান মন্ত্রী স্যার মহম্মদ সাদুল্লার বিরুদ্ধে লীগের নির্দেশ অমান্য করার জন্য কতকগুলি অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন এবং কয়েকটি অভিযোগ ইতিমধ্যেই লীগ হাইকম্যাণ্ডের নিকট জানাইয়াছেন।

কাঁথির মহকুমা হাকিম ভারতরক্ষা বিধানানুসারে শ্রীযুক্ত আশুতোষ রায় চৌধুরীকে দেড় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

১৮ই জানুয়ারী—মাদ্রাজে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের একবিংশতিতম অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে।

১৯শে জানুয়ারী—সেবাগ্রাম হইতে গান্ধীজীর সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত নরহরি পারেখ গুজরাটের কর্মীদিগের প্রতি এইরূপ নির্দেশ দিয়াছেন যে, যে সকল স্থানে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ আছে, সেই সকল স্থানে কর্তৃপক্ষকে যথোচিত নোটিশ দিবার পর আগামী ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবসে কংগ্রেসের সঙ্কল্পবাক্য পাঠ করা কর্তব্য।

মাদ্রাজে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে পাঞ্জাব প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি মিঃ ফজল ইলাহি কুরবান সর্বসম্মতিক্রমে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের একবিংশতিতম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

২০শে জানুয়ারী—কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসী দলের নেতা শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই আজ বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন। উভয়ের মধ্যে এক ঘণ্টাকাল আলাপ আলোচনা হয়।

বাঙলার গভর্নর জনস্বাস্থ্য (জরুরী বিধান) অর্ডিন্যান্স অনুসারে বাঙলা সরকারের সার্জেন জেনারেলকে শ্রীরামপুর মহকুমা হাসপাতালের কার্যভার গ্রহণ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন।

ওয়ার্ধার এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, সম্প্রতি পীড়ার পর মহাত্মা গান্ধীর স্বাস্থ্যের সন্তোষজনক উন্নতি হইতেছে বটে, কিন্তু এখনও তাঁহাকে দুর্বল এবং পরিশ্রান্ত দেখাইতেছে। তাঁহার দেহের ওজন তিন পাউণ্ড হ্রাস পাইয়াছে।

নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের বাৎসরিক অধিবেশনের আয়োজন প্রায় সমাপ্ত হইয়াছে। আগামী ২৭শে এবং ২৮শে জানুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে এই অধিবেশন হইবে।

২১শে জানুয়ারী—সিন্ধু প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি মিঃ জি এম সায়েদকে তাঁহার স্বগ্রামে তিন মাসকালের জন্য অন্তরীণ করা হইয়াছে।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া বর্তমানে আমেদনগর দুর্গে আটক আছেন; প্রকাশ, তাঁহার এই বন্দিদশার মেয়াদ আরও ছয় মাস বৃদ্ধি করিয়া তাঁহার উপর এক আদেশ জারী হইয়াছে।

২২শে জানুয়ারী—গত ১৯৪২ সালে মেদিনীপুর জেলার কয়েকটি অঞ্চলে যেসব পাইকারী জরিমানা ধার্য করা হইয়াছিল, ঐ জেলার বর্তমান আর্থিক দুরবস্থার বিষয় বিবেচনা করিয়া বাঙলা সরকার তাহা মকুব করিয়া দিয়াছেন।

সিন্ধু গভর্নমেণ্ট আগামী স্বাধীনতা দিবসে জনসভা, শোভাযাত্রা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করিয়াছেন। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে অমৃতসরে ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

১৫ই জানুয়ারী—ব্রহ্ম রণাঙ্গন—চীনা সৈন্যেরা সোয়েলি নদী অতিক্রম করিয়া নামখাম অধিকার করিয়াছে।

পূর্ব ইউরোপীয় রণাঙ্গন— লালফৌজ কার্পেথিয়ান পর্বতমালার উত্তর-পশ্চিম পাদদেশে যাসলো অঞ্চলে এক নূতন আক্রমণ শুরু করে।

১৬ই জানুয়ারী—পূর্ব ইউরোপীয় রণাঙ্গন—মার্শাল জুকভের পরিচালনায় লালফৌজ ওয়ারশ'র দক্ষিণে জার্মানব্যূহ ভেদ করে। জেস্টোচাওয়া-ক্রাকাও এলাকায় নূতন সোভিয়েট অভিযান শুরু হয়।

বর্তমান যুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মোট হতাহতের সংখ্যা সম্পর্কে মিঃ চার্চিল কমন্স সভায় বলেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের মোট হতাহত, বন্দী ও নিখোঁজের সংখ্যা ১০,৪৩,৫৫৪ জন। ভারতীয় সৈন্যদের মোট ১,৫২,৫৯৭ জন হতাহত, বন্দী বা নিখোঁজ হইয়াছে।

১৭ই জানুয়ারী—পূর্ব রণাঙ্গন—লালফৌজ অদ্য পশ্চিম ও দক্ষিণ হইতে যুগপৎ আক্রমণ চালাইয়া পোল্যাণ্ডের রাজধানী ওয়ারশ দখল করে।

১৮ই জানুয়ারী—কমন্স সভায় গ্রীস ও যুদ্ধ পরিস্থিতি সম্পর্কে এক বিবৃতিতে মিঃ চার্চিল বলেন, "শত্রু কবলমুক্ত দেশ ও অনুতাপ-ভোগী শত্রু তাঁবেদার দেশগুলি সম্পর্কে বৃটেনের নীতি হইল জনসাধারণের কল্যাণের জন্য জনসাধারণের দ্বারা জনসাধারণের গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করা।"

মিঃ আমেরী কমন্স সভায় বলেন যে, ১৯৪২ সালের হাঙ্গামা সম্পর্কে আটক বন্দিগণকে দেশের নিরাপত্তার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া মুক্তি দেওয়া হইতেছে। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের বিষয় বিবেচনা করা হইতেছে।

১৯শে জানুয়ারী—কমন্স সভায় গ্রীস সম্বন্ধে আলোচনার শেষে চার্চিল গভর্নমেণ্টের প্রতি ৩৪০--৭ ভোটে আস্থা প্রকাশ করা হয়।

২০শে জানুয়ারী—পশ্চিম ইউরোপীয় রণাঙ্গনে আক্রমণোদ্যোগ জার্মানদের হস্তচ্যুত হইয়াছে।

পূর্ব ইউরোপীয় রণাঙ্গন—জার্মানরা পূর্ব প্রুশিয়ায় ব্রেটিনাস্টিন ত্যাগ করিয়াছে।

২১শে জানুয়ারী—পূর্ব ইউরোপীয় রণাঙ্গন—সোভিয়েট সেনাপতি মার্শাল রকোসোভস্কি পূর্ব প্রুশিয়ায় টানেনবার্গ শহর দখল করিয়াছে।

মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, লালফৌজ জার্মানীর ২০ মাইল অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহারা ক্রুজবার্গ, রোসেনবার্গ, পিটসেন, গাটেনটাগ ও ল্যাণ্ডসবার্গ দখল করিয়াছে। সোভিয়েট বাহিনী বার্লিনের দুই শত মাইলের মধ্যে গিয়া পৌঁছিয়াছে।

ব্রহ্ম রণাঙ্গন—চতুর্দশ ভারতীয় বাহিনী মায়েবন উপদ্বীপে কাঁথা অধিকার করিয়াছে।

পশ্চিম ইউরোপীয় রণাঙ্গন—প্রথম ফরাসী বাহিনী দক্ষিণ আলসাসে এক জোরালো আক্রমণ শুরু করে। মার্কিন তৃতীয় বাহিনীর সেনারা জার্মানীর ভিতরে তিন মাইল অগ্রসর হইয়াছে।

২২শে জানুয়ারী—ব্রহ্ম রণাঙ্গন—মান্দালয়ের ৬০ মাইল পশ্চিমে মনিওয়া শহর মিত্রবাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। রামরী দ্বীপের চাউকপিউ বন্দর মিত্রবাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে।

পূর্ব ইউরোপীয় রণাঙ্গন—পূর্ব প্রুশিয়ার ইনস্টারবুর্গ শহর লালফৌজ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। মার্শাল কোনিয়েভের সৈন্যদল উত্তর সাইলেসিয়ার রাজধানী ওপেলনের ১৮ মাইলের মধ্যে গিয়া পৌঁছিয়াছে।

দেশ

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন | সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

১২ বর্ষ] শনিবার, ২১শে মাঘ, ১৩৫১ সাল। Saturday, 3rd February, 1945 [১৩শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

সম্পাদক সম্মেলন

সম্প্রতি কলিকাতায় নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গেল। এই সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্বরূপে শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এবং সম্মেলনের সভাপতি সৈয়দ আবদুল্লা ব্রেলভী উভয়ে তাঁহাদের অভিভাষণে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং জাতি গঠনের ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের দায়িত্ব প্রভৃতি প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে গভীরভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এ দেশের শাসকগণ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করিবার জন্য কিরূপ আগ্রহপরায়ণ এবং যুদ্ধের অজুহাতে তথাকথিত যুদ্ধপ্রচেষ্টায় বিঘ্ন সৃষ্টি না করার নামে তাঁহারা কিভাবে অর্ডিন্যান্সের উপর অর্ডিন্যান্স জারী করিতেছেন এবং পদে পদে কিভাবে তাহার অপপ্রয়োগ করা হইতেছে মিঃ ব্রেলভী তাহা উল্লেখ করেন। তিনি ভারত গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে স্পষ্ট ভাষাতেই এই অভিযোগ উপস্থিত করেন যে, সম্পাদক সম্মেলনের সঙ্গে তাঁহাদের যে চুক্তি হইয়াছিল তাঁহারা অনেক ক্ষেত্রে তাহা পালন করিয়া চলেন নাই। বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্নমেণ্টও অনেক ক্ষেত্রে প্রাদেশিক উপদেষ্টা কমিটির মত অগ্রাহ্য করিয়া সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর কঠোরভাবে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। সরকারের এইরূপ আচরণের মূল কারণ কোথায় রহিয়াছে, আমরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারি। মিঃ ব্রেলভী তাঁহার অভিভাষণে সে বেদনা ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি আমাদের অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, পৃথিবীর অপর সকল স্বাধীন দেশ অপেক্ষা ভারতে আমরা এই সত্য অধিকতররূপে উপলব্ধি করি যে, বিশ্বের সর্বত্র প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত জাতিতে জাতিতে সৌহার্দ্য দেখা দিতে পারে না এবং সে বিষয়ে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সর্বাগ্রগণ্য। যুদ্ধান্তে শান্তির কথা উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ এবং নাৎসী ও ফ্যাসিস্টবাদের সম্যক্ অবসান না হইলে ভারতের ন্যায় পরাধীন দেশের পক্ষে কোন নূতন সনদ এমন কি কোন চুক্তিরই কোন অর্থ থাকিবে না। বার্তাজীবিগণের আর্থিক উন্নতির বিষয়ে আলোচনা করিয়া মিঃ ব্রেলভী যেসব কথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে তাঁহার একটি উক্তি আমরা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মনে করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন, দেশীয় ভাষায় পরিচালিত সংবাদপত্রসমূহের বার্তাজীবিগণের পদমর্যাদা ও ভাতা যে ইংরেজি কাগজের অনুরূপে হওয়া উচিত এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। স্ট্যাণ্ডিং কমিটির লাহোর অধিবেশনে ইংরেজি ও দেশীয় ভাষায় পরিচালিত সংবাদপত্রের বার্তাজীবিগণের সর্বনিম্ন বেতনের হারে যে পার্থক্য করা হইয়াছিল, নবগঠিত স্ট্যাণ্ডিং কমিটি তাহা দূর করিবেন; তিনি আমাদিগকে এমন আশ্বাসও প্রদান করিয়াছেন। আমরা বরাবরই এই পার্থক্যের তীব্রভাবে প্রতিবাদ করিয়াছি। এই পার্থক্যের মূলে যে কারণই থাকুক, ভাষার মর্যাদাগত প্রশ্নটি আমরা কিছুতেই এড়াইতে পারি না এবং এই পরাধীন দেশে শাসকদের ভাষার প্রতি উচ্চদৃষ্টির পটভূমিকায় জাতিগত মর্যাদার প্রশ্নও এ সম্পর্কে আমাদের মনে স্বভাবত বড় হইয়া দেখা দেয়। আমরা আশা করি, ভাষাগত ভিত্তিতে এই পার্থক্য অবিলম্বে বিদূরিত হইবে।

বিনাবিচারে বন্দী সাংবাদিকগণ

নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের সভাপতি মিঃ ব্রেল্ভী তাঁহার সমাপিকা বক্তৃতায় বলিয়াছেন ঃ

> "গভর্নমেণ্ট চাহিয়াছিলেন যে, এমন কোন সংবাদ যেন সংবাদপত্রে প্রকাশিত না হয়, যাহা শত্রুর পক্ষে মূল্যবান বলিয়া গণ্য হইতে পারে, অথবা যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বাধার সৃষ্টি হইতে পারে। তাঁহারা সম্মেলনে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বাধা অবাঞ্ছনীয়। তাঁহারা ইতিপূর্বেই এইরূপ 'ভদ্রলোকের' চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহারা ইহাও স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, সংবাদপত্রকে স্বাভাবিক রাজনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টা প্রতিহত করার চেষ্টায় ব্যবহার করিলে তাহাতে তাঁহারা অংশ গ্রহণ করিবেন না।"

কিন্তু এদেশে সংবাদপত্র সম্বন্ধে সরকারী নীতি যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা হইতেছে এই যে, তোমরা আমাদের কথা মানিয়া চল, কিন্তু আমরা তোমাদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিতে এমন কি কণ্ঠ রোধ করিতেও পশ্চাদপদ হইব না। সম্পাদকগণ তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কার্য করিতেছেন। কিন্তু সংবাদপত্রের প্রতি সরকারী নীতির কোন পরিবর্তন হয় নাই। সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের বিধি-নিষেধ বিন্দুমাত্রও শিথিল করা হয় নাই। বহু সাংবাদিক বিনা বিচারে এখনও কারারুদ্ধ। তাঁহাদের মুক্তি-

দান সম্বন্ধে সরকারী নীতির কোন পরিবর্তনই লক্ষিত হইতেছে না। বিনা-বিচারে কারারুদ্ধ বন্দিগণের মুক্তির দাবী জানাইয়া সম্মেলন এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। সম্মেলনের গৃহীত প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত মাখনলাল সেন, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড ও আনন্দবাজার পত্রিকার শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ, মণীন্দ্রনাথ রায়, অশ্বিনী গুপ্ত, ক্ষেমেন্দ্রনাথ সেন, কেশবলাল ঘোষ, এবং 'সংহতি'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী—বাঙলার এইসব বন্দী সাংবাদিকের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। আমরা জানি ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই অসুস্থ। বর্তমানে ইঁহাদিগকে কারারুদ্ধ রাখিবার কোন সঙ্গত কারণই নাই। সম্মেলনের এই দাবী-সম্পর্কে সরকারের বিবেচনা বুদ্ধি এখনও জাগ্রত হইবে কি?

কংগ্রেসই নেতৃত্ব করিবার যোগ্য

উড়িষ্যার প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দাস সম্প্রতি এক বিবৃতিতে ভারতের বিভিন্ন রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানের মতামত সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। ভারতে কম্যুনিস্ট দলই সকল জ্ঞান-বুদ্ধির উৎস এবং কম্যুনিস্ট দল আজ যাহা ভাবে, কংগ্রেস কাল তাহা করে,—কম্যুনিস্ট দলের এই দাবী সম্পর্কে শ্রীযুক্ত দাস যাহা বলিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, এই মহাযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে কম্যুনিস্টগণও এই যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। কিন্তু যুদ্ধে রাশিয়ার যোগদানের পর হইতেই তাঁহাদের সুর বদলাইয়া যায়, তাঁহারা এই যুদ্ধকে জনযুদ্ধ নামে অভিহিত করিতে থাকেন! কিন্তু বৃটেন ও আমেরিকার যেসব ভদ্রমহোদয় ও মহিলা ভারত ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দিক হইতে ভারতীয় জনগণের সহিত একবাক্যে এই যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলিয়া অভিহিত করেন, তাঁহাদের এই উক্তির প্রতি তিনি কম্যুনিস্ট দলের জনৈক স্বয়ংসিদ্ধ নেতা ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। মুসলিম লীগের নেতা জিন্না সাহেব কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে বলেন যে, অন্তত কিছুকাল তাঁহাকে ভারতবর্ষ পরিচালনার সুযোগ দেওয়া হোক,—তাহার উত্তরে শ্রীযুক্ত দাস বলিয়াছেন, ১৯৩৯ সাল হইতে এ পর্যন্ত ভারত তাঁহার নেতৃত্বের অপেক্ষায় ছিল, কিন্তু সুযোগ পাশ কাটাইয়া গেল। এইরূপ আলোচনার পর উপসংহারে শ্রীযুক্ত দাস বলিয়াছেন যে, তিনি কংগ্রেসের নেতৃত্বে ও শক্তি-সামর্থ্যে গৌরব বোধ করেন। তিনি আরও বলেন যে, কংগ্রেসের উপযুক্ত নেতৃত্বের ফলেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতে তাহার অস্তিত্বের যৌক্তিকতা দৃঢ় করিতে পারে নাই এবং পরিষদগুলি ভাঙিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনও করিতে পারে নাই। কিন্তু যাহারা জাগিয়া ঘুমাইবার ভাণ করে এবং দেশবাসীকে প্রতারিত করিয়া তাহাদিগকে বিপথে চালনা করিতে প্রয়াসী হয়, একথায় তাহাদের চৈতন্যোদয় হইবে কি?

সরকারের দমন-নীতি

স্বাধীনতা-দিবস-পালনে সর্বপ্রকার সংঘর্ষমূলক কার্য এড়াইবার জন্য এবার মহাত্মা গান্ধী পূর্ব হইতেই নির্দেশ দান করেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এদেশের শাসন-কর্তৃপক্ষ এমন স্নায়ুরোগাক্রান্ত যে তাঁহারা এ সম্পর্কে দমন-নীতি অনুসরণে অতিরিক্ত তৎপর না হইয়া স্থির থাকিতে পারেন নাই। ঢাকের বাজনা শুনিলেই যেমন গাজনের সন্ন্যাসীরা নাচিতে থাকে, কংগ্রেসও দেশের নামে কিছু করিতে গেলেই তেমনই ইঁহাদের টনক নড়ে,—তা সে কাজ অহিংসই হোক, আর সংগঠনমূলকই হোক্। এলাহাবাদে স্বাধীনতা-দিবস প্রতিপালন সম্পর্কে শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডনের উপর জরুরি আদেশ জারি হইয়াছিল। জব্বলপুর, চিত্তুর, কৃষ্ণা, ত্রিচিনোপল্লী ও মাদুরা প্রভৃতি স্থানে স্বাধীনতা-দিবস উপলক্ষে সভা-সমিতি ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। লাহোরে সরকারী তৎপরতা সকলের উপর টেক্কা দিয়াছে। সেখানে কেবল সভা-সমিতি ও শোভাযাত্রাই নয়, প্রভাতফেরী ও পতাকা-উত্তোলন পর্যন্ত নিষিদ্ধ হইয়াছিল। অবশ্য যেসব স্থানে সভা-সমিতি ও শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা বলবৎ আছে, সেসব স্থানে উহা বন্ধ রাখিতে এবং উপযুক্ত কর্মপন্থা অবলম্বন করিতে মহাত্মা গান্ধী উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু লাহোরে প্রভাতফেরী ও পতাকা উত্তোলন সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞার হেতু দেশবাসীর কাছে দুর্বোধ্য। সেবাগ্রামে স্বাধীনতা-দিবসে স্থানীয় শাসন-কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত উৎসাহ যেমন অহেতুক, তেমনই হাস্যকর। শ্রীযুক্ত কানু গান্ধীর নেতৃত্বে একদল কর্মী 'সাফাই' কার্যের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইলে পুলিস তাঁহাদিগকে বাধা দেয় ও ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইতে বলে। তাঁহারা ইহাতে রাজী হন না এবং ঝুড়ি কোদাল ইত্যাদি রাখিয়া পথের ধারে বসিয়া পড়েন। অবশেষে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আসিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া পুলিস উঠাইয়া লন। ঝুড়ি, কোদাল ইত্যাদি যে যুদ্ধাস্ত্র নয়, পুলিস কি তাহাও হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম? বস্তী-পরিষ্কার প্রচেষ্টাও যে দেশে সরকারী দৃষ্টিতে আপত্তিজনক ও বাধাপ্রাপ্ত হয়, সে দেশ যে কোন সভ্য শাসনের অধীন, তাহা মনে করিতে কুণ্ঠা জাগে। কিন্তু দমননীতিতে বিহার সরকার সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। তাঁহারা বিহারের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, প্রাক্তন অর্থ-সচিব শ্রীযুক্ত অনুগ্রহনারায়ণ সিংহ, 'সার্চলাইট' পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত মুরলীমনোহর প্রসাদ এবং পণ্ডিত প্রজাপতি মিশ্র ও বিহার ব্যবস্থা-পরিষদের ডেপুটি স্পীকার অধ্যাপক আব্দুল বারীকে তাঁহাদের স্ব স্ব গ্রামে অন্তরীণবদ্ধ রাখিতে আদেশ জারি করিয়াছেন। এই কংগ্রেসকর্মিগণ আইন ও শৃঙ্খলা উল্লঙ্ঘন করিয়া সরকারী দৃষ্টিতে অপরাধজনক কোনরূপ কার্যের অনুষ্ঠান করেন নাই। তাঁহারা কেবল গঠনমূলক কার্যের জন্য দৃঢ়তা প্রকাশ করিয়াছেন। ইঁহাদিগকে অন্তরীণবদ্ধ রাখিবার পক্ষে বিহার সরকার এই অজুহাত উপস্থিত করিয়াছেন যে, ইঁহারা বিপ্লবাত্মক আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টায় ছিলেন; ইহার প্রমাণস্বরূপে তাঁহারা বিহার কংগ্রেসকর্মীদের সভায় পণ্ডিত প্রজাপতি মিশ্রের বক্তৃতার একটি বিচ্ছিন্ন অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা বিহারের পত্রিকায় পণ্ডিত মিশ্রের মূল বক্তৃতাটি পাঠ করিয়া দেখিলাম। এই বক্তৃতায় তিনি গঠনমূলক কার্যের উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। কংগ্রেসী আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে গান্ধীজীর নির্দেশিত গঠনমূলক কর্মতালিকা পালন না করার জন্যই আমাদের আন্দোলন ব্যর্থ হইতেছে; এবং গঠনমূলক কর্মতালিকা সফল করিতে না পারিলে আমরা স্বরাজ পাইব না। পণ্ডিত মিশ্র আন্দোলন পুনরুজ্জীবনের কথা বলিয়াছিলেন, ইহা সত্য; কিন্তু বিহার সরকারের এক্ষেত্রে অন্তত ইহা উপলব্ধি করা উচিত ছিল যে, তিনি ভারতের কংগ্রেসী আন্দোলনের নেতা নহেন, এমনকি বিহারেরও নহেন। অথচ কেবল তাঁহার উক্তির একাংশের জন্য আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া বিহারের কংগ্রেস-নায়কদিগের উপর আটক ও নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারি করা হইয়াছে। ইহাতে কর্তৃপক্ষের স্থির-মস্তিষ্কের অভাবই পরিলক্ষিত হয়। যুদ্ধপ্রচেষ্টায় গভর্নমেণ্ট দেশবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতার কথা বলেন, অথচ অসঙ্গতভাবে এবং অনর্থক রকমে দমনমূলক নীতি অবলম্বন করিয়া গভর্নমেণ্ট ব্যাপার আরও জটিল করিয়া তুলিতেছেন। ইহা দূরদর্শিতার পরিচায়ক নহে, আমরা গভর্নমেণ্টকে এটুকু প্রণিধান করিতে বলি।

নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলন

নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের সভাপতি মিঃ ব্রেল্‌ভি তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিতেছেন।





সম্মেলনের সভাপতি মিঃ এস এ ব্রেলভীর নাগরিক সম্বর্ধনায় কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত আনন্দীলাল পোদ্দার অভিনন্দনপত্র পাঠ করিতেছেন। বাম হইতে দক্ষিণে—সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদার, মিঃ এস এ ব্রেলভী ও শ্রীযুত আনন্দীলাল পোদ্দার।

দেশের কথা

সংবাদপত্রের দায়িত্ব

কলিকাতায় নিখিল ভারত সম্পাদক সম্মেলন হইয়া গেল। এই সম্পর্কে ভারতীয় সম্পাদকদের প্রধান এবং প্রথম কর্তব্য কি, এই প্রশ্নটি আমাদের মনে স্বতঃই উদয় হইবে। সম্মেলনের সভাপতি মিঃ এস এ ব্রেলভী গত ১২ই মাঘ বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে তাঁহার বক্তৃতায় বলেন—

"আমাদের আশু সমস্যা হইতেছে দেশের স্বাধীনতা লাভ করা। দেশের স্বাধীনতা অন্যান্য জনগণের নিকট যত বেশী প্রয়োজনীয়, সাংবাদিকগণের নিকটও ততবেশী প্রয়োজনীয়; কারণ আমরা সাংবাদিকগণ ইহা বুঝি যে, একনায়কত্ব শাসনের



আমলে স্বাধীন সাংবাদিকতার স্থান হইতে পারে না। স্বাধীন সাংবাদিকতা স্বাধীন আলাপ-আলোচনার পক্ষপাতী। স্বাধীন সাংবাদিকতা সত্যকার গণতন্ত্রের জীবনস্বরূপ। সাংবাদিকতা যেখানে প্রয়োজন সত্যকার গণতন্ত্রও সেখানে প্রয়োজন। সুতরাং ভারতের বর্তমান রাজনীতিক অচল অবস্থার আশু সমাধান হওয়া এবং এদেশে প্রকৃত জাতীয় গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যতটা জরুরী ও প্রয়োজন, সাংবাদিক ও সংবাদপত্র জীবনের পক্ষে ততটাই প্রয়োজন। আমরা সাংবাদিকেরা সত্যকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত এবং আমরা এমন কোন প্রচেষ্টা বা মনোভাবই সমর্থন করিতে পারি না, যদ্দ্বারা সংবাদপত্রগুলির উপর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, অথবা ধনিকদের স্বার্থে সংবাদপত্রগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়।"

জনগণের চিত্তের সঙ্গে পরিচয় এবং সেই পথে রাষ্ট্রশক্তিকে নিয়ন্ত্রণের বলেই স্বাধীন সংবাদপত্র জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ সম্ভব। যুক্তপ্রদেশ সাংবাদিক সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে গিয়া এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলার ডক্টর অমরনাথ ঝা সেদিন বলিয়াছেন—

জাতীয় জীবনের ব্যাপকতার পটভূমিতে সাংবাদিকতার পূর্ণ পরিণতি ঘটিতে পারে। আমার মনে হয়, ভারতে এই পটভূমি প্রস্তুত হইতেছে। ভারতে ইংরেজী সংবাদপত্রের প্রভাবের যুগের অবসান ঘটিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। এজন্য দুঃখ করিবার কিছুই নাই। দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের প্রতিপত্তির দিন আসিয়াছে। দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহ দেশের জনসাধারণের নিকট হইতে যথাসম্ভব উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করিবে, ইহাই আমি আশা করি। সত্য কথা বলিতে কি ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র দেশের খুব কম লোকই বুঝিতে পারে এবং সত্যই যদি দেশের জনমত গঠন করিতে হয়, দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদ-পত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে। হাঁ, ইহাতেও ইংরেজী সংবাদপত্রের প্রয়োজন এদেশে লোপ পাইবে না, আন্তঃপ্রাদেশিক সম্পর্ক বজায় রাখিবার জন্য সেগুলির প্রয়োজন হইবে; কিন্তু অধিকাংশ সংবাদপত্র দেশীয় ভাষাতেই প্রকাশিত হইবে।

সুতরাং দেশের স্বাধীনতার সমস্যা সংবাদপত্রের পক্ষে শুধু নৈতিক আদর্শের সমস্যা নয়, এ সমস্যা সাংবাদিক জীবনের মৌলিক সমস্যা—বাঁচামরার মত সমস্যা। এই দিক হইতে ভারতের স্বাধীনতার জন্য আন্তরিক সাধনাই পরাধীন এ দেশের সাংবাদিক জীবনের প্রধান ব্রত হওয়া কর্তব্য। ভারতের বর্তমান অবস্থায় সে ব্রত দুষ্কর এবং কঠোর। কারণ স্বাধীনতার কথা বলিতে যাওয়াই এদেশে বিপদ এবং তাহা দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে; কিন্তু সত্যই কি তাহা তেমন কোন অপরাধ?

সংবাদপত্রের অপরাধ

নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্বরূপে "বসুমতী"র সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় সংবাদ-পত্রকে জনগণের স্বাধীনতার সংরক্ষক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে জনগণের উপর প্রভুত্বপর স্বেচ্ছাচারী আমলাতন্ত্রের রোষদৃষ্টি সংবাদপত্রসমূহের উপর স্বভাবতঃই আপতিত হইয়া থাকে। শ্রীযুত ঘোষ বলেন—

আমাদের সংগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনা করিতে গেলে ১৯২০ সালের চিকাগো ট্রিবিউনের বিরুদ্ধে চিকাগোর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আনীত মামলায় তত্রত্য প্রধান বিচারপতি টমসনের উক্তি স্বতঃই আমাদের মনে পড়ে। তথাকার কর্তৃপক্ষের আর্থিক নীতির সমালোচনা করিয়া ঐ পত্রে যে মন্তব্য করা হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহাদের সুনাম ক্ষুণ্ণ হইয়াছে এই অভিযোগে এই মামলা আনা হইয়াছিল। বিচারপতি টমসন তাঁহার রায়ে বলেন,—সভ্যতার অগ্রগতির পথে মানুষের প্রধান প্রধান অধিকার সম্পর্কিত স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাক্যের স্বাধীনতার সংগ্রামও সুরু হয়। ইতিহাসই আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, অভাব-অভিযোগের কথা ব্যক্ত করিবার স্বাধীনতা না থাকিলে মানুষের কোন স্বাধীনতাই নিরাপদ নহে। তারপর সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অভাব-অভিযোগ প্রকাশ করিবার নানা পথ যখন খুলিয়া গেল, জনসাধারণ ও তাহাদের স্বৈরাচারী শাসকবর্গের মধ্যে সংগ্রাম তখন তিক্ততর হইয়া উঠিল। ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভে লোকে সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে লাগিল—আর তখন হইতেই সম্পাদকদের উপর অবর্ণনীয় নির্যাতন সুরু হইল।

পরাধীন ভারতে সংবাদপত্রসমূহের উপর নির্যাতনের এই নীতি এখনও চলিতেছে। এখানে সত্য প্রকাশে সংবাদপত্র-সমূহের স্বাধীনতা নাই এবং কর্তৃপক্ষের কণ্ঠরোধের নীতি অব্যাহতভাবে চলিতেছে। শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্রবাবু তাঁহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তিনি বলেন—

১৯৪৩ সালে ভারতে যখন ভীষণ দুর্ভিক্ষ চলিতেছিল এবং বহু নরনারী অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছিল, বাঙলা গভর্নমেণ্ট তৎকালে এই দুর্দৈবকে খাদ্যাভাব ঘটে নাই, এই মিথ্যা আশ্বাসের দ্বারা এড়াইবার চেষ্টা করেন এবং তাঁহারা পাঞ্জাব হইতে খাদ্যশস্য ক্রয় করিয়া বিপুলভাবে লাভ করিতেও ইতস্তত বোধ করেন নাই। তখন ভারত গভর্নমেণ্ট কি করিতেছিলেন, জানেন কি? এ সম্বন্ধে 'সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেট' লিখিয়াছিলেন,—

'বাঙলা সরকারের প্রচার বিভাগের ডিরেক্টার তৎকালে কলিকাতার দৈনিক পত্রসমূহে হাসপাতালে যেসব লোক অন্নাভাবের জন্য পীড়িত অবস্থায় ভর্তি হইত অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হইত, তাহাদের সংখ্যা সম্বন্ধে যে সংবাদ সরবরাহ করিতেন ভারত সরকার কর্তৃক সেসব সাধারণ সত্য কথা পর্যন্ত বাহিরে প্রেরণ করিতে বৈদেশিক সংবাদপত্রসমূহের ভারতস্থ সংবাদ-দাতাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছিল। যেসব ভয়াবহ সত্য বিবরণের ভীষণতা সরকারী দুর্ভিক্ষ নিবারণ ব্যবস্থার মাহাত্ম্যপূর্ণ বর্ণনার দ্বারা হ্রাস পাইত, শুধু দুঃখ-দুর্দশার তেমন কোন কোন বিবরণই বিদেশে পাঠাইতে দেওয়া হইত। অথচ ঐসব সরকারী ব্যবস্থার অধিকাংশেই শুধু সদিচ্ছামাত্র থাকিত। সংবাদদাতাগণ তৎকালীন অব্যবস্থার সম্বন্ধে অপ্রিয় সত্য ব্রিটিশ এবং মার্কিন জনসাধারণকে জানাইবেন, এমন উপায় রাখা হয় না।

অতঃপর শ্রীযুত ঘোষ বলেন,—

ঐ সময় বাঙলা সরকারের নিকট হইতে সংবাদপত্রসমূহ যেসব আদেশ, উপদেশ, পরামর্শ প্রভৃতি পাইত, আমার বিশ্বাস, এমন দিন নিশ্চয়ই আসিবে, যখন সেগুলি প্রকাশ করা সম্ভব হইবে। এই সময় 'ষ্টেটসম্যান' প্রথমে দুর্ভিক্ষের ভীষণতা সম্বন্ধে বর্ণনা এবং চিত্র-সমূহ প্রকাশ করিয়া সমগ্র ভারতে এবং ভারতের বাহিরের সকলের দৃষ্টি বাঙলার শাসনের কুব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট করে। এমন সম্মানের অধিকার অন্য কোন সংবাদপত্র লাভ করিতে পারে নাই।

ভারত যতদিন পর্যন্ত স্বাধীনতা লাভ না করিবে, ততদিন এদেশের সংবাদপত্র জীবনের এই দুর্গতি দূর হইবে না, ইহা নিশ্চয়।

স্বাধীনতা ও মানবতা

কারণ বিদেশী শাসকগণ চাহেন স্তাবকতা এবং তাঁহাদের অন্ধ স্তাবকতা দেশের স্বাধীনতার বিরোধী শুধু তাহাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে তাহা দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতারই সমতুল্য। সংবাদপত্রের সহিত শাসকদের সংঘর্ষের মূল কারণ এইখানে। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের শ্রমিক সদস্য মিঃ রেজিন্যাল্ড সোরেনসেন সম্প্রতি এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

ভারতের স্বাধীনতা দিবসের দাবীর ভিতর বিচ্ছিন্ন হইবার অনুচিত কিংবা অসম্ভব কোন ইচ্ছা আমি দেখিতে পাই না; পক্ষান্তরে একটা জাতির স্বাস্থ্যশীল ও স্বাভাবিক প্রাণপূর্ণ জীবনের অবদানের পরিচয়ই আমি ইহাতে পাই। রাজনীতিক আন্দোলন প্রকৃত পক্ষে একটি জাতির আধ্যাত্মিক জীবনেরই বহির্অভিব্যক্তি মাত্র। পরমুখাপেক্ষী, বিদেশী প্রভুর স্তাবকতায় প্রবৃত্ত ভারত—মানব-মহিমায় পরিপূর্ণভাবে জাগ্রত ভারত নয়; সুতরাং সেক্ষেত্রে বিশ্ব-মানবতার প্রতি নিষ্ঠাবুদ্ধিসম্পন্ন সাধনা তাহার নিকট হইতে আশা করা যাইতে পারে না। পক্ষান্তরে আত্মমর্যাদায় প্রবুদ্ধ এবং অবহিত ভারতই মানব-জীবনের পরিপূর্ণ গরিমায় আমাদিগকে সমৃদ্ধ করিতে সমর্থ। ভারতবর্ষ যদি স্বাধীনতা লাভ করে এবং জগতের অপরাপর স্বাধীন জাতিসমূহের সম-মর্যাদার ভিত্তিতে দাঁড়াইতে সমর্থ হয়, তবেই জগৎ হইতে দাসত্বের প্রভাব বিদূরিত করিতে সে আমাদিগকে সাহায্য করিবে। স্বাধীনতা লাভ করিলে ভারত তাহার সেই নবলব্ধ ক্ষমতা যথোচিত বিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচালনা করিবে কিনা, এ সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কোন কথা দেওয়া কাহারও পক্ষে সম্ভব হইবে না; তবে আমি আশা করি যে, এ বিষয়ে ভারত ভুল করিবে না। কিন্তু স্বাধীনতা বলিতে আমরা মনে যেসব বস্তুর ধারণা করি, যদি সেগুলির কোন মূল্য সত্যই থাকে, তবে ঐরূপ কোন নিশ্চয়তা আদায় করার জন্য জোর দেওয়া চলে না; কারণ তেমন কাজ নীতির দিক হইতে অত্যাচারই হইয়া দাঁড়ায়। এতদ্দ্বারা এক জাতির উপর অপর জাতির নিজের বিচার চাপাইবার অধিকার স্বীকৃত হয় এবং তাহাতে পরস্পরের মধ্যে মর্যাদাবুদ্ধির হানি ঘটে।

কিন্তু দেখিতেছি, যাঁহারা গণতন্ত্র ও মানব-স্বাধীনতার মহিমা প্রচার করিতেছেন, ভারতের ভবিষ্যৎ ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণে তাঁহাদের একচেটিয়া অধিকার রহিয়াছে, কার্যত তেমন ঔদ্ধত্য লইয়াই তাঁহারা চলিতেছেন। মনীষী বারট্রাণ্ড রাসেল সম্প্রতি 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রের নিজস্ব প্রতিনিধির নিকট সেদিন এ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"ভারতের ব্যাপার লইয়া যেসব সমস্যা দেখা দিয়াছে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট যদি সেগুলি সমাধানের ভার ভারতবাসীদের উপর ছাড়িয়া দেন, তবেই ভাল হয়, আমার ইহাই বিশ্বাস। ভারতের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়সমূহের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য নিজদিগকে বিশেষ দায়িত্বে জড়াইয়া রাখা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষে রাজনীতিক দিক হইতে সঙ্গত হইবে না। পাকিস্থানের প্রশ্নে অথবা ভারতীয় সামন্ত রাজাগুলি রক্ষা ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করাও তাঁহাদের কর্তব্য নয়; কারণ তাহা করিতে গেলে ব্রিটিশের সামরিক শক্তি তাহার সঙ্গে জড়িত হইবে এবং তাহা ভারতের স্বাধীনতার পরিপন্থী হইবে। আটলাণ্টিক সনদের নির্দেশিত নীতি অনুসারে ভারতের জন্য ভারতবাসীরা যেরূপ শাসনতন্ত্র কামনা করে, তাহা গঠন করিবার অধিকার তাহাদের নিজেদেরই থাকা উচিত। যদি তেমন শাসনতন্ত্র গণতান্ত্রিক নীতিসম্মত হয়, তবে এক্ষেত্রে আপত্তির কোন যুক্তিই টিকে না। ভারতবাসীদের নিজেদের মধ্যে যে পর্যন্ত সম্পূর্ণ ঐক্য না ঘটিবে ততদিন ব্রিটেন কিছুতেই ভারত ছাড়িবে না, এ বড় উৎকট যুক্তি। কারণ ব্রিটেন ভারতবর্ষে অবস্থিতির দ্বারা, ভারতবাসীদের বিভিন্ন দলের আপীল শুনিয়া নিজের রায় দিবার আদালত গড়িয়া তোলে; ইহা বিভিন্ন দলের মধ্যে মিলনের অন্তরায় স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়।"

ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের বর্তমান নীতির মূলীভূত মনস্তাত্ত্বিকতা ভারতবাসীরা বুঝিতে না পারে, এমন নয়; কিন্তু ব্রিটিশ রাজনীতির কর্ণধার আমেরী-চার্চিলের দল ভারতের জনমতের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন না। পার্লামেণ্টের শ্রমিক সদস্য মিঃ উইলিয়াম গালাচার দেখিতেছি এ সম্বন্ধে বৃটিশ মন্ত্রিমণ্ডলকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন—

মালয়ের ব্যাপারে আমাদের রাজনীতিক এবং সামরিক নেতাদের শিক্ষালাভ করা উচিত ছিল। মালয়বাসীরা যদি পৌর ক্ষমতা লাভ করিত এবং সেই ক্ষমতার পরিচালনপথে তাহাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগ্রত হইত, তবে মালয়বাসীরা জাপানীদিগকে বাধা দিতে সমর্থ হইত এবং তাহাদের দেশ রক্ষা করিতে পারিত; কিন্তু তাহাদের সহযোগিতা চাওয়া হয় নাই। তাহাদিগকে নিষ্ক্রিয় থাকিয়া মালয় রক্ষার ভার ব্রিটিশ সেনাদের উপর ছাড়িয়া দিতে পরামর্শ প্রদান করা হয়। অবশ্য এমন পরামর্শ জাপানীরা দেয় নাই; মালয়ের ব্রিটিশ শাসকগণই এমন পরামর্শ দিয়াছিলেন। এইভাবে মালয়ে ব্রিটিশ সেনাদের উপর একটি অসম্ভব কর্তব্যভার চাপান হয়। মালয়বাসীদিগকে স্বাধীনতা না দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ সেনাদিগকে প্রাণ দিতে হয়। মালয়ের সম্বন্ধে যদি ব্যাপার ইহাই হইয়া থাকে, তবে ভারতের ক্ষেত্রে ইহা কতটা অধিক প্রযোজ্য, বিবেচনা করিলেই বুঝা যাইবে। ভারতবর্ষ এসিয়ায় ফ্যাসিজমের প্রতিরোধে শক্তিশালী দুর্গস্বরূপে পরিণত হইয়াছে। ভারতের সঙ্গতির কথা—তাহার প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মানব বল কত বেশী ভাবিয়া দেখুন। যদি ভারতের এই সম্পদ সুগঠিত হইত এবং স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত হইত, তবে অবস্থা কতটা ভিন্ন আকার ধারণ করিত? কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতবাসীদিগকে অধীন রাখিয়া ভারতের সঙ্গতিসমূহের সংগঠনকে তুচ্ছ করিতেছে। তাহারা নিজেরাই ভারত শাসন করিতে চায়। তাহারা জানে, ভারতবর্ষ যতই রাজনীতিক এবং অর্থনীতির দিক হইতে উন্নত হইবে, ততই সেখানে তাহাদের প্রভুত্ব সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িবে। সুতরাং ভারতের উন্নতিতে উৎসাহ না দিয়া তাহারা সেপথে অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছে। এখন তাহাদিগকে শোণিতে এবং অশ্রুতে তাহাদের এই মারাত্মক নীতির মূল্য দিতে হইবে। বিলম্বে হইলেও এখনও ভারতের সম্বন্ধে যদি তাঁহাদের নীতি বিজ্ঞোচিত পথে পরিচালিত হয় এবং ভারতবাসীদিগকে তাহাদের নিজেদের দেশের শাসন-ব্যাপারে কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়, তবে অনেক সঙ্কট এড়ান সম্ভব হইতে পারে এবং বহু মূল্যবান জীবন রক্ষা পায়।

ভারতের ব্যাপার কি?

কিন্তু ভারতের জন্য চার্চিল-আমেরীর দল ব্যস্ত নহেন; অনুরক্ত ভারত নির্বিবাদে তাঁহাদের পাদুকা লেহন করিবে, তাঁহারা ইহাই সার বুঝিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা ইউরোপের জন্যই বেশী ব্যস্ত। তাঁহাদের নীতির সমর্থকদের মধ্যে এথোলের ডাচেসকে বিশেষ স্থান দেওয়া চলে। কিছুদিন হইল এই মহিলা ইউরোপীয় গণের স্বাধীনতা লীগ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন। সম্প্রতি রাশিয়ার সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের মুখপত্র "প্রাভদা" তাঁহার নীতির তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন; অবশ্য ডাচেস সোভিয়েট ইউ-নিয়নকে পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, ইহাই "প্রাভদা"র মন্তব্যের মূল কারণ। প্রাভদা লিখিয়াছেন, —ইঁহারা কি মনে করেন যে, শুধু ইউরোপের লোকেরাই স্বাধীনতা লাভে অধিকারী? এশিয়া এবং আফ্রিকার লোকেরা কি মানুষ নয়? তাহারা কি স্বাধীনতা চাহে না? ভারতবর্ষের সম্বন্ধে ডাচেস মহোদয়া এবং তাঁহার লীগের মনোভাব কি আমরা ইহাই জিজ্ঞাসা করি।" ডাচেস "প্রাভদা"র মন্তব্যের উত্তরে লিখিয়াছেন, ইউরোপের মধ্যেই যথেষ্ট সমস্যা রহিয়াছে। আমার লীগ ইউরোপের বাহিরের জন্য মাথা ঘামাইতে চায় না। ইউরোপের সমস্যাই আমাদের পক্ষে প্রধান সমস্যা।

আই সি এস-দের দাবী

এমন অবস্থায় এশিয়ার ভাগ্যে আটলাণ্টিক সনদের সুবিধা লাভের জন্য যাঁহারা আশা করিতেছেন, তাঁহাদের আশা দুরাশা মাত্র। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের ঘোষিত চতুর্বিধ স্বাধীনতা, — বক্তৃতায় স্বাধীনতা, চিন্তায় স্বাধীনতা, নিরাপত্তা এবং অভাব হইতে মুক্তির স্বাধীনতা— এ সবই ইউরোপীয়দের জন্য এবং ইউ-রোপীয় মনিবদের অনুগ্রহের উপর সংরক্ষিত আছে। ইহা দেখিয়াই পাঞ্জাবের আই সি এস'গণ সময় থাকিতে একটি স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা অভাব হইতে মুক্তির স্বাধীনতা চাহেন। এসোসিয়েটেড প্রেস, ২৫শে জানুয়ারী লাহোর হইতে নিম্নোদ্ধৃত সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন—

জানা গিয়াছে যে, পাঞ্জাব আই সি এস কমিশন শিশুদের জন্য ভাতা এবং যুদ্ধজনিত ভাতা দাবী করিয়াছেন। এই দাবীতে আছে যে, প্রত্যেক আই সি এস'কে তাঁহার প্রথম

সন্তানের জন্য মাসে ১ শত টাকা, দ্বিতীয় সন্তানের জন্য ৭৫ টাকা এবং তৃতীয় সন্তানের জন্য মাসিক ৫০ টাকা হিসাবে, ইহারা যে পর্যন্ত ২১ বৎসর বয়স্ক না হইবে ততদিন ভাতা দিতে হইবে।"

পাঞ্জাবের আই সি এস'গণ তৃতীয় সন্তান পর্যন্ত দাবীর গণ্ডী বাঁধিয়া দিলেন কেন, বুঝিতে পারি না। এ দেশের নিঃস্বার্থ সেবাব্রতে তাঁহারা ব্রতী ইহা বুঝি; কিন্তু আর্থিক কষ্টের হাত হইতে অপরাপর সন্তানদিগকে রক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া ইউরোপীয় মনিবদের এই সস্তা বিশ্ব-মানবতার যুগে তাঁহারা নিতান্তই অবিবেচনার কাজ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয়। কারণ এমন সুযোগ আর নাও আসিতে পারে।

ভারতের জনসাধারণের আয়

আই-সি-এসরা দেবলোকের জীব বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন; সুতরাং পাঞ্জাব সরকার যে তাঁহাদের দাবী সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য স্বর্গমর্ত্য তোলপাড় করিয়া তুলিবেন, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। কিন্তু তাঁহাদের মোটা বেতন এবং এই সব ভাতা যাহারা যোগাইবে, তাহাদের অবস্থা কি আমাদের সেই কথাই এক্ষেত্রে মনে পড়ে। গত ২৭শে জানুয়ারী, শনিবার সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলন উপলক্ষে কলিকাতায় আগত ভারতের সাংবাদিকদিগকে সম্বর্ধিত করিতে গিয়া ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বিষয়টি উত্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন—

বঙ্গীয় মেডিক্যাল রিলিফ কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্যগণ দেশের বিভিন্ন জনগণের সেবাকার্য সম্পর্কে কতকগুলি অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রথম অভিজ্ঞতা হইল এই যে, তাঁহারা দেখিতে পাইয়াছেন, এদেশের অধিকাংশ লোক পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে না; এজন্য এবং যৎসামান্য খাদ্য গ্রহণের ফলে তাহাদের স্বাস্থ্যের অবস্থা অত্যন্তই শোচনীয়। তাহারা যে কোন সময় অসুস্থ হইয়া পড়িতে পারে; মোটের উপর তাহাদের তথাকথিত সুস্থতা ও অসুস্থতার মধ্যে পার্থক্য অতি সামান্য। কিসে ইহাদের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হইতে পারে এ দেশের সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগ কিংবা চিকিৎসকগণ তাহা উপলব্ধি করিতে অক্ষম। আমাদের দেশের ১০ কোটি নরনারী প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়া রোগে কষ্ট পায়। সুতরাং এক্ষেত্রে রোগের চিকিৎসা অপেক্ষা প্রতীকার সাধনের দিকে লক্ষ্য রাখাই সর্বপ্রথমে প্রয়োজন। সুস্থতা এবং ব্যাধি—এ দেশের অধিকাংশের জীবনে এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ নাই বলিলেই চলে এবং ইহাদের আর্থিক অবস্থা এতই শোচনীয় যে, ইহাদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের সংস্থান না করিয়া চিকিৎসা বিধানের যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের উপাদেয় বাক্যাবলীর কোন মূল্য নাই। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। সরকারী হিসাব অনুসারে এদেশের প্রতি লোকের চিকিৎসার জন্য ব্যয়ের পরিমাণ বার্ষিক সাড়ে পনর আনা মাত্র। এ তুলনায় আমেরিকার প্রতি লোকের ঐ ব্যয় ৩৬৲ টাকা এবং ইংলণ্ডে ৫২৲ টাকা। এই হিসাবে দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি উন্মুক্ত হইবে।

ডাক্তার রায়ের এই বিবৃতি দেশের স্বাভাবিক অবস্থা সম্বন্ধে বলা চলে কিন্তু বিগত দুর্ভিক্ষে বাঙলাদেশের অবস্থা বিশেষভাবে গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। এখনও সে অবস্থার সম্যক প্রতীকার হয় নাই, আমরা এমন কথাই বলিব। এ সম্বন্ধে সরকারী আশ্বস্তিপূর্ণ উক্তি এবং বিবৃতিসমূহ বাস্তব সত্য দ্বারা সমর্থিত হয় না।

ও দেশ ও এ দেশ

ডাক্তার রায় তাঁহার বক্তৃতায় এ দেশের স্বাস্থ্য বিভাগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সেদিন কলিকাতার পৌর জনসভা অর্থাৎ কর্পোরেশনের অভিনন্দনের উত্তরে মিঃ ব্রেলভী এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি শহরের বস্তি অঞ্চলের সমস্যার প্রসঙ্গে বলেন যে, যতদিন পর্যন্ত জনসাধারণের দারিদ্র্যের সমস্যার সমাধান না হইবে, সে পর্যন্ত এ প্রশ্নের সমাধান হইবে না। শহর হইতে এই সব হতভাগ্য দরিদ্রদিগকে বিতাড়িত করিলেও বাহিরে বস্তি গড়িয়া উঠিবে। দারিদ্র্য সমস্যা বলিতে এদেশে প্রধানত আমরা অন্ন ও বস্ত্রের অভাবই বুঝিয়া থাকি। যুদ্ধের এই অবস্থার মধ্যে মার্কিন গভর্নমেণ্ট জনস্বাস্থ্য বিধানের দিকে কতটা লক্ষ্য রাখিতেছেন এবং তাহাদের খাদ্যবণ্টন ব্যবস্থা কিরূপভাবে পরিচালিত হইতেছে নিউ ইয়র্কের নিম্নলিখিত সংবাদ হইতেই তাহা বুঝা যাইবে—

'নিউ ইয়র্ক সান' পত্র সংবাদ দিতেছেন যে, আমেরিকার অধিকাংশ পরিবারের গৃহিণীরা যুদ্ধকালীন সরকারী রেশন ব্যবস্থার অনুমোদন করিতেছেন; কারণ তাহার ফলে পরিবারের লোকজনের স্বাস্থ্যের উন্নতি সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। এই সম্বন্ধে আমেরিকার ৪৮টি রাষ্ট্রের ৯৬ হাজার নারীর ভোট গৃহীত হয়, তাহাকে ভিত্তি করিয়াই এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। সাময়িকভাবে যুদ্ধ সম্পর্কিত কার্যে নিযুক্ত শ্রমিকদের সম্বন্ধে তদন্তের ফলে জানা গিয়াছে যে, তাহাদের শতকরা ৬১টি পরিবারের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটিয়াছে, শতকরা ৪টি পরিবার স্বাস্থ্যহানির কথা বলিয়াছে, শতকরা ৩৫টি পরিবার কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করে নাই। গৃহিণীরা এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, রেশনিংয়ের ফলে পরিবারের লোকেরা খাদ্য সম্বন্ধে পূর্বাপেক্ষা যত্নপর হইয়াছে, ইহা ছাড়া অধিকাংশ পুষ্টিকর খাদ্য বণ্টন করা হইতেছে বলিয়াই স্বাস্থ্যের এইরূপ উন্নতি ঘটিতেছে।

এই গেল অন্ন, এখন বস্ত্রের কথাও কিছু শুনুন। মার্কিন বার্তার ওয়াশিংটন শহরের সংবাদে প্রকাশ—

"আমেরিকার যুদ্ধ সম্পর্কিত শিল্পোন্নতি বোর্ড এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগ একযোগে বস্ত্রের মূল্য হ্রাস করিবার জন্য একটি কর্মতালিকা অবিলম্বে অবলম্বন করিবেন। এই কর্মতালিকা অনুসারে বৎসরে সাধারণ লোকের বস্ত্রের ব্যয় ৫০ কোটি ডলার হ্রাস পাইবে। এই ব্যবস্থায় অনেক কম দামে অপেক্ষাকৃত ভাল কাপড় পাওয়া যাইবে। এই বিভাগের কর্মচারীরা বলিতেছেন, তাঁহাদের অবলম্বিত ব্যবস্থায় মুদ্রাস্ফীতির ফলে বর্ধিত মূল্য-সমস্যার সমাধান হইবে এবং তুলা, পশম ও কৃত্রিম রেশমের অভাব বশত যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও জনসাধারণের ভদ্রোচিত পোষাক-পরিচ্ছদের কষ্ট থাকিবে না।"

সরকারী গুদামের পচা চাউল, আটা খাইয়া আমরা নানাবিধ রোগে অভিভূত হইয়া পড়িতেছি। শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের সরকারী গুদাম হইতে হাওড়ার ভাগাড়ে ৬ লক্ষ মণ পচা খাদ্যশস্য ফেলা হইয়াছিল। সম্প্রতি প্রকাশ পাইয়াছে যে, দুর্ভিক্ষ কমিশনের সদস্যগণ যখন ঐ স্থান পরিদর্শন করিতে যান, তখন তীব্র দুর্গন্ধ হইতে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য তাঁহাদিগকে গ্যাস মুখোস পরিতে হইয়াছিল। কলিকাতার স্বাস্থ্যহানির মূলে এই বিপুল পরিমাণ পচা খাদ্যশস্যের দুর্গন্ধ কাজ করিতেছে ইহাও শুনিতেছি। অপর পক্ষে বস্ত্রের চোরাবাজার বন্ধ করিবার জন্য ভারত সরকার হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাদেশিক অসামরিক সরবরাহ বিভাগের চেষ্টা সত্ত্বেও কাপড়ের চোরাবাজার নির্বিবাদে চলিতেছে এবং এই শীতের দিনেও এ দেশের অগণিত নরনারী বস্ত্রাভাবে ক্লেশ পাইতেছে; সুতরাং মহাযুদ্ধের সুফলের সম্বন্ধে প্রচারমূলক যত সব সংবাদ, সেগুলি আমাদের মনে সান্ত্বনার সঞ্চার না করিয়া পরাধীন অবস্থাজনিত বেদনার তীব্রতাই বৃদ্ধি করে।

প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধোত্তর জগতে বিশ্ব-মানবতা, গণতান্ত্রিকতা এবং স্বাধীনতার সম্বন্ধে বৈদেশিক রাজনীতি ধুরন্ধরগণের মুখে বড় বড় কথা সত্ত্বেও আমাদের কোন আশা ভরসা নাই। এক্ষেত্রে মিস পার্ল বাক সেদিন নিউইয়র্কে শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের সম্বর্ধনা সভায় আমাদিগকে একটি আশ্বাসের কথা শুনাইয়াছেন। বিগত মহাযুদ্ধের পর রাশিয়ায় যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহার সঙ্গে ভারতের বর্তমান অবস্থার তুলনা করিয়া তিনি বলেন—

বর্তমান যুদ্ধে ভারতে যত লোকক্ষয় ঘটিয়াছে, এক চীন ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে এত লোকক্ষয় ঘটে নাই। গত বৎসর সেখানে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ ঘটে, তাহাও যুদ্ধেরই প্রত্যক্ষ ফল,—সাধারণ কারণে এই খাদ্যসমস্যা দেখা দেয় নাই। সে দিনের রাশিয়ায় যেমন ঘটিয়াছিল, ভারতেও আজ তাহাই দেখিতে পাইতেছি। অসহনীয় বেদনায় সেখানে ক্রোধের আগুনে নূতন সৃষ্টির আবর্ত উত্থিত হইতেছে।

নূতন ভারত এই আবর্তের ফলে গঠিত হইবে। জনসাধারণের বৈপ্লবিক প্রেরণা স্বার্থ-সঙ্কীর্ণতাকে চূর্ণ করিয়া ফেলিবে। সত্যই এখানেই আমাদের যত কিছু আশা রহিয়াছে।

ইতিহাস ও সংস্কৃতি

ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

[২]

এইভাবে বাঙালী জনগণের পত্তন হইল—বাঙালীর সংস্কৃতি তাহার আদিম রূপ গ্রহণ করিল। এই সংস্কৃতিতে কোন্ জাতীয় লোকের কাছ থেকে কি কি উপাদান পাওয়া গিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা একটা অতি জটিল সমস্যা। এখন থেকে হাজার বারো শ কি পনেরো শ বৎসর পূর্বে বাঙালীর ধর্ম সংস্কৃতি ও সমাজ কি রকম ছিল, তাহা জানিবার চেষ্টার আরম্ভ হইয়াছে মাত্র; এই জানার সার্থকতা এখানে, যে তাহার দ্বারা আমরা আমাদের নিজেদেরই জানিতে পারিব এবং অতীত ইতিহাসের গতি আলোচনা করিয়া, জাতির প্রকৃতির কিছুটা আভাস পাইলে আমাদের ভবিষ্যৎকেও তাহার ফলে কতক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়তো আমরা সমর্থ হইব।

ইংরেজিতে একটি কথা আছে—the old Gods never die পুরাতন দেবতারা চিরকাল জীবিত থাকেন, তাঁহারা মরেন না। দেশের বা জাতির প্রাচীন ধর্ম একেবারে নির্মূল হইয়া যায় না—নূতন ধর্ম বাহির হইতে আসিয়া গৃহীত হইলেও তাহাতে পুরাতনের অনেক জিনিসই একটু নাম ও রূপ বদলাইয়া নিজ মৌরশী পাট্টা কায়েম রাখিয়া থাকে। আর্যেরা আসিল তাহাদের হবন বা হোমমূলক ধর্মানুষ্ঠান লইয়া। দেশে অনার্যদের মধ্যে পূজামূলক ধর্মানুষ্ঠান ছিল; 'পূজা' আংশিকভাবে অথবা ক্ষেত্র-বিশেষে সংস্কৃত ভাষাময় অনুষ্ঠান হইয়া আর্য অনার্যের মিলিত ধর্মে (ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মে) নিজ স্থান করিয়া লইল। আর্যদের দেবলোক ও অনার্য দ্রাবিড় ও অস্ট্রিকদের দেবলোক, উভয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বা মিল দাঁড়াইয়া গেল, আর্যানার্য অর্থাৎ পৌরাণিক দেবলোকের "সুধর্মা-সভার"—অধিবাসীদের সৃষ্টি হইল। প্রাচীনের ধারা নবীনের সঙ্গে আপস করিয়া লইয়া পরিবর্তিত আকারে কোথাও বা ক্ষীণ-ভাবে কোথাও বা আরও পরিবর্ধিতরূপে, এখনও পর্যন্ত প্রবাহিত রহিয়াছে।

প্রাচীন অনার্য ভাষা, অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়, স্বয়ং লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এগুলি আর্য ভাষার প্রকৃতিকে নানা বিষয়ে পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছে; এবং প্রচ্ছন্নভাবে খিড়কী দরজা দিয়া বহু অনার্য শব্দ আর্যভাষায় স্থান করিয়া লইয়াছে। এ সমস্ত হইতেছে ভাষাতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় এবং এই আলোচনার সাহায্যে আর্য ও অনার্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংঘাত ও সংমিশ্রণের পরিচয় আমরা কিছু পরিমাণে পাইতেছি। অনার্য ধর্মের স্বরূপ ও প্রকৃতি তেমনি অধুনাপ্রচলিত ব্রাহ্মণানুমোদিত ও শাস্ত্রনিবদ্ধ হিন্দু ধর্মে, তথা দেশের মধ্যে (বিশেষ করিয়া অনুন্নত ও অশিক্ষিত জন-সমূহের মধ্যে) প্রচলিত নানা গ্রাম-দেবতার পূজায় ও লোকধর্মে এবং Folklore অর্থাৎ লোকযানের মধ্যে মিলিবে। এখন মোটা-মুটিভাবে আমরা যেন বুঝিতে পারিতেছি যে, বৈদিক আর্যধর্মের বাহিরে যে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম মিলে, যে কর্মবাদ, জন্মান্তরবাদ, যোগদর্শন ও যোগের নির্দিষ্ট সাধনা, আদ্যাশক্তির আরাধনা ও শিব-শক্তি-বাদ, বিষ্ণুর আরাধনা প্রভৃতি লইয়া হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট্য, সে-সমস্ত জিনিস মুখ্যতঃ অনার্য ধর্মজগৎ হইতেই গৃহীত। এই দিক দিয়া উৎপত্তি ও বিকাশের দিক দিয়া, লৌকিক দেবতা লোকধর্ম ও লোকযানের আলোচনা সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। এগুলির মধ্যে আমাদের সৃজ্যমান বাঙালী জাতির সংস্কৃতির এবং আধুনিক বাঙালী গ্রামীণ সংস্কৃতির অনেক রহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, বাঙলাদেশের প্রচলিত দুই চারিটি লোকধর্মের কথার উল্লেখ করিতে পারা যায়। বাঙলায়, বিশেষ করিয়া পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গে, ধর্মপূজা নামে একটি সুপরিচিত লোকধর্ম প্রচলিত আছে। ব্রাহ্মণ্যের সহিত এই লোকধর্মের একটা আপস হইয়া গিয়াছে—ধর্মপূজার প্রধান দেবতা ধর্মঠাকুর এখন কোথাও বিষ্ণুর সহিত, কোথাও শিবের সহিত, কোথাও বা সূর্যের সহিত অভিন্নরূপে গৃহীত হইয়াছেন। ধর্মপূজাকে এখন বাঙলাদেশে প্রচলিত হিন্দু ধর্মের একটি অঙ্গ বলিতে হয়। কিন্তু ইহাতে এমন অনেক অনুষ্ঠান ও রীতি-পদ্ধতি, এমন অনেক ভাবধারা আছে যেগুলিকে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রানুমোদিত বলা চলে না, যেগুলি বিশেষভাবে ব্রাহ্মণেতর জগতের সহিত সম্পৃক্ত। আধুনিক শিক্ষিত জনের দৃষ্টি এদিকে পড়িল, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এ সম্বন্ধে প্রথম আলোচনা করিলেন। "ধর্ম" দেবতার নামটির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া এবং বৌদ্ধ-ধর্ম সম্বন্ধে দুই একটি উল্লেখ ধর্মপূজা বিষয়ক গ্রন্থে পাইয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, ধর্মপূজা হইতেছে বাঙলা দেশে বৌদ্ধধর্মের অবশেষ মাত্র। কিন্তু এ বিষয়ে নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে আলোচনার আবশ্যকতা আসিতেছে। ধর্মপূজার অন্তর্নিহিত ভাবাবলী এবং ইহার অনুষ্ঠানাদি দেখিয়া মনে হয়, ইহা বৌদ্ধধর্মের সহিত সম্পৃক্ত নহে—ইহা একটি স্বতন্ত্র cult বা আম্নায় এবং ইহা এদেশের (বাঙলাদেশের ও উত্তর ভারতের) আদিম অস্ট্রিক জাতির মধ্যে আর্যদের আগমনের পূর্বে এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উদ্ভবের পূর্বে যে ধর্ম প্রচলিত ছিল, তাহারই ব্রাহ্মণানুমোদিত রূপান্তর বলিয়া মনে হয়। ধর্মপূজা মতে সৃষ্টি পত্তন, ধর্মদেবতার বিশেষ ক্রিয়া বা শক্তি প্রভৃতি সমস্তই এক অতীত যুগের ধর্ম-বিশ্বাস ও আচরণের চিহ্নাবশেষ মাত্র। বাঙলার ধর্মপূজা সশ্লিষ্ট সৃষ্টি-কাহিনীর অনুরূপ কাহিনী মধ্য ভারতের অনার্য (দ্রাবিড়) জাতীয় গোণ্ডদের মধ্যে এখনও প্রচলিত আছে, Verrier Elwin ও তাঁহার সহকর্মী শ্যামরাও হিবলে তাহার উদ্ধার করিয়াছেন। এই অস্ট্রিক জাতির ও সম্ভবতঃ বাঙলার দ্রাবিড় জাতির ধর্মের স্বরূপ কি ছিল তাহার একটা ক্ষীণ আভাস হয়তো ইহা হইতেই পাওয়া যাইবে; এই আদিম অস্ট্রিক ধর্ম, ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহের যুগ হইতেই যে ভারতে উপনিবিষ্ট আর্য জাতির উপরে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল, তাহার কিছু কিছু ইঙ্গিত পাইতেছি বলিয়া মনে হয়।

বাঙালী জাতি ও বাঙলা ভাষা সৃজনের কালে, অর্থাৎ বিশিষ্টতা গ্রহণের কালে যে সমস্ত শুদ্ধ অনার্য এবং মিশ্র আর্য-অনার্য মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি বিষয়ক ভাব ও অনুষ্ঠান বিদ্যমান ছিল, ধর্মপূজার আদি রূপ তন্মধ্যে যেমন অন্যতম, তেমনি সহজিয়া, তান্ত্রিকতা, নাথধর্ম এবং সর্পের দেবতা বিষহরী বা মনসার পূজা, ব্যাঘ্রের দেবতা দক্ষিণরায়ের পূজা প্রভৃতিও ছিল। তান্ত্রিকতা ও সহজিয়া মত সামসময়িক মহাযান বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে যেমন মিশিয়া গিয়াছিল, তেমনি আবার ব্রাহ্মণ্য (শৈব ও শাক্ত এবং বৈষ্ণব) ধর্মের মধ্যেও এই দুইটি ধর্মমত ও পদ্ধতি নিজ স্থান করিয়া লয় এবং নাথধর্ম, মনসা পূজা ও দক্ষিণরায়ের পূজাও মধ্যযুগের বাঙলার হিন্দু ধর্মের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। আবার ওদিকে মুসলমান ধর্মের প্রতিষ্ঠার পরে দক্ষিণরায়ের পূজা ইস্‌লামী রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া গাজীমিয়াঁর নামে বাঙালী মুসলমান জানপদবর্গের মধ্যে বিদ্যমান আছে। ধর্মপূজা, নাথধর্ম, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সহজিয়া, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ তান্ত্রিকতা মনসা প্রভৃতি লৌকিক বিবিধ দেবতার পূজা

—এসমস্তের ইতিহাসের সহিত হাজার বছরের ও অধিক কালের বাঙলার ধর্মবিষয়ক ও উচ্চ-চিন্তা-বিষয়ক "সংস্কৃতি" ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। স্বর্গ, অন্তরীক্ষ ও মর্তে অবস্থিত ৩৩ জন দেবতাকে অগ্নির মাধ্যমে ঘৃত দুগ্ধ সমিধ্, মাংস পুরোডাশ প্রভৃতির দ্বারা আরাধনা করিয়া তাঁহাদের অনুগ্রহ লাভ করিয়া জীবনে প্রতিষ্ঠাপন্ন ও শক্তিশালী হওয়া ইহাই ছিল বাস্তববাদী আদি আর্যের কাম্য। অনার্যদের মধ্যে (যেমন অস্ট্রিকদের মধ্যে) জল, স্থল, গিরি, অরণ্য অন্তরীক্ষ এবং আকাশ-লোকের ও পৃথিবীর অভ্যন্তরে অধোলোকের অধিবাসী দেবতার পূজা ছিল; আবার তাঁহাদের মধ্যে যৌগিক বিভূতি বা অপার্থিব শক্তি-যুক্ত যোগীতে, দিব্যজ্ঞান ও শক্তিযুক্ত পূজারীতেও বিশ্বাস ছিল। এই পূজারী বা যোগী—আধুনিক ইউরোপীয় নৃতত্ত্ববিদ্যার পরিভাষায় এরূপ দিব্যশক্তিমান পূজারীকে shaman শব্দ দ্বারা অভিহিত করা হয়—মৃত্যুর পরেও যে সমাজের লোক তিনি ছিলেন, সেই সমাজের ভালমন্দ করিতে পারেন বলিয়া ধারণা ছিল; পৃথিবীর বহু আদিম ও এমনকি উন্নত জাতির লোকের মধ্যে এখনও অনুরূপ বিশ্বাস দেখা যায়। এইরূপ শক্তিধর যোগী বা পূজারীর মৃত্যুর পর তাঁহার সমাধিতে লোকে তাঁহার আত্মার তৃপ্তির জন্য নিয়মিত পূজা করিত। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার দেহ অথবা দগ্ধাবশিষ্ট দেহাস্থি বা দেহভস্মকে ভূপ্রোথিত করিয়া তাহার উপরে মৃত্তিকা ইষ্টক অথবা প্রস্তর দিয়া একটি "স্তূপ" গঠিত হইত এবং এই স্তূপকে অবলম্বন করিয়া তাহার অভ্যন্তরে সমাহিত মৃতের পূজা হইত। এই রীতি সম্ভবতঃ অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় উভয় জাতির লোকেদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং এই দুই জাতির মানুষের বিস্তৃতি বা ক্ষেত্র ধরিয়া পশ্চিমে ঈরান হইতে আরম্ভ করিয়া আফগানিস্থান এবং সমগ্র ভারত জুড়িয়া এই ধরণের প্রেতাত্মার সম্মাননার জন্য সমাধি পূজা প্রচলিত ছিল। আর্যেরা দেহ ভূপ্রোথিত করিত, দাহও করিত; কিন্তু তাহাদের মধ্যে এরূপ সমাধি পূজার রীতি ছিল না। ভারতে আসিয়া এই জিনিসকে তাঁহারা গ্রহণযোগ্য মনে করে নাই—"এড়ূক পূজা" বলিয়া মহাভারতে ও রামায়ণে ইহার অবজ্ঞাপূর্ণ উল্লেখ আছে। কিন্তু এই "এড়ূক পূজা" বা সমাধি পূজা ছিল অতি প্রাচীন রীতি, ইহা সহজে যাইবার নহে। বৌদ্ধ ধর্মে বুদ্ধদের প্রতি অত্যধিক সম্মানের রীতি থাকায়, বৌদ্ধ চৈত্য-পূজাকে আশ্রয় করিয়া এই সমাধি পূজাই বলবৎ রহিল—সারা দেশ বৌদ্ধ রাজা ও ভাগ্যবানদের প্রসাদে চৈত্যে চৈত্যে ভরিয়া গেল। পরে দেখাদেখি ব্রাহ্মণ্যধর্মেও সন্ন্যাসী গুরুর সমাধির পূজা বা সমাধির প্রতি বিশেষ সম্মান রীতিও গৃহীত হইল। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম কর্তৃক এই প্রাগার্য রীতি গৃহীত বা অনুমোদিত হইবার পরে আফগানিস্থান, উত্তর ভারত ও বাঙলা দেশের চৈত্যপূজক বৌদ্ধ (ও সন্ন্যাসীর সমাধির প্রতি সম্মান প্রদর্শক ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী) লোকেদের অনেকে নবাগত ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ করিল, কিন্তু চৈত্য-পূজা ছাড়িল না; এই পূজার বাহ্য অবয়ব ও অনুষ্ঠান এবং এই পূজা সংক্রান্ত পারিভাষিক শব্দ পরিবর্তিত হইল, চৈত্যপূজার অভিনব ইসলামী রূপ দেখা দিল—পীরের দরগারূপে। ইসলামের জন্মভূমি আরব দেশে অনুরূপ জিনিস নাই—যদিও ইসলামের মধ্যে "জাহিলিয়া" অর্থাৎ মোহম্মদের পূর্বেকার "অজ্ঞতা"র যুগের অনেক ধর্মাচার ও অনুষ্ঠান ইসলামের মধ্যে স্থান করিয়া লইয়া সমগ্র জগৎময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা বিশুদ্ধ কোরানী বা মোহাম্মদী ইসলামের পক্ষপাতী, তাঁহারা দরগাকে আশ্রয় করিয়া ধর্মানুষ্ঠান পছন্দ করেন না, অনেকে এ সম্বন্ধে ঘৃণা প্রকাশ করেন এবং এইরূপ রীতিকে "পীর-পরস্তী" অর্থাৎ "স্থবির-পূজা" এবং "গোর-পরস্তী" অর্থাৎ "সমাধি-পূজা" বলিয়া অবজ্ঞা করেন; কিন্তু সারা বাঙলা, সারা ভারত ও পূর্ব ঈরান জুড়িয়া পীরের দরগায় এবং মজারে মুসলমান (এবং মুসলমানদের দেখাদেখি হিন্দু) ভক্তবৃন্দ শীরণী দিয়া, জোরের সঙ্গে পূজা করিতেছে; এই জিনিস বন্ধ করিতে যাওয়া মুসলমান ধার্মিক ও অন্যবিধ নেতারা নিরাপদ মনে করেন না।

এইভাবে দেখা যায়, আমাদের বাঙলা দেশের সংস্কৃতি কতটা প্রাচীনের রূপান্তর মাত্র। ভৌতিক বা জাগতিক সভ্যতা অর্থনৈতিক সভ্যতা, যাহা সংস্কৃতির ভিত্তি, তাহা ভৌগোলিক এবং তদধীন অর্থনৈতিক পারিপার্শ্বিকের উপর নির্ভর করে। বাঙলা দেশ হইতেছে সর্বতোভাবে কৃষির দেশ, কৃষি ও মৎস্যশিকার এবং অল্পস্বল্প গোচারণ—এইগুলির উপরে বেশির ভাগ বঙ্গবাসীর আজীবিকা নির্ভর করে। বাঙলাদেশ স্বাভাবিকভাবে বাণিজ্যকেন্দ্র নহে—যেভাবে দক্ষিণ আরবদেশ এবং ফিনিশীয় প্রভৃতি পশ্চিম এশিয়ার কতকগুলি অঞ্চল ও কার্থেজ নগরী প্রভৃতি কতকগুলি প্রাচীন স্থান বাণিজ্যকেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। বাঙলার বণিকেরা জাহাজে করিয়া সুবর্ণভূমি বা দক্ষিণ ব্রহ্ম, কটাহ বা মালয়দেশ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, চীন-দেশ প্রভৃতি যাইত, সিংহলে খুবই যাইত এবং পশ্চিমে গোয়া অঞ্চলে ও এমনকি পারস্য-দেশেও যাইত; কিন্তু বাঙলাদেশ পৃথিবীর বাণিজ্যপথের বাহিরে এক প্রান্তে পড়িয়া থাকায়, বাঙালীরা পৃথিবীর অন্যতম বণিক্ জাতি হইয়া উঠিতে পারে নাই, বেশীর ভাগ বাঙালী বরাবরই কৃষিজীবী ছিল। এইজন্য বাঙলা দেশে যে সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা হইতেছে কৃষিমূলক গ্রামীণ সভ্যতা; তাহা গুজরাট-রাজপুতানা ও দক্ষিণ ভারতের কোনও কোনও অঞ্চলের মত, মধ্যযুগের ইটালির জেনোয়া ও ভেনিস প্রভৃতি বন্দরের মত, পরবর্তীকালের হলাণ্ড ও ইংলাণ্ডের মত বাণিজ্যমূলক এবং সমৃদ্ধ নাগরিক সভ্যতা নহে। বাঙলা দেশে তেমন বড় নগর গড়িয়া উঠে নাই—তক্ষশিলা, মথুরা, দিল্লী, কান্যকুব্জ, কাশী, উজ্জয়িনী, প্রতিষ্ঠান, কাঞ্চীপুর, উরগপুর বা মাদুরা, লাহোর বা পুণার মত শহর বাঙলার মাটিতে দেখা দেয় নাই। এ বিষয়ে বাঙলা দেশে অস্ট্রিক জাতির গ্রামীণ সভ্যতার ধারাই যে বলবৎ রহিয়াছে, তাহাই বলিতে হয়। পশ্চিম ও উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় জাতির নাগরিক সভ্যতা, যে সভ্যতার শিকড় গিয়া পঁহুছায় খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রকের মোহেন-জো-দড়ো, ছান্‌হু-দড়োট, হড়প্পা প্রভৃতির বিরাট্ নগরগুলিতে—সেই নাগরিক সভ্যতা বাঙলাদেশে প্রকাশ পায় নাই।

বাঙালী জাতির সৃজনের কালে বাঙলা দেশের অর্থনৈতিক সভ্যতার ইতিহাসে একটি বিষয় লক্ষণীয় এবং এ বিষয়ে আমাদের প্রথম দৃষ্টি আকর্ষিত করেন আমার সহকর্মী ও সুহৃৎ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন রায়। বাঙলা দেশের প্রাচীন অর্থাৎ এখন হইতে ১৫০০ বৎসর পূর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া তুর্কীবিজয় পর্যন্ত যে সমস্ত ভূমিদানের দলিলস্বরূপ তাম্রপট্ট পাওয়া গিয়াছে সেগুলির আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, গুপ্তরাজাদের আমলের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন তাম্রলিপিগুলিতে যে সমস্ত প্রধান রাজ-কর্মচারী ও জনসাধারণের পক্ষ হইতে প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের উল্লেখ থাকিত, তাঁহারা প্রায় সকলেই বণিক ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর ব্যক্তি হইতেন—যথা, "নগরশ্রেষ্ঠী" বা নগরের প্রধান শেঠ বা বণিক, "প্রথম সার্থবাহ" অর্থাৎ বণিকসমাজের প্রতিনিধি, "প্রথম কুলিক" অর্থাৎ উৎপাদক শিল্পীদের প্রতিনিধি এবং "প্রথম বা জ্যেষ্ঠ কায়স্থ" অর্থাৎ রাষ্ট্রের দপ্তরের প্রধান কর্মকর্তা। দেখা যাইতেছে যে, প্রথম প্রথম, গুপ্ত-রাজাদের রাজত্বকালে, বণিক্ ও শেঠ অর্থাৎ 'ব্যাঙ্কার' এবং শাসকবর্গেরই প্রাধান্য বেশি ছিল, প্রজা-সাধারণের পক্ষ থেকে, কৃষি-জীবীদের পক্ষ থেকে, প্রতিনিধিরূপে তেমন লোক নেওয়া হইত না বা ডাকা হইত না। কিন্তু পরবর্তীকালের পাল ও সেনরাজাদের আমলের তাম্রপট্টে দেখা যায় যে, পল্লীগ্রামের কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদেরও একটা স্থান দেওয়া হইয়াছে। আমার মনে হয়, ইহার কারণ এই যে, গুপ্তসম্রাট্‌দের আমলে বাঙলাদেশের কৃষিজীবী প্রজারা বেশির ভাগই অনার্যভাষী এবং বিজিত পর্যায়ের ছিল, কিন্তু বণিক্ ও স্বার্থবাহেরা ছিল পশ্চিম-হইতে আগত, আর্যভাষী, এই কারণে আর্য-ভাষী রাজকর্মচারীদের ন্যায়ই অনার্য প্রজার দেশে তাহাদের মর্যাদা ও উচ্চ স্থান ছিল। পরে আর্যভাষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে যখন পল্লী-অঞ্চলের সাধারণ অধিবাসীরাও আর্য-ভাষী হইয়া দাঁড়াইল, তখন রাষ্ট্রীয় বা রাজকীয় ব্যাপারে তাহাদেরও অন্ততঃ বাহিরেও কিছুটা সম্মান দেখানো অপরিহার্য হইয়া পড়িল।

পাল এবং সেনবংশীয় রাজাদের আমলে বাঙালী জনগণ তাহাদের ভাষা ও অন্যতম

মুখ্য বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হইল। নূতন ভাষা বাঙলার রূপগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর মানসিক সংস্কৃতি এই ভাষার মাধ্যমে আত্ম-প্রকাশের কার্যে লাগিয়া গেল—আনুমানিক দশম শতক হইতে প্রাচীন বাঙলা ভাষায় রচিত বৌদ্ধচর্যাপদকে অবলম্বন করিয়া বাঙলা ভাষার সাহিত্যিক ইতিহাস আরম্ভ হইল। কিন্তু অনুমান হয়, প্রথমটা নিরক্ষর জনসাধারণকে উদ্দেশ করিয়াই বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ ও নাথপন্থী সাধকগণ দেশ-ভাষা বাঙলাতে লিখিতে আরম্ভ করেন। শিক্ষিত লোকে তখন নিখিল ভারতীয় সংস্কৃতির ভাষা দেবভাষা সংস্কৃতের মোহে পড়িয়াছিলেন—তাঁহাদের হাতে সংস্কৃত ছাড়া দেশভাষার চর্চা হইত না—অন্ততঃ বাঙলা ভাষা একটা ক্রমোন্নতিশীল ও প্রৌঢ় সাহিত্যের ভাষারূপে দাঁড়াইয়া না যাওয়া পর্যন্ত। বাঙলা ভাষার প্রাথমিক যুগে, বাঙলা দেশের উচ্চশিক্ষিত মনের পরিচয় পাই, বাঙালী পণ্ডিত ও কবিদের লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থে ও সংস্কৃত কবিতায় এবং কাব্যে। "সদুক্তি কর্ণামৃত"র মত সংগ্রহ-গ্রন্থে আমরা শত শত বাঙালী কবির সংস্কৃত কবিতা দেখি এবং যে যুগে বাঙলা ভাষা শিশুর মত চলিতে শিখিতেছে মাত্র, সেই যুগে বঙ্গ-সরস্বতীর বীণাঝঙ্কার মার্জিত রুচির বাঙালী কবির কল্পনা ও ভাবুকতার পরিচয়, আমরা এইরূপ সংস্কৃত কবিতাবলীর মধ্যেই পাই।

তুর্কীবিজয়ের পরে বাঙালী পণ্ডিতজন এবং বাঙালী জনগণ পরস্পরবিরোধী টানের মধ্যে পড়িল। বৌদ্ধধর্ম তখন পতনের দশায় —ইহার অন্তিম রূপ অনেকটা বজ্রযান ও সহজযানের অনুষ্ঠান ও মন্ত্রতন্ত্রে পর্যবসিত হয় এবং আধ্যাত্মিক ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রে ইহার পরাভব ঘটে; ব্রাহ্মণ্যধর্ম তখন একদিকে বৈষ্ণব ভক্তিবাদকে ও অন্য দিকে তান্ত্রিক শক্তিপূজাকে অবলম্বন করিয়া ও জনসমাজের মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ-কাহিনীর মাধ্যমে সুযুক্তিময় ধর্ম-জীবনের প্রচার করিয়া, পুনরায় নবশক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে; এমন সময়ে তুর্কী রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষিত মুসল-মান ধর্ম আসিয়া দেশে নূতন ঝড় বহাইয়া দিল। লৌকিক বা গ্রামীণ ধর্ম উচ্চভাবের দর্শন ও চিন্তা হইতে বিচ্যুত থাকিয়া কেবল কতকগুলি নিরর্থক অনুষ্ঠানে অবনমিত হইল। এই কয়প্রকার বিভিন্ন আদর্শের বা বিভিন্ন অনুপ্রেরণার ভাবধারার পরস্পর সংঘাতের মধ্যে একদিকে যেমন ব্রাহ্মণ্য মনোভাব ব্রাহ্মণ্য আদর্শ, বৈষ্ণব ও শাক্ত উভয় সম্প্রদায়ের মাধ্যমে, দেশের জনগণের জীবনে সর্বাপেক্ষা প্রবল শক্তিরূপে দেখা দিল, অন্যদিকে তেমনি নূতন আগত ইসলামের সহিত এই শক্তির সংঘর্ষ অপরি-হার্য হইল।

ইসলাম ভারতবর্ষে দুইটি বিভিন্ন মূর্তিতে দেখা দেয়—এক, শরিয়ৎ বা শাস্ত্রের অনু-মোদিত গোঁড়া ইস্‌লাম, যাহার সহিত অন্য ধর্মমতের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী এবং যাহা ব্রাহ্মণ্যকে "কুফর", অর্থাৎ ইসলামবিরোধী ধর্ম মাত্র বলিয়া মনে করে; আর দুই—সুফী মতের ইসলাম, যাহার আদর্শ ছিল উদার ও সার্বজনীন, যাহার সহিত হিন্দু দর্শনের ও হিন্দুর উচ্চাঙ্গের ধর্মজীবনের একটা আপস সহজ ছিল। শরিয়তী বা গোঁড়া বা অনুদার ইস্‌লামের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য হিন্দুর সমস্ত চেষ্টা আপনা হইতেই নিয়োজিত হইল। ভক্তিবাদ এবং রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের ভাষানুবাদ এই কার্যে বিশেষ সহায়ক হইল। হিন্দুর মনকে সুফী মতের ইসলাম ভিতর হইতে বেশ একটু নাড়া দিল; তাহার ফলে ভারতের ধর্মজীবনে ভক্তিবাদের উপরে বাহিরের অনুভূতির একটু রঙ্গ চড়িল এবং কবীর প্রমুখ "সন্ত" বা সাধুদের জীবনী ও প্রচারের ফলে সুফিয়ানা ঢঙের সাধনমার্গ হিন্দুদের মধ্যে একটা স্থান করিয়া লইল। শরিয়তী ও সুফিয়ানা—এই দুই প্রকারের ইস্‌লামের মিলিত প্রভাব আসিয়া মুসলমান রাজশক্তির সহিত যোগ দিল এবং বহু হিন্দু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিল। বাঙালীর জীবনে ইহার ফলে আর একটি নূতন ভাবধারা আসিয়া মিলিত হইল—ইসলামী ভাবধারা, বিশেষ করিয়া সুফী মতের ভাবধারা ও আদর্শ।

শুনিয়াছি, কোথায় নাকি দেশবন্ধু চিত্ত-রঞ্জন দাশ বলিয়াছিলেন বা লিখিয়াছিলেন যে, বাঙালী হিন্দুর সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ বিকাশ হইয়াছে বৈষ্ণব কীর্তনগানে। এই কথার বিরুদ্ধে আমার জনৈক উচ্চশিক্ষিত এবং সংস্কৃতিপূতচিত্তযুক্ত বন্ধুকে প্রতিবাদ করিতে শুনিয়াছি—তিনি বলেন যে, বাঙালী হিন্দুর শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতির প্রকাশভূমি কীর্তনের গান নহে, বাঙলার সংস্কৃত পণ্ডিতের শাস্ত্র-জ্ঞান ও চিন্তা—বৈষ্ণব আখড়ায় নহে, পণ্ডিতের টোলে বাঙালী প্রতিভার পূর্ণতম বিকাশকে অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই দুই পরস্পর-বিরোধী মতের সমন্বয় এই-ভাবে করা যাইতে পারে যে, জ্ঞান এবং ভক্তি, রসসাধনা এবং নিদিধ্যাসন, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিতে উভয়েরই স্থান আছে, সুতরাং একটিকে বড় করিতে গিয়া অন্যটিকে বাদ দিলে চলে না। এ বিষয়ে আমাদের ব্যক্তিগত শিক্ষা ও রুচি বা প্রবৃত্তিই বলবৎ হইয়া থাকে, কোনটির দিকে আমরা ঝুঁকিব; কিন্তু একের জন্য আরটিকে বর্জন করা, যথার্থ মানসিক সংস্কৃতির লক্ষণ নহে। আমার মনে হয়, বিভিন্ন-জাতীয় উপাদান বাঙালী জনগণের মধ্যে বিদ্যমান থাকায়, সাধারণভাবে বলিতে পারা যায় যে, বাঙালীর সংস্কৃতিতে দুইয়েরই উপযুক্ত বিকাশ দেখা গিয়াছে; বাঙালী জগৎকে রসের পূজারী কবি ও রূপকার দিয়াছে এবং জ্ঞানের পূজারী দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকও দিয়াছে।

ইসলাম আসিয়া কিন্তু সাত শত বৎসর ধরিয়া ধীরে ধীরে অর্ধেকের অধিক বাঙালীকে নিজ পতাকার তলে টানিয়া লইলেও বাঙালীর ভাবজগতে সেদিন পর্যন্ত ইসলামের সাক্ষাৎ প্রভাব নিতান্তই অল্প ছিল। দুই পক্ষে গোঁড়া থাকিলেও বাঙলাদেশের ইসলাম ও বাঙলার হিন্দুকে প্রথম হইতেই একটা আপস করিবার জন্য চেষ্টিত ছিল দেখা যায়। বাঙলার শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেন মুসলমান প্রচারককে ভূমি দান করিতেছেন; তুর্কী কর্তৃক বাঙলা বিজয়ের প্রথম শত বৎসর মধ্যে ত্রিবেণী-বিজয়ী ও প্রথম মুসলমান মাদ্রাসা বা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা জফর খাঁও দরাপ খাঁ নামে পরিচিত হইয়া হিন্দুর উপাসিত গঙ্গাদেবীর ভক্ত বনিয়া গিয়া সুমধুর ও ভক্তিপূর্ণ ভাষায় গঙ্গাস্তব রচনা করিতেছেন। ইংরেজ আমলে ইংরেজ রাজনীতির চালের ফলে এখন এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই মুসলমান বাঙালীকে পাকা শরিয়তী মতের মুসলমান বানাইবার চেষ্টা দেখা দিয়াছে; ইতিপূর্বে বাঙালী মুসলমান নামেমাত্র মুসলমান ছিল; মনোভাবে ও চিন্তায় সে ছিল বাঙালী হিন্দুরই সহোদর; এবং তাহার ইসলাম ধর্ম আনুষ্ঠানিক দিকে পাকা কেতাব-মোতাবেক হইলেও তাহার ভাবের দিক ছিল সুফী দর্শন ও সাধনা এবং সামঞ্জস্য বা সমন্বয় মাত্র।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকে বাঙালী হিন্দুর একটা প্রধান অংশের সাংস্কৃতিক চেষ্টা (চৈতন্যদেবের শিক্ষার ফলে) এই পথ ধরিয়াই চলিয়াছিল যে, কিসে বৈষ্ণব মতবাদ অনুসারে সে সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে নিজের সত্তাকে শ্রেয়ের অভিমুখী করিতে পারে। বাহিরের জগতের সহিত সংযোগের সুবিধা স্বাধীন তুর্কী ও পাঠান সুলতানদের রাজত্বকালে বাঙালীর পক্ষে বড় বেশী ছিল না। মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর ষোড়শ শতকের শেষ পাদ হইতে শতাধিক বর্ষ ধরিয়া ভারতব্যাপী শান্তিময় মোগল সাম্রাজ্যের প্রসাদে সমগ্র ভারতের সঙ্গে বাঙলার যোগের পথ খোলা হইয়াছিল; কিন্তু বাঙালী, কি হিন্দু কি মুসলমান, সে সুযোগ ততটা গ্রহণ করিতে পারে নাই। তবে ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্তও যে বাঙালীর মনে বাহিরের জগতের সম্বন্ধে একটা ঔৎসুক্য, বাহিরের জগতের সঙ্গে একটা সংযোগ রাখিবার চেষ্টা ছিল, তাহা বাঙলার একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা কেদার রায় কর্তৃক গোয়ায় পোর্তুগীজদের দরবারে জাহাজযোগে বাণিজ্যের সুবিধার ব্যবস্থা করিবার জন্য দূত প্রেরণের কথা হইতে বুঝা যায়। কিন্তু এইরূপ চেষ্টা বেশী দেখা দেয় নাই। বাঙালী ঘরমুখ-ই রহিয়া গেল; যে দেশে মাটি আঁচড়াইলেই দুই মুঠার সংস্থান হয়, সে দেশের লোকে বাহিরে যাইতে চাহিবে কি দুঃখে? অষ্টাদশ শতকের বাঙালী একেবারে ঘোর-তর গ্রামীণ হইয়া দাঁড়ায়; সারা ভারতবর্ষের কথা দূরে থাকুক, সে ব্যাপকভাবে সারা বাঙলার কথাও ভুলিতে আরম্ভ করে, সে

তাহার গ্রাম্যজীবনের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে খুশী হইয়াই থাকিত। তখন প্রকৃতিতে ও সংস্কৃতিতে, সভ্যতায় ও জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিকোণে বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুসলমানের মধ্যে (মুষ্টিমেয় অভিজাত শ্রেণীর এবং আরবী-ফারসীতে পণ্ডিত আলেম শ্রেণী ব্যতীত) পার্থক্য কিছুই প্রায় ছিল না, বাঙালী মুসলমান নামতঃ মুসলমান ছিল, কার্যত মনেপ্রাণে সে বাঙালীই রহিয়া গিয়াছিল।

এমন সময়ে অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে ও ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে বাহিরের এক অতি প্রবল সভ্যতা ও সংস্কৃতি আসিয়া বাঙালীকে নাড়া দিল। ইংরেজ বাঙলার রাজা হইয়া বসিল; ইংরেজের বিশ্বগ্রাহী নাগরিক সভ্যতা আসিয়া বাঙালীর গ্রামীণ সভ্যতার দ্বারে হানা দিল। এই সভ্যতার সহিত বোঝাপড়া করিবার ভার বাঙালী হিন্দুর উপরই পড়িল। ঊনিশের শতকের প্রায় তিন ভাগ লাগিয়া গেল, বাঙালীর সংস্কৃতি এবং ইংরেজ কর্তৃক আনীত ইউরোপীয় সংস্কৃতির সঙ্গে একটা মিটমাট করিতে। বাঙালীর তথা ভারতবাসীর একটা বড় সৌভাগ্যের কথা এই যে, রামমোহন রায়ের মত, রাধাকৃষ্ণ দেবের মত মনীষীর উদ্ভব হইল এই বোঝাপড়ার ভার গ্রহণ করিবার জন্য। বাঙলার গ্রামীণ সংস্কৃতি একা হইলে ইংরেজের আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির সমক্ষে ইহা ধূলিসাৎ হইয়া যাইত। আধুনিক বাঙলা তথা ভারতকে শক্তি দিবার জন্য সংস্কৃত-ভাষা-নিবদ্ধ সাহিত্যে প্রকাশিত প্রাচীন ভারতের নিখিল ভারতীয় সংস্কৃতির আবাহন নূতন করিয়া করা হইল। সংস্কৃত-ভাষা-নিবদ্ধ সংস্কৃতি, পিতৃপুরুষ হইতে লব্ধ রিকথের ন্যায় দুর্দিনে বাঙলা ও ভারতকে রক্ষা করিল, নিজ ভারতীয় প্রতিষ্ঠায় দাঁড়াইয়া থাকিতে সহায়তা করিল, ইউরোপীয় সভ্যতার বন্যায় বাঙলা ও ভারত বহিয়া গেল না। ইয়ং বেঙ্গলের অবস্থা বাঙালী কাটাইয়া উঠিল, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব দেখা দিলেন, ভারতের সংস্কৃতির মধ্যে যাহা শাশ্বত এবং সার্বজনীন, তাহা হইতে বিচ্যুত না হইয়া ইউরোপীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ বস্তুগুলি আত্মসাৎ করিবার উপদেশ দিলেন, ইঁহারা নিজ নিজ লেখনী দ্বারা বাঙলার ও ভারতের জনগণকে এইরূপে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের পথে চালিত করিবার চেষ্টা করিলেন। আধুনিককালে ভারতীয় সংস্কৃতি এইভাবে এই যুগোপযোগী নূতন পন্থা গ্রহণ করিল।

কিন্তু বাঙলার ও ভারতের জনসমূহের মধ্যে একটি প্রধান অংশ এই সমন্বয়ের এবং এই সাংস্কৃতিক মিলনের প্রচেষ্টার সম্বন্ধে উদাসীন ছিল—সেটী হইতেছে মুসলমান সমাজ। ইংরেজ রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পরে মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ের এবং মুসলমান জনসাধারণের যে সকল বিশেষ সুবিধা ছিল, সেগুলির সঙ্কোচ ঘটিল; ইংরেজ শাসনকে এইজন্য তাহারা মানিয়া লইতে চাহিল না, ইংরেজের ভাষা শিক্ষা দীক্ষা সংস্কৃতি তাহাদের নিকট পরিত্যক্ত হইল। মুসলমান রাষ্ট্রশক্তির হ্রাস এবং ইংরেজ রাজ্যের পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বেকার মুসলমান সাম্রাজ্যের অস্তমিত বা অস্তায়মান গৌরবকে স্মরণ করিয়া উত্তর ভারতের মুসলমান শাসকদের বংশধরেরা উর্দু কবিতার নবরচিত বাগিচার আশ্রয়ে শান্তি ও আনন্দ লাভের জন্য চেষ্টিত হইল। ধর্মকে আশ্রয় করিয়া মুসলমানদের মধ্যে আবার সংহতিশক্তি এবং হৃত গৌরবের পুনরুদ্ধারের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল, ওয়াহাবী আন্দোলন দেখা দিল, কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের রক্তের প্রবাহে মোগল রাজপাট চিরতরে ভাসিয়া গেল। হিন্দুর মধ্যে সহযোগিতা দেখিয়া ইংরেজও তাহার প্রতি বেশী করিয়া অনুগ্রহ দেখাইতে লাগিল। এইভাবে ইংরেজ রাজশক্তিকে অটুট রাখিবার এক অব্যর্থ কৌশল ইংরেজ ভাল করিয়া আবিষ্কার করিল এবং ইহাকে কার্যকর করিবার জন্য ইহার প্রয়োগে লাগিয়া গেল—হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সন্দেহের দৃষ্টিকে ও পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে বাড়াইয়া তোলা। ইংরেজের প্রসাদপুষ্ট হিন্দু যখন তাহার দেশের দিকে তাকাইল তাহার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা ভাবিতে লাগিল এবং ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতে লাগিল, তখন ইংরেজ মুসলমানের দিকে কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। ভারতের ইতিহাসে ইহার ফলে আধুনিক কালের জটিলতম সমস্যা রূপগ্রহণ করিল, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা।

বাঙালীর সমাজে এই সমস্যা যেভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহার ফলে বাঙালী জাতির উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে যে সংস্কৃতি—ইহা মুখ্যত হিন্দু ভাবে অনুপ্রাণিত—হিন্দু বাঙালীর হাতে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার স্থানে এখনই নূতন কিছু আসুক বা না আসুক, তাহার সমূহ সঙ্কোচন বা হানির সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। বাঙালী মুসলমান এখন বাঙলাদেশে হিন্দুর চেয়ে সংখ্যায় অধিক; বাঙালী মুসলমান নেতা বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এখন অখণ্ড ইসলামী জাতির স্বপ্ন দেখিতেছেন, হিন্দু সংস্কৃতির তল্পীদার বা অনুচররূপে তাঁহারা মুসলমানকে আর দেখিতে চাহেন না। বাঙলার হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি আত্মীয়তাবোধ পোষণ করা তাঁহাদের অনেকে ইসলামীর পরিপন্থী বলিয়া মনে করিতেছেন। বাঙালী মুসলমানকে এখন তাঁহারা পুরাপুরি মুসলমান করিতে চাহিতেছেন, তাহার দৃষ্টি বাঙলার গৃহকোণ ছাড়িয়া বাঙলার ও ভারতের বাহিরের দিকে ফিরাইয়া দিবার প্রয়াস তাঁহারা করিতেছেন। নিজের জাতীয়তা, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিতে তাহার আর সন্তোষ নাই—অথচ বাহিরের ইসলামী জাতিদের ঐতিহ্যকেও মনে প্রাণে আপনার করিয়া লইবার প্রবৃত্তি থাকিলেও শক্তি নাই এবং তৎসম্বন্ধে মনের গোপন কোণে একটু সন্দেহও আছে। এই কারণে তাহার মানসিক অবস্থা এখন ব্যর্থতার ও অকৃতকারিতার ছায়ায় অন্ধকারময়। কিন্তু তথাপি উৎসাহী দুই-দশজন ইসলাম এবং পাকিস্থানের আদর্শকে বাঙালী মুসলমানের মানসোদ্যানে নূতন ধরণের সংস্কৃতি-লতারূপে রোপণ করিয়া তাহাকে ফুলে ফলে সমৃদ্ধ করিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন।

বাঙালীর সংস্কৃতির ইতিহাসে এইরূপে এক নূতন যুগসন্ধি দেখা দিয়াছে। বিংশ শতকের এই প্রথমার্ধে মুখ্যতঃ ইংরেজের রাজনীতির চালের প্রভাবে বাঙালী মুসলমানকে প্রকৃত মুসলমান বানাইবার চেষ্টায় ও আশায়, নূতনভাবে ভারতীয় ইসলামী সংস্কৃতির অর্থাৎ আরব ও পারস্যের ইসলামী সংস্কৃতির উত্তর ভারতীয় বা উর্দু অনুকরণের আবাহন, বাঙলাদেশে ও বাঙলা ভাষায় দেখা দিয়াছে। এই বস্তুর জীবনীশক্তি কতটা তাহার উপরেই বাঙলার সংস্কৃতিকে এই ভারতীয় ইসলামী বা উর্দু রঙে রঙানোর চেষ্টার সাফল্য নির্ভর করিতেছে।

এই জিনিস বাঙালী হিন্দুর ভাল লাগিতে পারে না—কিন্তু ইহার অন্তর্নিহিত মনোবৃত্তিকে দরদের সঙ্গে বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত। পুরাতন হিন্দু বাঙালী সংস্কৃতি এবং অনাগত বা অপ্রকটিত কিন্তু সাগ্রহে প্রার্থিত মুসলমান বাঙালী সংস্কৃতি দ্বিতীয়টি কিভাবে দেখা দিবে এবং তাহাতে সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রকাশ কিভাবে হইবে, তাহার কথা ভাবিয়া কেহ আতঙ্কিত, কেহ পুলকিত; কিন্তু তাহার স্বরূপ কেহই জানে না, অনুমানও কেহ করিতে পারিতেছে না। সে জিনিস আসিলে, তাহার সহিত বাঙালী হিন্দু সংস্কৃতির একটা আপস অবশ্যম্ভাবী হইবে; কারণ একই দেশের মধ্যে, রক্তে ও ভাষায় ও ইতিহাসে এক এমন জাতির দুই ধর্মসম্প্রদায় দুইটি বিভিন্ন ও প্রতিস্পর্ধী রাষ্ট্ররূপে থাকিতে পারে না। এই আপস বা সমন্বয়ের স্বরূপ কি দাঁড়াইবে, সে সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনার কোনও সার্থকতা নাই; কারণ উপস্থিত বাতাবরণ এমনই সন্দেহ-বিষ দ্বারা দূষিত যে, নিরপেক্ষ বিচার কঠিন এবং নিরপেক্ষ মত গ্রহণ করা আরও কঠিন। আমার মনে হয়, এ ক্ষেত্রে যদি বাঙলা ভাষাকেও আমরা হিন্দীর মত দুইটি ধর্মের ভাষা করিয়া তুলিয়া দুইটি বিভিন্ন প্রকৃতির ভাষাতে রূপান্তরিত করিতে না চাই—যেমন একই হিন্দী বা হিন্দুস্থানী ভাষাকে মুসলমানী-হিন্দী বা উর্দুতে এবং হিন্দু-হিন্দী বা সাধু হিন্দীতে রূপান্তরিত করা হইয়াছে—তাহা হইলে লিপি এক রাখিয়া যথেষ্ট পরিমাণে Laissez-faire অর্থাৎ "রুচি অনুসারে চল" এই নীতি পালন করিতে হইবে। অর্থাৎ মুসলমান লেখক আবশ্যক মনে করিলে আরবী ফারসী শব্দ বাঙলায় ব্যবহার করিবেন, এবং বিশেষ করিয়া ইসলামীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক এই প্রকার শব্দ হিন্দুদেরও শিখিয়া লইতে হইবে। কিছু আরবী ফারসী শব্দ যদি এইভাবে ভাষায় আসিয়া যায়, তাহার জন্য

চিন্তিত হইবার বিশেষ কিছু নাই; শব্দগুলি আসিবে বিকল্পে ব্যবহার্য প্রতিশব্দ রূপে, প্রচলিত বাঙলা (সংস্কৃত ও প্রাকৃতজ) শব্দ হিন্দু ও অন্য লেখকেরা ব্যবহার করিতে থাকিবেন; শক্তিশালী মুসলমান লেখক সেইরূপে আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহার করিয়া সাহিত্যে সত্যকার রস সৃষ্টি করিতে পারিলে সেই শব্দগুলি সকলেই মানিয়া লইবে।

আর একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। জাতি শিক্ষায় যত উন্নত হয়, তাহার মধ্যে শ্রেণীগত পার্থক্য তত কমিয়া যায়, ভাষা তত এক হইয়া যায়। বাঙলাদেশে যদি সেই প্রার্থনীয় অবস্থা না আসে, যদি এইভাবে ধর্মকে আশ্রয় করিয়া দুইটি বিভিন্ন রচনাশৈলী পাশাপাশি অবস্থান করে, যতদিন না সুবুদ্ধির উদয় হয় ও আমাদের এই খণ্ড ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ভারতকে বিরোধের দিক্‌কে উপেক্ষা করিয়া সাম্যের ও মিলনের দিকেরই সাধনা দ্বারা যতদিন না আমরা এক সংস্কৃতি ও এক রাষ্ট্রীয় আদর্শের অচ্ছেদ্য পাশে যতদিন না মিলাইয়া লইতে পারি, ততদিন এই অবস্থাকে পরাধীনতার আর একটি নিগড় বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে।

তবে আমার মনে হয়, এই অবস্থা চিরকাল ধরিয়া চলিবে না। Blood is thicker than water. যে মনোভাবের ফলে [illegible] আরবী-ফারসী শব্দের দিকে [illegible] বাঙালী মুসলমান লেখকের [illegible] হইতেছে, তাহার কিছুটা [illegible] হইবেই। আধুনিক তুর্কীস্থান ও [illegible] ভাষাগত সংস্কার পর্যালোচনা করিলে এইরূপই আশার সঞ্চার হয়। ইসলামী ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হইতে বাঙালী হিন্দুও কিঞ্চিৎ পরিমাণে চেষ্টা করিয়াছিল; রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইঁহাদের কথা স্মরণ করিতে হইবে, গিরিশচন্দ্র সেনের কোরানের অনুবাদ ও তাপসমালা অর্থাৎ "তর্জকিরাৎ-অল-ঔলিয়া"র মত গ্রন্থের ভাবানুবাদের কথা ভুলিলে চলিবে না। আরবী ও ফারসী জগতের সংস্কৃতির হাওয়া যদি বাঙলা ভাষার মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলমান নির্বিশেষে সকল বাঙালীর মনে বহাইতে পারা যায়, তাহাতে সমস্ত বাঙালী জাতিই লাভবান্ হইবে।

বঙ্গভাষীদের দিকে সমগ্রভাবে দৃষ্টিপাত করিলে বলিতে হয়, আজ বাঙালী জনগণ বড়ই বিপন্ন। তাহার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সব দিকেই সে বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছে। আদর্শ-বিপর্যয় এবং যুদ্ধের জন্য উপস্থিত অর্থনৈতিক বিভীষিকা (যাহার ফলে এবং রক্তশোষক বণিক এবং অকর্মণ্য ও উচ্চ আদর্শহীন শাসক সম্প্রদায়ের হৃদয়হীনতা হেতু দেশের মধ্য দিয়া এক বড় মারাত্মক একটা দুর্ভিক্ষ চলিয়া গেল ও চলিতেছে)—এই দুই প্রধান কারণে বাঙালীর—বিশেষ করিয়া বাঙালী হিন্দুর—সমাজের এবং ধর্মের উপরে যে প্রচণ্ড আঘাত ক্রমাগত আসিতেছে, তাহাতে তাহার সংস্কৃতির কথা দূরে থাক, সে নিজে টিঁকিবে কিনা এবং টিঁকিলে কিভাবে টিঁকিবে, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগিতেছে। বাঙলাদেশের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের সমাজতন্ত্রবাদীদের প্রচারিত স্বর্গরাজ্য যুদ্ধোত্তর জগতে দেখা দিবে কিনা এবং পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা দিলে ভারতবর্ষে তাহার অবতরণ হইবে কিনা, ইংরেজ, রুষ ও আমেরিকার রাজনৈতিক চালবাজী দেখিয়া, সে বিষয়েও সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে।

দুই হাজার বৎসরের অধিককাল পূর্বে উত্তর ভারত ও বিহার হইতে বাঙলাদেশে আর্য ভাষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী জনগণের সমভাষিতামূলক এক-জাতীয়তার সূত্রপাত হয়; দুই হাজার বৎসরের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে মুখ্য প্রকাশভূমিরূপে পাইয়া বাঙালীর সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, এই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত তাহার অব্যাহত গতি চলিয়া আসিয়াছে। বিগত ক্রান্তিকারী মহাযুদ্ধের স্পর্শ বাঙালীর জীবনে ও সংস্কৃতিতে বড় একটা ধাক্কা দিলেও তাহাকে ততটা বিপন্ন করিতে পারে নাই। কিন্তু বিগত বৎসরের দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ একটা অভূতপূর্ব ও অভাবনীয় ব্যাপার; ইহার দ্বারা বাঙালীর—বিশেষত হিন্দু বাঙালীর—মধ্যবিত্ত, কৃষক, শিল্পী ও শ্রমজীবী শ্রেণীগুলি প্রায় বিধ্বস্ত হইয়া গেল। ইহার ফলে বাঙালীর সংস্কৃতি কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, তাহার স্থিরতা নাই।

কিন্তু আমাদের তাহাতে দমিলে চলিবে না। যতদিন ভাষা ও সাহিত্য আছে, ততদিন জাতির বা জনগণের প্রাণ, ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির মত কোনও রকমে টিঁকিয়া থাকিবে। সেই ভাষা ও সাহিত্যের দ্বারা জাতিকে আবার জীয়াইয়া তুলিতে তাহার জন্মগত প্রকৃতি, তাহার ইতিহাস, তাহার আভ্যন্তর আত্মা এবং যাহা তাহার প্রকৃত সংস্কৃতি, তাহা বুঝিয়া তদনুসারে তাহাকে পথ দেখাইয়া তাহাকে আবার যাহাতে মানুষের মত খাড়া করিয়া তুলিতে পারা যায়, তাহাই হওয়া উচিত ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকের প্রধান ও প্রথম এবং পবিত্র কর্তব্য।*

---

* কানপুর প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের "ইতিহাস ও সংস্কৃতি" শাখার সভাপতির অভিভাষণ।

পাদপূরক

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

হে পাঠক, হে পাঠিকা, মোর পানে বারেক তাকাও।
না-ই বা পড়িলে, শুধু বারেক তাকাও।
মোরে দেখি' সম্পাদক বলেছিলো "নাহি নাহি ঠাঁই।"

দীন-কণ্ঠে বলেছিনু "তা-হলে আমরা কোথা যাই
কেহ নাহি ছাপ যদি? সম্পাদক, ধরি তব পায়,
আসিয়াছি আশা লয়ে, ফিরায়ে দিও না নিরাশায়।
কৃপা কর, ওগো কৃপা কর।"

সম্পাদক ঝাঁকাইয়া মাথা—
কহিল "উপায় নাহি। মাফ কর, বলিও না যা তা।"

হেনকালে ভাগ্যক্রমে আসি' বলে কম্পোজিটার
"তলায় যে খানিকটা খালি থাকে, কি দিব ম্যাটার"?
কাঁদিয়া কহিনু আমি "মোরে দাও।" চিন্তিয়া খানিক—
সম্পাদক কহে ধীরে "মাপ দিয়া দেখ দেখি ঠিক,—
কবিতাটি ধরে কি না"। "ধরে বাবু।" "নিয়া যাও তবে।—
জানি কেহ পড়িবে না; এ জিনিস পড়ে বা কে কবে?"

পদ্য আমি লভিলাম গদ্যের চরণ-তলে ঠাঁই।
হে পাঠিকা, হে পাঠক, শোনো ভগ্নী, শোনো শোনো ভাই—
আমারে পড়িয়া যদি সময় নাশিতে নাহি চাও
না-ই বা পড়িলে, শুধু বারেক তাকাও।



সস্তায় বাড়ি ভাড়া লইয়া বড় প্যাঁচে পড়িয়াছিলাম।

কয়েক বছর আগেকার কথা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখনও এমন মৌরসী পাট্টা লইয়া বসে নাই; এই পোড়া কলিকাতা শহরেই চেষ্টা করিলে ভদ্রলোকের বাসোপযোগী বাড়ি কম ভাড়ায় পাওয়া যাইত।

পাড়াটা তেমন ধোপদুরস্ত নয়; বাড়িখানাও পুরানো, কিন্তু বেশ ঝরঝরে; এঁদোপড়া নোনাধরা নয়। তাহার উপর ভাড়া মাত্র কুড়ি টাকা শুনিয়া দাঁও মারিবার মৎলবে একেবারে এক বছরের লেখাপড়া করিয়া লইয়াছিলাম। মনে মনে এই ভাবিয়া উৎফুল্ল হইয়াছিলাম যে, বাড়ি-



দাম্পত্যনিদ্রাকে নিরতিশয় বিঘ্নসংকুল করিয়া তুলিল

ওয়ালার খুব মাথা মুড়াইয়াছি। এই কলিকালে বাড়ীওয়ালার মাথা তাহার পিতৃশ্রাদ্ধেও কেহ মুড়াইতে পারে না, এ জ্ঞান তখনও হয় নাই।

জ্ঞান হইল যেদিন গৃহপ্রবেশ করিলাম সেইদিন সন্ধ্যাবেলা। দিনের আলো একটু ঘোলাটে হইতে না হইতে ঘরের মধ্যে ফর্-ফর্ কর্ কর্ শব্দ শুনিয়া দেখি, আরশোলা উড়িতেছে। তারপর যতই রাত্রি হইতে লাগিল ততই আরশোলা বাড়িতে লাগিল; পুরানো বাড়ির অসংখ্য ফাঁক ফোকর ফাটল হইতে বাহির হইয়া ঘরে ঘরে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহাদের অগণ্য বলিলেও যথেষ্ট হয় না, পঙ্গপালের মত সীমা সংখ্যাহীন আরশোলা! মানুষ সম্বন্ধে তাহাদের মনে লেশমাত্র সম্ভ্রম নাই; জামা-কাপড় ভেদ করিয়া শরীরের এমন দুর্গম স্থানে প্রবেশ করিতে লাগিল যে, মৃতদেহেরও বিপন্ন হইয়া পড়িবার কথা। রাত্রে মশারির মধ্যে শয়ন করিয়াও নিষ্কৃতি নাই, কোন অদৃশ্য ছিদ্রপথে প্রবেশ করিয়া ইহারা আমাদের দাম্পত্য নিদ্রাকে নিরতিশয় বিঘ্নসংকুল করিয়া তুলিল। আমাকে যৎপরোনাস্তি উস্তম-খুস্তম তো করিলই, ওদিকে গৃহিণীর অবস্থা সত্য সত্যই সঙীন করিয়া তুলিল।

তারপর যতপ্রকার বৈজ্ঞানিক উপায় আছে, সমস্ত প্রয়োগ করিয়া এই নিশাচর পতঙ্গগুলাকে নিপাত করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহারা এতই সংখ্যাগরিষ্ঠ যে, কোনও ফল হইল না। দিনের বেলা ইহারা কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়, কিন্তু সন্ধ্যা হইতে না হইতে আবার দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরিয়া আসে। কয়েক দিনের মধ্যেই ইহাদের উৎপাতে পাগল হইয়া যাইবার উপক্রম হইল।

রবিবার সকালে অত্যন্ত বিমর্ষভাবে বাহিরের বারান্দায় বসিয়া ভাবিতেছিলাম। বাড়ি ছাড়িয়া যাইতে পারি, কিন্তু বাড়িওয়ালা কোনও ছুতানাতাই শুনিবে না, কান ধরিয়া এক বৎসরের ভাড়া আদায় করিয়া লইবে। অথচ এ বাড়িতে আর কিছুদিন থাকিলেই হঠাৎ একদিন প্রাতঃকালে পরিধেয় বস্ত্রখানি ফেলিয়া দিয়া নাচিতে নাচিতে বাহির হইয়া যাইতে হইবে, ইহাও একপ্রকার সুনিশ্চিত। বাড়িওয়ালার উদ্দেশ্যে গালি দিয়া দিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, কোনও ফল হয় নাই। এখন উপায় কি?

চোখ তুলিয়া দেখি, ফেলু সম্মুখের রাস্তা দিয়া যাইতেছে। আমাকে দেখিয়া সবিস্ময়ে দন্ত বিকাশ করিল; আমি হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিলাম।

ফ্যালারামের সহিত আমার অনেক দিনের পরিচয়—প্রায় পাঁচ বছর পাশাপাশি বাড়িতে বাস করিয়াছি; ইদানীং কিছুকাল যাবৎ সে সহরের এক প্রান্তে এবং আমি অন্য প্রান্তে ছিটকাইয়া পড়িয়াছিলাম। তবু মাঝে মাঝে ট্রামে বাসে দেখা হইত। ফেলু বয়সে আমার কনিষ্ঠ, নেহাৎ সরল ভাল মানুষ-গোছের লোক। নিয়মিত কোনও কাজকর্ম করিত বলিয়া আমার জানা নাই অথচ বেশ সচ্ছলভাবেই সংসার চালাইত দেখিতাম। অন্তত আমার নিকট হইতে কখনও টাকা ধার চাহে নাই। টাকা উপার্জনের নানা ফন্দি তাহার মাথায় ঘুরিত এবং আপাতদৃষ্টিতে ফন্দিগুলা হাস্যকর মনে হইলেও সে তাহা হইতেই কিছু না কিছু রোজগার করিয়া লইত।

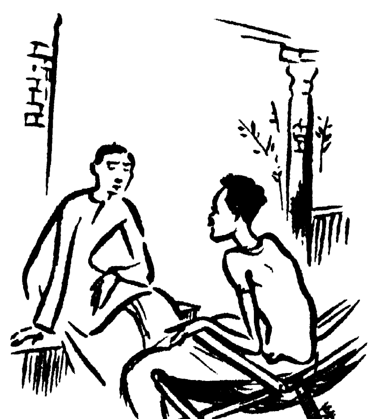
সে আসিয়া বলিল, এ কি দাদা! আপনি এখানে?

বলিলাম,—কয়েকদিন হল এ বাড়িতে উঠে এসেছি। তুমি এদিকে কি মনে করে?

ফেলু আমার পাশে বসিয়া বলিল,—বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছি, দাদা। বাড়িওয়ালা নোটিশ দিয়েছে, তার নাকি মেয়ের বিয়ে।

মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ শিহরিয়া গেল। ভগবান সত্যই মুখ তুলিয়া চাহিলেন? যথাসাধ্য তাচ্ছিল্যভরে বলিলাম,—বাড়ি খুঁজছ! তা—আমি এ বাড়িটা ছেড়ে দেব ভাবছি, অফিস থেকে বড় দূর হয়। তোমার যদি পছন্দ হয় নিতে পার।

বাড়িখানা একবার ঘুরিয়া দেখিয়াই ফেলু পছন্দ করিয়া ফেলিল, বস্তুত দিনের বেলা বাড়ি কাহারও অপছন্দ হইবার কথা নয়। ভাড়া কুড়ি টাকা শুনিয়া ফেলু আরও মুগ্ধ হইল। আমি তখন বলিলাম, সারা বছরের ভাড়াটা কিন্তু আগাম দিয়ে দিতে হবে ভাই। জান তো বাড়িওয়ালাদের ব্যাপার—চুষুণ্ডি ব্যাটারা—



বাড়ীওয়ালা নোটিশ দিয়েছে

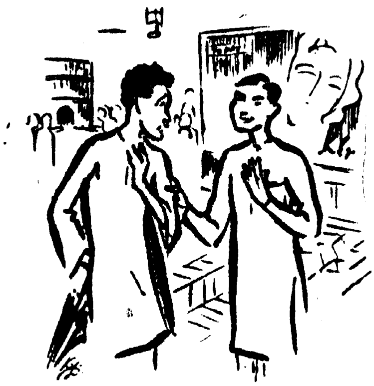
ফেলু ক্ষণেক চিন্তা করিয়া ঈষৎ বিহ্বলভাবে বলিল—কিন্তু দুশো চল্লিশ টাকা তো এখন বার করতে পারব না দাদা, একটু টানাটানি যাচ্ছে, মেরেকেটে দুশো টাকা দিতে পারি। তা বাকি টাকাটা যদি পরে নেন্—

আমিও ক্ষণেক চিন্তা করিলাম। এই সুযোগ—অগ্রিম যাহা পাওয়া যায় তাহাই লাভ, পরে আরশোলার খবর পাইলে ফেলুর মত ভালমানুষও আর টাকা দিবে না।

সুতরাং উদার কণ্ঠে বলিলাম—'বেশ, দুশো টাকাই নেব। তুমি তো আর পর নও। বাকি টাকা আর তোমাকে দিতে হবে না।'

আহ্লাদে ও কৃতজ্ঞতায় ফেলু গদগদ হইয়া উঠিল। স্থির হইল আগামী রবিবারে সে এ বাড়িতে উঠিয়া আসিবে, আমি ইতিমধ্যে অন্য বাড়ি খুঁজিয়া লইব।

অতঃপর নির্দিষ্ট দিনে ফেলু সপরিবারে আসিয়া বাড়ি দখল করিল; আমি দুইশত



কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে আরশোলার টেণ্ডার কল করলে কেমন হয় ?

টাকা পকেটে পুরিয়া বাড়িটিকে মনে মনে দণ্ডবৎ করিয়া বিদায় লইলাম। স্থির করিলাম, ভবিষ্যতে ফেলা রায়কে যথাসাধ্য এড়াইয়া চলিব। তার স্বভাবটা খুবই শান্ত, কিন্তু বলা তো যায় না।

মাস দুয়েক নির্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। তারপর হঠাৎ একদিন এক সিনেমা বাড়ির দরদালানে ফেলুর সহিত দেখা। দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া কাটিয়া পড়িবার চেষ্টায় ছিলাম, কিন্তু সে দাদা দাদা বলিয়া ডাক ছাড়িতে ছাড়িতে আসিয়া ধরিয়া ফেলিল। এই অল্প সময়ের মধ্যে আরশোলা সম্বন্ধে যত প্রকার কৈফিয়ৎ ভাবিয়া লওয়া সম্ভব তাহা ভাবিয়া লইলাম।

ফেলুর মুখে কিন্তু জিঘাংসার ভাব না দেখিয়া একটু খটকা লাগিল; সে যেন আমাকে দেখিয়া হৃষ্ট হইয়াছে। তবু মুখে সংশয়-কুণ্ঠিত একটু হাসি আনিয়া বলিলাম 'আরে, ফেলু যে! তারপর, কেমন আছ?'

ফেলু একগাল হাসিয়া একগণ্ডা কথা বলিয়া গেল,—'ভালই আছি দাদা। ভাগ্যে বাড়িখানা আপনি দিয়েছিলেন, বলতে নেই তারই কল্যাণে করে খাচ্ছি। —আপনি লক্ষ্য করেছিলেন কিনা জানিনা, বাড়িটিতে আরশোলা ছিল দাদা—এন্তার আরশোলা ছিল! তাই দেখে মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল, দিলুম এক সাইনবোর্ড টাঙিয়ে—'হাঁপানির পাঁচন।' বললে বিশ্বাস করবেন না দাদা, কাতারে কাতারে লোক; সকাল-বিকেল নিশ্বেস ফেলবার সময় নেই। বৌ রান্নাঘরে উনুন জেলে আরশোলার ক্বাথ তৈরি করে, আর আমি তাই আট আনা শিশি বিক্রী করি। কলকাতা শহরে এত হেঁপো রুগী আছে,



বৌ আরশোলার ক্বাথ তৈরী করে

কে জানত? রোজ নিদেন পক্ষে দশ টাকার ওষুধ বিক্রী করি; হাঁপানির ধন্বন্তরী বলে নাম বেরিয়ে গেছে। কিন্তু—'

ফেলু একটু বিমনা হইয়া চিন্তা করিল—'একটু ভাবনার কথা হয়েছে দাদা, আরশোলা ক্রমে ফুরিয়ে আসছে। আচ্ছা, আপনি তো অনেক জানেন শোনেন, কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে আরশোলার টেণ্ডার কল্ করলে কেমন হয়? এমন ব্যবসাটা শেষে আরশোলার অভাবে ফেঁসে যাবে!'

ইহাকেই বলে পুরুষস্য ভাগ্যং—!

সংকলন

[এই বিভাগে বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন সাময়িক পত্র হইতে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধাবলীর নির্বাচিত অংশ মুদ্রিত হইবে]

মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া যুদ্ধের আলোচনা

ডঃ সরসীলাল সরকার

প্রাণীর উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধেরও উৎপত্তি হইয়াছে। নিম্ন প্রাণীদের জীবন ও যুদ্ধ একত্র জড়িত। কেন না, "আহার সংগ্রহ ও আত্মরক্ষা" এই উভয় কারণে তাহাদের সর্বদাই যুদ্ধের প্রয়োজন হয়। প্রাণী হইতে ক্রমশঃ মানুষের বিকাশ হইল ও মনুষ্য সমাজ গড়িয়া উঠিল। অনেক বৈজ্ঞানিকের মতে মানব-সমাজ গঠনের মূলে আছে মানুষের পরস্পরের সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা। কিন্তু ডাঃ ফ্রয়েড মানব-সভ্যতা কিভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে। সে সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"কেবল প্রয়োজন বা সাধারণ কার্যের সুবিধা মানুষকে কখনই সঙ্ঘবদ্ধ করিতে পারিত না। মানব-কৃষ্টি প্রমাণিত করে যে, কামজ আকর্ষণের প্রভাবেই একক ব্যক্তি অপরের সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহা হইতে ক্রমশঃ পরিবার, সমাজ, শ্রেণী, জাতি ও অবশেষে একটি বৃহৎ একত্বের বন্ধনে সমস্ত মানুষ এক হইয়াছে, তাহা মনুষ্যত্বের বন্ধন। এরূপ কেন করিতে হইয়াছে, তাহা আমরা জানি না, তবে সোজাসুজি বলা যায়, এই যে সমাজ গঠন, ইহা কামজ আকর্ষণেরই কাজ। মানুষ আসঙ্গ লিপ্সায় নিশ্চয়ই একে অন্যের সহিত মিলিত হইবে।" (১)

ফ্রয়েড বলিয়াছেন,—Eros বা আসঙ্গ-লিপ্সা সহজাত সংস্কাররূপে যেমন শ্রেণীর ভিতর জীবদেহ রক্ষা কার্যে ব্যাপৃত আছে, সেইরূপ ঠিক ইহার বিপরীতমুখী একটি সহজাত সংস্কার আছে যাহা প্রাণিদেহ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে কার্য করে, এবং যে জড় উপাদান হইতে প্রাণিদেহ সৃষ্ট হইয়াছিল, সেই জড় পদার্থেই (পঞ্চভূতে) পুনরায় ইহা পরিণত করিবার উদ্দেশ্যেই কার্য করে। এই বিপরীতমুখী সহজাত সংস্কারকে ফ্রয়েড "Death Instinct" আখ্যা দিয়াছেন। ফ্রয়েড বলিয়াছেন, জীবন সৃষ্টিও ধ্বংসেরই লীলা।

নিজের ধ্বংস ও পরের ধ্বংস এই উভয় দিকেই ধ্বংসকারী সহজাত সংস্কারের ক্রিয়া আছে। মরিতে ও মারিতে কোনটিতেই যোদ্ধা পশ্চাৎপদ নয়। নিম্ন প্রাণিজগতে প্রাণীদিগকে পদে পদে মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে হয়। যখন বিপদ আসে, তখন স্বভাবানুসারে কতকগুলি প্রাণী শত্রুর সম্মুখীন হইয়া সাহসের সহিত তাহাকে আক্রমণ করে; অপর কতকগুলি প্রাণী ভয়ে পলায়ন করে, যেমন হরিণ জাতীয় দ্রুতগামী প্রাণী। আর কতকগুলি প্রাণী নানা কৌশল অবলম্বন করিয়া বা আত্মগোপন করতঃ নিজেদের রক্ষা করিতে চাহে। যেমন, বেজি গর্ত খুঁড়িয়া, কোন কোন প্রাণী মৃত্যুর ভান করিয়া, বহুরূপী রং বদলাইয়া এবং 'কাট্‌ল' মৎস্য শরীর হইতে নির্গত কালো তরল পদার্থের দ্বারা জল ঘোলা করিয়া আক্রমণকারীর চোখে ধূলা দিতে চেষ্টা করে। আক্রমণকারী পশুদের কার্যে জটিলতা নাই, কিন্তু যে সব প্রাণী পলাইয়া বা লুক্কায়িত হইয়া বাঁচিতে চাহে তাহাদের নানারূপ কৌশল আছে।

নিম্ন প্রাণীদের এই দুই শ্রেণী হইতে আমরা দেখিতে পাই,—যোদ্ধা প্রাণী যত ক্ষুদ্রই হোক্ না কেন, তাহাদের ভিতর একটি শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। পিপীলিকা ও মৌমাছির ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাণীও, আততায়ী যত শক্তিশালীই হোক্ না কেন, তাহাকে দংশন করিয়া বিব্রত করিয়া তুলে। মানুষের ভিতরও নিম্ন প্রাণীদিগের ন্যায় দুইটি শ্রেণী দেখা যায়। যে সমস্ত মানুষ ভীরু শ্রেণীর, তাহাদের কার্যকলাপে ফন্দি ফিকির জ্ঞানত অথবা অজ্ঞানত প্রকাশ পায় এবং তাহাদের মধ্যে বহু ব্যক্তি ধার্মিকতার ভান করে। এই ভানের দ্বারা কেবল পরকে নয়, নিজেকে ছলনা করিয়াও তাহারা বিশ্বাস করে যে, তাহারা ধার্মিক।

উপনিষদ গ্রন্থের সার-স্বরূপ ও মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া অতুলনীয় গ্রন্থ গীতার প্রথমেই আমরা যুদ্ধ-পরাঙ্মুখ অর্জুন ও যুদ্ধে প্রবৃত্তি-দাতা শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাই। প্রকৃত ধর্মতত্ত্ব মনস্তত্ত্ব না হইয়া যায় না। যুদ্ধে পরাঙ্মুখ অর্জুন, যে যুদ্ধে আত্মীয়স্বজনকে বধ করিতে হইবে, তাহা অত্যন্ত অধর্মের কাজ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীভগবান অর্জুনের এই অবস্থাকে "ধার্মিকতা" বা আত্মত্যাগ বলিয়া মানিয়া লন নাই, তিনি ইহাকে বলিয়াছেন ক্লৈব্য এবং ইহা অর্জুনের উপযুক্ত নয়,—"নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে"। এই "ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্বল্য" ত্যাগ করিয়া তিনি অর্জুনকে যুদ্ধার্থ উত্থিত হইতে বলিয়াছেন।

গীতায় অর্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া সমগ্র মানব-জাতির উদ্দেশ্যে যে উপদেশ দেওয়া

(১) "Civilization and its Documents"—Freud.

হইয়াছে, তাহা "ক্লৈব্য" অর্থাৎ সাহসহীনতা নয়। আমরা দেখিতে পাই, ভীরু শ্রেণীর অধিকাংশ লোকই যে ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহার পনের আনাই লোকাচার ও বাহিরের অনুষ্ঠান। প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা, এই অনুষ্ঠান, সংস্কার ও লোকাচারের ভিতর যে কোথায় তলাইয়া যায়, তাহার সন্ধান মেলে না।

মনস্তত্ত্বের দিক হইতে ভীরু নিম্ন প্রাণী ও ভীরু মানুষের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। "যঃ পলায়তি সঃ জীবতি" এই উক্তি হরিণ জাতীয় মানুষের পক্ষে খাটে। নিম্ন প্রাণীর গর্তে আশ্রয় গ্রহণের ন্যায় অনেকে নিজের অকার্য সাধনের সমর্থনে শাস্ত্রবচন, লোকাচার, ইত্যাদির আশ্রয় লয়। অনেকে "কাটল" মৎস্যের মত বড় বড় শাস্ত্র-ব্যাখ্যার দ্বারা অন্যের চক্ষে ধাঁধা লাগাইয়া নিজেদের অজ্ঞতা গোপন করে। অনেকে ধর্মের মুখোস পরিয়া "ভেড়িল হর্সের" মত চেহারাটা এমন করিয়া তোলে যে, সাধারণে সভয়ে ও সসম্ভ্রমে দূরে থাকিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করে। বিপদে মৃত্যুর ভানকারী ভীরু প্রাণীর ন্যায় বহু দুর্বল প্রকৃতির নরনারী "হিষ্টিরিয়া"গ্রস্ত হয়। "Instinct of Aggressiveness" নামে আর একটি আক্রমণাত্মক সহজাত সংস্কার সম্বন্ধে ফ্রয়েড বলিয়াছেন,—"আক্রমণের এই সহজাত প্রবৃত্তি Death Instinct হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। সঙ্গ-আকর্ষণের প্রবৃত্তি "Eros-"কে রিরংসা ও Death Instinctকে জিগীষা বলা যাইতে পারে। "Instinct of Aggressiveness" আক্রমণে প্রবৃত্তি-রূপ সংস্কার। জীবন-সৃষ্টি ও রক্ষার এবং ধ্বংসানয়নকারী সংস্কারের দ্বন্দ্বে যে ক্রিয়া হইতেছে, তাহার দ্বারাই মনুষ্যক্রম বিকাশ হইতেছে।

কিন্তু এই আক্রমণের প্রবৃত্তি যদি সর্বদা মানুষের মধ্যে ক্রিয়াশীল থাকে, তবে কিরূপে সমাজ ও সভ্যতা গড়িয়া উঠিবে? ইহার উত্তরে ফ্রয়েড বলিয়াছেন যে, মানুষের সহজাত আক্রমণ-প্রবৃত্তি এক আশ্চর্য উপায়ে সংযত না হইলে তাহা নিশ্চয়ই কৃষ্টির পক্ষে ক্ষতিকর হইত। এই আক্রমণ প্রবৃত্তি মোড় ফিরিয়া বহির্মুখী গতি হইতে অন্তর্মুখী হয় অর্থাৎ ইহাকে অহং-এর বিরুদ্ধেই পাঠান হয়। সেখানে অহং-এর যে অংশ এই প্রবৃত্তিকে গ্রহণ করে, তাহা ইহার অন্য অন্য অংশ হইতে ভিন্নভাবের। এই অহং-এর নাম "Super Ego" বা শ্রেষ্ঠ অহং এবং ইহা বিবেক-বুদ্ধির কাজ করে। অহং-এর যে আক্রমণ প্রবৃত্তি অন্যকে শাসন করিয়া আনন্দ লাভ করিত, তাহাই বিবেক বুদ্ধির অনুগত হইয়া অহংএর দোষ-গুণ বিচার ও তাহাকে শাসন করে।

প্রত্যেক মানুষের মনেই কম-বেশী পরিমাণে যে যুযুৎসু প্রবৃত্তি আছে, তাহা এক দিক দিয়া সমাজ ধ্বংসকর, আবার অপর দিক দিয়া তাহা সমাজ রক্ষার্থ আবশ্যক। অর্থাৎ এই যুযুৎসু প্রবৃত্তির শক্তি এমনভাবে নিয়োগ করা আবশ্যক, যাহাতে তাহা অনিষ্টকর না হইয়া সমাজের কল্যাণ ও প্রয়োজন লাগে। যদি আইন অথবা ধর্মের অনুশাসন দ্বারা যুদ্ধ একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়, তবে তাহা কল্যাণকর হইবে না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যদি non-violent হইয়া কখনও কখনও violentও হয়, তবে তাহাও নৈতিক দোষ হয় না। গীতায় এ সম্বন্ধে স্পষ্টই বলা হইয়াছে "যস্য নাহং কৃতোভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে। হত্বাপি স ইমাল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥

নিজের স্বার্থের জন্য অনুষ্ঠিত যুদ্ধ কিভাবে সমাজরক্ষা, দেশরক্ষারূপ সংগ্রামে পরিণত হইল, ইতিহাসে তাহার বিশেষ বিবরণ আছে। যুদ্ধপ্রবৃত্তি অন্তর্মুখী হইয়া অহং-এর স্বভাব-প্রবল স্বার্থ বুদ্ধি ভোগ কামনা ইত্যাদির সহিত নিয়ত যুদ্ধ করিতেছে বলিয়াই মানুষের মনে ত্যাগ, বৈরাগ্য, পরোপকার ইত্যাদি প্রকৃতির বিকাশ হইতেছে, মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া ফ্রয়েড এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং তাঁহার এই সিদ্ধান্তের সহিত গীতার সিদ্ধান্তেরও মিল রহিয়াছে। নিরীহ ভালো মানুষটি হইলে এবং কেবল পারলৌকিক কল্যাণ ও মোক্ষলাভের চিন্তা লইয়া থাকিলে দৌর্বল্যগ্রস্ত স্নায়ু রোগী হইয়া কোনরূপে জীবন কাটাইয়া দেওয়া ভিন্ন আর বিশেষ কোন উদ্দেশ্যই সাধিত হইবে না। যে যুদ্ধ-বিমুখতাকে শ্রীভগবান 'ক্লৈব্যং' বলিয়াছেন, তাহার অনুবাদ Neurotic অর্থাৎ স্নায়ু রোগগ্রস্ত করিলে ভুল হয় না। ভারতবর্ষে যে অধিকাংশ লোকই আজ Neurotic বা ক্লীবতাগ্রস্ত যুদ্ধহীনতা কি বিশেষ করিয়া তাহার কারণ নয়?

গীতায় ভগবান আত্মার অমরত্বসম্বন্ধে অর্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন, "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ"—ইত্যাদি। জগতে অত্যাশ্চর্য ব্যাপার কি,—এই প্রশ্নচ্ছলে বকরূপী ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে বুঝাইয়াছিলেন যে, প্রত্যহ মৃত্যু প্রত্যক্ষ করিয়াও মানুষের মনে হয় না যে তাহারও মৃত্যু হইবে! ডাঃ ফ্রয়েড মনস্তত্ত্বের দিক দিয়া ইহার উত্তর দিয়াছেন—"আমাদের অবচেতন মনে আমাদের নিশ্চয় প্রতীতি হইয়াছে যে, আমরা অমর।" (২) এই বিশ্বাস হইতেই পরকালে আত্মার অস্তিত্ব, পুনর্জন্ম ইত্যাদি বিশ্বাস জন্মিয়াছে। মানুষ যে সাহস করিয়া মৃত্যুর সম্মুখীন হয়, তাহার মূলে রহিয়াছে অমরত্ব বোধ।

অসহায়, ভীরু, দুর্বল মানুষ যেমন অসাধারণ কর্মসাধনে সমর্থ ও অসমসাহসী তেমন আর অন্য কোন জীবই নয়। মানুষের এই সাহসের মূলেও রহিয়াছে তাহার অবচেতন মনের অমরত্ব-বোধ ও মহৎ কার্যে জীবন উৎসর্গের প্রেরণা। মহৎ আদর্শের সম্মুখে মানুষের ব্যক্তিগত জীবন বাঁচা-মরা তুচ্ছ হইয়া যায়। এই উচ্চ আদর্শের প্রেরণায় বিপদ বরণের দুঃসাহস মানুষের মনে না থাকিলে সমাজ সভ্যতা কিছুই গড়িয়া উঠিত না।

ফ্রয়েড বলিয়াছেন—"আমাদের ভালবাসার ধন-গুলির উপর দুঃখের অসহ্য আঘাত হইবে বলিয়া আমরা তাহাদিগকে এবং নিজেকেও যখন বিপদের সম্মুখে দিতে অনিচ্ছুক হই, তখন জীবনের রসানুভতি হারাই এবং আমাদের জীবনে দৈন্য আসিয়া উপস্থিত হয়। Hanseatic league-এর Motto ছিল—সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া আবশ্যক বাঁচিয়া থাকা আবশ্যক নয়'।

আমাদের সেই পুরাতন কথা স্মরণ করিতে হইবে—"যদি তুমি শান্তি ইচ্ছা কর তবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক।" ফ্রয়েডের এই উক্তির ভিতর "Pleasure Principle"এর একটি দৃঢ় তথ্য আছে। মানুষের জীবন সরসতা চায়, কেবল বাঁচিয়া থাকিতে চায় না। তাঁহার মতে আমরা তখনই সরসতার আস্বাদ পাই যখন আমরা নিজেদের জীবন ও যাহা কিছু প্রিয়, তাহা বিপন্ন করিতে ভয় না পাই। কৃপণের মত কেবল জীবন আঁকড়াইয়া থাকিলে তাহাতে কেবল বাঁচিয়া থাকাই হয়, কিন্তু তাহাতে জীবনের ঐশ্বর্য ও সরসতা কিছুই থাকে না।"

ফ্রয়েড তাঁহার "Disillusionment of war" শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছেন—"যুদ্ধ দেখিয়া আমরা এই বিশ্বাসে উপনীত হই যে, মনুষ্য-জাতির মূল্যবান সম্পদের এরূপভাবে ধ্বংস করা, সর্বাপেক্ষা বিচারবুদ্ধিশালী ব্যক্তিগণকে ভ্রান্তপথে এবং উন্নতমনা ব্যক্তিদিগকে নীচ প্রবৃত্তিতে চালিত করা, যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুতে ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।"

এই প্রবন্ধে ফ্রয়েড আরো দেখাইয়াছেন যে, সভ্যতার যে পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করি তাহা অনেক স্থলে কেবল মানুষের বাহিরের আচার ব্যবহারের পরিবর্তন মাত্র। সভ্যতার বিধানে 'Reward' ও 'Punishment' আছে। এই পুরস্কার ও তিরস্কার প্রভাবের অধীন থাকার জন্যই অহং প্রবৃত্তির জগতের হিত-সাধন-যোগ্য পরিবর্তন না হইলেও মানুষের বাহিরের আচরণ সংযত ও ভদ্র হয়।

এই প্রবন্ধে যুদ্ধে মানব-মনোবৃত্তির অবনতি প্রসঙ্গে ফ্রয়েড আরও যাহা বলিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ এই যে, যে সমস্ত নাগরিক যুদ্ধে যোগ-দান করিয়াছিল, তাহাদের মনোবৃত্তির অবনতির কারণ যুদ্ধে যোগদান ঠিক নয়, তাহাদের ভিতরে যে সহজাত নীচ প্রবৃত্তিগুলি বাহিরের সভ্যতার আবরণে চাপা ছিল, যুদ্ধের সংঘাতে সেগুলিই নগ্নভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল।

ক্রমবিকাশে উদ্বর্তন সম্বন্ধে গত ১৩৪৭ সালের ভাদ্র সংখ্যার 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত 'আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের স্মৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধে আচার্য শীলের যে মন্তব্য আমরা পাইয়াছি, তদনুসারে শান্তিময় জীবন-যাত্রার মধ্যে যুদ্ধ ও বিপ্লব দুঃখদায়ক হইলেও ইহা বলা যায় যে, যুদ্ধের দুঃখ-দুর্দশাও মানব-জাতিকে ক্রমবিকাশের এক নির্দিষ্ট পথেই লইয়া যাইতেছে।

সম্প্রতি ইউরোপে যে যুদ্ধানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে সমগ্র পৃথিবীতে হয়ত এক অননুমেয় মহাবিপ্লব উপস্থিত হইবে। এই যুদ্ধের ভাবী ফল কল্পনা করিতে গেলে গীতার একাদশ অধ্যায়ের স্তম্ভিত অর্জুনের বিশ্বরূপ বর্ণনা মনে পড়ে।

মহাযুদ্ধের এই দৃশ্যে জাতির স্বার্থের জন্য জাতির জীবনপণ সংগ্রাম, ব্যক্তিগণের মৃত্যুর সর্বগ্রাসী অনলে আত্মবিসর্জন, নিম্ন প্রাণি-জগতে পিপীলিকা ও মৌমাছির ভিতর সহজাত সংস্কার প্রাথমিকভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। জাতীয় স্বার্থের জন্য মানুষের এই আত্মদান তাহারই পূর্ণ বিকাশ। কুরুক্ষেত্রের মহা-যুদ্ধকে এই জন্যই ধর্মযুদ্ধ নাম দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধ যতই নিষ্ঠুরতা ও সমাজ-বিধ্বংসী হউক না কেন, যুদ্ধের বিশেষ প্রয়োজন আছে। যুদ্ধের প্রয়োজন না থাকিলে সহজাত সংস্কাররূপে আক্রমণের প্রবৃত্তিও মানব মনে থাকিত না। যুদ্ধের সংঘাতেই চীনের অহিফেন নেশার আরাম-নিদ্রা টুটিয়াছে এবং চীন সকল দুর্বলতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া ধর্ম-যুদ্ধের বীর যোদ্ধরূপে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। জগতে প্রকৃত অহিংসা ও মৈত্রী স্থাপিত হইলে হয়তো যুদ্ধের প্রয়োজন আর থাকিবে না। কিন্তু সেরূপ দিন কখনও সম্ভবপর কি? বর্তমানে অন্যায়ের প্রতিবাদ, পুরাতন ভাঙ্গিয়া নব সভ্যতা গঠন ও ক্রম-বিকাশের পথে জাতিকে পরিচালনের উপায়-স্বরূপে যুদ্ধকে মানিয়া লইতে হইবে।

প্রবর্তক, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৮] (সংক্ষিপ্ত)

(১) "Our Attitude towards Death" —Freud

স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ

অভ্যাসময় জীবন

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য, ডি টি এম্‌

প্রাণী মাত্রকেই প্রাণরক্ষার জন্য যেমন খাদ্যাদি কতকগুলি বাইরের বস্তুকে গ্রহণ করতে হয়, তেমন আরো কতকগুলি অন্যান্য রকমের অনিবার্য আচরণ করতে হয়। তার জন্মগত মৌলিক প্রকৃতির চাহিদার দ্বারাই সে ঐ সমস্ত আচরণ করতে বাধ্য হয়, নতুবা তার জীবনরক্ষা সম্ভব হয় না। জীবের এই যে কয়েকটি প্রকৃতিগত চাহিদা, এর নাম দেওয়া যেতে পারে ক্ষুধা। নিম্নশ্রেণীর জীবদের এই প্রকার ক্ষুধার তাড়না সামান্য এবং সীমাবদ্ধ, কিন্তু উচ্চশ্রেণীর জীব মানুষের পক্ষে এই ক্ষুধার তাড়না ব্যাপক এবং বহুবিধ। মানুষের মানসিক ক্ষুধাও নানা প্রকারের আছে, কিন্তু সে কথা বাদ দিয়ে বর্তমানে আমরা শারীরিক প্রয়োজনের কথাই বলছি। প্রথমেই বলা যেতে পারে আমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাসের কথা। প্রয়োজন হেতু আমরা অনবরতই বায়ু গ্রহণ করছি এবং বায়ু ত্যাগ করছি, তবে নিরবচ্ছিন্নভাবে করতে থাকা এবং অনায়াসে তাতে সক্ষম হওয়ার জন্য ওটা আমাদের এতই গতানুগতিক হয়ে গেছে যে, কোনও বিশেষ ব্যতিক্রম না ঘটলে আমাদের চেতনার মধ্যে তার জন্য সজ্ঞান রকমের তাড়না জাগবার কোনও অবকাশ ঘটে না। কিন্তু এ ছাড়া অন্যান্য যেগুলির প্রয়োজন এমন নিরবচ্ছিন্ন নয়, তার তাড়না বিলম্বিতভাবে আমাদের মধ্যে কেবল থেকে থেকে জেগে ওঠে এবং সেইগুলোকে আমরা জানতে পারি আমাদের বিভিন্ন প্রকারের ক্ষুধারূপে। এর উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে,—খাদ্যের ক্ষুধা এবং জলের তৃষ্ণা। কিন্তু এই দুটি ছাড়াও আমাদের আরও কয়েকটি শারীরিক ক্ষুধা কিংবা তাড়না আছে। যথা,—মলমূত্র নিকাশের তাড়না, চাঞ্চল্যের তাড়না, নিদ্রার তাড়না, যৌন তাড়না। যে কয়টি তাড়নার কথা উল্লেখ করলাম এর প্রত্যেকটিই আমাদের মধ্যে অবশ্যম্ভাবী, সাধারণপক্ষে এর থেকে কারো নিষ্কৃতি নেই। এই সব তাড়নার মধ্যে এক রকমের পারম্পর্যের বিশেষত্ব আছে, সেটি হচ্ছে এর প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির পারম্পর্য অর্থাৎ প্রথমে পাবার জন্য একটা অদম্য আগ্রহ এবং পাবার পরেই তার শান্তি ও পরিতৃপ্তি। প্রত্যেকটি ক্ষুধার এই দুটি অংশ পরস্পরের মধ্যে একটা ব্যবধান রেখে যেন ছন্দোবন্ধের ন্যায় পরম্পরাক্রমে আমাদের মধ্যে ক্রিয়া ক'রে যেতে থাকে এবং সেই উত্থান-পতনের সামঞ্জস্য রাখতে রাখতেই আমাদের জীবনকে অবসাদ শূন্যভাবে চালনা করা সম্ভব হয়। প্রত্যেক ক্ষুধার যে এই দুই অংশ, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, আকাঙ্ক্ষা এবং পরিতৃপ্তি, চাহিদা এবং পূরণ, এই দুটির সমন্বয়ের দ্বারাই ক্ষুধাটি সম্পূর্ণ ও সার্থক। প্রত্যেকটিই সাধারণ শারীরিক প্রক্রিয়া। পেটের মধ্যে মোচড় দিতে থাকলেই আমরা বুঝতে পারি যে, ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে, তখন খাদ্য পেলেই গোগ্রাসে খেতে থাকি। আবার খানিকটা খেলেই আমরা পরিতৃপ্ত হ'য়ে যাই; তারপরে আর খেতে চাই না। তেমনি যখন গলা শুকিয়ে আসে তখন বুঝি তৃষ্ণা পেয়েছে, খানিকটা জল খেলেই সে তৃষ্ণা নিবারণ হ'য়ে যায়। তেমনি আবার মাঝে মাঝে আসে মলমূত্রের বেগ, তাকে মুক্ত ক'রে দিতে পারলেই তার নিবৃত্তি ঘটে। চাঞ্চল্যের তাড়নাও আমাদের জন্মগত বৈশিষ্ট্য, ভ্রূণ অবস্থা থেকেই এর সূত্রপাত। মানবভ্রূণ তাই মাতৃগর্ভে থেকে থেকে চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, আবার থেকে থেকে নিশ্চল হ'য়ে যায়। ভূমিষ্ঠ হবার পরে শিশু সজোরে চীৎকার করে, হাত পা ছোঁড়ে, খেলা করে,—সমস্তই চাঞ্চল্যের লক্ষণ। কিছুক্ষণ চাঞ্চল্যের পরেই শিশু বিশ্রাম নেয়, অর্থাৎ ঘুমিয়ে পড়ে। শিশুর পক্ষে যেমন খেলা এবং ঘুম, বয়স্থ মানুষের পক্ষে তেমনি কাজ এবং বিশ্রাম, জাগরণ এবং নিদ্রা। মানুষের পক্ষে চাঞ্চল্যও যেমন নিতান্ত প্রয়োজনীয়, নিদ্রাও তেমনি নিতান্ত প্রয়োজনীয়,—এই দুটি আমাদের একপ্রকার ক্ষুধার এপিঠ-ওপিঠ মাত্র। যৌন প্রয়োজন সম্বন্ধেও ঐ একই কথা, যদিও এই প্রয়োজনের তাড়না শৈশবকালে প্রকাশ পায় না, প্রকাশ পায় জীবনের পরবর্তীকালে। বলা বাহুল্য এরও প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি আছে।

এই সমস্ত মৌলিক ক্ষুধার পরিতৃপ্তির জন্যই আমরা ভিন্ন ভিন্ন রকমের আচরণ করতে থাকি এবং আমাদের সমস্ত শক্তি-সামর্থ্যকে সেই দিকে নিয়োগ করতে বাধ্য হই। এই সকল প্রকৃতিগত বৃত্তির তাড়না এতই কঠোর যে, এর কোনোটাকেই সম্পূর্ণরূপে নিরোধ করা সম্ভবপর নয়, কিন্তু নিরোধ করতে পারলেও তাকে ইচ্ছামত এবং প্রয়োজনমত নিয়ন্ত্রিত করা অনায়াসেই সম্ভব। এইগুলি সমস্তই শারীরিক প্রক্রিয়া, পরম্পরাক্রমে ঘটতে থাকলেও সাধারণত এইগুলি কোনও নিয়মের অধীন নয়, অর্থাৎ কখন কোনটির তাড়না জেগে উঠবে তার কোনও স্থিরতা নেই। শিশু ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গেই খাদ্যের জন্য তার ক্ষুধাটি জেগে ওঠে, তখন তাকে খেতে দিলেই সে খাবে, তার কোনও নিয়ম নেই। কোনও একটা নিয়ম করে না দিলে সে বারে বারেই কাঁদবে এবং বারে বারেই খেতে চাইবে। এমনিভাবেই যদি তাকে রাখা যায়, তবে এই অনিয়মেই সে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে, কারণ প্রতিদিন যা করা যায় তাই মানুষের অভ্যাস হ'য়ে ওঠে। কিন্তু এতে সকলের পক্ষেই অসুবিধা, আর শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষেও এটা মঙ্গলজনক নয়। সুতরাং একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে তাকে খেতে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তাতেই সে ক্রমে অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠে। একেই বলা যেতে পারে ক্ষুধাকে নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি।

কেবল মানুষের নয়, বোধহয় সকল জীবের ক্ষুধাকেই নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব। কিছুক্ষণ অভুক্ত থাকবার পরে খাদ্য দেখলে শরীরের মধ্যে ক্ষুধার সাড়া জাগে এবং জিভ দিয়ে লালাক্ষরণ প্রভৃতির দ্বারা তার লক্ষণ প্রকাশ পায়। এটা স্বাভাবিক। কিন্তু খাদ্য এসে পৌঁছবার অব্যবহিত পূর্বেই যদি কোনও একটি বিশেষ সংকেতের দ্বারা বারে বারে তার বার্তা জ্ঞাপন করা যায়, তবে ক্রমে ক্রমে জীবের এমন একটা অভ্যাস হ'য়ে যায় যে, পূর্বেকার অনুষঙ্গ হেতু তখন ঐ বিশেষ সংকেতটি উপস্থিত হওয়া মাত্রই সে বুঝতে পারে খাদ্য এবার আগতপ্রায়, তখন খাদ্য না দেখেও তার জিভ থেকে লালাক্ষরণ হ'তে থাকে। রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক পাভলো এই বিষয় নিয়ে অনেক রকমের পরীক্ষা ক'রে দেখিয়েছেন। কোনও কুকুরকে যদি খেতে দেবার আগে প্রত্যেকবার ঘণ্টা বাজাবার নিয়ম করা হয়, তবে খাদ্য না উপস্থিত হ'লেও ঘণ্টার শব্দ শুনলেই তার জিভ্‌ দিয়ে লালাক্ষরণ হ'তে থাকবে। এর নাম হচ্ছে conditioned reflex, অর্থাৎ পূর্বাভ্যাস অনুযায়ী সাড়া জাগার প্রক্রিয়া। এস্থলে ঐ কুকুরটি ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যপ্রাপ্তিতে বারে বারে অভ্যস্ত হওয়ায় তখন বাইরের ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে আপন ভিতরকার

ক্ষুধাবৃত্তিকে আনুষঙ্গিকভাবে জড়িত ক'রে ফেলেছে, সুতরাং তখন ঘণ্টাধ্বনিটি শোনবামাত্রই তার ক্ষুধা জাগে, নতুবা আর জাগে না। এরই নাম অভ্যাস। অভ্যাস হচ্ছে একরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত আচরণ, যাকে আগের থেকে কোনও কিছু অনুষঙ্গের দ্বারা গঠন ক'রে নিতে হয়। সেটা গঠিত হ'য়ে গেলে তখন অনুরূপ অবস্থা উপস্থিত হ'লেই আমরা তৎক্ষণাৎ অনুরূপ আচরণ করতে থাকি, নতুবা আর করি না। যেমন ঘণ্টা ধ্বনির সংকেত, তেমনি ঘড়ির কাঁটার সংকেত এবং সময়ের সংকেতের দ্বারাও আমরা নির্দিষ্টকালে আমাদের ক্ষুধাকে জাগিয়ে তৎক্ষণাৎ তার নিবৃত্তি ঘটাতে অভ্যস্ত হ'তে পারি।

এইরূপভাবে আমাদের প্রত্যেক ক্ষুধাটিকেই আপনাপন সুযোগ এবং সুবিধা অনুযায়ী আমরা নিয়ন্ত্রিত ক'রে নিতে পারি। অর্থাৎ এমন ব্যবস্থা আমরা ক'রে নিতে পারি, যাতে বেলা দশটা বাজলেই আমাদের ক্ষুধা পাবে, বিকেল পাঁচটা বাজলেই বেড়াতে যাবার ইচ্ছা হবে, রাত্রি নয়টা বাজলেই ঘুম পাবে এবং ভোর পাঁচটাতেই ঘুম থেকে উঠে পাইখানায় যাবার বেগ হবে। শুধু এই নয়, আরও অনেক রকমের শারীরিক ক্রিয়াকে আমরা চেষ্টা এবং ইচ্ছা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত ক'রে নিতে পারি। একবার একটা কিছু অভ্যাস হ'য়ে গেলেই যে সেটা চিরকালের জন্য বদ্ধমূল হ'য়ে গেল তাও নয়, কারণ অভ্যাস মাত্রই পরিবর্তন সাপেক্ষ। যে কোনও অভ্যাসকেই আমরা প্রয়োজনমত অন্যরূপ অভ্যাসের দ্বারা পরিবর্তিত ক'রে নিতে পারি। বাল্যকালে বেলা দশটার সময় ভাত খেতে বসা অভ্যাস করেছি বলেই যে বৃদ্ধকালেও বেলা দশটায় খেতে বসতে হবে এমন কোনও কথা নেই। পূর্বোক্ত কুকুরের বেলায় যেমন ঘণ্টাধ্বনির বদলে ইচ্ছামত বংশীধ্বনি বা অন্যরূপ ধ্বনির দ্বারাও অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি করা যেতে পারে, আমাদের বেলাতেও তেমনি এক অভ্যাসের বদলে অন্য অভ্যাসের স্থাপনা করা যেতে পারে। অবশ্য শৈশবকাল থেকে অভ্যাসকে গঠন করাই ভালো, কিন্তু প্রয়োজন হ'লে বৃদ্ধকালেও নতুন নতুন অভ্যাসকে গঠন করা যেতে পারে, এমন কি মৃত্যুকালের পূর্বক্ষণ পর্যন্তও আমাদের অভ্যাস গঠনের এবং পরিবর্তনের অবকাশ আছে। তাই বাল্যকালে বেলা দশটায় খেতে অভ্যস্ত হ'লেও বৃদ্ধকালে আমরা অবস্থাগতিকে বেলা দুটোয় খেতে অভ্যস্ত হ'তে পারি এবং প্রয়োজন হ'লে চিরাভ্যস্ত রাত্রিনিদ্রাকেও দিবানিদ্রায় রূপান্তরিত করতে পারি। অবশ্য যে-কোনও অভ্যাসের প্রথম স্থাপনা করাটাও যেমন কষ্ট এবং আয়াসসাপেক্ষ, তার পরিবর্তন করাটাও ততোধিক। একটা অভ্যাসকে স্থায়িভাবে দাঁড় করাতে অনেক সময় লাগে এবং তার জন্য প্রথম প্রথম অনেক বেগ পেতেও হয়। কিন্তু একবার কিছুতে অভ্যস্ত হ'য়ে গেলে, তখন আমরা অবলীলাক্রমে সেই কাজ ক'রে যেতে থাকি, আর আমাদের সমস্ত শরীর ও মন তার তালে তাল দিয়ে চলতে পেরে পরম স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে থাকে। কিন্তু সেই অভ্যাসের কিছু ব্যতিক্রম ঘটলেই মহা গণ্ডগোল বাধে, সময় ও সংকেত অনুযায়ী সাড়া দিতে না পারলেই শরীরে ও মনে বিদ্রোহ বাধে। সেইজন্য প্রত্যেক অভ্যাসকেই আমাদের নিষ্ঠা সহকারে পালন করা উচিত, কিন্তু প্রয়োজন ঘটলেই সেই অভ্যাসকে ত্যাগ ক'রে অন্য অভ্যাস গ্রহণ করা উচিত। অভ্যাস উপকারী, কিন্তু অভ্যাসের দাস হওয়া অনিষ্টকারী।

মানুষ মাত্রেই সামাজিক জীব, সুতরাং প্রত্যেকের পক্ষেই আপনাপন ক্ষুধাগুলিকে অভ্যাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ক'রে নেবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। প্রথমত, ক্ষুধা মাত্রকেই সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পূরণ করতে থাকার দরুণ যখন তখন সেগুলো জাগতে পারে না এবং অনর্থক অসময়ে তার তাড়নায় অস্থির হ'য়ে উঠতে হয় না। অভ্যাস থাকলে ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন রকমের ক্ষুধাটি জেগে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গেই তার নিবৃত্তি ঘটে যায়। এতে আমাদের অনেক সময় বেঁচে যায় ও শক্তিক্ষয় নিবারিত হয়, সেই সময় ও শক্তিকে আমরা নিশ্চিন্তে অন্যত্র নিয়োগ করতে পারি। আর অভ্যাসের একটা গুণ এই যে, অনভ্যাসে যে কাজে অনেক পরিশ্রম লেগে যায়, অভ্যাসে সেই কাজ আমরা কলের মতো সহজে অনায়াসে সেরে ফেলতে পারি। দ্বিতীয়ত অবস্থানুযায়ী অভ্যাসকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারলে আমরা সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়ে চলতে পারি, কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হ'তে হয় না। যারা অভ্যাসের নিয়ন্ত্রণের দ্বারা এমনভাবে খাপ খাইয়ে নিয়ে চলতে না পারে, তারা সামাজিক জীবনের পক্ষে অনুপযুক্ত হ'য়ে পড়ে। অভ্যাসকে কিছুতেই আমরা এড়াতে পারি না। যারা অনিয়মে চলে তাদের পক্ষে অনিয়মটাই অভ্যস্ত হ'য়ে যায়। কিন্তু তাদের দৈহিক এবং সামাজিক অনেক রকমের অসুবিধা ভোগ করতে হয়। সুতরাং অনিবার্য শারীরিক ক্রিয়াগুলিকে নিয়মের দ্বারা বেঁধে ফেলাই সকলের পক্ষে সমীচীন এবং কিরূপ অভ্যাস বাঞ্ছনীয় তা আগের থেকে জেনে রাখা দরকার।

ভোজন এবং পান—নিয়মিত সময়ে খাবার অভ্যাস করলে স্বাস্থ্যও ভালো থাকে এবং খাদ্যগুলিও সহজে হজম হ'য়ে যায়, কারণ হজম-বিভাগের যন্ত্রগুলি ঐ সময়ে অভ্যাসমত তার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে থাকে। জনশ্রুতিতে আমরা বরাবর শুনে আসছি যে, খবার সময় খেতে না পেলে পিত্ত পড়ে, এ কথা একেবারে মিথ্যা নয়। এ কথার প্রকৃত অর্থ এই যে, তখন পিত্ত প্রভৃতি হজমের রসগুলি আপনাপন ক্রিয়ার জন্য উন্মুখ হ'য়ে থাকে, সে সময় খাদ্য না পেলে ভিতরকার সে আয়োজন ব্যর্থ হ'য়ে যায়, তার পর অসময়ে সেখানে খাদ্য গিয়ে উপস্থিত হ'লে ঐ সব রসের আর তেমন সাড়া পাওয়া যায় না, সেই জন্য হজমের বিঘ্ন ঘটে। অতএব কোনও কারণে যদি খাবার সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে যায় এবং পিত্ত পড়ে যায় তাহ'লে অতঃপর আর খাওয়াই উচিত নয়, ঐ সময়টিতে একেবারে লঙ্ঘন দিয়ে পরবর্তী খাবার সময় উপস্থিত হ'লে যথারীতি খাওয়া উচিত। যদি দেখা যায় যে, বারে বারেই এমন ব্যতিক্রম ঘটছে এবং ঘটবার সম্ভাবনা আছে, তাহ'লে ঐ সময়টির পরিবর্তন ক'রে এমন একটা খাবার সময় ধার্য করা উচিত যখন আর ব্যতিক্রম ঘটবার অবকাশ থাকবে না। সাধারণত বাল্যাবধি আমরা মধ্যাহ্নে এবং সন্ধ্যায় দুবেলা পেটভরা খাদ্য খেয়ে থাকি, সেই জন্য ঐ দুটি সময় উপস্থিত হ'লেই আমাদের সহজাত ক্ষুধার উদ্রেক হয়। কিন্তু বেলা বারোটার মধ্যেই খেয়ে নিতে হবে কিংবা সন্ধ্যা ন'টার মধ্যেই খাওয়া শেষ করতে হবে এমন কোনও প্রাকৃতিক আইন নেই। প্রয়োজন অনুসারে এর অদলবদল করা অবশ্যই যেতে পারে। বস্তুত যিনি চিরকাল বারোটায় খান তাঁর স্বাস্থ্যও যেমন ভালো থাকবে, যিনি চিরকাল দুটোয় খান তাঁরও তেমনি থাকবে। কিন্তু যিনি যে সময়টাকে একবার ধার্য করে নিয়েছেন তাঁকে সেই সময়েই প্রত্যহ খেতে হবে, বারে বারে অদলবদল করা চলবে না। বিলেত প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে প্রত্যেক সংসারে কিংবা প্রত্যেক হোটেলে ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ ডিনার প্রভৃতি খাবার জন্য এক একটা সময় নির্দিষ্ট করা আছে, সেখানকার সকলে ঐ নির্দিষ্ট সময়টিতে খেতে বাধ্য হয়, কাজেই যে যেখানেই থাকুক ঐ সময়টিতে সকলে খাবার জন্য এসে উপস্থিত হয়। যারা কোনও কারণে তখন উপস্থিত হতে পারবে না, তারা আগের থেকে নিজেদের খাবার সংগ্রহ ক'রে সঙ্গে নিয়ে যায়, যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুক ঐ সময় উপস্থিত হ'লে নিজের খাবারটি সেখানেই খেয়ে নেয়। এমনি ক'রে তারা খাবার সময়ের নিয়মটিকে সর্বদা নিষ্ঠা সহকারে প্রতিপালন করে। আমাদের দেশের প্রাচীন যৌথ পরিবারেও এক সময় এমনি নিয়ম ছিল, তখন সকলে একসঙ্গে খেতে বসতো। কিন্তু এখন কাজের প্রয়োজনে প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে খেতে বাধ্য হয়। তাতে কোনও ক্ষতি নেই, কিন্তু যার যেটি ধার্য সময় তার প্রত্যহ সেই সময়েই খাওয়া উচিত। কাজের দিনে বেলা দশটায় খেয়ে রবিবার এবং অন্যান্য ছুটির দিনে বেলা দুটোয় খেলে কোনোটাতেই সুচারু-

ভাবে অভ্যস্ত হওয়া যায় না, ফলে কাজের দিন চায় ছুটির দিনের ঠাণ্ডা ভাত, আর ছুটির দিন চায় কাজের দিনের গরম ভাত। এগুলো হয়তো ছেলেবেলায় আর যৌবন-কালে তেমন অনিষ্ট করে না, কিংবা করলেও সেটুকু কাটিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু মধ্যবয়সে এবং বৃদ্ধকালে বিশেষ অনিষ্ট করে।

খাবার সম্বন্ধে আরও কতকগুলো নিয়ম আছে, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সেগুলোও রীতি-মত অভ্যাস করা উচিত এবং নিষ্ঠা সহকারে পালন করা উচিত। খেতে বসলে তখন খাওয়াই হলো একমাত্র কাজ, তখন আর অন্য কোনও দিকে মন দেওয়া চলবে না। ধীরে সুস্থে প্রত্যেকটি খাদ্যের আস্বাদ অনুভব করতে করতে খেতে হবে। অন্যমনস্কতায়, বিরক্তিতে, রাগে আর উদ্বেগে কোনও খাদ্যই ভালো করে হজম হতে পারে না। মনের ক্রিয়ার সংগে হজমের ক্রিয়ার বিশেষ যোগা-যোগ আছে।

খাবার সময় প্রত্যেকটি গ্রাস অনেকক্ষণ ধরে চিবিয়ে চিবিয়ে খাওয়া উচিত। ডাল ঝোল মেখে পিচ্ছিল করে নিয়ে দু'একবার মাত্র চিবিয়ে কোনোগতিকে কয়েক গ্রাস কোঁৎ ক'রে গিলে ফেলে দুচার ঢোঁক জল খেয়ে নিয়ে সমস্ত নিচে নামিয়ে দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়, এতে হজমের বিঘ্ন হয়। খাদ্যকে চিবিয়ে এমনভাবে নরম ক'রে নেওয়া উচিত যাতে চেষ্টা ক'রে গিলবার প্রয়োজনই হবে না, সেটি অবাধে আপনাআপনি গলা দিয়ে নেমে যাবে। খাবার সম্বন্ধে এই নিয়মটি ছেলেবেলা থেকেই অভ্যাস করানো উচিত। যাদের অল্প বয়স থেকেই তাড়া-তাড়ি খাওয়া অভ্যাস হয়ে গেছে তাদের ধীরে সুস্থে চিবিয়ে খেতে অভ্যাস করানো কঠিন। কিন্তু মনোযোগ সহকারে চেষ্টা করতে থাকলে তাও ক্রমশ অভ্যাস হ'য়ে যাবে। যাদের খুব তাড়াতাড়ি খাওয়া অভ্যাস তাদের পক্ষে এমন নিয়ম করতে হবে যে, প্রত্যেক গ্রাসটি গুণে গুণে ত্রিশ চল্লিশবার না চিবিয়ে কিছুতেই গলাধঃকরণ করা হবে না। সপ্তাহখানেক এই নিয়ম যদি অবিচলিতভাবে পালন করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, এই চিবিয়ে খাওয়ার প্রক্রিয়াটি তখন আপনিই অভ্যাস হয়ে গেছে, এই বিষয়ে অন্যমনস্ক হ'য়ে খেতে থাকলেও দাঁতগুলি তখন আপনিই যথা-নিয়মে চিবিয়ে যাচ্ছে। আমরা একজন রোগীর কথা জানি, যে চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত ডিস্‌পেপ্‌সিয়াতে কষ্ট পাচ্ছিল। তাকে এই নিয়মের দ্বারা চিবিয়ে খেতে অভ্যাস করানো হয় এবং পাঁচ মিনিটে খাওয়া সারার পরিবর্তে তাকে চল্লিশ মিনিট ধরে খেতে বলা হয়। তার ডিস্‌পেপ্‌সিয়া চিরকালের জন্য আরোগ্য হ'য়ে গেছে।

দৈনিক জলপানের মধ্যেও অভ্যাসের দ্বারা অনেক তারতম্য ঘটে। অভ্যাস হেতুই কেউ বা অনেক জল খায়, কেউ বা খুব কম। এমন অনেক লোক দেখা যায় যারা খাবার সময় দু'এক ঢোঁক ছাড়া স্বতন্ত্রভাবে আর মোটে জলই খায় না। বলা বাহুল্য তাতে তাদের স্বাস্থ্যের হানি হয় এবং কোষ্ঠকাঠিন্য প্রভৃতি অসুস্থতা এসে পড়ে, যদিও তারা বুঝতে পারে না যে, কিসের থেকে এই অসুস্থতা ঘটছে। আমাদের শরীরে প্রত্যহ জলের নিতান্তই প্রয়োজন, এমন কি খাদ্যের চেয়েও জলের প্রয়োজন বেশি। অবশ্য খাদ্যাদির মধ্যেও খানিকটা জল থাকে এবং চা, দুধ, ডাল, ঝোল প্রভৃতির ভিতর দিয়েও আমরা খানিকটা জল খেয়ে থাকি। কিন্তু এ ছাড়া স্বতন্ত্রভাবেও আমাদের ৫।৬ বারে অন্তত দেড় সের জল পান করা উচিত। এটাও নিছক অভ্যাসসাপেক্ষ, অভ্যাস থাকলে আপনিই মাঝে মাঝে জলপিপাসা পেয়ে যায় এবং পান করতে বাধ্য হতে হয়। জল খাদ্যের মতো হজম করবার জিনিস নয়, ময়লা ধোলাই করবার জিনিস। জল খেলেই তৎক্ষণাৎ সেটা পাকস্থলীকে ধুয়ে পরিষ্কার ক'রে ফেলে, তারপরেই সেটা অন্ত্রে গিয়ে সেখান থেকে লিভারে প্রবেশ করে, এবং লিভারের ভিতরটাও ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে রক্তের ভিতর দিয়ে ঘুরে ফিরে শেষে কিডনির ভিতর দিয়ে অনেক ময়লা নিকাশ ক'রে ছেঁকে বেরিয়ে যায়। যাদের প্রচুর জল খাওয়া অভ্যাস আছে, তাদের কিডনি কিংবা লিভার সহজে বিকল হয় না এবং তাদের পাথুরি কিংবা বাতরোগে কষ্ট পেতে হয় না। তবে কোনো খাদ্যের সংগে প্রচুর জল খাওয়া উচিত নয়, জল খেতে হয় স্বতন্ত্র-ভাবে।

উপবাস—দৈনিক খাবার নিয়মটি লঙ্ঘন করাকে বলে উপবাস। দৈনন্দিন খাবার অভ্যাসটিকে চিরদিন বজায় না রেখে মাঝে মাঝে উপবাস দিয়ে তার বিরতি ঘটানো স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। বোধ করি সেইজন্যই আমাদের দেশে নিয়মিত একাদশী পূর্ণিমা প্রভৃতি তিথিতে উপবাস পালনের প্রথা আছে। এতে হজমের যন্ত্রগুলি কিছু বিশ্রাম পায় এবং তারপরে আবার নতুন উদ্যমে কাজ করতে সমর্থ হয়। একদিন উপবাস দিলে বিশেষ কষ্ট হয় না, আর যাদের এটা অভ্যাস আছে তাদের কোনোই কষ্ট হয় না। মাসে একবার কিংবা দুবার নিয়মিত উপবাসে মানুষকে দীর্ঘায়ু করে। কিন্তু একাদিক্রমে চব্বিশ ঘণ্টার বেশি উপ-বাস করা উচিত নয়, আর নিরম্বু উপবাস করাও উচিত নয়। এমনিভাবে এক এক-দিন উপবাসের অভ্যাস যদি রাখা যায় এবং উপবাসের দিনে কেবল জলপান ক'রে থাকা যায়, তাতে স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকার হয়। তবে এ নিয়ম কেবল বয়স্থ লোকদের জন্যই প্রশস্ত। চিকিৎসা বিজ্ঞানের আদিগুরু হিপোক্রেটিশ বলে গেছেন, উপবাস অল্প বয়স্কদের পক্ষে অপকারী, মধ্য বয়স্কদের পক্ষে উপকারী, বৃদ্ধদের পক্ষে বিশেষ উপকারী। এ কথার মধ্যে অনেক অর্থ আছে। শৈশবকাল থেকে মধ্য বয়স পর্যন্ত শরীর গঠনের সময় কলেবরের আয়তন তখন উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে, সুতরাং তদোপযুক্ত মালমসলা যোগাবার জন্য খাদ্যের পরিমাণও উত্তরোত্তর বাড়িয়ে যেতে হবে এবং একদিনও বাদ দেওয়া চলবে না। মধ্যবয়স এলেই শরীরের গঠন থেমে গেল, তখন শরীরের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানো ছাড়া অতিরিক্ত খাদ্যের আর প্রয়োজন নেই, সুতরাং তখন থেকে খাদ্যের পরিমাণ কমাতে হবে। চল্লিশের পর থেকেই খাদ্যের পরিমাণ কমাতে শুরু করা উচিত। ষাট বছর বয়সে যখন বার্ধক্য এলো, তখন শরীরের পরিশ্রমও অনেক কমে গেছে, দৈনন্দিন প্রয়োজনও অনেক কমে গেছে। তখন কেবল শরীরটিকে রক্ষা করবার জন্য লঘিষ্ঠ পরিমাণ যতটুকু খাদ্যের দরকার তার বেশি খেলেই অনিষ্ট হবে, অতিরিক্ত খাদ্যের চাপ মোটেই সহ্য হবে না। সুতরাং তখন বেশি খাওয়ার পরিবর্তে কম খাওয়ার অভ্যাস করে নিতে হবে। আগেকার বয়সের মতো খাবার লোভ করতে গেলেই তখন শাস্তি পেতে হবে। অতএব ষাট বছর পেরিয়ে গেলেই খাবার পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া উচিত এবং যতদিন যায় তত আরো কমাতে থাকা উচিত, আর সেই সংগে মাঝে মাঝে উপবাস দেওয়াও ভালো। খাদ্য সম্বন্ধে এমনি সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে চলাই দীর্ঘায়ু এবং সুস্থ থাকার একমাত্র উপায়, আর একমাত্র অভ্যাসের গুণেই তা সম্ভব হ'তে পারে। বৃদ্ধবয়সে যারা কম খায় আর উপবাস দেয় তারা অনেকদিন বেঁচে থাকে।

প্রাতঃকৃত্য—সকালে ঘুম থেকে উঠে কোনো কাজে লাগবার আগে শরীর সম্বন্ধীয় নিত্যকর্মগুলো সেরে ফেলার অভ্যাস ছেলেবেলা থেকেই রপ্ত ক'রে নেওয়া দরকার, এবং সারাজীবন এই নিয়মেই চলা উচিত। ঘুম থেকে উঠেই প্রথমে পাইখানায় যাওয়া (কুড়ি মিনিটের মধ্যেই সারা উচিত), তারপরে ব্রাশ কিংবা দাঁতন দিয়ে দাঁত মেজে এবং জিভ ছুলে মুখ ধুয়ে ফেলা, আর দৈনিক একবার ক'রে সমস্ত দেহটিকে মার্জনা ক'রে পরিষ্কার ক'রে স্নান ক'রে ফেলা, এগুলি অভ্যাস হ'য়ে গেলে ছোটোবড়ো সকলেই আপনা-আপনি কলের মতো ক'রে যায়। অবশ্য ছেলেবেলায় এগুলির সম্বন্ধে প্রথম শিক্ষা দেওয়া কিছু কঠিন। ছোটো ছেলেদের মুখ ধোয়াবার জন্য আর পাইখানায় বসাবার জন্য যে কত বেগ পেতে হয় তা সকলেই জানে। কিন্তু ধৈর্যসহকারে যাদের শেখানো হয় তাদের স্বাস্থ্যের জন্য পরে আর ভাবতে

হয় না। তাদের সহজে কোষ্ঠকাঠিন্যও হয় না, কিংবা দাঁতে পোকাও লাগে না। কোষ্ঠ-কাঠিন্যের অন্যান্য কারণের মধ্যে অনিয়মটাই সকলের চেয়ে প্রধান। বেশি বয়সেও যারা অনিয়মের বদলে একটা নিয়মের অভ্যাস ক'রে নিতে পারে তাদের কোষ্ঠকাঠিন্য তাতেই অনেক সেরে যায়। স্নান সম্বন্ধেও নিয়ম এই যে, প্রত্যহ একটা নির্দিষ্ট সময়ে স্নানের অভ্যাস করা উচিত, অবশ্য সুবিধা ও সুযোগ অনুসারে। এই অভ্যাসটি থাকলে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে আবহাওয়ার পরিবর্তনগুলো অনায়াসে সহ্য হ'য়ে যায়, একটু বৈপরিত্যেই শরীরকে অসুস্থ ক'রে তুলতে পারে না।

শরীরের যত্ন সম্বন্ধে আরো কতকগুলি অভ্যাস আমাদের করা দরকার। যেমন স্নানের পরে চুল আঁচড়ানো। এটা বাবুগিরি নয়, চুলের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এটা সকলেরই করা দরকার। তারপরে চুল বড়ো হ'লেই কেটে ফেলা, মাঝে মাঝে সাবান বা সোডা দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলা, এও দরকার। হাত মুখ এবং গায়ের চামড়া নিত্য পরিষ্কার রাখা, এও একটা অভ্যাসের ব্যাপার। যারা অভ্যাস হেতু পরম অবহেলায় সর্বদা নোংরা হয়ে থাকে তাদের গায়ে মুখে দুর্গন্ধ বেরোয়, আর তারাই বারেবারে চর্মরোগে ভোগে। বড়ো বড়ো নখ রাখাও এক কু-অভ্যাস। এমন কোনো রোগের বীজাণু নেই যা নখের কোণের ময়লার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে থাকতে না পারে, অথচ তাই নিয়েই অনেকে নখের বাহার ক'রে লোকসমাজে বেড়ায়। কিন্তু যাদের নখ কাটার অভ্যাস আছে তারা নখগুলি একটু বাড়লেই আর স্থির থাকতে পারে না, তৎক্ষণাৎ কেটে ফেলে নিশ্চিন্ত হয়।

ঘুম ও কাজ—বিশ্রামের পরে চাঞ্চল্য, চাঞ্চল্যের পরেই আবার বিশ্রাম, এই হলো জীবের প্রকৃতি, প্রত্যেক জীবের স্বভাবেই এটা পর্যায়ক্রমে ঘটতে দেখা যায়। বিশ্রামের প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে ঘুম। এতে শরীরের সমস্ত অংশই বিশ্রাম পায়, কেবল রক্ত চলাচল বিভাগের আর শ্বাস-প্রশ্বাস বিভাগের যন্ত্রগুলি বিশ্রাম পয় না, আর মেরুমজ্জা ও অটোনমিক সিস্টেমের নার্ভ-গুলিও বিশ্রাম পায় না, তাদের কোনো ঘুম নেই। কথিত আছে যে, মস্তিষ্কের মধ্যে কতকগুলি নার্ভকেন্দ্র বহুক্ষণ জেগে কাজ করায় অবসন্ন ও ক্ষয়প্রাপ্ত হ'য়ে পড়াতে ঘুম পায়, এবং ঘুমের দ্বারাই সেগুলি পুনরুজ্জীবিত হয়। কিন্তু একথা হয়তো ঠিক নয়। বিভিন্ন জীবে বিভিন্ন অবস্থায় ঘুম ও জাগরণের অনেক মাত্রাভেদ আছে। কেউবা অনেক ঘুমোয় অল্প জাগে, কেউবা অনেক জাগে অল্প ঘুমোয়। নতুন শিশুরা ভূমিষ্ঠ হ'য়ে অনবরতই ঘুমোয়, ঘুমের মধ্যেই তাদের গঠন ও পুষ্টির কাজ চলতে থাকে। শিশুদের পক্ষে তাই এত বেশি পরিমাণ ঘুমের দরকার, বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের মাত্রা আপনিই অনেক কমে যায়। সুতরাং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের অভ্যাসকেও পরিবর্তন ক'রে চলতে হবে। শিশুরা এক বছর বয়স পর্যন্ত কেবল নাইবার, খাবার ও মলমূত্র ত্যাগের সময়টি ছাড়া দিবারাত্রই ঘুমোবে। এক বছর বয়স পার হ'লে তারা দিনের মধ্যে সকালে এবং দুপুরে দুবার ঘুমোবে, বাকি সময় জেগে থাকবে, আর সন্ধ্যা থেকে সারারাত ঘুমোবে। একটু বড়ো হ'লে আর সকালে ঘুমোবে না, কিন্তু পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত দুপুরে একবার নিশ্চয়ই ঘুমোবে। পাঁচ বছরের পরে দিনে না ঘুমোলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু রাত্রে সন্ধ্যার পর থেকেই ঘুমোবে। ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের রাত্রি ন'টার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়া উচিত, তার বেশি রাত জাগতে দেওয়া অন্যায়। ষোলো বছরের পরে জাগরণের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে হবে। বয়স্থ লোকদের পক্ষে দৈনিক আট ঘণ্টা ঘুমই যথেষ্ট। রাত্রি ন'টায় শুয়ে ভোর পাঁচটায় ওঠার অভ্যাস করাই সবচেয়ে উত্তম। কিন্তু আট ঘণ্টার কিছু কম কিংবা বেশি ঘুমোলেই যে-কোনো অনিষ্ট হয় তা নয়। সমস্তই অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। এমন লোকও দেখা গেছে যারা সারাদিনের মধ্যে মাত্র তিন চার ঘণ্টা ঘুমোয়, তাতে তাদের শরীরের কোনোই অনিষ্ট হয় না। কিন্তু দৈনিক কিছু পরিমাণ ঘুম প্রত্যেকের পক্ষেই নিতান্ত দরকার। উপর্যুপরি কয়েকদিন অনিদ্রায় কাটালে শরীরের অনিষ্ট হয়। সম্পূর্ণ অভুক্ত অবস্থাতে মানুষ তবু কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ অনিদ্রায় তাও পারে না, অল্পদিনেই উন্মাদ রোগ অথবা মৃত্যু ঘটতে পারে।

ঘুমের একটা নির্দিষ্ট সময় থাকা চাই এবং সহজে ঘুমিয়ে পড়ার একটা অভ্যাস থাকা চাই। বিছানায় শুয়ে কেউ পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ে, কেউ আবার আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টা পর্যন্তও জেগে থাকে। যারা সহস্র গোলমালের মধ্যেও শোবামাত্রই ঘুমিয়ে পড়ে, স্থানকালের তারতম্যে যাদের ঘুমের কোনো ব্যাঘাত হয় না, নিজের বিছানায় শুয়ে নির্দিষ্ট বালিশটি মাথায় না দিলে কিছুতে ঘুম আসবে না এমন যাদের বদ-অভ্যাস নয়, খুট্ ক'রে একটু শব্দ হ'লে যাদের সমস্ত ঘুমটাই চটে যায় না, তারাই ভাগ্যবান। চঞ্চল দেহকে অচিরে স্তব্ধ ক'রে দিয়ে আর মনের প্রদীপটিকে এক ফুৎকারে নিবিয়ে দিয়ে তারা এক ঘুমেই অনায়াসে স্বাস্থ্যের ব্যতিক্রমগুলি কাটিয়ে উঠে ভারাক্রান্ত মনকে নবীন ক'রে নিতে পারে। তাদের স্বাস্থ্য সহজে খারাপ হয় না, তাদের মন সহজে স্থবির হয় না। কিন্তু এই সহজে ঘুমিয়ে পড়ার অভ্যাসটি অনেকটা নির্ভর করে ছেলেবেলাকার শিক্ষার উপর। যারা ছেলেদের কোলে নিয়ে চড়া গেয়ে দোলা দিয়ে ঘুম পাড়াতে অভ্যাস করায় তাদের ছেলেরাই বয়সকালে ঘুমের জন্য নানা বিচিত্র রকমের অনুষঙ্গের অবতারণা করে, সেই আনুষঙ্গিক অবস্থা-গুলি না ঘটলে তাদের কিছুতে ঘুম আসে না। ঘুমের আনুষঙ্গিক সংকেতগুলি যত কম এবং সরল হয় ততই ভালো। ঘুমের জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় থাকলেই যথেষ্ট, ঐ সময়টিতে বালিশ মাথায় দিয়ে বিছানায় শুলেই ঘুমিয়ে পড়া উচিত, তার জন্য আর কোনো আরাধনার প্রয়োজন হবে না। ছেলেবেলা থেকেই এই শিক্ষাটি দেওয়া উচিত। ঘুমের জন্য যাদের নানাবিধ কৃত্রিম উপায়ের সাহায্য নেবার প্রয়োজন হয় তাদের বড়ো দুর্ভাগ্য। কিন্তু সংকল্প ও চেষ্টার দ্বারা সে দুর্ভাগ্যও দূর করা সম্ভব।

পরিশ্রমে যে ক্লান্তি আনে তাতে সহজেই ঘুম পায়। শরীর কিছু খাটলেই তার বিশ্রামের প্রয়োজন হবে। যারা খাটবার সময় খুব খাটে আর ঘুমের সময় খুব ঘুমোয় তার স্বাস্থ্য যে কত আশ্চর্যরকমে ভালো থাকে, এ আমরা প্রায়ই দেখতে পাই। যার খাটুনিও নেই, ঘুমও কম, তার স্বাস্থ্য সহজেই ভেঙে যায়। ঘুমের জন্য খাটুনির দরকার, খাটুনির জন্য ঘুমের দরকার, পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়ানো। খাটবার উপযোগী ক'রেই আমাদের শরীর নির্মিত, তাকে রক্ষা করতে হ'লে রীতিমত খাটাতে হবে, বসিয়ে রাখলেই নষ্ট হ'য়ে যাবে। এই বুঝে দৈনিক শরীরকে খানিকটা খাটাতে আমাদের অভ্যস্ত হওয়া উচিত, বাল্য থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত।

বদ-অভ্যাস—শরীরের প্রয়োজন ছাড়াও কতকগুলি অভ্যাস আমাদের থাকে যা অধিকন্তুভাবে শখ ক'রে আমরা সৃজন করি। তার মধ্যে এমন কতকগুলি আছে যা আমাদের জীবনের মধ্যে খানিকটা বৈচিত্র্য আনে, আবার এমন কতকগুলি আছে যা আমাদের ক্রীতদাসের মতো ক'রে রাখে। এইগুলোকে আমরা বলি নেশা। নেশার যে ক্ষেত্রে যতই গুণ থাক, আমাদের জীবনের পক্ষে সেগুলো অপ্রয়োজনীয় এবং অনিষ্টকারী।

বিজ্ঞানের কথা

ধনেশ

শ্রীজয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

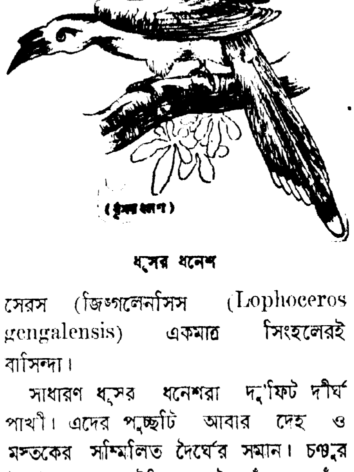
পৃথিবীতে যত প্রকার অদ্ভুত ধরণের পাখী আছে বোধ হয় ধনেশের সঙ্গে কারুর তুলনা হয় না। পাখী-দের পক্ষে যতদূর হওয়া সম্ভব এদের চেহারা ততদূর কিম্ভূত-কিমাকার। এদের কিম্ভূত দর্শনের প্রধান কারণ—এদের চঞ্চুর উপরকার খাঁড়ার মত অংশ। কারুর আবার এই উদ্গত অংশ চঞ্চুর মতই প্রায় সমান সুবৃহৎ। এই খাঁড়ার মত অংশটিকে ইংরেজিতে বলা হয় কাস্ক (Casque)। কাস্কটি পাখীদের যে কী উপকারে আসে জানা যায়নি। মনে হয় কোন উপকারেই আসে না। এ হয়ত প্রকৃতির খাম-খেয়ালীর একটি নিদর্শন। কারণ যেসব পাখীর এই খাঁড়ার মত অংশ দেখা যায় তাদেরও শিশু অবস্থায় কয়েকমাস পর্যন্ত আদৌ কাস্ক থাকে না—কাস্ক পরে গঠিত হয়। এমন কি দু'এক জাতের ধনেশ পাখীও আছে যারা একেবারেই খাঁড়াবিহীন। কিন্তু তাতে এদের গঠনাদির কোন আপজাতও ঘটেনি এবং জীবন যুদ্ধে এরা কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করে বলেও মনে হয় না।

ধনেশ পাখীদের চঞ্চু ও পুচ্ছ এত বড় যে, এদের চেয়ে দ্বিগুণ আকারের পাখীদের পক্ষেই একমাত্র তা সুশোভন হোত। এদের উড্ডয়ন প্রণালীও কম অদ্ভুত নয়। দেহের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর ডানাদ্বয় অসম্ভব রকম ঝটপটানির দ্বারা এরা কোন-মতে বাতাস কেটে অগ্রসর হতে পারে। কিন্তু ওড়াতে যে পরিমাণ পরিশ্রম ব্যয়িত হয় তাতে একসঙ্গে কয়েক সেকেণ্ডে বেশী একাজ করা সম্ভব নয়। নিকটে একটা গাছ পেলে পাখীটি অমনি ডানাদ্বয়কে একটু বিশ্রাম দেয়—শম্বুক গতিতে বাতাসে ভেসে একটু এগিয়ে যায়—তারপর আবার সুরু হয় সেই বিপুল ডানা ঝটপটানি। এইভাবে এরা কোনমতে এসে গন্তব্যস্থানে পৌঁছায়। এইখানেই সমস্ত বিপদের শেষ হয়ে যায়নি —চঞ্চুর বিপুল ভারের জন্য ডালে বসার সঙ্গে সঙ্গে উল্টে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা এবং যেতও সুনিশ্চিত কিন্তু ঐ দীর্ঘ পুচ্ছটি ভারসাম্য রক্ষা করে। ওড়ার সময় এরা এমন ডানা ঝটপটায় যে, মাইলখানেক দূর থেকে নাকি ঐ শব্দ শোনা যায়।

পক্ষীতত্ত্ববিদরা ধনেশদের বিউসারোটিডি (Bucerotidae) গোষ্ঠীতে স্থান দিয়েছেন। ভারতে এই গোষ্ঠীভুক্ত প্রায় পনেরটি বিভিন্ন জাতিভুক্ত ধনেশ পাখী দেখা যায়। এরা বেশীর ভাগই অরণ্যচারী। অবশ্য লোফো-সেরস (Lopho ceros) নামক একটি গণ (genus) আছে—এই গণান্তর্ভুক্তরা মাঝে মাঝে পথিপার্শ্বের গাছ, ঝোপে ঝাড়ে ও উদ্যানেও হানা দেয়।

লোফোসেরস গণান্তর্ভুক্ত পাখীরাই ধূসর ধনেশ নামে প্রখ্যাত। তিনটি জাতি নিয়ে এই গণটি গঠিত। লোফোরাস বিরস্ট্রিসদের (Lophorus birostris) একমাত্র বোম্বাই, ত্রিবাঙ্কুর ও মালাবার উপকূল বিভাগ ছাড়া ভারতের প্রায় সর্বত্র অরণ্যপ্রদেশে দেখা যায়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, উত্তর ও পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু ও রাজপুতানার পূর্বাঞ্চলের কতকাংশে, আসাম, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলেও এদের দেখা যায় না। হিমালয়ের দু-হাজার ফিট উঁচুতে পর্যন্ত এরা দৃষ্টি-গোচর হয়।

লোফোসেরস গ্রিসিয়াস (Lophoceros griseus) মালাবার উপকূল ও লোফো-



ধূসর ধনেশ

সেরস (জিংগলেনসিস (Lophoceros gengalensis) একমাত্র সিংহলেরই বাসিন্দা।

সাধারণ ধূসর ধনেশরা দু'ফিট দীর্ঘ পাখী। এদের পুচ্ছটি আবার দেহ ও মস্তকের সম্মিলিত দৈর্ঘ্যের সমান। চঞ্চুর দৈর্ঘ্য প্রায় চার ইঞ্চি—একটু বাঁকান। খাঁড়া বা কাস্কের দৈর্ঘ্য চঞ্চুর দৈর্ঘ্যের তিনভাগের এক ভাগের সমান। এদের পালকের সাধারণ রং ধূসর—বরং মনোরম বাদামী আমেজ মেশান ধূসর বলাই অধিকতর যুক্তিসংগত। মাথার দু'পাশের রং কালো। উদর, পুচ্ছ ও ডানার পালকগুলো শাদা। প্রত্যেক পুচ্ছ পালকের শেষাংশ কালোর ফিতে কাটা। পুচ্ছ কিছুটা দাগকাটা বলা চলে—মধ্যের পালক দীর্ঘতম এবং দু'পাশের পালক সব-চেয়ে ছোট।

পাখীটির আকারের তুলনায় ডানা যথেষ্ট ছোট। কাজেই উড্ডয়ন বেশ আয়াসসাধ্য ও শব্দময় অর্থাৎ যথেষ্ট ডানা ঝটপটানির প্রয়োজন হয়।

এদের ডাক ভারী অদ্ভুত—আকারের তুলনায় মৃদুতর। কোন বিপদাশংকা ঘটলে এরা ক-ক-কে এইপ্রকার তীক্ষ্ম ভয়ব্যাকুল শিস্ দ্বারা দলকে সতর্ক করে দেয়। এদের খাদ্য প্রধানতঃ ফল—তবে মৌমাছি, কীট-পতঙ্গ, লিজার্ড প্রভৃতিও এরা খেয়ে থাকে। ছোট ছোট দলে এরা উড়ে বেড়ায়।

ধনেশ পাখীদের নীড় রচনা, ডিমপাড়া প্রভৃতি এতই অদ্ভুত ও রোমাঞ্চপূর্ণ যে, প্রথমে যখন তার বর্ণনা হয় লোকেরা তখন সেসব অসম্ভব কল্পনাপ্রসূত গল্পকাহিনী বলেই উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু অদ্ভুত হলেও এর মধ্যে একটুও গাঁজাখুরী কিছু নেই। এরা কোন স্বতন্ত্র নীড় রচনা করে না—তার পরিবর্তে গাছের গুঁড়ির সুবৃহৎ প্রাকৃতিক গর্ত ব্যবহার করে। এরা পিপুল, শিমুল বৃক্ষ প্রভৃতি সাধারণতঃ মনোনয়ন করে। ডিম পাড়ার সময় হলে স্ত্রী-পাখীরা সেই গর্তে ঢুকে পড়ে আর বাইরে আসে না, এবং ঐ অবস্থায় গর্তে থেকে যায় যতদিন না বাচ্চারা উড়তে শেখে। প্রথম দু'তিন দিন স্ত্রী পাখী গর্তের প্রবেশ দ্বারে নিজের বিষ্ঠার প্রলেপ লাগায়। এই বিষ্ঠা অত্যন্ত আঁঠাল কঠিন মৃত্তিকার কাজ করে। এই কাজের জন্য চঞ্চুর চেপ্টা অংশ ব্যবহৃত হয়।

গর্তমুখ বন্ধ করবার মালমশলা সর্বাংশে গর্তবাসীর রুচির উপর নির্ভর করে। গোময়, ঘোড়ার বিষ্ঠা, কর্দম প্রভৃতি নাকি ব্যবহৃত হয়। এই কাজ সম্পাদনের শেষে মানুষের আঙ্গুলের সমান পরিধিযুক্ত ও দুই তিন ইঞ্চি গভীর একটি মাত্র সরু ছিদ্রের সাহায্যে বাইরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষিত হয়। এই গর্ত পথেই গৃহের জঞ্জাল বাইরে নিক্ষিপ্ত হয় এবং খাদ্যও সরবরাহ হয়ে থাকে।

স্ত্রী পাখীরা এইপ্রকার স্বেচ্ছাবন্দী অবস্থায় একমাত্র পুরুষ পাখীর উপরই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এবং পুরুষপাখীদের একনিষ্ঠতায় কোনদিনই একটুও কার্পণ্য লক্ষিত হয় না। কঠোর পরিশ্রম সহকারে এরা স্ত্রীর আহার্য যোগায় ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। এরা ঠোঁটে করে খাবার নিয়ে এসে নিকটস্থ গাছের ডালে বসে—তারপর বাসার মুখের কাছে উড়ে গিয়ে পায়ের নখর দ্বারা গাছের বাকল আঁকড়ে ধরে—স্ত্রী-পাখী ভিতর থেকে খাদ্য গ্রহণের জন্য চঞ্চুর অগ্রভাগ বের করে দেয়। বস্তুতঃ এরা যা পায় গিলে ফেলে—তারপর এসে সব উগরে দেয়। উগরে দেওয়া

বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার; গলাটাকে বার বার ঝাঁকাতে হয়—মাথা ঝাঁকুনীও চলে—এইভাবে একসময় হঠাৎ খাবার এসে ওষ্ঠাগ্রে পোঁছায়। প্রতিবার বাসায় এসে এরা কমপক্ষে দশবার খাবার উগরে দেয়।

ডিম ফুটে বাচ্চা বের হতে পনের দিন সময় লাগে। শাবকেরা যতদিন না চার সপ্তাহের হয় ততদিন এরা কুলায় ত্যাগ করে না। কাজেই দেখা যাচ্ছে স্ত্রীপাখীর এই বন্দী জীবন দীর্ঘ সাত সপ্তাহ ব্যাপী চলে। যখন এরা পুনর্বার বাইরে আসে তখন এদের চেহারাটা দাঁড়ায় অত্যন্ত বিশ্রী; ঝোড়ো কাকের মত—এমন কি ডানা এত আড়ষ্ট থাকে যে উড়তেও কষ্ট হয়।

শাবক অবস্থায় ধনেশদের চেহারা ঠিক বড়দেরই মত—শুধু চঞ্চুর উপরকার খাঁড়া থাকে না; দীর্ঘ লেজের পালকগুলোও আলগাভাবে দেহের সঙ্গে লাগান থাকে এবং টানলেই খুলে আসে।

এদের ডিমের সংখ্যা দু' থেকে তিন—শাদা ম্যাজমেজে রংয়ের ডিমগুলো। এদের নীড় রচনার সময় প্রধানতঃ মার্চ থেকে জুনের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

দেখে-শুনে

অ·কৃ·ব

ছেলেবেলা হইতে শুনিয়া আসিতেছি:

"যত হাসি তত কান্না
বলে গেছে রাম শন্না।"

পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে কান্নার সঙ্গে মিলাইবার জন্যই শর্মাকে শন্না করা হইয়াছে; মান্না পদবীটা ছড়া রচয়িতার হয়তো মনে আসে নাই, অথবা শর্মা-র উপর অতটা অত্যাচার করিতে তাঁহার মন চাহে নাই। রাম শর্মা নামে কোন ব্যক্তি সত্যই ছিলেন কিনা এবং তিনি বাস্তবিকই ঐরূপ উক্তি করিয়াছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু উক্তিটির হিসাবে একটু ভুল আছে। জগতে হাসির চেয়ে কান্নাই বেশী। আইরিশ্ কবি ইয়েট্সের (W. B. yeats) ভাষায়:

"The world is more full of weeping than you can understand."

* * * *

হাসির আকর্ষণের চেয়ে কান্নার আকর্ষণ বেশী জোরালো। যাহারা আমাদের হাসান তাহাদের আমরা ভুলিতে পারি, কিন্তু যাঁহারা আমাদের ভাল করিয়া কাঁদান তাঁহাদের আমরা সহজে ভুলি না। হাসিবার চাইতে কাঁদিতেই হয় তো আমরা বেশী ভালবাসি, তাই হাস্যরস অপেক্ষা করুণ রসে আমরা বেশী অভিভূত হই। তাই পৃথিবীর সাহিত্যে যে সমস্ত রচনা অমর হইয়া আছে তাহার অধিকাংশই 'ট্রাজেডি' অর্থাৎ করুণরস-প্রধান রচনা।

যে উপন্যাস পড়িয়া প্রচুর কাঁদা যায়, সে উপন্যাসের প্রেমে না পড়িয়া আমরা পারি না, যে বাণী-চিত্রে কাঁদিবার খোরাক প্রচুর আছে, আমরা তাহা একাধিকবার দেখিয়া আনন্দ পাই।

হাস্যরসাত্মক রচনা, মঞ্চনাট্য বা বাণী-চিত্রকে তখনি আমরা সম্মানের আসন দিই যখন হাসি শুধু নিছক হাসি মাত্রই নয়, তাহার পিছনে থাকে অশ্রুর পটভূমিকা। নমুনা স্বরূপ বলা চলে চার্লি চ্যাপলিনের পরিচালিত চিত্রগুলিতে যে হাস্যরস তাহাতে আছে অশ্রুর গভীরতা, যাহার তুলনায় লরেল হার্ডির কৌতুকাভিনয় নিম্নশ্রেণীর ভাঁড়ামি মাত্র। তাই চার্লি চ্যাপ্লিনকে লরেল হার্ডির বহু উচ্চে আসন দিয়া থাকি।

* * * *

"আমরা কাঁদিতে ভালবাসি"—শুধু এইটুকু বলিলে অবশ্য ঠিক বলা হইবে না। আমরা কাঁদিতে ভালবাসি এরূপ কান্না যাহাতে আনন্দই প্রধান, দুঃখ অপ্রধান। আমরা কাঁদিতে চাই নিজের দুঃখে নয়, পরের দুঃখে, কেন না পরের দুঃখে কাঁদিয়া আনন্দ পাওয়া যায়। গাঁটের পয়সা খরচ করিয়াও আমরা সিনেমায়, থিয়েটারে, সাহিত্যে কাঁদিয়া যে বুক ভাসাইতে ভালবাসি তাহার কারণ অন্যের দুঃখ দেখিয়া সহানুভূতির কান্না আমরা উপভোগ করি। কিন্তু ঐ দুঃখ নিজেদের জীবনে আমরা চাহি না। ওথেলো এবং ডেস্‌ডিমোনার ট্রাজেডি লইয়া শেকস্‌পীয়ার যে অমর নাটকের মধুচক্র রচনা করিয়া গিয়াছেন,—

"বিশ্বজন তাহে
আনন্দে করিছে পান সুধা নিরবধি।"

কিন্তু নিজের জীবনে ওথেলো হইতে রাজী এরূপ পাঠক এবং নিজের জীবনে ডেস্‌ডিমোনা হইতে রাজী এরূপ পাঠিকা পাগ্‌লা গারদে ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ।

* * * *

আমরা পরের দুঃখে সহানুভূতিতে কাঁদিয়া যে আনন্দ পাই তাহাতে খানিকটা Superiority Complex অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতা-বোধ প্রচ্ছন্ন থাকে এবং কিছুটা থাকে আত্ম-নিরাপত্তা বোধ। যে লোকটির দুঃখে সহানুভূতি বোধ করিতেছি, সৌভাগ্যের সিঁড়িতে সে আমা হইত কয়েক ধাপ নীচুতে বলিয়া একদিকে যেমন মনে "আহা বেচারা!" ভাবের উদয় হইয়া নিজের সৌভাগ্য শ্রেষ্ঠতায় অবচেতন মনে খানিকটা মৃদু গর্ব বোধ করি, তেমনি অন্যদিকে তাহা অপেক্ষা আমি নিজে অনেক নিরাপদে আছি একথা মনে করিয়া বেশ একটু স্বস্তি বোধ করি। এমন কি আমার সন্দেহ হয় মনের গহনে ঝোপ্‌ঝাড়ের অন্তরালে এই প্রার্থনাটিও হয়তো আত্মগোপন করিয়া থাকে: "হে ভগবান, এইরূপ অবস্থায় (অথবা পরিস্থিতিতে) আমি যেন কখনো না পড়ি।"

* * * *

এজন্যই পরের দুঃখে কাঁদার চেয়ে পরের আনন্দে হাসা অনেক বেশী কঠিন। নিজে যখন দুঃখে থাকি তখন পরের দুঃখ দেখিলে দুঃখ ভোগের সহযোগী পাইয়া সান্ত্বনার আনন্দ লাভ করি, নিজে যখন সুখে থাকি তখন অন্যকে দুঃখী দেখিলে কি করি তাহা আগেই বলিয়াছি। নিতান্ত ধাপ্পাবাজ অসরল না হইলে একথা স্বীকার করিতেই হয় যে, আমরা সাধারণতঃ অন্যকে নিজের নীচে দেখিতে চাই, সে উঠিয়া আমার সমান হউক অথবা আমার উপরে উঠিয়া যাক ইহা আমরা মনে মনে ঠিক পছন্দ করি না।

উদাহরণ স্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। একবার বহুদিন পর এক স্কুল-জীবনের বন্ধুর সঙ্গে পথে দেখা হইয়া গেল। তৃতীয় শ্রেণী হইতে বিদায় নিয়া সে যে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিল তারপর এই প্রথম দেখা। দেহ জীর্ণশীর্ণ চোখেমুখে হতাশার ছাপ যেন কায়েমী হইয়া বসিয়া গিয়াছে; চেহারা এবং জামা-কাপড়, এই দুয়ের ভিতর কোন্‌টা বেশী মলিন তাহা বিচার করা শক্ত। তবুও দেখিয়াই তাহাকে চিনিলাম। নিজের জীবনটা যে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে শোচনীয়ভাবে তাহার সংক্ষিপ্ততম ইঙ্গিত দিয়াই আমার জীবন সম্বন্ধে সে প্রশ্ন করিল। বন্ধুর অবস্থা চিন্তা করিয়া যথাসাধ্য মুখ কালো করিয়া ঝাপ্‌সা জবাব দিলাম এমনভাবে যেন "জীবনে আর সুখ নাই" ভাবটাই পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ইহাতে কাজ হইল। বন্ধু আমাকে দুঃখ-পথের সাথী মনে করিয়া আনন্দিত মনে আমাকে সহানুভূতি দেখাইল, প্রবোধ দিল, সাহস দিল। এমন কি একরকম টানিতে টানিতেই একটা রেস্তরাঁয় ঢুকাইয়া চাও খাওয়াইয়া দিল তাহার বহু কষ্টে অর্জিত সামান্য পয়সা খরচ করিয়া। কিন্তু এই সময় এক পরিচিত ভদ্রলোক অপ্রত্যাশিতভাবে আসিয়া আমাকে এমন দুই চারিটি কথা বন্ধুটীর সাম্নে বলিলেন যাহাতে বন্ধুটি পরিষ্কার বুঝিয়া ফেলিল আমার অবস্থাটা আর যাহাই হউক তাহার সহানুভূতির অপেক্ষা রাখে না। আমাকে পরম দুঃখী কল্পনা করিয়া যে বন্ধুর হৃদয় আন্তরিক সহানুভূতিতে কাঁদিয়া উঠিবার আনন্দ-গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছিল, সেই বন্ধুই মাত্র অল্প কিছুক্ষণ পরে আমাকে জীবনে সুখী মনে করিয়া করুণ ছলছল চোখে দ্রুত বিদায় নিয়া চলিয়া গেল। পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম আমার সম্বন্ধে ধারণা পরিবর্তন করিতে হওয়ায় সে সুখী হয় নাই, ব্যথিত মনে তাহাকে বিদায় নিতে হইয়াছে। বিদায় মুহূর্তে তাহার মুখের যে বেদনার্ত ভাবটুকু দেখিয়াছিলাম তাহা অবিস্মরণীয় এবং অবর্ণনীয়। মনে হইল ভিতরের সমস্ত কান্না যেন বাহিরে আসিয়া থমকিয়া আছে। কিছুদিন পরে তাহার সেই জমাট অশ্রুর স্মৃতি হইতেই আমি আমার আনন্দের খোরাক্ পাইয়াছিলাম একটি ছোট গল্পের প্লটরূপে।

* * * *

বন্ধু ধনপতির কাছে জনৈক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কাহিনী শুনিয়াছি। কাহিনীটির সত্যাসত্য সম্বন্ধে কোন প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি না। ভদ্রলোক প্রতিদিন ভোরবেলা খবরের কাগজটি হাতে লইয়া প্রথমেই বাছিয়া বাছিয়া করুণ সংবাদগুলি পড়েন, পড়িয়া চোখ এবং মন ভিজাইয়া তারপর অন্যদিকে মন দেন। কাগজে চোখ এবং মন ভিজাইবার খোরাক্ না থাকিলে তাঁহার মন খারাপ হইয়া যায়। তিনি বলেন "রোজ অন্ততঃ মিনিট পনেরো এভাবে চোখের জলে মন ভিজিয়ে না নিলে মনের নরম দিকটা শেষকালে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে যে!"

গভর্নমেন্ট এখন সাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বিতরণ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করছেন

মজুতদারি ও অতিলাভ নিবারণ আইনের জের টেনে সাধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিতরণ নিয়ন্ত্রণের আদেশ পাশ হয়। ১৯৪১ সালের জুলাই মাসে এই আদেশ আইনে পরিণত হয়। এই আদেশের উদ্দেশ্য এই যে কেবল দু'একটি বড় বন্দরে সব বিক্রি না হয়ে যেখানে প্রয়োজন বেশি দ্রব্যাদি যাতে সেখানেও পৌঁছায়।

এই আদেশ অনুসারে—

১। নির্দিষ্ট তালিকাভুক্ত জিনিসগুলির প্রত্যেক আমদানিকারক বিদেশ থেকে যে জিনিস আসবার সম্ভাবনা আছে অথবা এসে পৌঁছেচে সে জিনিস সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ সিভিল সাপ্লাইজ-এর কণ্ট্রোলার জেনারেলের কাছে দাখিল করতে বাধ্য।

২। কণ্ট্রোলার জেনারেলের অনুমতি বা নির্দেশ ছাড়া আমদানিকারক এই সব জিনিস বিক্রি করতে পারবেন না। মাল পৌঁছবার রিপোর্ট দাখিল করার ২১ দিনের মধ্যে কোনো নির্দেশ না পেলে বিক্রি করতে পারবেন।

৩। কেউ এদেশে নির্দিষ্ট তালিকাভুক্ত কোনো জিনিস প্রস্তুত করলে তাকে কণ্ট্রোলার জেনারেলের কাছে উৎপাদনের খরচের এস্টিমেট এবং বিতরণের নির্ধারিত ব্যবস্থার বিবরণ অবশ্য দাখিল করতে হবে।

৪। আভ্যন্তরীণ বিতরণের ব্যবস্থার জন্য কণ্ট্রোলার জেনারেল দেশের সর্বত্র এজেণ্ট নিয়োগ করবেন এবং এই সব জিনিস কেবল তাদের মারফতেই বিক্রি হতে পারবে।

কণ্ট্রোলার জেনারেলের ব্যাপক ক্ষমতা আছে। তিনি এই সংক্রান্ত ব্যবসা সম্পর্কে যে কোনো সংবাদ জানতে চাইলে তা জানাতে হবে এবং তিনি খাতাপত্র ও দলিলাদি পরীক্ষা করতে অথবা সে স্থান সার্চ করতে পারবেন।

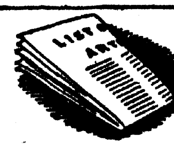
সঠিক বিতরণে ঘাটতি কমে

যুক্তপ্রদেশে মজুতদারি ও অতিলাভ
৮৭ জনের শাস্তি

লক্ষ্ণৌ, ১৭ই অক্টোবর—সেপ্টেম্বর মাসে যুক্তপ্রদেশের ৩২টি জেলায় মজুতদারি ও অতিলাভ (নিবারণ) আইন ভঙ্গ করা সম্পর্কে ১০৯টি মামলার বিচারে ৮৭টি মামলায় আসামীরা শাস্তি পায়। আটানব্বইটি নতুন মামলা দায়ের করা হয়।

সংবাদপত্রে এই ধরণের খবর পড়ুন। প্রতি সপ্তাহে আরও অনেক মজুতদার ও অতিলাভকারীদের সাজা হচ্ছে।

* নির্দিষ্ট তালিকায় এ পর্যন্ত ৩১টি জিনিস ধরা হয়েছে।
সম্পূর্ণ তালিকাটি এই ঠিকানায় পাওয়া যাবে—
ম্যানেজার অব পাব্লিকেশান্স্ সিভিল লাইন্স্, দিল্লী



HOARDING & PROFITEERING
HPPO
PREVENTION ORDINANCE

নিউ দিল্লী থেকে ডিপার্টমেণ্ট অব ইণ্ডাস্ট্রিজ অ্যাণ্ড সিভিল সাপ্লাইজ কর্তৃক প্রচারিত।

AAA 1525

ব্যবসা বাণিজ্য

তূলা উৎপাদন প্রচেষ্টায় বাঙলার স্থান

শ্রীবীরেন্দ্রলাল দাস, ডিপ্-এগ্রি

আজকাল অন্নবস্ত্রের জন্য চারিদিকেই হাহাকার। গত বৎসরের দুর্ভিক্ষের সময়ই এ অভাব বিশেষভাবে প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। অদ্যাবধি আমরা উহার জের টানিয়া চলিয়াছি। যদিও মুদ্রাস্ফীতির সুযোগ মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকই ভোগ করিয়াছে বা করিতেছে, কিন্তু মধ্যবিত্ত এবং চাষী শ্রেণীকে উহা পথে বসাইয়া গিয়াছে। বাঙালী জাতি বিশেষভাবে এই দুই শ্রেণীর লোক লইয়াই সমৃদ্ধ, কিন্তু গত বৎসরের দুর্ভিক্ষে তাহাদের মেরুদণ্ড একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। উহারা আবার কোনদিন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিবে কিনা সন্দেহ।

এবারকার যুদ্ধের বাজারে কি বাঙালী, কি অবাঙালী, কোন মিলের কাপড়ই সুলভে পাইবার সুবিধা নাই। এমন কি সাধারণ তাঁতের কাপড়গুলি পর্যন্ত অন্য সময়ের ৩।৪ গুণ দামে বিক্রয় হইতেছে। ইহার দুইটি কারণ। প্রথমত প্রত্যেক ভারতীয় মিলই সামরিক প্রয়োজন মিটাইয়া অসামরিক লোকদের জন্য অতি অল্পই কাপড় যোগাইতে পারে; আবার দ্বিতীয়ত যাহাও সামান্য পরিমাণে মিল হইতে বাহির হয়, উহাও সঙ্গে সঙ্গে চোরাবাজারে উধাও হইয়া যায়। সুতরাং সাধারণ ক্রেতাকে অনেক বেশী দাম দিয়াই ঐ সকল জিনিস খরিদ করিতে হয়। অন্নের অভাব যদিও ধীরে ধীরে অনেকটা কমিয়া আসিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে, কিন্তু বস্ত্রের অভাব ঘুচিবার কোন লক্ষণই নাই।

ভারতে যত তুলা উৎপন্ন হয় তাহার শতকরা ১৫·৭ ভাগ মধ্যপ্রদেশ ও বেরারে, ১৫·০ ভাগ বোম্বাই প্রদেশে, ১২·১ ভাগ পাঞ্জাবে, ৯·৯ ভাগ মাদ্রাজে, ৩·৭ ভাগ সিন্ধুতে, ২·২ ভাগ যুক্তপ্রদেশে, আর মাত্র ০·২ ভাগ তুলা বাঙলাদেশে উৎপন্ন হয়। বাঙলার ঐ তুলার আবার ১৫/১৬ অংশ ছোট আঁশের পাহাড়ী তুলা। এই তুলা ভারতীয় ২।১টি কাপড়ের কলেও কদাচিৎ ব্যবহৃত হয় কিনা সন্দেহ। কারণ বিশেষ রকমের কাপড়ের কল ভিন্ন সাধারণ কাপড়ের কলে উহা ব্যবহার করা যায় না।

বাঙলা যে বস্ত্রশিল্পে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন পাইয়াছিল, তাহা আজ স্বপ্নে পর্যবসিত হইয়াছে। তার জন্যে যদিও বাঙালী জাতিকে সর্বাংশে দোষী করা চলে না, তবুও তাহারা তাহাদের সেই পূর্ব গৌরব ফিরিয়া পাইতে মোটেই সচেষ্ট হয় নাই। কারণ ভারতের প্রথম কাপড়ের কল বাউরিয়া কটন মিল লিঃ ১৮১৮ সালে বাঙলাদেশেই প্রথম স্থাপিত হয়। যদিও উহা বিদেশীয় লোক দ্বারাই গঠিত হইয়াছিল, তবু উহার গৌরব বাঙলারই প্রাপ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় তারপর হইতে বাঙালীরা এই বস্ত্রশিল্পকে চালু রাখিতে একেবারেই পরাঙ্মুখ হয়। অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহাদের প্রদেশে বহু কাপড়ের কল স্থাপন করে। সেজন্য অদ্যাবধি বস্ত্রশিল্পে বাঙলা অন্যান্য প্রদেশের পিছনে পড়িয়া আছে। তবে একটা সুখের বিষয় এই যে, গত মহাযুদ্ধের সময়েই বাঙালীরা তাহাদের ত্রুটি বিশেষভাবে বুঝিতে পারে এবং কল স্থাপনে সচেষ্ট হয়। তজ্জন্য আজ ভারতে সুতা ও বস্ত্র উৎপাদক হিসাবে বাঙলার মিলগুলি পঞ্চম স্থান অধিকার করে।

বাঙলায় কাপড়ের কল চালাইবার জন্য মূলধন, কয়লা ও শ্রমিকের অভাব নাই। কেবল একমাত্র অভাব মিল চালাইবার উপযোগী লম্বা আঁশের তুলার। ভারতের যে যে প্রদেশে তুলা অধিক উৎপন্ন হয়, সেখানে সে অনুপাতে কাপড়ের কলও যথেষ্ট আছে। কারণ ঐ সকল স্থানের মিল মালিকেরা ঐ তুলার সুযোগ গ্রহণ করিয়া অল্প খরচে কাপড় তৈয়ার করিতে পারে। কিন্তু বাঙলাদেশে এই সুবিধা নাই। যদি বাঙলার চাষীরা যথেষ্ট লম্বা আঁশের তুলা উৎপন্ন করিত, তবে আজ বাঙলার মিলগুলিকে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইত না। বাঙলার মিলগুলিকে বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, পাঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশের তুলার উপরই বহুলাংশে নির্ভর করিতে হয়।

ভারতের মধ্যে পাঞ্জাব, ধারওয়ার ও মাদ্রাজ প্রদেশই লম্বা আঁশের আমেরিকান ও মিশরীয় তুলার আবাদ প্রথম বিস্তৃতভাবে আরম্ভ করে। কিন্তু আজও ভারতীয় মিলগুলি তুলা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হইত পারে নাই। সেজন্য প্রতি বৎসর ভারতীয় মিলগুলিকে কেনিয়া উপনিবেশ, আমেরিকা, মিশর ও টাঙ্গনাইকা প্রদেশ হইতে প্রায় ৮।৯ কোটি টাকার লম্বা আঁশের তুলা আমদানী করিতে হয়।

ব্যবসাক্ষেত্রে ভারতীয় তুলাকে প্রধানত ১৩টি প্রধান ভাগে বিভাগ করা হয়; যথা—(১) বেঙ্গল (Bengals), (২) আমেরিকান (Americans), (৩) সাদার্নস (Southerns), (৪) ওমরা (Omras), (৫) মধ্য ভারত (Central India), (৬) ব্রোচ (Brocah), (৭) ধল্লেরা (Dholleras), (৮) তিন্নেভেল্লি (Tinnevellys), (৯) হায়দরাবাদ গাওরাণী (Hyderabad Gaorani), (১০) সুরতী (Surti), (১১) সালেম (Salems), (১২) কুমিল্লা (Comillas) ও (১৩) বর্মা (Burmas)। উহার মধ্যে প্রথমোক্ত ৪ শ্রেণীর উৎপন্ন তুলার পরিমাণই অধিক। ১৯৪০-৪১ সালে ওমরা ৭০৫০০০ বেল (Bale), আমেরিকান ৬২১০০০ বেল, সাউদার্ন ৩৫৮০০০ বেল এবং বেঙ্গল ৩১০০০০ বেল উৎপন্ন হইয়াছে। (সাধারণতঃ ভারতীয় প্রচলিত বেলকে পরিষ্কৃত বীজছাড়ান তুলার আনুমানিক ৪০০ পাউণ্ড ওজন বলিয়া ধরা হয় কিন্তু উহার সঠিক ওজন ৩৯২ পাউণ্ড)। ভারতীয় যে কোন তুলার দাম নির্ণয় করিতেই ব্রোচ তুলার দামকেই সঠিক (standard) মূল্য ধরিয়া অন্যান্য তুলার মূল্য কম বা বেশী নিরূপণ করা হয়।

বেঙ্গল (Bengals) নামক যে তুলা (Gossipium Nelectum) ব্যবসাক্ষেত্রে প্রচলিত, উহার খুব সামান্য অংশই বাঙলাদেশে উৎপন্ন হয়। এই তুলা কেবল মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, ও বীরভূম জেলায়ই ক্ষেত্রজ কার্পাস (annual field crop) হিসাবে আবাদ করা হয়। এই শ্রেণীর তুলা বেশীর ভাগ যুক্তপ্রদেশ, রাজপুতনা, সিন্ধু (দেশী), এবং পাঞ্জাব (দেশী) প্রদেশেই জন্মে। শুধু পাঞ্জাবেই ৭২৫০০০ বেল (বীজ ছাড়ান) তুলা উৎপন্ন হয়; কিন্তু ইহার আঁশ ৩/৮″—৫/৮″ ইঞ্চির বেশী নহে। উহা দ্বারা ৮—১০ নম্বরের বেশী সরু সুতা তৈয়ার করা যায় না।

"Cotton fibre is spun into hanks of yarn each 840 yds. in length. The number of hanks to the pound is known as the count. The finer the yarn, the higher is the count."

ইহা হইতে বুঝা যায়, তুলার আঁশ যত সূক্ষ্ম ও লম্বা হয়, ততই মিলে উহা হইতে সরু ও মিহি সুতা তৈয়ার করিতে সুবিধা হয়। সেজন্য আজকাল সকল মিলেই বিদেশীয় লম্বা-আঁশের তুলার চাহিদা অধিক। কারণ ভারতের নিজস্ব তুলার

(indigenous) আঁশ কোথাও ২৭/৩২" অধিক লম্বা হয় না। সেজন্য মিলের সরু ও মিহি সূতার জন্য এই তুলা মোটেই উপযোগী নয়।

American Civil War-এর পূর্বে ল্যাঙ্কেসায়ারের কাপড়ের কলগুলি বেশীর ভাগ তুলাই আমেরিকা হইতে আমদানী করিত এবং ভারত হইতেও পর্যাপ্ত তুলা রপ্তানী হইত; কিন্তু ঐ যুদ্ধের সময় হইতে ইংলণ্ডকে ভারতীয় তুলার উপরই বেশীর ভাগ নির্ভর করা ছাড়া অন্য উপায় রহিল না। ভারতীয় তুলা যদিও দামে সস্তা, কিন্তু গুণে উহা নিকৃষ্ট ছিল। সেজন্য ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ ভারতের তুলার কিভাবে উৎকর্ষ সাধন করা যায়, তাহার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হইয়া উঠেন। এতদুদ্দেশ্যে ১৮৪৮ সালে John Bright-এর নেতৃত্বে একটি Select Comittee নিযুক্ত হয়। তাহাদের চেষ্টাতেই ভারতে বিদেশীয় (exotic) তুলার পরীক্ষা বিস্তৃতভাবে আরম্ভ হয়। ইহার পর হইতে যত সরকারী কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেই প্রকাশ যে, ইংরাজেরা এদেশে বিদেশীয় তুলার চাষ প্রবর্তন করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। Mr. J. G. Medlicott-এর "Cotton Hand Book for Bengal" নামক গ্রন্থে এই সকল পরীক্ষার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। East India Company-র সময়েও এই পরীক্ষা করা হইয়াছিল। Campman এবং Dr. Royle-এর বহিতে উহার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। Court of Directors ১৮২৯ সালের চিঠিতে লিখিয়াছেন—

"We have for many years directed our attention to the introduction of foreign kinds of cotton into British India, and lament our failure."

১৮৩৯ সালে কোর্ট অব ডিরেক্টরস পুনরায় ভারতের গভর্নর জেনারেলকে এই তুলার পরীক্ষা পুনরায় আরম্ভ করিবার জন্য অনুরোধ জানান। সুতরাং উক্ত পরীক্ষার জন্য ১৮৪১ সালে ৪ জন আমেরিকান তুলা বিশেষজ্ঞকে ভারতে আনা হয়। বিশিষ্ট তুলা বিশেষজ্ঞ Captain Baylesও তাঁহাদের সঙ্গে ভারতে আসেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাদের এই চেষ্টাও ফলবতী হয় নাই। এই সকল নিষ্ফলতার জন্য ভারতীয় কৃষকদিগকেই বারে বারে দোষী করা হইয়াছে; কিন্তু এই সম্বন্ধে Mr. Medlicott লিখিয়াছেনঃ—

"It could not be expected that foreigners coming from a country at a distance of half the circumference of the globe should make any kind of agriculture a source of profit until they had become acquainted with the seasons, the soils, and other peculiarities of the country. That kind of experience is acquired after years of care and frequent losses, yet the Americans have attempted to introduce into this country, the same system of cotton cultivation which was found to succeed in their own, with a different climate and different soils, while new implements of husbandry were placed in the hands of the labourers."

আবার ঐ সকল তুলা বিশেষজ্ঞদের মধ্যে Mr. Mercer লিখিয়াছেন—

"That the experimental farms were only a useless expense to Government; that the American system was not adapted to India, that the natives of India were, from their knowledge of the climate and capabilities of the soil, able to cultivate better and much more economically than any European."

উহাতেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে যতপ্রকার বিদেশীয় তুলার পরীক্ষা হইয়াছে উহা আমাদের দেশের মাটি ও জলবায়ুর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আবাদ করা হয় নাই। সেজন্য কেহ ঐ পরীক্ষায় সফলকাম হইতে পারেন নাই। ইহার পর Mr. Price ঢাকাতেও ঐ সকল লম্বা আঁশের তুলার পরীক্ষা করিয়া অকৃতকার্য হইয়াছেন। তৎপর তিনি তাঁহার পরীক্ষা-ক্ষেত্র উত্তর বঙ্গ এবং আসামে পরিবর্তন করিয়াও বিশেষ ফল লাভ করেন নাই।

ঐ সকল অকৃতকার্যতার জন্য একদিকে যেমন বিদেশীয় তুলা বিশেষজ্ঞদের এদেশ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাই বিশেষভাবে দায়ী, অপর পক্ষে তথাকার তুলার মূল্যও উহার একটি প্রধান কারণ। ভারতীয় কৃষকদিগের ঐ সকল উৎপন্ন তুলা ৩।৪টি ফড়িয়া ও দালালের হাত ঘুরিয়া কলের মালিকদিগের নিকট পৌঁছিত। সুতরাং কৃষকেরা তুলার দাম বাবদ যৎসামান্য টাকা পাইত। আবার সে সময় ভারতে কাপড়ের কলের সংখ্যাও একেবারে নগণ্য ছিল। এইসব কারণে তুলার চাষ ভারতীয় কৃষকদের নিকট মোটেই লাভজনক ছিল না। তজ্জন্য তাহারা স্বভাবতই তুলার পরিবর্তে অন্যান্য অর্থকরী ফসলের আবাদ করিতে সচেষ্ট হইত।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে এদেশে পুনরায় বিদেশী তুলার পরীক্ষা আরম্ভ করা হয়। এই শেষবারের পরীক্ষা বহুলাংশে সফল হইয়াছে। বর্তমানে ভারতের মধ্যে বিদেশীয় তুলা উৎপাদক হিসাবে পাঞ্জাব প্রদেশই সকলের অগ্রগণ্য। তৎপর, মদ্রাজ ও সিন্ধু প্রদেশের স্থান। দুঃখের বিষয় এই বিষয়ে বাঙলা সকলের পশ্চাতে পড়িয়া আছে। অনেকপ্রকার প্রতিবন্ধক এইজন্য দায়ী। প্রথমতঃ বাঙলা দেশের জলবায়ু ঐ সকল বিদেশীয় তুলার অনুকূল নহে। তদুপরি যে সময় তুলা গাছে জলের দরকার সে সময় জলসেচের ব্যবস্থা নাই। আবার বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টির জল নিষ্কাসনের ব্যবস্থাও নাই। এই জাতীয় তুলা ভারতের যে যে প্রদেশে উৎপন্ন হইতেছে, সেখানে ইহার সুব্যবস্থা আছে এবং প্রায় সর্বত্রই নদীর তীরবর্তী অঞ্চলেই উৎপন্ন হয়। যাঁহারা মনে করেন যে, বাঙলাদেশে লম্বা আঁশের ভাল তুলা উৎপন্ন হইতে পারে না, তাঁহাদের সে ধারণা ভুল। গত কয়েক বৎসর যাবত বঙ্গীয় কৃষি বিভাগ এই বিষয়ে অগ্রণী হইয়া বাঙলার বিভিন্ন জিলায় স্থিতভাবে ঐ সকল লম্বা আঁশের তুলার (Long-staple cotton) পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ পাইয়াছেন যে, বাঙলার কয়েকটি জিলায় বিশেষ করিয়া মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বহরমপুর এবং রংপুর প্রভৃতি জিলায় ঐ তুলা খুব ভাল ভাবে উৎপন্ন হইতে পারে। ঢাকেশ্বরী মিলের হাতায় অদ্যাবধি উহার পরীক্ষা চলিতেছে। তাঁহারাও সুফল পাইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

বাঙলার মাটিতে তুলার চাষ করিতে হইলে ভারতের অন্যান্য স্থানে যে সকল লম্বা আঁশের তুলার বিস্তৃত আবাদ হইয়াছে এবং জলবায়ুসহ হইয়াছে, উহাই বপন করা উচিত। পৃথিবীর মধ্যে যে যে দেশে এই তুলা বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হয়, সেখানের বৃষ্টিপাত গড়ে ৪০" ইঞ্চির অধিক নহে; কিন্তু বাঙলাদেশের বৃষ্টিপাত গড়ে ৩০"—১২৫" ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। বাঙলার অধিকাংশ জেলায় বৃষ্টিপাত অধিক বলিয়া তুলা গাছে নানা প্রকার পোকা ও ছাতা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। আবার বৃষ্টিপাত অধিক হইলে গায়ের ডালপালাই বেশি হয় বলিয়া তুলার ফলন কমিয়া যায়। এই ফসলের অপর একটি প্রতিবন্ধক এই যে, বর্ষার শেষ ভাগেই তুলার ফুল ও গুটি (Boll) হইতে আরম্ভ হয়। ইহার পূর্বে যে সকল কুঁড়ি (Square), ফুল ও গুটি হয়, উহার অধিকাংশই নানাবিধ কারণে, মেঘলা ও বাদলার জন্য, গাছ হইতে ঝরিয়া (Shed) যায়। কৃষিজাত সকল ফসলেরই ফুল আসিবার সময় জমিতে পর্যাপ্ত রসের (moisture) দরকার, কিন্তু বর্ষার শেষে বাঙলার প্রায় সকল জমিই রসশূন্য হইয়া যায়। এবং তখন জলসেচের সুব্যবস্থা করিতে না পারায় ফলন কমিয়া যায়। আবার বাঙলার পক্ষে তুলা একটি নূতন ফসল। উহার চাষ অনেকেই জানে না। সুতরাং কৃষকদিগকে উপযুক্তরূপ শিক্ষা দিতে পারিলে বাঙলাদেশে তুলা জন্মান মোটেই কষ্টকর নহে।

তুলাকে মিশ্র ফসল (Mixed crop) হিসাবে না জন্মাইলে কোনদিনই বিশেষ লাভবান হওয়া যায় না। কারণ এক বিঘা তুলার জমিতে শুধু তুলার চাষ করিয়া যে

লাভ পাওয়া যায়, সেই জমিতে আলু, আখ, তামাক প্রভৃতি অর্থকরী ফসল (economic crop) জন্মাইলে উহা হইতে অধিক লাভ পাওয়া যায়। সেজন্য চীনাবাদাম অথবা ধানকে সচরাচর উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া বপন করা হয়। তাহাতে একদিকে যেমন আগাছা পরিষ্কার করিবার খরচ অনেক কমিয়া যায়, অপর দিকে উহা হইতে যে ফসল পাওয়া যাইবে, তাহাতে অনেক লাভ হয়। আজকাল যদিও ধানের দাম অধিক বলিয়া উহারই চাষ করা সঙ্গত, কিন্তু লাভের হিসাব চাহিলে চীনাবাদামই তুলার সঙ্গে মিশ্রিত ভাবে আবাদ করা উচিত। এই চীনাবাদামের চাষ খরিফ ও রবি, দুই খন্দেই করা চলে। উহার জন্য দুই জাতের চীনাবাদাম আছে। বঙ্গীয় কৃষি বিভাগে দুই জাতের বীজই পাওয়া যায়।

বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের দ্বিতীয় উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ Dr. P. J. Gregory সাহেবের পরিচালনাধীনে গত ১৯৩৮ সাল হইতে বাঙলার বিভিন্ন জেলায় তুলার চাষের যে পরীক্ষা চলিতেছে, উহাতে ভারতীয় জলবায়ুসহ (acclimatized) ৮ রকমের আমেরিকান ও মিশরীয় তুলা শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে; উহারা যথাক্রমে—(১) সি, আইলণ্ড (ঢাকা নং ১), (২) ২৮৯ এফ (ঢাকা নং ২), (৩) কেমবোডিয়া (ঢাকা নং (৩), (৪) পারবনী আমেরিকান (ঢাকা নং ৫), (৫) বুড়ি (ঢাকা নং ৬), (৬) ধারওয়ার আমেরিকান (ঢাকা নং ৭), (৭) কামপালা (ঢাকা নং ৮)। তন্মধ্যে ২৮৯ এফ। (ক-২৫) এবং পারবনী আমেরিকান (Parbani American) তুলাই বাঙলার বেশীর ভাগ জেলাতেই অধিক ফলন (out-turn) দিয়াছে। এই সকল তুলার মধ্যে আঁশে, রঙে ও অন্যান্য গুণে সি, আইলণ্ড তুলাই সর্বোৎকৃষ্ট। উহার আঁশ ১ৼ"—১ৡ" পর্যন্ত লম্বা হয়। তুলা বিশেষজ্ঞদের মত এই যে, সকল বিদেশীয় তুলার আঁশই (staple-length) বাঙলার মাটিতে অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অধিক লম্বা হয়। সুতরাং উক্ত সি আইলণ্ড তুলার আঁশ বাঙলার মাটিতে কোথাও কোথাও ১ৡ" অধিক লম্বা হইয়াছে, কিন্তু বাঙলার জলবায়ুতে বর্ষাকালে এই তুলার গাছ ও গুটিতে 'Anthracnose' নামক একপ্রকার ছাতা রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হয়। সেজন্য এই তুলার বিস্তৃত আবাদ করিয়া বিশেষ সুফল পাওয়া যায় নাই, কিন্তু লেখকের অভিজ্ঞতায় এই কথা বলা যায় যে, ঐ তুলা গাছে চারা অবস্থায় একবার এবং ফুল আসিবার পূর্বে একবার, যদি বোর্দো মিকচার (Bordeaux Mixture) নামক ছাতানাশক ঔষধ পিচকারী (Sprayer) দ্বারা ছিটাইয়া দেওয়া যায়, তবে কোনপ্রকার ছাতারোগের আশঙ্কা থাকে না। বর্ষাকালেই এই রোগ সাধারণত বেশি হয়। বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী দ্বীপগুলিতে এবং সুন্দরবন অঞ্চলে উহার বিস্তৃত আবাদ করিলে নিশ্চয়ই সুফল পাইবার সম্ভাবনা। যদি গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মার চর অঞ্চলে শীতকালে এই তুলার আবাদ করা যায়, তাহা হইলেও বেশ ফলন দিবে।

আজকাল অনেকে হুজুকে মাতিয়া ২।১ কাঠা জমিতে বিদেশীয় তুলার অথবা দেব-কার্পাস নামক গাছ কার্পাসের (Kidney cotton)এর আবাদ করিয়াই মতামত প্রকাশ করেন যে, লম্বা আঁশের তুলা বাঙলার সর্বত্রই সমানভাবে জন্মিতে পারে। কিন্তু তাহাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ ছোট ক্ষেতে (garden scale) এ ফসলের যেরূপ যত্ন ও তত্ত্বাবধান করা যায়, বড় ক্ষেতে (field scale) তাহা কখনও সম্ভবপর হয় না। সেজন্য নানাপ্রকার রোগ ও পোকার আক্রমণ হইতে ফসল রক্ষা করা কষ্টকর। এই কথা যে শুধু তুলার বেলাতেই প্রযোজ্য তাহা নহে, সকল অর্থকরী ফসলের বেলায় ইহা সত্য। সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিতে না পারিলে সি, আইলণ্ড তুলা বাঙলার জলবায়ুতে জন্মান অসম্ভব। সে অনুপাতে ২৮৯ এফ এবং পারবনী আমেরিকান তুলা অধিক বৃষ্টিপাত সহ্য করিতে পারে। এই তুলা মেদিনীপুর জেলার সর্বত্রই সর্বাপেক্ষা অধিক ফলন দিয়াছে।

জলসেচন ও জল নিষ্কাসনের ব্যবস্থা থাকিলে বাঙলাদেশের একমাত্র উঁচু জমিতে শীত ও বর্ষা, উভয় ঋতুতেই তুলা জন্মিতে পারে। তুলা গাছের গোড়ায় বর্ষার জল দাঁড়াইলে গাছ মরিয়া যায়। আবার শীতের সময় জল সেচন করিতে না পারিলেও ফলন মোটেই ভাল হয় না। বর্তমানে বাঙলার নিজস্ব যে তুলা আছে, উহা সমস্তই পাহাড়ী জুমগুলিতে ধানের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া এপ্রিল ও মে মাসে বপন করা হয় এবং অক্টোবর হইতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ঐ তুলা সংগ্রহ করা হয়। বাঙলা দেশে বর্ষায় বিদেশীয় তুলার আবাদ করিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যায় নাই। তাহার কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে। সেজন্য জলসেচনের ব্যবস্থা করিয়া অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে ঐ তুলার বীজ বপন করিতে পারিলে, আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়। আর যদি বর্ষাকালে তুলার আবাদ করিতে হয়, তবে জুন-জুলাই মাসেই বীজ বপন করা সঙ্গত। ঐ সঙ্গে ২।১ বার গাছে বোর্দো মিক্সচার প্রয়োগ করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। একথা সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কি বর্ষা, কি শীত, কোন সময়েই জল সেচন ও নিষ্কাসনের (drainage) ব্যবস্থা না করিয়া বাঙলাদেশে লম্বা আঁশের তুলা জন্মান যায় না।

এক একর জমি আবাদ করিতে ছয় সের হইতে আট সের বীজ দরকার। তবে উহা অনেকাংশে তুলার জাতের উপরই বিশেষ-ভাবে নির্ভর করে। বর্ষায় তুলার আবাদ করিলে গাছের ডালপালা অনেক দূরে জমি বিস্তৃত হইয়া থাকে; কিন্তু শীতের সময় তুলা গাছ ততখানি বড় হইবার সুযোগ পায় না। সেজন্য ঘন করিয়া লাগাইলেও বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা নাই; কেবল বীজের পরিমাণ একটু বেশী লাগে। তুলা চাষীকে সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, তুলা গাছের খুব বেশী বাড়তি হইলে (Vegetative growth) সচরাচর গুটির সংখ্যা খুবই কমিয়া যায়। সুতরাং তাহাকে সর্বদা চেষ্টা করিতে হইবে গাছে কি করিয়া গুটির সংখ্যা অধিক হয়। নতুবা তুলা চাষীর লাভের ভাগ কমিয়া যাইবে। সেজন্য তুলা গাছ খুব বেশী বাড়ন্ত হইলে উহার প্রত্যেক ডগার মাথার কুঁড়িটি (২।৩টি পাতা সহ) ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে হয়। উহাকে Topping বলে।

তুলার চাষের জন্য জমিতে খুব ভালভাবে চাষ দিতে হয়। জমিতে লাঙল দিবার পূর্বে একর প্রতি কমপক্ষে ১০০/ মণ হিসাবে গোবর অথবা অন্যান্য গোশালার আবর্জনা ছড়াইয়া দিয়া অন্তত ৪ বার চাষ ও মই দিতে হয়। রংপুর, ঢাকা, মেদিনীপুর, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানের লাল মাটীতে চাষের পূর্বে একর প্রতি ৩/ মণ হিসাবে চূণ ছড়াইয়া দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। লক্ষ্য রাখিতে হইবে মাটী যেন বেশ ঝরেঝরে ও আলগা হয়। কেমিকেল সার দিতে হইলে বীজ লাগাইবার ২।১ দিন পূর্বে একর প্রতি ১ৼ—১ৡ মণ নিসিফস্ (Nicifos grade 2) জমিতে ছড়াইয়া চাষ দিতে হয়। তুলা বীজ সর্বত্রই লাইন করিয়া লাগান হয়। মাটীর তেজ অনুসারে ৩'—৫' ফুট দূরে দূরে লাইন করিয়া ঐ লাইনে ২'—২ৡ' ফুট দূরে বীজ লাগাইতে হয়। লাইন করার কাজটি দেশী হাত লাঙল অথবা আমেরিকান প্লেনেট জুনিয়ার হো (Planet Jr. Hand Hoe) দ্বারা সহজেই সম্পাদন করা যায়। একজন লোক ১ৡ"—২" ইঞ্চি গভীর করিয়া ঐরূপে লাইন করিয়া গেলে অপর একজন লোক তাহার পেছনে পেছনে উহার মধ্যে আনুমাণিক দূরত্ব ঠিক রাখিয়া বীজ বুনিয়া যাইতে পারে। আর একজন লোক সঙ্গে সঙ্গে ঐ লাইন ঢাকিয়া দিয়া যাইবে। সুতরাং ৩জন লোক (১জন পুরুষ ও ২জন স্ত্রীলোক) বীজ বুনার কাজ সহজেই সম্পন্ন করিতে পারে। মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশে Seed drill নামক যন্ত্র দ্বারা এই কাজ সম্পন্ন করা

হয়। সুতরাং উহাতে খরচ অনেক কম হয়।

একপ্রকার খুব ছোট আঁশ অধিকাংশ তুলার বীজের গায়ে লাগান থাকে, উহাকে fuzz বলে। ঐ আঁশ আটকান থাকে বলিয়া তুলার বীজগুলি পরস্পর জড়াইয়া যায়। সেজন্য তুলার বীজগুলিকে বুনিবার পূর্বে টাটকা গোবর দিয়া খুব ভালভাবে ঘষিয়া লইতে হয়। তাহাতে বীজগুলি বেশ ঝুরঝুরে হয় এবং বুনিতেও বেশ সুবিধা। আবার সংক্রামক ব্যাধির হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য প্রতিষেধক হিসাবে বীজগুলিকে গোবর মাখাইবার পূর্বে তুঁতের জলে (১½ মণ জলে ১ পোয়া তুঁতে (Copper Sulphate) ৫।৭ মিনিটকাল ডুবাইয়া পরে শুকাইয়া নেওয়া উচিত। বীজগুলিকে গোবর মাখাইয়া বুনিলে একদিকে যেমন বুনিতে সুবিধা হয়, আবার ঐ গোবর নূতন চারার সারের কাজ করে, গোবর অভাবে ছাই বা মাটী দিয়াও ঘষিয়া নেওয়া চলে। এক এক স্থানে ৪।৫টি করিয়া বীজ দিতে হয়। ৪।৫ দিনের মধ্যেই সমস্ত বীজ অঙ্কুরিত হইয়া যায়। তৎপর গাছ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে রুগ্ন ও নিস্তেজ গাছগুলি উঠাইয়া ফেলিতে হয়। বিস্তীর্ণ চাষে (Big plantation) যদি লাইনের মধ্যে ৯″—১′ ফুট দূরে দূরে বীজ বপন করা যায়, তবে বীজের পরিমাণ অধিক লাগে, কিন্তু লাইনের গাছ মরিয়া গেলে আবার ভর্তি করিবার দরকার হয় না। কেবল ২।১ বার গাছগুলি মাঝে মাঝে উঠাইয়া ফেলিয়া পাতলা করিয়া দিতে হয়।

বীজ বুনিবার ২০।২৫ দিন পরেই জমিতে অনেক আগাছার প্রাদুর্ভাব হয়। তখনই দুই লাইনের মাঝে Planet Jr. Hand Hoe নামক যন্ত্র চালাইয়া একদিকে যেমন আগাছা ধ্বংস করার কাজ হয়, অপরদিকে মাটীও বেশ আলগা হইয়া যায়। আগাছা পরিষ্কার করিয়া তখনই গাছের গোড়ায় একর প্রতি ২/ মণ হিসাবে হাড়ের গুঁড়া (Bone meal) ছড়াইয়া দিতে হয় এবং ঐ Hand hoe দ্বারাই গাছের গোড়ায় মাটী দেওয়ার কাজ করাও চলে। যেখানে হাড়ের গুঁড়া পাওয়া যায় না, সেখানে শুকনা মাছের গুঁড়া (dry fish powder) একর প্রতি ২/ মণ হিসাবে প্রয়োগ করিলে অত্যন্ত ভাল ফল পাওয়া যায়। কারণ হাড়ের গুঁড়া গুঁড়া এবং শুঁটকী মাছের গুঁড়ায় পর্যাপ্ত ফস্ফরাস (Phosphorus) থাকায় তুলা গাছে গুটির (Boll) সংখ্যা খুবই বেশী হয়। বর্ষাকালে এই সার দেওয়ার পর যদিও জল সেচনের দরকার হয় না, কিন্তু শীতের সময় যে কোন সার দেওয়ার পরই জমিতে জল সেচনের ব্যবস্থা করিতে হয়।

তুলা গাছের গোড়ায় মাটী দেওয়ার পর প্রত্যেক লাইনের ফাঁকে ফাঁকে চীনাবাদাম খোসা ছাড়াইয়া সুবিধামত দুই লাইন করিয়া লাগাইয়া দিতে হয়। উহা যেমন লাভজনক ফসল, আবার উহা ক্ষেতের আগাছাও দাবাইয়া রাখে। এইভাবে বীজ বুনিলে একর প্রতি ১/—১½ মণ চীনাবাদাম (খোসা-সমেত) দরকার হইবে। ৩।৪ দিনের মধ্যেই সমস্ত চীনাবাদাম অঙ্কুরিত হয়। ঐ চীনাবাদাম গাছের দুইবারের বেশি মাটি আলগা (mulching) করার দরকার হয় না। শীতের সময় জলসেচনের ২।১ দিন পর মাটির জো বুঝিয়া মাটি আলগা করিয়া দিতে হয়। ৬।৭ মাসের মধ্যেই গুটি ফাটিয়া তুলা বাহির হয়। সকালে ও বিকালে ঠাণ্ডার সময় তুলা উঠাইতে হয়। তুলা উঠাইবার কাজ স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকারা সহজে করিতে পারে। তুলা খুব পরিষ্কার ভাবে উঠাইতে হয়। কারণ তুলার মধ্যে শুকনা পাতা ও অন্যান্য ময়লা মিশ্রিত থাকিলে বাজারে তুলার দাম কমিয়া যায়। এই ভাবে যত্নের সঙ্গে তুলা উঠাইলে যদিও খরচ একটু বেশি হয়, কিন্তু দামে উহা পোষাইয়া যায়। তুলার মধ্যে রৌদ্র ও শিশির লাগিবার সুযোগ দিতে নাই। উহাতে তুলার রং খারাপ হইয়া যায়। তুলা উঠাইবার পর উহাদিগকে ছায়ার মধ্যে ছড়াইয়া রাখিতে হয়। উহাতে তুলার রং উজ্জ্বল ও চকচকে (Bright and glossy) হয়। তিনবারের বেশি সাধারণত তুলা উঠাইবার দরকার হয় না। তুলার গুটি ফাটিবার পূর্বেই চীনাবাদাম পরিপক্ক হইয়া মরিতে আরম্ভ হয়। তখন কাঁটা কোদাল (fork spade) দ্বারা উহা উঠাইয়া নিয়া, আর একবার জলসেচনের ব্যবস্থা করিতে হয়।

ভারতবর্ষে সাধারণত তুলার ফলন কম। প্রতি একরে আমেরিকায় গড়ে ৬৬০ পাউণ্ড, মিশরে ১৩৮০ পাউণ্ড এবং ভারতে মাত্র ৩০০ পাউণ্ড কার্পাস তুলা (Seed cotton) উৎপন্ন হয়। কিন্তু যথেষ্ট যত্ন ও চেষ্টা করিলে একর প্রতি ৬/০—৮/০ কার্পাস স্বচ্ছন্দে আশা করা যাইতে পারে। তৎসহ কমপক্ষে ১৮/—২০/ মণ চীনাবাদাম পাওয়া যাইবে। লম্বা আঁশের কার্পাসে বীজ ও তুলার (seed and lint)-এর অনুপাত সাধারণত ২ঃ১ অর্থাৎ যত ওজনের কার্পাস হইবে উহার ২ ভাগ বীজ ও ১ ভাগ তুলা পাওয়া যায়। এই সকল লম্বা আঁশের তুলার বীজ আমাদের দেশীয় চরকী নামক কাঠের যন্ত্র দ্বারা ছাড়ান বেশ কষ্টকর। আবার খরচও অধিক হয়। সেজন্য যাহারা ৪।৫ শত একর জমিতে বিস্তীর্ণভাবে তুলার আবাদ করিতে চান, তাঁহারা তাঁহাদের আবাদের মধ্যে একটি ছোটখাট বীজ ছাড়ান ও গাঁট-বাধা কল (Ginning & Pressing factory) রাখা দরকার। নতুবা এই সব কার্পাস চালান দেওয়া অত্যন্ত অসুবিধাজনক।

উপরোক্তরূপে তুলার চাষ করিলে আখ, তামাক, আলু প্রভৃতি ফসল হইতেও অধিক লাভ হয়। নিম্নে এক একর জমির আয়-ব্যয়ের হিসাব দেওয়া গেলঃ—

খরচঃ—

৪ বার লাঙ্গল ও মই দেওয়া ...	৫৷৷০
গোবর, চূণ, হাড়ের গুঁড়া	
(শুঁটকী মাছের গুঁড়া) ...	৩৫৲
/৮ সের তুলা বীজ ও গোবর মাখান ও	
তুঁতের জলে ভিজাইবার খরচ ...	১৷৷০
১৷০ সের চীনাবাদাম বীজ ...	২০৲
তুলা বীজ লাগান ...	৪৲
চীনাবাদাম, খোসা ছাড়ান ও লাগান ...	৪৲
হো দেওয়া, আগাছা বাছা ও গাছ	
পাতলা করা ...	১৭৲
৩ বার জল সেচন ...	১৫৲
চীনাবাদাম ও ৩ বার তুলা উঠান ...	২০৲
চীনাবাদাম শুখান ...	৷৷০
তুলার বীজ ছাড়ান ...	৬৲
জমির খাজনা ...	৩৷৷০
মোট	১৩২৲

লাভঃ—

তুলা ২/ মণ ৬০৲ হিসাবে ...	১২০৲
বীজ ৪/ মণ ৫৲ হিসাবে ...	২০৲
চীনাবাদাম ১৮/ মণ ১৫৲ টাকা	
হিসাবে ...	২৭০৲
মোট ...	৪১০৲

সুতরাং একর প্রতি খরচ বাদ যাইয়াও ২৭৮৲ টাকা মোট লাভ থাকিবে। ইহা অন্যান্য ফসলের তুলনায় মোটেই কম নহে। সেজন্য আজকাল লম্বা আঁশের তুলার আবাদ করিলে একদিকে যেমন মোটা লাভ পাওয়া যাইবে, অপর পক্ষে বাঙলার মিলগুলিকে আর অন্যান্য প্রদেশের তুলার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে না। যাঁহারা এই তুলার আবাদ করিতে ইচ্ছা করেন, আমি তাঁহাদিগকে তুলার বীজের জন্য বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের দ্বিতীয় উদ্ভিদতত্ত্ববিদের নিকট (পোঃ তেজগাঁও, ঢাকা) খোঁজ করিতে অনুরোধ করি। লেখকও এ বিষয়ে সানন্দে সাহায্য করিতে রাজী আছেন।

ট্রামে-বাসে

মুসলিম লীগের সেক্রটারী নবাব লিয়াকৎ আলী যখন মাদ্রাজ যাইতেছিলেন, তখন পথে ওয়ার্ধা স্টেশনে তাঁহাকে শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাইর সঙ্গে তাঁর আলোচনার কথা জিজ্ঞাসা করা হয়। উত্তরে সেক্রেটারী সাহেব দেশাইর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎকারের উপর কোন রাজনৈতিক গুরুত্ব আরোপ করিতে মানা করেন। এই প্রসঙ্গে বড়লাট সাহেবের সঙ্গে কায়েদে আজমের সাক্ষাতের কথাও মনে পড়িয়া গেল। এই ক্ষেত্রেও কোন রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল না বলিয়া লাট সাহেব ঘোষণা করিয়াছিলেন। বিশু খুড়ো বলিলেন —"তবে কি আমরা বুঝব যে, লীগপন্থী কারু সঙ্গে কোন আলোচনারই কোন রাজনৈতিক মূল্য নেই?" আমরা জবাব দিতে পারিলাম না।

* * * *

আমেদাবাদে মুসলমান ছাত্র সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়া কায়েদে আজম ভারতের আভ্যন্তরীণ বিরোধের সঙ্গে পিঠা লইয়া দুই বিড়ালের ঝগড়া এবং তারপর বাঁদরের মধ্যস্থতার তুলনা দিয়াছেন। শ্রোতারা কায়েদে আজমের মুখনিসৃত (সুস্পষ্ট কারণে "শ্রীমুখ" বলিতে পারিলাম না) এই তুলনা শ্রবণ করিয়া নিশ্চয়ই পুলকে গদগদ হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু পিঠাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করিবার মৎলব কোন্ বিড়ালটি দিয়া-



ছিল গল্পে তার কোন উল্লেখ নাই বলিয়াই শুধু চাকচিক্যে তুলনাটা উৎড়াইয়া গেল, নইলে দেখা যাইত এই উক্তিরও কোন রাজনৈতিক গুরুত্ব নাই। তবে, স্বীকার করিতেই হইবে যে, বিড়ালের ভাগ্যেও শিকা ছিঁড়ে! লীগপন্থীরা হয়ত সেই সুদিনের দিকে তাকাইয়া আছেন।

* * *

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কংগ্রেসে যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাকে মন্দিরের উপাসনা বলিলেও ভুল হয় না। পরমপিতা পরমেশ্বরের নিকট ভালভাবে পথ চলিবার নির্দেশ প্রার্থনা করিয়া প্রেসিডেন্ট বলিয়াছেন—"আমাদের নিজেদের উন্নতি নির্ভর করিতেছে দূর দেশস্থ অন্যান্য জাতির উন্নতির উপর। আমরা সমগ্র পৃথিবীবাসী মানবদলেরই অন্তর্ভুক্ত। পরস্পরের উপর বিশ্বাস, সাহস ও নির্ভরতাই শান্তির ভিত্তি



স্বরূপ।"—বক্তৃতা শুনিয়া আমরাও অবিচলিত শ্রদ্ধায় গদগদ হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু বাদ সাধিলেন বিশুখুড়ো। একটি পাল্টা বক্তৃতায় তিনি আবার বুঝাইয়া দিলেন যে, ভারত ভূখণ্ডে যাহারা বাস করে, তাহারা পৃথিবীবাসী মানব দল নয়—তাহারা শুধুই ভারতবাসী নামে খ্যাত! সুতরাং ভো ভো ভারতবাসী তোমরা—আনন্দে আত্মহারা হইও না। তোমাদের "বিজয়লক্ষ্মী" এই—"পরস্পরের উপর বিশ্বাসের" ফলে এখনও আমেরিকার "শ্বেতালয়ের" ত্রিসীমানায় ঘেঁষিতে পারিতেছেন না!

* * *

মানুষ যাহাতে দেড়শত হইতে দুইশত বৎসর পর্যন্ত বাঁচিতে পারে, তাহারই পন্থা আবিষ্কারের জন্য বৃটিশ বৈজ্ঞানিকগণ নাকি গবেষণা করিতেছেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যকে দেড়শত হইতে দুইশত বৎসর কি করিয়া বাঁচাইয়া রাখা যায়, বৃটিশ বৈজ্ঞানিকগণ এতদিন সেই গবেষণাই করিয়া আসিয়াছেন। এইবারে এতদিনে মানুষকে বাঁচাইবার গবেষণায় হাত দিয়াছেন। আমরা ট্রামবাসের যাত্রীরা সাধারণতই অবৈজ্ঞানিক, সুতরাং এ সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞান। দুইশত বৎসর পর্যন্ত মানুষ কি করিয়া বাঁচিতে পারে, তা আমাদের ধারণার বাইরে। তবে দুর্ভিক্ষের



সময় মানুষের খাদ্যসম্ভার গুদামজাত করিয়া না পচাইয়া সাধারণের মধ্যে তা যথারীতি বণ্টনের ব্যবস্থা করিয়া দিলে অকাল এবং অপঘাত মৃত্যু এত সহজে হয় না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস! জানি না এ সম্বন্ধে বৃটিশ বৈজ্ঞানিকগণের কি অভিমত।

* * *

জনৈক আমেরিকাবাসী সৈন্য নাকি নাক-ডাকায় রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছেন। তাঁর নাসিকা গর্জনে অন্তত দুইশত সৈন্যের এককালে ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। সংবাদটি সেন্সারের কবল কি করিয়া মুক্ত হইল তাই ভাবিতেছি। ইঁহাদের যুদ্ধ করিতে আসিয়া কি নাকে তেল দিয়া ঘুমাইতেছেন? কিন্তু সে যাহা হউক, বড়দের কথায় আমরা থাকিতে চাই না। তবে যাঁরা এই সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন, তাঁহাদের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, নিদ্রা এবং নাসিকা-গর্জনে ভারতবাসীর কৃতিত্ব এখনও কোন জাতি ছাপাইয়া যাইতে পারে নাই।

* * *

রঞ্জি ট্রফি প্রতিযোগিতায় বাঙলা দল ইন্দোরের সঙ্গে খেলিয়া প্রথম ইনিংসে মাত্র ৬৪ রাণ করিয়া আউট হইয়া যায়, আর ইন্দোর করে ৫৩৮। সি কে নাইডু ঠিক কথাই বলিয়াছিলেন—"বাঙলার খেলোয়াড়রা যেন মনে না করেন যে, তাঁহারা মস্ত বড় হইয়া গিয়াছেন।" নাইডুর উপর অভিমান না করিয়া তাঁহারা সত্যিকারের বড় হইতে চেষ্টা করিবেন বলিয়াই আশা করিতেছি। তবে বাঙলা দেশে আসিয়া এত ডিনার, এত টী আর এত আদর আপ্যায়ন পাইয়া পরে নিজের ঘরে ডাকিয়া নিয়া গিয়া এমন করিয়া হারাইয়া না দিলেও নাইডু পারিতেন! যাহা হউক, শুনিলাম ইন্দোরের হোলকার মোহন-বাগানের পৃষ্ঠপোষক ও Life member হইয়াছেন। এই Consolation Prize লইয়াই আপাতত আমরা বাঁচিয়া গেলাম!

বিজ্ঞানের খুচরা খবর

শক্তিশালী ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক যন্ত্র ঠাণ্ডা রাখার ব্যবস্থা

মার্কিন পেটেণ্ট আফিস হইতে ক্ষুদ্র অথচ শক্তিশালী মোটরের একটি নমুনা বাহির করা হইয়াছে। এই মোটরটির দৈর্ঘ্য ৬·৭৫ ইঞ্চি, ব্যাস ২ ইঞ্চি এবং ওজন প্রায় ৪ পাউণ্ড, কিন্তু মিনিটে ১৮ হাজারবার ঘূর্ণনে ইহাতে ৪ অশ্ব-শক্তি বিশিষ্ট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। আয়তনের তুলনায় বেশী তাড়িত-উৎপাদনের জন্য ইহা এত শীঘ্র গরম হইয়া পড়ে যে, কয়েক মিনিটের মধ্যেই ইহা পুড়িয়া যাইতে পারে। ভাল বিদ্যুৎবাহক বলিয়া মোটরের কাঠামোটা ঢালাই রূপার তৈয়ারী, ইহার ভিতরে ফ্রিয়ন নামক রাসায়নিক দ্রব্য ভরিয়া ইহাকে ঠাণ্ডা রাখা হয়। ফ্রিয়ন রেফ্রিজারেটারে এবং এরোসোন-বোমায় কীটপতঙ্গনাশক দ্রব্যের বাহনরূপে ব্যবহৃত হয়।

ইলেকট্রনের আণুবীক্ষণিক ছবি তোলার সূক্ষ্মতম ফিল্ম

ওয়াশিংটনস্থিত জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানীতে ইলেকট্রনের আণুবীক্ষণিক ছবি তোলার সূক্ষ্মতম ফিল্মের পাত তৈয়ারী হইয়াছে। এ পর্যন্ত এরূপ সূক্ষ্ম পাত আর তৈয়ারি হয় নাই। ইহার বেধ এক ইঞ্চির ২০ লক্ষ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ দশটি "এটম" বা অণুর সমান মাত্র। যে জিনিস দিয়া এই পাত তৈয়ারি, উহা গলিত অবস্থায় ধাতব বস্তুর সমতল উপরিভাগে ঢালিয়া দেওয়া হয় তখন গলিত বস্তুর প্রায় সবটাই চুয়াইয়া পড়িয়া যায়। যেটুকু লাগিয়া থাকে, উহা শুকাইলে এত পাতলা হইয়া যায় যে, উহা সহসা দৃষ্টি-গোচর হয় না।

তীব্র রাসায়নিক দ্রব্য-রোধক নূতন কাচ

আমেরিকান অপ্‌টিক্যাল কোম্পানী একরকম নূতন কাচ আবিষ্কার করিয়াছে। ইহাতে হাইড্রোক্লোরিক এসিড রাখিলেও কাচের কোন ক্ষতি হইবে না। ল্যাবরেটরীর বাসনপত্র, এসিডের আধার, সেফটি গগল্‌স্‌ ও অন্যান্য জিনিসপত্র নির্মাণে এই কাচ ব্যবহার করা যাইবে। এই নূতন কাচে বালুকা নাই। ফস্‌ফরাস্‌ পেণ্টকসাইড ইহার প্রধান উপাদান।।

বোমা ছাড়ার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র

ব্রিটেনের কোন উড়ন্ত কেল্লা বিমানঘাঁটির প্রধান অস্ত্র-নির্মাতা মাস্টার সার্জেন ওয়েক্‌ল্‌ এম ওসিনস্কি বিমান হইতে বোমা নিক্ষেপের একটি বিদ্যুৎ-চালিত স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার দ্বারা উচ্চ আকাশ হইতে বোমা নিক্ষেপে এখন আর মানুষের হাত লাগাইবার দরকার হইবে না। ৪০১নং বোমারু গ্রুপে এই যন্ত্রটি প্রথমত ব্যবহার করিয়া দেখা গিয়াছে যে, অভ্রান্তভাবে লক্ষ্যভেদে ইহা অদ্বিতীয়। এই সাফল্যের পর ঘাঁটির সমস্ত বিমানে এই যন্ত্রটি ব্যবহার করার আদেশ দেওয়া হয়। যখন বোমা ছাড়ার দৃষ্টি-যন্ত্র এবং লক্ষ্যবস্তুকে সমসূত্রে দেখা যায়, তখন এই নবাবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে বোমা আপনা হইতেই লক্ষ্যবস্তুর দিকে ছুটিয়া যায়, মানুষের হাত লাগাইবার দরকার করে না। পূর্বে বোমা নিক্ষেপকারীকে লক্ষ্য স্থির করিয়া পরে "Hand Lever" বা হস্তচালিত দণ্ডের সাহায্যে বোমা ছাড়িতে হইত। এখন তাহাকে কেবল লক্ষ্যস্থির করায় মনোনিবেশ করিলেই চলিবে। (মার্কিন-বার্তা)

পুস্তক পরিচয়

শ্রীগীতায় গুরুতত্ত্ব—স্বামী সচ্চিদানন্দ গিরি প্রকাশক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, ১নং ডোভার লেন, বালীগঞ্জ, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

গ্রন্থকার স্বর্গীয় স্বামী সচ্চিদানন্দ গিরি ভোলাগিরি মহারাজের শিষ্য ছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থকার আত্মসমর্পণের দিকটাই দেখাইতে চাহিয়াছেন এবং গীতার ভিতর দিয়া গুরুতত্ত্বকে উদ্দীপ্ত করিয়াছেন। তাঁহার মর্মস্পর্শী লেখার মধ্যে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি এই তিনের সমন্বয়ের একটি ধারা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

ঋতম্ভরা—শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণের অপরাজিতা ব্রহ্মবিদ্যা, অব্যয় আত্মদর্শন বা সত্যপাদ; শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীকুমুদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, উপনিষৎ রহস্য কার্যালয়, হাওড়া, মূল্য তিন টাকা।

শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ দেবশর্মার ঋতম্ভরা বাঙলার অধ্যাত্মরসপিপাসু সমাজের অনেকের নিকট সুপরিচিত গ্রন্থ। আমরা এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ পাঠ করিয়া পরম উপকৃত হইয়াছি। উপনিষদে যে সাধনা নির্দেশিত হইয়াছে, অধ্যাত্ম-বিদ্যার তাহাই চরম সীমা, এ সম্বন্ধে কোনরূপ দ্বিমত নাই। ঋষিদের সেই পুরাতন অথচ নিত্য-নূতন এবং সেই হিসাবে সনাতন সাধনার গূঢ় রহস্য সকলের নিকট উন্মুক্ত নহে, তাহা সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করিবার বিষয়। আলোচ্য গ্রন্থে সত্য-প্রতিষ্ঠা, প্রাণ-প্রতিষ্ঠা এবং মন্ত্রচৈতন্য এই কয়েকটি সন্দর্ভে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। উপনিষৎ সম্বন্ধে আলোচনা অনেক ক্ষেত্রেই দুরধিগম্য হইয়া থাকে; মামুলীভাবে মায়াবাদের কতকগুলি জটিল পরিভাষার অবতারণা করিয়া প্রতিপাদ্য বিষয়টি এমন দুরূহ করিয়া তোলা হয় যে, তৎসম্বন্ধে কোনরূপ ধারণা করাই কঠিন হইয়া পড়ে, প্রত্যয় তো দূরের কথা। ঋতম্ভরার আলোচনায় এই ধরণের অস্পষ্টতা বা দুর্জ্ঞেয়তা নাই। অপরোক্ষ প্রজ্ঞাবল বা আত্মানুভূতির অখণ্ড আলোকে এই আলোচনা আদ্যোপান্ত উজ্জ্বল এবং তাহা যেমন হেতুমৎ, তেমনই বিনিশ্চিত। গ্রন্থকার সত্যকে সোজাসুজি দেখিয়াছেন এবং দেখিয়া বা সাক্ষাৎ সম্পর্কে উপলব্ধি করিয়া তবে বলিয়াছেন। তিনি নিন্দাস্তুতি নিরপেক্ষভাবে সত্যের নির্দেশ করিয়াছেন। কাহারও মুখ চাহিয়া কথা বলেন নাই, সত্যের দিকেই চাহিয়াছেন; এজন্য ঋতম্ভরার সমগ্র আলোচনার কোথায়ও আমরা কোন সাম্প্রদায়িকতার রেখাপাত দেখিতে পাই না। বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ এবং পুরাণের অন্তর্নিহিত সত্য সমন্বয়-সূত্রে প্রোজ্জ্বলভাবে এ আলোচনার ভিতর দিয়া ফুটিয়াছে। শ্রুতির মহিমা কীর্তন করিতে গিয়া এখানে পুরাণকে উপেক্ষিত করা হয় নাই; পক্ষান্তরে শ্রুতিই যে পুরাণে পুষ্পিত এবং পল্লবিত হইয়াছে, এই সত্যই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এই দিক হইতে এ আলোচনায় সগুণ, নির্গুণ, শাক্তবৈষ্ণব, যিনি যেমন ধারা ধরিয়া সাধনার পথে চলুন না কেন, সকলেই অনুপ্রেরণা লাভ করিবেন। শুধু ইহাই নয়, ঋতম্ভরা মানুষের জীবনকে সমগ্র এবং অখণ্ডভাবে দেখাইয়াছে; সুতরাং সেক্ষেত্রে ধর্ম বিশ্বজনীন। মানবের জীবন মূলে অখণ্ড সত্যকে উপলব্ধির পথে এই আলোচনার আলোকে বিশ্বও সত্য রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং মায়াবাদ খণ্ডিত হইয়াছে। বিশ্ব এবং বিশ্বাতীত সবই যেখানে সত্য, সেখানে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—এ বিবর্তবাদ টিকে না। এ দৃষ্টিতে ব্রহ্মও সত্য, অপর 'সেই ব্রহ্মে জন্মে বিশ্ব, ব্রহ্মেতে জীবয়, সেই ব্রহ্মে পুনরায় হয়ে যায় লয়,' শ্রীমৎ মহাপ্রভুর উক্তি অনুসারে, এ জগৎ "সর্ব যজ্ঞময় মোর অঙ্গ এ পবিত্র" সেইরূপ সত্য হইয়া দাঁড়ায়। প্রকৃতপক্ষে উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব এবং আচার্য শঙ্করের 'ব্রহ্ম' সিদ্ধান্ত এতদুভয়ের মধ্যে এইখানে বড় একটা পার্থক্য রহিয়াছে। ঋতম্ভরায় ঋষি-প্রদর্শিত পূর্ণ সত্যকেই আমরা অশেষে এবং বিশেষে এ বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। এ আলোচনার বিশেষত্ব হইল ইহার প্রাণ-পূর্ণতা—গভীর অনুভূতির পরম বলে এই আলোচনা সহজ, সরল এবং সুমধুর। এ সম্পর্কে মহাভারতের সনৎসুজাতের একটি উক্তি আমাদের মনে পড়ে। তিনি বলিয়াছেন, সত্যকে আশ্রয় করিলে আর যুক্তিজালে বাক্যকে জটিল করার প্রয়োজন হয় না, সেই সত্যের মূল হইতে রস উচ্ছ্বসিত হইয়া উক্তিকে সরস এবং সরল করিয়া দেয়। ঋতম্ভরায় পাণ্ডিত্য আছে, বিচার আছে; কিন্তু সাধক-জীবনে সেগুলি খুব বড় জিনিস নয়। এই আলোচনায় প্রত্যক্ষানুভূতির আলোক আছে এবং তাহাই ঋত বা সত্য। ঋতম্ভরায় নির্দেশিত এই ঋত বাঙলার ঘরে ঘরে অমৃত বিতরণ করুক। ঋতম্ভরার ভাষায় আমরাও বলি—যে জাতি, যে ধর্মী, যে সম্প্রদায়ভুক্ত হও, সত্যের সন্ধানে বাহির হও, শুধু সংস্কারের বোঝা নৌকার কানায় কানায় ভরিয়া জীবনপ্রবাহের জোয়ার-ভাঁটায় এদিক ওদিক করিয়া বেলা বহাইয়া দিও না। শুধু এপারের দিকে চোখ রাখিয়া পথে দাঁড়াইয়া, সাঁতারের নামে হাত-পা সঞ্চালন করিও না—একটানায় ঝাঁপাইয়া পড়, সংস্কারের খুঁটো উপড়াইয়া ফেল।" এই গ্রন্থের যত প্রচার হয়, ততই ভাল। ছাপা ও বাঁধাই এবং কাগজ সবই সুন্দর এবং অনিন্দনীয়।

ধনতন্ত্র ও উপনিবেশ—শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী প্রণীত। মূল্য চারি আনা। শিল্পসম্পদ প্রকাশনী; ৩ নং ম্যাঙ্গো লেন কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

যে বিষয়বস্তুকে ভিত্তি করিয়া পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে, তাহা বর্তমানে অর্থনীতির একটি জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। এই যুদ্ধে যে সব উপনিবেশ তাহাদের পূর্ব-প্রভুর হাতছাড়া হইয়াছে এবং যাহারা স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রাম করিতেছে, যুদ্ধোত্তরকালে তাহাদের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইতে পারে, এই পুস্তকে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। আমাদের মত পরাধীন জাতির পক্ষে পুস্তকখানিতে অনেক ভাবিবার বিষয় আছে।

যুক্তধারা (উপন্যাস) পশুপতি ভট্টাচার্য; প্রকাশক—ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, **কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে চার টাকা।**

লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। ইতিপূর্বে অনুবাদ-সাহিত্যে এবং মৌলিক রচনার ক্ষেত্রে তাঁহার সাবলীল লিপিকুশলতা সুধীজনের সমাদর লাভ করিয়াছে এবং সাধারণ্যে স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব পাঠক পাঠিকার কাছে নূতন করিয়া তাঁহার পরিচয় দিবার আবশ্যক নেই।

আলোচ্য গ্রন্থখানি উপন্যাস। বাঙলা সাহিত্যে ঠিক এই ধরণের বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া আর কেহ উপন্যাস রচনা করিয়াছেন কিনা, জানা নাই। এত সূক্ষ্ম রসবস্তুকে আশ্রয় করিয়া এত বড় একখানি রসোত্তীর্ণ উপন্যাস রচনা করা লেখকের পক্ষে কম কৃতিত্বের কথা নয়।

বহুবিধ চরিত্রকে আশ্রয় করিয়া, বহুতর ঘটনার দুর্গম পথ দিয়া দুইটি হৃদয়ের প্রণয়-যাত্রার কাহিনীই হইল মূল উপন্যাসের কাহিনী। কিন্তু এই ঘটনাটুকুই সাহিত্যিকের শিল্পদৃষ্টিতে অদ্ভুতরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। একটির পর একটি কমলদল খুলিয়া যেমন পদ্মের অন্তরের সন্ধান পাওয়া যায়, গ্রন্থকার ঠিক তেমনি করিয়া কাহিনীর পর কাহিনীর কমলদল খুলিয়া আমাদের যে পদ্মগন্ধী অন্তর-লক্ষ্মীর সন্ধান দিয়াছেন, তাহা রসে মধুর, প্রেমে সুনিবিড়, রূপে নয়নাভিরাম। একটি কথা বলিতে গিয়া বহু কথা বলিতে হইয়াছে, একটি সুরের প্রতিষ্ঠা করিতে সাতটি সুরের অনুরণন করিতে হইয়াছে, একটি মানুষের কথা শুনাইতে জনতার অবতারণা করিতে হইয়াছে। অথচ ইহার জন্য লেখক কোথাও বিরক্তি বোধ করেন নাই, অতি সহজ, স্বচ্ছ ও সুন্দর ভঙ্গীতে সমগ্র কাহিনীকে তিনি সুখপাঠ্য করিয়া তুলিয়াছেন। দেহকে আশ্রয় করিয়া দেহাতীতের এই বন্দনা, সত্যই হৃদয়কে স্পর্শ করে।

একটি ছেলে ও একটি মেয়ে—কেহই কাহাকে চেনে না, চিনিবার কথাও নয়। যথাসময়ে তাহাদের বিবাহ হইয়া গেল এবং শতকরা নিরানব্বুইটি বাঙালী পরিবারে যাহা ঘটিয়া থাকে, ইহাদের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল, অর্থাৎ যে যার বিপরীত পরিবেশের মধ্যে গিয়া পড়িল। মেয়েটির স্বামী মেয়েটির মনটিকে বাদ দিয়া তাহার দেহকে লইয়া মাতিয়া উঠিল, ছেলেটির স্ত্রীও স্বামীর মনের নাগাল পাইল না। প্রয়োজনকে কেন্দ্র করিয়া ইহারা পরস্পরের সাক্ষাৎ পাইল। ছেলেটি ডাক্তার মেয়েটি রোগীর স্ত্রী। ভালবাসাবাসির কথা কেহ কাহাকেও বলিল না, শুধু নীরবে তপস্যা করিতে লাগিল। অন্ধ প্রেম-দেবতার আসন টলিল, তিনি এই দুটি হৃদয়ের দুইটি বেগবান প্রণয়ধারাকে একটিমাত্র যুক্তধারায় পরিণত করিয়া দিলেন। ইহার পরে উপন্যাসের প্রয়োজনে নায়ক মরুক বা বাঁচুক আমাদের কিছুই বলিবার নাই। কেননা এই যুক্তধারায় আর মুক্তধারা হইবার উপায় নাই, এই আশ্বাসই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। এমনই হয়, একা পৃথিবীর পথে চলিতে চলিতে কখন যে জনতার মধ্য হইতে ঠিক মনের দোসরটি বাহির হইয়া আসিয়া পাশে পাশে পথ চলিতে থাকে, তাহা বলা যায় না। দেয় সেবা, দেয় স্নেহ, দেয় সান্ত্বনা, তখন মন তাহাতে সায় দিয়া বলিতে থাকে—ইহার প্রয়োজন ছিল। অথচ মজা এই যে, মনের দোসরটি আসিয়া না পড়িলে হয়তো এই প্রয়োজনের কথা তাহার মনেও পড়িত না। হঠাৎ পাওয়াই তখন চিরকালের পাওয়া হইয়া দাঁড়ায়।

এই মধুর উপন্যাসখানি দেশের সর্বত্র সমাদৃত হইবে, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। ছাপা, বাঁধাই চমৎকার। কাগজের এই দুষ্প্রাপ্যতার বাজারেও এমন সুন্দর একখানি উপন্যাস প্রকাশ করিয়া ডি এম লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

জন ও ভাষাতত্ত্ব

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়

এ পর্যন্ত বাঙালীর জনতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া যাহা পাওয়া গেল ভাষাতত্ত্বের বিশ্লেষণের মধ্যে তাহার সমর্থন কতটুকু পাওয়া যায়, তাহা দেখা যাইতে পারে। এ-চেষ্টা আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একাধিকবার সার্থক ভাবেই করিয়াছেন; তবু মনে হয়, জনতত্ত্ব বিশ্লেষণ-লব্ধ তথ্যের দিকে দৃষ্টি আর একটু সজাগ রাখিয়া বাংলা দেশের জাতি ও ভাষাপ্রবাহের আলোচনা এবং পরস্পর সম্বন্ধ নির্ণয়ের অবকাশ এখনও যথেষ্ট আছে। বস্তুত, পশিলুস্কি, ব্লক্, লেভি, বাগচী ও চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে দিকে গবেষণার সূত্রপাত করিয়াছেন, সেদিকে সমস্ত সম্ভাবনা এখনও নিঃশেষিত হয় নাই। বাংলা দেশের ভৌগোলিক সংস্থান ও গ্রামাজীবনের সমস্ত খুঁটিনাটির জ্ঞান লইয়া প্রবোধবাবু ও সুনীতিবাবুর ইঙ্গিতগুলি ফুটাইয়া তোলার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে এবং আমার বিশ্বাস সেই ফলাফল-গুলি নরতত্ত্ব গবেষণার ফলাফলের সঙ্গে যোগ করিলে বাঙালী সমাজ ও সংস্কৃতির অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত হইবে।

ভারতবর্ষ ও পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ও দ্বীপপুঞ্জগুলির বিচিত্র ভাষার সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত গবেষণার ফলে আজ একথা সর্ব-জন স্বীকৃত যে আনাম, মালয়, তালৈঙ্, খাসিয়া, কোল (অথবা মুণ্ডা) সাঁওতাল, নিকোবর, মালাক্কা প্রভৃতি ভূমির বিচিত্র বিভিন্ন অধিবাসীরা যেসব ভাষায় কথা বলে, তালৈঙ্ ও খমের গোষ্ঠীর প্রাচীন সাহিত্য যেসব ভাষায় রচিত, সেই ভাষাগুলি একই পরিবারভুক্ত। এই সুবৃহৎ ও সুবিস্তৃত ভাষা-পরিবারের পুরাতন নাম অস্ট্রো-এশীয়, আধুনিক নামকরণ অস্ট্রিক। একটু মনঃসংযোগ করিলেই ধরা পড়িবে এই সব অধিবাসীরা সকলেই জন হিসাবে একই নর-গোষ্ঠীর নয়; আনাম বা মালয়-মালাক্কা অঞ্চলে অস্ট্রোলয়েড্ রক্তের সঙ্গে মঙ্গোলীয় রক্তের বহুল সংমিশ্রণ হইয়াছে, অথচ কোল অথবা সাঁওতালদের মধ্যে মঙ্গোলীয় প্রবাহ নাই, কিন্তু আদি অস্ট্রোলয়েড্ রক্তে অন্য জাতির রক্তপ্রবাহ কমবেশী সঞ্চারিত হইয়াছে। খাসিয়াদের ত মোটামুটি মোঙ্গলীয় রক্তবহুলই বলা চলে। ইহা হইতে স্বতঃই অনুমান হয়, ঐসব ভূখণ্ডে সন্ধান-সম্ভাব্য আদিমতম স্তরে সর্বত্রই অস্ট্রিক্ ভাষার প্রচলন ছিল এবং যাহাদের মধ্যে ছিল তাহাদের পরিচয় যতটা পাওয়া যায়, তাহা হইতে দেখা যাইবে ইহারা প্রায় সকলেই আদি-অস্ট্রেলীয় নরগোষ্ঠীর অন্তর্গত, যেমন মুণ্ডা, কোল ও সাঁওতালেরা, ভূমিজ ও সবরেরা, মালয় ও আনাম অঞ্চলের অধিবাসীরা, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের লোকেরা। পরবর্তী কালে ইহাদের মধ্যে কমবেশী অন্য জাতির রক্ত সংমিশ্রণ হয়ত অনেক ক্ষেত্রেই হইয়াছে, এমন কি অনেক জায়গায় নূতন কোনও জাতি তাহাদের একেবারে আত্মসাৎও হয়ত করিয়া ফেলিয়াছিল, যেমন করিয়াছে মালয়ে, আনামে, নিম্ন ব্রহ্মে যেখানে তালৈঙ্ ভাষাভাষী লোকের বাস, প্রভৃতি জায়গায়; কিন্তু পুরাতন জাতির ভাষা তাহারা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং নানা জাতি বিবর্তনের ভিতর দিয়াও সেই ভাষা প্রবাহ আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। উপরোক্ত তথ্য হইতে আর একটি তথ্য ধরা পড়ে যে, এই অস্ট্রিক ভাষা এক সময় মধ্যভারত হইতে আরম্ভ করিয়া সাঁওতাল-ভূমি, আসাম, নিম্ন ব্রহ্ম, মালয়, আনাম, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি সমস্ত ভূখণ্ডে বিস্তৃত ছিল; লক্ষ্যণীয় ইহাই যে, এই সমস্ত ভূখণ্ডই এক সময়ে আদি-অস্ট্রেলীয়দের বাসভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল। উপরে বলিয়াছি, উপরোক্ত ভাষাগুলি সবই অস্ট্রিক পরিবারের; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই একথাও বলা উচিত ছিল যে, এক পরিবারভুক্ত হইলেও ইহাদের মধ্যে আত্মীয়তার তারতম্য আছে; যেমন, তালৈঙ্, মন্-খমেরের সঙ্গে কোলগোষ্ঠীর আত্মীয়তা বেশী, খাসিয়ার সঙ্গে নিকোবরীর। কোল-মুণ্ডা খুব সম্পন্ন গোষ্ঠী; সাঁওতালী, মুণ্ডারী, ভূমিজ, হো, কোড়া, অসুরী, খাড়িয়া, জুয়াং, শবর, গদব প্রভৃতি সকল-বুলিই এই গোষ্ঠীর এবং মধ্যভারতের পূর্ব-ভাগ জুড়িয়া এই সব বুলিভাষী লোকদের বাস। আশ্চর্যের বিষয় ইহারা সকলেই আদি-অস্ট্রেলীয়। এই কারণেই অনুমান হয়, আদি-অস্ট্রেলীয়দের ভাষাই হয়ত ছিল যাহাকে আমরা এখন বলিতেছি অস্ট্রিক। যাহা হউক, এই ভূখণ্ডের দক্ষিণেই দ্রাবিড়-ভাষী জনপদ এবং তাহার ফলে বলবত্তর দ্রাবিড়ভাষা কোলভাষার ভূখণ্ডে কোথাও কোথাও ঢুকিয়া পড়িয়াছে। অথচ একথা আজকাল সর্বজনস্বীকৃত যে দ্রাবিড় ভাষার সঙ্গে মুণ্ডার কোনও সম্বন্ধই নাই। আবার অন্যদিকে, উত্তরে হিমালয়ের সানুদেশে এমন কতগুলি বুলি আজও প্রচলিত যেগুলি তিব্বতী-বর্মী গোষ্ঠীর ভাষা হইলেও তাহাদের এমন কতগুলি লক্ষণ আছে, যাহা মুণ্ডা ভাষারই বিশিষ্ট লক্ষণ। এই লক্ষণগুলি যে সেই সব দেশে এক সময়ে বহুল প্রচারিত মুণ্ডা বা অস্ট্রিকগোষ্ঠীর ভাষার লুপ্তাবশেষ তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শতদ্রু উপত্যকার কনবারী বুলি হইতে আরম্ভ করিয়া নেপালের কনাষী, বুনান্, রংকস, দারমিয়া, চৌদাংসী, বিয়াংসী, ধীমাশ প্রভৃতি বুলি পর্যন্ত প্রত্যেকটিতেই এই লুপ্তাবশেষ ধরা যায়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, অস্ট্রিক ভাষার বিস্তৃতি শুধু পূর্বোক্ত দেশগুলিতেই নয়, একসময় উত্তর ভারতের অনেক স্থলেই ছিল। পরবর্তী যুগে দ্রাবিড় ও আর্যভাষা পশ্চিম দিকে এবং তিব্বতী-বর্মী ভাষা পূর্বদিকে এই ভাষাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া অধিকাংশ স্থলেই ইহাকে গ্রাস করিয়া একেবারে হজম করিয়া ফেলিয়াছে; যে-সব ক্ষেত্রে তাহা পারে নাই, বা নানা প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক কারণে তাহা সম্ভব নাই, সেইসব স্থানেই কোনও মতে দ্বীপের মতন আশ্রয়ের মধ্যে স্বল্পসংখ্যক লোকের বুলিতে আবদ্ধ হইয়া নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে।

উত্তর ও পূর্বভারতে সর্বত্র, কাশ্মীরে, গুজরাটে, মহারাষ্ট্রে, কর্ণাটে, বিহারে, উড়িষ্যায়, বাংলায়, আসামে, হিন্দুস্থানে, রাজপুতানায়, পঞ্জাবে, সীমান্তপ্রদেশে, বিশেষভাবে গাঙ্গেয় উপত্যকায় সর্বত্র আর্য-ভাষার প্রবল প্রতাপ; এই আর্যভাষাই আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাহন। এই আর্যভাষার প্রধান রূপ সংস্কৃত, যাহা প্রাকৃতজনের মধ্যে প্রাকৃত। এই প্রাকৃত-সংস্কৃতির অপভ্রংশ হইতে বর্তমান উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম ভারতের প্রাদেশিক ভাষাগুলির উৎপত্তি। বাংলাভাষা তাহার মধ্যে অন্যতম। এখন, যদি একথা প্রমাণ করা যায় যে, এই প্রাকৃত-সংস্কৃতের ভিতর অস্ট্রিক ভাষার শব্দ ও পদরচনা রীতির প্রভাব আছে—হয় তাহা নিছক অস্ট্রিকরূপে অথবা সংস্কৃতিকরণের ছদ্মবেশে—তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আর্যভাষাভাষী লোকদের আদিমতর স্তরে অস্ট্রিকভাষাভাষী লোকের বাস ছিল এবং এ তথ্যও ধরা পড়িবে যে অস্ট্রিকভাষী লোকের যে বিস্তৃতি আমরা আগে দেখিয়াছি, তাহা

হইতেও তাহাদের বিস্তৃতি আরও ব্যাপক আরও গভীর ছিল। ঠিক্ এই তথ্যটাই সুপ্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস করিয়াছেন, প্রশিলুস্কি-ব্লক্-লেভি বাগচী-স্টেনকোনো-চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিতেরা। তাঁহাদের সুবিস্তৃত ও সুগভীর গবেষণার সকল কথা বলিবার প্রয়োজন নাই; অনুসন্ধিৎসু পাঠক তাহা দেখিয়া লইতে পারিবেন। আপাততঃ একথা বলিলেই ইতিহাসের প্রয়োজন মিটিতে পারে যে, ইঁহারা দেখাইয়াছেন, প্রাকৃতে-সংস্কৃতে হয়ত অস্ট্রিকরূপে না হয়, সংস্কৃত-প্রাকৃতের ছদ্মবেশে প্রাকৃত-সংস্কৃত ভাষায় প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে এমন অসংখ্য শব্দ ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত প্রচলিত আছে, এমন ব্যাকরণ ও পদরচনা রীতি আছে, যাহা মূলে অস্ট্রিক্ ভাষা হইতে গৃহীত এবং এই গ্রহণ সুপ্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক কাল পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। বাঙালীর ইতিহাস রচনা করিতে বসিয়া আমি এখানে এমন কতগুলি শব্দ ও রীতির উদ্ধার করিব, যাহা একান্তভাবে না হউক, অন্তত বহুলভাবে বাংলা দেশে এবং বাংলার সংলগ্ন দেশ গুলিতেই প্রচলিত। সব নির্ধারিত শব্দ উদ্ধার করা সম্ভব নয়; তাহার তালিকা উল্লিখিত পণ্ডিতদের রচনায় পাওয়া যাইবে; আমি শুধু সেই সব শব্দই উদ্ধার করিতেছি যেগুলির সঙ্গে বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ও প্রায় অবিচ্ছেদ্য।

আসামে ও বাংলা দেশে এক কুড়ি, দুই কুড়ি, তিন কুড়ি, চার কুড়িতে (বিশ বা বিংশ নয়) এক পণ, অর্থাৎ ৮০টায় এক পণ গণনার রীতি প্রচলিত আছে। হাটে বাজারে পান, সুপারী, কলা, বাঁশ, কড়ি, এমন কি ছোট মাছ ইত্যাদি দ্রব্যও এখনও এই ভাবেই গণনা করিয়া ক্রয়বিক্রয় করা হয়। এই কুড়ি শব্দটি এবং গণনা রীতিটি দুই-ই অস্ট্রিক্। সাঁওতালী ভাষায় উপুণ বা পুণ বা পণ কথাটির অর্থ ৮০ এবং সঙ্গে সঙ্গে ৪ও। মূলে অর্থ চার। অস্ট্রিক্ভাষাভাষী লোকদের ভিতর কুড়ি শব্দ মানবদেহের কুড়ি অঙ্গুলির সঙ্গে সম্পৃক্ত; কুড়িই তাহাদের সংখ্যা গণনার শেষ অঙ্ক এবং কুড়ি লইয়া এক মান। কাজেই এক কুড়ি, দুই কুড়ি, তিন কুড়ি, চার কুড়িতে (৪×২০=৮০) এক পণ। এই অর্থে আশীও পণ, চারও পণ। এই পণও তাহা হইলে অস্ট্রিক শব্দ। আবার কুড়ি গোণ্ড বা গণ্ডাতে এক পণ (=৮০), এও অস্ট্রিক ভাষারই গণনা। অর্থাৎ একগোণ্ডা বা গণ্ডতে চার সংখ্যা; প্রত্যেক কুড়িতে (৪×৫) পাঁচটি গোণ্ড। এই গোণ্ড বা গণ্ডই বাংলায় গণ্ডা যাহা চার সংখ্যার সমান। চার কুড়িতে এক গণ্ডা। এই গণ্ডাই খৃষ্টপূর্ব প্রথম দ্বিতীয় শতকের প্রাকৃত মহাস্থান শিলাখণ্ড লিপির গণ্ডকমুদ্রা। ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত এই গণ্ডক মুদ্রার প্রচলন বাংলা দেশে ছিল। গণ্ডক শব্দের অভিধানগত অর্থই হইতেছেঃ ভাগ, একপ্রকার গণনা রীতি, চার সংখ্যায় এক মান ধরিয়া গণনার রীতি, চার কুড়ি মূল্যের একপ্রকার মুদ্রা। দেখা গেল এই সমস্ত গণনা-পদ্ধতিটাই অস্ট্রিকভাষাভাষী লোকদের। আর কড়ি মুদ্রা যেখানে গণনা-ক্রমে এতটা স্থান অধিকার করিয়া আছে, সেখানে ইহাত সহজেই অনুমেয় যে এই গণনাপদ্ধতি আদিম ভারত ও বৃহত্তর ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য-সমৃদ্ধ সভ্যতার সৃষ্টি। বাংলা গুঁড়ি বা গুঁড়া ও গুঁটি, এই শব্দগুলিও গোণ্ড বা গণ্ডা শব্দ হইতে উদ্ভূত।

বাঙলা খাঁ খাঁ (করে ওঠা), খাঁখার (দেওয়া), বাঁখারী (বাখারী বা চেড়া বাঁশ), বাদুড়, কানি (ছেঁড়া কাপড়ের টুকরা), জাং (জঙ্ঘা), ঠেঙ্গ (গোড়ালী হইতে হাঁটু পর্যন্ত পায়ের অংশ), ঠোঁট, পাগল, বাসি, ছাঁচ, ছাঁচতলা, ছোঙা, কলি (চূণ), ছোট, পেট, খোস (পুরাতন বাংলায়, কচ্ছু), ঝোড় বা ঝাড়, ঝোপ, পুরাতন বাংলায় চিখিল (কাদা), ডোম (প্রাচীন বাংলার ডোম্ব-ডোম্বী). চোঙ্, চোঙ্গা, মেড়া (=ভেড়া), বোয়াল (মাছ), করাত, দা' বা দাও, বাইগণ (বেগুণ=সংস্কৃত বাতিঙ্গণ, বাতিগণ), পগার (জলময় গর্ত বা প্রণালী), গড়, বরজ (পানের), লাউ, লেবু-লেম্বু, কলা, কামরাঙ্গা, ডুমুর প্রভৃতি সমস্ত শব্দই মূলত অস্ট্রিক্গোষ্ঠীর ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। বাংলার প্রাচীন জনপদ বিভাগের মধ্যে পুণ্ড-পৌণ্ড্র, তামলিপ্তি-তাম্রলিপ্তি-তামালিপ্তি এবং বোধ হয় গঙ্গা (নদী) ও বঙ্গ এই দুটি নামও এই একই অস্ট্রিক-গোষ্ঠীর ভাষার দান। কপোতাক্ষ ও দামোদর, অন্তত এই দু'টি নদীর নামও কোল কব-দাক্ ও দাম-দাক্ হইতে গৃহীত। কোল দা বা দাক্=জল এবং দা বা দাক্ হইতেই সংস্কৃত উদক। অস্ট্রিকভাষাভাষী লোকেরা নিজেদের ভাষার কথা দিয়াই দেশের পাহাড় পর্বত নদনদী গ্রাম জনপদ ইত্যাদির নামকরণ করিয়াছিল, এই অনুমানই ত যুক্তি ও ইতিহাসসম্মত। তাহার কিছু কিছু চিহ্ন এখনও বাংলা বুলিতে লাগিয়া আছে, যেমন শিয়ালদহ বা শিয়াল-দা, ঝিনাইদহ বা ঝিনাই-দা, বাঁশদহ বা বাঁশ-দা (দহ=জলভরা গর্ত, নদীগর্ভের গর্ত); মুণ্ডা ঢেঙ্কি=বাংলা ঢেঁকি, মুণ্ডা মোটো=বাংলা মোটা। লেভি সাহেবও বলেন, পুলিন্দ-কুলিন্দ, মেকল-উৎকল, উদ্র-পুণ্ড্র-মুণ্ড, কোসল-তোসল, অঙ্গ-বঙ্গ, কলিঙ্গ-তিলিঙ্গ এবং সম্ভবত তক্কোল-কক্কোল, অচ্ছ-বচ্ছ, এই ধরণের জাতি-বাচক যমজ দ্বিত্ব নামকরণ পদ্ধতিটাই অস্ট্রিক। তাঁহার বচনটি উদ্ধৃতির যোগ্য—

"Pulinda-Kulinda, Mekala-Utkala (with the group Udra-Pundra-Munda), Kosala-Tosala, Anga-Vanga, Kalinga-Tilinga form the links of a long chain which extends from the eastern confines of Kashmir up to the centre of the peninsula. The skeleton of this "ethnical system" is constituted by the heights of the central plateau; it participates in the life of all the great rivers of India except the Indus in the west end Kaveri in the south. Each of these groups from a binary whole; each of these binary resites is united with another member of the system. In each ethnic pair the twin bears the same name, differentiated only by the initial: K and T; K and P; zero and V, or M or P. This process of formation is foreign to Indo-European; it is foreign to Dravidian; it is on the contrary characteristic of the vast family of languages which are called Austro-Aratic, and which covers in India the group of the Munda languages, often called also Kolarian". *

"আর্য মঞ্জুশ্রীমূলকল্প" (অস্টমশতক) নামক গ্রন্থে এই ভাষাগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটি মন্তব্য আছে এবং সম্ভবত প্রচলন স্থান সম্বন্ধেও একটু ইঙ্গিত আছে। তাহা এই প্রসঙ্গে উদ্ধার করা যাইতে পারে। এই গ্রন্থের মতে অষ্টম শতকে কামরাঙ্গা ফলের উৎপত্তি স্থান ছিল কর্মরঙ্গাখ্য-দ্বীপে (=য়ুয়ান্‌চোয়াঙের কামলঙ্ক, চীনা গ্রন্থের লংকীয়া, লংকীয়া-সু,), নাড়িকের-দ্বীপে (নারিকেল দ্বীপ), বারুসকদ্বীপে (বর্তমান বারোস্, সুমাত্রা দ্বীপ), নগ্নদ্বীপ, বলিদ্বীপ এবং যবদ্বীপ। এই সব দ্বীপের ভাষা 'র'-কার বহুল, অস্ফুট, অব্যক্ত (অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য?) এবং নিষ্ঠুর (কর্কশ, রূঢ়)।

কর্মরঙ্গাখ্যদ্বীপেষু নাড়িকের সমুদ্ভবে।
দ্বীপে বারুসকে চৈব নগ্ন বলি সমুদ্ভবে॥
যবদ্বীপে বা সত্ত্বেষু তদন্যদ্বীপ সমুদ্ভবা।
বাচা রকারবহুলাতু বাচা অস্ফুটাং গতা॥
অব্যক্তা নিষ্ঠুরা চৈব সক্রোধপ্রেতযোনীষু।*

যে বৈশিষ্ট্যের কথা "মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে"র লেখক উল্লেখ করিয়াছিলেন, আর্যভাষার দৃষ্টিভঙ্গি হইতে অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা সম্বন্ধে তাহা বলা কিছু অযৌক্তিক নয়। অস্ট্রিক ভাষায় 'ল' ও 'র'র বাহুল্য সত্যই লক্ষ্য করিবার মত। এই অসুর ভাষা-ভাষী লোকদেরেই ঋগ্বেদে 'অসুর' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে বলিয়া মনে করিলে অন্যায় হয় না।

"আর্য মঞ্জুশ্রীমূলকল্প" গ্রন্থের আর একটি সাক্ষ্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থকারের মতে বঙ্গ সমতট হরিকেল, গৌড় ও পুণ্ড্রের লোকেরা, অর্থাৎ পূর্ব ও পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর বঙ্গের লোকেরা 'অসুর' ভাষাভাষী : "অসুরানাং ভবেৎ বাচা গৌড়-পুণ্ড্রোদ্ভবা সদা"। কোল-মুণ্ডাগোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান বুলির নাম এখনও অসুর

* বাগচী সং—
"Pre-Aryan and pre-Dravidian in India, p. 95. See also. p. 124-26.

*—গণপতি শাস্ত্রী, সং—২য় খণ্ড ৩২২ পৃঃ

বুলি; কাজেই এই বুলিই খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে গৌড়ে পুণ্ড্রে বহুল প্রচলিত ছিল, এ অনুমান সহজেই করা চলে। মধ্যভারতের পূর্বখণ্ডে যে-সব লোকেরা অসুর বুলিতে কথা বলে তাহারা আদি-অস্ট্রেলীয় পরিবারের লোক, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। গৌড়-পুণ্ডের আদিমতর স্তরেও এই আদি-অস্ট্রেলীয়দের বিস্তৃতি ছিল, একথাও নর-তত্ত্ববিশ্লেষণ হইতে আগেই জানা গিয়াছে। ভাষার সাক্ষ্য হইতেও তাহা অনেকটা পরিষ্কার হইল। "মঞ্জুশ্রীমূলকল্পে"র গ্রন্থকার তাহা পরিষ্কার করিয়াই বলিলেন। আসামেও যে প্রাচীনতর কালে এই অসুর ভাষাভাষী লোকের বিস্তৃতি ছিল, তাহা অনুমানের আরও একটু কারণ আছে। কামরূপের বর্মণ রাজবংশের আদিপুরুষ সকলেই অসুর বলিয়া পরিচিত; অন্তত সপ্তম শতকের রাজারা তাঁহাদের পূর্বপুরুষদের অসুর বলিয়াই জানিতেন এবং মহিরাঙ্গ অসুর, দানবাসুর, হাটকাসুর, সম্বরাসুর, রত্নাসুর, নরকাসুর প্রভৃতি পূর্বপুরুষদের বংশধর বলিয়াই নিজেদের জানিতেন। ইঁহারা অসুরভাষাভাষী ছিলেন বলিয়াই কি ইঁহাদের নামে তাহার চিহ্ন থাকিয়া গিয়াছে?

আর একটি প্রাচীনতর সাক্ষ্য উদ্ধৃত করিয়াই এই অস্ট্রিক—আদি অস্ট্রেলীয় প্রসঙ্গ শেষ করিব। জৈনদের "আচারঙ্গ সূত্র" গ্রন্থে উল্লেখ আছে, মহাবীর (খৃষ্ট-পূর্ব ৬ষ্ঠ শতক) যখন পথহীন লাঢ় (রাঢ়দেশ), বজ্জভূমি ও সুব্ভভূমিতে (দক্ষিণ রাঢ় ও নিম্ন বঙ্গ) প্রচারোদ্দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন এই সব দেশের অধিবাসীরা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। কতগুলি কুকুরও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে কামড়াইতে আরম্ভ করে, কিন্তু কেহই এই কুকুরগুলিকে তাড়াইয়া দিতে অগ্রসর হয় নাই। বরং লোকেরা সেই জৈন ভিক্ষুকে আঘাত করিতে আরম্ভ করে এবং ছু ছু (খুক্ খু) বলিয়া চীৎকার করিয়া তাঁহাকে কামড়াইবার জন্য কুকুরগুলিকে লেলাইয়া দেয়। বাংলা দেশে এখনও লোকে কুকুর ডাকিবার সময় চু চু বা তু তু বলে। অস্ট্রিক ভাষা গোষ্ঠীতে কুকুরের প্রতিশব্দ হইতেছে 'ছক' (খ্মের), 'ছ্যকে' (কোন্ টু) 'ছো' (প্রাচীন খ্মের), 'ছো' (আনাম, সেদাং, কাসেং), 'অছো' (তারেঙ), 'ছু' (সেমাং), 'ছুও,' 'ছু—ও' (সাকেই)। এই তথ্য হইতে বাগ্চী মহাশয় মনে করেন যে, বাঙলা চু চু বা তু তু মূলত অস্ট্রিক প্রতিশব্দ হইতেই গৃহীত এবং চু চু বা তু তু সংস্কৃত কুকুরার্থক বাংলা বা দেশজ শব্দ; ওটা শুধু ধ্বন্যাত্মক ডাক্ মাত্র নয়, চু চু বা তু তু বলিতে কুকুরই বুঝায়। এ অনুমান সত্য হইলে রাঢ়ে-সুহ্মে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে অস্ট্রিক গোষ্ঠীর ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। আর, ছিল যে তাহার অন্য প্রমাণ এই দুই ভূখণ্ডে এখনও অস্ট্রিকভাষাভাষী পরিবারভুক্ত অনেক কোলদের বাস দেখিতে পাওয়া যায়।

অস্ট্রিক ভাষা হইতে যেমন, ঠিক তেমনই দ্রাবিড় ভাষা হইতেও আর্যভাষা 'সংস্কৃতে প্রাক্তে-অপভ্রংশে অনেক শব্দ, পদরচনা ও ব্যাকরণ রীতি ইত্যাদি ঢুকিয়া পড়িয়াছে। আর্যভাষাভাষী লোকেরা যে দ্রাবিড়ভাষাভাষী লোকদের সংস্পর্শে আসিয়াছিল, এই তথ্য তাহার প্রমাণ। সংস্কৃত ভাষা বিকাশের বিভিন্ন স্তরে এবং প্রাকৃত-অপভ্রংশ হইতে উদ্ভূত বাংলা ভাষায় এই দ্রাবিড় স্পর্শ কোন্ দিকে কতখানি লাগিয়াছে, তাহার ইঙ্গিত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দিয়াছেন কতকটা বিস্তৃতভাবেই। এখানে তাঁহার সকল কথা বলিবার প্রয়োজন নাই; অনুসন্ধিৎসু পাঠক তাহা দেখিয়া লইতে পারেন। তাঁহার বহু শ্রম ও বহু মননলব্ধ গবেষণার ফলাফল আজ প্রায় সর্বজন স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে; এই গৌরব সমগ্র বাঙালী জাতির। বক্ষ্যমান বিষয়ে তাঁহার বক্তব্য এইঃ

"Is there any evidence about the class of speech that prevailed in Bengal before the coming of the Aryan tongue? There is, of course, the presence of Kol and Dravidian speakers (the Santals, the Malers, the Oraons) in the western fringes of the Bengali area, and of th Boda and Mon-Khmer speakers in the northern and eastern frontiers. There are, again, **some unmistakably Dravidian affinities in Bengali phonetics, morphology, syntax and vocabulary;** but these agreements with Dravidian are not confined to Bengali alone, but are found in other NIA (New Indo-Aryan) also. Apart from that, **local nomenclature** in Bengal may be expected to throw some light on the question....The study of Bengali toponomy is rendered extremely difficult from the fact that old names, when they were not Sanskrit, have suffered from mutilation to such an extent that it is often impossible to reconstruct their original forms; especially when they are non-Aryan. Fortunately for us Bengal inscriptions, from the 5th century onwards, like the inscriptions found elsewhere in India, and occasionally works written in pre-Moslem Bengal, have preserved old forms of some scores of these names. But it is a pity that generally there was an attempt to give these names a Sanskrit look."*

তৎসত্ত্বেও এই সব লিপি হইতে অসংখ্য নাম ও প্রমাণ উদ্ধার করিয়া সুনীতিবাবু দেখাইয়াছেন যে, নামগুলিতে দ্রাবিড় প্রভাব সুস্পষ্ট। তাঁহার সুদীর্ঘ তালিকা উদ্ধার করিতে গেলে প্রসঙ্গের বিস্তৃতি বাড়িয়া যাইবার আশঙ্কায় আমি আর তাহা করিলাম না। তিনি আরও বলেনঃ—

"In the formation of these names, we find some words which are distinctly Dravidian: e.g. -jola, -jota, joti, -jotika etc.; hitti, bhitti, -viti, -hist(h)i etc.; -gadda, -gaddi; -pola, -vola, and probably also -handa, -vada, **-kunda, -kundi,** and cavati, cavada etc.; and besides there are many others which have a **desi** or non-Aryan look. The first word, **as** in Pindara-viti-jotika, **Uktara-yota** (=jota), **Dharmmayo-jotika, Nada-joti, Camyala-joti, Sik(ph)-gadi-joti, meaning** channel, water-course, **rivers, water, is found in** modern **Bengal place names.... An investigation of place names in Bengal, as in other parts of Aryan India, is sure to reveal the presence of non-Aryan speakers, mostly Dravidian, all over the land before establishment of the Aryan tongue."**

এই প্রসঙ্গে তিনি অসংখ্য প্রাচীন ও বর্তমান বাংলাদেশের স্থানের নাম, নামের উপান্ত 'ড়া' (বাঁকুড়া, হাওড়া, রিষড়া, বগুড়া) 'গুড়ি' (শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি), জুলি (নয়ন জুলি), জোল (নাড়াজোল), জুড় (ডোমজুড়), ভিটা, কুণ্ড, প্রভৃতি শব্দ উদ্ধার করিয়া তিনি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইহারা দ্রাবিড় ভাষার।

কিন্তু নরতত্ত্ববিদদের কাছে এই দ্রাবিড় ভাষাভাষী লোকদের সমস্যা বড় জটিল। সাম্প্রতিক নরতাত্ত্বিক পরিভাষায় দ্রাবিড় নরগোষ্ঠীর কোনও অস্তিত্বই নাই; দ্রাবিড় ভাষার নাম; নরগোষ্ঠীর নয়। প্রাক্ আর্য যুগে এই দ্রাবিড় ভাষাভাষী লোক কাহারা ছিল? ঐতিহাসিক যুগে দামিল-দ্রমিল-তামিল জাতির লোকেদের ভাষা দ্রাবিড় সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহারা কাহাদের বংশধর?

পূর্বে নরতত্ত্ব বিশ্লেষণে দেখা গিয়াছে, আদি-অস্ট্রেলীয় নরগোষ্ঠীর পরে একে একে তিনটি দীর্ঘমুণ্ড জাতি ভারত-বর্ষের জনপ্রবাহে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয় ধারাটি পঞ্জাব অতিক্রম করিয়া পূর্বে বা দক্ষিণে বোধহয় আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। প্রথম ধারাটি মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল এবং সেখানে পূর্বতন আদি-অস্ট্রেলীয়-দের সঙ্গে তাহাদের খানিকটা সংমিশ্রণও হয়ত ঘটিয়াছিল। তৃতীয় ধারাটির সঙ্গে সুমেরীয় আসীরীয় বাবলনীয় প্রভৃতি ভূমধ্য নরগোষ্ঠীর সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ এবং এই ধারাটিই হরপ্পা, মহেন্-জো-দড়োর প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতার জননী। ইহারা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল উত্তর ভারতের সর্বত্র; তবে উত্তর-পূর্ব ভারতে গঙ্গা-যমুনার উপত্যকায় পূর্বতন আদি-অস্ট্রেলীয় কোল-মুণ্ডা-শবর-নিষাদ-অসুর-দের বিস্তৃতি ও প্রতাপ প্রবলতর থাকায় ইহারা বিন্ধ্যগিরি অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ ভারতে ছড়াইয়া পড়িতে বাধ্য হয়। অ্যালপো-দীনারীয় আদি-নর্ডিক পরবর্তী কালে আর্য ভাষাভাষী জাতির বিভিন্ন তরঙ্গাঘাতে উত্তর ভারত হইতেও ইহারা ক্রমশ স্তরে স্তরে পূর্বে ও দক্ষিণে ছড়াইয়া পড়িতে বাধ্য হয়। এই প্রথম ও তৃতীয় ধারার দীর্ঘমুণ্ড দুইটি নরগোষ্ঠীর সমন্বয়ে যে জাতি গড়িয়া উঠে তাহারাই খুব সম্ভব দ্রাবিড় ভাষা

*** Origin and Development of the Language, Vol. I, p. 64-69, also App. B and C of the Introduction.**

গোষ্ঠীর বর্তমান তামিল, তেলেগু, মালয়ালী ভাষাভাষী লোকদের পূর্বপুরুষ। তবে, সিন্ধু নদের নিম্ন উপত্যকায় বেলুচিস্থানের দ্রাবিড়ভাষী ব্রাহুইদের অস্তিত্ব হইতে অনুমান হয়, এই দ্রাবিড় ভাষা ছিল সিন্ধু উপত্যকাস্থিত তৃতীয় ধারার দীর্ঘমুণ্ড নরগোষ্ঠীর ভাষা; অবশ্য এই অনুমান যথেষ্ট সিদ্ধ বলিয়া কিছুতেই গণ্য হইতে পারে না।

যাহাই হউক, বাংলা দেশে দ্রাবিড় ভাষার প্রচলনের দায়িত্ব এই দুই ধারার দীর্ঘমুণ্ড নরগোষ্ঠী দুইটির, সম্ভবত তৃতীয় ধারার যাহারা প্রতিনিধি তাহাদের, একথা কতকটা অনুমান করা চলিতে পারে।

আল্পো-দীনারীয় জাতির লোকেরা আর্যভাষাভাষী, কিন্তু তাহাদের ভাষার স্বরূপ কি ছিল, তাহা সঠিক বলিবার উপায় প্রায় নাই বলিলেই চলে। গ্রীয়ার্সন সাহেব গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্যভারত, উড়িষ্যা, কতকাংশে বিহার, বঙ্গদেশ ও আসামের যে আর্যভাষাকে Outer Aryans বা বেদ বহির্ভূত আর্য ভাষাভাষী লোকেদের কথা বলেন এবং বৈদিক আর্যভাষা হইতে উদ্ধৃত সিন্ধু-গঙ্গা উপত্যকার হিন্দি, রাজস্থানী প্রভৃতি ভাষা হইতে পৃথক্ গুজরাটি, মারাঠী, ওড়িয়া, বাংলা, অহমীয়া প্রভৃতি আর্যভাষার যে কথা ইঙ্গিত করেন, তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, বাংলা, মারাঠী, ওড়িয়া, গুজরাটি, অহমীয়া ইত্যাদি ভাষার মূল প্রধান ও বিশিষ্টরূপই যে অ্যাল্পো-দীনারীয় জাতির ভাষারূপ তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ, গ্রীয়ার্সনের এই "Outer Aryans" যে অ্যালপাইন জাতিরই অন্যতম শাখা রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বহুদিন আগেই তাহা সুপ্রমাণ করিয়াছেন এবং নরতত্ত্ববিদেরা প্রায় সকলেই তাহা স্বীকার করেন।

মোঙ্গলীয় ভোট-ব্রহ্ম ভাষার প্রভাব প্রাচীন অথবা বর্তমান বাংলায় প্রায় নাই বলিলে খুব অযৌক্তিক হয় না। নরতত্ত্বের দিক হইতে মোঙ্গলীয় রক্তপ্রবাহ বাঙালীর মধ্যে যেমন ক্ষীণ ও শীর্ণ মোঙ্গলীয় ভাষা প্রভাবও তাহাই। তবে উত্তরতম ও পূর্বতম প্রান্তের মোঙ্গলস্পৃষ্ট লোকদের ভিতর চলতি বুলিতে কিছু কিছু ভোট-ব্রহ্ম শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়; আর, অন্তত একটি নদীর নাম যে ভোট-ব্রহ্ম ভাষা হইতে গৃহীত তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায়; এই নদীটি দিস্তাং বা তিস্তা যাহার পরবর্তী সংস্কৃত রূপ ত্রিস্রোতা।

যাহা হউক, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও বেদ-বহির্ভূত আর্য ভাষা প্রবাহের উপর তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া ভাঙিয়া পড়িল বৈদিক আর্য ভাষা প্রবাহের প্রবল স্রোত। একদিনে নয়, দু-দশ বৎসরে নয়, শত শত বৎসর ধরিয়া এবং কালে কালে ক্রমে ক্রমে এই ভাষা সমস্ত পূর্বতন ভাষা প্রবাহকে আত্মসাৎ করিয়া তাহাদের নবরূপ দান করিয়া তাহার সংস্কৃতিকরণ সাধন করিয়া নিজের এক স্বতন্ত্র রূপ গড়িয়া তুলিল। তাহার ফলে যে সংস্কৃতি ভাষার বিকাশ হইল তাহাতে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় শব্দ, পদরচনারীতি, ব্যাকরণ পদ্ধতি সমস্তই কিছু কিছু ঢুকিয়া পড়িল। সাম্প্রতিক কালে শব্দ ও ভাষাতাত্ত্বিকেরা তাহা অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিতেছেন। বাংলা দেশেও তাহার প্রচলন হইল, কিন্তু দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শতকের সংস্কৃত লিপিগুলিতে দেখা যাইবে, সেই সংস্কৃত ভাষায়ও এমন সব শব্দের দেখা পাওয়া যায়, এমন ব্যাকরণ-বৈশিষ্ট্যের দর্শন মেলে যাহা বাংলার বাহিরে দেখা যায় না; 'বরজ', 'ডালিম্ব' (সংস্কৃত দাড়িম্ব নয়) 'লগ্গাবয়িত্বা' (লাগাইয়া অর্থে) ইত্যাদি তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র।

একান্তভাবে ভাষার দিক হইতে এই আর্যীকরণ সম্বন্ধে সুনীতিবাবু যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধারযোগ্য। একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই উদ্ধৃতির ভিতর আর্য বা অনার্য বলিতে তিনি আর্য ভাষা ও অনার্য ভাষাকেই বুঝাইতেছেন; যেখানে আর্য বা অনার্য নরগোষ্ঠী বলিতেছেন, সেখানেও আমি আর্য বা অনার্য ভাষা-ভাষী নরগোষ্ঠী হিসাবেই বুঝিতেছি; কারণ, আমি আগেই বলিয়াছি নরতত্ত্বের দিক হইতে আর্য নরগোষ্ঠী বা দ্রাবিড় নরগোষ্ঠী এই ধরণের কথা ব্যবহার করা অযৌক্তিক। অ্যালপো-দীনারীয় নরগোষ্ঠীর লোকেরাও আর্য ভাষাভাষী, আবার আদি-নর্ডিকেরাও তাহাই; আর দ্রাবিড় ভাষা-ভাষী লোকদের মধ্যে যে বিভিন্ন জাতি বিদ্যমান, সে ইঙ্গিতও আগেই করিয়াছি। এই কথাটা যাহাতে আমরা বিস্মৃত না হই সেই জন্য বন্ধনীর ভিতর আমি তাহা উল্লেখ করিয়া দিতেছি।

"ভারতবর্ষের সু-সভ্য, অর্ধ-সভ্য ও অ-সভ্য, সবরকমের অনার্য [ভাষাভাষী] আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে আর্য [ভাষী]দের প্রথম সংস্পর্শ হয় তো বিরোধময়ই হইয়াছিল। কিন্তু অনার্য [ভাষাভাষী] ভারতে আর্য [ভাষী]দের উপনিবেশ হইবার পর হইতেই উভয় [ভাষাভাষী] শ্রেণীর মানুষ—অনার্য [ভাষী] ও আর্য [ভাষী]—পরস্পরের প্রতিবেশ-প্রভাবে পড়িতে থাকে। আর্য [ভাষী]রা বিদেশ হইতে আগত এবং পার্থিব সভ্যতায় তাহারা খুব উচ্চে ছিল না। আর্য [ভাষী]দের ভাষা আসিয়া দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক্ ভাষাগুলিকে হীনপ্রভ করিয়া দিল; উত্তর ভারতের কোল ও দ্রাবিড় [ভাষী] অনার্য [ভাষী]দের মধ্যে ঐক্য বিষয়ক ভাষার অভাব ছিল, আর্য [ভাষী] নরগোষ্ঠীর বিজেতৃ-মর্যাদা লইয়া আর্যভাষা সে অভাব পূর্ণ করিল। ......আর্য [ভাষী নরগোষ্ঠীর] ভাষা ও আর্য [ভাষী নরগোষ্ঠীর] ধর্ম—বৈদিক ধর্ম ও বৈদিক হোম-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান—অনার্য [ভাষী]রা শিরোধার্য করিয়া লইল: অনার্য [ভাষী] আর্য [ভাষী]র পুরোহিত ব্রাহ্মণের শিক্ষাও মানিল। কিন্তু অনার্য [ভাষী নরগোষ্ঠী]র ধর্ম মরিল না, তাহাদের ইতিহাস-পুরাণও মরিল না; ক্রমে অনার্য [ভাষী নরগোষ্ঠী]র ধর্ম ও অনুষ্ঠান পৌরাণিক দেবতাবাদে পৌরাণিক পূজাদিতে, যোগচর্যায়, তান্ত্রিক মতবাদে ও অনুষ্ঠানে, অনার্যদের বংশধরদিগের দ্বারাও গৃহীত হইল। আর্য ও অনার্য [ভাষাভাষী নরগোষ্ঠীসমূহ] এই টানা ও পাড়িয়ান্ মিলাইয়া হিন্দু-সভ্যতার বস্ত্রবয়ন করা হইল।

"উত্তর ভারতের গঙ্গাতীরের আর্য [ভাষী নরগোষ্ঠী]র সভ্যতার পত্তন এইরূপে হইল। এই সভ্যতায় আর্য [ভাষী নরগোষ্ঠী] অপেক্ষা অনার্য [ভাষী নরগোষ্ঠী]র দানই অনেক বেশী—কেবল আর্য [ভাষী]দের ভাষা ইহার বাহন হইল। আর্য [ভাষী]দের আগমনের সময় হইতেই হইতেছিল; গঙ্গাতীরবর্তী দেশসমূহে ইহা আরও অধিক পরিমাণে হইল। ......বাঙ্গলা দেশে আর্য-ভাষা লইয়া যখন উত্তর ভারতের—বিহার ও হিন্দুস্থানের—লোকেরা দেখা দিল, যখন উত্তর-ভারতের মিশ্র আর্য-অনার্য [ভাষী] নরগোষ্ঠীসমূহের সৃষ্ট ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, জৈন মতবাদ বাঙ্গলা দেশে আসিল, তখন উত্তর-ভারতে মোটামুটি এক সংস্কৃতি ও এক জাত হইয়া গিয়াছে। রক্তের বিশুদ্ধি বোধহয় তখন কোনও আর্য [ভাষী নরগোষ্ঠী]র বংশীয়ের ছিল না।" *

ভাষা-বিশুদ্ধিও যে ছিল আর্যভাষী নরগোষ্ঠীর তাহাও ত মনে হয় না।

* সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য, ২য় সং ২০—২২ পৃ।



ক্রিকেট—

অধিনায়কের অবিবেচনার ফলে কিভাবে একটি দলকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয় রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার উত্তরাঞ্চলের ফাইন্যাল খেলায় সম্প্রতি তাহার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই খেলায় উত্তর ভারত দলের সহিত দক্ষিণ পাঞ্জাব দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। দল হিসাবে উভয় দলের শক্তির মধ্যে বিশেষ তারতম্য ছিল না। এইরূপ ক্ষেত্রে যে দল টসে জয়ী হয় তাহারই প্রথম ব্যাটিং গ্রহণ করা সংগত হয়। কিন্তু এই খেলায় তাহার ব্যতিক্রম করেন দক্ষিণ পাঞ্জাব দলের অধিনায়ক অমরনাথ। তিনি টসে জয়ী হইয়াও উত্তর ভারত দলকে প্রথম ব্যাটিং করিতে দেন। ফলে হইল এই প্রথম ব্যাটিং করিবার সুযোগ লাভ করিয়া উত্তর ভারত দল যে রান সংখ্যা সংগ্রহ করিল তাহা অতিক্রম করা তো দূরের কথা শেষ পর্যন্ত পিচ্ খারাপ হইয়া যাওয়ায় দক্ষিণ পাঞ্জাব দলকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল।

নিম্নে খেলার ফলাফল প্রদত্ত হইল—

উত্তর ভারত দল প্রথম ইনিংস:—৪৪৯ রান (মহম্মদ আসলাম ৯১, রামপ্রকাশ ৭৭, মুনীলাল ৫১, সবীর ১০৬ রানে ৪টি উইকেট পান)।

দক্ষিণ পাঞ্জাব দল প্রথম ইনিংস:—২৯৩ রান (মকসুদ ১৪৪, মুরাওয়াৎ ৭১, গুলজার ৩০, হাফিজ ৬৯ রানে ৩টি, চুণীলাল ৬৬ রানে ৩টি উইকেট পান)।

উত্তর ভারত দল দ্বিতীয় ইনিংস:—৭ উইকেটে ২৯৮ রান (ইমতিয়াজ নট আউট ১০০, মুনীলাল ৮৫, মহম্মদ সৈয়দ ৪৬, সবীর ৮৫ রানে ২টি, রামকিষেণ ৪০ রানে ২টি উইকেট পান)।

দক্ষিণ পাঞ্জাব দল দ্বিতীয় ইনিংস:—৯২ রান (দলজিন্দার সিং ১৬, চুণীলাল ২৫ রানে ৬টি ও বদরুদ্দিন ১১ রানে ২টি উইকেট পান)।

(খেলায় দক্ষিণ পাঞ্জাব দল ৩৬২ রানে পরাজিত হয়)।

ব্যাডমিণ্টন

বেংগল ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশনের অনুমোদিত মধ্য কলিকাতা ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা সম্প্রতি শেষ হইয়াছে। এই প্রতিযোগিতায় সিংগলস ও ডাবলস উভয় বিষয়ে সাফল্য লাভ করিয়াছেন বাঙলার বর্তমান চ্যাম্পিয়ান শ্রীযুত সুনীলকুমার বসু। শ্রীযুত সুনীল বসু তাঁহার খ্যাতি অনুযায়ীই এই প্রতিযোগিতায় কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। পর পর কয়েকটি প্রতিযোগিতায় শ্রীযুত বসুর খেলা দেখিয়া ইহাই আমাদের দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে, শ্রীযুত বসুকে এই বৎসর কোন প্রতিযোগিতায় বিশেষ করিয়া বাঙলায় পরাজয় স্বীকার করিতে দেখিব না। এইজন্য মনে হয় বাঙলার বাহিরের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় শ্রীযুত সুনীল বসুর যোগদানের সুবিধা করিয়া দেওয়া উচিত। কারণ তাহার ফলে বাঙলার খেলোয়াড়দের সম্মান বৃদ্ধি পাইবে ও সংগে সংগে শ্রীযুত বসু বিভিন্ন প্রদেশের বিশিষ্ট খেলোয়াড়দের সহিত ঘন ঘন মিলিত হইয়া নিজের দোষ ত্রুটি সংশোধন করিয়া লইতে পারিবেন। নিম্নে মধ্য কলিকাতা ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

সিংগলস ফাইন্যাল:—সুনীল বসু ১৫—৩, ১৫—৪ গেমে মনোজ গুহকে পরাজিত করেন।

ডাবলস ফাইন্যাল:—সুনীল বসু ও পি ঘোষ ১৫—৭, ১৫—৬ গেমে এস ব্যানার্জি ও বি ব্যানার্জিকে পরাজিত করেন।

কুস্তি

বংগীয় অপেশাদার কুস্তি সঙ্ঘের পরিচালকগণের আপ্রাণ চেষ্টার ফলে কুস্তি বিষয়টি বাঙলার ব্যায়াম অনুরাগীদের মধ্যে ক্রমশঃই জনপ্রিয়তা লাভ করিতেছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত আন্তঃস্কুল ও কলেজ কুস্তি প্রতিযোগিতা দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। এই প্রতিযোগিতায় খুব বেশী সংখ্যক মল্লবীর যোগদান করে নাই সত্য, কিন্তু কয়েকটি বিভাগে উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। বাঙলার স্কুল ও কলেজসমূহের মধ্যে ইহার বিশেষ প্রচারের ব্যবস্থা করিলে সারা বাঙলা দেশ হইতে আগামী বৎসরে বহুসংখ্যক স্কুল ও কলেজের ছাত্রকে যোগদান করিতে দেখা যাইবে ইহা আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি। এইজন্য প্রয়োজন বংগীয় অপেশাদার কুস্তি সঙ্ঘের পরিচালকদের প্রচারপত্র বাহির করা। যাহাতে কুস্তির কৌশল ও গুণাগুণ সম্পর্কে বিশদভাবে বর্ণনা করা থাকিবে। আমরা আশা করি সঙ্ঘের কর্তৃপক্ষগণ শীঘ্রই ইহার ব্যবস্থা করিবেন। নিম্নে ফলাফল প্রদত্ত হইল:—

স্কুল বিভাগ

৫ স্টোন বিভাগ:—বিমল কোলে (শ্যামাপদ ইনষ্টিটিউশন) ব্যোমকেশ ঘোষকে (ক্যালকাটা বয়েজ) পরাজিত করে।

৬ স্টোন বিভাগ:—হরি সাহা (ভারতী মডেল) শিবশঙ্কর ঘোষালকে (বালী রিভার ভিউ) পরাজিত করে।

৭ স্টোন বিভাগ:—সতোন অর্ণব (চেতলা বয়েজ) গঙ্গা মজুমদারকে (বালী রিভারভিউ) পরাজিত করে।

৮ স্টোন বিভাগ:—জ্যোতিষ ঘোষ (ক্যালকাটা বয়েজ) দীলিপ মুখার্জিকে (বালী রিভার ভিউ) পরাজিত করে।

কলেজ বিভাগ

কমলা ঘোষ (বংগবাসী কলেজ) মৃণাল বসুকে (আশুতোষ কলেজ) পরাজিত করে।

হকি—

বাঙলার হকি খেলার মরশুম আগতপ্রায়। ইতিমধ্যে বাঙলার বিশিষ্ট ক্লাবের পরিচালকগণ নিজ নিজ দল গঠন করিয়া অনুশীলন খেলার ব্যবস্থা করিতেছেন। এই সকল খেলা দেখিয়া আমরা খুব উৎসাহ লাভ করিতে পারিতেছি না। হকির স্ট্যাণ্ডার্ড বাঙলাদেশে যেরূপ নিম্নস্তরের হইয়া পড়িয়াছে তাহাতে কেবল অনুশীলন খেলায় যোগদান করিবার ব্যবস্থা করিলেই ক্রমোন্নতির ব্যবস্থা করা হইবে না। ইহার জন্য চাই উপযুক্ত শিক্ষা। এই শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য বহু বৎসর ধরিয়াই আমরা বলিতেছি কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের সেই উক্তির কোনই স্থায়ী ফল হয় নাই। এই বৎসরের মরশুমের প্রথম হইতে সেইরূপ কোন কার্যকরী ব্যবস্থা হইলে আমরা বিশেষ সুখী হইব।

ভারোত্তোলন—

বংগীয় এমেচার ভারোত্তোলন এসোসিয়েশনের প্রতিযোগিতার তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু উৎসাহী বাঙালী ভারোত্তোলনকারিগণ কিরূপে সহজে বর্তমানের বিজ্ঞান সম্মত ভারোত্তোলন শিক্ষা করিতে পারেন এবং সেইরূপ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা সঙ্ঘ করিয়াছেন কিনা তাহার কোন সংবাদ আমরা অবগত নহি। যদি এইরূপ কোন ব্যবস্থা হইয়া থাকে সঙ্ঘের পরিচালকদের উচিত অনতিবিলম্বে তাহার বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করা। ভারোত্তোলন বিষয়ে বাঙলা বর্তমানে ভারতের প্রায় সকল প্রদেশকে দলগত প্রতিযোগিতায় পরাজিত করিতে পারে। যাহাতে সেই খ্যাতি, সেই গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকে তাহার দিকে সঙ্ঘের পরিচালকগণের প্রখর দৃষ্টি রাখা কি উচিত নহে?

সাইকেল চালনা—

বাঙলার খ্যাতনামা সাইকেল চালকগণ একত্র হইয়া "ইউনিয়ন" গঠন করিয়া সাইকেল চালনার বিভিন্ন কৌশল শিক্ষা দিবার যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমরা খুবই আনন্দিত হইলাম। অদূর ভবিষ্যতে বিভিন্ন স্পোর্টস অনুষ্ঠানে গিয়া সাইকেল প্রতিযোগিতা "নো রেস" বলিয়া ঘোষিত হইতেছে দেখিতে হইবে না বলিয়াই আশা করি। নবগঠিত "বেংগল সাইক্লিস্ট" ইউনিয়নের পরিচালকগণ সারা বাঙলার ক্রীড়ামোদীর সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করুন ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

অদ্ভুত খামখেয়ালীর জন্যে ভারত সরকারের তুলনা সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে পাওয়া সত্যিই দুষ্কর হ'য়ে উঠেছে। অন্যদিকের বহু রকমের খামখেয়ালীর পরিচয় প্রতিনিয়তই পাওয়া যাচ্ছে, সে নিয়ে আলোচনা আর কি ক'রবো, কিন্তু সম্প্রতি ফিল্মের লাইসেন্স প্রাপ্তি প্রসঙ্গে যে সব সর্ত আরোপ করা হ'য়েছে তা বিচার ক'রতে গেলে ভারত সরকারের বড় বড় মাতব্বরদের বিবেচনাশক্তির বিচিত্র পরিচয়ে স্তম্ভিত হ'তে হয়।

এই সব সর্তের মধ্যে রয়েছে, কেউ ফিল্মের লাইসেন্সের জন্যে আবেদন করলে তাকে সেই সঙ্গে মহাজনের সঙ্গে সে যা



'মন-কী-জীত' চিত্রে নীনা

চুক্তি ক'রেছে সেই চুক্তির খসড়া, চিত্রের কাহিনী এবং প্রধান অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের সঙ্গে চুক্তির খসড়া পাঠিয়ে দিতে হবে।

এ থেকে এমন মনে করা অসঙ্গত হবে না যে, যে কেউ ওপরের সর্তগুলি পূরণ ক'রবে সে-ই লাইসেন্স পাবার অধিকারী হবে। তা যদি না হয় তো ওপরের সর্তগুলির কোন মানেই হয় না। যথারীতি সর্তগুলি পালন ক'রে আবেদন করার পর যদি কেউ লাইসেন্স পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয় তার অবস্থাটা সরকারী বিশেষজ্ঞরা অনুভব করার চেষ্টা করে নি—চুক্তি রক্ষা না ক'রতে পারার জন্য তাকে যে দায়ে পড়তে হবে তা থেকে বাঁচাবার ব্যবস্থা সরকারী কর্তৃপক্ষ কি ক'রেছেন? তা ছাড়া লাইসেন্স হাতে না পেলে অন্তত পাবার পুরো সম্ভাবনা না দেখলে কোন্ মহাজন টাকা আগিয়ে দেবে?

সরকারী কর্তৃপক্ষ ঐ সর্তগুলি অনুমোদনের জন্যে ফিল্ম এডভাইসরী বোর্ডে পেশ ক'রেছিল। বোর্ড তাদের গত কলিকাতার অধিবেশনে তা বাতিল ক'রে দেয়; তা সত্ত্বেও এটা আইনে পরিণত করা হ'য়েছে। এখানে আর একটা কথা হচ্ছে

রঙ্গ জগৎ

এই যে, যদি বোর্ডের কথা না-ই মানা হবে তো বোর্ড গঠন করার কি দরকার ছিল; কি দরকার ছিল বোর্ডকে এমন হাস্যাস্পদ অবস্থায় টেনে আনার? যাই হোক ভারতীয় চলচ্চিত্র সংঘ এই অদ্ভুত আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের বন্দোবস্ত ক'রেছে।

নূতন ও আগামী আকর্ষণ

এ সপ্তাহের নূতন আকর্ষণ হ'চ্ছে উত্তরা-পূরবী-পূর্ণতে এস ডি প্রডাকসন্সের 'কতদূরে' যার কাহিনী রচয়িতা প্রেমেন্দ্র মিত্র, পরিচালক চিত্ত বসু, সুরযোজক রবীন চট্টোপাধ্যায় আর ভূমিকায় মলিনা, জহর, পূর্ণিমা, ধীরাজ, শৈলেন চৌধুরী, শ্যাম লাহা, প্রভা, রেবা প্রভৃতি এবং গণেশ টকীতে কীর্তি পিকচার্সের শোভনা সমর্থ তারকায়িত 'বরাত'।

*

এ সপ্তাহে নতুন নাটক হ'চ্ছে স্টারে 'উষাহরণ'—নাট্যরচনা ও পরিচালনা মহেন্দ্র গুপ্তের এবং ভূমিকায় আছেন জয়নারায়ণ, সিধু গাঙ্গুলী, বীণা দেবী, অপর্ণা দেবী, যূথিকা দেবী, পূর্ণিমা ও হরিমতী।

*

আগামী চিত্রাকর্ষণের মধ্যে রয়েছে সেন্ট্রালে মিনার্ভা মুভীটোনের "ডাঃ কুমার" সম্ভবতঃ আসছে সপ্তাহে। আর সিটি ও পার্ক শো হাউসে শালিমার পিকচার্সের 'মন-কী-জীত' যার ভূমিকায় আছেন নীনা শ্যাম।

বিবিধ

দিল্লীতে 'চল চলরে নওজোয়ান'এর টিকিট কাটতে গিয়ে ভীড়ের চাপে একটি ১৪ বৎসরের বালক মারা গিয়েছে।

*

অভিনয়-শিল্পীরাও এখন 'চোরা' টাকা নিতে আরম্ভ ক'রেছে। পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকায় কারুর চুক্তি হ'লে সে ব্যক্তি কতকাংশ লেখাপড়ার মধ্যে রাখে আর বাকী অংশ আয়কর বাঁচাবার জন্যে 'চোরা'ভাবে গ্রহণ করে।

*

বম্বে টকীজের নতুন তারকা মৃদুলা দিল্লীর গুলাল নামক এক কায়স্থ যুবকের সঙ্গে গত সপ্তাহে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে।

*

তলোয়ার প্রডাকসন্সের আর সি তলোয়ার তার পরবর্তী ছবি অর্ধেক লাহোরে শেষ ক'রে বাকী অর্ধেক এখানে শ্রীভারতলক্ষ্মীতে শেষ ক'রেছে। এর পরের ছবিও এইখানে তোলার চুক্তি সুসম্পন্ন হয়েছে।

*

সন্ রাইজ পিকচার্সের মালিক পরিচালক ভি এম ব্যাস শোনা যাচ্ছে বড়ুয়ার সঙ্গে একখানা ছবির চুক্তি করেছে, এবং আর একখানা ছবিতে কাননকে নায়িকা হবার চুক্তি ক'রেছে। দু'খানি ছবিই অবশ্য এখানে তোলা হবে।

*

নিউ টকীজ তাদের পরবর্তী ছবি পরিচালনার জন্য বড়ুয়ার সঙ্গে চুক্তি ক'রেছে।

*

বম্বের অভিনেত্রী বিমলা বশিষ্ঠের স্বামী ডি বি বশিষ্ঠ এই বলে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা রুজু ক'রেছে যে, তার অনুপস্থিতিতে বিমলা মিঃ মালেকর, কালে ও যোগলেকর নামক তিন ব্যক্তির সঙ্গে একজোটে কতকগুলি মাওয়ালি গুণ্ডাকে ঘরে এনে তার ভগিনী ও ভাগ্নিকে ভয় দেখায় এবং ঘরের জিনিসপত্র নষ্ট করে।

*

স্বাধীন প্রযোজক সংঘ ভারত সরকারকে ভারতীয় চিত্রশিল্পের জন্য একটি পরামর্শ সভা প্রতিষ্ঠার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। এই পরামর্শ সভায় থাকবে স্বাধীনচেতা জননেতা, প্রযোজক, পরিবেশক, প্রদর্শক ও শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের প্রতিনিধি।



প্রভাত ফিল্মসের 'চাঁদ' চিত্রে প্রেম অদীব, বেগম পারা ও সিতারা



[১৩]

সে-রাত্রে সঞ্জীববাবুও মীরগঞ্জ থেকে গাঁয়ে ফিরেছেন। তিনি এখনো ওকালতী ছাড়তে পারেননি, কিন্তু ছেড়ে দেবেন বোধ হয়। প্রতিবেশীরা দলে দলে এসেছে, সঞ্জীববাবুর মত লোকের মুখে ও স্বকর্ণে এক অদ্ভুত বার্তা শুনে গেছে। ইংরেজের আদালতে আর প্রয়োজন নেই, এবার স্বরাজের আদালত হবে, নতুন করে পঞ্চায়েৎ গড়ে উঠবে। মাসে হাজার টাকা রোজগারের লোভ অবহেলায় দূরে ঠেলে দিয়ে, সঞ্জীববাবুর মত বিষয়ী লোকেও আজ এত বিহ্বল হয়ে পড়েছে কিসের জন্য, কোন্ পরম লাভের আশায়? মনে মনে এই প্রশ্নের বিচার ক'রে সন্দেহ আর থাকে না যে সব দিক্ দিয়ে আজ এক নতুন হাওয়া বইতে সুরু করেছে। একটা নতুন পরিণাম এগিয়ে আসছে। আর চুপ করে বসে থাকার উপায় নেই। চুপ করে বসে থাকাও সুবুদ্ধির কাজ হবে না। যারা সাড়া দেবে, তারাই এই নতুন হাওয়ার বেগে এগিয়ে যাবে। যারা সাড়া দেবে না, তারা ভেঙে পড়বে, তারা আর উঠতে পারবে না।

ইংরিজী স্কুলের ছেলেরা এসে নিঃসংশয় হয়ে গেল, কাল থেকেই নতুন করে তোড়জোড় করতে হবে, জাতীয় বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা হবে। সঞ্জীববাবু পাঁচশো টাকা দেবেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

স্কুলের ছেলেরা মাধুরীর সঙ্গে আলোচনা করলো—নতুন জাতীয় বিদ্যাপীঠের শিক্ষক কে হবেন? শুধু ছাত্র নিয়েই স্কুল হবে না, শিক্ষক চাই। দিনমণি বিশ্বাসের ষড়যন্ত্রে কোন শিক্ষক সাড়া দেবে না। জাতীয় বিদ্যাপীঠের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক চাই।

মাধুরী বললো—আপাতত পড়াবার মত একজন আছে, কেউ না আসে সে একাই কাজ আরম্ভ করে দেবে।

ছাত্রেরা কিছুক্ষণ কৌতূহল চাপা দিয়ে চুপ করে রইল। আভাসে তারা যেন খানিকটা বুঝতে পেরেছে, কে এই একা একজন। তাঁর নামে অনেকদিন থেকে অনেক কাহিনী শুনেছে তারা, তাঁকে অনেকদিন আগেই তারা দেখেছে, আজও তাঁকে মনে পড়ে। শোনা যাচ্ছে, সেই মাস্টারমশায় নাকি ফিরে এসেছেন, আবার পাঁচ বছর পরে।

ছাত্রদের কৌতূহল আর প্রশ্নের জবাব দিয়ে মাধুরী বললো—আপাতত আমিই পড়াবো।

ছাত্রেরা মনে মনে অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো। তাদের অনুমান সত্য হলো না। তবু ভাল, তবু নিঃসন্দেহে এটা অনেক গর্বের বিষয় যে মাধুরীদি পড়াবেন। একেবারে নতুনের চেয়েও নতুন এই প্রস্তাব। কী মোহ, কী সুন্দর রূপ নিয়ে আসছে তাদের নতুন জাতীয় বিদ্যাপীঠ। ছেলেদের আনন্দ আর হর্ষের সীমা ছিল না।

প্রতিবেশীরা চলে গেল, ছাত্রেরা চলে গেল। সমস্ত দিনের উত্তেজনার পর্ব যেন এতক্ষণে শান্ত হলো। এতক্ষণ পরে মাধুরী বুঝতে পারলো, শুধু শরীরটা নয়, তার মনটাও কত ক্লান্ত হয়েছে। এতক্ষণে গাঁয়ের বাড়ির শান্তি যেন একটা জ্বরের বিকারের মধ্যে লুপ্ত হয়ে ছিল। ধীরে ধীরে ঝিঁঝিঁর ডাকের সুরে এক পরিচিত স্তব্ধতার আস্বাদ আবার চার দিক থেকে সত্য হয়ে উঠেছে। হঠাৎ মনে হয়, আজকের সারাদিনের চাঞ্চল্য আর উত্তেজনা যেন একটা অভিনয়ের মত পার হয়ে গেছে। যেন মিছামিছি অনেক কথা জোর করে চেঁচিয়ে বলা হয়েছে, একটু নির্লজ্জ হয়েই অনেক কিছু করা হয়েছে। এতটা না হলেই ভাল ছিল।

কিন্তু এতটা লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই মাধুরীর। কেউ তাকে আজ প্রশ্ন করবে না, কেউ ত্রুটি ধরবে না, কেউ তার ভুল ধরিয়ে দিতে আসবে না। সবাই মুগ্ধ হয়ে গেছে। সারা মান্দারগাঁয়ের লোক শতমুখে প্রশংসা করছে। মাধুরীকে উপদেশ দেবার মত লোক আজ আর মান্দারগাঁয়ে কেউ নেই, সবাই তারই উপদেশ শুনছে। মাধুরীর স্বদেশীপনার দিকে ভ্রূকুটি করে আসবার মত দুঃসাহস রাখে, এমন কোন লোক নেই। সমালোচনা করার মত সাহস রাখে, এমন কেউ নেই। কাজেই কোন সঙ্কোচের কারণ নেই মাধুরীর। দ্বিধা করা, সঙ্কোচ করার কোন প্রশ্ন আসে না। তার জীবনে হঠাৎ এক নতুন অধ্যায়ের পাতা খুলে গেছে। সঞ্জীব চাটুয্যের মেয়ে বলে, এ গাঁয়েরই মেয়ে বলে, তার ব্যক্তিত্ব আজ আর কোন গৃহকোণে বা পাড়ার পথে আবদ্ধ নয়। অফুরন্ত সুযোগে, অবাধ অভিনন্দনে আর সম্ভ্রমে আজ তারই কাছে হাজার মানুষের কাজের পথ দেখাবার দায় চলে এসেছে।

মাধুরী নিজেই আশ্চর্য হয়, পাঁচ বছর আগে সে কল্পনাও করতে পারেনি, জীবনের পথ এভাবে সমতল ছেড়ে, এক বিচিত্র আদর্শের খাড়াই ধরে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যাবে উঁচু হয়ে। বোধ হয় অনেক দূর এগিয়ে এসেছে মাধুরী, তাই একটু ভয় হয়। এ শুধু ওঠার পথ, এ পথে নামবার কোন নিয়ম নেই, সুযোগ নেই। ভুল করলে, দ্বিধা করলে, ফিরে তাকালে শুধু পতনের ভয়টাই সুনিশ্চিত। কিন্তু পাঁচ বছর আগে.....।

বাইরের বারান্দায় সঞ্জীববাবুর সঙ্গে একটি পরিচিত গলার স্বরের আওয়াজে সত্যিই ভয় পেয়ে চমকে উঠলে মাধুরী। অজয়দার গলার স্বর। আজকের রাতের অন্ধকার এক পাশে সরিয়ে রেখে পাঁচ বছর আগের ঘটনাগুলির দূত হয়ে যেন অজয়দার মূর্তিটা পৌঁছে গেছে। মাধুরী শুনছিল, অজয়দা তেমনি আগের মত হেসে হেসে চেঁচিয়ে কথা বলছেন। একটুও পরিবর্তন হয়নি। পাঁচ বছরের মধ্যে সঞ্জীববাবু কত বড়লোক হয়ে গেছেন, সে খবরও যেন রাখে না অজয়দা। বোধ হয় কোন খবরই রাখেন না। নইলে এত নিঃসঙ্কোচে ঠিক পাঁচ বছর আগের সাহস, সজীবতা আর অধিকার নিয়ে আজ আলাপ করতে পারতেন না। সমস্ত ব্যাপারটা কেবল বিশদৃশ মনে হয়। জীবনে কোন ব্যতিক্রমকে গাঁয়ের লোকেরা যেন মানতে চায় না। কেমন একটা অন্ধ মোহ নিয়ে, মনের জিদের নেশায় অতীতের সত্যকে আঁকড়ে ধরে এরা কেমন একটু অদ্ভুত রকমের কাঠিন্য ও অটুট হয়ে থাকে। আজ যা ভুলে যাওয়া উচিত, বার বার যেন অতীতের দোহাই আর সাক্ষ্য দিয়ে এরা স্মরণ করিয়ে দেয় যে—না, ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

হঠাৎ মাধুরীর মনে হয়, গাঁয়ে ফিরে আসাই তার ভুল হয়েছে।

সঞ্জীববাবু ডাক দিলেন—এদিকে একবার এস মাধুরী।

কিছুক্ষণ চুপ হয়ে থেকে মাধুরী যেন মনে মনে তার ক্ষণিকের বিভ্রান্তি ও

বিচলতাকে অহংকারের জোরে শান্ত করে নিল। সঙ্কোচ করে কোন লাভ নেই। ভয় পাবার কোন দরকার পড়ে না। সে এগিয়ে যাবে, অজয়দার সামনে দাঁড়াবে, প্রতিটি প্রশ্নের তেমনি করে উত্তর দেবে। অজয়দা বুঝবে, পাঁচ বছরের ঘটনায় একেবারে বদলে যাওয়া নতুন একটি মেয়ের সঙ্গে তিনি আজ আলাপ করছেন। এত হেসে হেসে চেঁচিয়ে কথা বলার অন্তরঙ্গতা আজ ঠিক আর খাপ খায় না। এই সত্য যদি অজয়দা না বুঝে থাকে, তবে আজ বুঝে যেতে হবে।

মাধুরী এগিয়ে যেতেই অজয় চেঁচিয়ে অভিনন্দন জানালো—এই যে, কেমন আছ? কী ভয়ঙ্কর লীডার হয়ে গেছ।

সেই মুহূর্তে মনে মনে ছোট হয়ে যেন মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল মাধুরী। অজয়দার কথার প্রতিধ্বনিতে পাঁচ বছরের ঘটনায় মনে নতুনত্বের উচ্ছ্বাস যেন হঠাৎ চাপা পড়ে গেল। মাধুরীকে টেনে এনে দাঁড় করিয়ে দিল, পাঁচ বছর আগের এক সন্ধ্যায় দিঘিরঘাটের পথে।

অজয় বললো—শুনেছ বোধ হয়, কেশব জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে।

সঞ্জীববাবু একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—কেশব ছাড়া পেয়েছে? কবে?

অজয়—এই তো ক'দিন হলো?

সঞ্জীববাবু—কেমন আছে কেশব?

অজয়—ভাল আছে। ঠিক সেই রকমই আছে। আপনি তো ওকে ভাল করেই চেনেন ও চিরকাল ভালই থাকবে। অদ্ভুত মানুষ, ঠিক তেমনি স্ফূর্তি হাসি আর উৎসাহ। ঠিক তেমনি সাহস।

সঞ্জীববাবু একটু গম্ভীর হয়ে বললেন—হুঁ।

অজয় বললে—আচ্ছা, আমি উঠি এইবার।

পরমুহূর্তে মাধুরীর দিকে একবার তাকালো অজয়। এই ইঙ্গিতের অর্থ বুঝতে দেরী হয় নি মাধুরীর। লণ্ঠনটা হাতে তুলে নিয়ে অজয়ের সঙ্গে বারান্দা থেকে কিছু দূরে এগিয়ে এল মাধুরী।

অজয় বললো—কেশব ভাল নেই মাধুরী।

মাধুরী কোন উত্তর দিল না।

অজয়—কিরকম যেন হয়ে গেছে। ওর মুখের দিকে তাকাতে পারি না।

মাধুরী দাঁড়িয়ে পড়লো।

অজয়—তোমার কাছেই এই কথাটা জানাতে এসেছিলাম। কেশবের সঙ্গে তোমার একবার দেখা করা উচিত।

অনেক চেষ্টা করেও কোন কথার উত্তর দিতে পারলো না মাধুরী। তার পাঁচ বছরের শহুরে শিক্ষাদীক্ষার গর্ব যেন হঠাৎ ব্যর্থ হয়ে গেল। আজ অজয়দার অনুরোধের উত্তরে যা বলা উচিত ছিল, তার একটিও বলা হলো না। শুধু অজয় চলে যাবার পর মাধুরী বুঝতে পারলো, তার সংকোচের ভুলে কী ভয়ানক একটা পরাভব ক্ষণিকের জন্য সে স্বীকার করে নিল। একেবারে ভুল বুঝে, এক অসম্ভবের আশ্বাস নিয়ে অজয়দা চলে গেল।

অকারণে ঘর আর বারান্দার চার দিকে ছটফট্ করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো মাধুরী। সঞ্জীববাবু বার বার জিজ্ঞেস করছিলেন—কাল কি প্রোগ্রাম আছে মাধুরী?

গুছিয়ে কোন উত্তর দিতে পারছিল না মাধুরী। কালকের প্রোগ্রামের যেন শেষ নেই, স্বরূপ নেই। পিকেটিং হবে আফিমের দোকানে, জাতীয় বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা হবে, চরকা বিলি হবে।......আবার জনসভা হবে। আবার গান, পতাকা বন্দনা আর বিলিতি বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব। যেন অনন্তকাল এই প্রোগ্রাম চলবে। তারপর কি আছে বা কি হবে, মাধুরী তা জানে না। তার পরের কথা ভাববার মত শক্তি নেই তার। মাধুরী শুধু জানে, এই বিচিত্র কাজের চাঞ্চল্য মদিরতা আর মুক্তির প্রতিধ্বনিময় এক পথের ওপর সে তার সত্তাকে কোন্ এক আবেগের লগ্নে ছেড়ে দিয়েছে, এখন শুধু তাকে চলতে হবে। থামতে বা ফিরে যেতে তার আর সাধ্য নেই।

এতটা উতলা হবার কি কারণ ছিল মাধুরীর? ক্ষণে ক্ষণে থেমে যাবার, ফিরে যাবার কথা মনে জাগে কেন? একা পথ চলার এই উদ্দীপনার মধ্যে বৃথা কেন অবসন্নতার ইঙ্গিত অলক্ষ্যে ভেসে আসে?

সকল জয়ধ্বনির পুরোভাগে দাঁড়িয়ে তবু রিক্ততার রেহাই পায় না, এ মনস্তত্ত্বের কোন মীমাংসা পায় না মাধুরী। শুধু এক একবার মনে হয়, জীবনের যে কোন কাজের পথে একা চলার মধ্যেই রিক্ততার অভিশাপ আছে। সকল তৃপ্তি উৎসাহ আর বিশ্বাসের ঐশ্বর্য মন ভরে উঠতে পারে, যদি এই পথচলার আগে আগে একটি শ্রদ্ধেয় মূর্তি পথ দেখিয়ে চলে, হৃদয়ের সকল নিষ্ঠা দিয়ে যাকে উপাসনা করতে পারা যায়; সকল ভাবনা করার দায় সঁপে দেওয়া যায়; নিজেকে আর কষ্ট করে কিছু ভাবতে হয় না, বিচার করতে হয় না, নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে শুধু তারই পেছনে সারা জীবন ধরে চলা যায়—এমন একটি নায়কের মূর্তিকে আজ আবাহন করতে ইচ্ছে করে।

শুধু ইচ্ছে করে, তা নয়। মাধুরীর মনের পাঁচ বছরের নতুন সংস্কারের গর্ব চূর্ণ হয়ে যায়। মাধুরী সেই মূর্তিকে তার মনের অগোচরের একান্তে আজ আবার আবিষ্কার করতে পারে। সে আজও রয়েছে। পাঁচ বছর ধরে নির্বাসনের আড়ালেও সে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। সে আবার ফিরে এসেছে। এই মাত্র অজয়দা বলে গেলেন, সে নাকি ঠিক তেমনিই আছে, তেমনই উৎসাহী হাসিখুশী ও দুঃসাহসী। সে চিরকাল এমনিই ভাল থাকবে, চিরকালের ভাল দিয়ে তার অদৃষ্ট গড়া। তার তুলনা হয় না।

মাধুরীর মনের দুর্বলতা ছাপিয়ে সকল স্মৃতির অভিমান প্রগল্ভ হয়ে ওঠে। আর্য পাঠশালার আঙিনায় সার বেঁধে দাঁড়িয়ে নামতা পড়ার গুঞ্জরণের মধ্যে সেই কিশোর গুরুর মূর্তি আজও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সকল খেলাধুলায়, মেলায়, উৎসবে ও দীপালিতে তারই ইঙ্গিতে ও অনুশাসনে, কানে কানে বলা শত কথার পুলক একদিন যে-কাহিনীকে সত্য করে তুলেছিল, তার আবেদন যেন নেহাৎ লুকোচুরি খেলার ছলে কোথাও দূরে সরেছিল। সময়ের ব্যবধানে, অদেখার অবহেলার মধ্যেও সেই অর্বাচীন দিনের সত্য-মিথ্যা আজও এত প্রখর হয়ে বেঁচে থাকবে, এ-ধারণা মাধুরী করতে পারে নি। কিন্তু আবার হার মানতে হয়। মান্দার গাঁয়ের আলো-বাতাস যেন প্রতিশোধ নেবার জন্য তৈরী হয়ে উঠছে। নইলে, ঠিক সময় বুঝে আজ তার নির্বাসনের পালা শেষ হয় কেন?

সঞ্জীববাবুর ডাকাডাকির উপদ্রবে মাধুরী কিছুক্ষণের জন্য আনমনা আবেশ থেকে মুক্ত হয়ে আবার কাজের ব্যস্ততার মধ্যে ছুটাছুটি করে বেড়ালো।

সঞ্জীববাবু এক কাপ চা খাবার জন্য তাগিদ দিচ্ছিলেন। একটা কাজের অবলম্বন পেয়ে আধ ঘণ্টার মত তবু এই তীব্র চিন্তার বেদনা থেকে একটা রেহাই পেল মাধুরী।

তারপর? আর কোন কাজ না পেলে আবার বিপদে পড়তে হবে। মনে হয় চিন্তাগুলি আশেপাশেই, এই ঘরের আনাচে কানাচে গা-ঢাকা দিয়েছে। একটু স্থির হয়ে বসলেই, এক বিভ্রান্তির জ্বালা ছড়িয়ে তারা আবার দেখা দেবে। সারাদিনের এই অভিনয়ের উন্মাদনার পর একটু ঘুমের শান্তিও দুরাশা হয়ে উঠবে। আজকের মত যেন আর তাকে ভাবতে না হয়। কাল আবার কেটে যাবে। আবার কাজের প্রোগ্রাম শত জয়ধ্বনির মধ্য সহর্ষে দেখা দেবে। অজয়দার ভয়াবহ অনুরোধ আবার সেই হর্ষের বেগে দূরে সরে যাবে।

(ক্রমশ)

ইউরোপের পূর্ব রণাঙ্গনে সোভিয়েট বাহিনীর ব্যাপক ও প্রচন্ড আক্রমণ যে জার্মানীর পক্ষে বেশ শঙ্কাজনক অবস্থার সৃষ্টি করেছে, গত সপ্তাহে আমরা ঐ রণাঙ্গনের যে বিবরণ দিয়েছিলাম তা থেকেই সে কথা বোঝা যাবে। সম্প্রতি এই অবস্থা আরও ঘোরালো হয়ে উঠেছে। জার্মান সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান থেকেই সংবাদ দিয়েছে যে, সোভিয়েট কামানের গোলা-বর্ষণে কেনিগস্‌বার্গের বাড়িঘর আর রাস্তায় রাস্তায় আগুন জ্বলছে। কেনিগস্‌বার্গের অধিবাসীরা পিলাউয়ের দিকে পালাচ্ছে। পিলাউ হ'ল কেনিগস্‌বার্গের পশ্চিমে অবস্থিত বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী একটি বন্দর। কেনিগস্‌বার্গ থেকে ঐ বন্দরের দূরত্ব হল ২৯ মাইল। পিলাউ থেকে কেনিগস্‌বার্গ পর্যন্ত নাব্য খাল আছে। পিলাউয়ে জাহাজ তৈয়ারীর কারখানা ছিল। সোভিয়েট ইস্তাহারে বলা হয়েছে, রুশ বাহিনী দু'জায়গায় কেনিগস্‌বার্গের ২ মাইলের মধ্যে পৌঁছেছে। তা ছাড়া বাল্টিক অঞ্চলে রুশ বাহিনী নূতন দিকে আক্রমণ চালিয়ে লিথুয়ানিয়ার অন্তর্গত মেমেল অধিকার করেছে। রয়টার বলেছেন মেমেল অধিকার করার ফলে লিথুয়ানিয়া থেকে জার্মানরা সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হয়েছে। মেমেলও বাল্টিক সাগরের তীরবর্তী একটি প্রসিদ্ধ বন্দর। কাঠের ব্যবসার খুব বড় কেন্দ্র। যুদ্ধের পূর্বে এখানেও জাহাজ তৈয়ারীর কারখানা ছিল। মেমেলের গুরুত্ব বুঝতে হলে তার পূর্ব বিবরণ সংক্ষেপে জানা দরকার। মেমেল বন্দর ও তাহার সংশ্লিষ্ট স্থান মেমেল অঞ্চল বলে পরিচিত। এই মেমেল অঞ্চলের আয়তন হবে প্রায় এক হাজার বর্গ মাইল। আর বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময় লোকসংখ্যা ছিল দেড় লক্ষের মত। অধিবাসীদের অধিকাংশই ছিল জার্মান। গত মহাযুদ্ধের পূর্বে মেমেল অঞ্চল জার্মানীর অন্তর্গত ছিল। কিন্তু ভার্সাই চুক্তি অনুসারে এ অঞ্চল জার্মানী থেকে বিচ্ছিন্ন করে লিথুয়ানিয়ার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। লিথুয়ানিয়ার বাল্টিক সাগরে বেরোবার কোন ভাল পথ নেই, তার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্যে এই অঞ্চল তার সঙ্গে যুক্ত করা হল বলে তখন যুক্তি দেখানো হয়েছিল। প্রথম অবস্থায় এই অঞ্চল মিত্রশক্তিবর্গের রাষ্ট্রদূত সম্মেলনের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১৯২৩ সালের প্রথম ভাগে লিথুয়ানিয়া রাষ্ট্র ঐ অঞ্চলে নিজের অধিকার বিস্তৃত করেন। মিত্রশক্তিবর্গ তাদের এ কাজ মেনে নেন। ১৯৩৯ সালে চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকারের পর ২২শে মার্চ জার্মানী লিথুয়ানিয়াকে এক চরমপত্র দেন। তার ফলে লিথুয়ানিয়া এই অঞ্চল জার্মানীর হাতে সমর্পণ করে। বাল্টিক সাগরে আসার জন্য লিথুয়ানিয়াকে

সময়প্রসঙ্গ

একটি পথ দেওয়া হয়। মার্শাল রকোস্‌ভস্কির সৈন্যদল কুলমের (কেলমনো) নিকটে ভিশ্চুলা নদী পার হয়ে ডানজিগের দিকে অগ্রসর হচ্ছে বলেও সংবাদ পাওয়া গেছে।

মার্শাল স্ট্যালিন সর্বশেষ যে ঘোষণা করেছেন তা থেকে জানা যায় যে, মার্শাল জুকভের যে ব্যূহমুখ বার্লিনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে তাদের দূরত্ব এখন বার্লিন থেকে ৯২ মাইল। পোজনানের পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে লালফৌজ প্রবেশ করেছে। অবশ্য সংবাদ পাওয়া গেছে পোজনান অঞ্চলে জার্মানরা খুব প্রবলভাবে

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণীর শারীরিক অসুস্থতার জন্য এ সপ্তাহে তাঁহার আত্মকথা (ঝরাপাতা) প্রকাশ করা সম্ভব হইল না। তিনি সুস্থ হইয়া না উঠা পর্যন্ত উহার প্রকাশ স্থগিত থাকিবে।

—সম্পাদক, 'দেশ'

বাধা দিচ্ছে। আরও জানা গেছে জার্মানরা পোল্যান্ড ও জার্মানীর সীমান্তের নিকটবর্তী জার্মানীর অন্তর্গত ক্রোয়েৎস্‌ শহর জার্মানরা পরিত্যাগ করে গেছে। এখান থেকে বার্লিনাভিমুখী পথ ও রেলপথ আছে। লালফৌজ জার্মানীর পোমারানিয়া প্রদেশে প্রবেশ করেছে বলেও মার্শাল স্ট্যালিনের ঘোষণা থেকে জানা গেছে।

এ ছাড়া চেকোশ্লোভাকিয়ার অন্তর্গত পোপরাদ ও ক্র্যাকাউয়ের ৪০ মাইল দক্ষিণে নভিটার্গ রুশ সৈন্যরা দখল করেছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। ব্রেসলাউ বিপন্ন হয়ে পড়েছে সংবাদ থেকে এও জানা গেছে। বুদাপেস্ট অঞ্চলে জার্মানরা এখনও প্রবল প্রতিরোধ চালাচ্ছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। আর দুটী উল্লেখযোগ্য সংবাদ হল এই যে, হিটলার পূর্ব প্রুশিয়া থেকে হেড কোয়ার্টার সালস্‌বার্গের নিকটবর্তী ওয়েস্থাইস দুর্গে সরিয়ে নিয়ে গেছেন এবং পশ্চিম রণাঙ্গন থেকে পূর্ব রণাঙ্গনে জার্মান সৈন্য প্রেরিত হচ্ছে বলে রয়টারের সংবাদদাতা অনুমান করছেন।

পূর্ব রণাঙ্গনে রুশ বাহিনীর দ্রুত সাফল্য এবং এই রণাঙ্গনের প্রায় সর্বত্রই জার্মান সৈন্যদের দৃঢ় প্রতিরোধের অভাব সকলেরই মনে অল্পবিস্তর বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। বুদাপেস্তে জার্মাণ বাহিনীর মরণপণ প্রতিরোধ ও পশ্চিম রণাঙ্গনে তার আকস্মিক প্রচন্ড আঘাতের সংবাদ আমরা পেয়েছি এবং মিত্রপক্ষের নেতৃবর্গের মুখে ব্যস্ত জার্মানীর সমর শক্তির প্রচন্ডতার কথা শুনেছি। জার্মান বাহিনীর মনোবল এবং হিটলারের কাজে জার্মান জনসাধারণের সমর্থন থাকা সম্বন্ধেও সন্দেহ করার কোন কারণ এখনও ঘটেনি। কাজেই পূর্ব রণাঙ্গনে এই বিস্ময়কর নিষ্ক্রিয়তার পিছনে জার্মানীর কোন রাজনীতিক অভিসন্ধি আছে কিনা এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে হতে পারে। যে বলশেভিক জুজুর আতঙ্ক দেখিয়ে তিনি ইতিপূর্বে ব্রিটেন ও আমেরিকার প্রতিক্রিয়াপন্থীদের মনে রুশ-বিরোধ মনোভাব সৃষ্টি করে রুশিয়ার বিরুদ্ধে দল সংগঠনের ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন, এবারও হিটলার নূতন করে একবার সেই চেষ্টা করছেন বলে যেন মনে হচ্ছে। তিনি দেখাতে চাইছেন যে, রুশ সৈন্য যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে তাতে অচিরে তারাই জার্মানী দখল করে ফেলবে এবং তারা জার্মানী দখল করলে কার্যত সমগ্র ইউরোপেই রুশ প্রভাব বিস্তৃত হয়ে পড়বে। অতএব সাধু সাবধান। যুদ্ধে জয়লাভের কোন সম্ভাবনাই যে জার্মানীর এখন আর নেই, সে কথা সে ভাল করেই জানে। কাজেই এখন সে ভাল কোন সর্তে সন্ধি করতে পারে কিনা তার জন্য সচেষ্ট হওয়া তার পক্ষে স্বাভাবিক। এদিক দিয়েও একটা কূটনীতিক খেলা খেলবার মতলব তার থাকা অসম্ভব নয়। নিজের দেশের দুদিকে শত্রুকে রেখে সে পূর্ব রণাঙ্গনের যুদ্ধরত রাশিয়াকে বলবে যে, তোমরা যদি সন্ধির সর্তে রাজি না হও তা হলে আমরা পশ্চিম রণাঙ্গনের প্রতিরোধ উঠিয়ে নেব এবং তোমাদের অগ্রসর হওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করবো। বৃটেন ও আমেরিকান সৈন্যদের দ্বারা জার্মানী অধিকৃত হলে তোমার পক্ষে তা খুব কল্যাণকর হবে না। পশ্চিম রণাঙ্গনে সংগ্রাম রত বৃটেন-আমেরিকাকেও সে ঘুরিয়ে অনুরূপ কথাই হয়তো বলবে। এইভাবে মিত্রপক্ষের শিবিরে পারস্পরিক সন্দেহের সৃষ্টি করে সে নিজের কোন সুবিধা করে নিতে পারে কিনা শেষ সময়ে এই চেষ্টা করা তার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। কয়েক দিন খবরের কাগজগুলো জার্মানীর প্রদত্ত সন্ধির সর্ত ও সন্ধির কথার গুজবে একটু সরগরম হয়ে উঠেছিল। কিন্তু লাল জুজুর ভয় ও মিত্রপক্ষের শিবিরে বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াসে জার্মানীর চেষ্টা পূর্বেও যেরূপ ব্যর্থ হয়েছে, এবারও যে তাই হবে তাতে সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই। তবে তাই বলে জার্মানী এখনই আত্মসমর্পণ করবে এ যাঁরা মনে করেন তাঁদের সঙ্গে আমরা একমত নই। তারা দু' রণাঙ্গনেই প্রবল প্রতিরোধ চালাবে এবং শেষ পর্যন্ত মরণপণ সংগ্রাম করবে বলেই আমরা মনে করি এবং সে সংগ্রামের অবসান দু' এক মাসের মধ্যে হবে এ মনে করবার কোন সঙ্গত কারণ আছে আমরা মনে করিনে। —বিষ্ণুগুপ্ত

দেশী সংবাদ

২৩শে জানুয়ারী—মাদ্রাজে নিঃ ভাঃ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দাবী করিয়া এবং কংগ্রেসের উপর আরোপিত নিষেধাদেশ বহাল রাখার প্রতিবাদ জানাইয়া কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। শ্রীযুত মৃণালকান্তি বসু আগামী বৎসরের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইয়াছেন।

নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে বৃটেন, আমেরিকা, রাশিয়া এবং চীনে এক প্রতিনিধি দল প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

মহাত্মা গান্ধীর সেক্রেটারী মিঃ পিয়ারীলাল জানাইয়াছেন যে, মহাত্মা গান্ধী যখন আগাখাঁ প্রাসাদে অবরুদ্ধ ছিলেন, তখন তিনি স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান কল্পে ৩৭টি সংকল্পবাক্য রচনা করেন।

সরোজকুমার ঘোষ, অবনীমোহন চৌধুরী (সেনা বিভাগের জমাদার) এবং আরও ৬ ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই মর্মে এক অভিযোগ করা হইয়াছে যে, তাহারা ষড়যন্ত্র করিয়া জাল চেকের সাহায্যে কলিকাতার ৮টি ব্যাংক হইতে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা বাহির করিয়া লইয়াছে।

২৪শে জানুয়ারী—লাহোর, চিত্তুর, ত্রিচিনোপল্লী, মাদুরা প্রভৃতি স্থানে স্বাধীনতা দিবসে জনসভা ও শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হইয়াছে।

বাঙলার অন্যতম বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, কলিকাতা কলেজ স্ট্রীটস্থ কমলালয় লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা ও ডিরেক্টর শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী পরলোকগমন করিয়াছেন।

লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ মুনী নিখিল ভারত কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণ ও ডাঃ রামমনোহর লোহিয়াকে আগামী ৩০শে জানুয়ারী আদালতে উপস্থিত করিবার আদেশ দিয়াছেন।

কলিকাতা পুলিশ বড়বাজার অঞ্চলে ৭৮ গাঁইট বস্ত্র উদ্ধার করে। উহার মূল্য মোট দেড় লক্ষ টাকা হইবে।

২৫শে জানুয়ারী—নিঃ ভাঃ সংবাদপত্র সম্মেলনের সভাপতি মিঃ এস এ ব্রেলভী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে সাংবাদিকতা সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন।

গতকল্য এবং অদ্য কলিকাতা গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে ভারতীয় ও প্রাচ্য সংবাদপত্র সমিতির অধিবেশন হয়। শ্রীযুত দেবদাস গান্ধী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

২৬শে জানুয়ারী—অদ্য ভারতের বিভিন্ন স্থানে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়।

কলিকাতায় নিঃ ভাঃ সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের স্ট্যাণ্ডিং কমিটির ২১তম অধিবেশন হয়। মিঃ এস এ ব্রেলভী উহাতে সভাপতিত্ব করেন।

২৭শে জানুয়ারী—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে মিঃ সৈয়দ আবদুল্লা ব্রেলভীর সভাপতিত্বে নিখিল ভারত সম্পাদক সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রায় ১২৫ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন। প্রারম্ভে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন এবং অতঃপর সভাপতি তাঁহার অভিভাষণ দেন।

পাটনার দায়রা জজ কানাডিয়ানদের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে অতিরিক্ত মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন। তিনি এই মামলায় পাঁচজনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন

সাপ্তাহিক সংবাদ

এবং অবশিষ্ট তিনজনকে মুক্তি দিয়াছেন। এই মামলা ১৯৪২ সালের আগস্ট হাঙ্গামার জের।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের স্মৃতিরক্ষার্থ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কৃষিশিল্প সংক্রান্ত একটি কলেজ স্থাপনের সাহায্যার্থ ডাঃ নীলরতন ধর প্রায় এক লক্ষ টাকা দান করার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট অদ্য উহার বার্ষিক সভায় সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

২৮শে জানুয়ারী—বিহারের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, প্রাক্তন অর্থসচিব শ্রীযুত অনুগ্রহনারায়ণ সিংহ, বিহার ব্যবস্থা পরিষদের ডেপুটি স্পীকার অধ্যাপক আবদুল বারি, 'সার্চ লাইট' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুত মুরলীমোহন প্রসাদ এবং প্রজাপতি মিশ্রের প্রতি বিহার গভর্নমেণ্ট ১৯৪৪ সালের নিয়ন্ত্রণ ও আটক অর্ডিন্যান্স অনুসারে তাঁহাদের স্ব স্ব গ্রামের এলাকার মধ্যে থাকিতে আদেশ দিয়াছেন।

কলিকাতায় নিখিল ভারত সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের অধিবেশন শেষ হয়। সভায় সংবাদপত্র ও সাংবাদিকগণের স্বার্থ সংশিলষ্ট বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়। তন্মধ্যে একটি প্রস্তাবে এই দাবী করা হয় যে, যে সকল সাংবাদিক এক্ষণে বিনা বিচারে কারাগারে আবদ্ধ আছেন, তাহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হউক।

নয়াদিল্লীর এক ইস্তাহারে প্রকাশ, গত ২২শে জানুয়ারী যোধপুর নগরীতে সামরিক কুচকাওয়াজ প্রদর্শনকালে ১৩ জন লোক নিহত এবং ২৭ জন আহত হইয়াছে।

২৯শে জানুয়ারী—মধ্য প্রদেশের গভর্নর অস্তি ও চিমুর মমালায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ১৫ জন আসামীর মধ্যে ৮ জনের প্রাণদণ্ড মকুব করিয়া তাহাদের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

উড়িষ্যার ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দাস কলিকাতা ছাত্রসভায় কংগ্রেসের আদর্শ সম্পর্কে এক বক্তৃতা করেন।

বিদেশী সংবাদ

২৩শে জানুয়ারী—ব্রহ্ম রণাঙ্গন—জেনারেল সুলতান ঘোষণা করিয়াছেন যে, লেডো রাজপথ ব্রহ্ম রাজপথের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে। মান্দালয়ের ১৫ মাইল পশ্চিমে ইয়নবিগ্গান মিত্র বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে।

পূর্ব ইউরোপীয় রণাঙ্গন—সোভিয়েট বাহিনী ব্রেমবার্গ অধিকার করিয়াছে। স্টকহলমের সংবাদে প্রকাশ, লালফৌজ পোপনানে প্রবেশ করিয়াছে।

২৪শে জানুয়ারী—পূর্ব ইউরোপীয় রণাঙ্গন—মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, মার্শাল কনিয়েভের বাহিনী ওডার তীরে একটি সেতু-মুখ স্থাপন করে। উত্তর সাইলেসিয়ার রাজধানী ওপোলেনের রাস্তায় রাস্তায় সংগ্রাম চলে।

পশ্চিম ইউরোপীয় রণাঙ্গন—মার্কিন প্রথম আর্মি স্যাঁত ভিত অধিকার করিয়াছে।

ব্রহ্ম রণাঙ্গন—মিত্র সৈন্যগণ মান্দালয়ের ৩২ মাইল পশ্চিমে ইরাবতী নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত মাইনমু অধিকার করে।

২৫শে জানুয়ারী—পূর্ব ইউরোপীয় রণাঙ্গন—সোভিয়েট বাহিনী ব্রেসলাউয়ের উপকণ্ঠে প্রবেশ করে। ওয়ারস-বার্লিন সড়ক দিয়া অগ্রসর মার্শাল জুকভের বাহিনী পোজনানের রক্ষাব্যূহের উপর আঘাত হানে। প্রুশিয়ায় মার্শাল চার্নিয়াকোভস্কির বাহিনী কনিসবের্গ রক্ষা ব্যবস্থার বহির্ব্যূহে পেঁৗছে। লালফৌজ ওপেলন দখল করিয়াছে।

পশ্চিম ইউরোপীয় রণাঙ্গন—জার্মানরা সপ্তম আর্মির বিরুদ্ধে আক্রমণ সুরু করে। আলসাস পুনরধিকার করাই তাহাদের লক্ষ্য।

২৬শে জানুয়ারী—পূর্ব ইউরোপীয় রণাঙ্গন—মস্কোর সংবাদে প্রকাশ, লালফৌজ ডানজিগে প্রবেশ করিয়াছে। পূর্ব প্রুশিয়ায় জার্মান সৈন্যদল মূল জার্মান বাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। উত্তর সাইলেসিয়ার অন্যতম প্রধান শহর হিণ্ডেনবুর্গ রুশ বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে।

আনকারা বেতারে প্রচারিত পর্তুগালের সংবাদে প্রকাশ, মিত্রপক্ষ কি সর্তে জার্মানীর সহিত সন্ধি করিতে পারে, তাহা গোপন আলাপ-আলোচনার দ্বারা বুঝিবার জন্য ফন পাপেনের নেতৃত্বে এক জার্মান মিশন মাদ্রিদে পেঁৗছিয়াছে।

২৭শে জানুয়ারী—ব্রহ্ম রণাঙ্গন—মিত্রপক্ষীয় সেনারা কেদুবা দ্বীপে (রামরীর দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত) অবতরণ করিয়াছে।

২৮শে জানুয়ারী—পূর্ব ইউরোপীয় রণাঙ্গন—মার্শাল স্ট্যালিনের বিজ্ঞপ্তিতে বল্টিক অঞ্চলে রুশদের নূতন অভিযান এবং মেমেল দখলের সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে।

পশ্চিম ইউরোপীয় রণাঙ্গন—বৃটিশ বাহিনী রোর নদী তীরবর্তী সাঁৎ অডিলিনবের্গ দখল করিয়াছে।

২৯শে জানুয়ারী—পূর্ব ইউরোপীয় রণাঙ্গন—মার্শাল জুকভের সৈন্যদল ব্রাণ্ডেন-বুর্গের অন্তর্গত বার্লিন প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া জার্মান ওভরসীজ নিউজ এজেন্সী ঘোষণা করিয়াছেন। পোজনানের দিকে জার্মানরা এখনও প্রতিরোধ করিতেছে। জুকভের সৈন্যদল এখন বার্লিন হইতে ৯২ মাইল দূরে আছে।

যুগোশ্লাভিয়ার রাজা পিটার তাঁহার রাজকীয় ক্ষমতা রিজেন্সী কাউন্সিলের হাতে অর্পণ করিয়াছেন। ডাঃ সুবাসিকের প্রধান মন্ত্রিত্বে যুগোশ্লাভিয়ায় নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইয়াছে।

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

১ম সংখ্যা হইতে ১৩শ সংখ্যা পর্যন্ত







শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক ঃ—আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড ১নং বর্ম্মণ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

দেশ

সূচীপত্র

দেশ

সম্পাদক ঃ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন — সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রীসাগরময় ঘোষ

১২ বর্ষ] শনিবার, ২৮শে মাঘ, ১৩৫১ সাল। Saturday, 10th February, 1945 [১৪শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

দেশাই-বড়লাট সাক্ষাৎকার

শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাইয়ের সহিত বড়লাটের সাক্ষাৎকারের সম্পর্কে পুনরায় গবেষণা আরম্ভ হইয়াছে। শুনিতেছি বড়লাটের শাসন পরিষদের অধিকাংশ সদস্যই বলিতেছেন যে, ভারতে যদি প্রতিনিধিত্বমূলক গভর্নমেণ্ট গঠিত হয়, তবে তাঁহারা আনন্দিত হইবেন। তবে কেহ কেহ ব্রিটিশের কৃপালব্ধ ক্ষমতা ছাড়িয়া দিল্লীর তক্ত ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক। এই সম্বন্ধে বড়লাট শুধু ব্রিটিশ সরকারের সহিত নয়, প্রাদেশিক গভর্নরদের সঙ্গেও শুনিতেছি আলোচনা চালাইতেছেন। এক্ষেত্রে শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাইয়ের উদ্দেশ্য কি সে সম্বন্ধে আমাদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা নাই। বর্তমান অবস্থা অপেক্ষা অন্য যে কোন অবস্থা ভাল এবং ভারত গভর্নমেণ্ট পুনর্গঠিত হইলে বন্দী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মুক্তিলাভের সুবিধা হইবে, এই ধারণা মনে লইয়া তিনি এ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিতেছেন। এই ধরণের আনুমানিক গবেষণাকে আমরা কোনদিনই গুরুত্ব প্রদান করি না। আমাদের এই বিশ্বাস যে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতের বর্তমান এবং যুদ্ধোত্তর সমস্যা সম্পর্কে একটা সুনির্দিষ্ট নীতি লইয়াই দৃঢ়তার সঙ্গে অগ্রসর হইতেছেন, এবং সেক্ষেত্রে কোন পক্ষের পরামর্শ গ্রহণ করিবার অবকাশ তাঁহারা রাখেন না। চার্চিল-আমেরীর দল ভারতের রাজনীতিক অচল অবস্থার সাধনের জন্য আদৌ ইচ্ছুক নহেন; কারণ যদি তাঁহাদের এমন ইচ্ছা থাকিত, তবে বন্দী কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দকেও তাঁহারা এতদিন মুক্তিদান করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের তেমন মতি-গতির কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না এবং আমাদের এই বিশ্বাস যে, ঘটনাচক্রের গতিতে যদি বাধ্য হইতে না হয়, তবে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভারত সম্বন্ধে তাঁহাদের মনোভাব কিছুতেই পরিত্যাগ করিবেন না। আমরা এই সত্য সুনিশ্চিতভাবেই উপলব্ধি করিতেছি যে, ভারতের স্বাধীনতা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের সদিচ্ছায় বা অনুগ্রহে আসিবে না, ভারতবাসীদিগকেই ত্যাগের মূল্যে তাহা ক্রয় করিতে হইবে। সুতরাং অপরের অনুগ্রহের অপেক্ষা না রাখিয়া আমরা যেন সেই ত্যাগের পথে দেশকে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য নিজেদের সকল শক্তি প্রয়োগ করি।

টিকাদানের হুঁশিয়ারি

কলিকাতায় এবং ইহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে যেরূপ বসন্ত-রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তাহাতে প্রত্যেকেরই টিকা লওয়া যে অবশ্য কর্তব্য, সে সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ নাই। জরুরী ক্ষমতাবলে কর্পোরেশনের কর্তৃত্ব হইতে গভর্নমেণ্ট টিকাদান ব্যবস্থা হস্তগত করার পর হইতে টিকা সম্পর্কে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে নানারূপ সরকারী হুঁশিয়ারি প্রচার করা হইতেছে। সম্প্রতি একটি হুঁশিয়ারিতে জনসাধারণকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, কর্পোরেশনের টিকার বীজসংগ্রহ-কেন্দ্রে যেসব টিকার বীজ প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা ত্রুটিপূর্ণ। এজন্য গত ১লা নভেম্বরের পর যাহারা টিকা গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা যেন পুনরায় টিকা লয়। এই সরকারী বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় 'ইউনাইটেড প্রেসে'র নিকট যে বিবৃতি দান করিয়াছেন, তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে তিনি ১লা নবেম্বরের পর যাহারা টিকা লইয়াছে, তাহাদের সকলের পক্ষে পুনরায় টিকা গ্রহণের পরামর্শকে একান্ত অবিবেচিত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি জনসাধারণকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত টিকার বীজ-পরীক্ষার রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত যেন তাহারা দ্বিতীয়বার টিকা গ্রহণ না করে; কারণ একবার টিকা লওয়ার পর পুনরায় টিকা লইলে তাহার ফল অনিষ্টকর হইতে পারে। ডাঃ রায় একজন সুবিজ্ঞ, খ্যাতনামা চিকিৎসক। তাঁহার এই সতর্কবাণীতে গুরুত্ব আরোপ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। ডক্টর রায়ের বিবৃতি প্রকাশিত হইবার পর দেখিতেছি, প্রেসিডেন্সী কলেজের ফিজিওলজির অধ্যাপক শ্রীযুত নরেন্দ্রমোহন বসুও একটি বিবৃতিতে ডক্টর রায়ের অভিমতই সমর্থন করিয়াছেন। এই সঙ্গে সরকারী বিশেষজ্ঞ ডাক্তার গ্রাণ্ট, কর্নেল পাসরিচা এবং ডাক্তার এল সি ঘোষালের একটি বিবৃতিও প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহারা এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, কর্পোরেশনের টিকাবীজের বসন্তের আক্রমণ নিরোধ সামর্থ্য সম্বন্ধে সুনিশ্চিত নহে। বিশেষজ্ঞগণের এই বিবৃতি সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সরকারী বিশেষজ্ঞগণ কবে টীকা বীজ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়াছেন, বিবৃতিতে সে তারিখ উল্লেখ করা নাই; এদিকে কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার তাঁহার বিবৃতিতে বলিতেছেন যে, বিশেষজ্ঞগণের এই পরিদর্শনের পর ডাক্তার গ্রাণ্ট পরে আর একবার

কর্পোরেশনের রসায়নাগার পরিদর্শন করেন এবং ব্যবস্থা ঠিক আছে বলিয়া মত প্রকাশ করেন। প্রকৃতপক্ষে কর্পোরেশন-গভর্নমেণ্টের ভিতর একটা বিরোধ-বিতর্ক শুরু হইয়াছে; কিন্তু ইহার ফলে জনসাধারণের মধ্যে দুরূহ সমস্যার কারণ ঘটিয়াছে। টিকা গ্রহণ সম্বন্ধে এদেশের অজ্ঞ জনসাধারণের মনে নানারূপ কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়া আছে। তাহার উপর যদি বিশদভাবে পরীক্ষা না করিয়া এবং সেই পরীক্ষার ফল উপযুক্তভাবে জনসাধারণকে না জানাইয়া এইরূপ হুঁশিয়ারি প্রচার করা হয়, তবে তাহা বিজ্ঞতার পরিচায়ক নহে। এরূপ ক্ষেত্রে জনসাধারণের মনে যাহাতে কোনরূপ ভীতিপূর্ণ বা সংশয়মূলক ভাব জাগ্রত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া হুঁশিয়ারি প্রচার করা এবং পুনরায় টিকাদান সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত ছিল।

বিচার-প্রহসনের আর একটি নমুনা

অনেক সময় নিম্নতন আদালতে বিচারকেরা যে রায় দিয়া থাকেন, উচ্চতন আদালতে বা হাইকোর্টে তাহা টিকে না, এরূপ ঘটনা আমরা বরাবর লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। বিশেষ করিয়া রাজনীতিক মামলাগুলিতে এরূপ বিচার-প্রহসন অনেক সময়েই ঘটিয়া থাকে। এদেশের স্থানীয় শাসন-কর্তৃপক্ষ এরূপ স্নায়ুরোগাক্রান্ত যে, জনসাধারণ কোনরূপ সভা-সমিতি বা শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান করিলেই তাঁহারা আতঙ্কিত হইয়া উঠেন, তাহা অহিংসা-মূলকই হোক্, কিংবা রাজনীতি সম্পর্ক-শূন্যই হোক্, এবং তজ্জন্য অনেক ক্ষেত্রে তাঁহারা যে দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহার যুক্তিযুক্ততা ও বৈধতার দিকটা তাঁহাদের বাতিকগ্রস্ত আচ্ছন্ন বিবেকবুদ্ধির কাছে ধরা পড়ে না। ইলোরে সম্প্রতি স্বামী বিবেকানন্দ লাইব্রেরী-দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে সরকারী দমননীতিমূলক কার্যে এইরূপ ব্যাপার আবার আমরা লক্ষ্য করিলাম। শোভাযাত্রায় স্বামী বিবেকানন্দের ফটোর সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর ফটোও লইয়া যাওয়া হয়। ইহাতে পুলিস আপত্তি করে এবং এই অপরাধে শোভাযাত্রার উদ্যোক্তা বলিয়া কথিত দুইজন যুবককে ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে মাদ্রাজ হাইকোর্টে আপীল করা হইলে বিচারপতি মিঃ হ্যাপেল্ এই মন্তব্য করিয়া যুবকদ্বয়কে মুক্তিদান করেন যে, শোভাযাত্রায় কেবলমাত্র মহাত্মা গান্ধীর ফটো লইয়া যাওয়াই কোন অপরাধজনক কার্য নহে। অভিযুক্ত যুবকেরা এক্ষেত্রে আপীলে মুক্তিলাভ করিয়াছে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এরূপ-ভাবে দণ্ডিত ব্যক্তিগণের আপীল করিবার সুযোগ ও সামর্থ্য থাকে না; একটা ভ্রমাত্মক ত্রুটিপূর্ণ বিচারের ফলে তাহারা অনর্থক দণ্ডভোগ করে। তাহারা নানাদিক দিয়া অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পুলিসের দৃষ্টিতে তাহারা অপরাধী বলিয়া চিহ্নিত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া, যাহাদের এইরূপ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করার সুযোগ ও সামর্থ্য থাকে এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা নিরপরাধ বলিয়া মুক্তিলাভ করে, তাহাদের এইরূপ অনর্থক হয়রানি, লাঞ্ছনা, অর্থক্ষতি ও সময়ের অপব্যয়ের জন্য কোনরূপ ক্ষতিপূরণ করা হয় না; অথবা যে পুলিস কর্তৃপক্ষ ইহার জন্য দায়ী তাহাদের বিরুদ্ধেও সাধারণত কোনরূপ ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হয় না। সরকারী প্রেস্টিজ্ এমনই সাংঘাতিক চীজ্!

টটেনহামী রটনার স্বরূপ

ভারত গভর্নমেণ্টের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী স্যার রিচার্ড টটেন্‌হাম্ ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসের হাঙ্গামা সম্পর্কে সমস্ত দায়িত্ব কংগ্রেসের ঘাড়ে আরোপ করিয়া একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ বিষয়ের যথোপযুক্ত প্রত্যুত্তর মহাত্মা গান্ধী দিয়াছেন এবং ইহার আলোচনা ইতিপূর্বে হইয়া গিয়াছে। উড়িষ্যার একটি ঘটনা সম্পর্কে এই পুস্তিকাখানিতে যে মন্তব্য করা হইয়াছে, তথাকার প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ও জননায়ক শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দাস তৎপ্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাহার সমুচিত প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছেন। স্যার রিচার্ড টটেন্‌হাম্ তাঁহার পুস্তিকায় বলেন ঃ

> "তাহাদের (জনসাধারণের) আর্থিক অসুবিধার সুযোগ গ্রহণ করিয়া দুষ্টবুদ্ধি রাজনীতিকরা স্বেচ্ছায় এই কাণ্ড ঘটায়। পরিষদের কংগ্রেসী দলের সদস্য শ্রীজগন্নাথ দাসের জনৈক সহকারী এই ব্যাপারে পাণ্ডা-গিরি করে।"

এই অভিযোগের উত্তরে শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দাস বলিয়াছেন যে, পুস্তিকায় শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দাসের যে তথাকথিত সহকারীর উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহার নাম শ্রীঅনিরুদ্ধ মহান্তী। এই অনিরুদ্ধ মহান্তী একজন সাধারণ কংগ্রেসসেবক। শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দাসের সহিত তাঁহার সম্পর্ক এই যে, তিনি অনাথ বলিয়া শ্রীযুক্ত দাস তাঁহাকে আশ্রয়-দান করেন। তাহার পর যে ঘটনার জন্য শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দাসের উপর দোষারোপ করা হইয়াছে, শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দাস তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বলেন ঃ

> "শ্রীযুত জগন্নাথ দাস ১৯৪২ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে এক পার্শ্ববর্তী নির্বাচনকেন্দ্রে মন্ত্রিবর্গের প্রবল বিরুদ্ধতার মুখে উপনির্বাচন পরিচালনা করেন। ১৯৪২ সালের ১০ই আগস্ট নির্বাচন-পর্ব শেষ হইবার অত্যল্পকাল মধ্যেই ১৭ই আগস্ট তারিখে তাঁহার উপর নোটিশ জারি করা হয় এবং ২১শে আগস্ট তিনি গ্রেপ্তার হন। ১০ই আগস্ট তারিখে তাঁহার এরূপ প্রবল জ্বর আসে যে, তাঁহার গ্রেপ্তারকারী দারোগা তাঁহাকে তাঁহার কাঁটাপরী গ্রামের বাসভবন হইতে পাল্কীযোগে রামগড় থানা এবং পরে বালেশ্বরে লইয়া যান। সুতরাং তাঁহার পীড়িতাবস্থার কিয়ৎকাল এবং রোগমুক্তির সম্পূর্ণ সময়টুকু জেলে কাটে। এদিকে ১৯৪২ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর অর্থাৎ উপনির্বাচন সমাপ্তি ও জ্বর ভোগের পূর্ণ ১ মাস ১৮ দিন পর এরামে গুলী চালনা করা হয়। আরও কৌতুকের বিষয় এই যে, এরাম গ্রামটি শ্রীজগন্নাথ দাসের গ্রাম হইতে ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত......এবং যে নির্বাচন-কেন্দ্র হইতে তিনি নির্বাচিত হইয়া-ছেন এরাম গ্রামটি উহার এলাকাভুক্ত পর্যন্ত নয়।"

এইরূপ পুস্তিকাখানিতে মন্তব্যের অযৌক্তিকতা প্রমাণ এবং ভিত্তিহীন অভি-যোগের প্রত্যুত্তর দান করিয়া শ্রীযুক্ত বিশ্ব-নাথ দাস প্রশ্ন করিয়াছেন ঃ

> "স্যার রিচার্ড টটেনহাম স্বরাষ্ট্র-দপ্তরের সেক্রেটারী হিসাবে উচ্চতন পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রথমে শ্রীজগন্নাথ দাশকে কারারুদ্ধ করিয়া এবং তৎপর এই ধরণের অসমর্থিত ও অপ্রমাণিত বিবৃতি সমর্থন ও প্রকাশ করিয়া কি সংগত কাজ করিয়াছেন?"

এরূপ ক্ষেত্রে সংগত অসংগত কার্যের প্রশ্ন তো দূর স্থান, গভর্নমেণ্টের দপ্তরের এইরূপ হোমড়া-চোমড়াদের শ্রীমুখ নিঃসৃত অথবা লেখনী নিঃসৃত যেসব বাণী প্রকাশ লাভ করে, কংগ্রেসের নামে তাঁহাদের দৃষ্টি এমন আচ্ছন্ন যে, তাঁহারা সহজ ও সাধারণ বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া সত্যাসত্য নিরূপণ পর্যন্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করেন না।

তাহার পর যে অনিরুদ্ধ মহান্তী এই কুখ্যাত পুস্তিকাখানিতে এরূপ উল্লেখযোগ্য হইয়াছেন, তিনি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত। স্পেশাল কোর্টের বিচারে দণ্ড হইলে হাইকোর্টের বিচারে তিনি মুক্তি পান। কিন্তু হাই-কোর্টের রায়ের মর্যাদা লঙ্ঘন করিয়া তাঁহাকে নিরাপত্তা বন্দিরূপে আটক রাখা হইয়াছে এবং তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া যাওয়া সত্ত্বেও তাঁহাকে মুক্তিদান করা হয় নাই।

উড়িষ্যায় এই হাঙ্গামা সম্পর্কে দণ্ডিত ২২জন ব্যক্তি, জনৈক দয়াবান আইনজীবীর চেষ্টায় পাটনা হাইকোর্টে আপীল করা হইলে, ৬ হইতে ৮ মাসকাল জেলে থাকিয়া মুক্তিলাভ করেন। এই সম্পর্কে হাইকোর্ট সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেল সুপারকে তাঁহাদের বিরুদ্ধে যথাযোগ্য ব্যবস্থা কেন অবলম্বিত হইবে না, তাহার কারণ দর্শাইতে বলেন। বিচার প্রহসনের এইদিকটার উপর স্যার রিচার্ড টটেন্‌হাম্ নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই, বরং কংগ্রেসকে দায়ী ও দোষী করিবার জন্য অপ্রমাণিত ও অসমর্থিত কাহিনী ফাঁদিয়া বসিয়াছেন। শ্রীযুত বিশ্বনাথ দাসের এই বিবৃতিতে এদেশের সরকারী প্রচারকার্যের গোপন রহস্য আরও একবার উদ্ঘাটিত হইয়াছে।



ঘরমুখো

শিল্পী—শ্রীঅজিতকেশরী রায়.

দেশের কথা

খাদ্য-ব্যবস্থার উন্নতি

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে নিখিল ভারত খাদ্য-সম্মেলন হইয়া গেল। এই প্রতিষ্ঠান দেশের জনসাধারণের নয়, ইহা ভারত গভর্নমেণ্টের প্রতিষ্ঠান; সুতরাং আমাদের খাদ্য সম্বন্ধে সরকার কি ধারা ধরিয়া চিন্তা করিতেছেন, সম্মেলনের আলোচনা হইতে তাহার কিছু পরিচয় মিলিতে পারে। সম্মেলনের রিপোর্টে প্রকাশ—

সম্মেলন তাঁহাদের আলোচনায় কতকগুলি সুপারিশ করিয়াছেন, এগুলির মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদনে উৎসাহ দান, কৃষকদের জন্য উপযুক্ত মূল্যের ব্যবস্থা এবং রেশনিংয়ের পরিমাণ নির্ধারণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সম্মেলনের গৃহীত সিদ্ধান্তে রেশনিং বিধানের "শিশু"র বয়ক্রম সদ্যজাত হইতে ৮ বৎসর পর্যন্ত বুঝাইবে। পুষ্টিকর খাদ্য সংস্থানের প্রশ্ন সম্বন্ধে সম্মেলন এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, দেশের নরনারীর খাদ্যের পুষ্টিকারিতা বৃদ্ধি করা একান্তই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে এবং এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নমেণ্ট, স্ব স্ব এলাকাভুক্ত অঞ্চলের খাদ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন; কোন কোন হিসাবে প্রচলিত খাদ্যে অনুপযুক্ততা রহিয়াছে, পরীক্ষার দ্বারা তাহা স্থির করিতে হইবে। দেশের অপেক্ষাকৃত হীন অবস্থাপন্ন লোকেরা কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে দুগ্ধ এবং অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য লাভ করিতে পারে, ইঁহারা সে বিষয়ে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিবেন। প্রচলিত খাদ্যের পুষ্টিসাধন উদ্দেশ্যে যে সব নূতন খাদ্য আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইবে, অথবা প্রচলিত খাদ্যের সরবরাহের অভাব পরিপূরণ করিবার জন্য যে সব খাদ্য স্থিরীকৃত হইবে, সেগুলিতে সাধারণকে অভ্যস্ত করিবার জন্য ক্রমাগত প্রচারকার্য চালাইতে হইবে এবং সেগুলির প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়া প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সম্মেলনে গৃহীত এই সব প্রস্তাবে আমরা বিশেষ নূতন কিছু দেখিলাম না। সরকারী মহল হইতে এইরূপ ধরণের সদিচ্ছার অভিব্যক্তি আমরা অনেকদিন হইতেই পাইতেছি; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমাদিগকে সম্পূর্ণ বিপরীত অভিজ্ঞতাই লাভ করিতে হইতেছে।

এক বৎসরের রেশনিং

দৃষ্টান্তস্বরূপে কলিকাতায় রেশনিংয়ের ব্যবস্থার উল্লেখ করা যাইতে পারে। কলিকাতা এবং তন্নিকটবর্তী অঞ্চলে এক বৎসরকাল রেশনিং চলিতেছে। এই বৎসরের খতিয়ান লইলে আমরা কি দেখিতে পাই? এ সম্বন্ধে সরকারের রেশনিং বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ হার্টলী একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

মধ্যে মাঝে আমাদের সম্মুখে বিশেষ বিশেষ সমস্যা দেখা দিয়াছে। প্রথম দিকে আমাদের মজুত খাদ্যের পরিমাণও যেমন কম ছিল, সেইরূপ মালও ছিল খারাপ। বাহির হইতে যে চাউল আসিয়াছিল, তৎসম্বন্ধেই ইহা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কলিকাতার মধ্যবিত্ত ও উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা সাধারণত যে খাদ্য ব্যবহারে অভ্যস্ত, প্রথম দিকে সরবরাহ করা খাদ্য তদপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল বটে; কিন্তু মানুষের অখাদ্য কিছু কখনও সরবরাহ করা হয় নাই। ইহার পর গুদামের ব্যবস্থার উন্নতি সাধিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙলাদেশে উৎপন্ন চাউলও অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়; তখন গুদামের সব মজুত মাল পরীক্ষা এবং ঝাড়াই বাছাই করিয়া তবে দেওয়া হয়।

মিঃ হার্টলী মানুষের অখাদ্য বস্তু রেশনিং ব্যবস্থায় সরবরাহ করা হয় নাই বলিয়া আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিয়াছেন;



কিন্তু রেশনিংয়ের দোকান হইতে কিরূপ অখাদ্য বস্তু—যাহা শুধু মানুষেরই অখাদ্য নয়, পশুরও অখাদ্য এমন জিনিস সরবরাহ করা হইয়াছে, তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। কলিকাতা কর্পোরেশনের আলোচনায় সে সত্য প্রকাশ পাইয়াছে। মিঃ হার্টলী সে সব কথা চাপিয়া গেলেন কেন বুঝিতেছি না।

আধুনিক সমস্যা

অতীতের কথা আমরা আর বিশেষ করিয়া তুলিতে চাহি না। আমরা বর্তমান অবস্থার উপরই বিশেষ করিয়া জোর দিতে চাই এবং এ সম্পর্কে আমাদের প্রধান লক্ষ্য এই যে, চাউলের সমস্যা এখনও মিটে নাই। আতপ চাউল সংগ্রহের সমস্যা সর্বাপেক্ষা জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। রেশনিংয়ের দোকানে আতপ মিলিতেছে না; ইহার ফলে শহরে হিন্দু বিধবাদের খাদ্য সংস্থানে দারুণ সঙ্কট দেখা দিয়াছে। ডাইল, সুজী অধিকাংশ দোকানেই মিলে না; মিলিলেও হিসাব মত তাহা পাওয়া যায় না। পুষ্টিকর খাদ্যের দ্বারা দেশের লোককে চাঙ্গা করিয়া তুলিবার এই সবই কি উপায়?

তেলের সমস্যা

গভর্নমেণ্ট সরিষার তেলের মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন; কিছুদিন পূর্বে বাঙলার অসামরিক বিভাগের মন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী গর্ব করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি সরিষার এমন ব্যবস্থা করিতেছেন, যাহাতে ভেজাল সরিষার তেল বলিতে শহরে কিছু থাকিবে না। ফল হইয়াছে সম্পূর্ণ বিপরীত। কলিকাতা শহরে কণ্ট্রোলের দরে বর্তমানে সরিষার তেল নামে যে তরল পদার্থ বিক্রীত হয়, তাহাতে সরিষা কতটা আছে জানি না; তবে সে তেলের উৎকট দুর্গন্ধের সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা জন্মিতেছে। বঙ্গীয় তেল কল সমিতির সেক্রেটারী একটি বিবৃতিতে বলিয়াছেন, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলি হইতে যে পরিমাণ সরিষা আমদানী করা হইয়াছে, তাহা বাঙলার চাহিদার অনুপাতে অত্যন্তই সামান্য। সরিষার অভাবে অনেক তেলের কল বন্ধ করিতে হইয়াছে। ইহার পর দুগ্ধ, সে কথা না তোলাই ভাল। সেদিন নিউইয়র্কে শিশুরক্ষা সঙ্ঘের বার্ষিক সভায় শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত শিশুদের দুধের কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন—

"ভারতের দরিদ্র পরিবারের শিশুরা সর্বাপেক্ষা উপেক্ষিত—যেন ইহাদের কোন অস্তিত্বই নাই; অথচ ধনীর সন্তান অত্যধিক প্রাচুর্যের মাঝে নষ্ট হইতেছে। গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ শিশু পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে কষ্ট পায়। এই সব শিশুদের সাহায্যের জন্য আমি একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলাম; তখন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আমার দিকে এমন করিয়া তাকাইলেন, যেন আমি পাগল হইয়াছি।"

শিশু মৃত্যুর ভীষণতা

নিখিল ভারত নারী-সম্মেলনের উদ্যোগে গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় অনুষ্ঠিত একটি জনসভায় দেশের এই দুগ্ধ সমস্যার আলোচনা হয়। শ্রীযুত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী এ সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতায় বলেন—

এদেশের মায়েরা ছেলেদের দুধের জন্য চিন্তায় সকলেই উৎকণ্ঠিত। দুধের অভাবে বাঙলা দেশের শিশুরা দিন দিন জীর্ণ হইয়া পড়িতেছে এবং শিশু মৃত্যুর হার ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। শিশুহারা জননীর রোদনে বাঙলার আকাশ বাতাস মুখরিত হইতেছে। কিন্তু কয়জনের কানে তাহা প্রবেশ করে? এই অবস্থার প্রতিকার সাধনের জন্য সুগঠিত কর্মপ্রণালী অনুসারে কোন চেষ্টাই করা হইতেছে না। আমরা কর্তৃপক্ষের মুখে শুধু এই কথাই শুনিতেছি যে, দুর্ভিক্ষ কাটিয়া গিয়াছে এবং তাঁহারা দেশের অবস্থাকে আয়ত্তাধীন করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু যদি কেহ একটু শ্রম স্বীকার করিয়া দেশের অবস্থা ঘুরিয়া দেখেন, তবেই এদেশের ব্যাধিক্

শিশু এবং নরনারীর শোচনীয় দুর্দশার গুরুত্ব উপলব্ধি করিবেন।

কিন্তু দেশের অবস্থা এমনভাবে ঘুরিয়া দেখাও বর্তমানে সকলের পক্ষে সম্ভব নয়; কারণ ঘৃত, তৈল লবণের সঙ্গে ইন্ধনের চিন্তাও আছে। কিছুদিন যাবৎ কয়লার অভাব কঠিন সমস্যার আকার ধারণ করিয়াছে। সেদিন স্যার রামস্বামী মুদালিয়ার আমাদিগকে শুনাইয়াছেন, খনি হইতে কয়লা পূর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে উত্তোলিত হইতেছে, সমস্যা এখন কয়লার অভাবের জন্য নয়, কয়লা কিছু আর জমা থাকিতেছে না, এই সমস্যা। কয়েকদিন পূর্বেও ডেপুটি কোল কমিশনারের প্রমুখাৎ আমরা অবগত হইয়াছি যে, কলিকাতায় সন্তোষজনকভাবে জ্বালানি কলা সরবরাহ করা হইতেছে।



কলিকাতায় কয়লা আসিবার জন্য এতদিন দৈনিক ৩৫ খানি গাড়ী বরাদ্দ ছিল, সম্প্রতি সে স্থলে ৪৫ খানি গাড়ী বরাদ্দ করা গিয়াছে; সুতরাং কলিকাতার অধিবাসীদের দুঃখ এবার দূর হইবে; কিন্তু সরকারী অন্যান্য আশ্বাস বাণীর মত ডেপুটি কোল কমিশনারের এই আশ্বাস-বাণীও এ পর্যন্ত বাস্তব রূপ প্রকাশ করে নাই। গৃহস্থগণ এখনও নিকটস্থ দোকান হইতে কয়লা পাইতেছে না; এবং অনেক ক্ষেত্রে কয়লার নামে গৃহে ময়লাই বাড়াইতে হইতেছে।

সেদিন স্যার আর্দেশির দালাল তাঁহার পদোচিত মর্যাদা আমাদিগকে উপলব্ধি করাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, আমি যে সব প্ল্যান করিয়াছি, তাহাতে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন নাই। স্যার আর্দেশিরের এমন অবাধ 'প্ল্যান' করিবার অধিকারে আমরা বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্যগণের স্বদেশ সেবায় স্বাধীনতার মহিমা উপলব্ধি করিতেছি; কিন্তু সেজন্য আশ্বস্ত হইতে পারিতেছি না; কারণ 'প্ল্যান' করিতে বা কর্মপ্রণালী প্রণয়ন করিতে স্বাধীনতা এবং কাজ এই দুই বস্তু এক নয়। প্ল্যান বা কর্মপ্রণালীর বড় বড় কথা অতীতেও আমরা অনেক শুনিয়াছি কিন্তু সেগুলি কার্যে পরিণত হইয়াছে কয়টি? সেদিন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন—

ভারতের জনবল এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ও সংস্কৃতির বল অসামান্য; তথাপি ভারতবাসীরা জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দরিদ্র জাতি। ইহা জগতে একটি রহস্য। এই রহস্য এ পর্যন্ত উদ্ঘাটিত হয় নাই; ইহার কারণ এই যে, এদেশের গভর্নমেণ্ট ধরাবাঁধা রকমে কোন সুনির্দিষ্ট কর্মপ্রণালী অবলম্বন করিয়া এদেশের সম্পদ সংগঠিত করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। ভারতবর্ষ পরাধীন। এদেশে জাতীয় গভর্নমেণ্ট না থাকাতে বিষয়টি জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। কারণ পরাধীনদেশে স্বাধীনতার প্রশ্ন এবং তৎসম্পর্কিত রাজনীতিক সমস্যা সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব লাভ করে এবং আর্থিক প্রশ্নকে ছাড়াইয়া যায়। স্বায়ত্তশাসনের অভাব সুশাসনের দ্বারা পূর্ণ হইতে পারে না। জাতীয় গভর্নমেণ্ট ব্যতীত দেশের পুনর্গঠনের জন্য পরিকল্পিত অর্থনীতিক উদ্যমও কার্যকরী হইতে পারে না। কিন্তু রাজনীতিক প্রশ্নের গুরুত্বের জন্য দেশবাসীর জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করিবার জন্য অর্থনীতিক পরিকল্পনা গঠনের কঠিন কর্তব্য উপেক্ষিত হওয়া উচিত নয়।"

আমাদের কাছে এ যুক্তি অনেকটা হেঁয়ালীর মতোই মনে হয়। পরাধীন দেশের অর্থনীতিক পরিকল্পনার মূলে যদি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য বলিষ্ঠ প্রেরণা না থাকে, তবে পণ্ডিতগণের তেমন গবেষণা কোন কাজে আসে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই।

রাজনীতিক সংগঠন

আমরা দেখিতেছি, ভারত গভর্নমেণ্টের শিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা ডক্টর জন সার্জেণ্ট লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সংস্কার উপলক্ষে তাঁহার অভিভাষণে এই প্রশ্নটি উত্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন—

এদেশে আসিবার পর একটি বিষয় আমাকে বড়ই চিন্তাকুল করিয়া তুলিয়াছে। দেশের সমুন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে ব্যাপক সংগঠনমূলক পরিকল্পনার সহিত দ্রুততার সঙ্গে কাজ করিবার সার্থকতার সম্বন্ধে আমার অনেক ভারতবাসী বন্ধুগণের একটা নৈরাশ্যের ভাব আমি লক্ষ্য করি। অন্যান্য দেশে যে সব আন্দোলন সার্থকতা লাভ করিয়াছে, এদেশে তাহা সম্ভব নয়, এই যে ধারণা, ইহা আমি বিপজ্জনক মনে করি। কারণ, ইহা শুধু বর্তমান সম্বন্ধেই নৈরাশ্য সৃষ্টি করে না, এমন মনোবৃত্তি ভবিষ্যৎ উন্নতির পক্ষে ব্যাঘাতকর হইয়া থাকে। ডিকেন্স, থ্যাকার্স অথবা বিগত শতাব্দীর মধ্যযুগের অপরাপর ইংরেজ লেখকদের পুস্তক যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, একশত বৎসর পূর্বে ইংলণ্ডের স্বায়ত্তশাসন পদ্ধতি কতটা ত্রুটিপূর্ণ ছিল, তাহা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ইংলণ্ডে যদি এমন পরিবর্তন ঘটা সম্ভব হয়, তবে এদেশে তাহা অসম্ভব হইবে, এমন নৈরাশ্য আমি পোষণ করিতে পারি না।

ডক্টর সার্জেণ্ট ভারতের বর্তমান পরাধীন অবস্থাটাকে বড় করিয়া দেখেন নাই; ভারতবাসীরা অবিলম্বে দায়িত্বপূর্ণ শাসনতন্ত্র লাভ করিবে, তিনি এই সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করিয়া কথা বলিয়াছেন। এইখানেই পার্থক্য রহিয়াছে। সরকারী আবহাওয়ায় থাকিয়া তিনি যে সদিচ্ছাকে সার বলিয়া বুঝিয়াছেন, আমরা অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে ব্রিটিশের সেই সদিচ্ছাকে মনেপ্রাণে তেমন সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছি না।

দেশের অবস্থার সম্বন্ধে শাসন বিভাগের যেখানে এইরূপ উদাসীনতা, সেখানে সরকারী সদিচ্ছা প্রকাশে আমাদের বিশেষ কিছুই আশ্বাস নাই; কারণ নীতি নির্ধারিত হইলেও অনেক ক্ষেত্রে তদনুযায়ী কাজ হয় না। আমলাতন্ত্র ব্যবস্থার এমনই পরিণতি। ভারতে যতদিন পর্যন্ত জনমতানুযায়ী শাসন পরিচালিত না হইবে, ততদিন এমন অব্যবস্থা এবং কুব্যবস্থা, শুধু সরকারী নীতি নির্ধারণের দ্বারা দূর হইবে না। সম্প্রতি আমলাতন্ত্রের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া স্যার উইলিয়াম বিভারীজ কয়েকটি মূল্যবান কথা বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

আমলাতন্ত্র অফিসের শাসন, গণতন্ত্র জনগণের দ্বারা পরিচালিত শাসন এবং স্বৈরতন্ত্র হইল ডিক্টেটরের দ্বারা শাসন। যে শাসনতন্ত্রে কোন সরকারী কর্মচারী জনগণের ভৃত্যস্বরূপে কাজ না করিয়া তাহাদের মনিবস্বরূপে কাজ করেন, সেই শাসনই আমলাতান্ত্রিক শাসন। যাহার কাজে জনসাধারণের কার্যকর ভাবে কর্তৃত্ব নাই, এমন দায়িত্বহীন কর্মচারীকেই আমলাতান্ত্রিক বলা চলে। এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন স্বভাবতই উঠিবে, তাহা এই যে, সিভিল সার্ভিসের কর্মচারীরা, কোন্ ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক হইয়া পড়েন? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, যখন তিনি এমন মন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণে কাজ করেন, যে মন্ত্রীর তাঁহার উপর কর্তৃত্ব পরিচালনা করিবার মত যোগ্যতা নাই, অথবা যেখানকার আইন সভা মন্ত্রীকে যথাযোগ্যভাবে পরিচালনা করিতে পারেন না। এক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক মতিগতি অবলম্বনের জন্য কর্মচারীকে নিন্দা না করিয়া মন্ত্রী এবং আইন সভাকেই নিন্দা করা উচিত।

এ দেশের আইন সভাগুলিই সর্বপ্রথমে জনমতের প্রতিনিধিস্থানীয় নয় সুতরাং মন্ত্রীরাও জনমতের দ্বারা প্রকৃতপক্ষে পরিচালিত নহেন, তদুপরি সিভিল সার্ভিসের কর্মচারীদের উপর আইনত এবং কার্যত মন্ত্রীদের কোন কর্তৃত্ব নাই—আমলাতান্ত্রিকতার দিকে মতিগতি সম্প্রসারিত হইবার দ্বারও এখানে অবারিত। জনসাধারণের মনিবগিরিতেই এখানকার শাসকেরা মশগুল।

মন্ত্রী ও শাসন বিভাগ

শাসন বিভাগের কর্মচারীরা মন্ত্রীদের দ্বারা চালিত হন, ইহাই জনমতানুসারে নিয়ন্ত্রিত শাসনতন্ত্রের রীতি; কিন্তু এ দেশের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। এদেশের মন্ত্রীরা দেশের লোকের প্রতিনিধি বলিয়া নিজেদিগকে জাহির করিলেও তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে দেশের লোকের প্রতিনিধি নহেন; কিন্তু সে তো দূরের কথা, শাসন বিভাগের কর্মচারীদের উপর অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহাদের কার্যকর কর্তৃত্ব নাই। সম্প্রতি পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদে বন্দী কংগ্রেস সদস্যগণের মুক্তি দান প্রসঙ্গে এই সত্যটি প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। দেশের লোকে কয়েকটি সূত্রে ইহা স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারিয়াছে যে, বিভিন্ন আইনসভার কংগ্রেস নেতাদের আটক রাখা সম্বন্ধে ভারত গভর্নমেন্টের কোন দায়িত্ব নাই। ভারত গভর্নমেন্টের স্বরাষ্ট্রসচিব এ কথা বলিয়াছেন, তাহার পর স্যার আর্দেশির দালাল লাহোরে সে কথা বলিয়াছেন। সেদিন সীমান্ত প্রদেশের গভর্নরও বলিয়াছেন যে, তথাকার আইনসভার বন্দী কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি মন্ত্রীদের উপর নির্ভর করিতেছে। বলা বাহুল্য, সীমান্ত প্রদেশের মন্ত্রীরা নিজেদের পরাজয় নিশ্চিত জানিয়াও তথাকার বন্দী কংগ্রেস-নেতাদিগকে মুক্তি দিয়াছেন; কিন্তু পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রীর তেমন ভয় নাই; তথাপি তিনি কেন আইনসভার সদস্য বন্দী কংগ্রেস নেতাদিগকে মুক্তি দিতেছেন না, অনেকেই এই অনুমান করিতেছেন, কংগ্রেসের সঙ্গে পাঞ্জাবের মন্ত্রীদের কোন বিরোধ নাই, সেখানকার শাসন বিভাগের কর্মচারী বা আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধতার জন্যই তাঁহারা মুক্তিলাভ করিতেছেন না।

অধ্যাপক হিলের পরামর্শ

এমন অবস্থায় শাসনতন্ত্রের আমূল পরিবর্তনই সর্বপ্রথমে প্রয়োজন, নতুবা সদুপদেশ বা সদিচ্ছা প্রকাশে কোন সুফলই ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। এই প্রসঙ্গে কিছুদিন আগে বিলাতের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক এ ভি হিল লণ্ডনের রয়াল সোসাইটিতে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, আমাদের তাহা মনে পড়িতেছে। তিনি বলেন—

ভারতবর্ষ পরিদর্শন করিয়া আমি ইহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছি যে, বিজ্ঞান, এবং যন্ত্রশিল্প এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে গ্রেট বৃটেনের সঙ্গে ভারতের বন্ধুভাবে সহযোগিতা দৃঢ় হইবার পক্ষে সকলের চেয়ে বেশী আশা রহিয়াছে। শুধু রাজনীতিক গবেষণা নয়, এই সব ব্যাপারে প্রকৃত বাস্তবের সঙ্গে সম্পৃক্ত হইয়া আমরা কাজ করিতে পারি। ভারতবর্ষে ভাল বৈজ্ঞানিক কর্মীর সংখ্যা এখনও এত কম যে, অন্যান্য বৃহৎ বৃহৎ উদ্যমে অর্থ ব্যয়ের চেয়ে, এক্ষেত্রে সামান্য ব্যয়েও অনেক কিছু করা চলে। ১৯৩১ সালে যে অবিবেচিত অর্থনীতি ভারতে অবলম্বিত হয়, তাহার কুফল ভারত এখনও ভোগ করিতেছে।

অর্থনীতি এ দেশের স্বার্থের জন্য নিয়ন্ত্রিত না হইয়া বিদেশীর স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত হইলে তাহা অবিবেচিত বা অন্য কথায় অনুচিত হইবেই। এ কথা বলাই বাহুল্য।

অর্থনীতি ও বৈদেশিক স্বার্থ

এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে ভারতীয় বণিক সভার নব-নির্বাচিত সভাপতি মিঃ এম এ মাস্টার সেদিন সভার সাধারণ সভায় ভারতে বিদেশী মূলধনের বিনিয়োগের প্রতিবাদ করিয়া যে কথা বলিয়াছেন, তাহার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে। তিনি বলেন—

যে সব বিদেশীয় আমাদের দেশে টাকা খাটাইয়াছে, তাহারা আমাদের রাজনীতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পিষ্ট করিয়াছে এবং ভারতের স্বাধীনতার বিরোধী শক্তি এদেশে পাকাইয়া তুলিয়াছে, সে সম্বন্ধে আমাদের অত্যন্ত তিক্ত অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। ভারত গভর্নমেন্টের মুখপাত্রগণ স্যার আর্দেশির দালাল প্রমুখ ব্যক্তিরা ভবিষ্যৎ ভারতের শিল্প-বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য বিদেশী সহযোগিতা চাহিতেছেন, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। যে সব বিদেশী এদেশে মূলধন খাটাইবে, তাহারা এতটা নিঃস্বার্থ এবং এমন উদারতা লইয়া এখানে আসিবে না যে, ভারতের স্বাধীনতা তাহারা কামনা করিবে, কোন ভারতবাসীই এমন বিশ্বাস, অন্তরে স্থান দিবে না। সুতরাং ভারত গভর্নমেন্টকে অবিলম্বে একথাটা স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দেওয়া ভাল যে, এদেশের শিল্পোন্নতির জন্য আমরা আর বিদেশী মূলধন চাহি না। ইহার ফলে বিদেশীদের দ্বারা ভারত শোষণের পথ বন্ধ হইবে এবং ভারতের অর্থনীতি অতীতের অপেক্ষা প্রকৃষ্ট ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। ভারতের স্বাধীনতা ব্যতীত এদেশে অর্থনীতি জাতির উন্নতি এবং সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত হইতে পারে না।

কিন্তু এই সুস্পষ্ট সত্যটি জগতের কাছে চাপা দিবার জন্য নানাদিক হইতে চেষ্টা হইতেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতের রাজনীতিক সমস্যাকে গৌণ করিয়া অর্থনৈতিক উন্নতির বুলি অভিসন্ধিমূলকভাবে আওড়াইতেছেন এবং ব্রিটিশ শাসনের মহিমায় সেই অর্থনীতিক উন্নতি ঘটিবে, এই কথা রটনা করিতেছেন। তাঁহাদের ভারত সম্বন্ধে প্রচারকার্যের স্বরূপ হইল ইহাই। সেদিন ভারত গভর্নমেন্টের ভূতপূর্ব অর্থসচিব লর্ড হেলি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের তরফ হইতে ভারত সম্পর্কে প্রচারকার্যের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়া লর্ড সভায় বলিয়াছেন—

জগতের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আধুনিক ভারতের কি অবদান আছে, তাহার মূল্যে আমরা বুঝি না, অনেক ভারতবাসী এইরূপ উপলব্ধি করিয়া থাকেন। ভারতের জীবনপদ্ধতি এবং সে দেশের লোকের অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতার জন্য আমার ভারত বন্ধুদিগকে আমি ক্রমাগত বিক্ষোভ প্রকাশ করিতে শুনিয়াছি। ভারতের সম্বন্ধে এই অজ্ঞতা ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহেও রহিয়াছে। উপনিবেশবাসীদের মধ্যে যাহারা অন্য বহুবিধ বিষয়ে খোঁজ-খবর রাখেন, ভারতের বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের বিবাদের প্রশ্ন লইয়া প্রকৃত যে সমস্যা দেখা দিয়াছে, তাঁহারা আদৌ সে সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। আমি নিজেই কোন বক্তৃতা করিবার সময় একজন ঔপনিবেশিক রাজনীতিকের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তিনি আমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—ইহা কি সত্য যে, মুসলীমদের সঙ্গে মুসলমানদের সদ্ভাব নাই?

দেখিতেছি, ভারতের সম্বন্ধে মুসলিমদের প্রচারকার্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বলিতে গিয়া লর্ড হেলীর মনে ধর্ম সম্প্রদায়গত মতভেদের কথাটাই বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। মনের গোপন সুরই এইভাবে বাজিয়া উঠিয়াছে। ভারতের অজ্ঞতা নাশ করিতে গিয়া 'ভারত বন্ধু'দের এমন বিজ্ঞতা হইতে ভগবান আমাদিগকে রক্ষা করুন, আমরা ইহাই কামনা করি।

প্রচারকার্যের নমুনা

ভারতের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট কিরূপভাবে প্রচারকার্যে তৎপর হইয়াছেন সম্প্রতি 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রের দিল্লীর সংবাদদাতা ব্রিটিশ আর্মি জর্নালে লেফটন্যাণ্ট কর্ণেল ক্রোকারের লেখা হইতে তাহার কিছু নমুনা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

এই সামরিক কর্মচারীর বক্তৃতা হইতে কিছু মণিরত্ন উদ্ধার করিয়া দিলাম। তিনি ব্রিটিশ সেনাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—হিন্দুরা জগতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গণতন্ত্র বিরোধী জাতি এবং তাহারা সাক্ষাৎ-সম্পর্কে মুসলমানদের বিরোধী। ভারতবাসীরা নিজেরাও বৈদেশিকদের বংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ইহাদের পূর্বপুরুষগণ বহু শতাব্দী পূর্বে এদেশে অভিযান করে, ব্রিটিশদের অপেক্ষা ইহাদের এদেশে থাকিবার দাবী করিবার মত বিশেষ কোন অধিকার নাই। ভারতের ইতিহাস ইহাই প্রমাণ করে যে, ব্রিটিশেরা ভারতবর্ষে পদার্পণ করিবার পূর্বে পর্যন্ত ভারতবর্ষ কোনদিনই বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। নিরপেক্ষ ব্রিটিশ সেনাদের সাহায্য ব্যতীত ভারত গবর্ণমেন্ট কিভাবে দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন? ব্রিটিশ যদি আজ ভারত ছাড়িয়া যায়, তবে উত্তর-পশ্চিমের সীমান্ত প্রদেশ হইতে পাঠানেরা ভারতের ভিতরে হানা দিবে, লুঠতরাজই ইহাদের পেশা। ইহাদের আক্রমণ হইতে কে ভারতকে রক্ষা করিবে?

লেখক ব্রিটিশ সেনাদিগকে ভারতের স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন করিয়া দিয়া বলিয়াছেন, এ দেশের জন্য তাহাদের দায়িত্ব রহিয়াছে; পার্লামেন্টে তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মারফতে যাহাতে ভারতে সুশাসন চলে তৎপ্রতি তাহাদিগকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রচারকার্যের উদ্দেশ্য এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট; সুতরাং মন্তব্য অনাবশ্যক।

জননায়ক

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

ত্রিশ বৎসর আগে বিহারের এই ছোট শহরটিতে এসে 'হনুমান দাস কেদারনাথ' ফার্মের মালিক কেদারনাথ যখন তাঁর মুদিখানার দোকান খোলেন তখন তাঁর কল্পনা ছিল তিনি লক্ষপতি হবেন। মাত্র ত্রিশ বৎসর ব্যবসা ক'রে তিনি যখন মারা গেলেন তখন তাঁর শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে তাঁর ছেলে রঘুবীরপ্রসাদ এক লক্ষ টাকা শুধু দরিদ্রদের দান ক'রে প্রমাণ ক'রে দিলেন যে, কারও কারও অদৃষ্টে সিদ্ধি আসেন 'ভাবনা'র কূল ছাপিয়ে—কল্পনার বহুগুণ বেশি হয়ে। রঘুবীর প্রসাদও বাপের উপযুক্ত পুত্র. তিনি আরও দশ বৎসরের মধ্যে ব্যবসাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এমন অবস্থায় এনে দাঁড় করালেন যে তাঁকে সেই শহরের মালিক বললেও অত্যুক্তি হত না। একটা চিনির কল, একটা তেলের কল, তিনটে পেট্রোল পাম্প, কেরোসিনের গুদোম, গোটা চারেক বাস লাইন, একটা বিরাট কাপড়ের দোকান এবং প্রায় এক বর্গমাইল জায়গা জোড়া এক গোলদারী দোকানের মালিক হয়ে বসলেন তিনি। এছাড়া শহরে বাড়ি এবং দেহাতে জমিদারী কত যে তিনি করেছিলেন তা বোধ হয় তাঁর খুব অন্তরঙ্গ বন্ধুরও ভাল ক'রে জানা ছিল না। অবশ্য, কমলার এই অযাচিত প্রসাদের তিনি অপব্যবহার করেন নি। একটি ধর্মশালা, একটি হাসপাতাল এবং একটি অতিথিশালা সম্পূর্ণ তাঁর পয়সাতেই চল্‌ত। এছাড়া সমস্ত রকম স্বদেশী উৎসাহেই তাঁর দান থাক্‌ত মোটা অঙ্কের রূপ ধরে।

এহেন রঘুবীরপ্রসাদ একদিন তাঁর বাস স্টেশনের আফিসে বসে কী একটা হিসাব মনোযোগ দিয়ে দেখছেন এমন সময়ে একটি কুড়ি একুশ বছরের তরুণী মেয়ে ঈষৎ ত্রস্তপদেই সিঁড়ি কটা পেরিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে প্রশ্ন করলে, 'রঘুবীরবাবু কোথায় বসেন?'

কণ্ঠস্বর খুবই মিষ্ট আর তা শান্ত করবার একটা চেষ্টাও ছিল, তবু ব্যাকুলতাটুকু ধরা পড়ল। রঘুবীরপ্রসাদ বিস্মিত হয়ে তাকালেন এবং তাকিয়েই রইলেন। বাঙালীর মেয়ে, খুব যে সুন্দরী তা নয়—বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, চোখ দুটিও খুব আয়ত নয়—অসাধারণত্ব দেহের কোথাও নেই, তবু তার দীর্ঘ ঋজু দেহে এমন একটি মিষ্ট ছন্দ ছিল যে সেদিক থেকে চোখ ফেরানো সত্যিই শক্ত। বিশেষ ক'রে তার দৃষ্টি এমন আশ্চর্য প্রাণপূর্ণ যে, সে চাহনি অপর দৃষ্টিকে প্রায় চুম্বকের মতই আকর্ষণ করে। রঘুবীরপ্রসাদ যুবক নন, বয়স তাঁর চল্লিশের কোঠায় পৌঁচেছে, বিভিন্ন ব্যবসায়ের হিসাব এবং স্বদেশী আন্দোলনের কর্মব্যস্ততার মধ্যে তাঁর চোখ থেকে রং বিদায় নিয়েছে বহুদিন, তবু চোখ নামাতে তাঁর একটু দেরিই হ'ল।

চোখ নামিয়ে রঘুবীরপ্রসাদ বললেন, 'বলুন।'

'ওঃ, আপনিই?' মেয়েটি যেন একটু অপ্রতিভ হল। এত বড় ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদারকে সে এমন সাধারণ খদ্দরের পোষাকে খোলা অফিসে বসে থাকতে দেখবে আশা করেনি বোধ হয়। সে একটু থতিয়ে গিয়ে বললে, 'দেখুন আমি একটু বিপদে পড়েছি। আমি আপনাদের ঐ থানার পাশের বাংলোটায় থাকি—'

রঘুবীরপ্রসাদ শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'বাড়ি সম্বন্ধে কিছু যদি বলবার দরকার থাকে ত কষ্ট ক'রে আমার ম্যানেজার কুঞ্জবাবুর কাছে যেতে হবে। তিনিই ওসব দেখেন শোনেন, আমি বলতে গেলে, কোন খবরই রাখি না। আপনার কথার ঠিকমত জবাব আমি হয়ত দিতে পারব না।'

মেয়েটির কণ্ঠস্বর আবারও যেন কেঁপে উঠল। সে বললে, 'না, দেখুন দরকারটা আপনার কাছেই। কুঞ্জবাবুর কাছে আমি গিয়েছিলুম, তিনি বললেন আপনার হুকুম না পেলে তাঁর কিছু করবার নেই।'

তারপর একটুখানি, বোধ হয় এক মুহূর্ত, থেমে মেয়েটি বললে, 'আমার দাদা অসুস্থ, তাঁকে সারাতেই আমার এখানে আসা, এখন যদি আবার ফিরে যেতে হয় তাহলে তাঁকে বাঁচানো যাবে না।'

রঘুবীরপ্রসাদ যেন কোথায় একটু আলো দেখতে পেলেন, বললেন, 'কী অসুখ তাঁর?'

'অনেকদিন ধরে কালাজ্বরে ভোগবার পর শেষের দিকে একটু প্লুরিসি মত হয়েছিল। তিনি সে সব থেকে সেরেই উঠেছেন, সেই জন্যই তাঁকে নিয়ে চেঞ্জে এসেছি। এখানে এসে পথের কষ্টে একটুখানি শ্রম জ্বরের মত হয়েছে—কুঞ্জবাবু সন্দেহ করছেন টি-বি, কিন্তু টি-বি কিছুতেই নয় আপনি বিশ্বাস করুন।'

রঘুবীরপ্রসাদ বললেন, 'দেখুন আমি এসব কিছুই দেখিনে, কুঞ্জবাবুর ওপরই সব ভার আছে। তিনি ভাল বুঝে যা ব্যবস্থা করতে চান তার ওপর কথা বলা কি আমার উচিত? তাহ'লে কাজের গণ্ডগোল হয় নাকি?'

'কিন্তু,' মেয়েটির চোখে জল ছলছলিয়ে এল, তাহ'লে কোথায় যাই বলুন, এখানের সব বাড়িই ত আপনাদের। এখনই ফিরতে গেলে দাদা পথেই মারা যাবেন।'

রঘুবীরপ্রসাদ জবাব দিলেন, 'বেশ, আপনার দাদা যতদিন না সুস্থ হন্‌ তাঁকে এখানকার হাসপাতালে রাখবার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। কিন্তু নিয়ম যেটা আছে সেটা ভাঙ্গতে আমি পারব না। তাছাড়া একবার জানাজানি হয়ে গেলে ও বাড়ি কেন, আমার কোন বাড়িই সহজে ভাড়া হবে না।'

'কিন্তু আপনারা কেন ধরে নিচ্ছেন যে তাঁর টি-বি হয়েছে। আমি বলছি যে তাঁর টি-বি নয়।'

'বেশ ত, কয়েকটা দিন তিনি হাসপাতালেই থাকুন না। সুস্থ হ'লে না হয়—'

'সে হয় না।' মেয়েটি বাধা দিয়ে দৃঢ় কণ্ঠেই বললে, 'তাঁর যা সেন্‌জিটিভ নার্ভস, হাসপাতালে গেলে একদিনও বাঁচবেন না।'

রঘুবীরপ্রসাদও দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'তাহ'লে আমি কি আর করব বলুন, কুঞ্জবাবুর ব্যবস্থা বদল করা আমি সঙ্গত মনে করি না।'

মেয়েটির চোখে যেন এক মুহূর্তের জন্য আগুন জ্বলে উঠল, সে অকস্মাৎ তার হাতের দু'গাছি চুড়ি খুলে রঘুবীরের সামনের টেবিলে ফেলে দিয়ে বললে, 'টাকা আমার হাতে যথেষ্ট নেই এখন, আপনি এই দুটো চুড়ি রেখে দিন, এর যা দাম এখন তাতে আপনার ঐ দুটো ঘরের প্ল্যাস্টারিং খসিয়ে নতুন ক'রে প্ল্যাস্টারিং আর চূণকাম নিশ্চয়ই দিতে পারবেন—যদি দাদার অসুখটা টি-বিই প্রমাণ হয় তাহ'লে এইতেই ত আপনার যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ হবে!'

রঘুবীর যেন একটু বিরক্ত হয়েই এবার বললেন, 'দেখুন এসব ঝঞ্ঝাট আমরা করতে পারব না, আমাকে মাপ করবেন!'

মেয়েটি এবার সোজাসুজি জ্বলে উঠল, বললে, 'কিছুই পারেন না আপনারা, শুধু একটা অসুস্থ লোক আর একটা মেয়েছেলেকে পথে বার ক'রে দিতে পারেন, না? ...সে কাজটাও অত সহজ ভাববেন না, আমি ও বাড়ি ছাড়ব না। দেখি কি ক'রে আমাদের ওখান থেকে উঠিয়ে দেন! যা পারেন করবেন—'

সে তর্‌তর্‌ করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে নিমেষের মধ্যে তার বাড়ির পথে অদৃশ্য হলো।

রঘুবীরপ্রসাদ অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন, তারপর একটা বেয়ারাকে দিয়ে কুঞ্জবাবুকে ডাকিয়ে পাঠালেন। কুঞ্জবাবু বসেন গোলদারি গদিতে, তিনি শশব্যস্তে চলে এলেন, কারণ রঘুবীরবাবু তাঁকে ডেকে পাঠান কদাচিৎ, প্রয়োজন হলে প্রায় নিজেই যান।

কুঞ্জবাবুকে প্রশ্ন করলেন, 'থানার পাশের ঐ নতুন বাংলোটা কে ভাড়া নিয়েছে ? কার মারফৎ এসেছে ওরা ?'

কুঞ্জবাবু জবাব দিলেন, 'ওটা কলকাতা থেকে চিঠি লিখে ওঁরা ঠিক করেন। ইন্দ্রাণী বোস, এই নামেই মনিঅর্ডারে টাকা আসে। তখন ত জানি না যে ওঁরা ও-রকম রুগী আনবেন, চেহারা দেখে মনে হল টি-বির লাস্ট স্টেজ—'

রঘুবীর বললেন, 'যদি তাই হয়, ক্ষতি যা হবার তা ত হয়েই গেছে এই ক'দিনে, ওঠাতে গেলেও দু-একদিন আরো লাগবে। তাতে আর দরকার নেই।'

কুঞ্জবাবু খুবই বিস্মিত হলেন। এসব ব্যাপারে রঘুবীর কোনদিন তাঁর ব্যবস্থায় প্রতিবাদ করেন নি। তিনি মাথা চুলকে প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু—'

'সে রকম হলে এরপর বাড়িটা ভেঙে দিলেই চলবে।'

রঘুবীর আবার তাঁর কাগজে মন দিলেন।

দিন-দুই পরে একদিন রঘুবীরপ্রসাদকে কি কাজে থানায় আসতে হয়েছিল, ফেরবার পথে কি খেয়াল হলো তিনি সোজা রাস্তাটা ছেড়ে তাঁর বাংলোর পাশের গলিটাই ধরলেন। বাংলোর সামনে অনেকটা জমি খালি পড়েছিল, দু-একটা শালগাছ আর আতাগাছ আপনিই জন্মেছে, এখানে বাগান করার কল্পনাও করেনি কেউ। তারই মধ্যে একটা পাথর পড়েছিল, বহুকাল ধরে, সেই পাথরটার ওপর নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিল ইন্দ্রাণী, শালবনের ফাঁকে যেখানে সূর্যদেব অস্ত যাচ্ছিলেন সেই দূর আকাশের বিশেষ প্রান্তটির দিকে চেয়ে। সহসা পায়ের আওয়াজ শুনে মুখ তুলে রঘুবীরবাবুকে দেখে সে অবাক হয়ে গেল। কিন্তু সে মুহূর্ত মাত্র, চোখোচোখি হবার পর একটি মুহূর্তমাত্র তার সময় লাগল নিজেকে সামলে নিতে, তারপরেই উঠে দাঁড়িয়ে দুহাত তুলে নমস্কার করে বললে, 'কী সৌভাগ্য আমাদের, আসুন, আসুন—নেমে আসুন পথ থেকে—'

রঘুবীর সামান্য একটুখানি ইতস্তত করে নেমে এলেন, প্রতি-নমস্কার করে বললেন, 'আপনার দাদা কেমন আছেন ?'

ইন্দ্রাণী জবাব দিলে, 'ভালই আছেন কাল থেকে, কিন্তু সে ত আপনারই দয়া। শুনলাম আপনিই হাসপাতালের ডাক্তারবাবুকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তিনি ত 'ফি' পর্যন্ত নিলেন না আমাদের কাছ থেকে। কুঞ্জবাবুও আজ সকালে এসে খবর নিয়ে গেছেন—'

তারপর সহসা থেমে বললে, 'এখানেই বসবেন, না ভেতরে যাবেন ?'

রঘুবীর একেবারে পাথরখানার ওপর বসে পড়ে বললেন, 'এখানেই বস্‌ছি—'

'উঁহু, উঁহু, বসবেন না, বসবেন না—আমি আসন আনছি।'

সে ছুটে ভেতরে গিয়ে দু'খানা আসন নিয়ে এল। রঘুবীরবাবুকে জোর করে তুলে পাথরের ওপর একখানা আসন পেতে দিলে, আর একখানা মাটির ওপরই বিছিয়ে নিজে বসে পড়ল। তারপর একটু দম নিয়ে বললে, 'আচ্ছা আপনি এত অনুগ্রহই করবেন যদি ত সেদিন মিছিমিছি অত রাগিয়ে দিলেন কেন ?...ছি ছি, দেখুন দেখি, আমিও কতকগুলো কড়া কথা বলে এলুম।'

রঘুবীর এতক্ষণ যেন একটু অন্যমনস্ক হয়েই, ওর পরিশ্রমের ফলে আরক্ত ও ঈষৎ স্বেদসিক্ত সুডোল ললাটের দিকে চেয়ে ছিলেন, ওর কথাটা থামতে যেন চমক ভেঙে উঠে উত্তর দিলেন, 'মিছিমিছি ত রাগাই নি, আপনাকে যা বলেছিলুম সবই সত্য। শেষকালে আপনারা উঠে গেলে বাড়ি ভেঙে দেব, এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তবে কুঞ্জবাবুকে রাজি করিয়েছি—'

কথাটা বলে ফেলেই রঘুবীর বুঝতে পারলেন তাঁর ভুল। ইন্দ্রাণীর মুখ অপমানে রাঙা হয়ে উঠেই বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি সামলে নিয়ে বললেন, 'অবিশ্যি যদি আপনার দাদার রোগটা খারাপ বলেই শেষ পর্যন্ত জানা যায়—'

ইন্দ্রাণী কণ্ঠে অস্বাভাবিক জোর দিয়ে অথচ চাপাগলায় বললে, 'কিছুতে তা জানা যাবে না, আমি বলছি, আপনাকে তা নয়। দাদার কথা যদি সব শোনেন, তাহলে বুঝতে পারবেন কেন ওঁর চেহারা অত রোগা!'

রঘুবীর জিজ্ঞাসুনেত্রে শুধু চাইলেন। এর পর কিন্তু আলাপ দ্রুত জমে উঠল। ইন্দ্রাণীর দাদা সুব্রত কোন্ ইস্কুলের মাস্টার। ওদের বাবা মা ছেলেবেলাতেই মারা যান, মানুষ করেন ওদের ছোটমাসি। বাড়ি শ্রীরামপুর। দাদা মাস্টারি নেবার পর নিজে দুবার এম-এ পাস করেন, ইচ্ছে ছিল বোনকেও এম-এ পাস করাবেন, কিন্তু এই যুদ্ধের হাঙ্গামায় দাদার খরচপত্র কিছুতেই কুলোচ্ছে না, অতিরিক্ত পরিশ্রম করে, দুটো টিউসানী করেও কুলোচ্ছে না দেখে ইন্দ্রাণী বি-এ পাস করার পর লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে নিজেও জোর করে একটা ইস্কুলে মাস্টারি নিয়েছিল—মাস ছয়েক মাস্টারি করেওছে, এমন সময় এই বিপত্তি। আগে কালাজ্বর, তারপর প্লুরিসি। জমানো কিছুই ছিল না—ইন্দ্রাণীর সামান্য দু-একটা গয়না ও সুব্রতর প্রভিডেন্ড ফণ্ডের টাকা সবই গেছে। ইন্দ্রাণীর চাকরীও বাধ্য হয়েই ছাড়তে হয়েছে। চিকিৎসা ও পথ্যের যোগাড় করাই দায়—দাম দেওয়া ত আরও দুঃসাধ্য। ডাক্তাররা অনেক কষ্টে বাঁচিয়ে তুলেছেন বটে, কিন্তু চেঞ্জে না গেলে সেরে উঠতে পারবেন না কিছুতেই এ-ও জানিয়ে দিয়েছেন। ইস্কুলের ছেলেরা ও অন্য মাস্টারমশাইরা চাঁদা করে একশ' টাকা তুলে দিয়েছেন, তাই নিয়েই ও এখানে এসে পড়েছে। ভরসার মধ্যে দেশে এখনও একটা পুরানো বাড়ি আছে, সেইটেই বিক্রি করতে বলে এসেছে। মাসির হাতেও হয়ত কিছু আছে, কিন্তু যিনি চিরকাল ওদের জন্যেই সব কিছু বিসর্জন দিলেন, তাঁর এই অতি-বৃদ্ধ বয়সের শেষ সম্বল শেষ করতে ও রাজি নয়। তিনিও ওদের সঙ্গে এসেছেন। ইত্যাদি—

রঘুবীর এতক্ষণ প্রায় নিঃশব্দেই ওর সুদীর্ঘ কাহিনী শুনে যাচ্ছিলেন। অবাক্ লেগেছিল ওঁর মনে। তিনি বিশেষ লেখাপড়া করবার সুযোগ পাননি, তবে এই বিপুল ব্যবসায়ের সম্পর্কে এসে চলনসই রকমের একটু ইংরেজি তাঁকে আয়ত্ত করতে হয়েছিল। লেখাপড়া-জানা মেয়ে সামনাসামনি দেখবার সুযোগ কিন্তু তাঁর কখনই হয়নি। ও সম্বন্ধে একটা ভয়ই ছিল তাঁর মনে। তিনি তাই বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করছিলেন যে বি-এ পাস মেয়েও কেমন অবলীলাক্রমে, কত সহজে তাঁর সঙ্গে বসে গল্প করে যাচ্ছে। তাঁর ঘরের মেয়েদের সঙ্গে বিশেষ তফাৎ নেই এর কোথাও!

হঠাৎ যেন ইন্দ্রাণীই সচকিত হয়ে উঠল, 'আমিই খালি ছাই-ভস্ম বকে যাচ্ছি, আপনি ত একটা কথাও কইছেন না। নিশ্চয়ই আমাকে খুব অসভ্য ভাবছেন!'

অপ্রস্তুত হয়ে রঘুবীর বললেন, 'না না, তা নয়, তবে আপনার কাহিনী আপনারই ত বলবার কথা, আপনি বকে না গেলে কে বলবে বলুন ?'

কথাটা ঘুরিয়ে নেবার জন্য ইন্দ্রাণী বললে, 'দাদা একটু সামলে উঠলেই আমি কিন্তু একদিন আপনার বাড়ি যাবো। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করে আসব। আপনারা শুনেছি ভয়ঙ্কর বড়লোক, কিন্তু তাই বলে কি আর কথা কইবেন না আমার সঙ্গে ?'

হেসে রঘুবীর বললেন, 'নিশ্চয়ই কইবেন, তবে আমার মত বাঙলা তিনি বলতে পারেন না, তা কিন্তু আমি আগেই বলে রাখছি।'

ইন্দ্রাণী কান পেতে কী একটা শুনে বললে, 'দাদা বোধ হয় উঠেছেন। চলুন, আলাপ করিয়ে দিই—'

সুব্রতর ঘুম ভেঙেছিল সত্যিই, তবে উঠে বসবার শক্তি তখনও তার হয়নি, তাই শুয়েই ছিল। রঘুবীরপ্রসাদ ঘরে ঢুকতে কোন মতে উঠে বসল। তার অপরিসীম কৃশতা ও

পাণ্ডুরতা দেখেই রঘুবীর কুঞ্জবাবুর সন্দেহের কারণ বুঝতে পারলেন। হয়ত তাঁরই সন্দেহ সত্য—অন্য রোগের ছিদ্রপথে চরম রোগই কখন্ প্রবেশ করেছে এই শিক্ষাব্রতীর বুকে।

সামান্য দু-একটা কথা কয়েই রঘুবীর উঠে পড়লেন। যাবার সময়ে আর একবার নিজের বাড়ি যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি দ্রুত শালবনের মধ্যকার রাস্তাটা ধরে এক-সময়ে ইন্দ্রাণীর দৃষ্টির অলক্ষ্যে চলে গেলেন।

এর দিন-তিনেক পরেই একটি অত্যন্ত স্থূলকায়া বাঙালী মহিলা এলেন ইন্দ্রাণীর সঙ্গে দেখা করতে। পরিচয়ে জানালেন তিনি এখানকারই একটি বাঙালী মেয়ে-ইস্কুলের হেড্ মিস্ট্রেস্—কুমুদিনী মিত্র। ইস্কুলটিতে ক্লাশ এইট্ পর্যন্ত পড়ানর ব্যবস্থা আছে, কিন্তু না হয় সে ইস্কুলে পর্যাপ্ত মেয়ে আর না পাওয়া যায় স্থানীয় বাঙালী ভদ্রলোকদের কোন সহানুভূতি। 'হনুমানদাস কেদারনাথ' এস্টেটের একটা মোটা মাসিক সাহায্য পাওয়া যায় বলেই কোনমতে এখনও টিকে আছে, নইলে কবেই উঠে যেত। অবশ্য লোকাভাবও খুবই। উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী পাওয়াই যায় না। সামান্য বেতনে বাইরে থেকেও কেউ এসে থাকতে চায় না। স্কুল চালাবার রীতি-পদ্ধতি জানেন, এমন কাউকে কিছুদিনের মত পেলেও কুমুদিনী নূতন করে সব ব্যবস্থা করতে পারতেন। কুমুদিনী নিজে আই-এ পাস করেছেন বটে, কিন্তু ইস্কুলের অভিজ্ঞতা কিছুই নেই।

সব কথা শেষ করে কুমুদিনী আসল কথাটা পাড়লেন, 'শুনেছি আপনি মাস্টারী করেছেন কিছুদিন কলকাতায়, আর থাকবেনও এখানে তিন চার মাস—এই সময়টা আমাদের একটু সাহায্য করুন না! এগারটা থেকে চারটে পর্যন্ত ত!......আমরা আপনাকে তিন মাসের জন্য একশ' টাকা ক'রে মাইনে দিতে পারব।' ইন্দ্রানী মুহূর্ত-খানেক চুপ ক'রে থেকে বললে, রঘুবীর-বাবুর সঙ্গে আপনাদের ইস্কুলের কোন সম্পর্কে আছে নাকি?'

'আছে বৈ কি! তিনিই ত আমাদের সেক্রেটারী।'

'আমার সব কথা তাঁর মুখেই শুনলেন বুঝি?'

'হ্যাঁ, নইলে কোথা থেকে জানব বলুন!'

ইন্দ্রাণী মাথা নত ক'রে দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'দেখুন কাজ আমি করতে পারি, কিন্তু মাইনে আমি পঞ্চাশ টাকার বেশী নিতে পারব না।'

'কেন?' বিস্মিত হয়ে কুমুদিনী প্রশ্ন করলেন।

'পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত আমার প্রাপ্য—একশ' টাকাটা দান।'

কুমুদিনী কিছুক্ষণ পর্যন্ত হতবাক্ হয়ে চেয়ে রইলেন ওর দিকে তারপর বললেন, 'বেশ তাই হোক্। কাল থেকেই যাবেন ত? ঝি পাঠাব, না রঘুবীরবাবুর গাড়িটা পাঠাতে বলব?'

'কতদূর?'

'এই ত, মিনিট পাঁচেকের পথ'—

'তাহ'লে ঝি-ই পাঠাবেন।' কুমুদিনী বিদায় নিলেন।

পরের দিন থেকেই ইন্দ্রাণী ইস্কুলের কাজে লেগে গেল। গিয়ে দেখলে কাজ সত্যিই অনেক করবার আছে! ইস্কুল সেটাকে না বলে ইস্কুলের পরিহাস বলা উচিত, এমনই বিশৃঙ্খল অবস্থা সেখানকার। ইন্দ্রাণী বেশী দিন মাস্টারী করে নি, হেড মিস্ট্রেস্ ত ছিলই না, কিন্তু তবু কী করা উচিত সে সম্বন্ধে তার সহজবুদ্ধি দিয়েই একটা ধারণা করে নিতে পেরেছিল, ফলে তিন চার দিন না যেতে যেতেই মোটামুটি ব্যবস্থাটা ক'রে ফেললে সে।

ইতিমধ্যে রঘুবীরবাবুর সঙ্গে তার দেখা হয় নি। রঘুবীরবাবু ইস্কুলেও আসেন নি, তিনি ইন্দ্রাণীর প্রতি যে অনুগ্রহই করে-ছিলেন সেটা ইন্দ্রানীর মনের কাছে অজানা ছিল না, কিন্তু সে অনুগ্রহের সঙ্গে তিনি নিজেকে ঘনিষ্ঠ করে তুললেন হয়ত, এই আশঙ্কা ক'রে ইন্দ্রাণী আগে থাকতেই একটু বিরক্ত হয়েছিল। কিন্তু এই চারদিনের মধ্যেও তার কোনও আভাস পর্যন্ত না পেয়ে তার সে বিরক্তি সত্যকার কৃতজ্ঞতায় পরিণত হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ল ও'র বাড়িতে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছে সে, সেটা এবার পূর্ণ করা দরকার। সে আর দেরী না ক'রে শনিবার দিনই ছুটির পর ইস্কুলের ঝিকে সঙ্গে ক'রে রঘুবীরবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হ'ল।

রঘুবীর তাঁর স্ত্রীকে ইন্দ্রাণীর কথা ব'লেই রেখেছিলেন, তাই নর্মদা বিস্মিত হ'লেও ওর পরিচয়টা অনুমান ক'রে নিলেন খুব শীঘ্রই এবং ভাঙা বাঙলাতে অভ্যর্থনা জানিয়ে একেবারে ওপরে নিয়ে গিয়ে বসা-লেন। নর্মদার বয়স হয়েছে, ইন্দ্রাণীর মনে হ'ল পঁয়ত্রিশ ছত্রিশের কম নয়, চেহারাও সাধারণ বিহারী মেয়েদের মতই, সুন্দরও নয়—কুশ্রীও বলা চলে না। এককালে তন্বীই ছিলেন হয়ত—এখন একটু স্থূলতার দিকে মোড় ফিরেছেন।

আলাপ জমে উঠল দ্রুত। নর্মদা এক সময়ে বললেন, 'আপনি কলকাতার মেয়ে লিখাপড়িও ঢের শিখেছেন, গান গাইতে পারেন নিশ্চয়ই। একটা গান শুনান না!'

ইন্দ্রাণী লজ্জিত মুখে বললে, 'কিন্তু সে যে সব বাঙলা গান!'

'তা হোক্ না বাঙলা গান, কথা বুঝছি আর গান বুঝব না?'

অগত্যা ইন্দ্রাণীকে গাইতে হ'ল। রবীন্দ্র-নাথের দু' তিনখানা গান গেয়ে সে যখন থামল তখন নর্মদা মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, 'বড়ি মিঠা আছে আপনার গলা। হামার মেয়েদের আপনি দুখানা গান শিখাইতেন ত ভাল হ'ত'—

ছেলেমেয়েদেরও তিনি ডাকলেন। বড় ছেলেটির বয়স বছর ষোল, এখানকার ইস্কুলে পড়ে। তারও ওপরে একটি মেয়ে আছে। সে এখন শ্বশুর বাড়িতে থাকে। আরও গুটি চার-পাঁচ ছেলেমেয়ে ও'র। সব-গুলিই বেশ শান্ত আর ভদ্র। নর্মদা ওদের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আপনি যদি সত্যিই ওদের দু' একখানা গান শিখাইয়ে দেন ত বড় ভাল হয়। এখানে কেউ জানে না, অথচ আমার বড্ড শোনবার সখ আছে'—

ইন্দ্রাণী তৎক্ষণাৎ প্রতিশ্রুতি দিলে। তারপর প্রচুর জলযোগ ক'রে চা খেয়ে এক সময় তার হঠাৎ খেয়াল হ'ল যে চারটে বাজে, এইবার তার বাড়ি ফেরা উচিত। দাদার ঘুম ভাঙার সময় হয়েছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'এবার আমি বাড়ি যাব দিদি, সে ঝিটা আছে কি?'

নর্মদা জবাব দিলে, 'ঝিকে আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। ও'র অফিস যাবার সময় হয়েছে, উনিই গাড়ি ক'রে পেঁছে দেবেন।'

চমকে উঠে ইন্দ্রাণী প্রশ্ন করলে,—'রঘুবীরবাবু কী বাড়িতে আছেন নাকি? কই, তাঁকে ত দেখলুম না!'

নর্মদা হেসে জবাব দিলে, 'তিনি বিশ্রাম করছিলেন ওপরে। অন্য দিন এর আগেই বেরিয়ে যান, আজ আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন, পেঁছে দেবেন বলে'—

ইন্দ্রাণী অপ্রস্তুত হয়ে বললে, 'এ কিন্তু ভারী অন্যায়। মিছিমিছি তাঁর দেরী হয়ে গেল, তা ছাড়া আমি গানটান গাইলুম—কী মনে করলেন তিনি!'

রঘুবীরপ্রসাদ বোধহয় কাছেই কোথাও ছিলেন, তিনি ঘরে ঢুকে নমস্কার ক'রে বললেন, 'আমার গান শোনা কি নিষিদ্ধ মিস্ বোস?'

'না তা নয়—তবে'—

ইন্দ্রাণী ভাল ক'রে জবাব দিতে পারলে না।......

রঘুবীর শহরটা একটু দেখাবার জন্য গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়েই চললেন। দূরে পাহাড়ের নীল রেখার মধ্যে সূর্যদেব ঈষৎ রক্তাভ দেহে ঢলে পড়েছেন, দু ধারে শালবন আর ধানের ক্ষেতে তার লাল আলো এসে পড়ে কেমন যেন স্বপ্নের সৃষ্টি করেছিল। সে দিকে চেয়ে থাকতে এক সময়ে রঘুবীর একটা ছোট দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন,

'আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তাহ'লে স্থীর অনুরোধটা আমি একটু বাড়িয়ে দিতে চাই'—

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ আমার ছেলেমেয়েদের আপনি যদি এই ক'মাস একটু বাঙলা পড়াতে আর গান শেখাতে পারতেন ত আমার সত্যিই উপকার হ'ত।'

ইন্দ্রাণী ওঁর মুখের দিকে চেয়ে বললেন,, 'শেখাতে পারি যদি পারিশ্রমিক না নিতে হয়।'

রঘুবীরবাবু খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'কিন্তু এটাকে আপনি সাধারণ টুইশনি বলে মনে করতে পারছেন না কেন?......সবটাই আপনি উপকার করার চেষ্টা বলে মনে করছেন এই ত মুস্কিল!'

ইন্দ্রাণী বললে, 'কিন্তু এটা কি তাই নয়? অন্তত অনেকটা?......আপনি ত শুনেছি মিথ্যা বলেন না কখনই!'

রঘুবীর বললেন, 'মিথ্যা বলি বই কি—তবে প্রয়োজন না হলে বলি না। কিন্তু আমার সত্যই উপকার হ'ত।'

ইন্দ্রাণী বললে, 'বেশ ত। কিন্তু আপনিই বা পারিশ্রমিক দেবার জন্য ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আপনার একটু উপকার করার সুযোগই দিন না!......আপনার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানতুম না, তাই একদিন কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে গিয়েছিলুম আজ তার প্রায়শ্চিত্ত করতে দিন!'

রঘুবীর একটু হেসে বললেন, 'আমার সম্বন্ধে ইতিমধ্যেই কী এত জানলেন?'

'জানলুম যে আপনি ইতিমধ্যেই স্বদেশী আন্দোলনে বার চারেক জেল খেটেছেন, এখানকার কংগ্রেসী ব্যাপার সমস্তই আপনার আনুকুল্যে চলে। অন্তত কুড়িটি নিঃস্ব পরিবার আপনার দানে জীবনধারণ করে, প্রতিদিন আপনার গোলা থেকে দু' মন ক'রে চাল ভিক্ষা দেওয়া হয়—আর কত শুনবেন নিজের প্রশংসা?'

আরক্ত মুখে রঘুবীর বললেন, 'আর শুনতে চাইনে। এ নিশ্চয়ই মিসেস মিত্রের কাজ!'

হেসে ফেলে ইন্দ্রাণী বললে, 'কুমুদিনী-দি'র নিন্দা করাই স্বভাব বটে!'

গাড়ি ততক্ষণে শহরের বাইরে দিয়ে ঘুরে আবার শহরে প্রবেশ করছে। দূরে লাইব্রেরী হলের সামনের মাঠে একটা কী উপলক্ষ্যে জনসমাগম হয়েছে। সেদিকে দেখিয়ে ইন্দ্রাণী প্রশ্ন করলে, 'ওখানে কি সভা হবে নাকি কিছু, রঘুবীরবাবু?'

'হ্যাঁ। আমিই সভাপতি।'

'এখনও সময় হয় নি বুঝি?'

হাত ঘড়িটা দেখে রঘুবীরবাবু জবাব দিলেন, 'সময় হয়ে গেছে বৈ কি!..... একটু দেরীই হ'ল।'

ব্যস্ত হয়ে উঠে ইন্দ্রাণী বললেন, 'তবে ত বড্ড অন্যায় হয়ে গেছে। আপনি না হয় সভায় যান, আমি এটুকু একাই যেতে পারব। আমিও যেতুম তবে—দাদা'—

রঘুবীরবাবু বললেন। 'আপনার জন্যও ঠিক দেরী হয় নি মিস্ বোস। আসল কথা আজ একটা বড় ক্লান্তি অনুভব করছি—।... আপনি ব্যস্ত হবেন না। সারাজীবনই ত ঠিক সময়ে হাজিরা দিলুম, একদিন না হয় একটু দেরীই হ'ল'—

তাঁর কণ্ঠে অপরিসীম শ্রান্তি লক্ষ্য ক'রে ইন্দ্রাণী উদ্বিগ্ন হয়ে রঘুবীরবাবুর মুখের দিকে চাইলে। কিন্তু সে মুখ দেখে কিছুই বোঝা গেল না, কারণ তিনি তখন গাড়ির কোণে মাথা রেখে চোখ বুজেছেন।

এইটেই যথেষ্ট অবশ্য, রঘুবীরবাবুর ইতিহাসে অবসন্নতা নেই কোথাও, তা সে বহুবার শুনেছে কুমুদিনীদি'র মুখে। সে একটু চুপ ক'রে থেকে প্রশ্ন করলে, 'আজ কি সভাতে যেতেই হবে?'

'আমি তাদের কথা দিয়েছি, সুতরাং একটা বাধ্যবাধকতা নেই কি?'

তখন গাড়িটা ইন্দ্রাণীর বাংলোর সামনে এসে পৌঁচেছে। ইন্দ্রাণী বললে, 'তাহ'লে একটুখানি দাঁড়ান, আমি দু' মিনিটের মধ্যেই এক কাপ চা তৈরী ক'রে দিচ্ছি। এই অবস্থায় সভার কচকচিতে যেতে আমি কিছুতেই দেব না।'

রঘুবীরবাবু চোখ মেলে চাইলেন। খুব ম্লান একটুখানি হেসে বললেন, 'এ কিছু নয় মিস্ বোস, এখনই ঠিক হয়ে যাবে। তা ছাড়া চা আমি খাই না'—

ইন্দ্রাণী দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'না তা হয় না। আপনি বসুন, আমি লেবু দিয়ে এক গ্লাস সরবতই ক'রে দিচ্ছি। এতই দেরী যখন হ'ল দু' মিনিটে কিছু ক্ষতি হবে না।'

ইন্দ্রাণী উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই ছুটে চলে গেল। রঘুবীরবাবুও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার গাড়ির কোণে মাথা রেখে চোখ বুজলেন। তিনি বাইরে কোথাও কখনও খান না কিছু, কোন দিনই না, তবু আজ ইন্দ্রাণীকে ক্ষুণ্ণ করতে তিনি পারলেন না, একটু পরেই ইন্দ্রাণী যখন সরবৎ নিয়ে ফিরে এল, তখন তিনি নিঃশব্দে ওর হাত থেকে সরবতের গ্লাসটি নিয়ে নিঃশেষে পান করে গ্লাসটি ফিরিয়ে দিলেন। তিনিও কোন কথা কইলেন না, ইন্দ্রাণীও না, শুধু গাড়ি ছেড়ে দেবার পর তাঁর মনে হল যে ইন্দ্রাণীর নমস্কার তিনি ফিরিয়ে দিতে ভুলে গেলেন!

রঘুবীরবাবু চলে গেলেন বটে, কিন্তু ইন্দ্রাণী কিছুতেই স্থির হয়ে বসতে পারল না। সুব্রত অনেক আগেই ঘুম থেকে উঠেছে, তার যা দরকার মাসিমাই দিয়েছেন সব—সুতরাং কাজ কিছুই ছিল না। সুব্রতর সঙ্গে দু' একটা কথা কইবার পর সে একা বই নিয়ে বসল, কিন্তু বইতেও মন দি পারলে না। সমস্ত কাজের মধ্যেই বার বা রঘুবীরবাবুর সেই ক্লিষ্ট কণ্ঠস্বর কা বেজে ওকে উন্মনা ক'রে তুলতে লাগল শেষ পর্যন্ত সে কতকটা নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ল এবং একটা মো গোছের সিল্কের চাদর গায়ে জড়িয়ে বেরি পড়ল রাস্তায়।

সুব্রত একটু বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করলে 'কোথায় যাচ্ছিস রে ইন্দু!'

বোধ হয় একমুহূর্ত ইতস্তত ক'রে সে জবাব দিলে, 'এমনি। এখানে একটা মিটি আছে, মনে করছি একটু ঘুরে আসব।'

স্নেহার্দ্র কণ্ঠে সুব্রত বললে, 'যা যা একটু ঘুরে আয়।......সত্যি, একা একা বন হয়ে থাকা'—

কাছারীর পেছনের বিরাট আম বাগানট পেরিয়ে ইন্দ্রাণী যখন সভা স্থলে পৌঁছল তখন সভার অন্য বক্তাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে, স্বয়ং সভাপতিই বক্তৃতা করছেন। এ যেন রঘুবীরবাবুর সম্পূর্ণ ভিন্ন চেহারা। তাঁর কণ্ঠ এখনও তেমনি শান্ত ও সংযত বটে, মুখের প্রশান্তি কোথাও খর্ব হয়নি কিন্তু যে কথাগুলি তাঁর গম্ভীর কণ্ঠ ভেদ ক'রে বার হয়ে আসছিল ত যেন এক একটি আগুনের খণ্ড—তেমনিই তার জ্বালা, তেমনিই তার তেজ! বিষয় ছিল মিউনিসিপ্যালিটির কী একটা ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ—সব কথা ইন্দ্রাণী বুঝতেও পারলে না, তার মনেও রইল না অর্ধেক—কিন্তু সে স্থানকালপাত্র ভুলে গিয়ে মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে রইল এই মধ্যবয়সী বিহারী ভদ্রলোকটির দিকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রী এঁকে সম্মানিত করে নি, শিক্ষার সুযোগ পাওয়া তাঁর সম্ভব নয়—কিন্তু শুধু প্রখর সহজ বুদ্ধি ও আত্মসম্ভ্রম জ্ঞান তাঁকে যে মহিমা ও কর্মক্ষমতা দিয়েছে, তার কাছে ইন্দ্রাণীর মাথা নত না হয়ে পারল না।......

ইন্দ্রাণী বসে ছিল সভার পিছনেই, তখন সন্ধ্যাও ঘনিয়ে এসেছে, সভা স্থলের সামান্য আলোতে তাকে সেই ভীড়ের মধ্যে দেখতে পাবার কথা নয়। কিন্তু বোধ করি, তার প্রস্ফুটিত সূর্যমুখীর মত ঊর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত মুখ এবং নিষ্পলক চাহনিই এক সময়ে সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন রঘুবীরবাবুর বক্তব্য গোলমাল হয়ে গেল, তারপরই তিনি দৃঢ় কণ্ঠে পুনরায় তাঁর পূর্ব কথার জের টেনে নিলেন। বক্তব্য অবশ্য আর বেশী ছিল না, মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল, সভাও ভাঙ্গল সঙ্গে সঙ্গেই—কিন্তু সে তথ্যটা বুঝতে ইন্দ্রাণীর আরও মিনিটখানেক সময় লাগল। তার পাশ থেকে অন্য মেয়েরা

উঠে সভাস্থল ত্যাগ করছে দেখে তার চৈতন্য হ'ল, সে লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল।

কিন্তু বাইরে এসে আবার একটু গোল বাধল। এখানকার পথঘাট এখনও তার আয়ত্ত হয় নি, তাছাড়া অন্ধকারে ঠিক বোঝাও যায় না--- কোন পথ ধরবে ভাবছে সে এমন সময় ওর পাশে এসে দাঁড়ালেন স্বয়ং রঘুবীরপ্রসাদ, ঈষৎ চমকে দিয়ে বললেন, 'চলুন, আপনাকে পে'ৗছে দিয়ে আসি!'

ইন্দ্রাণীর সমস্ত দেহ অকস্মাৎ যেন কী কারণে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। সে জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে ও'র সঙ্গ নিলে। রঘুবীর-বাবুই একটু পরে বললেন, 'সভায় যোগ দেবার আপনার ইচ্ছা হয়েছিল জানলে আমি তখনই অপেক্ষা করতুম'—

ইন্দ্রাণী এবার যেন একটু জড়িত কণ্ঠে উত্তর দিলে, 'না, ঠিক তা নয়। তখন বুঝতেও পারি নি। দাদার যা দরকার আগেই সারা হয়ে গিয়েছিল, আর বিশেষ কোন কাজও ছিল না হাতে--তাই।....আপনার গাড়ি কোথায় গেল, হে'টে ফিরতে কষ্ট হবে না?'

'না, এইটুকু ত! বেড়াতে বেড়াতে চলে যাব। আপনার সঙ্গে দেখা করব ব'লেই ফেরৎ পা'ঠিয়ে দিয়েছি।'

তারপর একটু থেমে বললেন, 'আপনি যে নিজে ইচ্ছা ক'রে আজ আমাদের সভায় যোগ দিয়েছেন, আমার বক্তৃতা আপনাকে শোনাতে পেরেছি—একথাটি চিরদিন আমার মনে থাকবে!'

ইন্দ্রাণী জবাব দিতে পারলে না, তার কেমন যেন মনে হ'তে লাগল যে কথা কইতে গেলেই ওর গলা কে'পে যাবে।

আর একটুখানি চলবার পরই ওদের বাংলো পে'ৗছে গেল। একেবারে দোরের কাছে এসে রঘুবীরবাবু বললেন, 'তাহ'লে আমি যেতে পারি—মিস্ বোস?'

কী ছিল সে কণ্ঠস্বরে কে জানে, ইন্দ্রাণীর যেন নিমেষে সব গোলমাল হয়ে গেল। সে কিছু ভাবলে না, ভাববার অবসরও ছিল না, শুধু অন্ধ আবেগের প্রেরণায় সেই অন্ধকারেই তার ডান হাতখানা এগিয়ে দিলে রঘুবীরের দিকে। রঘুবীরও দুহাতে ওর হাতখানা চেপে ধরে কম্পিত কণ্ঠে শুধু বললেন, 'এ আমার অভাবনীয় সৌভাগ্য ইন্দ্রাণী, এ আমার কল্পনার অতীত!'

মুহূর্তের আবেগ মুহূর্তেই কেটে যায় —ইন্দ্রাণীও সেই একটি মুহূর্ত পরেই প্রকৃতিস্থ হ'ল। বিষম লজ্জায় ও'র মুঠোর মধ্যে থেকে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে এক রকম ছুটেই সে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল, একটা নমস্কার করার কথাও মনে রইল না।

এরপর রঘুবীরবাবুর বাড়ি যাওয়া ওর উচিত হবে কিনা, ভাবতেই দু' দিন কেটে গেল। কিন্তু নর্মদাকে ও একরকম কথাই দিয়েছে স্মরণ ক'রে তৃতীয় দিনে স্কুলের ফেরৎ রঘুবীরের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। নর্মদা ওঁকে দেখে আদরে অভ্যর্থনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। রঘুবীরবাবু আছেন কিনা জানা গেল না, জানবার প্রয়োজনও হ'ল না—তবে তাঁর সঙ্গে ইন্দ্রাণীর দেখা হ'ল না। সেদিনও না, তার পরদিনও না। পর পর সাতদিন ইন্দ্রাণী গেল ও'দের বাড়িতে ছেলেমেয়েদের পড়াতে এবং গান শেখাতে কিন্তু গৃহকর্তা একদিনও কোন ছলেই ওদের সামনে এলেন না। পাছে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়, আর লজ্জায় সে সহজভাবে কথা বলতে না পারে এই ভয়ই ছিল ইন্দ্রাণীর, কিন্তু সে ভয় যখন অমূলক প্রমাণিত হ'ল তখন সে যেন একটু ক্ষুণ্ণই হ'ল। এবং সে ক্ষোভ যেদিন নিজের কাছে ধরা পড়ল সেদিন সে নিজের উপরই বিরক্ত হয়ে উঠে স্থির করলে যে সে নর্মদাদের বাড়ি আর যাবে না।

সেই ভেবেই সেদিন সে ইস্কুলের ফেরত সোজা বাড়ি ফিরে এল। সুব্রত একটু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে, 'পড়াতে গেলিনে?'

'শরীরটা ভাল লাগছে না দাদা!'

বিষম উদ্বিগ্ন হয়ে সুব্রত প্রশ্ন করলে, 'সে কী রে! কী হয়েছে?......জ্বরটর হয় নি ত?'

'না না। এমনি—মাথাটা একটু ধরেছে'—

সে সুব্রতকে এড়িয়ে নিজের ঘরে চলে গেল। ভাল লাগছে না ওর কিছুই, কিছুতেই মন নেই যেন। একটা তিক্ততা জমা হয়েছে অকারণেই মনের ভেতর--তার কারণ অনুসন্ধান করতেও ভয় পায়। একটা অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা, একটা অপমানকর বেদনা ওকে ভুলতে হবে এটা ঠিকই, কিন্তু তার কোন পথই চোখে পড়ছে না যে!

সে বইখানা কোলের ওপর ফেলে শূন্য দৃষ্টিতে সামনের শালবনের দিকে তাকিয়ে ছিল, সহসা এক সময় পথের ওপরের শুকনো অর্জুন পাতাগুলো মচ্‌মচ্ ক'রে উঠতে ও চমকে চেয়ে দেখলে স্বয়ং রঘুবীরবাবু আসছেন, তাদেরই বাড়ির দিকে।

সে চকিতে ত্রস্ত হয়ে উঠল, নিজের অজ্ঞাতসারেই একবার নিজের বেশ-ভূষায় চোখ বুলিয়ে, খোঁপাটা ঠিক ক'রে নিলে, কিন্তু তখনই অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে গেল না। বাইরে চেয়ার নিয়ে বসেছিল সুব্রত, সুব্রতই রঘুবীরবাবুকে অভ্যর্থনা ক'রে বসালে। ইন্দ্রাণী উৎকর্ণ হয়ে বসে রইল অন্ধকারেই।—

অন্যান্য কুশল প্রশ্নের পর রঘুবীরবাবু বললেন, 'মিস্ বোস আজ আমাদের বাড়ি যান নি, তাঁর অসুখবিসুখ কিছু করল কিনা, তাই খোঁজ করতে এসেছি।.....আমি জানতুম না, আমার স্ত্রী চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন অফিসে, জোর হুকুম—এখনই ওঁর খবর নিতে হবে'—

একটু হেসে রঘুবীরবাবু মুঠো খুলে একখানা কাগজ দেখালেন।

সুব্রত বললে, 'হ্যাঁ, ওর মাথাটা ধরেছিল নাকি, সেইজন্যেই যেতে পারে নি। ইন্দু, ও ইন্দু, রঘুবীরবাবু এসেছেন!'

ইন্দ্রাণী কিছুক্ষণ ধরে তার পরিধেয় শাড়িখানা আরও একটু ভদ্রভাবে নামাবার চেষ্টা ক'রে এক সময়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। তার কণ্ঠ-কপোলের রক্তিমা অন্ধকারে চোখে পড়ল না কারোর, কিন্তু সেই শীতার্ত হেমন্ত সন্ধ্যাতেও তার ললাট যে স্বেদসিক্ত হয়ে উঠেছিল তা একটু চেষ্টা করলেই দেখা যেত।

ঈষৎ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে রঘুবীরবাবু প্রশ্ন করলেন, 'এখন কেমন আছেন? মাথাটা ছেড়েছে?......সন্ধ্যাবেলা একটু মাঠের দিকে বেড়ালে বোধহয় ভাল হ'ত। অতিরিক্ত পরিশ্রমেই বোধহয়'—

বহু চেষ্টায় যে স্বর বার হ'ল তা যেমন শুষ্ক তেমনি তীক্ষ্ণ—ইন্দ্রাণী উত্তর দিলে, 'না, এখন ভালই আছি।'

ও'রা দুজনেই সে কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলেন। সুব্রত বললে, 'কিন্তু রঘুবীরবাবু কথাটা ভালই বলেছেন, ঠাণ্ডা বাতাসে একটু পায়চারি করা উচিত।'

নিজের কণ্ঠস্বরের অকারণ তীক্ষ্ণতায় ইন্দ্রাণী নিজেই লজ্জা পেয়েছিল। সে একটু হাসবার চেষ্টা ক'রে বললে, 'কোথায় আর পায়চারি করব, তার চেয়ে নর্মদাদিদির ওখানেই একটু বেড়িয়ে আসি। আপনি যান, আমি নিজে গিয়েই তাঁর চিন্তা দূর করব'—

ওর মনে রইল না যে কথাটা ও শুনেছিল আড়াল থেকে সুতরাং সে কথার উল্লেখ না করাই উচিত। কিন্তু রঘুবীরবাবু সহজভাবেই কথাটা নিলেন, জবাব দিলেন, 'আমাকেও বাড়িই ফিরতে হবে, যদি আপত্তি না থাকে, না হয় আমার সঙ্গেই চলুন।'

একমুহূর্তেরও অল্প সময় ইতস্তত ক'রে ইন্দ্রাণী বললে, 'চলুন।'

সে চাদরটা জড়িয়ে পথে যখন নেমে এল, তখন অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। শুকনো ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে উত্তর দিক থেকে, তার ফলে শাল ও আমবনের মধ্যে জেগেছে মর্মর —সে শব্দ যেন ভীত ক'রে তুলল ইন্দ্রাণীকে। সে চলতে চলতে একবার একটু অস্ফুট শব্দ ক'রে শিউরে উঠল। অন্ধকারেও তার সে শিহরণ লক্ষ্য করে রঘুবীরবাবু বললেন, 'ভয় পেলেন নাকি? ভয় কি? ওটা শুকনো পাতার আওয়াজ?'

লজ্জিতা ইন্দ্রাণী কণ্ঠস্বরে অদ্ভুত একটা জোর দিয়ে বললে, 'বড্ড শুকনো পাতা চারিদিকে' আপনাদের এখানে।......বাগানগুলো রোজ ঝাঁট্ দেয় না কেন?......দু' চোখে দেখতে পারি না আমি পাতা ঝরার সময়টা!'

অন্যমনস্কভাবে রঘুবীর জবাব দিলেন, 'হেমন্তকালটাই খারাপ ইন্দ্রাণী, মানুষের বেলাও তা-ই। যৌবন চলে যায়, পাতা ঝরার সময় আসে তারও, অথচ বার্ধক্যের রিক্ততাকে সে মেনে নিতে চায় না!'

তিনটি অক্ষরের একটি শব্দ—মনের অবচেতন গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসা—ইন্দ্রণীর সারা মনটাকে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে দিয়ে গেল, অকস্মাৎ তার দুটি চোখ ভরে উঠ্ল জলে। সে আর কথা কইলে না, নিঃশব্দে সেই সুতীব্র বেদনার মাধুর্যকে রক্তাক্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে করতে এগিয়ে চলল।

রঘুবীরবাবুও তেমনি অন্যমনস্কভাবে নীরবে পথ চলতে লাগলেন।

সুব্রত সেরে উঠেছে। তার মন এবার এই অলস মন্থর অবসরে উঠেছে হাঁপিয়ে। কিন্তু ইন্দ্রাণীর কাছে বাড়ি ফেরার কথাটা পাড়তে তার সাহস হয় না। কারণ শরীর তার সুস্থ হলেও সবল হয় নি—সে কথা সে নিজেই জানে। আর ইন্দ্রাণী, তার দিন চলেছে কী এক উদ্দেশ্যহীন অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে। তার সমস্ত চিন্তা যেন কেমনতর এলোমেলো হয়ে গেছে। বাড়ির কথা, তার অতীত জীবনের কথা, যেন মনে হয় কোন্ যুগের কথা—সেখানে ফিরতে হবে বটে, কিন্তু কবে তা সে জানে না।

ইস্কুলে ওকে খাট্তে হয় খুব বেশী। ইস্কুলের অনেকটা সুবন্দোবস্ত হয়ে গেছে, উন্নতিও হয়েছে ঢের, সেজন্য কুমুদিনীর কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। সেক্রেটারী রঘুবীরবাবুও এর মধ্যে দু' তিন দিন এসে সব দেখেশুনে, ওকে উচ্ছ্বসিত স্তুতি জানিয়ে গেছেন এবং খুব সম্ভব তাঁরই প্ররোচনায় কমিটির এক বিশেষ সভায় ইন্দ্রাণীকে অনুরোধ করা হয়েছে বেশি মাইনে নেবার জন্য।

ইস্কুলের পর নিয়মিতভাবেই নর্মদার বাড়ি যায় ও। ছেলেমেয়েগুলিকে কিছু বাঙলা এবং কিছু গানও শিখিয়েছে সে, তাদের তার ভালও লাগে খুব। নর্মদার ত কথাই নেই—নিজের বোনের মতই তিনি ভালবাসেন ওকে। কিন্তু এ সবে ইন্দ্রাণীর মন ভরে না। কাজগুলো ক'রে যায় যেন একটা স্বপ্নের মধ্য দিয়ে; মন তার সর্বদাই কী একটা অজ্ঞাত ক্ষুধায় হু-হু করে।

রঘুবীরবাবু সেদিনকার সেই দুর্বলতার পর খুবই সতর্ক হয়েছেন। দেখা তিনি প্রায় রোজই করেন—নিজের বাড়িতে সহস্র কাজের ফাঁকে। নির্জনে দেখা করার যে সমস্ত সুযোগ তিনি এড়িয়ে যান তা ইন্দ্রাণী লক্ষ্য করে, সেজন্য সে কৃতজ্ঞ। রঘুবীরবাবু নিজের গাড়ি দিয়ে কাছাকাছি পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে যা কিছু দ্রষ্টব্য ছিল সব দেখবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন কিন্তু সুব্রতর কোন নিমন্ত্রণেই তিনি ওদের সঙ্গে যেতে রাজী হন নি। তাঁর কাজের বিবরণটা সম্যক পাবার পর সুব্রতও সাহস করেনি বেশি পেড়াপীড়ি করতে।

এমনি করেই দিন কাটছিল, সহসা একদিন সুব্রত রঘুবীরবাবুর কাছেই কথাটা পাড়লে, "এবার মনে করছি বাড়ি ফিরব রঘুবীরবাবু! ইন্দ্রাণীকে ত ছাড়তে হয়!"

যেন চমকে ঘুম ভাঙ্ল রঘুবীরবাবুর। তিনি কেমন একটা বিবর্ণ মুখ তুলে প্রশ্ন করলেন, 'সে কি? এরি মধ্যে? আপনি ত এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হন নি।'

'সুস্থ নিশ্চয়ই হয়েছি—হয়ত কিছু মোটা হ'তে বাকী আছে। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে দেশের জন্য মন টেনেছে এবার। তা ছাড়া ইস্কুলের চাকরীটা হয়ত এখনও গেলে আবার ফিরে পাওয়া যেতে পারে!'

রঘুবীরবাবু একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'অবিশ্যি দেশের জন্য যদি মন টেনে থাকে কিছুই বলবার নেই, তবে ইস্কুল এদেশেও ছিল এবং মাস্টারীরও অভাব হ'ত না সুব্রতবাবু!

সুব্রত ঈষৎ লজ্জিত হয়ে বললে, 'সে আমিও ভেবে দেখেছি। আপনি প্রথম থেকেই যে অনুগ্রহ করেছেন এবং যত রকমে সাহায্য করেছেন, তাতে আপনার আশ্রয়েই আমার অন্নবস্ত্রের একটা ব্যবস্থা যে হ'তে পারে সে ধারণা আমারও হয়েছে কিন্তু—চিরকাল বাঙলার বাইরে কাটানো সম্ভব হবে না আমার পক্ষে।'

রঘুবীরবাবু একটু চুপ ক'রে থেকে, যেন জোর ক'রেই একটু হেসে বললে, 'কী আর বলব বলুন, তবে অমন চমৎকার মাস্টারনীটিকে নিয়ে যেতে চাইছেন এইতেই আমাদের আপত্তি। বাস্তবিক এই তিনমাসেই ইস্কুলটাকে কি করেছেন! আরও কিছুদিন থাক্লে আমাদের উপকার হত খুব!'

সুব্রত চুপ ক'রে রইল। রঘুবীরবাবু যেন একটা উত্তরের আশা ক'রে ক'রে শেষ পর্যন্ত উঠে পড়লেন।......

সেদিন সন্ধ্যায় নর্মদার ওখানে ছিল ইন্দ্রাণীর নিমন্ত্রণ। এ ব্যাপার এর আগেও দু'একদিন হয়েছে—আহারের পর ঝি আর চাকর দিয়ে নর্মদা ওকে বাঙলোয় পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু সেদিন আহার শেষ ক'রে উঠে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে দেখলে যে স্বয়ং রঘুবীরবাবু অপেক্ষা করছেন ওকে পৌঁছে দেবার জন্য।

সংবাদটা শুনে মুহূর্তের জন্য ইন্দ্রাণীর বুকের কম্পন যেন দ্রুততর হয়ে উঠ্ল, তারপরই শুষ্ক কণ্ঠে বললে, 'আপনি আর কষ্ট করবেন কেন, ঝিয়ের অসুবিধা থাকে আমি একাই যেতে পারব। এই ত মোটে রাত আটটা—'

ঈষৎ হেসে রঘুবীরবাবু বললেন, 'না, ঝিয়ের অসুবিধার জন্য নয় আমারই একটু ওদিকে দরকার আছে, তাই—'

ইন্দ্রাণী আর কোন কথা বললে না। রাস্তায় নেমে খানিকটা নিঃশব্দে পথ হাঁট্বার পর রঘুবীরবাবু হঠাৎ বললেন, 'আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে, চলুন না কাছারীর দিকটা ঘুরে যাই। দু-একটা কথাও আছে আপনার সঙ্গে!'

উত্তর দেবার মত ইন্দ্রাণীর অবস্থা ছিল না, অকস্মাৎ যে দেহের সমস্ত রক্ত ওর মুখে উঠে এক ঝলক আবীর ছড়িয়ে দিলে ওর সুন্দর গণ্ডে, তাও অন্ধকারে দেখা গেল না—শুধু নিঃশব্দে ও শালবনের পথটা ধরলে।

রঘুবীরবাবুই কথাটা পাড়লেন, 'আপনার দাদা যে এবার বাড়ি ফিরতে চাইছেন! আপনার মত কি?'

বহুদিনের একটা তন্দ্রার ঘোর যেন ইন্দ্রাণীরও চমক্ লেগে ভাঙল। তবু সে যতদূর সম্ভব নিস্পৃহ কণ্ঠে উত্তর দিলে, 'তাঁর যদি শরীর সুস্থ হয়ে থাকে ত তিনি ফিরবেন, আমার মত আর কি দরকার বলুন! তাঁর জন্যই ত আমার এখানে থাকা!'

'কিন্তু শরীর কি তাঁর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে? আরও কয়েকদিন থাকা কি উচিত ছিল না?'

'তা হয়ত ছিল, কিন্তু মন যদি তাঁর এখানে আর না বসে, তাহলে ত শরীরও ভাল থাকবে না। তা ছাড়া কাজ ক'রেই যখন খেতে হবে তাঁকে তখন আর বিদেশ বাসের বিলাসে কি হবে বলুন!'

রঘুবীরবাবু একটু ইতস্তত ক'রে বললেন, 'কিন্তু তাঁর জীবিকার একটা ব্যবস্থা এখানেও ত হ'তে পারে!'

'তা হয়ত তিনি চান না—!' কণ্ঠস্বর তেমনি নির্লিপ্ত, তেমনি উদাসীন।

রঘুবীরবাবু প্রাণপণ চেষ্টায় সহজভাবে বললেন, 'আপনাকে হারালে আমাদের স্কুলের বড় ক্ষতি হবে, সেই কথাটাই ভাবছি।'

'আরও উপযুক্ত লোক পাবেন বৈকি!... তা ছাড়া আমার এখানে স্থায়িত্ব কম, জেনেই ত আমাকে নিয়েছিলেন।'

তার গলার আওয়াজে অপমানকর শৈত্য!

সহসা উত্তাপ এল রঘুবীরবাবুরই কণ্ঠে, তিনি যেন অকস্মাৎ ভেঙে পড়ে বললেন, 'কিন্তু কিছুতেই কি আর কিছুদিন আপনাকে ধরে রাখা যায় না?—অন্তত, অন্তত আর দুমাস?'

তীক্ষ্ম ছুরির মত ইন্দ্রাণীর কথাগুলো যেন অন্ধকারকে চিরে দিয়ে গেল, 'তাতে কি লাভ হ'ত বলতে পারেন রঘুবীরবাবু?'

'লাভ?' ভগ্নকণ্ঠে, আহতকণ্ঠে রঘুবীরবাবু বললেন, 'সব লাভের হিসাব কি মুখে দেওয়া যায় ইন্দ্রাণী?'

ইন্দ্রাণী! আবার সেই ছোট্ট একটু শব্দ। অকস্মাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রাণী বললে, 'এখানে থাকাটা কি আপনার জন্য চান, না ইস্কুলের জন্য?'

রঘুবীরবাবু একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'আমার জন্য চাই একথা বলবার অধিকার আমার যে নেই ইন্দ্রাণী। বলতে পারলে খুশি হতুম।'

ইন্দ্রাণীর ওষ্ঠে অন্ধকারেই একটা বিদ্রূপের হাসি খেলে গেল। সে বললে, 'কিন্তু তারপর? আরও দুমাস থাকলে আপনার কি সুবিধা হ'ত?......এমনি কালে-ভাদ্রে দেখা হ'ত—এই ত!'

রঘুবীরবাবু চুপ করে থাকলেন। নিষ্ঠুর ইন্দ্রাণী ব্যঙ্গ করে বললে, 'বড়জোর সৌজন্য করে মধ্যে মধ্যে এমনি পেঁছে দিয়ে যেতেন কিম্বা আমাদের দারিদ্র্য লাঘব করার জন্য নিঃশব্দে আড়াল থেকে কিছু সাহায্য করতেন। কিন্তু আপনার সেই পরোপকার ও স্নেহের বিলাস চরিতার্থ করে আমার কি লাভ হত ভেবে দেখেছেন কি? আমার রক্তমাংসের দেহ রঘুবীরবাবু, আপনার মত পাথর নয়!'

রঘুবীরবাবু নত মুখে অভিযোগটা মাথা পেতে নিয়ে যেন চুপি চুপি জবাব দিলেন, 'আমারই অন্যায় ইন্দ্রাণী, আমারই অপরাধ!'

ইন্দ্রাণী যেন পাগল হয়ে গেছে তখন, সে চাপা অথচ তীব্র গলায় বললে, 'দোহাই আপনার রঘুবীরবাবু, অন্তত একবার সৌজন্যটা থাক, সোজাসুজি বলুন আমাকে ভালবাসেন কি না!.....'

রঘুবীরবাবু যেন কী একটা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ ক'রে উঠলেন। বললেন, 'সে কী এতদিন পরেও বলতে হবে ইন্দ্রাণী?'

ইন্দ্রাণী বললে, 'কিন্তু তারপর? আর কিছুই কি বলবার নেই আপনার?

'বলবার হয়ত অনেক কথাই আছে, কিন্তু করবার কিছু নেই। কোন পথ আমার কোন দিকে খোলা নেই ইন্দ্রাণী!'

ইন্দ্রাণী বললে, 'কিন্তু কেন নেই জানতে পারি কি? আমাকে বিয়ে করুন। বহু বিবাহও ত লোকে করে!'

রঘুবীরবাবু বললেন, 'নিজের যা যন্ত্রণা তা নিজেরই থাক, অকারণে নর্মদার বুক ভেঙ্গে দিতে পারব না!'

'সৌভাগ্য নর্মদার! বিদেশিনী বাঙালীর মেয়ের বুক ভাঙ্গে ত ভাঙ্গুক—নর্মদা সুখে থাক, শান্তিতে থাক!'

'শুধু তাও নয়, ইন্দ্রাণী! আমি এ দেশের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লোক, এখানকার জননেতা আমি, কংগ্রেস বলতে, এদেশের যা কিছু জাতীয় অনুষ্ঠান বলতে সবই আমি। আমার দিকে তাকিয়ে আছে এ শহরের সমস্ত লোক—আমি যদি কোন অনাচার করি তাহ'লে ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি পর্যন্ত লোকচক্ষে হেয় হয়ে যাবে।...না, সে সম্ভব নয় ইন্দ্রাণী! আমার ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যক্তিগত কামনার জন্য আমি আমার স্বদেশের ক্ষতি করতে পারব না। যে সমস্ত যুবকেরা আমার দিকে তাকিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ গঠন করছে, তাদের আদর্শকে ছোট করে দিতে পারব না।'

এই নিষ্ঠুর অপমান ইন্দ্রাণীর সমস্ত দেহ মন যেন অসাড় হয়ে গেল। জবাব দেবার, কথা কইবার, তিরস্কার করার কোন ক্ষমতা কোথাও তার রইল না।

রঘুবীরবাবুই আবার বলে চললেন, 'জানি আমার জীবনের সমস্ত আলো নিভে গেলো, আমার জীবনের বসন্তের দিক, আনন্দের দিক চিরকালের মত শুষ্ক বিবর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু তবু আমার কর্তব্যেরই জয় হলে ইন্দ্রাণী। আমি সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমাকে ভালবাসি, কিন্তু আমার আদর্শ, আমার দেশসেবার ব্রত, প্রাণের চেয়েও বড়। তোমার সামান্য কণ্ঠস্বরের জন্য আমি বাতাসে কান পেতে থাকি, তোমার পায়ের শব্দ আমার রক্তকে চঞ্চল ক'রে তোলে—এ সবই সত্য কথা ইন্দ্রাণী, কিন্তু তবু, তবু আমার কিছু করবার নেই!'

ভগ্নকণ্ঠে ইন্দ্রাণী বললে, 'আমার জন্য আর কিছু করবার নেই তোমার, কোন ত্যাগ করতে পারো না?'

'প্রাণ দিতে পারি ইন্দ্রাণী, সেইটাই সবচেয়ে সহজ!......'

বহুক্ষণ, যেন বহু যুগ নিঃশব্দে অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে স্খলিত কণ্ঠে ইন্দ্রাণী শুধু বললে, 'আচ্ছা, নমস্কার।'

তারপর সেই অন্ধকার শালবনের মধ্য দিয়ে সে নিজের বাংলোর পথ ধরলে। রঘুবীরবাবু সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন নিশ্চল হয়ে। সঙ্গে যাবার সাহস তাঁর হ'ল না। অনেকক্ষণ, বোধ হয় মিনিট পাঁচেক পরে শুধু অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, 'তুমি যাও ইন্দ্রাণী, কালই যাও—অপরাধ বাড়াব না।'

পরের দিন সকালেই কুঞ্জবাবু এসে জানালেন, 'সুব্রতবাবুরা আজই চলে যেতে চান। ভাড়া ওঁরা এ মাসের পুরোই দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন......কিন্তু, আমি নিইনি।'

বাইরের দিক থেকে শূন্য দৃষ্টি ফিরিয়ে অনেকক্ষণ কুঞ্জবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবার পর রঘুবীরবাবু বললেন, 'ও, আজই চলে যাচ্ছেন।......তা, বেশ ত!...... না, আপনি ঠিকই করেছেন।'

কেরাণী ঈশ্বরদয়াল এলেন কী কতকগুলো কাগজ সই করাতে, ক্লান্তভাবে তাকে বললেন, 'একটু পরে ঈশ্বরবাবু, একটু পরে।' তারপর কুঞ্জবাবুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'আমার গাড়ীটা ব্যবস্থা ক'রে দিন না, স্টেশনে পেঁছে দিয়ে আসবে।'

'সে কথাও আমি বলেছিলুম, কিন্তু তাঁরা বাসের টিকিট কেটে ফেলেছেন। রাজী হলেন না।'

'ও, আচ্ছা।'

কুঞ্জবাবু চলে যাওয়ার পর রঘুবীরবাবু কিছুক্ষণ কাগজপত্রে মন দেবার বৃথা চেষ্টা ক'রে উঠে পড়লেন। শীতের অলস রৌদ্র এসে পড়েছে ধূলিবিবর্ণ শালগাছের পাতায়, পথের বাতাস অসংখ্য গরুর গাড়ীর চাকা থেকে বিক্ষিপ্ত ধূলোয় ভারী। পথে ঘুরতে ভাল লাগে না—তবু পথে-পথেই তিনি ঘুরলেন বহুক্ষণ ধরে। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, চোখের কোণে কালি—মুখ শুক্‌নো—এ রঘুবীরবাবুর সঙ্গে শহরের লোক পরিচিত নয়। তারা বিস্মিত হয়ে তাকাতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে, তাদের দৃষ্টিতে নিজের অবস্থা বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়ে তিনি বাগানের পথ ধরে এক সময়ে এসে হাজির হলেন ইন্দ্রাণীদের বাংলোতে। ওরা চলে গেছে, ঘরগুলো হা-হা করছে খালি—কতকগুলো কুঁচো কাগজপত্র এদিকে ওদিকে ছড়ানো, দু একটা ভাঙ্গা ফুটো পরিত্যক্ত জিনিস! এক মুহূর্তের বেশী সেখানে দাঁড়াতে পারলেন না রঘুবীরবাবু, এক রকম ছুটেই বেরিয়ে এলেন।

তখন এগারোটা, ট্রেনের আর মাত্র এক ঘণ্টা দেরী আছে। গাড়ি অফিস ঘরের সামনেই তৈরী থাকে, তিনি অকস্মাৎ গাড়িতে উঠে বসে নিজেই চালাতে শুরু করলেন, বিদ্যুৎগতিতে। স্পিডোমিটারের কাঁটা ত্রিশ, পঁয়ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ—শেষ পর্যন্ত ষাটে এসে পেঁছিল। দীর্ঘ পথ, তবু এই এক ঘণ্টার ভেতরে পেঁছতেই হবে।

সুব্রত বোনকে কোন প্রশ্নই করেনি, কিন্তু তার মুখ দেখে বোধ হয় অনুমান করতে পেরেছিল কিছুটা, তাই তার মুখের অপরিসীম বিবর্ণতা এবং আকস্মিক পলায়নের কোন কারণই জিজ্ঞাসা করেনি। স্টেশনে এসে ইন্দ্রাণী শুষ্ক মুখে, আরক্ত চক্ষু মেলে বসে ছিল ফেলে-আসা পথের দিকেই চেয়ে—বোধ হয় তার সমস্ত মন অপরিসীম ধিক্কার ও আত্মগ্লানির পরেও কোথায় বসে আশা করছিল যাত্রার আগে, অতি পরিচিত শান্ত, সৌম্য একখানি মুখ! কিন্তু মিনিটের পর মিনিটই কেটে গেল, না পেলে তার দেখা, না পারলে ইন্দ্রাণী নিজের মনের কাছে স্বীকার করতে—যে সে তাঁরই দেখা চায়!

সিগন্যাল দিলে। প্লাটফর্মের সমস্ত লোক চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তবু ইন্দ্রাণীর মুখে চোখে যেন কোন প্রাণ-লক্ষণ জাগল না। সুব্রত এসে পেছন থেকে সস্নেহ কণ্ঠে ডাকলে, 'ইন্দু, এবার যে উঠতে হবে দিদি!'

ইন্দ্রাণী মুখ তুলে চাইলে, 'উঠতে হবে? গাড়ি এসেছে?......এই যে—'

কিন্তু উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই ওর নজরে পড়ল দূরে পথের বাঁকে ধুলোর ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করতে করতে ছুটে আসছে একটি পরিচিত গাড়ি। সুব্রতও ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে সে দিকে চেয়ে বললেন, 'রঘুবীর বাবুর গাড়ি না?......আমি তাই ভাবছিলুম, ভদ্রলোক যাবার আগে একবার দেখা করতে এলেন না!......আমিও সময় পেলুম না—। বোধহয় উনিও সকালে খুব ব্যস্ত ছিলেন, না?'

ইন্দ্রাণী জবাব দিল না। গাড়িও তখন এসে গেছে। মেয়ে গাড়ি খালি দেখে সুব্রত তাড়াতাড়ি ওকে সেখানেই তুলে দিলে তারপর মালপত্র নিয়ে নিজে ছুটল স্থানের সন্ধানে। রঘুবীরবাবু যখন এসে পেঁৗছলেন তখন সুব্রতর কোনও চিহ্ন নেই কোথাও, ইন্দ্রাণী শুধু তার গাড়ীতে বসে আছে ওধারের প্ল্যাটফর্মের দিকে চেয়ে।

রঘুবীরবাবু কাছে এসে দাঁড়াতে সে মুখ না ফিরিয়েই বললে, 'সময় মোটে ছিল না বলেই দাদা দেখা করে আসতে পারেন নি, তাঁকে অকৃতজ্ঞ ভাববেন না।... আর, নর্মদাদিদিকে বললেন, তাঁকে আমি কোন দিন ভুলতে পারব না। তাঁর দয়া তাঁর স্নেহ চিরদিন মনে থাকবে—'

রঘুবীরবাবু ধরা গলায় বললেন, 'ইন্দ্রাণী, অপরাধের আমার মার্জনা নেই জানি। কিন্তু তবু, কিছু কি তোমাকে আমার দেওয়া সম্ভব নয়? কোন উপকারে কি আমি আসতে পারি না?'

'না।' শুষ্ককণ্ঠে জবাব দিলে ইন্দ্রাণী।

'কিন্তু—' ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন রঘুবীরবাবু, 'আমার দিন কি নিয়ে কাটবে ইন্দ্রাণী, অন্তত কিছু আমাকে দিয়েও যাও। কোন স্মৃতিচিহ্ন কি ভিক্ষা দিতে পার না?'

'না।'

আরও কিছু হয়ত রঘুবীরবাবু বলতেন সেই সময়েই গাড়ী ছাড়ার ঘণ্টা দিল। সমস্ত আবেগ প্রাণপণ শক্তিতে দমন করে তিনি স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তেই একটা বিপর্যয় ঘটল। অকস্মাৎ ইন্দ্রাণী গাড়ী থেকে নেমে এসে গলায় আঁচল দিয়ে প্লাটফর্মের ওপরেই ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে, তারপর চুপি চুপি বললে, 'আমার প্রণামই দিয়ে গেলাম তোমাকে, আমার শেষ স্মৃতি চিহ্ন!'

তখন গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। কোনমতে সে আবার গাড়িতে উঠে পড়ল।

স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ

বাতাস

অনেকে হয়ত আমাদের আলোচনার বিষয় দেখিয়া একটু আশ্চর্যান্বিত হইবেন এবং এমন কি প্রশ্নও করিয়া বসিতে পারেন যে, সংসারে এত জিনিস থাকিতে বাতাস, যাহার কিছুই দাম নাই, যাহা যে কোন জায়গায় না চাহিতেই পাওয়া যায় ও যে বাতাস আমাদের চারিদিকে বহুদূরব্যাপী বিস্তৃত রহিয়াছে—তাহা নিয়া আবার এত সময় নষ্ট করিয়া, কাগজ, কালি খরচ করিয়া অযথা হাঙ্গামা বাধাইবার দরকার কি? হ্যাঁ—একথা সত্য যে, বাতাসের কোন দাম নাই এবং আমাদের কখনও খুচরা বা পাইকারী দরে বাজার থেকে বাতাস কিনিতে হয় না; কিন্তু জগতে এমন অনেক জিনিস আছে, আপাতদৃষ্টিতে যাহার কোন economic value নাই; যেমন ধরা যাক বৃদ্ধ বাবা-মা—তাঁহাদের অবর্তমানে আমরা অতি সহজেই অনুভব করিতে পারি তাঁহাদের দাম—বুঝিতে পারি যে, তাঁহারা আমাদের কতখানি প্রয়োজনের সামগ্রী। সেই রকম টাট্‌কা বিশুদ্ধ বাতাস যতক্ষণ পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে আমাদের চারিপাশে বিস্তৃত রহিয়াছে, ততক্ষণ আমরা তাহার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারি না। এমন কি সময় সময় তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দিহান হই। বাতাস এত সহজলভ্য যে, যখনই আমরা কোন জিনিস অতি অনায়াসে পাই, তখন তাহা আমরা বাতাসের সঙ্গে তুলনা করিয়া থাকি।

বাতাসই আমাদের প্রাণ এবং আমাদের স্বাস্থ্যের প্রধান সহায়। খাবার না খাইয়া আমরা কয়েকদিন পর্যন্ত বাঁচিতে পারি,—এমন কি জল পান না করিয়াও কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত আমরা থাকিতে পারি—কিন্তু বাতাস ছাড়া আমরা এক মুহূর্তও বাঁচিতে পারি না। আমরা সকলেই জানি যে, বাঁচিয়া থাকিতে গেলে খাদ্য অথবা জলের চেয়ে বাতাসই বেশী প্রয়োজনীয়।

আজকাল এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, বিশুদ্ধ পরিষ্কার বাতাস পাইতে হইলেও যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হয়। প্রধানত তিনটি বিষয়ের উপর আমাদের স্বাস্থ্য নির্ভর করে।

প্রথম—আমাদের বাসগৃহে যথেষ্ট বায়ু চলাচল থাকা দরকার।

দ্বিতীয়—যেখানে বসিয়া আমরা কাজ করি বা খেলাধুলা করি, সেখানে পরিষ্কার বাতাস চলাচল করা দরকার।

তৃতীয়—পরিষ্কার বাতাসে শ্বাস গ্রহণ করার জন্য খোলা জায়গায় ব্যায়াম করা দরকার।

যেখানে আমরা বাস করি সেখানে কিভাবে ভাল বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করা যায়?:— বায়ু চলাচলের জন্য ছোট ছোট ঘুলঘুলির ব্যবস্থা করিয়া অনায়াসেই ইহা করা যায়। ঘুলঘুলির ব্যবস্থা এইজন্য করা উচিত যে, সব সময় ঘরের জানালা খোলা রাখা যায় না। শীতের সময় জানালা খোলা রাখিলে ঘরে অত্যধিক ঠাণ্ডা আসিতে পারে; কিম্বা হঠাৎ হয়তো এরূপ জোর বাতাসের ঝাপটা আসিয়া ঘরে ঢুকিল যে, তাহার ফলে আমাদের সর্দি লাগিয়া গেল। এখন কিভাবে এই বাতাসের জোর ঝাপটা নিবারণ করিয়া পরিষ্কার বাতাস পাওয়া যায়?—এইজন্য জানালায় পর্দা লাগান যাইতে পারে।

ঘরের বদ্ধ গরম বাতাসের মধ্য হইতে হঠাৎ বাহিরের খোলা ঠাণ্ডা হাওয়ায় আসিলেই সর্দি লাগিতে পারে। কাজেই ঘরের মধ্যে সর্বদা ঠাণ্ডা ও পরিষ্কার বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করিয়া অনায়াসেই সর্দির হাত হইতে নিজেদের বাঁচান যায়।

সর্দি লাগার কারণ:—অনেকের মনেই এই ধারণা আছে যে, ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা লাগাইলেই বুঝি সর্দি হয়। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। কেননা অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, ঠাণ্ডা ঝোড়ো হাওয়ার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইলেও সর্দি লাগে না। তবে হঠাৎ ঠাণ্ডা হইতে গরম লাগাইলে কিম্বা গরম হইতে ঠাণ্ডা লাগাইলেই সর্দি লাগে।

কোন বন্ধ ঘরের মধ্যে ব্যায়াম করার ফলে যখন শরীর খুব গরম হইয়া ওঠে, তখন যদি হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাসে যাইয়া দাঁড়ান যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সর্দি লাগিবে। কিন্তু সর্দি কখনও ঠাণ্ডা বাতাসেও লাগে না অথবা ব্যায়াম করার ফলেও লাগে না। এই সর্দি একপ্রকার বীজাণু হইতে হয়। হঠাৎ তাপ পরিবর্তনের সময় এই বীজাণুরা আমাদের দেহে প্রভাব বিস্তার করিবার সুযোগ পায় বলিয়া আমাদের সর্দি লাগে।

সর্দি কি ছোঁয়াচে রোগ?:—হ্যাঁ; কারণ সর্দি কতকগুলি বীজাণু হইতে হয় বলিয়া ইহা ছোঁয়াচে। যাহাদের সর্দি লাগে, তাহাদের মুখ ও গলার ভিতরে এই সব বীজাণুরা আমাদের দেহে প্রভাব বিস্তার করে। কাজেই সর্দি লাগিলে অসাবধানে হাঁচিলে, কাশিলে কিংবা জোরে জোরে কথা বলিলে ঐসব বীজাণু অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থুতুর কণার সহিত ছিটকাইয়া বাহিরে আসে ও তাহার চারিপাশের বাতাসকে দূষিত করে। যদি কেহ তখন ঐ দূষিত বাতাসে নিঃশ্বাস লয়, তাহা হইলে তাহারও সর্দি লাগিতে পারে।

আমাদের চতুর্দিকে সর্বদা এই বীজাণুরা ঘুরিয়া বেড়ান সত্ত্বেও কেন আমাদের সব সময় সর্দি লাগে না। আমাদের দেহ যদি সুস্থ ও সবল হয়, আমরা যদি খোলা বাতাসে উপযুক্ত ব্যায়াম করি, আমাদের বাসগৃহে যদি যথেষ্ট ঠাণ্ডা বাতাস চলাচল করে অথবা আমরা যদি খোলা বাতাসে কিংবা জানালা খোলা রাখিয়া ঘুমাই, তাহা হইলে ঐসব বীজাণুদের চেয়ে আমাদের দেহ বেশী শক্তিশালী হইবে। ফলে ঐসব বীজাণুরা আমাদের দেহে প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না।

আমাদের যখন সর্দি লাগে, তখন যদি আমরা অসাবধানে জোরে জোরে হাঁচি, তাহা হইলে সেই হাঁচির সহিত অসংখ্য সর্দির বীজাণু আমাদের চারিদিকের বাতাসে ছড়াইয়া পড়ে। কাজেই আমাদের যখন সর্দি হয়, তখন আমরা যেরূপ অন্যের একটা বিপদের কারণ হইয়া পড়ি, সেইরকম অন্য কাহারও সর্দি হইলে তাহারাও আমাদের একটা বিপদের কারণ হইয়া পড়ে।

তবে এই সম্বন্ধে কয়েকটা নিয়ম মানিয়া চলিলে আমরা অনায়াসেই অন্যকে এই বিপদের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারি। হাঁচিবার সময় আমাদের মুখ ও নাকের উপর একখানা রুমাল অথবা ন্যাকড়া চাপা দিয়া হাঁচা উচিত। তাহা হইলে সর্দির বীজাণুগুলি আমাদের চারি পাশের বাতাসকে দূষিত করিতে পারিবে না। সর্দি লাগিলে পাঠশালা, স্কুল অথবা অন্য কোন জায়গায়, যেখানে অনেক লোকের ভীড় সেখানে যাওয়া উচিত নয়। একথা সব সময়ই মনে রাখা দরকার যে, সর্দির বীজাণু আমাদের দেহে প্রবেশ না করিলে আমাদের সর্দি লাগিতে পারে না; এবং যে লোকের সর্দি লাগে, তাহারাই এই বীজাণু ছড়ায়। অতএব সর্দি ছোঁয়াচে।

অনেকে হয়তো বলিতে পারেন যে, সর্দি তো আর বিশেষ মারাত্মক কিছু নয়; সর্দিতে তো আর লোক মারা যায় না। কিন্তু সর্দি নিজে মারাত্মক না হইলেও অনেক সময় ইহা অনেক মারাত্মক রোগের কারণ হইয়া পড়ে। আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন না যে, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডিপথিরিয়া, হুপিং-কাশি, স্মল পক্স, নিউমোনিয়া এবং আরও অনেক সাংঘাতিক রোগ এই সর্দির পরেই হইয়া থাকে।

স্বাস্থ্যসম্মত নিয়ম সর্বদা মানিয়া চলিলে সর্দিও হইবে না এবং ঐ সমস্ত মারাত্মক রোগ হইবার সম্ভাবনাও কমিয়া যাইবে। যদি কাহারও কখন সর্দি হয়, তাহা হইলে উপযুক্ত বিশ্রাম নিলে, ঘুমাইলে, ভাল খাবার খাইলে ও খোলা পরিষ্কার বাতাসে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিলে শীঘ্র সারিয়া যাইবে।

বাতাস খুব বেশী শুষ্ক হওয়া উচিত নয়। বাতাসে সামান্য পরিমাণে জলীয় বাষ্প থাকা দরকার। সেই সঙ্গে উহা বিশুদ্ধ হওয়াও দরকার। যে বাতাসে তামাকের ধোঁয়া, ধুলো প্রভৃতি আছে তাহা মোটেই পরিষ্কার নয় এবং উহা আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত গ্রহণ করাও উচিত নয়। বাতাসে নানারূপ বীজাণুও থাকে। যখনই আমরা কোন ঝাড়ন দ্বারা ঘরের আসবাবপত্র ঝাড়ি, তখনই আমরা ঐ বাতাসের ভিতরকার বীজাণুদের অলোড়িত করিয়া তুলি। ফলে উহারা নিঃশ্বাসের সহিত আমাদের ফুস-ফুসের মধ্যে প্রবেশ করে এবং নানারকম রোগের সৃষ্টি করে। যে বাতাসে আমরা নিঃশ্বাস লই তাহাতে যথেষ্ট সূর্যের আলো লাগা দরকার। অন্ধকার ঘর অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। বীজাণুরা অন্ধকারই ভাল-বাসে ও সূর্যালোককে ভয় করে। কাজেই যে ঘরে যথেষ্ট সূর্যের আলো প্রবেশ করে সেই ঘরে বাস করিলে ও সূর্যালোকে খেলাধুলো করিলে আমাদের দেহ দৃঢ় ও সবল হইবে। সুস্থ ও সবল হওয়া সম্পূর্ণ-রূপে আমাদের নিজেদের উপরই নির্ভর করে।

বাতাস যে কেবল আমাদের ফুসফুসের পক্ষেই দরকারী তাহা নহে; ইহা আমাদের চর্মের পক্ষেও দরকারী। কাজেই খুব আঁটা জামা, জুতা অথবা বেল্ট প্রভৃতি আমাদের পরিধান করা উচিত নয়।

বন্ধ জায়গায় শুইয়া ঘুমানর চেয়ে কোন খোলা জায়গায় শুইয়া ঘুমান ভাল। তাহা সম্ভব না হইলে ঘরের জানালা খোলা রাখিয়া যাহাতে বায়ু চলাচল করিতে পারে এভাবে ঘুমান উচিত। কিন্তু হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা আসিয়া যাহাতে ঘরে না প্রবেশ করে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

প্রতিদিন অন্ততপক্ষে ২ ঘণ্টা খোলা বাতাসে বেড়ান উচিত। এমন কি বাড়ির ছোট ছোট বালকবালিকারাও যাহাতে প্রত্যহ কিছুক্ষণ খোলা বাতাসে খেলাধুলো করে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। যখন আমরা কাজকর্ম করি তখনই আমাদের ফুসফুসের মধ্যে বেশি পরিমাণে পরিষ্কার বাতাস প্রবেশ করে। কোন কাজ না করিয়া এমনি শুধু শুধু বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাসে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে অনেক সময় সর্দি লাগিয়া যাইতে পারে।

বিশুদ্ধ বাতাস আমাদের কেন দরকার?—আমরা শ্বাস গ্রহণকালে যে বাতাস লই তাহা আমাদের ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং আবার নিঃশ্বাসের সহিত বাহির হইয়া আসে। ফুসফুসের মধ্যে যখন বাতাস প্রবেশ করে তখন উহার মধ্যস্থ অম্লজান রক্ত দ্বারা আমাদের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে নীত হয়। পরিবর্তে আমাদের দেহের ভিতরকার দূষিত পদার্থ যাহা বাহির না হইলে আমাদের দেহের ক্ষতি হইতে পারে তাহা বাহির করিয়া দেয়।

যে অম্লজানের দ্বারা আমাদের দেহ ও রক্ত পরিস্কৃত হয় তাহা কি পদার্থ তাহা বোধ হয় আপনারা সকলেই জানেন। ঘরের মধ্যে আগুন জ্বালাইলে উহা বাতাসের মধ্য হইতে অম্লজান টানিয়া লয়। আমরা নিঃশ্বাসের সহিত যে অম্লজান গ্রহণ করি তাহা আমাদের দেহের মধ্যে যায় ও সমস্ত দূষিত পদার্থকে নষ্ট করিয়া ফেলে। ফলে আমাদের দেহ সুস্থ ও সবল হয়। যদি এই উপায়ে আমাদের দেহের ভিতরকার দূষিত পদার্থ নষ্ট না হইত তাহা হইলে আমরা অসুস্থ হইয়া পড়িতাম। আমাদের বাস-গৃহের জানালা দরজা বন্ধ করিয়া রাখিলে কিংবা কোন বন্ধ ঘরে বসিয়া থাকিলে আমরা এই অম্লজান পাইব না। ফলে আমরা অসুস্থ হইয়া পড়িব ও কোন কাজ করিতে পারিব না।

সুস্থ ও সবল হইতে হইলে নীচে যে বিধিগুলি লিখিত হইল তাহার প্রত্যেকটি প্রতিদিন পালন করা দরকার।

গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ করা:—প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় খোলা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া ১০ বার হইতে ১২ বার গভীর-ভাবে শ্বাস গ্রহণ করা দরকার।

মুখ দিয়া কখনও শ্বাস নেওয়া উচিত নয়। সর্বদা নাক দিয়া শ্বাস গ্রহণ করাই বিধেয়।

ব্যায়াম করার সময় গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ করা দরকার।

প্রতিদিন রাত্রিতে জানালা খোলা রাখিয়া ঘুমান উচিত।

ঘুমানর সময় যাহাতে হঠাৎ ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা আসিয়া গায়ে না লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

বাসগৃহে যাহাতে সর্বদা খোলা বাতাস চলাচল করে সেদিকে নজর রাখা প্রয়োজন।

বাসগৃহের মধ্যে যাহাতে হঠাৎ জোর বাতাসের ঝাপটা আসিয়া না ঢোকে সেজন্য জানালায় পর্দা লাগান দরকার।

বায়ু-চলাচলহীন বন্ধ ঘরে বসিয়া পড়া-শুনা প্রভৃতি কোন কাজই করা উচিত নয়।

প্রতিদিন অন্ততপক্ষে ২।৩ ঘণ্টা করিয়া খোলা বাতাসে ব্যায়াম করা দরকার।

মধু-ভেক

অ. কৃ. ব

"সত্য" বিষয়ক প্রবন্ধে ইংরাজ প্রবন্ধকার ফ্রান্সিস বেকন (Francis Bacon) বলিতেছেন:

"What is Truth?" said jesting Pilate, and would not stay for an answer.

অর্থাৎ "সত্য কি?" যীশু খৃষ্টের নিকট উপহাসের ছলে এই প্রশ্ন করিয়া বিচারক পাইলেট জবাবের জন্য অপেক্ষা করেন নাই।

স্বামী বিবেকানন্দ একদা প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "পরোপকারে কাহার উপকার?" এবং নিজেই তাহার জবাবও দিয়াছিলেন: "পরোপকারে নিজেরই উপকার।"

যাঁহারা পরোপকার করিতে চান তাঁহাদের উদ্দেশ্য মহৎ, কিন্তু কতকগুলি কথা জানিয়া রাখা ভাল। সেই কতকগুলি কথার কিছু কিছু বলিবার উদ্দেশ্যেই এ যাত্রা আসরে নামিলাম।

প্রথমেই গোবর্ধন বৈরাগীর একটি গান আপনাদের শোনানো দরকার। এ গানটি অনেককেই শুনাইয়াছি, আপনাদেরও শুনাইতেছি।

"ও মন, যাহার বিপদকালে করবা উপকার,
(তোমার) বিপদকালে তার দেখা আর পাইবা না।
(তাই) পরের ভাল কর রে যদি
নিজের ভাল ভাইবা না।
(যারে) ঠেকার কালে দিবা রে টাকা
তোমার ঠেকার কালে তাহার টাঁক রবে ফাঁকা,
এই দুনিয়ার নিয়ম রে ভাই,
আছে আমার তাই জানা।
জটিল জালে পড়বা রে মন, হও যদি সরল;
অমৃত যাহারে দিবা সেই দিবে গরল;
ঘরেতে ঠাঁই দিবা যারে
বসাইবে পথে তোমারে
(সে যে) আপন তালে ঠিক থাকিবে
তোমার বেলায় তালকানা।"

* * * *

বৈরাগীর গানের ভাষা পদ্মাপাড়ি হইলেও গঙ্গাপাড়ি পাঠকপাঠিকার বোধের অগম্য নহে। লোকটি বৈরাগী হইবার আগে যে সত্যটি সম্ভবত ঠেকিয়া অথবা দেখিয়া শিখিয়াছিল, সে সত্যটি অন্যকে শুনাইয়া শিখাইবার জন্যই হয় তো গানটি বাঁধিয়া সে যখন তখন যেখানে সেখানে যাহাকে তাহাকে শুনাইত।

বৈরাগী পরোপকার করিতে মানা করে নাই, মানা করিয়াছে প্রত্যুপকার আশা করিতে। "মন রে আমার, পরের ভাল যদি করিতে চাও তো কর, কিন্তু নিজের ভাল ভাবিয়া নয়।" উপদেশটা অনেকটা গীতার নিষ্কাম কর্মবাদের মত। ("পরোপকারে নিজেরই উপকার"—স্বামীজীর এই বাণীর অর্থও এই যে পরের উপকার যে করিলাম সেই করাটাই আমার নিজের উপকার, তাহার বেশী প্রতিদান আশা করা বাঞ্ছনীয় নহে।)

* * *

বৈরাগী সরল ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছে যে, আমি যাহার উপকার করিব সে আমার প্রয়োজনের সময় প্রত্যুপকার করা তো দূরের কথা, বরং ভবিষ্যতে তাহার নিজের প্রয়োজনে আমার মাথায় কাঁঠাল ভাঙিতে কসুর করিবে না। সেটুকু বৈরাগীর বলা উচিত ছিল, কিন্তু সে বলে নাই; সেটুকু আমি বলিতেছি। আমি উপকার না করিলে যদি বা কাঁঠালটা সে অন্যের মাথায় ভাঙিত, আমি উপকার করিয়াছি বলিয়াই কাঁঠালটা সে আমার মাথায় ভাঙিবে, মনে করিবে, "এই লোকটার উপকার প্রবৃত্তি দেখিয়াই বুঝিতেছি লোকটা কিছু সরল এবং নির্বোধ প্রকৃতির। অতএব ইহার মস্তকই কাঁঠাল ভাঙিবার পক্ষে উপযুক্ত স্থান। ভাঙিতে গিয়া ধরা পড়িলেও বিশেষ কোন আশঙ্কার কারণ নাই, কারণ আমার মাথায় পাল্টা কাঁঠাল ভাঙিবার প্রবৃত্তি এ লোকটির হইবে না।" পাঠক-পাঠিকাগণের মধ্যে যাঁহারা পরোপকারী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিবার বাসনা পোষণ করিতেছেন, তাঁহাদের এজন্যই সাবধান করিয়া দিতেছি। একবার ভাল লোক বলিয়া যদি নাম করেন, তাহা হইলে আপনার ভাল করিবার লোকের অভাব যদি বা হয়, খারাপ করিবার লোকের অভাব হইবে না।

* * *

অবশ্য পরোপকারের নেশা যাহাদের আছে, তাহারা পঞ্চাশ বার ঘা খাইয়াও আবার একান্ন বারে পরোপকার করিতে ছুটিবেই। নবকুমারেরা পরের জন্য কাষ্ঠ আহরণে না গিয়া পারিবে না। যাঁহারা প্রথমবার নবকুমার হইতে যাইতেছেন, তাঁহাদের আগেই বলিয়া দিতেছি, ফিরিয়া আসিয়া আর নৌকা দেখিতে পাইবেন না, ইহার জন্য প্রস্তুত থাকিয়াই যেন তাঁহারা কাষ্ঠাহরণে যান।

* * * * *

এ যুগে উপকারীকে বোকা মনে করাই প্রায় সাধারণ নিয়মে দাঁড়াইয়া গিয়াছে এবং বুদ্ধিমানেরা বোকাদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙিতে সর্বদাই চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা ছাড়াও আরেকটি কারণ আছে, যে জন্য উপকারের প্রতিদানে কৃতজ্ঞতা আশা না করিয়া সাধারণত কৃতঘ্নতাই আশা করা উচিত। মনে করুন আপনি আমাকে হ্যাণ্ড নোট দিয়া আমার নিকট হইতে কিছু টাকা ধার নিলেন। এ টাকা আপনি আমাকে সুদে আসলে শোধ দিতে বাধ্য রহিলেন এবং আপনার এই ঋণের প্রমাণস্বরূপ আপনার হ্যাণ্ডনোটটি আমার কাছে রহিল। কোন প্রকারে আমার নিকট হইতে এই হ্যাণ্ডনোটটি গায়েব করিবার সুযোগ পাইলে আশা করি আপনি তাহা ছাড়িবেন না।

তেমনি আপনি যেমনি আমার কাছ হইতে একটি উপকার পাইলেন অমনি সেজন্য ঋণ স্বীকার করিয়া আপনার বিবেক আমাকে একটি অলিখিত হ্যাণ্ডনোট দিল। আপনি সর্বদাই চেষ্টায় থাকিবেন কি করিয়া বিবেকপ্রদত্ত এই হ্যাণ্ডনোটটি ফেরত নেওয়া যায় অথবা হ্যাণ্ড-নোটটিকে জাল বলিয়া প্রমাণ করা যায়।

আমি আপনার উত্তমর্ণ হইয়া আপনার উপরে উঠিয়া থাকিব ইহা আপনার ভাল লাগিবে না, কাজেই আপনি প্রাণপণে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিবেন যে, আমি আপনাকে যে উপকার করিয়াছি, তাহা আসলে উপকার নয়, তাহার অন্তরালে আমার কোন গূঢ় মতলব লুকাইয়া আছে। আপনার নিজের কাছে আমাকে খেলো করিতে করিতে ক্রমে অন্যের কাছেও আমাকে খেলো করিতে আপনি সচেষ্ট হইবেন।

কথিত আছে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এক ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন, "মহাশয়, অমুক লোকটি চারি দিকে আপনার নিন্দা করিয়া বেড়াইতেছে।" তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয় বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "বলেন কি? কই, আমি তো তাহার কোন উপকার করিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।" অনেকে মনে করিয়া থাকেন ইহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রসিকতা; কিন্তু আসলে ইহা রসিকতা নহে, বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সাধারণ মানুষের মনস্তত্ত্ব জানিতেন তাহারই প্রমাণ।

* * *

উপকারীদের এইভাবে সাবধান করিয়া দিতেছি বলিয়া বহু উপকৃত—এবং যাঁহারা ভবিষ্যতে উপকৃত হইবার আশা রাখেন তাঁহারা—সম্ভবত মনে মনে আমার উপর অত্যন্ত খাপ্পা হইতেছেন। কিন্তু তাঁহারা অনর্থক খাপ্পা হইতেছেন, কেননা নবকুমারেরা চিরদিনই পরের জন্য কাষ্ঠাহরণে যাইবে, চিরদিনই ভাবিবে "তুমি অধম, তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?"

অনুবাদসাহিত্য

ঝড়

(অনুবাদ গল্প)

গোপাল ভৌমিক

আর্থার গুড্স্পীড্ তাঁর নিজের বাড়ীর সামনের ছোট লনটিতে দাঁড়িয়ে হেমন্তকালের তীব্র বাতাস জোরে নাকে টেনে নিচ্ছিলেন। যদিও কাছাকাছি কেউ ছিল না, তিনি যে পেটটা ভিতর দিকে টেনে নিয়েছিলেন এবং বুকটা সামনের দিকে বের করে দিয়েছিলেন—সে বিষয়ে তিনি সজাগ ছিলেন। তাঁর ফুসফুস ঠান্ডা নিঃশ্বাসের সঙ্গে সমান তাল রেখে সম্প্রসারিত হচ্ছিল না—সে বিষয়েও তিনি অস্বস্তিকরভাবে সচেতন ছিলেন। বাতাস জোরে জোরে তাঁর নাকের ভিতর দিয়ে ঠিকই যাচ্ছিল—কিন্তু বুকের মাঝামাঝি কোথায় যেয়ে যেন ঠেকে গিয়ে আবার বেশ জোরে বেরিয়ে আসছিল।

তাঁর স্বাস্থ্যলাভের আকাঙ্ক্ষার পক্ষে এটা এরূপ ক্ষতিকর ছিল যে, তিনি কিছুক্ষণের জন্যে পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে থাকা প্রয়োজন মনে করলেন—পাহাড়গুলোর মধ্য দিয়ে যেসব পথ এঁকে বেঁকে গেছে, সেগুলির কথা ভাবতে লাগলেন; সেসব পথ দিয়ে শান্তি, স্বাস্থ্য এবং যৌবন নিয়ে সগর্বে চলা যায়।

আকাশে নীচু করে ঝোলানো শীতল কুয়াসা এবং হাতে বোনা পশমী মোজার মধ্য দিয়ে পায়ে ক্রমবর্ধমান বায়ুর শীতলতা। তিনি জানতেন যে, এমন দিনে চিবুক ভিতর দিকে টেনে বুক উঁচিয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটা কষ্টকর কাজ। কোন কোন দিন তিনি ঠাকুরদাদার আশী বছর বয়সে তৈরীকরা ওয়ালনাটের ছড়িটা ঘুরিয়ে চলতেন এবং তাঁর দিকে অগ্রসরমান কোন গাড়ির যাত্রীদের দিকে হাসি ছুঁড়ে দেবার জন্যে প্রস্তুত থাকতেন। মিঃ গুড্স্পীডের হাসিতে কি যেন বেখাপ্পা জিনিস ছিল; প্রথমত তাঁর নতুন দাঁতগুলোর জন্যে হাসিটা ছিল অত্যন্ত বেশী শাদা—দাঁতগুলো দেখে মনে হত সেগুলো যেন কোন যুবক স্বাস্থ্যবান ঘোড়ার দাঁতের আদর্শে তৈরী করা হয়েছিল—ফাঁক ফাঁক এবং আন্তরিকতা-পূর্ণ যেন যতটা আনন্দ এবং শক্তি তিনি অনুভব করেন না, ততটা তিনি দেখানোর জন্যে ব্যগ্র।

প্রতিদিন তিনি পাহাড়ের পথে বেড়াতে বেড়াতে গ্রামে যেতেন; মহাসাগরের ওপার থেকে কেনা তাঁর টুইডের পোষাকে তাঁকে চমৎকার দেখাত—তিনি যে অদম্য উৎসাহ নিয়ে নিজের শরীরকে ঠিক রাখতেন, তা দেখলে প্রত্যেকেই কোন না কোন প্রকারে বিস্ময় প্রকাশ করত। তাঁকে দেখলে তাঁর নিকটতম প্রতিবেশিনী মিস্ অ্যাবি হার্টের যে গলা ছেড়ে চীৎকার করার ইচ্ছা হত, একথা তিনি কখনও শোনেন নি। মিস্ অ্যাবিকে মন্তব্য করতে শোনা গেছেঃ "আমার মনে হয় উনি প্রতিদিনই বেড়ান। অন্তত তিনি তাই দাবী করেন। তবে আমার কপালগুণে আমি তাঁকে এমন সব বিশ্রী ঠান্ডা দিনে বাইরে যেতে দেখি যখন কণামাত্র বুদ্ধি সম্পন্ন লোকও বাড়ির ভিতরে থাকে। দেখতে দেখতে আমার ঘৃণা ধরে গেছে। নিজের স্বাস্থ্য ঠিক রাখাই যদি তাঁর উদ্দেশ্য হয়, তবে কি উদ্দেশ্যে তিনি স্বাস্থ্য ঠিক রাখছেন? তিনি নিজেকে যতটা সুস্থ বলে জাহির করতে চান, তা যদি সত্যি হয়, তবে তাঁর বাড়িতে ঔষধের আলমারীতে অত বাইকার্বোনেট অব সোডা রাখা হয়েছে কেন? সে রকম জিনিস আপনারা কেউ দেখেন নি। আমি হঠাৎ একদিন আলমারীটা খুলে ফেলেছিলাম—অবশ্য লুকিয়ে নয়। আমি হাত ধুয়ে হাতে লাগানোর জন্যে কিছু একটা খুঁজছিলাম। আমার হাতদুটো যে কেমন তা ত আপনারা সবাই জানেন।"

জীবনের মধ্য থেকে যে একটা সমৃদ্ধি নাড়া দিয়ে বের করবার আছে—মিঃ গুড্স্পীড তা অনুভব করতেন। কিন্তু মিস্ হার্ট সে কথা বুঝতেন না। হয় মিঃ গুড্স্পীডের হাতের মুঠির বাঁধন ছিল বিশ্রী অথবা ফাঁক ছিল কম—কেন না ফাঁক দিয়ে তাঁর জন্যে যেসব রত্ন ঝরে পড়ত, সেগুলো ছিল নিষ্প্রভ। তবু তিনি যতটা পারতেন, চেষ্টা করতেন। তিনি পাইপ খেতেন—এমন কি আলোচনার সময় তাঁর প্রিয় পাইপটি স্বচ্ছন্দে ১৫ মিনিট ধরে টানা চলত। তাঁর চুল্লীর জন্যে তিনি জ্বালানি কাঠের বায়না দিতেন না; তিনি নিজেই কাঠ কাটতেন—ফলে জ্বালানি-গুলোকে আদৌ জ্বালানি বলে মনে হত না—সেগুলোকে মনে হত ডালপালা। তিনি পাহাড়গুলোকে বলতেন "পর্বত" এবং প্রায়ই তাঁর চোখে এমন সুদূর নিবদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে সেগুলোর দিকে তাকাতেন যে মনে হত, পাহাড়গুলো অত কাছে মৃদু এবং বন্ধুত্ব-পূর্ণভাবে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—এতে তিনি নিশ্চয়ই অস্বস্তি অনুভব করেন।

জীবন ধারণকে সুন্দর করে তোলা কঠিন ব্যাপার। তিনি গভীর হৃদ্যতাপূর্ণ হাসি এবং সুন্দর কথার দ্বারা যতই সজীব করে তোলার চেষ্টা করুন, যেসব জিনিসের নাম পদ্মরাগ মণির মত জ্বল জ্বল করত, তাঁর বেলায় তারাও যেন ম্লান হয়ে উঠত। তিনি কথা ভালবাসতেন—ভালবাসতেন উন্মুক্ত চুল্লীতে গণগণে আগুন, হাউন্ড কুকুর, তাম্রকূট সেবন, প্রিয় চেয়ার, ভদ্রলোক, উঁচু-দরের ভদ্রমহিলার সঙ্গ প্রভৃতি। কোন কোন সময় মনে হত যে সব কিছু ভালই বোধ হয় কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ, যেসব বস্তুর তারা-প্রতীক তাদের মধ্যে নয়।

তিনি যখন নৈর্ব্যক্তিক এবং অবগুণ্ঠনযুক্ত পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন, তখন মনে হত যে সেগুলো বুঝি বদলাচ্ছে এবং তাঁকে আকর্ষণ করছে। পাইন এবং হেমলকের কটু গন্ধ যেন বাতাস থেকে মিলিয়ে যেত—তার বদলে ভিজে মাটীর সোঁদা গন্ধ এবং পচা পাতার গন্ধ এসে নাকে ঢুকত। সেদিন বায়ু তীব্রতর হয়ে উঠল এবং কুয়াশা পরিষ্কার হয়ে সুদূরে দেখা দিল কালো ভীতিজনক মেঘ। তিনি সহসা একাকিত্ব অনুভব করে বাড়ির দিকে ফিরে চললেন—কিন্তু মরা ধূসর আলোতে পাহাড়ের তীক্ষ্ণ ঢালু পটভূমিকায় বাড়িটাকে মনে হল নড়বড়ে বহু দিনের জরাজীর্ণ। এটা যেন অনেকটা শুকনো খোলস—উত্তাপও নেই, হৃদ্যতাও নেই। যে জমানো কাঠ নিয়ে তাঁর এত গর্ব, তা যেন হাস্যকরভাবে কম বলে মনে হল—গাছের ডাল কেটে জমানো যে নিরর্থক তাঁর উপর ঝুলে-পড়া কালো গাছগুলো যেন তাই নির্দেশ করতে চায়।

ঘরের ভিতর গিয়ে তিনি দেশলাই জ্বালিয়ে কাঠে আগুন ধরালেন এবং তারপর রেডিওটা সুইচ টিপে চালিয়ে দিলেন। তিনি একটা সঙ্গীতানুষ্ঠানের শেষাংশ শুনতে পেলেন এবং তারপরই একজন ঘোষকের গলা সারা ঘরে বেজে উঠল। ঘোষক কি যে বলছিল কয়েক সেকেন্ড আগে মিঃ গুড্স্পীড তা শুনতেই পেলেন না। তারপরই তিনি বুঝতে পারলেন যে, বেতারে ঝড়ের সম্বন্ধেই একটা সাবধান বাণী প্রচারিত হচ্ছে এবং তাঁর মনে হল যে, ঘোষকের গলায় একটা দ্রুত জরুরী ভাব। তিনি রেডিয়োর সামনে দাঁড়িয়ে গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে

মন দিয়ে শুনতে লাগলেন এবং ঘোষণাটির শেষে সুইচ টিপে রেডিও বন্ধ করে দিলেন। নীচু হয়ে তিনি সযত্নে দেয়ালের গা থেকে প্লাগটা খুলে নিলেন। এক ঝটকা বাতাস এসে দরজাটা নাড়া দিয়ে গেল এবং জানলা দিয়ে তিনি দেখতে পেলেন যে, মেঘগুলো এখন কালো, ঘূর্ণায়মান এবং রাগান্বিত হয়ে উঠেছে।

বাড়িতে ঢোকার সময়ের মত এখন আর ছোট ঘরটাকে বন্ধ্যা, বিবর্ণ এবং ধূসর বলে মনে হল না—বরং যেন পরিচিত আরামদায়ক আশ্রয়। তাঁকে যেন হঠাৎ কাজের ভূত পেয়ে বসল এবং রান্নাঘরে গিয়ে দুটো তেলের বাতি বের করে সযত্নে ধুয়ে কাচ পরিষ্কার করে তেল ভরলেন। দরজা জানালাগুলো বন্ধ আছে কিনা দেখার জন্যে তিনি ছোট বাড়িটা ঘুরে বেড়ালেন। তিনি কাঠের বাক্সটা বোঝাই করলেন এবং কিছুটা অয়েল ক্লথ দিয়ে কাঠগুলো চাপা দিয়ে অয়েল ক্লথের উপর আবার পাথর চাপা দিলেন। তারপর আবার তিনি জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট দিয়ে সুরহীন সঙ্গীতহীন শব্দ করতে লাগলেন—ঠিক শিস্ নয়।

সত্য জানলে জানা যায় যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাঁকে অনেকদিন থেকেই হতাশ করে আসছে। তিনি বায়ু, বৃষ্টি এবং তুষারের শিশু-সুলভ ব্যবহার দেখে বিস্মিত হয়ে ভাবতেন যে, রবিবারের দৈনিক পত্রিকাগুলোর প্রবন্ধে আবহাওয়া ক্রমশ মৃদুতর হয়ে আসছে বলে যেসব কথা লেখা হয়, সেগুলো বোধ হয় ঠিক। প্রবন্ধগুলো তাঁকে উদ্বিগ্ন করে তুলত; তাঁকে বিরাট বিরাট জন্তু এবং গাছপালার পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হবে—একথা ভেবে তিনি ভয় পেতেন। তিনি একবার এইচ্ জি ওয়েলসের একখানা বই পড়েছিলেন এবং সেই বইয়ে লেখা পৃথিবীর শেষ জীবিত বস্তুর অপ্রীতিকর বর্ণনা—তৈলাক্ত নিস্তব্ধ সমুদ্রের পারে একটা বিরাট পদার্থের আত্ম সম্প্রসারণ এবং আত্মসংকুচন তার মনে অবিস্মরণীয় প্রভাব রেখে গেছে। অবশ্য এসব জিনিস অবিশ্বাস্য, তবু তাঁর যৌবনের ঝড়গুলো কোথায়? পাহাড়ের বিরুদ্ধে বয়ে-যাওয়া সেই চমৎকার নয়ন-অন্ধকারী তুষার-ঝড় কোথায়? আকাশ চিরে যে বিদ্যুৎ দেখা দেয় এবং এল্‌ম গাছ ছিন্নভিন্ন করে ফেলে তাই বা কোথায়? উপত্যকায় যে বজ্রের সুদূরপ্রসারী প্রতিধ্বনি হত, তারই-বা সন্ধান কই? মনে হয় তারা যেন শেষ হয়ে গেছে এবং মানুষও ক্রমশ কোমলতর হয়ে উঠছে। এই চিন্তাই তাঁকে পাহাড়ের মধ্য দিয়ে ঘুরে বেড়াতে অনুপ্রাণিত করত; তিনি মুখ বন্ধ করে কষ্টে নিঃশ্বাস নিয়েও এগিয়ে চলতেন—কেউ গাড়িতে তুলে নিতে চাইলে তিনি স্থির উজ্জ্বল হাসিতে প্রত্যাখ্যান করতেন। তিনি ভাবতেন যে, আগামী হাজার বছর পরে মানুষের হয়ত আর পা-ই থাকবে না।

হঠাৎ তাঁর শ্বেতগৃহ-নিবাসিনী প্রতিবেশিনী মিস অ্যাবি হার্টের কথা মনে পড়ে গেল—তিনি হয়ত ঝড়ের সাবধানবাণী শুনতেই পান নি। তিনি কষ্ট করে তাঁর হাঁটু পর্যন্ত লম্বা রবার বুট পরলেন এবং বর্ষাতিটা বের করে নিয়ে বাইরে বেরুলেন—ঠাণ্ডা বাতাস তাঁর চুলের মধ্য দিয়ে বইতে লাগল। বাতাসে কেমন একটা বন্যতা। তাঁর সামনে বাদামী রঙের পাতা উড়ে যেতে লাগল এবং কয়েকটি তরুণ মেপ্‌ল গাছের শাখা ইতিমধ্যেই রাস্তায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। একটা অদ্ভুত আলোকে তীক্ষ্ণভাবে ঘাসের শেষ সবুজ রঙ বেরিয়ে আসছিল এবং বৃষ্টির কয়েকটি বড় ফোঁটা এসে সজোরে তাঁর মুখে আঘাত করল।

মিস হার্টের ছাদের নীচে এসে তিনি দুটো ক্যানভাসের চেয়ার গুটোলেন এবং তারপর এক হাতে সে দুটো নিয়ে দরজার পিতলের হাতলটা তুললেন।

দরজা খুলতে গিয়ে মিস্ হার্ট এক মুহূর্তের জন্যে ভাবলেন যে, ওখানে দাঁড়ানো অবস্থায় তাঁকে প্রায় সুন্দর দেখাচ্ছে—বাতাসে তাঁর সাদা ঘন চুল নড়ছে।

তিনি বলে উঠলেনঃ "দেখুন, দেখুন, আমাদের ভাগ্যে ঝড় উঠেছে। আমিই আপনার চেয়ারগুলো ভিতরে বয়ে নিয়ে যাই।"

মিস্ হার্ট এগিয়ে এসে দরজার পর্দাটা সরিয়ে দিলেন। "আমি ভেবেছিলাম বৃষ্টিই হবে" তিনি মৃদু গলায় বললেনঃ "আজ দুপুরে আমার আলু থেকে জল শুকিয়ে গেছিল।"

মিঃ গুড্‌স্পীড কোন রকমে শোবার ঘরে ঢুকে চেয়ারগুলো দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখলেন। "বৃষ্টি নয়!" তিনি সবিস্ময়ে বলে উঠলেনঃ "ঝড় আসবে। প্রকৃত ঝড় আসবে! বেতারে সাবধানবাণী পেয়েছি।"

মিস হার্ট সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে জানলার বাইরে তাকালেন। "আমার কাছে অবস্থা ত তত খারাপ বলে মনে হয় না।" তিনি বললেন,—"তাছাড়া এটা ত ঝড়ের ঋতুও নয়। তুষারপাত যে হবে তাও ত আমার মনে হয় না।"

তিনি ছোট একটা নাসিকাধ্বনি করলেন—ভাবলেন যে মিস হার্টের বাড়িতে এলে বাড়িটাকে বেশ জীর্ণ বলে মনে হয়—তাঁর প্রতি পদক্ষেপে বাড়িটা যেন কাঁপছে। তিনি গম্ভীরভাবে বললেনঃ "আমি ইতিপূর্বে একবার আকাশের অবস্থা যেরূপ দেখেছিলাম, আজকের আকাশকে ঠিক তেমনই মনে হয়। আমার তখন দশ বৎসর বয়েস। তার আগে কিংবা পরে আকাশের সেরূপ অবস্থা আর আমি দেখিনি। এ ঠিক সাইক্লোনের আকাশ এবং সেই সঙ্গে প্রত্যেক জিনিসের উপর সেই মজার আলোটা পড়েছে।"

মিস হার্ট শুকনো হাসি হাসলেন। "আমি ত কখনও এ অঞ্চলে সাইক্লোনের কথা শুনি নি।"

"সব জিনিসেরই আরম্ভ বলে একটা কথা আছে," তিনি আশাবাদীর মত জবাব দিলেন। তিনি তাঁর রেডিওটা খুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। "আরও হয়ত কিছু আছে", তিনি বললেন, "ঝড়ের গতি কোনদিকে লোকটা হয়ত তাও আমাদের বলতে পারে।"

কিন্তু শুধু যন্ত্রসঙ্গীতের মধুর শব্দ শোনা গেল এবং যদিও তিনি কয়েকবার এদিকে ওদিকে রেডিওর নির্দেশকটি চালিয়ে দিলেন, তবু ঝড়ের সম্বন্ধে আর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। এক মুহূর্তের জন্যে তিনি আবার চেষ্টা করায় অনুতাপ করলেন—তাঁর মনে হল যে ঘোষকের শেষ জীবন্ত স্বরটা যদি তাঁর মনে থাকত—কিন্তু বাড়িটার বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ আকস্মিক একটা বাতাসের ঝাপটা তাঁর অস্বস্তি শান্ত করে দিল এবং তিনি মিস হার্টের বাতিতে তেল ভরে দেবার প্রস্তাব করলেন।

মিস হার্ট তাঁকে বললেনঃ "ব্যস্ত হবেন না। আমার মোমবাতি আছে। আমি কয়েক বছর আগে ছাদের ঘরে বাতিগুলো রেখে দিয়েছি। বিদ্যুতের বাতিগুলো এত কম সময়ের জন্যে নিবে যায় যে, এত অল্পকালের জন্যে আমি তেলের বাতির দুর্গন্ধ সহ্য করতে চাই না।"

বৃষ্টির বেগ বেড়েছিল এবং জানলার সার্শিতে সজোরে বৃষ্টি পড়ছিল এবং কিছু দূরে বজ্রের চাপা গর্জন। মিঃ গুড্‌স্পীড মাথা পিছনদিকে হেলিয়ে শুনতে লাগলেন। "ঐ ঝড় আসছে!" তিনি বললেন।

মিস্ হার্ট আবেদনের ভঙ্গীতে তাঁর দিকে তাকালেন এবং কম্পিত করে তাঁর বুননের কাঁটাটি নাড়তে লাগলেন। তিনি ভাবলেন যে, বেচারী বুড়ো এসে খুব ভাল করেছেন। তিনি ভাল প্রতিবেশী। প্রকৃতই তিনি সদয়—তবে ঝড় বিরক্তিকর। তাঁর রক্ষাকারী ব্যাপক দৃষ্টির নীচে থেকে তাঁর মনে হল যে তাঁর জন্যে কিছু করা উচিত এবং একটু সজোরে বজ্রের গর্জনে তিনি অল্প কেঁপে উঠলেন।

"ভয় পাচ্ছেন?" তিনি মৃদু হেসে সহনশীলভাবে বললেন।

"কিছুটা অস্বস্তি লাগছে," তিনি স্বীকার করলেন। যদি বেতারে সাবধানবাণী দিয়ে থাকে, তবে অবস্থা নিশ্চয়ই গুরুতর।"

রান্নাঘরের দরজায় শব্দ হচ্ছিল। মিঃ গুড্‌স্পীড্ তালাবন্ধ করতে গেলেন। তিনি বন্ধ করার জন্যে নিজেকে তৈরী করে নিলেন, কিন্তু দরজাটা সহজেই বন্ধ হল এবং বাতাসটা জোরে বইলেও মৃদু মন্দ, এটা

অন্‌ভব করে তিনি বিস্মিত হলেন। রান্না-ঘরটা বাষ্পপূর্ণ—পেঁয়াজের গন্ধ এবং জিঞ্জার ব্রেডের মশলার সুগন্ধে ভরপুর। তাকের উপর মিস হার্টের বড় অ্যালার্ম ঘড়িটার সজোর টিক্ টিক শব্দ; টেবিলে একটা কাঠের পাত্রে আপেল রাখা ছিল এবং স্টোভে তিনি জ্বলন্ত কাঠের শব্দও শুনতে পাচ্ছিলেন। বিশৃঙ্খলার একটা মধুর পরিবেশ; নর্দমায় আলুর খোসা; শুকানোর জন্যে ঝুলিয়ে রাখা এক জোড়া মোজা; একটা দুধের বোতল। তাঁর নিজের রান্না-ঘর পরিষ্কার, স্তব্ধ এবং অন্ধকার এবং তিনি চপ, সিদ্ধ আলু প্রভৃতি যে সব খাবার রাঁধতেন তা যেন প্রতিদিনই একঘেয়ে হয়ে উঠছিল।

এখানে একটা আরাম এবং উষ্ণতা ছিল। শোবার ঘরে ফিরে গিয়ে তিনি আগুনের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালেন এবং চটপট করে নিজের হাত দুটো ঘসতে লাগলেন। "আমি যে কথা বলছিলাম," তিনি ছেড়ে দেওয়া কথার খেই ধরে বলে চললেন, "সেই ঝড়ের আগের আকাশের মত আকাশ আপনি কখনও দেখেন নি। আর যখন ঝড় এল—সে কি ঝড়! পরে আমার বাবা ঝড়ের ফলে বিধ্বস্ত দৃশ্য দেখাতে আমায় নিয়ে গেছিলেনঃ সমস্ত জায়গায় গাছ গাছরা ওপড়ানো, তখনও ডিমের মত বড় বড় শিলা-খণ্ড ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। একটা গাছ আমাদের এক প্রতিবেশীর গায় প্রায় এসে পড়েছিল। সে ঝড় কমবার আগেই বাড়ি পৌঁছানোর জন্যে দৌড়ে আসছিল এবং সে ঠিক পিছনেই গাছ উপড়ে পড়ার শব্দ শুনতে পেল এবং সেই গাছটাই আমরা পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। বেচারী মাত্র তিন ফিটের জন্যে বেঁচে গেছিল।"

"ভয়ঙ্কর!" মিস হার্ট মৃদুকণ্ঠে বললেন। তিনি বুনন-যন্ত্রটি তুলে নিলেন।

মিঃ গুড্‌স্পীড আবার বাতাসের শব্দ শোনার জন্যে ঘাড়টা পিছন দিকে হেলিয়ে দিলেন। ঝড় কি কমে যাচ্ছে? তিনি স্মৃতির মধ্যে ডুবে গেলেন। তিনি সাই-ক্লোনের বদখেয়াল, বিদ্যুতের বেয়াড়া ইচ্ছা প্রভৃতির কথা বলতে লাগলেনঃ তিনি একবারের ঠাণ্ডা তুষার ঝঞ্ঝার কথা বললেন—তখন ১৫ ফিট গভীর তুষারপাত হয়েছিল।

কিছুক্ষণ পরে মিস্ হার্ট উঠে জানালার কাছে গেলেন। তিনি বললেনঃ "ঝড় থেমে যাচ্ছে বলে মনে হয়।" তিনি উদ্বিগ্নভাবে আকাশের দিকে চাইলেন। "অবশ্যই থেমে যাচ্ছে। শুধু গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে এবং আকাশ যথেষ্ট নীল।"

মিঃ গুড্‌স্পীডও তাড়াতাড়ি গিয়ে জানালার বাইরে তাকালেন। ধীরে ধীরে বৃষ্টি পড়ছিল আর বাতাস পড়ে গেছে। পাহাড়ের উপর দিয়ে স্পষ্ট স্বচ্ছ এক টুকরো নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে। তিনি গলা পরিষ্কার করে নিলেন। "হাঁ," তিনি বললেন—"যদি ফিরে না আসে, তবে আমরা এখন বিপন্মুক্ত!" কিন্তু তাঁর গলায় আশার কোন স্পর্শ নেই।

তিনি নীচু হয়ে তাঁর বড় রবার বুটের দিকে তাকালেন—বললেন, "এইবার আমি চলে যাই।"

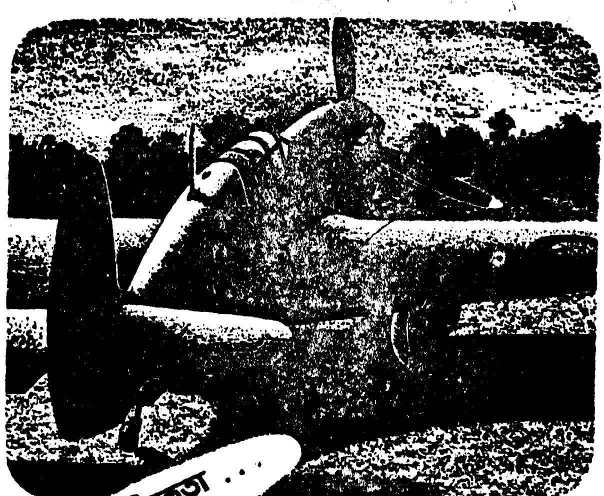
মিস হার্ট তাঁর বর্ষাতিতে বোতাম লাগাতে দেখলেন। সহসা তাঁর ইচ্ছা হল তাঁকে রাত্রে খাবার জন্যে নিমন্ত্রণ করেন, আর এক দম্পতিকে নিমন্ত্রণ করে ব্রিজ খেলার প্রস্তাব করেন, কিন্তু সে কথা বলার পূর্বেই তিনি বেরিয়ে গেলেন।

তিনি রবার বুটগুলো টেনে টেনে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চললেন। পথে স্তূপাকারে পাতা পড়ে আছে। মেঘগুলো মিলিয়ে যাচ্ছে—আর ঝড়—ঝড়ের পূর্বাভাস বললেও চলে—শেষ হয়ে গেছে।

তিনি সামনের দীর্ঘ একঘেয়ে সন্ধ্যা এবং দীর্ঘ একঘেয়ে মাসগুলোর কথা ভাবলেন। রাতের পর রাত একা বসে, সাময়িক পত্রিকার পাতা উল্টিয়ে, প্রাচীন-পন্থী হয়ে লাভ নেই বলে যুগের সঙ্গে সমান তালে চলে, বাতাসের দুঃসাহসিক শব্দ শুনে, ঘড়ির কাঁটাকে নয় দশ করে এগিয়ে যেতে দেখে তাঁর দিন কাটবে। এইসব কথা ভেবে তাঁর ভয় হল যে তিনি কোথায় যেন কি হারাচ্ছেন—যদিও তিনি নিজেকে বার বার করে এই বলে আশ্বস্ত করতেন যে, জীবনের সাধারণ জিনিসগুলোই শ্রেষ্ঠ।*

* আধুনিক আমেরিকান লেখক স্যালি বেনসনের (Sally Benson) "The Storm" নামক গল্পের অনুবাদ।





দুঃসাহসিকতা . . .

দুঃসাহসিকতাই ভারতীয় বিমানবাহিনীর মূলমন্ত্র. এবং দুঃসাহসের এই দুরন্ত নেশার জন্যই আই. এ. এফ এত দুর্ধর্ষ হতে পেরেছে। আজকের জগৎজোড়া ওলট-পালটের দিনে জয়পরাজয়ের প্রায় সম্পূর্ণ টাই নির্ধারিত হচ্ছে আকাশপথের আধিপত্য দিয়ে। আই এ এফ.ও মিত্রপক্ষের অন্য বিমানবাহিনীগুলি জাপানীদের বুঝিয়ে দিচ্ছে যে দুঃসাহস ও সুশিক্ষা থাকার জন্যই আজ আকাশপথে আমাদের এত প্রতিপত্তি।

যুদ্ধের পর কী করবেন তা' ঠিক করবার সময় এখনই!

* ভারতীয় বিমানবাহিনীর অফিসারেরা যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করবেন তার সাহায্যে ভবিষ্যতে বেসামরিক জীবনে ভালো কাজ তাঁরা সহজেই পাবেন।

* যতদিন যুদ্ধ চলবে ততদিন গভর্নমেন্ট অনেক চাকরি নিজেদের হাতে রাখবেন। যাঁরা এখন যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন কেবল তাঁরাই পরে এ সব চাকরি পাবেন।

* এখন থেকেই বন্দোবস্ত চলছে যাতে যুদ্ধপ্রত্যাগত কর্মপ্রার্থীরা গভর্নমেন্টের খরচে তাঁদের ইচ্ছে মত কাজ শিখতে পারেন।

* যাঁরা য়ুনিভার্সিটির পড়া ছেড়ে কাজে যোগ দিয়েছেন তাঁদের জন্য যুদ্ধের পর শিক্ষাসংক্রান্ত অনেক সুবিধের বন্দোবস্ত আছে, এর সাহায্যে তাঁরা যুদ্ধের পর আবার পড়া শুরু করতে পারবেন। এ সম্বন্ধে নিজের নিজের য়ুনিভার্সিটি থেকে বিস্তারিত খবরাখবর পাবেন।

আই. এ. এফ.এ প্রবেশ যোগ্যতা:

ভালো স্বাস্থ্য, সুস্থ দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি এবং বয়স ১৭॥ বছর থেকে ২৮ বছর। প্রচুর পরিশ্রমের ক্ষমতা থাকা চাই। আর চাই ভালো সাধারণ শিক্ষা ও ইংরিজিতে ভালো লিখতে ও বলতে জানা।

এই কুপনটি কেটে নিয়ে আপনার কাছাকাছি জি. ডি. (পাইলট) রিক্রুটিং অফিসারকে পাঠালে তিনি আপনাকে অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম ও ভারতীয় বিমানবাহিনীর কাজ সম্বন্ধে বিস্তারিত সর্ত ও বিবরণ পাঠাবেন।

নাম ____________________

ঠিকানা ____________________

____

____

কুপনটি আপনার কাছাকাছি জি. ডি. আর. ও.কে পাঠিয়ে দিন
আই. এ. এফ. জি. ডি. (পাইলট) রিক্রুটিং অফিসার—কলকাতা
১৫ ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট; ঢাকা: C/o আর.এ.এফ্.স্টেশন

ট্রামে-বাসে

যাঁরা সর্বসাধারণের মধ্যে সংবাদ পরিবেশণ করেন—তাঁরাই এবার সংবাদ হিসাবে সর্বসাধারণের মধ্যে পরিবেষিত হইয়াছেন। আমরা এই কয়দিন সর্বভারতীয় সাংবাদিকদের দুঃখ-সুখ এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা শুনিলাম। তাঁদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক—এবং মনের কথা খুলিয়া বলিবার অধিকার তাঁরা অর্জন করুন, এই কামনাই আমরা করিতেছি। সাংবাদিকদের অধিবেশনে ট্রামে-বাসের যাত্রীদের প্রবেশ অধিকার নাই। তাই আমাদের সুখ-দুঃখের কথা তাঁহাদিগকে জানাইতে পারিলাম না। তবে কলিকাতা ত্যাগের আগে সাংবাদিকগণ যে-কোন দিন অফিসের বেলায় একবার যদি টালা হইতে টালিগঞ্জ পর্যন্ত ট্রামে বা বাসে ভ্রমণ করিয়া যান তাহা হইলেই আমাদের জীবন-যাত্রার খানিকটা আভাস পাইতে পারেন। সংবাদপত্রের পাঠক হিসাবে এবং পাঠ না করিয়াও সংবাদ বিতরণে ট্রামে-বাসের যাত্রীদের তুলনা হয় না সুতরাং মিঃ রেলভী আমাদিগকেও সাংবাদিক গোষ্ঠীরই অন্যতম মনে করিতে পারেন।

* * *

মৌলানা আজাদ প্রমুখ বন্দী নেতৃবৃন্দ নাকি কারাপ্রাচীরের অন্তরালে বসিয়া সাহিত্য সাধনা করিতেছেন এই মর্মে একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়াই তাঁহাদের লেখনীপ্রসূত রচনাবলীর জন্য অপেক্ষা করিতেছি। কিন্তু সময়মত পাণ্ডুলিপিগুলি লইয়া তাঁহারা নিরাপদে বাহিরে আসিতে পারিবেন ত? সম্প্রতি একটি পাণ্ডুলিপি অন্তর্ধানের সংবাদ পাঠ করিয়াই আমরা এই আশংকা প্রকাশ করিলাম। সে যাহা হউক সদ্যমুক্ত শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল ঘোষ বলিয়াছেন যে, পণ্ডিত জওহরলাল খুব বেশি লিখিতেছেন কিন্তু তিনি কি সম্বন্ধে লিখিতেছেন তাহা প্রকাশ করেন নাই। অবসর মুহূর্তে



পণ্ডিতজীর ব্যাডমিণ্টন খেলার কথাও শুনিয়াছি। পণ্ডিতজী বোধ হয় ব্যাডমিণ্টনের ইতিহাসই লিখিতেছেন—এই অনুমান প্রকাশ করায়—বিশু খুড়ো বলিলেন,—"দূর পাগলা। তিনি এবারে "জহর-কোর্তার" প্রচার ও প্রসারের ইতিহাস লিখছেন।" বিস্ময় বিমূঢ় হইয়া খুড়োর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম।

* * * * *

সর্ষের অভাবে কলিকাতার কয়েকটি তেলের কলের কাজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। একটি অসমর্থিত সংবাদে প্রকাশ, চোরাবাজারের ভূত ছাড়াইবার জন্য নাকি গবর্নমেণ্ট দেশের সমস্ত সরিষা আগে হইতেই কিনিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কতকগুলি সরিষাতে ভূতেরা আশ্রয় লইয়াছিল বলিয়া তেলের জোগানও বন্ধ হইল, ভূতও ছাড়িতেছে না। কথাটা সত্য হইলে পরিস্থিতিটা কিন্তু সত্যই গুরুতর!

* * * * *

আমেদাবাদে অবস্থানকালে কায়েদে আজম নাকি জনৈক সাংবাদিকের নিকট বলিয়াছিলেন যে, পঞ্চাশ হাজার টাকার একটি তোড়া না দিলে (অবশ্যই মুসলমান



সমাজের উন্নতির জন্য) তিনি আর কোন সফরেই যাইবেন না। সেইজন্যই সুরাটবাসী কায়েদে আজমের আসন্ন সুরাট ভ্রমণ উপলক্ষে পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগ্রহের তোড়জোড় করিতেছেন। সকলের চেয়ে যে ছোট এবং অখ্যাত তার কাছেও যাইতে কায়েদে আজমের কোন আপত্তি নাই বলিয়া তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁর মাপকাঠিতে এই "ছোট" যে অন্তত পঞ্চাশ হাজারী হওয়া উচিত সেই কথাটা কিন্তু তখন ভাবিতে পারি নাই। মিঃ সপ্রু কি এই পঞ্চাশ হাজারী চুক্তির সফরের কথা জানিতেন না?

* * *

মাদাম চিয়াং কাইসেক তাঁর সাজসজ্জার জন্য বহু অর্থ অপব্যয় করেন এবং অত্যন্ত সৌখীন বাড়িতে বসবাস করেন বলিয়া—আমেরিকাতে নাকি তাঁর লোকপ্রিয়তা অনেকাংশে হ্রাস পাইয়াছে। মাদামের



এই গর্হিত আচরণের জন্য আমরাও খুব মর্মাহত হইলাম। যে আমেরিকাবাসী পর্ণকুটীর ছাড়া বাস করে না, যে হলিউডের চিত্রতারকারা জীর্ণ বাস ছাড়া কিছু পরিধান করে না, সেখানে গিয়া মাদাম তাঁহার দৈনিক ঐশ্বর্যের স্বরূপ দেখাইয়া এই দরিদ্র জাতির মনে আঘাত না দিলেই মানবতার দিক হইতে খুব একটি মহৎ কাজ করিতেন। তবে, এখনও হয়ত সময় আছে, অচিরে তিনি ভারতবর্ষ হইতে কণ্ট্রোলের শাড়ি নিয়া পরিতে আরম্ভ করুন—তাহা হইলে আমেরিকাবাসী শ্রদ্ধায় গদগদ হইয়া উঠিবে। বিজয়লক্ষ্মী আমেরিকাতেই আছেন, শাড়ি পরার কায়দাটা তিনিই শিখাইয়া দিতে পারিবেন।

* * *

কয়েকদিন আগে আমাদের জনৈক সহযাত্রী হোটেল বা রেস্তরায় বরাহ মাংস সরবরাহ করিয়া মুসলমান ক্রেতাদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত না করিবার জন্য হোটেলের মালিকদের নিকট অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। অনুরূপ অনুরোধ অন্য কোন সম্প্রদায় হইতে আসিলে হোটেলের মালিকের পক্ষে লালবাতি জ্বালানো ছাড়া আর উপায় থাকিবে না। আমরা বলি তার চাইতে বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক আহার পুইডাটার আমদানী করিলেই সর্বধর্মসমন্বয় করা যাইতে পারে এবং বাঙলা সরকারও ধীরে ধীরে ছাগ-প্রজননের দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারেন।

সংকলন

[এই বিভাগে বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন সাময়িক পত্র হইতে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধাবলীর নির্বাচিত অংশ মুদ্রিত হইবে]

আমাদের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা ও নূতন পরিকল্পনা

শ্রীঅনিলমোহন গুপ্ত

গত মহাযুদ্ধের পর প্রগতিশীল সকল রাষ্ট্রই নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থা নিয়ে পরীক্ষা করতে শুরু করেছিলেন। শিক্ষা যে একটা সমগ্র জাতিকে কতখানি প্রভাবিত করতে পারে, তা অনেক দেশেই মনীষী এবং সংগঠকরা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই মোটামুটিভাবে গত মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালকে আমরা নূতন শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনার ও প্রবর্তনের একটা যুগ-সন্ধিক্ষণ ব'লে মনে করতে পারি।

আমাদের দেশে শিক্ষার অভাব ও শিক্ষা-ব্যবস্থার গলদ আমাদের দেশের নানা শ্রেণীর লোকের মনেও একটা অস্বস্তির সৃষ্টি করেছিল। আমরাও অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে লেখাপড়া-জানা লোকের সংখ্যার স্বল্পতা দেখে উদ্বিগ্ন বোধ করছিলাম। তা ছাড়া স্কুল-কলেজের পাস-করা ছেলেমেয়েরা জীবনে স্বপ্রতিষ্ঠ হতে পারছে না, বেকার-সমস্যা ক্রমাগতই বেড়ে যাচ্ছে, এসব লক্ষ্য ক'রেও আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার কোথাও গলদ আছে—এই সন্দেহ[illegible]ই মনে জাগছিল। কিন্তু অন্যান্য দেশ [illegible]যেমন তাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে আগাগোড়া বি[illegible]লেষণ [illegible]'রে নূতন ছাঁচে গড়ে তুলছিল, তে[illegible]মনভাবে আমাদের ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ ক[illegible]রবার বা সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে [illegible] শিক্ষা-ব্যব[illegible]কে নূতন ক'রে গড়ে তোলার [illegible]সয়াজন [illegible]মরা করি নি। আমাদের দেশটা [illegible]; [illegible] বর, [illegible]ড়া কাপড় আমরা জোড়াতালি মধ্যে [illegible] ব্যব[illegible] করতে অভ্যস্ত। ছেঁড়া-দাঁড়ি[illegible] [illegible]-ব্যবস্থাকেও আমরা জোড়া-নয়। [illegible] দি[illegible] ব্যবহারের উপযোগী ক'রে করতে [illegible] [illegible]টা করেছিলাম। আমাদের বলা [illegible] [illegible]জ [illegible]ই তাঁর বিরাট শক্তিকে স্বয়ং-[illegible] [illegible]জিত করেছিলেন স্কুল-কলেজের মোচন [illegible] [illegible] দাঁড়িয়ে তুলতে, পাশ্চাত্যের অভাবও [illegible] [illegible]রণে [illegible]বিদ্যালয়ের পর বিশ্ব-যান্ত্রিক [illegible] [illegible]য় [illegible] ক'রে তুলতে। তাঁর এই শিল্পেরই [illegible] [illegible]কে স্মরণ করেই আমরা এত-শেষ হ[illegible] [illegible]প্রধানত আমাদের শিক্ষা-[illegible]র চেষ্টা করেছি। আমরা কখনও সন্দেহ করি নি যে, গলদটা আমাদের ব্যবস্থার মধ্যেই রয়েছে। বিষের গাছকে যত্ন ক'রে বাড়ালেই তাতে অমৃতের ফল ধরে না, বিষ ছড়ানোর ব্যবস্থাটাই পাকা-পোক্ত হয়। বছরের পর বছর ধ'রে আমরা যে-শক্তি দিয়ে স্কুল-কলেজের সংখ্যা বাড়িয়ে তোলার প্রাণপণ চেষ্টা করেছি, তাতে সমগ্র জাতির মঙ্গল যতটুকু হয়েছে তার চাইতে অমঙ্গলই হয়েছে বেশি, শিক্ষিতদের মধ্যে হিংস্র পশুর মত স্বার্থের কাড়াকাড়ির নিত্যনৈমিত্তিক অভিযান দেখে এ বিষয়ে কারও সন্দেহ থাকার কথা নয়। তবু আমরা বিরাট ব্যয়ে নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় খুলছি, ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়িয়েছে অন্দরের থালা-ঘটি-বাটি বন্ধক দিয়ে বৈঠকখানা সাজাবার মত।

আমরা যে শুধু অস্বস্তিই বোধ করেছি, গলদটা ঠিক কোথায় তা নির্দেশ করতে পারি নি, তার কারণ প্রধানত দুইটি। প্রথমত পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ শক্তিকে নষ্ট ক'রে দেবার আয়োজন আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাটার মধ্যেই রয়েছে;—নইলে অন্ধভাবে বিদেশী ভাষার বিরাট ভূতকে শিশুর ওপর চাপিয়ে দিয়ে আমরা ইংরেজীনবিস হচ্ছি ব'লে গর্ব অনুভব করতাম না বা একটা বিদেশী ভাষা শেখার প্রাণপণ চেষ্টায় জীবনের এতখানি মূল্যবান সময় নষ্ট করতাম না।

প্রত্যেক শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যেই, সে যে রকমই হোক না কেন, একটা আদর্শ থাকে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মধ্যে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে এই আদর্শের প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে। এর প্রভাব এত বড় যে, সমগ্র জাতির ভাগ্য এরই দ্বারা পরিচালিত হয়, যতক্ষণ না পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলীর চাপে এর ঘোর কেটে যায়। শিক্ষার এই বিরাট প্রভাব সম্বন্ধে সচেতনতাই বিগত মহাযুদ্ধের পর বিভিন্ন জাতির নূতন ক'রে শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিকল্পনা গ'ড়ে তোলার মূলে রয়েছে। আমাদের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাব যে, শিক্ষার্থীকে সর্বতোভাবে নির্ভরশীল ক'রে তোলাই এই ব্যবস্থার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য। হাতে-খড়ির পর শিশু যেদিন থেকে বিদ্যালয়ের শীর্ণ পরিসরের মধ্যে প্রবেশ-লাভ করে, সেদিন থেকে তার স্বাধীন ইচ্ছা ও চিন্তাকে বলিদান করাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে আদর্শ ব'লে ধরা হয়। যার কোন স্বাধীনতার বালাই নেই, সজীব ইচ্ছা শক্তি যার মধ্যে নিষ্ক্রিয়, সেই আমাদের দেশে ভাল ছেলে! বিদ্যালয়ে যে ছেলেটি বিনা প্রশ্নে, নির্বিরোধে বইয়ের ছাপার অক্ষরের মন্ত্রগুলি হজম করে, নিজে পরখ না করে বিনা অনুসন্ধানে যে পরের ভাষায় নিজের ঘরের কথা অনর্গল ব'লে যেতে পারে, তাকেই আমরা পুরস্কার লাভের উপযুক্ত বলে বিবেচনা করি; বিদ্যালয়কে বিন্দুমাত্র আকর্ষণীয় না ক'রে তুললেও, যারা কেবল আদেশ ও উপদেশ পালন করার জন্য নিত্য বিদ্যালয়ে আসে তাদেরই দিকে আমরা সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি। এই একান্ত মসৃণ বাধ্যতা ও প্রশ্নহীন নির্ভরতা আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থারই জারজ সন্তান। আবাল্যের এই অভ্যাসই আমাদের দাসত্ব ও পরমুখাপেক্ষিতার বনেদকে দৃঢ়তর করেছে।

আমাদের দ্বিতীয় অক্ষমতার কারণ, পাশ্চাত্য সভ্যতার বিদ্যুৎস্ফুরণের প্রতি অদম্য শ্রদ্ধা। একে আমরা যাচাই করে গ্রহণ করি নি, ওটা আমাদের ওপর চেপে বসেছে চাষীর কাদা-মাখা গায়ে ফরসা কোটের মত। পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলে যে শক্তি, তা হচ্ছে অন্যের শক্তিকে নিষ্পেষিত ক'রে নিজের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করার শক্তি। এটা ব্যায়াম ক'রে শক্তি বাড়ানো নয়, নিজেকে উন্নত করা নয়, ওটা অন্যের রক্তে নিজের জোর বাড়ানো। এ সভ্যতাটা তাই যখন পরের দিকে তাকায়, তখন অন্যকে নিষ্পেষিত ক'রে নিজেকে কি ক'রে আরও মহিমান্বিত করে তুলবে এই কথাটাই ভাবে। বাইরের লোকের চোখে এই মহিমাটাই পড়ে, বিরাট প্রাসাদ, বিরাট যন্ত্র দেখেই আমরা ভুলি, পর পর দুইটা মহাযুদ্ধের অবতারণা দেখেও আমরা এর গোড়ার দুর্বলতাটুকু ভাল ক'রে দেখতে পাই নি। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাটা এই সভ্যতারই সৃষ্টি, তাই প্রতিযোগিতাকেই এই শিক্ষা পুষ্ট ক'রে তোলে, সহযোগিতাকে নয়।

আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার এই দুইটি গলদই আমাদের দেশের কোন কোন মনীষীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন ধ'রে কোন কথাই এত বার বার বলেন নি, যতটা বলেছেন আমাদের জাতীয় জীবনের এই দুষ্ট ব্রণটির কথা। বিদ্যালয়ের পলাতক ছেলেকে যেদিন বিশ্ববিদ্যালয় তার গণ্ডির মধ্যে সসম্মানে আমন্ত্রণ করেছিল, সেদিন তিনি সেখানে প্রবেশ করেছিলেন আনন্দে বিগলিত হয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসা করতে নয়, দুঃখের কথা জানাতে। হয়তো তাঁর ভরসা ছিল যে, অপাঠ্য পুঁথিতে লেখা তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি-বাগীশরা উপেক্ষা ক'রেও থাকেন, তবু হয়তো তাঁদের সর্ববিশ্বাসের কেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদী থেকে উচ্চারিত কথাগুলি একটু আলোড়নের সৃষ্টি করবে। তাঁর সে বিশ্বাস তাঁর অনেক স্বপ্নেরই মত কার্যকরী হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার মূল ব্যাধিটাকে সনাক্ত করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, বিদ্যালয়ের সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে শিক্ষাকে জীবনের সুদূরপ্রসারী ক্ষেত্রে নিয়ে যেতে, পাশ্চাত্য সভ্যতার আত্মঘাতী আদর্শ থেকে শিক্ষাকে রক্ষা করতে। কিন্তু বস্তুতান্ত্রিক জগতের বিশ্লেষণের চাঁচা-ছোলা যন্ত্রপাতি নিয়ে কোমর বেঁধে তিনি কাজেতে নামতে পারেন নি, নানা কারণে কবির কল্পদৃষ্টির মধ্য

দিয়েই তিনি আমাদের দূরদৃষ্টের কুয়াশা-ঢাকা সত্যের স্বরূপ দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি নির্দেশ দিয়ে গেছেন, কিন্তু সুনির্দিষ্ট পথ দেখিয়ে যেতে পারেন নি। পরীক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতিকে তিনি একেবারে উপেক্ষা করতে পারেন নি, যদিচ তিনি বিশ্ববিদ্যালয় বলতে এখনকার যান্ত্রিক সিঁড়িহীন, অপাংক্তেয় কাঠামোটাকে বুঝতেন না, কল্পনা করতেন বাঙলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সজীব সমগ্র শিশু-মূর্তিটিকে। কিন্তু ওই ছিদ্রপথেই শনি তার প্রবেশের পথ ক'রে নিয়েছে, তাঁর গড়া বিশ্বভারতী মামুলী শিক্ষালয়ের উঁচু-নীচু পরীক্ষার ছাঁচে ঢালা একটু স্বতন্ত্র আর একটি বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে, সমগ্র জাতির মধ্যে নূতন একটা প্লাবন আনতে পারে নি, নূতন একটি পথ ও পরীক্ষার নির্দেশের মত এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে।

দগদগে ঘা-টার ওপর নির্মমভাবে ছুরি চালাবার জন্য গান্ধীজীর মত একজন ডাক্তারের প্রয়োজন ছিল। নিরাসক্ত ডাক্তারের মতই রুচিকে উপেক্ষা ক'রে তিনি প্রাণ-রক্ষার দিকে সমগ্র মনোযোগ দিতে পেরেছেন। আমাদের আসল রোগটা হচ্ছে যে, আমরা কিছু বুঝতে বা করতে পারছি না, কিন্তু আমরা সে সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা না করে বিদ্যালয়ের ঘরগুলিকে চূণকাম করতে লেগে গিয়েছি। এই বিদ্যালয়-গুলি চাষাকে চাষের কাজ শেখায় নি, তাঁতীকে তাঁত বুনতে শেখায় নি, যার যা করার ক্ষমতা আছে তাকে তা করার সুযোগ এবং শিক্ষা দেয় নি, দেশবাসীকে দেশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়নি, অথচ চাষীর ছেলেকে বাবু বানিয়ে, তাঁতীকে কেরাণী গ'ড়ে দেশের মধ্যে একটা অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি করেছে। আমাদের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা ঐতিহাসিকভাবে পরিকল্পিত হয়েছিল কোম্পানীর কাজের জন্য উপযুক্ত কেরানী গড়তে। সে পরিকল্পনা আজ পরিবর্তিত হয় নি, সুতরাং কেরাণী গড়ার যন্ত্র কেরানীই গড়ুক, ওটাকে মানুষ গড়ার কাজে লাগানো চেষ্টা করা বৃথা। সমগ্র জাতিকে কেরানীতে পরিণত করা যায় না জেনেও যে আমরা এই শিক্ষা-ব্যবস্থাকেই ব্যাপকতর করবার চেষ্টা করেছি সেটা আমাদেরই অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। আমাদের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা পাশ্চাত্যের যে আদর্শের অনুকরণে পরিকল্পিত হয়েছিল, সে ব্যবস্থাকে পাশ্চাত্য শতভাবে পরিবর্তিত করেছে। শিক্ষাকে নিয়ে কত-ভাবে পরীক্ষা যে ওরা করেছে তার ইয়ত্তা নেই। মরা নদীর মত আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা স্থির, স্থান-কাল-পাত্রভেদে এর কোন পরিবর্তন হয় না, বাস্তবের সঙ্গে একে মানিয়ে নেবার কোন ব্যবস্থা নেই; তাই অব্যবস্থাকে কেন্দ্র ক'রে এত বীভৎসতা জন্ম নিয়েছে।

আমাদের শিশুদের ভার যাঁদের হাতে, তাঁদের কোন শিক্ষা, কোন উপযোগিতাই নেই. এ'রাই জ্ঞাত এবং অজ্ঞাতসারে শিশুর জীবনের শিক্ষার প্রতি প্রথম আগ্রহকে বিভীষিকায় পরিণত করেন; প্রথম থেকেই আমাদের বিদ্যালয়গুলির কাজ হচ্ছে শিশুকে এইটুকু ভাল ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া যে, বিদ্যালয়টা জীবনের অন্য সব কিছু থেকে আলাদা, এই সময়টা হাসতে মানা, পৃথিবীর দিকে চাইতে মানা, সহজ হতে মানা। বইয়ের পৃথিবীর ভেতর দিয়ে চলতে হ'লে রামগরুড়ের ছানা হয়ে থাকতে হবে। শিক্ষাকে এমন ক'রে স্বাভাবিক জগৎ থেকে আলাদা ক'রেই আমরা শিশুর বিতৃষ্ণাকে জাগ্রত করি। যার পক্ষে ছুরি থেকে কাঁচিকে আলাদা করা কঠিন নয়, বিড়াল থেকে কুকুরকে আলাদা করা কঠিন নয়, তার পক্ষে ক থেকে খ-কে আলাদা করা একটা প্রকাণ্ড সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় এইজন্য যে, আমরা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পথটাকে একেবারে উল্টে ধরি, তথ্য দেবার আগেই তত্ত্ব কপচাতে শুরু করি। হাত-পা মুড়ে এক জায়গায় বসে থাকা শিশুদের পক্ষে অসহ্য—ওটা তার সজীবতারই লক্ষণ, তাই তারা প্রাণের প্রাবল্যে ছটফট ক'রে একটা কিছু গড়তে বা ভাঙতে চায়। যদি তাদের কিছু শেখাতে হয়, তবে ওই ভাঙা-গড়ার খেলার মধ্য দিয়েই শেখাতে হবে, শিক্ষকের কাজ সেই খেলাকে সুপরিচালিত ক'রে অর্থময় কাজে পরিণত করা। আমাদের তাই প্রথম সমস্যা, কি ক'রে কাজকে শিক্ষার বাহন ক'রে তোলা যায়।

দ্বিতীয়ত, আমাদের সমাজের সঙ্গে শিক্ষার কোন যোগ নেই। আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাটা ভিক্ষুক তৈরি করার যন্ত্রস্বরূপ—তাই আমরা এত অবজ্ঞার সঙ্গে বিদ্যালয়-গুলির দিকে তাকিয়ে থাকি। শিক্ষা আমাদের জীবনের জন্য প্রস্তুত করে না, তাই জীবনের সব চাইতে সুন্দর, সজীব, কর্মক্ষম সময়টুকু বিদ্যালয়-বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটিয়েও আমাদের ওর বাইরে এসে কি করব এই ভাবনা নূতন করে ভাবতে বসতে হয়। জগতের চলমান স্রোতের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় ঘটাবার এবং সমস্যার সমাধান করবার মত শক্তি অর্জন করার কোন ব্যবস্থাই বিদ্যালয়ের মধ্যে নেই বলেই এই অবস্থা ঘটে থাকে। সুতরাং শিক্ষাকে নূতন করে গড়তে হলে সমাজ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রাচীরটা কি করে ভেঙে ফেলা যায়, সে কথা আমাদের ভাবতে হবে। বিদ্যালয়গুলি যে সমাজের বোঝা নয়, সমাজের ঐশ্বর্য বাড়াবার কেন্দ্র, সেটা প্রমাণিত করতে হবে।

বইয়ের কতগুলি কথা মুখস্থ করাই আমাদের শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত; ছাত্র-ছাত্রী জীবনে সেগুলি প্রয়োগ করে কি না, তা দেখার কোন দায়িত্ব বিদ্যালয়ের নেই। যে কোন রকমে পরীক্ষা-প্যাসের ছাপটা জুটলেই সবাই খুশি। এই ব্যবস্থাই আমাদের বিদ্যালয়ে ভাল ভাল বুলি মুখস্থ করতে এবং জীবনে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিতে শিখিয়েছে। আমরা 'সত্য কথা বলিবে' 'অন্যের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে' ইত্যাদি মুখস্থ করি, কিন্তু সত্য কথা বলি না বা কারও সঙ্গেই সদ্ব্যবহার করি না। জীবনের মধ্যে খানিকটা পুঁথিগত জ্ঞান আত্মসাৎ করাই আমাদের মতে শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত, তা ছাড়া জীবনের সমগ্র ব্যাপক অংশটিকেই আমরা অবজ্ঞার সঙ্গে হরিজনের দলে ফেলে রাখি। সুতরাং কি করে শিক্ষাকে জীবনে প্রয়োগ করার কাজে লাগানো যায়, এই আমাদের আর একটি সমস্যা। এত এত শিক্ষা কি করে আমাদের সমাজের অর্থ-নৈতিক সংস্কারে সহায়ক হবে, সে কথা আমাদের ভাবা প্রয়োজন।

শিক্ষাকে একটা নূতন রূপ দেবার আশু প্রয়োজন দেশের অনেকেই অনুভব করছেন। ওয়ার্ধায় হিন্দুস্থানী তালিমি সঙ্ঘের উদ্যোগে গান্ধীজীর অনুপ্রেরণায় একটি শিক্ষা-ব্যবস্থার খসড়া তৈরি করা হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রদেশে একে ব্যাপকভাবে রূপ দেবার চেষ্টাও চলছে। কিন্তু বাঙলা দেশে এখনও পর্যন্ত এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনাই হয় নি। এই ব্যবস্থার ভিত্তি মোটামুটি চারটি প্রস্তাবের ওপর:—(১) সাত বছরের প্রাথমিক, সার্বজনীন, অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, (২) শিক্ষার বাহন হবে কাজ, এবং সমাজ ও আবেষ্টনীর সঙ্গে শিক্ষার ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করতে হবে, (৩) শিক্ষাকে আর্থিকভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠ করতে হবে, (৪) সত্য ও অহিংসার ওপর শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করতে হবে।

আমরা শান্তি, পবিত্রতা, সহযোগিতা, ন্যায়নিষ্ঠা প্রভৃতি অনেক কিছু ভাল ভাল জিনিসের জন্য চীৎকার করছি, কিন্তু ভবিষ্যতে যারা ভারতের নাগরিক হবে, তাদের তেমন ভাবে গড়ে তুলছি কি? শূন্য ভাণ্ডারের শিখণ্ডীকে সামনে দাঁড় করিয়ে আমাদের শাসকরা বহুদিন আমাদের শিক্ষা-সম্প্রসারণকে অচল করে রেখেছেন। ওয়ার্ধা-ব্যবস্থা দাবি করছে, শিক্ষার এসম প্রাথমিক সমস্যা জয় করা যায়। তবু যে কেন আমরা দীর্ঘ সাত বৎসরের মধ্যে এটাকে পরীক্ষা করে দেখারও সময় পাই নি, সেই আশ্চর্য।

ভারতবর্ষ গ্রাম-কেন্দ্রিক, এ দেশে শতকরা নব্বুইটি লোক গ্রামেই বা করে। আমাদের সমস্যাগুলিও তাই প্রধান গ্রামেরই সমস্যা। এ কথাটা সহজ হ'লে কার্যত আমরা এই কথাটা প্রা ভুলে যাই আমাদের শাসকেরা আমা দেশে সভ্যতার আমদানি করেছে তা নগর কেন্দ্রিক, ওটা সহজ স্বাভাবিকভাবে আমাদে দেশে গ'ড়ে ওঠে নি, ওকে আমাদের ওপ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। উনিশ শতাব্দীতে যে অপরিমেয় দ্রুতগতি জগৎ জ্ঞানে বিজ্ঞানে এগিয়ে গেছে, সঙ্গে ভারত-বর্ষ তাল রেখে চলতে পারে নি। গত দুই শত বছরে জগতের ভাণ্ডার অদ্ভুত

পূর্বরূপে প্রসারিত হয়েছে—ভারত সে জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয় নি, নূতন জীবনের শক্তি তার নাড়ীতে নাড়ীতে সঞ্চারিত হয় নি, কিন্তু সেই সভ্যতার বোঝা তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এইখানেই আমাদের চরম দুর্ভাগ্যের জন্ম। আমাদের কলের কাপড় যথেষ্ট গড়ার বা পরার সামর্থ্য নেই, অথচ নিজেদের তাঁতশিল্প আমরা ভুলেছি; আমাদের ট্রাক্টরও নেই, বৈজ্ঞানিক সারও নেই, অথচ হাল-লাঙ্গল চালানোও আমরা ভুলতে বসেছি। নূতন নূতন আধুনিক বিদ্যালয় গ্রামে গ্রামে গড়ার সামর্থ্যও আমাদের নেই, অথচ চতুষ্পাঠী, পাঠশালা, মক্তব, কথকতা, যাত্রা এগুলিকেও আমরা মেরে ফেলেছি। এই বিংশ শতাব্দীতে আমরা প্রাগৈতিহাসিক যুগে ফিরে যেতে পারি না একথা যেমন সত্যি, তেমনই ব্যাঙ থেকে ফুলে ষাঁড় হয়ে যেতে পারি না সে কথাও সমভাবেই সত্যি। মুষ্টিমেয় জনকয়েক শিক্ষিত হ'লেই জাতির ক্রমবিকাশ সাধিত হয় না; তার জন্য ব্যাপক শিক্ষার প্রয়োজন আছে।

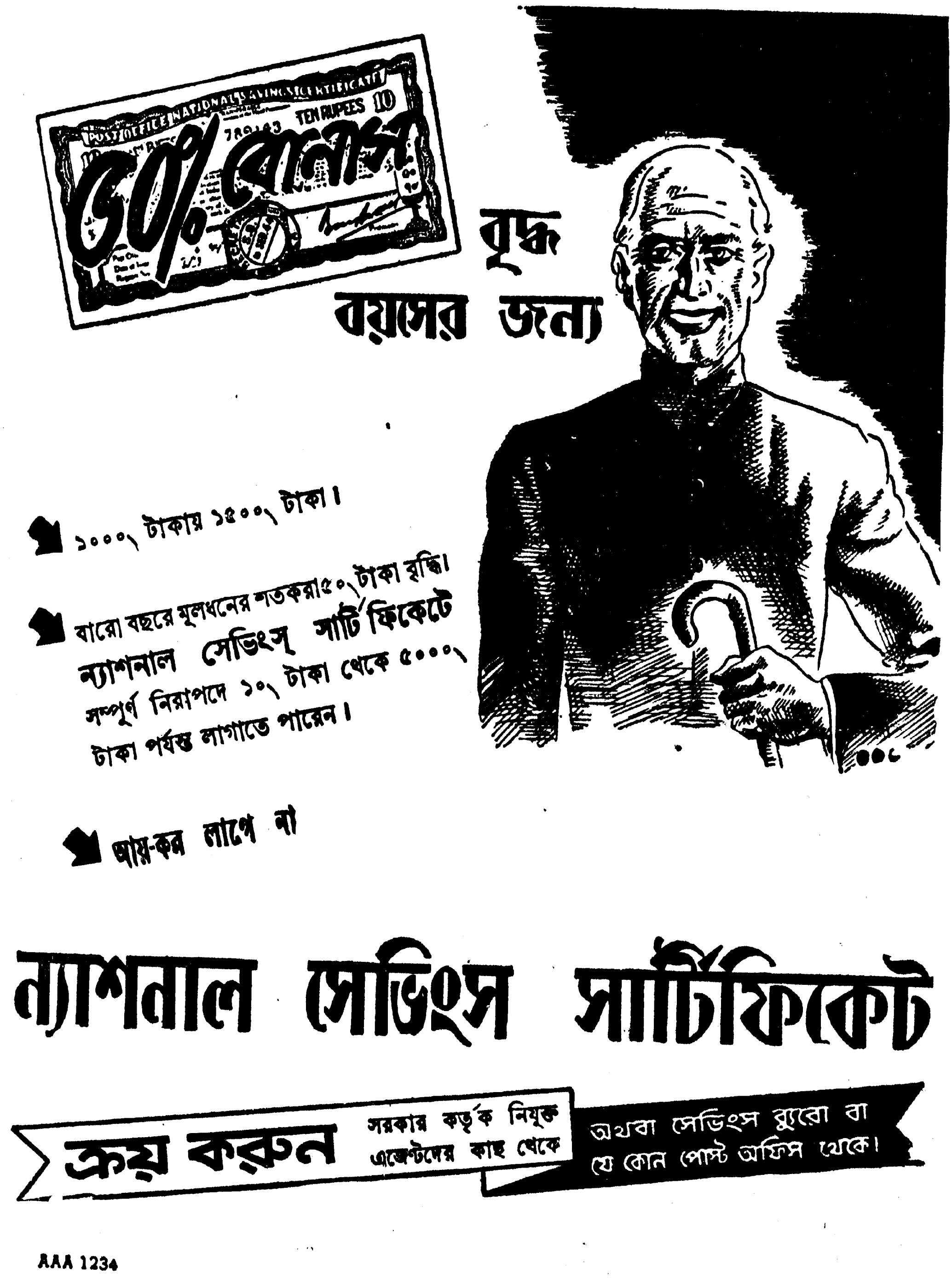
তা ছাড়া আর একটা কথা আছে। প্রথম যখন একটা সভ্যতা গ'ড়ে ওঠে, তখন তা এগিয়ে চলে ভিতরকার প্রাণশক্তির আবেগে বিচারের স্থান তাতে থাকে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানসর্বস্ব যান্ত্রিক-সভ্যতা ধূমকেতুর মত বিপুল বেগে পৃথিবীর বুকে ছুটে বেড়িয়েছে। এই বিপুল শক্তি জগৎকে মুগ্ধ ক'রে রেখেছিল। আজ যখন পৃথিবীর ক্ষতবিক্ষত বুকে এর বেগ স্তিমিত হয়ে এসেছে, যখন আমরা বিরাট বহ্নিদাহের প্রচণ্ড ঔজ্জ্বল্যের আড়ালে লুকানো বিপুল কালিমাকে দেখতে পাচ্ছি, তখন একে বিচার করার সময় এসেছে—এর সবটুকু যে গ্রহণযোগ্য নয়, সে কথাটাই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

এই দুইটি মূল উপলব্ধির ওপর ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনার ভিত্তি। এই পরিকল্পনা আজও পরীক্ষামূলক অবস্থার মধ্যে রয়েছে, স্থান-কাল-পাত্রভেদে এর রূপায়ণ ভিন্ন হবে, এ কথা পরিকল্পনাকারীরা স্বীকার করেন। বস্তুত এই স্বীকৃতিই পরিকল্পনার জীবনীশক্তির সুস্পষ্ট লক্ষণ। কিন্তু এর মূল সূত্রগুলি সুস্পষ্ট, আমরা সেগুলি সম্পর্কেই এই প্রবন্ধে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

গ্রামগুলি আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড, এ কথা কেউ অস্বীকার করেন না; অথচ এগুলি যে আজ চরম দুর্গতির মধ্যে সম্পূর্ণ বিলুপ্তির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, সে কথাটাও উপলব্ধি করা কঠিন নয়। এ যে এর বর্তমান সভ্যতাকে গ্রহণ করতে পারি নি ব'লেই ঘটেছে সে কথাও বলা কঠিন, কারণ কোনদিন এই গ্রামগুলি স্বয়ং-সম্পূর্ণ ছিল; এরা নিজেদের অভাব মোচন তো করেছেই, বরং পরের অন্নবস্ত্রের অভাবও ঘুচিয়েছে। এই বিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক সভ্যতার দিনেও যে সেই কুটীর শিল্পের প্রয়োজন আমাদের দেশে একেবারে শেষ হয়ে যায় নি, সংহত সুনিয়ন্ত্রিতভাবে চালালে আজও যে কুটীর শিল্প বেঁচে থাকতে পারে, তার প্রমাণ আজ ভারতবর্ষে একেবারে নেই এমন নয়। কিন্তু নিশ্চেষ্ট নিঃসহায়ভাবে এরা নিজেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মৃত্যুর জন্য অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে নীরব হয়। আমরাও বাইরে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতার ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে থাকি। রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা পরম দুর্ভাগ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু মৃত্যুর হিমশীতল আলিঙ্গনের মধ্যে দাঁড়িয়ে ওই নির্মম দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে ভাবা ছাড়া আর কিছু করার আছে কি না সেটাই চিন্তনীয় বিষয়। বৈজ্ঞানিক কার্যকারণবাদ সম্বন্ধে জ্ঞান নেই ব'লে আমরা অজ্ঞ গ্রামবাসীকে অবজ্ঞা করি, এদের কুসংস্কার, জড়তা, অদৃষ্টবাদকে ধিক্কার দিই; কিন্তু ওই কুসংস্কার ও জড়তাকে দূর করার চেষ্টা আমরা করি না। আমরা নিজেদের দিকে চেয়ে দেখি না যে, আমরা নিজেরা কতখানি জড়, মূঢ় ও অদৃষ্টবাদী ব'লে আমাদের মঙ্গলের সমাধি আমাদের চোখের সামনে রচিত হচ্ছে জেনেও এগিয়ে যেতে পারি না। বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আছে ব'লে আমরা গর্ব ক'রে থাকি, অথচ এই ধ্বংসোন্মুখ গ্রামের সঙ্গেই যে আমাদের সকল সৌভাগ্যের পরিসমাপ্তি ঘটছে, তা কয়জনে বুঝি বলা কঠিন। অবশ্য বোঝা ও করার মধ্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষা-মারফৎ আমরা যে সীমারেখা টানতে শিখেছি, তাতে বুঝেও কাজ না করা একটা কিছু আশ্চর্য নয়।

এ সম্পর্কে আমাদের করবার মত কাজ আছে, গ্রামগুলিকে বাঁচিয়ে তুলে আমাদের নিজেদের মৃত্যুর মুখ থেকে আজও বাঁচানো সম্ভব—এই কথাই বনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনা জোর দিয়ে বলবার চেষ্টা করেছে। 'গ্রামে ফিরে যাও, গ্রামের উন্নতি কর' এই কথাগুলো আমরা আলগাভাবে বহুদিন ধ'রে শুনে আসছি। মাঝে মাঝে হুজুগের মুখে গ্রাম-উন্নয়নের, জঙ্গল সাফ করার ধুম প'ড়ে যায়—ঝোঁক যখন কেটে যায় শহরের ছেলেরা শহরে ফিরে আসেন, স্তিমিত গ্রামগুলি আবার ঝিমিয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে দু-চার দিন আমরা নৈশবিদ্যালয় খুলে দু-চারপাতা লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করি, গ্রামের লোকের সাড়া না পেয়ে দিন কয়েক পরেই সেগুলি বন্ধ হয়ে যায়—গ্রামের লোকেরা হজম-না-করা বিদ্যাকে নিঃশেষে ভুলে নিশ্চিন্ত হয়, চণ্ডীমণ্ডপে গুরুমশাইয়ের অবিরাম বেত্রবর্ষণের মুখে অসহায় বালক-বালিকার কান্না অসহায় গ্রামের বোবাকান্নার প্রতিধ্বনি তোলে। জাতীয় জীবনের দীর্ঘকালের জড়তাকে জয় করতে হ'লে যে গোড়া থেকে শুরু করা দরকার, সে কথা ভুলে যাই ব'লেই আমাদের চেষ্টা এমনই ক'রে নিষ্ফল হয়।

আমাদের সর্বপ্রকার অধঃপতনের মূলে রয়েছে আমাদের জড়তা, অথচ আমরা আমাদের স্কুল-কলেজের মধ্য দিয়ে এই জড়তাকেই আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরের মধ্যে অঙ্কুরিত করি। যদি স্বাভাবিক প্রাণশক্তির প্রভাবে এরা চঞ্চল হয়ে ওঠে, তবে শৃঙ্খলার নামে আমরা অসংকোচে সেই কর্ম-প্রচেষ্টাকে নষ্ট ক'রে দিই। পারস্পরিক অসহযোগিতাই আমাদের দুর্বলতা, অথচ আমরা বাল্যকাল থেকে শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতাকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকি। ওয়ার্ধা-পরিকল্পনার লক্ষ্য—কাজের লোক গ'ড়ে তোলা এবং বাস্তব জগতে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে গেলে যে সহযোগিতার প্রয়োজন, এই সত্যটিকে আমাদের মনে এবং অভ্যাসে দৃঢ়বদ্ধ ক'রে দেওয়া। এজন্য অযোগ্য পাঠ্য-পুস্তকের অযথা-ভারমুক্ত হয়ে কাজকে কেন্দ্র ক'রে এই শিক্ষা গ'ড়ে উঠবে—এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এইটুকু শুনেই আমরা আঁৎকে উঠি। বহুদিন ধ'রে কাজ না ক'রে কেবল কথার তোড়ে মান বাঁচিয়ে চলার যে সহজ পথটি আমরা আবিষ্কার করেছিলাম, তার গোড়াতেই আঘাত পড়তে দেখে আমাদের বিচলিত হবারই কথা। বনিয়াদী শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রথম আপত্তি করা হয়ে থাকে যে, এই পদ্ধতি আমাদের জাতটাকে তাঁতী, ছুতোর, মিস্ত্রীতে পরিণত ক'রে ফেলবে, উচ্চতর জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্থান এতে নেই। জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই ধারণা হাস্যকর। কাজের মধ্যে দিয়েই আমরা কাজ করার সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি, সে সমস্যার সমাধান থেকেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্ম। পৃথিবীর যত বয়স বেড়েছে, আমাদের কাজ যত বহুমুখী হয়েছে, ততই আমাদের সম্মুখে নানা সমস্যা এসে দাঁড়িয়েছে, আমরাও ততই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের সমস্যাকে দেখাবার সুযোগ পেয়েছি। জ্ঞান-বিজ্ঞান আকাশ থেকে ঝ'রে পড়ে নি, আমাদের ও পরিবেশের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলেই এদের জন্ম। বনিয়াদী শিক্ষা এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও সমাধানের মধ্য দিয়েই পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা দিতে চায়, না-বোঝা-না-জানা কাল্পনিক সমস্যার কাল্পনিক সমাধানকে মুখস্থ করিয়ে নয়। আমরা এ কথা বলি না যে, বনিয়াদী শিক্ষা-সমিতি আজ দেশের সামনে যে কর্মসূচী দাঁড় করিয়েছেন, সেটা সর্বাঙ্গসুন্দর, ওতে আর নূতন কিছু যোগ করার নেই। বরং সমিতি বার বারই স্বীকার করেছেন যে, স্থান-কাল-পাত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কর্মপন্থাকে নূতন নূতন রূপ দেবার প্রয়োজন চিরদিনই হবে। আমরা, যারা আজ দর্শন কপচাচ্ছি বা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দোহাই পাড়ছি তারা ভুলে গেছি যে, প্রাচ্যের দর্শন বা পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান কোনটাই শুধু মাত্র ভাববিলাস নয়—সুনির্দিষ্ট জীবনধারা। আমাদের ব্যাধি-জর্জরিত, উপবাস-ক্লিষ্ট, দুর্ভিক্ষ-মহামারী-বিধ্বস্ত গ্রামের প্রাথমিক সমস্যা বেঁচে থাকার সমস্যা—অন্নবস্ত্রের সমস্যা। আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব নেই তবু আমরা রিক্ত, আমাদের মাঠে মাঠে সোনার ধান তবু আমরা অভুক্ত, যারা যোগায় সারা দেশের অন্ন তারাই অন্নহীন গৃহহীন, আমাদের সীমাহীন লোকবল তবু আমাদের পরম


POST OFFICE NATIONAL SAVINGS CERTIFICATE
TEN RUPEES 10
৫০% বোনাস
বৃদ্ধ বয়সের জন্য
১০০০৲ টাকায় ১৫০০৲ টাকা।
বারো বছরে মূলধনের শতকরা ৫০৲ টাকা বৃদ্ধি।
ন্যাশনাল সেভিংস্ সার্টিফিকেটে
সম্পূর্ণ নিরাপদে ১০৲ টাকা থেকে ৫০০০৲
টাকা পর্যন্ত লাগাতে পারেন।
আয়-কর লাগে না
ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট
ক্রয় করুন
সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এজেন্টদের কাছ থেকে
অথবা সেভিংস ব্যুরো বা যে কোন পোস্ট অফিস থেকে।
AAA 1234

দুর্ভাগ্যের কথা দুজনে মিলে ভাবতে পারি না, পরম ক্লান্তিতে আমরা এমনই স্তিমিত হয়ে পড়েছি যে, আমরা ব্যথায় চীৎকারটুকু পর্যন্ত করিতে অসমর্থ। এইটুকু শিক্ষা, পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার সামান্য একটুখানি নৈপুণ্য, সামান্য পশুর আত্মরক্ষা করার যে স্বাভাবিক প্রকৃতিদত্ত জ্ঞানটুকু সেটুকু জ্ঞান যাদের নেই তাদের কাছে অণুবীক্ষণ-দূরবীক্ষণের স্বপ্ন, ইউরোপ-আমেরিকার সভ্যতার খবর নিয়ে যাওয়া শুধু হাস্যকর নয়—ওদের প্রতি নির্লজ্জ অপমান, নিষ্ঠুর উপহাস।

কিন্তু বনিয়াদী শিক্ষা যে কেবল ওই একান্ত প্রয়োজনীয় প্রাথমিক শিক্ষার আয়োজন ক'রেই ক্ষান্ত হতে চায়, সে কথা সত্য নয়। বনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনাকারীরা বিশ্বাস করেন যে, শিক্ষাকে যদি গোড়া থেকেই সংস্কৃত করা যায়, তবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সবটুকু প্রয়োজনীয় সংবাদই গ্রামের ঘরে ঘরে পেণছে দেওয়া সম্ভবপর। সবাইকে তাঁতী ছুতোর চাষী ক'রে গ'ড়ে তোলাই বনিয়াদী শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য নয়। শিক্ষালয় থেকে স্বাভাবিকভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে সমাজের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে, শিক্ষালয় যাতে সমাজেরই একটা অবিচ্ছিন্ন অঙ্গরূপে গ'ড়ে উঠতে পারে এবং সমাজকে সর্বতোভাবে সংস্কৃত করতে পারে এইটেই এই শিক্ষা-পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য। শিশুর মধ্যে যাতে প্রথম থেকেই স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বিতার গোড়াপত্তন হয়, স্বেচ্ছাচার থেকে স্বাধীনতাকে যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা আলাদা ক'রে দেখতে শেখে, শিশুর কাজ করার সুস্থ প্রবৃত্তিকে যাতে তার মানসিক সর্বপ্রকার বিকাশের কাজে লাগিয়ে দেওয়া যায়, এগুলিই এই পদ্ধতির মূল সম্পাদ্য।

বনিয়াদী শিক্ষার পরিসর সাত বৎসর। আমরা যারা ইংরেজী-শিক্ষার মানদণ্ডে সব-কিছু মাপতে অভ্যস্ত তাদের জানানো হয়েছে যে, এই সাত বছরে ইংরেজী ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের চেয়ে বেশি বই কম জ্ঞান লাভ করবে না। আমাদের বর্তমান ব্যবস্থায় এই জ্ঞানটুকু আমরা প্রায় দশ বৎসরে লাভ ক'রে থাকি, তাও পরীক্ষার পর মুহূর্তে মুখস্থ-করা বুলিগুলো প্রায় নিঃশেষে ভুলে যাই। দশ বছরের শিক্ষা সাত বছরে কি ক'রে দেওয়া সম্ভব এ কথা যাঁরা ভাবেন, তাঁদের স্কুল-কলেজের পাঠ্যতালিকা ও বিকৃত পরীক্ষা-ব্যবস্থার দিকে একটু তাকিয়ে দেখতে অনুরোধ করি। শিক্ষাটা যে শিশুর জন্য, তাকে আগ্রহান্বিত ও সক্রিয় ক'রে তোলার যে কোন প্রয়োজন আছে, সে কথাটা আমাদের মনেই থাকে না। উনবিংশ শতাব্দীর বহুদিন পরিত্যক্ত প্রথায় শিক্ষক আজও আমাদের শ্রেণীগুলিতে বাক্যের স্রোত ছাড়িয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হন। বক্তৃতাগুলি করা হয় ক্লাসে যারা সব চাইতে বোকা তাদের লক্ষ্য করে; যারা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান তাদের যে বিরক্তি জন্মায় বা সময়ের অপচয় হয় সেদিকে আমরা লক্ষ্য রাখি না। পড়া তাড়াতাড়ি শিখলেও এগিয়ে যাবার উপায় নেই, তাই সারা বৎসর হেলায় কাটিয়ে পরীক্ষার আগে ছাত্র-ছাত্রীরা স্বাস্থ্য নষ্ট ক'রে মুখস্থ করতে বসে। সময়ের অসদ্ব্যবহার দেখে আমাদের ক্রোধ এবং বিরক্তি মাঝে মাঝে উদ্যত হয়ে ওঠে, কিন্তু আমরা লক্ষ্য ক'রে দেখি না, পরীক্ষার জুয়াখেলার জন্য মোটামুটি পাঠ্যবস্তুটুকুকে কোনমতে মুখস্থ করতে অধিকাংশ ছেলেমেয়েরই দু-তিন মাসের বেশি সময় লাগে না। আবার সারা বছর ফাঁকি দিয়ে যারা পরীক্ষার বেড়াগুলি টপ্ টপ্ ক'রে ডিঙিয়ে যায়, তাদের প্রতি আমাদের কোন অভিযোগ তো থাকেই না বরং আমরা অসংকোচে তাদের কৃতিত্বের প্রশংসা করি। বোঝা না-বোঝায় কিছু এসে যায় না, পরীক্ষার বোঝাটা যে অনায়াসে বইতে পারে, তারই পিঠে আমরা কৃতিত্বের ছাপটা এ'টে দিই। সুতরাং শিক্ষার্থীর আকর্ষণ জ্ঞানের দিকে থাকে না, থাকে পরীক্ষার দিকে এবং এই বিকৃত আকর্ষণকে কেন্দ্র ক'রেই শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে সর্বপ্রকারের বিকৃতি ও নির্লজ্জ কদর্যতা। আবার এই শিক্ষার ভার যাঁদের হাতে, তাঁদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষা বা শিশুর সঙ্গে কোন যোগই নেই—যোগ টাকার সঙ্গে। সেই টাকাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এত অল্প যে তাতে নামমাত্র কর্তব্যটুকুও পালন করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, তবু ঠিক থাকতে হয়, আর কিছু করার যোগ্যতা নেই ব'লেই। এইজন্যই আমাদের শিক্ষা এগিয়ে চলে মন্দাক্রান্তা তালে, আর সে শিক্ষাটুকু আমাদের জীবনে কোন মহৎ প্রভাব বিস্তার করতে পারে না—বিদ্যালয়ের গণ্ডির বাইরে পা বাড়িয়েই আমরা বিদ্যালয়ের কৃত্রিম শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে যেতে পারি। শিশুর সঙ্গে নিবিড় যোগ তার পরিবেশের। প্রকৃতির এই বিরাট পুঁথিখানিতে জ্ঞানের কোন বিষয়-বস্তুরই অভাব নেই—এর প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা পাঠ করার চেষ্টাই জ্ঞানের অনির্বাণ সাধনা। একে আমরা পড়তে জানি না ব'লেই আমাদের নকল পুঁথি লিখতে বসতে হয়। শিশুর যে সব জ্ঞান দরকার তার যথেষ্ট উপকরণ তার চারপাশেই রয়েছে, শুধু শিশুর প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়কে সে বিষয়ে সজাগ করে দেওয়া দরকার। এই পরিবেশের সঙ্গে শিশুর যোগ নিবিড়, শুধু যদি একবার তার আগ্রহকে জাগ্রত ক'রে দেওয়া যায়, তবে শিক্ষা এগিয়ে চলে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে—এইখানেই বনিয়াদী পরিকল্পনার সময়সংক্ষেপের সংকেত। স্বাস্থ্যরক্ষা শেখার জন্য পুঁথির পর পুঁথি ঘাঁটার প্রয়োজন অল্প—চারিদিকেই ব্যাধির যে তাণ্ডবনৃত্য চলছে, তা থেকে মুক্ত থাকা ও করার চেষ্টার মধ্য দিয়েই স্বাস্থ্য রক্ষা শেখানো যায়; গ্রামখানিই শিশুর ছোট্ট পৃথিবী, এর মধ্যে ভূগোল শেখার সমস্ত প্রাথমিক উপকরণ রয়েছে, প্রকৃতি কোথাও কৃপণ নয়, সেই অজস্রতার মধ্যেই বিজ্ঞানের মণিকোঠার চাবি। এই পরিবেশের সঙ্গে নিয়ত সংযোগে যে শিক্ষা তার মধ্যে কৃত্রিমতা নেই, এটা মুখস্থ ক'রে শেখা নয়, কাজ ক'রে শেখা, এই রকম শেখার ব্যবস্থা করাই বনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য।

আমাদের আর্থিক ব্যবস্থাকে ক্ষতবিক্ষত ক'রে শিক্ষাটা নিরর্থক বোঝার মত আমাদের কাছে একটা বিরক্তির বস্তুই হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভিক্ষুক তৈরী করার ভিক্ষুক-যন্ত্রটার দিকে আমরা অবজ্ঞার সঙ্গেই চেয়ে থাকি। বনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনা দাবি করে যে, শিক্ষার এই ভিক্ষাবৃত্তি নিরোধ করা দরকার এবং সম্ভবপর। শিক্ষাকে পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় ব'লেই আমাদের দেশে শিক্ষাটা পরের হুকুমমত চলে। গান্ধীজী এক জায়গায় অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছেন যে, শিক্ষাকে যদি আর্থিকভাবে স্বয়ং-সম্পূর্ণ ক'রে তোলা না যায়, তবে বুঝতে হবে মাস্টারগুলি বোকা, অকর্মণ্য; আর শিক্ষা-ব্যবস্থাটা একটা ধাপ্পাবাজী মাত্র। প্রথমটা এই কথাগুলি প'ড়ে একটা ধাক্কা লাগে। পৃথিবীর সব দেশেই যখন শিক্ষার জন্য টাকা ছড়ানোর অন্ত নেই, তখন এই বেসুরো কথাগুলি নিতান্তই অবাস্তব বলে মনে হয়। আমাদের এখনকার বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের কার্যক্ষমতাকে শুধু উপেক্ষা করি না, তার প্রকাশকে জোর ক'রে রুদ্ধ করে দিই। সামাজিক ও আর্থিকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রমের মধ্য দিয়ে শিক্ষাদানের প্রথা বঙ্গদেশ গ্রহণ করেছে, সুতরাং ওয়ার্ধা পরিকল্পনার প্রস্তাবটি সম্পূর্ণ নূতন নয়। আমাদের রাজনৈতিক অবস্থাতে এই প্রস্তাবের একটা বিশেষ মূল্য আছে। অন্য স্বাধীন দেশে শিশুকে সকল আবিলতা থেকে বাঁচিয়ে ভবিষ্যতের উপযুক্ত নাগরিকরূপে গ'ড়ে তোলার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের শাসকেরা কার্যত সে দায়িত্ব গ্রহণ করেন নি। সুতরাং এ যাদের জীবনমরণের সমস্যা, তাদেরই তাদের সাধ্যানুযায়ী শিক্ষা-ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হবে।

কিন্তু এই রাজনৈতিক মূল্যই এই নির্দেশের একমাত্র কারণ নয়। প্রত্যেকটি শিশু যদি জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির কাজে নিজেকে নিযুক্ত করে, তবে সাত বছরে সে তার শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হবে এবং এই উপার্জন ক্ষমতাই তার উপযুক্ততার মান বলে বিবেচিত হবে। গত কয়েক বছরের পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, প্রথম দুই বছর শিশু যথেষ্ট উপার্জন করতে না পারলেও তারপর শিশু ধীরে ধীরে তার শিক্ষাব্যয় বহন করার উপযুক্ত উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। আমরা অবশ্যই মনে করি যে, আর্থিক আত্মনির্ভরতার মানটিকে

অত্যন্ত নীচু করে রাখা হয়েছে। পঁচিশ টাকা মাইনেতে একজন শিক্ষকের জীবনের নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যয়টুকুও নির্বাহ করা চলে না। আমাদের মনে হয়, খণ্ডভাবে শিক্ষাকে দেখার জন্যই ওয়ার্ধা প্রস্তাবে এই ত্রুটিটুকু রয়ে গেছে। শিশুর শিক্ষা যতই এগিয়ে চলে, আমরা লক্ষ্য করেছি যে, জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি করার ক্ষমতাও তার ততই বেড়ে চলে। সাত বছর বনিয়াদী শিক্ষার পর বিবিধ প্রকারের বিশেষ উচ্চ-শিক্ষা যখন শিশু লাভ করবে, তখন তার উপার্জনক্ষমতা আরও অনেক বেশী বেড়ে যাবে এবং তার ফলে শিক্ষাব্যবস্থার আর্থিক ভিত্তিটা আরও দৃঢ় হবে ব'লে আমাদের বিশ্বাস। উচ্চশিক্ষা আজকাল ব্যয় বাড়াতেই সাহায্য করে থাকে, এই জন্য উচ্চশিক্ষার কথাটা বোধ হয় শিক্ষার রূপান্তরে প্রথম স্থান পায় নি। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে, কর্মকেন্দ্রিক বনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনের সংগে সংগে উচ্চশিক্ষারও পূর্ণ রূপান্তর ঘটবে—তখন উচ্চশিক্ষাও যাঁরা সাধন করবেন তাঁরাই জাতীয় সম্পদ বাড়িয়ে তোলার প্রধান সহায়ক হবেন এবং এই উচ্চশিক্ষার শ্রেণীগুলিই বিদ্যালয়ের আর্থিক বলকে দৃঢ় করবে। শিক্ষাব্যবস্থার রূপান্তরের এই পরিকল্পনার বিশেষ আলোচনা করার স্থান এই প্রবন্ধে নেই. আমরা অন্য প্রবন্ধে সে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

শিক্ষাকে আর্থিকভাবে আত্মনির্ভর করে তোলার প্রস্তাবকে আমরা গান্ধী-পরিকল্পনার নূতন কথা বলে মনে ক'রে থাকি। বিদ্যালয়গুলি জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির কেন্দ্র হবে—এ কথাটা অসম্ভবও নয়, নূতনও নয়, আমাদের দেশের অদ্ভুত আর্থিক ব্যবস্থার জন্যই প্রস্তাবটা এত নূতন ঠেকে। কিন্তু আপাতসহজ মনে হ'লেও শিক্ষাকে সত্য ও অহিংসার ভিত্তির ওপর গ'ড়ে তোলার প্রস্তাবই ওয়ার্ধা-পরিকল্পনার মৌলিক এবং সবচেয়ে বৈপ্লবিক প্রস্তাব। শিক্ষার ক্ষেত্রে সত্য বলতে আমরা কোন মতবাদ, তত্ত্ব বা তথ্যকে বুঝি না, বুঝি একটি মনোবৃত্তিকে। অন্ধ-ভক্তি বিশ্বাস বা দ্বেষের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে যুক্তি দ্বারা যে কোন সমস্যার সমাধানের চেষ্টাই, সত্য প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টাই অহিংসা। সত্য ও শান্তির আদর্শকে জোর গলায় প্রচার করলেও জাতীয় ও দলগত স্বার্থকেই আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়েছি। বিগত মহাযুদ্ধের পর শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রগতিশীল জাতিরা যে রূপ দিয়েছিল, তা উগ্রজাতীয়তার পরিপোষক। এই শিক্ষা-ব্যবস্থার ফলে জাতীয়তার প্রসার হয়েছে সত্যি, কিন্তু মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ ঘটে নি। বর্তমান মহাযুদ্ধের অবতারণা এবং এর ভয়াবহতা এই শিক্ষাব্যবস্থারই পরিণাম। শিক্ষা যে মানুষের বিকাশকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে তার পরীক্ষা হয়ে গেছে—গান্ধীজীর প্রস্তাব নূতনতর এবং কঠিনতর পরীক্ষার দাবি করছে। দেশাত্মবোধ, জাতীয় শৃংখলা এবং কর্মনিষ্ঠা যদি শিক্ষা দ্বারা জাগ্রত করা যায়, তবে উদার মনুষ্যত্বও শিক্ষার মধ্য দিয়েই জাগ্রত করা সম্ভব, এইটেই ওয়ার্ধা-পরিকল্পনার মূল প্রতিপাদ্য এবং এইটেই এই পরিকল্পনার সবচেয়ে বড় কথা। আজ যুদ্ধক্লান্ত জগৎ শান্তি চাইছে। আমরা মুখে শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য চীৎকার করছি, কাজে নূতন যুদ্ধের বীজ বপন ক'রে চলেছি! ওয়ার্ধা-পরিকল্পনা নূতন জাতি গড়তে চায়, নূতনতর সভ্যতার গোড়াপত্তন করতে চায়। এর সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে নানা সন্দেহ আমরা পোষণ করছি, কিন্তু এই নূতন পরীক্ষাকে কার্যকরী করার চেষ্টা করছি না। কাজের গোড়ায় তর্ক তুলে সময় নষ্ট করা ক্ষতিকর। এই পরীক্ষা নূতন, সুতরাং কোন নজির তোলার চেষ্টা করা বৃথা, কাজের মধ্য দিয়েই এর পরিচয় মিলবে। —"শনিবারের চিঠি"

ছবির ভাষা

শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

আমরা মুখে বলে বা লিখে অপরকে যদি কিছু জানাতে চাই তবে আমাদের কতকগুলি শব্দের সাহায্য নিতে হয়। শব্দ থেকে আমরা কথা তৈরি করি। লেখার অক্ষর আমাদের উচ্চারিত শব্দেরই প্রতীক। তাই লেখার অক্ষর এক রকমের রূপ (আকার) হলেও অক্ষরের এই আকার আমরা দেখেও দেখি না। লেখার অক্ষরের রূপ গৌণ, শব্দের প্রতীকরূপে শব্দকে মনে করিয়ে দেওয়ার লেখার অক্ষরের কাজ। অক্ষর আমরা দেখি, অর্থযুক্ত কতকগুলো শব্দকে শোনাবার জন্য ছবির ভাষা লেখার ভাষার ঠিক বিপরীত। ছবিতে শোনবার কিছু নেই রূপের প্রতীকে রূপকে মনে করিয়ে দেওয়াই জনাই ছবির ভাষা। সাহিত্যের ভাষায় যেমন শব্দের গাঁথুনিতে তৈরি হয়েছে কথা, ছবিতে তেমনি রং রেখার বাঁধুনিতে তৈরি হচ্ছে রূপ। সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে তুলনা করে বলা যায় রঙে রেখায় গড়া এই রূপ, নিচ্ছে বাক্যের স্থান, শব্দের স্থানে রং, ছন্দের স্থানে রেখা। এখানে আমাদের আলোচনার বিষয়, চিত্রকর তাঁর রং-রেখায় গড়া রূপ দিয়ে এমন কি দেখান যা কথায় বা অন্য কোন উপায়ে আমরা প্রকাশ করতে পারি না। ছবির রূপ রচনার কৌশলই বা কি? অর্থাৎ ছবির উদ্দেশ্যই বা কি? এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের উপায়ই বা কি? এই দুই প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য প্রথম আমাদের জানতে হবে রঙে রেখায় গড়া ছবির ভাষা। ভাষা না বুঝে ভাষায় প্রকাশিত বস্তুকে বুঝব কি করে? কারণ ভাষাকে অবলম্বন করেই আমরা আমাদের উদ্দেশ্য প্রকাশ করছি। ভাষার সঙ্গে ভাব যে পর্যন্ত না যুক্ত হচ্ছে সে পর্যন্ত অপরের মনের ভাব আমরা জানতে পারি না। তাই ছবিতে রঙে রেখায় গড়া রূপের ভাষায় কি প্রকাশিত হয় জানবার চেষ্টা মাত্রেই আমাদের রূপের ভাষার সঙ্গে পরিচয় দরকার।

আমাদের চারপাশে যা কিছু আমরা চোখে দেখছি—সব কিছুই কোন না কোন রূপের (appearance) অভিজ্ঞতা আমাদের দিচ্ছে; নানা নামে এইসব আকার (গাছপালা, বাড়িঘর মানুষ ইত্যাদি)কে আমরা চিনে রেখেছি। ছবিতে রঙে রেখায় যে রূপ তৈরি হচ্ছে সেই রূপের সঙ্গে আমাদের এইসব পরিচিত রূপের কোন মিল আছে, না, আমাদের চেনা রূপের সঙ্গে প্রভেদ। অর্থাৎ ছবিতে, যে রূপ আমরা দেখি সেই রূপ বস্তুরূপের থেকে আলাদা বা বস্তুরূপেরই প্রতিধ্বনি। এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে চিত্রকরের রচিত রূপ আর প্রকৃতির রূপের সঙ্গে তুলনা করে দেখলে।

প্রথম প্রকৃতির রূপ, (Natural form) বলতে ঠিক আমরা কি দেখি একটু খুঁটিয়ে দেখা যাক। চোখে আমরা যা কিছু দেখি সকলরই কোন না কোন রকমের আকার রয়েছে। এই সব আকার, এই সব রূপের জগতের সঙ্গে আমাদের চাক্ষুষ পরিচয় আলোর সাহায্যে। আলো নেই, চোখের সামনে রূপও নেই। রূপ আমরা সর্বদা দেখছি আলোর রঙে রঙীন। রং নেই এমন কোন বস্তুর রূপ আমরা ধারণা করতে পারি না। এইভাবে রঙের সঙ্গে রূপ এমনি ভাবে জড়িয়ে আছে যে, কোনটা রূপ, কোনটা রং বলা শক্ত। আলোর গতি আমরা দেখছি রঙে এবং এই আলোর রংকেই, নানা নামের চিহ্ন দিয়ে বলছি রূপ। আর যদি সত্যই চোখে দেখা ছাড়া, রূপের আমাদের অন্য কোন রকমের অভিজ্ঞতা না থাকত, কেবল চোখে দেখার উপরই দৃশ্যমান জগতের অভিজ্ঞতা নির্ভর করত, তবে আলোর গতিতে রঙীন কতকগুলি আকার ছাড়া বস্তুরূপের আর কোনই অভিজ্ঞতা আমাদের থাকত না। কিন্তু রূপের অভিজ্ঞতা আমাদের আর এক রকমে হয়। হাতের ছোঁয়ায় বা শরীরের স্পর্শে আমরা বুঝতে পারি রূপের (appearance) ঘনত্ব (dimension) ও গতি (movement), কাঠিন্য, কোমলতা ইত্যাদি স্পর্শের দ্বারা আমরা বুঝি। চোখে দেখার অভিজ্ঞতাকে বলছি রূপ, হাতে-ছোঁয়ার অভিজ্ঞতাকে বলছি গড়ন (form), রূপের গতি যেমন রঙিন আলো।

গড়নের গতি তার ঘনত্ব (Dimension)

একটা উদাহরণ দিলে কথাটা আরও পরিষ্কার হবে। চোখে দেখছি রঙীন আকার, এই আকারের একটিকে বলছি ফুল, একটাকে বলছি পাতা, আলোরই রঙীন ছায়াকে



রেনোয়া — "থিয়েটারের বক্স"

একবার বলছি ফুল, একবার বলছি পাতা, রংএর নির্দিষ্ট আকার ছাড়া আর কিছুই ফুলের বা পাতার অন্য ধারণা আমাদের হচ্ছে না। ঐ ফুল ঐ পাতাই হাতে ধরে বুঝছি অন্য রকম, হাতে ধরে ফুলের চারদিকের গতি বুঝছি এবং বলছি ফুলটা গোল, পাতাটা মোটা না পাতলা, নরম না শক্ত! হাতের ছোঁয়ায় যা বুঝছি এই অভিজ্ঞতা বলব গড়নের (form) অভিজ্ঞতা। রূপ মাত্রেই যেমন রয়েছে রং, তেমনি গড়ন (form) মাত্রেই রয়েছে ঘনত্ব। রূপ বললেই যেমন তার সঙ্গে আসছে রং, রঙের সঙ্গে আলো, তেমনি গড়ন মাত্রেরই রয়েছে ঘনত্ব, ঘনত্বের সঙ্গে আসছে গতি (movement) ও গঠন (texture)। এখন আমরা নিশ্চয় করে বলতে পারি যে, নিছক রূপ বলে কিছু নেই, রূপ মাত্রেরই কতকগুলি ধর্ম বা গুণ (Quality) রয়েছে, এই গুণ একত্রিত হয়ে নানা আকারে আমাদের চোখের সামনে জাগছে—রূপের ইঙ্গিতে আমরা গুণের সন্ধান পাচ্ছি। রূপই হোক কি গড়ন হোক, আলোই হোক কি রং হোক, কিছুরই অভিজ্ঞতা আমাদের হতে পারত না যদি বস্তুরূপের পটভূমি আকাশ (space) না থাকত। আকাশের পটভূমিতে যেমন আমরা নানা রূপ দেখছি বলেই space রূপের ধারণার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে। একদিকে যেমন আমরা আকাশের (space) সাহায্যে বস্তুরূপকে পাই অন্যদিকে বস্তুরূপের অস্তিত্বে আকাশের ধারণা করি; কাজেই আকাশ ছাড়া বস্তুরূপেরও যেমন ধারণা হয় না, তেমনি আকাশও বস্তুরূপ ছাড়া আমরা ধারণা করি না। এইভাবে রূপেরই বিশেষ গুণরূপে আকাশ দেখব। আমরা দেখছি রূপ কেবলমাত্র রূপ নয়। সর্বদাই রূপ কতকগুলি গুণকে প্রকাশ করছে। মানুষ মাত্রেরই মনে রূপের সঙ্গে জড়িত গুণের ধারণা রয়েছে। কোথাও কম কোথাও বেশি।

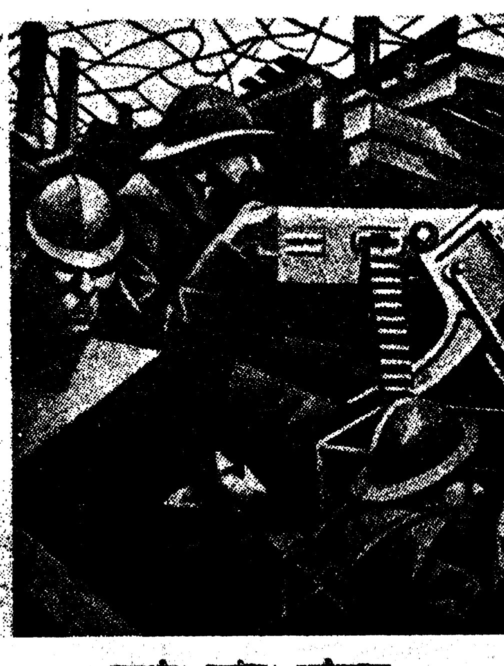


ফরাসী ইমপ্রেসনিস্ট শিল্পী মোনে (Monet) অঙ্কিত

চিত্রকর রং ও রেখায় যে রূপ প্রকাশ করছেন সেই রূপের সঙ্গে গুণ যুক্ত হয়ে আছে। চিত্রকর গুণ বাদ দিয়ে কেবলই রূপ দেখাতে পারেন না। আর রূপ ছাড়াও কোন গুণ তিনি প্রকাশ করতে পারেন না। কাজেই চিত্রকর রঙে রেখায় যে রূপ গড়ছেন, তা চোখে দেখা, হাতে ছোঁয়া, সংক্ষেপে দৃশ্য রূপের জগতের যে ধারণা সকল মানুষের মনে রয়েছে, ছবির ভাষায় তারই প্রকাশ। কিন্তু রূপের ধারণার সঙ্গে জড়িয়ে রঙের ধারণা যে আসতে বাধ্য সে কথা পূর্বেই আমরা বুঝেছি। এইবার



য়ুরোপীয়। অনুকারক



য়ুরোপীয়। ছান্দসিক: শ্রেণীগতছন্দে



জেরার্ড অঙ্কিত—ইরোস এবং সাইকি

আমরা চিত্রকরের রূপ গঠনের মূল প্রেরণা কোথা থেকে আসছে রূপ ও গঠনের মধ্যে কোন্ দিকের অভিজ্ঞতা চিত্রকর রং-রেখায় গড়া রূপের দ্বারা প্রকাশ করতে চাইছে দেখলে দেখা যাবে, আলো তথা রংএর উদ্দীপনা, অর্থাৎ রূপের রঙের গুণ প্রকাশ করাই চিত্রকরের উদ্দেশ্য। আলোর রং ধরতে গিয়ে গঠন রূপের আশ্রয় নিতে হচ্ছে, আলো হোক কিম্বা রং হোক এমনি কোরে রং প্রকাশ করবার চেষ্টায় রূপ ও রূপের নানা গুণ (quality) চিত্রকর রূপের ভাষায় প্রকাশ করতে চাইছেন। আমাদের চিত্রকরের রংএ রেখায় গড়া রূপ যে কেবল মাত্র আমাদের পরিচিত রূপের অনুসরণে তৈরি হচ্ছে না, এখন এ কথা নিশ্চয় করে আমরা বলতে পারি। সকল চিত্রকরই যদি এক উদ্দেশ্য নিয়ে, একই ভাষায় (রং ও রেখা) দৃশ্য রূপ রচনা করছেন তবে সকল ছবি কি দেখতে এক রকম? আর রঙের গুণ প্রকাশই যদি চিত্রকরের উদ্দেশ্য তবে রেখার প্রয়োজন কি? আমরা রেখার দ্বারা নির্দিষ্ট করা কোন রঙীন আকার ত দেখি না। এখানে রূপের সব গুণ যদি মনে করি তবে দেখব গড়নের অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে—গড়নের অভিজ্ঞতা অর্থে স্পর্শের অভিজ্ঞতা, স্পর্শের দ্বারা গড়নের যে অভিজ্ঞতা আমাদের জাগছে, সেই অভিজ্ঞতায় কয়েক রকমের গতির পরিচয় পাই। এই গতিকে দেখাবার জন্য ব্যবহার হয়েছে রেখা। রেখা গঠনের গতিকে রূপ দিচ্ছে বলে, রেখা ছন্দের স্থান অধিকার করছে একথা পূর্বেই বলেছি। এইবার উত্তর দেবার চেষ্টা করা যাক, কেন একই ভাষা সত্ত্বেও সব ছবি এক রকমের দেখতে নয়।

এপর্যন্ত যা আমরা বলে আসছি ছবির ভাষা রংএ রেখায় প্রকাশিত, কিন্তু সকল ক্ষেত্রে, রঙ ও রেখার মূল্য (value) এক নয়। কারণ চিত্রকরের দৃষ্টি যেমন আলোর থেকে রঙীন জগৎ দেখছে এবং গড়নের (form) কথা মনে করছে। আর এক ক্ষেত্রে চিত্রকর স্পর্শের দ্বারা গঠন ও গঠনের গতিকে চিনছেন এবং গড়নের বা গতির অভিজ্ঞতাকে রঙের সঙ্গে যুক্ত করে দেখছেন। অন্য ভাবে দেখলে রঙ ও গতি দেখছেন। আলোর গতি অনুসরণে রঙীন রূপ দেখছে যে চিত্রকর, সেখানে প্রধান স্থান নিয়েছে রং, যেখানে গড়নের গতিকে অনুসরণ করে রঙের জগতে এসেছে চিত্রকর, সেখানে ছবির ভাষায় প্রাধান্য দিয়েছে রেখা। একজন আলোর গতিকে অনুসরণ করে গঠনে পেঁছচ্ছে। অন্যজন গঠনের গতি থেকে রঙের জগতে আসছে। চিত্রকরের ভাষার ব্যবহারের এই দুই মূল উদ্দেশ্য। এর প্রথম, আলোর গতি প্রকাশের উদ্দেশ্যে যে চিত্র তার নাম আমরা দিতে পারি বাস্তব রীতি (Realistic Tradition) দ্বিতীয়—যেখানে গঠনের গতিকে অনুসরণ করে রঙ প্রকাশিত হচ্ছে তার নাম দিতে পারি, মণ্ডন রীতি (Decorative Tradition)। ছবির ভাষা ব্যবহারের দুই মূল রীতির পরিচয় এখানে আমি দিলাম। এই দুই রীতির সংযোগে চিত্রের নানা ভঙ্গী ও শ্রেণী বিভাগ করা হয়। এর পরে আমরা সেই আলোচনা করবার চেষ্টা করব।

সাহিত্য সংবাদ

মহাকবি মাইকেল জন্মোৎসব

যশোহর বনগ্রামের শ্রীমধু-স্মৃতি-সমিতির উদ্যোগে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ১২১তম জন্মোৎসব বনগ্রাম টাউন হলে বিগত ১২ই মাঘ মহাকবির জন্মদিনে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সভাপতিত্ব করেন।

শিল্পী শ্রীগুরুপদ সান্যাল কর্তৃক বিশেষভাবে অঙ্কিত মহাকবির প্রতিকৃতিকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করে মঞ্চোপরি স্থাপন করা হয়। সাহিত্যিক শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এক মনোজ্ঞ ভাষণে সভার উদ্বোধন করেন। সভাপতিকে মাল্যভূষিত করা হয়। সভাপতি মহাকবি মাইকেলের প্রতিকৃতি এবং কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথের মৃন্ময় মূর্তিতে মাল্যদান করেন। সম্পাদক শ্রীগোপালচন্দ্র সাধু সাহিত্যবিনোদ প্রাপ্ত বাণী পাঠ করেন। অন্যতম সম্পাদক শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বার্ষিক কার্যবিবরণী ও হিসাব পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীমধুসূদন সাহিত্যের বিভিন্ন দিক আলোচনা করে লেখা পড়েন শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় কাব্যরত্নাকর, শ্রীমধুসূদন বসু, শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅমলকুমার পাল, শ্রীসন্তোষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও কবি শ্রীকেশবলাল দাস। মহাকবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে বক্তৃতা করেন, শ্রীঅজিতকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, মহম্মদ এস্‌হাক, শ্রীসঞ্জীবকুমার মুখোপাধ্যায়। শ্রীমধু-স্মৃতি-সমিতির চিত্র প্রতিযোগিতায় শ্রীযুত মদনমোহন দত্ত (মেদিনীপুর) এবং প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় শ্রীযুত মধুসূদন বসু (যশোহর) প্রথম স্থান অধিকার করায় তাঁদের পুরস্কৃত করা হয়। সভাপতি মহাশয় তাঁর মনোজ্ঞ ভাষণে মহাকবির কাব্যের বিভিন্ন দিক ও কবিত্ব শক্তি বিশ্লেষণ করে, তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। মাইকেলের যোগ্য স্মৃতিরক্ষা কার্যে সমিতির সাধু প্রচেষ্টায় তিনি আনন্দজ্ঞাপন করেন। শ্রীপূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ কবিভূষণ কর্তৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর শ্রীবিষ্ণুপদ সান্যাল সামাপ্তিক সঙ্গীত করেন।

"এই আমাদের জলা জমি, জঙ্গল, এই কোমল মৃত্তিকার মধ্যে কর্মানুষ্ঠানতৎপর প্রবল সভ্যতার স্রোত আসিয়া আমাদের কাননবেষ্টিত প্রচ্ছন্ন নিভৃত ক্ষুদ্র কুটীরগুলি কেবল ভাঙিয়া দিতেছে মাত্র। আকাঙ্ক্ষা আনিয়া দিতেছে, কিন্তু কোন উপায় নাই,—কাজ বাড়াইয়া দিতেছে, কিন্তু শরীর নাই—অসন্তোষ আনিয়া দিয়েছে, কিন্তু উদাম নাই। আমাদের যে স্বস্তি ছিল, তাহা ভাসাইয়া দিতেছে—তাহার পরিবর্তে যে সুখের মরীচিকা রচনা করিতেছে, তাহাও আমাদের দুষ্প্রাপ্য। কাজ করিয়া প্রকৃত সিদ্ধি নাই, কেবল অহর্নিশ শ্রান্তিই সার। আমার মনে হয়, তার চেয়ে আমরা ছিলাম ভাল—আমাদের সেই স্নিগ্ধ কাননচ্ছায়ায়, পল্লবের মর্মর শব্দে, নদীর কলস্বরে, সুখের কুটীরে স্নেহশীল পিতামাতা, পতিপ্রাণা স্ত্রী, স্বজনবৎসল পুত্রকন্যা, পরিবারপ্রতিম প্রতিবেশীদিগকে লইয়া যে নিরুপদ্রব নীড়টুক রচনা করিয়াছিলাম, সে ছিলাম ভাল। য়ুরোপীয় বিরাট সভ্যতার পাষাণ উপকরণসকল আমরা কোথায় পাইব!"

—রবীন্দ্রনাথ

"দেশ"-এর নিয়মাবলী

বার্ষিক মূল্য—১৩, যাণ্মাসিক—৬৷৷০

বিজ্ঞাপনের নিয়ম

"দেশ" পত্রিকার বিজ্ঞাপনের হার সাধারণত নিম্নলিখিতরূপঃ—

সাধারণ পৃষ্ঠা—এক বৎসরের চুক্তিতে

১০০" ও ঊর্ধ্ব ... ৩, প্রতি ইঞ্চি প্রতি বার

৫০"—৯৯" ... ৩৷৷০ " " " "

সাময়িক বিজ্ঞাপন

৪, টাকা প্রতি ইঞ্চি প্রতি বার

বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে অন্যান্য বিবরণ বিজ্ঞাপন বিভাগ হইতে জানা যাইবে।

সম্পাদক—"দেশ"

১নং বর্মণ স্ট্রীট, কলিকাতা।

বাংলা ছবির হাল খারাপ হ'য়ে আসচে যেন! নতুন বছরে এ পর্যন্ত মুক্তিলাভ ক'রেচে মাত্র একখানি ছবি। এ ছাড়া গত বছরের দরুণ তৈরী হ'য়ে আছে খানপাঁচেক আর তৈরি হ'চ্ছে আরও খানপাঁচেক। বাঙলা ছবির সংখ্যা যে ক্রমশ হ্রাস হ'চ্ছে এ থেকে একটা মোটামুটি অনুমান ক'রে নেওয়া শক্ত নয়। তার ওপর কতকগুলো নতুন আশঙ্কাও দেখা দিচ্ছে। প্রথম হ'চ্ছে সরকারী লাইসেন্সদাতারা প্রাদেশিক ভাষার চেয়ে হিন্দুস্থানী ভাষায় তোলার ছবির জন্য বেশি লাইসেন্স দিচ্ছে। যার ফলে



যমুনা প্রডাকসন্সের 'রতন' চিত্রে স্বর্ণলতা।

পাঞ্জাবী ভাষায় তোলা ছবি তো বন্ধই হ'য়ে গেছে। তারপর, প্রযোজকরাও দেখছে যে, প্রাদেশিক ভাষায় তোলা ছবির চেয়ে হিন্দুস্থানী ছবি পয়সা পাইয়ে দেয় অনেক বেশি। আর তৃতীয়ত, বাঙলার বাইরের প্রযোজকরা এখানে এসে ছবি তুলতে আরম্ভ করায় বাঙলা ছবি তোলায় ব্যাঘাত ঘটার সম্ভাবনা। বাইরের ওরা তুলবে হিন্দুস্থানী ছবি; সুতরাং খরচের কোন পরোয়াই ক'রবে না; মোটা টাকার লোভ দেখিয়ে শিল্পী ও কলাকুশলীদের মধ্যে বড় বড়দের নিযুক্ত করা খুবই সহজ হবে ওদের পক্ষে। ফলে বাঙলা ছবি তুলতে গেলে তার খরচও যাবে বেড়ে হুহু ক'রে, শেষে হয়তো এমনি অঙ্কে গিয়ে পৌঁছবে, যা কোন প্রাদেশিক ছবির পক্ষে তোলা সম্ভব হবে না। তখন বাঙলা ছবি তোলার কথা প্রযোজকদের ভুলেই থাকতে হবে। এ অবস্থায় যাতে না পড়তে হয়, অর্থাৎ বাঙলা ছবি যাতে সত্যিই উচ্ছেদ না হ'য়ে যায়, এখন থেকে সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া দরকার। এখন এতটা আশঙ্কিত হবার কারণ হয়তো নেই, কিন্তু একটু আভাষ পেলেই তো সতর্ক হওয়া ভালো! হিন্দুস্থানী ছবিরও যেমন দরকার, তেমনি

রঙ্গ জগৎ

প্রাদেশিক ছবিগুলিরও একটা স্বতন্ত্র দাম যার জন্যে কিছুতেই তার উচ্ছেদসাধন হ'তে দেওয়া উচিত নয়—সে পাঞ্জাবীই হোক্ আর তামিল, তেলেগু, মারাঠি, বাঙলাই হোক্।

নূতন ও আগামী আকর্ষণ

৯ই তারিখের নতুন হ'চ্ছে দীপক ও পার্ক শো হাউসে ইণ্ডিয়ান আর্ট পিকচার্সের 'বিজয়লক্ষ্মী'—যার প্রধান ভূমিকায় আছেন শোভনা সমর্থ, মতিলাল, ডেভিড, গোপ ও যশোধরা কাটজু।

এই সপ্তাহের আর অপর আকর্ষণ গণেশ টকীতে 'বরাত'—এরও প্রধান ভূমিকায় শোভনা সমর্থ।

*

বিবিধ

সাধনা বসু যে ছবিখানি তোলার লাইসেন্স পেয়েছেন, তার নাম ঠিক হ'য়েছে 'অজন্তা'—অজন্তাকেই পশ্চাদপটে রেখে কাহিনীটি তৈরি হবে; তোলা আরম্ভ হ'তে মার্চের মাঝামাঝি।

*

শান্তারামের 'পর্বত পে অপ্‌না ডেরা'-তে যে নতুন ধরণের আসবাব ব্যবহার করা হয়, তা তৈরি ক'রতে খরচ পড়ে চল্লিশ হাজার। ছবি দেখে ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ আসবাবটা নিজের ব্যবহারের জন্য কিনে নিয়েছেন।

*

পাঞ্চোলীর 'শিরী ফরহাদ' তুলতে মোট খরচ পনের লাখ; এ পর্যন্ত দাম উঠেছে চব্বিশ লাখ, আরও চড়বার সম্ভাবনা আছে।

*

অশোককুমারের চারখানি গাড়ি থাকলেও ফিল্মিস্তানের কর্ণধার ভগিনীপতি শশধর মুখার্জির একখানিও নেই।

*

'ওমর-খৈয়াম'এর জন্যে সোরাব মোদী পূর্বে দু'টো চিত্রকাহিনী সংগ্রহ ক'রেছিলেন, তাতেও খুশি না হ'য়ে ডাঃ ভেদওয়াড়ের একটা কাহিনী ৭০০০, টাকায় কিনেছেন। এই তিনটের সাহায্যে পণ্ডিত সুদর্শন চিত্রনাট্যটি রচনা ক'রবেন।

*

'উদয়ের পথ'-এর কাহিনী অবলম্বনে



লক্ষ্মী প্রডাকসন্সের 'ভাগ্যলক্ষ্মী' চিত্রে শান্তা আপ্তে।

স্টালিনগ্রাদের অমর বীরত্ব কাহিনী অবলম্বনে তোলা এশিয়া ফিল্মসের 'স্টালিনগ্রাদ' ছবিখানি গত সপ্তাহ থেকে শ্রী-তে দেখানো হ'চ্ছে। আর কোন কারণে না হোক্, রুশীয় ছবির সুন্দর নিদর্শন হিসেবে ছবিখানি দ্রষ্টব্য।

বম্বেতে কে একজন একখানা ছবি তুল্‌ছে ব'লে শোনা গেল।

*

পৃথ্বী থিয়েটার নাম দিয়ে অভিনেতা পৃথ্বিরাজ একটি গণ-নাট্য সম্প্রদায় খুলেছে বম্বেতে।

*

কারদার স্টুডিওতে আবার গোলমালের খবর পাওয়া যাচ্ছে। এবারে প্রায় জন পঞ্চাশ কর্মী স্টুডিও থেকে বেরিয়ে গেছে।

*

মাদ্রাজের স্বর্ণকারেরা 'কান্নাগী' নামক একখানি ছবির বিরুদ্ধে এই নালিশ রুজু করে যে, ওতে ওদের ইষ্টদেব বিশ্বকর্মাকে এমনভাবে দেখানো হয়েছে যাতে সমগ্র স্বর্ণকার জাতিই অত্যন্ত নীচ এবং অসাধু প্রতিপন্ন হয়। মামলাটি ডিসমিস করতে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট মন্তব্য করেন যে, স্বর্ণকারদের মানহানি করবার উদ্দেশ্য প্রযোজকের ছিল না, তাছাড়া হাসিঠাট্টার মধ্যে দিয়ে যা দেখানো হ'য়েছে তার ওপর অত গুরুত্ব দেওয়া যায় না এবং 'শিলাপাদগ্রাম' যে সাহিত্যরত্ন থেকে এর কাহিনী অবলম্বন করা হয়েছে, ছবিতে স্বর্ণকারদের তার চেয়ে বাড়িয়ে কিছু দেখানো হয় নি। ভারতে এ ধরণের মামলা এই প্রথম।

*

ব্রিটেনের চলচ্চিত্র কলাকুশলীদের নির্ধারিত বেতন হচ্ছে ঃ নির্বাক আলোক-চিত্রশিল্পী ও শব্দগ্রহী প্রথম ছ'মাস সপ্তাহে ৮ পাঃ, পরের ১২ মাস সাড়ে ১০ পাউন্ড এবং তারপর সপ্তায় ১৩ পাঃ। সবাক চিত্রগ্রহী প্রথম ছ মাস সাড়ে ১০ পাঃ, পরের ১২ মাস ১৩ পাঃ আর পর থেকে ১৫ পাঃ সপ্তাহে। প্রধান সম্পাদক সপ্তায় ১৩ পাঃ আর সহকারী ১০ পাঃ। অপারেটর ৬ পাঃ আর তার সহকারী ৪ পাঃ।

*

কানাডার ১২৬৯ চিত্রগৃহের ১৯৪৩-৪৪-এর আমদানী হচ্ছে পোণে ষোল কোটি টাকা।

*

লড়াই শেষ হ'লে ২৫০০০ পুরানো প্রদর্শন যন্ত্র বাজারে ছড়িয়ে পড়বে যা এখন বিভিন্ন যুদ্ধপ্রান্তে ব্যবহৃত হ'চ্ছে।

*

শান্তারাম পরিচালিত 'ডঃ কোটনীশ'এর ভূমিকালিপি এ পর্য্যন্ত যা ঠিক হ'য়েছে তাতে আছেনঃ শান্তারাম, জয়শ্রী, দেওয়ান শারার, বাবুরাও পেন্ডারকর, উল্লাস, সালভী, বিনায়ক, অধ্যাপক হুবলীকর ও প্রতিমা দেবী।

*

প্রভাত ফিল্মের 'আলফ্ লয়লা' ছবিখানি রঙীন চিত্র হবে।

*

'ক্লিওপেট্রা' তোলা নিয়ে বম্বের প্রযোজক-দের মধ্যে বেশ প্রতিযোগিতা লেগে গিয়েছে। এ পর্য্যন্ত পাঁচজন,—আশিফ, সৌকত হোসেন, জয়ন্ত দেশাই, জহুর রাজা ও অপর একজন এই কাহিনীটির চিত্ররূপ দানে সংকল্প করেছেন।

*

খ্যাতনামা গান ও সংলাপ লেখক পণ্ডিত সন্তোষী পরিচালকের কার্যে ব্রতী হয়েছেন। তাঁর প্রথম ছবি প্রভাত ফিল্মের 'হাম এক হৈ'।

* * *

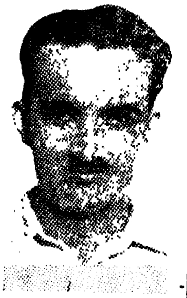
বাবুরাও প্যাটেল শোনা গেল, কলকাতায় অবস্থানকালে তার পরবর্তী ছবি 'মাতোয়ালী মীরা'র সুরযোজনা করার জন্য কমল দাশ-গুপ্তের কাছে হাজির হন এবং চুক্তি করার জন্য 'ব্ল্যাংক চেক' দেন; কমল দাশগুপ্ত এই ব'লে সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান ক'রেছেন যে, মীরার প্রায় সমস্ত ভজনগুলিরই সুর তিনি ইতিমধ্যেই দিয়েছেন এবং সেগুলি গেয়েছেন বম্বের সবচেয়ে প্রিয় গায়িকা যুথিকা রায়; সুতরাং নতুন ক'রে ঢেলে সাজা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এ ছাড়া বাবুরাও প্যাটেল সম্পর্কে আর একটা কথা শোনা গেল—নিউ থিয়েটার্সকে বরাবর গাল দিয়ে এলেও এবারে কলকাতায় একমাত্র সাংবাদিক বন্ধুর কাছে স্বীকার ক'রেছেন যে, ভারতে প্রকৃতপক্ষে ছবি শুধু নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওই তোলে।

ক্রিকেট

আন্তঃপ্রাদেশিক রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা শেষ হইতে চলিয়াছে। বোম্বাই, উত্তর ভারত, হোলকার ও মাদ্রাজ এই চারিটি প্রাদেশিক দল বর্তমানে সেমি ফাইন্যাল খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে। আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে বোম্বাইতে উত্তর ভারত বনাম বোম্বাই দলের খেলা ও আগামী ১৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে মাদ্রাজে হোলকার বনাম মাদ্রাজ দলের খেলা আরম্ভ হইবে। বিভিন্ন দলের শক্তি বিচার করিয়া এইটুকু সহজেই বলা যায় যে, ফাইন্যালে বোম্বাই ও হোলকার দল উন্নীত হইবে।

বোম্বাই বনাম বরোদা

রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার অবশিষ্ট সেমি-ফাইন্যাল খেলায় বোম্বাই দল ৭ উইকেটে বরোদা দলকে পরাজিত করিয়াছে। এই খেলায় উভয় দলের খেলোয়াড়গণ, বিশেষ করিয়া বিজয় মার্চেণ্ট ও বিজয় হাজারীর ব্যাটিং নৈপুণ্য দেখিবার আশা সকলেই করিয়াছিলেন, কিন্তু সকলকেই হতাশ হইতে হইয়াছে। তবে সেই হতাশায় সান্ত্বনা দিয়াছে, তরুণ খেলোয়াড় আর এস মোদী ও গুলমহম্মদ। বিশেষ করিয়া




হাজারী   আর এস মোদী

আর এস মোদীর ব্যাটিংয়ের অপূর্ব দৃঢ়তা সত্যই প্রশংসনীয়। দীর্ঘ আট ঘণ্টা একা ব্যাটিং করিয়া শেষ পর্যন্ত ২৪৫ রাণ করিয়া নট আউট থাকেন। আর এস মোদী এইবার লইয়া রণজি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় পাঁচবার শতাধিক রাণ ও দুইবার দুইশতাধিক রাণ করিবার গৌরব অর্জন করিলেন। আমরা এই তরুণ খেলোয়াড়ের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

খেলার ফলাফল ঃ—

বোম্বাই—প্রথম ইনিংস ঃ—৪৬৮ রাণ (আর এস মোদী নট আউট ২৪৫ রাণ, আর এস কুপার ৬২, পালওঙ্কার ৭৮, হাজারী ১৪২ রাণে ৪টি ও গুলমহম্মদ ৮৫ রাণে ৩টি উইকেট পান)।

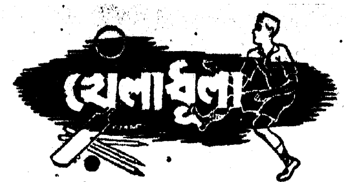
বরোদা—প্রথম ইনিংস ঃ—১৫১ রাণ (আর নিম্বলকার ৩৭, এইচ অধিকারী ২১, ফাদকার ৪৩ রাণে ৪টি উইকেট)।

বরোদা—দ্বিতীয় ইনিংস ঃ—৩৯০ রাণ (গুলমহম্মদ ১০০, আর নিম্বলকার ৯৬, ভি এন রায়জী ৪৩, মীরচাঁদনী নট আউট ৪৭, ফাদকার ৭৩ রাণে ২টি, তারাপোর ১০৮ রাণে ৪টি, আনোয়ার হোসেন ৭৭ রাণে ২টি উইকেট পান)।

বোম্বাই—দ্বিতীয় ইনিংস ঃ—৩ উইঃ ৭৪ (আর এস মোদী নট আউট ৩১)।

সিংহল ভ্রমণ

ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড ভারতীয় ক্রিকেট দলের সিংহল ভ্রমণ সমর্থন করিয়াছেন। দীর্ঘদিন ধরিয়া এই বিষয়টি লইয়া যেরূপ আলাপ আলোচনা চলিয়াছিল, তাহাতে আশঙ্কা হইয়াছিল, শেষ পর্যন্ত ভ্রমণ



ব্যবস্থা বাতিল হইয়া যাইবে। ভারতীয় ক্রিকেট দল মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সিংহলে যাইবে ও এপ্রিল মাসের মধ্যেই ফিরিয়া আসিবে। ভ্রমণ ব্যবস্থা দীর্ঘদিনের জন্য হইবে না। তবে কণ্ট্রোল বোর্ডের মনোনীত খেলোয়াড় নির্বাচনমণ্ডলী এই ভ্রমণের জন্য যে ১৩ জন ভারতীয় খেলোয়াড়কে মনোনীত করিয়াছেন, তাহার তালিকা দেখিয়া সকলে সন্তুষ্ট হইবেন বলিয়া মনে হয় না। বাঙলার খেলোয়াড় পার্থসারথী কিরূপে নিখিল ভারত দলে স্থান পাইলেন, ইহা আমাদের বোধগম্য হয় না। কি উইকেট রক্ষায়, কি ব্যাটিংয়ে তিনি মাকা, মন্ত্রী, এমন কি বর্তমানের হিন্দেলকার অপেক্ষা বহুগুণে নিকৃষ্ট। এইরূপ একজন খেলোয়াড়কে নির্বাচন করিয়া ইহাই নির্বাচনমণ্ডলী প্রমাণিত করিলেন যে, তাঁহাদের উপর বাহিরের লোকের প্রভাব ছিল। ইহা ছাড়া আমীর ইলাহির মত একজন বিচক্ষণ, অভিজ্ঞ বোলারকে দলে স্থান না দিবার কোনই কারণ থাকিতে পারে না। বৈদেশিক বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ যাঁহারা বর্তমানে ভারতে আছেন, তাঁহারা একবাক্যে আমীর ইলাহিকে বর্তমান ভারতের শ্রেষ্ঠ স্পিন বোলার আখ্যা দিয়াছেন। অথচ সেই খেলোয়াড় দল হইতে বাদ পড়িল। যে সকল ভারতীয় খেলোয়াড়দের লইয়া ভারতীয় সিংহল ভ্রমণকারী দল গঠন করা হইয়াছে, সেই দল সিংহলের সর্বত্র সাফল্যলাভ করিবে, সে বিষয় আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে উপযুক্ত নির্বাচন হইল না, ইহাই আমাদের দুঃখ। নিম্নে দলের নির্বাচিত খেলোয়াড়গণের নাম প্রদত্ত হইল ঃ—

বিজয় মার্চেণ্ট (বোম্বাই) অধিনায়ক, টি ভি পার্থসারথী (বাঙলা), এস ব্যানার্জী (বিহার), সি আর রঙ্গচারী (মাদ্রাজ), সি এস নাইডু (হোলকার), সি টি সারভাতে (হোলকার), কে সি ইব্রাহিম (বোম্বাই), বিনু মানকড় (গুজরাট), এল অমরনাথ (দক্ষিণ পাঞ্জাব), বিজয় হাজারী (বরোদা), মুস্তাক আলী (হোলকার), আর এস মোদী (বোম্বাই), জি কিষেণচাঁদ (পশ্চিম ভারত রাজ্য দল)।

অতিরিক্ত ঃ—আর নিম্বলকার (বরোদা), আমীর ইলাহি (বরোদা), গুলমহম্মদ (বরোদা), রাম সিং (মাদ্রাজ) ও এন চৌধুরী (বাঙলা)।

যদি পার্থসারথী যাইতে না পারেন, আর নিম্বলকার যাইবেন। সি এস্ নাইডু অথবা সারভাতে ইঁহাদের মধ্যে কেহ যাইতে না পারিলে আমীর ইলাহি যাইবেন। এস ব্যানার্জী ও রঙ্গচারী ইঁহাদের মধ্যে কাহারও যাইবার অসুবিধা থাকিলে এন চৌধুরী দলে স্থান পাইবেন। রাম সিং ও গুলমহম্মদকে অতিরিক্ত খেলোয়াড় হিসাবে রাখা হইয়াছে—যদি নির্বাচিত অপর কোন খেলোয়াড় যাইতে না পারেন।

এইচ এন কণ্ট্রাক্টর এই দলের ম্যানেজার নির্বাচিত হইয়াছেন। যদি তাঁহার যাইবার কোন অসুবিধা হয়, বোর্ডের সম্পাদক মিঃ রঙ্গরাও ম্যানেজার হিসাবে দলের সহিত যাইবেন।

মুষ্টিযুদ্ধ

লাহোরের নিখিল ভারত মুষ্টিযুদ্ধ শেষ হইয়াছে। এই প্রতিযোগিতায় আমেরিকার মুষ্টিযোদ্ধাগণ প্রায় সকল বিষয় সাফল্যলাভ করিয়াছেন। বাঙলার মুষ্টিযোদ্ধাগণের মধ্যে বি লাল ব্যাণ্টম ওয়েটে চ্যাম্পিয়ান হইয়াছেন। গত বৎসরও তিনি এই বিষয় সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন। নিখিল ভারত মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতায় তিনি যে তাঁহার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছেন, ইহার জন্য আমরা আনন্দিত হইয়াছি।

বেঙ্গলী বক্সিং এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ বাঙালী মুষ্টিযোদ্ধাদের দ্রুত উন্নতির পথে চালিত করিবার জন্য যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কলিকাতা ও তৎসংলগ্ন বিভিন্ন জেলায় যে সকল কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার উদীয়মান মুষ্টিযোদ্ধাগণ যাহাতে নীরবে বসিয়া না থাকেন, তাহার জন্য একটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই প্রতিযোগিতার নির্বাচিত মুষ্টিযোদ্ধাগণকে যেরূপভাবে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহাতে অনুষ্ঠানটি বেশ দর্শনযোগ্য হইবে বলিয়াই মনে হয়। পাবনা, রাজসাহী, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, মালদা প্রভৃতি স্থানেও ইঁহাদের কেন্দ্র শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইঁহাদের প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হউক, বাঙালীর "ভীরু" দুর্নাম চিরকালের জন্য বিদূরিত হউক, ইহাই আমরা প্রার্থনা করি।

মেডিক্যাল লাইসেন্‌শিয়েট্‌

জনসেবায় রত

বর্তমান মহাযুদ্ধ প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। জাপানকে পরাজিত করবার এই প্রচেষ্টায় আমাদের অনেক সৈন্য-সামন্ত হতাহত হবার আশঙ্কা আছে। আহতদের জন্য ডাক্তারের চিকিৎসা, পরিচর্যা ও সহানুভূতি একান্ত ভাবে দরকার। সামরিক ডাক্তারেরা আহত সৈন্যদের চিকিৎসা ক'রে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন শান্তি স্থাপিত হলে বেসামরিক প্রয়োজনে তা বিশেষ কার্যকরী হবে। এই কাজের জন্য "ইণ্ডিয়ান আর্মি মেডিক্যাল কোর"এ আজই নাম লেখান। **প্রবেশ যোগ্যতা :** প্রার্থীদের বয়স সাধারণতঃ ৪৫ বছরের নিচে এবং স্বাস্থ্য সামরিক কাজের উপযুক্ত হওয়া চাই। এল্. সি. পি. এস্., এল্. এম্. এস্. এফ্., এল্. এম্. এফ্., এল্. এম্. পি. অথবা সমপর্যায়ের ডিপ্লোমা থাকা চাই।

চাকরির সর্ত

"এ" ক্লাস সার্ভিস : এই কাজে ডাক্তারদের ভারতের বাইরে যেতে হয়, ফলে তাদের অভিজ্ঞতার প্রসারও বেড়ে যায় অনেক। পদোন্নতির সুযোগও প্রচুর। মাইনে সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্টের পদে ৪০০৲ টাকা থেকে শুরু ক'রে পদোন্নতির সঙ্গে বেড়ে লেফটেন্যাণ্ট কর্নেলের পদে ১৩৫০৲ টাকা পর্যন্ত হয়। **"বি" ক্লাস সার্ভিস :** এই কাজে ডাক্তারদের ভারতের মধ্যেই কাজ দেওয়া হয়। চরম উন্নতি ক্যাপ্টেনের পদে। মাইনে সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্টের পদে ২৫০৲ টাকা থেকে শুরু করে ক্রমে ক্যাপ্টেনের পদে ৫৫০৲ টাকা পর্যন্ত হয়।

এলাওয়েন্স (দু' ক্লাসেরই জন্য) স্পেশালিস্টদের (বিশেষজ্ঞ) মাইনে: যাঁরা স্পেশালিস্ট হিসেবে নিযুক্ত হন তাঁদের নির্দিষ্ট মাইনের উপরে ১০০৲ টাকা বেশি দেওয়া হয়। সামরিক চিকিৎসকদলের কর্তৃপক্ষে নিযুক্ত অফিসারদের মাইনের উপরে ৩০৲ টাকা থেকে ২৪০৲ টাকা পর্যন্ত বেশি দেওয়া হয়। **পোষাক পরিচ্ছদের জন্য** নিয়োগের সঙ্গে ৭৩৩৲ টাকা দেওয়া হয়। **অগ্রিম বেতন :** নিয়োগের প্রথমে ৩০০৲ টাকা পর্যন্ত দেওয়া হয়। **গ্র্যাচুইটি :** সমর বিভাগ ছাড়ার পর প্রত্যেক বছরের জন্য এক মাসের নির্দিষ্ট মাইনে হিসেবে টাকা পাওয়া যায়। তা ছাড়া শারীরিক অক্ষমতার জন্য পেন্‌শান্, পরিবার ও বিধবা স্ত্রীর ভরণ-পোষণ এবং সন্তানের শিক্ষার খরচ সবই চলতি রেগুলেশান্ অনুযায়ী পাওয়া যায়। ইণ্ডিয়ান ল্যাণ্ড ফোর্সের অন্যান্য অফিসারদের মতো সেপারেশান্ এলাওয়েন্স, ট্রাভেলিং এলাওয়েন্স এবং লীভ কন্‌সেশান্‌ও পাওয়া যায়।

বিস্তারিত খবরাখবর নিম্নলিখিত অফিসারদের কাছ থেকে পাবেন : প্রাদেশিক 'মেডিক্যাল ডিপার্টমেণ্টে'র কর্তাদের কাছে (বেসামরিক হাসপাতালের সার্জন জেনারেল বা ইন্‌স্পেক্টার জেনারেল) ; ভারতীয় সামরিক হাসপাতালের কর্তাদের কাছে ; জি. এইচ. কিউ. নিউ দিল্লীতে "ডিরেক্টার অব মেডিক্যাল সার্ভিসেস্"এর কাছে অথবা নিউ দিল্লীতে "ডিরেক্টার জেনারেল, ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিস"এর কাছে।

ইণ্ডিয়ান আর্মি মেডিক্যাল কোর



(১৪)

ঘরের ভেতর চরকাটার দিকে নজর পড়লো মাধুরীর। মনটা খুশী হয়ে উঠলো। ওর মধ্যে একটা শান্তির মন্ত্র আছে, সকল শ্রান্তি ও উত্তেজনার মধ্যে এক পরম প্রসন্ন আশ্রয়। গান্ধীজী বলেছেন, এই ক্ষুদ্র যন্ত্র চরকা তোমার ধ্যানের সাথী। সকল বিকার বন্ধ হবে, সকল ধাঁধাঁ ঘুচে যাবে, মনের অন্ধকারে জ্যোতি ফুটে উঠবে—ঐ চরকায় একবার হাত দাও। সকল অনুতাপ থেকে মুক্ত হবে, সকল গ্লানির আবরণ ঘুচে যাবে, চরকার গুঞ্জরণের ছন্দে তোমার চিন্তাকে সঁপে দাও।

হাত মুখ ধুয়ে, কাপড় ছেড়ে, চরকাটাকে আন্তরিক আগ্রহে কাছে টেনে নিল মাধুরী।

পাশের ঘর থেকে সঞ্জীববাবু একবার বিরক্ত হয়ে অনুযোগ করলেন—আবার এত রাতে চরকা নিয়ে পড়লি কেন মাধুরী? সারাদিন হৈ-চৈ করে তবু তোর একটু ক্লান্তি আসছে না, আশ্চর্য!

মাধুরী উত্তর দিল—বেশীক্ষণ নয়, এক্ষুনি রেখে দেব। কিছু ভাল লাগছে না।

সঞ্জীববাবু সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন—কেন রে?

মাধুরীর কথা শুনে যেন একটু চমকে উঠেছেন সঞ্জীববাবু, তাঁর গলার স্বরে সেই রকম একটা চাপা আতঙ্কের ধ্বনি মিশিয়েছিল।

মাধুরী নিজেই লজ্জিত হয়ে আর কোন উত্তর দিতে পারলো না। সঞ্জীববাবুর ব্যাকুল প্রশ্নের সাড়াও চাপা পড়ে গেল চরকার একটানা ঘর্ঘর্ শব্দের উচ্ছ্বাসে।

কতক্ষণ ধরে চরকা চালিয়েছে, সেই হিসাব জানে না মাধুরী। মনটা বেশ লঘু হয়ে গেছে। গভীর রাত্রি সারা মান্দারগাঁকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। মাধুরীর মনে পড়লো, আজ এক্ষুনি চিঠিটা শেষ করে রাখা উচিত, নইলে আবার এক সপ্তাহের মধ্যে বিলেতের ডাক পাওয়া যাবে না। এক মাস আগে এসেছে তার চিঠি, আজও নানা কাজের চাপে চিঠির উত্তর দেওয়া হয় নি। মনে মনে যেন ক্ষমা প্রার্থনা করলো মাধুরী।

সব কথা আজ তাকে খুলে লিখতে হবে। কেন কলেজ ছেড়ে দিলাম, বার বার এই প্রশ্ন করে সে লিখেছে। বার বার এই প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেছে মাধুরী। আজ আর সংকোচ করে লাভ নেই। দেবুদা বিলেত থেকে ফিরে আসবে আর এক বছরের মধ্যে, কিন্তু তার ফিরে আসতে আরও তিন বছর। সেই প্রবাসী হৃদয়ের শূন্যতাকে সান্ত্বনায় ভরে রাখার কাজে যেন কোন ত্রুটি না আসে। সময় মত চিঠি দেওয়া উচিত। অতীতের কোন প্রতিজ্ঞার মুখ চেয়ে তার বর্তমানের সবচেয়ে সজীব সত্তাকে সে অস্বীকার করতে পারে না। যে আশ্বাস নিয়ে পরিতোষ বিলেত চলে গেছে, সেই আশ্বাস নিয়েই সে ফিরে আসবে। তার এক তিল ব্যতিক্রম করবার পাপ যেন মাধুরীকে অর্জন করতে না হয়। নির্ভয়ে নিরাপদে সে আবার ফিরে আসুক, হোক্ না তিন বছর দেরী, তাতে কিছু আসে যায় না। শুধু সে যেন বদলে না যায়। জীবনের সাথীরূপেই তাকে যেন আবার ফিরে পাওয়া যায়।

নিজেকে ঠকাতে চায় না মাধুরী। আজ মাধুরী মর্মে মর্মে বুঝতে পারে, তার জীবনের পথে গুরুর চেয়ে সাথীর দরকার সব চেয়ে বড়। গুরু না হলেও চলতে পারে, সাথী ছাড়া চলতে পারে না, জীবনে প্রথম যাকে সাথীত্বে বরণ করে নিয়েছে সে তার বিশ্বাসের দুয়ারে কোন অপমান যেন না পোঁছায়।

দোয়াত ও কলম নিয়ে চিঠি লিখতে বসলো মাধুরী। আজ প্রাণমন দিয়ে সে তার নূতনকেই আপন করে ধরে রাখতে চায়। পিছিয়ে যাবার সামর্থ্য তার নেই। অতীত তার কৃতঘ্নতার দিকে তাকিয়ে অভিশাপ দিক, শান্ত মনে সকলই সহ্য করবে মাধুরী। কিন্তু বর্তমানের চোখের জল সে সইতে পারবে না।

বিদায় দেবার আগের দিন তার শেষ চোখের জল মাধুরী নিজের হাতেই মুছে দিয়েছিল। দেবু আর পরিতোষের বিলেত যাত্রার পথে বোম্বাই পর্যন্ত সঞ্জীববাবু গিয়েছিলেন, মাধুরীও গিয়েছিল। জাহাজ ছাড়ার আগের দিন এলিফ্যান্টা দ্বীপে বেড়াতে গিয়েছিল সবাই মিলে। কী মোহময় আবেশে, চাঞ্চল্যে পুলকে ও বেদনায় সারা দিনটা কেটে গিয়েছিল।

পরিতোষ আর মাধুরী দুজনে চুপ করে বসেছিল বড় গুহার বিরাট মূর্তিটার পায়ের নীচে। ত্র্যম্বক সদাশিব মূর্তি। কী বিরাট সান্ত্বনার আশ্বাস ভরে আছে সদাশিবের সুগম্ভীর মুখচ্ছবির মধ্যে। নিখিলের কল্যাণের ভার নিয়ে সদাশিব জাগ্রত প্রহরীর মত বসে আছেন, তাকিয়ে আছেন সম্মুখের আরব সমুদ্রের দিকে। *এই সমুদ্রের জলে কাল সকালে পরিতোষের* জাহাজ ভেসে চলে যাবে। কিন্তু সদাশিবের চক্ষে সেই আশ্বাস আছে, কাল যে চলে যাবে, চার বছর পরে তিনিই তাকে সকল দুঃখ বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দেশের মাটিতে ফিরিয়ে আনবেন। কিছু ভয় করার নেই মাধুরীর। মাধুরী পরিতোষের চোখের জল নিজের হাতে মুছে দিয়েছিল।

পুরনো কথা ভাবতে গিয়ে কিছুক্ষণ চিঠি লেখা বন্ধ ছিল মাধুরীর। কিন্তু আর দেরী করা উচিত নয়, রাত অনেক হয়েছে। সঞ্জীববাবু জানতে পারলে ধমক দেবেন।

তাড়াতাড়ি চিঠিটা শেষ করলো মাধুরী।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মান্দার গাঁয়ের প্রাণ এক বিচিত্র উন্মাদনার হর্ষ ও কলরবের মধ্যে জেগে উঠলো। দূরে ও নিকটে নানা সুরের জয়ধ্বনি শোনা যায়। তার প্রতিধ্বনি গুমরে ওঠে চারিদিকে। তরুবীথিকার শীর্ষ ছাপিয়ে সেই শব্দের উচ্ছ্বাস আকাশের পথে ছড়িয়ে পড়ে। এক অভিনব উৎসবের রূপে শত যুগের সঞ্চিত আগ্রহ যেন এক পবিত্র সুযোগের লগ্নে বর্ণে শব্দে ও চাঞ্চল্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। শুধু মান্দার গাঁ নয়, ক্রোশ ক্রোশ দূরের গাঁ বস্তি ও ডিহির প্রাণে প্রাণে একই সুরের সাড়া জেগেছে, ঠিক একই মুহূর্তে দূর গফুরাবাদের মাঠে চাষীদের জনতা, দূর মন্তরবাড়ির শালবনে ঘেরা ডিহিতে সাঁওতাল নরনারী মেলা, জেলা বোর্ডের সড়কে বড় বড় গাছের মাথায় এক একটি জাতীয় পতাকা ত্রিবর্ণের বৈভবে আকুল হয়ে উড়ছে। মান্দার গাঁয়ের কালীতলার প্রাঙ্গণে ছাত্রদের সভা বসে গেছে, সেখান থেকে সদলবলে তারা রওনা হবে এই মুহূর্তে, দক্ষিণ কুঠির পতিত মাঠের দিকে। সব আয়োজন পূর্ণ, জাতীয় বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা হবে সেইখানে।

শেষ রাত্রির অন্ধকার প্রভাত ফেরীর গানের আলোড়নে যেন ভেসে চলে গেছে দূর দিগ্বলয়ের দিকে। আর এই অন্ধকার ফিরে আসবে না, সেই সঙ্গে মান্দার গাঁয়ের শত বছরের ভীরুতা যেন দূরে পালিয়ে গেছে।

জেলা বোর্ডের সড়কের দিকে তাকালে দেখা যায়, বিচিত্র এক একটি জনতার

অভিযান চলেছে। কোন্ দিকে যায়, কেন, কি উদ্দেশ্যে কিছু বোঝা যায় না। শুধু মনে হয়, সবাই যেন নিজের নিজের অন্তরের ইঙ্গিতে কর্তব্যের দিশা পেয়ে গেছে। সবাই ছুটেছে। বক্ষে সাহস, চক্ষে উৎসাহ আর সারা মুখে নিঃশঙ্ক প্রতিজ্ঞার দীপ্তি নিয়ে তারা চলেছে এক অজানার প্রেরণায়।

এরই মধ্যে খবর এসে গেছে, গফুরাবাদের মাঠে এক খণ্ডবিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠেছে। সাত শো লাঙল নিয়ে চাষীরা নেমে পড়েছে বিশ বিঘা আন্দাজ এক পড়ো মাঠের ওপর। কেউ তাদের শিখিয়ে দেয়নি, তবু চাষীরা বুঝে ফেলেছে, সেই চিরকেলে ইতিহাসের সত্যকে, এ জমি তাদেরই জমি। এত উর্বর সুফলা মাটীর ক্ষেতকে অনাবাদী করে রাখার কোন অধিকার নেই জমিদারের। জমি ভগবানের জিনিস। সবারই তার ওপর সমান অধিকার। পৃথিবীতে যখন বৃষ্টিদার, আলোদার, রৌদ্রদার ও হাওয়াদার নামে কোন বাবুর দল নেই, তখন জমিদার কেন হবে? জমিকে অনাবাদী করে রাখা পাপ, এ-পাপ তারা দূর করবে, এ-জমি তারা চাষ করবেই।

লাঠি হাতে জমিদারের পাইক আর দারোয়ানেরা দাঁড়িয়েছিল মাঠের সীমানা আগলে। কোন ভ্রূক্ষেপ না করে চাষীরা লাঙল নিয়ে মাঠে নেমে পড়েছে।

মাতব্বর মালিক মিঞা হাতযোড় করে জমিদারের সরকারকে জানিয়ে দিয়েছে—রাজাবাবুকে আমাদের আরজি জানিয়ে দেবেন সরকার মশাই, হয় তিনি নিজে এ-জমি চাষ করুন, নয় আমাদের চাষ করতে দিন। এ-জমি তো পড়েই রয়েছে, আমরা যদি চাষ করি, তবে রাজাবাবুর কোন ক্ষতি নেই।

সরকার মশাই প্রশ্ন করলেন—খাজনা?

মালিক মিঞা উত্তর দিল—আমাদের সেলাম জানাবেন রাজাবাবুকে, এই আমাদের খাজনা। এর বেশী কিছু এখন বলতে পারি না।

ছোট একটি টাট্টু-ঘোড়ায় চড়ে তড়বড়িয়ে একটি লোক মান্দার গাঁয়ের ভেতর ঢুকলো। এ-পাড়া ও-পাড়া ঘুরে, কি-এক গোপন বার্তা শুনিয়ে চলে গেল।

আজ সকাল থেকে এইভাবে নানা গ্রাম থেকে এক-একটি বার্তা দৌড়ে দৌড়ে ছুটে আসছে মান্দার গাঁয়ে। আবার দৌড়ে চলে যাচ্ছে।

মন্তরবাড়ির সাঁওতালদের খবর চলে এসেছে এরই মধ্যে। শালবনের ধারে টাঙি হাতে শত শত সাঁওতাল দাঁড়িয়েছে। আজ আর কোন নিষেধ শুনে পিছিয়ে যাবার কথা তারা ভাবে না। কোন ফরেস্ট গার্ডের মূর্তি আদের আর সন্ত্রস্ত করে না। এই জঙ্গলের শাল-মহুয়ার ছায়া আর ডাল-পালার মালিক আবার কে? এর মালিক ধরিত্রী। সেই ধরিত্রীর দান বন্ধ করবে কেন রেঞ্জার সাহেব? কেন খাজনা চাইবে? কেন এক বোঝা শুকনো কাঠ কুড়োতে লাইসেন্স নিতে হবে? কি অদ্ভুত বিধি?

না, আজ আর সেদিন নেই। কত লক্ষ বছর ধরে তারা এই বনের আগুনে নেচে গেয়ে পুজো করেছে। সেই যখন আকাশ মেঘে ঢাকা ছিল, সূর্য দেখা দিত না, তখন থেকেই বোঙ্গার আশীর্বাদে বনের আগুনে তাদের শীত দূর হয়েছে, পথের কাঁটা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

সাঁওতালেরা দলে দলে রিজার্ভ জঙ্গলে কাঠ কাটছিল, মেয়েরা গান গাইছিল। নতুন এক জাতীয় উৎসবের পুলকে তাদের সারা অন্তর উথলে পড়ছিল। ফরেস্ট গার্ডেরা চুপ করে দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল এই উৎসব।

আমবাগান পার হয়েই জেলাবোর্ডের সড়কের মোড়ে সাত-আটটা গরুর গাড়িকে আটক করে দাঁড়িয়েছিল একটি জনতা। সংখ্যায় প্রায় সাত শত। স্বতন্ত্র ভারত কি জয়। মহাত্মা গান্ধী কি জয়! সাত শত কণ্ঠের গভীর নির্ঘোষে এক নতুন সংগ্রামের বাণী মান্দার গাঁয়ের বুকে প্রকম্প সৃষ্টি করছিল। এই সংগ্রামের বর্ণ-শব্দ রূপ সবই অভিনব। লাঠির আস্ফালন নেই, দন্তঘর্ষণ নেই, রুদ্র কটাক্ষ নেই—এক রূঢ়তাহীন, গঞ্জনাহীন, নিরভিশাপ সংগ্রাম। কোন অমঙ্গলের পসরাকে আজ গাঁয়ের পথে ঢুকতে দেওয়া হবে না। বাধা আজ দিতেই হবে। বহু যুগ ধরে, নেহাৎ তাদেরই আলস্যের পাপে, গাঁয়ের নির্বাধ পথে বহু পাপ ঢুকে পড়েছে। বিলাতি লবণে বোঝাই এই সাতটি গরুর গাড়িকে আজ আর সেই সুযোগ দেওয়া চলে না। সাত শত জনতা গরুর গাড়ির পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিল।

গাড়োয়ানদের চীৎকারে আর লবণের মালিক সাহু মহাজনের ধিক্কারে বৃথা সকাল বেলার বাতাস অপরিচ্ছন্ন হয়ে উঠছিল। বেলা বাড়ছিল, রোদের তাপে জনতার মুখ ঝলসে উঠছিল।

এক সাহু মহাজন হঠাৎ গাড়ি থেকে নেমে লাঠি তুলে সামনের লোকটির মাথায় সরোষে একটি আঘাত জমিয়ে দিল। একজন ভলান্টিয়ার আর দু-চারজনে মিলে আহত লোকটিকে তুলে নিয়ে গাছতলায় শুইয়ে দিল।

কয়েকটি মুহূর্তের মত জনতা শুধু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এক নিদারুণ ভ্রান্তি হিংসার রূপে মুহূর্তের মত তাদের চিন্তা ও কর্তব্যকে পথ ভুলিয়ে দেখার ছলনা নিয়ে দেখা দিল। সাতটি গাড়োয়ানের মূর্তির দিকে জনতা একদৃষ্টি দিয়ে তাকিয়েছিল।

কিন্তু ভলান্টিয়ার ছেলেটি জয়ধ্বনি করলো—সত্যাগ্রহ কি জয়।

জনতার মুখশ্রী মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল। জেলাবোর্ডের সড়কের ধুলোয় শত শত মানুষের শরীর লুটিয়ে শুয়ে রইল। বিলিতি লবণের গাড়ি যদি গাঁয়ে ঢুকতে চায়, ঢুকুক, তাদের বুকের ওপর দিয়ে চলে যাক। চাকার দাগ পড়ুক তাদের পাঁজরে।

সারা গাঁয়ের মাটির আড়ালে যেন এই ঘটনা আর দৃশ্যগুলি বীজের মত লুকিয়ে ছিল শত যুগ ধরে। এই হর্ষ, এই নির্ভয়, এই শক্তি। আইন আদালত পুলিশ—যে যেখানে ছিল, আজও সবই অটুট আছে। কিন্তু গ্রামের জনতার মনের মধ্যে তারা আজ বাতিল হয়ে গেছে। আজ শুধু ভয়ভাঙার পালা। ভয়ই জীবনের পথে সব চেয়ে বড় বোঝা। এই ভয় ভাঙতেও কত আনন্দ!

মান্দার গাঁয়ের দিঘীর ঘাটের কিনারায় আবার বহ্ন্যুৎসব জেগেছে। প্রতি ঘর থেকে ভাঙা কুলোয় ভরে ভরে যত বিলিতি আবর্জনা আর কাপড় এনে স্তূপাকার করা হয়েছে। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ভূদেব চাটুয্যে আর হেডমাস্টার দিনমণি বিশ্বেস চলে গেছেন সদরে।

ঘুম ভাঙতে একটু দেরি হয়েছিল মাধুরীর। সঞ্জীববাবু বললেন—চারদিকে একটা হাঙ্গামা বেধেছে মনে হচ্ছে।

মাধুরী ব্যস্ত হয়ে বললো—আমি যাই।

বেশি দূর যেতে হয়নি মাধুরীর। কালী-তলা পার হয়ে দক্ষিণ কুঠির দিকে যেতে যেতে কোন হাঙ্গামার চিহ্ন দেখলো না মাধুরী। শুধু এক একটা গাছের মাথায় জাতীয় পতাকা দুলছে। বড় বড় গাছের বাকলের ওপর খড়ি দিয়ে স্বাধীন ভারতের আহ্বান মন্ত্র লেখা আছে। নিজের মনের কৌতূহলের নেশায়, এক বিচিত্র কীর্তি-চারিণীর উন্মাদনায় মাধুরী শুধু ব্যস্তভাবে ছুটে পৌঁছলো দক্ষিণকুঠির মাঠে।

জাতীয় পতাকার নীচে প্রতিজ্ঞাপাঠ করে বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা হলো। জাতীয় পতাকার ছায়ায় বসে মাধুরী প্রথম ছাত্রদলের ক্লাস নিল। প্রথম পাঠ শুনলো ছাত্রেরা—ভারতীয় সভ্যতার প্রথম নেতা গৌতম বুদ্ধের জীবনী।

হঠাৎ একটি লোক এসে খবর দিল—সত্যিই হাঙ্গামা বেধেছে। খুনোখুনি বেধে গেছে গাঁজার দোকানের সামনে। যারা পিকেটিং করছিল, তাদের তিন জনের মাথা ফেটেছে, আর......।

মাধুরীর মুখ কালো হয়ে উঠলো। ছাত্রেরা ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো।

একটা এলোমেলো চিন্তার আবর্তের মধ্যে যেন অজ্ঞাতসারে ছাত্রদলের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে মাধুরী যখন গাঁজার দোকানের সামনে পৌঁছলো, তখন দুপুরের রোদ গাঁয়ের বাতাসে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। শত শত

লোক আতঙ্কিত হয়ে একটা কুম্বরের হুল্লোড় সৃষ্টি করছে। দশ বারোজন ভলান্টিয়ার গাঁজার দোকানের পথ রুখে দাঁড়িয়েছিল। সামনে মাটির ওপর ফোঁটা ফোঁটা রক্তের দাগ লেগেছিল। নিকটে অনেক-গুলি লোক বৃত্তাকারে ঘিরে আহত ভলান্টিয়ারদের দিকে তাকিয়েছিল। কেউ বা আপশোষ করছিল, কেউ বা উপদেশ দিচ্ছিলো, কেউ বা একটু বিদ্রূপ করেই বলছিল—যেমন কর্ম তেমনি ফল।

কিসের হাঙ্গামা? কে এই হাঙ্গামা বাধালো? এই হাঙ্গামা থেকে পরিত্রাণের উপায়ই বা কি?

হাঙ্গামা বাধিয়েছে ভজু বাউরী। মদ খেয়ে মাতাল হয়ে এসেছে ভজু। ভজুর মত অমানুষের সত্তা শুধু মদের রসে তৃপ্তি পায় না, এক ভরি গাঁজার ধোঁয়ার জ্বালায় তার হৃদ্‌পিণ্ড ভরে না নিলে ভজু কখনো শান্ত হতে পারে না। সেই ভজুকে ভলান্টিয়ারেরা বাধা দিয়েছে।

ভজু তখনো হুঙ্কার দিয়ে লাঠি আস্ফালন করছিল—আমার পয়সা দিয়ে আমি গাঁজা কিন্‌বো, তোরা বাধা দেবার কে রে বেইমান ভদ্রলোকের বাচ্চা......।

গাঁজার দোকানের রেলিংয়ের আড়ালে বসে ভেণ্ডার রামচরণ ফিক্‌ ফিক্‌ করে হাসছিল।

—যে শালা আমার সামনে আসবি, একটি বাড়িতে নাকমুখের চেহারা বিগ্‌ড়ে দেব।

ভজু আবার হুঙ্কার দিল। সারা জনতা বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতার মধ্যে শুধু থেকে থেকে বিরক্ত দাঁড়কাকের ডাক আর আহত ভলান্টিয়ারের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছিল।

চুপ করে দাঁড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে মাধুরী দেখলো, ধীরে ধীরে জনতা ভেদ করে ভজুর দিকে এগিয়ে আসছে একটি ভদ্রলোক। আজ পাঁচ বছর পরে মাধুরী তাকে দেখলো।

কেশব ভট্‌চায একেবারে ভজুর সম্মুখে এসে ডাক্‌লো—এসব কি হচ্ছে ভজু?

—(ক্রমশ)

সমর প্রসঙ্গ

পূর্ব রণাঙ্গনে লালফৌজ জার্মানীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করার পর থেকেই অনেকে মনে করছেন ইউরোপের যুদ্ধ সমাপ্তির অধ্যায়ে এসে পৌঁছেছে। অতি অল্পকালের মধ্যেই জার্মানী আত্মসমর্পণ করবে একথাও অনেকে অনুমান করছেন। জার্মান রাষ্ট্রনায়কেরা জার্মানী ছেড়ে পলায়নের চেষ্টা করছেন এ ধরণের সংবাদও অল্পবিস্তর রটেছে। আমরা পূর্ব সপ্তাহে বলেছিলাম—"যে বলশেভিক জুজুর আতঙ্ক দেখিয়ে হিটলার ইতিপূর্বে ব্রিটেন ও আমেরিকার প্রতিক্রিয়াপন্থীদের মনে রুশ-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করে রুশিয়ার বিরুদ্ধে দল সংগঠনের ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন, এবারও হিটলার নূতন করে একবার সেই চেষ্টা করছেন বলে মনে হচ্ছে।"

এই দলগঠনের আশা এখনও যে হিটলারের মন থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়নি, তা তাঁর সাম্প্রতিক বক্তৃতার ধরণ থেকেই কতকটা বোঝা যায়। গত ৩০শে জানুয়ারী হিটলার তাঁর ক্ষমতা অধিকারের দ্বাদশ বার্ষিকীতে যে বক্তৃতা করেন, তাতে তিনি বলেন—"আমি পূর্বে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছি তারই পুনরাবৃত্তি করে বলছি—ব্রিটেন যে শুধু বলশেভিজমকে বশে আনতে অসমর্থ হবে তাই নয়, তার নিজের যে সমাজদেহ গড়ে উঠবে তাও এই ক্ষয়কর রোগে জর্জরিত হবে। এশিয়ার তৃণভূমি থেকে যে অকল্যাণকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি আহবান করে আনছে, তার হাত থেকে তারা নিজেরা মুক্ত থাকতে পারবে না। ইউরোপে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো মিত্রপক্ষের প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে আত্মসমর্পণ করেছে তারা সম্পূর্ণ বিনাশের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এই পরিণতি এরূপ অনিবার্য যে তা একটু আগে ঘটুক কি পরে ঘটুক তাতে কিছুই আসে যায় না।" এই বক্তৃতায় হিটলার শুধু বলশেভিজমের ভীতি প্রচারেরই চেষ্টা করেন নাই, রুশিয়ার এই অগ্রগতির ও সাফল্যের ফলে ইউরোপের তথা বিশ্বরাজনীতির নেতৃত্ব যে ইউরোপের হাত থেকে এশিয়ার হাতে চলে যাচ্ছে সে কথাও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। ফলত হিটলার শুধু বলশেভিক মতবাদের প্রশ্নই বড় করে তোলেন নি, তার চেয়েও সংকীর্ণতর এবং মানুষের মনের তীব্রতর যে মনোবৃত্তি মহাদেশিক মর্যাদার প্রশ্ন (যা প্রাদেশিকতার মতই স্থূল) তাকে উস্কিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন।

যুদ্ধ এতদিন যেভাবে চলেছিল তাতে সাময়িকভাবে রাজনীতিক সমস্যাগুলোকে চাপা রেখে জার্মানীর পরাজয়ের প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করতে মিত্রপক্ষের কোন বাধা হয়নি। কিন্তু যুদ্ধ এখন যে স্তরে এসে পৌঁছেছে তাতে রাজনীতিক সমস্যাগুলো অমীমাংসিত রাখা সম্ভব বলে মনে হয় না। কারণ একথা বললে বোধ হয় অন্যায় হবে না যে, জার্মানীর পরাজয় সম্পর্কে মিত্রপক্ষের যতই মতৈক্য থাকুক রাজনীতিক মত ও স্বার্থ তাঁদের সকলের এক নয়। কাজেই এই রাজনীতিক স্বার্থ-সামঞ্জস্যের ওপরই যুদ্ধের গতি ও পরিণতি যে অনেকটা নির্ভর করছে তা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হবে না। এই স্বার্থ-সামঞ্জস্য-



বিধানের জন্যই যে এখন মিত্রপক্ষের বৃহত্তম ত্রিশক্তির অধিনায়কদের বৈঠক হচ্ছে একথাও বোধ হয় স্বচ্ছন্দেই বলা চলে। অবশ্য এই বৈঠক কোথায় হচ্ছে এবং তাতে কি হচ্ছে সে সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ এখনও পাওয়া যায়নি। তবে 'নিউইয়র্ক টাইমস্'এ প্রকাশিত এক সংবাদ উদ্ধৃত করে রয়টার জানিয়েছেন যে, রুশিয়াতেই স্ট্যালিন-রুজভেল্ট-চার্চিলের বৈঠক বসেছে। এ বৈঠকের কোন সংবাদই যখন এখনও পাওয়া যায়নি, ত এ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করে কোন ল নেই। ভবিষ্যতেই যে এ সম্বন্ধে ক সংবাদ প্রকাশিত হবে তাও বলা শক্ত। যুদ্ধের গতি প্রকৃতি দেখেই এই বৈঠ ফলাফল কতকটা অনুমান করা চলবে আপাতত এইটুকুমাত্র বলা চলে যে, এই বৈঠকের গুরুত্ব যে পূর্ববর্তী বৈঠকগুলো অপেক্ষা অনেক বেশি তার প্রমাণ সমস্ত ব্যাপারটাকে গোপন রাখবার এই সয প্রচেষ্টা।

এই ত্রিশক্তি সম্মেলনের ফলাফল যা হোক্ বর্তমানে জার্মানীতে রুশবাহিনীর অগ্রগতি যে অনেকটা মন্থর হয়ে এসে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কোন সমর সংবা- দাতার মতে এই মন্থরতার কারণ হ সরবরাহ অবিচ্ছিন্ন রাখার অসুবিধা এ জার্মানদের দৃঢ়তর প্রতিরোধ। জার্মা এই প্রতিরোধের দৃঢ়তা যে আরও ব পাবে তা অনুমান করলে বোধ হয় হবে না। কাজেই দু'এক সপ্তাহের বার্লিন অধিকৃত হয়ে যাবে বা জার্মানী সমর্পণ করবে এরূপ কোন সম্ভাবনা আ বলে মনে হয় না। জার্মান বাহিনী

হাঙ্গেরীর রাজধানী বুদাপেস্টেই এরূপ প্রবলভাবে প্রতিরোধ চালাচ্ছে যে, ক'মাসের প্রচেষ্টায়ও রুশবাহিনী তা' সম্পূর্ণ অধিকার করতে সমর্থ হয়নি। বুদাপেস্ট অপেক্ষা বার্লিন সংরক্ষণের ব্যবস্থা যে দৃঢ়তর, এবং তা রক্ষার জন্য জার্মান সৈন্য যে আরও অনেক বেশি মরিয়া হয়ে লড়াই করবে তা সহজেই অনুমান করা চলে। তারপর বার্লিনের পতন হলেই জার্মানীর চূড়ান্ত পরাজয় হবেই একথা মনে করবার কোন কারণ আছে বলে মনে হয় না। হিটলারের পেছনে জনমতের সমর্থন থাকলে জার্মানী গেরিলা বাহিনী গঠন করেও কিছুদিন সংগ্রাম চালাবে বলে মনে হয়। ইতিমধ্যে মিত্রপক্ষের সঙ্গে আলোচনার দ্বারা কোন সুবিধাজনক সর্তে যুদ্ধ-বিরতি করবার চেষ্টা করাও তার পক্ষে স্বাভাবিক। সে চেষ্টা ব্যর্থ হলে—হতাশা ও নিরুপায়তায় ক্ষিপ্ত জার্মানীর পক্ষে আন্তর্জাতিক যুদ্ধরীতি ভঙ্গ করে গ্যাসাদির সাহায্যে বিপক্ষধ্বংসের চেষ্টা করাও অসম্ভব নয়। অবশ্য তার প্রতিফলে তার নিজের ধ্বংসও যে অনিবার্য তা বুঝে নিয়ে তাকে এই উন্মত্ত প্রচেষ্টায় ব্রতী হতে হবে। আর ইতিমধ্যে মিত্রশক্তির সহায়পুষ্ট অন্তর্বিপ্লবের ফলে যদি জার্মানীর প্রতিরোধ শক্তি ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে তা হলে জার্মানীর সমস্ত প্রচেষ্টাই যে ব্যর্থ হবে—তাতে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য আপাতত সেরূপ সম্ভাবনা কিছু দেখা যাচ্ছে না। তাছাড়া একথাও এখানে বলা প্রয়োজন যে, সংবাদপত্রের মারফৎ যে সংবাদ পাওয়া যায় তার ওপর ভিত্তি করেই যুদ্ধের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করতে হয়। পরিবেষিত সংবাদে যদি যুদ্ধক্ষেত্রের সম্পূর্ণ চিত্র না থাকে তাহ'লে তার উপর ভিত্তি করে গঠিত অনুমানেও গলদ নিশ্চয়ই থাকবে। আর যুদ্ধের সম্পূর্ণ বিবরণ সংবাদের মারফৎ পেলেও সিদ্ধান্তে ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়। কারণ যুদ্ধালোচনা ভবিষ্যদ্বাণী নয়, যুদ্ধের সংবাদ বিশ্লেষণ করে তার একটা ধারা নির্ণয়ের চেষ্টা মাত্র। একথা সকলেই জানেন যে, যুদ্ধ সব সময় সামরিক ন্যায়শাস্ত্রের বিধান মেনে চলে না, আকস্মিকতাও তার অনেকটা স্থান জুড়ে থাকে।

যা হোক, পূর্ব রণাঙ্গনের শেষ যে সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে মার্শাল জুকভের সেনাবাহিনী কুস্ট্রিন্ ও ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরের মধ্যবর্তী ওডার নদীর নিকটে গিয়ে পেণছেচে। ফ্রাঙ্কফুর্ট ও কুস্ট্রিন দুটিই জার্মানীর প্রধান প্রতিরোধ ঘাঁটি। ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে বার্লিন ৫০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত আর কুস্ট্রিন থেকে বার্লিনের দূরত্ব রেলপথে ৫২ মাইল। কুস্ট্রিন একটি রেলওয়ে জংশন। ফ্রাঙ্কফুর্টের ৪ মাইল পূর্বে কুনেরডর্ফ যুদ্ধক্ষেত্রে এখন লড়াই চলছে বলে মস্কোর ইস্তাহারে প্রচারিত হয়েছে। জার্মানরা এ অঞ্চলে প্রবলভাবে বাধা দিচ্ছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। কুনেরডর্ফের যুদ্ধক্ষেত্র ইতিহাস প্রসিদ্ধ। কারণ এখানেই ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে রুশিয়ানরা ফ্রেডারিক দি গ্রেটকে পরাজিত করেছিল। পোমারানিয়ান অঞ্চলেও মার্শাল জুকভের বাহিনী ক্রমশ স্টেটিনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে বলে জানা গেছে।

মার্শাল কনিয়েভের সেনাবাহিনী গ্রোটকাউয়ের উত্তর পূর্ব অঞ্চলে পেণছেচে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে। গ্রোটকাউ ওপেলন্ থেকে ২৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এখানেও জার্মানরা খুব দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ করছে বলে জানা গেছে।

পূর্ব প্রুশিয়াতে লালফৌজ কেনিগসবার্গের ১৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত ক্রান্‌ৎস দখল করেছে এবং ডানজিগ উপসাগরের তটভূমিতে পেণছেচে বলে সোভিয়েট ইস্তাহারে ঘোষিত হয়েছে।

রুশসৈন্যেরা বুদাপেস্টে রাজপ্রসাদ এলাকায় প্রবেশ করেছে বলে সংবাদ পাওয়া গেছে।

ইউরোপের পশ্চিম রণাঙ্গনে মিত্রপ[illegible]র সৈন্য সীগফ্রীড লাইনের দ্বিতীয় ব্যূহ ভেদ করে ৫ মাইল অ[illegible] শহর দখল [illegible] গেছে। কোলমার [illegible] মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদের [illegible] আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা ক[illegible] অঞ্চলে মিত্রপক্ষীয় সৈ[illegible] হারপারসাইড শহর দুটি দ[illegible] জার্মানদের প্রবল বাধার সম্[illegible] বস্তুত পশ্চিম রণাঙ্গনে মিত্রপ[illegible] পূর্ব রণাঙ্গন অপেক্ষাও মন্থরত[illegible] মন্থর হলেও তারা যে ক্রমশ অ[illegible] চলেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধের সর্বাপে[illegible] সংবাদ আমেরিকান সৈন্যদের ফিলিপা[illegible] রাজধানী ম্যানিলা শহরে প্রবেশ। রয়[illegible] সংবাদ দিয়েছেন মার্কিন সৈন্যেরা অন্ধকা[illegible] গা ঢাকা দিয়ে এই শহরটিকে ঘেরাও করে ফেলে এবং ক্রমশ শহরে প্রবেশ করে। মার্কিন সৈন্যেরা লুজন দ্বীপে প্রথম লিঙ্গায়েন উপসাগরের তীরে অবতরণ করেছিল। তাদের অবতরণের স্থান থেকে ম্যানিলার দূরত্ব ১১৫ মাইল। ২৬ দিনে এই পথ অতিক্রম করে তারা ম্যানিলা শহরে প্রবেশ করেছে। মার্কিন সৈন্য এত সহজে এবং এত দ্রুত ম্যানিলা শহরে প্রবেশ করতে পারবে তা প্রায় কেউই মনে করতে পারে নি। লুজন দ্বীপে জাপানীদের দৃঢ় প্রতিরোধের অভাব যেমন বিস্ময়জনক আমেরিকান সৈন্যদের কৃতিত্ব ও রণকৌশলও তেমনি প্রশংসনীয়। লুজন দ্বীপের সামরিক গুরুত্বের কথা আমরা পূর্বে বলেছি। কাজেই তার আর পুনরাবৃত্তি করবো না। তবে ম্যানিলা অধিকৃত হলে জাপানীদের পক্ষে লুজন দ্বীপ রক্ষা করা যে প্রায় অসম্ভবই হবে তা স্বচ্ছন্দেই বলা চলে। আর লুজন দ্বীপ হাতছাড়া হওয়াকে ফিলিপাইনের ওপর জাপকর্তৃত্বের অবসান বলে ধরে নিলেও খুব অসঙ্গত হবে বলে মনে হয় না। ফিলিপাইনের যুদ্ধে পরাজয় যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে জাপানকে খুব কাবু করে ফেলবে তাতেও কোন সন্দেহ নেই।

—বিষ্ণুগুপ্ত

মাধ্যাকর্ষণের প্রতি

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

ওগো পৃথিবীর মধ্য আকর্ষণ,
উঁচু হতে নীচে সকলেরে তুমি টানো,
নীচু হতে ঠেলে দাও না কারেও তুলে;
একি অকরুণ অমোঘ তোমার স্নেহ?
তোমারি মায়ায় পাহাড়ের চূড়া হতে
নেমে এসে নদী কল-কল্লোলে মিশায় সাগর জলে।
রবি-কর-তাপে জলাশয় হতে বাষ্পের সমারোহ
তোমায় পরোয়া না করে' ঊর্ধ্বে ওঠে,
তুমি মৃদু হেসে অমোঘ মন্ত্র হানো;—

বাষ্পে বাষ্পে এক হয়ে মিশে দেখা দেয় মেঘদল,
নিবিড় ধারায় ঝ'রে পড়ে' শেষে লুটায় তোমারি পায়।

বহ্নি তোমায় অবহেলা করে' তাকায় ঊর্ধ্ব পানে,
অবশেষে হায় রহে না গর্ব তার—
লেলিহান্ শিখা হাওয়ায় মিলায়, পড়ে থাকে শুধু ছাই।
কিন্তু, শুধাই আমি,
তারে কি রাখিতে পারো—
দেহের সীমানা ছেড়ে যার প্রাণ ছোটে অসীমের পা[illegible]

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

৩০শে জানুয়ারী—পরলোকগত রাও বাহাদুর চৌধুরী স্যার ছোটুরামের স্থলে চৌধুরী টীকারাম পাঞ্জাবের রাজস্ব মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন।

আসামের গভর্নর এক আদেশ জারী করিয়া বিনা লাইসেন্সে পাঁচ তোলার অধিক স্বর্ণ ক্রয়, বিক্রয় বা নিজের কাছে রাখা নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

বাঙলা সরকার কলিকাতা শহর ও হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় টীকা গ্রহণ বাধ্যতামূলক করিয়াছেন।

স্বদেশী যুগের নেতা ও চন্দননগরের বর্ষীয়ান জননায়ক শ্রীযুত চারুচন্দ্র রায় গত ২৮শে জানুয়ারী পরলোকগমন করিয়াছেন।

৩১শে জানুয়ারী—কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে নিখিল ভারত রবীন্দ্রনাথ স্মৃতিরক্ষা সমিতির এক অধিবেশনে উক্ত সমিতি পুনর্গঠিত হয় এবং সভায় সমিতির নূতন কার্যনির্বাহক পরিষদ গঠন ও কর্মকর্তা নির্বাচন করা হয়। সভায় নিম্নলিখিত কর্মকর্তা নির্বাচন করা হয়ঃ—স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু প্রেসিডেণ্ট; বিচারপতি শ্রীযুত এস আর দাশ কার্যনির্বাহক পরিষদের চেয়ারম্যান; স্যার বীরেন মুখার্জি কোষাধ্যক্ষ; শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র মজুমদার জেনারেল সেক্রেটারী।

১লা ফেব্রুয়ারী—পাটনার 'সার্চ লাইট' পত্রিকা'র সম্পাদক শ্রীযুত মুরলীমনোহর প্রসাদকে ১৯৪৪ সালের ৩নং অর্ডিন্যান্স অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহার স্বগ্রামে অন্তরীণ করা হয়।

জয়পুর রাজ্যের দেওয়ান স্যার মির্জা ইসমাইলের পত্নীর পরিচিত ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দিয়া জনৈক লোক তাঁহার এক লক্ষ টাকা মূল্যের গহনা লইয়া উধাও হইয়াছে।

গতকল্য পিরোজপুর বাজারে এক অগ্নিকাণ্ডের ফলে প্রায় এক শতখানা দোকান ঘর ভস্মীভূত হয়। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা।

নয়াদিল্লীতে নিঃ ভাঃ খাদ্য সম্মেলনের অধিবেশন হয়। সম্মেলন পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির সুপারিশ করিয়াছেন।

২রা ফেব্রুয়ারী—ইউনাইটেড প্রেস জানিতে পারিয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় পরিষদের আগামী অধিবেশনে হিন্দু বিবাহ বিল সম্পর্কে কোনও প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে না। এইরূপ অনুমিত হয় যে, বিলটি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিদ রাখা হইবে।

৩রা ফেব্রুয়ারী—অদ্য কলিকাতা [illegible] পার্কের নিকট প্রায় ৬জন 'বৈদেশিক' [illegible] পাঁচেক পথচারীকে ছোরার আঘাতে আহত করিয়াছে। গতকল্য মধ্যরাত্রে [illegible] তিন 'বৈদেশিক' জনৈক ট্যাক্সি ড্রাইভারকে [illegible] রীপট করিয়া তাহার ট্যাক্সি লইয়া [illegible] করে।

[illegible] মামলার আসামী সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্টের ডেপুটি কণ্ট্রোলার অব পারচেজ মেজর (বর্তমানে ক্যাপ্টেন) এইচ এইচ বি গিল ও সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্টের ঠিকাদার অনিল লাহিড়ী চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারে অব্যাহতি পাইলে, বাঙলা সরকারের পক্ষ হইতে হাইকোর্টে নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করা হয়। হাইকোর্ট আসামীদের পুনর্বিচারের আদেশ দিয়াছেন।

নয়াদিল্লীতে জমিয়ৎ-উলেমা-ই হিন্দের ওয়ার্কিং কমিটির এক প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, ভারতের ভৌগোলিক ঐক্য বজায় রাখাতেই মুসলমানদের স্বার্থ নিরাপদ থাকিবে।

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভারত সরকারের উপদেষ্টা ডক্টর জন সার্জেণ্ট সমাবর্তনী অভিভাষণ দেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, শিক্ষা বিষয়ে ভারতকে অন্যান্য দেশের সমপর্য্যায়ভুক্ত করাই কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা বোর্ডের লক্ষ্য।

৪ঠা জানুয়ারী—কলিকাতা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে নিঃ ভাঃ মহিলা সম্মেলনের উদ্যোগে এক বিরাট জনসভায় এই মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, পাঁচ বৎসরের কম বয়সের শিশু, আসন্নপ্রসবা ও স্তন্যদাত্রী জননী ও পীড়িতদের জন্য গভর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে আবশ্যক দুগ্ধ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হউক এবং বিভিন্ন জনসমষ্টির আয় অনুসারে জনসাধারণের মধ্যে বিনামূল্যে ও অল্প মূল্যে দুগ্ধ বিতরণের জন্য রেশন প্রথা প্রবর্তন করা হউক।

কলিকাতা ও শহরতলীর ট্রামওয়ে ও অন্যান্য যানবাহন ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ হেতু বাঙলা গভর্নমেণ্টের সহায়তায় একটি ট্রান্সপোর্ট বোর্ড গঠন করা সম্পর্কে কলিকাতা কর্পোরেশনে গত ২২শে ডিসেম্বর এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। উহার উত্তরে ট্রাম কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ড কর্পোরেশনকে জানাইয়াছেন যে, কোম্পানী কলিকাতাস্থ এজেণ্টের মারফৎ সমগ্র ট্রামওয়ে দখলে রাখিবেন বলিয়া ঠিক করিয়াছেন।

ইলোরে অন্ধ্র কংগ্রেস সম্মেলনে এই মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট প্রস্তাবের গণ-সত্যাগ্রহের ধারাটি বাদ দিয়া এবং মহাত্মা গান্ধী মুক্তির পর প্রস্তাবের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা মানিয়া লইয়া অন্ধ্রের কংগ্রেসকর্মীরা এখনও কংগ্রেসের নীতি মানিয়া চলিবে।

৫ই ফেব্রুয়ারী—নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের কলিকাতা শাখা ও কমার্শিয়াল মিউজিয়ামের উদ্যোগে কলিকাতায় নিঃ ভাঃ দুগ্ধ দিবস প্রতিপালিত হয়। এই উপলক্ষে কমার্শিয়াল মিউজিয়ামে দুগ্ধ সম্বন্ধীয় বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রচারের জন্য একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় এবং শ্রীযুত জে সি মুখার্জির সভাপতিত্বে একটি জনসভার অধিবেশন হয়।

মিঃ [illegible] এল কে এলমহার্স্টের সভাপতিত্বে অদ্য শ্রীনিকেতনের [illegible] বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়।

বিদেশী সংবাদ

৩০শে জানুয়ারী—পশ্চিম ইউরোপীয় রণাঙ্গন—মার্কিন তৃতীয় আর্মির সৈন্যরা আউর নদী অতিক্রম করিয়া দুইটি স্থানে জার্মানীতে প্রবেশ করিয়াছে।

পূর্ব ইউরোপীয় রণাঙ্গন—লালফৌজ পোজনানের পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে জার্মান সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছে।

৩১শে জানুয়ারী—পূর্ব ইউরোপীয় রণাঙ্গন—লালফৌজ জার্মানীর ৩০ মাইল অভ্যন্তরে ল্যাণ্ডেসবের্গ দখল করিয়াছে।

পশ্চিম ইউরোপীয় রণাঙ্গন—আকেনের ১৫ মাইল দক্ষিণ-পূর্বস্থ মণ্‌শাউ অঞ্চলে মার্কিন বাহিনী আক্রমণ সুরু করিয়া স্থানে স্থানে তিন মাইলেরও বেশী আগাইয়া গিয়াছে।

ব্রহ্ম রণাঙ্গন—ভারতী ও বৃটিশ সৈন্যগণ [illegible] পর হইতে এক সপ্তাহে তথাকার ২ শত বর্গমাইল পরিমাণ স্থান অধিকার করিয়াছে।

১লা ফেব্রুয়ারী—পূর্ব ইউরোপীয় রণাঙ্গন—বার্লিনের দিকে সোজাপথে অগ্রসর মার্শাল জুকভের বর্শাফলক ফ্রাংকফুর্টের উত্তরে ওডার দীতটে পৌঁছিয়াছে।

নাৎসী প্রচার বিভাগের কর্তা ডাঃ গোয়েবলস বার্লিনের শেষ যুদ্ধের অধিনায়ক নিযুক্ত হইয়াছেন। বার্লিনের চতুর্দিকে পরিখা খনন করা হইতেছে।

পশ্চিম ইউরোপীয় রণাঙ্গন—স্ট্রাসবুর্গের উত্তর দিকে যে সমস্ত জার্মান ছিল তাহারা গাম্বসহাইম পরিত্যাগ করিয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গন—মার্কিন সৈন্যগণ সুবিক উপসাগরের প্রবেশপথে গ্রাণ্ড দ্বীপে অভিযান আরম্ভ করিয়াছে।

২রা ফেব্রুয়ারী—পশ্চিম ইউরোপীয় রণাঙ্গন—মার্কিন সৈন্যদল বেলজিয়াম-জার্মান সীমান্তের নিকট মালমেদীর পূর্বে সিগফ্রীড লাইনের মধ্যবর্তী কতিপয় জার্মান রক্ষাঘাঁটি দখল করিয়াছে। কোলমার ও স্ট্রাসবুর্গের মধ্যবর্তী জার্মান করিডরে প্রতিরোধের অবসান হইয়াছে।

পূর্ব রণাঙ্গন—সোভিয়েট বাহিনী লেজনোর পশ্চিমে জার্মান সীমান্ত অতিক্রম করিয়াছে। ওডার নদীর সম্মুখে মার্শাল জুকভ আজ প্রথম জার্মান ট্যাংক আক্রমণ ব্যর্থ করেন।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গন—আমেরিকানরা ম্যানিলার দক্ষিণে বাতাংগা প্রদেশের পশ্চিম উপকূলে অবতরণ করিয়াছে।

ব্রহ্ম রণাঙ্গন—ইরাবতী নদীর উত্তর তীরবর্তী লেটকাপিন গ্রামটি মিত্রসেনারা দখল করিয়াছে। রামরী দ্বীপের দক্ষিণে সাগু দ্বীপে মিত্র বাহিনী অবতরণ করে।

'পুসিফুট' নামে পরিচিত মার্কিন জননায়ক মিঃ ইউলিয়াম ইউজেন জনসন ৮২ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। সুরাবর্জন বিরোধী আন্দোলন চালাইয়া তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

৩রা ফেব্রুয়ারী—পূর্ব ইউরোপীয় রণাঙ্গন—লালফৌজ লেজনোর পশ্চিমে ওডার নদীতীরে পেঁৗছিয়াছে। ফ্রাংকফুর্টের পূর্বে অবস্থিত স্ট্রেনবের্গের পতন হইয়াছে।

ব্রহ্ম রণাঙ্গন—মিত্রবাহিনী মিনবিয়া অধিকার করিয়াছে।

গ্রীস—এথেন্সের সংবাদে প্রকাশ, রাষ্ট্রদ্রোহ ও হত্যার অভিযোগে সামরিক আদালত কর্তৃক এলাসের আরও তিনজন তরুণ সমর্থক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী—পূর্ব ইউরোপীয় রণাঙ্গন—রুশ ট্যাংক বহর কুয়েস্ট্রিনে প্রবেশ করিয়াছে। মার্শাল জুকভের বাহিনী বার্লিনের ৪৬ মাইল দূরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। লালফৌজ কনিগসবের্গের ৩৩ মাইল দক্ষিণ-পূর্বস্থ বার্টেনস্টেন দখল করিয়াছে।

পশ্চিম ইউরোপীয় রণাঙ্গন—সমগ্র কোলমার শত্রু কবলমুক্ত হয়। মিত্রপক্ষীয় সৈন্য জার্মানীর ভিতরে তিন মাইল প্রবেশ করে। সমগ্র বেলজিয়াম জার্মান কবলমুক্ত হয়।

ব্রহ্ম রণাঙ্গন—মিত্রপক্ষীয় ট্যাংকসমূহ ইরাবতী নদী অতিক্রম করিয়াছে। মিত্রবাহিনী আরাকান উপকূলের ১৩০ মাইলব্যাপী অঞ্চল জুড়িয়া যুদ্ধ করিতেছে।

৫ই ফেব্রুয়ারী—প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণাঙ্গন—আমেরিকান সৈন্যরা ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় প্রবেশ করিয়াছে। লুজনে প্রথম অবতরণের পর ২৬ দিন পরে ম্যানিলার পতন ঘটিয়াছে।